বিষয়-সূচী

(শ্রাবণ, ১৩৭২—পৌষ, ১ ৪২)

খ

চিত্র-সূচী

(কেবল পূর্ণ-পৃষ্ঠ)

বিচিত্রা

বাঁশীর ডাক

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রাবণ, ১৩৪২

নবম বর্ষ, ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৪২ | ১ম সংখ্যা

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু—

শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব স্থির করেছিলুম, ইতিমধ্যে কোনো একটি আমেরিকান কাগজে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়লুম, পড়ে খুসি হয়েছি। আমার মতটি এই লেখায় ঠিকমতো ব্যক্ত হয়েছে। হবার প্রধান কারণ এই, আমেরিকা দীর্ঘকাল থেকে বৈষয়িক সিদ্ধির নেশায় মেতে ছিল। সেই সিদ্ধির আয়তন ছিল অতি স্থূল, তার লোভ ছিল প্রকাণ্ড মাপের। এর ব্যাপ্তি ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তার ফলে সামাজিক মানুষের যে পূর্ণতা সেটা চাপা পড়ে গিয়ে বৈষয়িক মানুষের কৃতিত্ব সব ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজ হঠাৎ সেই অতিকায় বৈষয়িক মানুষটি আপন সিদ্ধিপথের মাঝখানে অনেক দামের জটিল যান বাহনের চাকা ভেঙে কল বিগড়িয়ে ধূলায় কাৎ হয়ে পড়েছে। এখন তার ভাবনার কথা এই যে, সব ভাঙাচোরা বাদ দিয়ে মানুষটার বাকী রইল কী। এতকাল ধ'রে যা কিছু সে গড়ে তুলছিল, যা কিছুকে সে সর্ব্বোচ্চ মূল্য দিয়েছিল তার প্রায় সমস্তই বাইরের। বাইরে যখন ভাঙন ধরে তখন ভিতরটাতে যদি দেখে সমস্ত ফাঁক তা হোলে সান্ত্বনা পাবে কী নিয়ে। আসবাবগুলো গেল কিন্তু মানুষটা কোথায়। সে এই ব'লে শোক করছে যে সে আজ ভিক্ষুক, বলতে পারছে না আমার অন্তরে সম্পদ আছে। আজ তার মূল্য নেই কেননা সে আপনাকে হাটের মানুষ ক'রে তুলেছিল, সেই হাট গেছে ভেঙে।

একদিন ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ, তখন ধনলাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না, কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে। সেই লক্ষ্য নির্ণয় করা, অভ্যাস করা, তার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। অবশ্য তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্ত্বা ব্যবহারিক পারমার্থিককে মিলিয়ে। সংস্কৃতির অভাব আছে অথচ দক্ষতা পুরোমাত্রায় এমন খোঁড়া মানুষ চলেছিল বাইসিক্‌ল চ'ড়ে। ভাবেনি কোনো চিন্তার কারণ আছে, এমন সময় বাইসিক্‌ল্ পড়ল ভেঙে। তখন বুঝল বহুমূল্য যন্ত্রটার চেয়ে বিনামূল্যের পায়ের দাম বেশি। যে

মানুষ উপকরণ নিয়ে বড়াই করে সে জানে না আসলে সে কতই গরীব। বাইসিক্‌লের আদর কমাতে চাইনে, কিন্তু দুটো সজীব পায়ের আদর তার চেয়ে বেশি। যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তাকেই ধন্য বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল ক'রে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব।

যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন এই লক্ষ্যটাই আমার মনে প্রবল ছিল। আসবাব জুটে গেলে তাকে ব্যবহার করার জন্যে সাধনার দরকার নেই কিন্তু আসবাব নিরপেক্ষ হয়ে কী ক'রে বাহিরে কর্ম্মকুশলতা ও অন্তরে আপন সম্মানবোধ রক্ষা করা যায় এইটেই শিক্ষাসাধ্য। তখন আশ্রমে গরীবের মতোই ছিল জীবনযাত্রা, সেই গরীবিয়ানাকে লজ্জা করাই লজ্জাকর এ কথাটা তখন মনে ছিল। উপকরণবানের জীবনকে ঈর্ষা করা বা বিশেষভাবে সম্মান করাই যে কুশিক্ষা এ কথাটা আমি তখনকার শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে রেখেছিলুম।

বলা বাহুল্য, যে দারিদ্র্য শক্তিহীনতা থেকে উদ্ভূত সে কুৎসিত। কথা আছে শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা, তেমনি বলা যায় সামর্থ্যবানেরই ভূষণ অকিঞ্চনতা। অতএব সামর্থ্য শিক্ষা করাই চাই ভোগের অভ্যাস বর্জ্জন ক'রে। সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়। অক্ষমকে দেবতা ক্ষমা করেন না।

আমি সব পারি, সব পারব, এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের শরীর মন যেন তৎপরতার সঙ্গে বলতে পারে। আমি সব জানি এই কথা বলবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় মন উৎসুক হয় তো হোক কিন্তু তার পরেও চরমের কথা আমি সব পারি। আজ এই বাণী সমস্ত য়ুরোপের। সে বলে, আমি সব পারি, সব পারব। তার আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করার অন্ত নেই। এই শ্রদ্ধার দ্বারা সে নির্ভীক হয়েছে, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হয়েছে। আমরা দৈবের দিকে তাকিয়ে আছি সেই জন্যে বহু শতাব্দী ধ'রে আমরা দৈব কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত।

সুইডেনের বিখ্যাত ভূপর্য্যটক স্বেন্ হেডিনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনেকদিন পরে আবার আমি পড়েছিলুম। এসিয়ার দুর্গম মরুপ্রদেশে আবহতত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণের উপায় করবার জন্যে তিনি দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই অধ্যবসায়ের মূলমন্ত্র হচ্চে আমি সব জানব, সব পারব। এই পারবার শক্তি বলতে কী বোঝায় সে তাঁর বই পড়লে বোঝা যায়। আমরা কথায় কথায় ওদের ব'লে থাকি বস্তুতান্ত্রিক। আত্মার শক্তি যার এত প্রবল যে জ্ঞান অর্জ্জনের জন্যে সে প্রাণকে তুচ্ছ করে, যার কিছুতে ভয় নেই, সাংঘাতিক বাধাকে যে স্বীকার করে না, দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনে যাকে পরাহত করতে পারে না, প্রাণপণ সাধনা এমন কিছুর জন্যে যা আর্থিক নয়, জীবিকার পক্ষে যা অত্যাবশ্যক নয়, বরঞ্চ বিপরীত, তাকে বলব বস্তুতান্ত্রিক! আর সে কথা বলবে আমাদের মতো দুর্ব্বল আত্মা!

আমরা সব কিছু পারব এই কথা সত্য ক'রে বলবার শিক্ষাই আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারে, এ কথা ভুললে চলবে না। আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্ম্মে সকল ইন্দ্রিয় মনের

তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক্, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্ত্তব্য ব'লে মনে করতে হবে। জানি এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক, পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্ম্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হোতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই সব চিরপঙ্গু মানুষের অকর্ম্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী ক'রে? উদ্যোগিনঃ পুরুষসিংহমুপেতিলক্ষ্মীঃ—আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তাহোলেই বুঝব দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হোতে চলল। এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্‌সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয়, চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্ম্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নিভর ক'রে কর্ম্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়, অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্য চর্চ্চায় নয়, পৌরুষচর্চ্চায়। সাধারণ ইস্কুলে এই সাধনার সুযোগ নেই, আমাদের আশ্রমে আছে। এখানে নানা বিভাগে নানা কর্ম্ম চল্‌ছে, তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করাতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই।

এই কৃতিত্ব শিক্ষা অত্যাবশ্যক হোলেও এই যে যথেষ্ট নয় সে কথা মানতে হবে। আমেরিকান লেখক এই কথাটারই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিষ কেমন ক'রে স্খলিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্চে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্য্যকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হোতে পারে?

সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জ্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কাজ উদ্ধার করবার উপযোগী বিনয়কৌশল তার অনুশাসন নয়, সংস্কৃতিবান মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। সে আড়ম্বরপূর্ব্বক নিজেকে প্রচার করতে বা স্বার্থপর ভাবে সবাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রসর করতে লজ্জা বোধ করে! যা কিছু ইতর বা কপট তার গ্লানি তাকে বেদনা দেয়। শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকলপ্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায়। সে বিচার করতে পারে, ক্ষমা করতে পারে, মত বিরোধের বাধা ভেদ ক'রেও যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে তা দেখতে পায়, অন্যের সফলতাকে ঈর্ষা করাকে সে নিজের লাঘবতা ব'লেই জানে।

সমগ্র মনুষ্যত্বের স্বকীয় আদর্শ প্রত্যেক বড়ো সমাজেই আছে। সেই আদর্শ কেবল পাঠাগারে নয় পরিবারের মধ্যেও। আমাদের দেশে বর্ত্তমান দুর্গতির দিনে সেই আদর্শ দুর্ব্বল হয়ে গেছে তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিদিন দেখতে পাই। তাই বীভৎস কুৎসা আমাদের দেশে আয়জনক পণদ্রব্য হয়ে উঠেছে। তারস্বরে নিন্দা বিস্তার ক'রে বাতাসকে বিষাক্ত করার অপরাধকে আমরা গ্রাহ্যই করিনে, একটু উপলক্ষ্য ঘটবামাত্র এই বীভৎসতাকে উদ্ভাবিত করার ও প্রশ্রয় দেবার লোক দলে দলে ভিড় ক'রে আসে, ইতর

হিংস্রতায় সমস্ত দেশ মারীগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ মেধার গুণে আমরা পড়া মুখস্থ করি, বি·এ এম এ পাস করি, কিন্তু আত্মলাঘবকারী পরস্পরের সৌভাগ্যবিদ্বেষী নিন্দালোলুপ যে চরিত্রদৈন্য শুভকর্ম্মে পরস্পরকে মিলিত হবার পথে পথে সচেষ্ট ভাবে কাঁটার বীজ বপন করে চলেছে, সকল প্রকার সদনুষ্ঠানকে জীর্ণ বিদীর্ণ করে দেবার জন্যে মহোল্লাসে উঠে প'ড়ে লেগেছে, সে কেবল সংস্কৃতির অভাবে মনুষ্যত্বের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লেই সম্ভব হোলো। সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহপূর্ব্বক নিজেদেরকে অকৃতার্থ করে আজ বাঙালী সমস্ত পৃথিবীর কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল। শিশুকাল থেকে এই ইতরতার বিষবীজ শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্মূলিত করা আমাদের বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হোক এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। এর একমাত্র উপায় হচ্চে পরীক্ষা পাসের জন্যে পড়া মুখস্থ করা নয়, মানুষের ইতিহাসে যা কিছু ভালো তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয় সাধন করিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ সর্ব্বদা ঘটিয়ে দেওয়া। একদা আশ্রমে আমার কবি-সহযোগী সতীশ রায় এই কাজ করতেন এবং আর একজন সহযোগী ছিলেন অজিত চক্রবর্ত্তী। তেমন শিক্ষক নিঃসন্দেহ এখনো আমাদের মধ্যে আছেন কিন্তু রক্তপিপাসু পরীক্ষা-দানবের কাছে শিশুদের মন বলি দিতে তাঁদের এত অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয় যে শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না।

আমেরিকান লেখক সংস্কৃতির এই ফলশ্রুতি বর্ণনা করেছেন,—তিনি বলেন, সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য্য ঘটে যাতে ক'রে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে, আত্মসংযম আসে, এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে।

একদিন দেখেছিলেম শান্তিনিকেতনের পথে গোরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে গিয়েছিল, আমাদের ছাত্ররা সকলে মিলে ঠেলে গাড়ি উদ্ধার ক'রে দিলে, সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে যখন উপস্থিত হলেন, তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিলনা, আমাদের কোনো তরুণ ছাত্র অসঙ্কোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথিমাত্রের সেবা ও আনুকূল্য তারা কর্ত্তব্য বলে জ্ঞান করত, সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্ম্মাণ করেছে গর্ত্ত বুজিয়ে দিয়েছে, এসমস্তই তাদের সতর্ক বলিষ্ঠ সৌজন্যের অঙ্গ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম করে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। সেইসব ছেলেদের প্রত্যেককে তখন আমি জানতেম, তারপরে অনেকদিন তাদের অনেককে দেখিনি,—আশা করি তারা নিন্দাবিলাসী নয়, পরশ্রীকাতর নয়, অক্ষমকে সাহায্য করতে তারা তৎপর—এবং ভালোকে তারা ঠিকমতো যাচাই করতে জানে। ইতি

১৫ জুলাই ১৯৩৫

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে লিখিত পত্র

নিয়তিবাদের নব্য প্রতিবাদ

বীরবল

১

Science,—বাঙলায় আমরা যাকে বলি বিজ্ঞান, সে বিদ্যার যে ইউরোপে জন্ম, তা আমরা সকলেই জানি। আর উনবিংশ শতাব্দীতে এ বিদ্যা যে অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে, তার প্রমাণ আমরা নব নব যন্ত্রপাতির প্রসাদে নিত্য প্রত্যক্ষ করছি ও চমৎকৃত হচ্ছি।

এই যন্ত্রারূঢ় বিজ্ঞানকে আর্থিক বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ টাকা করাই যন্ত্রনির্ম্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্য: দেশকালকে সংক্ষিপ্ত করা উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মাত্র।

এই আর্থিক বিজ্ঞানের পিছনে আছে পারমার্থিক বিজ্ঞান,---ইংরাজরা যাকে বলেন Theoretical Science। কারণ এ বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট করা। একটি উদাহরণ দেই। পৃথিবী ত্রিকোণ, এ হচ্ছে অবিদ্যার কথা; আর সেটি গোলাকার, এই হচ্ছে বিদ্যার কথা।

যন্ত্রপাতি সব পারমার্থিক বিজ্ঞান থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিম্বা পারমার্থিক বিজ্ঞান যন্ত্র থেকে আবির্ভূত হয়েছে; সংক্ষেপে জ্ঞানের মূল ক্রিয়া, অথবা ক্রিয়ার মূল জ্ঞান, সে আলোচনা বৃথা। আমার ধারণা, machine এবং mechanics শ্রুতিস্মৃতির মত "ব্যতিষঙ্গাৎ পরস্পরম্।" তাহলেও আমাদের শাস্ত্রকাররা শ্রুতিকেই মূল বিদ্যা বলে স্বীকার করেছেন। সেই নজিরের বলে আমিও Newtonএর Principiaকে বিজ্ঞানের মূল বলেই গ্রাহ্য করছি। গত যুগের এঞ্জিনীয়াররা তাঁদের আঁকজোখ সব Newtonএর আবিষ্কৃত তত্ত্ববিদ্যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে Newton এর revealed ধর্ম্মই বৈজ্ঞানিকদের সনাতন ধর্ম্ম হয়ে উঠেছিল।

২

উনবিংশ শতাব্দীর এই সনাতন ফিজিক্স এখন নব্য ফিজিক্স হয়ে উঠেছে; যেমন এদেশে ন্যায়, নব্যন্যায়; অলঙ্কার নব্য অলঙ্কার হয়ে উঠেছিল। আমি 'উঠেছে' বলছি এই জন্য যে, দাঁড়িয়েছে বলা যায় না। নব ফিজিক্সের কোন দাঁড়াবার স্থান নেই। দেশকালাবচ্ছিন্ন atomই ছিল সনাতন ফিজিক্সের অখণ্ড ও নিরেট ভিত্তি। এখন Eddingtonলিখিত সুসমাচার শুনুন—

"As for the external objects remorselessly dissected by science, they are studied and measured, but they are never known. Our pursuit of them has led from solid matter to molecules, from molecules to sparsely-scattered electric charges, from electric charges to waves of probability."

(New Pathways in Science, pp 322-23)

এর অর্থ কি বুঝলেন? অর্থ এই—

"ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙ্গে দু-ধারে।" এ উক্তি কবির কবিত্ব নয়, চরম বিজ্ঞান। এখন জিজ্ঞাস্য,---কিসের ঢেউ? ক্ষিত্যপতেজমরুৎব্যোমের নয়—"সম্ভবের।" এর নির্গলিতার্থ হচ্ছে এ বিশ্বে সৎ-বস্তু নেই, অসৎ বস্তুও নেই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন:—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

(গীতা, ২য় অধ্যায়, ১৬শ শ্লোক)।

এর থেকে আন্দাজ করছি, ফিজিক্সের সনাতন তত্ত্বদর্শীরা সব সদ্‌বাদী ছিলেন, নব্যেরা হয়েছেন স্যাৎ-বাদী। স্যাৎবাদ এদেশেও পাষণ্ড মত বলে নিন্দিত ছিল। কারণ ও মত হচ্ছে বেদবাহ্য জৈন ধর্ম্মের মত। সে যাই হোক্, এই নব্য স্যাৎ-বাদীরা আমাদের নব বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন। এ বিশ্বকে বোধহয়

ধূমজ্যোতির সন্নিপাত বলা যায়। এখন এই স্যাং বিশ্বরূপ একনজর দেখে নেওয়া যাক্।

৩

নব-বিজ্ঞানের হাতে পড়ে' বিশ্ব বর্ত্তমানে তার স্থূল দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করেছে। সাদা কথায় বহির্জগতের এখন আর কায়া নেই, আছে শুধু ছায়া (shadows)। অর্থাৎ যা ছিল বাস্তব, এখন তা হয়েছে শুধু সিনেমার ছবি। অভিনয় অবশ্য পুরোদমে সমানই চলছে। শুধু এ অভিনয় atom-এর পুতুলনাচ নয়- প্রতীকের (symbols) ছায়াবাজী।

এই বস্তুশূন্য বিদ্যুৎ-কণাগর্ভ বিশ্বের আকারও বদলে গিয়েছে। এ জড় বিশ্ব অনন্ত বটে, কিন্তু অসীম নয়---সসীম। পটাকাশ এখন ঘটাকাশ হয়ে গিয়েছে। আর তার সীমা-রেখাও সোজা নয়, বাঁকা। তারপর এই ফাঁকা ও ফাঁপা বিশ্ব নাকি ক্রমে আরও ফেঁপে উঠছে (expanding universe)। নব্যফিজিক্সের আদিগুরু Einstein বিশ্বের এই স্ফীতিধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না।

আমরাও বলি "অলমতি বিস্তারেণ"। এই সসীম বিশ্ব ত অসীম হতে পারবে না। সরল রেখারইত ধর্ম্ম প্রসারণ, বক্ররেখার আকুঞ্চন। সে যাই হোক, সনাতন ফিজিক্সের উপর একটা বৈজ্ঞানিক দর্শনও গড়ে উঠেছিল, যা অতি সহজবোধ্য, অতএব লোকায়ত। কারণ ও দর্শন আসলে স্পর্শন। Matter এবং Motion দুই আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য,--প্রথমটি ত্বকের, দ্বিতীয়টি পেশীর। এ দর্শন আমাদের Common-sense, ভাষান্তরে লৌকিক ন্যায়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু নব্য ফিজিক্স Common-senseএর সঙ্গে Scientific spiritএর যোগসূত্র ছিন্ন করেছে। কাজেই আমরা নব-ফিজিক্সের মধ্যে দিশেহারা হয়ে যাই। বিশ্বের এ অবস্থায় সনাতন বৈজ্ঞানিক দর্শনও অনবস্থা দোষে দুষ্ট হয়েছে। ফলে গত শতাব্দীর সর্ব্বাস্তিবাদ এখন বিজ্ঞানবাদে পরিণত হয়েছে। শূন্যবাদের পরিণাম যে বিজ্ঞানবাদ, তার প্রমাণ নাগার্জ্জুনের উত্তরাধিকারী হচ্ছেন অসঙ্গ। বৌদ্ধদর্শনের ক্রমবিকাশের ধারাও এই। এখন নব্য ফিজিক্স ও সনাতন ফিজিক্সের সাম্প্রদায়িক কলহের আর এক কথা শুনুন।

৪

নব্য ফিজিক্স নিয়তিবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে। ইংরাজিতে যাকে determinism বলে, তার দেশী নাম বোধহয় নিয়তিবাদ। Eddington বলেন যে determinisimএর অর্থ এই :—

"Yea the first morning of creation wrote
What the last Dawn of reckoning shall read."
(Omar Khayyam).

অর্থাৎ উক্ত পারসিক কবির বিশ্বাস ছিল যে, বিশ্বগ্রন্থ ফারসি হরফে লেখা। আমরা এ গ্রন্থের যেটি শেষ পাতা বলে' ভুল করি, সেইটেই তার প্রথম পাতা। এ মতের নাম কি নিয়তিবাদ নয়?---ভাষায় যাকে বলে কপালের লেখা। এখন Eddingtonএর বক্তব্য শোনা যাক্ :—

"Physical Science is no longer based on determinism. Determinism is often called the law of causality. Nothing is left of the old scheme of causal law।" (New Pathways in Science, pp. 77—78).

অর্থাৎ আ-মহৎ অণু পর্য্যন্ত অখিল বিশ্ব যে কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলে বাঁধা, তার কোন প্রমাণ নেই। পরমাণুর ভগ্নাংশ অণুগুলি---যাদের চরমাণু বলা যেতে পারে---তারা নেহাৎ বেপরোয়া ও খামখেয়ালী; আর তাদের লীলাখেলা হচ্ছে লুকোচুরি খেলা। "ঈশ্বরাসিদ্ধ প্রমাণাভাবাৎ", এ কথা শুনলে ভগবদ্ভক্তের দল যেরকম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, সনাতনীর দল এ নাস্তিক মত শুনে তেমনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন; বিশেষতঃ তাঁরা যখন তাঁদের আস্তিক মত প্রমাণ করতে পারছেন না, শুধু করবেন বলে শাসাচ্ছেন। নব্য ফিজিক্সের এ মত সাচ্চা কি ঝুটো, তা আমি বলতে পারিনে, পারেন আমার বন্ধু—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আমি এই পর্য্যন্ত জানি যে, তর্কটা সেকেলে।

৫

আমাদের দেশেও একমাত্র বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে "ত্রৈলোক্যং কার্য্যকারণাত্মকং" (বিজ্ঞানভিক্ষু, যোগবার্ত্তিক)। এই সাংখ্যমতই হচ্ছে এ দেশের সনাতন determinism।

তারপর গীতায় পাই বেদান্তজারিত সাংখ্যমত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :—

"কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।"
(গীতা, ১৩শ অধ্যায়, ২১ শ্লোক)

এই দু'মুখো মতের ইংরাজী নাম Semi-determinism, যা' অল্পবিস্তর আমাদের অনেকেরই মত। অর্থাৎ প্রকৃতি কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাবদ্ধ, কিন্তু পুরুষ চিৎশক্তিবিশিষ্ট বলে' মুক্ত।

সনাতন বৈজ্ঞানিকরা অবশ্য এ মত গ্রাহ্য করতে পারেন নি, কারণ তাঁরা চেতন অচেতন সকল বস্তুকেই এক সূত্রে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, আর সে সূত্র হচ্ছে কার্য্যকারণের সূত্র। কাজেই তাঁরা প্রকৃতির ধর্ম্ম পুরুষে আরোপ করেছিলেন। পুরুষ চিরকালই এ অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু সে প্রতিবাদ লৌকিক---বড়জোর দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক নয়। কারণ এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের উপরই বিজ্ঞান দাঁড়িয়েছিল। নব্য ফিজিক্স এ অতিদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ নব-বৈজ্ঞানিকরা পরমাণুর বুক চিরে বেচারাকে খণ্ডবিখণ্ড করে' প্রকৃতির অন্তরে এ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ পাননি। ফলে বিশ্বের ধ্রুবপদ এখন খেয়ালে পরিণত হয়েছে।

নব বিজ্ঞানের এই ফতোয়া শুনে জনৈক পলিটিসিয়ান Sir Herbert Samuel ভীত হয়েছেন। তিনি বলেন যে, এ বৈনাশিক মত যদি গ্রাহ্য হয়, তাহলে লোকযাত্রা বিনষ্ট হবে। কিন্তু এ ভয় তাঁর অমূলক। Electron ও মানুষ স্বাধীন বটে, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ পরমাণু ও সমাজবদ্ধ লোক উভয়েই আচারের অধীন; আর সে আচারের নাম "গড়পড়তার নিয়ম" বা Statistical law—যার উপর জীবন-বিমা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রকৃতি কার্য্যকারণাত্মক নাহলেও আচারভ্রষ্ট নয়। বলা বাহুল্য অঙ্কজ সূক্ষ্ম প্রকৃতি কার্য্য-কারণের বশীভূত নাহলেও, ইন্দ্রিয়গোচর স্থূল প্রকৃতি উক্ত নিয়মের অধীন।

নব্যদের বৈজ্ঞানিক মত যদি সত্য হয়, তাহলে এ বিশ্ব এখন একটা Mysterious universe হয়ে উঠেছে। কিন্তু যা-কিছু mysterious, আমরা তারই রহস্য ভেদ করতে চাই। তাই Jeans এখন নব বিজ্ঞানের New background পত্তন করছেন ও Eddington তার New Pathwaysএর পরিচয় দিচ্ছেন; অর্থাৎ নব-বিজ্ঞানের প্রস্থানভূমিও নতুন, আর মার্গও নতুন। এর থেকে বোঝা গেল, সনাতন বিজ্ঞানের জমির জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান। আর এই নব্য পথ হচ্ছে 'মহাজনো যেন গতঃ' সে পথ নয়; এ হচ্ছে "অতিগণিতের" (Super-mathematicsএর) মার্গ। অতিগণিতের প্রসাদে যা পাওয়া যায় তা' অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অর্থাৎ অবিজ্ঞেয়। এই সব কথা শুনে একটি কথা মনে হয়। এই নব-বিজ্ঞানবাদ, ব্রহ্মবাদের গা ঘেঁষে যাচ্ছে। তার কারণ ছায়াবাদ মায়াবাদের মাসতুতো ভাই। এতে আমাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হবার কথা নয়। কারণ মায়াবাদ ত আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তা' ছাড়া সনাতন বিজ্ঞানের পূর্ব্বমীমাংসা যখন অপদস্থ হয়েছে, তখন তার উত্তরমীমাংসাও আবির্ভূত হতে বাধ্য। আর এ মীমাংসার মূলসূত্র হচ্ছে—অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।

যাক্—এ সব বিচারবিতর্কে আমাদের ভয় পাবার কোন কথা নেই। বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ উড়ে গেলেও ত তার যন্ত্রভাগ থাক্‌বে। সোভানাল্লা। পৃথিবীর সার বস্তু হচ্ছে যন্ত্রণা,—মন্ত্রণা নয়। আর যন্ত্রমন্ত্র সবই এই যন্ত্রণা লাঘবের জন্য আমাদের মনগড়া ও হাতগড়া ফিকির মাত্র।

বীরবল

২৮শে জুন, ১৯৩৫

সান্ধ্য সনেট

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১

গোধূলি আড়ালে বসি' এক যে রূপসী
সন্ধ্যার রহস্যে কোটী তারকার বাতি
একে একে জ্বালি' দেয়—কি সুরে হরষি'
ধীরে ধীরে মহাকাশ জেগে ওঠে মাতি'
দূর নভস্থলে স্বচ্ছ নীলকান্ত-ভাতি
রহস্য সঙ্গীতে কার ভাঙে চূর চূর,
নূপুর-গুঞ্জন ভেসে আসে সারা রাতি
এ-প্রাণ ভাসিয়া যায় দূর অতি দূর।

সেই সে রূপসী যার আঁখির পল্লব
উদাসী করেছে মোরে জন্ম জন্মন্তর,
তাই এ ধরণী মোরে না দেয় বিভব
বিলাসী-পাগল ফিরি যুগ যুগান্তর,
জানি মোর সে প্রেয়সী নাহি দেবে ধরা
তাই চির বাজে মোর প্রেম-সপ্তস্বরা।

২

আজি এ সন্ধ্যায় কি যে লাগিতেছে ভালো
যেন সর্ব্বকাল তরে কামনার দেশ
পার হ'য়ে আসিয়াছি,—দুচোখে বুলালো
কে যে কি তুলিতে কোন অঞ্জন বিশেষ,
হেরি তাই জলে স্থলে এ কোন অশেষ
আপন আবেশ-মাখা সঙ্গীতের আলো
দিয়েছে বিচ্ছুরি ঘন,—কার্পণ্যের লেশ
আজি পৃথ্বী-বুক হতে নিঃশেষে মিলালো।

যদি এই সন্ধ্যাখানি সঙ্গীতের সুরে
রহিত এ চিত্ত-তলে বাঁধিয়া কুলায়
একটী বিহঙ্গ সম,—যদি ব্যথাতুরে
নিত যেথা চির মুক্তি-সমীর বুলায়—
হায় যদি হত সত্য এই সন্ধ্যাখানি
চির জন্ম জন্মান্তর লয়ে তার বাণী!

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বদেশ-কল্যাণ-সঙ্ঘের মাসিক অধিবেশন বসবে সন্ধ্যা সাতটায়, এখন ঘড়িতে বাজলো চারটে। অনেক দেরি। এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেণ্ট এককড়ি। প্রদীপে আলো জ্বালাবার লোকের অভাব হয় নি, কিন্তু তেল যোগাতে হয় একাকী তাকেই। তার গৃহেই সঙ্ঘের অফিস, তার বসবার ঘরেই বসে সঙ্ঘের বৈঠক। মেঝেয় আগাগোড়া সতরঞ্চি পাতা, তার উপর ফর্সা চাদর এবং দেয়ালের ধারে ধারে রাখা অনেকগুলি তাকিয়া। এরই একটা অধিকার ক'রে এককড়ি গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে চোখ বুজে বোধ করি বা একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল এমন সময়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রবেশ করলে জলধি। আসন গ্রহণ ক'রে ডাকলে, এককড়ি দাদা কি ঘুমিয়ে পড়লেন ?

এককড়ি চোখ মেলে উঠে বসলো। হাই তুলে তুড়ি দিয়ে গম্ভীর মুখে বললে, গভীর চিন্তামগ্ন ছিলুম। তার পরেই একটুখানি হেসে ফেলে বললে, ঘুমিয়ে পড়লেও দোষ নেই রে জলধি, বয়স তো হলো। এখন এইটেই স্বধর্ম্ম।

জলধিও হাসলে, বললে ইস্! ভারি ত বয়েস।

যৌবনের প্রথম দিকটা এককড়ির শেষ হয়-হয়। রগের কাছটায় চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু সুগঠিত দেহে শক্তি ও উদ্যমের অবধি নেই। এককড়ি বিপত্নীক। প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে আছে শুধু তার বছর দশেকের মেয়ে আর এক বিধবা পিসি। পাটের ও তিসির ব্যবসায়ে পিতা এত অর্থ সম্পদ রেখে গেছেন যে তাকে প্রভূত বলাও চলে। পরে পরে অনেকগুলি ভাই-বোন মরার পরে এককড়ির জন্ম, তাই ছেলেবেলায় এত সাবধানে তাকে রক্ষা করা হয় যে-সে প্রায় একপ্রকার পাগলামির অন্তর্গত। পিতা স্কুলে পর্য্যন্ত কখনো ছেলেকে পাঠান নি,—বাড়ীতেই নিযুক্ত ছিল মাষ্টার ও পণ্ডিত। নাম-জাদা ও উচ্চ বেতনের। ছাত্রের সম্বন্ধে তাঁদের সার্টিফিকেটের ভাষা ছিল উদার, কিন্তু বিদ্যার পরীক্ষা যাকে দিতে হয়নি তার বাজার দর কতো-এবং বাগ্দেবী সত্যই তাকে বর দিলেন কি পরিমাণ, এ তথ্য নিরূপণ করা আজ কঠিন। পাঠ সাঙ্গ হলো, শিক্ষকগণ বিদায় নিলেন, তবু লাইব্রেরী ঘরেই দিন কাটলো তার এতদিন। পিসিমার

বহু অশ্রুপাত অগ্রাহ্য করেও সে যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেনি বইয়ের শেল্‌ফগুলো ছাড়া এ রহস্য আর কেউ জানে না। এমনি করেই তার দিন কাটতে পারতো কিন্তু পারলো না। হঠাৎ বন্দে-মাতরমের বিরাট কঠিন ধ্বনি কোটর থেকে টেনে তাকে বার করলে। তারপরে জেলে গেলো, দলা-দলির আবর্ত্তে পড়ে নাকে-মুখে পাঁক ঢুকলো, দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রদত্ত নানা বিচিত্র বিশেষণের মালা শিরোপা পেলে, শেষে একদিন যাদের সংসার চালিয়েছিল তারাই চোর বলে যখন কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলে তখন সে আর সইলো না, পলিটিক্সে জলাঞ্জলি দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে আবার তার লাইব্রেরী ঘরে এসে আশ্রয় নিলে। কিন্তু দেশোদ্ধারের নেশা তখন পাকা করে ধরেছে, তাই পুরনো বইয়ের মধ্যে আর তার মৌতাতের খোরাক মিললো না, আবার তাকে অস্থির করে তুললে। এবার কতকগুলি ছেলে-মেয়ে জুটলো—তারাও তখন পলিটিক্সে তোবা ক'রে বেকার হয়ে পড়েছে—বল্‌লে, এককড়ি দা, রাজনীতি আর না, কিন্তু জীবনটাকে কি নিতান্তই ব্যর্থ করে আনবো, দেশের একটা কাজেও লাগবে না? এ দুর্গতি থেকে বাঁচাও—যাতে হোক লাগিয়ে' আমাদের দিয়ে তুমি কাজ করিয়ে নাও।

এককড়ি রাজি হলো। স্থির হলো এবারের প্রোগ্রাম সোসেল সার্ভিস। গ্রামে, নগরে, পল্লীতে—সর্ব্বত্র কেন্দ্র সংস্থাপন করা। জলধি বললে, বিদ্যায়, জ্ঞানে, চরিত্রে, অর্জ্জনে, সঞ্চয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দেশের মানুষকে সচেতন করতে না পারলে ঘরে-পরে কেবল বিদ্বেষ আর কলহ দিয়েই সঙ্কট মোচন হবে না। যোগ্য না হলে যোগ্যতার পুরস্কার পাবে কার কাছে? পেলেই বা থাকবে কেন? ধনীর কুপুত্রের মতো। বিত্ত-সম্পদ যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে লোপ পাবে—চক্ষের পলক সইবে না,—কমলা অন্তর্হিত হবেন। এসব যুক্তি শাশ্বত সত্য—অকাট্য। এর বিরুদ্ধে তর্ক চলে না।

অতএব প্রতিষ্ঠিত হলো কল্যাণ-সঙ্ঘ। গ্রামে গ্রামে প্রসারিত হলো শাখা প্রশাখা। অধ্যক্ষ এককড়ি, সচিব জলধি। নানা শাখার সদস্য সংখ্যা দুশোর বেশি। আজকের দিনে মাসিক অধিবেশনের বৈঠকে সাধারণতঃ হাজির যারা হয় সে-ও জন পঞ্চাশের কম নয়। দূরের সদস্যদের ট্রেণ ভাড়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

নীচের যে ঘরটায় সঙ্ঘের অফিস সেখানে বসে যে-মেয়েটি অবিশ্রাম কেরাণীর কাজ করে তার নাম মণিমালা। মাসিক ত্রিশ টাকায় সে ভর্ত্তি হয়, সম্প্রতি খুসি হয়ে এককড়ি মাইনে বাড়িয়েছে পঞ্চাশ টাকায়। গোড়ায় এককড়ি তাকে বাড়িতে থাকতেই বলেছিল, কারণ ঘরের অভাব নেই, কিন্তু সে রাজি হয় নি। কাজেই কোথায় তার বাসা—সেখানে নিজে রেঁধে খায়। একলা থাকে। একটা দিনের জন্যে তার কামাই নেই, একটা কাজে তার শৈথিল্য প্রকাশ পায় না। একদা অসহযোগের প্রবল বন্যায় ভাসতে ভাসতে ঠেকতে ঠেকতে সে এ অঞ্চলে এসে পড়ে। সঙ্গে বাবা ছিলেন কিন্তু বুড়ো বয়সে জেলের দুঃখ তাঁর সইলো না—বাইরে এসে যশোর না কোথায় উদরাময়ে মারা গেলেন। মণিমালার প্রাক্তন ইতিবৃত্ত এর বেশি কেউ জানে না। স্বল্পভাষী মেয়ে,—নিজের মুখে প্রায়ই কিছু বলে না। দেখতে সে সুন্দরী নয়, মুখের পরে একটা পুরুষালি ভাব, কাউকে টানে, কাউকে দূরে ঠেলে। বর্ণ কালোর দিকে কিন্তু

মেদ-মাংসের বাহুল্য বর্জ্জিত দীর্ঘচ্ছন্দের দেহ কর্ম্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু তা দেখামাত্রই বুঝা যায়। এবং জন্মভূমি যে পূর্ব্ব-বাঙলার কোন এক স্থলে সে পরিচয়ও ধরা পড়ে তার উচ্চারণে। মনে হয় একদিন কলেজে পড়েছিল সে নিশ্চিত, হয়ত বা কিছু কিছু পরীক্ষা পাশও করেছে, কিন্তু জিজ্ঞেসা করলে বলেনা, শুধু হাসে। তার ইংরাজি ও বাঙলা লেখার শুদ্ধতা ও ক্ষিপ্রতা দেখে এককড়ি অবাক হয়ে যায়। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে প্যাম্‌ফ্লেট ছেপে প্রচার করার বিধি আছে। আগে রচনার ভার ছিল জলধির, এখন পড়েছে মণি-মালার পরে। পূর্ব্বে এই লেখাটা আদায় করতে এককড়ি গলদ্‌ঘর্ম্ম হতো এখন বলামাত্র লেখা আপনি আসে। জলধি সেক্রেটারি, কাট কুট না ক'রে, কলম না চলিয়ে তার মান বাঁচেনা, এককড়ি বিরক্ত হয়ে মণিমালাকে আড়ালে ডেকে বলে ফুলের ক্ষেতে ফাল চালাবার যদি ওর সখ, কিন্তু উলুবনের তো অভাব নেই,—আমাকে বললে একটা দেখিয়ে দিতেও পারতুম,—তাতে কাজ না হোক অকাজ ঘটতোনা। কিন্তু এ লেখাটা যে দশজনে পড়বে মণি, একে নাম সই করে ছাপতে দেবো কি ক'রে? ওকে বোলো এবার থেকে ও-ই যেন দস্তখত করে।

মণিমালা জলধির হয়ে সলজ্জে বলে, কিছু খারাপ হয়নি এককড়ি দা', প্রেসে পাঠিয়ে দিন। সংশোধন গুলো আমার ভালোই লেগেচে।

সেই ভালো বলে এককড়ি ছাপতে পাঠিয়ে দেয়। সঙ্ঘের বাইরের চেহারার একটু নমুনা দিলুম, ভিতরের মূর্ত্তিটা ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে।

জলধি হাত ঘড়িটা মিলিয়ে দেখে বললে, চারটে পনেরো—ভিড় জমতে ঘণ্টা তিনেক দেরী। কিন্তু সঙ্ঘের সেক্রেটারি আমি, সকাল-সকাল আসাই আমার উচিত। খেয়ে দেয়েই আসবো ভেবেছিলুম কিন্তু ঘটে উঠলোনা। পথের মধ্যে ভাবলুম সুরেন আর তারিণীকে ডেকে নিই, কিন্তু পরের কাছে আপনি পাছে মন না খোলেন সেই ভয়ে বিরত হলুম।

এককড়ি বললে, সুরেন তারিণী পর হলো? তবে আপনার বলো কাকে?

বলি শুধু আমার নিজেকে। ওদের সামনে আপনি মন খুল্‌লেও আমি মুখ খুলতে পারতুমনা। ইতিমধ্যে গোটা দুই অনুরোধ আছে দাদা।

কিসের অনুরোধ?

একটা এই যে সঙ্ঘের আপনিই দেহ, আপনিই প্রাণ। আত্মার আলোচনা করবোনা, অচিন্তনীয় পদার্থ হয়ে তিনি চিন্তার অনধিগম্যই থাকুন। আমরা শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তিনটে বছর ত এই দেহ-যন্ত্রটা টেনে টেনে বেড়ালুম, এবার অনুমতি করুন পরের হাতে ঠেলে ফেলবার আগেই এর গঙ্গা-যাত্রাটা সমাধা করে যাই। দোহাই দাদা, অমত করবেন না হুকুমটি দিন।

প্রার্থনার রসটা এককড়ি বুঝলেনা, সবিস্ময়ে জিজ্ঞেসা করলে, কার গঙ্গা-যাত্রা করতে চাও, আমাদের সঙ্ঘের?

জলধি বললে, ঠিক তাই। মরবেই ত, শুধু নিশ্বাসটুকু বেরোবার পূর্ব্বে একটু সমারোহে ঘাটে নিয়ে যাওয়া।

এককড়ি স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো।

জলধি বলতে লাগলো, আফিস-ঘরে খাতাপত্র গুলো আছে। সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। তা' হোক, ও গুলো শুধু মুমূর্ষুর গায়ের নোঙরা কাপড়-চোপড়। দাম কাণা কড়িও নয়, বরঞ্চ রোগের বীজাণু ছড়াবার আশঙ্কা আছে। চলুন, সদস্য-বৃন্দ সমাগত হবার পূর্ব্বে দেশালাই জ্বালিয়ে সৎকার করে ফেলা যাক।

এককড়ি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে, আজ তোমার হলো কি জলধি?

জলধি বললে, কি হয়েছে সে বিবরণ আপনাকে সবিস্তারে দেবার নয়। মণিমালা উপস্থিত থাকলে সে হয়ত আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারতো।

এককড়ি আবার কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলো, বোধহয় মনে মনে কারণ বোঝাবার চেষ্টা করলে কিন্তু কিছুই স্পষ্ট হলোনা। প্রশ্ন করলে তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ?

জলধি বললে, এটা আরো বেশি দরকারি দাদা। আপনার মামা মস্ত লোক, তাঁকে ধরে করপোরেশনে হোক্, মিউনিসিপ্যালিটিতে হোক, জেলা বোর্ডে হোক, ইন্সিওর কোম্পানিতে হোক,—অর্থাৎ, আপনাদের স্বরাজ-পাণ্ডারা যেখানে বেশ একটু আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে পেরেছেন আমার চাকরি একটা করে দিন। যেন দুমুঠো খেতে পরতে পাই।

এককড়ি ক্ষুব্ধ মুখে, কাতর স্বরে বল্‌লে দুমুঠো খেতে পরতে কি পাওনা জলধি?

পাই বই কি দাদা, নইলে বেঁচে আছি কি করে? দেশের সেবা করি, একেবারে নিঃস্বার্থ। গোলামি করিনে বলে লোক ঠকিয়ে ইজ্জত বজায় করি,—ডান হাতটা ত রেখেছি দিন রাত বক্তার ঘুষিতে পাকিয়ে। তবু অলক্ষ্যে অগোচরে বাঁ-হাতের তেলোর পরে আপনার ছিটে-ফোঁটা মুষ্টি ভিক্ষে যা এসে পড়ে তাতেই শোধ করি মেসের দেনা, খদ্দরের বিল। কুকুর বেরালে যে ভাবে বাঁচে প্রায় তেমনি। আপনি বড় লোক, বিশ-পঁচিশ পঞ্চাশ আপনার হিসেবের মধ্যেই নয়। কিন্তু আর নয় দাদা, এর থেকে ছুটি দিন।

এককড়ি চুপ করে রইলো, কথা কইলে না। দেয়ালের ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো। যে-চাকরটা তামাক বদ্‌লে দিতে ঢুকেছিল তাকে বললে, গোপাল, নীচে থেকে মণিদিদিকে ডেকে দিয়ে যাতো। জলধি, পরের কাছে লজ্জাই যদি বোধ করো—

না না দাদা, পর কোথায়? যে-সব মহাত্মাদের মাঝে ঘোরা ফেরা করি তাঁরা সবাই অন্তরঙ্গ, সবাই আত্মীয়। তাঁদের অজানা কিছুই নেই। বছ'র দশেক স্বদেশ সেবা ব্রতে লেগে আছি, লজ্জা থাকলে বাঁচবো কেন?

চাকরটা গুড়গুড়ির মাথায় কল্‌কে রেখে নীচে যাচ্ছিলো জলধি তাকে বারণ করে বল্‌লে, গোপাল তোর কাজে যা। একটু হেসে বললে, মণিমালা আসেনি এককড়ি দা, মিছে সিঁড়ি ভাঙিয়ে ওকে লাভ কি?

আসেনি? এমন ধারা ত কখনো হয় না।

হয় না বলেই হতে নেই দাদা? আজ তার দেহটা একটু বে-এক্তার—আমিই আসতে বারণ করে দিয়েছি।

কিন্তু অধিবেশনের কাগজ-পত্র ?

কাগজ-পত্র আজ থাক্‌গে।

এককড়ি চিন্তিত সুরে বললে, যাদের কখনো কিছু হয় না তাদের একটা কিছু হলে সহজে সারতে চায় না। ভয় হয় পাছে ওকে ভোগায়।

জলধি চুপ করে রইলো। এককড়ি বলতে লাগলো, চমৎকার মেয়ে। যেমন বিদ্যে বুদ্ধি তেমনি চরিত্রের নির্ম্মলতা। সাহসও তেমনি,—ভয় কাকে বলে জানে না।

জলধি সায় দিয়ে বললে, সাহস আছে তা' মানি।

আমাদের গোপাল ওর বাসা চেনে। সন্ধ্যের পরে তাকে পাঠাবো। যদি ডাক্তারের দরকার হয় দত্ত সাহেবকে ডেকে নিয়ে যাবে।

ডাক্তার বদ্যির দরকার হবে না এককড়ি দা, বরঞ্চ গোপালকে দিয়ে বলে পাঠাবেন আর বেশি অত্যাচার না করে।

কিন্তু অত্যাচার ত সে করে না জলধি।

আপনি বড় সে-কেলে দাদা। সব তাতেই পূর্ব্ব কালের দোহাই পাড়েন, পরিবর্ত্তন মানতে চান না। সে যা হোক্‌গে, মণিমালা এখন যা সুরু করেছেন সাধারণ মানুষে তাকে অত্যাচার না বলে পারে না। ওঁর বাসায় গিয়ে দেখলুম বিছানায় শুয়ে, আর সেই বন্ধুটি শিয়রে বসে দিচ্চে মাথা টিপে।

এককড়ি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বন্ধু আবার কে ? একথা ত কখনো শুনিনি।

আবার সেই পূর্ব্বকালের নজির। কিন্তু তে হি নো দিবসা গতাঃ —বন্ধু কিছু দিন হলো এসেছেন। কোথায় নাকি আগে আলাপ হয়েছিল। চোখ রাঙা, গলা ভেঙেছে, জিজ্ঞেসা করলুম ঠাণ্ডা লাগালে কি করে মণি? মণি লোকটিকে দেখিয়ে বল্লে কাল রমেনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলুম বজ-বজে। বাস্ ছেড়ে গাঁয়ের পথ ধরে দুজনে হাঁটলুম অনেক দূর। গঙ্গার ধারে একটা পুরনো বটগাছ, তার তলায় গিয়ে দুজনে বসে পড়লুম। আকাশে চাঁদ উঠলো, পাতার ফাঁকে ফাঁকে নাম্‌লো জ্যোৎস্নার আলো, সুমুখে নদীর জলে দিলে স্বপ্ন মাখিয়ে,—ভুলে গেলুম ওঠবার কথা। হঠাৎ খেয়াল যখন হলো তখন ঘড়িতে দেখি বারোটা বেজে গেছে। অত রাতে ফেরবার বাস্ পাওয়া যাবে কোথায়, কাজেই রাতটা কাটাতে হলো সেই গাছতলায়। জলের ধারে, খোলা যায়গায় একটু ঠাণ্ডা লাগলো বটে, কিন্তু সময় কাটলো যে কি করে দুজনের কেউ টেরই পেলুম না। কাব্যের চরম।

এককড়ি হতবুদ্ধি হয়ে বল্‌লে, বলো কি জলধি, এ কি সত্যি ঘটনা, না সে তামাসা করলে ?

খামোকা তামাসার ত কোন হেতু ছিল না দাদা। সে সত্যি কথাই বলেছে।

বলতে লজ্জা পেলেনা ?

না। বরঞ্চ শুনে আমিই লজ্জা পেলুম ঢের বেশি। আসবার সময়ে বললুম, এ বয়সে এ্যাডভেন্চারে রস আছে মানি, কিন্তু এককড়ি দা শুনে এ্যাপ্রিসিয়েট করবেন বলে ভরসা করিনে। হয়ত

বা অখুসিই হবেন। সে বললে তাঁর অ-খুসি হবার কারণ তো নেই। আমি ছেলে মানুষ নই এ তাঁর বোঝা উচিত।

এককড়ি আস্তে আস্তে বল্‌লে, বিলিতি গল্পের বয়ে এ-রকম ঘটনা পড়েচি, কিন্তু দেশটাকে কি ওরা বিদেশ বানিয়ে তুলতে চায় না কি?

জলধি ক্রুর হাসি হেসে বললে, ওরা মানে মণিমালা আর তার নতুন বন্ধু। কিন্তু দেশে ওরা ছাড়াও অন্য লোক আছে তারা এ-সব পছন্দ করে না। অন্ততঃ, আমি ত না। এর পরেও যদি আমাদের মধ্যে ওকে রাখতে হয় আমাদের কল্যাণ-সঙ্ঘের নামটা একটুখানি পাল্‌টে নিতে হবে।

এককড়ি নিরুত্তরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

জলধি বলতে লাগলো, এতাবৎ সঙ্ঘের বাবদে আপনার টাকা কম যায়নি। আমাদের টাকা নেই বটে, কিন্তু তবু যা গেছে তার হিসেব নেই। হিসেব করতেও চাইনে। শুধু আবেদন এবার এই বেকার যুবকটির একটা চাকরি করে দিন।

এককড়ি তেমনি নীরবেই বসে রইলো, জলধির কথাগুলো তার কানে গেল কিনা সন্দেহ। দেয়ালের ঘড়িতে সাতটা বাজলো। গোপাল এসে খবর দিলে বাবুরা আসছেন।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

একরাত্রি

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য এম-এ

প্রবল বর্ষণ ভেদ করে আমাদের যাত্রা সুরু হোলো। আশ্বিন মাস। মাঠে মাঠে কাশের হাসি সবে ফুটে উঠতে সুরু করেছে। নিবিড় কৃষ্ণ মেঘের ছায়ায় তাদের শুভ্র সৌন্দর্য্যের ওপরও ম্লানিমা নেমেছে। দু পাশে ঘন বন। বিশাল শাখা-প্রশাখা সমাচ্ছন্ন গাছগুলোর নীচে সাধারণতই অন্ধকার থাকে আজ সেই অন্ধকার আরো গাঢ়, রহস্যময়, হয়ে উঠেছে। বিরাট গুঁড়িগুলোর গা বেয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে, অবিরাম বর্ষার জলে সেগুলোর গায়ে পুরু শ্যাওলার আস্তরণ পড়েছে।

আজ সারাটা দিন যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাটছে। কাল রাতে শোবার পর আজ যে আবার সকাল হয়েছে, জেগে উঠে মোট-ঘাট বেঁধে ট্রেনে করে দূর দেশে চলেছি, তা যেন বিশ্বাস করা শক্ত। যাত্রীদের কোলাহল, ফেরী-ওয়ালার চীৎকার, ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ সবই যেন স্বপ্নের ঘোরে শুনছি। আমার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে শুধু বাজছে বৃষ্টির ঝর ঝর শব্দ আর ট্রেনের একঘেয়ে ঝক্‌ঝকানি। পরিপূর্ণ বর্ষার এই দিনটা ভরা শরৎকালের মধ্যে এসে পড়লো কি করে?……

… … ষ্টেশনে এসে যখন নামলুম তখন বৃষ্টি ধরে গেছে। ঘড়িতে তখন সাড়ে পাঁচটা, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার তখনই বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছে। গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেসা করলুম,—"বাড়ী কতদূর রে?" সে বল্লে, "দূর আছে, বাবু, এক ক্রোশ হবে।"

অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হতে লাগলো। দু'পাশের নালা থেকে অবিরাম ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে, আর তারি সঙ্গে যোগ দিয়েছে সিক্ত বনস্থলীর উল্লসিত ঝিল্লীর দল।…উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের শুভদৃষ্টি হয় দিনের আলোয়। কিন্তু সন্ধ্যার পর—যখন ঝোপে-ঝাড়ে ছায়া জড় হতে থাকে, যখন চারিদিকের আবেষ্টনী হঠাৎ যেন কোন্‌ যাদুকরের ছোঁয়ায় রহস্যময়, অচেনা হয়ে পড়ে, তখন প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষও কেমন দুর্ব্বল, অসহায় বোধ করে। বিশেষ আজকের এই বর্ষা-ঘন রাত্রির প্রথম প্রহরে সময়ের চাকা যেন হঠাৎ থেমে গেছে। নিত্যকার জীবনের সঙ্গে আজকের এই ঝিল্লী-মুখর বর্ষা-রাত্রিটার কোনোই সংশ্রব নেই।…

বাড়ীতে এসে পৌছুলুম। মালী এসে গেট খুলে দিলে ও মালপত্র যথাস্থানে রাখিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ মানুষের কণ্ঠস্বরে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন রইলুম। কিন্তু সামান্য কিছু খেয়ে যখন শয্যা নিলুম, সেই গভীর অন্ধকার ঘরে বোধ হতে লাগলো জগতে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। এই বিশ্বজোড়া বিশাল অন্ধকারে আমি একা। আলো নিবিয়ে দিয়েছিলুম। টর্চ্চ জ্বালিয়ে দেখলুম দমের অভাবে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজলুম। যাক্‌, জগতের সঙ্গে রাত্রির মত সব সম্বন্ধ চুকে গেল।…

…বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তারই সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া। ঝড়ের সে কী ক্ষুব্ধ, উন্মত্ত গর্জ্জন! দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল প্রান্তরের ওপর বাদল বাতাস অশরীরী অশান্ত আত্মার মত গর্জ্জে ফিরছে—সোঁ-ও-ও-সোঁ…। দুয়ার জানালাগুলো সেই বাতাসের বেগে কেবলই খট্‌-খট্‌ করে নড়ে উঠছে। ভিতরে অন্ধকার—নীরব নিষ্ঠুর, নিরন্ধ্র। সে অন্ধকার বর্ণনা করবার ভাষা নেই। চোখ বুজে আছি, কি খুলে আছি হঠাৎ যেন বুঝতে পারা যায় না। মনে হয় হাত বাড়ালেই সে অন্ধকার বুঝি স্পর্শ করা যায়। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ, শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় উন্মুক্ত রেখে বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করছি। মর্ম্মান্তিক, দুঃসহ যাতনায় যে কান্না শুকিয়ে গিয়ে দীর্ঘশ্বাসের আকারে বুকে গুমরে ওঠে, তারই নির্ভুল অভিব্যক্তি ওই ঝড়ের

মাঝে। সে আর্ত্তনাদ কান্নার চেয়েও ভয়াবহ; যেন কোন্ অভিশপ্ত আত্মা মুক্তির কামনায় দ্বারে দ্বারে তার নিষ্ফল কাকুতি নিয়ে আছড়ে পড়ছে। দেহের অবলম্বন যার নেই, দেহীকে জানাতে চায় সে তার মর্ম্মের যাতনা। ভাষার সম্বল তার নেই, তাই তার অবোধ্য আর্ত্ত স্বর শরীরী হয়ে আঁধারে ঘুরে বেড়ায়।...

...নিশ্চল, নিশ্চেতন হয়ে শুয়ে আছি। হাত-পা নাড়বার ক্ষমতাটুকুও বুঝি চলে গেছে। রাত্রি এখন দশটাও হতে পারে, দু'টো হওয়াও অসম্ভব নয়। মনে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে এই নিষ্করুণ অন্ধকারে আমি পড়ে রয়েছি। এর আদিও নেই, অন্তও নেই। এ দুর্য্যোগভরা রাত্রির অবসানে আরাম ও তৃপ্তিভরা সূর্য্যের আলো কোনদিনই দেখা দেবে না। আলোর প্রাণী আমরা পরিপূর্ণ অন্ধকার আমরা সহ্য করতে পারি না। আমার সারা প্রাণ আলোর জন্যে তৃষিত হয়ে উঠ্‌লো—আলো, আলো, ওগো আলো কই?...কখন এক সময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়লুম। নিবিড়তর আঁধারে রাত্রির অন্ধকারও ঢেকে গেল।

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য

পরিচয়

—অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

আজি শেষ হ'লো, ওগো অজানিতা, অপরিচয়ের পালা;
তোমার কণ্ঠে দুলাইয়া দিনু মোর কণ্ঠের মালা!
শুভদৃষ্টির মধ্যতে উছল্ তোমার ও-আঁখি দু'টি
মোর মনোসরে কমল হইয়া, শাশ্বত র'বে ফুটি!
হাতে হাত রেখে রাখী-বন্ধন মনে মনে পড়ে বাঁধা,
এক হ'য়ে গেল দু'টি প্রাণ তাই এক সাথে হাসা-কাঁদা
সুখে দুখে শোকে সমবেদনার আজি হ'তে হ'ল সুরু;
ভীরু কপোতীর মত কেন তব বুক কাঁপে দুরু দুরু!
কোনো ভয় নেই, যে করযুগল নিয়েছি আমার হাতে,
তোমারে ছুঁইয়া শপথ করিনু আজি এই শুভ রাতে,
মোর করতলে বন্দী রহিবে, ছাড়িব না কোনো দিন;
ছিঁড়িবে না তার, যে-তারে আজিকে বাঁধিলে মনের বীণ্!
র'বে অম্লান মোর গৃহ কোণে যে-শিখা হয়েছে জ্বালা!
ওগো অজানিতা, আজি শেষ হ'ল অপরিচয়ের পালা।

শিল্পী রমেন্দ্রনাথ

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বাংলার নবশিল্পকলা অর্দ্ধপথে স্রোত হারাইয়াছে, পনার বিকাশের নূতন নূতন পথ খুঁজিয়া লইতে পারিতেছে শিল্পরসিকমহলে এই গুজবের কাণাঘুষা ক্রমশ মুখর য়া উঠিতেছে। জন্মাবধিই সে পিছনের দিকে মুখ ফিরাইয়া শিল্পকলা নানা পদ্ধতিতে যে মূর্ত্তি ধরিতেছে তাহার সহিত পরিচয় করিয়া লইয়া বাংলা দেশের শিল্পকলা কোনো রস সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না—ধারাবাহিকতার আবর্ত্তে অকালমৃত্যু তাই তাহার আসন্ন ও নিশ্চিত।

রবীন্দ্রনাথ (উড্ এনগ্রেভিং)

সিয়া আছে, তাহার লুব্ধদৃষ্টি অজন্তা গুহার অভিমুখে, পরি-র্শ্বের জীবন-স্রোতের কোন ঢেউ তাহার গায়ে লাগে ই—উৎসুক চিত্তের নিয়ত অনুসন্ধিৎসায় বিভিন্ন দেশে . এই সমালোচনার মধ্যে অনেকখানি যে সত্য আছে তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। ভারতীয়তার নাম লইয়া যে পুনরাবৃত্তি ও অশিক্ষিতপটুত্ব সমাদর পাইতেছে তাহাতে

জননী (উড্-এনগ্রেভিং)

ইঁহাদের সকলেই অবশ্য তাঁহার প্রত্যক্ষ শিষ্য নহেন। আমাদের আলোচ্য শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সাক্ষাৎভাবেই তাঁহার শিষ্য এবং গুরুর পরীক্ষণস্পৃহার বহুলাংশেই তিনি উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

বাংলাদেশের ও ভারতবর্ষের শিল্পরসিকসমাজে রমেন্দ্রনাথ সুপরিচিত—শিবের বিবাহ, বুদ্ধচরিত-চিত্রমালা প্রভৃতি চিত্রে, এবং বাংলার পল্লী ও

আমাদের শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইলে তাহা অস্বাভাবিক নয়। ছবি লইয়া ব্যবসায় যাঁহারা এদেশে করেন, দশের সহিত শিল্প ও শিল্পীর পরিচয় সাধনের ভার যাঁহারা লইয়াছেন, এ-অবস্থার জন্য তাঁহারা কতখানি দায়ী সে-আলোচনা এখানে করিয়া লাভ নাই। তবে মনে হয় যে উক্ত সমালোচনার সবখানিই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লইবারও একান্ত কোনো কারণ নাই। আমাদের বর্ত্তমান শিল্পী-গোষ্ঠীর মধ্যে কেহ অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর প্রতিভার উত্তরাধিকারী হইবেন তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা চলে না; কিন্তু, অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নূতন নূতন পথ খুঁজিয়া লইতে ব্যগ্র, শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে একান্ত মনে পরীক্ষণশীল একদল শিল্পীর কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। একটা সংহত রূপ পায় নাই বলিয়াই আমাদের বর্ত্তমান শিল্প প্রচেষ্টা নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং ইহার সার্থক দিকটা সাধারণের নিকট ও শিল্প-শিক্ষার্থীদিগের কাছে প্রতিভাত হইতে পারিতেছে না।

এই সার্থকনামা শিল্পী-গোষ্ঠীর উদ্ভাবনশীলতা ও পরীক্ষণ-প্রিয়তার বর্ত্তমানে কেন্দ্র হইতেছেন নন্দলাল বসু মহাশয়—

নগরের জীবনযাত্রার বহু ছবি আঁকিয়া তিনি যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁহার অর্জ্জিত এই প্রতিষ্ঠা লইয়া তিনি বাংলা দেশের অনেক শিল্পীর মত খুসি হইয়া বসিয়া নাই, অবিরতই নানা craft ও medium লইয়া চর্চ্চা করিয়া চলিয়াছেন।

ইংরাজিতে যাহাকে Graphic Arts বলা হয় গত কয়েক বছর ধরিয়া বাংলাদেশে তাহার অল্পবিস্তর চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, এবং বিশেষ করিয়া উড্‌কাট ও লিনোকাট ছবির কাজ অগ্রসর হইতেছে। উড্‌কাট উড্-এনগ্রেভিঙ্ ইত্যাদি এদেশে প্রধানত বিদেশ হইতে আমদানী; আমাদের দেশে পূর্ব্বে কাঠখোদাই ডিজাইনের ব্যবহার থাকিলেও, অধুনা বিদেশে শুধু সাধারণ পুস্তকচিত্রে নয়, সূক্ষ্ম ও বিচিত্রভাবের প্রকাশের জন্য কাঠখোদাই পদ্ধতির ব্যবহার যেরূপ বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে তাহা আমাদের দেশে পূর্ব্বে কখনো হয় নাই। তবুও ভারতীয় শিল্পের অন্যতম অগ্রণী নন্দলাল বসু মহাশয় সাদরেই ইহাকে তাঁহার শিষ্যদের শিক্ষণীয় বিষয়ের অঙ্গ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে রমেন্দ্রনাথ ও তাঁহার অন্যান্য সতীর্থগণ এবং তাঁহাদের শিক্ষায় তরুণ শিল্পশিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকে

কাঠখোদাই ছবির চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এবং বহুল-পরিমাণে সার্থকতাও লাভ করিয়াছেন বলিতে হইবে। বিদেশে বহু দক্ষ ও শক্তিমান্ শিল্পীর হাতে এই পদ্ধতিটি বহু বিস্তার-লাভ করিয়াছে এবং বহু বিচিত্র ও বিভিন্নধর্ম্মী ভাবের বাহন হইয়াছে। পুস্তকচিত্রের কাজে ইহার ব্যবহার প্রচুর; মৌলিক ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রেও ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রাত্যহিক জীবনের সামান্য দৃশ্য, অতি তুচ্ছ দিক্, কাঠখোদাইর সাদাকালোর সুষমায় আলোছায়ার সম্পদে অপূর্ব্ব হইয়াছে। সার্কাসে সমবেত জনতার সম্মুখে একটি লোক অদ্ভুত খেলা দেখাইতেছে, একখানি বিদেশী কাঠ-খোদাইর প্রতিলিপিতে (The Circus : Emma Borman) দেখিয়াছিলাম। ইহা যে শিল্পের বিষয়বস্তু হইতে পারে তাহাই হয়ত সাধারণ আমরা অনুমান করিতে পারিনা; অথচ শিল্পীর দরদে ও নৈপুণ্যে সাদাকালোয় এই ছবিখানা সহজেই মনকে আকর্ষণ করে, বিষয়বস্তুর হাস্যকরত্ব তাহাতে বাধা দেয় না বা জোর করিয়া নূতনত্বের 'খাতি'রে শিল্পী উহা নির্ব্বাচন করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। অপরদিকে খ্যাতনামা শিল্পী ফ্র্যাঙ্ক ব্র্যাঙ্গুইন যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবহন বিষয়ক ছবিতে যে জীবন-বেগ স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, যে সুগভীর বেদনা-বোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহা আমাদের ন্যায় সাধারণ দর্শকের মনকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে। অতিসাধারণ ও অসামান্য, দুইরূপ বিষয়বস্তু লইয়াই এই পদ্ধতির চিত্র সার্থক হইয়াছে, এবং বিভিন্নধর্ম্মী শিল্পীগণ আপনাদের বিভিন্নমুখী বৃত্তি ও ভাব-প্রকাশের জন্য অন্যান্য পদ্ধতির সহিত ইহাকেও উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শিল্পীসমাজে ইহার বিশেষ সমাদরের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া, স্বয়ং কাঠখোদাই শিল্পী শ্রীমতী ক্লেয়ার লেটন-ও এই কথাই বলিয়াছেন ঃ

"The wood-block, through its wider range of keyboard from blackest black to dead white permits of a greater precision of tone and of much strong rendering of form which is the intellectual element... The draughtsman, the painter, the sculptor, the decorative designer, the traditional objective artist and the modern abstract artist, one and all can satisfy their particular special talents and temperaments to a degree impossible in any other medium."

সাধারণত ছবিতে যে বর্ণসুষমা সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে উড্‌কাট ও এনগ্রেভিংএ তাহা নাই—কেবল শাদা ও কালোর বিভিন্ন সমাবেশই তাহার উপজীব্য; তাহা অবলম্বন করিয়াই শিল্পীরা যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন

কালীঘাটের শেষ পটুয়া (উড্-এনগ্রেভিং

বর্ণবহুল চিত্র অপেক্ষা তাহা সর্ব্বদা ন্যূন নহে। আমাদের দেশের শিল্পীদের কাজেও তাহার পরিচয় আছে।

রমেন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার উডকাট ও লিনোকাট ছবিগুলি লইয়া একটি চিত্রসংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা ও প্রতিবেশের দৃশ্য লইয়া তিনি যে সৌন্দর্য্যদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সাধারণ "জননী"র ছবিতে, মাতার স্নেহসুকরুণ উদ্বেগনত দৃষ্টিকে রূপ দিয়া তিনি আমাদের দেশের একটি দৈনন্দিন আপাততুচ্ছ দৃশ্যকে মধুর করিয়া তুলিয়াছেন। "কালীঘাটের শেষ পটুয়ার" ছবি আমাদের দেশীয় শিল্পের একটি বিস্মৃত-প্রায় অধ্যায়। বৃদ্ধ পটুয়ার বয়োভারক্লান্ত দেহ ও শ্রান্ত দৃষ্টিকে সমধর্ম্মী দরদের সহিত সহজকরুণ ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

আশ্রম-বিদ্যালয় (উড্-এনগ্রেভিং)

শিল্পরসিকসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। তিনি সম্প্রতি উড-এনগ্রেভিং্ পদ্ধতিতে (ইহা উড্কাট হইতে কিছু ভিন্ন) যে সব ছবি করিয়াছেন তাহা শিল্পীর যশ অক্ষুণ্ণ রাখিবে। "সাঁওতাল জননী" উড্কাট ছবিতে সাঁওতাল রমণীর প্রাণবান্ দেহভঙ্গী, মাতৃত্বের সহজসুন্দর ভাব ফুটাইয়া তিনি পূর্ব্বে সাধুবাদ পাইয়াছিলেন—এইবারে বাংলাদেশের "আশ্রমবিদ্যালয়" ছবিখানি তরুছায়ার মাঝে মাঝে আলোক কণার সম্পাতে সরস। "সাঁওতাল নৃত্য" ছবিখানি শিল্পী ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছিলেন; শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীরূপে থাকিবার সময় প্রতিবেশী সাঁওতালদের জীবনলীলার বিচিত্র আনন্দ ও দৃশ্য শিল্পীর অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে "সাঁওতাল জননী" প্রভৃতি বহু কাঠখোদাই চিত্রে তিনি তাহা
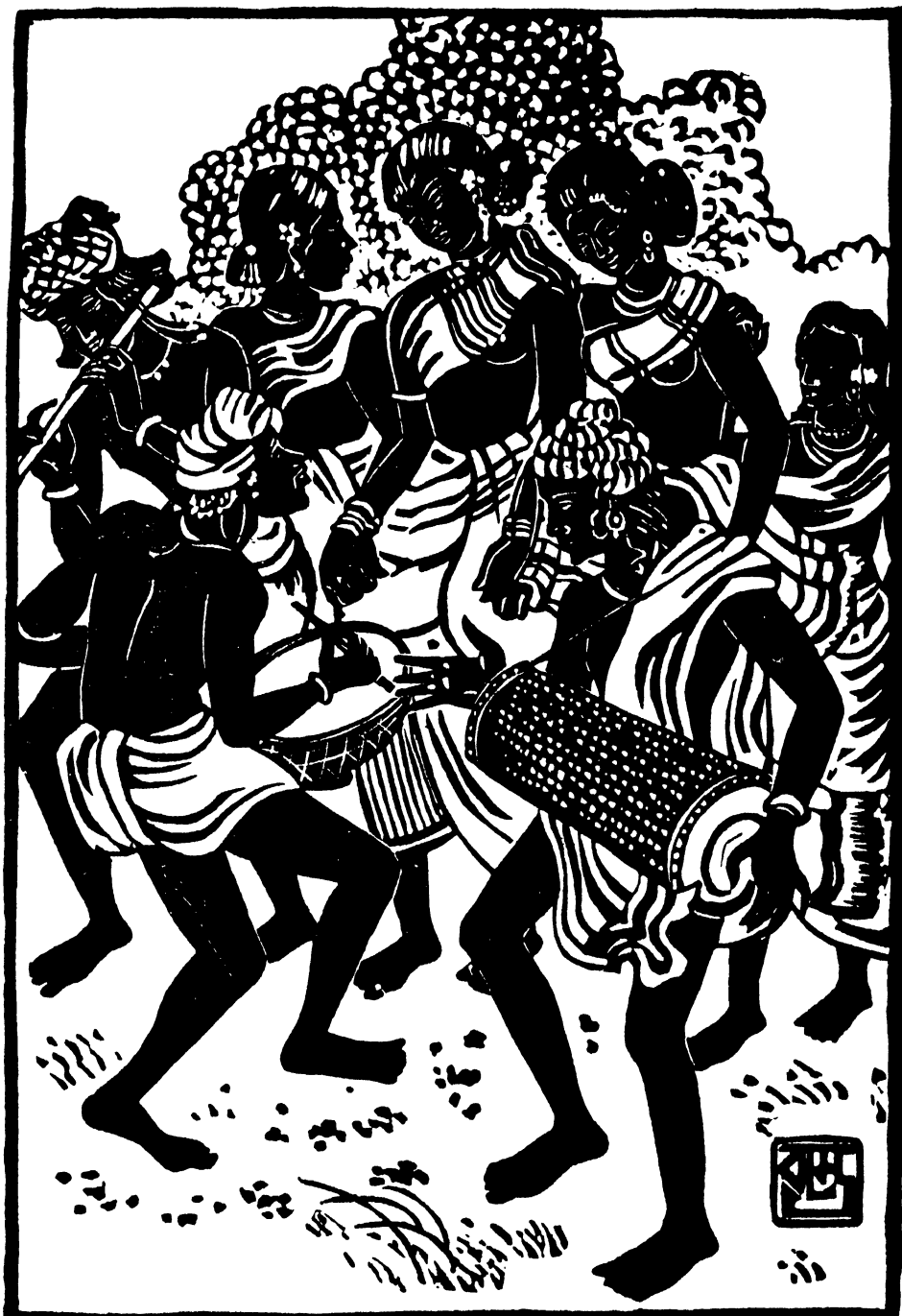
সাঁওতাল নৃত্য (উড্-কাট)
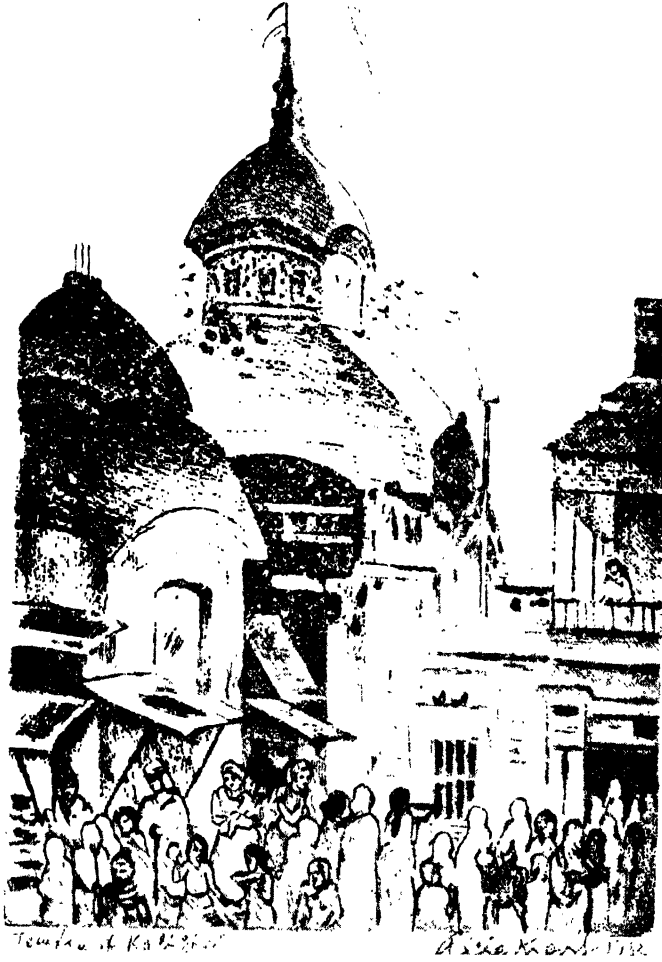
কালীঘাটের মন্দির (এচিং)

মহাশয় সর্ব্বপ্রথম আমাদের দেশে এই পদ্ধতি শিখিয়া আসিয়াছিলেন—গতবৎসরও প্রাচ্য কলা সমিতিতে সে ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের এচিং ছবিও তৎপূর্ব্ব বৎসরে প্রদর্শনীতে শিল্পরসিকদিগকে আনন্দ দিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা এখনো তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। রমেন্দ্রনাথ নিজেই পরখ করিয়া ইহা শিখিয়া লইতেছেন, এবং তাহা যে ব্যর্থ হয় নাই "খিদিরপুর ডক্", "নগরীর একপ্রান্তে", "কালীঘাটের মন্দির", "বদরীনাথ" প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। একজন শিল্পী সমালোচক এচিংকে বলিয়াছেন 'রেখার সঙ্গীত' (The song of the line on a copper plate) ; আলোচ্য

পরিচয় রাখিয়াছেন—আলোচ্য চিত্রখানিতেও সাঁওতাল পুরুষরমণীর সসৌষ্ঠব দেহভঙ্গিমা ও স্বভাবগত উৎসবমত্ততা রূপ পাইয়াছে।

রমেন্দ্রনাথ কিছুকাল যাবৎ তামার পাতে ছবি আঁকার (এচিং) চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। মুকুলচন্দ্র দে

নিদর্শনগুলিতেও সে আখ্যা অসত্য হইবে না। প্রথমোক্ত ছবিতিনখানিতে কলিকাতার কয়েকটি অপরিচ্ছন্ন, শিল্পে অপরিজ্ঞাত দৃশ্য শিল্পীর রেখাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। "বদরীনাথে" পর্ব্বতের শ্যামগম্ভীর মূর্ত্তি, মন্দিরের চূড়া, সব মিলিয়া একটি অপূর্ব্ব রহস্যরূপের সৃষ্টি হইয়াছে। রমেন্দ্রনাথ

ক্রমশ এচিং ও উহার স্বজাতীয় অন্যান্য পদ্ধতিগুলিতে আরও বিশদ পরীক্ষা করিয়া কৃতকর্ম্মা হইবেন, রেখার সঙ্গীত শুনাইয়া আমাদের আরও মুগ্ধ করিবেন এমন আশা আমরা মনে রাখিলাম।

বদরীনাথ (এচিং)

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

দেবতার কামনা

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সহসা খুলিয়া গেল রহস্য-দুয়ারখানি সম্মুখে আমার।
হেরিলাম—আমরা এসেছি নেমে দেবতারা দলে দলে
এই মর্ত্ত্য ধরণীর পরে;
নন্দন-কানন হতে অনিত্য এ ধরার ধূলিতে
লক্ষ লক্ষ মুহূর্ত্তের অনিত্য ও রঙিন্ হিয়ায়
পাতিয়াছি সিংহাসন;
অমৃতের পাত্র ত্যজি' মৃত্যুর এ নিত্য খেলাঘরে
আকণ্ঠ করেছি পান সুখ-দুখ-অশ্রুর আসব
মৃত্তিকার ভঙ্গুর ভৃঙ্গারে;—
আমরা এসেছি নেমে দেবতারা দলে দলে
নশ্বর ভুবনে।
শিশু খেলে খেলা-ঘরে শিশুর খেয়ালে তার আপন নিয়মে
কাদা তার কাদা নহে, বালি তার নহে তুচ্ছ বালি,
বালিরে সে চিনি জানে কাদারে সন্দেশ,
কেমন সহজে যত পিষ্টকের রূপ ধরে পনস-পল্লব,
কদলীর শিশু-তরু মুহূর্ত্তে উদয় হয় ছাগশিশুরূপে,
শিশুর কামনা-মন্ত্রে সত্যের প্রদীপ জ্বলে অসত্যের মাঝে,
নির্জ্জীব সজীব হয় তার দুটী নয়নের আলোর সম্পাতে—
শিশু খেলে খেলা-ঘরে শিশুর খেয়ালে তার আপন নিয়মে,
কামনার মন্ত্রে তার সত্যের জনম হয় অসত্যের বুকে।
আমরা এসেছি নেমে দেবতারা দলে দলে
মানব-শিশুর রূপে এই মর্ত্ত্য ধরণীর বুকে।
আমাদের বুকের কামনা—দেবতার বুকের কামনা—
দিকে দিকে দীপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠে অনিত্য ভুবনে
মায়া জাগে ছায়া রূপে,
ছায়া ধরে কঠিন শরীর স্থূল বাস্তবতারূপী;
আমাদের বুকের কামনা—দেবতার বুকের কামনা—
দান করে ধরণীর প্রতি ধূলি-কণিকায় সত্যের সাহস
প্রতি মুহূর্ত্তের বুকে সৃষ্টির সঙ্গীত;
আমাদের বুকের কামনা—দেবতার বুকের কামনা—
দিকে দিকে মূর্ত্ত হয় লক্ষ লক্ষ বিগ্রহের রূপে,
তৃণে বৃক্ষে লতায় পাতায়
ফুলে ফলে কাননে কান্তারে
নদনদী সাগর-কল্লোলে গগনের তারায় তারায়
সঞ্জীবিত করি' তোলে আপন পুলকে আর আপন কুহকে,
প্রেয়সীর নশ্বর স্বরূপ—
দেবতার কামনায় মুহূর্ত্তের তরে পায় উর্ব্বশীর রূপ,
অধরের মদিরা-সম্ভার
মুহূর্ত্তের তরে তার স্বাদ পায় নন্দন-সুরার।
আমরা এসেছি নেমে দেবতারা দলে দলে
এই মর্ত্ত্য ধরণীর বুকে—
তাই মোরা অবন্ধন—শুদ্ধ বুদ্ধ ক্ষুধা-তৃষ্ণা-লোভ-ক্ষোভহীন
অশঙ্কিত অসঙ্কোচে তাই মোরা আলিঙ্গনি' ধরি
ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ শোক মোহ মদ ক্রীড়ার কৌতুকে,
হাসি-অশ্রু-দুঃখ-সুখ-পুলকে উচ্ছল
জন্ম-মৃত্যু-বন্ধনীর মাঝে;
অনিত্যের রসে ভরা নশ্বর ক্ষণিকাগুলি
নশ্বর খেলার ঘরে সাজায়ে সহজে
খেলি মোরা কৌতূহলী শিশু;—
সন্ধ্যাতারা সম
মোদের আঁখির জ্যোতি জ্বলে নিত্য আকাশের বুকে।
সহসা খুলিয়া গেল রহস্য-দুয়ার খানি সম্মুখে আমার,
হেরিলাম—নশ্বর ভুবনে
আমরা এসেছি নেমে দেবতারা দলে দলে
অবন্ধন—বন্ধন-কৌতুকী!
নিত্যমুক্ত—অনিত্যের রসের বিলাসী!

ফুলের নাম

(Browning এর The Flower's Name হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ (ক্যাল ও ক্যাণ্টাব)

এই বাগানে সে কিছু আগে এসে রাখি হাত এই হাতে
বেড়া'ল আমার সাথে।
জাফ্‌রি দুয়ার কব্‌জায় তার শেওলা জমেছে ফাঁকে,
ব্যথা পেয়ে যেন ডাকে।
দাঁড়াইল ফিরে ওই ঝোপ্‌টিরে পঁহুছিল সে যখন,
তুলি মৃদু গুমরণ,
দরজা আপনি বন্ধ তখনি হ'ল পিছু পিছু তার,
কানে জাগে ঝঙ্কার।
পথে যেতে যেতে অনবধানেতে দলিনু শামুকটিরে,
তারে তুলি' নিল ধীরে,
রাখিল তাহারে ঝোপের মাঝারে, কচি পাতা সেথা খাবে,
সব ব্যথা ভুলে যাবে।

এই পথ দিয়া গেল সে চলিয়া কাঁকরের মরমরে
তুলি মৃদু পদভরে।
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সাড়ীর কানায় ফুলের কেয়ারিগুলি :
তার সে মধুর বুলি
থামিল হেথায়, দেখাল আমায় দোলন চাঁপার বুকে
পোকা এক আছে ঢুকে।
গোলাপের দল রূপে ঢল ঢল করিও না কিছু মনে,
আজি তোমাদের সনে
কথা না বলিয়া গেল সে চলিয়া পাহাড়ী ফুলের পাশে।
কত সে যে ভালবাসে
তোমাদের সবে, ব'লে কি বা হ'বে, শুনিবে তাহারি মুখে
ভুলে যাবে সব দুখে।

পরিভাষা-প্রসঙ্গে

অধ্যাপক শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ এম-এ, পি-এইচ-ডি

বাংলা ভাষায় গণিত ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তক রচনার যে চেষ্টা ও উদ্যোগ হইতেছে তৎসম্বন্ধে জনৈক বন্ধুর সহিত আলোচনা কালে তিনি বলেন, "দেখুন, হয় ইংরাজী রাখুন, না হয় বাংলা করুন, একটা খিচুড়ী করিবেন না।" গণিত ও বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পরিভাষা সংকলন ও পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন সমস্যা ও মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমানে আমার উদ্দেশ্য নহে। শুধু উপরোক্ত বন্ধুবরের উক্তিসম্বন্ধে দু একটি কথা বলিব।

ডাল ও ভাত রান্না আমরা আগে শিখিয়াছি, পরে খিচুড়ী রাঁধিতে শিখিয়াছি, ইহা বোধ হয় ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং খিচুড়ী ডাল ও ভাতের উন্নত সংস্করণ হওয়াই সম্ভব। তা ছাড়া ব্যঞ্জনাদির অভাবে অগত্যাই যে আমরা খিচুড়ীর ব্যবস্থা করি তাহা নহে, যখন কোন কারণে শরীর ও মন উৎফুল্ল ও পুলকিত হয়, তখন আমরা মেসের ঠাকুরকে বা বাড়ীর গৃহিণীকে খিচুড়ীর অর্ডার দিয়া থাকি। সুতরাং খিচুড়ী যে ডাল ও ভাত হইতে অপকৃষ্ট পদার্থ, তাহা মনে করিবার হেতু নাই। বরং এই খিচুড়ীর যে-সকল বিভিন্ন রন্ধনরীতি উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং ইহাকে অধিকতর উপভোগ্য করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, ডাল ও ভাতের বেলায় তাহা হয় নাই। অতএব আমাদের রন্ধনশালায় খিচুড়ীর স্থান ডাল ও ভাত অপেক্ষা উচ্চেই থাকিবে।

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেও ক্রমাগত আমরা খিচুড়ীর দিকেই চলিয়াছি, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। আমরা যে পোষাক পরি, তাহা বাঙ্গালী, পারশী, পাঞ্জাবী, ভারতীয় ও অভারতীয় পোষাকের খিচুড়ী। আমরা সকালে উঠিয়া গুড় দিয়া বিস্কুট এবং জ্যাম দিয়া আটার রুটি খাইয়া থাকি। ঝাল চচ্চড়ী ও অম্বলে আমাদের যেরূপ তৃপ্তি হয়, চপ কাটলেট ও কোর্ম্মা কোপ্তাতে তাহা অপেক্ষা কম হয় না। আমাদের আহারের তালিকা দেশীয় ও বৈদেশিক রীতির সংমিশ্রণে ক্রমশঃ কিরূপ খিচুড়ী পাকাইতেছে তাহার বেশী দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। এবং এই সংমিশ্রণে যে শুধু অপকারই হইতেছে তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। অপকারই হউক আর উপকারই হউক, সংমিশ্রণ যে অনিবার্য্য তৎসম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নাই।

পরিবারের মধ্যে বিধবা মাসিমা নিরামিষাশিনী এবং উপবাস-পূজা-পার্ব্বণাদিনিরতা; বৃদ্ধ জেঠামহাশয় আফিমের নেশায় ভরপুর; ছোটমামা ডাম্বেল ও মুগুর ভাঁজেন; পিসে-মশাই ইজি-চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে নারাজ; খুকী পেঁয়াজের গন্ধে বমি করে; খোকা পেঁয়াজের ফুলুরি পাইলে ডবল ভাত খায়; কর্ত্তা মুর্গী ভালবাসেন; গৃহিণী মুরগী স্পর্শ করেন না; ইত্যাদি নানা প্রকার রুচির এবং অভ্যাসের খিচুড়ী এক বাড়ীতেই দেখিতে পাই। ইহা অনিবার্য্য।

একই পরিবারের মধ্যে কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ পৌত্তলিক, কেহ নিরাকারবাদী, কেহ কোন-বাদীই নহে, এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র। এইরূপ মতবাদের খিচুড়ী হইবেই। শুধু তাহাই নহে, একই ব্যক্তির জীবনে একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদের খিচুড়ী বিরল নহে। মাছ খান, মাংস খান না; কালী পূজা করেন, বলিদান করেন না; পৈতা আছে, টিকী নাই; টিকী আছে পৈতা নাই; সন্ধ্যা আহ্নিক করেন, জুয়াচুরিও করেন; সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না, জুয়াচুরিও করেন না; ইত্যাদি নানাপ্রকার মনোভাবের খিচুড়ী সর্ব্বত্র।

আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে কি দেখিতে পাই? তাহাদের জীবনও আমাদেরই মত খিচুড়ী নয় কি? বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কার্য্য, বিভিন্ন ব্যবসায়, বিভিন্ন আচার ব্যবহার অনুসরণ করিতেছেই, একই ব্যক্তির জীবনও নানা আপাতবিরোধী কার্য্য ও ভাবসমূহের বোঝা নিত্য বহিতেছে। একই ব্যক্তি

বাস-কণ্ডাক্টর, ঘটক, বাড়ী ও জমির দালাল এবং জ্যোতিষী; একই ব্যক্তি সকালে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, দুপুরে কেরাণী এবং বৈকালে ইন্‌সিওরেন্স এজেন্ট; প্রবীণ অধ্যাপকেরাও হয়ত বিচক্ষণ শেয়ার ব্যবসায়ী; ঠাকুর মহাশয় রন্ধনাদি করেন, সুযোগ পাইলে পূজার্চ্চনাও করেন; এইরূপ বিভিন্ন মত ও কার্য্যের সমন্বয় বা খিচুড়ী অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে সমাজের যে অপকারই হইতেছে, ইহা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

আমাদের আসবাব দেশী ও বিলাতীর খিচুড়ী। ফরাস ও তাকিয়ার পাশে অনেকস্থলেই আজকাল সোফা ও চেয়ার শোভা পায়। তক্তপোষের পাশে ড্রেসিং টেব্‌ল্ অনেক বাড়ীতেই পাওয়া যাইবে। সাবান দিয়া হাতে মাটি এবং টুথ-পেষ্ট দিয়া দাঁতের মাজন আমরা অনেকেই করি। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের জীবনের আশে পাশে যে খিচুড়ীরই স্তূপ বিরাজমান, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন?

আমরা যাহাকে উন্নতি বলিয়া থাকি, তাহা কি খিচুড়ীরই নামান্তর নয়? নৌকা ও ষ্টিম এঞ্জিনের খিচুড়ীকেই আমরা ষ্টিমার বলিয়া থাকি। মোটরকার এবং নৌকার খিচুড়ীকে মোটরলঞ্চ বলে। আবার মোটরলঞ্চ এবং এরোপ্লেনের খিচুড়ী হাইড্রোপ্লেন। ফটোগ্রাফ এবং গ্রামোফোনের খিচুড়ী টকি-সিনেমা। ফটোগ্রাফী আবার রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং গণিতের খিচুড়ী। ম্যাগনেটো চুম্বক ও বিদ্যুতের খিচুড়ী। এক কথায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিমাত্রই এক একটি বিরাট খিচুড়ী।

বহিঃপ্রকৃতিটাই কি খিচুড়ী নয়? শুভ্র সূর্য্যরশ্মিটি সাতটী বিভিন্ন রংএর খিচুড়ী নয় কি? একটী ফুলের বাগানের দিকে চাহিলে কি অগণিত রংএর ও রূপের খিচুড়ীই চোখে পড়ে না? ময়ূরপুচ্ছ বহুবর্ণের খিচুড়ী বলিয়াই এত রমণীয়। ভূপৃষ্ঠটি নদী, পর্ব্বত, অরণ্য, প্রান্তর প্রভৃতির একটি বিশাল খিচুড়ী বলিয়াই এত উপভোগ্য। নির্ম্মল, স্বচ্ছ, স্বাদহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন জলকণাটিও হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের খিচুড়ী।

মানুষের ভিতরে বাহিরে আশে পাশে সর্ব্বত্রই যখন খিচুড়ীরই রাজত্ব, তখন শুধু তাহার ভাষা সম্বন্ধে একটা অনির্দ্দেশ্য পবিত্রতার প্রতি এত মোহ কেন? মানুষের ভাষা খিচুড়ী হইতে বাধ্য—অতীতে হইয়াছে, বর্ত্তমানে হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এ স্রোত রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। টেবিল, চেয়ার, স্ক্রু, মোটরকার, রেডিও, টেলিগ্রাম, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ বাংলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—এবং ক্রমাগত যাইতেছে। সেদিন একটি মিস্ত্রী বাসায় কাজ করিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল সে আলমারি প্রস্তুত করিতে পারে কি না। সে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, ও সব ফাইন কাজ আমরা করি না।" সেদিন একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, "Smooth মানে কি?" আমি বলিলাম, Smooth মানে—মানে—মসৃণ—মানে সমান, যাতে উঁচুনীচু কিছু নেই।" ছেলেটি বলিয়া উঠিল, "ও বুঝেছি, প্লে—ন"। এরূপ হইবেই। ইহার উপায় নাই। এজন্য কোনরূপ দুঃখ করিলে চলিবে না। পল্লীগ্রামে অনেক স্থানে 'জল মোটর' ও 'ডাঙ্গা মোটর' জলে স্থলে এবং লোকমুখে নিয়মিত চলিতেছে। ইহার জন্য কোন পরিভাষা সমিতির আবশ্যক হয় নাই। 'মাষ্টার' শব্দটি ইংরাজী হইলেও 'মাষ্টারণী'-কে ত্যাগ করা সহজ হইবে না। এরূপ খিচুড়ীতে বিরক্ত হইলে জীবন দুর্ব্বহ হইবে। বাংলা পরিভাষার অভাব সত্ত্বেও সেমিজ, ব্লাউজ, পেটিকোট, বডিস্, ব্রেস্‌লেট, সেফ্‌টি-পিন প্রভৃতি বাঙ্গালী তরুণীর রমণীয়তা বৃদ্ধিই করিতেছে। 'গ্রামোফোন' কথাটা বিদেশী হইলেও উহার গান আমাদের ভালই লাগে। সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ 'রেডিও'ই বা মন্দ কি? 'টেলিফোন' সকলের বাড়ীতে না থাকিলেও 'টেলিগ্রাম' সব বাড়ীতেই আসে। অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত অ্যাসিডিটি চূর্ণ ও অজীর্ণান্তক পাউডারে যদি অসুখ সারে, তাহা হইলে ঔষধের নামে কি আসে যায়? দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই খিচুড়ী ভাষা চলিতেছে।

যদি কেহ বলে, "এস্‌গিন রোডের মোড়ে ট্রামে উঠিয়া কণ্ডাক্টরের নিকট টিকেট লইয়া সামনের সীটে গিয়া বসিতেই ট্রামখানি লোয়ার সারকুলার রোডের জংশনে আসিয়া পড়িল এবং পূর্ব্ব দিক হইতে আগত একখানা ট্যাক্সির সঙ্গে ভীষণ কলিশন হইল। একটি তরুণীকে আহত অবস্থায় ট্রাম লাইনের উপর ছিটকাইয়া পড়িতে দেখিয়াই আমি ট্রাম হইতে নামিয়া একখানা ট্যাক্সি করিয়া তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের ইমার-

পরিভাষা-প্রসঙ্গে

অধ্যাপক শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ এম-এ, পি-এইচ-ডি

বাংলা ভাষায় গণিত ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তক রচনার যে চেষ্টা ও উদ্যোগ হইতেছে তৎসম্বন্ধে জনৈক বন্ধুর সহিত আলোচনা কালে তিনি বলেন, ''দেখুন, হয় ইংরাজী রাখুন, না হয় বাংলা করুন, একটা খিচুড়ী করিবেন না।'' গণিত ও বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পরিভাষা সংকলন ও পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন সমস্যা ও মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমানে আমার উদ্দেশ্য নহে। শুধু উপরোক্ত বন্ধুবরের উক্তিসম্বন্ধে দু একটি কথা বলিব।

ডাল ও ভাত রান্না আমরা আগে শিখিয়াছি, পরে খিচুড়ী রাঁধিতে শিখিয়াছি, ইহা বোধ হয় ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং খিচুড়ী ডাল ও ভাতের উন্নত সংস্করণ হওয়াই সম্ভব। তা ছাড়া ব্যঞ্জনাদির অভাবে অগত্যাই যে আমরা খিচুড়ীর ব্যবস্থা করি তাহা নহে, যখন কোন কারণে শরীর ও মন উৎফুল্ল ও পুলকিত হয়, তখন আমরা মেসের ঠাকুরকে বা বাড়ীর গৃহিণীকে খিচুড়ীর অর্ডার দিয়া থাকি। সুতরাং খিচুড়ী যে ডাল ও ভাত হইতে অপকৃষ্ট পদার্থ, তাহা মনে করিবার হেতু নাই। বরং এই খিচুড়ীর যে-সকল বিভিন্ন রন্ধনরীতি উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং ইহাকে অধিকতর উপভোগ্য করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, ডাল ও ভাতের বেলায় তাহা হয় নাই। অতএব আমাদের রন্ধনশালায় খিচুড়ীর স্থান ডাল ও ভাত অপেক্ষা উচ্চেই থাকিবে।

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেও ক্রমাগত আমরা খিচুড়ীর দিকেই চলিয়াছি, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। আমরা যে পোষাক পরি, তাহা বাঙ্গালী, পারশী, পাঞ্জাবী, ভারতীয় ও অভারতীয় পোষাকের খিচুড়ী। আমরা সকালে উঠিয়া গুড় দিয়া বিস্কুট এবং জ্যাম দিয়া আটার রুটি খাইয়া থাকি। ঝাল চচ্চড়ী ও অম্বলে আমাদের যেরূপ তৃপ্তি হয়, চপ কাটলেট ও কোর্ম্মা কোপ্তাতে তাহা অপেক্ষা কম হয় না। আমাদের আহারের তালিকা দেশীয় ও বৈদেশিক রীতির সংমিশ্রণে ক্রমশঃ কিরূপ খিচুড়ী পাকাইতেছে তাহার বেশী দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। এবং এই সংমিশ্রণে যে শুধু অপকারই হইতেছে তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। অপকারই হউক আর উপকারই হউক, সংমিশ্রণ যে অনিবার্য্য তৎসম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নাই।

পরিবারের মধ্যে বিধবা মাসিমা নিরামিষাশিনী এবং উপবাস-পূজা-পার্ব্বণাদিনিরতা; বৃদ্ধ জেঠামহাশয় আফিমের নেশায় ভরপূর; ছোটমামা ডাম্বেল ও মুগুর ভাঁজেন; পিসে-মশাই ইজি-চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে নারাজ; খুকী পেঁয়াজের গন্ধে বমি করে; খোকা পেঁয়াজের ফুলুরি পাইলে ডবল ভাত খায়; কর্ত্তা মুর্গী ভালবাসেন; গৃহিণী মুরগী স্পর্শ করেন না; ইত্যাদি নানা প্রকার রুচির এবং অভ্যাসের খিচুড়ী এক বাড়ীতেই দেখিতে পাই। ইহা অনিবার্য্য।

একই পরিবারের মধ্যে কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ পৌত্তলিক, কেহ নিরাকারবাদী, কেহ কোন-বাদীই নহে, এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র। এইরূপ মতবাদের খিচুড়ী হইবেই। শুধু তাহাই নহে, একই ব্যক্তির জীবনে একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদের খিচুড়ী বিরল নহে। মাছ খান, মাংস খান না; কালী পূজা করেন, বলিদান করেন না; পৈতা আছে, টিকী নাই; টিকী আছে পৈতা নাই; সন্ধ্যা আহ্নিক করেন, জুয়াচুরিও করেন; সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না, জুয়াচুরিও করেন না; ইত্যাদি নানাপ্রকার মনোভাবের খিচুড়ী সর্ব্বত্র।

আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে কি দেখিতে পাই? তাহাদের জীবনও আমাদেরই মত খিচুড়ী নয় কি? বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কার্য্য, বিভিন্ন ব্যবসায়, বিভিন্ন আচার ব্যবহার অনুসরণ ত করিতেছেই, একই ব্যক্তির জীবনও নানা আপাতবিরোধী কার্য্য ও ভাবসমূহের বোঝা নিত্য বহিতেছে। একই ব্যক্তি

বাস-কণ্ডাক্টর, ঘটক, বাড়ী ও জমির দালাল এবং জ্যোতিষী; একই ব্যক্তি সকালে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, দুপুরে কেরাণী এবং বৈকালে ইন্সিওরেন্স এজেণ্ট; প্রবীণ অধ্যাপকেরাও হয়ত বিচক্ষণ শেয়ার ব্যবসায়ী; ঠাকুর মহাশয় রন্ধনাদি করেন, সুযোগ পাইলে পূজার্চ্চনাও করেন; এইরূপ বিভিন্ন মত ও কার্য্যের সমন্বয় বা খিচুড়ী অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে সমাজের যে অপকারই হইতেছে, ইহা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

আমাদের আসবাব দেশী ও বিলাতীর খিচুড়ী। ফরাস ও তাকিয়ার পাশে অনেকস্থলেই আজকাল সোফা ও চেয়ার শোভা পায়। তক্তপোষের পাশে ড্রেসিং টেব্‌ল্ অনেক বাড়ীতেই পাওয়া যাইবে। সাবান দিয়া হাতে মাটি এবং টুথ-পেষ্ট দিয়া দাঁতের মাজন আমরা অনেকেই করি। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের জীবনের আশে পাশে যে খিচুড়ীরই স্তূপ বিরাজমান, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন?

আমরা যাহাকে উন্নতি বলিয়া থাকি, তাহা কি খিচুড়ীরই নামান্তর নয়? নৌকা ও ষ্টিম এঞ্জিনের খিচুড়ীকেই আমরা ষ্টিমার বলিয়া থাকি। মোটরকার এবং নৌকার খিচুড়ীকে মোটরলঞ্চ বলে। আবার মোটরলঞ্চ এবং এরোপ্লেনের খিচুড়ী হাইড্রোপ্লেন। ফটোগ্রাফ এবং গ্রামোফোনের খিচুড়ী টকি-সিনেমা। ফটোগ্রাফী আবার রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং গণিতের খিচুড়ী। ম্যাগনেটো চুম্বক ও বিদ্যুতের খিচুড়ী। এক কথায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিমাত্রই এক একটি বিরাট খিচুড়ী।

বহিঃপ্রকৃতিটাই কি খিচুড়ী নয়? শুভ্র সূর্য্যরশ্মিটি সাতটী বিভিন্ন রংএর খিচুড়ী নয় কি? একটী ফুলের বাগানের দিকে চাহিলে কি অগণিত রংএর ও রূপের খিচুড়ীই চোখে পড়ে না? ময়ূরপুচ্ছ বহুবর্ণের খিচুড়ী বলিয়াই এত রমণীয়। ভূপৃষ্ঠটি নদী, পর্ব্বত, অরণ্য, প্রান্তর প্রভৃতির একটি বিশাল খিচুড়ী বলিয়াই এত উপভোগ্য। নির্ম্মল, স্বচ্ছ, স্বাদহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন জলকণাটিও হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের খিচুড়ী।

মানুষের ভিতরে বাহিরে আশে পাশে সর্ব্বত্রই যখন খিচুড়ীরই রাজত্ব, তখন শুধু তাহার ভাষা সম্বন্ধে একটা অনির্দ্দেশ্য পবিত্রতার প্রতি এত মোহ কেন? মানুষের ভাষা খিচুড়ী হইতে বাধ্য—অতীতে হইয়াছে, বর্ত্তমানে হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এ স্রোত রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। টেবিল, চেয়ার, স্ক্রু, মোটরকার, রেডিও, টেলিগ্রাম, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ বাংলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—এবং ক্রমাগত যাইতেছে। সেদিন একটি মিস্ত্রী বাসায় কাজ করিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল সে আলমারি প্রস্তুত করিতে পারে কি না। সে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, ও সব ফাইন কাজ আমরা করি না।" সেদিন একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, "Smooth মানে কি?" আমি বলিলাম, Smooth মানে—মানে—মসৃণ—মানে সমান, যাতে উঁচুনীচু কিছু নেই।" ছেলেটি বলিয়া উঠিল, "ও বুঝেছি, প্লে—ন"। এরূপ হইবেই। ইহার উপায় নাই। এজন্য কোনরূপ দুঃখ করিলে চলিবে না। পল্লীগ্রামে অনেক স্থানে 'জল মোটর' ও 'ডাঙ্গা মোটর' জলে স্থলে এবং লোকমুখে নিয়মিত চলিতেছে। ইহার জন্য কোন পরিভাষা সমিতির আবশ্যক হয় নাই। 'মাষ্টার' শব্দটি ইংরাজী হইলেও 'মাষ্টারণী'-কে ত্যাগ করা সহজ হইবে না। এরূপ খিচুড়ীতে বিরক্ত হইলে জীবন দুর্ব্বহ হইবে। বাংলা পরিভাষার অভাব সত্ত্বেও সেমিজ, ব্লাউজ, পেটিকোট, বডিস্, ব্রেস্‌লেট, সেফ্‌টি-পিন প্রভৃতি বাঙ্গালী তরুণীর রমণীয়তা বৃদ্ধিই করিতেছে। 'গ্রামোফোন' কথাটা বিদেশী হইলেও উহার গান আমাদের ভালই লাগে। সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ 'রেডিও'ই বা মন্দ কি? 'টেলিফোন' সকলের বাড়ীতে না থাকিলেও 'টেলিগ্রাম' সব বাড়ীতেই আসে। অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত অ্যাসিডিটি চূর্ণ ও অজীর্ণান্তক পাউডারে যদি অসুখ সারে, তাহা হইলে ঔষধের নামে কি আসে যায়? দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই খিচুড়ী ভাষা চলিতেছে।

যদি কেহ বলে, "এস্‌প্লেনেড রোডের মোড়ে ট্রামে উঠিয়া কণ্ডাক্টরের নিকট টিকেট লইয়া সামনের সীটে গিয়া বসিতেই ট্রামখানি লোয়ার সারকুলার রোডের জংশনে আসিয়া পড়িল এবং পূর্ব্ব দিক হইতে আগত একখানা ট্যাক্সির সঙ্গে ভীষণ কলিশন হইল। একটি তরুণীকে আহত অবস্থায় ট্রাম লাইনের উপর ছিটকাইয়া পড়িতে দেখিয়াই আমি ট্রাম হইতে নামিয়া একখানা ট্যাক্সি করিয়া তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের ইমার-

জেন্সি ওয়ার্ডে লইয়া গেলাম এবং অনেক কষ্টে ওখানকার সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ইন্‌ডোর পেশেণ্ট ভাবে অ্যাডমিট করাইলাম। হোষ্টেলে ফিরিয়া দেখি সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট রোল কলের সময়ে আমাকে অ্যাবসেণ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। পরদিন হইতে ভিজিটিং আওয়ার্সে নিয়মিত তরুণীটিকে দেখিতে যাইতাম। অসুখ সারিয়া আসিলে তিনি তাঁহার বাসার ঠিকানা দিয়া আমাকে চা খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে ক্রমশঃ তরুণীটীর সহিত ইত্যাদি।" তাহা হইলে তাহাকে চালিয়াৎ বা মিথ্যাবাদী বলিতে পারেন, কিন্তু তাহার ভাষা যে অস্বাভাবিক তাহা বলা চলে না। বিশুদ্ধ বাংলায় উক্ত কথাগুলি যে বলা একেবারে অসম্ভব তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তাহা করিলে বড়বাজার হইতে হাওড়া ষ্টেশনে যাইবার সময়ে বিদেশীয় ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রপাতি দ্বারা নির্ম্মিত হাওড়ার পুলের উপর দিয়া না গিয়া স্বদেশীয়গণ কর্ত্তৃক বাহিত ডিঙ্গীতে অথবা পবিত্র গঙ্গাজলে সাঁতার কাটিয়া নদী পার হইবার মতই হইবে।

সাহিত্যে উক্তরূপ খিচুড়ী-ভাষার সমর্থন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্যের মর্য্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা আবশ্যক এবং তাহার ভার কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক এবং অন্যান্য সাহিত্যিকগণ লইবেন। এখানে বৈজ্ঞানিক ভাষাই আমার মুখ্য আলোচ্য।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কার্য্য ও ভাবের খিচুড়ী হইলেই যে তাহা শুভ ও শ্রেয় হইবে, ইহাও আমার বক্তব্য নহে। মাংসের সহিত পরমান্নের খিচুড়ী সুস্বাদ হইতে পারে না। ইউরোপীয় জাতির সহিত ভারতীয় জাতীর মিশ্রণে যে ওয়েলেস্‌লি সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহা শুভ হইয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন না। তবে খিচুড়ী হইলেই যে তাহা অপকৃষ্ট হইবে, তাহা ঠিক নহে, ইহাই আমার বক্তব্য।

সাহিত্যিকগণ যতই চেষ্টা করুন, বিদেশী শব্দ ক্রমাগত বাংলার সহিত মিশ্রিত হইতে থাকিবে। তৎসত্ত্বেও যথাসম্ভব ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা বাঙ্গালীর দেশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও মর্য্যাদার হানি হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পক্ষে খিচুড়ীই প্রশস্ত। যাহাতে সেই খিচুড়ী সুপক্ব ও সুস্বাদু হয় এবং তলায় ধরিয়া গিয়া দুর্গন্ধ না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ

যমুনা

অধ্যাপক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম-এ

১

যমুনা! ষোড়শী নয়, সপ্তদশী নয়, অষ্টাদশী নয়, যমুনা তরুণী কি বৃদ্ধা তাহা বলিয়া লাভ নাই। কেন না যমুনা নারীই নয়।

যমুনা একখানি ষ্টীমার। নারায়ণগঞ্জের ঘাটে সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। নোঙ্গর তোলা হইয়াছে। সিঁড়ি একটা তোলা হইয়াছে, অপরটা তোলা হইতেছে। শেষ দুই একজন যাত্রী কোনও রকমে অর্দ্ধভগ্ন সিঁড়ি বাহিয়া জাহাজে আসিয়া উঠিতেছে। কেরাণী কুলী কাগজওয়ালারা একে একে জাহাজ ত্যাগ করিতেছে।

খালাসীর দল হৈ হৈ রৈ রৈ রবে শেষ সিঁড়িখানা তুলিয়া ফেলিল। জাহাজের ও ঘাটের বাঁধন খসিল। উপর হইতে ঢং ঢং ঘণ্টা পড়িল। গুরু-গম্ভীর সিঙ্গারবের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের এঞ্জিন চলিতে সুরু হইল।

সমস্তের উপরের ডেকে হাল হাতে দাঁড়াইয়া জাহাজের প্রৌঢ় সারেঙ্গ, নাজীর আলি। আজ হাল ফিরাইতে ফিরাইতে তাহার হাতটা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল; বয়সের জন্য নয়, শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য নয়। জাহাজ নড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতরটায় কেমন একটা নাড়া দিয়া উঠিল। আজ তাহার জীবনে এই শেষ বার জাহাজ চালানো। কোম্পানী তাহার উপর অনেক মেহেরবানি দেখাইয়াছে। চাকরির বয়স সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে কাজে রাখিয়াছে। কিন্তু অবশেষে তাহাকে কাজ ছাড়িতে হইল। একমাস পূর্ব্বে সে সেরূপ অর্ডার পাইয়াছে। তাহার টাকা পয়সার হিসাব সব ঠিক হইয়া আসিয়াছে। আজ ষ্টীমার গোয়ালন্দে পৌঁছাইয়াই তাহার কাজ শেষ।

যমুনা! গত দীর্ঘ বারো বৎসর ধরিয়া নাজীর আলি এ জাহাজখানাকে চালাইয়াছে। কোনও দিন কথাটা এ রকম করিয়া ভাবে নাই, কিন্তু আজ নাজীর অনুভব করিল যমুনার সহিত তাহার সম্বন্ধ কত গভীর। যমুনা তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনের সঙ্গিনী, যমুনা তাহার সমস্ত পৌরুষের কেন্দ্র। সে যতক্ষণ যমুনায়, ততক্ষণ সারেঙ্গ, কাপ্তান, মনিব। যমুনা ছাড়িয়া গেলে সে সাধারণ মানুষ, ভিড়ের মধ্যে একজন।

যমুনা! নাজির তাহাকে অন্তরঙ্গভাবে ভালবাসিয়াছে। ওমার খইয়াম্ তাহার সাকীকে এর চেয়ে বেশি ভালবাসিয়াছিল কি না সন্দেহ।

অনেকটা ছবির ওমারের মতই নাজিরের চেহারা। খালি মাথায় লম্বা লম্বা আধপাকা চুল, মুখে সাদা দাড়ি গোঁফ, গায়ে আচকানের মত লম্বা পাঞ্জাবী আর ঢিলা পাজামা, পায়ে কালো চটি।

দেখিতে দেখিতে জাহাজখানা মোড় ফিরিয়া শীতল-লক্ষার বুকের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দগতিতে বহিয়া চলিল। এক পাটের আফিসের বড় সাহেব নদীর পাড়ের বাড়ীর কোণ হইতে তাহার পকেট-দূরবীন চোখে লাগাইয়া জাহাজের নাম পড়িল—জুমনা! ঘাটের মাঝির দল বলাবলি করিতে লাগিল, 'এবার গোয়ালন্দ-ষ্টীমার ছাড়লো।'

পেছনের নৌকাগুলিকে হেলাইয়া দোলাইয়া, দুইদিকের চাকাদ্বারা সাদা ফেনার বৃত্ত বচনা করিয়া, যমুনা দ্রুতবেগে লক্ষা ছাড়িয়া বাহিরের দিকে চলিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষার কালো জল ছাড়াইয়া ধলেশ্বরীর শাদা ঘোলাটে জলে আসিয়া পড়িল। যাত্রীরা সোৎসুক নয়নে শাদা কালোর স্পষ্ট রেখাটা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

নাজীর আলি সঙ্গীর হাতে হাল দিয়া কিছুক্ষণ দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি ও আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। এতকাল এ সবকে বিশেষ কিছুই মনে করে নাই। এখন হঠাৎ তাহার

মনে হইল, হয়ত বাকী জীবনটা চাটগাঁ সহরের একটা সরু গলির ভিতরে গিয়া কাটাইতে হইবে। কেন না নাজীরের পৈত্রিক গৃহ সেখানে; সে তাহার স্ত্রী-পুত্রকে সেখানেই রাখিয়াছে। এ যাত্রার শেষে সেও সে গৃহের উদ্দেশ্যেই রওনা হইবে।

জাহাজ মেঘনার বুক বাহিয়া পদ্মার বিশাল জলরাশির দিকে ধাবিত হইল। নাজির ধীরে ধীরে উপরের ডেক হইতে নামিয়া আসিল। মনে হইল একবার দোতলা একতলা,—সমস্তটা জাহাজ ঘুরিয়া দেখিবে।

এই যে বিশাল যাত্রীর দল, সে-ই তাহাদের কাণ্ডারী, তাহাদের রক্ষক, আশ্রয়। তাহার বিচার-শক্তিতে যদি কোনও ভুল হয়, তবে জাহাজ হয়ত বিপথে চলিবে, হয়ত চড়ায় আটকাইবে, হয়ত বা ঝড়ের মধ্যে অতলগামীও হইতে পারে। দীর্ঘ বারো বৎসর ধরিয়া সে নিজ মস্তিষ্ক-শক্তির অবিরাম প্রয়োগ দ্বারা দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া আসিয়াছে। বিদায়ের কালে কোম্পানী তাহার উপর খুসী হইয়া তাহাকে সার্টিফিকেট এবং বকশিস্ উভয়ই দিয়াছে।

প্রথমতঃ নাজীর এঞ্জিন দেখিতে গেল। এঞ্জিনের সাদা ঝক্‌ঝকে পিষ্টনগুলি যেন আনন্দে নাচিতে নাচিতে ওঠানামা করিতে লাগিল। কিনারের কার্নিশে বসিয়া একটা খালাসী তেল দিতেছিল। নাজির দেখিল, কবিরুদ্দিন। গত সাত বৎসর যাবৎ কবির রীতিমত তেল দিয়া এঞ্জিনখানাকে কার্য্যক্ষম করিয়া রাখিয়াছে। সে কার্নিশের উপরই দাঁড়াইয়া সারেঙ্গকে সেলাম ঠুকিল। নাজীর একের পর এক এঞ্জিনের মীটারগুলি পরীক্ষা করিল; দেখিল প্রত্যেকটাই ঠিক ঠিক নির্দ্দেশ দিতেছে। এঞ্জিনের তুইজন চালক, আরও চার পাঁচ জন খালাসী নাজীরকে সেলাম করিল। নাজীর তাহাদের কুশল প্রশ্ন করিতে করিতে সম্মুখের দিকে চলিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিল বয়লারের নীচে বাদসা মিঞা কয়লা দিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে চুলার দরজাটা হঠাৎ খুলিয়া ফেলাতে বাদসা মিঞার মুখের উপর আগুনের চমক আসিয়া লাগিল। তাহার কয়লার ভস্মমাখা চুল, ভ্রু, গোঁফ ও দাড়ি মিনিটখানেকের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নাজীর আরও অগ্রসর হইয়া গেল। স্তূপীকৃত সিঁড়ির তক্তাগুলির উপর যাত্রীরা বসিয়াছে। তুইদিকে তুইটা জলের কল, লোকে হাত দিয়া পাম্প করিয়া জল তুলিতেছে, হাত মুখ ধুইতেছে। পাটাতনের উপরে বিছানা পাতিয়া এক এক পরিবার অবস্থান করিতেছে। তারপর ডেকের মাঝখানে মাল,—কাঁচা মাল, ক্ষীরের ভাঁড়, ডিম ইত্যাদি। পাশে সারি সারি ঝাঁকা, তার মধ্যে মোরগ।

মালের পাশে খালাসীদের বাসা। তুই এক জন বিশ্রাম করিতেছে। একজন জাহাজের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া নদী হইতে দড়ি বাঁধা বালতি দিয়া জল তুলিয়া স্নান করিতেছে। অপর একজন পাটার উপর মরিচ বাটিতেছে। সে সারেঙ্গকে দেখিয়া হঠাৎ উঠিয়া সেলাম করিল। সারেঙ্গ মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিরে সোনা মিয়া।" ভাবে বোঝা গেল সোনা যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে।

২

সে অপ্রস্তুত হইবার কারণ, জাহাজ ছাড়িবার মুহূর্ত্ত হইতেই সোনা মিঞার চোখ তুটি তুইটা কার্য্যে ব্যস্ত ছিল।

প্রথমতঃ তাহার সমুখের খাঁচার একটি বৃহৎ কুক্কুটীর ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয়ের ভীরু দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলাইতেছিল সোনা মিঞার চক্ষু তুটি অতৃপ্তভাবে লক্ষ্য করিতেছিল, মুরগীর পা তুটি বিশেষ রকম পুষ্ট, বুকটা বিশেষ রকম স্ফীত, গায়ের পালকগুলি তেলের জোরে বিশেষ রকম উজ্জ্বল দেখাইতেছে সোনা বহু পেয়াজ কুটিয়াছে, মরিচ বাটিতেছে, কিন্তু তার উপাদান মাত্র একটা বৃহৎ, বহুকালপক্ক কুমড়া! বাস্তবের সঙ্গে তাহার মন কোনও মতেই খাপ খাইতেছিল না। তাহার তরুণ প্রাণ, কল্পনা-প্রবণ, অভিযানকামী; তাই তাহা আগতকে ছাড়িয়া অনাগতের দিকে ধাবিত হইতেছিল!

দীর্ঘ তুই ঘণ্টা যাবৎ পিঞ্জরাবদ্ধ অনাগতের সঙ্গে সোনার শুধু দৃষ্টি বিনিময়ই হইল। অনাগত আগত হইবার বিন্দুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কিন্তু তরুণ প্রাণ হটিবার পাত্র নয়, তাই হঠাৎ সারেঙ্গের আগমনে অপ্রস্তুত হইয়াও সোনা আবার পূর্ব্ববৎ চোখাচোখীতে ব্যাপৃত হইল।

এ দৃষ্টি বিনিময়ের অবকাশে সোনা এক একবার আর এক দিকে শুধু দৃষ্টি করিতেছিল, সেখানে বিনিময়টা আর ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার কিঞ্চিৎ দূরে, মাথার দিকে ট্রাঙ্ক

পাশের দিকে ছাতা লাঠি এবং ঘটি রাখিয়া, পদ্মাতীরনিবাসী লৌহকর্ম্মনিপুণ রতন কর্ম্মকার তাহার সপ্তদশবর্ষীয়া কনিষ্ঠা কন্যা হেমশশী, সংক্ষেপে হেমীকে স্বামিগৃহ হইতে নিজ গৃহে লইয়া যাইতেছিল। ট্রাঙ্কটা হেমীর, তার উপকার বোচকাটি রতনের। হেমী গতকল্য দ্বিপ্রহরে পিতার দর্শনাবধি আজ প্রভাতে যাত্রা এবং তারপরে ষ্টীমারে ওঠা পর্য্যন্ত এমন গভীর মানসিক উত্তেজনায় কাটাইয়াছে যে, জাহাজের এক কোণে বিছানা পাতিয়া বসিতে বসিতে সে শুইয়া পড়িয়াছে, এবং শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। রতন পাশে বসিয়া হেমীর স্বামীর বাড়ীর দেওয়া একখানা বাঁশের কঞ্চির পাখা দ্বারা অনবরত বাতাস করিতেছে; বাহিরে দেখাইতেছে যে সে গরমে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে বাতাসের অধিক ভাগই নিজের গায়ে না লাগিয়া, তাহার পাশে শয়ানা কন্যার গায়ে গিয়া পড়িতেছে এবং তাহার নিদ্রাকে গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছে।

হেমী যে তাহার নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য তাহা নয়। তাহার নিদ্রালস তরুণ দেহখানি ব্যাপিয়া একটা অপরিসীম স্নিগ্ধতা বিরাজ করিতেছিল। পিতার সঙ্গে যাইতেছে, তাই মুখের ঘোমটা ফেলিয়া দিয়াছে। নির্ম্মল, ভাবনাশূন্য মুখখানি; ঠোঁটদুটি পানে রাঙ্গা; চুল ভিজা ছিল, তাহা বালিশের উপর ছড়াইয়া দিয়া শুইয়াছে (হেমীর কাছে 'বাপ যেখানে, বাপের বাড়ীও সেখানে; সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত); স্বামীর ঘরের দেওয়া একজোড়া দুল (বোধ হয় ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ আভরণ) কাণ হইতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কোমল, সতেজ, সুদর্শন মুখখানি। চোখদুটি যদি বুজানো না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তাহাদের ভিতর হইতে একটা উজ্জ্বল তেজ বিকীর্ণ হইত।

সোনা মিঞা প্রায় প্রত্যেক পনর মিনিটে একবার কুকুটী ছাড়িয়া হেমীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। এখানেও তাহার তরুণ প্রাণের একটা দিক চঞ্চলতায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এখানেও অনাগতের প্রতি তরুণ হৃদয়ের অদম্য অভিযান যাত্রাপথের দিকে উন্মুখ হইয়া ছিল!

নাজির আলি ডাকিল, "ওরে সোনা মিঞা!" সোনা মিঞা কাছে আসিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইল। নাজীর আলি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সোনা, আমি আজ চলে যাচ্ছি। কাল হ'তে আর আস্‌ব না। ঠিক ভাবে চলিস্। কাজ ভাল ভাবে করে গেলে ভবিষ্যতে খুব উন্নতির আশা আছে।" সোনা জানিত সারেঙ্গ চলিয়া যাইতেছে। তাহাকে ডাকিয়া সারেঙ্গ নিজে সে কথাটা বলিল, তাহাতে সে খুব আপ্যায়িত হইল। গর্ব্বে তাহার বুক ফুলিয়া উঠিল। সে নতশিরে বলিল, "আপনার দোআ!" নাজির আলি সিঁড়ি গুলির পাশ দিয়া ঘুরিয়া গিয়া ষ্টীমারের অপর দিকের পথটা ধরিল। মিনিট খানেকের জন্য তাহার পথ আবদ্ধ করিয়া রাখিল, জনৈক কবিরাজ-যাত্রী। কবিরাজ কলের নীচে স্নান করিয়া, গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া, গামছা দিয়া শরীর মুছিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ চিত্তপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। সে কল স্নানের জন্য ছিল না। ষ্টীমারে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর জন্য স্নানের কোনও বন্দোবস্ত নাই। কবিরাজ যে তাহা করিতে পারিয়াছে তাহা এক রকম অসাধ্য সাধনেরই সামিল। তাই তাহার আত্মপ্রসাদের মাত্রাটা এত বেশী।

নাজির আলি যখন ছিটানো জল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটু সরিয়া দাঁড়াইল, তখন সে স্তূপীকৃত সিঁড়ির উপরে বসা একজন তরুণ যুবককে প্রায় চিৎপাত করিয়া দিয়াছিল। যদিও নাজির একমিনিট পূর্ব্বে তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তথাপি যুবক তাহার উপস্থিতি অনুভব করে নাই। কেন না তাহার চক্ষুদ্বয় নিকটকে ছাড়িয়া দূরেতে নিবিষ্ট ছিল।

সে যুবক—তাহার নাম রেবতীমোহন—অজ্ঞাত ভাবে এমন এক জীবন-নাট্যে জড়িত হইয়া পড়িতেছিল, যাহার ওসমান্ সোনা মিঞা, জগৎ সিংহ সে, আর আয়েষা ঐ রতন কর্ম্মকারের কনিষ্ঠ কন্যা হেমশশী, সংক্ষেপে হেমী!

শ্রীমান্ রেবতীমোহন মুন্সীগঞ্জ স্কুলের অষ্টম মান পর্য্যন্ত পড়িয়া বৎসর দুই তিন পূর্ব্বেই পড়া ছাড়িয়াছে। ছাড়িবার পর হইতে এতাবৎকাল ভবঘুরের দলের সর্দ্দারি করিয়া সম্প্রতি চাকরির সন্ধানে ঢাকা গিয়াছিল। সেখানে সপ্তাহ দুই কোনও দূর সম্পর্কিত মাতুলের অন্নধ্বংস করিয়া ফিরিতেছে, মুন্সীগঞ্জে নয়, পদ্মাতীরস্থিত স্বগ্রামে। হয়ত সেখানে নূতন রকম একটা 'কেরিয়ার' গড়িয়া তুলিবে। তবে দুই ঘণ্টা যাবৎ (প্রায় সোনা মিঞার সমসাময়িক ভাবেই)

সে আত্মনিবেশ করিয়াছে, রতন কর্ম্মকারের পঞ্চমা কন্যা হেমীর নিদ্রাশ্লথ দেহটার রূপ বিশ্লেষণে!

রেবতীর পরণে একটী নূতন কাপড়, গায়ে কোট, পায়ে নূতন ফ্যাসনের পাম্প সু, হাতে একটী নূতন ছাতা, তাহার বাঁটের উপর ভর করিয়া সে অনিমিষ নেত্রে তন্ময় ভাবে চাহিয়া আছে। চোখ দুটি কোটরগত, চোখের তারা দীপ্তি-হীন, মুখের উপর বহুকালের আলস্য ও অশ্লীল চিন্তার ছাপ। মাথাটি যেন চিন্তার ভারে নুইয়া ছাতার বাঁটের উপরে আসিয়া পড়িতেছে। এক একবার তরুণী কাৎ ফিরিতেছে, হাত দুটি উঠাইতেছে, নামাইতেছে, তাহার দেহের ঊর্দ্ধভাগ স্থানে স্থানে অনাবৃত হইয়া পড়িতেছে। আর রেবতীমোহনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার প্রত্যেকটি খুঁটি নাটি অতি ঔৎসুক্যের সহিত গ্রহণ করিতেছে।

আজ ঢাকা হইতে ফিরিবার সময়ে গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া রেবতীমোহন ভাবিতেছিল, অষ্টম মানের বিদ্যা লইয়া চাকরি যোগাড় করা যে রকম কঠিন দেখা যাইতেছে, সে ক্ষেত্রে আর একটু কষ্ট করিয়া ম্যা ট্রিক পাশ করিবার চেষ্টা দেখিলে কেমন হয়? হয়ত ম্যা ট্রিক পাশ করিতে পারিলে আই এ পড়িবারও ইচ্ছা হইবে, হয়ত সে একদিন একটা গ্র্যাজুয়েটও হইতে পারিবে!

রেবতীমোহনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়। কিন্তু সে যদি গ্র্যাজুয়েট অথবা তদপেক্ষা আরও কিছু বড় হইয়া দৈব-দুর্ব্বিপাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়! হয়ত সে কথা কল্পনা করিতেই বিধাতা পুরুষের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, তাই তিনি রেবতীমোহনের চিত্তকে সবলে অন্য দিকে ফিরাইয়া নিয়াছেন, যেমন করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতারা ঋষিদের অসম-সাহসিক ব্রত পূর্ব্বাহ্লেই পণ্ড করিয়া দিতেন।...

রেবতীমোহন ধাক্কা খাইয়া নিজকে সামলাইয়া লইল। একবার উঠিয়া দাঁড়াইল। জাহাজের রেলিং পর্য্যন্ত একটু পায়চারি করিল। তারপর আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া নিজ ধ্যানে মগ্ন হইল।

নাজির আলি ষ্টীমারের কেরাণীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করিল। তারপর বহু পার্শেল ও লগেজের স্তূপ পাশে রাখিয়া ষ্টীমারের অপর প্রান্তে গিয়া আর, এম, এস-এর কেরাণীকে কুশল জিজ্ঞাসা করিল। তারপর ষ্টীমারের সম্মুখ-ভাগটায় দাঁড়াইয়া, এক রকম অন্যমনস্কভাবেই ষ্টীমারের সার্চ্চলাইটটা পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পাশে একটা চুঙ্গি, উপরের দিকে গিয়াছে, তাহা দিয়া নীচের লোকে উপরের সারেঙ্গের সঙ্গে কথা বলে। নাজির মুহূর্ত্তের তরে ভাবিল, তাহাকে আর ঐ চুঙ্গীর মুখে কথা শুনিতে হইবে না। ভাবিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ সে ভাবনা সত্যে পরিণত হইল না, কেন না সে সন্ধ্যায়ই এমন ঘটিল যাহার জন্য তাহাকে বহুক্ষণই চুঙ্গীর মুখে দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

৩

নাজির আলি এবার উপরে উঠিল। সারি সারি সেকেণ্ড ক্লাসের কামরা অতিক্রম করিয়া ফার্ষ্ট ক্লাসের দিকে চলিল। সেকেণ্ড ক্লাসে মাত্র গুটিকতক যাত্রী। ভাবিল, ফার্ষ্ট ক্লাস একেবারেই শূন্য থাকিবে। কিন্তু সামনের বহু চেয়ার-সজ্জিত বিস্তৃত ডেকের উপর যাইতেই দেখিল, একজন ইংরেজ বসিয়া আছে, নিশ্চয়ই চা-কর সাহেব। সে তাহার লম্বা দুইটী পা জমিনের উপর বেশ কিছুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া, ডেক চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িয়া, আপন মনে একটা মোটা পাইপ হইতে ধূমপান করিতেছে। দাঁড়াইলে সে নিশ্চয়ই ছয় ফুটেরও কিছু বেশী হইবে। নাজির লক্ষ্য করিল, দেহের তুলনায় তাহার মাথাটি অতিশয় ছোট, গোলগাল। ঠিক বন্দুকের বুলেটের আকার! ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশকালের জন্য তাহার প্রতি নিবদ্ধ হইল, তারপর আবার পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া গেল। হাত পা বিন্দুমাত্রও নড়িল না।

নাজির ডেক অতিক্রম করিয়া অপর পথ দিয়া ফিরিতে গেল। সেখানে যাইবার সময় একটু অবাক হইয়াই দেখিল এক জোড়া দেশী সাহেব মেম, মানে, বাঙ্গালী দম্পতি কাহারও বয়স পঁচিশ অতিক্রম করে নাই। মেম সাহেবের হয় ত চার পাঁচ মাসের জন্য করিয়া থাকিবে, কিন্তু সাহেবের মোটেই করে নাই। হয় ত সে রকম মনে হইবার কার মেম-সাহেব সাহেব হইতে একটু লম্বা। সাহেবটী নিশ্চয় কলিকাতার কোনও বিলাতী কোম্পানীর বাড়ী হইতে পোষাক তৈরি করাইয়াছে। মেমের পরণে হাল্কা রংয়ে-

শাড়ী, পায়ে উঁচু হীলের লেডী-শূ। উভয়ের মুখই কসমেটিক যোগে মসৃণ করা হইয়াছে। সাহেবটী অবশ্য ক্ষৌরকার্য্য দ্বারা প্রথম মসৃণ হইয়াছে। উভয়ের রংই সাধারণ রকম ফর্সা, তবে সাহেবটীর একটু বেশী। হঠাৎ মুখের দিকে দেখিলে কোন্‌টী পুরুষ কোনটী মেয়ে চিনিয়া ওঠা কঠিন। নাজির আলির কাছে তুজনকেই ছবির মত মনে হইল। সে পাশ কাটাইয়া মিনিট কয়েক রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে সাহেব মেমদের আলাপ তাহার কাণে আসিতেছিল। নাজির লক্ষ্য করিল সাহেব-মেমদ্বয় বাংলায় কথা বলিতেছে। আরও লক্ষ্য করিল, যদিও মেমটীর কথার সুর ঠিক কলিকাতার ভাষার, সাহেবটীর সুরে তাহার স্বদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; যদিও তাহা ঠিক চাটগাঁর নয়, তথাপি তাহা যে পূর্ব্ব অঞ্চলের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নাজির ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাস ত্যাগ করিয়া দোতলার ডেকের মধ্যস্থলে আসিল। তুই দিকে কাতার বাঁধিয়া লোকের দল কেহ বসিয়া কেহ শুইয়া আছে। কেহ খবরের কাগজ পড়িতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, তুই তিন জায়গায় তাস খেলিতেছে।

হঠাৎ একটী কালো লোক আসিয়া তাহাকে সেলাম করিল। নাজির তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, একটু ভাবিয়া, উৎসাহের সহিত বলিল, "মকবুল যে! কোথায় চলেছ?" মকবুল তাহার স্বদেশী লোক। সে স্বদেশী ভাষায়, সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দ জ্ঞাপন কয়িয়া বলিল, "কলিকাতায়।"

'সেখানে কি কর?'

'চাকরি।'

'কোথায়?'

"কয়লাঘাটে।"

"কি চাকরি?"

"জাহাজের। কয়লা দিই।"

"কোনখানের জাহাজ?"

এ প্রশ্নের কোনও নির্দ্দিষ্ট উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া মকবুল একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "জাহাজ নানান্ জায়গায় যায়। মার্সেই, লিবারপুল, সানফ্রান্‌সিস্কো, সিডনি, কোবে..."

নাজির আলি স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "ভাল আছ তো?" মকবুল বলিল, তাহার ছোট ভাইটি ঢাকায় এক দোকানে কাজ করিত, এবার তাহাকেও লইয়া যাইতেছে, বলিয়া একটী আঠারো উনিশ বৎসরের ফর্সা রংয়ের যুবকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। নাজির আলি বলিল, "বেশ।"

তখন হঠাৎ জাহাজের গতি অতিশয় বাড়িয়া গেল। রেলিং, পাটাতন সব কাঁপিতে লাগিল। নাজির আলি তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া নূতন চালকের অতিরিক্ত উৎসাহ দমন করিল। তারপর নিজের ঘরে গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এবং এক পেয়ালা সরবৎ খাইয়া আবার নীচে আসিল।

চায়ের দোকানওয়ালাকে শেষ সদিচ্ছা জানাইল; সে সারেঙ্গকে নিজ হাতে তৈরি করিয়া পান দিল। তাহা চিবাইতে চিবাইতে নাজির আলি জাহাজের পশ্চাদ্‌ভাগে গেল। সেখানে প্রথম মেয়েদের, তারপর পুরুষদের ইণ্টার ক্লাস। সে জায়গায় লোকের ভিড় দেখিয়া, নাজির আলি ফিরিয়া অপর দিকে গেল। সেখানে মেয়েদের থার্ড ক্লাস, তারপর জাহাজের হাসপাতাল, মানে ছোট একটি ঘর। অবশ্য সে হাসপাতাল শুধু নামে, রোগী কখনও সেখানে যায় না। ডাক্তার সারাপথ বসিয়াই কাটায়। তবে হাসপাতালের দরজায় এক ব্যক্তিকে শয়ান দেখিয়া নাজির ভাবিয়াছিল বুঝি সে অসুস্থ। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাহার কোনও অসুখ নাই। সে লোকটী একজন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, ঢাকায় পাঁউরুটির ব্যবসা করে। এই জীবনে প্রথম বিবিসহ চলিতেছে। তাহার বিবি, সখিনা খাতুন, মেয়েদের তৃতীয় শ্রেণীতে আছে। সেখানে ইণ্টার ক্লাসের মত বেঞ্চ নেই, নীচে বিছানা পাতিয়া বসিতে হয়। তাই অনেক সময় অসহ গরম। এ জন্যই অনেক যাত্রী মেয়েদের সহ নীচের ডেকে বসিয়া থাকে। সখিনা মেয়েদের কামরায় ঢুকিয়া, গায়ের বুরখা খুলিয়া ফেলিয়া, একখানা ছোট সতরঞ্চ পাতিয়াবসিয়াছে। তাহার পাশে বসিয়া ছিল নীচের রামকুমার কবিরাজের বৃদ্ধা মাতা নিস্তারিণী দেবী। তাহার অতিশয় শুচিবায়ু, তাই নীচে বসিতে স্বীকৃত হয় নাই; কবিরাজ তাহাকে মেয়েদের

ঘরে রাখিয়া গিয়াছে। নবাগতা তরুণীর ঘর্ম্মসিক্ত মুখখানির পানে চাহিয়া বৃদ্ধার মনে সাত বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগতা তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সকরুণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধা এবং তরুণীতে নিবিড় আলাপ জমিয়া গেল। সখিনা অকপটভাবে বৃদ্ধার নিকট নিজের শাশুড়ী ননদ ও জায়েদের কাহিনী বলিয়া যাইতে লাগিল। বোধ হয় তাহার স্বরটা একটু উচ্চে উঠিয়াছিল, তাই তাহার স্বামীটি দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল; তাহাতে পাশ হইতে অপর একটী মুস্লিম বধূ বলিয়া উঠিল, "এখানে পুরুষ কেন?" মুহূর্ত্তের তরে সে-বধূতে ও সখিনায় চোখাচোখি হইল, তারপর সখিনায় ও তাহার স্বামীতে চোখাচোখি হইল; তাহার স্বামী ব্যাপার সুবিধাজনক নয় দেখিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল, এবং কিঞ্চিৎ ভাবিয়া, নিজের বিছানাটিকে সরাইতে সরাইতে হাসপাতাল ঘরের দরজা পর্য্যন্ত লইয়া গেল।

নাজির আলি হাসপাতাল ত্যাগ করিয়া উপরের ডেকের সিঁড়ির দিকে চলিল। যাইতে যাইতে লক্ষ্য করিল, উপরে ঝোলানো বয়াগুলি; প্রত্যেকের উপরে লেখা আছে, 'যমুনা'। লক্ষ্য করিল, সারি সারি বাল্‌তি, উপরে লেখা 'ফায়ার।' ধীরে ধীরে নাজীর সিঁড়ি বাহিয়া তেতলার ডেকে উঠিল। তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। বিশাল পদ্মাবক্ষের উপর তাহার স্বর্ণরশ্মি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দুইদিকে দুইটি পাড়, একটি ফরিদপুর, অপরটি ঢাকা, শ্লেট পেন্সিলের মত সরু দেখা যাইতেছে। সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া একটা গভীর শান্ততার ছায়া বিছাইয়া পড়িয়াছে। পদ্মার উপর ছোট ছোট ডিঙ্গিগুলি রং বেরংয়ের পাল তুলিয়া যেন কোন্ স্বপ্নলোকের অভিযানে চলিয়াছে। দূরে দুই একটা ষ্টীমারের ধোঁয়া আকাশে মিলাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে একটা ষ্টীমার পাশ কাটিয়া, যমুনাকে একটু দোলা দিয়া চলিয়া গেল। পশ্চিমের আকাশ ভরিয়া অস্তগামী সূর্য্যের বিচিত্র বর্ণ-বৈভব অসীম গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নাজির আলি তাহার ক্যাবিনে গিয়া, ছোট একখানি মাদুর বিছাইয়া, সান্ধ্যোপাসনায় ব্যাপৃত হইল।

৪

নাজির ইণ্টার ক্লাসের দিকে যে ভীড় দেখিয়া চলিয়া গিয়াছিল, ক্রমশঃ সে ভীড় বাড়িয়াই চলিল। তার কারণ, মেয়েদের ইণ্টার ক্লাস।

জাহাজ ছাড়িবার কিছু পরেই সে ঘরের মধ্যবয়স্কা যাত্রিণীটী প্রথম তাহার ছেলের ঘুম পাড়াইল, তারপর নিজে ঘুমাইয়া পড়িল। তারপর তরুণী একজন একজোড়া তাস বাহির করিয়া অপর তিনজন যাত্রিণীকে খেলায় আহ্বান করিল এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের খেলা চলিল। দীর্ঘ সময় খেলা চলিবার কারণ, খেলায় তাহাদের দক্ষতা নয়—তাহা তাসের মালিক ব্যতীত অপর কাহারই ছিল না; আসল কারণ, সকলেরই প্রায় সমান বয়স। কিন্তু মুখে সৌহৃদ্যের ভাব থাকিলেও সকলের মনেই আনন্দ ছিল না। একটীর নির্ম্মল মুখমণ্ডল বিষাদে ছাইয়া ছিল, তার কারণ, সে পিতামাতা, ভাই বোন ছাড়িয়া, স্বামীর সঙ্গে সুদূর প্রবাসে চলিয়াছে; এ ষ্টীমার যাত্রা এক দীর্ঘ যাত্রার সামান্য আরম্ভমাত্র। তাহার একটি ছেলে পুরুষ আর মেয়েদের ইণ্টার ক্লাসে আনাগোনা করিতেছে। অপর একটি তরুণী তাহার সমবয়স্কা হইলেও কুমারী। সে পিতার সঙ্গে কলিকাতা চলিয়াছে। কলেজে ভর্ত্তি হইতে নয়, কারণ এখনও কলেজ খোলার অনেক দেরী,—মুখ্যতঃ বেড়াইবার জন্য। কিন্তু উকিল অযথা ব্যবসা ফেলিয়া মেয়ে সহ কলিকাতা বেড়াইতে যায় না। মেয়ে যতদূর ধারণা করিতে পারিয়াছে, এ যাত্রার উদ্দেশ্য, কোনও বিবাহেচ্ছু পাত্রকে বা তাহার আত্মীয় স্বজনকে অথবা সকলকেই তাহাকে দেখানো। সৌভাগ্যক্রমে সে বিশদভাবে কিছুই জানে না, তাই তাহার চিত্তে একটা অস্পষ্ট অনিশ্চয়তা ছাড়া আর গুরুতর কোনও ভাবনা নাই। তাহার মুখে বিষাদের ছায়া নাই; তবে উৎফুল্লতাও নাই। কেমন একটা শান্ত স্থৈর্য্য। যাহারা জীবনের সম্মুখীন হয় নাই, অথচ তার সম্বন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীনও নয়, তাহাদের মুখে যে গাম্ভীর্য্য থাকে, এ তাহাই। কিন্তু সে গাম্ভীর্য্যে ভীতির কোনও মিশ্রণ নাই। তরুণীর সুন্দর ঠোঁটদুটিতে একটা মিষ্টি হাসি লাগিয়াই আছে। তাহা দেখিলে মনে হয় সে এই পৃথিবীকে ভাল বাসিয়াছে। সে হাসিটি দেখিয়া লোকেরও পৃথিবীকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়। অপর দুইটি মহিলার চেহারার বিশেষত্ব এই যে তাহাতে লক্ষ্য করিবার বিশেষ কিছুই নাই।

জাহাজ যখন এক ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, তখন তাহারা খেলা শেষ করিয়া পাড়ের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। একটা বড় নৌকাতে করিয়া যাত্রীরা আসিতেছে; ষ্টীমারের পাশে জলে নামিয়া ময়রারা মিষ্টি বিক্রি করিতেছে। একটা লম্বা বাঁশের মাথায় ছোট ঝোলার মধ্যে মিষ্টিগুলি উপরে দিতেছে, এবং সে ঝোলায় করিয়া পয়সা লইতেছে। তাহাদের পাশ দিয়া একদল ভিখারী তার চেয়েও অধিক লম্বা বাঁশের আগায় ঝুলি বাঁধিয়া পয়সা ভিক্ষা করিতেছে।

জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে দুইজন নূতন যাত্রিণী ইণ্টার ক্লাসে আসিয়া ঢুকিল। তাহারাই কিছুক্ষণ পরে ভিড়ের সৃষ্টি করিল। তাহাদের উভয়ের রংই কৃষ্ণ, চুল বব্ করা, মুখ রুক্ষ, (বোধ হয় গ্রাম হইতে দীর্ঘপথ নৌকাতে চলার দরুণ), পরণে রঙিন ধুতি, (ঠিক শাড়ী বলা চলে না), পায়ে স্যাণ্ডাল বা দেশী কথায় চপ্পল। চোখ দুটি বড় না হইলেও গাঢ় কৃষ্ণ, বিশেষতঃ বড়টীর। বয়স উভয়েরই আঠারো হইতে চব্বিশের মত হইবে,—ঠিক কি তাহা বলা কঠিন। তাহাদের জিনিস গুছাইতে অত্যধিক ব্যস্ততা, দেহের সলীল ভাব, এবং দৃষ্টির অতিরিক্ত চাঞ্চল্য,—(বব্ করা চুলের কথা ছাড়িয়া দিলেও),—সহজেই জ্ঞাপন করে যে তাহারা অতি-আধুনিক। যদিও অপর মেয়েরা তাহাদের সমবয়সী অথবা তাহাদের চেয়ে সামান্য বড়, তথাপি উভয় দলকে দেখিলে মনে হইবে, তাহারা দুই যুগের, হয় ত দুই জগতের, অধিবাসিনী।

নবাগত মেয়ে দুইটি—ঈলা ও লীলা—মিনিট তিনেকের মধ্যে ঘরের অন্য মহিলাদের নিরীক্ষণ করিল, মিনিট দুয়েক তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিল, তারপর উভয়ে ঘরের বাহিরে গিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল, এবং উভয়ে কোরাসে গান ধরিল। ভগবান তাহাদিগকে যেমন কোকিলের রং দিয়াছেন, তেমন কোকিলের কণ্ঠও দিয়াছেন। সে গানের সুর বাংলায় সেই প্রথম। তাহারা তাহা কলিকাতায় অতি হালফ্যাসনের শিক্ষয়িত্রী বা শিক্ষকের কাছে শিখিয়াছে। আধুনিক হোক্ আর যাই হোক্, সে সুরের রেশের মধ্যে এমন একটা করুণতা, এমন একটা মৃদুতা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, যাহা কাহারও সহজ অভিব্যক্তি হইতে পারে না; তাহা শুধু বড় বড় ওস্তাদ ও বড় বড় কবির মস্তিষ্কের ভিতরেই সৃষ্টি লাভ করে। সে গানের আকর্ষণে, একজন দুইজন চারজন করিয়া শতাধিক লোক ষ্টীমারের কোণে গিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। এখন আর পদ্মার তীর দেখা যায় না। সূর্য্যাস্তের ম্লান আভা বিশাল নদীবক্ষে নিবিড়ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। জলের নীচে সমস্ত রক্তিম আকাশ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। জাহাজের আলোড়নের বাহিরে নদীর জলে ঝির ঝির করিয়া মৃদু মৃদু ঢেউ খেলিতেছে।

পশ্চিম আকাশের রং ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া চলিল। সে রং ও রংয়ের প্রতিচ্ছায়ার ভিতর দিয়া আকাশে বাতাসে যেন একটা অপরিসীম ব্যথা একটা অপরিসীম মাধুর্য্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার সংস্পর্শে মানুষের চিত্ত নিবিড় ঔদাস্যে ভরিয়া উঠিল।

বালিকা দুটির গান সে ঔদাস্যকে শতগুণ করুণ, শত গুণ কোমল করিয়া তুলিল।

বাঙ্গালীর সাধনার চরম উৎকর্ষ বুঝি এই ঔদাস্যভরা করুণতা ও কোমলতার মধ্যে! বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিরা তাহাই ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে; বাংলার প্রাচীন বৈষ্ণব ও বাউলেরা তাহাকেই সুরের রূপ দিয়াছে; বাংলার নবযুগে সম্ভবতঃ তাহাকেই নৃত্যের রূপ দেওয়া হইবে।

জাপানের জাতীয় পতাকায় উদীয়মান সূর্য্য চিত্রিত করা হয়; বাঙ্গালীর জাতীয় পতাকায় চিত্রিত করিতে হইবে, অস্তগামী সূর্য্য!

হয়ত মেয়েদের গানের অতি করুণ ভাবটা লোকের অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রতিবাদ করিল ইণ্টার ক্লাসের পুরুষদের কক্ষ হইতে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, মেয়েদের ঘরের মধ্যবয়স্কা মহিলাটির স্বামী,—একজন ব্যবসায়ী, মফঃস্বলের কোনও বড় বাজারে হরিমোহন বাবু বলিয়া সুপরিচিত। হরিমোহন অসহিষ্ণু কণ্ঠে ডাকিল, "খোকা!" খোকা আসিলে তাহাকে তাহার মায়ের নিকট হইতে হারমোনিয়মের বাক্সের চাবিটা আনিতে পাঠাইল। চাবি আনিলে বাক্স খুলিয়া হারমোনিয়াম বাহির করিয়া হরিমোহন বাবু তাহাতে অতি রুদ্র সুর বাহির করিল, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজে জলদ-গম্ভীরস্বরে গান ধরিল। সে গান মেয়েদের করুণ কোমল সঙ্গীতালাপকে ডুবাইয়া দিয়া অর্দ্ধেক জাহাজকে মন্দ্রিত করিয়া

তুলিল। কিন্তু মেয়েরা হটিল না। তাহারাও এক এক বার ছাড়িয়া ছাড়িয়া এক একটা কোমল সুরের তালকে ধরিতে লাগিল। কতক্ষণ ধরিয়াই দুই পক্ষের প্রতিযোগিতা চলিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ প্রতিযোগিতায় বিচার করিবার সুযোগ নাই। সূচ আর কুড়োলের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করিতে পারে? নেংটি ইঁদুর আর কচ্ছপের মধ্যে কে উচ্চ নীচ ভেদ দেখাইতে পারে? হরিমোহন বাবুর সুর জ্ঞান যদি কণ্ঠস্বরের সমকক্ষ হইত, যদি তাহার আরও অধিক তাল মান লয় বোধ থাকিত, হরিমোহন যদি মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে বধ না করিত, তবে হয়ত সমবেত জনতা তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইত। সহসা হরিমোহনের জলদমন্দ্রকে ডুবাইয়া দিয়া আকাশের অগ্নি কোণ হইতে সত্যিকার জলদ-মন্দ্র নিঃসৃত হইল, এবং সকলকে আতঙ্কিত করিল। শোঁ শোঁ রবে প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল। নদী উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে দিগন্তের প্রান্তদেশ হইতে গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ মাথা তুলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সে মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল। তারপর হঠাৎ বাতাস থামিয়া পড়িল। বায়ু-মণ্ডল কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সমস্ত যাত্রীর মুখ কালিমায় ভরিয়া গেল। লোকে যার যার জায়গায় ফিরিল। যাহাদের ক্যাবিন ছিল তাহারা ক্যাবিনে ঢুকিল।

সহসা প্রচণ্ড বেগে ঝড় আরম্ভ হইল। কালবৈশাখীর ঝড়, তাহার আগমন যেমন আকস্মিক, গতিও তেমনি ক্ষিপ্ত। কয়েকজন যাত্রী ছুটিয়া পর্দ্দা ফেলিতে গেল, কিন্তু দেখিল সেখানে খালাসীরা দাঁড়াইয়া; পর্দ্দাগুলিকে উপরের কাঠের সঙ্গে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিতেছে।

৫

নাজির আলি নমাজ শেষ করিয়া উঠিয়াই হঠাৎ অবাক হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি করিল। পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণের দিকের বিদ্যুৎচমকগুলি তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটু আশঙ্কা-জনক মনে হইল। তারপর যখন পাহাড়ের মত মাথা উঁচু করিয়া একটা ঘোর কৃষ্ণ মেঘ আকাশের কোণে দেখা দিল, তখন তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে বেশ একটু বড় রকমের কালবৈশাখীর ঝড় উঠিতেছে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই যখন অনেকগুলি মেঘ উঠিল এবং আকাশ ছাইয়া গেল, তখন তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে ঝড়ের বেগ অতিশয় প্রবল। যাত্রীরা বুঝিবার পূর্ব্বেই নাজির খালাসীদের সর্দ্দারকে ডাকিয়া কাজের কড়া হুকুম দিয়াছে। এঞ্জিনের লোকদিগকে যার যার জায়গায় উপস্থিত থাকিতে বলিয়াছে। তারপর তাহার অধীনস্থ ব্যক্তিকে সরাইয়া নিজে হাল ধরিয়াছে।

হঠাৎ যখন বাতাস থামিয়া গেল, নদী নিস্পন্দ হইয়া রহিল, নৌকার মাঝীরা প্রাণপণে তীরের দিকে ছুটিতে লাগিল, তখন নাজিরও জাহাজের গতি ফিরাইয়া উত্তরের দিকে চলিল। পাড়ের আশায় নয়, কেননা পাড় দৃষ্টির অতীত। সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ঝড় আসিবে; জাহাজকে ঠিক বাতাসের মুখ হইতে যথাসম্ভব সরাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে। নাজির চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, আশ্রয় পাইবার জায়গা নাই; সে স্থান বহু নদীর মুখ; দেখিতে একরকম সমুদ্রেরই মত।

ঝড় যে এত ভীষণ বেগে আসিবে তাহা নাজিরও কল্পনা করে নাই। সে ভাবিয়াছিল হয়ত মেঘগুলি আকাশে ছড়াইয়া পড়িবে। সামান্য দমকা হাওয়া মাত্র বহিবে। কিন্তু মেঘের স্তূপ মধ্যাকাশে না আসিতেই তাহাদের বাধা ভেদ করিয়া একটা প্রচণ্ড ঝটিকা উন্মত্ত বেগে ছুটিয়া আসিল এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই চারিদিক ঘোর অন্ধকারে ঢাকিয়া দিল। ঝড়ের বেগ এত দ্রুত আর তাহাতে বৃষ্টির পরিমাণ এত অধিক, যে মুহূর্ত্তের জন্য নাজিরের মনে হইল, সে যেন জলের উপরে নয়, জলের মধ্যে অক্ষম ভাবে হাল ধরিয়া বসিয়া আছে; যেন নীচে নদী, উপরে আকাশ নয়, উভয়ে একই অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। সহসা নদীর জল পাগলা ঘোড়ার মত লাফাইয়া উঠিল। জাহাজখানাকে একটা লাটিমের মত পুরাপুরি দুই প্যাঁচ ঘুরাইয়া দিল। পাটের উপর ধোবার কাপড়ের মত যমুনা ঢেউয়ের মধ্যে আছাড় খাইতে লাগিল।

ঝড়ের বেগ বাড়িয়াই চলিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির প্রকোপ দ্বিগুণিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে উপর নীচ উভয় ডেক ভাসাইয়া দিল। পর্দ্দা ফেলিয়া আত্মরক্ষার উপায় ছিল না, কেননা সারেঙ্গের আদেশ, পর্দ্দা ফেলিতে দেওয়া হইবে না। খালাসীর দল বৃষ্টি মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যাহাতে কেহ পর্দ্দায় হাত দিতে না পারে।

মেঘের অন্ধকার, তারপর সমাগত রাত্রির অন্ধকার, এ

দুই অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া হঠাৎ ষ্টীমারের সমস্ত আলো নিবিয়া গেল। যাত্রীদের মধ্যে এক তুমুল কোলাহল উঠিল।

বৃষ্টির দাপটে তাহারা ধীরে ধীরে এক পাশে গিয়া সরিতে লাগিল এবং তাহাদের কোলাহল ক্রমশই তীব্র এবং ঘনীভূত হইয়া চলিল।

নাজির হাল ধরিয়া জাহাজখানাকে ঝড়ের মুখ হইতে যথাসম্ভব ফিরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু দেখিল সে চেষ্টা বৃথা। বাতাসের এমন তীব্র বেগ, এবং ঢেউ এত প্রচণ্ড, যে জাহাজের হাল সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িল।

তখন জাহাজের চালার একটা কোণ—মেয়েদের থার্ড এবং মেয়ে ও পুরুষদের ইণ্টারের চালটা—বাতাসে উলটাইয়া দিল। ক্ষিপ্ত বৃষ্টির ধারা লোকের মাথার উপর দিয়া বহিতে লাগিল।

এতক্ষণ নাজির যাত্রীদের আর্ত্তনাদে ততটা মনোযোগ দেয় নাই, বিশেষতঃ মেঘের গর্জ্জনে এক একবার তাহা ডুবাইয়া দিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে কোলাহল যেন ক্রমাগত জাহাজের একদিক হইতে মাত্র শোনা যাইতেছে। তারপর হঠাৎ বিদ্যুতালোকে দেখিল, সমস্ত জাহাজখানা কাৎ হইয়া পড়িয়াছে। আতঙ্কে নাজিরের বুক শিহরিয়া উঠিল। সে নীচে নামিল।

সব অন্ধকার। এ যেন এক অন্ধ পুরীতে প্রেতের লীলা চলিয়াছে। নাজির উচ্চৈঃস্বরে তাহার খালাসীদের ডাকিল। কে কার কথা শোনে! ঝড়ের উন্মত্ত গর্জ্জন, নদীর উন্মত্ত আস্ফালন, লোকের উন্মত্ত চীৎকার! সে চীৎকারের মধ্যে এক একবার এক একটা নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ অতি তীক্ষ্ণ ভাবে আসিয়া কান বিদ্ধ করে। বুঝি নাজীরকেও সে উন্মাদনায় পাইয়া বসিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "সব মাঝখানে এসো, নইলে জাহাজ ডুববে।" কে তাহার কথা শোনে!

নাজির অনুভব করিল, জাহাজের এঞ্জিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভাবিল, ঝড়ের বেগে জাহাজ তো বঙ্গোপসাগরের মুখে ছুটে নাই? ভাবিতেই নাজিরের আর্দ্র মুখে ঘাম দেখা দিল। সে লাফাইয়া উপরে গিয়া হাল ধরিল। এক মুহূর্ত্তের তরে মনে হইল, সব বৃথা। আজ সমস্ত যাত্রীর দলকে লইয়া তাহাকে অতলে ডুবিতে হইবে। এ ঝড়ের মধ্যে এমন স্থানে, একটি লোকও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে না। দশবিশটা বয়া যাহা আছে তাহাদ্বারা কি হইবে? আর সেগুলিও খুব সম্ভব কার্য্যকরী অবস্থায় নাই।

মনে পড়িল আজ তাহার নৌ জীবনের শেষ দিন। আজ তাহার জীবনেরও শেষ দিন! কি মর্ম্মান্তিক শেষ দিন! এই ছিল তাহার নসীবে!

মুহূর্ত্তের তরে মনে হইল, ফার্ষ্ট ক্লাসের সেই বুলেটের মত মাথাওয়ালা ইংরেজ, সেই ছবির মত দেশী সাহেব-মেম-যুগল। মনে হইল কবির আর জাহাজে তেল দিবে না, বাদসা মিঞা আর কয়লা ঠেলিবে না। মনে হইল ছোকরা খালাসীদের কথা। সোনা মিঞা, জামীর, আরও সব। একে একে তাহার অধীনস্থ সমস্ত লোকের ছবি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। মনে পড়িল টিকেট চেকার হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কথা, দোকানদার প্রকাশ পালের কথা, বাটলার নবাব আলীর কথা। মনে হইল তাহার স্বদেশবাসী মকবুলের কথা, যে কলিকাতা কয়লাঘাটে কাজ করে আর কোথাকার লিভারপুল মার্সেই সিড্‌নি ঘুরিয়া বেড়ায়! সে ভাইটীকে শুদ্ধ অকালে প্রাণ হারাইবে।

নাজির ভাবিতে লাগিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণে হাল চাপিয়া ধরিল। শুনিতে লাগিল যাত্রীদের বিকট আর্ত্তনাদ, আর মাঝে মাঝে, মেঘের তুমুল গর্জ্জন।

৬

হঠাৎ যখন ঝড় আরম্ভ হইল এবং জাহাজের ডেকের উপর একটা গোলমাল বাঁধিল, তখন সোনা মিঞা ভাবিল, এই তাহার সুযোগ। সে মাছ কাটিবার কাটারি খানা দিয়া পার্শেলের ঝুড়ির কোণটা কাটিয়া মুরগীটিকে বাহির করিয়া আনিল, এবং গোলমাল বাড়িয়াই চলিয়াছে দেখিয়া, নিশ্চিন্ত মনে তাহাকে সান্ধ্য আহারের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সে-গোলমালের মধ্যে রেবতীমোহন দেখিল সে সিঁড়ি ছাড়িয়া সামনের পাটাতনের উপরে গিয়া বসিয়া পড়িয়াছে এবং দমকা বাতাসে হেমশশীর শাড়ীর আঁচলটা তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে। যখন ডেক অন্ধকার হইয়া পড়িল

এবং হেমী তাহার বাপের লোহা-পেটা শক্ত হাতের পাঞ্জরটাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, তখন রেবতী তেমনই দৃঢ়ভাবে হেমীর শাড়ীর আঁচলখানা নিজের দুই হাতের মুঠার মধ্যে চাপিল। আর সে অবস্থায় হেমীর এত নিকটে গেল যে বালিকার উন্মুক্ত কেশপাশ হইতে, তিন মাস পূর্ব্বে আবিষ্কৃত, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কেশ-তৈল বলিয়া ঘোষিত, "বনফুলরাণীর" জাপানী সৌরভ রেবতীর নাসারন্ধ্র দুইটীকে আমোদিত করিয়া তুলিল। তাহার মস্তিষ্কে ঠিক কবিতা না হইলেও, কবিতার বহুতর "র ম্যাটেরিয়াল" খেলা করিতে লাগিল। সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা অন্ধকারের মধ্যে তাহার মনে হইল, "শীতল বলিয়া শরণ লইনু—ঐ সে আঁচলখানি!"

হঠাৎ প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত হইল, বিদ্যুৎ চমকিল। হেমী আতঙ্কে চীৎকার করিতে লাগিল। সে চীৎকারের শব্দ লক্ষ্য করিয়া সোনা মিঞার দুইটী হাত আসিয়া হেমীর একখানা হাত আকর্ষণ করিল। সে আকর্ষণের ফলে রেবতীর হাত হইতে হেমীর আঁচল খসিয়া পড়িল। রেবতী মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত মণিহারা ফণীর মত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তার পর হঠাৎ বিদ্যুতালোকে দেখিল, এক খালাসী তরুণীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া। সে ভাবিল, পুলিশ ডাকিবে; কিন্তু জাহাজে পুলিস নাই। ভাবিল, লোকটা কি পাষণ্ড, তাহাকে এমন নির্ম্মমভাবে আঁচলের স্পর্শ-সুখ ও কেশের সৌরভ-মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। ভাবিল জগতে এমন সব খারাপ লোক থাকে কেন? সরকার তাহাদিগকে জেলে পুরিয়া রাখে না কেন?

রেবতী যতক্ষণ ভাবিতেছিল, ততক্ষণে রতন কর্ম্মকারের হাতুড়িপেটা হাতখানা আসিয়া পিচ্ছিল পাটাতনের উপর সবলে সোনাকে ঠেলিয়া দিয়া মেয়েকে একটা হেচকা টানে তাহার পাশে আনিল। সে দুপুর বেলাকার স্নেহশীলতা বিস্মৃত হইয়া কটুস্বরে বলিল, "রেখে দে তোর চেঁচামেচি হেমী! চোর ডাকাত ডেকে আনিস্ নে। দুলটা কানে আছে কিনা দ্যাখ্।"

সোনা মিঞা ধাক্কা খাইয়া ডেকের উপর পা পিছ্‌লাইয়া পড়িল। তার পর উঠিয়া ক্রুদ্ধদেহে প্রায় পূর্ব্ব স্থানেই ফিরিয়া গেল। গিয়া অন্ধকারে যে ঘা বসাইল, তাহা রতন কর্ম্মকারকে স্পর্শ করিল না। সে ঘা গিয়া পড়িল রেবতী-মোহনের কানের উপর। রেবতী উজ্জ্বল দিবালোকে বা দীপালোকে কি করিত জানিনা! কিন্তু অন্ধকারের ভিতর সে প্রচণ্ড হইয়া উঠিল এবং সোনাকে আক্রমণ করিল। বোধ হয় অন্ধকারে সাধারণ মানুষের বীরত্ব অসাধারণ হইয়া উঠে; এ কারণে কামান্ধ ক্রোধান্ধ স্বার্থান্ধ বা অন্ধবিশ্বাসী ব্যক্তির মধ্যে যে উগ্রভাব জাগে, অপরে তাহা দেখা যায় না। সে ঝড়ের মধ্যে, জাহাজের অন্ধকার ডেকের উপর সোনা মিঞা আর রেবতীমোহনের তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিল।

তার একটু দূরেই রামকুমার কবিরাজ সিক্তদেহে এবং এবং তদধিক সিক্ত মনে বিড় বিড় করিতেছিল, "আজ এ রকম না হয়েই যায় না। ভরপুর অশ্লেষা নক্ষত্রে যাত্রা! মার সঙ্গে সঙ্গে আমারও কুমতি হয়েছিল!" তাহার মাতা এ কথার উত্তরে শুধু ঠক্ ঠক্ করিয়া দাঁতে দাঁত লাগাইতেছিল।

সোনা মিঞা ও রেবতী যখন অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহাদের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল, তখন তাহারা, তাহাদের কম্পিত হস্তে যত জোর আসিতে পারে তাহা দ্বারা একজন রেবতীমোহনকে অপরে সোনা মিঞাকে, অন্ধকারে যতক্ষণ কাছে পাইল প্রাণপণে প্রহার করিল। যুদ্ধের নিয়মই এই, যুযুৎসু শক্তি সমভাগে বিভক্ত হইয়া যায়; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এবং গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে তাহাই হইয়াছিল, আজও তাহাই ঘটিল, কবিরাজ এক পক্ষে, তাহার সঙ্গী অপর পক্ষে গেল। বোধ হয় "ব্যালান্স অব পাওয়ার" শুধু রাজনৈতিক নিয়ম নয়, প্রাকৃতিক নিয়মও। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার ফল একটু বিভিন্ন হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সোনা মিঞা ফিরিয়া লড়িতে লাগিল কবিরাজের সঙ্গে, এবং রেবতী লড়িতে লাগিল তাহার সাথীর সঙ্গে! রতন কর্ম্মকার একটু দূরে দৃঢ়ভাবে কন্যার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছিল, ঝড় ও বৃষ্টির সঙ্গে একটা নূতন রকম গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে।

ফার্ষ্ট ক্লাসের ডাইনিং হলে মাত্র তিনজন যাত্রী আহারে বসিয়াছিল। একজন চা-কর সাহেব সোওয়া ছয় ফুট উঁচু, মাথাটি ঠিক বুলেটের মত; অপর একজোড়া দেশী সাহেব

মেম; সাহেবের গায়ে চৌরঙ্গীর সাহেবের বাড়ীর পোষাক, মেমের পায়ে সেখানেরই এক বড় দোকান হইতে কেনা এক-জোড়া উঁচু হীলের জুতা। উভয়েই বয়সে তরুণ। তবে মেম সাহেব অপেক্ষা একটু লম্বা। তাহাদের ডিনার অর্দ্ধেক অগ্রসর না হইতেই ঝড় আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহাদের ঘর সুরক্ষিত তাই তাহারা নিশ্চিন্ত মনে ডিনার শেষ করিল। বাটলার টেবিলের উপর কয়েকটা মদের বোতল রাখিয়া গেল। যখন ঝড়ের বড় রকম একটা ঝাপটা আসিয়া ঘরের চালটাকে একটু উপরে তুলিয়া ফেলিল তখন প্রথম দেশী সাহেবটীর, তারপর দেশী মেমটীর চক্ষুদ্বয় আতঙ্কিত ভাব ধারণ করিল। তারপর যখন জাহাজের আলো নিবিয়া গেল, তখন একে অপরকে জড়াইয়া ধরিয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। বিলিতি সাহেব পকেট হইতে একখানা টর্চ্চ বাহির করিয়া, বাটলারের চোখের উপর ফেলিয়া বলিল, "ড্যাম্! জল্দি চিরাগ লে আও।" বাটলার কাতরোক্তি করিয়া বলিল, তাহার কাছে কোনও বাতি নাই। সাহেব হঠাৎ ডেকের উপর সোওয়া ছয় ফুট উঁচু হইয়া খাড়া হইল, এবং বক্সিং-এর রীতিতে একটা বড় রকমের ঘুসি তুলিয়া বলিল, "হ্যায়! জরুর হ্যায়!" বাটলার ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। সম্মুখের পাত্রে যে মদ ঢালা হইয়াছিল সাহেব টর্চ্চের সাহায্যে তাহা ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করিল। তারপর পাশের মদের বোতল খুলিয়া বোতল হইতেই সমস্তটা মদ পান করিল। মদ্য পান করিতে করিতে চোখের কোণ দিয়া দেখিল, দেশী যুগলটী কবুতরের মত মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে।

তখন হঠাৎ একটা দরজা খুলিয়া গিয়া বাহির হইতে জলের ঝাপটা ভিতরে আসিয়া পড়িতে লাগিল। দরজা দিয়া চাহিয়া তিন জনেই দেখিল, বাহিরে বিরাট তাণ্ডব লীলা চলিতেছে। বিলিতি সাহেব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "বাটলার! খানসামা!" কোনও উত্তর না পাইয়া, মাটিতে পা দাপাইয়া অধিক ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল "ড্যাম, শূয়ার!" তারপর নিজে উঠিয়া গিয়া দরজাটা বন্ধ করিল, এবং ফিরিয়া আসিয়া পকেট লাইটার দ্বারা পাইপ ধরাইয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিল। বাঙ্গালীদের কাতরভাব দেখিয়া, হিন্দিতে বলিল, "কুছ ডর নেই, ঈধর আও।"

বাঙ্গালী সাহেব প্রথমতঃ ক্ষুণ্ণ হইল যে সাহেব তাহার খাঁটি বিলিতি কাটের পোষাক দেখিয়াও তাহার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা না বলিয়া হিন্দিতে বলিতেছে। কিন্তু মনকে আশ্বাস দিয়া বলিল, তার জন্য সেই দায়ী, কেন না সে তাহার স্ত্রীর সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলিয়া আসিয়াছে। সে সাহেবের দিকে চাহিয়া চোস্ত ইংরেজী উচ্চারণে বলিল, "থ্যাঙ্ক ইউ":—"থ্যাঙ্ক"টা প্রায় "ফ্যাঙ্ক"-এর কাছাকাছি আসিল। কিন্তু তাহাতেও সাহেবের মন গলিল না। সে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দৃঢ় স্বরে বলিল, "ঈধর আও, ডরো মৎ।" দেশী সাহেব দেখিল, সাহেবের টর্চ্চের আলো তাহার স্ত্রীর মুখের উপর পড়িয়াছে। সাহেব তাহার স্ত্রীর মুখের দিকেই চাহিয়া, এবার সোজাসুজি হুকুমের স্বরে বলিল, "ঈধর আও।" তারপর পাইপ টেবিলে রাখিয়া আর এক বোতল মদ খুলিয়া, তাহার অর্দ্ধেকটা নিজে গলাধঃকরণ করিয়া, বাকীটা দেশী মেমসাহেবের দিকে ধরিয়া বলিল, "পিয়ো! ডর নেহি রহেগা।"

দেশী সাহেব আতঙ্কে, উত্তেজনায়, বাতাহত কদলীপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল। ক্ষীণ, ত্রস্ত, কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "বাট্লার! খানসামা, ঈধর আও।" বিলাতি সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা আরও রুক্ষস্বরে বলিল, "পিয়ো।" বলিয়া তাহার দীর্ঘ হাত দ্বারা বোতলটী মেমসাহেবের সামনে রাখিয়া, মেম-সাহেবের উপর টর্চ্চটী ফেলিয়া, কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল।

আকাশে কড়কড় রবে বজ্র হানিল। বাঙ্গালী অভিজাত যুবক প্রতিবাদের স্বরে ইংরেজীতে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সাহেব আর এক বোতল নিঃশেষ করিয়া তাহারই উপর আলো ধরিয়া বলিল, "তুম্ হিঁয়াসে ভাগো!" সে বলিল "ওযে আমার স্ত্রী! আমি গবর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্ট।" সাহেব বোতলের শেষ কয়েক ফোঁটা মদ জিভের উপর চুষিতে চুষিতে বলিল, "তুম্ ভাগো।" মেমসাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুম্ পিয়ো।" তারপর একটু একটু তোত্লাইতে তোতলাইতে বলিতে লাগিল, "তুম্ ভাগো! তুম্ পিয়ো! তুম্ ভাগো! তুম্ পিয়ো!" সে কথার ছন্দের সঙ্গে তাল রাখিয়া রাখিয়া তাহার হাতের টর্চ্চটী একবার দেশী সাহেবের উপর, একবার দেশী মেমের উপর পড়িতে লাগিল। তারপর হঠাৎ সাহেব

উগ্রভাবে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল। তখন সহসা পেছন দিকের দরজা খুলিয়া গেল। প্রায় পঞ্চাশজন অন্য শ্রেণীর যাত্রী যুগপৎ সে গৃহে প্রবেশ করিল।......

মেয়েদের ইন্টার ক্লাসে ঈলা ও লীলার গান থামিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কোকিলত্ব ঘুচিয়া গেল; তাহারা বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাকের রূপ ধারণ করিল। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে সে স্থান ত্যাগ করিল।

বোধ হয় দোকানের এক পাশে গিয়া আশ্রয় লইল। কারণ দোকানদার প্রকাশ পাল এক হাতে দোকানের রেলিং এবং অপর হাতে টাকাপয়সা রাখিবার কাঠের ছোট হাত বাক্সটি ধরিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে, শুনিতে পাইতেছিল, একটা ক্ষীণ, অথচ উন্মাদময় সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, যেন ঝড়ের আঘাতে জাহাজের বুক ফাটিয়া গলিয়া পড়িতেছে। প্রকাশ প্রথমতঃ ভাবিল, এ জাহাজের চালার ছিদ্রের ভিতর ঝড়ো বাতাসের করুণ, আর্ত্তনাদের মত, গান। কিন্তু তাহার হাতের তালু দিয়া কান দুটিকে বাতাসের বেগ হইতে কিঞ্চিৎ বাঁচাইয়া, মনোযোগের সহিত শুনিল, যেন একাধিক নারীকণ্ঠে গাহিতেছে, "ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার......"

মেয়েদের ঘরগুলির ছাত যখন উড়িয়া গেল, তখন প্রথমতঃ মেয়েদের থার্ড ক্লাস হইতে সমস্বরে নিস্তারিণী ঠাকরুণ, সখিনা খাতুন এবং অপর মুস্লীম বিবিটি বিলাপ করিয়া উঠিল। এ বিলাপ-ধ্বনি শুনিয়া সখিনার স্বামী অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে প্রথম সখিনার তোরঙ্গটাকে তারপর সখিনাকে আবিষ্কার করিল, এবং আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় নেই।" তখন অপর বিবিটি বিলাপের সুরকে অভিযোগের সুরে পরিণত করিয়া বলিল, "মেয়েমানুষের কামরায় পুরুষ মানুষ কেন?" সখিনা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "ছাত উড়ে' গেছে, এখন আবার কামরা কোথায়?" তারপর কে কি বলিল ঝড়ের জন্য কিছুই শোনা গেল না।

জাহাজের এ ভাগের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ যাত্রীরা মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া প্রবল ঝড়ের তাড়নায় বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। এক একটা বিদ্যুতের ঝলকে তাহাদের বৃষ্টি-প্লাবিত কুণ্ঠিত দেহ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। একটী তরুণী তাহার শিশু পুত্রটীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া নুইয়া পড়িয়া নিজের পিঠে ঝড়ের প্রকোপ বহন করিতেছে। অপর শিশুটী তাহার বাপের কাছে বসিয়া হারমোনিয়ম বাদ্য শুনিতেছিল, সেখানেই রহিয়া গিয়াছে। তাহার মা বারংবার কাতর আহ্বান করিয়া কোনও সাড়া পাইতেছে না। অপরেরা বেঞ্চের পায়া ধরিয়া বসিয়া আছে। একটী—যাহাকে ভাবী বরের দেখার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছিল—ঠাণ্ডায় অসাড় হইয়া যাইতেছে।

ইণ্টার ক্লাসের পুরুষেরা আসিয়া মেয়েদের দরজায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারাই এখন কতকটা পর্দ্দার কাজ করিতে লাগিল।

হঠাৎ কোথা হইতে আর্দ্রদেহে পাঁচ ছয়টী লোক আসিয়া তাহাদের উপর ছোট একটা টর্চ্চের আলো ফেলিয়া ত্রস্তভাবে বলিল, "আপনারা মেয়েদের নিয়ে সরে আসুন।" তাহারা সকলেই কলেজে পড়া যুবক, সে জাহাজেরই যাত্রী। তুফানের মধ্যে তাহারা উভয় ক্লাসের মেয়েদের আলো দেখাইতে দেখাইতে ধীরে ধীরে জাহাজের অপর প্রান্তে লইয়া গেল, এবং ফার্ষ্ট ক্লাসের ডাইনিং হলের দরজার হুড়কাটা ধাক্কা দিয়া ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে সেখানে ঢুকাইল। তাহাদের পেছনে পেছনে ডেকের উপর হইতে আরও ত্রিশ চল্লিশটি লোক সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

সকলে চলিয়া গেলে হঠাৎ বিদ্যুতালোকে দেখা গেল, উন্মুক্ত আকাশের নীচে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে, মেয়েদের ইণ্টার ক্লাসের কামরায়, উপরোক্ত যুবকের একজন এক তরুণীর অবশ দেহখানির একদিকে এবং একজন বৃদ্ধ অপর দিকে ধরিয়াছে। কিছুদূর আসিয়া বৃদ্ধটী সে দেহের ভার বহনে অক্ষম হইয়া পড়িল। তখন যুবক তাহাকে তাহার বাহুর উপর উঠাইয়া প্রথম হাঁটুতে ভর করিয়া, তারপর দাঁড়াইয়া বহিয়া নিতে লাগিল। সিঁড়ির কাছে অনিশ্চিত ভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইল এবং বৃদ্ধকে কি বলিল। তারপর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দেহটীকে প্রবল ঝড়ের মধ্যে নীচের ডেকে লইয়া গেল, এবং এঞ্জিনের বয়লারের উত্তাপের মধ্যে, খালাসী-দের দুইটা কাঠের তোরঙ্গের উপর তাহা শোয়াইয়া রাখিল। তারপর নিজের সার্ট খুলিয়া তাহা দ্বারা ধীরে ধীরে সে দেহের জল মুছিতে লাগিল।—

ঝড় থামিয়াছে। জাহাজের এঞ্জিন চলিতে আরম্ভ

করিয়াছে। আবার সমস্ত আলো জলিয়াছে। খালাসীরা কাজে ব্যস্ত। যাত্রীরা যার যার সঙ্গীর সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। জাহাজ গোয়ালন্দের নিকটবর্ত্তী, তাই মাঝে মাঝে বিপুলনাদে সিঙ্গাধ্বনি হইতেছে। ইতিমধ্যে জাহাজ এক ষ্টেশনে ধরিয়াছিল, সেখানে কয়েকজন যাত্রী নামিয়া গিয়াছে।

নাজির আলি পোষাক বদলাইয়া, মাথা মুছিয়া, নিজ ক্যাবিনের তক্তপোষটীর উপর বসিয়া গভীর তৃপ্তির সহিত বলিতেছে, "শুধু যমুনা বলে আজ এ ভাবে রক্ষা পেল। অন্য জাহাজ হ'লে কোন্ সময় পঞ্চাশ হাত জলের তলে পড়ে থাকৃত! যমুনার খোলটা অক্ষয়, আরও দশটা ঝড়েও তার কিছু করতে পারবে না।"

গোয়ালন্দ-ঘাটে একটী মেয়েকে ডেক্ চেয়ারে বসাইয়া গাড়ীতে তোলা হইল। চেয়ারের একদিকে ধরিল তুইজন কুলী, অপর দিকে একটী বলিষ্ঠ চশমাধারী, কলেজেপড়া যুবক। সম্মুখে একজন বৃদ্ধ। উপরের ডেক হইতে নীচে নামিয়া ভিড়ের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে একজন কুলী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, এ আপনার কে হয়? বোন, মা,—" যুবক একটু অবাক হইয়া, নেহাৎই সহজভাবে উত্তর করিল, "তা' এখনও জানিনে। চল্।"

শেষ যাত্রীটি চলিয়া গেলে নাজির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজ ক্যাবিনে গিয়া জিনিষপত্র গুটাইয়া তুইজন খালাসীর মাথায় দিল। তারপর ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি বাহিয়া ঘাটের ফ্ল্যাটে গিয়া উঠিল। সে রাত্রিটা এবং পরদিনের অর্দ্ধেক সেখানে যাপন করিবে এবং পরদিন বিকালে চাঁদপুরের ষ্টীমার ধরিয়া চাটগার অভিমুখে চলিবে।

ফ্ল্যাটের ছোট্ট ক্যাবিনের জানালা খুলিয়া নাজির পদ্মার দিকে চাহিল। দেখিল, আকাশ অপরিসীম নির্ম্মল, চাঁদ উঠিয়াছে, চারিদিক জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। সে জ্যোৎস্নার মধ্যে, অদূরে তাহার বারো বৎসরের স্মৃতি জড়িত ষ্টীমারখানি নোঙ্গর করিয়া আছে, এবং মৃদু ঢেউয়ের উপর আস্তে আস্তে দোলা খাইতেছে।

নাজির জ্যোৎস্নার মধ্যে ক্লান্ত চক্ষু তুটি আয়ত করিয়া মোটা শাদা শাদা অক্ষরে লেখা তাহার নাম পড়িল,— যমুনা।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

স্বপ্ন

শ্রীসুপ্রভা দেবী

মৃত্যু এল অর্দ্ধরাতে। কৌমুদী-হসিত,
শিশির-সজল সেই হেমন্ত রজনী
শেফালী-সুবাস ভরা। আধ বিকশিত
আনম্র কিশোরী তনু জ্যোছনা-বরণী,
নিরখিনু অনুপম। বারেক নীরেব
হেরিয়া নিসুপ্ত ধরা কহিলাম তবে,
ভালোবেসে জীবনেরে করেছি গ্রহণ,
ভালোবেসে মৃত্যু তাই করিব বরণ।

তারপরে কত দেশ হয়েছিনু পার,
কত দূর স্বপ্ন-তীরে দোঁহার বিহার :
কল্পলোকে যাপিলাম অচঞ্চল ক্ষণ,
নিস্তরঙ্গ মহাকাল। জাগিনু যখন,
সবিস্ময়ে হেরিলাম চন্দ্র অস্ত যায়,
এক বিন্দু অশ্রুলেশ আঁখির পাতায়।

গুরু-প্রণাম

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ক্লান্তদহন ধরণী যখন রৌদ্ররুক্ষ সকল দিশা,
হুহু বায়ুদাপে তৃণ তরু কাঁপে, প্রখর তৃপ্তিবিহীন তৃষা।
মর্ত্ত্যের ধূ ধূ মরুভূর বুকে উদ্যান রচি শ্যামল ছবি
বিমল শান্তি বিতর নিয়ত তুমি ভারতের প্রাণের কবি।

মোরা পুরাতন শিষ্য তোমার মহানগরীর অঙ্গনেতে
বিগত দিনের স্মরণের মাঝে মিলেছি মোদের আশ্রমেতে ;
কৃষ্ণচূড়ার আবিরের গুঁড়া হেথাও আগুনে রাঙায় ধূলি,
চম্পকশাখে হের জ্বলে ওই কনককান্তি প্রদীপগুলি।

মুক্ত উদার নাহি প্রান্তর, দিগন্ত নহে অন্তহারা,
অম্বর হেথা ধূলিভারে নামি চুম্বন করে প্রাচীর-কারা ;
কর্ম্ম ও কোলাহলের কালিমা ম্লানিমা ঢেলেছে অঙ্গ ভরি'
মোরা তারি মাঝে তবু উৎসাহে উৎসব করি তোমারে স্মরি !

তব জীবনের নবীন ঊষার স্মরণের স্রোতে উজান বাহি
মূঢ় বিস্ময়ে আজো দুনয়ন রহে নিশ্চল পলকে চাহি।
উদয়াচলের তরুণ তপন অস্তাচলের তীরেতে আসি'
কি মন্ত্রে আজো করুণ অধরে ধরে অম্লান অরুণ হাসি।

আজি শতকথা কুসুম সমান ফুটিবারে চাহে হৃদয় বনে
তোমার পুষ্পবোধন মন্ত্র সঞ্চার করো মৌন মনে ;
বাণীহারা যারা তাদেরো ইসারা ছন্দে যাহার প্রকাশ লভে
বিমূঢ় হিয়ার গোপন ভাষার আভাস জানি সে নিমেষে লবে।

জগৎ জেনেছে আধেক তোমার—ভাবের ভুবনে বিলাসী কবি,
জীবনের আশা, স্নেহ ভালবাসা, তুমি যে মোদের দিয়েছ সবি।
জগতের হিয়া জিনিল যে কবি পূজা তার সারা জগৎ জুড়ি,
মোদের পরাণ তপোবন তরু ছায়ার মায়ায় মরিছে ঘুরি !

শান্তি ও শ্রীর চিরনিকেতন সে যে আশ্রম,—সাধনা ভূমি
গুরুদেব মোরা শিষ্য তোমার, সেথায় কেবল মোদেরি তুমি ;
শান্ত হেথায় সব কোলাহল, মূক হয়ে যায় সকল ভাষা,
দেওয়া নেওয়া চলে গোপন হৃদয়ে, পলকে পূর্ণ সকল আশা।

শালবীথি তলে আলোক ছায়ায় আলিপনা আজো হতেছে আঁকা,
আম্রবনের নিবিড় মায়ায় পুরাতন স্নেহ রয়েছে ঢাকা।
বায়ু-হিল্লোলে তরু-পল্লবে কলালাপ আজো তেমনি চলে
আজিও বিরাজে পরমা শান্তি সপ্তপর্ণী তরুর তলে।

ধূসর মাঠের বক্ষের পরে বাঁকা রাঙা পথ গিয়াছে ঘুরে,
সকলে মিলিয়া বলে বার বার "তোমরা কেহই নহ গো দূরে।"
তোমার স্নেহের পরশমণির পরশ পরাণে পেয়েছে যারা
জীবন তাদের বাঁধা যে হেথায় দূরে যাবে চলে কেমনে তারা !

তব জীবনের সাধনার পথে মোদের করেছ নিত্য সাথী
পরাণ মোদের তোমার পরাণে অলখসূত্রে লয়েছ গাঁথি ;
মোদের জীবনে জীবন তোমার খুঁজিছে আপন স্বার্থকতা,
সুগভীর তব বাণী সে অমোঘ—নহে নিষ্ফল মুখের কথা।

আজিকার দিন বক্ষে তোমার চির-নূতনের বারতা আনে
অমল আলোকে নবজীবনের অমৃত সরস পরশ প্রাণে ;
ললাটে তিলক শুভ কামনার আঁকেন প্রাণের দেবতা তব
চলে বৈশাখী তপ্ত পবনে জীবনের অভিষেকোৎসব।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন আশ্রমীক সঙ্ঘের (প্রাক্তন অধ্যাপক ও ছাত্রদের সভা) কলিকাতা শাখা সমিতির রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত।

কাব্য ও জীবন

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ

বর্ত্তমান বাঙ্গালীকে গড়ে তুলেছেন তিন জন মনীষী—কর্ম্মজগতে স্বামী বিবেকানন্দ, ধর্ম্মজগতে পরমহংসদেব এবং ভাবজগতে কবি রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষিত বাঙালী, ভাবুক ও চিন্তাশীল বাঙালী আজ যে ভাষায় কথা বলেন, লেখেন এবং বক্তৃতা দেন তাহা রবীন্দ্রনাথের ভাষা। এমন কি যে-সব বাঙালী বিদ্বেষ বা মূঢ়তাবশে তাঁকে নিন্দা বা ঠাট্টা করেন সে-ভাষাও রবীন্দ্রনাথের। বাঙালীর চিদাকাশে রবির দীপ্তি এত উজ্জ্বল যে, তাতে আর কোন আলো দেখা যায় না।

কবির অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মনীষিদের পূজা পেয়েছেন তাঁর এই সামান্য অর্ঘ্যে কোন প্রয়োজন নেই। তবে মনে হয়, বহুদিন হ'তে তাঁর মনের কোণে বাঙালীর উপর কেমন একটা অভিমান জমাট হ'য়ে আছে। তাঁর সভাষাভাষী স্বজাতির হাতের কশাঘাত তাঁকে সব চেয়ে ব্যথা দিয়েছে। আশা করি, আজ তিনি 'অস্তাচলের ধারে বসি' 'পূর্ব্বাচলের পানে' তাকিয়ে বল্‌তে পারবেন 'Father! forgive them, for they know not. মানুষের বুঝবার সীমা আছে, না বুঝবার ত কোন সীমা নাই। আজকের দিনে তাঁকে মাত্র এই নিবেদনটুকু জানাতে চাই যে, যদি কেহ তাঁর কবি-প্রতিভার যথার্থ সমঝদার থাকে সে বাঙ্গালী। 'এক হাতে তার তরবারি আর এক হাতে হার'—তরবারির আস্ফালনটা হ'য়েছে বাইরের জগতে, কিন্তু চিরদিন যাঁরা হাতে হার নিয়ে পূজা করেছেন তাঁদের পূজা চলেছে গোপনে। আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব অধ্যাপক ৺নিখিলনাথ মৈত্র মহাশয় (১৯টি ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল) বলতেন, "হোমার, দান্তে, গেটে, সেক্‌স্‌পীয়ার ও কালিদাস—জগতের শ্রেষ্ঠতম কবিদের সঙ্গে যখন রবীন্দ্রনাথের তুলনা করি তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সত্যই অতুলনীয়।"

তিনি 'চির-তরুণ, চির সবুজের কবি।' অচলায়তনে তাঁর স্থান নেই, গতিশীলদের তিনি পথ প্রদর্শক। নব জাগ্রত বাঙ্গালীর, নবীন জগতের, বর্ত্তমান জগতের আশা—আকাঙ্ক্ষার বাণী তিনিই মূর্ত্ত কো'রে তুলেছেন। তাঁকে দেশ বা কালের গণ্ডী দিয়ে বাঁধা চলে না। বিধাতার জয়টীকা তাঁর ললাটে, জগৎপূজ্য সুধীজনের বরমাল্য তাঁর কণ্ঠে, আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার শ্রীচরণে।

প্রাচ্যের খৃষ্টকে প্রতীচ্য মোক্ষদাতারূপে গ্রহণ কো'রেছে সেই প্রতীচ্যই আজ পূর্ব্বের রবিকে পূজা দিয়েছে। তবে প্রতীচ্যে মানুষ খৃষ্টের বাণী পালন করেনি। আমাদের মনে হয় প্রতীচ্যের যে এই রবীন্দ্র-পূজা এতে আছে মূঢ় আনন্দ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার কলরব। মাধবীর মাধুর্য্য কোন দিনই প্রতীচ্য বুঝবে না, আমরাও Willowর করুণতা বুঝতে পারি না। কাজেই তাঁর কাব্যের রস প্রকৃতপক্ষে যদি কেহ গ্রহণ কোরতে পারে সে এই বাঙ্গালী। তাঁর কাব্যের স্পর্শে আমাদের মন, বিজ্ঞান ও আনন্দময় জীবন বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। একখানা 'চয়নিকা' হাতে থাকলে সংসারের অনেক দুঃখই সহনীয় হ'য়ে ওঠে।

কবি কোন কথাই ভোলেন না। 'শেষের কবিতায়' নিরীহ অধ্যাপক সম্প্রদায়কে বড়ই কৃপার পাত্র ক'রে এঁকেছেন। জানি, এক অধ্যাপকের তর্কের ভয়ে তিনি কাশ্মীর ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ন। এক বিরাট অধ্যাপক তাঁহার গভীর গবেষণা ও সূক্ষ্মতত্ত্ব কবিকে বোঝাতে এসে বুঝতে পারলেন তাঁহার পাণ্ডিত্য কতটুকু কাজেই শূন্য কুম্ভ পূর্ণ করে ফিরে গেলেন। এমন কি একজন সামান্য অধ্যাপক তাঁর আশ্রমে থিয়েটার ও দৃশ্যপটের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে তর্ক করেন, তাঁহাকেও তিনি ভোলেন নি। 'তপতী'র ভূমিকায় সেই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দেওয়া হ'য়েছে।

দার্শনিক সম্প্রদায় সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি দিয়ে শাস্ত্রানুশাসন পালন ক'রে যে তত্ত্বে উপনীত হন, পণ্ডিতবর্গ গভীর গবেষণা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের দ্বারা যে সমস্যার সমাধান করেন তাহাতে চমৎকৃত ও বিস্মিত হ'তে হয়। ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাকা যায় না। কিন্তু এ পথ কঠিন, ক্ষুরস্য-ধারা নিশিতং দুরত্যয়া। ভক্ত সাধনা দ্বারা যে সত্য লাভ করেন, লব্ধানন্দী হন, তাহাও অতি কঠিন। কিন্তু কবি ঋষি। অন্তর্দৃষ্টি সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও জন্মান্তরীন সাধনা বলে তিনি সত্যকে দেখেন সহজে, দিবালোকে। তাঁহার প্রকাশের ভাষা বিচিত্র, মধুর, আবেগময়, অনন্ত সুষমামণ্ডিত। কবির কৃপায় আমরা সত্যকে কত সহজে দেখতে পাই এবং 'তদ্ভাবিতং' হ'লে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি।

শুনতে পাওয়া যায় প্রতি পাঁচ শত বছরে একটী Phoenix অগ্নিতে আহুতি দিলে তাহার ভস্ম হ'তে নূতন এক Phoenix-এর জন্ম হয়। একটা জাতির বহুকালের সাধনা, বহু প্রকাশের ব্যথার পর তবে একজন কবির আবির্ভাব হয়। যেমন কত দিনের চেষ্টায় একটি chrysanthemum ফোটে, সেইরূপ কত যুগের সাধনায় একজন কবির উদয় হয়।

জাতির সংস্কৃতির (culture) পরিচয় পাই তাহার কাব্য-সম্পদে, তাহার শিল্প সাধনায়। কাব্যে যে আনন্দ পাই, তাহাই ত চরম আনন্দ। শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত, নৃত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা ও কাব্য চর্চ্চায় যাঁহারা আনন্দ পান তাঁহারাই এ সংসারে ভাগ্যবান। মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠ দান তাহা উপভোগ কোরতে হো'লে শিক্ষা, সাধনা ও কালচার চাই। কোন বড় কবি বা শিল্পীর সহিত পরিচিত হো'তে হোলে শ্রদ্ধা চাই, ভাবুকতা চাই, রসবোধ চাই। যাঁর জীবনে রসবোধ উদ্বুদ্ধ হয়নি, তাঁর নিকট কাব্যের কোন মূল্য নাই। ক্ষুদিরাম মুদী যদি 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ' বুঝতে না পারে—তাহাতে কবির কোন ক্ষতি নাই। কোন বড় কবি বা বড় শিল্পী সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়। গেটে বা রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে যে সাধনার প্রয়োজন, ভারতচন্দ্র বা দাশরথি রায়কে বুঝতে তাহার কোন প্রয়োজন নেই। যে সব সমালোচক রবীন্দ্রনাথ কেন দাশরথি রায়ের ন্যায় 'জনগণের' কবি হ'তে পারলেন না বলে 'হায় হায়' করেন—তাঁদের শিশু-সুলভ ভাবে হাস্য সংবরণ কঠিন হ'য়ে ওঠে। অভিজাত সাহিত্যই যথার্থ সাহিত্য, জনগণের মন কখনই কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের কাব্য চর্চ্চায় আনন্দ পায় নাই, পেতে পারে না। রাখাল বালক বা ছিদাম মুদীর কণ্ঠে যে গান গীত হয় তাহা নীলকণ্ঠ বা মতিরায়ের রচনা।

আমাদের পরম সৌভাগ্য তিনি কোন মহাকাব্য লেখেন নি। আজকালকার দিনে মহাকাব্য পড়তে অবসর নেই। তিনি আনন্দের প্রেরণায় গান গেয়েছেন, সর্ব্ব মানবের বেদনার, আশার অভয়ের বাণী তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। পিপাসিত, ত্রিতাপ জর্জ্জরিত মানব তাঁহার অভয় বাণীতে সান্ত্বনা পেয়েছে, জীবনসমস্যার সমাধান পেয়েছে। নৈরাশ্যের মাঝেও আনন্দ পেয়েছে। কবি গেয়েছেন—

'শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি
পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশ তলে।
অন্তর হ'তে আহরি বচন
আনন্দ লোকে করি বিরচণ
গীত রসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলি জালে।

তাঁহার উদ্দেশ্য—

কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা
বিদায়ের আগে দু চারিটা কথা
রেখে যাবো সুমধুর।

জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তিই তো কাব্য। যে কাব্য জীবন নিয়ে নয় তাহা তো ফুলঝুরি। তাঁর কাব্য সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাঁর দু একটি ছোট কবিতা ব্যক্তিগত জীবনকে কেমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে, কত নৈরাশ্য ও বেদনায় সান্ত্বনা দিয়েছে, দৈনন্দিন জীবনে মানুষের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতাকে হাসিমুখে উপেক্ষা করতে সমর্থ করেছে, এই কয়টি কথা নিবেদন করেই আমি বিদায় নিতে চাই। জীবনকে বহন করতে হ'লে কুশাঙ্কুর হ'তে তরবারির আঘাত সবই সহ্য করতে হয়। We should laugh

through tears—চোখে জল আসে আসুক তা' ব'লে প্রাণ খুলে হাসব না কেন ? জীবনের একমাত্র Philosophy, good humoured cynicism with a tincture of stoicism। কবি লুক্রেসিয়স্ সম্রাট অরিলিয়ম্ এবং মনীষি আনাটোল ফ্রান্স ঋজুজটীল নানা পথ দিয়ে যে সত্যে উপনীত হ'য়েছেন কবি 'ক্ষণিকার' 'বোঝাপড়া' কবিতাটিতে সেই সত্য কত সহজে, কত মধুরভাবে প্রকাশ করেছেন এবং মাত্র এই একটি কবিতাতেই আমাদের জীবন যাপন কত সহজ হ'য়ে ওঠে।

তিনি বলেছেন,

কেউবা তোমায় ভালবাসে
কেউ বা বাসতে পারে না যে
কেউ বিকিয়ে আছে, কেউ বা
সিকি পয়সা ধারে না যে।
কতকটা যে স্বভাব তাদের
কতকটা বা তোমারও ভাই,
কতকটা বা ভবের গতিক
সবার তরে নহে সবাই।
মান্ধাতারি আমল থেকে
চলে আসচে এমনি রকম
তোমারই কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম।

এটা কিছু অপূর্ব্ব নয়,
ঘটনা সামান্য খুবি,
শঙ্কা যেথা করে না কেউ
সেইখানে হয় জাহাজডুবি
মনেরে তাই কহ যে
ভাল মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

তোমার মাপে হয়নি সবাই,
তুমি হওনি সবার মাপে
তুমি মর কারো ঠেলায়
কেউ বা মরে তোমার চাপে।
তবু ভেবে দেখ্‌তে গেলে এমন কিসের টানাটানি ?
তেমন কো'রে হাত বাড়ালে সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে মধুর ঠেকে ভোরের আলো
মরণ এলে হঠাৎ দেখি মরার চেয়ে বাঁচাই ভাল।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।

রবীন্দ্রনাথের বাণী আশার বাণী। তিনি কিছুতেই দমেন না। মৃত্যুকে এত মধুর রূপে বিশ্বের আর কোন কবি দেখ্‌তে পেরেছেন কি ? 'আমার সকল কাঁটা ধন্য কো'রে ফুট্‌বে গো ফুল ফুটবে।' এ বাণী শুধু কবির নয়, ইহা ভগবৎপ্রাণ ভক্তের। যিনি সত্যং শিবং সুন্দরং-এর উপাসক 'অনন্তং জ্ঞানং ব্রহ্ম' যাঁর উপাস্য তাঁর কণ্ঠেই ও গান সম্ভব। তিনি মুক্ত কণ্ঠে গেয়েছেন

শুধু অকারণ পুলকে
নদী জলে পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের অলকে
মর্ম্মর তানে ভরে ওঠ গানে
শুধু অকারণ পুলকে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অনাগত সুদিনের লাগি

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

সুদীর্ঘ নিদাঘ দিন মন্থর সর্পের মতো আপনার অবসন্ন কায়া
সন্ধ্যার বিবর মাঝে গুটাইয়ে লয় ধীরে, নেমে আসে প্রদোষের ছায়া।
কালো দীর্ঘিকার জলে বনতলে ধীরে দোলে সায়াহ্নের অস্তমিত আলো
আজিকে নূতন করে পুরাতন সায়ন্তন মূর্ত্তিখানি লাগিয়াছে ভালো।

এই ধীরে-ধীরে-নামা অন্ধকার, এই শান্ত ছবি
দেউলেতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা—
পিয়াসী আমার চোখে আর ফিরিবে না এরা,
আজি মোর বিদায়ের পালা।

আমার মনের বীণা যে রাগিণী রচে আজ সায়াহ্নের ভালে,
আমার হিয়ার মাঝে সঙ্গীহীন মৌন শোক নিদারুণ যে-আগুন জ্বালে,
তাহার স্ফুলিঙ্গ রবে জাগি
নিখিলের বিরহীর লাগি—
তাহার মূর্চ্ছনাখানি মৌনবীণা তন্ত্রীলীনা রবে,
চিরদিন ধ্বনিবে নিরবে।

দীর্ঘিকার কালোজলে দেউলের ছায়াতলে ধীরে গোঠে ফিরে আসা ধেনু,
কম্পিত বেতস বনে বনানীর আবরণে উদাসীন দীর্ঘছায়া বেণু,
এদের সবার মাঝে রেখে গেনু মোর ভালোবাসা,
এদের নীরব কণ্ঠে সঁপিলাম এ প্রাণের ভাষা।

ওগো মাধবীর লতা, পত্রশ্যাম আম্র-উপবন,
বায়ু-মর্ম্মরিত ঝাউ, সুকোমল শ্যাম তৃণাসন,
তোমরা রহিও জাগি প্রিয়ার মন্দির দ্বারে সতর্ক প্রহরী
আমার পতাকা লয়ে অনিমেষে অবিরাম দিবস শর্ব্বরী।

যদি কোনো দিন শেষে ঘুম ভাঙা আঁখি মেলি প্রিয়া
চাহে তোমাদের পানে দক্ষিণের বাতায়ন দিয়া—
যদি দেখ চোখে তার নাহি জ্বলে প্রণয়ের আলো,
ভাষাহীন রিক্ত আঁখে ভরা শুধু সুনিবিড় কালো,
তোমরা কয়ো না কথা, শুধু রয়ো জাগি
অনাগত সুদিনের লাগি।

কিন্তু যবে ফাল্গুনের অগ্নিলাগা ফুল্লতরু প্রস্ফুটিত যৌবনের দিনে
'ত্যজি লজ্জা ভয় মান নিঃশেষে করিবি দান'—বাজে গান বনানীর বীণে,
অথবা আকাশে যবে ঘনমেঘ ঘোর রবে উচ্ছ্বসিত বিরহের বাজায় ডমরু,
সঙ্কোচের বাধা টুটি বারিধারা পড়ে লুটি, বিপুল ঝটিকা বেগে
দোলে বনতরু—

দেখ যদি সেই দিন প্রিয়া মোর উচ্চকিত আঁখি
উচ্ছ্বসিত বক্ষ তার কাঁপিয়া উঠিছে থাকি থাকি,
দেখ যদি চোখে তার অজানা কি বেদনার আলো,
দৃষ্টি তার দিগন্তপ্রসারি—

তখনি মিলিত কণ্ঠে হে ব্রততী বনস্পতিগণ,
আমার প্রণয় লিপি তাহারে করিও নিবেদন—
বোলো তারে শতকণ্ঠে বোলো—
"তুমি তারে ভোলো, নাই ভোলো,
সে তোমায় ভোলে নাই, তারি বাণী রহিয়াছে জাগি—
শুধু তোমা লাগি!

তব নব জাগরণ-গান
আমরা গাহিলাম।"

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

কালিকা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

যাহারা সৃষ্টিরহস্যের কিছু কিছু খবর রাখে তাহাদের মতে নটু গোঁসাইয়ের কন্যা রাধারাণীকে গড়িতে বিধাতা পুরুষ একটা মস্ত বড় ভুল করিয়া বসিয়া আছেন—মেয়ে না হইয়া রাধারাণীর বেটাছেলে হওয়া উচিৎ ছিল। অমন আদর্শ বৈষ্ণব পরিবার, বাড়ির কুকুর বেড়ালটি পর্য্যন্ত যেন তৃণাদপি সুনীচ, মাঝখানে তালগাছের মত খাড়া, রুক্ষ ঐ ধিঙ্গি মেয়ে! একেবারে বেমানান। লোকে বলে—'নটু তপস্যা ক'রে মেয়ে পেল্লাদ পেয়েচে—না ডোবে জলে, না পোড়ে আগুনে।'

নূতন কলেবরের প্রহ্লাদটির রূপের পরিচয় এইখানেই একটু দিয়া রাখা ভাল। কালো, বেশ স্পষ্টভাবেই কালো; শ্যামবর্ণ কি ঐরকম কোন গোলমেলে বিশেষণ হাতড়াইবার দরকারই হয় না। হাড়কাঠ মোটা, তাই গড়নটা খুব গোলাল নয়। চওড়া পিঠের উপর একরাশ চুল; অন্যত্র প্রশংসা পাইত, এ মেয়ের কাঁধে পিঠে সমস্তদিন নাচিয়া কুঁদিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া একটা বিশৃঙ্খল বোঝা হইয়া থাকে। মাত্র চোখ দুইটির নিন্দা করা চলে না,—ডাগর, টানা টানা; তবে যাহারা খুব প্রশংসা করে তাহাদেরও স্বীকার করিতে হয়—'হ্যাঁ, একটু পুরুষালি ভাব আছে বৈকি চাউনিতে—তা' যে দস্যি মেয়ে!'

বাপমায়ের ভাবনার কুল কিনারা নাই, বয়স তো আর মুখ চাহিয়া কথা কহিবে না? মেয়ে ভাবনার কিনারা দিয়াও যায় না। ঘুঁড়ি উড়ায়; সাঁতার কাটে; জল ছাঁচিয়া, ডিঙি ভাসাইয়া হাল টানে; পূজা আসিলে যাত্রার আসর সাজায়, ভাঙা আসরে রাবণের অভিনয় করে। যখন বিয়ের লগনসা নামে, শানাইয়ের বাদ্যে গ্রাম মুখরিত হইয়া ওঠে, তাহার বাপ-মায়ের মনে আশার শিখাটি নীরাশার ধূমে ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া আসে, রাধারাণী সদলবলে বরযাত্রীদের নানাপ্রকারে বিপন্ন করিবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনে মনে প্রাণে মাতিয়া থাকে। সন্ধ্যার রঙে রঙ মিশাইয়া যখন বাড়ি ঢোকে, মায়ের কাছে সেই এক ধরণের বাঁধা অভ্যর্থনা—"এলেন গেচো মেয়ে!......ওলো তুই আবার ফিরলি কেন, গাছের সব ভূত পেত্নী বেহ্মদৈত্যি ভাগাড়ে গেচে? নিতে পারলে না তোকে?"

অত শান্ত নিরীহ মা, কাহারও কাছে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে জানে না; সন্ধ্যায় মেয়ের শ্রী ছাঁদ দেখিয়া কিন্তু তাহারও আর ধৈর্য্য থাকে না।

মেয়ের কিন্তু এতটুকু খেদ নাই, দুঃখ নাই। গ্রীবাভঙ্গি করিয়া উত্তর দেয়—"আহা কি মেয়েই পর্শ ক'রেচ! ভূত পেত্নীতে দূর থেকে দেখেই পালায়, তার আবার নিতে আসবে ..."

—হাসিয়া ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে মার হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া অমিত উৎসাহে লাগিয়া যায়—কুটনা কোটা বাসন মাজা থেকে ভাইয়ের দুধ খাওয়ান পর্য্যন্ত যে কাজেই হোকনা কেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিনের কীর্ত্তি-বিবরণী চলিতে থাকে—"বুঝলে মা, বাঁধের ধারে আজ থেকে যাওয়া ঘুচিয়ে দিলে ড্যাকরা নস্টেটা। কুটির সায়েব তাঁবু ফেলেচে, তুই ওসব করতে গেলি কেন বাপু? আমায় উল্টে বলে—'তুই তো শিকিয়ে দিয়েছিলি'...বোঝ'; হ্যাগা, আমার কি দায়টা পড়েচে শেকাতে যাবার? মেয়ে মানুষ আমি। মাঝখান থেকে অমন চমৎকার কুলগুলো পাঁচভূতের পেটে যাবে। আর এই সময় নদীতে যা গঙ্গার কাঁকড়া আসতে লেগেচে মা!...হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা, আঁচলে রক্ত লাগতে যাবে কেন? বারে, কনুই থেঁৎলে যাবে কেন সুস্থ শরীরে?...দেখি, তাই তো গো!—এ মা, মাখনার কাণ্ড; আমি অত করে পাড়লাম পেঁপেটা, আর পোড়ারমুখো কি না গাছের ওপর উঠে গিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিলে, অবলা মেয়েমানুষ পেয়ে!

তেমনি হ'য়েওচে, তিনমানুষ ওপর থেকে প'ড়ে গতর চুর হ'য়ে গেছে বাছাধনের। রাধীবামনীর মুখের গেরাস খাবে—খাও..."

২

গেছো মেয়ের পাকা দেখা হইল গাছের ওপরেই। কালিকাপুরের বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য চরণডিহির কালভৈরবীর তলায় মানৎ পাঁঠা বলি দিয়া ফিরিতেছিলেন, রাস্তার ধারে, পেয়ারা গাছের ডালে একটি ১২।১৩ বৎসরের মেয়ের ওপর নজর পড়িল। নজর না পড়িয়া উপায় ছিল না।—মেয়েটির গাছ-কোমর বাঁধা, খালি গা, এলো চুল; ডালের আরও উর্দ্ধে উপবিষ্ট একটি ছেলেকে ভুমিসাৎ করিবার শুভ উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া দোলা দিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসি!

বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য কাছাকাছি কয়েক বাড়ি ঘুরিয়া পরিচয় লইলেন, তাহার পর সরাসরি রাধারাণীদের গৃহে গিয়া তাহার পিতার নিকট মেয়েটিকে পুত্রবধূরূপে ভিক্ষা করিলেন। নটু গোঁসাইয়ের কথাটা বুঝিতে এবং বিষ্ণু ভট্টাচার্য্যের মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ মিটিতে যা একটু দেরি হইল, তাহার পর কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। অন্তরের উল্লাস সাধ্যমত সংযত করিয়া নটু গোঁসাই বলিলেন—"তাহ'লে পাকা দেখাটা কবে সুবিধে..." বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন—"পেয়ারা গাছের মগডালে মাকে আমার পাকা দেখেছি, আর দেখেই চিনেছি; দ্বিতীয় বার দেখার দরকার নেই।"

বৈশাখের মাঝামাঝির ঘটনা, জ্যৈষ্ঠমাসের গোড়ায় বিবাহ হইয়া গেল। শ্বশুরের আগ্রহাতিশয্যে রাধারাণী বিয়ের পর আর বেশীদিন বাপের বাড়ি থাকিতে পাইল না, আশ্বিন পড়িলে বিজয়ার শুভদিনে শ্বশুরঘর করিতে চলিয়া গেল। মা মেয়ের চখের জলের সঙ্গে নিজের চখের জল মিশাইয়া বলিল—"সেখানে গিয়ে আর ওসব যেন করতে যেয়োনা মা, রাধারমণ যখন মুখ তুলে চাইলেন..."

মেয়ে ফোঁপানির মধ্যে যতটা সম্ভব স্পষ্টই বলিল—"ফিরে আসতে দাও, তারপর তোমার রাধারমণকে যদি না..."

মা মুখের ওপর হাত দিয়া অমঙ্গলসূচক কথাটা আর শেষ করিতে দিল না।

শ্বশুর কালিকাপুরে আসিয়া বধূকে একবার বাড়ির বিস্তীর্ণ সিমানার মধ্যে ঘুরাইয়া আনিলেন, বলিলেন—"এই তোমার পেয়ারা গাছ মা; ঐ আম, জাম, জামরুলের বাগান; সাঁতার কাটার জন্যেও তোমায় বাইরে যেতে হবে না, দেখছই মস্ত বড় পুকুর সামনে প'ড়ে আছে। কাজের দিকে যাবে না তার ঢের বয়েস আছে, কাজের মধ্যে কাজ রইল এই মন্দিরটি। নিলে তো মা'র সেবার ভার?...বেশ... তোমার শাশুড়ী যাওয়ার পর থেকে মা'র সেবার ত্রুটি হ'চ্ছিল বলেই আমাকে তোমায় পাইয়ে দিলেন..."

একটু থামিয়া বধূর মাথায় হাত দিয়া হাসিয়া বলিলেন—"নিজের কাজ নিজে করবার ইচ্ছা হ'য়েচে এবার, না গা মা?"

বধূ কথাটা বুঝিল না অতশত, তবুও মাথা নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ।

ঘোর শাক্ত লোকটি। প্রকাণ্ড দেবোত্তর সম্পত্তির মাঝখানে বাড়ির লাগোয়া শ্যামা-মন্দির। নিকষ পাথরে গড়া মূর্ত্তি, পায়ের তলে শ্বেত পাথরের মহাকাল স্তিমিতনেত্রে শয়ান। মূর্ত্তি বেশী উঁচু নয়। চাহিতেই প্রথমে বরাভয়ে তোলা দক্ষিণ হাতটির ওপর নজর পড়ে—রক্তাভ করতল, তর্জ্জনী আর মধ্যমা আঙুল দুইটি ঈষৎ লীলায়িত, মুখখানি ডাহিনে একটু তোলা, আকাশনিবদ্ধ উন্মনা দৃষ্টি—একটি বারো তেরো বৎসরের কিশোরী নিজেরই ভাবের সম্মোহনে যেন হঠাৎ নিশ্চল হইয়া গিয়াছে।

কোথাও এতটুকু পাষাণত্ব নাই, শিল্পী নিজের বাসনাতপ্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া যেন সব কঠোরতা গলাইয়া লইয়াছে। দিগ্বসন অঙ্গখানির রোম-রোম মাতৃত্বের সুষমায় পূর্ণ।

এর সঙ্গে সেদিনের পেয়ারা গাছের মেয়েটির কোথায় একটি মিল ছিল—খুব সূক্ষ্ম, সুধু তেমন চোখেই ধরা পড়ে। তাই বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য তাহাকে সযত্নে আনিয়া বাড়িতে তুলিলেন। সবচেয়ে তাহার ভাল লাগিল নামটি—রাধারাণী! বিষ্ণু ভট্টাচার্য্যের মনে হইল এই রহস্যময়ী মেয়েটির এ যেন একটি ঘোর প্রবঞ্চনা, নামের অন্তরালে আত্মগোপনের প্রয়াস, একটি ছলনা; ঐ পাষাণময়ী মায়ের হাতের ছিন্নমুণ্ডে, কটিতটের করমালিকায় যে রকম ছলনার আভাস লুকান আছে।

বধূ পরুষ—নাম ধরিয়াছে কোমল। মা মমতাময়ী, হাতে লইয়াছে ছিন্ন মুণ্ড। যে ধরা দিতে চায় না, সেই মনকে প্রবলতর বেগে টানে।

৩

বিষ্ণু ভট্টাচার্য্যের রাধারাণীকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনার দরকার ছিল বটে, কিন্তু পুত্রের বিবাহ দেওয়ার মোটেই তাগাদা ছিল না, তাহাকে রাধারাণীর আসার উপলক্ষ্য রূপে দাঁড় করান হইল মাত্র।

কালিপদর বয়স বছর চৌদ্দ হইবে, মাথায় রাধারাণীর চেয়ে মুঠা খানেকও বেশী হয় কি না হয়। বাপের সম্পত্তি আছে, খায় দায় নিজের খেয়াল খুশী লইয়া থাকে। সকালে একটু সংস্কৃত পড়িয়া আসে, রাত্রে মৌলবি আসিয়া খানিকটা ফারসী পড়াইয়া যায়। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ইংরাজ সবে এদেশে পা দিয়াছে, শিক্ষার আসরটা সংস্কৃত ফারসীর মধ্যে ভাগাভাগি করা।

ফল কথা রাধারাণী যে একটা স্বামী-বিভীষিকা লইয়া বাড়ি হইতে বিদায় হইয়াছিল, শ্বশুরবাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রায় তিরোহিত হইয়া গেল। সে দেখিল—পুঁটে, গোবরা গোছেরই তাহার একটি সঙ্গী জুটিয়া গিয়াছে—বরং আরও একটু বেশী অন্তরঙ্গ। জীবনের এই নূতনত্বটুকু পুরাতন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে তাহার মোটেই দেরি হইল না।

সংসারটি খুব ছোটখাট, তাহার গতির পথে কাহারও সহিত ঠেলাঠেলি হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রথম—শ্বশুর, তিনি প্রতিমাটি আর মন্দিরটি লইয়াই থাকেন। বাড়িতে বিধবা পিস্-শাশুড়ী—ঘোর বৈষ্ণব পরিবারের কুলবধূ। অল্পভাষী আর বেজায় রাশভারি মানুষটি—আসিয়া অবধি জগদম্বার পাঁঠা খাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। প্রথম একদিন বলির পর এমন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করিয়া তুলেন যে মা নাকি সেই রাত্রেই বিষ্ণু ভট্টাচার্য্যের নিকট আবির্ভাব হইয়া কাতরভাবে বলেন—'বাবা বিষ্ণু, ঢের হ'য়েচে, এত হেনস্তার চেয়ে বরং আমায় কুমড়ো বলিই দিস্ তদ্দিন।"

কথাটা বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য বড় দুঃখের সহিত দু'একজনের কাছে হাজির করিয়াছেন, ভগ্নীরও কানে উঠিয়াছে, তবে কোন প্রতিকার হয় নাই।

তবে, এমনি তিনি কোন কথাতেই থাকেন না। ভিতর বাড়িতে জগন্নাথের বিগ্রহ, নানামতে তাঁহারই সেবায় দিন কাটে।

একটি ঝি আছে, একটি বামনের মেয়ে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া যায়। এই সংসার;—দুইটি ঠাকুর আর এই কয়টি মানুষ। প্রকাণ্ড বাড়ি—পূজাপার্ব্বণে, কাজেকর্ম্মে আত্মীয়-স্বজনদের জোয়ার আসে, ভাঁটার সময় অধিকাংশ ঘরই তালা-আঁটা থাকে।

রাধারাণীর কাজ বাঁধা। ভোরে উঠিয়া, স্নান সারিয়া, এলোচুলের একটি সরু গোছায় একটা গেরো দিয়া, কালিপদকে ডাকিয়া তোলে। দু'জনে ফুল তুলিতে বাহির হইয়া যায়। গাছে উঠিবার পালা থাকে কালিপদর;—বেলগাছ আছে, চাঁপা গাছ আছে, অশোক গাছ আছে। সুবিধা পাইলে কালিপদ ফুল তুলিয়া রাধারাণীর কোঁচড়ে ফেলিয়া দেয়। যখন হাতের কাছে পায় না, কিম্বা যখন আগ্‌ডালের দিকে অগ্রসর হইতে সাহসে কুলায় না, পা দিয়া দুলাইয়া দুলাইয়া রাধারাণীকে ধরাইয়া দেয়। রাধারাণী হাসিয়া বলে "ঘেন্না ধরালে তুমি পুরুষ নামে, ভয়েই সারা! কি বলব, আমার পা নিস্‌পিস্ ক'রচে, নেহাৎ নাকি ইয়ে হ'য়েচি তাই···"

"ইয়ে" হওয়ার জন্য যে বড় একটা আটকায় এমন নয়। গাছটা একটু ঝাঁকড়া হইলে, এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া কখন কখন উঠিয়াও পড়ে, এডালে ওডালে পা দিয়া, অসম্ভব রকম জায়গায় গিয়া কোঁচড় ভরিতে থাকে; কালিপদ ত্রস্তভাবে ডাকিতে থাকে—"চলে এসো,···রাধু, শুনচ? তোমার পায়ে পড়ি···এইবার তা'হ'লে আমি চেঁচাব··চেঁচাই?···ও বা···!"

শাসনের ভঙ্গিতে রাধারাণীর চোখের তারকা আয়ত হইয়া ওঠে, বলে—"ডাকো বাবাকে, শেষ ক'রেচ কি আমি হাত পা ছেড়ে নাপিয়ে প'ড়েচি—বাবা এসে দেখবেন তাল-গোল পাকিয়ে ম'রে প'ড়ে আচি···"

যা মেয়ে, ও তা স্বচ্ছন্দে পারে, কালিপদর আর সন্দেহ থাকে না। বেচারি জোর কাকুতি মিনতি লাগাইয়া দেয়, লোভ দেখায়; লম্বা কিছু একটা আঁটে, আঙুলের দ্বারা এই ধরণের একটা মুদ্রা সৃজন করিয়া বলে—"দেখ, এই এনে দোব,

ঘোষালদের পুকুর পাড় থেকে, পেকে হ'লদে হ'য়ে রয়েচে, তি্যি।"

জিনিষটা কামরাঙা। তবে রাজী হওয়া না হওয়া নির্ভর করে রাধারাণীর মেজাজের উপর। এক এক দিন যেন কোন মন্ত্রের আকর্ষণে নামিয়া আসে; কামরাঙার নামে মুখে গত লালা জমিয়া ওঠে যে কথা কহা শক্ত হইয়া পড়ে, সামলাইবার চেষ্টায় মুখে একটা চক্ চক্ শব্দ করিতে করিতে বলে—"ঠিক ব'লচ? ঠিক? মা কালীর খাঁড়ার দিব্যি—মিথ্যে হ'ললে তেরাত্তির কাটবে না···আচ্ছা তিনসত্যি গাল···"

একেবারে তেরাত্তির লইয়া গালাগাল! মুখটি ভার করিয়া কালিপদ বলে—"আমি না তোমার বর হই?"

এ ধরণের আলাপনে এক একদিন কথায় কথায় ঝগড়াও হয়; আবার কোন দিন রাধারাণী একটু অপ্রতিভ বা অনুতপ্ত হয়—যেমন মেজাজ থাকে; বলে—"হ্যাঁ, তাই আমি ব'ললাম নাকি? চললাম—'যদি মিথ্যে বল—যদি···"

চলিতে চলিতেই হয়ত হাতটা ধরিয়া ধীরে ধীরে বলে—"সে সব কিচ্ছু হবে না, আমি রোজ মা কালীর কাছে মাথা খুঁড়ি—হে ঠাকুর দেখ' যেন···"

ঝোঁকের মাথায় এটুকু বলিয়া আবার লজ্জা হয়, হাতটা ঠেলিয়া দিয়া বলে—"হ্যাঃ, মাথা খুঁড়ি না আরও কিছু; মিছিমিছি ব'লছিলাম; ব'য়ে গেছে আমার পরের জন্যে মাথা খুঁড়তে।"

পূজার জোগাড় করিবার সময় আর এক রূপ,—রাধারাণী তখন মহা তাত্ত্বিক একজন,—চন্দন ঘষিতে ঘষিতে, কিম্বা শুরে শুরে বিল্বপত্র গুছাইতে গুছাইতে প্রশ্ন করে—"তাহ'লে গিয়ে কালী কার মেয়ে হ'লেন বাবা?"

শ্বশুর হাসিয়া উত্তর দেন—"উনি আবার কার মেয়ে হ'তে যাবেন, মা? বিশ্বপ্রসবিনী, উনিই তো সবার মা।"

"তবুও তো কেউ না কেউ বাপ মা ছিলই। শিবঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে দিলে কে?—কালী তো আর ফিরিঙ্গী নন্ বাবা, তাদের শুনেচি নাকি···"

"পাগলী মেয়ে", শ্বশুর বাধা দিয়া বলেন—"ওঁদের কি আর বিয়ে দেওয়ার জন্যে বাবা মায়ের দরকার হয় মা?—প্রকৃতি আর পুরুষ—অনাদি কাল থেকেই ওঁদের লীলা..."

"আমিও তাই বলি। বাপ মা থাকলে একটু ব্যবস্থা হোতই। দেখনা, গায়ে একখানি গয়নার পর্য্যন্ত বালাই নেই—আহা!... আর রাধারমণের দেখনা বাবা,—বাপ হ'লেন বসুদেব, না হয় ধর নন্দই চ'ল, তিনিও তো হাঘরে ছিলেন না? কেমন গয়না-গাঁটি, মোহনচূড়া, রেশমের কাপড়চোপড়ে জম জম ক'রচেন ঠাকুর!... আর এদিকে দেখনা...কপালগুণে বরটিও তেমনি জুটেচেন...আহা!..."

হয় তো প্রতিমার দিকে চোখ তুলিয়া চায়। শূন্যদৃষ্টি উদাসিনী প্রতিমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেমন যেন একটা মায়ায় মনটি সিক্ত হইয়া আসে। ক্রমে অন্যমনস্কতায় হাতটি শিথিল হইয়া পড়ে, আহা, বড় যেন রূঢ় কথা বলা হইয়াছে, ওঁর বাপ মা থাক না থাক, উনি তো সবার মা—ঠিক হয় নাই বলাটা···হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় বিয়ের কয়েকদিন আগে কি একটা কড়া কথায় তাহার নিজের মায়ের চোখ দুটি এই রকমই করুণ হইয়া উঠিয়াছিল ···হারুদের মার মুখখানি চখের সামনে ভাসিয়া ওঠে—স্বামী বিছানায় পড়িয়া, একা মেয়েমানুষ বাড়ি বাড়ি পাট সারিয়া দুপুরে ফিরিতেই ছেলে মেয়েতে সাতটি যখন ঘিরিয়া ফেলিত···আবার ছোট মেয়েটির নিত্য রাঙ্গা কাপড়ের ফরমাস···নিজের এদিকে চিরকুট পরা, সাত জায়গায় তালি··· কোলে তুলিয়া লইয়া চুমা খাইতে খাইতে যখন বলিত—'হ্যাঁ দোব বই কি, দোব না?' এই রকম ঠিক মুখের ভাবটি হইত। তাহার মাতৃবিরহিত মনের সামনে এইরকম কত মার ছবি ফুটিয়া ওঠে—যত জায়গায় যত মা দেখিয়াছে সবার—ঐরকম সব চোখ, বেদনাতুর দৃষ্টি সব ছাড়াইয়া যেন কোথায় গিয়া পড়িয়াছে; কেমন যেন একটা অতৃপ্তভাব—মা মা মাখান···

ঠাকুরে মানুষে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়—হঠাৎ মায়ের জন্য বড় মন কেমন করিয়া ওঠে, আর তেমনি আকস্মিক ভাবেই প্রতিমাটির উপর মন করুণায় ভরিয়া ওঠে—কোথায় তোমার ব্যথা মা? তুমি এমন সর্ব্বহারা কেন হ'তে গেলে?···

শ্বশুর আড় চোখে দেখেন—বধূ হাঁটুর উপর চোখ ঘস্যিয়া অশ্রু মুছিতেছে। টোকেন না।

স্বামীর কাছে রাধারাণী অন্তরের বেদনাটা না জানাইয়া থাকিতে পারে না। বলে "আহা, আমার এত কষ্ট হচ্ছিল দেখে আজ, কে জানে কেন! ঠাকুরেরা হোন্ ঠাকুর,—কিন্তু এ ত মানুষের মতন!···

কালিপদ এক কথায় সব উল্টাইয়া দেয়—"দেখতো বোকামি মেয়ের; কালীঠাকুর কিনা ভালমানুষ! অমন ভয়ঙ্কর ঠাকুর নাকি আছে!—পারো তুমি স্বামীর বুকে পা দিতে?··· ডাকাত যে ডাকাত তাকেও কালীঠাকুর পুজো ক'রতে হয়"—

রাধারাণী একটু অন্যমনস্ক হইয়া যায়। বলে "তা জানি মশাই, আমায় আর বলতে হবে না।"

ছেলেবেলার একটি দৃশ্য মনে পড়িয়া যায়। সে সাজিত কালী গোবরা সাজিত ডাকাত, নন্তেদের পাকা ফলে রাঙা মোহনভোগ আমগাছটা হইত রাজবাড়ি···

কতকটা এই সব স্মৃতিতে, কতকটা স্বামীর কালীগুণ-কীর্ত্তনে মনের সেই দুর্ব্বল, করুণ ভাবটা কাটিয়া যায়। আবার পূর্ণ উৎসাহে গাছে ওঠা, জলে ঝাপাই ঝোড়া, বাগান কাঁপাইয়া হাসি, ছুটাছুটি, দাপাদাপি চলে; স্বামীর বুকে পা ওঠেনা বটে, তবে ফরমাসে, বকুনিতে, টানাহিচড়ানিতে সে বেচারিকে যে নির্য্যাতনটা সহ্য করিতে হয়, তাহার তুলনায় শিবঠাকুরকে ভাগ্যবান বলিতে হয়। কালীপদ বড় দুঃখে এক একদিন বলিয়া ফেলে—"তুমি ভাই কালীঠাকুরের বাবা; স্বামী বলে আমায় একটুও মান্য করনা ···

৪

মাঝের-পাড়ায় নবনারীতলায় যাত্রা ছিল; সুভদ্রা-হরণের পালা বিকাল বেলা শেষ হইল। পিসিমা যে রকম গুছাইয়া সুছাইয়া নবনারীর মন্দিরে মালায় বসিলেন, শীঘ্র উঠিবার সম্ভাবনা নাই। কালিপদ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য থাকিয়া গেল। অর্জ্জুন সুভদ্রার কেমন এক জোটে কাজ! রাধারাণীর মনে অব্যক্ত কি একটা হইতেছিল, বলিল, "তুমি তার চেয়ে চলনা কেন?--ঝি থাক।"

কালিপদর মনে অর্জ্জুনের বীরত্বের আঁচ তখনও লাগিয়া আছে, বলিল—"তা' কি হয়? একজন বেটাছেলে থাকা ভাল।"

রাধারাণী নীচের ঠোঁটটা একবার উল্টাইল, বিদ্রুপে; তাহার পর ঝিয়ের হাত ধরিয়া বাড়ীমুখো হইল।

পথে কথায় কথায় বলিল—"সুভদ্রাঠাকরুণ কেমন কড়া হাতে রাশ বাগিয়ে রইল ঝি!"

ঝি বলিল—"সব মেয়েমানুষেই পারে।" তাহার পর রাধারাণীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বলিতেছিল—"আহা, দি ঠাকরুণ যেন কিছু জানেন না,—কেন, মেয়েমান্‌সের ঘোঁড়া হ'ল সোয়ামী, রাশ মানে হ'ল···

এমন সময় তাহাদের ঠিক সামনে একটা মাটির ঢেলা পড়িয়া চুর হইয়া গেল এবং তাহার সঙ্গে বাঁধা একটা কাগজের টুকরা ছিটকাইয়া রাস্তার ধারে পড়িল। ঝি, "ও মাগো!" বলিয়া গুটাইয়া সুটাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাধারাণী একবার চারিদিকে দেখিয়া লইল—কেহই কোথাও নাই। একটু আগাইয়া গিয়া কাগজটা তুলিয়া লইল। নিজে পড়িতে জানে না; ঝি পড়িয়া দিল—তাহার পরিবারে সব যাত্রার গান বাঁধে; লেখা আছে—"মার মহাপূজা। রক্ততর্পণ। শনিবার, তিথি শ্রাবণ অমাবস্যা। ভৈরব।"

দু'জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। সুভদ্রাহরণ দেখিয়া যে অনুপ্রেরণা জাগিয়াছিল তাহা আর বেশীক্ষণ রহিল না, বিশেষ করিয়া ঝির; জোরে হাঁটিতে হাঁটিতে সে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য মন্দিরে ছিলেন, চিঠিটা তাঁহার হাতে পঁহুছিল।

কথাটা রাষ্ট্র হইতে দেরি হইল না। তিন জায়গায় এই রকম চিঠি পড়িয়াছে, পাড়ার ঠিক তিনটি কোণে,—ওদিকে অধর চৌধুরীর বাড়ি, গ্রামের অপর প্রান্তে সনাতন চক্রবর্ত্তীর বাড়ি, আর মাঝখানে এই বিষ্ণু ভট্টাচার্য্যের বাড়ি। ভৈরবের প্রথাই এই; লোকে এই জন্য বলে—ভৈরব সর্দ্দারের মহাজাল পড়িয়াছে।

কিন্তু এতো সকলেরই জানা কথা যে মার আদেশ না পাইলে ভৈরব বাহির হয় না, তবে এ গ্রামে মার পূজার কি ত্রুটি হইয়াছে?

বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য সমস্ত রাত মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িয়া ছিলেন, সকালে রুদ্ধদ্বারের উপর দ্রুত করাঘাত পড়িল। দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তিনি চৌকাঠের উপর

দাঁড়াইলেন। সামনে দালান ভরিয়া একদল লোক। মুখপত্র হিসাবে বৃদ্ধ নিবারণ ঘোষাল আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—"বিষ্ণু, ধন্না দিয়ে কা'র কাছে সাড়া পাবে, মাকে কি রেখেচ? ...এ অনাচার গ্রামে সইবে না; হয় আজই ন'টি বলিদানের ব্যবস্থা কর, না হয় মাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এস—একের পাপে সারা গ্রাম যে যায়।"

বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"আমার কি অসাধ কাকা? তবে..." চারিদিকে রব উঠিল—"তবে টবে নয়; পাঁঠার সব ঠিকঠাক, আমরা নিয়ে আসচি, আজ রক্তের স্রোতে গ্রামের পাপ ভাসিয়ে তবে কথা—"

দলটা আস্তে আস্তে কিছুক্ষণের জন্য একটু পাতলা হইল, তাহার পর ক্রমেই আবার জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল—লোকের হাঁক ডাকে, মা—মা শব্দের সঙ্গে একপাল ছাগশিশুর ত্রস্ত চিৎকার মিলিয়া জায়গাটাকে সরগরম করিয়া তুলিল।...ক্রমে পূজা সুরু হইল, হাঁড়িকাঠ পোতা হইল, কয়েকটি ছাগশিশুকে স্নান করাইয়া মন্দিরে উঠানও হইল। মন্দির হইতে গলা বাড়াইয়া একজন প্রশ্ন করিল—"বাজনদারেরা তোয়ের আছে?...নিক্, ঢাকে ঘা দিক্ এবার!"

কাঁসার, ঘণ্টা ঢাকে ঘা পড়িল।

এমন সময় সিংহাসনসুদ্ধ জগন্নাথকে বুকের কাছে লইয়া, নামাবলি গায়ে একজন গৌরকান্তি বিধবা খুব সহজভাবে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন, এবং একটু জল ছিটা দিয়া, সিংহাসনটি রাখিয়া গম্ভীর ভাবে তাহার সম্মুখে জপে বসিয়া গেলেন।

বাজনার আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গেল! তাহার অল্পক্ষণের মধ্যেই মানুষের ভিড়ও গেল, পাঁঠার কাতরানিও গেল; মন্দিরের মধ্যে শুধু বিষ্ণু ভট্টাচার্য্যের পূজার মন্ত্রগুলা শুনা যাইতে লাগিল—খুব সংযত স্বর।

সন্ধ্যার সময় রাধারাণী যখন আরতির যোগাড় করিতে আসিল, দেখিল মন্দির ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ, দরজায় ঘা দিল, ডাকাডাকি করিল; যখন কিছুতেই দুয়ার খুলিল না, নিতান্ত মনমরা হইয়া চুপি চুপি বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। ঝি রাঁধুনী আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া ঝাঁঝ দেখিয়া মানে মানে সরিয়া পড়িল। কালিপদ অনেক সাধাসাধি করিল সে নিজেও খাইবে না বলিয়া ভয় দেখাইল, কোন ফল না হওয়ায় ধীরে ধীরে উঠিয়া আহার করিয়া আসিয়া পাশটিতে শুইয়া পড়িল।

ঘুম আসিতে কালিপদর বোধ হয় রাত হইয়া গিয়া থাকিবে, সকাল বেলা দিব্য ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া নিদ্রা দিতেছে,—"ওঠ, ওঠ, শীগ্গীর ওঠ গো!" বলিয়া তীব্র ঝাঁকানি দিয়া রাধারাণী তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কাৎ হইয়া কালিপদ জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কেন?"

রাধারাণী ভীতকণ্ঠে বলিল, "ডাকাত পড়েচে যে!" তাহার পর কালিপদ ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কালিপদ রাগিয়া বলিল—"বাব্বা, কি মেয়ে যে!—এখনও বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করচে।"

রাধারাণী হাসিতে দুলিয়া দুলিয়া বলিল—"যেমন ভীতু..."

কালিপদ রাগত ভাবেই বলিল—"ভারী বীর পুরুষ আমার; ডাকাতদের ঠেকিও তারা হাজির হ'লে।"

রাধারাণী তাচ্ছিল্যের সহিত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"পারি না নাকি?—আহা বড্ড শক্ত!...ওরা মেয়েদের কিছু বলে না মশাই, তাতে কালো মেয়ে, তাতে আবার স্বপ্ন দেখেচি মা কালী এসে নিজের গায়ের রং আমায় খানিকটা মাখিয়ে দিয়ে গেলেন।...বিশ্বাস হচ্চে না বুঝি?" হাতটা কালিপদর মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"এই দেখ, যাইনি হ'য়ে আরও এক পোঁছ কালো?"

তাহার পর স্বামীর গায়ে একটু ঢলিয়া কৃত্রিম করুণার স্বরে বলিল—"আহা—হা—হা, একজনের কনে আরও কালো হ'য়ে গেল গো; আহা—হা—হা, মরে যাই, মরে যাই..."

কালিপদ বলিল—"হ'ল তো বোয়েই গেল।...মা কালী রঙের পোঁছ দিয়ে কি বললেন? ব'ললেন বুঝি—,ডাকিনী যোগিনী হ'য়ে আমার সঙ্গে..."

রাধারাণীর মুখ হঠাৎ কৌতুকচ্ছটায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; বলিল "ঠিক কথা গো, স্বপ্নে আর একটা বড় মজা হয়েচে, বড্ড মজা; কিন্তু যা ভীতু তুমি, বলাই বৃথা, শুনলেই ভির্মি

যাবে।...আমার যেন মনে হল মা কালী এসে বাবাকে মেঝে থেকে তুলে বললেন—"ওঠ, আমি বাড়ি জুড়ে রয়েচি, ভয় কি? তারপর হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে... ...চল, ফুল তুলতে তুলতে সব বলচি, চলনা...কালী ঠাকুর আবার এত নকলও জানেন; কি, আমি নিজেই ঘুমুতে পারিনি শুয়ে শুয়ে এই সব তন্দ্রায় দেখেচি, কে জানে,—বাবার জন্যে মনটা যা ছটফট করছিল......চল, ওঠ, সব বলচি...।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া পুকুর ধারের ধনুকপানা নারিকেল গাছটার গোড়ায় বসিয়া গল্প চলিল, শুধু গল্পই নয়, কত সব জল্পনা কল্পনা, মান অভিমান, জেদাজেদি, এমন কি ছাড়াছাড়ি পর্য্যন্ত। শেষ নাগাদ কিন্তু আবার সব ঠিক হইয়া গেল; সাজিভরা ফুল বিল্বপত্র লইয়া গলাগলি হইয়া দু'জনে বাড়ি-মুখো হইল। মন্দিরের সিঁড়ির কাছে আসিয়া কালিপদ বলিল—আমি তাহ'লে এক্ষুণি আসচি; ভয় ক'রলে..."

তাচ্ছিল্যের সহিত—"ইস্"—করিয়া রাধারাণী মন্দিরে উঠিয়া গেল।

৫

অমাবস্যা তিথি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য মন্দির হইতে বাহির হইলেন। কি ভাবিলেন তিনিই জানেন—ধীরে ধীরে বাড়িতে গিয়া সমস্ত ঘর সমস্ত দেরাজ সিন্দুকের তালা চাবি খুলিয়া আবার শান্ত ভাবে নামিয়া আসিয়া চাবির তাড়াটা প্রতিমার পদমূলে রাখিয়া দিলেন।

"বাবা—?" বলিয়া রাধারাণী বিমূঢ় ভাবে প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, হাত তুলিয়া বারণ করিলেন। তাহার পর কি ভাবিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিজেই বলিলেন, "আজ যে মা আসচেন, মা।" আবার পূজায় বসিলেন।

রাত্রি যখন প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, হঠাৎ চক্রবর্ত্তীদের পাড়ায় প্রচণ্ড এক শব্দ উঠিল—রে-রে-রে-রে-রে!...

কালিপদ আর রাধারাণী পূজার কাছে বসিয়া ছিল; কালিপদ একটু কাঁপা গলায় ডাকিল—"বাবা।"

উত্তর পাওয়া গেল না। বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য অনেকক্ষণ হইতেই প্রণাম করিতেছিলেন, বুঝা গেল সংজ্ঞা নাই। কালিপদ রাধারাণীর মুখের পানে চাহিল।

রাধারাণী বলিল—"তোমার ভয় করচে নাকি?—বাবার মুখেও শুনলে তো? ভয় করলে আমাদের বাড়িতে মা-কালী আর আসবেন কোথা থেকে?"—বলিয়া বেশ সহজ ভাবেই হাসিয়া উঠিল। ক্রমে কোলাহল আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। ও পাড়ার গাছপালার মধ্যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার মসালের আলোয় খণ্ডিত হইয়া বিকশিতদংষ্ট্রা দৈত্যের মত বিকট হইয়া উঠিল।

প্রায় ঘণ্টা দু'এক পরে দলটা এ মুখো হইল। ভৈরব সর্দ্দার আগে আগে, পিছনে ধ্বংসোন্মত্ত প্রায় শতাবধি লোকের একটা দল। বাগানে প্রবেশ করিয়া সবাই সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। ভৈরব বলিল—"আস্তে রে, এটা মায়ের বাড়ি।"

একজন রুক্ষস্বরে উত্তর করিল—"উপোসী মায়ের পূজো দিতে এসেচি, জানিয়ে আসব না?"—এই কথার উপর আর একটা উগ্রতর নিনাদ উঠিল।

দলটা আসিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। মন্দির অভ্যন্তরের দীপের স্তিমিত আলোকে দেখা গেল রক্তচেলিপরা একটি গৌরকান্তি পুরুষ প্রতিমার সামনে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছে। অত শব্দের মধ্যেও নিশ্চল। সবাই ঠেলিয়া মন্দিরে উঠিতেছিল, ভৈরব পিছনের চাপে দুই পা অগ্রসর হইল, তাহার পর জমিতে শক্তভাবে পা পুতিয়া, দক্ষিণ হাতটা উঠাইয়া বলিল—"না, উঠতে দে; অসাড়ের রক্ত মা খায় না, জাগুক, ততক্ষণ ও দিকটা সেরে আসবি চল সব—কিছুর যেন চিহ্ন না থাকে..."

দলের নির্দ্দিষ্ট একটা অংশ বাড়িটা ঘেরিয়া ফেলিল। গগন বিদীর্ণ করিয়া রে-রে শব্দ, গ্রামের চতুঃসীমা হইতে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। সে যুগে ডাকাতরা প্রথমে সমস্ত গ্রামটা ঘেরিয়া ফেলিত।

মন্দিরের পিছনে, কাঠাকয়েক জমির পরেই বাড়িটা। মসালের ধূমমলিন আলোয় দূর থেকেই দেখা গেল, কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই; পুরীর মুক্তদ্বার গৃহগুলার বাহিরে আলো পড়িয়া ভিতরকার অন্ধকারকে স্পষ্ট আর বীভৎস করিয়া তুলিল।

এ-ধরণের বিরোধহীন অবরোধে ভৈরব সর্দ্দার অভ্যস্ত

ছিলনা। ডাকাতি করিতে আসিয়া যদি উভয় পক্ষেই দু'চারটে মাথা না পড়ে তো তরোয়ালে আর সিঁধ কাটিতে ব্যবধান থাকে কোথায়? পা তুলিয়া তাহার পা দুইটা যেন ভারালস বলিয়া বোধ হইল। নিশ্চল হইয়া একটু দাঁড়াইল, তাহার পর হঠাৎ জোর করিয়া আগাইয়া জোর করিয়াই রাগিয়া বলিল, "আয় এগিয়ে, তোরা সব থমকে দাঁড়াস্ যে!"

অনায়াস লুণ্ঠন। বাড়ীটা যেন মুক্তাঞ্জলিতে সমস্ত ধনসম্ভার লইয়া অপেক্ষাই করিতেছিল, সুধু লওয়ার দেরি। ভৈরব সর্দ্দারের একটা অহেতুক অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। সে কি ভাবিল বলা যায় না, সুধু একটি মাত্র মশাল আর মাত্র জন পাঁচেক লোক সঙ্গে রাখিয়া বাকী সমস্তই বাহির করিয়া দিল। বোধ হয় ভাবিল অন্ধকার বাড়িতে খুঁজিয়া পড়িয়া আঘাত পাইয়া লুণ্ঠন করিলে তবুও বিরোধের একটু আস্বাদ পাওয়া যাইবে, তবুও ডাকাতির মর্য্যাদাটা কতকটা বজায় থাকিবে। মানুষের নিকট নিরাশ হইয়া সে যেন বাড়ীটাকে অন্ধকারে সজীব করিয়া লইয়া তাহাকেই যুদ্ধে আহ্বান করিল।

সবচেয়ে ক্ষীণশিখ মশালটা লইল, নিজের হাতেই লইল; তাহার পর সেই অল্পসংখ্যক সঙ্গী লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ-ঘর ও-ঘরের ভিতর দিয়া, ডালাখোলা বাক্স উজাড় করিয়া, বারান্দা দিয়া চলিয়া আসিতে একটা একটু প্রশস্ত জায়গা; তাহার পর সরু এক ফালি গলি, ধূমে আর ছটা লোকের বিকট ছায়ায় যেন ভরাট হইয়া গেল। কোনখানে একটু শব্দ নাই, আর্ত্তনাদ নাই; নিস্তব্ধতার মধ্যেও যে স্তম্ভিত প্রাণের একটা পরিচয় সে পাইয়া আসিয়াছে এই প্রাণহীন পুরীতে সেটার অভাব তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় সর্দ্দারের কেবলই মনে হইতে লাগিল আজ মায়ের—শ্মশান কালীর পায়ে জবাফুল দাঁড়ায় নাই, মা পূজা লন নাই।...মনকে শান্ত করিবার জন্য মনে মনে বলিল—মা তোমার পূজা আজ এই খানেই; তপ্ত-রক্তে পূজা চাই, তাই জবায় তুষ্ট হও নাই। তুমি আজ শ্মশান ছেড়ে এস, ভক্ত তোমার জন্যে আজ এইখানেই শ্মশান সৃষ্টি করে দেবে।

ভৈরব কোমরে জড়ান রক্তাম্বরের মধ্য হইতে একটা বোতল বাহির করিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া গলায় খানিকটা ঢালিয়া দিল,—কারণ বারি। পরে চিত্তের দুর্ব্বলতা জয় করিবার জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক মশাল তুলিয়া একবার "জয় মা!!" করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—পাঁচ জনে যোগ দিল, উন্নত মশালের আলোয় ছায়াগুলো যেন হঠাৎ উচ্চকিত হইয়া উঠিল।

প্রশস্ত একটা প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িল। ওদিক দিয়া উপরের সিঁড়ি। সিঁড়ি দেখিতে তাহার মনটা আবার নাচিয়া উঠিল,—না, সিঁড়ি বাহিয়া উঠিবে না, লাঠিতে ভর দিয়া এক লাফে আলিসার উপর, এক হাতে থাকিবে মশাল —তবুও একটা যাহ'ক কিছু হয় তাহাতে।

ভৈরবের কারণ-মথিত রক্ত শিরায় শিরায় চন্ চন্ করিয়া উঠিল; পাশের লোকের হাত হইতে মশালটা ছিনাইয়া লইয়া, একটা হুঙ্কারের সঙ্গে মাথার উপরে ঘুরাইয়া লাঠিটা পাতিতে যাইবে, হঠাৎ সিঁড়ির অন্ধকারে গলির দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া, নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর লাঠি ফেলিয়া মশাল লইয়া ধীরে ধীরে গলির দিকে অগ্রসর হইল। দু'একজন সঙ্গে আসিতেছিল, ভৈরব ফিরিয়া দাঁড়াইল। চক্ষু দুইটা আগুনের ভাঁটার মত জ্বলিতেছে, চাপা গলায় প্রশ্ন করিল—"দেখেছিস্?"

দু'একজন সুধু স্থির দৃষ্টিতে তাহার চোখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহারা দেখিয়াছে; দু'একজন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। ভৈরব তাহাদের সবাইকেই ইঙ্গিতে অপেক্ষা করিতে বলিল; ভয়ে, বিস্ময়ে, আশায় তাহার চক্ষু দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। অগ্রসর হইল।

ঠিক যেখান হইতে সিঁড়িটা উঠিয়া গিয়াছে, তাহারই পাশে, ঈষত্তরলিত অন্ধকারে ছায়াকল্প এক মূর্ত্তির আভাস, মশালের চঞ্চল আলোক পড়িতেই পিছনে যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কারণ মাথার শিরা উপশিরায় আগুন ধরাইতে ছিল, তবু ভৈরব তখনই নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিল—মা আসিয়াছে বটে, শ্মশানবাসিনী ভক্তের আহ্বান শুনিয়াছে; কিন্তু সে যে আঁধারময়ী, স্পষ্ট আলোকের বস্তু তো নয়; আলোকসম্পাতে লুপ্ত অন্ধকারের সঙ্গে এখনই, এই পর

মুহূর্ত্তেই এ কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে, আর জন্মজন্মান্তরের সাধনায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এক মুহূর্ত্তেই ভুলটা হইয়া যাইত ; কিন্তু ভৈরব সমস্ত চেতনা একত্র করিয়া হাতের মশালটা ক্ষিপ্রগতিতে দূরে ফেলিয়া দিল। বাঁকা গলির ভিতর দিয়া সেই নির্ব্বাণপ্রায় মশালের সামান্য একটু আলো কুণ্ঠিত ভাবে প্রবেশ করিল মাত্র। ভৈরব একবার গাঢ়স্বরে ডাকিল---"মা !!" তাহার পর সেই ঘনায়মান অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে নিজের উৎসুক দৃষ্টিরেখাকে সম্মুখে চালিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ক্রমে তাহার মনে হইল—সেই অতি ক্ষীণভাবে প্রদীপ্ত অন্ধকার স্থানে স্থানে জমাট বাঁধিয়া উঠিল—প্রথমে ভূমিতলে এক শয়ান মূর্ত্তি, মাথার দিকটা একটু স্পষ্ট, বাকীটা অল্পে অল্পে গাঢ়তর অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে, মাথায় জটাজুট—বিসর্পিত বিক্ষিপ্ত ; পাশেই তাহার উপর চরণ তুলিয়া এক দীর্ঘ, অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি !—সারা দেহ ঘিরিয়া আলুলায়িত, চুর্ণ কেশভার ; বাম করে খড়্গ, দক্ষিণ কর বরাভয়ে তোলা---ত্রস্ত বিশ্বের উপর মায়ের স্বস্তি যেন ঝরিয়া পড়িতেছে।···ভৈরব চক্ষু মুদিল, আর চাহিয়া থাকিতে সাহস হয় না,---সে মূর্ত্তি ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, ভয় হয় বুভুক্ষু দৃষ্টির সামনে তাহা অচিরেই বুঝিবা বিলীন হইয়া যাইবে ; অমানিশার অন্ধকার মূর্ত্তিতে জমাট হইয়া উঠিয়া আবার ঐ তমোসমুদ্রে মিশিয়া একাকার হইয়া যাইবে।

তখনও রাত্রি আছে ; অতি সামান্য একটু আলোর আভাস পূর্ব্বাকাশে দেখা দিয়াছে। শঙ্কাতুর্ব্বল গ্রামটা নিস্তব্ধ। রাধারাণী উপরে পিসশাশুড়ীর ঘরে গিয়া ডাকিল---"পিসীমা !' সাড়া পাওয়া গেলনা। রাধারাণী আর অপেক্ষা না করিয়া গায়ে হাত দিয়া বেশ জোরে নাড়া দিয়া ডাকিল---''পিসিমা, ও পিসিমা, শীগ্‌গির ওঠ।"

বিগ্রহের বেদীতল হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া পিসীমা বিহ্বল ভাবে চাহিলেন। রাধারাণী বলিল---"আর দেরি ক'রনা, শীগ্‌গির চল---ওর কি হ'য়েচে ; কথা কইচে না"

পিসীমা আচ্ছন্নভাবে প্রশ্ন করিলেন---"কার ?... কোথায় ?"

রাধারাণী কোন উত্তর দিল না এবং আর ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে জোর করিয়াই তুলিল এবং বাম হস্তে প্রদীপটা লইয়া তাঁহাকে একরকম টানিয়াই লইয়া চলিল।

সিঁড়ি দিয়া ক্ষিপ্রগতিতে নামিল, তাহার পর সিঁড়ির পাশে মাটির দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঐ দেখ ; কি হ'য়েচে, নড়েও না, কথাও কইচে না, আমি কিছু বুঝতে পারচি না বাপু !"

পিসীমার ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল, একেবারে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন---"এযে কালিপদ আমাদের ! মাথায় যাত্রার শিবের জটা কেন ? টিনের সাপ, ছাপা বাঘছাল, কি এসব ব্যাপার বৌমা ?···জল দাও, জল দাও শীগগীর, অজ্ঞান হয়ে গেছে যে গো !··· আর এসব গয়না পত্তর, টাকা কড়ির রাশ !! ব্যাপার খানা কি ?---কালিপদ এখানে এল কি করে ?......"

জল নিকটেই ছিল, রাধারাণী তাঁহার হাতে ঢালিয়া দিতে দিতে বলিল---"শোন কথা পিসীমার ! কি করে এলো তা'কি আমি জানি ? দেখলাম 'গোঁ গোঁ' করচে, কথা কয়না কিচ্ছুনা, ভালমানসি করে ডেকে আনতে গেলাম...ভয়ে কি আমারই জ্ঞানগম্যি আছে ? ...'কি ক'রে এলো !'···আমি যদি সঙ্গে থাকতাম তবে তো বুঝতাম গা—কি করে এলো ?···'

একটু থামিয়া, কি ভাবিয়া গলায় অভিমানের সুর আনিয়া বলিল "তোমার যেমন সন্দেহ দেখচি পিসিমা, জ্ঞান হয়ে ও যদি বলে আমিও এর মধ্যে ছিলাম, তুমি নিশ্চয় চট্ করে বিশ্বাস ক'রে নেবে।"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সদানন্দ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(অতুলপ্রসাদ—সুরেন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র—দ্বিজেন্দ্রলাল—জগদিন্দ্রনাথ)

You hear that boy laughing ?
You think he is all fun ?
But the angels laugh, too,
At the good he has done.

...O. W. Holmes

শুনছ কি ঐ শিশুর হাসি ? ভাবছ : প্রগল্‌ভতা ?
তার সে-শুভব্রতে হাসেন আনন্দে দেবতা !

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

মজলিশরসিকেষু

অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে আপনি গত ৩০শে আগষ্টের ফরোয়ার্ডে যা লিখেছেন পড়লাম। তাতে রয়েছে আপনি বলেছেন : "The very first impression about Atulprasad that scarcely failed to capture one's notice was the candid spirit of a child that made him laugh the heartiest and make others laugh as much."

প'ড়ে আমার মনে জাগল হরষে-বিষাদ। কথাটা সত্যি ব'লেই। কেন না আমার বারবারই মনে হয়েছে যে, হাসবার ও হাসাবার ক্ষমতা অস্ত যাচ্ছে এ-যুগে ক্রমেই ; এবং এর একটা কারণ তীক্ষ্ণধী আলডুস হাক্সলি মহোদয় বড় সুন্দর নির্দ্দেশ ক'রেছেন এই ব'লে যে, এ-যুগের আমোদ-প্রমোদীরা ক্রমশই আমোদ-প্রমোদ যে কী বস্তু তা-ই যাচ্ছেন ভুলে ; মনে ক'রে বসছেন ক্রমেই—যান্ত্রিকতার কল্যাণে—যে, পরের যোগানো উদ্ভাবনা-হীন আমোদেই আনন্দের কৈবল্য-লাভ ধ্রুব। তাঁর বিখ্যাত "Do What You Will" বইখানির "Silence is Golden" প্রবন্ধটি প্রত্যেক আনন্দান্বেষীর উচিত মন দিয়ে পড়া। তাতে তিনি দেখিয়েছেন টকি প্রভৃতির আমোদের হট্টগোল-ট্রাজিডি। লিখছেন : "I flee from those 'good times', in the having of which they (my contemporaries) are prepared to spend so lavishly of their energy and cash," যার নাম তিনি দিয়েছেন তাঁর বিদ্যুদ্ব্যঙ্গ ভাষায় : "the latest and most frightful creation-saving device for the production of standardised amusement." এ জ্বালাময় ইংরিজির বাংলা অনুবাদ অসম্ভব।

সত্যি, বলুন তো কোনো চিন্তাশীল মানুষের এ-দুঃখ না হ'য়ে পারে ? আনন্দ করতে যেয়ে আনন্দ কারে বলে তা-ই যে যাচ্ছে লোকে ভুলে। ঝুঁকছে সবাই দলে দলে এই সৃষ্টিবিমুখ সস্তা পরাসক্ত (parasitic) আমোদের দিকে। তাদের খুব দোষই বা দেই কেমন ক'রে বলুন ? সারাদিন প্রবৃত্তির সংস্পর্শবর্জ্জিত ধূমমলিন আপিস বা কারখানায় কাটিয়ে ক'জনার উদ্বৃত্ত থাকে সে জীবনীশক্তি যা দিয়ে আনন্দমেলা রঙের ঝুলন হাসির হররা করা যায় প্রতিষ্ঠা ? মানুষ অনুসরণ করে the line of least resistance : সুলভ আমোদের তাই তো জয়জয়কার। সমস্তদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরে সন্ধ্যায় একটু "ফূর্ত্তি" চাই না ? চাই বৈ কি। অতএব চলো এই পরের-গ'ড়ে-তোলা একাকার "ফূর্ত্তির" আখড়ায় : কার্নিভালে, ছবিঘরে, নাচঘরে, টকিতে। সবই যখন অপরে যোগান দিচ্ছে, তখন কি দরকার নিজের উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগের ? এমন কি, হাসি যে হাসি সেও অনায়াস-লভ্য, সস্তার চূড়ান্ত : পয়সা ফেলে দাও—দলে দলে পেশাদার হাসিয়েরা এসে যাবেন হাসিয়ে। গান ? তারই কি কম সুবিধে রেডিয়ো গ্রামোফোনের প্রসাদাৎ ? সাধে কি এ যুগের রেডিয়ো টকি-আমোদকে লক্ষ্য ক'রে মনস্বী

আলডুস সশ্লেষে ব'লেছেন: "Ours is a spiritual climate in which the immemorial deceneies find it hard to flourish. Another generation or so should see them definitely dead."

কিন্তু আজকালকার মানুষ একথা শুনবে? শোনে কখনো? সে চাইবেই কম খর্চায় আমোদ, বিনা উদ্ভাবনী শক্তিতে সৃষ্টি-লহরী-লীলা। আর সেজন্য আছেও এই সব আমোদ, যেমন যান্ত্রিক জলসা, ওরফে রেডিয়ো। হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড। কি না, সব প্রোগ্রাম তার বাঁধা। তোমার বেদনা কষ্ট নেই শুধু চাঁদাটা ফেলে দেওয়া ছাড়া। অতি সামান্তই সে চাঁদা—আর ঘরে ব'সে তোফা শোনো পান খেতে খেতে গল্প করতে করতে—গান বাজনার এমন কি কোনো আগ্রহদীপ্ত আবহ—atmosphereও—কষ্ট ক'রে তৈরি করতে হবে না। আজ কালাচাদ বটব্যালের ফ্লুটে "যমুনা এই কি তুমি" কীর্ত্তন, সঙ্গে রামরাবণ মিশ্রের পিয়ানো সঙ্গত বা রূপচাঁদ তেওয়ারির তবলা তরঙ্গ। কাল বাজখাই বঙ্গের খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ, সঙ্গে পেশোয়ার জঙ্গের মৃদঙ্গ ও জগদম্বাবল্লভ পালোয়ানের হার্ম্মোনিয়াম। পরন্ত আরও ভালো: লোকপ্রিয় অতুলপ্রসাদের গান শ্রীমতী পাঙ্গুবালার মন্দানা গলায় গাওয়া। পরে হাসাবেন স্বয়ং শ্রীযুক্ত হাস্যদিগ্‌গজ গুম্‌গুলি মহাশয়!!...

অতুলপ্রসাদ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর আদরের গানের এই রেডিয়োসম্ভব আদ্যশ্রাদ্ধ শুনেছেন কি না জানি না—হয়ত সে যন্ত্রণা থেকে পুরো অব্যাহতি পান নি—এক কর্ণহীন না হ'লে হয় ত সে নিষ্কৃতি-মেলা অসম্ভব—কিন্তু এই যে আনন্দ মেলা বা গানের আসরও অপরে বেঁধে ধ'রে দিয়ে চলেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর,—আমার দৃঢ় বিশ্বাস: এতে তাঁর জীবনে বৈরাগ্য নিশ্চয়ই গভীরতর হয়েছিল। একথা আমি বলছি তাঁকে জানি ব'লে।

কারণ তিনি যে ছিলেন সদানন্দ পুরুষ—এবং সেই যুগের লোক (যে-যুগ আজ অস্তগতপ্রায়) যখন মানুষ নিজের আনন্দ করত নিজে সৃষ্টি—(আলডুসের ভাষায়) "creation-saving device"-এর সহায়তায় সময়কে খালা বধ করতে চাইতও না, পারতও না। মনে পড়ে এমনিই সদানন্দ পুরুষ শাহেদ সুরাবর্দ্দিকে বার্লিনে আমার তিনটি রাশিয়ান বান্ধবীর কাছে নিয়ে গিয়াছিলাম একদিন। তাঁরা ছিলেন গায়িকা তথা বাদিকা। তাঁদের ওখানে চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প, গান ও তর্কের কলরোল—সামোভারেতে রুষ চা (লেবু দিয়ে) সেবনের সঙ্গে সঙ্গে। একদিন হ'ল কি, কনিষ্ঠা কিশোরী বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "বাঙালীর বিশেষত্ব কি?" সুরাবর্দ্দি পেছুবার পাত্র ন'ন: হেসে উত্তর দিলেন ফরাসীতে: "মাদমোয়াজেল্, তার কোনো প্রতিশব্দ নেই কোনো ভাষায়ই" (সুরাবর্দ্দি সাত আটটি য়ুরোপীয় ভাষা জানতেন)। তরুণী নাছোড়বন্দ, বললেন: "তবু?" সুরাবর্দ্দি বললেন: "তাকে আমরা বলি 'আড্ডা'।" এ কথাটি ব্যাখ্যা করতে বেশ একটু বেগ পেতে হ'য়েছিল সেদিন আমাদের দুজনকেই, মনে আছে।

"আড্ডাই" বটে। বাঙালীর বিশেষত্ব এই দুটি কথায় যেভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় অন্য কোনো দুটি কথায় যে তেমন ভাবে যায় না—তা যে কোনো ভাবুক রসিকই মেনে নেবেন অকুণ্ঠে! (আপনি তো নেবেনই—আপনার নানা বই, বিশেষ ক'রে "মহাপ্রস্থানের পথে" ও "কলরব" প'ড়েই বুঝেছি আড্ডা কাকে বলে সে ধারণা আঁতুড় থেকেই আপনার মজ্জাগত।) আর অতুলপ্রসাদকে যিনিই জানতেন তিনিই জানেন আড্ডারসের কি প্রচণ্ড রসিক তিনি ছিলেন আজীবন। তিনি যেখানেই থাকতেন তাঁকে অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে উঠত মধুচক্র—এই "আড্ডার" মধুচক্র। এক এক জন মানুষ দেখা যায় না, যাঁদের দেখলেই শুধু নাভিশ্বাস ও বৈরাগ্যশতকের কথা মনে হ'য়ে চক্ষে বয় ত্রাসাশ্রু, গাইতে ইচ্ছা হয় রক্তরাগে ব্রহ্মতালে—"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর!—

(যবে) অন্যে কথা কইবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।"

আবার এক এক জন মানুষ ক্ষণজন্মার মতনই উদয় হ'ন এই বিষাদধূমল জীবনে যাঁরা ভুলিয়ে দেন মানুষের আধি-ব্যাধি, শোকজ্বালা, দুঃখ দৈন্য—তাঁদের হাসির হর্ষের গানের সুধাপ্লাবনে। অতুলপ্রসাদ ছিলেন এই শ্রেণীর মানুষ।

আপনি তাঁকে কমই জানতেন, কিন্তু যাঁরা সে-সদানন্দ আত্মভোলা মানুষটির অফুরন্ত হাসির গানের সখ্যের স্বাদ একবার পেয়েছেন তাঁদের স্মৃতি-মঞ্জুষায় সে লাভ থাকবে

একটা স্মরণীয় বরণীয় সম্পদ হ'য়ে। তাঁরা ভুলতে পারবেন না যে, এ ম্লানায়মান জগতেও সময়ে সময়ে এমন মানুষ দেখা দেয় যে আপনাকে পারে অকুণ্ঠে বিলিয়ে দিতে—যে গড়পড়তা মানুষের মতন স্বভাবকৃপণ নয়: লোকোত্তর দাতার মতনই স্বভাব-অমিতব্যয়ী।

এ অমিতব্যয়িতা যে অবিমিশ্র শুভ নয় কে না মানবে? তবু যাঁদের প্রকৃতির মধ্যে বাজে দানের বাঁশি, তাঁরা ডেকে ডেকে আপনাকে যান বিলিয়ে, না বিলিয়ে পারেন না —অতুলপ্রসাদের মতন। কারণ তাঁদের মধ্যে নামে যেন একটা উচ্ছল আলোকবন্যা, আনন্দগঙ্গোত্রী প্রতি চরণে যে স্রোত নিজেকে ক্ষয় করে অক্ষয়ভাবে—অপরের জন্যে অপরের সুখের জন্যে, অপরের হাসির জন্যে, অপরের সেবার জন্যে।

অতুলপ্রসাদের আনন্দ ছিল এই ধরণের। সে ভাবত না, দাঁড়াত না, শুধু চলত—নিজেকে বিলিয়ে। তাঁর যে জীবন-মন্ত্র ছিল: "মন দুখ চাপি' মনে হেসে নে সবার সনে, (যখন) ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা জানাস প্রাণের বেদন।" নিজের দুঃখ নিজের বেদনা নিজের শোকতাপ সব লুকিয়ে অপরকে দিত নিজের সম্পদ। মানুষ যেখানে শ্রীহীন, যেখানে অভাব-ক্লিষ্ট, যেখানে আতুর সেখানে সে একা—নিরুত্তাপ, নিরালোক। কিন্তু যেখানে মানুষ ঐশ্বর্য্যশালী সেখানেই সে বন্ধু, দাতা, সখা, সারথী। কত মানুষের কত নিরানন্দ মুহূর্ত্ত যে এই সদানন্দ মানুষটি আনন্দ-উজ্জ্বল ক'রে গেছেন তার হিসেব করবে কে! আর কে বলবে এ সব মুহূর্ত্ত চলমান বলেই নশ্বর?

আর দান? সবাই জানে তিনি ছিলেন দানশীল—স্বভাব বদান্য। প্রার্থী কখনো খালি হাতে তাঁর কাছ থেকে ফিরত না। বহু অর্থ উপার্জ্জন ক'রেও তিনি ব্যাঙ্কে মোটা টাকা রেখে যান নি—প্রায় নিঃস্ব আজ তাঁর উত্তরাধিকারীরা—বিত্ত-সম্পদে। এ ঔদার্য্য কম নয়। অর্থ যার কাছে তুচ্ছ, সত্যিই তুচ্ছ, তার হৃদয়ের সম্পদ কম বলবে কে? আর কে না মানবে যে, এ অর্থলুব্ধ জগতে অর্থে অনাশক্তি হৃদয়ের উৎকর্ষের পরিমাপকও খানিকটা।

কিন্তু তবু বলা চলে যে সব চেয়ে বড় দান অর্থদান নয়, এমন কি বিদ্যাদানও নয়: সব চেয়ে বড় দান—আত্মদান। আর নিজের সব চেয়ে বড় সম্পদ আনন্দরস—রসো বৈ সঃ। প্রতিপদে বেদনা থেকেও রূপান্তরিত আনন্দ পাঁচজনকে দান। আপনার শ্রেষ্ঠসম্পদ প্রীতি স্নেহ দরদ মমতা ভালোবাসা বিলোনা পরকে। অতুলপ্রসাদের গান বা হাসি ছিল উপলক্ষ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আত্মদানের। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় প্রতি বন্ধুকে অতুলপ্রসাদও বলতে পারতেন:

"যদি এই গানে হাস্যে লভিয়াছি তব প্রীতি সার্থক আমার হাস্য সার্থক আমার গীতি।" *

আর গানে হাস্যে মনেপ্রাণে অপরের মন কাড়তে চাওয়া এ পারে ক'জন মহাপ্রাণ মানুষ? কজনার আছে সে ক্ষমতাই বা—নিজের চারদিকে আনন্দ সৃষ্টির মণ্ডল গড়ে তোলার? অতুলপ্রসাদেরই সেই দরদভরা সরল আত্মনিবেদনের গানটি মনে পড়ে আজ তাঁর মূর্ত্তি মনে হ'লেই:

সবারে বাসরে ভালো (নইলে) মনের কালো ঘুচবে না রে
আছে তোর যাহা ভালো ফুলের মতন দে সবারে।
ক'রে তুই 'আপন আপন'—হারালি যা ছিল আপন:
এবার তোর ভরা আপন বিলিয়ে দে মন যারে তারে।

অতুলপ্রসাদ দিতেন—দিতে জানতেন, ফুলের মতনই অনাড়ম্বর নিবেদনে, তাঁর মধ্যেকার শ্রেষ্ঠ সুগন্ধটুকু—তাঁর আনন্দনির্য্যাস। জীবনে বেদনা তিনি যে কত পেয়েছেন তার সীমা নেই বললেও বোধ করি বেশি বলা হবে না!—অথচ কখনো কি কোন বন্ধুকে সে দুঃখের ভাগ দিয়েছেন এতটুকুও? না। বড় কুণ্ঠায় হয় ত কখনো কারুর কারুর কাছে বলেছেন তাঁর কোনো গভীর আঘাতের কথা। কিন্তু তার পড়েই হাসির হাওয়ায় সব তাঁর ক'রে দিয়েছেন লাঘব। তাঁর বেদনা ছিল সত্যিই তাঁর কাছে "পবিত্র"—তাকে তিনি গড়পড়তা কবিদের মতন ভাববিলাসের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতেন না, তাকে গোপনে লালন ক'রে, হৃদয়ের রসায়নে রসিয়ে আনন্দের উত্তাপে নবজন্ম দিয়ে ঢালতেন অন্য সবাইয়ের প্রাণপাত্রে। বিশেষ ক'রে তাঁর গানের হারে ও হাসির দেয়ালিতে। সে গান যে কি ছিল তাঁর মুখে যে না শুনেছে সে কি জানে? সে হাসি যে কি ছিল তার কণ্ঠে যে

* "মন্দ্র ও ত্রিবেণী" পুস্তক দ্বিজেন্দ্রলাল, "উত্তর" কবিতা দ্রষ্টব্য।

না শুনেছে সে কি কল্পনাও করতে পারে? মনে পড়ে শুধু দ্বিজেন্দ্রলালের কথা। হাসিতে ও গানে তাঁরা ছিলেন সতীর্থ। তাঁরা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন কি সাধে?

কিন্তু বলব কি করে' সে হাসির কথা—সে গানের কথা? দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদের হাসিতে ঘর সত্যিই কাঁপত। তেমন হাসতে কয়জনকে শুনেছি? সে রকম প্রাণকাড়া মনখোলা উদাত্ত অট্টহাসি? মনে হ'ত যেন সব পরশ্রীকাতরতা, সঙ্কীর্ণতা, দলাদলির আঁধি সে হাসির দমকা হাওয়ায় যেত কেটে—মুহূর্তে। সৌরভ তার অবর্ণনীয়। দুঃখ এই যে কম হাসিই এমন শুভ্র। বিশ্বকবি শেক্ষপীয়র বড় দুঃখেই গেয়ে ছিলেন "হাসে কত জনা—ভয় হয় তবু যেন তারা অসরল হাসি-আলো-তলে হৃদয়ে লুকায়ে রাখে বিষছায়াদল।" *

তবু এমনধারা নিতান্তই ছায়াময় ভাবে তাঁর হাসিপ্রিয়তার কথা ব'লে থামতেও প্রাণ চায় না যে! তাই দুএকটা কাহিনী বলি তাঁর হাসির। খেদ এই যে, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের পরিপ্রেক্ষিতে সে হাসিকে না দেখলে না শুনলে তার মহিমা যথাযথ উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। তবু তাঁর স্মৃতিতর্পণে যা পারি কিছু বলি। † বলব নিতান্তই দু চারটে ঘরোয়া কথা—দেব তাঁর রসিকতাপ্রিয়তার তাঁর হাসাতে পারার দু একটা দৃষ্টান্ত। এর বেশী কিছু না। কেবল এত আক্ষেপ হয় যে কতটুকু সার্থকতা এ সবের? আর ক'টা দৃষ্টান্তই বা দেওয়া যায় বলুন? সে আনন্দ কুড়োনোর সে হাসির কি শেষ ছিল? প্রতি তুচ্ছ কথাকেই উপলক্ষ করে সে যে নিবেদন করত আপনার আলো, যেমন পুষ্পাঞ্জলিকে প্রতিমাকে আরতিকে উপলক্ষ ক'রে ভক্ত দেবতাকে নিবেদন করে আপনার ভক্তি।

মনে পড়ে প্রথমেই মধুপুরে তাঁর হাসির হররার কথা বড় দিনের সময়। সে সময়ে উৎসবীদের মধ্যে ছিলেন আমার অভিভাবক মাতুল পরিবার, ছিলেন শ্রীমতী সাহানা দেবী—অতুলপ্রসাদের বোন, ছিলেন আমার এক গায়ক ভ্রাতা শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়—যিনি আজ বোলপুরে, আর আমার অজস্র ছোট বড় ভাই বোন বন্ধু বান্ধব।

প্রথমে সেই সময়েই তাঁর একটু কাছে আসার সুযোগ পাই গান ও হাসির কলরোলে। সে ছিল যেন একটা ঝরণা, হাসি ও গানের। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলত গান গাওয়া, গান শেখানো, আমোদ প্রমোদ ও—বর্ত্তমান নিবন্ধের বিষয়—হাসি। মাত্র তিন চার দিন ছিলেন তিনি আমাদের অতিথি হ'য়ে। কিন্তু সেই তিন চার দিনের স্মৃতি কি ভুলবার? ভোরবেলা উঠে সাধছি সব প্রভাতী রাগ তানপুরার সাথে, দেখি পিছনে অতুলদার স্নিগ্ধ শান্ত সদাহাস্যময় মূর্ত্তি। ভালো গানে তাঁকে ক্লান্ত হ'তে দেখিনি কখনো। আপনি হয়ত জানেন না কতবড় একটা ভুল ধারণা সাধারণের মনে চারিয়ে আছে যে, ভালো গান সবাই ভালোবাসে। না, বাসে না। সস্তা গান, চটকদার গান, রংদার গানই ভালোবাসে শতকরা নব্বই জন শ্রোতা। ভালো গান ভালোবাসে অতুলপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলাল জগদিন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথের মতন দু চারজন বোদ্ধা গুণী ও গভীরচিত্ত মানুষ—দরদী। আর এসব গানপ্রেমিকের মধ্যেও অতুলপ্রসাদ ছিলেন অগ্রণীদের অন্যতম। মানে সঙ্গীত তাঁর কাছে বিলাস ছিল না, ছিল অবলম্বন—জীবনের। তাঁর কাছে সত্যিই এটা কথার কথা ছিল না:

(ওগো) দুঃখ সুখের সাথী সঙ্গী দিন রাত্তি সঙ্গীত মোর।
(তুমি) ভবমরুপ্রান্তরমাঝে শীতল শান্তির লোর।"

কিন্তু গানের কথা থাক আজ। বলি তাঁর হাসিরই কথা। আমার রসিক ভ্রাতা বন্ধু-ক্ষেপানে শচীন্দ্রলাল রায় আমাদের এক বিহগাসক্ত বন্ধুকে নিয়ে লিখেছিলেন (তাঁর নাম ছিল নিশু):

নিশু! পোরো পোরো পক্ষী পোরো গলে।
ছি ছি! দিয়ো না ক্ষ্যামা ভাই লাজ ছলে।

গানটি অতুলপ্রসাদের বিখ্যাত "বঁধু ধর ধর মালা পর গলে
ফিরে দিও না বনকুসুম ব'লে"

গানটির ছেলেমানুষি লালিকা। সবটা মনে নেই, তবে শেষে ছিল বুঝি:

মা ভৈ যদি রাখো দেহ ধরাতলে
মোরা ফেলে দেব তোমায় নদীজলে।

---

* And some that smile have in their hearts I fear
Millions of mischiefs......Octavius Caesar (Shakespeare).

† তাঁর গানের কথা আশ্বিনের উত্তরায় বলেছি দেখবেন—তাই এ নিবন্ধে সেই বিষয়ে কিছু লিখলাম না।

অবশ্য লালিকা হিসেবে গানটি দ্বিজেন্দ্রলাল বা সতীশচন্দ্র (ঘটক) প্রমুখ সাহিত্যিকের রচিত লালিকার প্রতিস্পর্দ্ধী—এমন কথা বলছি না। নিছক খুনশুড়ি করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই গানটি লেখা, একান্ত ভাবেই হাসির উপলক্ষ্য হিসেবে। আমার ছোট ছোট গাইয়ে ভাই বোনরা ঐক্যতানে গানটি গাইত অতুলপ্রসাদেরই কালাংড়া সুরে—স্রেফ হাসতে। কিন্তু হলে হবে কি, অতুলপ্রসাদের উপস্থিতিতে উপলক্ষ্য সামান্য হ'লেও হাসির শিহরণ অসামান্য না হয়েই পারত না। কারণ তাঁর নিজের প্রাণখোলা হাসি সব তুচ্ছকেই করত বৃহৎ—অসার্থককে করত কৃতার্থ।

এ গানটি শুনে তাঁর অফুরন্ত অক্লান্ত হাসির কথা আমার আজও মনে পড়ে। (পরে নিশু বেচারী হঠাৎ মারা যায়। তখন আবার তাঁর পরিতাপও ভুলব না "আহা দিলীপ, ও গানটিতে বেচারীকে ফেলে দেব মোরা নদীজলে' বলে গেয়েছিলাম? এমনিই কোমল ছিল তাঁর হৃদয়। যেমন করুণ তেমনি প্রফুল্ল!…)

আর কত গল্পই না শুনতাম তাঁর কাছে। সে সব বলতে গেলেও ঠেকে নিষ্প্রভ। সে কৌতুকদীপ্ত চাহনি পাব কোথা? সে টোন পাব কোথা? সে হাস্যকর অথচ সুশীল সংযত অঙ্গভঙ্গি পাব কোথা? সব চেয়ে বড় কথা: সে হাসির রসান পাব কোথা—যাতে প্রতি কৌতুকব্যঞ্জনই হ'য়ে ওঠে রসের পাকে নিটোল ভরপুর? তবু বলি দু একটি কাহিনী তাঁর। আপনারা রসিক সুজন—কল্পনা করে নেবেন তাঁর টোন তাঁর হাসি তাঁর চাহনি। কেমন?

চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছি সবাই মিলে। অতুলদা তাঁর প্রাত্যহিক রসাল গল্প বলতে আরম্ভ করলেন আমাদের:

"জানো দিলীপ, বিলেতে তো গেছি। আমার সঙ্গে বন্ধু পি মিত্তির, এক ঘরে শুয়েছি। পাশাপাশি বিছানা—স্প্রিঙ্গের। আমি শুয়েছি। রাত দুপুরে দেখি পি মিত্তির 'হি হি হি হি' করছে শীতে: 'ওরে অতুল, এরা শীতে কম্বল দেয় না জানা ছিল না রে।' আমি দেখি কি: বিছানার কম্বলের ওপরে যে বিছানার মোটা চাদর—sheet—থাকে—বিলিতি সব বিছানায়ই না? তার ওপরেই শুয়েছে বোকাটা—আর কম্বল পাবে কোথা? কাজেই কাঁপছে আর বলছে: 'ওরে অতুল, ওভারকোট জড়িয়ে বিছানায়ও হি হি হি হি করতে হবে জানলে কোন্ বেল্লিক আসত এ উল্লুক দেশে! হি হি হি হি!" সে মজার হি হি হি হি ব'লে তাঁর কী দারুণ হাসি! ঘর ওঠে কেঁপে। তাঁর হাসি শুনতে শুনতে সে সময়ে প্রায়ই মনে পড়ত বাইরণের ডন জুয়ানের Laugh at any mortal thingএর কথা।

"আর একদিন", অতুলদা বললেন: "পি মিত্তির বিলেতে গানের আলোচনা করছে আমাদের সঙ্গে। আমি বললাম 'তোর এ বিড়ম্বনা কেন বল্ দেখি? না জানিস বাংলা গান, না ইংরিজি।' ও সভ্রূভঙ্গে বল্ল: 'জানি না বৈ কি—দুটোই জানি, আমি সব্যসাচী।' আমি হেসে বললাম: 'কী ইংরিজি গান জানিস আবার? ও সা সা সা সা রে রে রে রে মাত্র এই দুটো সুরে গাইল: 'All the way to Mandalay' আমি বললাম: 'মরি কী সুর! এবার বাংলা?' তৎক্ষণাৎ ধরল: 'কোথা গেলে পাব তারে'—ঐ সা সা সা সা রে রে রে রে কার্ফা তালেই। দুটোই অবিকল এক সুরে কেঁউ কেঁউ করছে—অবিকল এক সুর—দুটো পর্দ্দা!' অথ সবাইয়ের অট্টহাস্য। (কিন্তু এসব লিখতে যাওয়া বৃথা। সে গল্প বলতেন তিনি যে অপূর্ব্ব সুরে সে সুরের আলোই যে নেই এতে) মনে পড়ে বিখ্যাত গায়ক ৺রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের সেই তাঁর বন্ধু কেদারের গানের নকল "জানো দিলীপ, শোরীর সিন্ধু গাইছে কেদার আদ্যন্ত বেসুরা 'হো মিঞা যে জানে ওয়ালে।' সে কী অপূর্ব্ব বেসুরার নকল। আদ্যন্ত বেসুরা গাওয়া সুরেলা মানুষের পক্ষে যে কী শক্ত!… সুরেন্দ্রনাথ কেদারের গান শুনে ভড়কে গিয়ে বললেন: "কেদার, এ গান আমার কাছেই শিখে আমার বুকে ব'সে দাড়ি ওপড়াচ্ছিস্ রে?" কেদার চটে বলল: "আহা, ষ্টাইলটা দেখ্ না, অবিকল শোরীর ষ্টাইল তো হচ্ছে? বেসুরোর জন্যে মাথা ব্যথা কেন তোর? গাইতে গাইতে সুরকে কায়দা তো করবই।"

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের হাসির সঙ্গে অতুল প্রসাদের হাসির ছিল অনেক তফাৎ। সুরেন্দ্রনাথের ছিল ব্যঙ্গ হাসি, স্নিগ্ধতার আমোদের সঙ্গে। অতুলপ্রসাদের: ঘর কাঁপানো

অট্টহাস্য, তাতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আমেজ ছিল না এতটুকুও। আর একটা গল্প বলি। অতুলদা বললেন:

"জানো দিলীপ, তখন আমরা ডাকাতে ক্লাবের মেম্বর; তোমার বাবা, আমি, রবিবাবু, দেশবন্ধু সবাই। একদিন খুব গান বাজনা। আমি সবে রচনা করেছি আমার সেই গানটি:

আমার মনের ভগন দুয়ারে সহসা তুমি কে গো, তুমি কে?

নন্দন-আভা বেষ্টিত তনু উজ্জ্বল নিজ আলোকে, তুমি কে গো, তুমি কে?

একি প্রেম-প্রতিম অঙ্গ!
একি যৌবন রূপ রঙ্গ!
একি মন্দাকিনী-মন্দ-সলিল ভঙ্গ!
একি সহসা মম জীবন বন-পুষ্পিত
সখি তব ও নয়ন-পলকে,
তুমি কে গো তুমি কে?
ছিল অশ্রু নদমুলীন হৃদয় দুঃখ তামস গগনে
আজি প্রাণ যে মম ইন্দ্রধনু লো তোমার নয়ন-কিরণে,
আজি প্রাণ যে মম মত্ত মধুপ, লুণ্ঠিত তব চরণে,
মম জীবন, মরণ, ধরম, সরম
সকলি লীন পুলকে
তুমি কে গো তুমি কে?
তুমি বিশ্ব করেছ সুন্দর মনের নিভৃত কন্দরে,
মম ক্ষুদ্র তরণী চঞ্চল ক্ষুদ্র জীবন-বন্দরে;
তুমি সহসা উদিত ভাস্কর নীল নিশীথ অম্বরে;
মম জীবন গহন-চয়ন-কুসুম
শোভিত তব অলকে,
তুমি কে গো, তুমি কে? *

"মনে আছে"—অতুলদা বলতে লাগলেন—"কবি ও তোমার বাবার এ গানটি ভালো লেগেছিল। হাততালিও পড়েছিল।" (এটুকু সলজ্জে) "বলা বাহুল্য মনটা ভারি খুসি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের মতন কবির ভালো লেগেছে আমার মতন কাঁচা কবিযশঃপ্রার্থীর গান। গর্ব্বও বেশ একটু"—অতুলদা হাসলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি। "হবে না গর্ব্ব! বলো দেখি? আমি ও ক্লাবের সবচেয়ে তরুণ মেম্বর। তখন বয়স হবে বড় জোর বাইশ তেইশ।" বলে থেমে বললেন "যাহোক গান শেষ হলে হঠাৎ দেখি হাত-ছানি দিয়ে রসিকরাজ নাটোরের মহারাজা (জগদিন্দ্রনাথ) ডাকছেন বাইরের বারান্দায়। দুরু দুরু বক্ষে চললাম তাঁর কাছে। মহারাজার মুখে খুসি পড়ছে উপছে। বুঝলাম তাঁরও ভালো লেগেছে। অতবড় গুণীর ভালো লেগেছে আমার মতন নগণ্য তরুণের হোঁচট-খাওয়া-ছন্দে-রচা গান! উঃ, মনে হল যেন হাতে স্বর্গ মিলল। তাঁর দিকে দ্রুতপদে যেতে যেতে কত জল্পনা কল্পনাই করছি: মহারাজ না জানি কী তারিফই করবেন! মহারাজা বারান্দার এক কোণে নিয়ে গিয়ে আমার কাঁধে হাতে রেখে চোখ মিট মিট ক'রে ফিশ ফিশ শব্দে বললেন 'কে র‍্যা?"

অতুলদার এ ঘটনাটির বিবৃতিও কালির আখরে বর্ণনা করা অসম্ভব। কেননা এর মধ্যে হাসির পনের আনা উপাদানই ছিল তাঁর গলার টোনে, তাঁর ঈষৎ লাজুক ঈষৎ বেপরোয়া হাতের ভঙ্গিতে—এক কথায় তাঁর ব্যক্তি-স্বরূপের অবর্ণনীয় ধরণ ধারণে। তবু এ থেকে কিছু তো ধারণা পাওয়া যাবে। কিন্তু কতটুকুই বা পাওয়া যাবে বলুন?

দ্বিজেন্দ্রলালের একটা গানে আছে:

জগত যা নিয়ে যায় একবার—ফিরায়ে দেয় না আর তায়,
নিয়ে যায় সব ভেঙ্গে চুরে—শুধু স্মৃতিটুকু তার রেখে যায়।

এ কথার সত্যতা অস্বীকার করবে কে? দ্বিজেন্দ্রলালের গান অতুলপ্রসাদের হাসি এ সব আর ফিরবে না। থাকবে শুধু তাদের স্মৃতির সৌরভটুকু।

তবু অতুলপ্রসাদের কথা ভাবতে কোন্ সৌরভটির চির-বিদায়ের কথা মনে পূরবীর সুরে বেজে উঠে বলব? তাঁর আভিজাত্য। সব বিষয়েই অচলপ্রতিষ্ঠ সরলছন্দ আত্মসম্ভ্রম। হৃদয়ের অনাবিল প্রীতির সাথে মানুষের জন্মনিঃসঙ্গতার উদাস গন্ধ। এই নিঃসঙ্গতা গণমনে মেলে না, যূথমমে মেলে

* মিত্র মাত্রাবৃত্ত-লঘুগুরু ছন্দ। অর্থাৎ কোথাও কোথাও দীর্ঘ স্বরবর্ণ দুই মাত্রা—কোথাও কোথাও এক মাত্রা। এ ভাবেই অনেক বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ্য।

না, ডিমক্র্যাসিতে মেলে না। মেলে এক আভিজাত্যে যে আভিজাত্য হল গত যুগের। আর সে আসবে না। বঙ্কিম, রাজনারায়ণ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ এঁদের আভিজাত্যও আর দেখা দেবে না, যাকে বলে Aristocracy of Personality। ডিমক্র্যাটরা এতে পুলকিত হবেন হয়ত, কেন না আভিজাত্যের নামে নিষ্ঠুর অনেক কিছুও চলত সাবেক কালে। তবু আমি বলব সে মিথ্যা ছিল না—বিশেষ যখন সে নিজেকে বিলোতো সখ্যে সৌহার্দ্যে সৌকুমার্য্যে গানে হাসিতে।

আর আভিজাত্যের একটা পরম দান হ'ল নিজের বেদনাকে গোপন রেখে হাসিকে বিলোনো। গণমনই করে হা হুতাশ নিজের বেদনা নিয়ে লোকদেখানে বুক চাপড়ে। আভিজাত্য বলে:

> যবে হাসো—ধরা তোমার পুলক ঝলকে হাসে,
> যবে কাঁদো—করো একেলাই সে বিলাপ;
> আনন্দ-ঋণ সবে যাচে নিতি—সবার পাশে
> দুঃখ অথই কারো নাই সে অভাব। *

কথাটা পরিষ্কার হ'ল কি না জানি না। বিশদ করতে বলিই না কেন নীচে আমার এক ফরাসী বন্ধুর কথা! তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন জাপানীদের আভিজাত্যের নানা কাহিনী। একটি গল্প তাঁর ভুলব না কোনোদিন। তাঁর এক জাপানী বন্ধুর বাড়িতে একদিন সন্ধ্যায় তিনি যান রোজকার মতনই। স্বামী স্ত্রী তাঁকে কী আদরই করলেন যে—কী হাসিটাই হাসালেন যে! রাত্রে তিনি খবর পেলেন তারা হারিকিরি † করেছে। বন্ধু বললেন আমাকে: "পরে জানতে পারলাম তাঁরা সেদিন সকালবেলা খবর পেয়েছিলেন যুদ্ধে তাঁদের একমাত্র পুত্র নিহত হয়েছে এবং দুঃখে শোকে স্থির করেছিলেন যে রাতেই করবেন হারিকিরি। অথচ আমার কাছে মৃত্যুর ঘণ্টা খানেক আগেও তাঁরা রোজকার মতনই সদাহাসি সদানন্দ ব্যবহার করেছিলেন।" বন্ধুবর বলেছিলেন: "দিলীপ, এ চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না হয়ত কোনোদিনই।"

গভীর দুঃখেও জন্ম-অভিজাতের এই যে অপরকে নিজের শুধু আনন্দটুকুই দেওয়া, সুকুমার দরদী মনের এই যে অপরকে তার দুঃখের ভাগ দিতে না চাওয়া; এই যে সহজ সংযম, এই যে অভীপ্সা "তার ভালোটুকুই" "ফুলের মতন" সবাইকে বিলোবে দুহাতে; নিজের অন্ধকারটুকু গোপন রেখে শুধু আলোর দক্ষিণা দিয়েই এই যে জীবন-ঋণ শুধতে চাওয়া; মনে হয় না কি যে সত্য মানুষের একটা মস্ত নিদর্শনই হ'ল এই অনাড়ম্বর নিষ্কলুষ আত্মদান? মনে হয় না কি যে এর মধ্যে আছে সত্যিকারের অনুভব বিকাশ, দরদ, প্রেম? সত্যতার কতখানি বিকাশে এ চেতনার উদ্ভব হয় বলুন তো? কয়জন বলতে পারেন বুকে হাত দিয়ে যে অপরকে নিজের দুঃখের বিবৃতিতে দুঃখ দিয়ে সুখ পান না? বিশেষ জন্ম-ঢঙী কবির জাত? ক'জন কবি অভিনেতা ন'ন? দুঃখের যে মুগ্ধকর বিলাস তাতে গা ঢেলে দিতে মনে প্রাণে পরাঙ্মুখ কজন সত্য দরদী?

কিন্তু যাঁরা ন'ন অতুলপ্রসাদ ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় কতিপয়েরই অন্যতম। তিনি জীবনে কত দুঃখ স'য়ে গেছেন—তাঁরই অযাচিত অন্তরঙ্গতার দানে—আমার কিছু জানার সৌভাগ্য হয়েছিল—তাই আমি জানি সে দুঃখ হাসিমুখে বহন করা বলিষ্ঠতম মানুষের পক্ষেও কত কঠিন।

কিন্তু কোমলতম যাঁর হৃদয়, ভিক্ষুক, কাঙাল, প্রভৃতিকেও যিনি কোনোদিন একটা কড়া কথা বলতে পারতেন না, একটি তুচ্ছ প্রাণীর তুচ্ছ পতঙ্গের দুঃখেও যাঁর বেদনা বোধ ছিল—তিনি নিজের গভীরতম দুঃখেও সমবেদনা চাইতেন না কখনো। তাই নিজের অতিবড় দুঃখের বাষ্পও পরকে জানতে দিতেন না কোনোদিনও। আমাকে কিছু বলেছিলেন, কিন্তু সে কত সঙ্কোচে কত লজ্জায় যেন। আর ব'লেই সব হেসে করে দিতেন হাল্কা। দুঃখকে বলা যায় এক গানে কাব্যে রূপান্তরিত ক'রে বিশ্বজনীন রসে গলিয়ে। কিন্তু মুখে

---

* Laugh and the world laughs with you,
Weep and you weep alone,
For this brave old earth must borrow its mirth
But has trouble enough of its own.

......Ella Wheeler Wilcox

† জাপানীরা ঘটা ক'রে পেট চিরে আত্মহত্যা করে—আইন-অনুমোদিত ভাবে। তার নাম হারিকিরি।

সহজে বলতে পারে কি—সুকুমারমতি অভিজাতে? আর অতুলপ্রসাদ ছিলেন যে সৌকুমার্য্যের অনুভব-আভিজাত্যের প্রতিমূর্ত্তি। মনে পড়ে তাঁর এমনিই এক দুঃখের সময়ে আমি তাঁকে ধরে নিয়ে যাই আমার বোন মায়ার ওখানে সিমুলতলায়। সুন্দর তাদের বাড়ীটি একটি ছোট্ট পাহাড়ের ওপরে। কয়দিন কী আনন্দই যে তিনি দিয়েছিলেন আমাদের! তাঁর হাসিতে, গানে, তাঁর চরিত্রের সৌরভে—কিসে নয়?

রোজ আমরা একটা বড় খাটে রাতে একত্র শুতাম সারাদিন গান বাজনা হাসি গল্পের পর। আমি তাঁর চেয়ে ছিলাম প্রায় পঁচিশ বছরের ছোট। কিন্তু তাঁকে বন্ধু ছাড়া কিছু মনে করতেই পারতাম না। পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে কত কথাই যে হত···কত রাত অবধি! তাঁর অন্তরঙ্গতার সে উপহার আজও আমার কাছে কত যে মহার্ঘ! কারণ তাঁর অভিজাত মনের কত গোপন মধুর করুণ পেলব দিকের পরশ যে পেতাম এই নিরালা রাতের কথাবার্ত্তায়!...বলেছি, তিনি ছিলেন আমার পিতৃদেবের পরমবন্ধু। সৌভাগ্যক্রমে—তাঁরই অতুল প্রসাদে, আমার গুণে নয়, আমাকেও তিনি তাঁর বন্ধুত্বের দানে করেছিলেন ধন্য। সে সদানন্দ মানুষটির এ দান কখনো কি ভুলব? আনন্দের পাথেয় জীবনে যত লোকের কাছে পেয়েছি অঞ্জলি ভ'রে, অতুলপ্রসাদ সে সব দাতাদের মধ্যে ছিলেন অগ্রণী। যে তাঁকে অন্তরঙ্গ হিসেবে পেয়েছে সে তাঁর প্রীতির দানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ না ক'রে পারে? জীবনে প্রতিভা মনীষা মেলে কম মানি, কিন্তু এমন সর্ব্বগুণাধার দরদী হৃদয়?—আরও অনেক কম নয় কি? ঐ দেখুন, কখন যে ফের হাসি ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে এসে গিয়েছি। কিন্তু তাঁর নানা হাসিই যে ছিল অশ্রুরই নামান্তর। যাক।

সেখান থেকে আমরা দুজনে যাই বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যে।

সে হাসির আর এক উজ্জ্বল গর্ভাঙ্ক। দুঃখের বিষয় সেখানে গানের আসর তেমন জমত না, কেন না গান সম্বন্ধে অতুলপ্রসাদ ও আমার রুচি ছিল এক ধরণের, রবীন্দ্রনাথের অন্যধরণের—কাজেই গানে কোনো মিলাত্মক মজলিশ বসত না। কিন্তু হাসির আসরে আমাদের মধ্যে হ'ত পূবের দহরম মহরম যাকে বলে। কবির সে কী অপূর্ব্ব রসিকতা!

অতুলদাকে একটু পুষ্টকায় দেখেই: "কী অতুল, একটু যে বেশ" (সকটাক্ষ) "সংগ্রহ ক'রে এনেছ দেখছি!" (অথ অতুলদার অট্টহাস্য) ব'লেই বললেন: "দেখ তোমাদের হয় ত আমার আতিথ্যে আপাতত একটু কষ্ট হবে দুজনে মিলে একটা ঘরে থাকতে—" অতুলদা বললেন: "আহা না—" কবি হেসে বললেন: "বাঁচা গেল। তবে আমি জানতাম হে, যে আগে থাকতে কষ্ট হবে ব'লে রাখলে তোমরা কি আর সত্যিই তাতে সায় দিয়ে আমায় অপ্রস্তুত করবে?" (অথ পুন অতুলনীয় অট্টহাস্য) *

কবি বললেন: "অতুল, চলো আর একবার যাই পদ্মায় বজরায় সেই আগেকার মতন। মনে পড়ে সেই কথা। যখন চারধারে থাকত হংস মধ্যে আমি—পরমহংস?" (অথ—অনুমেয়)

অতুলদা সলজ্জ হেসে বললেন: "আমাদের কাগজ উত্তরার জন্যে—"

কবি টপ ক'রে বললেন: "কিছু দক্ষিণা চাই এই তো? পাবে হে পাবে, ঝুলিতে কিছু থাকেই সব সময়ে। ও অমিয়—"ইত্যাদি

কবি একদিন সকালে চমৎকার চমৎকার কথা বললেন তাঁর বিলাতী জীবন সম্বন্ধে। আমি সেগুলি টুকে রাখতে এক গাছতলায় গিয়ে মহোৎসাহে সুরু করলাম লেখনী চালনা। ফিরতে একটু বিলম্ব হল। দেখি ওঁরা খেতে বসে গেছেন। কবি বললেন: "কি দিলীপ, এত দেরি, আমরা টেবিলে যে খেতে ব'সে গেছি?" আমি লজ্জিত হয়ে বললাম টেবিলে বসে: "একটু লিখতে লিখতে—"অতুলদা বাধা দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন: "কবি তোমার জন্যে কী দারুণ উচাটন, জানো দিলীপ? শুনলে খুসি না হয়েই পারবে না। বলছিলেন: দিলীপ আমার বাচালতায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে অন্য কোথাও খেতে চলে গেল না কি হে অতুল? ব'লেই গুণ গুণ ক'রে গাইছিলেন: সে কি 'আন ঘরে গেল আমার আঙিনা দিয়ে?" (অথ—ডিটো)

* এ কয়দিনের রোজনামচা আমি লিখে রাখতাম তখনি তখনি। এটুকু সেই ডায়ারি দেখে লিখেছি। ওটা ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৭-এর বিবরণীতে লেখা রয়েছে।

সে তিনদিনের কথা টুকে রেখেছি বটে সবিস্তারে এবং কোনো একদিন দেখতেও পাবেনই। কিন্তু কবির ও অতুলপ্রসাদের সে অপূর্ব্ব রসিকতা ও কলহাস্যের কী-ই বা জমা ক'রে রাখা যায় বলুন? সময়ে সময়ে সত্যিই এত দুঃখ হয় প্রবোধ বাবু! না হ'য়ে পারে? এসব মুহূর্ত্ত কত সংক্ষিপ্ত ভেবে? বলুন তো! তবু আর একটা মাত্র বিবরণী দেই ঐ রোজনামচা থেকে। অতুলদা ও আমি বোলপুরে পৌঁছে কবির কাছে হাজিরা দিতেই অতুলদা বললেন: "আপনার চেহারা তো খুব ফিরেছে দেখছি—"

কবি বাধা দিয়ে সত্রাসে ফিশ ফিশ ক'রে বললেন "চুপ চুপ। কালই এক ভদ্রলোক এসেছেন তাঁর স্ত্রীর স্বর্গারোহণ পর্ব্বে আমাকে সভাপতি খাড়া করতে। আমার শরীর ভিতরে ভিতরে থাসা সুস্থ এ কলঙ্ক রটলে কি আর সভাপতি না হ'য়ে কলঙ্কমোচনের পথ থাকবে?"

অতুলদা হো হো ক'রে হেসে বললেন: "কি রকম?" কবি বললেন: "কি রকম আবার? লোক ডেকে তাঁর স্ত্রীর জন্যে চোখের জল ফেলতেই হবে।" ব'লে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনুপম চোখ মিট মিট করে বললেন: "আচ্ছা অতুল, স্ত্রী মারা গেছেন তার জন্যে এ কেন? সাধ মিটিয়ে হাহাকার করো না বাড়ি ব'সে, না হয় বেসুরো গানই গাও যদি তেমন বেসামাল হয়। তাতেও না শানায়, হ'ল ছুটো কবিতাই লিখে ফেললে অশ্রু রাগে উচ্ছ্বাস তালে। কিন্তু সভা ক'রে এমন একজন নিরীহা স্বর্গগতার আত্মীয়ের জন্যে শোক করাটা কি শোভন—বিশেষত আমার মতন ততোধিক নিরীহ অসহায় মানুষকে সভাপতির আসনে উঁচু ক'রে ধ'রে?"

অতুলদা হাসতে যাবেন এমন সময়ে কবি বাধা দিয়ে বললেন: "খবর্দ্দার বেশি হেসো না এ নিয়ে। অদূরেই তিনি শোভমান—বেশি হাসির অট্টরোল শুনলেই এঁচে নেবেন আমি খাসা আছি।" বলে আমার দিকে ফিরে ফিশ ফিশ ক'রে কৌতুকোজ্জ্বল চোখে বললেন: "আমি কিন্তু তাঁকে বোঝাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছি যে এরূপ ক্ষেত্রে যিনি 'পতি' তাঁরই 'সভাপতি' হওয়া সবচেয়ে শাস্ত্রসম্মত। তিনি প্রায় এ যুক্তি বিশ্বাস করার কিনারায় এসেছেন। তাই বলি বেশি হেসে যেন মজিয়ো না আমায়।"

অতুলদা রাত্রে বললেন: "দিলীপ, তোমার বাবার সঙ্গেও এমনি কত হাসির কথাই যে হ'ত। আহা! বাংলদেশে সে হাসির তুলনা নেই—যেমন কবির স্নিগ্ধ হাসি আলাপেরও তুলনা নেই।" (এই "আহা" যে তিনি কী সুরেই বলতেন!)

আমি বললাম: 'তাঁর সঙ্গে খুব হাসি হ'ত বুঝি আপনার?'

অতুলদা বললেন: "উঃ। আর সারারাত ধ'রে। একদিন মনে আছে, আমরা সবাই সারা রাত হাসব ও গাইব ঠিক করলাম। রবীন্দ্রনাথ রাত ঘটায় প্রস্থান করলেন ডাকাতে ক্লাব থেকে। জগদিন্দ্রনাথ, তোমার বাবা, দেশবন্ধু * ও আমি ভোরে কফি খেয়ে তবে হাসির পালা সাঙ্গ।" ব'লেই থেমে বললেন, "না শান্তি পর্ব্ব তখনও না, তারপর আমায় ছুটতে হ'ল দ্বিজুবাবুর সঙ্গে তোমার মার কাছে—দাম্পত্য বিধানে তামা তুলসী হাতে ক'রে তোমার মার কাছে হলফ করতে যে কোথায় রাত কাটানো হল। সে সব জানো না তো বেঁচে গেছ।" বলে সে কী হাসি ফের সেই রাত বারোটায়!...হাসির কি তাঁর সময় ছিল!

আমি বললাম: "তাঁর রসিকতা কিন্তু অন্য ধরণের ছিল। কবির রসিকতা আবার অন্য ধরণের।"

অতুলদা বললেন: "তা তো বটেই। তবে টপ ক'রে উত্তর দেওয়া যাকে বলে repartee জানো তো? তাতে এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ অবস্থা।"

—"কি রকম—বলুন না একটু।"

—"সে কি একটা দিলীপ যে বলব?" ব'লে একটু ভেবে বললেন: "হাঁ একটা মনে পড়ছে। তাঁর 'কর্ণবিমর্দ্দন কাহিনী'তে সংস্কৃত ছন্দে মনে আছে তো এক জায়গায় আছে 'না হইলে সম সঙিন অবস্থা, বাক্যে, বীরত্ব হি অতি সস্তা?'

আমি হেসে বললাম: "সেই কেরাণীর সাহেবকে ঘুষি মারা নিয়ে না?

'জানো না সে স্থানে একা—লাগে প্রথমত ভ্যাবাচ্যাকা
যখন পরাজয় খলু অনিবার্য্য—তখন কি যুদ্ধটি বুদ্ধির কার্য্য?
না হইলে সম সঙিন'—"

---

* অতুলপ্রসাদ বলতেন "চিত্ত"—দেশবন্ধুকে। কারণ তাঁরা ছিলেন খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু।

অতুলদা হেসে বললেন: "হাঁ হাঁ—ওখানে 'বীরত্ব হি অতি সত্তায়' 'হি' লিখলেন কেন দ্বিজুবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমরা ডাকাতে ক্লাবে। তাতে তিনি একটুও না ভেবে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বললেন: 'জানো না? ওটা হ'ল 'নিশ্চয়াত্মক অব্যয়'। তাঁর সে গম্ভীর মুখে 'নিশ্চয়াত্মক অব্যয়' শুনে ক্লাবশুদ্ধ লোক উঠল হো হো ক'রে হেসে।" আমিও খুব হাসলাম।

অতুলদা বললেন: "তাঁর আর এক মস্ত ক্ষমতা ছিল স্নবদের স্নাব করবার জানো তো? একদিনের কথা মনে পড়ে। গয়াতে একজন গয়ালি জমিদার ভারি চাল মারতেন তাঁর টাকার জোরে। চৌঘুড়ি হাঁকাতেন—পরতেন কানে কুণ্ডল গলায় সোণার মালা—গা জ্ব'লে যায় দেখলে। তিনি চা খেতেন না। একদিন আমাদের এক সিভিলিয়ান বন্ধু লোকেন পালিতের বাড়িতে দ্বিজুবাবুর হাসির গান হয়। দ্বিজুবাবু সিভিলিয়ান বন্ধুকে ইসারা করলেন চা আনতে গান গেয়েই:

অসার সংসার কে বা বলো কার দারা সুত বাপ মা,
এ অসার জগতে যাহা কিছু সার সে ঐ প্রাতের এক পেয়ালা চা।

তিনি বললেন জানো তো যে গানের আসরে চা হ'ল—ব'লেই এ গানটিও গেয়েছিলেন:

'যেন জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা, যেন নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি
আর গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম * আর টপ্পার সুরে হরিনাম।"

আমি হেসে বললাম: 'জানি, এরকম উপমা দিতেন তিনি কথায় কথায়। তারপর?"

অতুলদা বললেন: "এলেন তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা চা দেবী। দ্বিজুবাবু স্বহস্তে এক পেয়ালা চা ধরলেন সেই চালিয়াৎ জমিদার-পুঙ্গবের সামনে। তিনি মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললেন: 'আমি চা খাই না কলেক্টর সাহেব।' দ্বিজুবাবু টপ্ ক'রে চোখ কপালে তুলে বললেন: 'সে কি! কিন্তু আপনাকে যে প্রায়-ভদ্রলোকের মতন দেখাচ্ছে!!' এই প্রায় কথাটা তাঁর হাস্ত-গম্ভীর অর্থাৎ mock-grvityর টোনে এমন টেনে বললেন তিনি যে ঘরশুদ্ধ লোক হেসে লুটোপুটি।" (অথ পুনরায় অট্টহাস্য)।

আমি বললাম: "কিন্তু এ একটু প্র্যাক্‌টিকাল জোক মতন হ'য়ে গেল না কি?"

অতুলদা বললেন: "হাঁ তা হ'ল বটে, কিন্তু সবাই খুসি হ'য়েছিল সেই চাষাটার স্নাবিঙে। তাছাড়া জানোই তো তিনি প্রকৃতিতে কোন দিনই নিরীহপন্থী ছিলেন না। আর সব দোষ কেটে যেত—এমন টপ ক'রে দিতেন তিনি এসব বোড়ের চাল।"

আমি বললাম: "অতুলদা, তাঁর টপ ক'রে জবাব দেওয়ার আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয় কত লোকের কাছেই যে শুনেছি—স্বকর্ণেও কত যে—একটা ঘটনা বলি শুনুন—প্রসাদ দাস গোস্বামীর কাছে শোনা। সে সময়ে পিতৃদেব না কি ছিলেন মুঙেরে ডেপুটি। মাকে দেখতে এসেছিলেন মাতামহ (ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার)। সামনের গাছে ছিল এক হনুমান ব'সে। দাদামহাশয় মাকে ঠাট্টা ক'রে বললেন: 'সুরো—গাছে কে জানিস?' মা হেসে বললেন: 'কে?' দাদামহাশয় (বেহাই সম্পর্কে) বললেন: 'তোর শ্বশুর।' মা লজ্জিত হ'য়ে হেসে চুপ ক'রে রইলেন। দাদামহাশয় হেসে বললেন: 'চুপ ক'রে রইলি যে?' পিতৃদেব বললেন: 'আহা! একে মেয়ে তার ওপর ছেলেমানুষ, ওকে চুপ করানো ভারি বাহাদুরি। বলুন তো দেখি আমাকে: দ্বিজু, গাছে তোমার শ্বশুর—দেখুন জবাব দিতে পারি কি না?" শুনে অতুলদার সে কি হাসি।

অতুলদা প্রায়ই বলতেন: "তাঁর মধ্যে ছিল এমন unique sense of the grotesque—আর তাঁর ঐ অবলা তবলা ও ভাঙ * সুতরাঙের মিল—ওঃ হোঃ হোঃ হোঃ।"

সে কত কথা। কটা আর বলব বলুন। হাসির সে যুগ যেন অস্ত গেছে এ রেডিয়ো গ্রামোফোন হট্টগোলের আমলে।

অতুলদার রসিকতা সম্বন্ধে কিন্তু একটা কথা বলবার

* হাসির গান বা ত'রাবাইয়ে "আহা কিবা মানিয়েছে-রে" গান দ্রষ্টব্য।

* (আরো) অভ্যাস আমার দুবেলা বাজিয়ে বাজিয়ে তবলা
সকল সময়ে জ্ঞান থাকে না—তবলা কি অবলা। (আষাঢ়ে)
লিখে গেছেন পুরাণকর্ত্তা স্বয়ং ভোলা খেতেন ভাঙ
খেতেন না হয় ভোলা, কিম্বা পুরাণকর্ত্তাই সুতরাং। (হাসির গান)

আছে। যাকে বলে repartee তাতে রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের বা জগদিন্দ্রনাথের সমকক্ষ তিনি ছিলেন না। তাঁর বিশেষত্ব ছিল মজলিশে গল্প বলায়। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এখানে তাঁর মিল আছে। সুখের বিষয় শরৎচন্দ্র যে কতরকম মজলিসি গল্প জানেন সে পরিচয় আপনারাও জানেন, তিনি আজও জীবিত। আমি শুধু সাহিত্যের পাতায় পাতায় তাঁর অনুপম মৃদু হাসির কথা বলছি না, বলছি তাঁর নানা চটকদার রসাল গল্প বলার কথা। যেমন ধরুন এই গল্পটি তাঁর :

"আমাদের পণ্ডিত মশায়"—শরৎবাবু বলতেন মাঝে মাঝে আমাদের—"ছিলেন বড় ভয়তরাসে পাছে তাঁকে কেউ বলে তাঁর কোনো প্রেজুডিস আছে। 'পণ্ডিত মশায় সিগার খাও।' পণ্ডিত মশায় নাচার, খেতে বাধ্য—নইলে রটবে সিগারে তাঁর প্রেজুডিস আছে। 'পণ্ডিত মশায়, একটু পক্ষিমাংস।' একটু আমতা আমতা করে তাই সই। 'পণ্ডিত মশায়, একটু সোমরস।'—পণ্ডিত মশায় রেগে উঠবার মুখেই নিভে গেলেন। 'আচ্ছা দাও।' মুখ বিকৃত ক'রে এক ঢোঁক কোনমতে উদরস্থ। 'পণ্ডিত মশায় আর একটু।' —'না না আর না।' 'সে কি পণ্ডিত মশায়, এতেও প্রেজু—' পণ্ডিত মশায় আগুন হ'য়ে উঠে বললেন : 'হতভাগারা! মদে প্রেজুডিস নেই ব'লে কি মাতাল হওয়াতেও প্রেজুডিস থাকবে না?'"

শরৎচন্দ্রের কাছে এমন কত গল্পই যে শুনেছি। এ ধরণের লোক কিন্তু কই আর মেলে না তো আজকাল।

অতুলপ্রসাদের হাসির একটা খুব বড় দান ছিল কিন্তু শুধু গল্প বলবার ক্ষমতা নয়, গল্পবলাবার ক্ষমতা। শুধু হাসি দেওয়া নয় হাসি আদায় করতেও ছিলেন তিনি অতুলন। একটুও হাসতে যে জানে, হাসাতে যে জানে সে তাঁর উৎসাহে আদরে তার হাসির ডালিটি উজাড় ক'রে না দিয়েই পারত না—তা সে ডালি যত তুচ্ছই হোক না কেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পারিভাষিকে বলা চলে : তিনি ছিলেন হাসির কদরদান—পেট্রন—যেমন আমীর ওমরাও রাজারাজড়ারা ছিলেন—দরবারী আলাপীদের। ভালো শ্রোতা না পেলে যেমন গুণীর গুণপনার স্ফূর্তিলাভ হয় না, তেমনি বড় বোদ্ধা না মিললে রসিকের রসনা উধাও হ'য়ে ছোটার তাগিদ পায় না। কবি একথা প্রায়ই বলতেন অতুলপ্রসাদের হাসির দাবী সম্পর্কে। বলতেন : "বড় জিনিষ চাইতে শিখতে হয় অতুল, শিখতে হয়—এদেশের লোক এই কথাটাই প্রায় ভুলে গেছে, কিন্তু ওদেশের লোক (অর্থাৎ য়ুরোপে) সবাই জানে ও মানে। আমার কাছে ক'জন চায় বলো তোমাদের মতন এসব হাসি গল্প কাহিনী? চায় শুধু মৃত পত্নীর স্বর্গারোহণ সভার পিণ্ডদান, তেলের সার্টিফিকেট, মলমের প্রশংসা, আর বৈকুণ্ঠের খাতার সংশোধন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা।" (ঠিক এই কথাগুলিই নয় তবে এই মর্ম্মে বহুবার কবি আমার কাছে ক'রেছেন আক্ষেপ কত যে।...)

অতুলপ্রসাদকে যে দেখেনি, জানেনি সে কবির এ আক্ষেপ হয়ত সম্যক বুঝতে পারবে না। তার হয়ত মনে হবে যে আমি একটু বাড়িয়েই বলছি যে, চুম্বক যেমন অনাদৃত লৌহকণাকে টেনে আনে অতুলপ্রসাদ তেমনি প্রতি মানুষের কাছ থেকে টেনে আনতেন হাসি গান আনন্দ। একথা সত্যিই অত্যুক্তি নয় যে অক্সিজেনের আবহাওয়ায় যেমন আগুন জ্বলে বেশি তেজের সঙ্গে, অতুলপ্রসাদের আবহাওয়ায় তেমনি সরসতার স্ফুলিঙ্গও উঠত অগ্নিশিখা হ'য়ে; সামান্য বলিয়ে-ও হ'ত কথক, সামান্য গুণগুণিয়েও হ'ত গায়ক। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদকে শুধু গানের দিক থেকে নয়—সামাজিকতার দিক থেকেও বলা যায় একজন প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা—রসস্রষ্টা। কারণ তাঁদের সান্নিধ্য আপনা থেকেই ফুটিয়ে তুলত স্নিগ্ধ হাসিকে, জমাট আদরকে, প্রাণখোলা আলাপকে। আর এ তাঁরা পারতেন কতই না সহজে! "যে পারে সে আপনি পারে পারে সে ফুল ফোটাতে।" কত সত্যি কথা!

আর অতুলপ্রসাদ এ পারতেন—তাঁর মধ্যে জ্বলত ব'লে প্রাণোচ্ছলতার স্পর্শমণি, বইত ব'লে রসজাহ্নবী। প্রত্যেককেই সে-মণির সে-রসসুরধুনীর কল্লোলে উঠতেই হ'ত কমবেশী উদ্বেলিত হ'য়ে। জীবনের ছড়িয়ে-পড়া আলগা রং হাসি চাহনি—এককথায় নানা মানুষের মধ্যে নানান্ বিচ্ছিন্ন টুকরো সৃষ্টিদ্যুতি তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের বৈদ্যুতিকতায় উঠত স্বয়ংপ্রভ হ'য়ে, স্বয়ংসিদ্ধ হ'য়ে। তাই না যেখানেই তিনি যেতেন তাঁকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠত আনন্দমেলা, হর্ষহোলি।

গুণি! তোমার হাসির গানের নূপুর রসিকজনার প্রাণ টানি'
রচ্‌ত বাঁধন আনন্দজাল বুনি':
যেথায় যত কুহেলিকা তোমার পরশ-দান মানি'
জল্‌ত হ'য়ে জ্বলন্ত ফাল্গুনী!
যেথাই তুমি রইতে—তোমার রং সুরেলা মনখানি
দিশা-হারার হ'ত যে কাণ্ডারী:
রস বিনা যে হয় না জীবন স্বপ্ন-সরোজ সন্ধানী
বুঝিয়ে গেলে সুধার হে ভাণ্ডারি!
কয়জনা হায় হৃদ্‌মৃণালে সাজায় প্রেমের ফুলদানী?
বাদল করে কমলব্রত কালো:
তাই নীলিমা কণ্ঠে তোমার ঝঙ্কল 'অতুল'বাণী—
'প্রসাদে' যার আঁধার হ'ত আলো!

ইতি—
বশংবদ
শ্রীদিলীপকুমার রায়

না—দাবী

শ্রীকালীকৃষ্ণ সেনগুপ্ত এম-এ, বি-এস-সি,
এম-বি, ডি-টি-এম্

পৃথিবীর চলতি পথে
খেয়াল মতে চল্‌তে গিয়ে—
হে আমার মর্ম্মরমা,
নাই উপমা
তোমার দেখা পেলেম প্রিয়ে।
দেখে আর সাধ মেটেনা
চোখের দেনা
মুখের কথায় শোধ হবে কি?
না হ'লেও ছন্দে সুরে
দিন-দুপুরে
নেশার ঘোরে—স্বপ্ন দেখি।
জানি আর শোধ হবেনা
দেনার দেনা
সুদের সুদে বাড়্‌বে রাণী;
নেবে কি নিলাম ডেকে
গেলাম রেখে
এই না-দাবী পত্রখানি।

তিরিশ বৎসর পরে

শ্রীআশীষ গুপ্ত

সুমিত্রা,

তোমার চিঠি পেলাম। কত বছর পরে যে ওই অতিপ্রিয় হস্তাক্ষর আমার চোখে কাজল বুলালো!—সেই গোটা গোটা ঋজু লেখা, প্রতিটি অক্ষর স্পষ্ট, উজ্জ্বল,—সেই ছোট ছোট ইকার উকারের টান!

—সুমিত্রা, তোমার হাতের লেখা তেমনই সুন্দর আছে, তোমার পত্ররচনার ভঙ্গী আছে তেমনই মনোরম,—আজও আমার চিত্ত তাতে অভিভূত হয়, চোখে ঘনায় ঘোর, মন হয়ে ওঠে ছান্দসিক। অথচ আমার কাব্যের যুগ, মোহের যুগ বিগতকালের যুগ, তাতে আমার নেই দাবী, নেই অধিকার। সাতান্ন বছরের রণজিৎ লাহিড়ীর জীবনে কোন স্বপ্ন নেই এক সুমিত্রার স্বপ্ন ছাড়া, অথচ সেই সুমিত্রার সাগ্রহ আমন্ত্রণ রণজিৎ লাহিড়ী গ্রহণ করবে না, কিছুতেই করবে না, এ তুমি অবধারিত জেনো।

তুমি লিখেছ যে এর পূর্ব্বে আমার কাছে চিঠি লিখবার আকাঙ্ক্ষা তোমার মনে চিরকালই জাগরূক ছিল। সর্ব্বদা আগ্রহ ছিল আমার সঙ্গে দেখা করবার, কিন্তু শত চেষ্টাতেও জানতে পারনি আমার বাসস্থানের সংবাদ, সেই জন্যেই বাধ্য হ'য়ে ছিলে এতদিন চুপ করে।—এর জন্য আমি খুসী হ'য়ে উঠি এবং আরও বেশী পুলকিত হ'য়ে তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এই ভেবে যে, আমার সুমিত্রা বুদ্ধিমতী, আমার সুমিত্রার সুবিবেচনার অন্ত নেই,—তিরিশ বছর পরেও সে রণজিৎ লাহিড়ীর ঠিকানা অবগত হ'য়ে প্রথমে তাকে পত্র লিখে আমন্ত্রণ করেছে, তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য উতলা হ'য়ে একেবারেই হট্ করে' এসে হাজির হয়নি।

সুমিত্রা, কত যে কৃতজ্ঞ আমি তোমার কাছে তা বলতে পারিনে, কত বড় দুর্ভাগ্য থেকে যে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ তা হয়ত জান না তুমি নিজেই!

এই দুটো চোখ দিয়ে আমি আর তোমাকে কোনদিন দেখ্‌তে পাব না, জীবনে নয়, মৃত্যুতে নয়, অসংযত সুখের মলিনতায় নয়, সহিষ্ণু দুঃখের গৌরবে নয়, কোনদিন কোন পরিপার্শ্বে, কোনও ছলেই আর রণজিৎ লাহিড়ীর সহিত সুমিত্রা দেবীর সাক্ষাৎ সম্ভব নয়।

সুমিত্রা, তোমার রূপ কি এখন বেড়েছে? —তিরিশ বছর পূর্ব্বেও ত তুমি এমন কিছু আর অসামান্যা রূপসী ছিলে না।—কিন্তু তোমার সেই স্নিগ্ধ, শান্ত শ্রী কি প্রৌঢ়ত্বের সুষমায় মণ্ডিত হ'ল? অতিক্রান্ত যৌবনের একটি অপরূপ মাধুর্য্য আছে জানি, কিন্তু সে ত সবার জন্য নয়।—বাংলার পল্লীর ছায়াঘন প্রাঙ্গণ,—হয়ত আমাদের কল্পিত পল্লীর ছায়াঘন প্রাঙ্গণ,—যে প্রাঙ্গণ কল্যাণী বধূ স্বহস্তে পরিমার্জ্জিত করে, করে তাকে পরিচ্ছন্ন, করে তাকে পবিত্র, যেখানে সে সন্ধ্যালোকে তুলসীতলায় প্রদীপ দেয়, প্রণাম করে আকাশের সুদূরতম নক্ষত্রটিকে, সেই প্রাঙ্গণের প্রশান্তির সঙ্গে তুলনা করি প্রৌঢ়ত্বের মাধুর্য্যকে,—সে মাধুর্য্য স্বল্পের জন্য নির্দ্দিষ্ট। তুমি কি তাদের একজন? তোমার মাতৃমূর্ত্তি কি স্মরণ করিয়ে দেয় ইতালীয়ান শিল্পীদের ম্যাডোনার কথা?

না আজ তুমি পরিণত হ'য়েছ পুত্রকলত্রপরিবৃতা মাংসপিণ্ডরূপিনী বিশালকায়া গৃহিণীপদবাচ্যা নারীতে?—তোমার দেহ এবং মুখ কি আকারবিহীন বহুভুজে রূপান্তরিত হ'য়েছে? এবং তার চেয়েও যা অধিকতর বেদনার, তোমার মনের কি আজ আর কোনও চেহারা নেই?

কিন্তু হও তুমি ম্যাডোনা, হও তুমি নিরাকার মাংসপিণ্ড-তুল্যা রাউণ্ড মাইণ্ডেড্ পৌঢ়া,, কোনও দুঃখ থাক্‌বে না তাতে যদি আমার মনে তিরিশ বছর পূর্ব্বেকার আমার সুমিত্রা রাজরাণীর আসনে অধিষ্ঠিতা থাকে।

অথচ এ রাজরাণী আমার নিজের হাতে গড়া। নারায়ণ-

গঞ্জের সুরেন মুখার্জ্জির কনিষ্ঠা কন্যা বেথুন কলেজের সুমি মুখার্জ্জির সামান্য রূপ, সামান্য বুদ্ধি, অনসাধারণ মনের চারিদিকে কত কল্পনা, কত স্বপ্ন দিয়ে যে একে আমি গঠন করেছি তা আমি নিজেই জানিনে।

—সুমিত্রা, তুমি ছিলে এর প্রস্তাবনা এর সমাপ্তি না। সেই জন্যই তোমার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে পালাতে হ'ল, —মনে হ'ল কত সুলভ তুমি! কত অনায়াসেই যে আমার রাজরাণীকে পথের ভিখারিণী করে তোলা যায়।

ভাবলাম এক ঘরে ঘর কর্‌তে গেলে তোমার সামান্যতাকে আড়াল করে' রাখবার সকল মন্ত্র যাব বিস্মৃত হ'য়ে,—চিত্তের অপ্রসন্নতার আর সীমা থাক্‌বে না, বিরোধের পর বিরোধ জড় হ'য়ে উঠে সকল সত্য কল্পনাকে কর্‌বে আচ্ছন্ন, সকল শুভবুদ্ধিকে কর্‌বে মোহগ্রস্ত, স্বল্পকালের মধ্যে সর্ব্ব সম্পদ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে নিঃস্ব রিক্ত হ'য়ে যাব।

কিন্তু তোমাকে বেদনা দিলাম, এ দুঃখও আমার রইল। যেদিন চলে গেলাম তোমাদের ছেড়ে বহুদূরে সেদিনকার অনুভূতি এক অদ্ভুত বস্তু। গভীর বেদনা এবং বিপুল আনন্দ এমনতর পুঞ্জীভূত হ'য়ে রইল সমস্ত মন অধিকার করে' যে সাধারণ কোনও হিসাব-নিকাশের কথা নিমেষের তরেও স্মরণ হ'ল না। স্থির কর্‌লাম, এখানে থাকব না, এ দেশে থাকব না। চলে যাব দূরে বহুদূরে, পৃথিবীর শেষপ্রান্তে যাব উদয়াচলের পথে, যাব অস্তাচলের তীরে, যাব যেদিকে দু'চোখ যায়, যাব যেখানকার পথের প্রতি আমার দুর্নিবার আকর্ষণ! মর্ম্মন্তুদ বেদনা রইল তোমাকে ছেড়ে যাবার, কিন্তু তার সঙ্গে রইল আনন্দ তোমাকে অসামান্য মর্য্যাদাদানের। উল্লসিত হ'য়ে রইলাম এই কথা মনে করে যে সামান্যা সুমিত্রাকে আমি অনির্ব্বচনীয়া নারীতে রূপান্তরিত করে' গেলাম। কিন্তু নিভৃত হৃদয়ের ব্যথা এক বিষয়ে রইল অচঞ্চল হ'য়ে, সুমি হয়ত আহত হবে। কিন্তু সে ব্যথার তুলনায় ত্যাগের আনন্দ এত বেশী গভীর যে আমার এমনতর প্রারম্ভিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করার সম্ভাবনাও নিমেষের তরে মনে বারেক উদিত হ'ল না।

সুমিত্রা, তারপর কতদিন কতমাস কতবর্ষ কেটে গিয়েছে, সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছি, ভারতবর্ষে ফিরেছি তাই আজ তেরো বৎসর পরে,—আত্মীয়স্বজনদের নিষেধ ছিল তোমাকে আমার ঠিকানা জানাতে, জানিনে তুমি কি উপায়ে অবশেষে তা সংগ্রহ করেছ। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী আমি ঘুরে বেড়িয়েছি, এবং বেড়িয়েছি ভারতবর্ষেরও কুমারিকা হ'তে কাশ্মীর অবধি, ভামো হ'তে করাচী পর্য্যন্ত, কত দেশ বিদেশের নারী দেখলাম, পড়ল চোখে কত অলোকসামান্যা রূপসী, —একদিনও চিত্ত হয়নি মোহগ্রস্ত, একদিনও আকাঙ্ক্ষা হয়নি ঘর বাঁধবার, নিমেষের তরেও তোমার আলেখ্য হয়নি আচ্ছন্ন। তোমাকে ঘিরে আমার যে নন্দন কানন তার পারিজাত হ'ল না ম্লান, তার ঐশ্বর্য্য হ'ল না ধূল্যবলুণ্ঠিত। কি বিপুল প্রহর্ষেই যে সমস্ত জীবনটা কেটে গেল!

এ আনন্দের হেতু নারায়ণগঞ্জের সুরেন মুখার্জ্জির কনিষ্ঠা কন্যা রণজিৎ লাহিড়ীর একদাভাবী গৃহলক্ষ্মী বেথুন কলেজের সুমি মুখার্জ্জি নয়, এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই সুমিত্রা যাকে আমি রাজরাণী করেছি, জীবনের প্রতি পথে পথে যাকে দিয়েছি সম্রাজ্ঞীর অর্ঘ্য!

সুমিত্রা, তুমি বিবাহিতা নারী, তোমার আজকের কর্ত্তব্য স্ত্রীর কর্ত্তব্য, জননী, পিতামহী, মাতামহীর কর্ত্তব্য,—সে সব কর্ত্তব্যের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, সেই জন্যই তোমাকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে এই পত্রে আমি রিটায়ার্ড ইন্‌স্পেক্টার জেনারাল অভ্ রেজিষ্ট্রেশান মিঃ মোহিনীমোহন চ্যাটার্জ্জির পত্নী মিসেস সুমিত্রা চ্যাটার্জ্জি সম্বন্ধে কোনও উক্তি করিনি,—মিসেস চ্যাটার্জ্জিকে আমি চিনিনে, তার প্রেমে দিশেহারা হ'বার কথা আমার নয়। সুমিত্রা মুখার্জ্জি ছিল আমার ভালবাসার সামগ্রী,—বাইরের সেই সাধারণ মেয়ে মহিমময়ী হ'য়েছে আমার মনের আওতায়,—মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয়ই নেই, অন্তরঙ্গতা ত দূরের কথা!—কি ধার ধারে আমার সুমিত্রা মিসেস্ মোহিনী চ্যাটার্জ্জির!

ভাবছি তোমার পত্র পেয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে যাওয়ার চেয়ে বড় দুর্ঘটনা আমার জীবনে আর কিই বা ঘট্‌তে পার্‌ত। তুমি নমনীয়, তুমি কমনীয়, অতএব গড়ে পিটে তোমার মনের যা চেহারা বর্ত্তমানে দাঁড়িয়েছে, তাতে হয়ত তুমি আমাকে জ্যেঠামশাইও বল্‌তে পার! তিরিশ বছর পরে

দেখা হলে হয়ত প্রসন্নমুখে নিয়ে আসতে পার জলখাবার, তারপর হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তুমি মোহিনী চ্যাটার্জ্জির গৃহলক্ষ্মী মিসেস মোহিনী চ্যাটার্জ্জি চালাতে পার হয়ত অতীতকালের আলোচনা, তোমার প্রতি আমার প্রেমের দৃষ্টিগত স্থূল বর্ণনা!

জানিনে সামাজিক আবেষ্টনীর কারখানায় প্রস্তুত সুমিত্রা চ্যাটার্জ্জি আজ কোন্ শ্রেণীর জীব—কিন্তু এ আলোচনায় হয়ত তার ভ্যানিটি স্যাটিস্‌ফায়েড হবে, বিশেষ করে' যখন সে জানবে রণজিৎ লাহিড়ী তার পাণ্ডিত্যের জন্য ইউরোপ-বিখ্যাত, রণজিৎ লাহিড়ী দেশীয় রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি।—তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের এই যে ধারা, এ হ'ত নোংরা, অসুন্দর, ভালগ্যার। অতএব আর দেখা হ'ল না মিসেস চ্যাটার্জ্জি!

তোমার পত্র সংক্ষিপ্ত, নেই তাতে তোমার মনের বিশেষ কোন পরিচয়, অতএব জানিনে তোমার চিত্তের বর্ত্তমান গতির ইতিহাস। কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস যে যেদিন নিয়েছিলাম তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমাদের নিকট হ'তে বিদায়, সেদিনকার অন্তরের মূলধন তোমার অপচয়ের দ্বারা হ'য়ে গিয়েছে নিঃশেষ, হয় নি তা চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি। নেই তার অস্তিত্ব। এমন কি নেই তার গ্লানিও।—এই আমার বিশ্বাস, এরই জন্য আমার আন্তরিক কামনা। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি এমনিতরটিই যেন ঘটে থাকে।

কিন্তু আমার সহিত অসাক্ষাতের জন্য দুঃখ কোরো না সুমিত্রা।

আমি সুমিত্রা মুখার্জ্জিকে ভালবাসি, কিন্তু তোমার চিঠি আমি গ্রাহ্য করি নে। আজ যদি তুমি না খেতে পেয়ে মরে যাও, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হ'য়েও আমি তোমাকে কাণাকড়ি সাহায্য করব না। তোমার ছেলেদের চাকরীর জন্য আজ যদি তুমি লেখো তাহ'লে সে লেখা তোমার ঘরের দেয়ালটার দিকে চেয়ে বক্তৃতা দেওয়ার মত হবে। তোমার সুপারিশপত্র নিয়ে কোনও কাজের জন্য যদি কেউ আমার কাছে আসে তা হ'লে না পড়ে' ছিঁড়ব সেই চিঠি এবং বিনা পত্রপাঠে হ'বে সেই লোকের বিদায়। অথচ আমি আমার সৌজন্যের জন্য বিখ্যাত!

কিন্তু কি প্রয়োজন এত কথা লিখবার?—মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি তাঁর ঘর সংসার, স্বামী পুত্র কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা, নাতী, নাত্নী নিয়ে প্রচণ্ড গৌরবে ভূমণ্ডলে বিরাজ করুন,—শান্তি তাঁর অক্ষয় হ'ক, দীনহীন রণজিৎ লাহিড়ী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অসমর্থ। এতে যদি ত্রুটি কিছু ঘটে থাকে তাহ'লে মিসেস চ্যাটার্জ্জি যেন নিজগুণে মিঃ লাহিড়ীকে মার্জ্জনা করেন!—অতএব নমস্কার সুমিত্রা দেবী!—ইতি

বিনীত—

শ্রীরণজিৎ লাহিড়ী

শ্রীআশীষ গুপ্ত
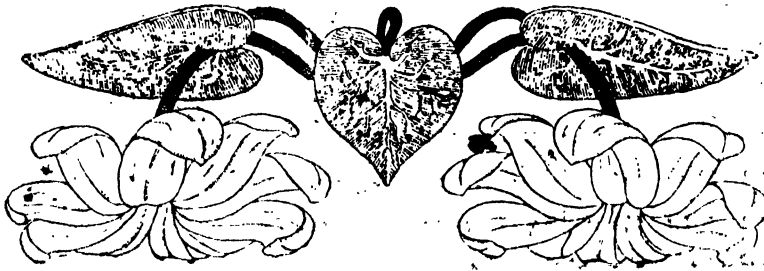
উপনিষদে ব্রহ্ম

শ্রীঅনিলবরণ রায়

বৈশাখ মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "উপনিষদের একটি চিন্তার ধারা যে এই পথে ('জগৎ মিথ্যা' এই দিকে) চলেছিল সে কথা খুবই সত্য। এবং সেই কারণে মায়াবাদ যে উপনিষদের মত নয় সে কথা বলা খুবই শক্ত হবে।" কোনও বিশেষ দার্শনিক মতবাদ উপনিষদের মত কি না তাহা বলা খুবই শক্ত হয়, কারণ উপনিষদ দার্শনিক মতবাদের গ্রন্থ নহে, বিচার বিশ্লেষণ করিয়া কোনও দার্শনিক 'চিন্তাধারা সেখানে পরিস্ফুট করা হয় নাই। উপনিষদের ঋষিগণ অধ্যাত্ম সাধনার ফলে সত্যকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আভাসে ও ইঙ্গিতে নানা রূপক ও উপমার সাহায্যে তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলেন—কারণ যাহা বচন মনের অতীত সাধারণ ভাষায় সুস্পষ্ট ভাবে তাহাকে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, শ্রোতা বা পাঠককে নিজের অনুভূতি উপলব্ধির দ্বারাই তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। মন বুদ্ধি দিয়া বিচার করিতে গেলে উপনিষদের কথাগুলি অনেক সময়েই দুর্বোধ্য ও পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়, এবং এই জন্যই এক উপনিষদকে প্রামাণ্য ধরিয়া ভারতে নানা দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। আমার "মায়াবাদ" প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি যে, মায়াবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে, এই মতটিও অধ্যাত্ম অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে সে অনুভূতি পূর্ণ ও সমগ্র নহে। অতএব অনুসন্ধান করিলে উপনিষদের মধ্যে যে মায়াবাদের সমর্থন পাওয়া যাইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই এবং আমিও তাহা অস্বীকার করি নাই। আমি আমার প্রবন্ধে শুধু ইহাই বলিয়াছি যে, শঙ্কর "মায়া" শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, বেদে বা উপনিষদে "মায়া" কোথাও সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বস্তুতঃ সেখানে "মায়া" শব্দের খুব কমই ব্যবহার হইয়াছে, "মায়াবাদ" ভারতের চিন্তাধারার উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে শঙ্করেরই প্রচারের ফলে।

এই জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা না হইলেও ইহা নীচের খেলা এবং এই অনিত্য ও দুঃখময় সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে মুক্তি লাভের সাধনা করাই কর্ত্তব্য—উপনিষদের মধ্যে এই শিক্ষা ক্রমশঃ স্পষ্ট ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে শেষের দিকে। ঈশা উপনিষদের ন্যায় প্রাচীন উপনিষদে আমরা জগতে থাকিয়া কর্ম্ম করিবার এবং জগৎকে ভোগ করিবার যে স্পষ্ট শিক্ষা পাই পরবর্ত্তী উপনিষদগুলিতে আর সেদিকে তেমন ঝোঁক থাকে না, কর্ম্মত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান এই গুলিকেই মানব জীবনের শ্রেয় বলিয়া প্রচার করা হয় এবং শঙ্করের মায়াবাদ ইহারই চরম পরিণতি। কিন্তু এই যে ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের আদর্শ, ইহা আর আধুনিক যুগের মানুষকে আকৃষ্ট করিতেছে না। যদি সমস্ত জগৎ দুঃখের মধ্যে পড়িয়া রহিল, তাহা হইলে নিজের মুক্তি লইয়া লাভ কি? "Better hell with the rest of our suffering brothers than a solitary salvation"—এইটিই আধুনিক যুগের মনোভাব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

বিশ্ব যদি ফিরে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
একা আমি বসে রব মুক্তি সমাধিতে?

আধুনিক যুগের মানুষের কাছে অন্তরাত্মার এই বাণী ক্রমশঃ বেশী বেশী পরিস্ফুট হইতেছে যে, পৃথিবীতে মানুষের জীবন মিথ্যা ও অর্থহীন নহে, মানবজাতির এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার আছে, মানুষের সৃষ্টির এক ভগবদ লক্ষ্য আছে, যাহা ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের বহু উর্দ্ধে। বেদে ব্যক্তিগত মুক্তিকেই চরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই; ব্যক্তিগত মুক্তিকে এক মহান জয়ের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে, অতিমানস সত্য ও আনন্দের শক্তিতে মানবজীবনকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিতে হইবে, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—ইহাই বেদের বাণী। উপনিষদ হইতে যদি আমরা এই বাণীর পূর্ণ সমর্থন না

পাই তাহা হইলে আমাদিগকে আমাদের অন্তরাত্মার ইঙ্গিত অনুসারে বেদের শিক্ষায় ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং নিজেদের অধ্যাত্ম সাধনার আলোকে সেই শিক্ষাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে।—কিন্তু উপনিষদ বিশেষ যুগ-প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কোনও এক বিশেষ দিকে ঝোঁক দিলেও, মানবজীবনের যে লক্ষ্যের কথা আমরা বলিতেছি, উপনিষদের মধ্যেই তাহার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়।

হিরণ্ময় উপনিষদে দুইটি চিন্তাধারার কথা বলিয়াছেন, একটি ধারা এই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। আর এক ধারা এই বিরোধের দুঃখ দ্বন্দ্বের জগতেই ব্রহ্মের পূর্ণতর প্রকাশ দেখিয়া ইহার রস উপলব্ধি করিতে চায়।—এই জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-পূর্ণ জগৎ ব্রহ্মের পূর্ণতর প্রকাশ, উপনিষদের চিন্তাধারার এরূপ ব্যাখ্যা নূতন বটে। এই জগৎ যে অপূর্ণ, দুঃখময় এবং এই দুঃখের যে অবসান করিতে হইবে, সে বিষয়ে ভারতীয় চিন্তাধারায় কোথাও দ্বিমত নাই, কিন্তু প্রতিকার কি তাহা লইয়াই মতভেদ। একটি মত এই যে, সংসারের দুঃখের কোনই প্রতিকার নাই, অতএব এই সংসার ছাড়িয়া যাওয়াই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। কিন্তু তাহা হইলে ভগবানের পক্ষে এই দুঃখময় জগৎ সৃষ্টির কোন অর্থই থাকে না। তাই বলিতে হইয়াছে জগৎ মিথ্যা, মায়া, ইহার কোন অস্তিত্বই নাই। অন্য মতে, জগৎ মিথ্যা নহে, ভগবান এক দিব্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই দুঃখময় জগতের অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহারা মধ্যে যে সব অনন্ত আনন্দের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে, তাহারই একটি বিকাশের জন্য তাঁহাকে এই অজ্ঞান ও দুঃখের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। জগৎ সত্য, জগতের দুঃখও সত্য, জগতের দুঃখকে জয় করিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য দিব্যানন্দের উপাদানে পরিণত করিতে হইবে, অমৃতত্বে পরিণত করিতে হইবে, ইহাই জগৎ লীলার অর্থ। ঈশা উপনিষদে আছে,

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

জগতে যে বহুর খেলা, দ্বন্দ্বের খেলা চলিতেছে এইটিকেই সত্য বলিয়া যাহারা এইটিকে লইয়া থাকিতে চায় তাহারা অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে। আবার যাহারা বলে একই সত্য, বহু মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা এবং সেজন্য জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায় তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে। বহুর মধ্যেই এককে দেখিতে হইবে, একের মধ্যে বহুকে দেখিতে হইবে, এবং এই জ্ঞানের সাহায্যে ক্ষুদ্র বাসনা কামনা ও অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া জগতের দুঃখরাশিকে নাশ করিতে হইবে, জরা ব্যাধি মৃত্যুকে জয় করিতে হইবে, অমৃতত্ব লাভ করিতে হইবে—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

কেন উপনিষদে দেবতাগণের যে জয়কে ব্রহ্মেরই জয় বলা হইয়াছে তাহা এই জয়, মন, প্রাণ, দেহের ক্রমবিকাশমান সিদ্ধির দ্বারা শুভ, সত্য, আনন্দ, জ্ঞান, শক্তি লাভ করা। বেদেও এই জয়ের কথা আছে। আধুনিক যুগের মানুষ অন্তর্দেবতার প্রেরণায় সংসারে থাকিয়া এই জয়েরই সাধনা করিতে চাহিতেছে।

"উপনিষদের ব্রহ্ম" প্রবন্ধে হিরণ্ময় প্রসঙ্গক্রমে এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন যাহা আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। কঠ উপনিষদে আছে ব্রহ্মলোক তাঁদেরই যাঁদের তপস্যা হল ব্রহ্মচর্য্য, যাঁদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। হিরণ্ময় বলিয়াছেন, "এখানে ব্রহ্মচর্য্য অর্থে আজকাল যা বুঝি তা যে কঠোপনিষদের ঋষির মনে কখনও স্থান পায় নি তা আমরা জোর করেই বলতে পারি।" ব্রহ্মচর্য্য বলিতে আজকাল বুঝায় ইন্দ্রিয়সংযম, আত্মসংযম, বিশেষতঃ sexual purity; হিরণ্ময় জোর করিয়া বলিতে চান যে ব্রহ্মলাভের জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা উপনিষদের ঋষিগণ স্বীকার করেন নাই, "তাঁদের একমাত্র এবং প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে উপলব্ধি করা, আর কিছুই নয়।"। হিরণ্ময়ের এই মত চমকপ্রদভাবে মৌলিক হইলেও ইহার মধ্যে কিছুমাত্র সত্য নাই। সত্যকে উপলব্ধি করা উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্যের সাধন মন, প্রাণ, দেহের সংযম ও শুদ্ধি—ইহাই উপনিষদের শিক্ষা, তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা (কেন উপনিষদ)। গীতায় ব্রহ্মচর্য্যকে বলা হইয়াছে শারীরিক তপস্যা। যাহার ভিতর বাহির শুদ্ধ নহে, যে ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করে নাই, প্রাকৃত ভোগ-বাসনাকে জয় করে নাই তাহার পক্ষে সত্য বা অমৃতত্ব লাভের

আশা দুরাশা। তাই উপনিষদের ঋষিদের কথা—দময়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শময়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা (তৈত্তিরীয়-১।৪)।

হিরণ্ময় বলিয়াছেন, "উপনিষদের যিনি ব্রহ্ম তিনি হলেন সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে এক, তিনি সমস্ত সৃষ্টির সমষ্টি। ইংরেজি দার্শনিক পরিভাষায় উপনিষদের বাদ হল Pantheistic বা সর্ব্ব ব্রহ্মবাদ।" উপনিষদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত পরিচয় আর কিছুই হইতে পারে না। ব্রহ্ম কোন কিছুর সমষ্টি নহেন, তিনি এক, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য, আপনাতে আপনি পূর্ণ। যত ব্রহ্মাণ্ডেরই সমষ্টি করা যাউক না কেন তাহা কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না, ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির কণামাত্র লইয়া সকল ব্রহ্মাণ্ড, ইহাই উপনিষদের শিক্ষা।

"ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছন", "এই সবই ব্রহ্ম"—এই সব উপনিষদের কথা হইতে বুঝায় না যে, ব্রহ্ম এই সবেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ *। সব জগৎ ব্রহ্ম, কিন্তু সব ব্রহ্ম জগৎ নহেন, ব্রহ্ম জগতের সহিত, সৃষ্টির সহিত একও নহেন। গীতার ভাষায়,—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ,

আমি আমার একাংশ মাত্র এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। ইংরেজী দর্শনের পরিভাষায় ইহা Pantheism নহে, কেহ কেহ এই বাদকে Panentheism নাম দিয়াছেন।

তাহার পর হিরণ্ময় বলিয়াছেন—"সকল কটি উপনিষদের সব কটি পাতা খুঁজেও কেউ বার করতে পারবেন না তাঁকে (ব্রহ্মকে) কোথাও শিব বা সুন্দর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্মকে তাঁরা নির্দ্দেশ করেছেন সত্য শিব সুন্দর বলে নয়, সত্য জ্ঞানময় এবং অনন্ত বলে।" তিনি যদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-খানির কয়েকটি পাতা উল্টাইয়া যান তাহা হইলে নিজেই দেখিতে পাইবেন,

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমতি॥

আরও একটি দৃষ্টান্ত,

জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, উপনিষদের ভাব প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী আমাদের হইতে বিভিন্ন ছিল। উপনিষদে ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; আমরা এখন সত্য, শিব, সুন্দর বলিতে যাহা বুঝি, তাহাই উপনিষদের সচ্চিদানন্দ। উপনিষদে বর্ণ, মধু, অমৃত, আনন্দ প্রভৃতি যে সব শব্দ ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে, সে সবই সত্য, শিব ও সুন্দরের জ্ঞাপক। সৌন্দর্য্য আনন্দেরই বাহ্য রূপ, ব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্ম রসো বৈ সঃ—যিনি রসময় তাঁহা অপেক্ষা আর সুন্দর কে? উপনিষদের দেবতাগণ ব্রহ্মেরই বিভিন্ন শক্তি, রূপ, aspects। ব্রহ্মের যে সৌন্দর্য্য ও আনন্দের দিক, সোম দেবতা তাহারই মূর্ত্তি। ঈশা উপনিষদে আছে,

তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। অতএব হিরণ্ময় যে বলিয়াছেন, "উপনিষদের ঋষিরা কোন দিন ব্রহ্মকে শিব ও সুন্দর রূপে নির্দ্দেশ করেন নাই, এ-কথা সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁহার যুক্তি এই যে, জগতে শিব ও অশিব, সুন্দর ও অসুন্দর দুইই রহিয়াছে, তখন ব্রহ্মকে শুধু শিব ও সুন্দর বলিলে তাঁর ব্যাপকতা কমে যায়, তিনি সীমার মধ্যে এসে পড়েন, তাই উপনিষদের ঋষি বলেন ব্রহ্মকে তোমরা সুন্দর কি অসুন্দর বোলো না, ভাল কি, মন্দ বোলে না, ব্রহ্মকে তোমরা বোলো কেবল সত্য।" কিন্তু হিরণ্ময়ের এই যুক্তি অনুসরণ করিলে ব্রহ্মকে সত্যও বলা চলে না, কারণ জগতে যেমন সত্য আছে তেমনি অসত্যও আছে। তিনি নিজেইত বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে দেখাইয়াছেন ব্রহ্ম দুই বিপরীত রূপ নিয়ে প্রকট হন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে সত্যং চানৃতং চ। প্রকৃত কথা এই যে, আমরা যাহাকে অশিব, অসুন্দর, অসত্য বলি তাহা শিব সুন্দর সত্য হইতে ভিন্ন বা বিপরীত কোনও জিনিষ নহে। অন্ধকার যেমন আলোকের অভাব মাত্র, সেইরূপ সত্য শিব সুন্দর ব্রহ্ম যেখানে নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন সেইখানেই হয় অসত্য অশিব অসুন্দরের আবির্ভাব। এই বিশ্বজগৎ ব্রহ্মের লুকোচুরি খেলা, তিনি নিজকে লুকাইয়া রাখিয়া নিজেই খুঁজিয়া বাহির করিতেছেন। মানুষের জীবনের লক্ষ্য হইতেছে তাহার সত্তার মধ্যে যে সত্য, শিব, সুন্দর, যে সচ্চিদানন্দ লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহাকেই পূর্ণভাবে প্রকট করা।

শ্রীঅনিলবরণ রায়

* অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার উপনিষদ সম্বন্ধে তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ ও সুচিন্তিত Hindu Mysticims নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"Yajnavalkya has emphasised the immanence and the transcedence of Atman. Atman is in all things. It is out of everything. Such contrariety occurs in almost all places of the Upanishads."

চিত্রকূটে *

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

'জয় সীতারাম'—
বনের চন্দনা টিয়া গায় অবিরাম ;
গিরিসঙ্কটের মুখে বারির আরসী বুকে
ধরেছে মুর্চ্ছিতা নদী,- 'মন্দাকিনী' নাম।

বাল্মীকি আশ্রম
দিব্যশঙ্খরবে শান্ত সমুদ্রের সম ;
অক্ষয় সে ছায়াবট মেলিছে অনন্ত জট,
রামনামাবলীঢাকা স্থাবর জঙ্গম।

নীলকান্ত-শির
বিন্ধ্যের 'কামদ শৃঙ্গে পূজার মন্দির ;
ভিতরে পশিলে তার স্থান-কাল-একাকার,
মুক্ত দ্বারে বাধা পায় সমস্ত বাহির।

নতি কর্ মন,
হোক্ চিত্তশতদলে রাম-পদার্পণ,—
অমর সে হনুমান্- ধারা-জলে করি' স্নান
পর চোখে রামময় রসের অঞ্জন।

চল্ পন্থা চিনে'
যোগীর আসন পাতা অমৃত-পুলিনে,—
ত্রেতার প্রহরী হেথা, ঘোষিছে মঙ্গল-কথা,
বাজে তা'র স্বরলিপি নিভৃত বিপিনে।

'গুপ্ত-গোদাবরী'
গুহামাঝে মুখরিত নিরুদ্ধ লহরী ;
ফল্গুরূপা গঙ্গা এসে 'রাম ত্রিবেণী'তে মেশে,
'অনসূয়া' তাপসীরে বরদান করি'।

এই সেই ঠাঁই,
এইদিকে গিয়াছেন রামরঘুরাই,-
কাঁধে ধনু, হাতে বাণ, পদব্রজে চলে' যান,
তরুরা লোটায় মাথা চরণ-ধূলায়।

পথের খবর
যারেই শুধান, সে-ই দেয় সদুত্তর;—
আছে কি ঠিকানা ঠাঁই, যেথা নাথ তুমি নাই ?
চিনিতে পেরেছি প্রভু পরম-সুন্দর !'

দণ্ডক-কানন,
ডাক দেয়, যাত্রাপথে পুষ্প-বরিষণ !
কোল কিরাতেরা এসে সেবা করে ভালোবেসে'
লক্ষ্মণ-সমান পায় রাম-আলিঙ্গন।

জানকী-সুন্দরী
শিশুতরুমূলে হেথা যাপেন শর্ব্বরী,
প্রবাসে পথের ঘরে কুশপত্রশয্যা'পরে
প্রিয়-বাহু-উপাধানে শিথিলকবরী।

* উত্তরপাড়া, 'রাম-মঠে' (কৃপাকুঞ্জ) সীতা-নবমী-উৎসবে পঠিত।

কবে এইখানে
সতীর সে পদাঙ্গুলে পক্কবিম্বজ্ঞানে
কাকচঞ্চু ঠুকরিল, রক্তরাগ ফেনাইল ?
আজো সেই রাঙা ছাপ বেদীর পাষাণে।

ফিরিল ভরত,
ক্ষুণ্নমনে ফিরে গেল রামশূন্যরথ !
পাদুকা বহিয়া শিরে পৌঁছিল সরযূতীরে
প্রজাহিতে নিল রাজ-সন্ন্যাসীর ব্রত।

জুড়াইল প্রাণ
গোঁসাই সে 'তুলসী'র রামলীলা-গান,
নরনারী খগমৃগে জাগাইয়া দিগে দিগে,
আকাশের রন্ধ্রে ভরে আকুতির তান।

আরতি-আলোকে
সাজালেন রামেশ্বরে চন্দন-তিলকে,—
বিগ্রহের ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠে থরথর,
আবাহনী গাহে কবি উচ্ছ্বসিত শ্লোকে !

শোন্ বসি ধ্যানে
যে-মৌন অনুচ্চারিত বাহিরের কানে,
রটে বাণী, 'যেথা কাম, সেথা কভু নাহি রাম,
অন্তরে রাবণ তোর বারণ না মানে।

'যুদ্ধ থামিল না,
এখনো ভোলায় তোরে সোনার খেলনা।
অন্ধের ভূমিকা নিয়ে আত্মহারা অভিনয়ে,
আলোকের ঢেউ লেগে চোখ ফুটিল না !

'সবহারা প্রেম
না বুঝিলি কত ঋজু, কত সে মহৎ।
অশ্রু নয় দুঃখময়, হরণ করে গো ভয়,
পিয়াসীকে দেখায় সে অজাত জগৎ।

'সবাকার চোখ
এ নব মুহূর্ত্তে তোর আপনার হোক্।
ক্ষুদ্র-খণ্ড-দরশন, হবে পূর্ণে সমাপন
মায়ামৃগ, সূর্পনখা রবে পলাতক।

'ত্যাগ করে' চল্,
ভোগ সে ছুটিবে পিছে রে ভোগ-পাগল।
বাড়াইলে ব্যগ্র হস্ত আনন্দ যাবে সে অস্ত,
নাগাল পাবি না তার অশান্ত-চঞ্চল।

সত্যঞ্জীব বীর
নবদূর্ব্বাদলশ্যামে নোয়াইয়া শির,
চল্‌রে দুর্গম লঙ্ঘি' ডাকিছে অজয়সঙ্গী,
নররূপে রাম রঘুবংশের মিহির।'

ব্রহ্ম-দ্বিখণ্ডিত
সীতারাম-পরসাদে শুদ্ধ হোক্ চিত,
পাবি রে করুণা তাঁর সকল-কুশল-সার,
অমিত যাঁহার ক্ষান্তি, আয় সন্তাপিত।

এই শুভক্ষণ,
সূর্য্য ঘড়ি শেষ বেলা করে নিরূপণ,—
জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে কে কে ?
সার্থক হয়েছে মন্ত্র-অজপা-সাধন।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

চার অধ্যায়

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল মৈত্র

শরীরে ব্যথার স্থানে হঠাৎ হাত পড়লে বেদনায় যেমন বিষিয়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম উপন্যাস চার অধ্যায় তেমনি সমাজের ব্যথার স্থানে আঘাত করেছে। সন্ত্রাসবাদ একটা বিশেষ সমস্যা এবং সে সমস্যা গোপন ক্ষতের মতই বেদনাদায়ক। এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হলেও এমন স্পষ্টতর ভাবে কেউ এ সমস্যার কেন্দ্র লক্ষ্য করে শরসন্ধান করেন নি।

চার অধ্যায়কে উপন্যাস না বলে উপন্যাসিকা বললে অধিকতর সুষ্ঠু হয়। মাত্র কয়টি চরিত্র ঘিরে এবং তাদের মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসিকাটি গড়ে উঠেছে। এবং নায়ক নায়িকা অতীন্দ্র এলার প্রেমলীলা এবং যে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন ভিত্তি করে এর সূচনা চার অধ্যায়ে তা বিবৃত হয়েছে।

প্রথমেই কবি আভাস দিয়েছেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনে সন্ত্রাসবাদের বিফলতা এবং সেই প্রসঙ্গেই তিনি লিখ্‌চেন—"সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোর তেতালার ঘরে একলা বসে ছিলাম—হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্ত্তার মধ্যে আমাদের সেই পুর্ব্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠ্‌লেন। চৌকাঠ পর্য্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বল্‌লেন, 'রবিবাবু আমার খুব পতন হয়েছে।'

বইটি শেষ পর্য্যন্ত পড়ে হঠাৎ পাঠকের সন্দেহ হতে পারে কবির চার অধ্যায় লেখার উদ্দেশ্য আধুনিককালে সন্ত্রাসবাদের যে সমস্যা উঠেছে তারি বিফলতা অতীন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা। উপাধ্যায় মহাশয়ের মত স্বদেশ প্রেমিক সন্ন্যাসী যখন "আমার খুব পতন হয়েছে বলে" নিজের জীবনে সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতা ব্যক্ত করলেন তখন সাধারণ পাঠক এ কথাটিকে খুব বড় করে দেখবে সন্দেহ নেই। কবি যেন ইচ্ছা করেই অতীন্দ্রের জীবনে সন্ত্রাসবাদের বিফলতা প্রমাণ করবার জন্যে উপাধ্যায় মহাশয়ের স্বীকারোক্তিকে ভূমিকাস্বরূপে গ্রহণ করেচেন।

সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন ও যে মনোভাবের পর ভিত্তি করে তার আবির্ভাব এ বইটিতে বিবৃত হয়েছে, ঠিক এ ধরণের বই বাংলা সাহিত্যে জুড়ি মিলবে কিনা সন্দেহ। গল্পাংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সহজ। প্রথমেই এলেন ইন্দ্রনাথ যিনি সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের করলেন গোড়াপত্তন, তারপর এলা যে দিয়েছে শক্তি, তারপর অতীন্দ্র যে প্রেমের হাওয়ায় কোথাকার মেঘ নিয়ে এল টেনে, তারপর বটু যে আন্‌লো ঝঞ্ঝা।

বইটি আগাগোড়াই একটা বিরাট ট্রাজেডি। যে কটি জীবন পরস্পরের আকর্ষণে কাছে এসেছিল অবশেষে কঠিন আঘাতে তারা হল বিচ্ছিন্ন। যে আন্দোলনকে ভিত্তি করে আগমন তাও একটা কঠিন ট্রাজেডিতে শেষ হয়েছে।

রাজনৈতিক দিকটা যেটা হচ্ছে বইটির background সে সম্বন্ধে পাঠকদের মধ্যে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। এবং এই দিকটা নিয়েই দেশের মধ্যে একটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। চার অধ্যায় সম্বন্ধে দু একটা সমালোচনা যা দেখেছি তাতে এই কথাটিই প্রকাশ যে কবি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মূলরহস্যকে ঠিক বুঝতে পারেন নি। নচেৎ তিনি এত বড় আঘাত কখনো করতে পারতেন না। অতীন্দ্র নামক চরিত্রের সৃষ্টি শুধু কবির স্বমনোভাব ব্যক্ত করবার জন্যে।

তবে এ কথা নিশ্চিত চার অধ্যায় কবির সন্ত্রাসবাদের একটা সুকঠিন প্রতিবাদ। এই প্রসঙ্গে নরনারীর সমস্যা, স্বদেশ সেবার সমস্যা, আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সমস্যা কবির মূলবক্তব্য অন্তু-এলা প্রেম কাহিনীকে আচ্ছন্ন করে অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। সেই হিসেবেই এ বইটিকে অনেকে ব্যর্থ বলেছেন।
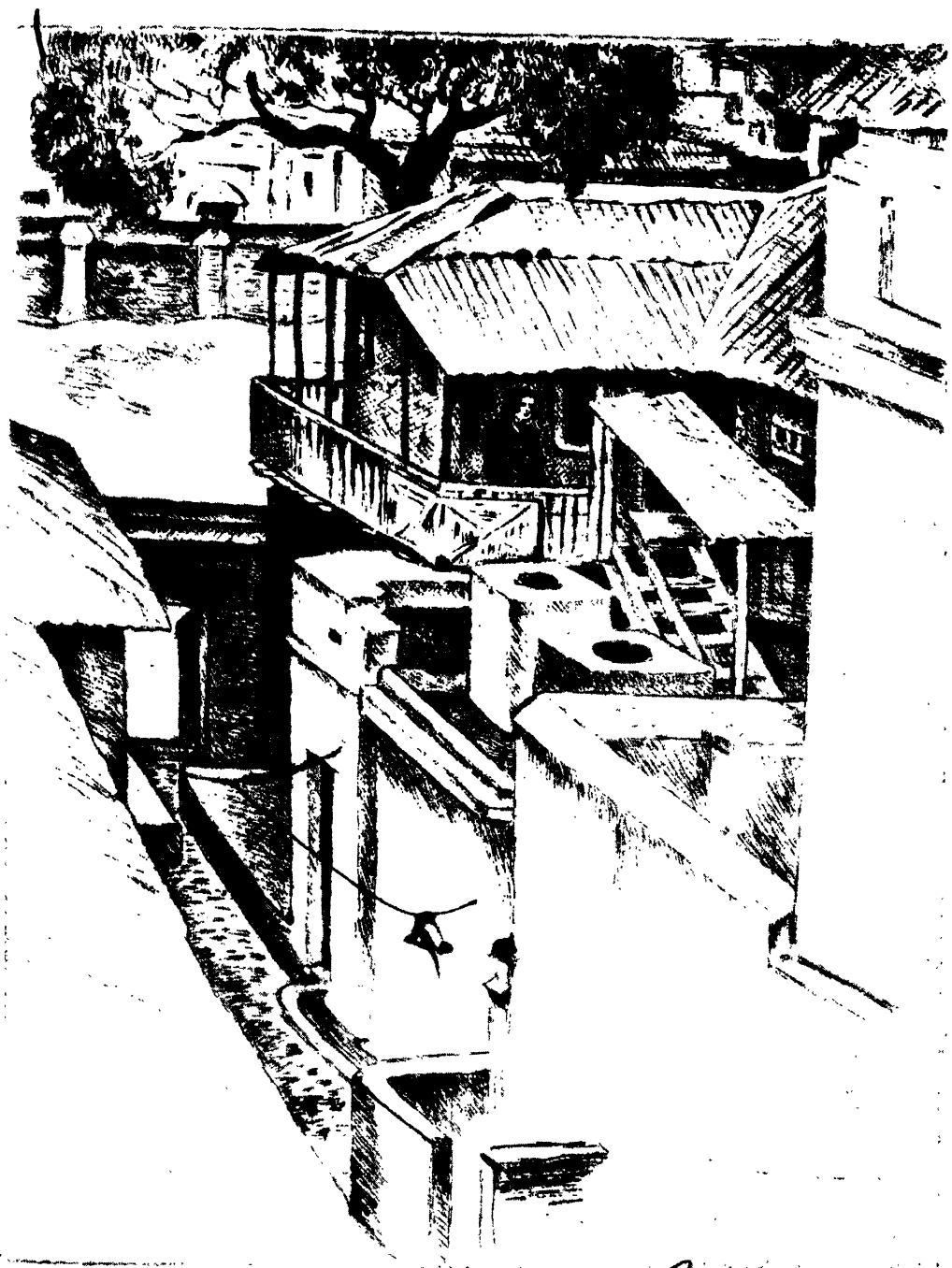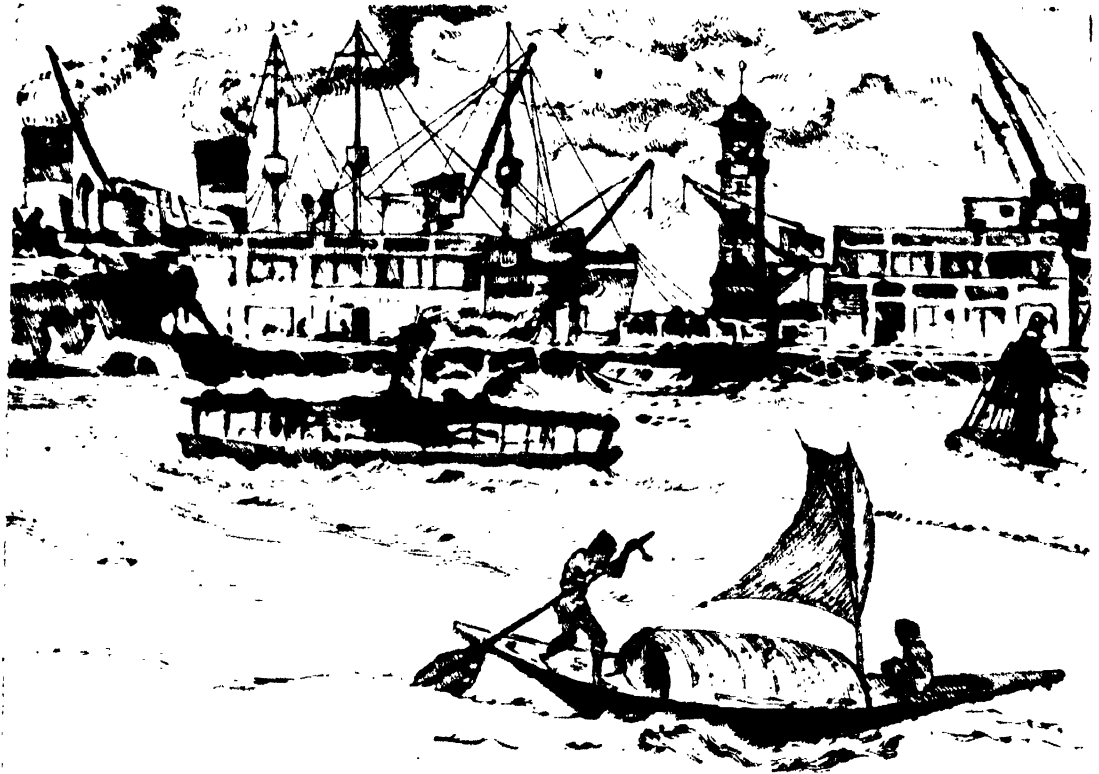
নগরীর একপ্রান্তে (এচিং)

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

খিদিরপুর ডক্ (এচিং)

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সমস্যা যে আধুনিক সাহিত্যে নেই তা নয়। বরং য়ুরোপীয় সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সমস্যা সাহিত্যই য়ুরোপের সাহিত্যপ্রাঙ্গণ জুড়ে রয়েছে। ইবসেন সমাজ-দ্রোহ প্রচার করছেন, টলষ্টয় মানবতার আহ্বান নিয়ে লোকশিক্ষা দিচ্ছেন আর বার্ণার্ড শ সোস্যালিজম্ প্রচার কাজে ব্যস্ত আছেন। পূর্ব্বেই বলেছি কবির মূলবক্তব্য আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে তার রাজনৈতিক মতবাদে। তাই বলে তিনি জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয়তাকে আক্রমণ করেছেন এ কথা প্রমাণ হয় না। দেশে কোন জাতীয় আন্দোলন উপস্থিত হলে সমসাময়িক লেখকের লেখায় তা প্রতিভাত হয়। কিন্তু যখনই দেখা গিয়েছে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তাঁর পুস্তকে সংস্কার বর্জ্জিত মন নিয়ে এই আন্দোলনের আভ্যন্তরিক ঘাত-প্রতিঘাত, বিকাশ ও পরিণতি, মহত্ব ও স্বার্থপরতা বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বিকশিত করতে চেয়েছেন তখনই দুটো দল গড়ে উঠেছে। কোনদলই তার মতবাদকে সহজে স্বীকার করতে চায় না। ঠিক এই কারণেই একদল পাঠক হাঁ হাঁ করে উঠেছেন। গোরা, ঘরেবাইরে, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী এই কারণেই দেশের মধ্যে ফেনিল আবর্ত্তের সৃষ্টি করেছিল।

টুর্গেনিভ যখন Fathers and Sons লেখেন তখন রাশিয়ায় Bazarov চরিত্র কেন্দ্র করে এক প্রবল আবর্ত্ত উঠেছিল। এই বইয়েই টুর্গেনিভ নিহিলিজমের আবির্ভাব দেখান। স্বাদেশিকেরা Bazarov চরিত্রকে তাদের ব্যঙ্গ চিত্র ভেবে উত্তপ্ত হয়ে উঠ্‌লো। অপর পক্ষও এই ভেবে চটেছিল যে টুর্গেনিভ নিহিলিজমের পর সহানুভূতি দেখিয়েছেন। "In Russia itself the effect of the story was astonishing. The portrait of Bazarov was immediately and angrily resented as a cold travesty. The portraits of the "backwoodsmen" or retired aristocrats fared no better. Turgenev had indeed roused the ire of both sides, only too surely."

চার অধ্যায় পড়ে অনেকের ধারণা কবি আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করেছেন। কবি তাঁর নির্ম্মুক্ত দৃষ্টিতে এ আন্দোলনকে যে ভাবে দেখেছেন ঠিক সেই ভাবেই তাকে অঙ্কিত করেছেন। অযথা তাকে কল্পনার বর্ণবাহুল্যে বিকৃত করে তোলেন নি। একদিক দিয়ে চার অধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে বিচিত্র বলা যেতে পারে। কারণ যে স্বপ্নালু ভাববোধ ও অন্ধগতিশীলতার অনুপ্রেরণায় এই সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি এবং তা থেকে যে বিকার বিকৃতি, দুর্জ্জয়তা, নিষ্ঠুর বাস্তববোধ, পাপ ও অন্যায়ের উৎপত্তি কবির রচনায় তা আপনার ভীষণতা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সমূহের মধ্যে চার অধ্যায় আরো এক কারণে বিচিত্রতর। গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ প্রভৃতি উপন্যাসের চরিত্রগুলির একটি বিস্তৃতি ও তার ক্রমিক সুপরিণতি আছে। কিন্তু চার অধ্যায়ের চরিত্রগুলি আকস্মিক ও বিদ্যুতের মত ক্ষণসঞ্চারী দীপ্তিশালী। ইন্দ্রনাথ, অতীন্দ্র, এলা সব চরিত্রই এক একটি বৃহৎ চরিত্রের খণ্ডাংশ।

উপন্যাসে প্রথম পুরুষ চরিত্র পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করে ইন্দ্রনাথ। তার অনমনীয় বীর্য্য ও রাজসিক দীপ্তি ও প্রভূত খ্যাতি এলার অন্তরে পূর্ব্ব থেকেই শ্রদ্ধার বীজ বপন করেছিল। তাই প্রথম পরিচয়ের যুগে যেন কত কালের পরিচয় এমন অসঙ্কোচ চিত্তে সে ইন্দ্রনাথকে নিজের পথ পরিচালক হিসেবে বলেছিল—"আমাকে আপনার কোন একটা কাজ দিতে পারেন না।"

ইন্দ্রনাথের ছিলো অসীম লোক আকৃষ্ট করবার ক্ষমতা। এক নিমেষে এলার মনের দুর্দ্দমগতিবেগ স্মরণ করে তার দুর্ব্বল স্থানে আঘাত দিয়ে বললেন—"তুমি নবযুগের দূতী, নব যুগের আহ্বান তোমার মধ্যে।"

ইন্দ্রনাথ বিলেতফেরত বৈজ্ঞানিক। বিদ্যার খ্যাতি তার অসামান্য। কিন্তু বিলেতে থাকতে কোন পোলিটিক্যাল বদনামীর সঙ্গে সাক্ষাতের দরুণ জীবনের গতি তার অন্যরকম হয়ে গেল। ইংলণ্ডের কোন বিজ্ঞান-আচার্য্যের বিশেষ সুপারিসে দেশীয় কোন কলেজে এক নিম্নতম পদ পেলেন। জীবনটা তার এমনি ভাবেই কেটে যেতে পারতো। কিন্তু গভীরতম তলদেশ থেকে যে নির্ঝর আপনার বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছে তাকে শিলা চাপা দিয়ে রাখা যাবে কেমন

করে? নির্ঝরিণী হয়ে সে বেয়ে চল্‌লো বহু জনচিত্তের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু সে ধারা হয়তো দুর্গম গিরির শিলাতলে অন্তঃসলিলা হতে পারতো যদি না ইন্দ্রনাথের চরিত্রে ও চেহারায় থাকতো একটা আকর্ষণ শক্তি। এরই জোরে বহুধারা তার সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে, তাকে বৃহত্তর করেছে ও গতিশীল করেছে। কবি নিজেই ইন্দ্রনাথের চরিত্রের অন্তর্নিহিত বিশেষত্বটা প্রকাশ করে দিয়েছেন। "ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণ শক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জ্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। মুখের ভাবে মাজা ঘসা ভদ্রতা, শান দেওয়া ছুরির মতো। কড়া কথা বল্‌তে বাধে না কিন্তু হেসে বলে; গলার সুর রাগের বেগেও চড়ে না, রাগ প্রকাশ পায় হাসিতে। যতটুকু পরিচ্ছন্নতায় মর্য্যাদা রক্ষা হয় ততটুকু কখনো ভোলে না এবং অতিক্রমও করে না। চুল অনতি-পরিমাণে ছাঁটা, যত্ন না করলেও এলোমেলো হবার আশঙ্কা নেই। মুখের রঙ্‌ বাদামী, লালের আভাস দেওয়া। ভুরুর উপর দুই পাশে প্রশস্ত টানা কপাল, দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সঙ্কল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব। অত্যন্ত দুঃসাধ্য রকমের দাবী সে অনায়াসে করতে পারে, জানে সেই দাবী সহজে অগ্রাহ্য হবে না। কেউ জানে তার বুদ্ধি অসামান্য, কেউ জানে তার শক্তি অলৌকিক। তার পরে কারো আছে সীমাহীন শ্রদ্ধা, কারো আছে অকারণ ভয়।"

ইন্দ্রনাথের চরিত্রে 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপের চরিত্রের কিছু ছাপ পাওয়া যেতে পারে। সন্দীপের চরিত্রেও ঠিক এই রকম সম্মোহন শক্তি ছিলো যার আকর্ষণে পড়ে বহু নরনারী তার উর্ণনাভ জালে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সন্দীপের মধ্যে দেখি একটা লালসার নগ্নমূর্ত্তি, একটা ক্ষুধার প্রচণ্ডতা, কিন্তু ইন্দ্রনাথের মধ্যে শুধু পৌরুষের দীপ্তি আর স্বভাবজয়ী মাধুর্য্য। চার অধ্যায়ে ইন্দ্রনাথের চরিত্রের সবখানি প্রকাশ নয় কিন্তু যেটুকু প্রকাশ সে টুকু হচ্ছে তার এই স্বভাবজেতা পৌরুষ। এরই জোরে সে আহ্বান করে সবাইকে ঝড়ের মধ্যে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের মধ্যে তাদের পালতোলা নৌকার মত ভাসিয়ে দেয়। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে তারা ভেসে চলুক। কেউ যে প্রাণের স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেতে পারবে না, ভয় খেয়ে বসে থাকবে ইন্দ্রনাথ এ সহ্য করতে পারে না। ইন্দ্রনাথ ঝড়ের প্রচণ্ডতাও বটে আবার বিদ্যুৎও। যেমন জোর, তেমন দীপ্তি। সে কাউকে ভয় করে না—কারো হুকুম মানে না।—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম।

ইন্দ্রনাথকে আমরা দেখেছি ভূমিকায় কিছু ও প্রথম অধ্যায়ে পূর্ণভাবে। এই দুইস্থানেই তার চরিত্রের মূল সুরের আরম্ভ বিকাশ ও পরিণতি। তারপর একবার চকিতে তাকে দেখেছি গুপ্তস্থানে টর্চ্চহাতে, অতীন্দ্রের প্রস্থানের পর যখন এলা আসন্ন বিপদ ও বিরহের মূর্চ্ছনায় পাণ্ডুর সেই সময়। তারপর আর ইন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ নেই।

অতীন্দ্রের চরিত্রে প্রথম থেকেই কেমন একটা আক-স্মিকতা। এলা যে তাকে ভালবেসেছে, এ আমরা ইন্দ্রনাথের মুখে চায়ের দোকানেই পেয়েছি। তারপর তার আবির্ভাব এলার ঘরে দমকা হাওয়ার মতো। অতীন্দ্রের মুখেই শুন্‌লেম তার প্রেমের নবোন্মেষের ইতিহাস। দেশপ্রেমের অন্ধ ভাবালুতার মধ্যে নারীপ্রেমের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল উত্তরোত্তর তাই ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে বনস্পতি হয়ে উঠ্‌লো। চার অধ্যায়কে যারা মুখ্যরাজনৈতিক বই হিসেবে বিচার করছিলেন তারা দ্বিতীয় অধ্যায়ে অস্ত এলার প্রেমলীলার মাধুর্য্য উপলব্ধি করে বইটির নিহিতার্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাবেন।

অতীন্দ্রের চরিত্রে ইন্দ্রনাথের মত পৌরুষের প্রচণ্ডতা নেই বটে কিন্তু গতিশীলতা আছে। এই কারণেই অতীন্দ্রের জীবনে রাজনৈতিক অধ্যায়টা মুখ্য নয় ওটা বাহুল্য। এলার প্রেমের টানে সে চলে এসেছিল এই দিকে। এলার প্রেমই তাকে দুর্গম পথে নাবিয়েছে। অতীন্দ্র নিজেই সে কথা বল্‌চে—

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্ব্বনাশ।

প্রথম প্রেমের ভাবপ্রবণতা, স্বপ্নমদিরতা ও প্রাণোচ্ছলতা যখন অতীন্দ্রকে দুর্গম পথযাত্রী করেছিল একদা সহসা আঘাত খেয়ে ফিরে চেয়ে দেখে যে পথ ধরে সে এসেছে সেটা তার প্রার্থিত পথ নয়: অথচ এতদূর সে এগিয়েচে যে তারপর আর ফেরবারও উপায় নেই। সে নিজেই বল্‌চে—"আজ যে পথে এসে পড়েছি এ পথ ক্ষুরধারের মত সঙ্কীর্ণ, এখানে দু'জনে পাশাপাশি চলবার জায়গা নেই।"

বস্তুতঃ অতীন্দ্রের পথ এ নয়। সে সাহিত্যিক। সাধারণ মানুষের চেয়ে তার মন তরল। তীক্ষ্ণ বস্তুগত দৃষ্টি তার নয়। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে সে সাহিত্যলোকে প্রবেশ করেছিল, দেখেছিল—"কালের সেই আবর্জ্জনারাশির সর্ব্বোচ্চে অটল বাণীর সিংহাসন। সেই সিংহাসনের পায়ের কাছে যুগ যুগান্তরের তরঙ্গ পড়চে লুটিয়ে লুটিয়ে। কতদিন কল্পনা করেচি সেই সিংহাসনের সোনার স্তম্ভে অলঙ্কার রচনা করবার ভার নিয়ে এসেছি।" তারপর অতীন্দ্রের সেই কল্পনাই অভিসারিকা হল সাহিত্যের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে প্রেমলোকের দিকে। সে পথ সরল নয়, জ্যোতির্লোকের দীপ্তিতে উদ্ভাসিতও নয়। প্রচলিত পথ ছেড়ে মরীয়া হয়ে জীবন পণ করেছিল বাঁকা পথে। এতেই এলা হয়েছিল মুগ্ধ।

অতীন্দ্রের কাছে রাজনৈতিক জীবন কাম্য ছিল না। সে চেয়েছিল প্রেম ও শান্তি, সে চেয়েছিল তৃপ্তি ও দীপ্তি। সে চেয়েছিল একখানি ছায়াস্নিগ্ধ নির্জ্জন গৃহনীড়। এ সুখ তাকে একমাত্র দিতে পারতো এলা এবং সেই লোভেই সে মরীচিকার পেছনে ছুটেছিল। তারপর যখন তার প্রেম প্রত্যাখান করে এলা তাকে দেশের কাজের মধ্যে আত্মদান করতে আহ্বান করলো তখন তার নেশা গেল ছুটে। তীব্র আঘাতের বেদনায় বিবর্ণ হয়ে সেও এলাকে আঘাত দিয়ে বল্‌লে—"দেশের কাছেই হোক আর যার কাছেই হোক তুমি আমাকে সঁপে দেওয়ার কে? তুমি সঁপে দিতে পারতে মাধুর্য্যের দান যা তোমার যথার্থ আপনার সামগ্রী, নারীর মহিমায় অন্তরের ঐশ্বর্য্য যা তুমি দিতে পারতে তা সরিয়ে নিয়ে তুমি বল্‌ছ—দেশকে দিলে আমার হাতে। পারো না দিতে, পারো না, কেউ পারে না। দেশ নিয়ে এক হাত থেকে আর এক হাতে নাড়ানাড়ি চলে না।"

অতীন্দ্রের জীবন একটা নির্ম্মম ট্রাজেডি। ভাগ্যবিধাতা তার জীবন আরম্ভে অলক্ষ্য থেকে হেসেছিলেন, সোজাপথে চল্‌তে চল্‌তে ভুলপথে তার জীবন চালিত হলো—তার পরিণতিতেই ট্রাজেডির সমাপ্তি।

এলা চার অধ্যায়ের নায়িকা। সাধারণ বাঙালী মেয়ের মতো ওর মন সে রকম নমনশীল নয়। প্রথম থেকেই সে বিদ্রোহী। বাল্যকালেই নিজের প্রবলা মায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও কখন ও ভয় পায়নি, তার স্বাধীন মনোবৃত্তির জন্যে। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই নিজের জীবনের গতি সে নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছিল। "তুমি নব যুগের দূতী, নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে"—ইন্দ্রনাথের একটী কথাতেই তার জীবনে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছিল। তারপর এলার জীবনে এলো অতীন্দ্র! কঠিন তেজস্বী মনের মধ্যে প্রেম কোন্ ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে সযত্নে রাজ্যপাট বসিয়েছিল, সে নিজেই টের পায়নি। একদিকে তার দেশের কর্ত্তব্যের টান আর একদিকে প্রেমের আকর্ষণ। কিন্তু দেশের আকর্ষণই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। এলার ভয় ছিলো সাধারণ মেয়ের মতো স্ত্রী হয়ে পুরুষের পবিত্র সাধনার ক্ষেত্রকে করবে কলুষিত। লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে না দিয়ে তাকে ছোট করে রাখাই হলো মেয়েদের কাজ এই ছিলো এলার ধারণা। এই কারণেই সে নিজে বিবাহ করতে চায়নি, দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল। তারপর সহসা একদিন অতীন্দ্রের কাছে আঘাত খেয়ে যখন প্রকৃত মূর্ত্তি নিজের উদ্ঘাটিত হয়ে পড়লো তখনই সে অতীন্দ্রের পায়ের নীচে মাথা লুটিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে তার হাতে সমর্পণ করে বল্‌লে—"নাও—এই নাও, এই নাও।"

কিন্তু তখন আর ফেরবার উপায় নেই। অতীন্দ্র তখন কর্ত্তব্যের রঙ্গভূমিতে দাঁড়িয়ে নাটকের চতুর্থ অঙ্কে এসে পৌছেচে। এর পর মৃত্যু ছাড়া আর উপায় নেই।

এলার চরিত্রে প্রেম ও কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্বই সকলের চেয়ে প্রবল। কর্ত্তব্যের অনলে তার প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা হয়েছে। অবশেষে কর্ত্তব্য যখন পরাস্ত হয়ে তার অন্তরে সুপ্ত নারীধর্ম্ম জেগে উঠ্‌লো তখনই হলো তার প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি।

চার অধ্যায়ে এই তিনটেই হল প্রধান চরিত্র। এ ব্যতীত আরো দুই একটি চরিত্র আছে যারা শরীরে হাত পায়ের মত অঙ্গ নয় কিন্তু আঙ্গুলের মত অপরিহার্য্য। যেমন ধরা যাক বটু। অতীন্দ্র আর বটু ছিলো এক পথের পথিক। বটু হচ্ছে সেই ধরণের মানুষ যাদের অন্তরে পৌরুষের ঔদার্য্য নেই আছে লালসার নীচতা। এলাকে সে কামনা করেছিল কিন্তু পায়নি। এরই ফলে সে অতীন্দ্রকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল তার কামনার পথ থেকে। এলা বটুকে সম্পূর্ণভাবে বুঝ্‌তে পেরেছিল এবং তার চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছিল—"ওর একটা ভিতরকার চেহারা দেখ্‌তে পাই কুৎসিত অক্টোপাস জন্তুর মতো মনে হয় ও আপনার অন্তর থেকে আটটা চটচটে পা বের করে আমাকে একদিন অসম্মানে ঘিরে ফেল্‌বে এই চক্রান্ত করচে।"

যারা মনে দুর্ব্বল তাদের কার্য্যসিদ্ধি গোপনতায়। বটু দুর্ব্বল বলেই অতীন্দ্রের পৌরুষকে চিরদিন ভয় করে এসেছে এবং তার লালসা কামনা চরিতার্থ করবার জন্যে অন্যায় ভাবে তাকে সরিয়ে নিতে চেয়েছে। অতীন্দ্র-এলার জীবন-ট্রাজেডির ইন্ধন জুগিয়েছে এই বটু।

পূর্ব্বেই বলেছি বইখানিকে উপন্যাস না বলে উপন্যাসিকা বলা শ্রেয়। উপন্যাসের কথা বিস্তৃতি, ছোট গল্পের প্রধান কথা এককেন্দ্রীভাব। উপন্যাসের প্রাণ গল্প ও মনোবিকলনে, গল্পের প্রাণ চমৎকারিতায় ও একত্বে। চার অধ্যায়ে গল্প উপন্যাস উভয়েরই উপাদান রয়েছে। বিস্তৃতি নেই কিন্তু ভাবের একত্ব রয়েছে আবার মনোবিকলন রয়েছে কিন্তু এক-কেন্দ্রীভাব নেই। শুধু তাই নয়, এতে নাটকের উপাদানও যথেষ্ট। বিরোধজনিত দ্বন্দ্বই নাটকের মূলকথা। দুপক্ষে দুটী দল থাকে তাদের স্বার্থসংঘাতেই নাটকের সাফল্য নির্ভর করে। একদিকে অতীন্দ্র অপরদিকে বটু, অপর দিকে প্রেম অপর দিকে কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব এই উভয় দ্বন্দ্বেই নাটকীয় রূপটী পরিস্ফুট হয়েছে।

বহুদিক দিয়েই চার অধ্যায় বিচিত্রতর। চার অধ্যায় রবীন্দ্রপ্রতিভার আর একটি গোপন অধ্যায়। যে নূতন ধারা তিনি বাংলা উপন্যাসে প্রবর্ত্তন করলেন সাহিত্য রসিকেরা অবশ্য একারণে আনন্দিত হবেন।

কবির রাজনৈতিক মতামত নিয়ে আমি আলোচনা করিনি। তবুও একথা সত্য যে রাজনৈতিক মতে উপন্যাসিকটি আচ্ছন্ন হলেও অন্তু এলার প্রেমকাহিনী এর মূল বক্তব্য। ফল্গুনদীর ওপরে ধূসর বালুকা বিস্তার হলেও সে নদী। বহু জনের তৃষ্ণা নিবারিত হচ্ছে সেই বালুকা থেকে জল সিঞ্চন করে। পাঠকের তৃষ্ণা যদি চার অধ্যায়ের অন্তঃসলিলা অন্তু এলার প্রেমরস ধারা নিবারিত করতে পারে তবেই বোঝা যাবে পাঠকের বৈদগ্ধ্য।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল মৈত্র

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

আধুনিক সিনেমার একটা দিক

যাহার ভাল করিবার শক্তি অসীম, অপব্যবহার হইলে, তাহার মন্দ ফলও সীমা অতিক্রম করিতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে যে শক্তি, সম্পদ ও সুখ সুবিধার অধিকারী করিয়াছে, তাহা আরও বহু শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে পারিত যদি মানুষের স্বার্থবুদ্ধি ও লোভ ইহাকে নরহত্যা ও তাহারই অপরিহার্য্য অন্যতম রূপ, মানুষের হাত হইতে আত্মরক্ষার কার্য্যে প্রধানতঃ নিযুক্ত না রাখিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা সত্য, ইহার প্রতি বিভাগ, উপবিভাগ এবং মানুষের সকল শক্তি সম্বন্ধেই তাহা অল্পাধিক পরিমাণে সত্য।

শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তারে, মানুষকে আনন্দদানে এবং রসের পরিবেশনে চলচ্চিত্রের বিশেষ করিয়া সবাক চলচ্চিত্রের অপরিসীম সম্ভাব্যতা রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাভাবে মানুষের জ্ঞানদান কার্য্যে নানাদেশে বিশেষ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ায় ইহাকে নিয়োগ করা হইতেছে। আমাদের দেশেও ছায়াচিত্রকে শিক্ষা ও প্রচারের কার্য্যে কিছু কিছু লাগান হইতেছে। অবশ্য এদেশের জন-সাধারণের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য বাঁচিবার পক্ষে অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি বুঝাইবার পক্ষে ইহার, বিশেষ করিয়া উন্নত ধরণের সবাক চিত্রের যে বিপুল উপযোগিতা ছিল, তাহাকে এখনও কাজে লাগাইবার চেষ্টা করা হয় নাই, এবং আজও ইহা বিশেষ ভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেও সমর্থ হয় নাই।

কিন্তু, ইহার মানুষকে আনন্দ দান করিবার যে শক্তি আছে, আমাদের মনের গল্প শুনিবার, মানুষের জীবনেতিহাস জানিবার অদম্য কৌতূহলকে কতকটা বাস্তব রূপের মধ্যে পরিতৃপ্ত করিবার যে অভাবনীয় সুযোগ ইহার আছে, তাহাকে মানুষের বণিকবৃত্তি সহজেই কাজে লাগাইয়াছে।

আমাদের বৈচিত্র্যহীন প্রাত্যহিক জীবনের পশ্চাতে দুঃসাহসিক কার্য্যের, দুঃসাধ্য প্রচেষ্টার, মধুর রোমান্সের যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আছে, চলচ্চিত্রের মধ্যে তাহার একটা কাল্পনিক পরিতৃপ্তির সহজ ও সস্তা উপায় আছে বলিয়া জনসাধারণের বিশেষ করিয়া যুবক সাধারণের উপর ইহার প্রভাব বিশেষ শক্তিশালী। ইহার প্রভাব গভীর ও শক্তিশালী বলিয়াই, ইহার অপব্যবহারও মারাত্মক।

যে সকল কারণে চলচ্চিত্রের উপর লোকের আকর্ষণের কথা বলা হইল, কাব্যের উপর গল্পের উপর চিত্রের উপর এবং অন্যান্য আর্টের সৃষ্টির উপরও লোকের আকর্ষণ প্রধানতঃ সেই সকল কারণে। যাহা মানুষের এই সকল আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করিতে পারে, মাত্র তাহাকে আশ্রয় করিয়াই আর্টের সৃষ্টি হইতে পারে। পারিপার্শ্বিক ও বাস্তবের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যে বাণী অকথিত থাকিয়া যায়, যে রূপাতীত অলক্ষ থাকিয়া যায়, আভাষ ইঙ্গিত এবং দ্যোতনার মধ্যে যাহা সেই অব্যক্ত ও রূপাতীতকে প্রকাশ করিতে পারে তাহা আর্টের পর্য্যায়ভুক্ত হয়। এইদিক দিয়া চলচ্চিত্রের মধ্যে আর্টের বিকাশের প্রশস্ত এবং অনুকূল ক্ষেত্র আছে। শিল্পীরা এই সুযোগকে গ্রহণ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহাতে মানুষের আনন্দ ও রসোপলব্ধির ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে।

কিন্তু এখানে শিল্পীদের একটা বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আর্ট সর্ব্বক্ষেত্রেই শিল্পীর ব্যক্তিগত সাধনার বিষয়; অবশ্য আবার সর্ব্বক্ষেত্রেই, অর্থের জন্য জনপ্রিয়তার জন্য শিল্পীকে কিছু পরিমাণে আত্মবিক্রয় করিতে হইতে

পারে। তবুও শিল্পীর সৃষ্টির সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য সব সময়েই একদল সমঝদার চাই। ইঁহাদেরই সূক্ষ্ম ও পরিমার্জ্জিত অনুভূতি শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখে। কিন্তু, আর্টের এই সূক্ষ্মতাকে একটা স্থূল প্রতিষ্ঠাভূমির উপর দাঁড়াইতে হয়। আর্টকে ক্ষুন্ন করিয়া এই প্রতিষ্ঠা-ভূমিকে বড় করিয়া তুলা যাইতে পারে, এবং এই অপ-ব্যবহারের মধ্য দিয়াই আর্ট সমঝদার মণ্ডলীর বাহিরে গিয়া জনসাধারণের বিকৃত রুচির খোরাক যোগাইয়া তাহাকে বাড়াইয়া তুলিতে পারে। শিল্পীদের ব্যক্তিগত সাধনার শক্তিই আর্টকে এই দুর্গতি হইতে রক্ষা করে। শ্রেষ্ঠ শিল্পী অবিমিশ্র উচ্চাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আভিজাত্যকে বাঁচাইতে পারেন।

কিন্তু, নানা কারণে সিনেমাকে সংঘবদ্ধ ধনবলের অধীন হইতে হইয়াছে। তাহার সকল কারণের বিস্তৃত আলোচনা অবশ্য এখানে সম্ভব নহে। তবে লোকরঞ্জনের অদ্ভুত ক্ষমতাই ইহাকে যে প্রধানতঃ ধনশালী এবং ধনলিপ্সু ব্যবসায়ীদের করতলগত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বিপুল ধনবলের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, বহুজনের বিকৃত রুচির উচ্চ দাবী যাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সমাজের কল্যাণকার্য্যে, সৃষ্টির আনন্দে, সৃষ্টির কার্য্যে মানবসমাজকে শ্রেষ্ঠতর ও সমৃদ্ধতর করিবার কার্য্যে তাহাকে নিয়োগ করিবার সম্ভাবনা দূর-পরাহত। এখানে শিল্পীদের ব্যক্তিগত চেষ্টার ক্ষেত্র বিশেষ ভাবে সংকীর্ণ। কোনও শিল্পীর বিশেষ আভিজাত্য থাকিলেও, অনেকের সমবায়ে সৃষ্টিকার্য্য সমাধা হয় বলিয়া এখানে অবিমিশ্র উৎকর্ষের সম্ভাবনা কম। কাজেই, ভাল শিল্পী থাকিলেও, শিল্পামোদীরা খুব উচুঁদরের আর্টকে বিশুদ্ধভাবে পাইতে পারেন না।

এতদ্ব্যতীত সব আর্টের যে স্থূল প্রতিষ্ঠাভূমির কথা এবং তাহার অপব্যবহারের ফলে আর্টের যে অধোগতির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আলোচ্য ক্ষেত্রে তাহারও আবার একটু বিশিষ্টতা আছে। অন্যান্য অনেক উঁচুদরের আর্ট বুঝিবার জন্য শিক্ষিত সমঝদারমণ্ডলীর দরকার হয়, কিন্তু এখানে কলাকৌশলের উৎকর্ষ অনেকটা সাধারণ লোকের অধিগম্য। আবার আর্টের ভিত্তিভূত প্রতিষ্ঠাভূমিও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে আর্টের প্রতিষ্ঠাভূমি বলিয়াই মূল্যবান তাহা নহে, তাহার (অর্থাৎ মূল গল্পাংশের) নিজস্ব একটা মূল্য ও আকর্ষণ সমঝদার ও সাধারণ সকল লোকের নিকটই আছে। এই জন্য দর্শকদের অনেকটা অজ্ঞাতে এবং অলক্ষিতে আর্টের গৌণ অংশ মুখ্য অংশকে পরাভূত করিয়াছে। ইহার এই গৌণ অংশ এখন একমাত্র লোকরঞ্জনের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা বিশেষতঃ পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীরা লোকের মনের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিবার কৌশল ভালভাবেই জানেন; কোন প্রকার সুযোগ তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই এবং কোন প্রকার দ্বিধা, সঙ্কোচ বা বিবেচনা তাঁহাদিগকে প্রতি-নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। যে সকল দৃশ্য প্রত্যক্ষভাবে মানুষের যৌনবৃত্তিতে ইন্ধন যোগাইয়া উত্তেজিত করিতে পারে বিশেষ দক্ষতার সহিত তাহার সদ্ব্যবহার করা হইতেছে।

অনেক সময় বিদেশী ফিল্মগুলির কদর্য্যতার কথা বলিতে আমরা নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন চিত্রগুলির কথাই বলিয়া থাকি কিন্তু নগ্নতাই ইহার একমাত্র কদর্য্যতা নহে, অথবা কদর্য্যতার ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ রূপ নহে। যে সকল হাবভাব ও দেহভঙ্গী মানুষের যৌনবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে পারে, ক্ষমতাশালী দক্ষ লোকদের দ্বারা অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত সে সকল ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে।

আমাদের দেশীয় চিত্রগুলিও কিছু কিছু এই দিক দিয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতেছে। হয়ত কতকটা বাধ্য হইয়াই ইহাকে এই পথের অনুসরণ করিতে হইতেছে, কারণ পাশ্চাত্য ফিল্মের উন্মাদক চিত্র দেখিতে অভ্যস্ত সিনেমাগামী জনসাধারণ (অবশ্য সকলেই নহেন) অপেক্ষাকৃত নিরীহ ধরণের চিত্র দেখিতে চাহিতেন না।

আমাদের জাতীয় চরিত্রের উপর ইহার ক্ষতিকর প্রভাব

দেশের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে যাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, সিনেমাগামীদের মধ্যে সেই তরুণ বয়স্কদের (ইহাদের মধ্যে অনেকেই আবার ছাত্র) সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কাজেই সিনেমা ইহাদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হইবে।

যাহা মানুষের পাশব বৃত্তিকে জাগাইতে পারে, তাহার ফল কোন দেশের কোন লোকের পক্ষেই ভাল হইতে পারে না। অধিকন্তু, আমরা একটা বিশেষ পরিবর্ত্তনের সময়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছি বলিয়া, সকল জিনিসই ভাল করিয়া দেখিয়া বিবেচনা করিয়া, যাচাই করিয়া লইবার বিশেষ প্রয়োজন অন্যদের অপেক্ষা আমাদের বেশী আছে। আমাদের বহুদিনের পরাধীনতা ও জড়ত্বের ফলে আমাদের চরিত্র স্বভাবতঃ যে পৌরুষ ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে ইহা আমাদের সেই শক্তি ও পৌরুষহীনতাকে আরও বাড়াইতে পারে এবং ভবিষ্যতে আমাদের শক্তিশালী দৃঢ়চিত্ত বীর্য্যবান জাতিরূপে গড়িয়া উঠিবার পথে বাধা জন্মাইতে পারে।

তদুপরি এ প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটা কথা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার আছে। এদেশে নারীরা এতদিন সম্পূর্ণভাবে পর্দ্দার অন্তরালে ছিলেন (এখনও অধিকাংশ নারী তাহাই আছেন)! কিন্তু অধুনা স্ত্রী স্বাধীনতার প্রসার ঘটিতেছে। এই আন্দোলন যাহাতে সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারে, নারীরা যাহাতে পুরুষের সমকক্ষতা ও তাঁহাদের সহিত সমানাধিকার লাভ করিতে পারেন তাহা সকল মানব ও দেশহিতৈষী ব্যক্তিরই কাম্য ও চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত। আমাদের দেশের পুরুষেরা সামাজিক জীবনে, স্ত্রীলোকের সহিত মিশিতে অভ্যস্ত ছিলেন না, নারীদেরও বহির্জীবনের সহিত পরিচয় নূতন, কাজেই ছেলে মেয়েরা যাহাতে স্বাস্থ্যকর অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে পারেন, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে সকল আমোদপ্রমোদ খেলাধূলায় দেহ ও মনের শক্তি ও স্বাস্থ্য লাভ হইতে পারে, এমন সব আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাই তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে।

সম্ভবতঃ কেহ বলিতে পারেন নীতি সম্বন্ধে অতিশয় সচেতনতা ভাল নহে এবং অতীতকালের নানাদেশের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা দেখা গিয়াছে যে, বাস্তবকে দূরে রাখিয়া ভাল থাকিবার চেষ্টা অনেকটা অসম্ভব, নিরর্থক এবং কল্যাণের পরিপন্থী। কিন্তু আবার এই সঙ্গে একথাটাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের বাস্তব জীবনের কোন একটা বিশেষ অংশকে চটকদার রংএর সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিতে গেলে তাহাও সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে। সাধারণ সভ্যতা ভদ্রতা এবং সুরুচির জন্য আমাদের বাস্তব জীবনের যে সকল অংশ অপ্রকাশ্য, তাহাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিবার প্রয়োজন আছে কি না এবং তাহা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর কি না তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

সমাজের অন্যায় এবং কঠোর বিধানে পীড়িত হইয়া বহু মানুষের জীবন যখন বিপথে যাইতে থাকে তখন সেই বিকৃত জীবনের চিত্র উদ্‌ঘাটন প্রয়োজনীয় হইতে পারে এবং তাহার মধ্যে কাব্যের উপাদানও থাকিতে পারে। লৌকিক ধর্ম্ম বা রীতি নীতি যখন মানবধর্ম্মের বিরোধী হইয়া উঠে অথবা মানুষ যখন নবতন সত্যকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়; তখন সমাজের নিম্নতল হইতে অনেক অপ্রকাশিত চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই অবস্থা এবং এই প্রয়োজন সকল মানবসমাজের সকল সময়েই থাকে, এবং ইহাই কাব্য ও আর্টের প্রেরণা ও উপাদান যোগাইতে পারে। এই সকল চিত্রকে বাস্তব চিত্র বলা যাইতে পারে। ইহাতে আমাদের সংস্কার ও নীতি সম্বন্ধীয় ধারণা আহত হইলেও উপায় নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া গল্পের নায়িকার শয়ন কক্ষে বস্ত্র পরিবর্ত্তনের দৃশ্যকে এই পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। (অবশ্য ইহাপেক্ষাও অশ্লীলতর ছবি দেখান হইয়া থাকে)। বরং ইহার ফলে তরুণ বয়স্ক দর্শকদের মনে যে চাঞ্চল্য ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে মূল গল্পাংশ সম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহল কতকটা শিথিল হইবে, এবং ইহার সহিত যে সকল উচুঁদরের আর্ট মিশ্রিত আছে, তাহাও উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। সত্য বটে, আমাদের কোমলতম শ্রেষ্ঠতম এবং মহত্তম অনেক অনুভূতির এবং মহিমার উৎপত্তি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যৌন প্রেরণা হইতে হইলেও ইহার নগ্ন স্থূলতা এই মহিমা এবং সূক্ষ্মতার প্রতিকূল।

এই সকল কারণে সিনেমার নিম্নগতির বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীপুরুষের সমাজিক মেলামেশা বা একত্র অধ্যয়ন

প্রভৃতি স্বাভাবিক ব্যাপারে সমাজের শৃঙ্খলা এবং গার্হস্থ্য জীবনের শান্তি বিপন্ন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, সেদিক দিয়া বিপদের আশঙ্কা না থাকিতেও পারে, তবে এই দিক দিয়া যে বিষ সমাজ শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে তাহার পরিণাম অনেকটা সুনিশ্চিত।

যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের চরিত্রের উপর এই সকল দৃশ্যের কোন প্রভাব নাই, তাঁহারা ভুলিয়া যান, যে, বাস্তবজীবনে যে প্রকার দৃশ্যকে আমরা ঘৃণাজনক মনে করি তাহা দেখিতে অভ্যস্ত হইলে, মনের যে পরিমার্জ্জনা ও সুরুচি নষ্ট হইবে, তাহার মূল্য উপেক্ষণীয় নহে।

ভারতীয় ফিল্‌ম্ ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব

ভারতীয় ফিল্‌ম শিল্পের যেরূপ দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে, তাহাতে ব্যবসায়ী, শিল্পী এবং পরিচালকদের দায়িত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যাঁহারা নিয়মিত আলোচনাদি করেন, এ বিষয়ে তাঁহাদেরও দায়িত্ব আছে।

১৯৩২-৩৩ সালে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য বেঙ্গল-বোর্ডের নিকট যে সকল ফিল্‌ম্ পেশ করা হয় তাহার পরিমাণ ২৯,৬৮,১৫৫ ফুট এবং এই সকল ফিল্‌মের বিষয়বস্তুর সংখ্যা ৯৪৩। ইহার মধ্যে শতকরা মোটামুটি ৯·৯৭ ভারতীয়, ৩২·৮৭ ব্রিটিশ, ৫২·৪৯ আমেরিকান এবং ৪·৬৭ অন্যান্য দেশের। অল্পদিন পূর্ব্বের হিসাব অনুসারে মোট ফিল্‌মের শতকরা ৯৮ ছিল আমেরিকান, ১ ছিল ভারতীয় এবং অবশিষ্ট ১ ব্রিটিশ এবং অন্যান্য দেশ হইতে আসিয়াছিল। যদিও অন্যান্য দেশের বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ চিত্রের তুলনায় ভারতীয় চিত্রের প্রসার আশানুরূপ হয় নাই তবু ভারতীয় চিত্রের প্রসারের কথাটা অন্যদিক দিয়াও বিচার করিবার আছে। ভারতীয় জনপ্রিয় চিত্রগুলি যত দীর্ঘদিন ধরিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারে, বিদেশী চিত্রগুলি সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল তাহার অনেক পূর্ব্বেই পরিতৃপ্ত হয়।

মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত বিস্তার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে এবার প্রায় এক সহস্র ছাত্রী সাফল্য লাভ করিয়াছেন। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার যে কত দ্রুত হইতেছে, ইহা হইতে তাহার কতকটা প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কতকটা এই জন্য বলিলাম যে সমাজে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে প্রেরণা জাগ্রত হইয়াছে, উপযুক্ত সুযোগের অভাবে যথাযথরূপে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে না। ইহার ফলে, যেখানে স্কুল কলেজের সুবিধা নাই, এমন অনেক ক্ষেত্রেই অভিভাবকেরা গৃহে রাখিয়াই বালিকাদিগকে শিক্ষাদানের চেষ্টা করিতেছেন; ইহার দ্বারা আংশিক ফললাভও হইতেছে। বালিকাদের পড়িবার জন্য পল্লী অঞ্চলেও যদি বালকদের স্কুলের ন্যায় যথেষ্ট সংখ্যক স্কুল থাকিত (অবশ্য তাহা সহসা সম্ভব হইবে না), অথবা সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত (ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এবং কার্য্যকরী পন্থা) তবে, পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকার সংখ্যা ইহার চেয়ে নিঃসন্দেহ অনেকগুণ বেশী হইত। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া একথা অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, এই সকল শিক্ষাপ্রাপ্তা তরুণীদের অনেকেই নিজেরা জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া বর্ত্তমান প্রথানুযায়ী গৃহস্থালী করিবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, আর্থিক লাভ যদি কিছু না হয় তবে, মেয়েদের মধ্যে এই শিক্ষাবিস্তারের ফলে আমাদের লাভ কি হইবে। কেহ কেহ আবার এমন কথাও বলিতেছেন যে, মেয়েরা শিক্ষিতা হইলে, তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট রাখা যাইবে না, এবং তাহার ফলে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হইবে। মেয়েদের অবস্থার কোন প্রকার উন্নতিকে যাঁহারা ভয়ের চক্ষে দেখিতেছেন, এবং তাঁহাদিগকে বর্ত্তমানের ন্যায় অস্থাবর সম্পত্তিবিশেষের মত রাখিতে চান, তাঁহাদিগের সেই মোহ এবং স্বপ্ন ভাঙ্গিবার দিন আসিয়াছে।

তবে যাঁহারা মেয়েদের স্বাভাবিক অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইতে পারিবেন (তাহা একদিন সকলকেই করিতে হইবে), তাঁহাদের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি ও সুবিধা অনেকগুণ বাড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমানে যাঁহারা অনেকটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছেন, তাঁহাদের মার্জ্জিত বুদ্ধি, রুচি এবং বিদ্যা পরিবারের শক্তি অনেকগুণে বাড়াইয়া দিবে।

বর্ত্তমানে, আমাদের সমাজ অনেকটা পুরুষদের সমাজ।

নারীরা সংখ্যায় যদিও প্রায় পুরুষদের সমান তবুও আমাদের সমাজ ও গণজীবন তাঁহাদের শক্তি ও সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত। একমাত্র তাঁহাদের স্বাধীনতালাভের ফলেই এই অবস্থার অবসান হইতে পারে। এবং শিক্ষালাভের সহিত স্বাধীনতালাভের নিকট সম্পর্কও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অশিক্ষিতা মেয়েরা স্বাধীন হইলেও, যে সকল শিক্ষিত পুরুষ আমাদের সর্ব্বপ্রকার বিধিব্যবস্থাদির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁহাদের উপর অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইবেন না; তাঁহাদের হাতের পুতুল হইয়া থাকিবেন মাত্র। কিন্তু তাঁহারা শিক্ষিতা হইলে তাঁহাদের মতের ও মনের প্রভাব সর্ব্বত্র অনুভূত হইবে।

জীবিকার সংস্থানের জন্য আমাদের পুরুষেরা অতিমাত্রায় কর্ম্মব্যস্ত ও চিন্তাগ্রস্ত। এইজন্য আমাদের জাতীয় ও গণ-জীবন পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছে না। জীবিকার জন্য ব্যতিব্যস্ত নহেন এমন শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা বাড়িলে, জাতীয় জীবন গঠনের দিক দিয়া, নানা কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার দিক দিয়া, নানা প্রয়োজনীয় জ্ঞান সমাজের নানাস্তরে ছড়াইয়া দিবার দিক দিয়া আমাদের আশাতীত লাভ হইবে।

বিদ্যা ও জ্ঞানানুশীলন, সাহিত্য ও নানা সুকুমার শিল্পের চর্চ্চা এক কথায় সভ্যতা ও কৃষ্টির সৃষ্টি ও লালনের জন্য যে উদ্বেগহীন অবসরের প্রয়োজন অন্ততঃ কিছুদিন পর্য্যন্ত শিক্ষিতা মেয়েদের এক বৃহৎ অংশ তাহা পাইবেন। ইহাতে আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সভ্যতা যে সমৃদ্ধতর হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শিক্ষিতা মেয়েরা যে শুধু নিজেদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা দিয়া দেশের নিরক্ষরতা দূর করিবার কার্য্যে সহায়তা করিতে পারিবেন তাহা নহে তাঁহারা অবৈতনিক ও সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে শিক্ষা বিস্তারেও যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিবেন।

মেয়েদের শিক্ষার আর্থিক মূল্য ব্যতীত, সমাজের অন্যান্য যে সকল লাভ হইবে, তাহার সকলগুলির বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে; কয়েকটির উল্লেখ করা হইল মাত্র।

সাম্প্রদায়িকতা ও নারী সমাজ

ভারতের সকল সম্প্রদায়ের নারীরা স্বাধীনতা যত পরিমাণে লাভ করিবেন এবং আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনের উপর তাঁহাদের প্রভাব যত বর্দ্ধিত হইবে সাম্প্রদায়িকতা বিষ ভারতবর্ষ হইতে তত পরিমাণে অপসারিত হইবে,—আশা করা যায়। পুরুষেরা যখন সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া মারামারি করিয়াছেন, সকল সম্প্রদায়ের নারীরাই তখন সুস্পষ্ট ভাষায় সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জিত জাতীয়তার সমর্থন করিয়াছেন।

ইস্তাম্বুল আন্তর্জাতিক নারী-সম্মিলনের প্রতিনিধি বেগম হামিদ আলি, ভারতীয় নারী সংঘের লণ্ডন সমিতি কর্ত্তৃক তাঁহার বিদায়োপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি জলযোগ সভায় ইণ্ডিয়া বিল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন বিধির জন্য এই বিল ভারতীয় নারীদের পক্ষে আরও বিশেষ ভাবে আপত্তিজনক। সাম্প্রদায়িক দলের বহির্ভূত হইয়া নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার হইতে ইহা নারীদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। ইনি ভারতীয় পুরুষদিগকে নারীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

ব্রিটিশ নারীদের সম্বন্ধে ইনি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা দেড়শত বৎসর পরে ভারতীয় নারীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইনি মহাত্মা গান্ধীকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শান্তিপ্রয়াসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও বাংলা কংগ্রেস

দিনাজপুর সম্মিলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীকে রাজনৈতিক বাংলার মত বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং বাংলার কংগ্রেস সম্ভব হইলে এই সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন এবং সম্ভব না হইলে ইহাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিবেন, ইহা সঙ্গত আশা।

এইরূপ প্রকাশ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দিনাজ-পুরের সিদ্ধান্তানুযায়ী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে গণতন্ত্র ও জাতীয়তার বিরোধী এবং অবিচারমূলক বলিয়া ইহা পরিত্যাগ করা উচিত এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় মহাসমিতিও যাহাতে বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বর্ত্তমান মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া তৃতীয় পক্ষের সাহায্য ব্যতীত এই সমস্যার

মীমাংসা করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবার জন্য তাঁহাদিগকেও অনুরোধ করা হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, কংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির একটি আন্তঃসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে; এই জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক দাবীর সামঞ্জস্য বিধানের দায়িত্ব তাঁহাদের নাই। কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতাকামী লোকদের প্রতিষ্ঠান। সেই জাতিয়তার আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিবার দায়িত্ব তাঁহাদের আছে এবং কোন আপাত লাভের মোহে এই আদর্শকে ক্ষুন্ন করিলে তাহা কখনই জাতির ভবিষ্যৎ শক্তি ও সংহতির পরিপোষক হইবে না। সাহসের সহিত ভুল সংশোধন করিবার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায়, বাংলা কংগ্রেসের দুই দলের মধ্যে বিবাদের অবসান হইল, আশা করা যাইতে পারে।

অনেককে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা আদর্শবিরোধী বলিয়াই যে হিন্দুরা আপত্তি করিতেছেন, একথা মুখে তাঁহারা বলিলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা সত্য নহে। ইহাতে তাঁহাদের স্বার্থ ব্যাহত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে এত তীব্রভাবে বলিতেছেন; ইহার প্রমাণস্বরূপে ইঁহারা বলেন যে, হিন্দুদের স্বার্থ যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, সেই বাংলা ও পাঞ্জাবেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা পরিত্যাগ করিবার আন্দোলন সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, নিজের বা নিজেদের স্বার্থ সকলেই অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। তাহা যদি বৃহত্তর স্বার্থ বা আদর্শের প্রতিকূল হয়, তবে বাধ্য হইয়া এইরূপ স্বার্থ-হানিকেও বরণ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু, কোন ব্যবস্থার ফলে যদি কাহারও উপর অবিচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে, যাহাদের স্বার্থহানি ঘটিতেছে তাহারা যে, এই অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আন্দোলন করিবে, এই ব্যবস্থা যে আদর্শ বিরোধী তাহা দেখাইবে এবং যাহাদের উপর অবিচারের মাত্রা যত অধিক তাহারা যে তত তীব্রভাবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করিবে, ইহা অতি স্বাভাবিক। এজন্য বলা যায় না যে, আদর্শ (বা বৃহত্তর স্বার্থ) আন্দোলন কারীদের লক্ষ্য নহে।

শ্রীযুক্ত মৈত্রের অভিজ্ঞতা

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নূতন মনোনীত বাঙ্গালী সদস্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র লিখিয়াছেন, "ভারতীয় নেতাদের সংস্পর্শ হইতে আমি যে অল্পকালীন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির কাউন্সিলে বাঙ্গালীর কোন স্থান নাই দেখিয়া এবং বাংলার অনৈক্যকে বিশেষভাবে বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার সুযোগ গ্রহণ করা হইতেছে বলিয়া বিশেষ হীনতা বোধ করিয়াছি।"

স্ত্রীশিক্ষা ও ডাঃ রামন

ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বক্তৃতায় ডাঃ রামন বলিয়াছেন, "আমরা আমাদের মেয়েদের অবনত করিয়া রাখিয়াছি। আমরা তাহাদের জন্মগত অধিকারকে, জ্ঞান লাভ করিবার জন্মগত অধিকারকে অস্বীকার করিয়াছি। যাহারা নিজেদের অর্দ্ধাংশকে চাপিয়া রাখিতে চায় তাহারা কখনও একটা জাতি হইয়া উঠিবার আশা করিতে পারে না। একথা বিশেষভাবে সত্য যে পিতা নহেন, মাতাই সন্তানের শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক চরিত্র গঠন করিয়া থাকেন। স্পার্টানদের বিজয়ের গৌরব স্পার্টান পুত্রদের অপেক্ষাও মাতাদের অধিক।

এই বক্তৃতায় ডাঃ রামন দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন যে এখানেও দেশীয় ভাষায় শিক্ষা-দানের প্রয়োজন আছে এবং ইহা কোন বাধার সৃষ্টি না করিয়া শিক্ষার পক্ষে সহায়ক হইবে।

কংগ্রেস সভাপতি ও পাশ্চাত্য রাজনৈতিক মত

সোসালিস্ট্‌ মতবাদকে লক্ষ্য করিয়া কংগ্রেস সভাপতি বম্বে কোন এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য দেশ

হইতে ভারতবর্ষে মতবাদ ও কর্ম্মপদ্ধতি আমদানি করিবার তিনি বিপক্ষে। তিনি বলেন, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অনুসৃত নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতির বিষয় পাঠ করিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন যে, এই সব আমাদের দেশের পক্ষেও উপযোগী হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা পাশ্চাত্য দেশগুলির অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এইজন্য পাশ্চাত্য দেশের কর্ম্মপন্থা সমূহের অনুসরণ এদেশে করিতে গেলে, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে।

অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের দেশের অবস্থা যে সর্ব্ববিষয়ে এক নহে তাহা কিছুপরিমানে সত্য। আমাদের জন্মগত-অস্পৃশ্যতা, ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক মনোভাব নারীদের অধীনতা প্রভৃতি সমস্যা ভারতেরই নিজস্ব। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে কোন কোন ব্যাপার বৈসাদৃশ্য থাকিলেও যে সকল ব্যাপারে সাদৃশ্য আছে তাহাদের মূল্য এবং গুরুত্ব কম নহে। কাজেই অন্যান্য দেশে যে সকল নীতি বা কর্ম্মপন্থা ফলপ্রসূ হইয়াছে, আমাদের দেশেও তাহার ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যদি কেহ মনে করেন, তাহা হইবে না, তবে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে, ভারতবর্ষের কোন বিশেষ অবস্থার জন্য তাহা হইবে না; সেই বিশেষ অবস্থা কতটুকু বাধা জন্মাইবে, সেই বিশেষ অবস্থা যদি বাঞ্ছনীয় না হয় তবে, তাহা দূর করিবার জন্য কি করা যাইবে; যদি সে অবস্থা রক্ষণ করা প্রয়োজনীয় ও লাভজনক মনে হয় তবে তাহার জন্য মূলনীতির কতটুকু মাত্র পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক হইবে। নহিলে শুধুমাত্র আমাদের প্রাচ্যত্বের এবং বৈশিষ্টের দোহাই দিয়া রাজনীতি বা অন্য কোন ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যকে দূরে রাখিবার চেষ্টা সফল বা যুক্তিযুক্ত হইবে না। যাঁহারা সোসালিস্ট্ মতবাদকে পাশ্চাত্যদেশজাত বলিয়া বর্জ্জনীয় মনে করিতেছেন তাঁহাদের একথাও মনে করা দরকার যে আমাদের সকল প্রকার রাষ্ট্রীক চিন্তা ও আদর্শই পাশ্চাত্য কোন না কোন দেশের নিকট হইতে আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

অন্যপক্ষে যাঁহারা সোসালিস্ট্ মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন তাঁহাদিগকেও কোন বিশেষ মতাবাদের প্রতি অবস্থানিরপেক্ষ গোড়ামি ত্যাগ করিতে হইবে, যুক্তি ও তথ্যের কথা শুনিতে হইবে এবং যাহাতে কোন প্রকার মতানৈক্য অকারণে বাড়িয়া না উঠে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বৈধব্য ও মহাত্মা গান্ধী

কোয়েটার আকস্মিক দুর্ঘটনায় যে সকল হিন্দু নারী বিধবা হইয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন; "আমি পুনঃ পুনঃ একথা বলিয়াছি যে, প্রত্যেক বিপত্নীকের পুনরায় বিবাহ করিবার যতটুকু অধিকার আছে প্রত্যেক বিধবার পুনরায় বিবাহ করিবার ঠিক ততটুকু অধিকার আছে। স্বেচ্ছামূলক বৈধব্য হিন্দু ধর্ম্মের অমূল্য সম্পদ; কিন্তু বাধ্যতামূলক বৈধব্য অভিসম্পাত। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি কোন প্রকার ভয়ের কারণ না থাকিত এবং সে ভয়ও শারীরিক নিগ্রহের ততটা নহে, যতটা হিন্দু জনমতের নিন্দার, তবে বহুসংখ্যক তরুণী বিধবা কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়াই বিবাহ করিতেন। এইজন্য সকল তরুণী বিধবাকেই পুনরায় বিবাহ করিতে সম্মত করাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা উচিত, এবং এই নিশ্চিত আশ্বাস তাঁহাদিগকে দিতে হইবে যে বিবাহ করিলে তাঁহারা কিছুমাত্র নিন্দিত হইবেন না; এবং ইঁহাদের জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচনের সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রকার কার্য্য কোন প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া করা সম্ভব নহে। যে সকল সংস্কারব্রতীদের আত্মীয়ারা বিধবা হইয়াছেন, তাঁহাদেরই এই কার্য্যে অগ্রণী হওয়া উচিত। ইঁহাদিগকে নিজ নিজ দলের মধ্যে, সংযম ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তীব্র আন্দোলন চালাইতে হইবে এবং যখনই তাঁহারা এইরূপ বিবাহ দিতে সফল হইবেন, তখন তাহাকে ব্যাপকতমভাবে প্রচার করিতে হইবে।"

মনে রাখিতে হইবে, মহাত্মা গান্ধী কোয়েটা ভূমিকম্পে সদ্য বিধবা একটি সন্তানবতী নারীর অসহায় করুণ ভাগ্যকে উপলক্ষ করিয়া কথাগুলি বলিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি বিবাহেচ্ছু সন্তানবতী নারীদেরও বিবাহের পক্ষপাতী। কোয়েটার বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমাদের সমাজের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধেও তাহা সত্য। এ সম্পর্কেও মহাত্মা বলিয়াছেন, এই দুর্ঘটনার স্মৃতির বেদনা মনে থাকা কালীন

জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে এবং এইরূপে একবার ব্যাপকভাবে সংস্কার আরম্ভ হইলে, যাহারা সাধারণ অবস্থায় বিধবা হইবেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের পক্ষে বিবাহ করা সহজ হইবে।

দেশে মহাত্মার যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আছেন, তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা করেন এমন লোকের সংখ্যাও কম নাই। কিন্তু, তাঁহার যে সত্যদৃষ্টি, সত্যভাষণ, এবং পরিচ্ছন্ন বিচারবুদ্ধি তাঁহার মহৎ চরিত্রের অন্যতম প্রধান অংশ, শুধুমাত্র তাঁহার ফটো পূজা না করিয়া, তাহার প্রতিও তাঁহারা মনোযোগী হইবেন এবং তদনুরূপ কাজ করিবার চেষ্টা করিবেন, এ আশা করা অন্যায় নহে।

কোন প্রকার সংস্কার প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা সম্বন্ধে, কিছু বলিবার কথা আছে। মহাত্মা যেরূপ বলিয়াছেন, প্রধানতঃ আত্মীয়দের সহায়তায় ও চেষ্টায়ই এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কিন্তু অনেক সময়ই আত্মীয়দের একক শক্তি সমাজের সংঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে না। অন্যদিকে সমাজের সংস্কারেচ্ছু-শক্তির সংঘবদ্ধ রূপই হইতেছে সাধারণ প্রতিষ্ঠান। ইহা সংস্কারকামী ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিতে, উৎসাহ দিতে, নূতন সমাজের আশ্রয় দিতে (প্রয়োজন হইলে) পারিবে এবং সাধারণ ভাবে যাহাদের মনোযোগ এদিকে আদৌ আকৃষ্ট হইত না এমন অনেককেও ইহা উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে।

বৈধব্য ও বংলার হিন্দু সমাজ

অসংখ্য বৈধব্য ও অবিচারের মধ্যে বাস করিয়া, তাহা আমাদের গাসহা হইয়া গিয়াছে; কাজেই, কোন জিনিষ কাহারও পক্ষে মনুষ্যত্বের হানিকর, অপমানজনক বা অবিচার-মূলক বলিয়াই তাহার প্রতি আমাদের মন বিমুখ হইয়া উঠে না। আমাদের সমাজের অনেক লোকের কাছেই, মনুষ্যত্ব ও সুবিচারের দোহাই দেওয়া অনর্থক। কিন্তু যাঁহারা হিন্দু সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতার কথা, কোন কোন স্তরে কন্যাভাবের তীব্রতার কথা এবং তাহার আনুসঙ্গিক কুফল প্রভৃতির কথা অবগত আছেন, তাঁহারাই বিধবা বিবাহের আশু প্রচলনের কথা স্বীকার করিবেন।

বাঙ্গালী হিন্দুদের কয়েকটি জাতির মধ্যে কন্যাভাব এত বেশী হইয়াছে যে, পুরুষদের মধ্যে যৌবন বিবাহ অনেকটা অসম্ভব হইয়াছে। ফলে কন্যাপণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং যাঁহাদের অর্থ আছে তাঁহারাই অধিক মূল্যে কন্যা ক্রয় করিয়া লইয়া থাকেন। বিবাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় বলিয়া সাধারণতঃ পুরুষদের প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ করিতে হয় এবং তাহাও আবার বালিকা। ইহাতে এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সমাজের উপর ইহার ফল সহজেই অনুমেয়।

হিন্দুদের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির বৈবাহিক গণ্ডী আবার অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া অবস্থা অনেক স্থলে বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে।

হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ও বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে বিবাহের প্রচলন না হইলে, এ সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না।

যে সকল শ্রেণীর মধ্যে বিবাহযোগ্যা কন্যার সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে এবং প্রগতিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির চেষ্টায় তাঁহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন অত্যন্ত ধীরে ধীরে হইতেছে বটে, কিন্তু তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ইহার প্রচলন অপেক্ষাকৃত অধিক না হইলে, ইহা বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিবে না।

কেহ কেহ হয়ত মনে করেন, বিধবা বিবাহ প্রচলনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা হইতেছে যে, মেয়েরা সহসা বহুদিনের সংস্কার জয় করিতে পারিবেন না এবং তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে সম্মত করান যাইবে না। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে (একটি সংস্কারপন্থী প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগের ফলে) বলিতে পারি, তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিবাহেচ্ছু অনেক তরুণী বিধবা আছেন, অথচ উপযুক্ত পাত্রের অভাবে তাঁহারা বিবাহ করিতে পারিতেছেন না বা তাঁহাদের বিবাহ দেওয়া যাইতেছে না।

হিন্দী বর্ণমালা সংস্কার

ইন্দোর হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলন কর্ত্তৃক নিযুক্ত বর্ণমালা-সংস্কার সমিতি শ্রীযুক্ত কাকা কালেনকরের সভাপতিত্বে

হিন্দীবর্ণমালা সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন। সমগ্র হিন্দু-ভারতেই সংস্কৃত বর্ণমালার প্রচলন আছে বলিয়া, এই সংস্কার সাধিত হইলেই তাহা ভারতের সমগ্র প্রদেশেরই উপকারে আসিবে। সমগ্র ভারতে একলিপি প্রচলনও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বর্ণমালার বর্ত্তমান জটিলতা দূর হইলে, শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা হইবে এবং ছাপা, টাইপ করা প্রভৃতি কার্য্য অনেক সহজসাধ্য হইবে। সমগ্র ভারতে একলিপি প্রচলিত হইলে, তাহার ফল আরও অনেক দূর প্রসারী হইবে; ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ অনেক বাড়িয়া যাইবে, এবং লোকের সুবিধাও বহুগুণে বাড়িয়া যাইবে।

সমগ্র ভারতেই বর্ণমালার ঐক্য আছে, কথা হইতেছে শুধু লিপির রূপ হইয়া। লিপির কোন রূপ গ্রহণ করা যাইবে, তাহা নির্ব্বাচনের সময় কঠোর নিরপেক্ষতা অত্যাবশ্যক; কোন প্রকার প্রাদেশিক প্রীতি বা কোন প্রকার ঝোঁক যাহাতে বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন না করে তাহার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রচলিত লিপিগুলির ভিতর বাংলা যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন সেকথাটা কেহ যথেষ্ট সহৃদয়তা এবং গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিবে কি না সে বিষয়ে আমাদের মনে বিশেষ সন্দেহ আছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষ

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষ এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান এত দীর্ঘদিন ধরিয়া এত বিভিন্ন অপমানজনক ও ক্ষতিকর উপায়ে চলিয়াছে যে তাহা অন্যতম প্রধান জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি ট্রান্সভাল প্রাদেশিক কাউন্সিলে, গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধজ্ঞাপক দুইটি প্রস্তাব এই মর্ম্মে গৃহীত হইয়াছে যে, ইউরোপীয় মেয়েদের ভারতীয় দোকানে চাকরী করা আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক এবং এসিয়া ও আফ্রিকাবাসী অশ্বেত লোকেরা যাহাতে ইউরোপীয়দের মোটরচালক না হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হউক। এই সকল আইনে ক্ষতির দিক অপেক্ষা অপমানের দিকটাই অধিকতর পরিস্ফুট এবং আভিজাত্যের অহঙ্কার প্রসূত বর্ণবিদ্বেষ হইতে উৎপন্ন।

বিহার পর্দ্দা উচ্ছেদ দিবস

৮ই জুলাই তারিখে সমগ্র বিহারে পর্দ্দা উচ্ছেদ দিবস প্রতিপালনের আয়োজন হইতেছে। বিহারের বড় বড় সহর ও গ্রামে সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হইতেছে। পর্দ্দানশীন মহিলারা যাহাতে এই সকল সভায় যোগদান করেন তাহার জন্য বিবিধমত চেষ্টা হইতেছে। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সরকারি কর্ম্মচারী, জমিদার ও মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক যোগদান করিবেন। কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাটনার সভায় উপস্থিত থাকিবেন। আমাদের মনের অসাড়তাকে আঘাত দিবার পক্ষে বিক্ষোভ ও আড়ম্বরের প্রয়োজন ও মূল্য আছে। বিহারের প্রগতি-মূলক জনমত যে মনুষ্যত্বনাশকারী এই অনাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইতে পারিয়াছে, এজন্য বিহারকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। অবশ্য সর্ব্বত্র যেরূপ হইয়া থাকে, বিহারেও ইহার বিরুদ্ধে একটা চেষ্টা হইতেছে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

পট ও মঞ্চ

—আনন্দ—

অপকীর্ত্তির এক অধ্যায়

গত চৈত্র মাসের 'বিচিত্রা'য় ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা সম্বন্ধে সামান্য দু এক কথা বলেছিলাম ; এখন সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার সময় এসেছে। আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা বহুকাল থেকেই চলে আসছে। ব্যাপারটা অদ্যতন নয় কিন্তু প্রতিবাদের তুফান উঠেছে আজকে, কারণ আজ আমরা প্রতিবাদ করবার মত সঙ্ঘশক্তি অর্জ্জন করেছি।

মেট্রোর অপকীর্ত্তি Son of India এবং Hearst Metronews এর ব্যাখ্যাকার এডুইন্ সি হিলের অর্দ্ধোদয় যোগ সম্বন্ধে বিকৃত ও কদর্য্য ব্যাখ্যা। ফক্সের Chandu, the Magician ; এ ছাড়া Pleasure Cruise ছবিতে গান্ধীজীর বেশধারী মেষপ্রিয় এক হাস্যাস্পদ চরিত্র ছিল। ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের 42nd Street ছবিতে Pleasure Cruiseএর মতই এক চরিত্র আছে এবং Beauty Spots on Earth, Southern India প্রভৃতি বহু ছোট ছবিতে আমাদের সভ্যতা ও সমাজ, দেবদ্বিজে ভক্তি প্রভৃতির জঘন্য ও বর্ব্বর রূপ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ইউনাইটেড্ আর্টিষ্টের Kid Millions ছবিতে গান্ধীজীর মত একটি লোককে আমরা দেখেছি। কিন্তু সেই লোকটীকে নিয়ে ফিল্মের যে সব অংশে রূঢ় ব্যঙ্গ ও কদর্য্য বিদ্রূপ করা হয়েছে সে সব অংশ বাদ দিয়ে ছবিটী আমাদের দেশে দেখানো হয়েছে। রেডিও পিক্‌চার্সের Everybody Likes Music ছবির সম্বন্ধেও উক্তরূপ অভিযোগ ছিল। রেডিওর স্থানীয় কর্ত্তা গ্রেগরি সেদিন ছবিটী দেখাবার কালে আমাদের বলেন ছবিটী সেন্সর বোর্ড একটুও না বাদ দিয়ে পাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, ছবিতে গান্ধীজীর তথা ভারতের অপমানকর কিছুই দেখা গেল না। মিঃ গ্রেগরিকে প্রশ্ন করা হয়. (১) উক্ত ছবি এদেশে আসবার আগে এবং (২) সেন্সর বোর্ডের কাছে উপস্থাপিত করবার আগে তা থেকে কোন অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে কি না। এর উত্তরে তিনি বলেন ছবিটী যেমন তাঁরা পেয়েছেন তেমনই অবস্থায় কিছু বাদ না দিয়ে দেখাচ্ছেন। যদি আমেরিকা থেকেই ঐ ছবি এ দেশে পাঠাবার পূর্ব্বে ভারতবাসীর আপত্তিজনক অংশ বাদ দেওয়া হয়ে থাকে এবং শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে নৃত্যরত গান্ধীজীর দৃশ্য সম্বলিত Everybody Likes Music থেকে ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য অংশে দেখানো হয়ে থাকে তা হলে ছবিটীর mischievous anti-Indian propagandaর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

ভারতের লোক গান্ধীজীকে ভাল ভাবেই জানে, সুতরাং তারা ঐ দৃশ্য দেখলে ভীষণ রেগে যাবে বটে কিন্তু মহাত্মার সম্বন্ধে তাদের ধারণা বদলে যাবে না। অপর পক্ষে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক যারা মহাত্মাকে আমাদের মত ভালভাবে জানে না তারা তাঁর সম্বন্ধে ছবি দেখে মন্দ ধারণা করতে পারে ; এবং আমাদের ক্ষতিটাই এখানে, আপত্তিও এখানে। থাকুক না আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক রাষ্ট্রে 'গান্ধী এসোসিয়েসন', আমেরিকার প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন সাধারণ লোক জানুক্ না কেন মহাত্মার নাম,—গান্ধীজীর সম্বন্ধে তাদের অস্পষ্ট ভাল ধারণা ছবি দেখলে মন্দে দাঁড়াবে। আমাদের হাতে Everybody Likes Musicএর script দেওয়া হয়। ছবিটী এই scirptএরই ছায়ারূপ। scriptএ গান্ধী বলে কোনো ভূমিকা বা কোনো শব্দ পর্য্যন্ত নেই। গান্ধীজীর পোষাক পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়, সুতরাং ঐ পোষাকে তাঁর মত দেখতে কোনো লোককে শ্বেতাঙ্গিনীর বাহুলগ্ন দেখানো মানে নিশ্চয়ই গান্ধীজীকে অপমান করা। Everybody Likes Music থেকে সম্ভবতঃ শ্বেতাঙ্গিনীর বাহুলগ্ন মতাত্মাজীর 'বল' নাচের দৃশ্যটী কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

আগে Pleasure Cruise বা 42nd Streetএ এসব দৃশ্য দোষাবহ ছিল না কিন্তু এখন সময় বদলেছে। মিঃ গ্রেগরি ঐদিন আমাদের জানিয়েছিলেন যে রেডিও পিক্‌চার্স ভারতে কি করছে না করছে সে বিষয়ে তিনি দেখতে পারেন কিন্তু অন্যত্র কি করছে না করছে সে বিষয়ে গায়ে পড়ে সদুপদেশ দিতে যাওয়া তাঁর অনধিকার চর্চ্চা হবে। Eveybody Likes Music সম্বন্ধে রেডিও পিক্‌চার্সের ভারতীয় শাখা এবং মিঃ গ্রেগরির অবস্থা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল।

Kid Millionsএর যে সব অংশ বাদ দিয়ে এদেশে দেখানো হয়েছে সেইসব অংশের সম্বন্ধে পারিপার্শ্বিক প্রমাণদ্বারা এতদূর জানা গেছে যে (১) গান্ধী নামে বা গান্ধীজীর মত দেখতে একটি লোক ছিল (২) লোকটীর শূকর মাংসের 'পরে লোভ ছিল ইত্যাদি। এ ছাড়া ঐ ছবিতে মিশরের শেখকে দিয়ে বলানো হচ্ছে: যে শেখের ২৫ জন বেগম আছে সে প্রায় Bachelor. ঐ ছবিতে মুসলমানদের জঘন্য বিদ্রূপ করা হয়েছে ও কদর্য্যভাবে চিত্রিত করা হয়েছে কিন্তু এ কারণে মুসলমানদের তরফ থেকে এতটুকু প্রতিবাদ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

সুভাষচন্দ্র Bengali নামে যে কুৎসামূলক ছবির সন্ধান দিয়েছেন তার বর্ণনার সঙ্গে Lives of a Bengal Lancer-এর সামঞ্জস্য দেখে আমাদের Bengal Lancerও Bengaliর অভিন্নতায় সন্দেহ হয়েছিল এবং এখন প্রমাণও পাওয়া গেছে একই ছবি ভিন্ন নামে অন্যত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

সমালোচকরা যাঁরা Lives of a Bengali Lancerএর প্রথম প্রদর্শন কালে ছবিটীর প্রশংসা করেছিলেন তাঁরা এখন বলছেন যে ছবিটীর আপত্তিজনক দৃশ্যগুলি ছেঁটে এদেশে দেখানো হয়েছে। আমরাও Bengal Lancerএর entertainment valueর জন্য ছবিটীর প্রশংসা করেছিলাম কিন্তু কোনো কালেই অস্বীকার করবো না সে ছবিটী এখনও (অর্থাৎ ছেঁটে ছোট করলেও) প্রায় আগাগোড়া আপত্তিকর। ঐ ছবিতে (১) Clownishly funny এবং decidedly humiliating ও ridiculous এক করদ রাজ্যের শাসনকর্ত্তা আমীরের চরিত্র আছে (২) ভারতীয়দের ইংরাজ সৈনিকের কুকুরের সামিল অথবা সাপুড়ে প্রভৃতি আপত্তিজনকভাবে দেখানো হয়েছে (৩) মহম্মদ খাঁ নামে এক আফ্রিদি সর্দ্দারকে হীন, কুচক্রী, কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক দেখানো হয়েছে (৪) পারিপার্শ্বিক আবহ সৃষ্টির জন্য যে সব দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই আপত্তিকর এবং (৫) সংলাপে ইংরাজদের মহিমাকীর্ত্তন করা ও ভারতীয়দের ভীরু, অক্ষম ও অযোগ্য বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও মুসলমানদের বিশেষ করে প্রতিবাদ করা উচিৎ কিন্তু তাঁরা নীরব।

India Speaks হচ্ছে কল্পনাতীত জঘন্য ছবি। এই ছবির পরিবেশন সম্বন্ধে স্থানীয় রেডিও পিক্‌চার্সকে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা বলেন তাঁরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। 'ভ্যারাইটিজ' পত্রিকা আমেরিকা থেকে এই প্রশ্নের উত্তর আনালেন—India Speaksএর ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র পরিবেশক রেডিও পিক্‌চার্স। কিন্তু স্থানীয় রেডিও পিক্‌চার্স তাঁদের হেড্ আফিস্-এর কাজকর্ম্ম নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন না। যাই হোক্, India Speaks ছবি হিসাবে একেবারে বাজে, সুতরাং মাত্র দিন কয়েক প্রদর্শনের পরেই ছবিটি বন্ধ হয়ে যায়। India Speaksএর কথা আমরা ছেড়ে দিতে পারি, তেমনি ছেড়ে দিতে পারি ভারতের বিরুদ্ধে অন্যান্য কুৎসামূলক ছবির কথা যে-গুলির প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেছে এদেশে ও অন্যত্র। কিন্তু Pleasure Cruise, Chandu the Magician, Return of Chandu, 42nd Street, Beauty Spots on Earth, Southern India, Lives of a Bengal Lancer, Monkey's Paw (রেডিও), Son of India, Kid Millions প্রভৃতি এবং আমাদের জানিত-অজানিত যে সব ছবি এখনও প্রদর্শিত হচ্ছে সেগুলির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হবে? অবশ্য সবগুলি ছবিই সমান দোষাবহ নয়। কলম্বিয়ার Scrappy's Party নামে এক কার্টুনে দেখানো হয়েছে মহাত্মাজী, হিট্‌লার, মুসোলিনী, সম্রাট্ প্রভৃতির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাচছেন। এটাকে আমরা দোষাবহ বলে মনে করি না। আর তা ছাড়া কার্টুন্ ত' বড় লোকদের নিয়েই আঁকতে হয়। ইউনিভার্সালের Bombay Mail ছবিটী নিষিদ্ধ হয়েছে। আমরা জানতে পারলাম বিদ্রোহাত্মক বলে ছবিটীর ঐ পরিণতি ঘটেছে। খাস বিটিশ ছবি Elephant

Boy ও Soldiers Threeও বোধ হয় আমাদের অনুগ্রহ করবে।

সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য

কুৎসামূলক ছবিগুলির সম্বন্ধে সাংবাদিকদের করণীয় অনেক কিছু আছে। আমরা এখানে বিচার করে দেখবো তাঁরা কি করেছেন, না করেছেন।

যাঁরা দৈনিক সংবাদপত্রের রঙ্গজগৎ বিভাগের নিয়মিত পাঠক তাঁরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন সেখানে সমালোচনার নামে চলে নির্জ্জলা স্তুতিবাদ। যারা বিজ্ঞাপন ও পাশ দেয় তাদেরই গুণগানে সংবাদপত্র মুখর হয়ে ওঠে। দেখা যাচ্ছে (১) সাংবাদিকরা সব ছবি দেখেন না (২) যারা বিজ্ঞাপন ও পাশ না দেয় তাদের ছবি দেখেন না এবং (৩) যারা বিজ্ঞাপন দেয় তাদের ছবির সম্বন্ধে মন্দ বিশেষ কিছু বলতে পারেন না।

সাংবাদিকদের একটা মস্ত বড় সাফাই আছে—Opinions may differ এবং আমরাও জানি Purchased opinionএর সঙ্গে স্বাধীন সত্যসন্ধী মানুষের Opinion চিরকালই differ করে থাকে।

সাংবাদিকদের বিজ্ঞাপনের মোহ ত্যাগ করতে হবে। আমাদের দেশের কাছে যারা অপরাধ করেছে বিজ্ঞাপনের মায়া ত্যাগ করে এবং বন্ধুত্বের খাতির বিসর্জ্জন দিয়ে তাদের কুকার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করতে হবে। সাংবাদিকদের এই আন্দোলন ভারতের বিরুদ্ধে সকল কুৎসা রটনাকারীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে—ছিদ্রান্বেষীর মত এক প্রতিষ্ঠানের অল্প অপরাধে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করলে ও প্রকৃত অপরাধীকে ছেড়ে দিলে চলবে না। কার্য্যকালে কর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপর হওয়া চাই।

প্রতিকারের প্রস্তাবিত পন্থা

এই কুৎসা রটনা বন্ধ করবার জন্য কয়েকজন সহযোগী নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেছেন :—

(১) দর্শকদের তরফ থেকে আমেরিকান ছবি বর্জ্জন করা হোক।

(২) সরকার আইন প্রণয়ন করে এদেশে আমেরিকান ছবির প্রদর্শন ও প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিন।

কিন্তু এসব প্রস্তাবের একটীও যুক্তিসহ বা সমর্থনযোগ্য নয়। প্রথমতঃ আমরা End করার থেকে Mend করার পক্ষপাতী এবং আমেরিকান ছবিকাররাও ভবিষ্যতে এমন কুকার্য্য আর করবে না বলছে। তারপর যে সব আমেরিকান কোম্পানীর ছবি আমরা বর্জ্জন করবো তারা বাধ্য হয়ে এদেশ থেকে আফিস তুলে নিয়ে যাবে। এদের ভারত-ছাড়া করা মানে প্রতিকারের কোনো উপায় না রেখে এদের ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবার প্রকৃষ্ট সুযোগ দেওয়া। তারপর কথা হচ্ছে আমেরিকান ছবি বন্ধ হ'লে চাহিদা পূরণের জন্য বাজে বিলাতী মাল আমদানি করা ভিন্ন উপায় থাকিবে না। আমি কিন্তু আমার পয়সায় সর্ব্বোচ্চ প্রমোদক্রয় ক্ষমতা চাই। যে আট ন' আনা পয়সায় আমি David Copperfield বা Sweet Adeline প্রভৃতির মত ছবি দেখতে পাই সেই পয়সা বা তদধিক পয়সা খরচ করে কেন আমি The Love Affair of the Dictator, Fighting Stock, Oh! Daddy বা Blosoom Time এর মত বাজে ছবি দেখতে যাবো? পয়সা যখন আমার দেশের লোক পাচ্ছে না তখন বিদেশীদের মধ্যে যার জিনিষ সবচেয়ে ভাল তাকেই আমি পয়সা দেবো। আজ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিলাতী ছবির সংখ্যা আধ ডজনের বেশি নয়, ছবির ষ্টাণ্ডার্ড উন্নততর করতে বিলাতী ছবিকারদের অনেক দেরী। আমি মনে আশা রাখি সর্ব্ব-সাহায্য-বঞ্চিত বাংলা সর্ব্বসাহায্যপ্রাপ্ত বিলাতের চেয়ে আগে ছবির ষ্টাণ্ডার্ড উন্নত করবে—এ ক্ষেত্রে কেন অযোগ্যকে সাহায্য করে আমি আমার দানের অমর্য্যাদা করবো?

শেষতঃ আমাদের দেশে নাকি অনেক ভাল ভাল ছবি হচ্ছে। 'দেবদাসে'র পূর্ব্বে যা হয়ে গেছে গেছে, কিন্তু তারপর ভাল ছবি বলে যা তা জিনিষ দিয়ে দর্শকদের ভুলিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আর এ কথাও সত্য নয় যে বাংলা ছবি যত হবে সবই চলবে এবং লাভ দেবে। বাংলা ছবির বাজার নিয়ে পূর্ব্বে আলোচনা করবার কালে আমরা দেখেছি যে বাংলা ছবির বাজার বলতে প্রধানতঃ আমাদের এই

সহর, এখানে ছবি পয়সা না তুলতে পারলে কোম্পানীকে তুলে দেবে। এখন অল্প যে কয়েকখানা বাংলা ছবি হয় তা পড়তে পায় না। শ্যামবাজার ভিন্ন অন্যান্য অঞ্চলের ছবি-ঘরের মালিকরা শত চেষ্টা করেও বাংলা ছবির প্রথম প্রদর্শন পান না। ছবির সংখ্যা বেশি হলে সকলেই বাংলা ছবি দেখাতে পারবেন বটে কিন্তু পয়সা পাবেন না। প্রতি-যোগিতা আর তাড়াহুড়ার বাজারে ছবির Quality বলতে যাও বা কিছু আছে তাও নেমে যাবে এবং যাঁরা বাজে ছবি দেখাবেন তাঁরা লাভবান হবেন না।

জর্জ্জ আলিসের সম্বন্ধে মস্ত অভিযোগ এই যে আলিস্ চিরকাল আলিসই থেকে যাচ্ছেন—সব ভূমিকাতেই তাঁর ব্যক্তিত্ব চরিত্রচিত্রণকে ছাপিয়ে ওঠে। কিন্তু আলিসের আলিসত্ব আমাদের আনন্দই দিয়ে থাকে। এখানে আমরা জর্জ্জ আর্লিস্কে Cardinal Richlieu চিত্রে দেখেছি।

প্রতিকার কোথায়

প্রতিকার আমাদের সকলের হাতে। ব্রিটিশ সরকারের পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রতিনিধি আছেন। সরকার থেকে তাঁদের জানিয়ে দিতে হবে যে, কোনো ছবিতে ভারতের প্রতি অবিচার করা হলে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি তৎক্ষণাৎ স্থানীয় সরকারের কাছে তার প্রতিবাদ জানাবেন এবং উক্ত বিষয় বৃটিশ সরকারের গোচরী-ভূত করবেন। সেন্সর বোর্ড এতাবৎকাল দেখে এসেছেন যে বৃটিশ সর-কারের স্বার্থের বিরুদ্ধ না হয়, ছবি ভীষণ অশ্লীল না হয় বা তাতে সম্প্রদায়-বিশেষ ক্ষুণ্ণ না হয়। আমরা এতদিন জানতাম সেন্সর বোর্ড কেবল ঐ সব জিনিষ বাঁচিয়ে চলে এবং ছবির ভালমন্দ জানে না, কিন্তু এখন দেখছি বোর্ড দেশের ভালমন্দও বিশেষ জানে না। সেন্সর বোর্ডে জননায়ক ও সাংবাদিকদের স্থান দিতে হবে কারণ এঁরাই লোকমতের প্রতীক। বোর্ডে যদি এঁদের

স্থান না হয় তবে সাংবাদিকদের কাজ হবে দুষ্ট ছবির বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করা এবং সত্যই কোনো vilifying ছবির খবর পেলে দেশের লোককে তা দেখতে স্পষ্ট বারণ করা। এই কর্ত্তব্যের বেশির ভাগ পড়ছে দৈনিক সংবাদপত্রের চিত্র-সমালোচকদের 'পরে। আশা করি তাঁরা যথাকালে কর্ত্তব্য সম্পাদন করবেন। চিত্রপ্রিয়দের ও সমালোচকদের প্রতি আস্থাবান হতে হবে। আমরা জানি Bengal Lancer প্রথম যখন লাহোরে দেখানো হয় তখন ছবিটির বিরুদ্ধে কিছু প্রকাশ পায় নি এবং ছবি প্রচুর পয়সা উপার্জ্জন করেছিল। তারপর Bengal Lancer সম্বন্ধে যখন সব জানাজানি হয়ে গেল তখন লাহোরে ছবিটীর দ্বিতীয় প্রদর্শন কালে একজনও ছাত্র ছবিটী দেখেন নি। বলা বাহুল্য, প্রমোদের patron ছাত্ররাই সব চেয়ে বেশি। কিন্তু আমাদের এখানে ছবিটীর তৃতীয় প্রদর্শন কালে ম্যাডান্ থিয়েটারে অত্যধিক লোকসমাগন হয়েছিল। Protest হয়েছিল, কিন্তু timely হয় নি। সমালোচকরা যদি বলেন, এ ছবি আমাদের অপমান করেছে তবে চিত্র-প্রিয়রা কোথায় কি করে অপমান করেছে তা দেখার লোভ অনুগ্রহ করে সংবরণ করবেন। বিদেশী ছবির distributor-দের অবস্থা মিঃ গ্রেগরির কথায় পরিষ্কার হয়ে গেছে। কলম্বিয়া পিক্‌চার্সের স্থানীয় শাখার সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নীতিশ লাহিড়ীর মত তাঁরা সবাই নিজেদের producerদের জানাতে পারেন না—If you want business here, stop vilifying India.

ইউনাইটেড্ আর্টিষ্টদের স্থানীয় শাখার ম্যানেজার মিঃ সিড্ লিউইস্ সেদিন আমাদের জানালেন তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ভারতের সম্মান রক্ষার্থ এক থেকে দেড় ডজন ছোট ছবি তুলতে মনস্থ করেছেন এবং ইউনাইটেড্ আর্টিষ্ট কোম্পানীকে ঐ ছবিগুলি পরিবেশনের ভার দেবেন। মিসেস লিউইস্ ঐ বিষয়ের যে আখ্যান রচনা করেছেন তাও তিনি আমাদের শোনালেন। ঐ সব ছবির ব্যয়ভার তাঁর কোম্পানী বহন করবে না, তিনি নিজেও সে বিষয়ে রাজী নন—তিনি চান কোন দেশী প্রোডিউসার অর্থ দিয়ে স্বদেশের মুখ রক্ষা করে।

আমরা দেখেছি বয়কট্ কোনো কাজের কথা নয়। আমেরিকান ছবি বয়কট্ করলে আমরা শিখবোই বা কোথা থেকে ছবির ভাল মন্দ! আমাদের ক জনের হাতে-কলমে বৈদেশিক শিক্ষা আছে? আমেরিকান ছবি দেখেই ত। আজ আমাদের এত Direction, scenario, technic, photography, audiography নিয়ে মাথা ঘামানো। আমরা অল্প সুযোগেই অধিক শিখতে পারি বটে কিন্তু আমাদের শিক্ষা যে সম্পূর্ণ নয় তার প্রমাণ আমাদের বর্ত্তমান ছবিগুলি। আর বয়কট্ করলেও vilification বন্ধ করা যায় না। আমরা পূর্ব্বে বলেছি এবং এখনও বলছি দেশের মান বজায় রাখতে হলে antipropaganda বন্ধ করে counter-propaganda

David Copperfield ছবিতে ফ্রেডি বার্থোলোমিউ এবং এড্‌না মে অলিভার। এদের দুজনের গুণে শিশু ডেভিড্ ও বেট্‌সে বুড়ী অমর হয়ে থাকবে।

চালাতে হবে। আমাদের দেশের ছবিকারর। এ বিষয়ে অবহিত হোন। আমাদের দেশের ভাল জিনিষের ছবি তুলে তাঁরা বিদেশের বাজার হাত করবার সুবর্ণ সুযোগ হারাবেন না। পৃথিবীর সকলেই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, সি ভি রমণ, শরৎচন্দ্র, ধ্যানচাঁদ, উদয়শঙ্করের দেশকে জানতে চায় কিন্তু পায় না। এ

ওয়ালেস্ বীরি West Point of the Air এবং The Mighty Barnum চিত্রে আবার তার স্বাভাবিক, সুন্দর ও অবিস্মরণীয় অভিনয়-ক্ষমতার সুষ্ঠু পরিচয় দিয়েছে।

দেশের তুচ্ছতম খবর ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ছাপা হয়। ইউনাইটেড্ আর্টিষ্ট, আর কে ও রেডিও, যে কোনো distributor এরকম ছবি লুফে নেবে। জগৎকে জানানো দরকার যে ভারতবাসী শিক্ষিত ও সভ্য ত বটেই, জগৎকে দেয় তাদের অনেক কিছু আছে। এই সব ছোট ছবির বিনা পারিশ্রমিকে বা নাম মাত্র পারিশ্রমিকে ইংরাজি explanatory notes দিতে আমাদের প্রফেসররা গররাজী হবেন না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে ছোট ছবির আদর পৃথিবীর সর্ব্বত্র হবেই। তথা-কথিত 'বৎসরের শ্রেষ্ঠতম বাণীচিত্রে'র কিছু কমতি দিয়েও এ ছবি তুললে লাভ বই লোকসান নেই। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা বহু পূর্ব্বেই করেছি কিন্তু প্রোডিউসাররা আজও এ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার দেখে দুঃখ হয়।

বিদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচারের প্রয়োজন উপলব্ধি করে স্বর্গীয় ভি জে প্যাটেল তাঁর বহুমূল্য সম্পত্তির অধিকাংশ সুভাষচন্দ্রের নামে দিয়ে গেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ অর্থ আজও সুভাষচন্দ্রের হাতে পৌঁছাল না। সুভাষচন্দ্র কুৎসামূলক ছবিগুলির সন্ধান দিয়ে ও যথাস্থানে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁর দেশাত্মবোধেরই পরিচয় দিয়েছেন।

চিত্র পরিচয়

গত জুন মাসে সর্ব্বসমেত ৩৪খানা ছবি মুক্তিলাভ করেছে ; এর মধ্যে মাত্র একটি বাংলা, নাম 'দেবদাসী'। এপ্রিল মে জুন এই তিনটে মাস সহরের সিনেমাগুলি নানা কারণে অধিক সংখ্যক দর্শক পায় না এবং একারণে বছরের এই সময়টায় খুব বেশি সাধারণ ছবি চালানো হয়। আমাদের মতে (ক) শ্রেণীর ছবি হবে অসাধারণ, (খ) সুন্দর, (গ) উপভোগ্য এবং (ঘ) শ্রেণীর ছবি হবে সাধারণ। (ছ) চিহ্নিত ছবি ছেলেরাও দেখতে পারে।

সুইট্ এডেলাইন্ (ক)—আইরিন্ ডান্ ভাল গান গাইতে পারে জানতাম কিন্তু এই ছবি দেখে জানতে পারলাম তার গান পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়ে আনতে পারে। আইরিন্ সেরা অভিনেত্রী সুতরাং তার অভিনয় যে অনিন্দ্যসুন্দর হবে একথা বলা বাহুল্য। আর চমৎকার অভিনয় করেছে নিডা ওয়েষ্টম্যান্ নেলির ভূমিকায়। হিউ হার্বার্ট জোসেফ ক্যাথর্ণ ও নেড্ স্পার্কস খুব হাসিয়েছে। ডোনাল্ড উড্স্ ও লুইস্ ক্যাল্হার্ণের অভিনয় এবং ফিল্ রিগ্যান্ ও ডরোথি ডেয়ারের গানও ভাল হয়েছে। সর্ব্বোচ্চ প্রশংসার দাবী করতে পারেন প্রযোজক প্রবর মার্ভিন্ লি রয় তাঁর সঙ্গীতসুন্দর প্রযোজনার জন্য।

লা মিজারেবল্ (ক) ও (ছ) —ভিক্টর

হিউগোর যে কাহিনী শুনলেই মানুষ মুগ্ধ হয় তার নিখুঁত চিত্ররূপ যে আমাদের হৃদয় অধিকার করবে তাতে আর সন্দেহ কি! প্রত্যেকটী চরিত্র পটে প্রাণময় হয়ে উঠেছে। Jean Valjeanএর অতীব কঠিন ভূমিকায় M. Harry Baur যে কলাকৌলীন্যের পরিচয় দিয়েছেন ক্বচিৎ কদাচিৎ তার তুলনা মেলে। ছবিটীর সংলাপ ফরাসী ভাষায় এবং সকলের সুবিধার জন্য ইংরাজি পরিচয়লিপি দেওয়া আছে কিন্তু প্রাণের সঙ্গে যার সংযোগ তার আর পরিচয়ে প্রয়োজন কি! Les Miserablesএর চিত্রগ্রহণও অপূর্ব্ব ; নূতন নূতন কোণ থেকে ছবি নেওয়া হয়েছে—ফটোগ্রাফি ছবিটীর বিশিষ্ট সম্পদ।

ডেভিড্ কপারফিল্ড (ক) ও (ছ)—ডিকেন্সের শ্রেষ্ঠ কাহিনী পটে অপরূপ রূপ পেয়েছে। বালক ডেভিডের অংশে ফ্রেডি বার্থোলোমিউ অসাধারণ সুন্দর অভিনয় করেছে। প্রথম দর্শনেই এই ফুলের মত ফুটফুটে ছেলেটীকে সকলেই ভালবাসবেন এবং তার গুণপনা দেখে আনন্দে আত্মহারা হবেন। এড্না মে অলিভার, ফ্রাঙ্ক লটন্, ডব্লু সি ফিল্ডস্, মাওরীন্ ও স্যালিভান্, এলিজ্যাবেথ এলান্, রোলাণ্ড ইয়ং, জেসি রালফ্, লায়োনেল্ ব্যারীমোর, ম্যাজ ইভান্স, লিউইস্ ষ্টোন্ প্রভৃতি বিশজন তারকা ও নামজাদা নটনটী প্রত্যেকটী ভূমিকাকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। ডেভিডের ব্যথা বেদনা, দুঃখ দুর্দ্দশা, আনন্দ ও প্রেমের কাহিনী সবার মনেই গভীর রেখাপাত করবে। জর্জ্জ কিউকরের অনবদ্য প্রযোজনা ছবিটীর শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম উপাদান।

দি মাইটি বার্ণুম (খ) ও (ছ)—পৃথিবীর সেরা। Showmanএর চমকপ্রদ কাহিনী। ছবিটীর মধ্যে দুটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক, ওয়ালেস্ বীবির অতীব আনন্দকর অভিনয় এবং দুই, সিনেরিয়ো লেখকের situation তৈরী করবার অসাধারণ ক্ষমতা। প্রধানতঃ এই দুই কারণে ছবিটী একান্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। য়্যাডলফ্ মেঞ্জু, রচেল্ হাড্সন্, জেলেট্ বিচার প্রভৃতি সকলেই সুঅভিনয় করেছে। ভার্জ্জিনিয়া ব্রুসের ভূমিকায় বিশেষ কিছু নেই। ওয়াল্টার ল্যাংয়ের প্রযোজনা খুব সুন্দর হয়েছে।

ওয়েষ্ট পয়েণ্ট অব্ দি এয়ার (খ) ও (ছ)—প্রতিভাবান্ অথচ shaky পুত্রকে বিমানবীর করে তোলবার জন্য পিতার ত্যাগের ও স্নেহের বিচিত্র, রোমাঞ্চকর কাহিনী। ওয়ালি বীরি এই ছবিতেও তার অসামান্য প্রতিভার অনুপম পরিচয় দিয়েছে। রবার্ট ইয়ং, রোজালিণ্ড রাসেল্, লিউইস্ ষ্টোন্ মাওরীন্ ও স্যালিভান্ প্রভৃতিও সুন্দর অভিনয় করেছে তবে মাওরীনের চেহারা কিছু খারাপ হয়েছে দেখলাম যেন। মেট্রো দেখছি ওয়ালিকে ষোল আনা নায়ক করতে এখন আর রাজি নয় (যেমন মেট্রোরই Viva Villa বা টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির Bowery ও Mighty Barnum রিচার্ড বসুনের প্রযোজনা এক রকম ভালই। ছবিটিতে রোমাঞ্চ, উত্তেজনা ও বিস্ময়ের খোরাক প্রচুর।

নিম্নে (গ) শ্রেণীর ছবিগুলির নাম ও তাদের বৈশিষ্ট্যে পরিচয় দিলাম :—

এজ্ অব্ ইনোসেন্স (Back Streetএর নায়ক নায়িকা জ বোল্স্ ও আইরিন্ ডানের অভিনয়) উইংস্ ইন্ দি ডার্ক (মার্ণা লয়ের অভিনয়), ওয়েষ্ট অব্ দি পিকস্ (ছ) কেণ্টাকি কার্ণেল (ছ) শিশু স্প্যাঙ্কির অভিনয়), ফলিস্ বার্জেয়ার (মরি শেভালিয়েরর বৈজয়ন্তী), হোয়াইট্ প্যারেড্ (লরেটা ইয়ংয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনয়), মিসিসিপি (ছ) (ডব্লু সি ফিল্ডসের অভিনয় এব বিং ক্রসবির গান ও অভিনয়), ওয়ান্ মোর স্প্রিং (জেনে গেনর ওয়ার্ণার বাক্সটার ও ওয়াল্টার কিংয়ের অভিনয়), থার্টি গেষ্ট (ছ), ফগ্ ওভার ফ্রিস্কো, অল্ দি কিংস্ জসেস্ (কা ব্রিসন্ ও মেরি এলিসের গান ও নাচ), স্পিট্ফেয়ার (ক্যাথরি হেপ্বার্ণের Personal triumph), হ্যাপিনেস্ এ হেড (ডি পাওয়েলের গান) এবং মার্ডার ইন্ দি ক্লাউডস্।

(ঘ) শ্রেণীর ছবিগুলির উল্লেখ করলাম না।

দেবদাসী—পাইয়োনীয়র ফিল্মসের বাংলা ছবি অত্যাচার ও ব্যভিচার-পরায়ণ সমাজপতিদের ক একে আমরা শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে গেছি তা ওপর এই Over-dealt theme কে বলবার ধর সম্পূর্ণ বিশেষত্বহীন। সুতরাং আখ্যানভাগের আকর্ নেই। প্রযোজক প্রফুল্ল ঘোষ চিত্রনাট্য রচনার নামে নলি চট্টোপাধ্যায়ের মূল নাটকটী প্রায় অপরিবর্ত্তিত রেখেছেন চিত্রনাট্য দুর্ব্বল ও তাতে আছে অপটু হাতের ছাপ দেবদাসীর চিত্রনাট্য বলতে একরকম কিছুই নেই, মঞ্চো যোগী নাটকটী স্বাভাবিক দৃশ্য-সংযোগে পটে ধরে দেবা চেষ্টা হয়েছে। ফলে ছবি হয়েছে প্রথমদিকে অসংলগ্ন অস্থানে গীতি সন্নিবেশের ফলে ছবির গতি অত্যন্ত মন্থ হয়েছে। প্রযোজনায় কৃতিত্ব ও মস্তিষ্কের পরিচয় নেই।

'দেবদাসী' আসলে যখন এক নিতান্ত সাধারণ নাটকে ছায়ারূপ তখন অভিনয় তার মঞ্চোপযোগী হওয়াই স্বাভাবি এবং হয়েছেও তাই। অহীন্দ্র চৌধুরী সুন্দর অভিনয় করেছে কিন্তু সে অভিনয় মঞ্চোপযোগী। ইন্দু মুখোপাধ্যায় ও ভা রায়ের উপযুক্ত অভিনয় সম্বন্ধেও আমাদের ঐ মত। শা গুপ্তার অভিনয় নিতান্ত প্রাণহীন এবং নিতান্ত "অভিনয় রবি রায়ের ভূমিকায় সাহিত্যিক-সুলভ বচনই আছে এ রবিবাবুর বাচন ভালই। অন্যান্য ভূমিকাতেও কিছু নেই বিনয় গোস্বামীর গানগুলি বেশ সুখশ্রাব্য।

আনন্দ

পট ও মঞ্চ

(প্রতিবাদ)

শ্রীদীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গত আষাঢ় মাসের "বিচিত্রায়" "পট ও মঞ্চ" প্রসঙ্গে "আনন্দ"-মহাশয় অনেক কথাই বলেছেন। প্রথমে তিনি "সমালোচকদের অবস্থা" সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তা পড়ে বোঝা গেল "বিচিত্রায়" লিখতে সুরু করার আগে তিনি "জন্মভূমি" নামক কোন কাগজে লিখতেন। একবার এক নাট্যাভিনয় দেখে এসে তিনি তার যে Just and impartial সমালোচনাটি লিখেছিলেন অফিসে গিয়ে তার প্রুফ দেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ ছবির নির্ম্মাতা "জন্মভূমির" সঙ্গে এক বছরের বিজ্ঞাপনের চুক্তি করার ফলে তাঁর লেখাটি আমূল পরিবর্ত্তিত হয়ে Slavish flatteryতে পরিণত হয়েছিল! তখন তিনি সম্পাদকের উদ্দেশ্যে * এক চিঠি লিখে তাঁকে নমস্কার জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অতঃপর যদি কেহ মনে করেন যে "আনন্দের" লেখার মধ্যে সুধু just and impartial সমালোচনা ব্যতীত আর কিছু থাকবে না এবং তাতে সমালোচনার নামে eulogise করা হবে না, তবে তাঁকে বড় বেশী দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু পর পৃষ্ঠাতেই দেখা গেল যে "নাটকের অভাব" সম্বন্ধে বলতে বসে তিনি "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" গেয়েছেন। ফলে তাঁর লেখা কতকগুলি নাট্যকারের ও লেখকের অকারণ স্তুতিবাদ ও অপর কতকগুলি নাটকের ও লেখকের বিশেষতঃ মহিলা ঔপন্যাসিকগণের, অযথা নিন্দাবাদে পরিণত হয়েছে। ব্যাপারটা হয়ত লক্ষ্য করবার মত নয়; কিন্তু কিছুকাল ধরে দেখা যাচ্ছে যে বাঙ্গালা যে সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রে পীঠ ও পট সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাদের সকলেরই মধ্যে মহিলা লেখিকাবৃন্দের উপন্যাসসমূহ অথবা তাদের নাট্যরূপগুলিকে যে কোন রকমে খাটো কর্‌বার যেন একটা বিশেষ প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে। ফলে নিরপেক্ষ সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষের গুণগানে পরিণত হয় এবং একজনকে বড় করতে হলেই আমাদের দেশে অপরকে ছোট করে দেখানোর যে দুদ্দমনীয় প্রবৃত্তিটা চিরকাল ধরেই আছে সেইটা উদ্দাম হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও এই নিরপেক্ষ সমালোচনাটি সেইরূপ এক পক্ষের স্তুতির বাহুল্য এবং অপর পক্ষের নিন্দাবাদে দাঁড়িয়েছে। যাদের লেখা নিয়ে এ সব আলোচনা হয় তাদের পক্ষে বাদ প্রতিবাদে নামা এবং নিজেদের সাফাই নিজে গাওয়া সুরুচিসম্মত অথবা শোভন হয় না বলেই তাঁরা নীরব থাকেন। কিন্তু অবস্থা এখন এমন জায়গায় এসে পৌঁচেছে যে এর একটা প্রতিবাদ হওয়া নিতান্তই আবশ্যক বলে মনে করি।

"আনন্দ" বলেছেন "অভিনয়ে আর নাটকে এসে গেছে কৃত্রিমতা আর প্যাঁচ (যেন এইটাই মনীষীদের নাটকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান ছিল) এবং তাই দেখতে পাই বাংলা রঙ্গালয়ে মেয়েদের উপন্যাসের নাট্যরূপ।" কথাগুলির মানে ঠিক বোঝা গেল না। কৃত্রিমতা ও প্যাঁচ কি সুধু মেয়েদের উপন্যাসেই আছে? তা ছাড়া কৃত্রিমতা ও প্যাঁচ বলতে আনন্দ কি বোঝেন তা আরও স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন ছিল। কারণ এর পরই তিনি যা বলেছেন একটু ভেবে দেখলেই তিনি বুঝতে পারতেন যে সেগুলি সুধু মেয়েদের উপন্যাসেরই এক চেটিয়া সম্পত্তি নহে। তাঁহার মতে "ঐ সব উপন্যাসে আছে দ্বিরুদ্বাহ, একের বাগ্‌দান ও অপরের প্রতি প্রেম, বিধবার দীর্ঘশ্বাস, সমাজের ঘোঁট, হাঁড়ি হেঁসেলের কথা এবং সর্ব্বোপরি মৃত্যু এবং কল্পনীয়, কল্পনাতীত সর্ব্বপ্রকার ট্রাজিডি বা sob-stuff।" পুরুষলেখকগণের কা'র কা'র লেখাতে বর্ণনীয় বিষয়গুলি আছে তা নাম করে নির্ণয় করে প্রবন্ধের কলেবর অকারণ বর্দ্ধিত করা নিরর্থক। সুধু তাঁর মতে যে নাটকখানি আদর্শস্থানীয়

* কথাটি তাঁর লেখা থেকে নেওয়া

হয়েছে সেই খানির ও আর কয়েকটির নাম করা যাক। "দেনাপাওনা," পল্লীসমাজ" ও "দত্তা" অথবা তাদের নাট্যরূপ "ষোড়শী," "রমা" ও "বিজয়ায়" বোধ হয় সমাজের ঘোঁট, হাঁড়ি হেঁসেলের কথা, এককে বগ্‌দান ও অপরের প্রতি প্রেম, বিধবার দীর্ঘশ্বাস ও সর্ব্বোপরি ষ্টেজের উপর মৃত্যু এ সবের কিছুই নাই? না "আনন্দ" বইগুলি পড়েন নি?

"বিজয়ার" সাফল্যের কারণ নির্ণয়ও যে তাঁর ঠিক হয়েছে তা মনে হয় না। তিনি বলেছেন "বিজয়াতে" প্যাঁচ নেই, তথাকথিত Complex character নেই, কিন্তু "বিজয়া" কি পাবলিক্ নেয় নি? বরঞ্চ এতবেশী আদর হালফিল কোন নাটক পায়নি। "বিজয়া" সমাদৃত হবে না কেন? তার প্রত্যেকটি চরিত্রের সাথে আমাদের পরিচয় আছে, সবাইকেই যে আমরা চিনি ও জানি! মানুষ যদি নাটকে তার অন্তরের ভাষা শোনে, মহত্তর জীবনের ইঙ্গিত পায় তবে সে নাটক ত' সে গ্রহণ করবেই।"

'বিজয়া' সাধারণে সমাদৃত হয়েছে, ভাল কথা; তাতে কা'রও আপত্তি কর্‌বার কিছু নাই। কিন্তু আমাদের দেশে এক পক্ষকে বড় করতে হলে আর সকলকে তুচ্ছ করবার এবং সেজন্য দরকার হলে প্রকৃত কথা গোপন করবার যে মনোবৃত্তিটা দেখা যায়, তাহা যে সর্ব্বথা নিন্দনীয় সে কথা পূর্ব্বে বলেছি। তবে যদি 'আনন্দ' বলেন যে "মন্ত্রশক্তি" (১৯২৯) এবং "মহানিশা" ও "মা" (১৯৩৩) হালফিল পর্য্যায় মধ্যে পড়ে না, সে কথা স্বতন্ত্র। "অন্তরের ভাষা" ও "মহত্তর জীবনের ইঙ্গিত" "বিজয়াতে" 'আনন্দ' কি দেখেছেন তিনিই জানেন। কথা দুটিতে কি বোঝায় তিনি বলতে পারেন। হয়ত তাও পারেন না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য নানা quibble-এর মধ্যে এই কথা কয়টারও বহুল প্রচলন ঘটেছে।

তারপর "আনন্দ" শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে "অপরের রচনার নাট্যরূপদানে নিজের প্রতিভার অপব্যয়" না করে স্বয়ং নাটক রচনা করতে উপদেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর এ প্রস্তাবের সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। বাস্তবিক যিনি উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রসৃষ্টি করেছেন নিজ সৃষ্ট চরিত্র নিয়ে নাটক-রচনা তাঁর হাতে যেমন মূর্ত্ত হতে পারে অপরের পক্ষে তাহা কি আর সম্ভব? আমাদের মনে হয় "বিজয়ার" সাফল্যের কারণগুলির মধ্যে "আনন্দ" এইটিকেই সর্ব্বপ্রধান বলে ধরে নিতে পারতেন।

আর একটি কথা বলে এবার শেষ করব। "আনন্দ" প্রশ্ন করেছেন "নাট্যকারদের মধ্যে যোগেশ চৌধুরী, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত প্রভৃতি কোথায়? তাঁদের চেষ্টার বিরতি ঘটেছে কেন?" এ প্রশ্ন নিরর্থক। বিগত কয়েক বৎসরে মধ্যে এঁদের প্রত্যেকের কয়খানি নাটক অভিনীত হয়েছে এবং তা কেন ঘটেছে একথা তিনি সামান্য চেষ্টা করলে নিজেই জানতে পারতেন। সুতরাং "এ যুগে নাট্যালয় জোর করে পাব্‌লিককে গিলিয়েছে নিমতিক্ত মেয়েদের উপন্যাসের নাট্যরূপ" কথাটা ছেলেদের পক্ষে শুনতে বেশ মধুর হলেও আদৌ সত্য নহে। বরং নাট্যালয় প্রদত্ত মেয়েপুরুষের নাটক ও নাট্যরূপগুলির মধ্যে পাবলিক্ যেগুলিকে অবান্তর মনে করেছে সেইগুলি পরিত্যাগ করে যাদের মধ্যে কিছু সার পেয়েছে অথবা "আনন্দ" মহাশয়ের ভাষায় বলতে যাদের প্রত্যেকটি চরিত্রের সাথে তাদের চেনা পরিচয় আছে এবং যার মধ্যে "মহত্তর জীবনের ইঙ্গিত" পেয়েছে সেইগুলিকেই গ্রহণ করেছে বলাই অধিকতর সঙ্গত ও বিচারসহ। মেয়েদের লেখার আর যত দোষগুণ থাক, তাঁরা propaganda করে নাম কর্ব্বার জন্য যে লালায়িত নন, এ কথাটা তাদের অতি বড় বিরুদ্ধ পক্ষীয়কেও স্বীকার কর্ত্তে হবে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী এম-এ

টবল—

এবারও নামজাদা টিমের স্বপ্নরচা কত আশা ও আকাঙ্ক্ষা
ঙ্গে চূরে লীগের শীর্ষস্থান অধিকার করল মহমেডান স্পোর্টিং।
৭ ৩ বৎসর আগে প্রথম ডিভিসনে খেলতে নেমে দু দুবার
গ নিয়ে ক্যালকাটা লীগ ইতিহাসে এক রেকর্ড করবার
ন্ন করেছে। কেউ বলে, ভারতের নানা জায়গা হতে

মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং খেলায় গোলকিপার কে দত্ত একটি অনিবার্য্য গোল বাঁচাচ্ছে। মহমেডান স্পোর্টিং এক গোলে জয়লাভ করে।
(অমৃত বাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

ান পেশোয়ার, বাঙ্গালোর, দিল্লী, ইউ, পি প্রভৃতি বাছা
া মুসলমান খেলোয়াড় জড় করে মহমেডান স্পোটিং
ম্পিয়ান হবে, এ আর আশ্চর্য্য কি ! কিন্তু সেই বিষয়ে
বেঙ্গল টীম ত কম যায় না। তিন বছর ক্রমান্বয় চ্যাম্পিয়ান
হয়ে ডারহ্যাম লাইট ইনফ্যানট্রি গত বছরে লীগ চ্যাম্পিয়ান
হওয়ার প্রতি একটা বিদ্বেষ ভাব এসে গিছলো ; তারপর
আবার মোহনবাগান সুদক্ষ খেলোয়াড়দের সব সাউথ আফ্রি-
কায় টিমে ছেড়ে দিতে, এতবড় সুবর্ণ সুযোগ সেবার মাঠে
মারা যায়। এবার শেষ পর্য্যন্ত কে বাজী জিতবে সে'ত এক
অনিশ্চিতই ছিল। ইষ্ট বেঙ্গল, মহমেডান স্পোটিং, ব্ল্যাকওয়াচ,
মোহনবাগান, কালীঘাট লীগের শেষ পর্য্যন্ত
সমান সমান যায়, সবারই মনে এক দারুণ সন্দেহ
কার ভাগ্যে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়ে।
বরুণ দেবতা নিজের কর্ম্ম গেলেন ভুলে।
আগে জুনমাসে লীগের মাঝামাঝি বৃষ্টিতে ভিজে
শুকনো মাঠে জল জমে যেত কিন্তু এবার দু
ফোঁটা মাত্র জল দেখা দিল একেবারে জুলাইর
গোড়ায় অর্থাৎ সারা মাঠ তখন তপ্ত রোদে
পুড়ে খাঁ খাঁ করেছে, মাটীগুলো পাকিয়ে শক্ত
ডেলা হয়ে উঠেছে এবং লীগও প্রায় শেষ
অবস্থায় এসে পৌছেছে। হঠাৎ হারান উদ্যম,
উৎসাহ ও ক্রীড়া নৈপুণ্য এক নিমিসেই ফিরিয়ে
এনে মহমেডান স্পোর্টিং লীগের শেষে কয়েকটি
ম্যাচে মরণ পণ করে নামল বিজয়ী হবার
নেশায়। এক ই, বি, আর-এর হাতে অভাবনীয়
পরাজয়ের পর কেউ এদের বিজয় পথের বিঘ্ন সৃষ্টি করতে
পারলে না। রহমত ও রসিদ ঠিক যেন আগেকার মোহন
বাগানের কুমার আর মোনা দত্ত। রসিদের বহু স্কোরের
পশ্চাতে শিল্পী রহমতের কতখানি হাত আছে; এ কে না

জানে। অখিল আমেদ দু বছর আগেকার সেই মুগ্ধকর খেলা যেন হারিয়ে বসেছে। ব্যাকে পেশোয়ারী জুম্মাখাঁ মন্দ খেলেনি। ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, ডালহৌসি, ব্ল্যাকওয়াচ, ক্যালকাটা প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট টিমদের, এরাই, একমাত্র হারায়।

লীগে রাণাস আপ্ হল ইষ্ট বেঙ্গল। এ কৃতিত্ব ইষ্টবেঙ্গল আগেও অর্জ্জন করার সময় যে আনন্দটুকু ছিল এবার তারই বিপরীত একটা অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ সারা মাঠে ঘাটে এখনও পাওয়া যায়। শুধু এক পয়েণ্টের জন্যেই নয় শেষের দিকে কালীঘাট বা মোহন বাগানের সঙ্গে ড্র না করলে আর লীগের গোড়ার দিকে ইচ্ছামত হেরে অমূল্য পয়েণ্টগুলি নষ্ট না করলে আজ ইষ্ট বেঙ্গলের আনন্দ ও প্রাণ-খোলা হাসি মাঠে ঘাটে ফুলিয়ে উঠত না। এক পয়েণ্টের জন্য লীগে উচ্চ সম্মান হাত থেকে ফসকে যেতে পারে—এত বড় শিক্ষা ইষ্ট বেঙ্গলই পেলো। টিমের পিভট্ নূর মহম্মদ এবার যেন সব টিমের সেণ্টার হাফের উৎকৃষ্ট খেলাকে ম্লান করে দিয়েছে। এক মোহনবাগানের্ সন্মথ দত্ত ছাড়া এত দরদ দিয়ে টিমের জন্য কাহাকেও খেলতে দেখেনি। এই দুর্লভ গুণ আজ আর খেলার মাঠে বড় বিশেষ দেখা যায় না। লক্ষ্মীনারায়ণের খেলায় সকলেই আনন্দ পেয়েছে। দুলালের চমৎকার খেলার জন্য সেই অনেকাংশে দায়ী। মজিদের গ্যালারী গেমের দোষ বোধ হয় পূর্ব্বজন্মের ফল আর ধূমকেতুর মত উড়ে এসে গোলকিপারকে বোকা বানিয়ে গোল দিতে হীরা দাসই সব চেয়ে পটু! লীগের প্রথম দিকে ব্ল্যাকওয়াচ বেশ খেলছিল।

ব্ল্যাকওয়াচ বনাম ইষ্টবেঙ্গল ম্যাচ-এ মজিদ হেড করছে। (এ্যাডভান্সের সৌজন্যে)

আকাশের দিকে চোখ রেখে অনেকেই একেই শেষ বাজী মারবে বলে পথ চেয়েছিল কিন্তু বরুণ দেবতার কৃপা'ত হল না; তারপর দ্রুত ও চতুর ভারতীয় দলের কাছে শ্লো টিম ব্ল্যাকওয়াচ তেমন করে যুজতে পারল না। দ্বিতীয় ভাগে

মোহনবাগানের কাছে ৩ গোল ইষ্টবেঙ্গল ১ গোল মহমেডান স্পোর্টিং ২—১. ডালহৌসি ১ গোল অর্থাৎ বিশিষ্ট টিমের কাছেই এরা পরাজিত হয়েছে। বৃষ্টি পড়লে একটা আপসেট্ হ'ত –এ খুব সত্যি। মনস্থনে ব্ল্যাকওয়াচ ভাল খেলে, কাষ্টমসকে ৪ গোল এবং ডালহৌসিকে ৭ গোলে হারানই প্রমাণ।

লীগের প্রথম হাফে কালীঘাট প্রথম হয়ে সকলের মনে এক বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছিল। লীগ চ্যাম্পিয়ান কালীঘাট হ'তে পারে—এতবড় অঘটন ঘটাতে সে অপারগ নয় লীগে অনেক উত্তম খেলাই প্রমাণ। খেলোয়াড়রা হঠাৎ সাহস ধৈর্য্য ও উৎসাহ সব না হারিয়ে বসলে লীগ চ্যাম্পিয়ানপদে আজ তাদের কে আটকায়! কালীঘাট কত নিকৃষ্ট খেলতে পারে তারই নিদর্শন দিল ক্যালকাটা ম্যাচে; ফলে ক্যালকাটা দল ১ গোলে জয়লাভ করে। বেণীপ্রসাদ ও এস, রায় দুজনেই উক্ত টিমের উৎকৃষ্ট খেলোয়াড়। মজিদের চেয়েও স্বার্থপর,

ছট্টু কুমার (মোহন বাগান)

মন্মথ দত্ত (মোহন বাগান)

হাততালির লোভে গ্যালারী গেমে প্রেমলাল সকলকে হার মানিয়েছে। মিড-ফীল্ডে জন্ ভাল খেললেও গোলের মুখে খেলার সব দোষটুকু প্রকাশ করে ফেলে। সাবু, এস, ব্যানার্জি ও বি, বোসের খেলা বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।

লীগের এত উচ্চস্থানে বসে ই, বি, আর এই প্রথম। বরাবর লীগের প্রায় শেষের দিকে ই, বি, আরকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মুগ্ধকর খেলা দেখিয়ে সকলকে আনন্দ দিয়ে মহমেডান স্পোর্টিংকে ২ গোলে হারিয়ে ই, বি, আর সারা মাঠে এক চাঞ্চল্য উপস্থিত করেছিল। তার ফলে লীগ প্রায় সব আপসেট্ হয়ে যায় যদিও শেষ পর্য্যন্ত মহমেডান স্পোর্টিংই চ্যাম্পিয়ান হয়। পুরানো মোনা দত্তর হেড ও টকে কলকাতায় এমন কোন টিম নেই যে এখনও ভয় করে না, াদুকর সামাদের খেলা যেমন হওয়া উচিত ছিল তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেণ্টার হাফে সোম নিজের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। ব্যাকে কার্ভে ব্রাদারস্ দুটি রত্ন। বিপক্ষদলের বার বার আক্রমণকে এরাই একরকম দমন করে রাখে।

অগণিত ছেলেমেয়ের কতখানি উৎসাহ ও আনন্দ এক নিমেষেই মুছে গেছে এ মোহনবাগানের নিশ্চয়ই অগোচর নেই। শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান, ৭।৮ বার লীগে রাণার্স আপ, এত নিম্নস্থানে এসে পৌঁছবে কে জানত। লীগ চ্যাম্পিয়ানের বরাত মোহনবাগানের ক্রমেই যেন ফুরিয়ে আসছে। ১৯২৩ সালে তখনকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট টীম রেন্জারসকে জিততে পারলে লীগ বিজয়ী হ'ত; খেলায় পেনাল্টি পেয়েও মণি দাসের অকৃতকার্য্যে শেষ পর্য্যন্ত ড্র করে নিরুৎসাহ ও ভগ্ন মনে মাঠ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। এতবড় স্বর্ণ সুযোগ এবং এরই কাছাকাছি আরও কয়েকটি মোহনবাগানের হাত থেকে কতবার পালিয়ে গেছে মাঠে ঘাটে আজও তার প্রমাণ আছে। মোহনবাগানের বর্ত্তমান অবস্থা অস্তমিত মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দুর্ব্বল অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়। আকবর ঔরংজেবের বংশধরের অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারী ফকির উদ্দেসা বাহাদুর সা আর বিজয় ও শিব ভাদুড়ী, সুধীর চ্যাটার্জ্জী অভিলাষ, কানু, রাজেন সেন, পাল, রবি গাঙ্গুলি, এস, বোস, কুমার, শরৎ সিংহ ও মোনাদত্তের স্থানে বর্ত্তমান অযোগ্য সব খেলোয়াড়রা এ, দেব, নকুল, অশোক, বোখরা, এস, বোস, মিশ্র প্রভৃতি। এঁদের অনেকেই বি ডিভিসন বা পাওয়ার লীগ খেলবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছেন কিনা ভুল হয়। একা মন্মথ দত্তই টীমটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। হামিদ আর করুণা না থাকিলে টীমটা আরও কত নিম্নস্থানে এসেই না পৌঁছাত। পূর্ব্বেকার নিখুঁত খেলা করুণার মাত্র ২।১টী গেমে দেখা গিয়েছিল। নন্দচৌধুরীর দ্রুতগতি চাতুর্য্য এবং হেড সবই সুন্দর তবুও মোনাদত্তর পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা নেই। অন্যান্য টীমের চেয়ে ফরওয়ার্ড লাইন কত দুর্ব্বল। ভাল স্কোরারের অভাবে মোহনবাগানের আজ এত দুর্গতি, তা না হলে একরকম খেলার মাঠ থেকে বিদায় হয়েও কুমারকে আবার খেলতে হয়!

কোন খেলা আপসেট্ কর্ত্তে কাষ্টমস্‌এর তুলনা হয় না।

মোহনবাগান, ব্লাকওয়াচকে হারিয়ে, এবং মহমেডান স্পোর্টিংএর সঙ্গে ড্র করে কাষ্টম্‌স্ লীগের মাঝের স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট আছে। বুড়া নীলের খেলার চাতুর্য্য এখনও কমেনি। সেণ্টার হাফে ডেভিস ও ফরওয়ার্ডে সিম্যান ও ডিফেণ্ডসের খেলা বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। ডালহৌসি টীম তত সুবিধা কর্ত্তে পারেনি। প্রথম হাফে বেশী ভাগ খেলায়ই ড্র করেছে। পুরান ডেভিস ও ব্রাউটন ছাড়া এ টীমে আজ আর কেউ নেই। নতুন খেলোয়াড়দের এখনও মাঠ চিনতে বোধ হয় দু বছর লাগবে। গোড়ার দিকে ক্যালকাটার খেলার যেমন পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল যেন বি, ডিভিসনে নাবলেই হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাঁচালো হাওড়া ইউনিয়ন এবং টীমের গোল্ড ও আরমষ্ট্রং। কালীঘাটকে ১ গোলে হারিয়ে ক্যালকাটা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিল কিন্তু শেষের দিনে মহমেডান স্পোর্টিংএর খেলায় পেনাল্টি পেয়েও বুড়া নাইট গোল দিতে অসমর্থ হওয়ায় একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাটের টেণ্ট থেকে বেরিয়ে আসে। সেদিনকার খেলা অন্ততঃ ড্র হলেও এবারের লীগে কে চ্যাম্পিয়ান হত বলা শক্ত। খেলা অনুসারে লীগে নিম্নস্থান এরিয়ান্সের হওয়া উচিত নয়। বিশিষ্ট টীমদের এরিয়ান্সই প্রায় রীতিমত বেগ দিয়ে আসে, কিন্তু ননে মজুমদার পায়ে আঘাত পেয়ে কিছুদিনের জন্য বিদায় নিতে টীমটা সত্যই দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ডিভনস মিলিটারী টীমের নামে সম্পূর্ণ অযোগ্যতা প্রমাণ করেছে। ড্রাগুণ এদের কীর্ত্তি আজ যেন স্বপ্ন হয়ে পড়েছে। তবে বৃষ্টি হলে টীমটা আরও যোগ্যতার পরিচয় দিত সন্দেহ নেই। এবার প্রথম ডিভিসন থেকে বিদায় নিল হাওড়া ইউনিয়ন, গত ৫ বছর ধরে হাওড়া তার যতটুকু সামর্থ্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণ করে এসেছে। তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে সে এবার তত কৃতকার্য্য হয়নি তাতে দুঃখ করবার নেই। আবার সে প্রথম ডিভিসনে আসবে এ আশা সকলেই রাখে।

লীগের ফলাফল

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	গোল স্বঃ	গোল বিঃ	পয়েণ্ট
মহমেডান স্পোর্টিং	২২	১১	৮	৩	৩৭	১৭	৩০
ইষ্ট বেঙ্গল	২২	১১	৭	৪	২৯	১৭	২৯
ব্ল্যাক ওয়াচ	২২	১২	৩	৭	৩৭	১৮	২৭
কালীঘাট	২২	৯	৮	৫	২৯	২২	২৬
ই, বি, আর,	২২	৮	৯	৫	২৮	২৩	২৫
মোহনবাগান	২২	৮	৮	৬	২৩	২২	২৪
কাষ্টমস	২২	৮	৭	৭	৩০	৩৩	২৩
ডালহাউসি	২২	৫	১০	৭	১৯	২৬	২০
ক্যালকাটা	২২	৬	৬	১০	১৯	১৬	১৮
এরিয়ান্স	২২	৬	৫	১১	১৬	৩২	১৭
ডিভন্স	২২	৫	৪	১৩	২৪	৪৪	১৪
হাওড়া ইউনিয়ান	২২	৩	৫	১৪	১০	৩৬	১১

ইণ্টারন্যাশান্যাল ম্যাচ—

বহুদিন পরে ভারতীয় দল এবার ইউরোপিয়ানদের হাতে পরাজয়ের গ্লানি বরণ কর্ত্তে বাধ্য হল। কয়েকবছর ধরে ইণ্টারন্যাশনাল ম্যাচে ইউরোপিয়ানদের অতি সহজ ও সুন্দর ভাবে হারান ভারতীয় দলের একটা পাকা বন্দোবস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল; এবার কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা গেল ২—১ গোলে হারিয়ে জয়ের একটা অপরিমিত আনন্দ বহুদিন পর ইউরোপিয়ানরা পেলো। বাছা বাছা খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দল গঠিত হয়েছিল। এমন দুর্দ্ধর্ষ ফরওয়ার্ড শুধু খেলার দোষেই বারবার অকৃতকার্য্যের পরিচয় দেয়। রাইট আউট এন. ঘোষ খেলায় বেশীভাগই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। রসিদ, রহমত ও সামাদ—এই ৩ জনের দর্শকদের ভুলিয়ে নাম করবার লোভটুকু জয় করবার মতো মনে বল ছিল না। সেদিন টিপিটিপি বৃষ্টি হয়ে ক্যালকাটার মাঠ একটু ভিজে যায়। প্রথম ভাগেই ভারতীয় দল খেলায় মন দেবার আগেই রেনজারসের বিখ্যাত সেণ্টার ফরওয়ার্ড লাম্‌সডেন দুটো গোল ঢুকিয়ে দেয়। ভারতীয় দলের আত্মচেতনা ক্রমে প্রকাশ হতে এন, ঘোষের সুন্দর সেণ্টারে রসিদ কোনমতে ১টা গোল দিতে সক্ষম হয়। তারপর কত সুবর্ণ সুযোগ এল কিন্তু নিজেদের দোষে, আর ইউরোপিয়ানদলের ডিফেন্স প্রাণ দিয়ে খেলায় ভারতীয় দলকে সেদিনকার মত পরাজিত হয়ে ফিরতে হয়।

ভারতীয় দল :—এস, বানার্জ্জি (কালীঘাট); এস্ দত্ত মোহনবাগান) ও জুমা খাঁ (মহমেডান স্পোর্টিং): জে, ানার্জ্জি (এরিয়ান্স), নূর মহম্মদ (ইষ্ট বেঙ্গল) মাসুম মহমেডান); এন্ ঘোষ (স্পোর্টিং ইউনিয়ান), করুণা ট্টাচার্য্য (মোহনবাগান), রসিদ (মহমেডান), রহমত মহমেডান) ও সামাদ (ই, বি, আর, ক্যাপ্টেন)।

ইউরোপিয়ান দল: আরমষ্ট্রং (ক্যালকাটা: জি, ারভে (ই, বি, আর), ম্যাকফারলেন (ব্ল্যাক ওয়াচ): ারপার (ডিভন্স), ডেভিস (কাষ্টমস, ক্যাপ্টেন) েবুল (ক্যালকাটা): ব্রাউটন (ডালহাউসি), রিচি ব্লাক ওয়াচ), লামসডেন (রেঞ্জাস), সিম্যান (কাষ্টমস) ইুয়ার্ট (ব্ল্যাক ওয়াচ) রেফারি—এস, ঘোষ।

হকি—

নিউ জিলাণ্ডে ভারতীয় হকিদলের কৃতিত্ব বেশ সন্তোষজনক, প্রতিদিনকার খেলার ফলাফলই তার প্রমাণ। প্রায় শ বছর আগে নিউজিলাণ্ড হতে আমন্ত্রিত হয়ে ইণ্ডিয়ান ার্ম্মি হকি টীম ওদেশে খেলতে যায়। সেই টীমে একমাত্র অদ্বিতীয় ধ্যান চাঁদ ছিল। নিউ জিলাণ্ড অতি সহজেই সেবার বশ্যতা স্বীকার করেছিল। নিউ জিলাণ্ডে হকির ষ্টান্‌ডার্ড তখন অতি শিশু অবস্থায়, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই এরা অনেক উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে। জার্ম্মাণী, নরওয়ে, হল্যাণ্ডের ন্যায় তত উৎকৃষ্ট টীম না হলেও একদিন

ধ্যানচাঁদ

এরা হকির উচ্চতম স্থানে পৌঁছবে। নিউ জিলাণ্ডের সমস্ত শক্তি, সাধনা ভারতের কাছে অবনত হচ্ছে—তার প্রধান কারণ অদ্বিতীয় ধ্যানচাঁদ, রূপসিং ও ওয়েলস—এই থ্রি মাসকেটিয়ারসের" আশ্চর্য্যকর সঙ্ঘভাবে খেলা। ভারতীয় দলের বেশীর ভাগ গোল এরা তিনজনই দিয়েছে। হকৃবে টীমকে ১৭ গোল, প্রভাটি বে'কে কম করে ১১ গোলে পরাজিত করে। তারপর একেটা লুনার সঙ্গে খেলায় ভারতীয় দলের একটু অধঃপতনের পরিচয় পাওয়া যায়। নিউ জিলাণ্ডের উত্তম টীম হিসাবে উক্ত টীম স্থান পায় না অথচ মাত্র ৬—১ গোলে ভারতীয় দল জয়লাভ করে এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যকর ধ্যান চাঁদের স্কোরিং রেকর্ডে সেদিন শূন্য। রূপসিং ৫টি ও ওয়েলস ১টি গোল দেয়। তারপর নিউ জিলাণ্ডে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীম ওয়ানগ্যানিকে ১৪—৪ গোলে জয়লাভ কর্ত্তে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। বাংলার ভাল প্রথম ডিভিসনের টিমের মত এদের খেলার ষ্টাণ্ডার্ড কিন্তু ওটাকী টিমকে অতি সহজেই ১৬ গোলে হারায়। শুধু উক্ত টিমের গোলকিপার উইলসন সুন্দর খেলার দরুণ ভারতীয় দল ৪০ গোলে জয়লাভ কর্ত্তে সক্ষম হয়নি। কিন্তু হকি যুদ্ধে যথার্থভাবে ভারতীয়দলের সম্মুখীন হয়েছিল একমাত্র ওয়েলিংটন টিম। বহু সহস্র উৎসুক নর নারীর সামনে বিখ্যাত এথেলিক গ্রাউণ্ডে এই খেলা । প্রথম হাফে ওয়েলিংটন ২—১ গোলে হারে! মামুদ, ধ্যান চাঁদ, ওয়েলস্, রূপসিং ও গোলকিপার মুখার্জ্জি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দ্বিতীয় হাফে ওয়েলিংটন টিমের ডিফেন্স

অদ্বিতীয় ওয়েলস্

আর বিপক্ষদলের ক্রমান্বয় আক্রমণের কাছে দাঁড়াতে পারল না, শেষ পর্য্যন্ত ১০-১ গোলে পরাজিত হয়ে সেদিনকার খেলার যবনিকা পড়ে। তারপর ক্যানটারবারি টিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ৫-২ গোলে ওদের হারাতে ইণ্ডিয়ানদের বেশ কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হয়েছিল। হকি খেলা ভুলে এরা ফুটবল খেলারই অনুসরণ করেছিল যার ফলে ভারতীয় খেলোয়াড়রা বেশ আঘাত প্রাপ্ত হয়! এদের সত্যিকার হকি খেলবার ইচ্ছা থাকলে বোধ হয় মিনিটে মিনিটে গোল খেত সন্দেহ নাই। এদেশে সবচেয়ে শীতপ্রধান স্থান ইনভার কাসিনের দিকে ভারতীয় দল রওনা হয়। অসহ্য শীত ভ্রূক্ষেপ না করে ওটাগোকে ১৭ গোল সাউথ ক্যানটারবারিকে ১২ গোল এবং নর্থ ওটাগোকে ১৬-১ গোলে পরাজিত করে ভারতীয় দল এক আশ্চর্য্যকর ক্রিয়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে।

ক্রিকেট—

এই সেদিন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের হাতে পরাজয় স্বীকার করে নটিংহাম মাঠে ইংলাণ্ড ক্রিকেট যুদ্ধে সাউথ আফ্রিকার সম্মুখীন হয়েছে। টিমে খেলছে ইংলণ্ডের বাছা বাছা সব টেষ্ট খেলোয়াড় ওয়াট, হ্যামণ্ড, সাটক্লিফ, লেলাণ্ড, এমস্ ভেরিটি প্রভৃতি। প্রথম টেষ্টে টস্ জিতে ইংলণ্ডের সাটক্লিক ও ওয়াট ব্যাট কর্ত্তে নামে। সাউথ আফ্রিকার ফাষ্ট বোলার ক্রিস্প্ এবং লেফ্‌ট হ্যাণ্ড স্পিন বোলার ভিন্‌সেণ্ট ও ল্যাংটনের এর উপর আক্রমণের ভার পড়ে। প্রতিবলটি বেশ মনোযোগ দিয়ে খেলে ২৯০ মিনিটে ওয়াট (ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন) ১৪৯ রান করে। সুন্দর ষ্ট্রোক দেখিয়ে সাটক্লিফ ৬১ রান করে ইংলণ্ডের মোট স্কোরকে আরও বাড়িয়ে তোলে। হ্যামণ্ডের চমৎকার খেলা খোলবার মুখে ভিনসেণ্টের লুব্ধকর বলে এল, বি হয়ে যায়; অক্সফোর্ড ভারসিটির নামজাদা মিচেলইন মাত্র ৫ রান করে সকলকে নিরুৎসাহিত করে। সাউথ আফ্রিকার ফিল্ডিং বেশ সন্তোষজনক হয়েছিল; ভিন্সেণ্ট ৩ উইকেটে ১০১ রান ও ক্রিস্প দুই উইকেটে ৪১ রান নেয়। ইংলণ্ড ৮ উইকেটে ৩৮৪ রানে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। ইহার প্রত্যুত্তরে সাউথ আফ্রিকার প্রথম ব্যাটসম্যান সিভেল ও মিচেল ইংলণ্ডের মারাত্মক বোলিংএর কাছে বেশীক্ষণ টিকলো না। অতি উচ্চধরণের খেলা দেখিয়ে সিডেল ৪৯ রান করে কিন্তু চা পানের পর দুর্দ্ধর্ষ নিকল্‌সের বলে সাউথ এফ্রিকান খেলোয়াড়রা ভীত হয়ে পড়ল। একা কাসিরল ছাড়া পর পর ৫টি ব্যাটস্‌ম্যানের অতি সহজেই নিকল্‌সের হাতেই মৃত্যু হয়। নিকল্‌সের বোলিং এভারেজ তখন ৫ উইকেটে মাত্র ১৩ রান। তারপর আবার ভেরিটির বল খুলতে সাউথ এফ্রিকা সর্ব্বশুদ্ধ ২২০ রান করে ইংলণ্ডকে ফলো কর্ত্তে বাধ্য হল। দ্বিতীয় ইনিংসএ সাউথ এফ্রিকার প্রায় পরাজয় ঘটেছিল কিন্তু বৃষ্টি এসে সব আপসেট করে দেয়, সে জন্য খেলার ফলাফল অমীমাংসিত ভাবে থাকে।

ইংলাণ্ড বনাম সাউথ এফ্রিকা প্রথম টেষ্ট ম্যাচে সাউথ এফ্রিকা সিড্‌লঃ ব্যাট কচ্ছে। খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থাকে।

দ্বিতীয় টেষ্ট লর্ডস মাঠে আরম্ভ হয়। এই খেলায় ইংলণ্ডের অভাবনীয় পরাজয়ে সকলে বিস্মিত হয়। সাউথ এফ্রিকার কাছে ইংলণ্ডের এই প্রথম পরাজয়। অষ্ট্রেলিয়ার পর সদ্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কাছে পরাজয়ের গ্লানি এখনও ইংলণ্ড ভুলতে পারেনি; এখন শুধু বাকী ইণ্ডিয়া,—এদের কাছে

বশ্যতা স্বীকার করলেই ইংলণ্ডের দশা হবে বাংলার ফুটবল মাঠে মোহনবাগানের দুরবস্থার মতো। বাছা বাছা খেলোয়াড় নিয়েও ইংলণ্ডের বার বার পরাজয় ইংলণ্ডের বড় বড় ক্রিকেট অভিজ্ঞদের ভাবিয়ে তুলেছে, কারণ আসছে বছর ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ায় যাবে। সব চেয়ে প্রিয়, ক্রিকেটের অমূল্যরত্ন 'Ashes' লাভ কর্ত্তে। এই খেলায় সাউথ এফ্রিকার প্রথম ইনিংসএর ২২৪ রানে মিচেলের ৩০, রোয়ানের ৪০ এবং ক্যামিরনের ৭০ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিডেন মাত্র ৬ রান করেছিল। ভেরিটির এভারেজ তিন উইকেটে ৬১, নিকলস্ দু উইকেটে ৪৭ এবং হ্যামণ্ড দু উইকেটে ৮ রান। তদুত্তরে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের রান আরও চমৎকার হয়। সমস্ত দায়িত্ব নিজের মাথায় নিয়ে ওয়াট ৫৩ এবং হ্যামণ্ড ২৭ রানে টিমটিকে কোন মতে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এদের আশা ভেঙ্গে চুরে দেয় সাউথ এফ্রিকার বোলার বেলাকা। পাঁচ উইকেটে মাত্র ৪৯ রান বেলাকা দেয়। দ্বিতীয় ইনিংস এ ইংলণ্ডর সর্ব্বশুদ্ধ স্কোর মাত্র ১৫১—এ একটা রেকর্ড। একটা নিবিড় পরাজয়ে গোঁড়া ভক্তদের কাছে ইংলণ্ড তখন নুয়ে পড়েছে। সাটক্লিফ (৩৪) আর হ্যামণ্ড (২১) শেষ পণ নিয়ে একবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সে আর কতক্ষণ। সাউথ এফ্রিকা ২৭৮ রান করে ১৫৭ রানে জয়লাভ করে। ইংলণ্ডের সমস্ত বোলারের কৌশল ব্যর্থ করে ও আশ্চয্যকর ক্রীড়ানৈপুণ্যে সকলকে মুগ্ধ করে মিচেলের ১৪৯ রান নট আউট সেদিনকার সাউথ এফ্রিকার খেলার ছিল সব চেয়ে বিশেষত্ব।

টেনিস—

ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ানসিপ্

টেনিস জগতে পরিচিত ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ানসিপ খেলায় প্রতি বছরই বিশিষ্ট খেলোয়াড়রা দেখা দেয়। এবারকার সিঙ্গলস্ ফাইনালে আশ্চর্য্যকর ঘটনা পেরি, গ্রেট ব্রিটেনের এক নম্বরের খেলোয়াড় এবং ব্যারণ ভনক্র্যাম, জার্ম্মানীর এক নম্বর খেলোয়াড়এর সাক্ষাৎ ঘটে। ডেভিস কাপ ফাইনালেও এদের আবার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ভনক্র্যান গত বছরের ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ান, সুতরাং এই যুদ্ধের ফলাফল দেখার জন্য দর্শকদের বিশেষ ভীড় হয়েছিল। ইংলণ্ডের সম্মান বাঁচিয়ে পেরি ৬-৩, ৩-৬, ৬-১, ৬-৩ গেমে ভনক্র্যামকে পরাজিত করে। এই জয়লাভে পেরির সবচেয়ে আনন্দ যে ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ানসিপ পেরির অধীনে কখনও ভুল করে আসেনি। মহিলা সিঙ্গলস্
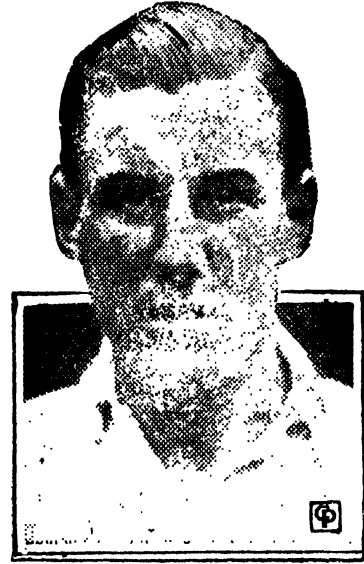
ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান পেরি

ফাইনালে মিসেস স্পালিং জার্ম্মানীর সম্মান রেখেছিল। টেনিসে ফ্রান্সের গৌরবময় সম্মান ক্রমেই অন্য দেশের হাতে এসে পড়ছে বিখ্যাত টুরণামেন্টের খেলার ফলাফলই তার প্রমাণ। তবু সুখের বিষয় সিঙ্গলস্ খেলায় ফ্রান্সের বাছা বাছা খেলোয়াড়দের পরাজয়ের পরেও মহিলা সিঙ্গলস্ ফাইনালে মাডাম মাথিউকে দেখতে পাই। খেলার ফলাফল মাথিউর রেকর্ডকে বিদ্রূপ করছে। মিসেস স্পালিং ৬-২, ৬-০ গেমে মাদাম মাথিউকে অতি সহজেই পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান হন।

ডেভিস কাপ—

উইম্বলডনে পৃথিবীর নানাদেশের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়ের প্রতি বছরই একসঙ্গে সন্নিবেশ হয়। টেনিস যুদ্ধে বিজয়ী হলে শুধু দেশের সম্মানই রাখা নয় পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ান খেলা হিসাবে দেশ দেশান্তরে সমাদর পাওয়া যায়। এত বড় উচ্চ আশা অন্তরের মাঝে

পোষণ করেই তরুণ খেলোয়াড়রা দর্শন দেয়। লাকস্ত্, কোশে, বরোত্রা, মাডাম লাংলেন এরাই একদিন টেনিসে

বিগ্যা ও বরোত্রা মেঙ্কিলএর বিরুদ্ধে খেলছে

ফ্রান্সে প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। আজ ভাগ্যচক্রে অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্যারিসের সেই প্রাইলিং খেলোয়াড় বরোত্রা সিঙ্গলস খেলাতে একরকম বিদায় নিয়েও শেষে বাধ্য হয়ে খেলতে নেমে যেকোশ্লোভ্যাকিয়ান চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড় আর, মেঞ্জলের কাছে ৫-৭, ৬-৪, ৬-২, ২-৬, ১১-৯ গেমে হেরে যায়। খেলার ফলাফলেই প্রকাশ মেঞ্জলে বরোত্রাকে জয় কর্ত্তে কত বেগ পেতে হয়েছিল। ফ্রান্সের তুলনায় এমেরিকার অবস্থা আরও শোচনীয়। টিলডেন, ভাইনস প্রফেসনাল হবার পর থেকে উইম্ব্‌ল্‌ডন চ্যাম্পিয়ানসিপ ইংলণ্ডের হাতে গিয়েই একরকম পড়েছে। কিন্তু মেয়েরাই এমেরিকার শেষ সম্মানটুকু রাখল; মিসেস হেলেনস্ উইলস্ মোডি মিস জেকব মুগ্ধকর ক্রীড়া কৌশলের পাশে কোন দেশের মেয়েদের স্থান নেই। এমেরিকার তরুণ খেলোয়াড় বাজ ভনক্র্যামের কাছে সেমি ফাইনাল গেমে হেরে যায়। ক্রীড়ামহলে একদিন সে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত কর্ব্বে উইম্ব্‌ল্‌ডন খেলাই তার আভাস দিচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়ার একমাত্র আশা ও ভূতপূর্ব্ব উইম্ব্‌ল্‌ডন্ চ্যাম্পিয়ান ক্রফোর্ড জাতভাই ইংলণ্ডের পেরির কাছে সেমি ফাইনালে ৬-২, ৩-৬, ৬-৪, ৬-৪ গেমে হেরে এবারকার মত বিদায় নিল। টেনিসে ক্রফোর্ডের রেকর্ড আশ্চর্য্য। গত বছর এই ওইম্ব্‌ল্‌ডনের ফাইনালে পেরির কাছে হারার পর ক্রফোর্ডের জীবনে সবচেয়ে উচ্চ আশা পূরণ করবার সে উৎসাহ উদ্যম যেন পালিয়ে গেছে। এবারকার সিঙ্গলস ফাইনালে দুটি তরুণ খেলোয়াড় পেরি ও ভনক্র্যামের সাক্ষাৎ হল। মহাযুদ্ধের পর টেনিস যুদ্ধে এই দুই দেশের মহারথীর সাক্ষাৎ একটি বিশেষ ঘটনা। এই বিশ বছরের মধ্যে জার্ম্মানীর কোন খেলোয়াড় ওয়েমব্লি ফাইনালে পৌঁছায়নি। প্রথম সেটে পেরী ভনক্র্যামের খেলার দোষে আর নিজের সুন্দর খেলার জোরে জেতে, দ্বিতীয় সেটে ভনক্র্যাম চমৎকার খেলতে থাকে। তৃতীয় সেটে ভনক্র্যামের স্পিন দেওয়া সার্ভিস মারাত্মক ব্যাকহ্যাণ্ড সট্ সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত কর্ত্তে পেরির সমস্ত ক্রিয়া কসরৎ প্রকাশ হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত পেরি ৬-২, ৬-৪, ৬-৪ গেমে ভনক্র্যামকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ান হলো। একদিন ভনক্র্যামকে উচ্চপদে দেখবো এ খুব সত্যি। মহিলা সিঙ্গল্‌স ফাইনালে হেলেন উইল্‌স মোডি নিজের দেশের মেয়ে মিস্ জেকবকে ৬-৩, ৩-৬, ৭-৫ গেমে হারিয়ে টেনিস মহলে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করল। মিস লেংলেনের পাশেই মিসেস্ হেলেন

অষ্টিন—গ্রেট ব্রিটেন

মহিলা সিঙ্গল্‌স চ্যাম্পিয়ন
হেলেন উইল্‌স্ মোডি

উইলসের আশ্চর্য্যকর রেকর্ড চিরদিন স্থান পাবে। ক্রমান্বয়ে ৭।৮ বার মহিলা সিঙ্গল্‌স জয়লাভ করে এবং বিশ্বের সব নামজাদা টুরণামেণ্টগুলি আয়ত্ত করে বিজয়িনী মিসেস মোডি ক্রীড়ামহলে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাচ্ছে।

ক্রীড়াজগতের খবর—

ইণ্ডিয়ান টেষ্ট ক্রিকেটার অলরাউণ্ডার অমর সিং বিলাতে ক্রিকেট মাঠে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন কর্চ্ছেন। এল, সি সির টীমের বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান জিমখানার হয়ে খেলতে নেমে মাত্র ১০ মিনিটে ৪৭ রান করেন। এ একটা রেকর্ড বল্লেও চলে।

বিখ্যাত সাঁতারু পি, কে, ঘোষ রেঙ্গুনে হাত পা বদ্ধ অবস্থায় প্রায় ২৪ ঘণ্টার অধিক অবিরাম সন্তরণ করেন। ক্লান্তি স্বেও তারপরে সিঙ্গাপুরের নামজাদা মিঃ গোল্ডম্যানকে অতি সহজেই ১০০ গজ সাঁতারে হারিয়ে সকলকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মিঃ ঘোষ জাপানে যাচ্ছেন ১০০ ঘণ্টা অবিরাম সাঁতার কেটে পৃথিবীতে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন কর্ত্তে। পথে সিঙ্গাপুরে সাঁতারের নানা ক্রিয়া কৌশল দেখাবেন স্থির করেছেন।

এবারকার কেণ্ট মহিলা সিঙ্গলস্ টুরণামেণ্টে খেলার সব চেয়ে আশ্চর্য্যকর ঘটনা হল ব্রিটিশ হার্ড কোর্ট চ্যাম্পিয়ান মিস্ ষ্টামার্সের পরাজয়। অতি সহজেই যে অজ্ঞাত নূতন খেলোয়াড় মাডাম পেনিটার কাছে হারবেন এ আশা অন্যায় কিন্তু অঘটন ঘটালেন পেনিটা ৬-৩, ৬-৪ গেমে ষ্টমার্সকে পরাজিত করে।

মিস লীলারাও আমাদের হতাশ করেছেন। বিলাতে কয়েকটা নামজাদা টুরণামেণ্টে সুনাম অর্জ্জন করলেও নিজের খেলার সবটুকু চাতুর্য্য ও দক্ষতা তিনি হারিয়ে বসলেন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানসিপে। তিন বছর আগেও মিস রাও প্রথম এসে তত সুবিধা কর্ত্তে পারেন নি। মিস ডিয়ার-ম্যানের কাছে মাত্র ৬-২, ৬-১ গেমে হেরে গিয়ে নিজের সুনাম নষ্ট করেন।

হার্লিংহ্যাম পোলো টুরণামেণ্ট ফাইনালে অপ্‌টিমিষ্ট দলকে ৮-৬ গোলে হারিয়ে মহারাজ কাশ্মীর দল বিজয়ী হয়েছে। পোলোতে যোদপুরের মহারাজার মতন বিলাতে কাশ্মীর তত নাম রাখতে পারেনি। সেবার যোদপুর খেলতে এসে সবকটা টুরণামেণ্টেই জয়লাভ করে।

ব্রিটিশ মহিলা ক্রিকেটদল অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথম খেলতে যাচ্ছে।
(অমৃত বাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

ক্যালকাটায় ওয়াডসওয়ার্থ চেস ট্রফি টুরণামেণ্টে প্রথম জয়লাভ করলেন বিদেশী হাঙ্গেরিয়ান খেলোয়াড় রবার্ট, পিকলার। দশ পয়েণ্টের মধ্যে পিকলারের স্কোর হয়েছিল সাড়ে নয়। তরুণ এস, সি, আঢ্য খেলায় বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৭ বছরের মেয়ে মিস হেলেন ষ্টিফেন্স ১০০ মিটার মাত্র ১১৩/৫ সেকেণ্ডসে এ দৌড়ে পৃথিবীতে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন। ২২০ গজ দৌড়ে মিস ষ্টেলা ওয়ালস্ পৃথিবীতে আর একটি নূতন রেকর্ড করেছেন। সময় ২৪৩/১০ সেকেণ্ড।

কলিকাতার লীগ ম্যাচ ফলাফল—হাওড়া বি-ডিভিসনে, পুলিস ও রেন্জারসের মধ্যে একজন এ ডিভিসনে, থার্ড ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ান এন্টালী স্পোর্টিং বি ডিভিসনে এবং পোর্ট কমিশনার ফোর্থ ডিভিসনে সব গেম জিতে সি ডিভিসনে খেলবে। এবার প্রথম ডিভিসনের সব চেয়ে ভাল স্কোরার হিসাবে রসিদ—১৫, পার্কার—১৪ সিম্যান—১৩, প্রেমলাল—১২ এবং নন্দ চৌধুরী—১০ গোল করার সম্মান পায়।

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী

স্মৃতি

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়নের নভে তব হয়তো এবার নব বাষ্প-মেঘ বাঁধিয়াছে বাসা,
পল্লব অধরে বুঝি নিঃশব্দে স্ফুরিছে কোনো অর্দ্ধস্ফুট লাজ-ভীরু বাণী,
কোলের উপর খোলা রয়েছে আমার এই ছন্দোময়ী চতুর্দ্দশীখানি,
অন্তরের অন্তঃপুরে লুকায়ে কাঁদিছে রিক্তা বিরহিণী বালিকা নিরাশা।
বেদনাবিধুর হিয়া উচ্ছলিয়া তুলিয়াছে অশ্রুলেখা কবিতার ভাষা,
কিসের ক্ষণিক মোহ বৈরাগী মনেরে কোন্ নিরুদ্দেশে নিয়েগেছে টানি;
পুরানো দিনের স্মৃতি সহসা নূতন হ'য়ে মর্ম্মতলে করে কানাকানি,
বুঝিতে পেরেছ আজ একখানি মুসাফির ব্যর্থ-কবি হৃদয়ের আশা।

সাতটি সাগর সখি, দুলিছে বুকের মাঝে শুধু মোর রাত দিন ধরি'
জীবন আঁধার করি নেমেছে নিবিড় ঘন দুর্য্যোগের সুদীর্ঘ শর্ব্বরী।
স্মৃতির জানালাগুলি খুলেদিয়ে শূন্য মন কেঁদে কেঁদে পায়নাক দিশে,
বাদল ধারার সাথে ব্যথাতুর মোর দুটি নয়নের জল যায় মিশে।
অবসন্ন হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে খালি কবিতার ছন্দ পায় মিল,
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস অতীতের ফুল-গন্ধে ভরি তোলে আমার নিখিল।

৮

সমন লইয়া আদালতের পেয়াদা দেখা দিল।

মালাধর পড়িয়া যাইতেছিল—বাদী শ্রীমত্যা সৌদামিনী ঘোষ, জওজে মৃত শিবনারায়ণ ঘোষ, জাতি কায়স্থ, পেশা—

দেখি—বলিয়া নরহরি তার হাত হইতে কাগজটা টানিয়া লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

মালাধর কহিল—শেষকালে ঐ যে লিখেছে, বুধবারে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া—মোটের উপর তারিখটা যেন ঠিক থাকে, হুজুর—

চৌধুরী মালাধরের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিলেন; সে দৃষ্টির সম্মুখে মালাধর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিল—মানে, ফৌজদারী মামলা কি না—অন্তর্জলী থেকে আসামী টেনে তুলে নিয়ে যায়···তাইতে বলছিলাম, তা দেখুন না হয় একবার যুক্তি-পরামর্শ করে—

হঠাৎ নরহরি হাসিয়া উঠিলেন। নীরস ভয়ানক হাসি, অন্তরের মধ্য অবধি কাঁপিয়া উঠে। বলিলেন—শ্যামগঞ্জের চৌধুরীরা কোন্ পুরুষে কবে কাঠগড়ায় উঠেছে মালাধর, যে মামলার তারিখ মনে করিয়ে দিচ্ছ? মরদে মরদে বিবাদ, লাঠিতে লাঠিতে তার মীমাংসা; আইন-আদালত করবে কি?

নিঃশ্বাস ফেলিয়া এক মুহূর্ত্ত তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন—তবে কিনা এবার মাঝে মেয়ে-মানুষ এসেছে। বরণডাঙার গিন্নি সদরে গিয়ে এমন করে মাথা মুড়োবেন, কে জানত? হাকিমের কাছে না কেঁদে আমার কাছে কাঁদলে দিতাম এ সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে—

চৌধুরী গম্ভীর ভাবে পায়চারী করিতে আরম্ভ করিলেন। মালাধর শ্যামকান্তের বৈঠকখানায় ঢুকিয়া গেল। অনেকক্ষণ এমনি কাটিল। শেষে নরহরি ডাকিলেন—রঘুনাথ!

রঘুনাথ আসিলে বলিলেন—চল, ঘুরে আসি: দু'জনে পাল্লা দিয়ে আজ ঘোড়া ছোটানো যাবে।

সর্দ্দার ও মনিব বিদ্যাধরীর কূলে কূলে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। বালুকায় ঘোড়ার খুরের শব্দ হইতেছে না। অনেক রাত্রি, চারিদিকে অতল নিস্তব্ধতা। তেঘরার বাঁকে জল নাই মোটে। নদীজলে ঘোড়া নামাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে তাঁরা পার হইয়া উঠিলেন।

গভীর রাত্রে কেউ বিদ্যাধরীর রূপ দেখিয়াছ?

ভাঁটার টান শেষ হইয়া ঘোলা জল থমকিয়া দাঁড়ায়, জেলেরা জাল তুলিয়া লণ্ঠনের আলোয় বাঁধের পথে ঘরে ফিরে, আবছা অন্ধকারে আকাশভরা তারা ঝিকমিক করে, ওপারে নির্জ্জন নিঃশব্দ দিগন্তবিসারী মাঠ, এপারে ঢালি-পাড়ার শত শত খোড়োঘর, বাবলা বন—; ঠিক এই সময়টা শ্রান্ত অবসন্ন নদী শিথিল দেহ এলাইয়া যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। খড়ের নৌকা, ধানের নৌকা, পূবদেশী ব্যাপারীর লঙ্কা-হলুদের নৌকা সারি সারি সমস্ত নোঙর ফেলিয়া বালু-

তটে মাথা রাখিয়া ঘুমায়, দিনের আলোয় যে মরদগুলার লম্বা পাকা লাঠি আর চিতানো চওড়া বুক দেখিয়া চমকিয়া ওঠ, রাতের নক্ষত্রালোকে মাটির দাওয়ায় কাঠির মাদুরের উপর অসহায়ের মতো তারাও পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়। হয়ত হঠাৎ অনেক দূর হইতে অস্পষ্ট একটা কুকুরের ডাক আসে, শোঁ-করিয়া আকাশে একটা উল্কা ছুটিয়া যায়, এক ঝলক শীতল নৈশ বাতাস ঘুমের মধ্যে একবার বা পাশমোড়া দিয়া জাগিয়া উঠে। হাওয়ায় হাওয়ায় জলতরঙ্গে সেই অপরূপ নির্জ্জনতায় রূপসী বিদ্যাধরীর এলানো আঁচল, গায়ের কত গহনা ঝলমল করিয়া উঠে!…

এত পথ দুজনে চলিয়া আসিলেন, ভাল-মন্দ একটি কথা নাই। যেখান হইতে নরহরি ঘোড়ায় চাপিয়াছিলেন, চাতালের নিকট সেখানটিতে আসিয়া তিনি লাফাইয়া নামিলেন। পুরাণো দুর্গের মতো বিশাল প্রাসাদ অন্ধকার-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। রঘুনাথ ঘোড়া দুটি আস্তাবলে লইয়া গেল। উঠানে ঢুকিয়া নরহরি দেখিলেন, শ্যামকান্তের বৈঠকখানায় আলো। অত বড় মহলের মধ্যে কেবল শ্যামকান্ত ও মালাধর জাগিয়া থাকিয়া কি পরামর্শে মাতিয়া আছে। মালাধরের এখন আর বাড়ী হইতে আসা-যাওয়া করিতে হয় না; এখানেই থাকে, বৈঠকখানার পাশের ঘরটা শ্যামকান্ত তাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। নরহরি ধীরে ধীরে সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। গম্ভীর স্বরে কহিলেন—সদরে গিয়েছিলাম—

পরামর্শ বন্ধ হইয়া গেল, দু'জনেই তাঁর মুখের দিকে চাহিল। নরহরি বলিতে লাগিলেন—কিছুতে বিশ্বাস হয় না, শিবনারায়ণের বউ সত্যি সত্যি গিয়েছে মামলা করতে—এ কি একটা বিশ্বাস হবার কথা? অথচ সমন দেখে অবিশ্বাসই বা করি কি করে? তাই গেলাম ভাল করে খবরটা নিতে। কৈলেস উকীলকে জিজ্ঞাসা করলাম—এ কি কাণ্ড, মশাই? সে বল্লে—দেওয়ানী-ফৌজদারী আজকাল কোন জমিদারের ঘরে বিশ-পঁচিশ নম্বর না আছে?—ওতে আর ভয়টা কি? বলিয়া নরহরি একটু হাসিলেন। বলিতে লাগিলেন—কৈলেস অভয় দিল, তবু ভয় আমার এত হয়েছে, সমস্তটা পথ কেবল ভাবতে ভাবতে এসেছি। ঐ সমস্ত করে এখন থেকে জমিদারী রাখতে হবে নাকি?

মালাধর বলিল—কিছু ভাবনা নেই। আমরাই বা পিছ-পাও কিসে? বরঞ্চ ঐ বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন—। বলিয়া শ্যামকান্তকে দেখাইয়া দিল।

সে কথা কানে না লইয়া নরহরি বলিতে লাগিলেন—বরণডাঙার গিন্নি যা করছেন, ঐ চল্‌ন এখন দেশের মধ্যে। পুরুষ-জোয়ান নেই আর—সমস্ত মেয়ে রাজ্য। আমি আর করব কি?—এবার আমার ছুটি। যা করতে হয় তুমি কর, শ্যামকান্ত। আমি মামলা-মোকর্দ্দমা করে বেড়াতে পারব না,—বুঝিও না।

মালাধর তৎক্ষণাৎ বলিল—বেশ তো হুজুর, আমরাই করব। দুই তুড়ি দিয়ে মামলা জিতে আসব। নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন আপনি। হেঁ হেঁ—পনের আনা তদ্বির এরই মধ্যে সারা।

শ্যামকান্ত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।—তা সত্যি। বড্ড কাজের লোক এই মালাধর। ওকে পেয়ে খুব কাজ হল। মামলার জন্যে কোন ভয় নেই, বাবা।

নরহরির মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—ভয়? বড্ড ভয়ই, সত্যি। কিন্তু আসল ভয়টা হচ্ছে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। তোমাদের সাথে তাল রেখে চল্‌তে পারছি নে। তারপর পুরাণো স্মৃতির ভারে নরহরির কণ্ঠস্বর যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। বলিতে লাগিলেন—শিবনারায়ণের বউ গেল সদরে নাকে কাঁদতে। বাঘের ঘরণীর এই দশা—কিসে আর সাহস থাকে বল। শিবনারায়ণের বিদ্যের কাছে নবদ্বীপের বামুনদের অবধি মাথা হেঁট হয়ে যেত। কিন্তু যেদিন থেকে জমিদারী কিনলেন, কোথায় গেল পুঁথিপত্তোর আর কোথায় রইল কি? ঐ বয়সে নিজে আর লাঠি ধরতে পারলেন না, দেশ-দেশান্তর খুঁজে নিয়ে এলেন চিন্তামণি সর্দ্দার। হাঁ—সর্দ্দারই বটে। একদিন সেখহাটির এক বাঁধের ধারে একটুখানি পরখ করতে গিয়েছিলাম। ডান কাঁধে আজও এই দাগ রয়েছে তার।—বলিয়া একটি স্বল্পাবশেষ আঘাত-চিহ্নের উপর সগর্ব্বে তিনি আঙুল রাখিলেন।

শ্যামকান্ত বলিল—অনেক রাত হয়ে গেছে বাবা, আপনি এখন বিশ্রাম করুন গে।

মৃদু হাসিয়া নরহরি বলিলেন—হাঁ যাই। পুরোপুরি

বিশ্রাম এবার। আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না শ্যামকান্ত, এখনও চিন্তামণি সর্দ্দার বেঁচে আছে, অথচ জমাজমির হাঙ্গামায় বরণডাঙার বাড়ী থেকে লাঠি বেরুল না, বেরুল একরাশ পচা কাগজপত্তোর। তাই ত বলি, আমরা সেকেলে মানুষ—বিদ্যে ত কেবল আঁকুড়ে ক আর বকঠুঁটো খ ;—ঐসব কাগজ-পত্তোরের আমরা বুঝি কি ? তুমি মস্ত বিদ্বান হয়ে এসেছ, ও সব তোমাদের পোষায়। এই কথাটাই তোমাকে বলতে এলাম।

বলিয়া হাসির শব্দে চতুর্দ্দিক সচকিত করিয়া নরহরি বাহির হইয়া গেলেন।

পাশের ঘরে সকলে অঘোরে ঘুমাইতেছে, নিঃশ্বাসের গভীর শব্দ আসিতেছে। নরহরির কিন্তু ঘুম নাই। শিয়রের দেয়ালে আঙটার উপর সযত্নে লাঠি রাখা আছে। এ লাঠি এখন আর ব্যবহার হয় না, পঞ্চাশ বছর আগে কিশোর বয়সে প্রথম তিনি এই লাঠি ধরিয়াছিলেন। মাথায় তার পেঁচানো সোনার সাপ, সাপের দুই চোখে দুটি লাল পাথর। নরহরি ঘুমাইয়া পড়িলে যৌবনের সাথী লাঠিখানা এখন পাথরের চোখ মেলিয়া পাহারা দিয়া থাকে। নির্জ্জন কক্ষে লাঠিয়ালের সঙ্গে লাঠি কথা কহে। আজ রাত্রে বাদাম বনে কুয়োপাখী ক্রমাগত ডাকিতেছে, ডাকাতের বিল ভরিয়া অজস্র জোনাকী, যেন আকাশের সমস্ত তারা ভাঙ্গিয়া খসিয়া ধূলার মতো হইয়া উড়িতেছে, যেন মাঠের মধ্যে শত শত দীপ জ্বালিয়া বড় ধুম করিয়া কাদের বিয়ে হইতেছে। নরহরির কি হইল—অনেক দিনের পর লাঠিটা নামাইয়া মুঠা করিয়া ধরিয়া শয্যার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিশোর কালে এমনি করিয়া লাঠি ধরিতে বুক ফুলিয়া উঠিত। অভ্যাসের বশে এখন আর সে উত্তেজনা নাই, লাঠির পরে সে ভালবাসা নাই, লাঠি যেন নরহরির মুখোমুখি চাহিয়া সেই সব দিনের কত দুঃখ করিতে লাগিল।

ও-ঘরে হঠাৎ স্বর্ণলতা ধড়মড় করিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া বসিল। বোধকরি কোন স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে। সভয়কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল—বৌদিদি, বৌদিদি! তারপর ঝিকে ডাকিতে লাগিল—হাবির মা, ও হাবির মা গো—

নরহরি ডাকিলেন—এসো মা, তুমি এ ঘরে এসো।

বাপের আদরে ঘুম চোখে স্বর্ণ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। এত রাত্রে বাপের হাতে লাঠি। স্বর্ণ চমকিয়া উঠিল।

—লাঠি কি হবে, বাবা ?

—কি হবে ভাবছি ত তাই। ফেলে দেব।

স্বর্ণ বলিল—আমি নেব।

—নিবি তুই ? নিবি ? তারপর অসহায়ের মতো কণ্ঠে নরহরি বলিলেন—যার নেবার কথা, সে নিল না, নেবেও না কোন দিন।···স্বর্ণ, তুই লাঠি শিখবি ?

স্বর্ণলতা আনন্দ আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। বলিল—হ্যাঁ বাবা। তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে। দিনে না হয়, রাতে শিখিও। বড় আলোটা জেলে দিয়ে শিখব—আমি ঘুমুব না।

নরহরি বলিলেন—না মা, দিনমানেই শিখো তুমি—সমস্ত দিন ধরে আমি তোমাকে লাঠি শেখাব। এবার আমার ছুটি হয়ে যাচ্ছে।

স্বর্ণ বাহু দিয়া বাপের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। বলিল—বেশ হবে বাবা, খুব ভাল হলে। তুমি আর কোথাও যাবে না তা হলে ? কোথাও না ? তারপর অল্প একটু হাসিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত চুপি চুপি কহিল—আজকে তবে তোমার সঙ্গে শোব, বাবা।

নরহরি মেয়েকে পাশে বসাইয়া মাথার উপর হাতখানি রাখিলেন।

৯

স্বর্ণের আজকাল মাটিতে পা পড়ে না। পড়িবার কথাও নয়, সে পাঁচের বাড়ি শিখিয়া ফেলিয়াছে। লাঠি হাতে একবার সোজা হইয়া দাঁড়ায়, একবার বা হাঁটু গাড়িয়া বসে, কখনও মাটিতে শুইয়া পড়ে, ভাবখানা যেন সামনে তার শ' দুইতিন লোক, আর সেএকেলা অত লোকের মোহড়া লইতে বসিয়াছে। নরহরি টিপিটিপি হাসেন। সরস্বতী প্রশংসমান চোখে চাহিয়া থাকে ; তারও বড় লোভ হয়। নরহরি যখন সামনে না থাকেন এক একদিন করুণা-পরবশ হইয়া স্বর্ণ বলে—আচ্ছা, ধর্ তুই একখানা লাঠি---এমনি করে, হ্যাঁ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

এদিক ওদিক তাকাইয়া সরস্বতী লাঠিটি তুলিয়া লয়। বুকের মধ্যে ঢিব-ঢিব করে, বার বার চারিদিকে চায়, স্বর্ণ যেমন করিয়া বলে তেমন ধরা হয় না; হঠাৎ গায়ের উপর স্বর্ণের লাঠির চোট আসিয়া পড়ে, সামলাইতে পারে না। হাতের লাঠি ফেলিয়া সরস্বতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে। বলে—থাক্ ভাই, থাক্ তোর পাঁচের বাড়ি। ঠাকুর-জামায়ের জন্যে তুলে রেখে দে। তখন কাজে আসবে। আমাদের উপর বাজে খরচ করিস নে।···

বাড়ীর মধ্যে দুষ্ট কেবল শ্যামকান্ত। সে বড় ক্ষেপায়। আরশুলায় স্বর্ণের বড় ভয়। আরশুলা উড়িতে দেখিলে সে আঁতকাইয়া উঠে, গায়ে পড়িলে চেঁচাইয়া বাড়ির লোক জড় করে। ইদানীং বাপের কাছে লাঠি শিখিয়া লাঠিয়াল হইতেছে, আরশুলার ভয় কিন্তু যায় নাই। শ্যামকান্ত তার নূতন নামকরণ করিয়াছে আরশুলা-পালোয়ান। ঐ নামেই যখন তখন ডাকে। তাই তাকে লুকাইয়া লুকাইয়া লাঠি খেলিতে হয়।

স্বর্ণ বলে—বাবা, বৌদিদিকে তুমি কিছু শেখাও না। ও কাঁদে।

হাসিমুখে নরহরি জিজ্ঞাসা করেন—তাই নাকি রে?

এমন মিথ্যুক স্বর্ণ! কাঁদিল সে কবে? বড় বড় চোখে সরস্বতী স্বর্ণের দিকে চায়। তারপর কিন্তু সত্যসত্যই চোখে জল আসিয়া পড়ে, শ্বশুরের প্রতি অভিমান হয় বড়। নরহরি তবু হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়েন। বলেন—সে হচ্ছে না, দুষ্টু বেটী। ছেলে আমার লাঠি উঁচু করতে আছাড় খায়, লাঠি শিখে তাকে বুঝি নাকানি-চুবানি খাওয়ানোর মতলব। আচ্ছা, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ,—সেই বা কি বলে।

সে দিককার মতামত সরস্বতীর ভাল করিয়াই জানা আছে, জিজ্ঞাসার আবশ্যক হয় না। কোন দিন বা নরহরি বলেন—আচ্ছা বেশ—মুখ ভার করে থেকো না, মেয়ে। এসো এদিকে, লাঠিখেলা থাক—হাতের খেলা বরঞ্চ দুই একটা শিখিয়ে দিই—বলিয়া হাত মুঠা করিয়া দুই একটা ভঙ্গি দেখাইয়া দেন; লাজুক মুখে সরস্বতী অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা করে। নরহরি হাসিয়া বলেন—ঐ হয়েছে। ব্যস, আজকে থাক ঐ অবধি। এইটে এখন ভাল করে শেখ। তার-পর শ্যামকান্তের ইচ্ছেটা কি জেনে নিয়ে দেখা যাবে তখন।

স্বর্ণ চুপি চুপি বৌদিদির কানে বলে—এই, এক বুদ্ধি শোন্। সব ঠিক হয়ে যাবে। যা শিখলি, ঐটে আজ ভাল করে চালাবি—দাদার পিঠের উপর। তখন মত দেবার দিশে পাবে না। সরস্বতী স্বর্ণের গায়ে চিমটি কাটিয়া দেয়।

আবার বাপে মেয়ে লাঠি লইয়া পায়তারা দিতে থাকে। গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সরস্বতী ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। নরহরি তাহাকে এড়াইতে চান, সরস্বতী স্পষ্ট বুঝিতে পারে।

একদিন উহাদের ঐ আখড়ায় রঘুনাথ আসিয়া ডাক দিল—চৌধুরী মশায়!

নরহরি ঘাড় নাড়িয়া না-না করিয়া উঠিলেন। বৈঠক-খানার দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—এখানে নয় সর্দ্দার, অফিস এখন ঐদিকে। যাও, তোমাদের বড়বাবুর কাছে। আমার ছুটি—

রঘুনাথ বলিল—তাই ত অবাক হয়ে যাচ্ছি, কর্ত্তাবাবু, এটা কি রকম হল। দুই পক্ষে সাজ সাজ পড়ে গেছে। উকীল-মুহুরীগুলো সব আদালতের বটতলায় টুল পেতে ঝিমুতো, এখন তারা সব চাপকান মেরামত করে ঐ ভরসায় হা-পিত্যেশ তাকিয়ে আছে। সৌদামিনী ঠাকরুণ সদরে কায়েমী বাসা-ভাড়া নিলেন, আর আপনি নিলেন ছুটি!

নরহরি বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—মামলা না হ'তেই আমার হার। অনেকে অনেক কথা বলে সর্দ্দার, সব আমার কানে আসে। তোমাদের বড়বাবুও নাকি বলাবলি করছিলেন, মামলার তোড়জোড় দেখে বাবা ভয় পেয়ে গেছেন। আহা, ছেলের আমার একান্ত ইচ্ছা, জমিদারী করে বেড়ায়। দোষ দিইনে; অনেক বিদ্যে শিখেছে; বিদ্যে খাটাবার উপায় ত চাই? আমি তাই উপায় করে দিলাম। বলিয়া নরহরি চুপ করিলেন।

চিরকঠোর সর্দ্দারের চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। রুদ্ধ কণ্ঠে রঘুনাথ কহিল—চৌধুরী মশায়, আমরা ত বিদ্যে শিখিনি,—আমাদের উপায়?

—বিদ্যে না শিখলে একদম বিদ্যাধরীর তলায়, অন্য উপায় নেই। নিজের রসিকতায় চৌধুরী নিজেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন—দিন বদলাচ্ছে। তুমি, আমি লাঠি ধরে ঠেকাতে পারব কেন? ধুলোয় পড়ে মরে থাকব, কেউ চেয়েও দেখবে না। তার চেয়ে শ্যামকান্ত যেমন বলে, সেই রকম করে যাও,—সুখে থাকবে। ওর খুব সাফ মাথা—সব জিনিষ ভাল বোঝে।

—আর আপনি?

নরহরি বলিলেন—আমার কথা কেন, সর্দ্দার! আমি বুড়ো হয়ে গেছি—

রঘুনাথ বলিল—কিন্তু আমরা ভাবতাম, বুড়ো কোন দিন হবেন না আপনি—

কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া নরহরি বলিতে লাগিলেন—আমিও ভাবতাম তাই। দশটা দিন আগেও বুড়ো ছিলাম না। সখীসোনার চকে তোমরা সব লাঙ্গল চালাতে গেলে—কেউ মাঠে, কেউ বাঁধে, কেউ বা নৌকোর মধ্যে সমস্ত দিন ধরে হল্লা করে এলে। সন্ধ্যার পর শ্যামকান্ত এল, সঙ্গে আরও দু'চারজন মাতব্বর ব্যক্তি। সবাই বলে, দিন দুপুরে পরের জমিতে পড়ে এমনটা করা ঠিক নয়। আইন বড্ড খারাপ। আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। আইন আবার কি? যার লাঠি, তার মাটি—এই ত আইন!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন—সেদিনও আমি বুড়ো হইনি। ওদের সমস্ত কথায় কেবলই হাসি পাচ্ছিল। ভাবছিলাম, শ্যামশরণ চৌধুরীর বাড়ীর মধ্যে এসে, এরা এসব বলে কি? দাঙ্গার দোষ দেখাচ্ছে এখানে বসে! এই পাথরের দেয়ালগুলোর যদি জোড় খুলে দেখা যায়, এর ভাঁজে ভাঁজে কত মাথার খুলি, কত হাড়-পাঁজরা বেরুবে বলত! কৈলেস উকীলকে বলছিলাম তাই যে, দেশসুদ্ধ বুড়িয়ে গেল কি করে? কৈলেস বল্লে—বুড়ো আপনিই চৌধুরী মশাই, বসে বসে মড়ার হাড় আগলাচ্ছেন, ওদিকে আর কেউ ফিরে চাইবে না।

রঘুনাথ রাগ করিয়া বলিল—না চায় বয়ে গেল। কিন্তু লাঠি হল গিয়ে মড়ার হাড়? কৈলেস উকিল বল্লে একথা?

নরহরি বলিতে লাগিলেন—অন্যায় কথা বলেছে কি সর্দ্দার? আমাদের বাপ পিতামহের হাড় এই লাঠি। বিশ পুরুষ ধরে এই লাঠি রাজ্য করে এসেছে। এবার যদি সে লাঠিতে ঘুণ ধরে থাকে, ঝগড়া করতে যাব কার সঙ্গে?

রঘুনাথ অনেক দিনের লোক, নরহরি চৌধুরীর অনেক সুখ-দুঃখের সাথী। রাগের মুখে তার পাত্রাপাত্র জ্ঞান রহিল না, বলিল—আমরা ছোটলোক ঢালী, আমাদের লাঠিতে ঘুণ ধরবার দেরী আছে, চৌধুরী মশাই। সর্ব্বস্ব ভাসিয়ে দিয়ে তুমি এবার লাঠি এখানে নিয়ে এসেছ—ঘুণধরা লাঠি মেয়েদের হাতে দিয়ে যাবে বুঝি।

চৌধুরী হাসিতে লাগিলেন। হাসিমুখে বলিলেন—ঠিক তাই। যাকে দেব ভেবেছিলাম, সে নিল না, কি করব? কি ভেবেছিলাম, শুনবে সর্দ্দার? বলিতে বলিতে সহসা চৌধুরীর কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, মুখের ভাব কেমন এক রকম হইয়া গেল. বলিতে লাগিলেন,—ইচ্ছা ছিল, শ্যামশরণকে আবার তাঁর পুরাণো বাড়ীতে নিয়ে আসব। ছেলের নামও রাখলাম শ্যামকান্ত। তোড়জোড়ের ত্রুটি থাকল না, কিন্তু এই কথাটা একবারও মনে হয় নি, শুকনো গাছ ঠেলে উঁচু করে তুললেই কি আর তাতে পাতা গজায়? শ্যামশরণ স্বর্গে বসে হাসতে লাগলেন, নামের ফাঁকি অপমান হয়ে রাতদিন আমার বুকে সূঁচ ফুটাচ্ছে।

রঘুনাথ বলিল—তাই এবার অন্দরে লাঠি খেলতে লেগেছ চৌধুরী মশাই। বেশ বুদ্ধি হয়েছে। দু চারদিন খেলার পর ওঁদের সখ মিটে যাবে; তখন লাঠি উনুনে চলে যাবে। রান্না-ঘরের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে বটে।

—খেলা? না, তা হবে না। ঘাড় নাড়িয়া নরহরি বলিতে লাগিলেন—আগুনে পোড়ে পুড়বে—তবু আমার লাঠি নিয়ে আমি খেলতে দেব না কাউকে। লোকে বলে, লাঠি-খেলা। খেলা করতে করতে আমিও এই লাঠি শিখেছিলাম। কিন্তু এখন এই ডান হাত আমার যেমন, হাতের লাঠিখানাও তেমনি। তাই নিয়ে খেলা করতে দেব আমি? আমার লাঠি মরবার আগে মেয়ের হাতে দেব,—আর তা না হয় ত বিদ্যা-ধরীর জলে। তাই রাতদিন মেয়েকে নিয়ে আছি, ঘুমিয়েও স্বস্তি নেই। তা মেয়ে আমার পারবে…পারবি নারে খুকী?

রঘুনাথ নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। নরহরি বলিতে

লাগিলেন—ঐ দেখ, বৌমা আমার মুখখানা শুকনো করে বসে বসে দেখছেন। কিন্তু হবে না মা, তোমার রক্তে এ জিনিষ নেই। তোমার হাতে আমি কি খেলা করতে লাঠি দেব?

১০

বাপের কাঁধের বোঝা শ্যামকান্ত সর্ব্বান্তঃকরণেই লইয়াছে। পিতৃভক্ত ছেলে, সন্দেহ নাই। দিনরাত যুক্তি-পরামর্শ, লোকজন ডাকাডাকি; মালাধর ত ভোরবেলা হইতেই কুড়ি খানেক মানুষ ডাকিয়া সাক্ষীর তালিম দিতে বসিয়া যায়। সদরেও দু একদিন অন্তর গতায়াত চলিতেছে—এমনি সময়ে একদিন শ্যামকান্ত মালাধরের সঙ্গে নরহরির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—নানা রকম ছল-ছুতো করে কাটান গেল অনেক দিন। এবারে হাকিম আর শুনবে না। পরশু মোকর্দ্দমা।

নরহরি বলিলেন—আমি আর শুনে কি করব?

শ্যামকান্ত বলিল—আপনি আপনার ঘোড়াতেই যাবেন। শেষরাতে রওনা হলে, কাছারী বসবার আগে হাজির হয়ে যাবেন। আমরা কাল সকালে আগে আগে পানসীতে রওনা হয়ে যাব।

নরহরি বলিলেন—মামলা-মোকর্দ্দমা আমি বুঝি নে। আমি গিয়ে করব কি?

মালাধর সামনে চলিয়া আসিল। হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বুঝতে হবে না কিছু। বুঝবার কিছু কি বাকী রেখেছি আমরা? সমস্ত ঠিকঠাক। আপনি খালি বলে আসবেন, সখীসোনার চক আমার চার পুরুষে সম্পত্তি। ব্যস!

নরহরি বলিলেন—বল্লেই হয়ে যাবে অমনি?

মালাধর সগর্ব্বে একবার শ্যামকান্তের দিকে চাহিল। বলিল—তা হবে কেন? পাকা পাকা দলিল-দস্তাবেজ রয়েছে যে। পান্সী বোঝাই হয়ে সমস্ত যাচ্ছে...অত বড় পান্সী তবে ভাড়া হল কি জন্যে?

—দলিলের সিন্দুকসুদ্ধ নিয়ে চলেছ নাকি?

মালাধর হাসিয়া বলিল—সিন্দুকে আর ক'টা দলিল আছে চৌধুরী মশাই? বেশীর ভাগ ত এখনও চালের বস্তায়। নরহরির বিস্ময়ের ভাব দেখিয়া বলিতে লাগিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। বস্তার মধ্যে সব পড়ে পড়ে পুরাণো হচ্ছে। শ্যামশরণের আমলের দলিল—আজকের ত নয়। জমাখরচ, সেহা, করচা,—সমস্ত। বেরুক আগে, দেখবেন তখন। কারো বাপের সাধ্যি হবে না যে বলে, ওসব আপনার এই অধমাধম মালাধর সেনের কারুকার্য্য। বলিয়া নিজের চতুরতায় মালাধর হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

হাসি থামিল নরহরির কথায়। শ্যামকান্তকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—আমার কোন পুরুষ কাঠগড়ায় ওঠে নি; আমিও উঠব না। আমার ছুটি। যা করতে হয়, তোমরা কর গিয়ে। এত করেছ, আর বাকীটুকু হবে না?

শ্যামকান্ত বলিল—তা যদি হত, মিছামিছি আপনাকে কষ্ট দেব কেন বলুন। আপনার নামে জমিদারী, মোকর্দ্দমাও আপনার নামে, নেহাৎ একটা বার হাকিমকে দেখা দিয়ে আসতে হবে। তারপর অতিশয় ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিল—আমরা অনেক খেটেছি, সমস্ত অনর্থক হয়ে যাবে। আর এটা গোলমাল হলে—বলা যায় না, ফৌজদারীতে যদি জেলের হুকুম-টুকুম হয়ে বসে, তাতেও মুখ উজ্জ্বল হবে না, বাবা। এবারটা আপনাকে যেতেই হবে।

মালাধরও বলিল—কিছু গোলমাল নেই, চৌধুরী মশাই। এজলাসে গিয়ে হলপ পড়বেন—দিব্যি মোটা মোটা অক্ষরে ছাপান রয়েছে, পড়ে যাবেন—ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া যাহা বলিতেছি তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তারপর কয়টা কথা বলেই খালাস। শেষে আমরা আছি—

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু গোলমাল বেশ বাধিয়া উঠিল।

নরহরি কাঠগড়ায় উঠিয়া কথা কয়টি নির্ভুলভাবেই বলিয়া আসিলেন, সখীসোনা নামক একটি চক সৌদামিনী কিনিয়াছেন বটে, কিন্তু জমি তাহাতে মাত্র দুই-তিনশ' বিঘা। চকের উত্তর সীমায় নরহরির তালুক। সেই তালুকের জমি অন্যায় ভাবে গ্রাস করিবার চেষ্টা হইতেছে। নরহরির প্রজা-পাটক পুরুষানুক্রমে ঐ সব জমি চাষ করিয়া থাকে,—এ কেবল এবারের একটি দিনের ঘটনা নহে;—কিন্তু মিথ্যা মামলার সৃষ্টি করিয়া চৌধুরীকে নাস্তানাবুদ করা হইতেছে এই প্রথম।

—প্রমাণ ?

প্রমাণের অভাব নাই কিছু। কমপক্ষে ঝুড়িখানেক কাগজপত্র দাখিল হইয়াছে ; কতকগুলি তার অতি পুরাণো, সেকেলে অদ্ভুত ছাঁদে লেখা, পোকায় কাটা। আবার পাল্টা জবাবে বরণডাঙা তরফ হইতে যাহা সব বাহির হইতে লাগিল, তাহাতেও আতঙ্ক লাগে। হাজার দলিলের হাজার রকম মর্ম্ম গ্রহণ করিতে করিতে টানাপাখার নীচে বসিয়াও সকলে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিল।

কাগজের স্তূপ উল্টাইতে উল্টাইতে বরণডাঙার উকীল হঠাৎ নরহরিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—বাপরে বাপ, আয়োজন ত কম নয়। একেবারে ষাট বছরের দাখলে সংগ্রহ। এক-খানা হারায় নি, নষ্ট হয় নি। আপনার প্রজারাও বড় ভালো, চৌধুরী মশাই। দলিলগুলো দরকার মাফিক ঠিক ঠিক বের করে দিয়েছে।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন—ভাগ্যিস্ পেরেছে। নইলে আপনাদের দয়ায় রাঁধা কইমাছ যে এতক্ষণ কানে হেঁটে বেড়াত।

—কিন্তু এত দাখলে লেখা হল কোথায়, তাই কেবল ভাবছি।

মালাধর নরহরির পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল। ফিসফিস করিয়া সে সমঝাইয়া দিল—মস্ত বড় কাছারী রয়েছে আমাদের। আটচালা ঘর—দেউড়ী সমেত। সেখানেই আদায়পত্তোর হয়, দাখলে লেখা হয়—

নরহরি কহিলেন—ভেবে কিনারা করতে পারলেন না, উকীল বাবু? দাখলে লেখা হয়ে থাকে পাটের আড়তে—

উকীল মৃদু হাসিয়া কহিল—পাটের আড়তে নয়, পাটো-য়ারীর ঘরে ; সে আমি জানি।

নরহরি কহিলেন—তা যদি বলেন, আমার কাছারী ঘরটা তবে একদিন দয়া করে দেখে আসবেন মশাই।

উকীল কহিল—আমি দেখব কেন? যাঁরা দেখবার তাঁরাই দেখবেন। ঘরটা শক্ত করে বাঁধবেন যেন ; দেখবার আগেই যেন উড়ে না পলায়।

সৌদামিনীর উকীল পুরা দুইদিন এমনি কত কি জেরা করিল, বিশ-কুড়িটা সাক্ষীরও তলব হইল। কিন্তু মীমাংসা কিছুই হয় না, সমস্যা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠে।

হাকিম রাগ করিয়া কলম ছুঁড়িয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে সরেজমিন তদন্তের হুকুম হইল। বিচার স্থগিদ রহিল।

বাহিরে আসিয়া মালাধর হাসিয়া খুন। বলে—রসগোল্লা খাওয়ান, বড়-বাবু। জয় নির্ঘাৎ। গোটা ঢালিপাড়া প্রজা হয়ে এসেছে···পানসীর খোল বোঝাই দলিল-দস্তাবেজ···তার উপর কাছারী বাড়ী, নায়েব গোমস্তা···আর চৌধুরী মশাই যা বলা বলে এসেছেন—

শ্যামকান্ত বলিল—রোসো ; তদন্তটা হয়ে যাক আগে। কোন বেটা যাবে, সে আবার কি করে আসে—

মালাধর বলিল—ফৌজদারী ত ফেঁসে গেল। এখন সত্বা-সত্বির কথা দেওয়ানী মামলা মশাই, কেবল এখন দেও আনি'··· যা কিছু আছে, সব এনে এনে দিয়ে যাও। ব্যস্। তদন্ত এখন গড়াতে গড়াতে ছ' মাসের ধাক্কা। দুটো মাস সময় দিন আমাকে—কি কাছারী বাড়ী করে দেব, দেখবেন...বলেছি ত, দুটো মাস কেবল চাই—

কিন্তু স্বপ্নেও যাহা আন্দাজ হয় নাই, তাহাই ঘটিল। আদালতের আদিকাল হইতে এমন অসম্ভব কাণ্ড বোধকরি কখন হয় নাই। ঐ শ্যামগঞ্জ-বরণডাঙা অঞ্চলটাতে জমাজমি ঘটিত আরো কয়টা তদন্ত ছিল। ডেপুটী যাওয়ার ঠিক হইয়াই ছিল। তাঁর সেই তালিকার মধ্যে সখীসোনাটাও যুড়িয়া দেওয়া হইল। ঢালিপাড়ার যারা সাক্ষী হইয়া আসিয়া-ছিল, তারা সব বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে। কেবল পরবর্ত্তী আরও কয়টি কাজকর্ম্মের জন্য নরহরিরা কেহ যান নাই। ভোররাত্রে পাল্সিতে সকলে একত্র হইয়া রওনা হইবেন, এইরূপ ঠিক আছে। বিকালে অকস্মাৎ কৈলাস উকীল তাঁহাদের জরুরী খবর পাঠাইল,—ডেপুটী পরের দিনই সখীসোনা চকের তদন্ত শেষ করিতে যাইবেন।

শ্যামকান্ত মাথায় হাত দিয়া বসিল। এখন উপায়? তদন্তের তারিখ একটা সপ্তাহও পিছাইয়া দেওয়া যায় না?

কৈলাস কহিল—সখীসোনা পথেই পড়ে গেল কিনা? ঐটে সেরে তারপর অন্যান্য জায়গায় যাবেন। ও আর ঠেকাবার উপায় নেই। এখনো বেলা আছে, চলে যান—কাছারী গিয়ে তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে ফেলুন গে—

নরহরি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—মালাধর আছে,

গুছোবার বাকী নেই কিছু। কিন্তু কাছারীরই কেবল অভাব। কিন্তু মালাধর, আমাকে দাঁড় করিয়ে তোমরা মিথ্যেবাদী সাজালে? শিবনারায়ণের বউ এখন থেকে যে হাসতে আরম্ভ করেছে।

মালাধর ক্ষুব্ধস্বরে কহিল—হাসে কি সাধে, কর্ত্তা? ঘুস দিয়েছে কত? আদালতের টিকটিকিগুলোর পর্য্যন্ত পেট ভর্ত্তি। আর, আমাদের হল কি?—আমি করছি তদ্বির, টাকার থলি বড়বাবুর হাতে। অমন কাঁচা তদ্বিরে কাজ হয় কখনো?

খুব তাড়াতাড়ি ফিরিবার দরকার। আর পানসী নয়; তিন খানা পাল্কীর বন্দোবস্ত হইল। নরহরি, শ্যামকান্ত, মালাধর—সকলেরই পাল্কী। হুম্‌হাম্‌ করিয়া বিকালবেলা বেহারারা শ্যামগঞ্জের দিকে ছুটিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোজ বসু

ক্ষান্তবর্ষণ এক প্রভাতে

শ্রীনবেন্দু বসু

এ কোন প্রভাত জাগলো আজি এমন শ্যামল এমন সোনায়
কাজলটানা অরুণনয়ন মেললো কে আজ গগন কোনায়,
লুটিয়ে গেল মলয় ও কার সিক্ত শিথিল কেশের জালে,
ইন্দ্রধনুর তিলক আঁকা ও কার দিব্য উজল ভালে;
মেঘাম্বরীর প্রান্তে লোটায় স্বর্ণজরির আঁচল কাঁপা,
চরণতলায় উঠলো ফুটে শত বেল যুঁই কনকচাঁপা?

এ নয় আমার নতুন দিনের নতুন দেখার নতুন মায়া,
অতীতের এক রূপ দর্শন আজ ফেলেছে স্মৃতির ছায়া।

জীবন, মরণ, প্রশ্ন, আশা, সেদিন ছিল অনেক দূরে,
আমি শুধু ব্যাপ্ত ছিলুম কেবল সুরে, কেবল সুরে;
সেই ছন্দসাগর মাঝে সুদূর সে এক শেষের রাতে
স্বপন চোখে লাগলো আমার—সেদিনের সে বাদল প্রাতে
এমন রূপই পড়লো চোখে, আলোর কালোর এমন মেলা,
এমন ধারাই কান্তকোমল কোকিলডাকা সকালবেলা।

পাগলের পরিচয়

১

পাগল উপাধি এ সভ্যজগতে তাহারই হয়, যাহার বাক্যে সামঞ্জস্য থাকে না, বা যাহারা কর্ম্মের পদ্ধতি সাধারণতঃ অনিয়মিত এবং পূর্ব্বাপর সম্বন্ধশূন্য। কিন্তু উন্মাদ যাহারা, স্বতন্ত্র তাহারা—চিকিৎসকের অধীনস্থ জীব। নিখিলবন্ধুকে আমি পাগল জানিতাম। কারণ, তাহার কথা শুনিলে তাহাকে তাহাই মনে হইত তবুও তাহার কথা মনোযোগ আকর্ষণ করিত, না শুনিলেও উপায় ছিল না। কথার সাধারণ সূত্রই হইল চিন্তা, তাহার কথাগুলি যে সব চিন্তার ফল, সে চিন্তা সাধারণ ত মোটেই নয়, পরন্তু এতটা পরিমানে অসাধারণ, যে তাহা বিশ্বাস করা ত দুরের কথা, শুনিতেই কেমন একটা অস্থির ভাব আসে।

আমায় বন্ধু বলিয়াই বিশ্বাস করিত বলিয়া আমার কাছেই সে আসিত, বসিত, ধূমপান করিত, তাহার পুঁজিপাটা যা কিছু সকলগুলিই ঝাড়িয়া ফেলিত। সে সকল গ্রাহ্য হইল কিনা তাহা সে কখনও বিচার করিত না—বলিয়া বা প্রকাশ করিয়াই খালাস। তাহার কোনও বন্ধন আছে বলিয়া আমি জানি না, কোথায় থাকিত তাহারও ঠিক ছিল না, তবে মধ্যে মধ্যে আসিত। ধীরে ধীরে, চিন্তায় জর্জ্জরীভূত স্থবিরের মত সে যখনই ঘরে প্রবেশ করিত, অনুমানে বুঝিতাম আজ কিছু নূতন বিস্ময়কর ব্যাপার বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ছড়াইয়া দিবে, যাহাতে আমার প্রবহমান চিন্তাস্রোত ওলট-পালট হইয়া যাইবে। যাহা হউক তাহার পরিচয় এখানে একটু দেওয়া ভাল।

ভূতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনায় সকল তত্ত্বই কোন না কোনও সময়ে তাহার মুখের কথায় রূপ পাইত। কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও কথা কখনও তাহার মুখে শুনি নাই। একদিন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, এত কথা বল, কিন্তু ভগবানের প্রসঙ্গ ত কিছু কোনদিন বল্‌লে না—ও তত্ত্বটি তোমার বাদ পড়ল কেন? এটা যে কেমন লাগে।

তাহাতে সে কোন প্রকার চিন্তা না করিয়াই বলিল যেমন আমার মুখে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও কথা না শুনে তোমার কেমন কেমন লাগে আমারও ঠিকই তেমনি ও বিষয় চিন্তা কর্‌তেও কেমন কেমন লাগে। শুনিয়া কৌতুকের বশে জিজ্ঞাসা করিলাম—কি রকম খুলে বল ত শুনি!

রকম আর কিছুই নয় অন্য সব বিষয়ে চিন্তা কর্‌তে গেলে ভিতরে যে উৎসাহ আকর্ষণ অনুভব করি, ও বিষয়টি ভাব্‌তে গেলে যেন বাধা আসে, সূত্র হারিয়ে ফেলি। জোর করে' স্বভাবের বিরুদ্ধে ত আর কিছু ভাবা যায় না!

আচ্ছা, পাঁচ জনের কাছে ঈশ্বর সম্বন্ধেও ত কিছু শুনেছ—তাতে কি মনে হয়!

সে ত পুরাণো পুঁথির বা বইয়ের কথা এদিক ওদিক ক'রে বলা, না হয় শুনা কথা ফলিয়ে বলা, তাদের নিজের সে বিষয়ে কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞানও নেই, চিন্তাও নেই। যাক্ ও সব কথা না কওয়াই ভাল।

আরও একটু খোঁচা দিবার অভিপ্রায়েই বলিলাম—তা হোলে তুমি ঠিক একটি নাস্তিক, বল—হাঁ কি না।

শুনিবামাত্র সে যেন একটু চিন্তিত হইল, এরূপ বোধ হইল; কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব কাটিয়া গেল, বলিল—হাঁ—না।

শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না, মুখে বলিলাম হাসালে বটে, এক কথায় বুঝি উত্তর দিতে বুদ্ধিতে কুলাল না!

সে বলিল, তোমার যেমন কথা তেমনি উত্তর। যখন ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আর সেইজন্য বিশ্বাস না থাকার কথা ভাবি তখন নাস্তিক; কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাক্‌লেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বাধে না, এটা যখন ভাবি তখন নাস্তিক নয়। এত সোজা কথা। যাক্‌, ছেড়ে দাও না ও সব কথা।

ওর গায়ে কিছু লাগে না, সবই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে; এ সম্বন্ধে আর ঘাঁটাইয়া কি হইবে যখন তার ইচ্ছা নাই। তবে একটা কথা আরও শুনিবার উদ্দেশ্যে আর একবার প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, জানিতাম, সে কখনও তাহাতে রাগ করিবে না।

আচ্ছা, যখন এত লোকে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করে' কিছু পেয়েছে, তখন অবশ্যই তাঁর অস্তিত্ব আছে। আমি সাধারণের কথা বল্‌ছি না। এই ধর না, পৌরাণিক যা কিছু না হয় ছেড়ে দিলে, কিন্তু বেদব্যাসকে ত উড়িয়ে দিতে পার না! তা সে যুগের বেদব্যাস থেকে শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষেরা আবার এ যুগের দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রভৃতি অসাধারণ মানুষদের কথাই বলেছি। আমাদের দেশের এরা যখন সাক্ষী—

বাধা দিয়া নিখিলবন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, কিসের সাক্ষী?

ঈশ্বর আছেন তার সাক্ষী।

তাতে আমার কি? ঈশ্বর আছে কি নেই, এ যখন আমার মোকদ্দমা নয়, তখন তাঁরা সাক্ষী থাকেন, আছেন—না থাকেন, না আছেন—আমার মাথাব্যথা কিসের বল দেখি?

আহা, একেবারে উড়িয়ে দাও কেন! আমরা মানুষ, জগতের সভ্য সমাজে বাস করি; আমাদের সমাজের যে সব বড় বড় লোক, তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে যে অসাধারণ শক্তি, এবং ভাব-ধারার বিকাশ দেখিয়ে গেছেন, যা ধরে এক এক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে গেল, তাঁদের ভাবের সঙ্গে পরিচয় না করলে চল্‌বে কেন? তাঁরা যে বস্তু নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে গেলেন, আমরা চক্ষের সুমুখে পেয়ে সেটা দেখ্‌বো না!

কে বারণ করেছে তোমায় দেখ্‌তে—সে সব ত তুমিও দেখ্‌ছ, আমিও দেখ্‌ছি।

বলি, তাঁরা ঈশ্বর-বস্তুকে অবলম্বন করে'ই না মহৎ হয়েছেন, আর তুমিও ত এটা দেখতে পাচ্ছ, যেমন আমি পাচ্চি!

যেমন তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ, ঠিক তেমনি দেখতে আমিও পাচ্চি—এই কথা তুমি বলছ?

হাঁ, অন্ততঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে।

না, ও সম্বন্ধেও আমরা দুজনে একই বিষয় বা বস্তু দেখতে পাচ্চি না। তোমার কাছে হয়ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত; সেইজন্য তুমি ঈশ্বরকে অবলম্বন করে'ই এই সকল লোকের অসাধারণত্ব, এটি দেখতে পাচ্চ, বিশ্বাস কর্‌ছ—আমার ত তা হয় নি!

আচ্ছা, তুমি এ সকল ব্যক্তিদের অসাধারণ বলে' স্বীকার কর কিনা!

আহা, তা কর্‌বো না কেন! তাঁরা সমাজের গড়পড়তা তুলনায় কতটা বড়, সে আর বুঝতে পারি না! কি যে বল তুমি—আমায় পাগল ঠাওরালে, দেখছি!

আচ্ছা, সেই যে অসাধারণত্ব সেটি কিসের জন্য?

শক্তির জন্য জ্ঞানের জন্য নিজের ভিতর যে কর্ম্মশক্তি আছে কোনও বিশিষ্ট ধারায় প্রসারিত হবার সুযোগ পাওয়ার জন্য। সেই জ্ঞানকে অবলম্বন করে যে সব কর্ম্ম করেছেন, তাতে একশ্রেণীর মানুষ সুখী হয়েছে তাতে তাদের আনন্দের স্ফুরণ ও ভাবের প্রসার হয়েছে সেই জন্য।

তা হলেই এটা ত বুঝ্‌তে পারা যায়, যে শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের স্ফুরণ ঈশ্বরকে অবলম্বন না কর্‌লে আসবে কি করে! তাঁরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে অবলম্বন করেছিলেন বলেই না এতটা জ্ঞান ও আনন্দের এবং একটি বিরাট জনসমষ্টির শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছিলেন।

একথা ত আমি বুঝ্‌তে পারি না, যে ঈশ্বরকে অবলম্বন করেছিলেন ব'লেই জ্ঞান, আনন্দ কিম্বা জনসমাজের শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ ভাব বা বস্তু লক্ষ্য করেছিলেন—এইটিই বরং আমি বেশী দেখ্‌তে পাই। ঈশ্বর ব'লে কোন বস্তুর অস্তিত্ব আমি এর মধ্যে দেখতে পাই নি।

প্রত্যেকে আলদা বস্তু লক্ষ্য করেছিলেন—আর সে বস্তু ঈশ্বর নয়, এই কথা তুমি বলছ?

হাঁ তাইই; আমি অন্য আর কিছু বুঝিনি বা বলিনি—ছেড়ে দাও না ও সব, যার ভিতরে আমার মাথা যায় না।

তা বল্‌লে হবে না, তুমি ত এদের কথা আলোচনা করেছ। আচ্ছা বল দেখি, বেদব্যাস ভগবান সম্বন্ধে কি অদ্ভুত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ভাবেই বলেছেন।

গোড়ায় বেদব্যাসের দায়িত্বই এ ব্যাপারে খুব বেশী এ কথা ঠিক, কিন্তু তাঁর অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টিকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করবার ত কোনও প্রয়োজন আছে বোলে আমি মনে করি না। তারপর তাঁর অন্যান্য মতও আমার অভ্রান্ত ব'লে মেনে নিতে প্রাণ যদি বা না চায়, ত জোর করে মানাতে পার কি? আমার প্রাণ তা চায় না।

আচ্ছা, তারপর শঙ্কর—এতবড় আচার্য্য মহাপুরুষ—সেই ত পুরাণো কথা নিয়েই তার কারবার—

কি রকম? উপনিষদের আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব সেই পুরাতন কথা নিয়ে আলোচনা নয় কি? উপরন্তু জোর করে মায়া বা বিবর্ত্তবাদের প্রতিষ্ঠা নিয়েই ত শঙ্করের যত বাদানুবাদ! যা আমি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মেনে নিতে পারি না।

আর রামানুজ! তাঁর যা কিছু—বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বাদানুবাদ নয় কি?

মাধবাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি! তাঁদেরও ত ঐ দ্বৈতাদ্বৈত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ আর মিমাংসা প্রেম ভক্তির দ্বারা পাঁচ জনের মধ্যে শক্তিসঞ্চার আর নিজ নিজ জীবনে আনন্দ লাভ—অবশ্য সেটা ব্যাপক ভাবে।

আচ্ছা, এ যুগের মানুষ ধর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন!

দু'জনের ত এক মত নয়! দেবেন্দ্রনাথের সেই পুরাণো উপনিষদের, আর মহানির্ব্বাণতন্ত্রের বাছা বাছা শব্দ ও স্তোত্রপাঠ আর সগুণ নিরাকার উপাসনার জাঁক জমক। সূর্য্যোপাসনাও তাঁর ছিল বোলে জানি। আর কেশব সেনের ত আলাদা বিধানই হয়ে গেল।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ?

ওঁরাও ত দুজনে আলাদা; রামকৃষ্ণের মত বা সিদ্ধান্ত সবইত ভাব রাজ্যের ব্যাপার; তাঁর কর্ম্মজীবন একরকম, বিবেকানন্দের একেবারেই আলাদা। তাঁর আগা পাসতলাই কর্ম্মরাজ্যের। এসব ত তুমিও বুঝতে পার, আমিও বুঝতে পারি—নিজ নিজ বুদ্ধির মত করে' নিয়ে অবশ্য।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর?

সেও ত মাধবাচার্য্য, চৈতন্যের অনুসরণ।

আচ্ছা, অরবিন্দ?

আত্ম-চৈতন্যের স্ফুরণ, তাঁর মধ্যে সকলেই স্বীকার কর্‌বে—বাকীটা ত কর্ম্মজগতের।

তা হ'লে এই যে সব মহাপুরুষের কথা আমরা পাচ্ছি, তাঁদের লক্ষ্য সেই এক ঈশ্বরবস্তু কি না, কর্ম্ম অবশ্য বিভিন্ন হতে পারে!

তাঁদের লক্ষ্য ত এক নয়ই, বরঞ্চ কর্ম্ম তাঁদের সকলের এক বল্‌তে পার। তাঁদের আশপাশের সকলকে মজানো, আর সেই কাজটি সুসিদ্ধ করবার জন্য শক্তিলাভের চেষ্টা বা সাধনা ছাড়া অন্য কর্ম্ম ত দেখ্‌তে পাই না।

আচ্ছা, তাঁদের জ্ঞান, ভক্তি, শক্তি, আনন্দ—এ গুলি ত সকলকার একই?

সরলভাবে বিচার কর্‌লে ওগুলি গুণগত ভাবে এক—তাতে কি এলো গেল! কর্ম্মের ফলে জ্ঞানও লাভ করা যায়, ভক্তি বা ভাবও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, শেষে আনন্দও পাওয়া যায়। শক্তি থাকুলে যাকেই ছোঁবে তাইতেই ত সংক্রামিত হবে।

সত্যবস্তুকে অবলম্বন কর্‌তে পার্‌লে তবেই না,—

যে যেটা ধরে' থাকে সত্য ব'লেই ধরে না কি?

যদি বলি জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দই ঈশ্বর—

তা সেত অল্প বেশী নানা মাত্রায় সকলকার মধ্যেই রয়েছে। কৈ তাতে ত ভগবান বা ঈশ্বর বলে আল্‌দা একটি কিছু অনুভব হয় না।

Hopeless—তুমি ঈশ্বর বলে' বা ভগবান বলে' তা'হলে কিছুই মান না?

নির্ব্বিচারে সংস্কার-বশে ভগবান বলে' শব্দময় ফাঁকা একটা ভাব ছেলেবেলা থেকে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে আসে বটে; কিন্তু বুঝ্‌তে গেলে তার কোনও হদিশ পাই নি, কেউ পেয়েছে বলে'ও শুনি নি। তারপর তোমার যা বিশ্বাস। আর ওসব কথায় কাজ নেই।

কেন ভগবানকে পেয়েছেন বা জেনেছেন—এ কথাও ত রামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষদের জীবনে—

শব্দটা ঐ রকম শোনায় বটে; কিন্তু ভাবের বা বস্তু-নির্দ্দেশের বেলা সেই নিজের সত্তায় প্রতিফলিত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের উপরে এনে ফেলেছেন।

তা হলে' কি জগৎ জুড়ে যত ধর্ম্ম, ঈশ্বর বলে' এই অধিকাংশ জনসমষ্টি একজনের প্রতি লক্ষ্য করছে সেটা কি ভ্রম বল্‌তে চাও?

জনসমষ্টি মিলিত হয়ে যখন কোন কাজ করে, তখন কি তাকে ভ্রম বলা যায়? আমার কথা ধর কেন ভাই, আমি এই বুঝি—আমাদের যে সত্তা, তার জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের বিকাশের তারতম্যেই ছোট বড় আমাদের বিচারে ঠিক হয়। গুরুভাব অর্থাৎ মানুষ হয়ে মানুষের উপর আধিপত্যই হল এখানকার চরম ভোগ। তা রাষ্ট্র ব্যাপারেই হোক, কোন কর্ম্ম বা ধর্ম্ম ব্যাপারেই হোক্, অধ্যাত্ম জ্ঞান বুদ্ধি, বিজ্ঞানের ব্যাপারেই হোক, কেন্দ্রস্থ সত্তা যে বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে, তাকেই মহাপ্রসারিত করে' তুল্‌বে—যার ফল সমধর্ম্মী অন্যান্য সত্তার আকৃষ্ট হওয়া, শক্তির স্ফুরণ হওয়া; আর এই সকল প্রত্যক্ষ অনুভব বা দর্শনে আনন্দে ভাসা আর দোলখাওয়া।

মাপ কর ভাই—আর ঈশ্বরের কথায় কাজ নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

তুমি ও আমি

শ্রীমতী সুবালা হালদার

তুমি আমি করিতেছি একঘরে বাস,
আমার আমিত্ব শুধু তোমারি বিকাশ।
তোমার বিকাশ যাহা আমার ভিতরে,
প্রকাশ হয়েছে তাহা আমি নাম ধরে।
তোমাতে আমাতে ভেদ কিছুই তো নাই,
পূর্ণ ও অপূর্ণে যাহা শুধু আছে তাই।
একই বৃক্ষে ফল ফুল মূল কিন্তু এক্,
ভিন্ন ভিন্ন রূপ লয়ে হয়েছে পৃথক।
এক তুমি প্রকাশিত বহু নাম নিয়ে,
মানব হয়েছ তুমি এক অংশ দিয়ে।
খণ্ডের অখণ্ড তুমি সর্ব্বমূলাধার,
তুমি হও সকলের সকলি তোমার।
তোমাতে আমাতে এই অপূর্ব্ব মিলন,
বিশ্বমাঝে সে সৌন্দর্য্য না হয় বর্ণন।
পূর্ণত্বে ডুবিয়া থাক্ অপূর্ণের আমি,
আমার আমিত্ব নাশ হে হৃদয়স্বামি।

———

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯

শেষ রাত্রির দিকে সহসা সন্ধ্যার ঘুম ভেঙে গেল। তিমিরাবৃত জনহীন প্রান্তর ভেদ ক'রে গাড়ি হু হু শব্দে ছুটে চলেছে। বাহিরে অন্ধকারের মধ্যে রেলপথের অতি নিকটবর্ত্তী গাছ-পালার কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি মাঝে মাঝে দ্রুতবেগে শট্ শট্ ক'রে পেছিয়ে যাচ্ছে। আকাশে একটিও তারা দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং সমস্ত আকাশ নিশ্চয়ই এখনো মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ঘরের ভিতরকার আলো নেভানো,—ল্যাভেটরীর বাতি জলছে, ঘসা কাঁচের ভিতর দিয়ে তার নিষ্প্রভ রশ্মি এসে কক্ষটিকে নির্ভেদ্য অন্ধকারের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে। সেই স্তিমিত আলোকে দেখা যাচ্ছে অপর বেঞ্চে প্রমথ শয়ন ক'রে আছে; নিদ্রিত কি জাগ্রত তা ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু তার নিশ্চল নীরব দেহাবয়ব দেখে অনুমান হয় নিদ্রিতই।

প্রমথর গাত্রবস্ত্র তখনো দেহে আচ্ছাদিত রয়েছে মনে হওয়া মাত্র সন্ধ্যা ক্ষিপ্রবেগে সেটাকে টেনে নিয়ে মাথার শিয়রে একটা কোণে গুঁজে রেখে দিলে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, কি হবে তুচ্ছ একটা গাত্রবস্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন ক'রে, দেহ যখন প্রমথর অর্থে ক্রীত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করছে এবং পাকস্থলীতে যখন প্রমথর অর্থে ক্রীত খাদ্য জীর্ণ হচ্ছে! প্রমথর গাত্রবস্ত্র ত' সহজেই টেনে ফেলে দেওয়া যায়; কিন্তু এই যে প্রমথর প্রসাদ-সঞ্জাত পরিবেশ, যার মধ্যে সে তারই অন্নে-বস্ত্রে জীবন যাপন করছে, তাকে ত' সহসা টেনে ফেলে দেবার উপায় নেই! এ অবস্থাকে সে স্বয়ং স্বীকার ক'রে নিয়েছে, গৃহস্থ গৃহের শেষ প্রত্যন্ত রেখা অতিক্রম ক'রে সে স্বেচ্ছায় এর মধ্যে প্রবেশ করেছে। এখানে তার প্রমথর সঙ্গে যোগ!

সন্ধ্যা অপাঙ্গে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করল। তার অস্পষ্ট দীর্ঘ-বিসারিত দেহ দেখে মনে হ'ল যেন কোনো দৈত্য কার্য্যসিদ্ধির পর অপহৃতা বন্দিনীকে পাশে শুইয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যা'চ্ছে। দ্রুতগামী রেলগাড়ি নদ নদী পার হ'য়ে মাঠ-ঘাট কানন-কান্তার পশ্চাতে ফেলে কোন্ সুদূরে কত দিনের জন্য তাকে রেখে আসবার জন্য ছুটে চলেছে তার কোনো নিশ্চয়তাই নেই! সহসা মনে পড়ল পঞ্চবটী-নিবাসিনী জানকীর কথা। তাঁকেও একদিন লঙ্কেশ্বর রাবণ অপহরণ ক'রে রথে নিয়ে এম্‌নি ক'রে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করেছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রামচন্দ্র জানকীকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু তাকে উদ্ধার কে করবে? উদ্ধার ত দূরের কথা তার রামচন্দ্র গ্রহণ করতেও জানেন না, বোঝেন শুধু বর্জ্জন করার যুক্তি! তারই ফলে সে এখন আর কন্যা নয়, বধূ নয়, পুরস্ত্রী নয়,—সে এখন যূথভ্রষ্টা বিপথগামিনী,—হয় ত' বা অদূর ভবিষ্যতে কোন এক লঙ্কা-পুরীর কক্ষে প্রমথর চিরজীবনের রক্ষিতা!

দুঃখে নৈরাশ্যে, অপমানে, অভিমানে সন্ধ্যার সমস্ত দেহ বিমথিত ক'রে মর্ম্মান্তিক বেদনা জাগ্রত হ'ল। শয্যার উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রোদন করতে লাগ্‌ল যতক্ষণ না নিদ্রা এসে তাকে পুনরায় অচেতন ক'রে দিলে।

প্রমথর যখন ঘুম ভাঙল তখন আকাশে প্রত্যূষের আলো দেখা দিয়েছে। সেই অনুগ্র স্নিগ্ধ আলোকে প্রথমেই চোখে পড়ল নিদ্রিতা সন্ধ্যার মীলিতনেত্র মুখ; ঘুমের ঘোরে কোনো-এক সময়ে সে প্রমথর দিকে পাশ ফিরে শয়ন করেছে। নিদ্রাজড়িত চক্ষে সন্ধ্যার মুখের অনির্ব্বচনীয় সুষমা নিরীক্ষণ ক'রে প্রমথর বিস্ময়ের সীমা রইল না!—আশ্চর্য্য! এত সুন্দরও স্ত্রীলোকের মুখ হয়! সন্ধ্যার ঈষৎ-হিল্লোলিত দেহখানি দেখে মনে হল যেন একটি সদ্য-ছিন্ন পুষ্পবল্লরী

শয্যার উপর পড়ে রয়েছে! শাড়ির কালো পাড় অতিক্রম ক'রে আগু পিছু রক্ষিত উন্মুক্ত ছুখানি পা দেখে প্রমথ মনে মনে বল্‌লে, পাদপদ্ম কেন যে বলে আজ তা স্পষ্ট বোঝা গেল! নিজেকে অসীম ভাগ্যবান ব'লে মনে হ'ল। এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার তার প্রতিক্ষণের অধিকারের বস্তু হ'ল। এই রজণীগন্ধারূপিণী বালিকার সহিত সে একত্রে নিশি যাপন করেছে! সুপ্রভাত!

পুলকিত চিত্তে প্রমথ উৎসাহভরে শয্যা ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর দক্ষিণে বামে ভাল-রকম ছুটো আড়া-মোড়া ভেঙ্গে জামার পকেট থেকে সিগার-কেস্ ও দেশলাই বার ক'রে একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে বেঞ্চের প্রান্তে যুৎ ক'রে পা মুড়ে বস্‌ল। তারপর সন্ধ্যার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নিঃশব্দ মৃদু মৃদু টানে চুরুটটি উপভোগ করতে প্রবৃত্ত হ'ল। দেখতে দেখতে, এবং সম্ভবতঃ ভাবতে ভাবতে, সহসা কোন্ এক মুহূর্ত্তে প্রমথ ভিতরে ভিতরে স্তব্ধ হ'য়ে গেল, মুখের চুরুট টানার অভাবে মুখের মধ্যেই নিভে গেল, মনে হ'ল চিত্তের একটা নবোন্মুক্ত পথ দিয়ে এমন একটা অনুভূতি প্রবেশ করেছে যা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করে নি! দুঃখে, করুণায়, সমবেদনায় চোখের পাতা ভিজে এল; মনে মনে সন্ধ্যার প্রতি যে ভাব ব্যক্ত করলে ভাষায় তা প্রকাশ করলে বলা যেতে পারত, ওরে আমার ঝড়-খাওয়া পাখী, এসেছ যখন আমার পিঞ্জরে, নির্ভয়ে অবস্থান কর! ভয় নেই, ভয় নেই!

নেভা চুরুটটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে; আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আপন মনে মৃদুস্বরে বললে, সত্যই সুপ্রভাত! তারপর তোয়ালে আর সাবান নিয়ে সন্তর্পণে ল্যাভেটরীতে প্রবেশ করলে।

ল্যাভেটরী থেকে বেরিয়ে এসে প্রমথ দেখ্‌লে তখনো সন্ধ্যা নিদ্রা যাচ্ছে; নিকটে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ডাকলে, "ঊষা, ঊষা!"

কানে শব্দ যেতেই সন্ধ্যা চোখ মেলে দেখ্‌লে পূর্ব্বেকার অন্ধকার কক্ষ কখন্ আলোকে ভ'রে গেছে; ধড়মড় ক'রে শয্যার উপর উঠে বসে অপ্রতিভ মুখে স্খলিত কণ্ঠে বল্‌লে, "কিছু বলছেন?"

নিকটেই সুটকেস ছুটা উপর-নীচে রাখা ছিল, তার উপর ব'সে প'ড়ে স্মিতমুখে প্রমথ বল্‌লে, "বলছি, সন্ধ্যা নামের পরিবর্ত্তে আজ তোমার নূতন নামকরণ করলাম,—ঊষা।"

প্রমথর এই অদ্ভুত প্রস্তাবে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়ে বিমূঢ়ভাবে সন্ধ্যা প্রশ্ন করলে, "কেন?"

প্রমথ হাস্‌তে লাগ্‌ল; বললে, "তা' হ'লেই বিপদে ফেললে দেখচি! কেন বল্‌তে হ'লে হয় ত' এমন কথাও বল্‌তে হবে জীবনে যা কোনদিন বলিনি। সরস সৌখীন পোষাকী কথা আমি দু-চক্ষে দেখ্‌তে পারি নে। ধর এমন কথাই যদি বলি যে, 'আজ ঊষাকালে তোমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ মনে হল, আমার জীবনেও আজ এক নূতন ঊষার উদয় হল, সুতরাং তুমি আমার পক্ষে সন্ধ্যা নও, ঊষা, তা হ'লে লজ্জায় আর মুখ দেখাবার জো থাক্‌বে না। আসলে হয় ত' কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়,—কিন্তু সব সত্যি কথাই কি মুখ দিয়ে বলা যায়? এই ধর, তোমার হয় ত উপস্থিত মনের অবস্থা এ-রকম যে, সুবিধে পেলেই আমাকে গাড়ি থেকে নীচে ঠেলে ফেলে দিতে পার, কিন্তু তাই ব'লে ত' আর সে কথা খুলে বল্‌তে পারছ না।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা একবার তার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে মুখ নত করলে। আরক্ত মুখে অতি ক্ষীণ যে হাস্যটুকু স্ফুরিত হ'ল, তার যথার্থ অর্থ করা কঠিন।

প্রমথ হো হো ক'রে হেসে উঠল; বললে, "রাগ কোরো না, উদাহরণ দিয়েছি, 'হয় ত' বলেছি। 'হয় ত'-র মধ্যে 'হয় ত না'-ও আছে; কাজেই না-ও ঠেলে ফেলে দিতে পার।"

এবার সন্ধ্যার মুখে যে হাসি দেখা দিলে তা' তত দুর্বোধ্য নয়। তার মধ্যে কৌতুকের স্পষ্ট আভা লক্ষ্য ক'রে প্রমথ খুসী হ'ল; বল্‌লে, "ও সব বাজে কথা যাক্, ঊষা নামে তোমার কোনো আপত্তি আছে কি-না বল?"

প্রথমটা সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে রইল, তারপর মৃদুস্বরে বললে, "কোনো সুনামই আর যার নেই, কোনো নামেই তার আপত্তি থাকৃতে পারে না। আপনার যদি ইচ্ছে হয়, ঊষা ব'লেই আমাকে ডাকবেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে উৎফুল্ল মুখে প্রমথ বললে, "সুনাম-

দুর্নামের তর্ক অন্য কোনো সময়ে হবে, এখন তার সময় নেই। আপাততঃ তুমি যে আমার প্রস্তাব মঞ্জুর করলে এর জন্যে ধন্যবাদ দিই। আজ হ'তে যতদিন তুমি আমার কাছে থাকবে ততদিন তুমি আমার উষা। কিন্তু ভবিষ্যতে কোনো দিন যদি তোমাতে আমাতে ছড়াছাড়ি হবার কারণ হয়,—ধর কোনো শুভদিনে যদি আবার তোমার শ্বশুর বাড়ি কিম্বা বাপের বাড়ি ফিরে যাবার মত অবস্থা আসে,—তা হ'লে সেদিন থেকে তুমি হবে আবার আমার সন্ধ্যা। কেমন ?—এ বেশ ভাল ব্যবস্থা নয় ?"

সন্ধ্যা এ কথার কোন উত্তর দিলে না,—নতমুখে ব'সে রইল।

প্রমথ বল্লে, "বিলাসপুর পৌঁছতে আর বেশী দেরী নেই। বাথরুম থেকে চট্ ক'রে হ'য়ে এস। গাড়িতে জল-টলের ব্যবস্থা তবু ভাল আছে, অধ্রুব বিলাসপুরের উপর নির্ভর ক'রে কাজ নেই।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে শয্যা উত্তোলন করতে উদ্যত হ'ল। প্রমথ বাধা দিয়ে বল্লে, "ও কাজটা আমার এলাকার ভেতরের। আমি বাঁধা ছাঁদা-গুলো সেরে রাখি, তুমি ততক্ষণে বাথরুম থেকে হ'য়ে এস। আমার বাথরুম যাওয়া হয়ে গেছে।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সন্ধ্যা বল্লে, "আমি না হয় আমার বিছানাটা তুলে দিয়ে যাই।"

প্রমথ মাথা নেড়ে বল্লে, "না, সে ভাল দেখাবে না, লোকে বল্‌বে শুধু আপনারটাই বোঝে ; তুল্‌তে হলে দুটো বিছানাই তুল্‌তে হয়। কিন্তু বিছানা হোল্ডলে পোরা তোমার কর্ম্ম নয়, ও কাজে পৌরুষের দরকার।"

সন্ধ্যা বল্লে, "তা হ'লে না হয় শুধু গুটিয়ে দিয়ে যাই ?"

প্রমথ মৃদু হেসে বল্লে, "তাও না। অতিথি-সেবার আনন্দের পুরোপুরিটাই ভোগ করতে দাও। জান ত, অতিথি পুরুষমানুষ হ'লে নারায়ণ, আর স্ত্রীলোক হ'লে লক্ষ্মী। সুতরাং আর তর্কাতর্কি না ক'রে লক্ষ্মীটির মতো ল্যাভেটরীতে ঢুকে পড়।"

এ কথার পর ল্যাভেটরিতে প্রবেশ করা ভিন্ন উপায়ান্তর রইল না। বিলাসপুরে গাড়ী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, প্রমথ একবার মনে করলে সেইখানেই কুলীদের দিয়ে বিছানা-পত্র বাঁধিয়ে নেবে, কিন্তু মনের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এত বেশি সঞ্চিত হয়েছিল যে তার তাড়নায় নিজেই উদ্যমের সহিত লেগে গেল ; তা ছাড়া, সন্ধ্যার কাছে সদ্য-প্রকাশিত পৌরুষের গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ না হয় সে বিষয়েও বোধ হয় আগ্রহ কম ছিল না।

ল্যাভেটরী থেকে সন্ধ্যা নিষ্ক্রান্ত হ'লে প্রমথ বল্লে, "বিলাসপুর ত' পৌঁছলাম উষা, এখন কোথাকার টিকেট করব বল,—কাশীর, না লক্ষ্ণৌর ?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে, একবার প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বল্লে, "কাশীরই না হয় করুন।"

প্রফুল্লমুখে প্রমথ বল্লে, "বেশ কথা, আমারও তাই ইচ্ছে। কাশী আমরা এর চেয়ে অনেক সোজা পথে যেতে পারতাম। ইচ্ছে ক'রেই এই ঘোরা পথে যাচ্ছি। কাল বেলা সাড়ে দশটার সময়ে আমরা কাশী পৌঁছব, তার আগে পথে পথে এ দু রাত্রের ঘরকন্না বোধ হয় নিতান্ত মন্দ হবে না।"

প্রমথর গৃহে প্রবেশ ক'রে সন্ধ্যা প্রথমে যে স্বজনহীন কারাগৃহের নির্ম্মমতার মতো একটা রূঢ় আঘাত পাবে, এ কথা অনুমান ক'রেই প্রমথ এই দীর্ঘ বিসর্পী পথ অবলম্বন করেছিল। পাখীকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করবার পূর্ব্বে গাছের শাখায় বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, যদি তদবসরে কতকটা পোষ মানিয়ে নিতে পারে।

বিলাসপুরে যখন গাড়ী পৌঁছল তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। আকাশ মেঘহীন হয়ে গেছে, বায়ু সুশীতল, এবং রাত্রে বৃষ্টি-পাতের ফলে বৃক্ষলতা তখনো আর্দ্র।

প্রমথ বল্লে, "উষা, ওয়েটিং রুমে যাবে, না বাইরে বেঞ্চিতে বস্‌বে ? টিকিট কিনে আর চা-পানের ব্যবস্থা ক'রে আমরা গাড়ীতে গিয়ে বস্‌ব। গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্মের কাছেই লেগে আছে।"

বাহিরের স্নিগ্ধতা পরিত্যাগ ক'রে ওয়েটিং রুমের আবদ্ধ-তার ভিতরে যেতে সন্ধ্যার প্রবৃত্তি হ'ল না ; বল্লে, "বাইরেই বস্‌ব।"

প্ল্যাটফর্ম্মের অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে একটা বেঞ্চে সন্ধ্যাকে বসিয়ে এবং অদূরে কুলীর জিম্মায় জিনিষ-পত্র রেখে প্রমথ বুকিং অফিসে উপস্থিত হ'য়ে টিকিট করলে, তারপর

রিফ্রেশমেণ্ট রুমে গিয়ে চা ও খাবার প্রস্তুত ক'রে কাটনিগামী গাড়ির প্রথম শ্রেণীতে নিয়ে যাবার উপদেশ দিয়ে সন্ধ্যার নিকট ফিরে চল্‌ল। দূর থেকে দেখ্‌লে বেঞ্চে সন্ধ্যার বাম পাশে একজন প্রৌঢ়া মহিলা ব'সে আছেন, মনে হল তাঁর দক্ষিণ বাহু যেন সন্ধ্যার স্কন্ধদেশ বেষ্টন ক'রে আছে। নিকটে আস্‌তেই মহিলাটি সন্ধ্যার কাঁধ থেকে হাত তুলে নিলেন এবং সন্ধ্যাও একটু সরে সোজা হ'য়ে বস্‌ল।

সন্ধ্যার মুখ চোখের আরক্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হয়ে প্রমথ বললে, "কি ব্যাপার উষা? কি হয়েছে?"

উত্তর দিলেন মহিলাটি; সহাস্যমুখে বললেন, "হয় নি বিশেষ কিছু। এইদিক দিয়ে যেতে যেতে দেখ্‌লাম মেয়েটীর চোখ দুখানিতে জল টলটল করছে,—বোধ হয় বাপ মার জন্যে মন কেমন করছিল, কাছে এসে ব'সে একটু আদর করতেই ঝরঝর ক'রে সমস্তটা ঝরে গেল!" ব'লে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

প্রমথও সহাস্যমুখে কপট বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বল্‌লে। "সে কি উষা? একেবারে কান্নাকাটি?" তারপর মহিলাটিকে সম্বোধন ক'রে স্নিগ্ধ স্বরে বললে, "আপনার সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ।"

মহিলাটি স্মিত মুখে বললেন, "না, না, এর জন্যে ধন্যবাদ দেওয়ার আর কি আছে। এঁর নাম বুঝি উষা?"

প্রমথ বললে, "হ্যাঁ, উষা।"

সন্ধ্যার প্রতি সতৃপ্তনেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে মহিলাটি বললেন, "যেমন নাম, মুর্ত্তিখানিও তেমনি!" তারপর সন্ধ্যার চিবুক স্পর্শ ক'রে চুম্বন ক'রে বললেন, "চললাম উষা, সুখে থেকো।"

সন্ধ্যা যুক্তকরে নমস্কার করলে, চক্ষে তার কৃতজ্ঞতার দীপ্তি।

মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়ে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "আপনার স্ত্রীভাগ্য ভাল।"

ঈষৎ বিমূঢ় ভাবে প্রমথ বললে, "কেন বলুন ত?"

মহিলাটি সহাস্য মুখে বললেন, "কেন, তা যদি এখনো না বুঝে থাকেন ত শীঘ্রই বুঝতে পারবেন। আমরা জিনিষ দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারি। যত্নে রাখবেন।" তারপর একটু ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, "রায়পুর থেকে আমার আত্মীয় আসছেন। ডিসট্যাণ্ট সিগনাল ডাউন হয়েছে; এখন তা হ'লে আসি।"

প্রমথ যুক্তকরে নমস্কার করলে। প্রতিনমস্কার ক'রে মহিলাটি দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "সময় পাওয়া গেল না উষা, নইলে স্ত্রীভাগ্য আমার কি রকম ভাল তা ভাল করেই বুঝিয়ে দিতে পারতাম। যে ফুল এ পর্য্যন্ত ফুটল না, আর সম্ভবত কোনদিনই ফুটবে না, সে ফুলের সুগন্ধের উনি প্রশংসা করে গেলেন! তবে তুমি যে ভাল সে অনুমান ওঁর ভুল হয় নি; সে বিষয়ে উনি পাকা জহুরীর পরিচয় দিয়েছেন। আচ্ছা চল, এবার আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি।" ব'লে জিনিষপত্র ও সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ প্ল্যাটফর্ম্মের সন্নিকটে অবস্থিত কাটনি যাবার গাড়ীতে গিয়ে প্রবেশ করলে।

বিলাসপুর থেকে কাটনি পৌছতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, এবং সেখানে গাড়ী পরিবর্ত্তন ক'রে পরদিন প্রত্যূষে পাঁচটার সময়ে প্রমথ ও সন্ধ্যা এলাহাবাদে উপনীত হ'ল।

প্রমথ বললে, "উষা, কি করবে বল? কাশী গেলে সেখানে পৌছতে একটু বেলা হয়ে যাবে, এগারটা সাড়ে এগারটার কম হবে না। হয়ত' তোমার কষ্ট হবে। এলাহাবাদে আজ থাকবে? সুবিধে আছে থাকবার।"

সন্ধ্যা বললে, "আমার কষ্ট হবে না। আপনার যদি কষ্ট হয় তা হ'লে না হয় থাকুন।"

প্রমথ বললে, "আমারও কষ্ট হবে না। কিন্তু তুমি যদি কাশী পৌছে প্রথমেই বিশ্বেশ্বর দর্শন কর তা হ'লে ত আরও বেলা হয়ে যাবে। উপোষ ক'রে থাক্‌লে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে।"

সন্ধ্যা বললে, "না, তাতেও কষ্ট হবে না। আপনি কিন্তু পথেই চা-টা খেয়ে নিন।"

প্রমথ বললে, "ক্ষেপেচ? এক যাত্রায় পৃথক ফল কিছুতেই হ'তে দেওয়া হবে না। তুমি উপবাসী থেকে বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'রে পুণ্য অর্জ্জন করবে, আর আমি চা-পাঁউরুটি পেটে পুরে গিয়ে নন্দীভৃঙ্গীর লাঠির গুঁতো খাব—এ সহ্য করতে পারব না। অতএব আমারও অদৃষ্টে আজ পুণ্য অর্জ্জন আছে দেখছি।"

বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে যখন গাড়ি পৌছল তখন বেলা এগারটা উত্তীর্ণ হয়েছে। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে প্রমথ ও সন্ধ্যা গোধুলিয়ার একটা ত্রিতল গৃহের সম্মুখে উপস্থিত

হ'ল। ঘন ঘন হর্ণের শব্দ শুনে একজন পশ্চিমা ভৃত্য বেরিয়ে এল, তারপর প্রমথকে দেখেই দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

মিনিট খানেক পরে একজন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে গাড়ির ভিতর প্রমথকে দেখে উৎফুল্ল মুখে বললে, "ও মা, তুমি এসেছ! আর মুখপোড়া বিশুয়াটা গিয়ে বল্লে কি-না যে বল্‌দেঘাটার জমিদার বাবু এসেছে।"

প্রমথ স্মিতমুখে বললে, "মুখপোড়া বিশুয়া ত' তা হলে তোমাকে ভারী নিরাশ করেছে মাসি! এসে দেখলে কি-না বল্‌দেঘাটার জমিদার বাবুর বদলে কলকাতার ফতো বাবু।"

মাসী বললে, "তোমার মতো ফতো বাবুর পকেটে অমন দশ-বারোটা বল্‌দেঘাটার জমিদার বাবু পোরা থাকে। কিন্তু গাড়িতে ব'সে কেন?—এস, নেমে এস!"

প্রমথ পকেট থেকে দশখানার দশটাকার নোট বার ক'রে মাসীর হাতে দিয়ে বললে, "না মাসী, এবার আর এখানে থাকা চলবে না। তুমি এখনি একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাওয়াদার বাড়ি এক মাসের জন্যে ভাড়া ক'রে ফেল, আর একটা পাচক, একজন চাকর, একজন ঝি,—আর মোটামুটি সংসারের যা-যা জিনিসপত্র দরকার হয় সব ব্যবস্থা করে দাও।"

বিস্মিত হয়ে মাসী বললে, "কিন্তু এ-সবের কি দরকার আছে তা ত বুঝতে পারছিনে। তেতলায় তোমার তিন-খানা বড় বড় ঘর আছে, নিত্যি ঝাঁট সন্ধ্যে পড়ে, সারাদিন দোর-জানলা খোলা থাকে,—পাঁচ বছর ধ'রে তুমি ভাড়া দিয়ে আসছ। তবে আবার একটা আলাদা বাড়ীর কি দরকার?"

প্রমথ বললে, "ও যেমন আছে থাক মাসী, এবার একটা আলাদা বাড়িই চাই।"

প্রমথর কথায় সন্ধ্যাকে একটু ভাল করে নিরীক্ষণ ক'রে মাসী সহসা বললে, "বুঝেচি এখন! বউমা? বিয়ে করেছ? তা বেশ, কিন্তু আমি এবার ছাড়ছিনে বাছা, এক জোড়া গরদের শাড়ি, আর গলার জন্য এক ছড়া পবিত্তির হার আমার চাই-ই। মাদুলীটা সদা-সর্ব্বদা খুলে খুলে প'ড়ে যায়, একটা হার হ'লে সুবিধে হয়।"

প্রমথ বললে, "আচ্ছা মাসী, সে সবের জন্য চিন্তা নেই, সে সব হবে। উপস্থিত আমরা শঙ্কর পাণ্ডার বাড়ি চললাম, সেখানে গঙ্গা স্নান ক'রে, বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'রে প্রসাদ পাব। তারপর সমস্ত দিনটা বজরায় কাটিয়ে সন্ধ্যার সময়ে তোমার কাছে আস্‌ব। জিনিস-পত্রগুলো নামিয়ে রেখে দাও।"

"স্নানের পর কাপড় চোপড়?"

"সে একটা পুঁটলি বেঁধে নেওয়া হয়েছে।"

নিকটেই বিশুয়া ছিল, জিনিসপত্র নাবিয়ে নিলে।

প্রমথ বললে, "যেমন বললাম সব যেন ঠিক থাকে মাসী।"

মাসী হাসিমুখে বললে, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো,—তোমার মানদা মাসীর হাতে আধখানা কাশী আছে।"

"আর কিছু টাকা দোবো?"

মাসী বললে, "ওমা, সে কি কথা, লক্ষ্মীকে কি না বলতে আছে? দেবে দাও।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করে অস্ফুট কণ্ঠে প্রমথ বললে, "আর যাই বল মাসীকে নাস্তিক বলতে পারবে না।" তারপর আর পাঁচখানা নোট মানদা মাসীর হাতে দিয়ে গাড়ি চালাতে আদেশ দিলে।

মাসী যে একজন 'কাশীবাসিনী মাসী' এর বেশি পরিচয় দেবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। প্রমথ তার একজন শাঁসাল যজমান। সৌখীন জীবন-যাপনের ব্যাপারে এই সব কাশী-বাসিনী মাসীরা প্রমথর মত ধনী যুবকদের অভিভাবিকা।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কোন্ পথে

শ্রীরঘুনাথ মাইতি

কোন্ পথে আজ যাবেরে আমার মনোরথ—
রাজপথ ডাকে দক্ষিণে, বামে বনপথ।
রাজপথ বলে—'এসো হে পথিক, নাহি ভয়,
সবাই তো জানে—এই পথটী যে সুখময়,
যত চাও পাবে শান্তি-তৃপ্তি-অনায়াস,
লক্ষ পথিক এই পথে চলে বারোমাস,
কেবলি আরাম—ভাবনার কিছু রবে না,
চোখ বেঁধে যাও তবু যেতে ভুল হবে না।
বিপদের হেথা নাহি কোন লেশ, নাহি ক্লেশ,
বাঁধা পথে তাই চলে নিশিদিন সারা দেশ।
পরিচিত জন দল বেঁধে সব চলে যায়
বাঁধা বুলি বলে, বাঁধা সুরে সব গান গায়
লাখো বরষের চরণ পরশে বাধাহীন
এ পথে কেবলি হাসি নাচ গান বেণুবীন।'

বন পথ বলে—'বাধা দেখে যদি পাও ভয়,
প্রাণ যদি শুধু খুঁজে পুরাতন পরিচয়,
তা হলে পথিক মন যেথা চায় চ'লে যাও—
এ পথের মায়া থাকে যদি কিছু মুছে দাও।

আমি দুর্গম, আমি বন্ধুর, সুভীষণ,
বুক জুড়ি মোর শিলাসঙ্কট কাঁটাবন।
কভু সাথে যাই—কখনো লুকাই আঁধারে,
ফণিনী বাঘিনী গর্জ্জে আমার দুধারে।
তবু যদি যাও প্রতিপদে সহি বেদনা,
প্রতিপদে পাবে তীব্র মধুর চেতনা।
পলকে পলকে দেখা দিবে অভাবনীয়—
দুঃখের সুখ—গরলের সাথে অমিয়।
সংঘাতে আর প্রতিঘাতে চির-চঞ্চল
এ পথে প্রচুর হাস্য—প্রচুর আঁখিজল।

কোন্ পথে আজ যাবেরে আমার মনোরথ
রাজপথ ডাকে দক্ষিণে—বামে বনপথ।

বিশ্বনাথ আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়

গত আষাঢ়ের বিচিত্রায় বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম যে, আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে সত্য আছে, প্রচুর সঠিক বল্‌তে পারিনে, হয়ত আধুনিক কালের পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার প্রয়োগ এবং প্রচলন সেই আঘাতসমূহের অন্যতম;— কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে প্রচুর প্রাণশক্তি যে আছে তার

বিশ্বনাথ আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়

প্রাণশক্তি আছে, তাই অনেক আঘাত সয়েও তার মৃত্যু হয়নি। এই অনেক আঘাত যে কি, তা আমরা হয়ত প্রমাণ এই অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ইলেক্ট্রোপ্যাথি প্রভৃতি পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী অধিরূঢ় যুগে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুত্থান।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অন্তর্গত শরীরতত্ত্ব, নিদান, আরোগ্য প্রণালী, দ্রব্যগুণ বিচার, খাদ্যবিচার, নাড়ী বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের সহিত যাঁদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে তাঁরা জানেন কোনো এক সময়ে এই চিকিৎসাবিদ্যা নিরন্তর অনুশীলন,

সর্ব্বজনমান্য মহামহোপাধ্যায়, প্রাণাচার্য্য
কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন
সরস্বতী বিদ্যাসাগর M. A. L. M. S.

পরীক্ষণ ও প্রয়োগ বিচারের দ্বারা বৈজ্ঞানিক সত্যের সমুচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছিল। অনেকের ধারণা আছে যে, অস্ত্র চিকিৎসা (Surgery) পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের একচেটিয়া সম্পদ,—কিন্তু আয়ুর্ব্বেদোক্ত শল্যতন্ত্র এবং শালাক্য তন্ত্রে যে বহু বিচিত্র অস্ত্রের বিবরণ এবং প্রয়োগ-বিধি আছে তদ্দ্বারা এ কথা নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণিত হয় যে অস্ত্র-চিকিৎসাতেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধিকার সামান্য ছিল না।

কিন্তু যে কারণেই হ'ক, এই ক্রমবর্দ্ধমান চিকিৎসা-শাস্ত্রের গতি-স্রোতে পলি প'ড়ে পড়ে এর বিস্তার ত বন্ধ হ'য়ে গেলই, অবশেষে অবনতির পথে ক্রমশঃ ক্ষয় এবং সঙ্কোচ আরম্ভ হয়ে কয়েকটি অঙ্গ লুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু পাশ্চাত্যপ্রভাবের প্রতিক্রিয়ার যুগে যখন দেশাত্মবোধ জাগ্রত হল, তখন এই অবহেলিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের দিকেও দেশের লোকের দৃষ্টি পড়ল। তারই ফলে কতিপয় আয়ুর্ব্বেদসেবীর জীবনব্যাপী সাধনা অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রভূত অর্থব্যয়ে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা-বিদ্যা তার গৌরবময় স্থান পুনরাধিকার করতে সমর্থ হয়েছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই কলিকাতা সহরেই কয়েকটি আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয় ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয় তন্মধ্যে অন্যতম।

মহামহোপাধ্যায় গণনাথের জীবনব্যাপী আয়ুর্ব্বেদ সাধনার ফল তাঁর পিতৃনামে উৎসৃষ্ট এই মহাবিদ্যালয়। গত পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে তিনি যে চতুষ্পাঠিতে অধ্যাপনা ক'রে এসেছেন তারই পূর্ণ বিকাশ এই বিরাট প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ের পঞ্চতল বৃহৎ সৌধ এবং তৎসংলগ্ন সমুদয় সম্পত্তি, যার মূল্য অন্যূন দুই লক্ষ টাকা, তিনি সমস্ত স্বত্ব পরিত্যাগ ক'রে জন-সাধারণের সেবার জন্য একটি ট্রাষ্টি সমিতির হস্তে প্রদান করেছেন।

বিদ্যালয় পরিচালনার মহৎ ব্রতে তাঁর দক্ষিণ হস্ত তাঁর সুযোগ্য পুত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার সেন এম্-এস্-সি

বিশ্বনাথ আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়ের ভাইস্‌প্রিন্সিপ্যাল, ও আরোগ্য-শালার ডেপুটী সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট কবিরাজ শ্রীসুশীলকুমার সেন ভিষগাচার্য্য কবিরত্ন এম, এস, সি, এম, আর, এ, এস

ভিষগাচার্য্য ও তদীয় ভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র সেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় উচ্চতম শিক্ষিত এই দুটি যুবক চিকিৎসক এই বিরাট শিক্ষায়তনের প্রাণস্বরূপ। মধুর ব্যবহারে ও অভিনব অধ্যাপনাগুণে তাঁরা ছাত্রগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন।

বিশ্বনাথ আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয় তার প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপকমণ্ডলী ক্রমবর্দ্ধমান ছাত্রসংখ্যা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিনব শিক্ষাপ্রণালী সুপরিচালিত আরোগ্যশালা, বিস্তৃত ও বহুমূল্য প্রদর্শনী (মিউজিয়ম), বিশাল গ্রন্থাগার, ভেষজোদ্যান, বিজ্ঞান সম্মত পরীক্ষাগার এবং গবেষণামন্দির দ্বারা সকলের প্রশংসা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

সর্ব্বজনমান্য আয়ুর্ব্বেদের নবযুগ প্রবর্ত্তক মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন সরস্বতী, লোকপ্রিয় কবিরাজ সুশীলকুমার সেন, দেশবিশ্রুত অস্ত্রচিকিৎসক রায় বাহাদুর ডাক্তার ইউ, এন, রায় চৌধুরী, কবিরাজ রাখালদাস কাব্যতীর্থ, কবিরাজ হরিপদ শাস্ত্রী, ডাক্তার ডি, পি, ঘোষ প্রভৃতি মনিষীগণ ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান ক'রে থাকেন। এই বিদ্যালয়ে Anatomy, Physiology, Pathology এবং আধুনিক Surgery, Midwifery প্রভৃতির শিক্ষা সম্যকভাবে প্রদত্ত হয়।

আরোগ্যাশালা, অন্তঃ এবং বহির্ভাগ এই দুইটী বিভাগে বিভক্ত। অন্তঃ বিভাগে পুরুষ ও স্ত্রী রোগিনীগণের জন্য পঞ্চাশটী শয্যা আছে। বহির্বিভাগে প্রত্যহ প্রায় দুইশত রোগীকে ব্যবস্থা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। তথায় ছাত্রদের হাতেকলমে কাজ শেখবার সুব্যবস্থা আছে।

বিশ্বনাথ আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার পক্ষে আদর্শ প্রতিষ্ঠান। তথায় সুশিক্ষিত ছাত্রগণ জীবন সংগ্রামে জয়ী হ'য়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করুন আমরা এই কামনাই করি।

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

বিগত ১০ই জুলাই থেকে বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিমিটেডের গৌরবময় কর্ম্মজীবনের সপ্তদশ বর্ষ আরম্ভ হোলো। এই ষোলোটা বৎসরের অপ্রতিহত ও দ্রুত উন্নতির ইতিহাস পরম সন্তোষের বিষয়। প্রাণিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এঁদের অভিযান প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই নূতন নূতন আবিষ্কারে জয়যুক্ত হ'য়েছে। অতি সামান্য অবস্থা থেকে আরম্ভ করে আজ এঁরা, সিরাম ভ্যাক্সিন ইত্যাদি প্রণয়নের ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান দাবি করতে পারেন। এঁদের খ্যাতি আজ শুধু বাংলা দেশে আবদ্ধ নেই, ভারতবর্ষ অতিক্রম করে সুদূর পশ্চিম জগতেও ছড়িয়ে পড়েছে।

সেদিন ১০ই জুলাই বরাহনগরের সুন্দর শান্তিপূর্ণ আবেষ্টনের মধ্যে এঁদের পরীক্ষাগার পরিদর্শন করে আমরা পরম প্রীত হ'য়েছি। চিকিৎসাকার্য্যের সহায়ক অনেক অতি সূক্ষ্ম ঔষধ এঁরা প্রস্তুত করতে সক্ষম হ'য়েছেন সেটা ত সামান্য কথা, প্রাণি-বিজ্ঞানের অধুনা অনধিকৃত অনেক ক্ষেত্রে এঁদের গৌরবময় অভিযান, মানবজাতির রোগ-যন্ত্রণা লাঘবের জন্য এঁদের অক্লান্ত চেষ্টার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। ধনুষ্টঙ্কারের বিষ প্রতিষেধক এঁরা যা প্রস্তুত করেছেন,—তার মধ্যে প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারের ৪৪০০ করে আন্তর্জাতিক ইউনিট আছে। এতখানি শক্তিশালী ঔষধ অনেক পাশ্চাত্য পরীক্ষাগারে এখনো প্রস্তুত হয় নি। বহুমূত্ররোগের চিকিৎসার জন্য এঁরা যে খাবার ঔষধ 'ওরালিন' আবিষ্কার করেছেন, তা বহু পরীক্ষার পর সন্তোষজনক প্রমাণিত হওয়ায় আজকাল লণ্ডনের হাঁসপাতালে ব্যবহৃত হ'চ্চে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন এমন বহু চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক এঁদের পরীক্ষাগার পরিদর্শন করে বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

এই প্রতিষ্ঠানটি যৌথশক্তির কারবার হ'লেও এর বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার জন্য বিচক্ষণ কর্ম্মী ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত এন-এন-দত্ত মহাশয়ের সুদক্ষ পরিচালনা একান্তভাবে প্রশংসার্হ। আমরা সর্ব্বান্তকরণে এই প্রতিষ্ঠানটির ক্রমোন্নতি কামনা করি।

আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থাগার কংগ্রেস ও কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

সম্প্রতি স্পেন দেশে আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হয়েছে। মাদ্রিদ, সালামানকা সেভিল ও বার্সিলোনা সহরে মোট বার দিন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। কংগ্রেসে পৃথিবীর নানাস্থান হতে

তেত্রিশটী দেশের ৫১০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন, তন্মধ্যে ষাট জন বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী প্রতিনিধি ছিলেন। কংগ্রেসে গ্রন্থাগারের উন্নতিবিষয়ক নানা বিষয়ে আলোচনা হয় এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। ভারতের প্রতিনিধিরূপে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম্ এল্ সি উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেন। প্রথম দিনই তাঁকে ভারতের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে হয়। তাঁর অভিভাষণ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। তাঁর অভিভাষণের পর ভারত-গ্রন্থাকার আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করেন। কংগ্রেসের পর তিনি ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন। সে সব দেশের ন্যাশান্যাল বিবলোথেকাগুলি তাঁর সম্বর্দ্ধনার বিশেষ আয়োজন করেন এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মজগতের গুরু পোপ স্বীয় প্রাসাদে নিমন্ত্রিত ক'রে তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত এবং তাঁর সহিত ভারত সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আলোচনাও করেন। গত বুধবার ১১ই আষাঢ় কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, এম্ এল্ সি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতি প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হাওড়া ষ্টেসনে তাঁর অভ্যর্থনার

ইণ্টারন্যাশান্যাল লাইব্রেরী কংগ্রেসে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।
(দক্ষিণদিক হইতে দ্বিতীয়)

আকৃষ্ট হয়েছে। মাদ্রিদ রাজপ্রাসাদে, স্পেন দেশের সাধারণ তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট, ফরেন আফিসে বিদেশসংক্রান্ত মন্ত্রী এবং যে যে সহরে অধিবেশন হয়েছিল সেখানকার মেয়র, প্রাদেশিক গবর্ণর, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ন্যাশান্যাল বিবলোথেকা সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন। কুমার মুনীন্দ্রদেব কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে বিলাত গিয়েছিলেন। সেখানে ব্রিটিশ মিউজিয়াম, বোড্‌লিয়ান অক্সফোর্ড, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েসান ও গ্রেট বৃটেনের ন্যাশান্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী বিশেষ আয়োজন করেছিলেন; সেখানে বহুলোকের সমাগম হয়েছিল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার পক্ষ হ'তে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে বিভাসচন্দ্র সিংহ, অবণীনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্তগিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ ও গৌরীপ্রসন্ন ঘোষ ও মহিলা সমিতি প্রভৃতি তাঁকে মাল্যদান ও অভিনন্দন প্রদান করেন।

পরলোকগত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৮ শে জুন শুক্রবার রাত্রি ১০-৩০ মিনিটের সময়

কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কলিকাতার বাস ভবনে পরলোক গমন করেছেন। তিনি বহুদিন যাবৎ ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভুগছিলেন; শেষ অবস্থায় ব্রঙ্কোনিমোনিয়া রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র ৫৩ বৎসর হয়েছিল।

বাঙ্গলার এক বিখ্যাত পরিবারে দুর্গাচরণ বাবুর জন্ম। দুর্গাচরণ বাবুর পিতার নাম ৺রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বহুবৎসর পর্য্যন্ত অরডিগ্‌নাম এণ্ড কোম্পানীর

৺দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একজন অতিশয় বিশ্বাসী সহকারী ছিলেন। দুর্গাচরণবাবুর শিক্ষাজীবন অতিশয় উজ্জ্বল ছিল। তিনি বি, এ, পরীক্ষায় ইতিহাসে অনার্স সহ পাস করেন এবং এম, এ, পরীক্ষায় ঐ বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আইন পড়েন এবং আইন পরীক্ষাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পাশ করার পর অচিরে তিনি দেশের একজন মেধাবী আইন ব্যবসায়ী বলিয়া পরিগণিত হয়েছিলেন। মেসার্স অর ডিগনাম এণ্ড কোম্পানীর আর্টিকেল ক্লার্ক হ'তে তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে ভবিষ্যতে ঐ কোম্পানীরই একজন অংশীদার হন। তিনিই ঐ ফার্ম্মের একমাত্র ভারতীয় অংশীদার।

ছোট বেলা হ'তে দুর্গাচরণ বাবু পৌর ও মিউনিসীপ্যাল ব্যাপারে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি কলিকাতা করপোরেশনে কমিশনার ছিলেন এবং বরাবর তিনি কলিকাতা করপোরেশনের ভবিষ্যৎ গঠন সম্পর্কে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে এসেছিলেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে যদিও কখনও তাঁকে পুরোভাগে দেখা যায়নি তথাপি বাঙ্গলার সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর কিছু না কিছু অংশ ছিল। দেশের কাজের জন্য অর্থ দান করতে তিনি সর্ব্বদা অকুণ্ঠ ছিলেন। দেশবন্ধু পল্লীসংগঠন তহবিলে, মহাত্মা গান্ধীকে ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তাঁর দান চিরস্মরনীয় হ'য়ে থাকবে। তিনি দেশবন্ধু মেমরিয়াল কমিটীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

ব্যবসায়জগতে স্বদেশী ফার্ম্মগুলিকে রক্ষার জন্য তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু চা-কোম্পানী ও কয়লা-কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বেঙ্গল পটারিজ লিঃ-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরদের তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন এবং একমাত্র তাঁরই চেষ্টায় উক্ত কোম্পানী ধ্বংসের হাত হ'তে রক্ষা পায়। বেঙ্গল পটারিজ লিঃ সম্পর্কে দুর্গাচরণ বাবু যে কাজ করেছিলেন তজ্জন্য তাঁকে স্যার পি, সি, রায় তাঁর জীবন-স্মৃতিতে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

দুর্গাচরণ বাবুর সাহিত্যানুরাগও কম ছিল না। তাঁর প্রণীত আইন পুস্তক—ইণ্ডিয়ান কনভেয়েনসিং ও ইণ্ডিয়ান রেজিষ্ট্রেসন এক্ট্‌ শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলে সর্ব্বত্র প্রশংসিত হয়েছে।

দুর্গাচরণ বাবু একজন ক্রীড়ামোদী ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এরিয়ান্স ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

দুর্গাচরণবাবু উত্তরপাড়ার পরলোকগত রাজা জ্যোৎ-কুমারের জামাতা। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন এবং মুঙ্গেরের ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও-বি-ই'র জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়-

এর সহিত তিনি তাঁর অপর এক কন্যার বিবাহ দেন। তাঁর বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিতা।—মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী, তিন পুত্র (শ্রীযুত জগদ্ধাত্রীকুমার, শচীন্দ্রকুমার ও পবিত্র-কুমার), তিন কন্যা ও বহু বন্ধু বান্ধব বর্ত্তমান রেখে গেছেন। আমরা দুর্গাচরণবাবুর শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গকে আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পরলোকগত পণ্ডিত আশুতোষ বিদ্যাবিনোদ

বিগত ১৫ই আষাঢ় ভাটপাড়ার সুবিখ্যাত পণ্ডিত আশুতোষ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭১ বৎসর হয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্রে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অসাধারণ অধিকার ছিল এবং একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ব'লে তাঁর বিশেষ খ্যাতি এবং সম্মান ছিল। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কবাগীশ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা'লয়ের অধ্যাপক।

নোয়াখালী নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ—শ্যামবাজার শাখা

বিগত ২রা জুলাই ১৯৩৫ শ্যামবাজারে নোয়াখালী নাথ ব্যাঙ্কের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাথ ব্যাঙ্কের মত এমন একটি নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত হওয়ায় শ্যামবাজার এবং তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসীগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

গত ১৯২৬ সালের শরৎকালে একটি টিনের ঘরে অতি সামান্য মূলধন নিয়ে এই ব্যাঙ্কটির সূত্রপাত হয়। এই অত্যল্প কালের মধ্যে যৎপরোনাস্তি সুনিপুণ পরিচালনার ফলে কলিকাতা সহরেই এই ব্যাঙ্কের তিনটী শাখা স্থাপিত হ'ল। ব্যাঙ্কের এই সমুন্নত অবস্থার জন্য ব্যাঙ্কের সুযোগ্য বিচক্ষণ জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এন্, এন্, দালাল মহাশয় বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত হওয়ার অধিকারী। আমরা নাথ ব্যাঙ্কের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি কামনা করি।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কুমারী আরতী সেন ও অর্চ্চনা সেনগুপ্তা

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রায় একহাজার ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিল। তন্মধ্যে কুমারী

কুমারী আরতী সেন

আরতী সেন এবং অর্চ্চনা সেনগুপ্তা উভয়েই সমান নম্বর পেয়ে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

...d by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at the Sahitya Bhaban Press, 26, Sitaram Ghose Street, and published by the same from 27-1, Fariapooker Street, Calcutta.

বর্ষায় বাংলা

শ্রী ত্রিপুরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

বিচিত্রা
ভাদ্র, ১৩৪২

নবম বর্ষ, ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৪২ | ২য় সংখ্যা

বর্ষামঙ্গল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

১

জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে
মনের ভুলে,
তাই হোক্ তবে তাই হোক্, দ্বার
দিলেম খুলে'।
এসেছ তুমি তো বিনা আভরণে
মুখর নূপুর বাজেনা চরণে,
তাই হোক্ তবে তাই হোক এসো
সহজ মনে।

ঐ তো মালতী ঝ'রে প'ড়ে যায়
মোর আঙিনায়,
শিথিল কবরী সাজাতে তোমার
লও না তুলে।
না হয় সহসা এসেছ এ পথে
মনের ভুলে॥

কোনো আয়োজন নাই একেবারে,
সুর বাঁধা নাই এ বীণার তারে,
তাই হোক্ তবে এসো হৃদয়ের
মৌন পারে।
ঝর ঝর বারি ঝরে বন মাঝে
আমারি মনের সুর ঐ বাজে,
উতলা হাওয়ার তালে তালে মন
উঠিবে দুলে
না হয় সহসা এসেছ এ পথে
মনের ভুলে ॥

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

২

কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো
ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা,
আজি এ নিবিড় তিমির যামিনী বিদ্যুৎ-সচকিতা ॥
বাদল বাতাস ব্যেপে
হৃদয় উঠিছে কেঁপে,
ওগো সে কি তুমি জানো ?
উৎসুক এই দুখ জাগরণ
একি হবে হায় বৃথা ॥

ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা,
আমার ভবনদ্বারে
রোপন করিলে যারে,
সজল হাওয়ার করুণ পরশে
সে মালতী বিকশিতা,
ওগো সে কি তুমি জানো ?
তুমি যার সুর দিয়েছিলে বাঁধি'
মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি'
ওগো সে কি তুমি জানো ?
সেই যে তোমার বীণা, সে কি বিস্মৃতা ?
ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা ॥ *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* ৩০শে শ্রাবণ (১৩৪২) শান্তিনিকেতনে, বর্ষামঙ্গল উপলক্ষে রচিত ও গীত।

কাব্যে রবীন্দ্রনাথের দুই রূপ—আদিযুগ

শ্রীসুখরঞ্জন রায় এম্‌-এ

রবীন্দ্রনাথ একদিকে কবি, অন্যদিকে তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি; একদিকে তাঁর চিত্ত সুন্দরের অভিসারে ছুটিয়াছে, অন্যদিকে তাহা সত্য ও মঙ্গলের সাধনায় বিধৃত হইয়া আছে; একদিকে তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে নিত্য নূতনের সন্ধানে ছুটিয়াছেন, অন্য দিকে চিরন্তনের ধ্রুব কেন্দ্র-বিন্দুর উপরে তাঁর চিত্তবৃত্তি স্তব্ধ হইয়া আছে। তাঁর চিত্তদেশের দক্ষিণমেরু আনন্দে মুখর, সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল, রসে উদ্বেল; আর উত্তরমেরু কর্ত্তব্যে কঠোর, সংযমে শান্ত, নিষ্ঠায় অটল। একদিকে মনে হয় সুন্দরের অভিমুখে হৃদয়কে তুলিয়া ধরা এবং সুন্দরের সম্বন্ধে সুন্দর করিয়া বলাই হইয়াছে তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ; অন্যদিক দিয়া দেখি সেই জীবন সত্যের দর্শনে এবং শিবের অনুষ্ঠানে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাঁর মনের এক দিকে রহিয়াছে চাঞ্চল্য, অন্য দিকে রহিয়াছে স্তব্ধতা; একদিকে সম্ভোগ, অন্যদিকে বৈরাগ্য; একদিকে সৌন্দর্য্যের আকুলতা, অন্যদিকে সংযম; একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে নিষ্ঠা। এক কথায়, একদিকে তিনি কবি, অন্যদিকে তিনি লোকশিক্ষক, দার্শনিক ও কর্ম্মী। রবীন্দ্রনাথের এই দুইরূপ সর্ব্বজনবিদিত।

এমার্সন্ ঐশী শক্তির ত্রিধা আত্মপ্রকাশের কথা বলিয়াছেন, The Knower, the Doer, আর the Sayer—অর্থাৎ জ্ঞানী, কর্ম্মী এবং কবি—একই শক্তির তিন ভিন্ন বিকাশ—ঐশী শক্তির সীমানা স্পর্শ করার, ঐশী শক্তির সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করার এই তিন ভিন্ন উপায়। যুগে যুগে পৃথিবীর নরোত্তমেরা এই তিনের এক ভাগে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া মানবের মনে তাঁদের সিংহাসন পাকা করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ এক-এক দিকেই তাঁরা বড় হইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর মহামানবদের কথা ভাবিলেও এ কথা প্রমাণিত হইবে যে, এই তিনের বিশেষ এক রূপকেই তাঁরা তাঁদের জীবনে রূপায়িত করিয়াছেন, অন্য রূপগুলি তাঁদের মধ্যে থাকিলেও খুবই অপ্রধান হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব হইয়াছে এই যে, তিনি মুখ্যতঃ কবি অথবা সৌন্দর্য্যের উপাসক হইলেও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবীর এবং কর্ম্মবীরদেরও তিনি অন্যতম। জীবনের এই সর্ব্বদিকস্পর্শী সমগ্রতার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ব-ইতিহাসের পূর্ণতম মানব বলা চলে। এই তিনের মধ্যে সত্য ও মঙ্গলকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াই এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দুই রূপের কথা বলা হইয়াছে। নহিলে তাঁর ত্রিরূপের কথা বলাই সঙ্গত হইত।

দার্শনিক এবং লোকশিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে হইলে তাঁহার গদ্য প্রবন্ধাবলী নিয়াই আলোচনা করিতে হয়। দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া মানুষে মানুষে যে মূলগত ঐক্য রহিয়াছে, সমগ্র মানব-সমাজ যে একই শৃঙ্খলে গাঁথা, একই সঙ্গে যে তার উত্থান এবং পতন, এই বহু-অবয়ব মানবজাতির এক অঙ্গের বর্দ্ধন যে অন্য অঙ্গের কৃশতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—এই সমগ্রতার এই বিশ্বমানবতার বোধ এবং তার দার্শনিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা জগতের চিন্তা-ভাণ্ডারে দার্শনিক রবীন্দ্র-নাথের বিশেষ দান। এই চিন্তাধারা রবীন্দ্রনাথের নানা বাংলা ও ইংরাজী প্রবন্ধমালার ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া তাঁর ইংরাজী "Creative Unity," "Religion of Man" ইত্যাদি গ্রন্থে তার চরমরূপ পাইয়াছে। এইরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর উদার সার্ব্বজনীন ধারণা, তাঁর সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের বোধ, সমাজ সম্বন্ধে তাঁর সমুচ্চ আদর্শ, রাজনীতি সাহিত্য ও ললিত-কলা সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর চিন্তা—এই সব নিয়া আলোচনা

করিতে গেলে—অর্থাৎ জীবনের বিভিন্ন বিভাগে রবীন্দ্রনাথকে চিন্তানায়করূপে দেখিতে গেলে—তাঁর গদ্য প্রবন্ধাবলীর কথাই তুলিতে হয়। তেমনি কর্ম্মবীর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে গেলে তাঁর প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের বহু সংকল্প, তাঁর অনারব্ধ আরব্ধ এবং সম্পূর্ণীকৃত বহু অনুষ্ঠান, বাঙ্গালীর জীবনের উপর তাঁর বহুমুখী প্রভাব, দেশে দেশে তাঁর প্রচার-কার্য্য ইত্যাদির ভিতর দিয়া তাঁর বিচিত্র-চেষ্ট জীবনের আলোচনাই আসিয়া পড়ে। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁর গদ্য রচনা এবং জীবনকে আড়ালে রাখিয়া শুধু তাঁর কাব্য রচনার উপরই একটু চোখ বুলাইয়া লইব, এবং তারি মধ্যে তাঁর রসরূপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সত্য ও শিবরূপেরও যে বিকাশ হইয়াছে তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব।

কবিরূপেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব এবং এখনো তিনি মুখ্যতঃ কবিই। তিনি কবি, এ কথা বলা যা, তিনি সুন্দরের উপাসক—এ কথা বলাও তাই, কারণ সুন্দরকে যিনি যে পরিমাণে রসরূপ দিতে পারিয়াছেন তিনি সেই পরিমাণে বড় কবি। প্রত্যেক কবি সম্বন্ধেই এ কথা খাটে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তো বিশেষ রূপেই খাটে, কারণ রবীন্দ্রনাথ কবিগণ মধ্যেও কবি, কবি কুলশিরোমণি। অন্তরে বাহিরে, দেহে ও মনে, কাব্যে ও জীবনে, চিন্তায় এবং কর্ম্মে, কথার ভঙ্গীতে এবং অনুষ্ঠানে সৌন্দর্য্যের উপাসনা ও প্রতিষ্ঠা জগতে তাঁর মত আর কেহ করিয়াছেন কি না জানি না। কাজেই বাক্যে কর্ম্মে ও চিন্তায় রবীন্দ্রনাথকে সৌন্দর্য্যের পূজারী করিয়া দেখা, তাঁর এই রূপকে তাঁর বিশেষরূপ বলিয়া ভাবা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। কিছুদিন আগে প্রবাসীর এক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ও তাই ভাবিয়াছেন এবং তাঁর ভাবকে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়া সারস্বত সমাজের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ পড়িয়া সর্ব্বসাধারণের এ ভ্রম করা অসম্ভব নয়, এবং সে জন্য নলিনী বাবুও কিছু পরিমাণে দায়ী, যে রবীন্দ্রনাথের বুঝি এই একমাত্র রূপ। তাঁর প্রবন্ধ না পড়িয়াও দেশে এবং বিদেশে এই ধারণা অনেকের আছে তা আমরা জানি। কিছু দিন আগে কাগজে দেখিয়াছিলাম Paul Richard রবীন্দ্রনাথকে "রূপ দেবতা" আখ্যা দিয়াছেন—তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের শুধু সৌন্দর্য্যের পূজাই রহিয়াছে, সত্য জ্ঞান ও বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা নাই। আমাদের দেশের শিক্ষিতম্মন্য অনেকের এই রকম একটা আবছায়া ধারণা এখন পর্য্যন্তও আছে। তাই রবীন্দ্রনাথের রস-সৃষ্টির মধ্যেও সত্য ও মঙ্গল কি করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে বিশেষ করিয়া আজ তাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক—এখন তাঁর অনুরাগী ভক্ত এমন কেহ কেহ আছেন যাঁরা প্রথম বয়সে রবীন্দ্রনাথকে "কমলবিলাসী" কবি বলিয়া অভিহিত করিতেন। ফুলের হাসি, চাঁদের কিরণ, কোকিলের কুহু প্রভৃতি কোমল জিনিষের কাব্যে অতিরিক্ত আমদানি করিয়া তখন কবি এই অভিযোগের কারণ যোগাইয়াছিলেন।

সন্ধ্যা সঙ্গীত

সন্ধ্যাসঙ্গীতের গান আরম্ভে কবি কবিতাবধূকে তাঁর পাশে আসিয়া বসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই কবিতাবধূর সঙ্গে পৃথিবীর যত কিছু কোমল জিনিষের সাহচর্য্য তিনি কল্পনা করিয়াছেন, কঠিন এবং ভীষণকে পরিহার করিয়াছেন। "বিদ্যুৎ যেমন নেমে আসে," "ঝটিকা যেমন ছুটে আসে" সেই বেশে কবিতাকে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণ সন্ধ্যা সঙ্গীতের এই প্রথম কবিতাতেই কবির প্রথম বয়সের সমস্ত কবিতার প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। এই সব কবিতাতে সত্য ও জীবনের বলিষ্ঠ আশ্রয় নাই বলিয়া সব এলাইয়া পড়িয়াছে। মানুষের জগৎ হইতে বহু দূরে "মেঘময় পুরে" তখন কবিতার সঙ্গে তাঁর লীলাখেলা।

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার,
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে, কবিতা আমার।

কিন্তু সেই সময়েই শ্রেষ্ঠ কবিসুলভ উপলব্ধি তাঁর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—

কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়
ভালবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,

ভক্তি করি পৃথিবীর মত
স্নেহ করি আকাশের প্রায়। (অনুগ্রহ)

তখনি ভালবাসা সম্বন্ধে কবি যে ধারণা করিয়াছিলেন তার মধ্যে গীতিকাব্যোচিত লঘুতা নয়, মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য্য ও ও মর্য্যাদাই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আকাশে হেরিলে শশী আনন্দে উথলি উঠি
দেয় যথা মহাপারাবার
অসীম আনন্দ উপহার,
তেমনি সমুদ্রভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালবাসে।

কবি সন্ধ্যাকে শ্রোতা করিয়া যে গান শুনাইতেছেন সে গান যদি আর কেহ না শোনে,

যদি তারা হারাইয়া যায়,
সন্ধ্যা তুই সযতনে, গোপনে বিজনে অতি
ঢেকে দিস্ আঁধারের ছায়।
যেথায় পুরান গান যেথায় হারান হাসি
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন,
সেইখানে সযতনে রেখে দিস্ গানগুলি,
রচে দিস্ সমাধি-শয়ন।

এইখানে কবি-চিত্তের গভীরতা, তাঁর অন্তঃপ্রবেশ-কুশল বুদ্ধি ও দার্শনিকতার স্বাদ পাই। এ ধরণের পংক্তি শুধু হৃদয়কে তৃপ্ত করে না, আমাদের বুদ্ধিকেও নাড়া দেয়।

কিন্তু সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে এই প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় "সংগ্রাম সঙ্গীত" ও "আমি হারা" এই দুইটি কবিতা। কবি আপন মনে বাঁশী বাজাইয়াছেন, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-গীতি ঢালিয়াছেন, নিজ আবেগে ছুটিয়াছেন— এই আবেগ উচ্ছ্বাসের ছাপ সন্ধ্যাসঙ্গীতের প্রতি কবিতাতেই আছে। কিন্তু এই আবেগই যখন কবিকে নিয়া, তাঁর "হৃদয় অরণ্যে" প্রবেশ করাইয়াছে, কবি যখন তাঁরি মনোগহনে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির সাহচর্য্য পর্য্যন্ত হারাইয়া বসিয়াছেন তখন কবির একমাত্র উপজীব্য হৃদয়ের সহিতই তাঁহাকে সংগ্রামে নিরত দেখিতে পাই।

আজ তবে হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম!
ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম।
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা!

* * * * * *

হৃদয়েরে রেখে দেব বেঁধে,
বিরলে মরিবে কেঁদে কেঁদে।
দুঃখে বিঁধে কষ্টে বিঁধি জর্জর করিব হৃদি
বন্দী হয়ে কাটাবে দিবস,
অবশেষে হইবে সে বশ।

কবির মধ্যে আনন্দ আছে, আবেগ আছে, কিন্তু তার উল্টাদিকে এই হৃদয় নিপীড়নের মধ্যে রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে এই প্রথম নিষ্ঠা ও সংযমের আভাস পাওয়া যায়। আমি-হারা কবিতায় কবি যাকে

সে আমার শৈশবের কুঁড়ি
সে আমার সুকুমার আমি!

বলিয়াছেন সে হইতেছে ফুলের মত পবিত্র কবির নিষ্কলঙ্ক শৈশব জীবন। যৌবনারম্ভে হৃদয়-অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সংসারের ধূলি ও মালিন্যের সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম সংস্পর্শ ঘটিল তখনই তিনি তাঁর "সুকুমার আমি"কে হারাইয়া বলিয়া উঠিলেন—

রাখ দেব, রাখ, মোরে রাখ,
তোমার স্নেহেতে মোরে ঢাক,
আজি চারিদিকে মোর একি অন্ধকার ঘোর
একবার নাম ধরে ডাক।
পারি না যে সামালিতে, কাঁদি গো আকুল চিতে
কত রয় মৃত্তিকা বহিয়া?
ধূলিময় দেহখানি ধূলায় আনিছে টানি
ধূলায় দিতেছে ঢাকি হিয়া।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই প্রথম নীতি-চৈতন্য ও আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ, ঋষি রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম সুস্পষ্ট পদ-চিহ্ন। পাপের বোধ হইতেই প্রথমে পুণ্যের আলো জগতে ছড়াইয়াছে, আঁধারের উল্টা পিঠেই [illegible]

রহিয়াছে ঋষিত্বের উদ্বোধন। আদি মানবের সুকুমার আমিতে এই প্রার্থনা কখনো সম্ভব ছিল না।

তারপর প্রভাত সঙ্গীতে আসিয়া দেখি কবি হৃদয়-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণের গান ধরিয়াছেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' সেই নিষ্ক্রমণের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে; কবির আনন্দ উচ্ছ্বাস ও আবেগের ইহা সমুজ্জ্বল ছবি—মূর্ত্ত প্রতীক। জগৎ-অতীত আকাশ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল, প্রাণের বাসনা আকুল হইয়া কোথায় ভাসিয়া যাইবে ঠিক পাইতেছে না, 'জগৎ বাহিরে যমুনা পুলিনে কে যেন বাজায় বাঁশি' তাহা শুনিয়া কবি-চিত্ত আর স্থির থাকিতে পারিতেছেনা, ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, এ চিত্র কবি অমর তুলিকায় আঁকিয়াছেন। হৃদয়-অরণ্য হইতে বাহির হইয়া প্রকৃতির সহিত কবির পুনর্মিলন হইল, মানুষকেও তিনি কোলের কাছে পাইলেন।

প্রভাত সঙ্গীত

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।

(প্রভাত উৎসব)

কবির কাব্যে এই প্রথম প্রকৃত মানুষের আবির্ভাব। এই মানুষকে ভালবাসার পরেই আসিবে মানুষের সেবা।

এই প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে নবজীবন লাভ করিয়া কবির গর্ব্ব ও নিজ সমুন্নত মহিমা সম্বন্ধে সজ্ঞানতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বারেক চেয়ে দেখ আমার মুখপানে,
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে।
আপনি আসি উষা শিয়রে বসি ধীরে,
অরুণ কর দিয়ে মুকুট দেন শিরে।

এমন কথা কোনো কমল-বিলাসী কবির মুখ দিয়া বাহির হইতেই পারিত না।

প্রভাত সঙ্গীতে কবির আনন্দ আবেগটি খুব উপভোগের জিনিষ হইলেও তার মানস (Intellectual) রসটিও কম উপভোগের জিনিষ নয়। যে কবি পরিণত বয়সে হৃদয়ের প্রবল সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর মানসতার তৃপ্তি বিলাইয়া চলিয়াছেন, একই হাতে মানুষের পাতে দুই জিনিষ পরিবেশন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁর মানসতার প্রথম দ্যোতনা দেখিতে পাই এই প্রভাত সঙ্গীত কাব্যে। ইহার "অনন্ত জীবন" "অনন্ত মরণ" "প্রতিধ্বনি" "মহাস্বপ্ন," "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়" "স্রোত" এই কবিতা কয়টি শুধু আমাদের অনুভূতিকে জাগ্রত করে না, মনের অন্তস্থল পর্য্যন্ত গভীরভাবে স্পর্শ করে। এই কবিতা কয়টি দিয়া প্রথম প্রমাণিত হয় যে এই কবির কাজ শুধু প্রাণন নহে, মননও বটে। 'অনন্ত জীবনে' কবি বলিতেছেন—

স্মৃতির কণিকা তা'রা স্মরণের তলে পসি'
রচিতেছে জীবন আমার!"

"অনন্ত মরণে" কবি বলিতেছেন—

যতটুকু বর্ত্তমান তারেই কি বল প্রাণ?
সেত শুধু পলক নিমেষ।
অতীতের মৃতভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার,
না জানি কোথায় তার শেষ!

"প্রতিধ্বনির" মধ্যেও সেই সত্যের সাক্ষাৎ, সেই মানসতার রসের আস্বাদ পাই।

পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহ তপনের,
কোটি কোটি তারার সঙ্গীত,
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানিয়ে হতেছে মিলিত!
সেইখানে একবার বসাইবি মোরে,
সেই মহা আঁধার নিশায়,
শুনিবরে আঁখি মুদি বিশ্বের সঙ্গীত,
তোর মুখে কেমন শুনায়।

তারপর "মহাস্বপ্নে" "পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন" নিদ্রামগ্ন মহাদেবের মহান স্বপনের কথা বলা হইয়াছে। মহাদেবের হৃদয়-সমুদ্রে বিশ্বের মতন সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিতেছে, ধ্রুব কেন্দ্র বিন্দুর উপর দিয়া চলিয়াছে the continuous flux of things—চির পুরাতনের উপর দিয়া চলমান নূতনের খেলা, অর্দ্ধ চেতনা হইতে স্ফুট চেতনার দিকে প্রয়ান—

চেতনা ছিঁড়িতে চাহে আধ-চেতনার আবরণ,
দিন রাত্রি এই তার আশা এই তার পণ।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের স্থিতি-অংশে প্রেম-তত্ত্বের ছবি—যৌবনের সৃষ্টির রহস্য—শক্তির সহিত সৌন্দর্য্যের সমন্বয়—

এ কি রে যৌবন—উচ্ছ্বাস
এ কিরে মোহন ইন্দ্রজাল,
সৌন্দর্য্য-কুসুমে গেল ঢেকে
জগতের কঠিন কঙ্কাল।

এই সব কবিতায় তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও তত্ত্বরসের সঙ্গে সঙ্গে আছে কল্পনার বিশালতা ও গভীরতা, যার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে বিশেষ করিয়া মহাকাব্যোচিত মহিমা। কবি অল্প কিছুদিন আগেই ঠিক মহাকাব্য না হউক, দীর্ঘকাব্য লিখিয়া আসিয়াছেন, তারি কল্পনার বিশালতা এখনো তাঁকে পরিত্যাগ করে নাই। এই বিশালতাকে গীতিকাব্যের ক্ষুদ্রতায় ভাঙ্গিয়া গভীরতার সাধনায় সিদ্ধ হইয়া গীতিকাব্যের ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতর দিয়াই মহাকাব্যের সীমানা স্পর্শ করার নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী কাব্য চেষ্টাতেও আমরা মাঝে মাঝে দেখিতে পাইব। গীতিকাব্য লিখিয়াও যে রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, আর Southeyর মত ঝুড়ি ঝুড়ি মহাকাব্য লিখিয়াও যে অনেকে মহাকবি নন্, এটা প্রমাণ করা খুব শক্ত নয়।

প্রভাত-সঙ্গীতের স্রোত নামক কবিতায় সমগ্র বিশ্বের সহিত মানুষের এবং মানুষে মানুষে ঐক্যের দার্শনিক ভিত্তির কথা প্রথম সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে। পরিণত বয়সে যিনি বিশ্বমানবতার অন্তস্থিত দার্শনিকতার প্রতিষ্ঠা করিবেন মানুষে মানুষে ঐক্যরূপী চিরন্তন সত্যের কথা প্রচার করিয়া মানবের চিন্তাকে নবপথে শুভঙ্করী গতি দিবেন, তাঁরি প্রথম আবির্ভাব এই কবিতায়। সেই ভাবে বিচার করিলে এই কবিতাকে Creative unityর পদ্ম বীজকোষ বলিয়া ধারণা হইবে, বৃক্ষশাখে যুক্তিরূপী পরিপূর্ণ ফলটি পাইবার আগে তারি এটি ভূগর্ভে-লীন সুগোপন সূচনা।

অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস্ আমি আমি
উজান যেতে পারিবি কি সাগর-পথগামি।
জগৎ পানে যাবিনেরে আপনা পানে যাবি,
সে যে রে মহামরুভূমি কি জানি কি যে পাবি।
মাথায় করে আপনারে, সুখ দুখের বোঝা,
ভাসিতে চাস প্রতিকূলে সেত রে নহে সোজা।
অবশ দেহ, ক্ষীণ বল, সঘনে বহে শ্বাস।
লইয়া তোর সুখদুখ এখনি পাবে নাশ।

প্রভাত-সঙ্গীতের পর ছবি ও গানে আমরা শুধু নিছক কবিকেই পাই। ছবি ও গানে কবি শুধু "জাগ্রত স্বপ্নে" নিমগ্ন। এখানে কবির ছবি এইরূপ—

ছবি ও গান

উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি, মুখে লয়ে হাসি
ভ্রমিতেছি আন্ মনে।

এখানে কবি যে-রাজ্যে বাস করিতেছেন সেখানে—

ঘর দ্বার সব মায়া ছায়া সম,
কাহিনীতে গাঁথা-খেলাধূলি,
মধুর তপন মধুর পবন
ছবির মতন কুঁড়ে গুলি।

এখানে কবি পাগল হইয়া "গানের মত" "প্রাণের মত" "সৌরভের মত" বাতাসে উড়িতেছেন, চাঁদের কিরণ পান করিয়া এই কবি-মাতালের আঁখি ঢুলু ঢুলু হইয়া উঠিয়াছে। ছবি ও গানের সর্ব্বত্র এই ছবি, এই সুর। এখানে মনন কিম্বা নিষ্ঠার কোনো অবকাশ নাই। আমি অনেক সময় ভাবি 'প্রভাত সঙ্গীত' ও "কড়ি ও কোমলের" মধ্যে এই "ছবি ও গান" সম্ভব হইল কি করিয়া। সেই সময়ের এক ধরণের কবিতাকে বাছিয়া একত্র করিয়াই কি এই নিছক কোমলতা এবং আবেশের মালা গাঁথা হইয়াছে? এই অলস আবেগ-মাখা চোখের সাম্‌নে মধ্যাহ্নের ছবিটি চমৎকার হইয়া ফুটিয়াছে।

'ছবি ও গানের' মধ্যে তিনটি কবিতা সমগ্র বই হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে—'রাহুর প্রেম' 'যোগী' ও 'নিশীথ-জগৎ।' রাহুর তীব্র ক্ষুধা এবং উগ্রতা এই কাব্যের অলস সম্ভোগ হইতে পৃথক হইয়া প্রথমেই চোখে পড়ে। "যোগী"র ছন্দে ও ভাবে একটা ধ্রুবপন্থী সংযম—classical restraint—রহিয়াছে—যাহা এই কবিতাকে সমগ্র কাব্যটির মধ্যে একটা বিশিষ্টতা দিয়াছে। ধ্রুবপন্থা বা classicism-এর সুর হইয়াছে সংযম নিষ্ঠা ও সারস্বত সনাতনত্বের সুর, এই কাব্যের আবেশ ও আবেগের কল্পপন্থী বা Romantic note হইতে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া

আছে। 'নিশীথ-জগৎ' কবিতায় জীবনের বাস্তবতাকে মুখোমুখি দেখিবার একটা প্রয়াস আছে—রবীন্দ্র-কাব্যে তাকে প্রথম প্রয়াস বলা চলে। ইহাতে এই কবিতায় কতকটা স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়াছে! পাপের বোধ হইতে সংসারে যেমন পুণ্যের ভাতি ফুটিয়াছে, বাস্তবতার সংস্পর্শ হইতেই তেমনি মানব-মন শ্রেয়ের দিকে ছুটিয়াছে—সাহিত্যে বস্তুপন্থা ও শ্রেয়ঃপন্থা—Realism ও Idealism—অনেক সময় তাই একই জিনিষের এপিঠ ওপিঠ। এ কবিতায় 'আঁধারের রাজ্য লয়ে বিবাদে'র কথা আছে, 'সখারে বধিছে সখা সন্তানে হানিছে পিতা' এই খবর আছে। কিন্তু এই 'নিশীথের কারাগারে'র সঙ্গে সঙ্গে নিশীথের 'স্বপনের' শ্রেয়ঃ পন্থী সুরটিও ইহাতে আছে। 'নিশীথ চেতনা'তেও এই শ্রেয় পন্থার বিকাশ দেখি, দেখি 'একত্রে স্বরগ মর্ত্ত্য নাহিক দিকের শেষ।'

ভানুসিংহের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের কল্পপন্থী আচরণের ভিতর দিয়া কবির প্রেম—যা এতদিন অনেকটা আবছায়া রকমের ছিল—তা কতকটা বাস্তবতার স্পর্শ লাভ করিয়াছে, নির্দ্দিষ্ট বস্তু-বিষয়ের অবলম্বনে একটু ঘনীভূত হইয়াছে মনে হয়। সেই দিক দিয়া ভানুসিংহের পদাবলীকে 'কড়ি ও কোমলের' প্রেম সম্ভোগের ভূমিকা বলা চলে।

ভানুসিংহের পদাবলী

কড়ি ও কোমলের মধ্যে আসিয়াই আমরা প্রথম বস্তুর কঠিন ঠাঁই লাভ করি। 'প্রভাত সঙ্গীতে' মানুষ অনেকটা ভাবরূপী, 'কড়ি ও কোমলে' মানুষ বস্তু হইয়া কবির বুক জুড়িয়া বসিয়াছে। এখানে জগৎ-প্রাণের সঙ্গে কবির শুধু ভাবের যোগ নয়, বাস্তব যোগ। "কড়ি ও কোমলের" প্রথম কবিতা "প্রাণে" কবি তাঁর নব কাব্যজীবনের মূল সুরটি ধরিয়া দিয়াছেন। এটিকে তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনের মূল সুরও বলা চলে। এ সুর মাঝে মাঝে তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন, জীবনের অস্তাচলের কাছে দাঁড়াইয়া আবার তাহা গভীর ভাবে লাভ করিবার জন্যই। এই বাস্তবতার বিকাশের সূত্রেই কড়ি ও কোমলের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ শিশু কবিতাকে দেখিতে পাই। তার আগে ছবি ও গানের মধ্যে দুই একটার প্রথম আবির্ভাব দেখিয়াছিলাম। কিন্তু কড়ি ও

কড়ি ও কোমল

কোমলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব বাস্তব নারী-প্রেম, নারী-দেহের বর্ণনা এবং কবির যৌবন-মোহকে অবলম্বন করিয়া। যে কতগুলি সনেটে কবি তাঁর যৌবন স্বপ্নকে মূর্ত্তি দিয়াছেন সেগুলি সনেটের দেহ-সীমার মধ্যে ভাষা ও ভাবের সংযত প্রকাশে উৎকৃষ্ট সম্ভোগ-কাব্য রূপে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তবে এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট নীতির দিক দিয়া সেগুলি চিরকাল নিন্দিত হইয়া আছে।

কিন্তু সে গুলিতে কবি নারী-দেহের লোভনীয়তাকে আঁকিয়া থাকিলেও নিছক দেহ-সর্ব্বস্বতাতেই সেগুলি পর্য্যবসিত হইয়া যায় নাই। "হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর," "লাজহীনা পবিত্রতা শুভ্র বিবসনে" ইত্যাদি ভাব ও ভাষার ইঙ্গিত ছড়াইয়া তিনি নগ্ন দেহকে দৈহিকতার অনেক ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছেন; আর নীতির দিক দিয়া বিচার করিলেও বলিতে হইবে এই সম্ভোগই কবির নীতি-বোধকে, তাঁর মহত্ত্বকে, তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও মঙ্গল-চেষ্টাকে জাগ্রত করিতে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করিয়াছে। এই সম্ভোগসূত্রেই আমরা দেখি কবির "শ্রান্তি," দেখি "কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাসে" কবি আর বন্দী থাকিতে চাহিতেছেন না, তাঁর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হইতেই কবি "পবিত্র প্রেমের" ধারণায় আসিয়া উন্নীত হইয়া বলিতেছেন—

> যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
> যারে ভালবাস তারে করিছ বিনাশ!

মানব-জীবন যে কত পবিত্র কত মহৎ তাহাও তিনি বুঝাইয়াছেন—

> এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ,
> বলো না ইহার কানে আবেশের বাণী।
>
> (পবিত্রজীবন)

এখন তিনি আর নিজ প্রণয়িনীর সঙ্গে সুখরৌদ্র-মরীচিকায় বাস করিতে চাহেন না, তিনি চান মানবের সুখ-দুঃখের অংশ লইয়া সকলের সঙ্গে মঙ্গলের যোগে যুক্ত হইয়া বাস করিতে। ("মরীচিকা") দেখিতে পাই এই স্বপ্নরুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া, এই কীটের মত আপনার চারিদিকে সূক্ষ্ম রেশমের জাল ঘিরিয়া তাঁর মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে; তিনি দুঃখ করিতেছেন—"পারিনা করিতে আমি সংসারের

কাজ।" তিনি নিজ "অক্ষমতা"র জন্য ব্যথা বোধ করিতেছেন। "জাগিবার চেষ্টা" কবিকে এখন পাইয়া বসিয়াছে, তিনি মানবের সেবায় লাগিতে চাহিতেছেন—

মোর বলে কাহারেও দেব নাকি বল,
মোর প্রাণে পাবে নাকি কেহ নব প্রাণ ?
করুণা কি শুধু ফেলে নয়নের জল,
প্রেম কি ঘরের কোণে গাহে শুধু গান ?
তবেই ঘুচিবে মোর জীবনের লাজ,
যদি মা করিতে পারি কারো কোন কাজ।

শুধু গান গাহিয়া এখন আর তিনি "কবির অহঙ্কার" উপভোগ করিতে চান না—

গান গাহি বলে কেন অহঙ্কার করা।
শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না সরমে।
খাঁচার পাখীর মত গান গেয়ে মরা
এই কি মা আদি অন্ত মানব জনমে।

তাই এখন তিনি বলিতেছেন—

প্রাণে মরে গানে কিরে বেঁচে থাকা যায় !

"সিন্ধুতীরে" বসিয়া ক্ষুদ্র কথা তুচ্ছ কানাকানি ভুলিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন—

সবারে আনিতে বুকে বুক বেড়ে যায়,
সবারে করিতে ক্ষমা আপনারে ছাড়া।

সত্যের শিখায় তাঁর হৃদয়-দীপ তিনি জ্বালাইয়া তুলিতে চাহেন—

আমার হৃদয়-দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হতে তুলি এরে দাও জ্বালাইয়া,
ওই ধ্রুবতারাখানি রেখেছ যেথায়
সেই গগনের প্রান্তে রাখ ঝুলাইয়া।

যে 'ক্ষুদ্র-আমি' শীর্ণ বাহু-আলিঙ্গনে তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে তার কবল হইতে মুক্ত হইতে চাহিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

তুমি কাছে নেই বলে হের সখা তাই
"আমি বড়" "আমি বড়" করিছে সবাই।

এই 'প্রার্থনা' সনেটটিকে কবির প্রথম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক কবিতা বলা চলে, আধ্যাত্মিক গান হয়ত তিনি এই সময়ই প্রথম রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কবি-চিত্তে এই মহত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিকতা স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে মানবের সেবার ভাবও তাতে আসিয়া স্থান পাইয়াছে।

মানবের সুখ মানবের আশা
বাজিবে আমার প্রাণে,
শত লক্ষকোটী মানবের ভাষা
ফুটিবে আমার গানে।
মানবের কাজে মানবের মাঝে
আমরা পাইব ঠাঁই—
বঙ্গের দুয়ারে তাই শৃঙ্গা বাজে
শুনিতে পেয়েছি ভাই।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেশসেবার কথা বলিতে গিয়া কবি নিজ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

ওঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষেরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায়
যে ভাষা করিবে পান।
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে
ভাসিবে নয়ন জলে,
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে
মায়ের চরণ তলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই ব'লে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায়
গাও জগতের গান,
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়
ঘুচে যায় অপমান।

"বঙ্গবাসীর প্রতি," "আহ্বান গীত" প্রভৃতি খাঁটি দেশপ্রেমের কবিতা অতি স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই প্রথম দেখা দিল।

কিন্তু নিষ্ঠা সংযম মহত্ত্ব পবিত্রতা এবং উচ্চচিন্তার সব চেয়ে বেশী উজ্জ্বল এই কাব্যের "পত্র" শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা। এই কবিতাতেই কবি বিপদ দারিদ্র্য ও শোক যে

মানুষের চরিত্রবলকে বাড়াইয়া দেয় সেই উপলব্ধির কথা জোরের সহিত প্রথম বলিয়াছেন।

মানবের বল দেয় সহস্র বিপদ
প্রাণ দেয় সহস্র ভাবনা,
দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্প'দ,
শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা।

এই কবিতাতেই কবি সহস্র বচন হইতে একটি পরিপূর্ণ জীবনের কত বড় প্রভাব তাহা জানাইয়াছেন।—

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ
থেমে যাবে সহস্র বচন।

এই কবিতাতেই অহঙ্কার ছাড়িয়া হিংসাদ্বেষ ছাড়িয়া মানবের হৃদয়ের মাঝে এবং জগতের কাজে যাত্রা করার কথা কবি বলিয়াছেন। কবির মনুষ্যত্ব এবং ঋষিত্বের সাধনার প্রথম উদ্বোধন পাই এই কড়ি ও কোমল কাব্যেই। এই মহত্ব এবং চরিত্র সমুন্নতি এই নর-সেবার ভাব দুই একটি অসংলগ্ন পংক্তিকে অবলম্বন করিয়া ফুটে নাই, তাহা সমস্ত গ্রন্থের মেরুদণ্ডরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কাজেই যে পাঠক কবির যৌবন-স্বপ্নের মধ্যে তাঁর এক রূপের ক্ষুদ্র একটি অংশ দেখিয়াই বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন এবং সেটাকেই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিয়া তার বাহিরে অথচ তারি গায় গায় সংলগ্ন অপর রূপটা দেখিতে পান না তাঁকে অর্ব্বাচীন এবং স্থূলদর্শী ছাড়া আর কি বলিব।

এই কড়ি ও কোমল কাব্যেই কবির কাব্য জীবনের আদি যুগের পরিসমাপ্তি। এই কাব্যের মধ্যেই দেখিতে পাই একদিকে কবির সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন, অপর দিকে তাঁর সত্যদর্শন এবং মঙ্গলচেষ্টা তাঁর কাব্য জীবনের নীহারিকা ভেদ করিয়া প্রথম স্ফুট মহিমায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ধূম জ্যোতি বাষ্প মরুতের কায়াহীন অস্পষ্টতার ভিতর হইতে কবির কাব্যে ও জীবনে শ্যামল ফসলের সম্ভাবনা বহন করিয়া সজল বাদল ধারায় কবি-চিত্তে নামিয়া আসিয়াছে। কবির কাব্য-জীবনের এই আদিযুগের শেষের দিকে আসিয়া আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি এই কবি শুধু ফল ফুটাইয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, ফলও ধরাইবেন।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

অন্বেষণ

(Browning-এর Love in a Life হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্‌-এ (ক্যাল ও ক্যাণ্টাব)

নাই, তুমি নাই।
এ ঘর ও ঘর শুধু আতি পাতি খুঁজিয়া বেড়াই।
এই গৃহে আছ তুমি জানে এ হৃদয়,
তাই তার অটুট প্রত্যয়
—পাবে তব দেখা।
ওই যে ঝলকি ওঠে অঞ্চলের সূক্ষ্ম প্রান্তরেখা
আরসির পরে,
কর যবে পলায়ন ক্ষিপ্রপদভরে।
দ্রুত সঞ্চালনে তব বসন ভূষণ
তোলে মৃদু গুঞ্জরণ
ঠুং ঠাং খুস্ খাস চুড়ির সাড়ীর
কেশগন্ধ আনে বহি সন্ধানী সমীর
ছিল যত ঝরা ফুল পুষ্পপাত্র ভরি'
তোমার হাওয়ায় তারা পুনরায় উঠিল মুঞ্জরি'।

বেলা যায় বৃথা অন্বেষণে,
দ্বার হ'তে দ্বারান্তরে ফিরি শুধু চঞ্চল চরণে।
সুবিপুল এই গৃহে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াই
হই ব্যর্থ, তবু ভাবি এইবার যদি দেখা পাই!
যেমনি ঢুকিনু কোনো ঘরে,
মনে হ'ল অমনি যে পলালে সত্বরে।
ধীরে ধীরে গোধুলি ঘনায়,
কত ঘর আছে বাকী! শূন্য মনে ফিরি পায় পায়।

অপরাজিত

(Browning-এর Life in a Love হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ (ক্যাল ও ক্যাণ্টাব)

আমারে এড়াবে তুমি ভেবেছ কি মনে ?
—কভু নয়, জেনো এ জীবনে।
যত দিন ভবে
আমি র'র আমি, আর তুমি তুমি র'বে,
—আমার অনুসরণ, পলায়ন তোমার সতত,
তুমি বিমুখিনী নারী, প্রেমাকুল আমি অবিরত।
জাগে যে সংশয়,
এ জীবন বুঝি মোর পরমাদময়।
পরিপন্থী নিয়তি নিয়ত
প্রাণপণ প্রযতন ব্যর্থতায় নিত্য পরিণত !
কী বা আসে যায়,
লভি যদি চিরব্যর্থতায় ?

অক্লান্ত প্রয়াস আর দুর্নিবার অশ্রু সম্বরণ,
হাস্যমুখে তুচ্ছ করি চরণ স্খলন
দৃঢ়পদে অগ্রসর হওয়া লক্ষ্য পানে,
চিরন্তন সন্ধান-প্রয়াণে
—এই বুঝি জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা ?
তবু তুমি একবার হে আমার দূর পরাহতা
দেখো চেয়ে, কে চলেছে অন্ধকারে পথধূলি 'পরে
শুধু তোমা তরে !
পুরাতন আশা মোর লক্ষ্যহারা শর,
যেমনি লুটায় ধূলি'পর
আরবার ছুঁড়ি তারে সেই লক্ষ্যপানে,
নিরাশা কাহারে বলে প্রাণ নাহি জানে।
তোমা হতে দূরে আছি পড়ি',
ভেঙে চুরে আপনারে গড়ি।

ইবসেন সাহিত্যের এক অধ্যায়

শ্রীসত্যভূষণ সেন

বর্ত্তমানকালে অন্ততঃ আমাদের দেশে সাহিত্যে যে যুগ চলিতেছে—তাহা বাল্মীকি বেদব্যাসের যুগ নয়, কালিদাস ভবভূতির যুগ নয়, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির যুগও নয়, এমন কি সেক্ষপীয়র গেটের যুগও নয়; এ যুগের উপরে বিশেষভাবে প্রভাব বিকীরণ করিতেছে—দুই মহাদেশের অশেষ ক্ষমতা-সম্পন্ন দুইজন মহারথীর অসামান্য প্রতিভা,—একজন বাংলা-দেশের সুসন্তান, ভারতবর্ষের গৌরব, এসিয়ার কবি-সম্রাট—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; অপরজন নরওয়ের দীপ্ত ভাস্কর, উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্যের মুকুটমণিস্বরূপ স্বণামধন্য নাট্যকার ইবসেন। রবীন্দ্রনাথ এখনও পূর্ণ-জ্যোতিতে বিদ্যমান; আর ইবসেনের প্রতিভা বর্ত্তমান শতাব্দীতে পদার্পণ করিয়াই অস্তমিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গ ইবসেন্‌কে লইয়া। শুধু আমাদের দেশে নয়, ইউরোপীয় সাহিত্যেও ইবসেনের প্রভাব বহুদূরবিস্তৃত। ইউরোপের ভীমপ্রভঞ্জন সদৃশ ফরাসীবিপ্লবের ফলে জনগণের চিন্তাধারাতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়, সাহিত্যেও ধীরে ধীরে তাহার প্রভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল কিন্তু সেই আদর্শই পূর্ণ-প্রকট হইয়া উঠিল ইবসেনে আসিয়া। ইবসেনের প্রতিভার সংঘাতে যেন সেই আদর্শই একটা বিপ্লবাকার ধারণ করিয়া সমষ্টির বিরুদ্ধে ব্যষ্টিকে জনগণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে অসামান্য প্রতিষ্ঠা দান করিল।

বর্ত্তমানে সাহিত্য অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে কিন্তু সাধারণতঃ সাহিত্য বলিতে বুঝায় রসসাহিত্য, যথা কাব্য নাটক গল্প উপন্যাস প্রভৃতি। আমরা এস্থলে ঐরূপ সাধারণ সাহিত্য লইয়াই আলোচনা করিতেছি। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই সাহিত্যের প্রধান ভিত্তি মানুষের জীবন, কারণ সাহিত্যরচনার একদিকে আছে আনন্দদান করিবার আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে আছে সাহিত্যরসাস্বাদে আনন্দলাভ করিবার আগ্রহ; এবং মানুষের জীবন-কাহিনী ছাড়া আর কোনও বিষয় অত সহজে মানুষের সহানুভূতি উদ্রেক করিয়া তাহাকে আনন্দদান করিতে পারে না। মানবজীবনের কতটা সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে এবং কি ভাবে তাহা সাহিত্যের উপাদান যোগাইতে পারে তাহা নির্ভর করে লোকের রুচি প্রবৃত্তি এবং আদর্শের উপরে। প্রাথমিক যুগে যখন কেবলমাত্র গল্পের জন্যই গল্পের অবতারণা করা হইত, তখন দেবদেবী যক্ষরক্ষ অসুর প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ইতর প্রাণী এমন কি বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত সকলই মানুষের সহিত সমপর্য্যায়ে সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইত। সাহিত্যরচয়িতারা যেমন ইহাতে আপত্তির কোন কারণ দেখিতেন না—শ্রোতা বা পাঠকেরাও ইহা নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতেন। অবশ্য এ সকল স্থলেই ইতর প্রাণীতে মনুষ্যোচিত বৃত্তি আরোপ করিয়া তাহাদিগকে মানুষের সহিত সমদুঃখভাগী করিয়া কল্পনা করা হইত এবং দেবদেবী অসুর প্রভৃতিকে মানবাকারে চিত্রিত করিয়াই আসরে নামান হইত। কিন্তু যখন বিচার বিবেচনার প্রশ্ন উঠিল যে ইতর প্রাণীরা মানুষের সহিত মিশিতে পারে কি না এবং দেবদেবীগণ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসেন কি না, তখন হইতেই সাহিত্য হইতে ইতর প্রাণীও বাদ পড়িল এবং দেবতারাও নির্ব্বাসিত হইলেন। তখন হইতেই প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য হইল মানুষের সাহিত্য—অর্থাৎ মানবজীবনের সাহিত্য। এই সাহিত্যে প্রথমতঃ স্থান পাইল মানবজীবনের সাধারণ রুচি প্রবৃত্তি এবং সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা; পরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল মানুষের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার আভাষ। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যখন আরও বাড়িয়া গেল তখন একমাত্র তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আর তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারিলনা। তখন সাহিত্যে চিত্রিত হইতে লাগিল মানবজীবন সম্পর্কেই এমন সব বিষয় বা ঘটনা যাহা সচরাচর

ঘটেনা অথচ একেবারে সম্ভাব্যতার সীমার বাহিরেও না। তারপরে ক্রমে মানুষের জীবন হইয়া উঠিল আরও জটিলতর, জগতের নানা প্রকার বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইল মানুষের জীবনে এবং জগতে, ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা হইল নানা প্রকার মতবাদের, ক্রমে এই সকল মতবাদের সংঘাত আসিয়া পৌছিল মানুষের জীবনে। ইহার ফলে নানাপ্রকার সমস্যার পর সমস্যার উদ্ভব হইয়া মানুষের জীবন হইয়া পড়িয়াছে—অতি ভয়াবহরূপে সমস্যাসঙ্কুল। ইহার ফলে সাহিত্যে আবার একটা নূতন ধারার প্রবর্ত্তন হইল। এখন আর কল্পনাকে দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত করিয়া সাহিত্যে রসসৃষ্টি করিবার উৎসাহ রহিল না। তাহার স্থান অধিকার করিল মানুষের অতি সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কিত করিয়া সাহিত্যে মানবজীবনের নানা প্রকার সমস্যার অবতারণা এবং সমস্যা সমাধান বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান। এখন মানুষের জীবনের ন্যায় সাহিত্যেও মানবজীবনের বিচিত্র প্রকারের সমস্যাই হইতেছে মহাসমস্যা এবং বর্ত্তমান সাহিত্যের অধিকাংশই হইতেছে সমস্যামূলক সাহিত্য। ইবসেন এই সমস্যামূলক সাহিত্যের একজন অতিপ্রধান হয়তো বা সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত ও প্রবর্ত্তক।

মানুষের জীবন যেমন জটিল হইয়া উঠিয়াছে মানবজীবনের সমস্যার বিচিত্রতারও তেমনই অন্ত নাই। যেমন ব্যক্তি ও সমাজগত সমস্যা, পুরুষনারী সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক, ও নৈতিক সমস্যা প্রভৃতি। জীবনের এই সকল প্রকার সমস্যাই বর্ত্তমান সাহিত্যের উপাদান যোগাইতেছে, এমনকি বৈজ্ঞানিক সমস্যা লইয়াও গল্প উপন্যাস রচিত না হইয়াছে এমন নয়।

এই সকল প্রকার সমস্যার মধ্যে নারীজীবনের সমস্যা একটা মস্ত বড় সমস্যা। এই সমস্যার আলোড়নে সমস্ত পৃথিবী আন্দোলিত। আমেরিকা ও ইউরোপে নারীর অনেক বিষয়ে স্বাধিকার লাভ কতকটা ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাও বেশীদিনের কথা নয়। আমাদের দেশের ন্যায় ইউরোপেও নারীজীবন নানাপ্রকার সমাজিক শৃঙ্খলে কবলিত এবং প্রথা দ্বারা পীড়িত ছিল। Tennyson তাহার The Princess কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে কতশত রমণী নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাইয়া জীবনে ধন্য হইতে পারিতেন কিন্তু এই সকল প্রথার উৎপীড়নে তাহা সম্ভব হয় নাই—There are thousands now but convention beats them down। টেনিসন তাঁহার এই Princess কাব্যে নারী-জীবন সমস্যার একটি চিত্র দেখাইয়াছেন। একদল রমণী শুধু পুরুষদের সহিত অসহ-যোগিতা করিয়া শুধু নারীর জন্য একটী শিক্ষামন্দির ও কর্ম্ম-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু তাহাদের এই একদেশদর্শিতার জন্য অর্থাৎ পুরুষদের সহিত অসহযোগিতার তীব্রতার ফলে তাহাদের সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা পণ্ড হইল। এই কাব্যের শেষ কথা হইল—The woman's cause is man's; they rise or sink together, dwarfed or godlike, bond or free; ইহা উনবিংশ শতাব্দীর কথা। উনবিংশ শতাব্দীতে যাহা ছিল আদর্শ, বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া অনেক দেশে তাহার অনেকটা সফল হইয়াছে বটে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নারী-প্রগতি এই পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিয়া যায় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বর্ত্তমান যুগের একটা বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠায়। বর্ত্তমানে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ ধীরে ধীরে নারী-জীবনেও প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এ পর্য্যন্ত নারী সমস্যা ছিল—সমাজে এবং পারিবারিক জীবনে নারীর স্থান কোথায় এবং সকলের সহিত সকল বিষয়ে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তাহার স্বাধিকার কতটুকু সম্প্রসারিত হইতে পারে ইহাই লইয়া। বর্ত্তমানে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে যে পরিবার বা সমাজে নিরপেক্ষভাবে নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার কোন ক্ষেত্র আছে কি না, এরূপ ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার মূল্যই বা কতটুকু এবং এবিষয়ে তাহার স্বাধিকারই বা কতটা পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইতে পারে। নারী-জীবনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই আদর্শ রচনাবিষয়ে ইবসেনের সমকক্ষ কেহ নাই। বস্তুতঃ ইবসেন প্রবর্ত্তিত সমাজ নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিশেষতঃ নারীজীবনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠার এই আদর্শই ইবসেনিজম্ নামে পরিচিত।

ইবসেনের কয়েকখানা নাটকেই নানাভাবে নারী জীবন সমস্যার অবতারণা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই সমস্যার একটা দিক্ লইয়া আলোচনা করিব—যে দিকটা প্রকটিত হইয়াছে তাঁহার দুইখানা অতি প্রসিদ্ধ নাটকে—Dolls

House এবং Ghostsএ। ইবসেনের এই দুইখানা নাটক সর্ব্বজন পরিচিত; সর্ব্বসাধারণ্যের নিকট ইবসেনের পরিচয়ের হেতুও প্রধানতঃ এই দুইখানা নাটকই। ইবসেন-সাহিত্যের সহিত যাহাদের সামান্য মাত্রও পরিচয় আছে তাহারা অন্ততঃ এই দুইখানা নাটকের সহিত পরিচিত ইহা একরূপ নিশ্চিত করিয়াই বলা যাইতে পারে। আবার ইবসেনের সহিত নূতন পরিচয় সাধন করিতে হইলেও এক হিসাবে এই দুইখানা নাটক লইয়া আরম্ভ করাই ভাল।

আলোচ্য বিষয়ে সমস্যাটা নারীসমস্যা হইলেও যৌন-সমস্যা নয়; নারী-জীবন সমস্যা। এখানে বিষয়টা প্রণয় লইয়া নয়, পরিণয়ও নয়, পরিণীত জীবনের কথা। নারী এখানে প্রণয়ীর প্রণয়িনী নয়; সে এখানে পুরুষের সহধর্ম্মিণী, পতির পত্নী, সন্তানের জননী এবং গৃহের গৃহিণী।

প্রথমে ডলস্ হাউস্। এই নাটকের নায়িকা নোরা। নোরার সহিত আমাদের যখন প্রথম পরিচয় তখন সে তিনটী সন্তানের জননী। তাহার জীবন পতিপ্রেমের আলোকে উজ্জ্বল, সন্তানবৎসল্যে হৃদয়মন পরিপূর্ণ। একমাত্র কষ্ট—অর্থকষ্ট, তাহারও অবসান হইয়া আসিয়াছে—অদূর ভবিষ্যতে এদিকেও সুখ সৌভাগ্যের আলোক দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই সুখস্বপ্নময় দৃশ্যের পশ্চাতে ছিল এমন একটি ঘটনা যাহার উপরে সমস্ত নাটক নির্ভর করিতেছে। কয়েক বৎসর আগেকার কথা; তখন নোরার প্রথম সন্তানের জন্ম আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। স্বামী হেলমার ব্যারিষ্টার কিন্তু কাজ করিতেন একটা ব্যাঙ্কে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে হেল-মারের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। ডাক্তার তাহার অজ্ঞাতে নোরাকে জানাইয়া গেলেন যে হেলমারের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন; একমাত্র উপায় স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া কিছুকালের জন্য ইটালী দেশে বসবাস। তাহাদের আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়—এমন অবস্থায় হেলমার তাহার নিজের জন্য কোন ব্যয়সঙ্কুল ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইবেন না ইহা নিশ্চিত জানিয়া নোরা আবদার ধরিল যে একবার ইটালী দেশটা দেখিবার জন্য তাহার নিজেরই বড় সাধ হইয়াছে। তাহার অন্তঃস্বত্বা অবস্থার এই সাধ পূর্ণ করিবার জন্য স্বামীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ হেলমার অর্থাভাবের জন্য তাঁহার অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। নোরা ধার করিবার প্রস্তাব করিলে এমন যে পত্নীগতপ্রাণ হেলমার তিনিও বিরক্ত হইলেন। কিন্তু নোরা জানিত যে স্বামীকে বাঁচাইতে হইলে ইটালীতে যাওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। তখন নিরুপায় হইয়া নোরা নিজ দায়িত্বে সাড়ে তিন হাজার টাকা ধার করিল; স্বামীকে জানাইল যে তাহার পিতা তাহাকে স্বচ্ছন্দব্যবহারের জন্য এই টাকাটা দান করিয়াছেন। নোরা টাকা ধার পাইল এই সর্ত্তে যে দলিলের উপরে নোরার পিতার দস্তখতও লইয়া দিতে হইবে। নোরার পিতা তখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত; অগত্যা নোরা নিজেই দলিলের উপরে পিতার নাম দস্তখত করিয়া কাজ সংক্ষেপ করিয়া ফেলিল। মহাজন নোরার চতুরতা বুঝিতে পারিয়াও কোন প্রকার উচ্চ-বাচ্য করিল না। তাহার বিশ্বাস ছিল যে জাল দলিলের টাকা শোধ করিবার জন্য অধমর্ণের চেষ্টা থাকিবে সাধারণ হিসাবের চেয়ে বেশী।

ইটালী ভ্রমণের ফলে হেলমারের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া আসিল। নোরা স্বামীর অজ্ঞাতে রাত্রি জাগরণ করিয়া অপরের লেখা নকল করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। সংসার খরচ হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের সংসার খরচের বরাদ্দ বেশী ছিল না; তাহার উপর স্বামীর কোন প্রকার অস্বচ্ছন্দতা সহ্য করিবার অভ্যাস ছিল না। স্বামী এবং সন্তানদের কোন প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত করিতে নোরার নিজের প্রাণও কাঁদিয়া উঠিত। কাজেই সংসার খরচ হইতে সামান্যই বাঁচিত। তথাপি তাহাকে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া ধার শোধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এইরূপ কঠোর সংযম ও চেষ্টার ফলে ধার যখন প্রায় শোধ হইয়া আসিতেছিল—সামান্য কিছু বাকী—এমন সময় নাটকের আরম্ভ।

এই সময়ে হেলমার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের পদে উন্নীত হইলেন। নোরার মহাজন ক্র্যাষ্টাও ছিল এই ব্যাঙ্কেরই একজন কর্ম্মচারী। হেলমারের নূতন বন্দোবস্তে ক্র্যাষ্টাকে চাকুরী হইতে ছাড়াইয়া দিয়া অপর লোক রাখিবার প্রস্তাব হইল। এরূপ অবস্থায় ক্র্যাষ্টা আসিয়া নোরাকে ধরিয়া পড়িল হেল-

মারের নিকট তাহার নিমিত্ত সুপারিস করিবার জন্য। নোরা সহজে রাজি না হওয়াতে ক্র্যাষ্টা সেই জাল দলিলের উল্লেখ করিল। নোরা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে ওরূপ সঙ্কটময় অবস্থায় পড়িয়া পিতার নাম নিজে দস্তখত করিয়া দেওয়াতে এমন কিছু অন্যায় হইতে পারে—দেশের আইন কি এটুকুও বুঝিবেনা যে সে সময়ে এই টাকাটা না পাইলে তাহার স্বামীর প্রাণ বাঁচান অসম্ভব হইত? আর টাকাটা আত্মসাৎ করাও তো আর তার মতলব নয়—সে তো টাকা যথারীতি শোধ করিয়াই আসিতেছে। এদিকে হেলমার নোরাকে বুঝাইলেন যে ক্র্যাষ্টাকে ব্যাঙ্কের কাজে রাখা অসম্ভব কারণ তাহার নামে আছে একটা দস্তখত জাল করিবার অপরাধ। হেলমার বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে এসব অপরাধের গুরুত্ব কত, কারণ এসব পাপ প্রায়ই পিতামাতা হইতে সন্তানদের উপর সংক্রামিত হয়। হেলমারের অভিমত শুনিয়া নোরা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এখন সে বুঝিতে পারিল যে পিতার নাম. দস্তখত করিয়া দেওয়াতে তাহার কত বড় গুরুতর অপরাধ হইয়াছে। তার উপরে আরও সর্ব্বনাশের কথা এই যে, তাহার এই অপরাধ হইতে পাপপ্রবণতা জন্মিয়া তাহার ছেলেমেয়েদের উপরে পর্য্যন্ত গিয়া তাহা সংক্রামক হইয়া পড়িবার খুবই সম্ভাবনা; অর্থাৎ যে ছেলেমেয়েদের জন্য সে তাহার সমস্ত কায়মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার জীবনসর্ব্বস্ব সেই সব ছেলেমেয়েদের পক্ষে তাহার নিজের সান্নিধ্যও এখন আর নিরাপদ নয়। কারণ সে পাপী এবং এই পাপ সংক্রামিত হইতে পারে সন্তানের উপরে পর্য্যন্ত গিয়া। এইখানে নোরা একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল; তাহার এমন আনন্দকোলাহলময় গৃহে এমন সুখস্বপ্নময় সংসারে এইখানেই প্রথম কীট প্রবেশ করিল।

যাহাই হউক অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইল তাহাতে সেই দলিলের ধারের টাকাটা সম্পূর্ণরূপে শোধ করিয়া দেওয়ার আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িল। নোরার ধার শোধ করিবার মত অর্থ সংগ্রহ ছিল না অথচ স্বামীর নূতন পদোন্নতির ফলে শীঘ্রই স্বচ্ছন্দভাবে অর্থসমাগম হইবে। নোরা স্থির করিল যে এই সময়ের জন্য তাহাদের বন্ধু ডাক্তার ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার করিয়া এই টাকাটা সংগ্রহ করিবে। স্বামীকে জানাইবার অবশ্য কোন প্রয়োজন হইবে না। এই ডাক্তার ছিলেন হেলমারের এবং সেই সম্পর্কে নোরারও একজন বিশেষ বন্ধু। এমন দিন যাইতনা যে ডাক্তার অন্ততঃ একবার হেলমারের বাড়ীতে না আসিতেন। নোরার সহিতও ডাক্তারের যথেষ্ট ঘনিষ্টতা ছিল; ইহারই উপর নির্ভর করিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা ধার করিবার অভিপ্রায়ে নোরা ডাক্তারের সহিত অতি অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিতেছিল মাত্র। ডাক্তার এমন সুযোগ আশাতীত গণ্য করিয়া নোরার নিকট প্রেম নিবেদন করিয়া বসিল। নোরা একেবারে অপ্রস্তুত। সে জানে ডাক্তার তাহার স্বামীর বন্ধু এবং এই পরিবারের একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ, সেই হিসাবেই সে ইহার সহিত অকপটভাবে মিশিয়াছে। আজ তাহার এমন বন্ধুত্বের প্রতিদান আসিল এইভাবে। নোরার জীবনযাত্রার পথে এইখানেই ঘটিল তাহার দ্বিতীয়বারের পরাজয়।

নোরার একান্ত চেষ্টা ছিল যাহাতে সেই ধারের কথা এবং দলিলে দস্তখত জাল করিবার কথা হেলমার কিছুতেই না জানিতে পারেন। কিন্তু তাহার সকল কৌশল এবং সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া যেন নিয়তির বিধানের মতই সেই সব কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল, হেলমারের নিকট লিখিত ক্র্যাষ্টার একখানা চিঠিতে। নোরা ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী জানিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। তাহার ধারণা ছিল দলিলে দস্তখত জালের কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তাহার এমন পত্নীগতপ্রাণ স্বামী নিশ্চয়ই সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া পত্নীকে জগতের সমক্ষে মুক্ত রাখিবেন। কিন্তু ইহাতে হেলমারের নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। নোরা দেখিল যে স্বামীকে এইরূপ অবস্থা-সঙ্কট হইতে মুক্তি দিবার একমাত্র উপায় তাহার নিজের পক্ষে এই জগত হইতে বিদায় গ্রহণ করা। কিন্তু নোরার সমস্ত ধারণা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল তাহার স্বামীর আচরণে। হেলমার যখন চিঠি পড়িয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাহার পত্নী দস্তখত জাল করার অপরাধে অপরাধী তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। এই ক্রোধ প্রকাশ পাইল পত্নীর প্রতি তাঁহার তিরস্কার এবং ধিক্কারে। সেই ক্রোধবহ্নির কি জ্বালা—যেন আগ্নেয়গিরি হইতে বহ্নি উদ্গীরণ হইতে লাগিল। নোরা এই ব্যাপারে একেবারে বিহ্বল হইয়া

পড়িল। নোরা তাহার স্বামী এবং সন্তানদের প্রাণ দিয়া ভালবাসিত এবং জানিত যে স্বামীও তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, কিন্তু আজ কোথায় গেল তাহাদের সেই প্রেমের সম্পর্ক? যে প্রেম এই আটবৎসরে গড়িয়া উঠিয়াছে—এবং প্রতিদিন পুষ্টিলাভ করিয়াছে—আজ একদিনে তাহা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে বসিয়াছে। অথচ তাহার অপরাধ এইমাত্র যে পিতার দস্তখত প্রয়োজন হওয়াতে তাহাকে নিজেই পিতার দস্তখত লিখিয়া দিতে হইয়াছিল কারণ তাহার পিতা তখন মৃত্যু-শয্যায়—আর এদিকে এমন সঙ্কটময় অবস্থা যে এইরূপে অর্থ সংগ্রহ না হইলে তাহার পতির প্রাণ রক্ষা হয় না। ইহাতে কাহারও কিছুমাত্র ক্ষতি ঘটিল না, এই ঋণশোধ করিবার দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণ তাহার নিজের উপরে, সে নিজে কত শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া কতভাবে তাহার স্বামী ও সন্তানদের পর্য্যন্ত বঞ্চিত করিয়া এই ঋণশোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে—তাহা কেহ বুঝিল না, কিন্তু ব্যবহারিক হিসাবে তাহার যে একটু ত্রুটি ঘটিয়াছে তাহাই সংসার ও সমাজের চক্ষে মস্ত বড় অপরাধ হইয়া দেখা দিল। নোরা যে স্বামীকেও না জানাইয়া একমাত্র নিজের স্কন্ধে এই ঋণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিল তাহাও তাহার স্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যই। আর আজ তাহার সেই স্বামীও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। এইখানে আর একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে নোরার অপরাধ সংসার ও সমাজের চক্ষে অপরাধ বলিয়াই তাহার স্বামীর নিকটও তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। যখন পরমুহূর্ত্তে ক্রগষ্টার নিকট হইতে পত্র আসিল এবং সেই দলিলখানা তাহাদের হাতে আসাতে নোরার অপরাধ সর্ব্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবার কোন সম্ভাবনা রহিল না তখন হেলমারও নোরাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু নোরা স্বামীর এই ক্ষমা গ্রহণ করিতে পারিল না। ততক্ষণে তাহার ভ্রান্তি ঘুচিয়া গিয়াছে। যে স্বামী তাহার এমন প্রেমের মূল্য বুঝিল না, কোথায় তাহার সহিত প্রেমের সম্পর্ক? তাহার মনে হইল যেন সে এতকাল একজন অপরিচিত লোকের সহিত ঘর করিয়া আসিয়াছে। ইহার সহিত প্রাণের পরিচয় হইবার কোন সুযোগ হয় নাই হয়তো হইবেও না। সে বৃথাই ইহার জন্য সন্তান ধারণ করিয়াছে। এই সন্তান বাৎসল্য এবং সন্তানদের লইয়া যে এমন আনন্দময় গৃহ এ সবই যেন মায়া মরীচিকা। তাহাদের এই প্রেমপ্রীতিবাৎসল্যের সম্পর্ক যেন অভিনয় মাত্র। সে তাহার স্বামীর নিকট খেলার পুতুল। তাহার সমস্ত প্রাণের মাধুরী দিয়া রচিত এমন গৃহও যেন পুতুলের ঘর মাত্র। নোরা বুলিতে পারিল যে এতদিন পর্য্যন্ত সে সংসারকে চিনিতে পারে নাই; এখন বুঝিতে পারিল যে সংসারের এই গতানুগতিকতার মধ্যে কোন কিছুরই প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত হইবার আশা নাই। অগত্যা সে সংকল্প করিল যে স্বামী ও এমনকি শিশু সন্তানদের সহিতও সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাহাকে সংসারের পথে বাহির হইতে হইবে—সংসারকে জানিবার জন্য এবং নিজের মূল্য বুঝিবার জন্যও। হেলমারের কোন প্রকার সান্ত্বনা-বাক্যও তাহাকে আশ্বস্ত করিতে পারিল না। নোরা সেই রাত্রিতেই স্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। এবং শিশু সন্তানদিগকে পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য অপেক্ষা মাত্র না করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এই খানেই ডলস্ হাউস্ নাটকের শেষ।

তারপরে গোষ্টস্। এই নাটকখানাও নারীজীবনের কথা লইয়া রচিত। পারিবারিক জীবনে, সংসারে এবং সমাজে নারীর স্থান কোথায় এই সমস্যাই এক হিসাবে এই নাটকেরও প্রধান ভিত্তি। অলভিং ছিলেন একজন অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি। ভোগ বিলাসে তাহার রুচি শক্তি সামর্থ্যও ছিল প্রচুর। গৃহে এবং সমাজে এসব বিষয়ে প্রশ্রয় পাইবার কথা নয় বরং নানা প্রকারে বাধাই জন্মিতে লাগিল। সুতরাং তাঁহার ভোগাকাঙ্খার পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে গোপনতার আশ্রয় লইতে হইল। ফলে তাহার নিজ গৃহেরই একটি দাসীর সহিত গুপ্তপ্রণয় ঘটিল। গুপ্তপ্রণয় হইলেও পত্নীর নিকট ইহা অজ্ঞাত রহিল না। অলভিং পত্নী ছিলেন সতী সাধ্বী স্ত্রীলোক। পতির এই অনাচারে তাহার সমস্ত জীবন ব্যর্থ বোধ হইল। ক্ষণকালের জন্য হইলেও তিনি পতিরেকো গুরু স্ত্রীণাং এই সনাতন আদর্শ হইতে বিচলিত হইলেন। এবং গৃহত্যাগ করিয়া পাদরী ম্যানডার্সের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। এই ম্যানডার্সের সহিত পূর্ব্বেই

তাঁহার পরিচয় ছিল। সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়া ইহাদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধেরও সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই রমণী পারিবারিক কারণ বশতঃ পিতৃপরিজনবর্গের কল্যাণার্থে ম্যাণ্ডারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া অলভিং-এর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

অলভিং-পত্নী পরিণীত জীবনে এরূপ ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া ম্যানডারসের্র শরণাপন্ন হইলে ম্যাণ্ডারস্ তাহাকে প্রশ্রয় দিলেন না; তিনি দেখাইয়া দিলেন সেই সনাতন পন্থা "পতিরেকো গুরু স্ত্রীণাং"। অলভিং-পত্নী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং স্বামীর ও গৃহের সৌষ্টব সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি স্বামীর মঙ্গলকামনা করিয়া তাহার কুৎসিৎ রুচি এবং অনাচার সহ্য করিয়াও তাহাকে গৃহে আবদ্ধ রাখিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি স্বামী কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ দাসীটিকেও প্রতিপোষণ করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে উৎপন্ন স্বামীর সেই জারজ কন্যাটিকে নিজের গৃহেই দাসীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর কাজ হইল-যে তাহার নিজের এক মাত্র পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্যারিনগরীতে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন, কারণ তাঁহার নিজ গৃহের সংসর্গ এইরূপ বয়সের পুত্রের পক্ষে বিষবৎ হইবারই সম্ভাবনা যোল আনা।

অতঃপর অলভিং-এর মৃত্যু হইল। ইহাতে পত্নী একদিকে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ভবিষ্যতে জীবনের পথে—যেন সুখের রেখাও দেখিতে পাইলেন। কিন্তু এই সুখস্বপ্নের তিরোভাব ঘটিতেও বিলম্ব হইল না। স্বামীর মৃত্যুর পরেই অলভিং-পত্নী পুত্রকে দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। পুত্র গৃহে আসিল বটে কিন্তু মাতার আদর্শপথে চলিবার জন্য তাহার কোন উৎসাহ দেখা গেল না। অস্ওয়ালভ্ ছিল পিতারই উপযুক্ত সন্তান, তাহারই ন্যায় ভোগবিলাসপরায়ণ। সে প্রথমে বিরক্ত হইয়া উঠিল বৃষ্টির জন্য গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবার দরুণ। ক্রমে তাহার পানাসক্তিরও পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। একদিন দেখা গেল সে বাড়ীর একটী দাসীর সহিতই অন্তরঙ্গতার প্রয়াসী। এই দাসীর প্রকৃত পরিচয় একমাত্র অলভিং পত্নীর নিকটই জানা ছিল। অস্ওয়ালভ্ জানিত না কিন্তু এই দাসীটি ছিল তাহার পিতারই জারজ কন্যা। অস্ওয়ালভ্এর মাতা পুত্রের এই ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন, বটে কিন্তু বোধ হয় বাৎসল্যের দায়ে পড়িয়া পিতার অপরাধের ন্যায় পুত্রের অপরাধ তাঁহার নিকট একেবারে অমার্জ্জনীয় বোধ হইল না। তিনি অগত্যা সংকল্প করিলেন যে তিনি আর মিথ্যা আদর্শের মোহে পড়িয়া সন্তানের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিবেন না।

এদিকে যে অস্ওয়ালভ্ পিতার নিকট হইতেই তাহার ভোগাকাঙ্ক্ষাপ্রবৃত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিল এমন নয়। পিতার অর্জ্জিত দুএকটা কুৎসিৎ ব্যাধিও তাহার উপরে আসিয়া দেখা দিতে লাগিল। প্যারীর এক ডাক্তার তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে উন্মাদজনসুলভ একপ্রকার পক্ষাঘাত তাহাকে আক্রমণ করিবার খুবই সম্ভাবনা। অস্-ওয়ালভ সেই আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদা এক শিশি বিষ সঙ্গে করিয়া চলিত যেন আবশ্যক বোধ হইলে জীবনান্ত করিয়াও এই ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। মাতার নিকট ইহাও আগোচর রহিল না। মাতা পুত্রের জন্য কি না করিতে পারেন? তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যেন অস্ওয়াল্ড এই দুর্ভাবনা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। তিনি এমন ভাবে গৃহের ব্যবস্থা করিলেন যেন তাহার পুত্র নিজ গৃহে বসিয়াই প্যারীর সুখসম্পদের আস্বাদ লাভ করিতে পারে। পুত্রের পানাকাঙ্খা পরিতৃপ্তির জন্যও যথাযথ ব্যবস্থা হইল। তারপরে তিনি ইহাও স্থির করিলেন যে যদি অস্ওয়াল্ড এই মেয়েটিকে ভালবাসে তবে বৈমাত্রেয় ভগ্নী হইলেও তিনি ইহারই সহিত পুত্রের বিবাহ দেওয়াইবেন। কিন্তু দাসীকন্যাটী অস্ওয়াল্ডের শারীরিক ব্যাধির খবর জানিতে পারিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কারণ সেও পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছে প্রবৃত্তিপরায়ণতা, সুতরাং একজন রুগ্ন ব্যক্তির প্রতি চিরকাল অনুরক্ত থাকিয়া নিজ জীবনকে শৃঙ্খলিত করিতে তাহার আগ্রহ বা ঔৎসুক্য না হইবারই কথা।

তারপরে গৃহের নিঃসঙ্গতার মধ্যে মাতাপুত্রের জীবনযাত্রা চলিতে লাগিল। বাহিরে নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় বারি বর্ষণের ফলে সমস্ত জগৎ যেন তাহাদের নিকট হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। অস্ওয়াল্ডের নিকট যখন এরূপ জীবন অসহ্য বোধ হইয়া উঠিল তখন মাতা তাহাকে এই বলিয়া আশ্বাস

দিলেন যে যদি ব্যাধির আক্রমণ এমন অতর্কিতে আসিয়া পড়ে যে বিষপানের আর অবসর না ঘটে, তবে মাতা তাহার সমস্ত মাতৃভাব বিসর্জ্জন দিয়া স্বহস্তে পুত্রকে বিষদানে সহায়তা করিবেন।

একদিন দেখা গেল যে ব্যাধির আক্রমণ অস্ওয়াল্ডের উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তখন পুত্রকে এই ব্যাধি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে একেবারে পৃথিবী হইতেই বিদায় করিবার সময় হইল—যেমন একদিন গৃহের পাপস্পর্শ হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য তাহাকে একেবারে দেশ ছাড়িয়া বিদেশে পাঠানো হইয়াছিল।

প্রথমে Doll's House। এই নাটকের মূলসূত্র নারী-জীবনসমস্যা। নায়ক হেলমার এই নাটকের প্রধান চরিত্র নয়—এই নাটকের প্রধান চরিত্র নোরা—নাটকের নায়িকা। সংসারে এবং সমাজে নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব কতটা স্বীকৃত হইতে পারে এবং কতটা মূল্য পাইতে পারে এই সমস্যাই নোরার জীবনকে উপলক্ষ্য করিয়া নাটকে বিকাশ লাভ করিয়াছে।

নোরা যেখানে গৃহের গৃহিণী সেখানে স্বামী ও পুত্রকন্যাদের লইয়া তাহার সুখের সংসার কিন্তু পার্থিব জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখের সংযোগ অতি বিরল। নোরার জীবনে প্রথম সমস্যা দেখা দিল যখন স্বামী পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং তাহার চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন হইল। সাধারণতঃ স্বামীর উপরেই সংসার-ব্যবস্থার ভার থাকে কাজেই অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব তাহারই। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। স্বামী নিজে পীড়িত সুতরাং অর্থসংগ্রহ করিয়া সমস্ত ব্যবস্থার ভার পড়িয়াছে নোরার উপরে। নোরা যদি সমস্ত দায়িত্ব সামাল দিতে না পারিত তবে জীবনের প্রথম সমস্যা সমাগমেই tragedy বা দুঃখ দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইত। কিন্তু নোরা এক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিল। সে প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করিল নিজ দায়িত্বে—এবং স্বামীকে না জানাইয়া এবং এইবার শোধ করিবার ব্যবস্থাও করিল নিজে একমাত্র নিজের শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া। যখন অর্থের প্রয়োজন সিদ্ধ হইল স্বামী নিরাময় হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখনও নোরা তাহার নিজের আরব্ধ কর্ম্মের দায়িত্ব নিজেই বহন করিয়া চলিল। সাধারণতঃ নারী পতির প্রতি চিরনির্ভর-শীলা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজনের দায় উদ্ধার হইয়া গেলে স্বামীর নিকট অকপটে সকল কথা নিবেদন করিয়া স্বামীর উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু নোরা এস্থলে স্বাধীন ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে নিজ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিল। সে ধারের কথা ঘুর্ণাক্ষরেও স্বামীকে না জানাইয়া নিজে শত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া ধার শোধ করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। টেনিসন তাঁহার Princess কাব্যে যে আদর্শের আভাস দিয়াছেন এ পর্য্যন্ত সকল দেশেই তাহাই ছিল সনাতন রীতি এবং আদর্শ—

> Man for the field, womau for the hearths.
> Man for the Sword for the need be she,
> Man with the head woman with the heart.
> Man to command woman to obey.

ইবসেনের নোরা চরিত্রে টেনিসনের এই আদর্শ অতিক্রান্ত হইয়াছে। অবশ্য টেনিসনের পূর্ব্বেও ইহার নজির আছে সেক্ষপীয়রের লেডী ম্যাকবেথ চরিত্রে কিন্তু সেখানে কবি নিজেই বলিয়াছেন যে লেডী ম্যাক্‌বেথ নারীজনসুলভ বৈশিষ্ট্য হইতে স্খলিত হইয়া (unsexed হইয়া) তবে না ওরূপ অস্বাভাবিক কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নোরা রমণীজনসুলভ বৈশিষ্ট্য হইতে কিছুমাত্র স্খলিত হয় নাই! তাহার পতিপ্রেম ছিল অটুট্। তাহার সন্তান-বাৎসল্যের যে চিত্র দুই একটী মাত্র রেখাপাতে এমন মনোহরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে—বাৎসল্যের এমন সুন্দর চিত্র শুধু ইউরোপে কেন বোধ হয় ভারতীয় সাহিত্যেও খুব সুলভ নয়। মনে হয় ইউরোপে ইহার একমাত্র তুলনাস্থল র‍্যাফেলের অঙ্কিত মাতৃমূর্ত্তির চিত্র। পতিপ্রেম এবং সন্তান বাৎসল্য নোরার চরিত্রে অতি সুন্দরভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া সে যে কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল তাহা লেডী ম্যাক্‌বেথের মত তাহার নিজের বা স্বামীর কোন প্রকার উচ্চাকাঙ্খার ইন্ধন যোগাইবার জন্য নয়। সংসারের আবাল্য এবং চিন্তার ভাব হইতে স্বামীকে মুক্ত রাখিবার জন্য।

অবশ্য নিজের আত্মপ্রসাদ লাভের আকাঙ্খাও ইহার সহিত মিশ্রিত ছিল যে সে নিজে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া একমাত্র নিজের শক্তিসামর্থ্যের দ্বারাই স্বামীকে ওরূপ সঙ্কটময় অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছে। আর নোরা যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিল তাহা লেডী ম্যাক্‌বেথের মত অমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়। কিন্তু নোরার ক্ষেত্রে সমস্যাটা একটু জটিল হইয়া পড়িয়াছিল—সেটা তাহার পিতার দস্তখত।

কাহারও দস্তখত জাল করা যে নীতিবিগর্হিত কাজ তাহা যে নোরা না জানিত এমন নয় কিন্তু—জানিয়া শুনিয়াও সে এদিকটায় আমল দিতে চায় নাই—তাহার সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আশু প্রয়োজনের প্রতি। ক্রগষ্টা তাহাকে জানাইল যে অবস্থা সংঘাত তাহার যত বিষমই হইয়া থাকুক না কেন আইনের নিকট ইহা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইবে। তাহার সংকল্প যত সাধুই হউক এবং প্রয়োজন যত জরুরিই হউক আইন তাহা কিছুমাত্র বুঝিবে না। নোরা তখনও ইহা মানিতে চায় না—সে বলিল' You must be a very poor lawyer, Mr. Krogstad.' নোরার মত প্রখর বুদ্ধি ও প্রতিভাশালিনী নারীর পক্ষে এরূপ উক্তি আত্মপ্রতারণা বই আর কি হইতে পারে? কিন্তু আত্মপ্রতারণা হইলেও এরূপ উক্তি নোরার পক্ষে বেশ সুন্দর এবং সুসঙ্গতই হইয়াছে। তাহার চরিত্রের সহিতও ইহা কিছুমাত্র অসমঞ্জস হয় নাই। অবশ্য এই দস্তখত নকলের কথাটা এই নাটকের মূল কথা নয় তবে প্রসঙ্গক্রমে এখানেও একটা সমস্যার আভাস দেওয়া হইয়াছে। সমস্যাটা এই যে, কোন একটা কাজ সাধারণভাবে নীতিবিগর্হিত হইলেও স্থল বিশেষে বিশিষ্ট প্রকার অবস্থার সংঘাতে পড়িয়া কোন-প্রকার সংটময় প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তাহা অনুমোদন-যোগ্য হইতে পারে কিনা।

নোরার এই আত্মপ্রবঞ্চনা বেশীক্ষণ টিঁকিতে পারিল না। স্বামী হেলমার যখন ক্রগষ্টার চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে বুঝাইয়া দিলেন যে দস্তখত জাল করাটা কত বড় অপরাধ তখন সে বুঝিতে পারিল যে তাহার অপরাধের গুরুত্ব কত বড়। যখন সে শুনিতে পাইল যে এই সব অপরাধের জের সহজে মিটে না—মাতা হইতে সন্তানদের উপর পর্য্যন্ত গিয়া ইহার প্রভাব বিস্তৃত হয়—তখন সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে, যে কাজ সে করিয়াছিল তাহার স্বামীর মঙ্গলকামনায় এখন তাহারই প্রভাব আসিয়া পড়িতেছে সন্তানদের উপর একটা অভিসম্পাতের মত। স্বামী এবং পুত্র কন্যাগণ ছিল—নোরার জীবনের সকল সুখের উৎস, এই সন্তানদের পরিচর্য্যাই ছিল তাহার জীবনের আনন্দ, ইহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তাই ছিল তাহার জীবনের আশা ভরসা। এখন দেখা যাইতেছে যে, যে সন্তানদের কল্যাণ কামনায় নোরা তাহার সমস্ত কায়মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল সেই সন্তানদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের পক্ষে তাহার নিজের প্রভাবই হয়তো হইতে পারে সর্ব্বাপেক্ষা অমঙ্গলজনক। এই চিন্তায় তাহার সমস্ত জীবন অভিশপ্ত হইয়া উঠিল। বাস্তবিক পক্ষেও নোরার মতো এমন সন্তানবৎসলা জননীর পক্ষে এরূপ অভিশম্পাত জীবনের চরম দুর্ঘটনা—একটা মহা সঙ্কটময় সমস্যা। কিন্তু নোরার জীবনের পক্ষে ইহা যত বড় সমস্যাই হউক সমস্ত নাটক খানার পক্ষে ইহাও চূড়ান্ত সমস্যা নয়।

আসল সমস্যা প্রকাশ পাইল নাটকের শেষভাগে—চতুর্থ অঙ্কে—যখন নোরার দস্তখত জালের কথা হেলমারের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল—ক্রগষ্টা-লিখিত এক পত্রে। নোরা এরূপ অবস্থা-সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাহার জন্য নানাভাবে প্রস্তুত হইতেছিল কারণ সে জানিত যে তাহার এমন পত্নীগতপ্রাণ স্বামীর—এমন নিষ্কলুষ হেলমারের নিকট তাহার পত্নীর এমন একটা অপরাধ কিরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখদায়ক হইবে। কিন্তু নোরা বিস্মিত হইল স্বামীর আচরণে। হেলমার পত্নীর অপরাধের বিষয় জানিয়া পত্নীর জন্য দুঃখ এবং অনুকম্পাবোধে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন না—তিনি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হেলমারের নির্ম্মম ব্যবহার নোরার নিকট কিরূপ মর্ম্মান্তিক বোধ হইল। নোরা ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহার অপরাধ ব্যবহারিক অপরাধ মাত্র হইলেও আইনের চক্ষে তাহা অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইবে; এই অপরাধের মূলে তাহার যে সঙ্কটময় প্রয়োজনের দায় ছিল তাহাও তাহার ব্যক্তিগত দায় বলিয়া

সংসার বা সমাজের নিকট আমল না পাইতে পারে, কিন্তু তাহার স্বামী—যে স্বামীর সহিত প্রেমের প্রভাবে উভয়ের মধ্যে একাত্মতাযোগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—সেই স্বামীও তাহার এমন কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিচার করিলেন সংসার ও সমাজের আদর্শ ধরিয়া এবং আইনের দণ্ডবিধি দ্বারা। এতদিনকার প্রেমের সম্পর্ক, এতদিনকার প্রাণের যোগ এসব কি কিছুই নয়? এই একটি মাত্র ঘটনাতে যেন তাহার চিরপরিচিত জগত সম্বন্ধে তাহার চিরঅভ্যস্ত সমস্ত ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। জগতের সহিত তাহার পরিচয়ের যে ভিত্তি তাহাও যেন ধ্বসিয়া পড়িয়া গেল। এই একটী মাত্র ঘটনায় যেন তাহাকে অপর জগতে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল যে জগত তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই অপরিচিত জগতের অনভ্যস্ত ব্যবস্থা বিধির সহিত পরিচয় লাভের জন্য তাহাকে গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইতে হইল।

সমস্যা গুরুতর সন্দেহ নাই। এক জন বিবাহিত স্ত্রীর পক্ষে যে কোন অবস্থায়ই হউক, স্থির ধীর বিচার বিবেচনার ফলে নিজের ইচ্ছায় এবং নিজেরই দায়িত্বে পতির আশ্রয় এবং পতির গৃহ ত্যাগ করিয়া নিজ অভীপ্সিত পথে যাত্রা করা—ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা দূরে থাকুক এরূপ কল্পনাও সাহিত্যে ইহার পূর্ব্বে আর দেখা দেয় নাই। এই খানেই ইবসেনের মৌলিকতা এবং ইবসেনিজম্ এর আরম্ভ এই খানেই।

যেখানে এরূপ কল্পনা সাহিত্যেও প্রচলিত হয় নাই সে স্থলে সমাজে যে ইহার জন্য পথ প্রস্তুত হইয়া রহে নাই—তাহা বলাই বাহুল্য, হউক না তাহা ইউরোপীয় সমাজ। এরূপ সমাজ-বহির্ভূত এবং নীতিবিগর্হিত কল্পনা সাহিত্যে স্থান পাইলেও যে সমাজে ইহার প্রভাবে দুর্নীতির প্রশ্রয় লাভ ঘটিতে পারে এরূপ বশবর্ত্তী হইয়া যে একদল লোক ইবসেনের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতে পারে এরূপ আশঙ্কা ইবসেনেরও ছিল। ইবসেন যেন এরূপ আশঙ্কনীয় অভিযোগের প্রত্যুত্তর স্বরূপ 'গোষ্টস্' নামক নাটকের পরিকল্পনা করিলেন।

এই 'গোষ্টস্'ও ইবসেনের একখানা অতি প্রসিদ্ধ নাটক। অনেক প্রকার পাপজ ব্যাধি যে বংশানুক্রমে পিতা হইতে পুত্রে সংক্রামিত হইতে পারে অনেকের মতে এই তত্ত্বই এই নাটকের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু এই মূলধারার সঙ্গে সঙ্গে যে আর একটি ভিন্ন প্রবাহ অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে তাহাও অনুধাবনযোগ্য। এই ধারার প্রধান কথা পতি-পত্নীর সম্বন্ধ এবং তাহাদের সম্পর্কের বিকার ঘটনায় পারিবারিক জীবনের অবস্থা বিপর্য্যয়। এই সূত্রেই "ডলস্ হাউস্" নাটকের সহিত এই নাটকের সম্পর্ক এবং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ইহার স্থানলাভ।

'ডলস্ হাউস্' নাটকে প্রধান সমাজনীতি বিগর্হিত অংশ নাটকের শেষ অঙ্কে একেবারে শেষ দৃশ্যে, যেখানে তাহার ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হইল না বলিয়া স্বামী তাহার প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিলেন না বলিয়া নোরা অভিমানে পতির গৃহ ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। ইউরোপীয় সমাজে পতি পত্নীর সম্বন্ধ বিচ্ছেদের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে; ইবসেনের সময়ে ইবসেনের দেশেও বোধ হয় এরূপ প্রথা ছিল। কিন্তু যে সব কারণে পতি পত্নীর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটে বা ঘটিতে পারে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে প্রকার কোন ঘটনা ছিল না। নোরার পতিগৃহ ত্যাগের একমাত্র কারণ তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিমান। বিবাহে পত্নীর পক্ষে এরূপ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ ইউরোপীয় সমাজেও প্রচলিত ছিল না। কাজেই 'ডলস্ হাউস্' নাটকের আদর্শবাদে যে ইউরোপীয় সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে—তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

সমাজে যে আদর্শ এবং যে প্রথা প্রচলিত ছিল সেই হিসাবে নোরার উচিত ছিল স্বামীর শত ত্রুটী সত্ত্বেও, স্বামী তাহার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব স্বীকার নাই করুক, তাহার প্রেমের মর্য্যাদা নাই বুঝুন—তথাপি স্বামীর আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক পতিগৃহকেই পরমকাম্য বলিয়া স্বীকার করিয়া সেখানেই চিরকালের জন্য অবস্থিতি করা। কিন্তু কোন প্রকার অবস্থা ভেদ স্বীকার না করিয়া সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে স্বামীর আনুগত্য রক্ষা করিয়া চলিতে গেলে অবস্থা বিশেষে যে প্রকার বিভ্রাট ঘটিতে পারে—গোষ্টস্ নাটক তাহারই একটা দৃষ্টান্ত।

গোষ্টস্ নাটকে পতির যেরূপ চরিত্র-দোষ ছিল তাহাতে বিবাহ বিচ্ছেদ অনায়াসেই ঘটিত পারিত কিন্তু নায়িকা এখানে সে সুযোগ গ্রহণ করিলেন না। অলভিং-পত্নী বিবাহ-বিচ্ছেদের চিরাচরিত পন্থা অবলম্বন না করিয়া স্বামীর

প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহার ভূতপূর্ব্ব প্রণয়পাত্র পাদরী ম্যানডারসের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। এস্থলেও নায়িকার চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাণ্ডারর্স ছিলেন ধর্ম্মযাজক, সে জন্যই হউক অথবা বিবেক-বিরুদ্ধ বলিয়াই হউক তিনি এই প্রলোভন জয় করিয়া অলভিং-পত্নীকে দেখাইয়া দিলেন সনাতন পন্থা—পতিরেকো গুরু স্ত্রীণাং—পতিকে স্বীকার করিতেই হইবে এবং পতি-গৃহকেও রক্ষা করিতেই হইবে। অলভিং-পত্নী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং পতিসেবায় মনোনিবেশ করিলেন। এই অবস্থায় পতিসেবাব্রত যে তাহার পক্ষে কিরূপ কঠোর হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পতির অনাদর সহ্য করিয়া নিজের প্রেমের মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া পতির ব্যভিচারের ফলাফলকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাকে সেই পতিরই সুখ বিধানের ব্যবস্থা করিয়া চলিতে হইল। দাম্পত্য-প্রেমের সম্পর্কে এরূপ কঠোর সংগ্রামের সমস্যা যাহার আঘাতে মানুষ এরূপ নৃশংসভাবে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়—ইউরোপীয় সাহিত্যে বোধহয় ইহার তুলনা নাই। ভারতীয় সাহিত্যেও ইহার উপমাস্থল লক্ষহীরার কাহিনী যে স্থলে নায়িকা পতির সন্তোষবিধানার্থে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পতিকে নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া বারাঙ্গনার গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অলভিং-পত্নীর এরূপ মহনীয় সেবার ফল কি হইল ? পতির চরিত্র কিছুমাত্র সংশোধিত হইল না। একমাত্র পুত্রকে নির্ব্বাসনে পাঠাইতে হইল যেন যেন পিতার সংর্গস পুত্রকে স্পর্শ না করে। অলভিং-এর মৃত্যুর পরেও অলভিং-পত্নীর জীবনে বা গৃহেও কোন প্রকার মঙ্গলের রেখাও দেখা গেল না; বরং আরও ঘোরতর দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিয়া সমস্ত নাটক খানাকে যে কিরূপ ভয়াবহ শোকদৃশ্যে পরিণত করিল তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। যাহারা ডল্‌স হাউসের আদর্শবাদে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন তাহাদের জন্যই এই নাটকে এই ইঙ্গিত আছে যে সমাজের প্রচলিত নীতি সকল ক্ষেত্রেই মঙ্গলের নিদান রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না; সুতরাং যতই বিসদৃশ হউক না কেন অবস্থা ভেদে বিভিন্ন প্রকারের অভিব্যক্তির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে 'ডলস্ হাউস্' এর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এই ধারা বাংলা সাহিত্যেও দেখা যায়। ডাক্তার নরেশ সেন গুপ্তের 'শুভা' নয়। শুভাও স্বামীর নির্য্যাতনে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু তারপরে তাহার জীবন কাহিনী যেরূপভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে শুভার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তেমন প্রাধান্য লাভ করে নাই। বাংলা সাহিত্যে 'ডলস্ হাউসের' একমাত্র উপমাস্থল—একটি ছোট গল্প—গল্পটির নাম স্ত্রীর পত্র, লেখক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গোষ্টস্ নাটকের শেষাংশও অনুসরণ যোগ্য। ঘটনা বিবৃতিকালে বলা হইয়াছে যে অলভিংএর মৃত্যুর পর পুত্র অস্‌ওয়াল্‌ড্ গৃহে ফিরিয়া আসিল। পুত্র পিতার নিকট হইতে বংশানুক্রমে লাভ করিয়াছিল কয়েকটি পাপজ ব্যাধি, পানাসক্তি এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা। সে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়া গৃহের একটি দাসীকন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। এই দাসীকন্যা ছিল তাহার পিতারই জারজ কন্যা। মাতা সকলই জানিলেন। তিনি এবার আর আদর্শ মানিয়া চলিতে রাজী হইলেন না। তিনি যেন অদৃষ্টকে স্বীকার করিয়া লইয়া এই জারজ কন্যার সহিতই পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন—অভিপ্রায়—পুত্রের সন্তোষ-বিধান। এদিকে দাসীকন্যাটীও পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিল প্রবৃত্তিপরায়ণতা, সুতরাং সেও একজন রুগ্ন ব্যক্তির সহিত চিরকালের জন্য শৃঙ্খলিত হইবার সম্ভাবনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চলিয়া গেল। পিতার পাপজ ব্যাধি এবং পাপ প্রবৃত্তি যে বংশানুক্রমে পুত্র কন্যাতে সংক্রামিত হইতে পারে এইখানে তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি। তারপরে অস্‌ওয়াল্ডএর মৃত্যু পর্য্যন্ত মাতা পুত্রের জীবন যাত্রার যে শোকাবহ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে চিরপ্রসিদ্ধ গ্রীক নাটকের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ট্রাজেডির পূর্ণ প্রকট মূর্ত্তি শুধু 'গোষ্টস্'এ নয়, ইবসেনের আর একখানা নাটকেও দেখা যায়—সেই নাটকখানার নাম—Warriors of Helgeland.

প্রসিদ্ধ গ্রীক্ নাট্যকার সফোক্লিসের কোন কোন নাটকে যেমন অদৃষ্টবাদ দেখা যায় ইবসেনের দুই একখানা নাটকে সেরূপ অদৃষ্টবাদেরও পরিচয় আছে যেমন 'Ghosts', 'Warriors of Helgeland' এবং 'Lady from the Sea.' কিন্তু সে সব স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ।

শ্রীসত্যেন্দ্রভূষণ সেন

এক গোলাপ

শ্রীজীমূতপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ

হেমন্তের আসন্ন সন্ধ্যা। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল। হঠাৎ বিশাল প্রান্তরের উপর এক পশলা বৃষ্টি নেমে এল।

বাড়ীর সাম্‌নে বাগানটী সূর্য্যকিরণে রঙিয়ে উঠে বৃষ্টির জলে স্নান করে স্নিগ্ধ হ'ল।

ঘরের ভিতরে একটী টেবিলের সামনে আবেশমাখা চোখে সে বসেছিল—অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে।

আমি জানতুম সে মুহূর্ত্তে তার মন কি চাইছে; বুঝতে পাচ্ছিলুম মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সে ক্রমশঃ পরাজয় মান্‌ছে। হঠাৎ উঠে সে বেরিয়ে গেল।

এক ঘণ্টা কেটে যায়···মনে হয় একটি মুহূর্ত্ত। তবু সে আসে না।

আমিও উঠলুম। যে পথ দিয়ে সে গেছে অনুমান করে সেই পথে চল্‌লুম।

আমার চারিদিকে অন্ধকার। রাত্রি এসেছে। কিন্তু বালির উপর দেখতে পেলুম কুয়াসার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে রক্তিম আভা। কুড়িয়ে নিলুম। দেখলুম সদ্য-প্রস্ফুটিত একটী গোলাপ। দু'ঘণ্টা আগে এটী তার বুকের উপর ছিল।

যত্ন করে তুলে নিলুম কাদার ভিতর থেকে। ঘরে গিয়ে রেখে দিলুম তারই টেবিলে।

তার পর সে এল—লঘুপদবিক্ষেপে। বস্‌ল গিয়ে চেয়ারে।

মুখে তার ফুটে উঠেছে রৌদ্র-ছায়ার খেলা। আনমিত চোখে যেন কিসের আনন্দ।

গোলাপটী দেখেই তুলে নিলে। কাদামাখা চটকে যাওয়া পাপড়ীগুলো লক্ষ্য কর্‌তে কর্‌তে আমার দিকে চাইলে; চঞ্চল চোখদুটী তার হয়ে এল স্থির, অশ্রুবিন্দুতে সমুজ্জ্বল।

'কাঁদ্‌ছ কেন?'—প্রশ্ন কর্‌লুম।

'দেখ, দেখ, গোলাপটীর কি দশা হয়েছে!'

বলে উঠলুম দ্ব্যর্থবোধক ভাবে—

'তোমার চোখের জলে ময়লা যাবে ধুয়ে।'

'চোখের জলে ধুয়ে যায় না, জ্বালিয়ে দেয়'—সে বল্‌লে।

তারপর চুল্লীর দিকে ফিরে ছুঁড়ে ফেল্‌লে অগ্নিশিখায়। চেঁচিয়ে বলে উঠল—

'চোখের জলের চেয়ে আগুন পোড়ায় ভাল ক'রে।'

তার সুন্দর অশ্রুসমুজ্জ্বল চোখ দুটী আনন্দে ও তৃপ্তিতে যেন হেসে উঠল।

দেখলুম সেও আগুনে পুড়েছে—। *

* টুর্গেনিভ্

বোঝাপড়া

শ্রীলীলা নন্দী

আজ তবে বোঝাপড়া হো'ক্—
মুছে ফেল অশ্রুভরা চোখ।
অযত্ন-শিথিল বাস
আকুল কেশের রাশ
যেমন রয়েছে তাই রো'ক্।
তুমি শুধু মুছে ফেল চোখ॥
বাহিরে বরষা ঝরঝর—
বনবীথি কাঁপে থরথর।
সজল যূথীর বনে
কি যে বলে সঙ্গোপনে
শ্রাবণের পবন মন্থর,
বাহিরে বরষা ঝরঝর॥
দিগন্তের পরপারে লীন
চাতকের বিশ্রাম—বিহীন
"ফ-টি-ক ফ-টি-ক-জল"
অবিশ্রাম অবিরল
আর নাহি বাজে শ্রান্তিহীন।
দিগন্তের পরপারে লীন॥
আকাশেরো আঁখিভরা জল
অভিমানে ছিল টলমল।
আদর-পরশ লেগে
ঝ'রেছে প্রবল বেগে
ম্লান করি আঁখির কাজল,
আকাশের আঁখিভরা জল॥
দিও না মাথার পরে বাস,
অবারিত থাক্ কেশরাশ।
ললাটে বিলীন টীপ
সকরুণ সন্ধ্যাদীপ
যেন গোধূলির স্মিতহাস,
দিওনা মাথায় তুলে বাস॥
মুখে যদি নাহি সরে কথা—
প্রকাশ ক'র না আকুলতা।
যত কথা মনে তব
সকলি বুঝিয়া লব
কলভাষী পূর্ণনীরবতা।
মুখে যদি নাহি সরে কথা॥
মুছাইয়া দিব কালো আঁখি
বক্ষোপরে শ্রান্ত শির রাখি—
অযত্ন-শিথিল চুলে
গুছাইয়া দিব তুলে,
জয়টীকা ওষ্ঠে দিব আঁকি।
মুছাইব স্ফীত কালো আঁখি॥
বিজিত হইব বিনা রবে—
বোঝাপড়া তবু বাকি রবে?
তোমারি রোষের স্মৃতি
গাবে না—বিদ্রূপ-গীতি
যবে তুমি কণ্ঠলগ্না হবে,
এই কর নিজ করে লবে?
তবু কি জাগিয়া রবে রোষ?
ভুলে কি যাবে না অসন্তোষ?
প্রীতির শ্রাবণ-ধার—
করিবে না একাকার
তুলনার যত গুণদোষ?
তখনো কি জেগে রবে রোষ?

ঘোষালের হেঁয়ালী

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১

সেদিন সন্ধ্যায় একা বাড়ী বসেছিলুম। শরীরটে ছিল মাদা, তার উপর সেদিন পড়েছিল একটু বেশি শীত। তাই বাড়ী থেকে না বেরনোই শ্রেয় মনে করলুম।

এ সময় বেকার বাড়ী বসে থাকাটা আমার পক্ষে ঈষৎ বিরক্তিকর। এ দেশে কোন evening paper নেই, যার মারফৎ দুনিয়ার টাটকা খবর পাওয়া যায়; যে খবরের জন্য আমরা কেউ ব্যস্ত নই, তবুও যা আমরা পড়ি। তাই বসে বসে একখানি futurist নভেলের পাতা ওল্টাচ্ছিলুম। দু'চার পাতা উল্টেই মনে হল, বাংলার তরুণ সাহিত্যের কোনও future নেই।

এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে—"একঠো বাবু আপকো সাথ মুলাকাত করনে আয়া।" আমি বল্লুম—"বাবুকো আনে বোলো।" যদিচ এ অসময়ে কে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল বুঝতে পারলুম না। সে যাই হোক্, বাবুর আগমন সংবাদ শুনে খুসীই হলুম। কেননা বুঝলুম যে আগন্তুকটি যিনিই হোন, তাঁর সঙ্গে হয় কাজের নয় বাজে কথা কয়ে এই ফাঁকা সময়টা ভরিয়ে দিতে পারব।

ভদ্রলোকটি ঘরে ঢোকবামাত্র বুঝলুম, তিনি বিল সাধতে আসেননি। কারণ তাঁর পরণে শাদা কাগজের মত ধব্‌ধবে খদ্দরের জামা ও ধুতি। গায়ে ধূপছায়ারঙের মুর্শিদাবাদী বালাপোস, আর মাথায় খদ্দরের গান্ধী টুপি। দেখে মনে হল তিনি হয়ত স্বরাজের জন্য চাঁদা সাধতে এসেছেন। যদি তাই হয় ত ভাবী স্বরাজের অনেক খবর পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক টুপিটি খুলতেই দেখি তিনি স্বয়ং ঘোষাল। কারণ তার হচ্ছে সেই জাতের স্বপ্রকাশ চেহারা, যা একবার দেখলে জীবনে আর ভোলা যায় না।

কথাপীঠ

আমি তাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করেই জিজ্ঞাসা করলুম—কি খবর? ঘোষাল উত্তর করলে—unemployed।

—রায় মহাশয়ের সঙ্গে তোমার কি ফারকৎ হয়ে গিয়েছে?

—না। যা হয়েছে, তাকে একরকম judicial separation বলা যেতে পারে।

—Divorce নয়?

—না। তবে যে-কোন মুহূর্ত্তে আমি তাঁকে তালাক দিতে পারি। ব্যাপার কি ঘটেছে, তা পরে বল্‌ব। আগে কাজের কথাটা সেরে নেওয়া যাক্। আমি স্বরাজ-দলে ভর্ত্তি হতে চাই।

আমি ঘোষালের মুখে এ প্রস্তাব শুনে বুঝলুম কথাটা নেহাৎ বাজে। সে বলতে চায় গল্প। আর এ প্রস্তাব তার গল্পের ভূমিকা মাত্র। ও সে ভূমিকা G. B. S.-এর নাটকের ভূমিকার মত, যার অস্থায়ীর সঙ্গে অন্তরার কোন সম্বন্ধ নেই। তাহলেও ঐ বিষয়েই আলাপ সুরু করলুম। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"সেই জন্যই বুঝি খদ্দরমণ্ডিত হয়েছ?"

—অবশ্য। মুখপাত্র ত দুরস্ত চাই। তা' ছাড়া বেশেই ত দেশ গড়ে। নব রাশিয়া গড়েছে লাল কুর্ত্তায়, আর নব ইতালি কালো কুর্ত্তায়।

—তথাস্তু। এখন দেশের কাজে এত লোভ কেন?

—ও কাজটা sinecure বলে।

—তুমি বলতে চাও কিছু না করারই অর্থ দেশের কাজ করা?

—আমার মত অকর্ম্মণ্য লোকের পক্ষে তাই। স্বরাজের কেষ্টবিষ্টুদের অবশ্য অগাধ খাটুনি। তাঁরা আলেয়ার মত নিয়ত ভ্রাম্যমাণ। আজ জ্বলে উঠছেন পুরুষপুরে, কাল কামাখ্যায়। আর আমরা Hail! holy light বলে সেই

উদ্‌ভ্রান্ত আলোর পিছনে ছুটছি। এখন আপনার কাছে কিঞ্চিৎ সাহায্য চাই,—পয়সার নয়, মুখের কথার।

—এ দলের বড় কর্ত্তাদের কাছে না হোক্‌, উপকর্ত্তাদের কাছে গিয়ে তোমার প্রস্তাব জানাতে হবে।

—আপনার মুখের কথা রসিকতা বলে উপেক্ষিত হবে। রসিকতা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রাহ্য।

—তবে কি certificate লিখে দেব?

—মাপ করবেন। আপনি ত লিখবেন যে ঘোষাল একজন জাতগুণী, চমৎকার টপ্পা গাইয়ে, আর নিত্য নতুন স্বরচিত গল্প বলতে পারে। আপনি কি জানেন না যে, গান ও গল্প স্বরাজ্যে থাকবে না?

—তবে থাকবে কি?

—বক্তৃতা আর তার স্বরলিপি, অর্থাৎ খবরের কাগজ।

—তবে আমাকে কি তোমার application লিখে দিতে হবে?

—দরখাস্ত আমি নিজেই লিখব। স্বরাজের ভাষা আমি জানি। সে ভাষা ত দেশী মনের তাঁতে বোনা বস্তাপচা বিলেতী শব্দ।

—তবে কি চাও?

—As regards my qualifications সম্বন্ধে কি লিখ্‌ব, সেই বিষয় আপনার পরামর্শ চাই। যে মার্কার qualification-এর কিঞ্চিৎ বাজার দর আছে, সে qualification-এর কথা লিখতে ভয় হয়।

—কেন বল ত?

—সেই qualification-এর কথা একবার মুখ ফস্কে বেরিয়ে পড়েছিল, তার ফলেই ত আমার এই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা।

—হেঁয়ালি ছেড়ে ব্যাপার কি হয়েছিল স্পষ্ট করে বল্‌লে বুঝতে পারি। সত্য কথা বলতে হলে তোমার ভবিষ্যৎ কাস্মিনকালেও ছিল না, এখনো নেই; কেন না তুমি সামাজিক ও সাংসারিক জীব নও। সমাজে তোমরা হচ্ছ সব উদ্‌বৃত্তের দল। স্থতরাং তুমি কোন্ দলে ভর্ত্তি হও আর না হও, তা'তে কিছু আসে যায় না,—তোমারও নয়, সমাজেরও নয়।

তোমার গত চাকরী কি করে ছুটিতে পরিণত হল, তাই জানবার কৌতূহল আমার হচ্ছে।

মুখবন্ধ

—আচ্ছা সেই নিকট অতীত কাহিনী বলছি।

এই কথা বলে ঘোষাল চেয়ারের উপর জোড়াসন হয়ে বসে ইংরাজীতে বল্লেন:—

—Beastly cold. May I have a drop of—

—What will you have—whisky or brandy?

—Cognac, s'il vous plait.

আমি বেহারাকে একটি brandy-peg আন্‌তে হুকুম দিলে ঘোষাল বল্লে—Merci, monsieur. আমি প্রশ্ন করলুম—

Vous parlez francai's, monsieur?

—Pardon, monsieur, ও অপরাধ আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়। এই Cognacই ঐ ফরাসী বুলি টেনে এনেছে। Cognacএর সঙ্গে 'if you please' কি খাপ খেত? আর 'thank you'এর মত মিছে কথা কি কোন ভাষায় আছে?

এ কৈফিয়তে আমি হেসে উঠলুম, সঙ্গে সঙ্গে সেও। বেহারা brandy-pegটির সঙ্গে soda সংযোগ করতে উদ্যত হলে ঘোষাল বল্লে—"ও ব্র্যাণ্ডিটুকুকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিন। আমি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করে পানাহার করি। জাত যায় সোডায়, ব্র্যাণ্ডিতে নয়।"

—Unfiltered water?

—সে ত গঙ্গামৃত্তিকা। আমি চাই ইন্‌ভাগাস্ত বিলেতী ওষুধ দিয়ে শোধনকরা গঙ্গার জল—যার নাম কলের জল।

তারপর সজল ব্র্যাণ্ডি এক চুমুকমাত্র গলাধঃকরণ করে ঘোষাল তার কাহিনী বলতে স্থরু করবার পূর্ব্বে ছু'কথায় তার মুখবন্ধ করলেন। তিনি বল্লেন,—এ উপন্যাস নয়, ইতিহাস। এর রস অতি ফিকে,—গঙ্গাজলী ব্র্যাণ্ডির মত। স্থতরাং একটু ধৈর্য্য ধরে শুনতে হবে। আশা করি রায় মহাশয়ের সভার নবরত্নদের সব মনে আছে, যথা পণ্ডিত মহাশয়, উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি।

—হাঁ, আছে।

—তাহলে শুনুন।

কথামুখ

একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর ঘরে বসে বিশ্রাম করছি, অর্থাৎ আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় গীতা পড়ছি—

—তুমি কি আবার গীতাপাঠ করো নাকি?

—করি। অবসরবিনোদনের জন্য নয়, পণ্ডিত মহাশয়ের আদেশে, আমার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। ভয়ানক ঘুম পাচ্ছিল, তারপরে এই শ্লোকটি পড়বামাত্র জেগে উঠলুম :—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি, সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

—ও শ্লোকের অর্থ কি বুঝলে?

—এর অর্থ ঘুমের ঘোরে বোঝা যায়, কিন্তু জেগে অপরকে বোঝানো যায় না। ও শ্লোকটা "We are such stuff as dreams are made on"-এর সগোত্র।

—তুমি Shakespeare পড়েছ নাকি?

—Tempest ও Hamletএর সুভাষিতাবলী ত মুখে মুখেই চলে। ও সব কি আর বই পড়ে শিখতে হয়?

—তারপর?

—এমন সময় দুয়োর ঠেলে কে ঘরে প্রবেশ করলে। বই থেকে মুখ তুলে দেখি 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা' সখীরাণী সুমুখে দাঁড়িয়ে। তার চোখেমুখে লেগে রয়েছে অর্দ্ধস্ফুট হাসি। ও মূর্ত্তি দেখলে স্বতঃই মুখ থেকে বেরিয়ে যায়—অরালা কেশেষু প্রকৃতি সরলা মন্দহসিতে—

—এ দেবীটি কে?

—এ রমণী দেবী নয়, বোষ্টমের মেয়ে। তার পিতৃদত্ত নাম শ্যামদাসী। সখীরাণী নাম আমি দিয়েছি, রাণীমার প্রিয় সখী বলে'। রাণীমা তাকে বাপের বাড়ী থেকে সঙ্গে এনেছেন, তাঁর বাল্যবন্ধু বলে'। প্রায় তাঁর সমবয়সী, বছর দুত্তিনের বড় হবে। এ বাড়ীতে তার কাজ হচ্ছে রাণীমার কাছে গল্প করা, কীর্ত্তন গাওয়া ও চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি বৈষ্ণব গ্রন্থ সব তাঁকে পড়ে' শোনানো। আর রাণীমার নেপথ্য বিধান করা। কিন্তু রাজবাড়ী এসেও তার চাল বিগড়ে যায়নি। সে পরণপরিচ্ছদে আহারবিহারে বোষ্টমী কায়দা পুরো বজায় রেখেছে। তার পরণে একখানি চাঁপাফুলের রঙের তসরে সাড়ী, গায়ে নামাবলী, গলায় তুলসী কাঠের মালা, নাকে রসকলি, একরাশ ঢেউখেলানো চুল কপালের ডান ধারে চুড়ো করে' বাঁধা। হঠাৎ দেখতে মনে হয় একটি জীবন্ত ছবি। রাধিকা একবার অভিমান করে কৃষ্ণকে বলেছিলেন যে, "আপনি হইয়ে শ্রীনন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা।" শ্রীনন্দের নন্দন যদি হঠাৎ মেয়ে হয়ে যেতেন, তাহলে তাঁর রূপ হত ঠিক সখীরাণীর মত।

সখীরাণীর দৌত্য

তাকে দেখে আমি একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম—

—এ অবেলায় তোমার হঠাৎ আগমনের কারণ কি?

—আমি নিজের গরজে আসিনি, এসেছি মীনারাণীর দূত হয়ে।

—মীনাক্ষী দেবীর, থুড়ি রাণীমার কি হুকুম?

—আজ সন্ধ্যেয় তোমাকে গানগল্প করতে হবে তাঁর সভায়।

—সে সভা কিরকম সভা?

—মেয়ে-মজলিস্।

—সে মজলিসে বোধহয় নিষ্পুরুষ নাটকের অভিনয় হয়?

—ধরে' নাও যে তাই হয়।

শুনেছি পুরাকালে কোন বীরপুরুষ "একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনং।" আমাকেও দেখছি তাঁর পদানুসরণ করতে হবে।

—কি বলছ, ভাষায় বল।

এ কথা শুনে আমি বল্লুম—

—তুমি দেখছি এখন কথায় কথায় সংস্কৃতের ফোড়ন দাও।

—এ অভ্যাস হয়েছে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গদোষে। নইলে আমার ফরাসী বিদ্যা যদ্রূপ, সংস্কৃত বিদ্যাও তদ্রূপ। এক বর্ণ গাইতে না পারলেও যে লোক খাঁ সাহেবদের সহবৎ করেছে, সে কি শ্রুতি কপ্ চায় না?

সে যাই হোক্, কথাটা বাঙ্গলায় বুঝিয়ে দেবার পর সখীরাণী বল্লেন—

—তুমি যে বীরপুরুষ নও, তা' আমি জানি। দু'বেলা ঐ মুগুর ভেঁজে তোমার বুক চওড়া হয়েছে, কিন্তু বুকের পাটা হয় নি। তবে ভয় নেই। তোমাকে ঘোড়ায়ও চড়তে হবে না, একাও যেতে হবে না। পণ্ডিত মহাশয় থাকবেন তোমার

প্রহরী। আর রায় মহাশয়ের অন্দরমহল গহন বন নয়, ফুলের বাগান।

—তাহলে সেখানে গিয়ে দেখব—

"কোন ফুল জপত হরিনাম,

কোন ফুল ফুকারে অলি অলি।"

—ও দুই কাজ করা ছাড়া মেয়েদের আর উপায় কি? প্রথমে অলি অলি, শেষে হরি হরি। সে যাই হোক্, তোমাকে আজ একটি সাদাসিধে গল্প বলতে হবে, যা' মেয়েরা বুঝতে পারে। রায় মহাশয়ের আড্ডায় যে-সব গল্প বল, তা' শুনলেই আমার বলতে ইচ্ছে যায়—এহ বাহ্য, আগে কহো আর।

—কেন?

—তার দু' আনা গল্প, আর পড়ে'পাওয়া চোদ্দ আনা তর্ক;—অর্থাৎ বাক্যি।

—আচ্ছা, গল্পটা যথাসাধ্য সাদা করব, তবে সিধে হবে কি না বলতে পারিনে।

—যাক্, তা'তে কিছু আসে যায় না। গুটি দু' চ্চার ভাল ভাল গানও শোনাতে হবে।

—আচ্ছা, তাহলে কীর্ত্তন গাইব, যা' মেয়েরা বুঝতে পারে। যথা "প্রাণবঁধুর সনে কথা কইতে পেলেম না।"

—না, কীর্ত্তন নয়।

—কেন?

—কীর্ত্তন তুমি আমার মত গাইতে পারবে না। ধর ঐ গানটার ভিতর যত মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে হবে, আখর দিয়ে নয়, সুরের টান টেনে। নইলে কীর্ত্তন হয়ে পড়ে নেড়া গান।

—তুমি বলতে চাও নেড়ানেড়ির গান। যথা, আমি চাপান দিলুম—"যদি গৌর চাস্, কাঁথা নে ধনী;" আর তুমি উতোর গাইলে, "এ পূজোতে ঝুম্‌কো দিবি, তবে ঘরে রব।"

—এ কীর্ত্তনে অবশ্য আবদার আছে, আক্ষেপ নেই। আর তা ছাড়া ও সব ভাবের কীর্ত্তন নয়, অভাবের সং-কীর্ত্তন। ও সংপনা এ দরবারে চলবে না।

—তাহলে আমাকে কি গাইতে হবে?

—হিন্দী।

—তোমাকে যে ক'টি গান শিখিয়েছি, তারি মধ্যে দুয়েকটি?

—হঁ্যা। "গোরে গোরে মুখপর"ও চলবে, "চমেলি ফুলি চম্পা"ও চলবে।

—তুমি বলতে চাও সে মজলিসে গোরে গোরে মুখও থাকবে, চমেলি ফুলি চম্পাও থাকবে।—তবে কথা হচ্ছে, আমার সঙ্গে সঙ্গত করবে কে?

—খেয়ালের ভারিত তাল। আমি খঞ্জনীতে ঠেকা দেব এখন। তোমার তাল আমি সামলে নেব।

—তাহলে আমি নির্ভয়ে গাইতে পারব।

—আচ্ছা, তবে আসি। মেয়েদের সন্ধ্যে আহ্নিক হয়ে যাবার পর রাধানাথ শিকদের এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।

—আচ্ছা, হুকুম ঠিক তামিল করব। ইতিমধ্যে দুর্গানাম জপ করি।

—মধ্যে মধ্যে মা'র নাম স্মরণ করা ভাল, বিশেষতঃ চিরকুমারের পক্ষে।

সখীরাণীর গুণাগুন

আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি যে, সখীরাণী আমার পূর্ব্বপরিচিত। এ বাড়ীতে তার গতিবিধি ছিল অবাধ। তার তুল্য স্বাধীন জেনানা আমি আর একটিও দেখিনি। সে বোষ্টমের মেয়ে, তাই মনুর বিধিনিষেধের সে তোয়াক্কা রাখত না। সংসারে তার কোনরকম বন্ধন ছিল না; কারণ সে কুমারীও নয়, সধবাও নয়, বিধবাও নয়। উপরন্তু সে সুন্দরী ও গুণী। তার যে রূপ আছে, সে তা' জানত; কারণ না জানবার তার উপায় ছিল না। আর সে কীর্ত্তন গাইত চমৎকার। তারপর সে ছিল আমার শিষ্যা। রাণীমার ইচ্ছায় আর রায় মহাশয়ের আদেশে আমি তাকে হিন্দী গান শেখাতুম,—টপ্পাঠুংরি নয়, সাদাসিধে মামুলী গান; অর্থাৎ সেই সব গান যা' আজও বাতিল হয় নি, যদিচ লোকে সেগুলো নবাবী আমল থেকে গেয়ে আসছে। আমি তাকে তান শেখাইনি, পাছে তার গলার অপূর্ব্ব টান নষ্ট হয়। সুরের প্রাণ তার কাঁপুনির উপর নির্ভর করে না; করীকর্ণের মত অবিরত চঞ্চল হওয়া প্রাণের একমাত্র লক্ষণ নয়।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি রাণীমার নাম হচ্ছে মীনাক্ষী দেবী। শ্যামদাসী তাঁকে আজন্ম মীনা বলেই ডেকে এসেছে; এ বাড়ীতে এসে শুধু তার পিছনে রাণী জুড়ে দিয়েছে। কারণ গবর্ণমেণ্টে রায় মহাশয়কে রাজা খেতাব না দিলেও, এদেশের লোকে তাঁকে রাজা বাবুই বল্ত। সে যাই হোক্, আমি সখীরাণীর প্রস্তাব শুনে একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম। কেন না, আমি জানতুম যে, এই মজলিসে একজন উপস্থিত থাকবেন, যাঁর সুমুখে কি ব্যবহারে, কি কথাবার্ত্তায়, পান থেকে চুণ খসলেই সভাবন্ধ হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তিনি কে?

ঘোষাল বল্লেন—তিনি এই রাজপুরীর পুরদেবতা।

—মানবী না পাষাণী?

—ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সখী সমিতি

সন্ধ্যের পর রাত যখন ৮টা বাজে, পণ্ডিত মশায় আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে রায় মহাশয়ের প্রিয় খানসামা রাধানাথ শিকদার। রাধানাথ আমাদের ঠাকুরবাড়ীতে নিয়ে চল্লে। বা'রবাড়ী ও অন্দরমহলের মধ্যস্থ মহলটি হচ্ছে পূজার মহল। পশ্চিমে প্রকাণ্ড পূজার দালান, তার সুমুখে নাটমন্দির, আর তিন পাশে প্রশস্ত ভোগের দালান; সব আগাগোড়া সাদা মার্ব্বেলে মোড়া,—পবিত্রতার নিদর্শন।

আমাদের পথপ্রদর্শক আমাদের দুজনকে নিয়ে গিয়ে নাটমন্দিরে একখানি গালিচার উপর বসালে। তাকিয়ে দেখি ঠাকুরদালান স্ত্রীজাতি নামক উপদেবতায় গুলজার। শুনলুম এঁরা সবাই ব্রাহ্মণকন্যা,—রায় মহাশয়ের কুটুম্বিনী। আর দাসীচাকরাণীরা বসেছে সব নাটমন্দিরের ডাইনে বাঁয়ে, ভোগের দালানের বারান্দায়। প্রথমেই চোখে পড়ে এ দুই দলের বর্ণের পার্থক্য। যাক্, সে স্ত্রীরাজ্য আর বর্ণনা করব না, তাহলে পুঁথি বেড়ে যাবে। ছায়া পিছনে ফেলে আলোর দিকে ফিরে দেখি যে, ঠাকুরদালানের সামনে প্রথমেই বসে আছেন রাণীমা, তাঁর বাঁয়ে তাঁর তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী সখীরাণী।

রাণীমাকে এই প্রথম দেখলুম। দিব্যি সুশ্রী, যেন একটি ননীর পুতুল।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনী বহিয়া যায়।

মূর্ত্তিমতী আনন্দলহরী, এর চেয়ে তাঁর বিষয় বেশী কিছু বলবার নেই।

তাঁর ডাইনে বসে আছেন একটি বিধবা—the woman in white। ইনিই হচ্ছেন এ পুরীর পুরদেবতা। তাঁর রূপ বাঙ্গলা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কারণ এ তরল ভাষার কোন সংহত গাঢ়বন্ধ রূপ নেই। সংস্কৃত কবি হয়ত বলতেন :—

"তড়িল্লেখা তন্বীং তপনশশি বৈশ্বানরময়ী।"

ঠাকুরাণী

এই সংস্কৃত বচন আউড়েই ঘোষাল বল্লেন—আর চার ড্রাম, একটা liqueur glass-এ। এখন আমি সুর বদ্লে নেব, নইলে এ ইতিহাস কাব্য হয়ে উঠবে,—অর্থাৎ প্রলাপ। চার ড্রাম একটা বুড়ো আঙুলের মত গেলাসে এল; এক চুমুকে গেলাসটি খালি করেই ঘোষাল আবার তার গল্প আরম্ভ করলে—

যে মহিলাটির রূপবর্ণনা করতে পারিনি, এখন তাঁর গুণ বর্ণনা করি। তাঁর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী, এ বাড়ীতে তিনি ঠাকুরাণী নামেই পরিচিত। তার কারণ, তিনি রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালক হরিসত্য শর্ম্মা ঠাকুরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বিবাহের পর থেকে তিনি এই বাড়ীতেই বাস করছেন, বিদেহ আত্মার মত; কেননা তাঁর দেখাসাক্ষাৎ সকলে পায় না। অথচ তিনি হয়ে উঠেছেন এ পরিবারের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এরি নাম নীরব প্রভুত্ব। এক কথায়, সকলেই ছিল তাঁর বশীভূত; হয়ত তাঁর রূপের জ্যোতিই ছিল তাঁর বশীকরণ মন্ত্র, নয় ত তাঁর অন্তরের কোনও X-ray।

উপরন্তু তিনি ছিলেন বিদুষী। বিয়ের বছরখানেক পরে তাঁর স্বামীবিয়োগ হয়, তারপর থেকেই তিনি বিদ্যাচর্চ্চা সুরু করলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন সুপণ্ডিতা। পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন তাঁর শিক্ষক। তিনি বিধবার আচার 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। যদিচ শাস্ত্রে তাঁর কোনরূপ ভক্তি ছিল না। পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে শুনেছি, কিছুদিন বেদান্তচর্চ্চা করে তিনি তাঁকে বলেন যে, ও

আধ্যাত্মিক ধূমপানে আমার অরুচি হয়ে গিয়েছে। পণ্ডিত মহাশয় তখন বলেন যে, তবে কাব্যামৃত রসাস্বাদ করুন। তারপর থেকেই সুরু হল রামায়ণ, কালিদাস ও ভবভূতির চর্চ্চা। এ সব কাব্য ইতিহাস চর্চ্চা করেও তিনি তৃপ্তিলাভ করেন নি। তিনি নাকি বলতেন যে, যা' হওয়া উচিত তার কথা একরঙা, আর সে রঙও জলা। যা' হয়, তাই বিচিত্র। এর পর থেকে তিনি ইংরাজী শিখেছেন, আমিও পণ্ডিত মশায়ের অনুরোধে এ শিক্ষার কিছু সাহায্য করেছি। এই মেয়ে-মজলিসে তিনিই ছিলেন আমার গল্পের একমাত্র বিচারক। তিনি হাসলে সকলে হাসতেন, তিনি গম্ভীর হলে সকলে গম্ভীর হতেন;—শুধু সখীরাণী ছাড়া। কেন না ত্রিপুরাসুন্দরীর কাছে ছিল শ্যামদাসীর সাত খুন মাপ। শুধু তাঁরা উভয়ে সমবয়সী বলে' নয়, কতকটা সহধর্ম্মী বলে'ও বটে।

প্রফেসর

তারপর মুখ ফিরিয়ে দেখি পাশে একটি মহা বেরসিক বসে রয়েছেন। তাঁকে দেখে একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—ভদ্রলোকটি কে?

—রায় মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের শ্যালক—নাম ভৃঙ্গেশ্বর ভট্টাচার্য্য, Professor বলেই এখানে গণ্য ও মান্য। তিনি একজন ডবল M.A.,—প্রথম পক্ষে Pure Mathematicsএর, দ্বিতীয় পক্ষে Mixed Philosophyর। Mixed Philosophy এই জন্য বলছি যে, তিনি হিন্দুদর্শন ও বিলেতীদর্শন তেলের সঙ্গে জলের মতন বেমালুম মিলিয়ে দিয়েছিলেন। সে মিশ্র দর্শন উজ্জ্বল নীলমণি ছাড়া আর কেউ গলাধঃকরণ করতে পারত না। এই অতিবিদ্যের ফলে তিনি সত্য কথা ছাড়া আর কিছু বলতেন না। সত্য কথা যে অপ্রিয় হতে পারে, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, অপ্রিয় কথামাত্রই সত্য হতে বাধ্য, আর সে কথা যত অপ্রিয় হবে, তত বেশী সত্য হবে। ফলে তিনি একটি মহা ক্রিটিক হয়ে উঠেছিলেন,—প্রায় আপনারই জুড়ি। আমি একদিন রায়-মহাশয়ের আড্ডায় গল্পচ্ছলে বল্লুম যে, কৃষ্ণ কদম তলায় একা দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছিলেন, আর সেই বংশীধ্বনি শুনে একদিক থেকে রাধিকা আর একদিক থেকে চন্দ্রাবলী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলেন, তারপর পাঁচজনে মিলে মহা গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে। প্রফেসর অমনি নাক সিটকে মন্তব্য করলেন যে,—দুই আর একে তিন হয়, পাঁচ হয় না। এ বিষয়ে দেখি রায় মহাশয় থেকে দেওয়ানজি পর্য্যন্ত সকলেই একমত। তখন আমি বল্লুম—শ্রীকৃষ্ণ যে একে তিন আর তিনে এক। আমার জবাব শুনে রায় মহাশয় বল্লেন "বহুত আচ্ছা!" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নন্?—তাই তাঁর লীলাখেলা হচ্ছে একদিকে সৃষ্টি আর একদিকে প্রলয়। প্রফেসর বল্লেন যে, একে তিন ধর্ম্মে হতে পারে, অঙ্কে হয় না। আমি বল্লুম—গণিতেও হয়. কেননা কৃষ্ণ হচ্ছেন বীজগণিতের X, তাঁকে বিন্দুও করা যায়, তেত্রিশকোটিও করা যায়।—এর থেকে বুঝতে পারছেন তিনি কত বড় ক্রিটিক।

কথারম্ভ

সে যাই হোক, রাণীমার মুখপাত্র হয়ে সখীরাণী আদেশ করলেন যে, আজ একটি আজগুবি গল্প বল। প্রফেসর অমনি বলে' উঠলেন যে,—ঘোষাল মহাশয় যা' বলবেন, তাই আজগুবি হবে। আমি সখীরাণীকে সম্বোধন করে বল্লুম—শুনলেত, আমি যা' বলব তাই আজগুবি হবে, সেই ভরসায় আমি গল্প সুরু করছি। প্রফেসর একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন যে,—ঘোষাল যা বলবে তা শুধু গল্পই হবে—অর্থাৎ গল্প হবে না। তার ভিতর দর্শন বিজ্ঞান কিছুই থাকবে না;—ওরকম গল্প একালে চলে না। এ যুগে কাব্য হচ্ছে শাস্ত্রের বেনামদার।

আমি বল্লুম—তা' যদি হয়ত পণ্ডিত মহাশয় গল্প বলুন, তারপরে আমি শাস্ত্রচর্চ্চা করব।

এ কথা শুনে সখীরাণী খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও,—মায় ঠাকুরাণী। ফলে তাঁদের দন্তরুচি কৌমুদীতে আকাশবাতাসও হেসে উঠল।

তারপর সখীরাণী আবার আদেশ করলেন—এখন গল্প বল, কাল বৈঠকখানায় বসে তর্ক কর'।

আমি মনে করেছিলুম গল্প বলব "অচেতন প্রেমের।" কিন্তু বেগতিক দেখে শেষটা একটা নেহাৎ বেপরোয়া গল্প সুরু করে দিলুম। তার পত্তন করলুম চীনদেশে। কল্পনাকে দিলুম

সে দেশের ঘুড়ির মত উড়িয়ে, আর সেই চীনে মাটির দেশের ফুল ফল ও নরনারীর বাঁকা চেহারার বর্ণনা করলুম। সে সবই এড়ো, সবই তেবৃচা, চীনেদের চোখের মত। বলা বাহুল্য, প্রফেসর কথায় কথায় আমার ভুল ধরতে লাগলেন, Geographyর এবং Botany ইত্যাদির। অতঃপর আমি যখন বল্লুম যে, আমি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েত এখানে উপস্থিত হইনি, আমি এসেছি রূপকথা বলতে। রূপকথার রাজ্য ম্যাপে কোথায় আছে? আমার কথার রূপ আছে কিনা, তার বিচারক মা-লক্ষ্মীরা ও স্বয়ং সরস্বতী।

কথার অপমৃত্যু

তারপর, আমি আমার চীনে নায়ককে উপস্থিত করলুম। নায়কের যেরকম রূপগুণ অলঙ্কার শাস্ত্রমতে থাকা উচিত, তার অবশ্য সে সব ছিল। তার চোখ ছিল, যে চোখ দিয়ে সে দেখতে পারত; কান ছিল, যে কান দিয়ে সে শুনতে পারত; আর যদিও চীনে, তবু তার নাক ছিল। নায়কের রূপবর্ণনা করবার পর আমার অপরাধের মধ্যে বলেছিলুম যে, সে চীনদেশের পাসকরা মুখস্থবাগীশ mandarinদের মত স্থুলদেহ ও স্থূলবুদ্ধির লোক নয়, একটি মানুষের মত মানুষ। এতেই হল যত গোল। প্রফেসর চটে উঠে বল্লেন যে,—"নিজে কখনো স্কুলকলেজে পড়নি বলে তুমি ফাঁক পেলেই বিদ্বান লোকদের বিদ্রূপ কর।" আমি একটু বেসামাল হয়ে বল্লুম,

—আমিও স্কুলে পড়েছি।

—কলেজে?

—আজ্ঞে তাও।

—পাস ত কখনো করনি?

—আজ্ঞে তাও করেছি।

—কি পাস করেছ?

—M. A.

—কোন্ বিষয়ে?

—প্রথমে Mixed Mathematics, পরে Pure Philosophy.

—কোন্ বৎসর?

—Calender-এ আমার নাম পাবেন না। ঘোষাল আমার ছদ্মনাম।

—চুরি করে জেলে গিয়েছিলে বুঝি? বেরিয়ে এসে, পুনর্জন্ম লাভ করে' ঘোষাল রূপ ধারণ করেছ?

—হয় ত তাই। আমি জাতিস্মর নই, পূর্ব্বজন্মের পাতা ওল্টাতে পারব না!

এর পরে তিনি লাফিয়ে উঠে বল্লেন যে—"আমি মিথ্যা-বাদী ও চোরের সঙ্গে এক আসনে বসিনে।"

আমি বল্লুম—যদভিরোচতে।

উপসংহার

এর পরেই তিনি সরোষে চলে গেলেন। ঠাকুরাণী আদেশ দিলেন যে, আজকের মত সভা বন্ধ। পণ্ডিত মহাশয় আর আমি ধীরে ধীরে বাসায় ফিরে এলুম। তিনি হয়ে গিয়েছিলেন অবাক, আর আমি নির্ব্বাক।

তারপর রাত যখন সাড়ে দশটা, সখীরাণী আমার ঘরে উপস্থিত হয়ে বল্লেন যে "ঠাকুরাণী আপনাকে ডাকছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম—এত রাত্তিরে কিসের জন্য?

—সে গেলেই বুঝতে পারবেন।

—তবু?

—শ্যালাবাবু রেগে রায় মহাশয়ের কাছে গিয়ে নালিশ করেছে যে, তুমি ভদ্রমহিলাদের সামনে তাঁকে গায়ে পড়ে অপমান করেছ। রায় মহাশয় তাই শুনে মহা চটে,—তোমার উপর নয়, শ্যালাবাবুর উপর,—রাণীমার কাছে গিয়ে তাঁর ভ্রাতার উপর ঝাল ঝাড়ছিলেন। মীনারাণীও তোমার দিক নিলেন দেখে ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট রায় মহাশয় উল্টা রেগে বল্লেন যে—"ঘোষালটাকে আজই বাড়ী থেকে বার করে দেব।" মীনরাণী বল্লে—"তার আগে একবার ঠাকুরাণীর মত জেনে নাও।" অমনি তিনি ঠাকুরাণীর মন্দিরে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হল। ফলাফল ঠাকুরাণীর কাছেই শুনতে পাবে।

—আচ্ছা যাচ্ছি। তোমার রায় কি?

—ও রসিকতাটা না করলেই ভাল হত। প্রফেসরের যে অজীর্ণ বিদ্যায় মাথা ঘুরে গেছে তা' আমরা সকলেই জানি, —এমন কি মীনারাণীও। তাঁর মত—তোমার কথা সত্যও হতে পারে, রসিকতাও হতে পারে। কিন্তু তুমি ওকথা বলে' ভালই করেছ। মানুষের ধৈর্য্যেরও ত একটা সীমা আছে।

এখন ঠাকুরাণীর মত কি, তা' তুমি তাঁর কাছে গেলেই শুনতে পাবে। আমি জানিনে।

আমি "আচ্ছা" বলে' আবার ঠাকুরবাড়ীতে ফিরে গেলুম, কারণ শুনলুম তিনি সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ঠাকুরাণী আমাকে আসন গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়ে ধীর শান্তভাবে বললেন :—

"আমার বিশ্বাস তুমি সত্য কথা বলেছ, কেননা তুমি যে কৃতবিদ্য, তা প্রত্যক্ষ। ছদ্মবেশ গায়ে যত সহজে পরা যায়, মনে তত সহজে নয়। মন জিনিষটে হাজার ঢাকতে চাইলেও যখনতখন বেরিয়ে পড়ে।

তুমি বোধহয় জানো যে, মীনা আমার আত্মীয়া। যখন দেখলুম যে বিপত্নীক রায় মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষ করতে আর স্বর সয় না, আর বাল্যবিবাহেও তাঁর আপত্তি নেই, বিধবা বিবাহেও নয়—তখন বালবিধবাবিবাহরূপ যুগপৎ অধর্ম্ম থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য মীনাকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করলুম। এ কাজ ভাল করেছি কি না জানিনে। সনাতন ধর্ম্মের বিধি নিষেধ সকলের পক্ষে ভাল হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের পক্ষে নয়। কোন কোন রমণীর স্বধর্ম্ম হচ্ছে ফুটে ওঠা, আর শাস্ত্রের ধর্ম্ম হচ্ছে তাকে ফুটতে না দেওয়া। তাতেই এজাতীয় স্ত্রীলোকের জীবন হয় প্রাণহীন শরীরধারণ মাত্র। একথা অবশ্য ভৃঙ্গেশ্বর বোঝে না। কারণ সে জীবনের মূলও জানে না, ফুলও জানে না। তার বিদ্যে হচ্ছে জীবনের ভাষা ভুলে তার বানান শেখা। সে যাই হোক, তোমায় আজ শেষ রাত্তিরেই এখান থেকে চলে যেতে হবে। কাল সকালে যেন কেউ তোমার দেখা না পায়! এতে তোমারও মর্য্যাদা রক্ষা হবে, ভৃঙ্গেশ্বরেরও শিক্ষা হবে।

রায় মহাশয় তোমার ছ' মাসের ছুটি মঞ্জুর করেছেন; পুরো মাইনেয়। তুমি যেখানে যাও, যেখানে থাকো, শ্যাম-দাসীকে চিঠি দিয়ে জানিয়ো, আর আমাদেরও যদি কিছু বলবার থাকে ত শ্যামদাসী তোমাকে জানাবে।

দেখো, আমার বিশ্বাস কলেজ ছেড়ে, সংসারে ঢুকেই তোমার জীবনে কোন একটা বড় ট্র্যাজেডি ঘটেছিল, আর সেই থেকে তোমার জীবনযাত্রার মোড় ফিরে গেছে। তুমি যে জীবনটাকে প্রহসনরূপে দেখতে ও দেখাতে চাও, সে হচ্ছে ঐ ট্র্যাজেডির বাহ্য আবরণ মাত্র।

আজ তবে এসো। শ্যামদাসী পরে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।"

আমি বাসায় ফিরে আসবার কিছুক্ষণ পরে শ্যামদাসী এসে যথেষ্ট টাকা দিয়ে বললে—"বিদেশে কখনো যদি কোন বিপদে পড়ো আমাকে জানিয়ো, ঠাকুরাণী তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে! তুমি চলে গেলে এ পুরী নিরানন্দ পুরী হবে।"

তারপর থেকেই তীর্থভ্রমণ করছি, অর্থাৎ নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পরশু শ্যামদাসীর একখানি চিঠি পেয়ে কাল কলকাতায় এসেছি। এদিকে শ্যামদাসীও আজ উপস্থিত হয়েছেন। আজ রাত্তিরের ট্রেনেই নাকি মকদমপুর রওনা হতে হবে। আমার সেখানে পদবৃদ্ধি হয়েছে, সে বাড়ীতে আমি এখন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছি। ঠাকুরাণীকে শেখাতে হবে ইংরেজী, সখীরাণীকে সঙ্গীত ও মীনারাণীকে অঙ্ক। ঠাকুরাণী এখন আয়ব্যয়ের হিসাব তাঁর কাছে বুঝিয়ে দিতে চান, সেই জন্যই তাঁর তেরিজ বারিজ শেখা দরকার। দেখেছেন একবার qualificationএর কথা বলে' কি মুস্কিলেই পড়েছি। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলুম যে, দেশের কাজ করতে গেলে কি qualificationএর প্রয়োজন?

—তোমার বিপদটা কি ঘটল, তা ত বুঝতে পারছি নে।

—একটি বালবিধবা আর একটি বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, আর একটি স্বাধীনভর্তৃকা, এই তিনজনের ত্রি-সীমানায় ঘেঁষলে কি বিপদের সম্ভাবনা নেই? সখীরাণী ত আগেই বলেছে যে, আমার বুকের পাটা নেই। আমি ত আর Shelley নই যে, এ অবস্থায় Epipsychidion লিখে পরে ত্রি-রাণী সঙ্গমে ডুবে মরব।

—একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে হয়ত দেখবে যে, এ তিনই এক?

—অর্থাৎ তড়িল্লেখা, তপন ও শশী তিনই এক,—অর্থাৎ আলো। কিন্তু ঐ তিনের মধ্যে এক যদি উপরন্তু বৈশ্বানরময়ী হন?

—সখীরাণী ত আগেই বলেছে ঠাকুরাণী তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তারপর ঘোষাল বললে—তবে আসি, সখীরাণী অনেকক্ষণ আমার জন্য একা অপেক্ষা করছে।

—কোথায়?

—রাস্তায় Taxiতে।

তার পর ঘোষাল au revoir বলে' অন্তর্দ্ধান হলো।

শেষ পর্য্যন্ত আমি বুঝতে পারলুম না যে, ঘোষালের গল্পটি সত্য কিম্বা সর্ব্বৈব রসিকতা—অথবা অসম্বদ্ধ প্রলাপ। আপনাদের কি মনে হয়?

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

যাঁরা সবুজ পত্রে প্রকাশিত "ফরমায়েসি গল্প"র সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এই গল্পোল্লিখিত ঘোষাল সেই গল্পের বক্তা বলে'ই সেকালের পাঠক সমাজে পরিচিত।

মৃত্যুর পারে

শ্রীঅবনীনাথ রায়

তিলোত্তমার যখন পাড়াগাঁয়ে বিয়ে হইল তখন মনে মনে কেহই অসুখী হইল না। দাদা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তিলু, এ ভালই হ'ল যে তুই পাড়াগাঁয়ে পড়্‌লি, সহরের বদ্ধ জায়গায় তোকে মানায় না। সেখানকার অবারিত মাঠ, প্রচুর আলো, খোলা বাতাস—সেই তোর ভাল লাগ্‌বে। তোর কাব্যিক মন সেখানেই ছাড়া পাবে—হয়ত বা দু'চারটে কবিতাও লিখ্‌তে পারবি। সহরে বাড়ীর পাশে বাড়ী, সে রকম জায়গায় তোর দম বন্ধ হ'য়ে যেত।

তিলোত্তমা দাদার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

কিন্তু বিয়ের পর কয়েক মাস যাইতে না যাইতে তিলোত্তমা বুঝিতে পারিল যে পাড়াগাঁয়ের যে মধুর ছবি সে মনের পটে আঁকিয়া রাখিয়াছিল পাড়াগাঁ কেবলমাত্র তাহাই নয়। সেখানে উন্মুক্ত মাঠ আছে সন্দেহ নাই, মাঠের মধ্যে বড় বড় অশ্বত্থ গাছ ক্লান্ত পথিককে ছায়া দানও করে। দিনের বেলা এ সব শোভা তিলোত্তমার মনকে আকর্ষণও করে কিন্তু রাত্রে এই সব বস্তুই ভয়ঙ্কর হইয়া ভীরু বালিকার কণ্ঠরোধ করিতে থাকে।

স্বামী কমলকুমার কোন্ একটা রেলের ষ্টেশনে চাকরি করেন। বিয়ের পর কিছুকাল বাড়ীতে ছিলেন—তাহার পর চাকরি করিতে গিয়াছেন—আর আসেন নাই। বাড়ীতে কেবলমাত্র শ্বশুর এবং শ্বাশুড়ী—শ্বশুর সমস্ত দিন দাবা এবং পাশা খেলা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন—এক খাওয়া-দাওয়ার সময় ছাড়া বাড়ীর মধ্যে তিনি বড় একটা আসেন না। শ্বাশুড়ী খুব রাসভারি লোক—তিনি জানেন বধূর তুলনায় তাঁর পদমর্য্যাদা অনেক বেশি—সুতরাং তিনি অকারণে বধূর সহিত বাক্যালাপ করিয়া নিজের মর্য্যাদার লাঘব করিতে চাহেন না। দুপুর বেলা তিনি নিজের বয়সী সঙ্গিনীদের লইয়া তাস খেলেন—বধূর সেখানে প্রবেশাধিকারও নাই।

বেচারী তিলোত্তমার সময় আর কাটিতে চাহে না। বাড়ীর আশে-পাশে সমবয়সী কেহ নাই—যাহারা আছে তাহাদের বাড়ী অন্য পাড়ায়। তাহারা মাঝে মাঝে আসে—কথাবার্ত্তাও হয় কিন্তু কাহারও সহিত খুব অন্তরঙ্গতা হয় নাই। ছোট দেওর বা ঠাকুরঝি নাই যে তাহারের সহিত ফষ্টি-নষ্টি করিয়া সময় কাটিবে। পড়িতে জানে, পড়াশোনা করিবার ঝোঁকও খুব কিন্তু পাড়াগাঁয়ে লাইব্রেরী আছে কি না সে খবর সে জানে না এবং থাকিলেও বই আনিয়া দিবার লোক কোথায়! ছবি আঁকিতে পারিত, সূচিকর্ম্মেও নাম ছিল কিন্তু এখানে সাজ সরঞ্জামের অভাব। কেহ আগ্রহ করিয়া কিছু আঁকিতেও বলে না, দেখিতেও চাহে না। গান গাহিবার গলা বেশ ভালই ছিল কিন্তু আসিয়াই শুনিয়াছে গান গাহিলে মেয়েমানুষ বিধবা হয়। তাহার পর হইতে আর সে দিকটা ভাবিয়া দেখিবার তাহার সাহস হয় না। এক কাজ ছিল স্বামীকে চিঠি লেখা—তাহাতেই যা' খানিকটা সময় কাটিতে পারিত। কিন্তু স্বামী ঘন ঘন চিঠি লেখেন না—সুতরাং ২।১ দিন অন্তর তাঁহাকে চিঠি লিখিতে তিলোত্তমারও লজ্জা করে। সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে চিঠি লেখেও কিন্তু সেগুলি আর ডাকে দেওয়া হয় না। দু'চার দিন রাখিয়া পরে ছিঁড়িয়া ফেলে।

এই প্রথম সহরের বাহিরে আসিয়া সহরের সহিত পাড়াগাঁয়ের সে তুলনা করিতে পারিল। ছোট বেলা থেকে সহরের জনসংঘের বিচিত্র কর্ম্মলীলাময় সভ্যতার সহিত তাহার মনের মিতালি, 'যাও' বলিলেই একদিনে তাহা যাইবার নয়।

আরও মনে পড়ে বাপ মায়ের স্নেহ, দাদার অনাবিল ভালবাসা। বেচারী তিলোত্তমা এই শামুকডাঙ্গা গ্রামে মনটাকে বাঁধিবার কোন আশ্রয়ই যেন খুঁজিয়া পায় না!

কিন্তু কয়েক মাস পরে এই ভাবটা কাটিয়া গেল যখন সে

জানিল যে তাহার মা হইবার সময় আসিয়াছে,—তাহার সন্তান আসিতেছে। তখন হইতে তাহার মনের ভাব উল্টা মুখে বহিতে সুরু করিল। তাহার ভবিষ্য সন্তান,—তাহার রূপের গুণের, রুচির, কাল্‌চারের উত্তরাধিকারী—বাপ্‌রে সে কি কম কথা! তাহার মধ্যে কত সম্ভাবনা রহিয়াছে যে! তাহাকে সে মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিবে, দেশের জন্য কাঁদিতে শিখাইবে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা থাকিবে তাহার ওষ্ঠাগ্রে, কাহারো মনে সে ব্যথা দিতে পারিবে না—এমনি করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিবে সে!

এইরূপ নানা স্বপ্নের জাল বুনিয়া সময়টা বেশ কাটিয়া যায়। হাতেও নানা দ্রব্য সামগ্রী তৈয়ারি হইতে লাগিল; যে অনাগত, তাহার জন্য ভাবিয়া একজনের ঘুম নাই; তাহার মোজা বোনা হইতে লাগিল, তাহার শয্যা প্রস্তুত হইতে লাগিল, একটা কাল্পনিক মাপ অনুযায়ী তাহার জামা সেলাই করিতেও বাদ পড়িল না!

শ্বাশুড়ীও এখন মাঝে মাঝে বধূর শরীরের খোঁজ খবর লইতে লাগিলেন। তাঁহার কমলকুমারের সন্তান আসিতেছে!

অবশেষে একদিন সেই বাঞ্ছিত পরম মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তিলোত্তমা একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান পুত্র প্রসব করিল। বাড়ীর সকলের আনন্দের আর সীমা নাই। কমলকুমারের কাছেও খবর পাঠান হইল।

কিছুদিন পরে বোঝা গেল পুত্রটির আবির্ভাব তিলোত্তমার পক্ষে একেবারে অবিমিশ্র সুখের কারণ হয় নাই। সেই সময় হইতে তাহার শরীর ভাঙিয়া গেল—যাহা খায় তাহার কিছুই হজম হয় না। শরীরও দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল—এত দুর্ব্বল বোধ হয় যে যেন ছয় মাস ধরিয়া রোগে ভুগিতেছে।

শ্বাশুড়ী বলিলেন, বৌমা, শিশিতে আশু ডাক্তারের ওষুধ থাক্‌লো খেয়ো। আর গন্ধ ভ্যাদালের পাতা সেদ্ধ ক'রে খেতে বলেছে—

সে ঔষধ যেমন বিস্বাদ, প্রতিদিন তাহা সেবন করাও তেমনি বিরক্তকর। নিজের হাতে পথ্য রাঁধিয়া না খাইলেই কি নয়!

বলা বাহুল্য রোগ বাড়িয়াই চলিল। দিনের বেলাটা ত এক রকম কাটে কিন্তু রাত্রি আসিবার পূর্ব্বে তিলোত্তমার বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিতে থাকে। পাড়াগাঁয়ে পায়খানার কোন বালাই নাই—মাঠের দিকে একটু গেলে একটি পুকুর—তাহারই এক পাশে পায়খানার ব্যবস্থা। রাত্রে একলা ঐ পুকুরের পাড়ে যাইতে তিলোত্তমার দারুণ ভয় করে। সেই পুকুরের পাড় থেকে দেখা যায় একটা বড় অশ্বত্থ গাছ—রাত্রে সেই গাছটার দিকে তিলোত্তমা কোনমতেই তাকাইতে পারে না। মনে হয় সে যদি ঐ গাছের দিকে তাকায় তবে কাহারা যেন গাছ থেকে সুড় সুড় করিয়া নামিয়া আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিবে।

এত ভয় কিন্তু তবু সাহস করিয়া শ্বাশুড়ীকে সঙ্গে দাঁড়াইতে যাইতে বলিতে তাহার ভরসা হয় না! ছিঃ, তিনি কি ভাবিবেন! সে যে নূতন বৌ!

মাস তিনেক পরে খবর পাইয়া একদিন কমলকুমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তিলোত্তমা আর বড় একটা উঠিতে পারে না—তাহাকে শয্যা আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

বলিল, তিলু, শরীরটাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছ। আগে আমাকে খবর দাও নি কেন? রোগ এতটা না বাড়িয়ে সময় মত চিকিচ্ছে করা উচিত ছিল।

তিলোত্তমার শীর্ণ মুখে একটু হাসি দেখা দিল। বলিল, কি করবো বল, তোমার রেলের চাকরি—ছুটি পাবে কি ক'রে যে আস্‌বে? আর চিকিচ্ছের কথা বল্‌ছো—তার ত' কই কিছু ত্রুটি হয় নি—মা সমানে আশু ডাক্তারের ওষুধ আনিয়ে দিয়েছেন। কপাল ভাল হ'লে ওতেই সেরে যেত।

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা যা হবার তা'ত হয়েছে—আশু ডাক্তারের যা' চিকিচ্ছে সে আমার অজানা নয়। এখন চল, তোমাকে নিয়ে কল্‌কাতায় যাই, এমন ক'রে এখানে প'ড়ে থাক্‌লে তোমার অসুখ কিছুতেই সারবে না।

তিলোত্তমা চুপ করিয়া রহিল। কমল টেলিগ্রাম করিয়া কলিকাতায় একটি বাসা ভাড়া লইল, এবং দিন দুয়ের মধ্যেই তিলোত্তমাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বিশেষ মনোযোগের সহিত

রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করিলেন যে রোগিনীর পেটের নাড়ী এবং অন্ত্রের মধ্যে ঘা হইয়া গিয়াছে—নিরাময় করিয়া সারান দুঃসাধ্য—তবে চেষ্টা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

তিলোত্তমার দাদা কানাইলাল ভগিনীকে প্রাণের মত ভালবাসিত। খবর পাইয়া সে ভগিনীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেখান হইতেই তাহার প্রাত্যহিক আপিসে যাতায়াত করিতে লাগিল। অবসর সময় ভগিনীর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকাই তখন তাহার একমাত্র কাজ।

তিলোত্তমার অসুখের প্রবলতার জন্য সকলের মনোযোগ তাহার উপরই নিবদ্ধ ছিল, তাহার ছেলেটির উপর যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় নাই। একেত জন্মের পর হইতেই মা রোগে ভুগিতেছে, মায়ের দুধ যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পায় নাই—তাহার উপর কলিকাতার ভেজাল দুধ খাওয়ানোর ফলে তাহার পেট একেবারে ছাড়িয়া দিল। তখন মাতাপুত্রের ঘটা করিয়া চিকিৎসা হইতে লাগিল। পুত্রটিকে পাশের ঘরে পৃথক রাখার বন্দোবস্ত করা হইল।

কয়েক দিন ঔষধ খাওয়ানোর ফলে তিলোত্তমার সবিশেষ উন্নতি দেখা গেল। ডাঃ রায় বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথ, তিনি খুসি হইয়া বলিলেন, আপনারা আর বেশী উতলা হবেন না, রোগী react করেছে—এবার ফল হ'তে দেরি হবে না। শুধু ওষুধের জন্যে নয়, রোগীর মন প্রফুল্ল থাকার জন্যেও ফল পাওয়া গেছে। আপনারা কেবল সেইটুকু দেখ্‌বেন—ওঁর মনের প্রফুল্লতা যেন বজায় থাকে।

ডাক্তারের কথায় এতদিন পরে বাসার একটা চাপা গুমোট ভাব কাটিয়া গেল।

তিন চার দিন পরের কথা। হঠাৎ শেষরাত্রে তিলোত্তমার খোকার বুকের ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ হইতে লাগিল। কানাই-লাল তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিলেন—দেখিলেন খোকার চোখ উল্টাইয়া গিয়াছে, বুকের কাছে ছোট্ট প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ করিতেছে মাত্র। হাত পা সব ঠাণ্ডা।

হাত পা গরম করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন সবই করা হইল কিন্তু খোকার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। পূর্ব্ব দিগন্তে ঊষার আভাস দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ছোট্ট প্রাণটুকু বাহির হইয়া গেল।

সকালে জাগিয়াই তিলোত্তমা বায়না ধরিল খোকাকে দেখিবে। কমলকুমার আশ্বাস দিলেন, খোকা ঘুমাইতেছে, পরে লইয়া আসিবে। তিলোত্তমা কিছুতেই শুনিবে না। অবশেষে কানাইলাল আসিলেন, বলিলেন, আমি এখন আপিসে যাচ্ছি, ওবেলা আপিস থেকে এসে খোকাকে নিয়ে আস্‌বো এখন। এখন তাকে ঘুমের মধ্যে তুলে দরকার কি?

বিকালবেলা আপিস থেকে ফিরিতেই তিলোত্তমা পুনরায় বায়না ধরিল, খোকাকে দেখাও। ইতিমধ্যে কমলকুমার এবং কানাইলালের মধ্যে পরামর্শ হইয়া গিয়াছিল। কানাইলাল বলিলেন, ওমা, ওকে ফাঁকি দিয়ে ক'দিন রাখা যাবে? ও প্রতিনিয়তই যদি এই রকম ছেলে ছেলে ক'রে হেদোয়, তবে ওর নিজের শরীরও সারবে না। তার চেয়ে জানিয়ে দেওয়াই ভাল—তাতে প্রথমটা হয়ত খুব লাগ্‌বে কিন্তু সাম্‌লে গেলে পরে ফল ভাল হবে। আর অনিশ্চিত দোটানার মধ্যে থাক্‌লে ফল সুবিধের হবে না।

বলা বাহুল্য এর উত্তরে কমলকুমারের বলার কিছু ছিল না। কানাই তিলোত্তমাকে বলিল, ছেলে ছেলে করচিস্ তিলু, ছেলে কি তোর?

তিলোত্তমা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, তার মানে?

'মানে হচ্চে এই যে যাঁর ছেলে তিনি তাকে নিয়ে নিয়েচেন।'

তিলোত্তমা আর কিছু বলিল না—দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল মাত্র। কি হইয়াছিল, কখন মরিল সে কথাও যেমন জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল কিনা তাহাও তেমনি দেখা গেল না।

সেই রাত্রে তিলোত্তমার রক্তভেদ হইতে লাগিল। ডাঃ রায় আসিয়া বলিলেন, সর্ব্বনাশ হয়েচে, ঘায়ের মুখগুলি সব খুলে গেছে। আর রক্ষা নাই। এই খানেই ডাক্তারের মার—তার জীবনের ট্র্যাজেডি। আর কোন উপায়ই আমাদের হাতে নেই। এখন শেষ মুহূর্ত্তের জন্য নীরবে প্রতীক্ষা করতে হবে।...কিন্তু কি ক'রে এমন ঘট্‌লো?

কানাই সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। ডাক্তার কহিলেন, এ দেখ্‌চি বিধাতার মার—আমাদের সাধ্য কি আমরা এর

কিছু উল্টোই? নয়ত রোগীকে ত আরোগ্যের পথে নিয়ে এসেছিলুম।

ইহার পর আরও পনেরো দিন সে বাঁচিয়া ছিল কিন্তু তাহার প্রতিদিনের মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার করুণ কাহিনী বিবৃত না করাই ভালো। একেবারে শেষ দিনের কথাটাই বলি।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রদীপের অল্প আলো মৃত্যুপথ-যাত্রিনীর মুখে পড়িয়াছে। সে মুখ রক্তলেশহীন—পাণ্ডুর। কানাই ভগিনীর শিয়রে দিনরাত বসিয়া আছে। ইতিমধ্যে বাপ মা আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। সকলেই যখন কান্না চাপিতে পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়াছেন কানাই তখনো নির্ব্বিকার ভাবে ভগিনীর শিয়রে বসিয়া। যেন একাকী মৃত্যুর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ অনুসরণ করিতেছে।

ইতিমধ্যে একদিন শ্বশুর আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। আসিয়াই হাঁউ মাউ করিয়া কান্না! ওগো আমার এমন গুণের বৌমা আমি কোথায় পাব গো—ইত্যাদি। কানাই অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুড়াকে পাশের ঘরে সরাইয়া দিয়াছে। সময় থাকিতে যে একদিনের তরেও বধূর ভাল মন্দের ভার গ্রহণ করে নাই সে আজ তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে আসিয়াছে। শান্তিতে মরিতেও দিবে না।

কানাইয়ের হঠাৎ মনে হইল তিলোত্তমার চোখ দুটি যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে। তাড়াতাড়ি কমলকুমারকে ডাকিয়া পাঠাইল। কথা আগেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু জ্ঞান ছিল পুরামাত্রায়। কমল যে দিকে আসিয়া দাঁড়াইল তিলোত্তমা তাহার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল; কমল আসিতে কানাই তিলোত্তমাকে ডাকিয়া কহিল, তিলু, এই যে কমল এসেচেন। তিলোত্তমা তাড়াতাড়ি অপর দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে গেল। কমল ইতিমধ্যে আবার যেদিকে তিলোত্তমার চোখ ছিল সেই দিকে আসিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। কানাই আবার বলিল, তিলু, এই দিকে। তিলোত্তমা আবার বিপরীত দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে গেল কিন্তু দেখার আগেই এই পরিশ্রমের ফলে তাহার প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পলাইল।

ত্রিতল বাড়ী। কমলকুমার তর তর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া তেতালার ছাদে উঠিয়া গেল এবং কান্নার বেগ প্রশমিত করিবার জন্য একটা সিগ্রেট্ ধরাইল।

হঠাৎ সে দেখিতে পাইল লাবণ্যময়ী তিলোত্তমা তাহার সুমুখে দাঁড়াইয়া। দেহে রোগ-ভোগের কোন চিহ্ন নাই; একখানা চওড়া লাল পেড়ে সাড়ী পরণে, তাহার টক্‌টকে লাল পাড়টা যেন জল্ জল্ করিতেছে। বলিল, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? আমি যে তোমাকে কত খুঁজে বেড়াচ্চি। বলিয়া কমলকুমারকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল।

একটা গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দে সচকিত হইয়া কানাই ছাদে আসিয়া দেখিল কমল অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। চোখে মুখে জল ছিটাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে কমলকুমারের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে কানাইকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। তাহার পর দুঃখিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, সে আবার আসে না? আবার সেই রকম জড়িয়ে ধরে না? তার শরীরের স্পর্শ যে আমি সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করেছি।

সেই রাত্রে তিলোত্তমার মৃতদেহ যখন শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল তখন কমলকুমার সারাপথ এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে গেল, যদি কোন বাড়ীর ছাদ হইতে বা কোন গলির মোড় হইতে, কোন রাস্তার বেঁক হইতে তিলোত্তমা তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে!

শ্রীঅবনীনাথ রায়

———

কবি ও কাব্য পরিচয়

শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

মানুষের সঙ্গে মানুষ কথা বলে। তাহাতে নানা রকম ভাবের আদান প্রদান হয়। সেই জন্য মানুষের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই নানা রকম ভঙ্গী বা ইঙ্গিত। তাহা দ্বারা আমরা হৃদয়ের ভাষা বুঝি ও অন্তরের সুর ধরিতে পারি।

মানুষ ছাড়া আমাদের পারিপার্শ্বিক পশু পাখীর মধ্যেও হর্ষ-বিষাদের ভঙ্গী বা সুর আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি; এইরূপ প্রত্যেক বস্তু ব্যক্তি বা প্রাণীর মধ্যেই হয় ভঙ্গী, না হয় ভাষা, না হয় কোন একটা সুর আছেই আছে এবং তাহা দ্বারা অবিরাম ভাবের প্রকাশও হইতেছে।

সাধারণ লোকের স্থুলদৃষ্টি হয়ত বা বিশ্বের বিভিন্ন প্রকাশ-ভঙ্গী দেখিতে পায় না, শ্রুতি সকল কথা বা সুর ধরিতে পারে না; তাই আকাশ, বাতাস, পশু, পাখী, উদ্ভিদ্ জল স্থল প্রভৃতি বিশ্ব চরাচরে সকল মানুষ সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে এবং সকলের সঙ্গে সহজে হৃদয়ের যোগ সাধন করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা বৃক্ষের ভঙ্গী, পত্রের মর্ম্মর, বনের দোলন, আকাশে রঙের খেলা, বাতাসের শব্দ, গ্রহ নক্ষত্র ও বালুকণার বিভিন্ন প্রকাশ ও জীব-জগতের মর্ম্ম কথার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির বাণী রূপ ও রস উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহারা কবি। তাই ত কবি ঘন মেঘকে দূত সাজায়, বাতাসকে অভিনন্দন জানায়, আকাশকে নমস্কার করে, ফুলের হাসি দেখিয়া পুলকে নাচিয়া উঠে ও বর্ষার মেঘমল্লার কদম্ব বন ব্যথিয়া তোলে।

মানুষ মানুষকে বুঝিতে হইলে তাহার অনুকূলে অনেকগুলি উপায় আছে। ভাষা, ভঙ্গী, ইঙ্গিত, সুর, সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি নানা ভাবের ভিতর দিয়া মানুষ মানুষের সঙ্গে অনেকটা পরিচিত। তাহার পরে পশু ও পক্ষী ইতর প্রাণীর জগতে তাহাদিগকে বুঝিবার জন্য মানুষের অনুকূলে এতগুলি উপায় নাই। তাহাদের আছে নীরব প্রকাশ ভঙ্গী এবং তাহার মধ্যে কাহারও আছে অপরিচিত কণ্ঠস্বর। উদ্ভিদের মধ্যে কেবলই নীরব প্রকাশভঙ্গী। তাহা ছাড়া আকাশ, বাতাস, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির মধ্যে কবি স্বয়ং ভাবের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে ভঙ্গিমাময় মানসী প্রতিমাকে প্রাণবন্ত করিয়া দেখেন, বোঝেন ও তাহার সঙ্গে নানা আলাপ করিয়া ভাবের আদান প্রদান করেন। অতএব কবির জগতে অপ্রাণীবাচক কিছুই নাই।

কবি শুধু রূপ বা রস স্রষ্টা নহেন। তিনি জড় ও মৃতের মধ্যে প্রাণদান করিয়া তাহার মাধুর্য্য বা বিভা বিশ্ববাসীকে পরিবেশন করিবার অধিকারী।

কবির কল্পলোকে মিথ্যা বলিয়া কোন কিছু নাই। মৃত্যুকে কবি স্বীকার করেন না। দেহকে বাদ দিয়া যদি কবিকে বিচার করা যায়, তাহা হইলে হৃদয়ের ব্যাপারে কবি অটুট, অম্লান, চিরসুন্দর, দীপ্তিময়, অক্লান্ত ও বেগবান্। যেই কবি-হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের উন্মেষ হইয়াছে তাঁহার হৃদয়ের অনুভূতি অসীমের মাঝখানে আত্মহারা হইয়াছে।

কবির স্থান অন্তর-জগতে। হৃদয় ও মন লইয়া কবির কারবার, তাই বাহিরিন্দ্রিয়ের চৌকাঠে আবদ্ধ দেহকে বাদ দিয়া শুধু হৃদয়ের রাজ্যেই কবিকে বিচার করা হইল।

কাব্যেই কবির হৃদয় ও রূপ প্রকাশিত। তাহাতেই তাঁহার অন্তরদীপ্তি ও অনুভূতির বিকাশ। কবি-জীবনীর সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ না-ও থাকিতে পারে। তাহাতে কিছু আসে যায় না। কবি ও ভাবুক যে কর্ম্মী হইবেই ইহার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই।

জীবনীর সীমা স্থুল দেহের জীবনকাল ব্যাপিয়া স্থুল দৃষ্টির কার্য্যকারণের মধ্যে; কিন্তু অন্তরের অসীম রূপ-ঐশ্বর্য্য ও কল্পনার সৃষ্টি-রহস্য ইহার সঙ্গে অতুলনীয়। সাধারণতঃ কবি বলিতেই আমরা কোন একটা ব্যক্তি বিশেষকে বুঝিতে গেলে

ভুল বুঝিব। কবি ব্যক্তি বিশেষের অন্তর-অমরাবতীতে সৌন্দর্য্য-রসের ভাব বা কল্পনার রূপ। ইহা দেহের মধ্যেই দেহাতীত, সীমার মধ্যে অসীম এবং অরূপের মধ্যে সরূপ। অতি নগণ্য শুক্তির মধ্যে দুর্ম্মূল্য মুক্তার মাধুর্য্যের মত সাধারণ জীবনের অন্তরালে কবি-প্রতিভা বিরাজ করে। অতএব কবি চিনিতে হইলে কবির বাহ্যিক জীবন লইয়া নাড়া চাড়া করিলে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইতে হইবে।

এই যে মানুষের অন্তর্নিহিত কবি-পুরুষটি বিশ্বের সমগ্র সৌন্দয্য, রস ও মাধুর্য্যের সঙ্গে আপনার অচ্ছেদ্য যোগ সাধন করিয়া বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি ক্ষুদ্র নহেন, সামান্য নহেন। সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সঙ্গে যেমন ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর জলের বৃদ্ধি ও সল্পতা পরিলক্ষিত হয় এবং নিত্য প্রবাহে সমুদ্রের সঙ্গে ইহার প্রাণরসের আদান প্রদান চলিতে থাকে, সেইরূপ মানব-জীবনের অন্তরালে যে-কবি থাকেন তাঁহার সঙ্গে বিশ্ব-কবির অবিরাম সৃজনানন্দ রসের সম্বন্ধ ও আদান প্রদান চলিয়াছে।

যদি প্রশ্ন ওঠে এই কবি-পুরুষটি প্রত্যেক মানুষের অনুভূতির রাজ্যে আছে কি না? তাহা হইলে উত্তরে বলিতে হইবে ইহা আছে, কিন্তু সর্ব্বত্র ইহার প্রকাশ নাই। অতএব যেখানে ইহা প্রকাশিত নহে সেখানে ইহার থাকা না থাকা দুইই সমান। যেমন সকল শুক্তির মধ্যে মুক্তা দেখা যায় না, অথচ মুক্তা শুক্তির মধ্যেই উৎপন্ন হয় বলিয়া মুক্তার অলক্ষিত ও অপরিণত অবস্থা তাহার মধ্যে রহিয়াছে বলিলে অযৌক্তিক হয় না; সেইরূপ তথাকথিত অকবি লোকের মধ্যেও বিশ্ব-কবির অস্তিত্ব একেবারে নাই বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। হয়ত সময় বা অবস্থার পরিণতিতে এখনও ইহার কোন স্ফুরণ হয় নাই। অতি সঙ্কীর্ণ খালে বিলে সমুদ্রের জোয়ার ভাটা আসিয়া তরঙ্গের দোল না-ও দিতে পারে, তাই বলিয়া জল-রেখার যোগ যে সেই বিরাটের সঙ্গে রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অনুকূল অবস্থায় পড়িলে এই সূত্র ধরিয়াই নালা বিল দিন রাত্রি নাচিতে নাচিতে কুল ভাঙ্গিতে পারে ও বন্যা আনিতে পারে। এরই জন্য বিশ্বকবির সৌন্দর্য্য যাঁহারা অনুভব করেন, তাঁহাদের কাছে নিরর্থক কিছুই নাই। লোক চক্ষুর গোচরে ও অগোচরে তাঁহাদের কল্পনার গতিবিধি দৃষ্টি ও অনুভূতি।

এইত হইল অন্তর-কবির অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা। তাহার পরে এখন বিচার করা যাউক ইহার প্রকাশভঙ্গী কিরূপ। কি পোষাক ও কি অঙ্গ-সৌষ্ঠব লইয়া আমাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলে ইহাকে কবির কাব্য বলিয়া বরণ করিব।

যেখানে দেখিব ভাবের প্রকাশ বা কল্পনার অভিব্যক্তি কেবল সাদা সিদা সহজ ও নগ্নরূপে দৃষ্টি, শ্রুতি ইত্যাদির যে কোন এক ইন্দ্রিয় পথে একটানা মনে গিয়া হাজির হয় অথচ অন্যান্য একাধিক ইন্দ্রিয়গ্রাম এমনি উপেক্ষিত হইয়া থাকে যে, উহারা সেই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিত বা মধুর হইয়া উঠিতে পারে না; তখন সেই প্রকাশকে আমরা কাব্যের পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি না। তাহাকে সাধারণতঃ দর্শন, বিজ্ঞান বা অন্য যে কোন প্রকাশের পর্য্যায়ে রাখা যাইতে পারে। সাদা সিদা পোষাকে পুরুষের সভ্যতা হানি হয় না। নারীর পোষাকে একটু ঠান-ঠমক চাই। তাহাদের হৃদয় লইয়া কারবার। হৃদয় হঠাৎ চোখে পড়ে না বলিয়া অনেক আয়োজন করিয়া তাহাকে প্রকাশ করিতে হয়; তাই নারীর পোষাকের আড়ালে সৌন্দর্য্য বিকাশের একটা স্বাভাবিক চেষ্টা আছে। আর পুরুষের পোষাক কাজ চলা গোছের হইলেই যথেষ্ট। কাব্যও সেইরূপ ভঙ্গীর দিক দিয়া নারী-ধর্ম্মী। ইহা সকল ইন্দ্রিয়কে সচেতন করিয়া ভাব ও কল্পনার সঙ্গে রস পরিবেশন করিয়া চলে। আর কাব্য ছাড়া অন্যান্য ভাব প্রকাশে কোন রকমে বক্তব্য বুঝাইতে পারিলেই কর্ত্তব্য শেষ হয়।

কাব্যরসের পরিবেশন শুধু যে ছন্দোবদ্ধ কবিতার মধ্য দিয়াই হইবে এমন কোন কথা নাই। তাহা গদ্য লেখার মধ্যেও চলিতে পারে এবং সঙ্গীতে, নৃত্যে, অঙ্কনে, গড়নে, কথনে সকল ভাবেই কাব্যের সার্থকতা হইতে পারে।

কবির কাব্য-সৃষ্টির সঙ্গে স্বপ্নলোকের তুলনা চলিতে পারে। আমরা ঘুমন্ত অবস্থায় যখন স্বপ্ন দেখি সেই স্বপ্নের ছবির সঙ্গে বাস্তবের হুবহু মিল সমগ্র ভাবে নাও হইতে পারে; অথচ টুকরো টুকরো বাস্তব সৌন্দর্য্য মিলাইয়া মধুর কল্পনার মত এমন একটি নূতন সৃষ্টির অবতারণা হয় যে তাহাতে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সেই স্বপ্নকালে খুব স্পষ্ট হইয়া ইহাকে উপভোগ করে, এবং ঘুম ভাঙিলে

অনেক সময় মনে হয়, এমন সৌন্দর্য্য-অনুভূতির মধ্যে সমগ্র জীবন কাটাইয়া দিতে পারিলে জীবন সার্থক হইত; এই ঘুম না ভাঙিলেই মধুর হইত। সেইরূপ কাব্য-সৃষ্টিতেও পাঠকের মনে যখন স্বপ্নের সৌন্দর্য্য আসিয়া পটবিস্তার করিতে থাকে তখন বুঝিতে হইবে কাব্য সফল হইল।

সৌন্দর্য্য ও রসের উপভোগ প্রকৃত কবি-মন চঞ্চল বা মত্ত হইয়া উঠে না এবং গভীর অনুভূতির মধ্যে ইহা স্তব্ধ হইয়া যায়। সৌন্দর্য্যকে পাইবার জন্য কবির ব্যস্ততা নাই, সৌন্দর্য্যই অহনিশি কবি-মনকে ঘেরিয়া আছে।

সহস্ত হৃদয় মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম যদি একযোগে উপভোগ করিবার মত সামর্থ্য পায়, তাহা হইলে সেই উপভোগে স্তব্ধ না হইয়া আর উপায় কি? চক্ষু যেই সৌন্দর্য্যকে নিখুঁত ভাবে দেখিতে থাকে, কাণ তাহার মধ্যে সুর বা সঙ্গীত শুনিতে পায়, দেহে তাহার স্পর্শের অনুভূতি জাগে, রসনায় অমৃত-রস সঞ্চারিত হয়, তাহার রমণীয় গন্ধে মর্ম্ম বিভোর হইয়া পড়ে; সেই কবিত্বের উপাদান ফুল হউক, পাতা হউক, আকাশ, বাতাস, মেঘ, বারি কিম্বা নর, নারী বা অন্য কোন প্রাণী অথবা অন্তরোত্থিত যে কোন ভাব হউক; তাহাই কবির প্রিয়তম বা অন্তরঙ্গ হয় ও একযোগে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহী হইয়া পড়ে। রস বিনোদনে ইহা কবিকে লইয়া একান্ত নিবিড় ভাবে মধুর খেলায় মসগুল হইয়া থাকে। বিশ্বের এই পরম রমণীয় কবিতা-রূপসী তাহার দশবাহু বিস্তার করিয়া কবিকে যখন ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে স্পর্শ দিতে থাকে তখন সে তাল ভঙ্গী ও সুর-সঙ্গীতে চঞ্চলা, কিন্তু কবি-মন সেই মধুর রসগ্রহণে তৃপ্ত ও স্তব্ধ। সেই সময়ে কবি যেন বিশ্বে থাকিয়াও বিশ্বছাড়া কোন এক রমণীয় লোকে অবস্থান করেন।

শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

সনেট্ *

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

আমারে স্মরিয়ো তুমি যবে আমি দূরে যাবো চ'লে,
চ'লে যাবো বহুদূরে নীরব প্রদেশে; বাহু-পাশে
যবে তুমি নারিবে বাঁধিতে মোরে; ফিরিবার আশে
দাঁড়াবো না ফিরে তবু র'বো প্রতীক্ষিয়া। কোনো ছলে
আর তুমি কহিতে নারিবে যবে আমার সকাশে
আমাদের ভবিষ্যৎ যাহা তুমি কল্পনার বলে
রচিয়াছো মনে, তখন স্মরিয়ো মোরে; হৃদিতলে
বুঝিবে তখন, মোর সঙ্গ তব নিষ্ফল প্রয়াসে।
যদি তুমি ক্ষণতরে ভুলে যাও মোরে, তার পরে
মনে পড়ে, তথাপি তাহার লাগি' করিয়ো না শোক।
অতীতের অন্ধকার বিশ্লেষিয়া পাবে কি আলোক?
তারা যদি রেখে যায় মোর স্মৃতি-ছায়া-চিহ্নখানি!
আমারে ভুলিয়া তুমি সুখ যদি পাও ক্ষণতরে;
আমারে স্মরিয়া তব দুঃখ পাওয়া চেয়ে শ্রেয় মানি।

---

* Christiana Rosseti.

সুভদ্রাঙ্গী

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্‌-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

১

আজ আশ্বিনমাসের পূর্ণিমা—চাতুর্মাস্য ব্রতের উদ্যাপনের দিন। চম্পানগরের * গগ্‌গরা-সরোবর নামক বৃহৎ জলাশয়ের চতুঃপার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ বৃক্ষবাটিকা মধ্যে আজ কয়েকদিন থেকে মেলা বসেছে। চম্পানদী নামক একটী ছোট নদীর উপর চম্পানগর অবস্থিত। এই নদীটী কয়েক ক্রোশ উত্তরে গিয়ে গঙ্গায় পড়েছে। বৃক্ষবাটিকাটী চম্পানদীর তীর পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং নানাজাতীয় পুষ্প-বৃক্ষে সুশোভিত। চাঁপাগাছের সংখ্যা অধিক বলে সম্ভবতঃ এই নগরের নাম চম্পানগর। নদীর বাঁকের উপর অবস্থিত থাকাতে এই নগরটী উপদ্বীপের ন্যায় এবং পরপারের শ্যামল বনানীপূর্ণ অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত থাকাতে স্থানটী অতি মনোরম। অনেক ভিক্ষু, সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক এখানে এসে এখানকার প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে বৃক্ষ বাটিকার নদী-তীরস্থ অংশে আরাম (আশ্রম) নির্ম্মাণ ক'রে বর্ষা কাল অতিবাহিত করেন।

আজ এই পুণ্য তিথিতে বহুদূরস্থ গ্রাম সমূহ থেকে অসংখ্য নরনারী পবিত্র সলিলে স্নান এবং মেলায় আনন্দ করবার অভিপ্রায়ে এখানে এসেছে। বাগানের নানা অংশে দর্মা, চট বা কাপড়ের ছাউনীর নীচে নানা দ্রব্যের দোকান শ্রেণী-বদ্ধভাবে নির্ম্মিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। কোথাও খেলনা, কোথাও খাবার, কোথাও নানাজাতীয় ফল, কোথাও সিন্দুর, আয়না, চিরুণী, আলতা ইত্যাদি স্ত্রী-প্রসাধন; কোথাও নানা রঙের শাড়ি, কাঁচলী, নীবীবন্ধ ইত্যাদি; কোথাও কাঁসা ও রূপার অলঙ্কার; কোথাও পিতল ও কাঁসার বাসন; কোথাও কড়া, হাতা, কোদাল, কুড়ুল ইত্যাদি; কোথাও চন্দনের তেল, ফুলের তেল, কেওড়া ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য, কোথাও ফুল ও ফুলের গহনা; কোথাও পান, সুপারী, এলাচ, কর্পূর, চোয়া ইত্যাদি বিক্রীত হচ্ছে। যে দ্রব্য যাকে আকৃষ্ট ক'রছে সে তার জন্য ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শরৎকাল। মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোলে বৃক্ষ-শাখা সকল কম্পিত; প্রস্ফুটিত পীত চম্পক-পুষ্পের সৌরভে উৎসবস্থান পরিপূর্ণ। শেফালী-বৃক্ষসমূহের নীচে যারা উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান তাদের মাথায় এবং দোকান-ঘরগুলির ছাউনীর উপর রক্ত-বৃন্তযুক্ত শ্বেত-শেফালী পুষ্পের বৃষ্টি হ'চ্ছে। নানা স্থানে নানা আমোদ-প্রমোদ—নট নটীদের নৃত্যগীত, যুবকদের ব্যায়াম-কৌশল-প্রদর্শন, দ্যূত ব্যসনীদের দ্যূতক্রীড়া—চল্‌ছে।

মেলার স্নান-ঘাটের উপর এক চাতালে ব'সে এক জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ প্রার্থিগণের ভাগ্য গণনা করে দিচ্ছিলেন। অনেকে নিজ নিজ ভবিষ্যৎ জানবার জন্য তাঁর নিকট আস্‌ছিল এবং গণনান্তে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে যৎকিঞ্চিত প্রণামী দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। সন্ধ্যার পর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিজ কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হ'লেন। দেখলেন কোন ভীড় নাই—পরীক্ষা প্রার্থীরা সব চ'লে গিয়েছে। তাঁদের সমাগত দেখে জ্যোতিষী ঠাকুর ঐ ব্রাহ্মণকে বললেন, "আপনি কি হাত দেখাতে চান?" ব্রাহ্মণ ব'ললেন, "না, ঠাকুর, আমার এই কন্যার ললাটে বিধাতা কি লিখেছেন, অনুগ্রহ ক'রে দেখে দিন।" এই ব'লে ব্রাহ্মণ তাঁর কন্যার বাঁ হাতখানি টেনে দৈবজ্ঞ ঠাকুরের সম্মুখে প্রসারিত ক'রে দিলেন। দৈবজ্ঞ অনেকক্ষণ ধ'রে হাতের রেখাগুলি অতি মনোযোগের সহিত পরীক্ষা ক'রে কন্যার মুখ, ললাট, কেশ ও শারীরিক গঠনও নিরীক্ষণ ক'রলেন। যৌবনোন্মুখী কন্যা লজ্জা বশতঃ দৃষ্টি অবনত

* চম্পানগর প্রাচীন অঙ্গদেশের একটী নগর। এখনকার ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলার দক্ষিণাংশ অঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল। শিশুনাগ বংশীয় রাজাদের সময় অঙ্গদেশ মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। এই বৃত্তান্তটী চন্দ্রগুপ্ত-পুত্র বিন্দুসারের সময়।

করলে। জ্যোতিষী দেখলেন যে, তার শরীরের কান্তি অসাধারণ, এবং বল্‌লেন, "গণনা ব্যবসায়ে আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি, কিন্তু এরূপ সুলক্ষণা ও সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যা কখন আমার দৃষ্টি গোচর হয়েছে ব'লে মনে হয় না।"

ব্রাহ্মণ বল্‌লেন, "ঠাকুর কি দে'খলেন বলুন।"

জ্যোতিষী—এর শরীরে সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের সব লক্ষণই বিদ্যমান। হাতের চক্রচিহ্ন দেখে অনুমান হয় যে, এ রাজমহিষী হ'বে।

ব্রাহ্মণ—এ কি পুত্রবতী হবে?

জ্যোতিষী—দুটী পুত্রের জননী হ'বে; একটী পরাক্রান্ত সম্রাট হ'য়ে স্বীয় দয়া ও সদ্‌গুণের জন্য বিখ্যাত হবে, অপরটী ধর্ম্মজীবন লাভ ক'রে ভিক্ষু হ'বে।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যার নেত্র উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁদের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হ'ল। তাঁরা ভাবলেন, এ কি সম্ভব? জ্যোতিষী ঠাকুরের ভবিষ্যদ্‌বাণী ঠিক নয়—তাঁর গণনায় ভুল হয়েছে। গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ের রাণী হওয়ার সম্ভাবনা কোথা?

২

পূর্ব্বোলিখিত গরীব ব্রাহ্মণের নাম নারায়ণ শর্ম্মা—বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসর। এককালে তিনি সুপুরুষ ব'লে গণ্য ছিলেন, কিন্তু এখন দারিদ্র্যে, শোকে ও দুশ্চিন্তায় তাঁর সে জ্যোতি মলিন হয়ে গিয়েছে। তাঁর বাড়ী চম্পানগরের উত্তর প্রান্তে—ব্রাহ্মণ-পল্লীতে। এই পল্লীটী বেশ ফাঁকা ও নিরিবিলি। পনর ষোল কাঠা জমির উপর তাঁর মাটীর দেয়ালের খোড়ো ঘর—একখানি অপেক্ষাকৃত বড়, আর একখানি ছোট। বড়-খানি শয়ন ঘর—দুপাশে দুটী দাওয়া,—একটী উঠানের দিকে, অপরটী বাইরের দিকে। ছোট ঘরখানি রান্না ও ভাঁড়ার-ঘর,—উঠানের দিকে তার একটী দাওয়া। উঠানের বাইরে একপাশে কয়েকটা আম ও দুটা তালগাছ, আর একপাশে দু-তিন ঝাড় কলাগাছ এবং বাইরের দাওয়ার সামনে একটা প্রকাণ্ড মহুয়া গাছ।

নদীর অপর পারে নারায়ণ শর্ম্মার কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি, এবং চম্পানগরে কয়েক ঘর যজমান আছে। ভাগে বিলি ক'রে জমি থেকে যে ত্রিশ-চল্লিশ মন ধান,—মনটাক্ অড়হর ও আধমনটাক্ গুড় পান এবং যাজকতা ক'রে যা কিছু সামান্য আয় হয়, তাই দিয়ে কষ্টে সৃষ্টে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অজন্মা হ'লে কষ্টের আর সীমা থাকে না। আজ চার বৎসর হ'লো তাঁর পত্নী-বিয়োগ হ'য়েছে। এখন সংসারে কেবল তিনি ও তাঁর কন্যা সুভদ্রাঙ্গী। মাতার মৃত্যুর সময় সুভদ্রার বয়স বার বৎসর ছিল। রন্ধনাদি সমস্ত গৃহকর্ম্ম এখন সুভদ্রাই করে।

পরদিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গতেই জ্যোতিষীর ভবিষ্যদবাণী নারায়ণ শর্ম্মার মনে পড়্‌ল। তিনি মনে মনে তোলাপাড়া ক'রতে লাগলেন, "ভদ্রা রাজ-মহিষী হ'বে, আর তার ছেলে সম্রাট হ'বে। এ কি কখন সম্ভব? এ পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি? যে ব্যক্তি অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তার মেয়ে কিনা রাজবধূ হ'বে—দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করবে!"

তিনি এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় তাঁর প্রতিবাসী শঙ্কর মিশ্র এবং চম্পানগরের প্রধান অধ্যাপক ও অঙ্গদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রমৌলী শাস্ত্রী তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লেন। নারায়ণ বাইরের দাওয়ায় তালের চেটাই পেতে সাদরে তাঁদের বসালেন। শঙ্কর মিশ্র ব'ল্‌লেন, "নারায়ণ ভায়া, কাল সন্ধ্যার পরে কোথায় ছিলে? আমি তোমার বাড়ী এসে কোন সাড়াশব্দ পেলাম না"।

নারায়ণ—কাল বিকালে ভদ্রাকে মেলা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ঘু'রতে ঘু'রতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একজনের মুখে শুনলাম যে এক জ্যোতিষী-ব্রাহ্মণ মেলার স্নান ঘাটের এক চাতালে ব'সে লোকের ভাগ্য ব'লে দিচ্ছেন। যদিও রাত হ'য়ে গিয়েছিল, তথাপি ভারি কৌতুহল হ'ল—জ্যোতি-ষীকে দিয়ে সুভদ্রার হাত দেখাবার ইচ্ছা দমন ক'রতে পা'রলাম না—সুভদ্রাকে নিয়ে দৈবজ্ঞ ঠাকুরের কাছে গিয়ে পড়্‌লাম। সেখানে দেখ্‌লাম তখন আর কোন পরীক্ষাপ্রার্থী নাই সকলে চ'লে গিয়েছে। জ্যোতিষী সুভদ্রার হাত দেখে বল্‌লেন, "এই মেয়েটীর হাতের রেখা দেখে অনুমান হয় যে, এ রাজমহিষী ও রাজমাতা হ'বে।" কিন্তু আমাদের এটা অসম্ভব ব'লে বোধ হ'ল।"

শাস্ত্রী মহাশয় বল্‌লেন,—"অসম্ভব কেন"?

নারায়ণ—গরীব বামুনের মেয়ে কি কখন রাণী-হতে পারে ? আমরা ব্রাহ্মণ, এবং রাজারা প্রায়ই ক্ষত্রিয়।"

শঙ্কর—কোন ব্রাহ্মণ রাজা আছে ব'লে কি আপনি জানেন, শাস্ত্রী মশায় ?

শাস্ত্রী—কোন ব্রাহ্মণ রাজা নাই বটে। কিন্তু দেখছনা দেশের কি অধঃপতন হয়েছে। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ত প্রায় সকলেই বৌদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। বৈশ্যদের মধ্যে অনেকে এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধ ভাবাপন্ন হ'য়েছে। ব্রাহ্মণ ছাড়া অতি অল্প লোকই শাস্ত্র মেনে চলে। বৌদ্ধদের মধ্যে জাতিভেদ নাই—অসবর্ণ বিবাহ বহু পরিমাণে চল্‌ছে। বৌদ্ধদের প্রভাবে অনেক ব্রাহ্মণেরও পদস্খলন হয়েছে ও হ'চ্ছে। ভ্রষ্টাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিছুদিন পরে প্রতিলোম বিবাহ কেহ গর্হিত ব'লে ধরবে না। রাজাদের শরীরেই কি এখন শুদ্ধ ক্ষত্রিয়-রক্ত খুঁজে পাওয়া যায় ? নন্দ-বংশীয় রাজারা শূদ্র-সংস্পর্শ দোষে দুষ্ট। সেই রক্তে এখন নাপিতের রক্ত মিশেছে। শীঘ্রই সব একাকার হ'য়ে যাবে। বালির বাঁধ দিয়ে আর কত কাল এই স্রোত ঠেকিয়ে রাখা যাবে ?

শঙ্কর—তাই বলে কি হতাশ হ'য়ে আমাদের পূর্ব্বজদের আচার এখন থেকে ছেড়ে দিতে হ'বে ?

শাস্ত্রী—এখন না ছাড়লেও শীঘ্রই ছাড়তে হ'বে, শঙ্কর ভায়া। মগধের সম্রাট এখনো বৈদিক আচার পালন ক'রছেন ব'লে সমগ্র দেশের লোকের মধ্যে বৌদ্ধ ব্যভিচার প্রবেশ লাভ ক'রতে পারেনি। কিন্তু যদি কখন সম্রাট বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন বৈদিক ধর্ম্মের নাম গন্ধও থাকবে না।

শঙ্কর—সম্রাট বিন্দুসার অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ। শুনেছি রাজভবনে সহস্র সহস্র সদাচার স্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা হয়, এবং সহস্র কণ্ঠোত্থিত বেদধ্বনিতে রাজ-প্রাসাদ মুখর হয়। অতএব এখনো রাজবংশ স্বধর্ম্ম-নিরত আছে। ভবিষ্যতের আশঙ্কায় এখন থেকেই কি হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত ?

শাস্ত্রী—অনেক আচার যা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও আপত্তিজনক ব'লে ধরা হ'ত, তা এখন অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রবেশ ক'রেছে। বৌদ্ধদের অনুকরণে এখন অনেকে শিখা ত্যাগ ক'রেছে, যজ্ঞোপবীত ধারণ করা নিষ্প্রয়োজন ব'লে ভাব্‌ছে, ত্রিসন্ধ্যা প্রায় কেহ করে না, গোপনে নিষিদ্ধ খাদ্য খাওয়ার কথাও শোনা যায়। অসবর্ণ বিবাহ চলিত হ'য়ে গিয়েছে। কিছু অধিক প্রাপ্তির আশা থা'ক্‌লে স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা প্রতিলোম বিবাহের ব্যবস্থাও দিয়ে থাকেন। যে সকল কাজ গর্হিত বলে সমাজ বিবেচনা ক'রত, এখন আর সেরূপ করে না। এই দেখ না পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন নারায়ণ ভায়ার কন্যা ভদ্রা, তোমার কন্যা মালতী, আমার কন্যা কমলা ও অন্যান্য মেয়েদের আমার বাড়ীতে লেখা পড়া শেখাতে আরম্ভ করি, তখন কি নগরে কম হৈ চৈ প'ড়েছিল ! কিন্তু এখন স'য়ে গিয়েছে—কেউ আর আপত্তি করে না। আমি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। অনেক উচ্চ শিক্ষিতা নারী প্রাচীন কালে আমাদের দেশে ছিলেন, এরূপ উল্লেখ উপনিষদাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের কয়েকটী সূক্তের ঋষি ছিলেন নারী।

শঙ্কর—আপনার শিক্ষাদানের ফল ভদ্রাতে যেমন ফ'লেছে, তেমন আপনার আর কোনো ছাত্রীতে ফলেনি।

শাস্ত্রী—তা বটে। পাঁচ বছর আগে ভদ্রা, মালতী ও কমলার বর্ণ-পরিচয় এক সঙ্গেই হয়েছিল, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধার বলে ভদ্রা তার সহপাঠী দুজনকে কত দূরে ফেলে চ'লে গিয়েছে। সে এখন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্রের মহাভারতের আদি পর্ব্বের এবং গীতার ছ' অধ্যায়ের আবৃত্তি করতে পারে। তার হস্তাক্ষরও সুন্দর। তাকে ব্রাহ্মী-লিপিতে লেখা একখানা ছোট পুঁথির প্রতিলিপি ক'র্‌তে দিয়েছিলাম। প্রতিলিপিখানি এমন সুন্দর ভাবে লিখেছে যে অবাক হ'তে হয়—বর্ণগুলি সব সমান, সমঘন ও সমরেখ। কমলার মুখে শুনেছি যে সে গোপনে, বিনা সাহায্যে, বাড়িতে ব'সে চিত্র আঁকে। পরমাত্মা তার উপর রূপ ও গুণ অজস্র ধারে বর্ষণ ক'রেছেন। যদি কোনো নারী রাণী হওয়ার উপযুক্ত থাকে, তবে সে সুভদ্রাঙ্গী। নারায়ণ করুন জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের কথা সত্য হ'ক্। তখন, নারায়ণ ভায়া, তুমি, ব্রাহ্মণ ব'লে, যেন পিছিয়ে যেয়োনা। তোমার কার্য্য কিছুদিন পরে দূষ্য ব'লে বিবেচিত হ'বে না। এখন সভা ভঙ্গ করা যা'ক। আজ থেকে এক সপ্তাহ আমি একটী বৈদিক কার্য্যে ব্রতী থাক্‌ব। এ কয়েক দিন ভদ্রাকে আমার বাড়িতে পড়্‌তে যেতে বারণ ক'রো।

৩

পরদিন বিকালে কমলা ও মালতী সুভদ্রাদের বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়াল। রৌদ্র চম্ চম্ ক'রছে—তারা দেখ্‌লে সেই রৌদ্রে উঠানের একদিকে একখানা দর্মার উপর কতকগুলি ধান, এবং আর একদিকে মাটীতে কতকগুলো ঘুঁটে শুকুচ্ছে। রান্নাঘরে ধপ্ ধপ্ ক'রে শব্দ হ'চ্ছে। তারা বুঝলে যে সুভদ্রা মুশল দিয়ে উদূখলে ধান ভা'নৃছে। কমলা 'ভদ্রা' ব'লে ডাকৃলে। ভদ্রা হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে এল—তার আঁচলখানি বাঁ কাঁধ থেকে ডান দিকে নামিয়ে কোমরে জড়ান। ঘরের দাওয়ায় একখানা চেটাই পে'তে তাদের বসালে। তারপর ঘরে ঢুকে কোটা ধানগুলো সাম্‌লে এসে তাদের কাছে ব'স্‌ল।

কমলা বল্‌লে "হাঁলা, অত হাস্‌ছিস্ কেন? রাণী হবি ব'লে বুঝি? কালরাত্রে বাবার মুখে শুন্‌লাম এক জ্যোতিষী ব'লে গিয়েছে তুই রাজমহিষী হবি।"

মালতী—আমিও কালরাত্রে বাবার কাছে ঐ কথাই শুনেছি।

সুভদ্রা—তোরা কি পাগল হয়েছিস? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে—আমাদের ভাত জোটেনা—আমি রাণী হ'ব? কোথাকার কে একজন হাত দেখে ব'লে গেল "তুমি রাণী হবে", অম্‌নি তাই বিশ্বাস করৃতে হবে? .

কমলা—কেন তুই কি জ্যোতিষে বিশ্বাস ক'রিস্‌নে? তুই আমাদের চেয়ে অনেক বেশী শিখেছিস্ কিনা, তাই তোর জ্ঞান অনেক। আমি কিন্তু, ভাই, জ্যোতিষে বিশ্বাস করি।

মালতী—আমিও।

সুভদ্রা—আমারও বিশ্বাস নেই যে তা নয়। কিন্তু যারা দৈবজ্ঞ ব'লে নিজেদের পরিচয় দিয়ে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়, তাদের অনেকের শাস্ত্র জ্ঞান কম—নেই বল্‌লেই হয়। তারা যা' তা' ব'লে দেয়।

কমলা—এই জ্যোতিষীর শাস্ত্রজ্ঞান নেই, তুই কি ক'রে জান্‌লি? হয় ত তিনি সামুদ্রিক বিদ্যায় মহানিপুণ।

সুভদ্রা—জান্‌লাম তাঁর কথা থেকে—সামান্য ব্রাহ্মণের মেয়েকে ব'লে গেলেন, "তুমি রাজমহিষী হবে"। তাঁর একটা সম্ভব অসম্ভবের জ্ঞান নেই।

মালতী—ভাগ্যে থাকৃলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমাদের মন বল্‌ছে তুই রাণী হবি। তোর মত রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি কোন্ মেয়ের আছে? তুই সব দিক্ থেকেই রাণী হবার যোগ্য।

সুভদ্রা—থাম্ ভাই, আমি তোদের কথায় বড় লজ্জা পাচ্ছি—তোরা আমাকে বড্ড বাড়াচ্ছিস্। রাণী হওয়াতেই কি চরম সুখ? সব রাণীই কি সুখী?

কমলা—সুখ দুঃখ ভাগ্যের কথা। বাপ মা মেয়েকে ভাল বরের হাতে সম্প্রদান করৃবারই চেষ্টা করেন। পরে তার কপালে যা থাকে তাই হয়।

মালতী—বেলা প'ড়ে এল। ভদ্রা, তুই জল আন্‌তে যাবিনে?

সুভদ্রা—যাব। আগে উঠোনের ঐ ধান গুলো আমার তুল্‌তে হবে, এঁটো বাসন মাজ্‌তে হবে, আর ঘর ঝাঁট দিতে হবে।

কমলা—এখন আমরা যাই—তুই ঘাটে যাবার সময় আমাদের ডেকে নিয়ে যাস্। তুই যে কলসীটে নিয়ে যাস, সেটা জল ভরা হ'লে আমরা চাগাতেও পারিনে। অথচ তুই আমাদের চেয়ে ছমাস এক বছরের ছোট। লম্বাও ত তুই কম নস্—আমাদের মাথার চেয়ে তোর মাথা দু আঙ্গুল উঁচু।

উঠানে নাম্‌তেই সুভদ্রার লাউ-মাচা, ধোঁদোল-মাচা, এবং শাক বেগুনের ক্ষেতের উপর কমলা ও মালতীর নজর পড়ল। কমলা বল্‌লে "বাঃ বেশ ধোঁদোল ঝুলছে ত। লাউ গাছও মাচার উপর উঠেছে।"

মালতী—তোর বেগুনগাছগুলি বেশ জোরাল হ'য়ে উঠেছে ত—এই বারেই ফুল ধরৃবে। বাঃ রে, পালম শাগও ত বেশ জন্মেছে। আচ্ছা, ভাই, তোর তরি তরকারীর সব গাছ এত ভাল হয় কিসে? আমাদের বাগানে ত এত ভাল হয় না—অথচ আমাদের বাড়িতে চাকর আছে।

সুভদ্রা—আমি যে ভাল ক'রে সার দিয়ে মাটীর পাট ক'রে গাছপালা পুঁতি, আর মাটী শুকুতে না শুকুতে গাছের গোড়ায় জল ঢালি। তোদের বাড়ির গোবর যেখানটা পড়ে, সেখান থেকে ঝুড়ি ক'রে সার মাটী নিয়ে এসে ক্ষেতে ফেলি। বাবা প্রথমে একবার মাটীটা খুঁড়ে দিয়েছিলেন। তারপর

আমি সার ফেলে বেশ ক'রে দুই মাটী এক ক'রে আর একবার কুদ্‌লে গুঁড়ো ক'রে নিয়েছি। প্রায়ই বাড়ির কুয়ো থেকে জল তুলে গাছের গোড়ায় দিই। মাঝে মাঝে ঘাস ও আগাছা তুলে ক্ষেত পরিষ্কার করি। কাঁচা গোবর এনে ঘুঁটেও তৈরী করি—ঐ দেখ্ শুকুচ্ছে। তা ছাড়া আম, তাল ও মহুয়া গাছের শুক্‌নো ডাল পালা ও ধানের তুষও আমার জ্বালানীর কাজ করে।

কমলা—তুই এত খেটে শরীরটাকে যে মাটী করে ফেল্‌ছিস্।

সুভদ্রা—শরীরটা মাটী হ'চ্ছে, না, ভাল হচ্ছে? এই পরিশ্রম করি ব'লেই ত শাগ ভাত যা খাই, তা শরীরের রক্ত হ'য়ে যায়। আজ ভাই সাঁতার কাটতে হবে—এ সময় ঘাটে কেউ নেই।

মালতী—সাঁতারে ত তোর সঙ্গে আমরা পারিনে। এখন আমরা চল্‌লাম।

সুভদ্রা—আমার দণ্ড খানিকের অধিক বিলম্ব হবে না।

৪

সময় কারো অপেক্ষা করে না—অবিরাম গতিতে দৌড়ুচ্ছে। যতদিন যেতে লাগ্‌ল, ততই নারায়ণ শর্ম্মার চিন্তা বাড়তে লাগ্‌ল। তিনি ভাবেন, "দৈবজ্ঞ ঠাকুর হয় ত গণনায় ভুল ক'রেছেন। কিন্তু ভুলই বা তাঁর হবে কেন? তিনি ত সামুদ্রিক বিদ্যায় খুব নিপুণ ব'লে বোধ হ'চ্ছিল। তিনি এই কাজ করতে করতে বুড়ো হ'য়ে গিয়েছেন—তাঁর গণনায় কি ভুল হ'তে পারে? তিনি নিশ্চয়ই প্রতারক নন্। প্রতারণা ক'রে তাঁর লাভই বা কি? বুঝতেই ত পেরেছিলেন যে আমার কাছ থেকে তাঁর অধিক প্রাপ্তির আশা নেই, আর তাঁর জানাই ত ছিল যে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে হ'তে পারে না। তবে কি যারা প্রতিলোম বিবাহের পোষকতা করে, তিনি তাদের দলের? আমার মনটাও যেন প্রতিলোম বিবাহের দিকে ঢ'লছে ব'লে বোধ হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে মাথা ঠিক রাখতে পার্‌ছিনে। হাঁ, এতে সন্দেহ নেই যে ভদ্রার খুব রূপ। কোনো রাজার নজরে পড়ে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু রাজ-চক্রবর্ত্তী ত কেবল মগধের সম্রাটই। নারায়ণের কি ইচ্ছা দেখা যাক্।"

কৈশোর থেকে সুভদ্রা এখন যৌবনের পূর্ব্বসীমায় পদার্পণ করেছে। সেকালে পর্দ্দার কঠোরতা ছিল না, তথাপি স্ত্রী-জনোচিত সঙ্কোচ থাকাতে সে বিনা কারণে বাড়ির বা'র হ'ত না। সে প্রাতে স্নানের সময় স্নান করতে এবং বিকালে জল আনবার সময় জল আনতে পাড়ার ঘাটে যেত। অবসর কালে উঠানে বাগানের কাজ কর্‌ত। একবার মাত্র তৃতীয় প্রহরে শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে পাঠ নিয়ে আস্‌ত।

আজ মকর-সংক্রান্তি—পাড়ার প্রায় সকল স্ত্রীলোকই স্নান ঘাটে এসেছে। বেলা এক প্রহর উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। কমলা ও মালতী আগেই ঘাটে পৌঁছেছে। কমলার মা ও মালতীর মাও এসেছেন। কারো নাওয়া শেষ হ'য়েছে—তীরে উঠে মাথা মুছ্‌ছে বা চুল ঝাড়ছে। কেউ বা এখনো জলে নামেনি। ভারি শীত—পশ্চিম দিক থেকে জোরে ঠাণ্ডা বাতাস বচ্ছে। অনেকক্ষণ সুভদ্রার অপেক্ষায় ব'সে থেকে, সে এল না দেখে, কমলা ও মালতী জলে নেমে পড়্‌ল এবং গা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ল। এমন সময় একটি কলসী নিয়ে সুভদ্রা ঘাটে পৌঁছল। সে আস্‌তেই সকলে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। কমলার মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে ভদ্রা, তোর যে এত দেরী হ'ল?

সুভদ্রা—ঘরে ডাল ছিল না, জ্যাঠাই মা। তাই চাট্টী অড়র ভাঙ্‌তে হ'ল'। তার পর দেখলাম চিঁড়ে নেই। তাই ভাবলাম চাট্টী চিঁড়েও কুটে ফেলি। খুব ভোরে ভোরেই আরম্ভ করেছিলাম তবুও বেলা হয়ে গেল।

মালতীর মা—আহা, বাছারে! তোকে কত খাটুনীই খাট'তে হয়! আজ বৎসরকার দিনটা বাদ দিলেই ত হ'ত।

সুভদ্রা—খাটুনীকে আমি কষ্ট ব'লে ভাবিনে, জ্যেঠাই মা। আমার অমনোযোগে কোন কাজ নষ্ট হয়েছে জান্‌লে আমার মনে ভারি কষ্ট হয়।

এই ব'লে সুভদ্রা জলে নাম্‌ল। কমলা ও মালতী শীতে আর জলে থাক্‌তে না পেরে উঠে পড়্‌ল। তাদের সঙ্গে যাবে ব'লে সুভদ্রা তাড়াতাড়ি দুটো ডুব দিয়ে কাপড়খানা কেচে নিলে, এবং কলসীটে জলে ডুবিয়ে নিয়ে পাড়ের উপরে গিয়ে তাদের ধর্‌লে। এই সময় একখানা নৌকা নদী দিয়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে সুভদ্রা বল্‌লে "নৌকোয় চড়ে একবার

কোনো যায়গায় যেতে ইচ্ছে করে। কখনো ঘট্‌বে কি না বল্‌তে পারিনে! আজ অনধ্যায়—আজ আর, কমলা, তোদের বাড়ী পড়্‌তে আস্‌ব না। লাল, হল্‌দে ও সবুজ সূতো দিয়ে একখানা কাপড়ে নক্‌সা পাড় তুলতে আরম্ভ করেছি। আজ পড়ার সময়টা খালি পাওয়া যাবে, সেই সময় পাড়ের কাজটা কর্‌ব।"

কমলা—রাঁধবি নে?

সুভদ্রা—বেলা হয়ে গিয়েছে—আজ আর রান্না চল্‌বে না। আজ বাবাকে চিঁড়ে, দই আর গুড় খেতে দেব—এটা তাঁর প্রিয় খাদ্য। আজ বাবা এক ভাঁড় দই নিয়ে আসবেন, সকালে বেরুবার সময় ব'লে গিয়েছেন। মা বেঁচে নেই—বাবা যেন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে বেড়ান। মার কথা মনে প'ড়লে, তাঁর চোখের পাতা দুটো ভিজে ওঠে। এখন তিনি আমায় নিয়ে ভুলে আছেন—সর্ব্বদা আমারই ভাবনা। ইন্দ্রাণী হ'তে পেলেও আমি বাবাকে ছেড়ে যেতে পার্‌ব না। বাবাকে দেখ্‌বে কে?

প্রথমে কমলা ও তার পর মালতী আপন আপন বাড়িতে ঢুক্‌ল। শেষে সুভদ্রা বাড়ি পৌছে রান্না ঘরের দাওয়ায় ভারি কলসীটা কোমর থেকে নামিয়ে রেখে বস্‌ল। বেলা দেড় প্রহর অতীত হ'য়ে গিয়েছে।

কমলারা ঘাট থেকে চলে গেলে একজন প্রৌঢ়া গৃহিণী বল্‌লেন, "ভদ্রার কি রূপ? চাঁপা ফুলের রং—মুক্তোর মত দাঁত—কুঁদে কাটা মুখ—পটল-চেরা চোখ। ওর সুভদ্রাঙ্গী নাম সার্থক—সত্যি সত্যিই ওর অঙ্গের লালিত্য অদ্ভুত—হাত পায়ের কি সুডোল গড়ন—হাত ও শরীরের নড়ন্ চড়নে কি একটী মেয়েলী ভাব!"

আর একজন প্রৌঢ়া মহিলা বল্‌লেন, "বিয়ের বয়স হয়েছে—ভাল ঘরে বরে পড়ে, তবে ত?"

আর একজন বল্‌লেন, "ভাল ঘরে পড়বে কি করে? ওরা যে বড় গরীব।"

প্রথমা মহিলা বল্‌লেন, "ওদের ঐ মন্দ অবস্থাই ওকে কেজো, কষ্টসহিষ্ণু ও ধীর হ'তে শিখিয়েছে। ও মোটেই বাচাল নয়—কেমন বুঝিয়ে বুঝিয়ে ধীরে ধীরে মোলায়ম ক'রে কথাগুলি বলে, যেন ওর ঠোঁট থেকে' জুঁই' মল্লিকে, বকুল ফুল আস্তে আস্তে ঝ'রে পড়ে।"

দুপরের সময় ভদ্রার রান্না ঘরের দাওয়ায় উঠে মালতী দুয়ারের ভেতর উঁকি মেরে দেখলে যে সুভদ্রা কুলা দিয়ে কোটা ধানের তুষ ঝেড়ে ফেল্‌ছে, আর সুর ক'রে গীতার শ্লোক আওড়াচ্ছে। মালতী বল্‌লে, "ভদ্রা, তোর কাজের আর কামাই নেই। কাকা বোধ হয় এখনো বাড়ি ফেরেন নি। মা এই আট দশটা তিলের নাড়ু আর চার পাঁচখানা গুড় পিঠে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর বলেছেন আজ পৌষ সংক্রান্তির দিন তিল ও পিঠে খেতে হয়। কাকার খাবার সময় তাঁকে দিস্, আর তুইও খা'স্। আমি এখন চল্লাম, গিয়ে খেতে বস্‌ব। তুই এখন পর্য্যন্ত কিছু খাস্ নি?"

সুভদ্রা—আমি গুড় দিয়ে দুটী চিঁড়ে চিবিয়ে খেয়েছি। আমার মা নেই—এখন জ্যেঠাইমারাই আমার মা।

৫

সুভদ্রার চিন্তা ছাড়া নারায়ণ শর্ম্মার আর কোনো চিন্তাই নাই। জ্যোতিষীর কথায় ক্রমশঃ তাঁর কোনো সন্দেহ রইল না—তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলবে। তিনি সেই শুভ সংযোগের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, যা তাঁর কন্যার ভাগ্য ফেরবার কারণ হ'বে। হয় ত কোনো রাজা জল-বিহারে বেরিয়ে চম্পানগরের ধার দিয়ে যাবেন, আর সেই সময় সুভদ্রা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

কিন্তু দেখতে দেখতে এক বৎসর কেটে গেল—তবুও তাঁর কন্যার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের কোনো সূচনাই দেখা গেল না। জ্যোতিষীর বাক্যে তাঁর যে আস্থা হয়েছিল, তা সন্দেহের ঝটকায় মাঝে মাঝে দুল্‌তে লাগল বটে; কিন্তু তার মূল নড়ল না।

নারায়ণ শর্ম্মা জান্‌তেন যে শাস্ত্রী মহাশয় উদারমতাবলম্বী ও কুসংস্কারবর্জিত। ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে সে সম্বন্ধেও তাঁর দূরদর্শিতা আছে। উপায়ান্তর না দেখে, পরামর্শের জন্য নারায়ণ শর্ম্মা একদিন শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হ'লেন। তাঁকে দেখে শাস্ত্রী মহাশয় বল্‌লেন, "আরে এস, ভায়া—কি মনে ক'রে?"

নারায়ণ—আপনার কাছে আর লুকিয়ে কি হবে? সুভদ্রার ভাবনা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। প্রথমে জ্যোতিষীর কথায় আমার ঘোর সন্দেহ ছিল—কিন্তু এখন দৃঢ় বিশ্বাস

হয়েছে। আমি প্রতিলোম বিবাহে সম্মত। এক বৎসর বেরিয়ে গেল—আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্‌ব ভাঙ্‌ব কর্‌ছে। আমি ভদ্রাকে নিয়ে পাটলীপুত্র যেতে চাই। দেখি, সেখানে যদি কোন সুযোগ ঘটে। আপনার মত কি?

শাস্ত্রী—আমার মত আছে। কিন্তু তোমরা যাবে কি ক'রে? এখান থেকে পাটলীপুত্র বহুদূর। প্রশস্ত রাজপথ আছে বটে, কিন্তু হেঁটে যাওয়া ভদ্রার পক্ষে অসম্ভব। গোরুর গাড়ী কিম্বা ডুলি ক'রে যাওয়া চল্‌তে পারে, কিন্তু তা বহু-ব্যয়-সাধ্য—তুমি সে খরচ যোগাতে পার্‌বে না। তা ছাড়া রাস্তায় ডাকাতের ভয়। সুযোগের অপেক্ষা কর্‌তেই হবে—ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে না।

নারায়ণ—আমার মনের আবেগ আমায় ব্যস্ত করে তুলেছিল। আপনি আমার প্রস্তাব সমর্থন করাতে, এখন আমি সুস্থ হ'লাম। দেখছি ধৈর্য্য অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নাই। এখন আসি।

সেই দিন দুপরের পর নারায়ণ শর্ম্মা বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন যে ময়লা-ছেঁড়া-কাপড়-পরা একটী ইতর জাতীয়া স্ত্রীলোক রান্না ঘরের দাওয়ায় ব'সে কলাপাতায় ভাত খাচ্ছে। তিনি সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "এ কে ভদ্রা?"

সুভদ্রা—একে আমি চিনিনে, বাবা। দণ্ড দুই আগে এ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাওয়ার উপর শুয়ে পড়ল—প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মত হ'ল। আমি এর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে পাখা দিয়ে বাতাস কর'তে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে একটু সাম্‌লে এ বল্‌লে যে তিন দিন কিছু খায় নি। আমি একে ধরে বসিয়ে ঘরের ভিতর থেকে একটু গুড় ও একঘটী জল এনে দিলাম। গুড়টা খেয়ে, সমস্ত জলটা ঢক্‌ ঢক্‌ ক'রে খেয়ে ফেল্‌লে—কিছু সুস্থ হ'ল। এখন ভাত দিয়েছি, খাচ্ছে।

নারায়ণ—বেশ করেছিস্‌ মা। গৃহস্থের যা কর্ত্তব্য তা করেছিস্‌। সকল জীব-দেহে একই আত্মা বিরাজ কর্‌ছেন। রান্না কি শেষ হ'য়ে গিয়াছে?

সুভদ্রা—হাঁ, বাবা। আপনি ভাত খান্‌—আমি চিঁড়ে খাব এখন।

নারায়ণ—আমি চিঁড়ে খাই—তুই ভাত খা।

সুভদ্রা—তা হবে না, বাবা। আপনি খাবেন ব'লে আমি রেঁধিছি—আপনার খেতেই হ'বে।

সুভদ্রা দুঃখিত হ'চ্ছে দেখে নারায়ণ শর্ম্মা তার কথায় সম্মত হ'লেন। বাইরে ফেল্‌বে বলে স্ত্রীলোকটী এঁটো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পিতা পুত্রী রান্নাঘরে ঢুক্‌লেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

[বর্ত্তমান আখ্যায়িকার লেখক বহুদিন যাবৎ ভাষা-তত্ত্ব, palaeogrpahy (লিপিবিদ্যা) বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা, সাহিত্য ও শিল্প, সুরদাস মীরাবাই প্রভৃতি প্রচীন কবিগণের কাব্যরচনা ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু রচনা হিন্দি ও বাংলা সাহিত্যে দান করে এসেছেন। তাঁর 'সুরদাসের কাব্যরচনা' 'ভারতবর্ষে লিপি বিদ্যার বিকাশ' (দুটিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত) 'আলোচনা ও কল্পনা', 'সৃষ্টি রহস্য', 'বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গভাষাতেই লিখিত। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত তামিল ভাষায় লিখিত তিরুবল্লুবরের 'কুরল' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছে। ভূমিকাংশ কিছু কাল পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত 'তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকা ইতিহাস', কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য এবং ঐ সম্বন্ধে হিন্দি সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ।

সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বের এই আখ্যায়িকাটি সেই বহু পুরাতন দিবসের একটি চিত্র জাগিয়ে তুলে পাঠকদিগকে একটি মুখরোচক নূতন আস্বাদ দেবে বলে ভরসা করি। বিঃ সঃ]

প্রাক্‌ভারতীয় রূপযান

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

[সভাপতি, কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলন শিল্পকলা বিভাগ ১৯৩৪]

তারানাথ বহুপূর্ব্বে ভারতীয় রূপসৃষ্টির বৈচিত্র্য আলোচনা প্রসঙ্গে যথাক্রমে মধ্য, পশ্চিম ও পূর্ব্বাঞ্চলের কৃতিত্বের কথা আলোচনা করেন। * এ প্রসঙ্গে দুটি প্রথিতনামা রূপশিল্পীর নাম উল্লিখিত হয়—সে দুজন হচ্ছে বীমান ও বিটপাল। এ দু'জন বাঙ্গালী বলেই অনুমিত হয়েছে। এ দু'জনের রীতিকে মধ্যমণি করে একটা বিরাট শিল্প-মাল্য রচিত হয়েছে পূর্ব্বাঞ্চলে—যার প্রভাব ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতীয় সৃষ্টিকে হতশ্রী করে দেয়।

লোকেশ্বর মূর্ত্তি

[মগধ]

বস্তুতঃ ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশসমূহের রীতির মুগ্ধকর আবেশ স্বত্বেও ক্রমশঃ সে থরের প্রভাব আলেয়ার মত অন্তর্হিত হয়ে যায়। নব্য ভারতের নব্যতর মনন ও অপ্রতিহত প্রগতির পথে সে সব সার্থক হতে পারে নি। পূর্ব্বাঞ্চল বহুকাল হতেই একটা প্রবহমান সৌন্দর্য্যের লীলাচক্রকে উৎসারিত করেছিল। গুপ্তযুগের রাজধানীও পূর্ব্বভারতে ছিল এবং এই অঞ্চল হ'তেই ভারতীয় শীলতা সেকালে নিজের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করেছে। তা'তে করে পশ্চিম ভারতীয় সমগ্র শিল্প চেষ্টাই আবর্ত্তিত হয়ে নূতনরূপ ধারণ করে। শুধু যে শিল্পগত স্রোতোধারা পূর্ব্বভারত হতে উদ্গত হয়েছে তা নয়, বুদ্ধের জন্মভূমিও প্রাকভারতে অবস্থিত ছিল এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ জগতের বহু অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য পূর্ব্ব ভারত হতে সংক্রামিত হ'য়ে শুধু পশ্চিম ও দক্ষিণভারতে নয় যবদ্বীপ, কাম্বোদিয়া, চীন ও জাপানে বিস্তৃত হয়েছে। সে ইতিহাস অতি রোমাঞ্চকর।

এদেশে গুপ্তযুগের সম্পর্কে একটা অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। অজান্তা প্রভৃতি অঞ্চলে দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া এবং অন্যত্র গুপ্তসৃষ্টি একটা ভাবের রামধনু সৃষ্টি করে।

লোকেশ্বর

[কুরকিহার]

* Indian Antiquary Vol. IV. 1875, p. 102

মার্জ্জিত রুচি, সূক্ষ্ম পরিনিবেশ ও বিশুদ্ধ ছন্দলীলায় গুপ্তসৃষ্টি মুখরিত। মথুরার শিথিল ও ক্লান্ত রচনা এবং ভাবগদগদ আতিশয্য গুপ্ত ঋজুতার স্পর্শে অস্তমিত হয়ে যায়। গান্ধার শিল্পের পরিপক্ক বহিরবয়ব ও দেহশ্রীর যে স্থূল রচনা ভারতকে

তারামূর্ত্তি
[নালন্দা]

আর্ত্ত করে তোলে মথুরা তার উপর যবনিকা পাত করে মাত্র, কিন্তু এদুটি বিপরীতমুখী শিল্পচেষ্টার ভিতর কোন সমন্বয় সাধনা করতে পারেনি। গুপ্তযুগের ভূমারা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত রচনায় একটা নূতন সৃষ্টির উল্লাস ও আনন্দ দীপ্যমান হয়ে উঠে। তা'তে অসংলগ্ন আতিশয্য বা ভাবগত অত্যুক্তিও নেই এবং গান্ধার শিল্পের ভাবহীন জড় মাংসপিণ্ডও সঞ্চিত হয়নি; সর্ব্বোপরি তাতে একটা সহজ রসানুভূতির বিরাট প্রভা-বেষ্টনী আছে। মনে হয় গুপ্তসৃষ্টি একেবারে ক্লেদ-হীন আনন্দের স্বপ্ন—সদ্যবিকশিত বৃন্তশায়ী সূর্য্যমুখীর মত তা' বৃক্ষের সমস্ত আরণ্য আবর্জ্জনা ও উচ্ছৃঙ্খল পত্রসঞ্চয়কে অস্বীকার করে যেন ভারতীয় সাধনার প্রতীক হয়ে প্রদীপ্ত হয়েছে! এমনি করে একটা বিরাট মুক্তির ইতিহাস গুপ্তসৃষ্টির পশ্চাতে মুখর হয়েছে। এবং সে বার্ত্তা সমগ্র এসিয়ায় ব্যক্ত হ'য়ে পূর্ব্বভারতীয় শীলতাকে জয়যুক্ত করেছে। আলোচকদের কেউ কেউ গুপ্তভাস্কর্য্যে রোমকসৃষ্টির কারুতা ও লীলাভঙ্গ লক্ষ্য করেছে। বস্তুতঃ এ ধারণা রোমক মূর্ত্তির তত্ত্ব বা প্রকাশধর্ম্মে গভীর জ্ঞানের অভাবেই জন্মেছে। রোমক শীলতা দেবমূর্ত্তিদের অলঙ্করণস্থানীয় করে তোলে—কোন গভীর নিষ্ঠা বা ধর্ম্মগত প্রেরণায় রোমের রচনা মুকুলিত হয়নি। অথচ গুপ্তসৃষ্টির প্রত্যেক রচনাভঙ্গী একটা বিপরীত তত্ত্বই প্রস্ফুট করে' তোলে। ভারতীয় ভক্তিতত্ত্ব মর্ম্মর ইতিহাসের রূপকদম্বে অসীমকালের জন্য ন্যস্ত হ'য়ে আছে—তাকে কিছুতেই উৎখাত বা বিলীন করা যেতে পারে না। গুপ্তভাস্কর্য্য চিত্তবৃত্তির এ সুনিপুণ ব্যঞ্জনায় শিঞ্জিত। গুপ্তযুগের হৃদয়তত্ত্ব পরবর্ত্তীকালে রূপবিহারে মসগুল হ'য়ে ভোগবিলাস ও জর্জ্জরিত রসচর্চ্চায় আত্মসমর্পণ করে। এ যুগের নাট্যকলায় তা'র পরিস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়। মৃচ্ছকটিকে পাওয়া যায় গুপ্তসভ্যতার একটা উষ্ণ ও প্রধূমিত হিল্লোলের বার্ত্তা। সভ্যতা যখন পরিপক্ক হয়ে আসে তখন তা বাইরের অলঙ্করণ ভ্রূভঙ্গী ও তরল কেলিতে নিজের দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতাকে গোপন করতে চায়। গুপ্তযুগের পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় জিজ্ঞাসা কঠিনতর ও জটিলতর স্তরে উপস্থিত হয়। তখন দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতীয় গুহাদিতে উৎকীর্ণ রূপপদ্ধতি গভীরতর আত্মতত্ত্ব উদ্ঘাটনে অপ্রচুর হয়ে পড়ে। প্রাক্‌ভারতের পাল সম্রাটগণ যখন ভারতে প্রাধান্যলাভ করতে থাকে তখন মরু-প্রান্তরের অলীক ছায়ার মত পশ্চিম ভারতের রূপচর্চ্চাকে অন্তর্হিত হ'তে হয়েছে।

স্থাপত্যেও এ ব্যাপারটি প্রস্ফুট হয়েছে। গুপ্তযুগের শিখরহীন মন্দির কোথাও বা ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। প্রাক্‌ভারতীয় শীলতা এজন্য স্থাপত্যক্ষেত্রে বহু বিচিত্র রূপাগুলি দান করে এ রিক্ততাকে পূর্ণ করেছে। ভুবনপ্রবেশে আছে

ইতর জনের পক্ষে মহত্ত্বের আশা করা যেমন ধৃষ্টতা, শিখরহীন প্রাসাদের পক্ষেও কৌলীন্য লাভ করার চেষ্টা বাতুলতা :—"শিখরহীন প্রাসাদং ইতর জন যথা মহা।" গুপ্তস্থাপত্যের এই ঋজু অপ্রাচুর্য্য পরবর্ত্তী যুগের ভাবের ঐশ্বর্য্যের বাহন হ'তে

মহাদেব

[খিচিঙ্গ—ময়ূরভঞ্জ]

পারেনি। তাই প্রাক্‌ভারতীয় শিল্প নব নব পদ্ধতি সৃষ্টি ক'রে অগ্রসর হয়েছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এদেশের রসের আয়তন বৈদেশিকের চাপল্যের ভূমি হয়ে পড়েছে। ইউরোপের বহিরঙ্গ কাব্য ও কলা রচনায় দীক্ষিত বৈদেশিকগণ ভারতীয় ভাবতত্ত্বের বহুমুখী নির্দ্দেশ ও রসস্তর অনুসরণ করতে পারেনি। বৈদেশিকদের অনুসরণকারীগণও বিভ্রান্ত হয়ে পরবর্ত্তী যুগের শিল্পকলার প্রাচুর্য্য ও বিস্তৃতির কারণ খুঁজে পায়নি। তা ছাড়া প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণ রসতত্ত্বে বহু পরিমাণে অনভিজ্ঞ বলে' কোন রীতি সুন্দরতর এ বিচারও করতে পারেনি। এক সময় গ্রীক্ ও রোমক রীতি রসিকজনের আলোচনা প্রসঙ্গে অধিক বাহবা পেত—সে যুগ চলে গেছে। এ যুগের ভাস্কর্য্যরীতির বিচার জ্যামিতিক বিধান দ্বারা বা প্রাকৃতিক হুবহুত্বের উপর নির্ভর করে না। কাজেই রসবিচারে প্রাথমিক ধারণাগুলি বিপর্য্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকত্বকে একমাত্র মানদণ্ড করে' অগ্রসর হওয়া চলে না, কাজেই ভারতীয় রূপচর্চ্চা একান্ত জটিল হয়ে' পড়েছে।

অষ্টম শতাব্দীতে এল এক ভাবের সুপ্রবল উচ্ছ্বাস এক বিরাট রূপসৃষ্টির প্লাবন—পূর্ব্বাঞ্চলে। কোন লেখকের মতে বঙ্গ ও বিহারে এক শতাব্দীতে যত মূর্ত্তি রচিত হয়েছিল ভারতের সকল প্রদেশের রচনা যোগ করে'ও সংখ্যায় ততটা হয়নি—এ প্রাচুর্য্য সামান্য ব্যাপার নয়। পাল ও সেন রাজাদের আধিপত্যের আমলে একটা নূতন উন্নয়নের যুগ ভারতবর্ষে সংক্রামিত হয়। সে যুগের আদর্শ ও তত্ত্ব গুপ্তযুগের অনুরূপ ছিল না। বস্তুতঃ গুপ্তযুগের মূর্ত্তি বাঙ্গলাদেশে অতি সামান্যই পাওয়া গেছে। বাঙ্গলাদেশ একটা স্বপ্রতিষ্ঠ ভাবজগৎ সৃষ্টি করবার সুযোগ পালরাজাগণের আমলে লাভ করে—তখন বাঙ্গলার সৃষ্টি-প্রতিভা ও সমীকরণের উৎসাহ একটা বিরাট আধার রচনা করে তৃপ্ত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের পক্ষে এযুগের সমুত্থান একটা হেঁয়ালীর ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এ রকমের একটা পরাসৃষ্টির প্রেরণা কিরূপে মুঞ্জরিত হ'ল তা তারা ঠিক করতে পারেনি। বস্তুতঃ এটা একটা বিরাট ভাব পরিবর্ত্তনের যুগ—বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ আলো এ সময়েই অস্তমিত হয়। তার পরিবর্ত্তে আসে তন্ত্রবাদ যা সমগ্র এসিয়ায় পরিব্যাপ্ত হয়ে এক অপরূপ পটক্ষেপ করে' সকলকে বিস্মিত করে দেয়।

মহাযানবাদ প্রচ্ছন্ন তন্ত্রবাদের উপর নিহিত হ'য়ে' ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। ধর্ম্মপালের পূর্ব্বতন যুগে মন্ত্রযানবাদের সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযানও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমস্তই তন্ত্রনামে অভিহিত হয়। তান্ত্রিকরা পালরাজাদের সময় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছে। একদিকে এই বিরাট সাহিত্য রচনা, অন্যদিকে কলাক্ষেত্রে তান্ত্রিক দেবতাগণের রূপরচনা, এই দু'ধারায় পালযুগের শীলতা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ক্রমশঃ এ সমস্ত ধর্ম্মবিধি ও তান্ত্রিক সাধনা নেপাল, তিব্বত ও চীন প্রভৃতি দেশে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে গৌড়ীয় ভাবসম্পুটের অপরূপ বাহনস্থানীয় হয়।

এ যে একটা বিরাট বিপ্লব সমস্ত এসিয়ায় পরিব্যাপ্ত হ'ল তা' প্রাক্‌ভারতীয় রূপকেই আত্মপ্রকাশের জন্য গ্রহণ করে—আর সমস্ত বৌদ্ধ রূপরীতি ও প্রথা এক্ষেত্রে অপ্রচুর হয়ে' পড়ে। অসংখ্য ও অসামান্য দেবমূর্ত্তি রচনায় প্রাক্‌ভারতীয় রূপ-প্রতিভা অফুরন্ত লীলায় হিল্লোলিত হয়। নেপালে এবং অন্যত্র সমগ্র দেবকল্পনাই তন্ত্রোক্ত নূতন পরিকল্পনায় ও আধারে অধিষ্ঠিত হয়। বলা প্রয়োজন সমসাময়িক ধর্ম্মব্যবস্থার ভিতর বাঙ্গলার তন্ত্রবাদের স্থান শীর্ষদেশেই ছিল। শুভকর বজ্রবোধি ও অমোক চীনদেশে অসাঙ্গের যোগাচার ধর্ম্ম আনয়ন করে। চীনের ইতিহাসে অষ্টম শতাব্দী একটা গৌরবের যুগ এ সময় ধ্যাঙ্গ-আন চীনের রাজধানী ছিল এবং সকল জাতির ও দেশের ধর্ম্মচর্চ্চা হ'ত এই জায়গায়। জাপানী পণ্ডিত কুকাই এসে পারস্য, খৃষ্টীয় প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম আলোচনা ক'রে সমসাময়িক সকল ধর্ম্মের ভিতর তান্ত্রিক ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠজ্ঞানে জাপানে নিয়ে আসে। তান্ত্রিক তত্ত্ব প্রচলিত ভারতের সমস্ত ধর্ম্মচিন্তাকে সংহত করে একটা ঐক্য দেয়। শৈব, শাক্ত বৈষ্ণব সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি পাঁচটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তন্ত্রান্তর্ভূত হয়ে অধিকাংশ স্থলেই আরাধ্য দেবের সহিত শক্তি যোগ ক'রে বিরাট তন্ত্রশাসনকে অনুসরণ করেছে। কৃতিত্বের হিসেবে শক্তিবাদ বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা বিরাটতর কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৌদ্ধবাদের পরাজয়ও তা সূচিত করেছে—তত্ত্বে, সাহিত্যে ও কলায়। প্রাক্‌ভারতীয় রীতির সাহায্যে কলাক্ষেত্রে যা সংসাধিত হয়—গৌড়ীয় সাহিত্য ও সাধনাক্ষেত্রে ধর্ম্মজগতে তা' সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

গুপ্তযুগের সহজ ও তরল ভাবলীলা যে উপাদানে প্রতিফলিত করা হয় পালযুগের গভীর ও দূরগামী তত্ত্ব সেরূপ উপায়ে বিম্বিত করা সহজ হয়নি। পালযুগের কলাচক্রের প্রধান কেন্দ্র মগধে প্রতিষ্ঠিত ছিল—তা' পাটনা জেলার দক্ষিণাংশ ও গয়া জেলার এদু'টি জায়গার সীমান্তর্গত। এ সময়কার অসংখ্য মূর্ত্তি নালন্দা গয়া ও কুরকিহারে আবিষ্কৃত হয়েছে। বস্তুতঃ প্রাক্‌ভারতীয় রীতি গৌড়, মগধ, মিথিলা, নেপাল ও অযোধ্যা

পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর

[নেপাল]

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বরেন্দ্রভূমিতে প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলি প্রায়ই একাদশ ও দ্বাদশ শতকের। এসমস্ত মূর্ত্তি প্রায়ই বৌদ্ধধর্ম্মের দ্যোতক। নবম শতকের অধিকাংশ মূর্ত্তিই মগধে পাওয়া গেছে। সম্রাট দেবপাল বৌদ্ধ ছিলেন—পালরাজাদের আমলে একমাত্র গৌড়েই বৌদ্ধধর্ম্ম জাগ্রত ও জীবন্ত ছিল। কাজেই

নানা দেশ হ'তে বৌদ্ধপণ্ডিত ও তীর্থযাত্রী গৌড়ে এসে সমাদর লাভ করত। বস্তুতঃ কনৌজের গুর্জরদের অধিকার দূরীভূত করে প্রথম মহীপালই দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ব্রহ্মপুত্র হ'তে শোননদী, হিমালয় হ'তে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত

শিবানুচর
[নেপাল]

এবার একছত্র হ'ল। ফলে বিরাট পালরাজ্যে বাঙ্গলার রীতির প্রস্তাব বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ হল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাঙ্গলা দেশের শিল্পকলার স্রোত প্রতিহত হয়—তৎপূর্ব্বে বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক উদ্দণ্ডপুর (বিহার) ধ্বংস ও নালন্দার লুণ্ঠন (১১৯৯) গৌরবদীপ্ত বাঙ্গলার ইতিহাসের একটা অন্ধকারপূর্ণ অধ্যায়।

পাল ও সেন রাজগণের আমল ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রবল ঊর্ম্মি ও প্রত্যূর্ম্মির দ্বারা মুখরিত ছিল। বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রবাহ ক্রমশঃ শুধু পূর্ব্বভারতকে আচ্ছন্ন করে' ফেলে এবং বলা হয়েছে সুদূর প্রাচ্যে বাঙ্গালী প্রচারকগণ এসমস্ত মতবাদ বিস্তৃত করতে উৎসাহিত হয়।

পালরাজগণের একছত্র সাম্রাজ্যে প্রাক্‌ভারতীয় রীতি অভ্যুত্থান ও গভীরতর পাদ পীঠে স্থাপিত হয়। এ রীতিকে যুগে যুগে যে সমস্ত বিচিত্র মূর্ত্তি ও বিগ্রহ রচনার ভার গ্রহণ করতে হয়েছে যে-কোন ভাস্কর্য্যের পক্ষে তা' দুঃসাধ্য ছিল। গৌড়াধিপতিদের এ প্রসঙ্গে প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে পূর্ব্বভারতে একটা শীলতাগত ঐক্য স্থাপন করা। এই ঐক্যই সমগ্র রূপরচনার ক্ষেত্রে একটা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য স্থাপন। তাতে নেপাল হতে উড়িষ্যা এবং বিহার হ'তে চীন পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের মূর্ত্তিশিল্পে এক অখণ্ড সৌন্দর্য্য সংস্কার সাধিত হয়। গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক উড়িষ্যারও অধিপতি ছিলেন। ফলে প্রাক্‌ভারতীয় রীতি ভারতের ইতিহাসের পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে বিশ্বভারতীয় রীতি বলেই পরিগণিত হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য রীতি এই রীতির মর্য্যাদা ও ব্যঞ্জনার বহুমুখী কৌলীন্যের ভগ্নাংশও দাবী করতে পারে কিনা সন্দেহ।

পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের বিচিত্র বিষ্ণুমূর্ত্তি, মুঙ্গের, বুদ্ধগয়া, নালন্দা ও গোরক্ষপুরের বিষ্ণুমূর্ত্তি বাঙ্গলার প্রভাবে অনুষিক্ত নেপালের বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রভৃতির ভিতর একটা গভীর সমানধর্ম্ম লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র বৈচিত্র্যের ভিতর এই ঐক্য অতি হৃদয়গ্রাহী হয়ে পড়ে। শুধু বিষ্ণুমূর্ত্তি কেন সমগ্র দেবমূর্ত্তি সঞ্চয়ে এক অপূর্ব্ব সৌকুমার্য্য ও সরস স্বাভাবিকতা দীপ্যমান হবে। এদেশে এ বিরাট সৃষ্টির হৃদ্‌কম্প খুব কমলোকই অনুধাবন করেছে। আধুনিক বাঙ্গলাদেশ অজন্তা ও এলোরার অলীক ও অজানা নাগপাশে বদ্ধ। অথচ বাঙ্গলা দেশের সৌন্দর্য্যের স্বাধীনতাবাদ যুগযুগান্তরের জন্য একটা মুক্তির পথ রচনা করে' রেখেছে। বহু সাধনায় ও ত্যাগে—ভাবের অন্তর্মথিত হোমানলে সে স্বাধীনতাকে বরণ করা হয়েছিল। পরিতাপের বিষয় সাধারণের সে সম্বন্ধে জ্ঞান অতি অকিঞ্চিৎকর। উড়িষ্যার কতক অঞ্চল অন্ধ্রদেশের শীলতার সহিত যুক্ত—অবশিষ্টের প্রাণকম্প বাঙ্গালার সহিত গ্রথিত। খিচিঙ্গে প্রাপ্ত ময়ুরভঞ্জের রীতিতেও বাঙ্গলার প্রভাব সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে বাঙ্গলা কথাটির ব্যবহার অপরিহার্য্য হয়ে উঠে—কারণ

গৌড়ীয় শিল্প একটা ব্যাপক সৃষ্টি। পালরাজগণের সার্ব্বভৌমিক প্রাধান্যের পূর্ব্বেও রাজধানী পাটলীপুত্রের প্রভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যগণের একটা শিল্পকীর্ত্তি ছিল। পালরাজগণ বাঙ্গলাদেশ ও সমগ্র পূর্ব্বভারতে নিজের শীলতার প্রভামণ্ডল বিস্তৃত করে' বাঙ্গলার ধর্ম্মে সমগ্র রূপচিন্তাকে রঞ্জিত করে। এই ধর্ম্মই ক্রমশঃ পরবর্ত্তী শতাব্দীতে একটা সৌন্দর্য্যব্যূহ রচনা করে যা' সকলেরই শ্রদ্ধার বিষয় হয়েছিল। সে ধারা পাহাড়পুরের অজস্র রূপসৃষ্টিতে একটা উল্লোল বন্যা এনেছিল। বস্তুতঃ শুধু পাহাড়পুরের কেন্দ্রে যা' কিছু শিল্পসম্পদ্ পাওয়া গেছে জগতের কোন একটি কেন্দ্রে সেরূপ কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি। বিস্তৃতভাবে সে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

পালরাজগণের প্রভুত্বের অন্তরালে ছিল সচকিত বাঙ্গালার ক্ষুরধার দৃষ্টি ও মনন। অন্য ক্ষেত্রে বিশেষতঃ বিপুল বৌদ্ধ-সাহিত্যে তা' দেখিয়েছে অসাধারণ মনীষা ও সংস্কৃতির আবেগ। যে মুহূর্ত্তে বাঙ্গলার সম্রাটের নবজাগ্রত প্রেরণায় ভাস্কর্য্যে একটা বিরাট সৃষ্টির অবকাশ হ'ল সে শুভ মুহূর্ত্তে বাঙ্গলার দুর্লভ ও মহান জাতীয় প্রতিভা ও সংস্কার প্রচলিত সমগ্র বিধি ব্যবস্থা ও রূপশাসনকে মথিত করে' এক রূপলক্ষ্মীর জন্মদান করল যা'তে শুধু উপস্থিত প্রয়োজন মাত্র সিদ্ধ হলনা—একটা চিরন্তন রূপমার্গ কাটা হ'ল। এই রূপযানেই আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতের শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তি উৎসারিত হয়েছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালা দেশে সেই যে রূপভিত্তির পত্তন করা হয়েছে আজ পর্য্যন্ত অবিসম্বাদিত ভাবে সদাজাগ্রত ও নব নব ভাবোন্মেষের সহিত সঙ্গতি রক্ষার সে রীতি প্রবহমান হয়ে এসেছে। বাঙ্গলার বর্ত্তমান মৃদ্ভাস্করেরা আদিযুগের সে বিরাট স্রষ্টাদেরই ধারা বহন করে এসেছে।

কোন ইউরোপীয় লেখক স্বীকার করেছেন সেন রাজগণ যখন মুসলমান আক্রমণে বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ হ'তে অন্তর্দ্ধান করেন—যখন মূর্ত্তিবিদ্বেষী ইসলাম চারিদিকেই মূর্ত্তিধ্বংসের ঝড় তুলে' একটা ধূসর ধূলিপটলের সমারোহ করে' তোলে তখন বাঙ্গলার প্রতিভা মূর্ত্তিশিল্পকে শ্রেষ্ঠতম পীঠে স্থাপন করে' অমরত্বের দাবী সফল করে' তুলেছে। সে দাবীর মৃত্যু নেই। যখনই কোন সাহিত্য বা শিল্প চেষ্টা একটা চরম সিদ্ধির স্তরে উপস্থিত হয় তখনই তা নানাভাবে ও দিকে প্রচ্ছন্ন ও মুক্তভাবে সকল সাধনাকে পরিব্যাপ্ত করে। এজন্য বাঙ্গলা দেশের মুসলমান যুগেও গৌড়ের বাদশাহদের কীর্ত্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বচ্ছন্দ ধর্ম্মে অনুসিক্ত এবং কোন কোন বিষয়ে তা' সমগ্র ভারতের অনুকরণস্থানীয় হয়েছে। বস্তুতঃ বাঙ্গলার মুসলমান স্থাপত্য ও পশ্চিম ভারতীয় রীতিকে প্রত্যাখ্যান করে' স্বপ্রতিষ্ঠ লালিত্যে সকলের চিত্তহরণ করেছে, এমন কি সাহিত্য ক্ষেত্রকেও তা' 'মহাভারত' 'রামায়ণ' শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির অনুবাদ সাহিত্য দ্বারা সমৃদ্ধ করে' তুলেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রাক্‌ভারতীয় শীলতা বাঙ্গলার প্রতিভাকে অন্তর্গ্রহণ করে যে রূপরাজ্য রচনা করেছে তা' সাময়িক উচ্ছ্বাস বা ক্ষণভঙ্গুর উৎসাহের উপর নিহিত ছিল না—তা একটা পরম উপলব্ধি ও সমন্বয়ী সাধনার উপর ফলিত হয়েছিল।

যমুনা

[কনারক]

ভাস্কর্য্যক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতও অন্ধ্রদেশের কীর্ত্তিও সামান্য নয়। কিন্তু উৎসতঃ প্রাক্‌ভারতীয় রীতির সহিত সে সবের

আন্তর বিভেদ আছে। উড়িষ্যার মূর্ত্তিশিল্পে যতটুকু অন্ধ্র প্রভাব আছে তাতেও প্রাক্‌ভারতের রীতির সহিত ভিন্নতা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য হয় না। সে বিভেদ নানাদিক দিয়ে অনুধাবনের বিষয়—কিন্তু সব চেয়ে আর একটা আদিম

রাধাকৃষ্ণ

[পাহাড়পুর]

বৈপরীত্য সকলের চোখে পড়ে। দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর্য্য স্থাপত্যের অঙ্গস্থানীয় বা architectonic। ভূয়িষ্টভাবে মন্দিরের অলঙ্কারস্থানীয় হয়েই মূর্ত্তিগুলির সৃষ্টি হয়েছে। মূর্ত্তির জন্য মন্দির নয় মন্দিরের জন্যই যেন অসংখ্য মূর্ত্তি সৃষ্টি হয়েছে। মূর্ত্তি যখন অলঙ্কারস্থানীয় হয় তখন তা' পূজ্য-পূজকের মহার্হ সম্পর্ক হ'তে বহুপরিমাণে স্খলিত হয়—তা'কে নিয়ে যথেচ্ছ বিহার সম্ভব হয়। তার ভিতর সূক্ষ্মভাব প্রয়োগ ও পেলব ব্যঞ্জনার সন্নিবেশের উৎসাহ থাকে না। মন্দিরের অংশরূপেই সে সব মূর্ত্তির স্বার্থকতা। এজন্য মূর্ত্তির সম্পর্ক উপাসকের সঙ্গে নয়—নিজের পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিতই যোগ থাকে বেশী। কাজেই পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতের দেবমূর্ত্তির তুরীয় মূর্চ্ছনা এসব রচনায় পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ, শুধু মণ্ডনের দিক্ দিয়ে দেবরচনা করার মূলে আছে একটা লঘুতা। দ্রাবিড় অন্তর বস্তুবাদী প্রাচুর্য্যের আশ্রয় খোঁজে—দ্রাবিড় শীলতায় জড়বাদের অবসর প্রচুর। এজন্য তা' মিশরের মত উত্তুঙ্গ মন্দির নির্ম্মাণ করে' অসীমের সীমা খোঁজে। এই উত্তুঙ্গতার অঙ্গীভূত হয়ে দেবমূর্ত্তিও বস্তুবাদের (object) বিষয় হয়ে পড়ে। এজন্য অন্ধ্রদেশের নটরাজে শরীরভঙ্গের মুগ্ধকর লীলা আছে কিন্তু মনোভঙ্গের ঐশ্বর্য্য তেমন নেই। অপরদিকে পূর্ব্বাঞ্চলের সভ্যতার সংযোগে এলোরায় ও অজান্তায় আছে একটা আন্তর স্বাধীনতার সংগ্রাম। মনোজগতের লীলাভঙ্গ যেমন একদিকে সুস্পষ্ট—

বলরাম

[পাহাড়পুর]

অন্যদিকে তা' দেহচাপল্যের অফুরন্ত শ্রীর সহিতও সুসঙ্গত। কিন্তু ভাস্কর্য্যশ্রী তবুও গুহার এই অজ্ঞান৷ অন্ধকার অভ্যন্তরে স্থাপত্যের লীলাকবল হ'তে মুক্ত নয়।

বিষ্ণু
[গৌড়ীয় রীতির প্রাচীনতন মূর্ত্তি]

পূর্ব্বভারতীয় দেবরচনা মণ্ডনস্থানীয় ব্যাপার মাত্র হয়নি। বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে এবং বাঙ্গলা দেশ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বৃহত্তর বঙ্গে দেবমূর্ত্তির স্বপ্রতিষ্ঠ লালিত্য দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়। দ্রাবিড় রচনায় একটির পর একটি দেবমূর্ত্তি মন্দিরের বহিরঙ্গ শোভা বর্দ্ধন করে' যেন গৌরবহীন হয়ে যায়---বাঙ্গলা দেশের দেবমূর্ত্তি মূর্ত্তি হিসেবেই রচিত— আসবাব হিসেবে নয়। মানবদেহের অন্তরঙ্গলীলা তান্ত্রিক ভাবুকগণ যতটা পরখ করেছে এমন আর কেউ নয়। এই অন্তরঙ্গ লীলার শোভন ঐশ্বর্য্য প্রাক্‌ভারতীয় সৃষ্টিতে নানা ভাবে দীপ্ত করার সুযোগ ও অবসর দিয়েছে বাঙ্গলার মনস্তত্ত্ব।

বাঙ্গলা দেশের মূর্ত্তিতে আছে বিগলিত মানবিকতা এবং রসোজ্জ্বল সামাজিকতার এমন এক আকর্ষণ যাতে করে' সহজেই হৃদয় আকৃষ্ট হয়। এদেশে মানুষের স্বাভাবিক চেহারার সহিত শিল্পীর বিরোধ কখনও ছিল না—এই স্বভাব সম্পর্কের উপর আরোপিত হয়েছিল সৌন্দর্য্যের একটা রসগত ঐশ্বর্য্য। কোন রকম উৎকট ভঙ্গীতে (mannerism) এই সার্ব্বভৌম রীতি বিকলাঙ্গ হয়নি। অজন্তা ও এলোরার যেটুকু বিভব বিশিষ্ট ভাবে চিত্তহরণ করে—সেটুকু তা'কে সাময়িক ও শীর্ণ করে তোলে। বাঙ্গলার মর্ম্মর শিল্পে একান্ত ভাবে প্রাদেশিক গ্রাম্যতা নেই বলে নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে সাধনামালাদি গ্রন্থের নির্দ্দেশে অসংখ্য দেবতাদি রচিত হয়েছিল। বস্তুতঃ বাঙ্গলার শীলতা ভাস্কর্য্য ক্ষেত্রে রূপের একটা রাজপথ রচনা করে; সমগ্র প্রাচ্যভূমির অগণ্য নর-নারী সে পথে আনাগোনা করে ধন্য হয়েছে।

বাঙ্গালীর রক্তে আছে আর্য্য, দ্রাবিড় ও মোঙ্গলের সংমিশ্রণ। আর্য্য সম্পর্ক বহুত্বের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন করে —ভাবাত্মক (abstract) মনের তাঁতে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি মনীষীগণ বাঙ্গালীর মনের এই সমন্বয়ী বৃত্তির পরিচয় দিয়েছে তিব্বতে। চ্যাং চুয়াং বিরোধী বৌদ্ধতন্ত্রে যে জটিলতা ছিল সমগ্র এসিয়ায় তা' নিরাকরণের জন্য আর কোথাও না গিয়ে বাঙ্গালীর চরণতলে আশ্রয় নেয়। অত বড় চৈনিক পণ্ডিত এপর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি। একদিকে বাঙ্গলার এই সূক্ষ্ম বোধশক্তি—অন্যদিকে দ্রাবিড় সম্পর্কে বস্তুগত জগৎ সম্পর্কে (objective world) একটা বোঝাপড়া ও সুষমা সম্পাদন বাঙ্গলার শীলতায় এক অপূর্ব্ব সম্পদ দান করেছে। মঙ্গোলীয় সম্পর্ক নিয়ে এসেছে অতি সুকুমার রচনার সুষমা, হস্তলীলার (Craftsmanship) লঘু কৃতিত্ব এবং সুনিপুণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি ও সাধনার অবিচ্ছেদ্য পরম্পরা। আর্য্য স্বপ্ন ও সমন্বয় দ্রাবিড়ের পার্থিব বাস্তবতা ও ন্যায় (logic) এবং মঙ্গোলের সূক্ষ্ম মনের বুনন ও হাতের লঘুতা বাঙ্গলা দেশে রচনা করেছে এক দিবাস্বপ্ন। তাই প্রাক্‌-ভারতীয় মর্ম্মর স্বপ্নে ফুটে উঠেছে একটা কল্পনা জগৎ মাত্র নয়—কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয়; এবং সূক্ষ্মতার সহিত তা' প্রতিপাদন বাঙ্গলা ভাস্কর্য্য সম্ভব করে' তুলেছে। একান্তভাবে ভাবতন্ত্রও নয় বস্তুতন্ত্রও নয়—অথচ রূপসীমান্তের সমগ্র দিক্‌ আচ্ছন্ন করে' বাঙ্গালী রচনা করেছে অনবদ্য দেবমূর্ত্তি। এই

প্রবন্ধে প্রদত্ত বাঙ্গলা দেশের সরস্বতীমূর্ত্তিতে এই সঙ্গতি দেখতে পাওয়া যাবে। পাহাড়পুরের রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও বলরাম মূর্ত্তিতেও

সরস্বতী
[বঙ্গদেশ]

সহজ বিশ্বতোমুখী মানবিকতার সঙ্গে রস-সমারোহে ভরপুর একটা ভাবপ্রবাহ দীপ্ত হচ্ছে। দক্ষিণ বাঙ্গলার ভবানী মূর্ত্তিতে আছে একটা কঠোর রস-সম্পর্ক—অথচ তাও পূজ্য পূজকের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেনি। নেপালের সৃষ্টিতে প্রাক্‌ভারতীয় পদ্ধতি কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে সফল হয়েছে। শিবানুচরের প্রগল্ভ গাম্ভীর্য্য ও ভাববিহ্বলতা এবং পদ্মপানি অবলোকিতেশ্বরের সহজ কৌলীন্য ও ঐশ্বর্য্য কোনরকম কৃত্রিম অবস্থার সহায় চায়নি। মগধের ও কুর-কিহারের লোকেশ্বরমূর্ত্তির ভিতর গৌড়ের স্পর্শের প্রথম শিহরণ লক্ষিত হয়—অহল্যাপাষাণী যেন সহজ মানুষ হয়ে' জেগে উঠ্‌ছে সমস্ত কৃত্রিম ভঙ্গী ও অলীক আবেষ্টনকে ত্যাগ করে। এ প্রসঙ্গে গৌড়ীয় শিল্পীর সর্ব্বপ্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তিও দ্রষ্টব্য। নালন্দায় প্রাপ্ত তারামূর্ত্তি একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি—প্রাক্‌ভারতীয় রচনার একটা প্রকৃষ্ট নমুনা। কনারকের যমুনামূর্ত্তির তুলনা পাওয়া কঠিন। এমন স্বচ্ছ ও পুলকিত প্রসন্নতা প্রস্তরে ব্যক্ত করা যেতে পারে এ বিশ্বাস সহজে জন্মে না। প্রাক্‌ভারতীয় শীলতার সম্পর্কে এ মূর্ত্তিতে স্বাভাবিকতাও অনুধাবন করার ব্যাপার। খিচিঙ্গে প্রাপ্ত মহাদেবমূর্ত্তিতে দেখা যাবে বাঙ্গলার রীতি সমস্ত বাধা ভেদ করে জয়যুক্ত হয়েছে। বৃষভের জান্তব আননের ভিতর দিয়েও মানবিক ভাবের সুস্পষ্ট প্রতিমা সকলকে বিস্মিত ক'রে দেয়। মহাদেবের দিকে উন্মুখতা ও একান্ত নির্ভরতা স্বর্গে ও মর্ত্তে এক অপূর্ব্ব সেতু রচনা করেছে জান্তব রূপের ভিতর দিয়েও। প্রাক্‌ভারতীয় সাধনার পক্ষে সকল বাধা ধূলিসাৎ হয়েছে। বস্তুতঃ জগতের ইতিহাসে এমন প্রাচুর্য্য কোথাও

ভবানীমূর্ত্তি
[দক্ষিণবঙ্গ]

নেই এবং এমন রত্নসম্ভব রীতিও কখনও সৃষ্ট হয়নি। অক্লান্ত সৃষ্টিতেও এই রীতির গঙ্গোত্রী বিশুষ্ক হয়ে যায়নি। অফুরন্ত যৌবনশ্রীর উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গ অহরহ দশদিক মুখর করে' তুল্‌ছে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

মরা পাখীর পালক

শ্রীবিমল মিত্র

স্বভাবতঃ আমি একটু নির্জ্জনতা-প্রিয়; তাই সবাই আমাকে ভাবে লাজুক। কাউকে আমি আনন্দ দিতে পারিনা; সাধারণ লোকে প্রথম পরিচয়ে কেউ আমার সঙ্গ কামনা করেনা। নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে হ'লে আমাকে বিপদে পড়তে হয়! তাই যখন যেখানেই আমি যাই, পরিচিতদের দৃষ্টি-পরিবেষ্টিত হওয়ার কুণ্ঠা আমায় ভোগ করতে হয়না। নিশ্চিন্তে আর নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা করি; অপরিচয়ের অবাধ স্বাধীনতায় আমার দিন কাটে! আমার কোনখানে ত্রুটি কোনখানে ফাঁকি—তা' ধরা পড়ার লজ্জা থেকে আমি বাঁচি!

কিন্তু তবু এইবার পুরীতে এসে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হ'য়ে গেল। কী জানি প্রসাদবাবু কেমন ক'রে বুঝি জানতে পেরেছিলেন আমি লেখক! নিজে থেকে এসে পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ ক'রে তুললেন, তখন আর তাকে এড়াতে পারলাম না! এত লোকের মধ্যে আমি কেবল মাত্র একজন সঙ্গী পেলাম। সত্যি কথা বলতে, সেইদিন থেকে তাঁকে আমার ভালো লাগতে লাগলো; তার কারণ হয়ত এই যে আমার লেখার তিনি নিন্দে করতেন!

সেদিন হোটেলের বারান্দায় চুপ করে বসেছিলাম। ওদিকে আরো ওদিকে, যেখানে ভ্রমণবিলাসী ছেলেমেয়েরা সমুদ্রের তীর ধরে হেঁটে চলেছে, সেখানে কত মানুষের ভীড়! সমুদ্রের জলের শব্দে—অস্পষ্ট অন্ধকারে—আর এই বহমান ঠাণ্ডা বাতাসের আবহাওয়ায় আমি নিজেকে বড় আপনভাবে কাছে পেয়েছিলাম। সারা জীবনের অপরিচিত পথ চলায় কত পরিশ্রান্তি কত—কষ্টার্জ্জিত অভিজ্ঞতা—কত অগণিত উদ্দেশ্যের অর্থহীনতা—সমস্ত আজ নিজের কাছে প্রকট হ'তে লাগল! এই বিশ্রাম, এ আমার কাছে কত অমূল্য! চিন্তায় আর পরিশ্রমে সারাজীবন কত স্বার্থত্যাগ করেছি। অনেকদিন আগে কবে কা'র কাছে জিনিষ কিনে পয়সা দিতে ভুলে গেছি, কবে ট্রেণে কোন্ সহযাত্রীর কাছে বই পড়তে নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি, কবে আমার পায়ের চাপ লেগে এক বেরালছানা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল—এই সমুদ্রের অপরিমিত বিশালতার দিকে চেয়ে সেই সব দিনের ছোট ছোট খুঁটিনাটিকে কেন মনে পড়ছে! আরও মনে পড়ছেঃ একটি দিনের কথা, একটি মেয়ের কথা নিতান্ত আকস্মিকভাবে বিনা চেষ্টায় যা'কে কাছে পেয়েছিলাম, কিন্তু চেষ্টা করেও যা'কে ধরে রাখতে পারিনি। ওই প্রশান্ত পটভূমিকার ওপর অলস অপরাহ্ণের এই বিশাল বিস্তৃতি এই বর্ণ-সুষমা এ আমার বড় ভালো লাগছে!

পাশেই আর একটা চেয়ার ছিল; কখন প্রসাদবাবু এসে সেটাতে বসেছিলেন টের পাইনি, একটু পাশ ফিরতেই নজরে পড়ল!

বললাম—নমস্কার, কখন এলেন?

প্রসাদবাবু বললেন—লেখক মানুষ আপনারা, সমুদ্রের দিকে চেয়ে কত কি ভাবছিলেন তাই বিরক্ত করিনি; কিন্তু কী দেখছিলেন বলুন তো? সমুদ্র? দেখে দেখে আমার চোখ পচে' গেল মশাই, অমন মূর্ত্তিমান একঘেয়েমি আর কখনও দেখেছেন! সেই প্রেমের গল্পের মত একঘেয়ে বলুন! কতবার যে এখানে এসেছি তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু চোদ্দ বছর আগে একদিন যা' এসে দেখিছি, আজ এই এখন এই মুহূর্ত্তে সে রূপের এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নি। সত্যি সত্যি, আজ একটা অনুরোধ করব আপনাকে—আপনারা আর ওই একঘেয়ে প্রেমের গল্প লিখবেন না, সত্যিকারের একটু নতুন কিছু লিখুন দিকি, নতুন দিকে চেয়ে দেখুন তো—জীবন আর সমুদ্র অনেক তফাৎ—মানুষের জীবন আপনাদের গল্পের মত অত একঘেয়ে নয়—

প্রসাদবাবু যখন কথা বলেন—তাঁর চোখ দু'টো উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে—দাঁতগুলো নড়ে কপালের শিরাগুলো ফুলে ফুলে

ওঠে—আর ঠোঁট দুটো কাঁপে! সেই সজীব চেহারার দিকে চেয়ে দেখলে বুঝতে পারি, একদিন কত উৎসাহ কত উত্তেজনা ছিল ওই বুকে—কিন্তু কেন জানিনা মনে হয়ঃ কোথায় অন্তরের প্রান্তদেশে বুঝি তার নিদারুণ দৈন্য—কোথায় যেন তা'র দুর্ব্বলতা!

বললেন—আজ আপনাকে একটা গল্প বলব, চলুন বীচের ওপর বেড়াতে বেড়াতে বলিঃ আমার এক বন্ধুর জীবনী। দেখবেন জীবন কত রূঢ় রুক্ষ, আর আপনাদের গল্প কত মেকি, এ নিয়ে আজ পর্য্যন্ত কেউ কোথাও লেখেনি, কিন্তু—একটু দাঁড়ান, টর্চ্চটা নিয়ে আসি।

চারিদিকে সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে; বীচের ওপর ভীড় পাৎলা হ'তে সুরু হোল। সুসজ্জিতা আর কুসজ্জিতা ছেলে মেয়েদের কথাবার্ত্তায় বাতাস ভারী, টুক্‌রো কথা, গান, সিগ্রেটের ধোঁয়ায় মন বিরস হ'য়ে উঠলো। এই ভীড় ছেড়ে আমরা চক্রতীর্থের দিকে চলেছি। প্রসাদ বাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। সত্তর কি আশী বছর বয়েসের বৃদ্ধ; আশে পাশের কোনও দিকে তা'র আজ ভ্রূক্ষেপ নেই। কবেকার কোন বসন্তের বিস্মৃত কথার জালে হয়ত উনি ধরা পড়েছেন—অশ্রুজলের তীর্থে যে কয়টা পূজার ফুল আজও শুকোয় নি হয়ত সেই সব কথা! সোনামাখা একটি মেয়ে—প্রীতিমতী একখানি মুখ, ভাসা ভাসা দু'টি চোখ, বাঁকা ভুরু আর রাঙা ঠোঁট হয়ত পঞ্চাশ বছরের উজান ঠেলে আজ এই বৃদ্ধের মনে উদয় হোল; চুপ করে পাশে পাশে চলতে লাগলাম।...

প্রসাদবাবু বললেন—মানুষের জীবনে কারো কারো এমন সময় আসে যখন মনে হয়ঃ এ কিছু না—এই বেঁচে থাকা! দিনের পর দিন প্রাণধারণ আর কুৎসিৎ পৃথিবীর গ্লানি বহন ক'রে বাঁচা! এ কিছু না, কেবল শরীরের একটা ক্ষতচিহ্নের মত রক্তের নিঃসারতা প্রমাণ করা! কেবল ছন্দ-পতন! এক এক সময় সত্যিই এমনি মনে হয় আমাদের অথচ কোনও যুক্তি-সঙ্গত উপায় নেই সেই যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার, দিনানুদৈনিক সেই অসহনীয় যন্ত্রণা—শুধু চলতে হবে একঘেয়ে পথ-শ্রমের ক্লান্তি নিয়ে! দীর্ঘ নিঃশ্বাসের তাপে বাতাস হয়ত দূষিত বিষাক্ত হয়ে উঠবে; আমরা বেঁচে থাকি—নিঃশ্বাস ফেলি—নিতান্ত যান্ত্রিক অভ্যাসের মতই আমাদের সব করতে হয়, না করলে চলেনা, অথচ প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা মৃত্যুর ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করি, আমাদের জীবন বিষময় ফেনার স্পর্শে শিথিল হ'য়ে আসতে থাকে; আমরা মরতে চাই, সমস্ত এই বিকৃতির থেকে মুক্তি পেতে চাই, কিন্তু হয় কি আমরা বেঁচেই থাকি, আর জীবনকে অভিশাপ দিই—ঠিক এমনি একটি লোককে আমি চিনতাম, তারই কথা আপনাকে বলব আজ—

তখন আমরা সমুদ্রের ধার ধার দিয়ে চলেছি। হঠাৎ এক একটা অতর্কিত ঢেউ এসে আমাদের পা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অবিমিশ্র সাদা ফেণায় সমুদ্রের ধার শুভ্র হ'য়ে উঠছে। সেই ঢেউএর সঙ্গে চিক্ চিক্ করে উঠছে নানা রঙের ঝিনুক...ছোট, বড়, মাঝারি। ভিজে বালির উপর দু'জোড়া পদচিহ্ন রাখতে রাখতে আমরা চলেছি; অনেকদূরে পূব মুখো ঝাউবন—ছাড়া ছাড়া বাড়ী—স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ী বৃদ্ধ বৃদ্ধা আর রোমাঞ্চ-সন্ধানী যুবক যুবতীদের ভীড় এদিকে পাৎলা হ'য়ে এল। সমুদ্রের নীল জলে কষ্টুমপরা শ্বেতাঙ্গ আর শ্বেতাঙ্গীদের দেহ এই অন্ধকারেও স্পষ্ট! সমস্ত কোলাহল আর কল্লোল পেছনে ফেলে আমরা অনেকদূরে চ'লে এসেছি—অতীত দিনের গল্প বলা আর শোনার পক্ষে একান্ত অনুকূল আবহাওয়া!...

প্রসাদবাবু বলতে লাগলেন—ধরুন সুগতিবাবু তাঁর নাম। নাম শুনে আমরা যে রকম চেহারার কল্পনা করি তাঁর চেহারা মোটেই তেমন নয়। ছ'ফিট দু'ইঞ্চি লম্বা একটি দেহ—বলিষ্ঠ বাহু—মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অবয়বের একটি সুগঠিত সামঞ্জস্য; প্রথমে দেখলে মনে হবে লোকটি সবল সুস্থ আর মানসিক শক্তিতে অটুট। সত্যি কথা বলতে, বাঙ্গালীর মধ্যে সে-রকম চেহারা দেখলে দুদণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়—সেই উদ্ধত নাসিকা আর দৃঢ় চক্ষুর সামনে অনেককেই মাথা নীচু করতে হবে; কিন্তু আর কেউ না জানুক আমি তো জানতুম সে মানুষটির ভিতর কী গোপন দুর্ব্বলতা, অহরহ মনের মধ্যে তা'র কী ব্যাধি-যন্ত্রণা—প্রাত্যহিক মুহূর্ত্ত যাপনে কী প্রবল মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষা! অনেক সময় দেখেছি সুন্দর দেখে যে ফুলটি গাছ থেকে তুলতে গেছি সেই ফুলটিতেই পোকা, সূর্য্যাস্তের রক্তিমাভার পেছনেই তো আছে রাত্রির কালো অন্ধকার! চকচকে শান্ দেওয়া ছোরাতেই তো মৃত্যুর অনিবার্য্যতা!

অর্থাৎ এক কথায় যেখানে আমাদের সঙ্কোচ আর সন্দেহ কম, ভয় আর বিপদের উৎস সেখানেই থাকে লুকিয়ে; বন্ধুর কাছেই আমরা বিশ্বাসঘাতকতা পাই শত্রুর কাছে নয়। যাক্ গে, আসল কথা বলি: এই সুমতিবাবুকে দেখলেও সাধারণ লোকের সেই ধারণাই হবে! শান্ত সুন্দর সুস্থ মনের বুঝি একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ! কিন্তু যদি সকলে দেখতো কোথায় তার গলদ—কোথায় কাঁটা ফুটছে—বাইরের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে যদি কেউ ভেতরে ঢুকতো! কিন্তু সে কেবল আমি জানতুম—খুলেই বলি এবার—তার ছিল কুষ্ঠ—শ্বেত কুষ্ঠ—ওই নীল আকাশের এককোণে একটুক্‌রো বিবর্ণ মেঘের মত একটি দাগ অস্পৃশ্য আর অশ্লীল—

প্রসাদবাবু থামলেন। প্রশান্ত মুখের ওপর নীল জলের ছায়াপাত হয়েছে। সুমতিবাবুকে চিনিনা, সুমতিবাবুকে দেখিনি, সুমতিবাবু আমার কাছে কল্পনা, কিন্তু এই প্রত্যক্ষ লোকটিকে চিনি, এই প্রসাদবাবু—কবেকার বিস্মৃত কাহিনী আজ এর মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠলো—অভ্রভেদী আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগলাম—এযেন গল্প শোনা নয়—বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি ...

প্রসাদ বাবু আরম্ভ করলেন—

—কী কোরে জানাব আপনাকে কী তাঁর যন্ত্রণা—কী তাঁর ব্যথা। বাইরে তিনি হাসতেন—গল্প করতেন—মনে হোত ভেতরটাও বুঝি তাঁর অম্‌নি সাদা; কিন্তু বুকের মধ্যে তাঁর সারা জীবন চিতা জলেছে—! আপনি বুঝতে পারবেন না কী ছিল তাঁর প্রতিভা! যদি কোনও দিন তিনি ব্যাধিমুক্ত হতেন তা' হ'লে দেশের লোক বুঝতো কত কাজের লোক তিনি! কিন্তু তা' হয়নি; নিজের ব্যাধির দুশ্চিন্তা তাঁকে এক মুহূর্ত্তের বিশ্রাম দেয় নি। তাঁর মনে হোত: ভগবানের অভিশাপগ্রস্ত জীব তিনি—যশ মান অর্থ শান্তি পৃথিবীর যা' কিছু কাম্য তা' তাঁর জন্যে নয়! মনে হয়েছে: এ পৃথিবীর তিনিও তো একজন মানুষ—ভগবানের সৃষ্ট জীবের তিনিও তো একজন —এই তৃণ, তরু, আকাশ, বাতাস, সুখ, স্বস্তি এতে তাঁরও অধিকার আছে—তাঁ'রও অধিকার আছে চাঁদের আলোয়—মুক্ত বায়ুতে, অধিকার আছে বেঁচে থাকতে—সজীব আর সবুজ প্রাণ নিয়ে চলাফেরা করতে—তাঁরও অধিকার আছে আর সকলের মত গানে আর গন্ধে পাগল হ'তে—হাসি আর কথায় উজ্জ্বল হ'তে; তিনিও মানুষ, তাঁর প্রতিবেশীর যা' আছে যেটুকু আছে তা'র চেয়ে বেশী আছে তাঁর; তবু তিনি নিঃস্ব, পৃথিবী তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে। তাঁর যেন নির্ব্বাসন হয়েছে—ওদের পৃথিবীতে প্রবেশ করবার ক্ষমতা নেই তাঁর! তিনি অস্পৃশ্য—তাঁর দেহ ব্যাধি-যুক্ত—তাঁর যে কুষ্ঠ আছে!

কী করে' আপনাকে বোঝাব সেই দিনানুদৈনিক যন্ত্রণার ইতিহাস। তাঁর ব্যাধির অশ্লীল দাগটি যেন তাঁর জীবনের পথে—তাঁর বেঁচে থাকার পথে একটা বিরাট কলঙ্ক! অপরিচিত লোকের তীক্ষ্ণ নিবদ্ধ দৃষ্টির আঘাতে তাঁর সমস্ত অঙ্গ সমস্ত ইন্দ্রিয় আগুনের মত অসহ্য হ'য়ে উঠত! কেন তাঁ'র দিকে লোকে চায়? কী তাঁর পাপ? রাস্তায় ঘরে বাড়ীতে কোথাও তাঁ'র শান্তি নেই—সান্ত্বনা নেই —সারা জগতের দৃষ্টি তাঁর ব্যাধিকে অনুসরণ করে অলক্ষ্য ও অশ্রাব্য বিদ্রুপ করছে! সারা পৃথিবীর কোথাও সহানুভূতি নেই। অসংখ্য পথচারী আর পথচারিণীর মধ্যে তাঁকে—কেবলমাত্র তাঁকে—চিহ্নিত লক্ষ্য করে' জগতের সমস্ত লোক যেন অভিশাপ বর্ষণ করছে! তাঁর স্পর্শে বাতাস নাকি বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে—তাঁর ছোঁয়ায় মাটি কলঙ্কিত হয়! পরিচিত বন্ধুরা দূর থেকে বিদায় জানায়—তাঁর বাড়ীতে আসতে তাঁ'দের হৃৎকম্প হয়! কেন তবে বেঁচে থাকা? তাঁর এক একবার মনে হোত—কেন তবে বেঁচে থাকা? আপনাকে প্রথমেই বলেছি—এক এক সময় আমরা মরতে চাই···মৃত্যুর ইচ্ছা আমাদের প্রবল হ'য়ে ওঠে—তবু আমরা পারিনা—দিনের পর দিন এই গ্লানি বহন করে' আমরা বেঁচেই থাকি—বেঁচে থাকি আর জীবনকে অভিশাপ দিই, ঠিক এমনি হোত সুমতিবাবুর—! সারা পৃথিবীর পুঞ্জীভূত বিদ্রুপ যেন তাঁর শিরে দিবারাত্রি বর্ষিত হচ্ছে! মানুষ তাঁ'কে কাছে পেতে চায়না! জানালা খুলে কত রাত তাঁর জেগে জেগে কেটেছে —কত চাঁদ আকাশে জলে' গেছে—ব্যাধির দুর্ভাবনায় তাঁর ঘুম উড়ে গেছে; জীবনকে বুঝি তিনি বড় বেশি করে' ভালবেসেছিলেন তাই মরণ ছিল তাঁর চির-শত্রু! সারা জীবনে তিনি কোনও মানুষের সহানুভূতি পাননি—তাঁর

দিন কেটেছে তাচ্ছিল্যে আর অবহেলায়! দুর্ব্বিষহ বেদনায় তাঁর জীবন ছিল ভারগ্রস্ত।

কল্পনা করুন তো এমন একটি লোককে—পথে চলতে যাঁর ভয়—বাড়ীতে থাকতেও যাঁ'র অশান্তি। তাঁ'র ব্যাধি তাঁর ওই অস্পৃশ্য দাগই তাঁ'কে এক মুহূর্ত্তের বিশ্রাম দেয় না। অথচ সত্যি বলতে সে-ব্যাধির এতটুকু যন্ত্রণা নেই—তবু অনেক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির চেয়েও এ যেন ভীষণ! সেই বিবর্ণ সাদা দাগ নিয়ে চলাফেরা, সেই শ্রান্তিহীন দুশ্চিন্তা তাঁ'কে যে শেষ পর্য্যন্ত পাগল করেনি, সে কেবল তাঁর বিশাল ধৈর্য্যের গুণে! তাঁর মনে হোত: যদি ব্যাধিই তাঁকে ভগবান দিয়েছিলেন—তবে তাঁ'কে পাগল করেন নি কেন? কেন সভ্য সমাজে, শিক্ষিত আবহাওয়ায় তাঁ'র জন্ম হোল, তবে কেন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হ'য়ে থাকার জ্ঞান তাঁর হোল! কেন তাঁর জন্ম হোল না অতি নীচ স্তরের বস্তিতে, যেখানে ব্যাধিকে কেউ ঘৃণা করে না, কারণ ব্যাধিগ্রস্ত সেখানে সবাই...সেখানে জন্মালে এমন নীরব লাঞ্ছনা তাঁ'কে ভোগ করতে হোত না—লজ্জায় ম্রিয়মান থাকতে হোত না; নির্ব্বিবাদে আর নিশ্চিন্তে জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত তাঁ'র আনন্দে কেটে যেত!—

প্রসাদবাবু এবার থামলেন। বললেন—একটা কথা আমার বলতে ভুল হ'য়ে গেছে।—সুমতিবাবুর বিয়ে হয়েছিল। একটি শান্তিময়ী সরলা মেয়ে—কী স্নেহ কী সেবা নিয়ে সে যে সুমতিবাবুর সংসারে এসেছিল, কী বোলবো! ব্যাধিগ্রস্ত লোকটিকে কীসে দেবে সান্ত্বনা, কেমন করে' দেবে প্রেম...সেই তাঁ'র চিন্তা! এই সত্তর বছর ধরে' জীবনে তো অনেক জায়গাতেই ঘুরেছি—পাহাড়ের আর সমতলের সব জায়গাতেই আমার গতিবিধি, কত লোক, কত মানুষের সঙ্গে আলাপ হোল—কিন্তু অমন একজন মহিলা আর দেখলুম না। সংসারে দৈন্য দারিদ্র আছে—আছে তো? প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে, ক'জন মুখ বুজে সব সইতে পারে বলুন? নীরব হাসি দিয়ে প্রশান্ত স্নেহ-দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত অনর্থকে কে ক্ষমা করতে পারে, বলুন তো? অথচ সত্যিই তাঁ'র অন্তরেও দুর্য্যোগের ঝড় বইত—তবু যখনই গেছি—স্নেহ আর আতিথ্যের ত্রুটি কোথাও এতটুকু হ'তে দেখিনি! সুমতিবাবুর জীবনে যদি কোথাও সান্ত্বনা থাকত তো সে কেবল তাঁ'র ওই সহধর্ম্মিনীতে। কিন্তু তবু বলবো: সুমতিবাবু ভুল করেছিলেন...মস্ত ভুল...ওই বিয়ে করাই হয়েছিল তা'র জীবনের চরম ভুল!...কেন?—সে কথা পরে বলছি—

এবার অনেকক্ষণ ধ'রে প্রসাদবাবু চুপ করে রইলেন। পার্শ্বে এই চঞ্চল সমুদ্র...আর সামনে কেবল বালির রাজ্য—আর এদের কেন্দ্র করে' চারিদিকে অন্ধকারের বিশাল বিস্তৃতি!—সমস্ত মিলে এক অভিনব ইন্দ্রজাল রচনা করেছে! দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সমুদ্রের বুকের ওপর একখণ্ড চাঁদ উঠেছে—মেঘে অর্দ্ধ-আবৃত মলিন চাঁদখানি, জলের উপর তা'রই আভা দুলছে ...সেই দোদুল্যমান অস্পষ্ট রেখাটি জলের ওপর দিয়ে সোজা আমাদের পায়ের কাছে পর্য্যন্ত এসে লুটিয়ে পড়েছে;—আমরা পূবমুখো চলেছি...

আবার সুরু হোল...

প্রসাদবাবু বললেন—সেইদিনটার কথা আমার আজো মনে আছে। তখন শেষ রাত্তির—অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। বাইরের ঘরে আকাশভেদী উৎকণ্ঠা নিয়ে সুমতিবাবু আর আমি বসে' আছি। ভেতরে ডাক্তার আর দাই ঢুকেছে। সমস্ত বাড়ীতে ভয় যেন মূর্ত্তি নিয়ে নিঃশব্দ পদে ঘুরে বেড়াচ্ছে! প্রথম প্রসব—উৎকণ্ঠা সে জন্যে তত বেশী নয়—উৎকণ্ঠার কারণ ছিল অন্য—

সুমতিবাবুর ধারণা: পৃথিবীতে যে আসছে তা'র ভাল মন্দর দায়িত্ব সুমতিবাবুর নিজের। তার যদি কুষ্ঠ হয়? তাঁ'র মত সাদা সাদা অস্পৃশ্য দাগ যদি তা'র গায়েও থাকে? তা হলে কী হবে? কত বোঝালুম! সত্যি সত্যি শ্বেতকুষ্ঠ তো আর সত্যিকারের কুষ্ঠ নয়—কী বলেন—লিউকোডারমা কি আর কুষ্ঠ? চামড়ার ওপর সামান্য একটু প্যাচ—ছোঁয়াচেও নয়—আর বংশগতও নয়!... ডাক্তারী বইতে তো তাই বলে! কিন্তু সুমতিবাবু কিছুতেই বুঝবেন না! সেই রাত্তির বেলা অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে—সেই ঘরে বসে' সুমতিবাবু যেন কেঁদে ফেললেন!

কী করে' আপনাকে বোঝাবো তখনকার সেই মনের অবস্থা! সেই বাতাসে দোদুল্যমান উৎকণ্ঠা! সেই

ছুঁচের মতন সুতীক্ষ্ম আগ্রহ! কী হবে কী হবে প্রতিমুহূর্ত্তের সেই প্রবল আশঙ্কা! সেই জীবন-মরণ সমস্যা। সে কি কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছে? চুপ করে' দু'জনে বসে আছি! আর প্রহর গুনছি—হটাৎ ভেতর থেকে শাঁখের আওয়াজ এল।

দুর্ব্বার কৌতূহল নিয়ে সুমতিবাবু ছুটলেন—

ছোট নবজাত ছেলে একটি। ছেলেটির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তন্ন তন্ন করে' দেখা হোল। দেহের গোপনতম আর তুচ্ছতম অংশটি পর্য্যন্ত খোঁজা হোল। কলঙ্কের চিহ্ন কোথাও আছে নাকি? কোথাও সেই ব্যাধির একটি অস্পষ্ট দাগও কি দেখা যাচ্ছে? সেই অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে সুমতিবাবু ছেলেটির আগাগোড়া পর্য্যাবেক্ষণ সুরু করলেন। নেই—কোথাও নেই—! সুমতিবাবু দেখলেন—ডাক্তার দাই সবাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে—নেই কোথাও ব্যাধির দাগ নেই! এত আনন্দ সুমতিবাবু কোথায় রাখবেন? সেদিন সেই মুখে যে প্রফুল্লতার প্রচ্ছায়া দেখেছিলাম জীবনে আর কোনদিন তা দেখলাম না!

কিন্তু সত্যি বলতে আমার নিজের ভয় কিন্তু তখনও কাটেনি!—কেন কাটেনি সে কথা পরে বলবো। আপাততঃ এই বলে রাখি: সেদিন সুমতিবাবুর সেই আনন্দে আমিও আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে তো পারছেন—যে-মানুষ জীবনে হতাশ—ব্যর্থতাকে কেন্দ্র ক'রে যে-মানুষের দিন কেটে যাচ্ছে—যা'র পথ চলায় পাথেয় কেবল বাইরের অজস্র বিদ্রূপ—তার জীবনে এ কতখানি আনন্দ—তার প্রাণে এ কী সান্ত্বনা! তিনি যেন নতুন করে' আবার জন্মগ্রহণ করলেন।—নতুন যেন সূর্য্যোদয় হোল। সুমতিবাবু পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে বাঁচলেন।—তাঁর মনে হোল—পৃথিবীতে বেঁচে সুখ আছে—

কিন্তু প্রথম দিনটি থেকে ছেলের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হোল। সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা! তাঁ'র নতুন ঘর—নতুন বিছানা—নতুন আসবাব—এ-বাড়ীর সঙ্গে তা'র কোনও সংস্রব থাকবেনা। এ-বাড়ীর প্রতিটি জিনিষ ও-শিশুর অস্পৃশ্য! এ রোগ ছোঁয়াচে নয়—স্পর্শদোষে এ রোগের যে উৎপত্তি হয়না সুমতিবাবু কি আর সে কথা জানতেন না? তবু বলা কি যায়—সাবধানতার মার নেই—

আলাদা বাড়ীতে বিজন মানুষ হ'তে লাগলো। মা তা'কে প্রসব করেই খালাস! সুমতিবাবুর হুকুম হয়ে গেল: এ-বাড়ীর কেউ ওকে ছুঁতে পারবে না। দাই এল—এল ঝি। মাইনে করা লোক এল স্নেহ আর সেবা দিয়ে বিজনকে মানুষ করে তুলতে। মা বাপ তা'কে ছুঁতে পারবে না! সে-বাড়ীর কোন জিনিষও মা'র অস্পৃশ্য!

রাত্রিবেলা বিজন হয়ত কেঁদে উঠেছে: এবাড়ী থেকে সুমতিবাবু শুনতে পেলেন। ·· ছেলে কাঁদছে—দুধ খাবার জন্যে কাঁদছে! মা কাছে নেই—মাইনে করা আয়া সেও ঘুমোচ্ছে! ছেলে তখনও কাঁদছে! দু'জনে জেগে উঠলেন। কিন্তু উপায় নেই! খানিক পরে কাঁদতে কাঁদতে আপনিই খোকা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে—খুব ক্লান্ত হয়েছে হয়ত! সুমতি-বাবুর চোখে আবার ঘুম নেবে এল।—কাঁদুক আর যাই করুক—এবাড়ীর কেউ ওকে স্পর্শ করবে না!

সেই ছেলে—মা'র দুধ না খেয়েও যে বেঁচে রইল কেমন করে সেইটেই আশ্চর্য্য!

এমনি করে সেই ছেলে বড় হোল।

দিনের পর দিন—বছরের পর বছর গেল—বিজন বুঝে নিলে বাবা মা'কে তার ছুঁতে নেই। আলাদা বাড়ীতে সে আয়ার কাছে মানুষ। ঝি আছে—চাকর আছে—তারাই তা'র সব কাজ করে দেয়।—বাবা মা দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন।

পূজোর সময়—বিজয়ার দিন নতুন জামা কাপড় পরে' খোকা এল। এসে সুমতিবাবুর সামনে দাঁড়াল।...

নিচু হ'য়ে মা'র পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করতে যাচ্ছিল সুমতিবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—না না—ছুঁয়োনা তা' বলে'—হ্যাঁ দূর থেকেই—

দূর থেকেই নমস্কার শেষ হোল।...

এমনি বছরের পর বছর। যখন বয়স হোল—স্কুল পেরিয়ে কলেজে গেল—তখন সে রীতিমত বুঝে নিয়েছে। কলকাতায় নতুন বাড়ীতে নতুন জায়গায় এসে সে আত্মহারা হয়ে উঠলো।

সারা পৃথিবীতে সে একলা। বাড়ীতে শুধু চিঠি যায়। আর তা'র নামে আসে টাকা। এর বেশী সম্বন্ধ সুমতিবাবু রাখতে চান্‌নি। বিজন মানুষ হোক—আকাশের মত বিশাল

তা'র কল্পনা...সমুদ্রের মত অশান্ত তা'র স্বপ্ন—! মানুষ হোক সে—সুমতিবাবুর নিজের জীবন অস্তিত্বহীন—তাঁর যেন মৃত্যু হয়েছে—ছেলের সাফল্য দেখেই তা'র শান্তি!

শেষে সুমতিবাবুর আশা হোল: ছেলে মানুষ হবে! মানুষের মত মানুষ হ'তে সে পারবে। জীবনে কখনও সে দ্বিতীয় হয়নি...স্কুল থেকে কলেজে উঠেছে প্রথম হ'য়ে। যেন এত ছেলের মাঝে প্রথম হবার অধিকার কেবল মাত্র তার একলার। কলেজের সমস্ত অনুষ্ঠানে বিজনের সাহায্য অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। ডিবেটিংক্লাব সরস্বতী পূজো—কোথাও সে বাদ নেই।

বছর বছর দেশে বসে' সুমতিবাবু খবর পা'ন এক একটা পরীক্ষার শেষে ছেলে কেবল ওই এক কথাই লেখে—এবার আমিই ফার্ষ্ট হয়েছি বাবা—

ঘর থেকে বেরিয়ে সুমতিবাবু এপাশ ওপাশ চেয়ে বলেন... কই, কোথায় গেলে তুমি?

সর্ব্বেশ্বরী পাশেই কোথাও ছিলেন হয়ত। সামনে এসে দাঁড়াতেই সুমতিবাবু বলেন—মঙ্গলচণ্ডীতলায় পূজোর সিদে পাঠাও—বিজু ফার্ষ্ট হয়েছে—

প্রত্যেক ছুটিতে সুমতিবাবু লেখেন—দেশে তোমায় আসতে হবে না—দার্জ্জিলিং কি অন্য কোথাও যাও—যা দরকার লিখবে—

কেবল চিঠি আর চিঠি। দু'শো মাইল দূর থেকে একটি সজীব প্রাণের বার্ত্তা বয়ে' আনে কেবল ওই একটি চিঠি! দিন গেলে দিন আসে—চিঠির পর চিঠি! সুমতিবাবুর টেবিলে চিঠির পাহাড় জমেছে। নিস্তব্ধ রাতে হঠাৎ কী যেন স্বপ্ন দেখে সুমতিবাবুর ঘুম ভেঙে যায়—

—শুনছো ওগো—

সর্ব্বেশ্বরী শুনতে পেয়ে উঠে পড়েন।—সুমতিবাবু বলেন—খারাপ স্বপ্ন দেখেছি একটা—টেলিগ্রাম করতে হ'বে—

এক একদিন বিকেল বেলা আকাশ যখন পরিস্কার থাকে চেয়ারটা বাইরে বাগানে এনে সুমতিবাবু বসেন। দূরে আমবাগানের মগডালগুলোর ওপর যেখানে আকাশ নিচু হ'য়ে এসেছে সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অনেক সাধ বুকের মধ্যে জমা হয়ে ওঠে! এমন সময় বিজন যদি কাছে থাকতো! যদি সে এই এখন তা'র পাশে এসে বসতো! বসে গল্প করতো! ওদেশের গল্প—এদেশের গল্প! কিম্বা এমনও হ'তে পারতো এক বাড়ীতে এক সঙ্গে থেকে জীবনের শেষদিনটি পর্য্যন্ত ছেলের সাহচর্য্যে কেটে যেতো!

যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে চারিদিকে—গুটি গুটি পায়ে অন্ধকার ক্রমে তাঁকে ঘিরে ফেললে সুমতিবাবু উঠে আসেন। ঘরে এসে বসেন। সর্ব্বেশ্বরী চিরকালই কমকথার লোক; বসে' থাকেন চুপ করে'—নয়তো শুয়ে থাকেন—অথবা কথাও নয় ঘুমও নয়—এটা ওটা নাড়েন চাড়েন।

সুমতিবাবু কাছে গিয়ে বলেন—চাবিটা কই আমার?

সর্ব্বেশ্বরী তবু একবার জিগ্যেস করেন—চাবি? ...চাবির এখন কী দরকার?

—বাক্সটার ভেতরে দরকার আছে আমার—

চাবি নিয়ে সুমতিবাবু বাক্স খোলেন। ছোটবেলায় বিজন যে ঝুমঝুমিটি নিয়ে খেলতো, যে জামাটি পরতো—তা'র স্মৃতির সঙ্গে জড়িত অনেক জিনিষ তা'র ভেতরে পোরা আছে। সেগুলো একটা একটা ক'রে বের করেন—হাত বুলোন—নাড়েন, আবার রেখে দেন। ছেলেকে তিনি কোনও দিন স্পর্শ করেন নি—তাঁর নিজের ছেলেকে ছোঁবার অধিকার তাঁর নেই—তাই তা'র ব্যবহৃত জিনিষগুলি অমনি করে' কৃপনের মতো বাক্সের ভেতর পুরে রেখেছেন—যখন ছেলেকে কাছে পাবার ইচ্ছে হয়, বড় সাধ হয় ছেলের গায়ে হাত বুলোতে, তখন এই বাক্সটা বা'র করেন, বার করে' পুতুল ঝুমঝুমি চুষিকাটি—এটা সেটা সবগুলো নিয়ে অতি সাবধানে স্পর্শ করেন। ওইগুলোই তাঁর সান্ত্বনা, বহুমূল্যবান পাথেয়!

কিন্তু—যাই হোক—বিজন মানুষ হোল। সবগুলো পরীক্ষার পাশ থেকে মুক্ত হ'য়ে সে চাকরী পেলে—কোন কলেজের প্রফেসারী—

তারপর এল সেই দিন—সেই চির পুরাতন দিন—প্রজাপতির পাখার মত রঙিন্ আর রমণীয়—

এতক্ষণ পরে সুমতিবাবু থামলেন—

বললাম—তা'র বিয়ের কথা বলছেন?

বললেন—ঠিক ধরেছেন। তবে সাধারণ বিয়ের মত ঠিক নয়—

এমন সময় আসে জীবনে, যখন মনে হয় পৃথিবী যেন গোলাপের পাপড়ীর মত নরম আর গন্ধময়! পৃথিবীর প্রথম বসন্তের মত রমণীয়! যখন কাউকে ভালবাসি; ভালবেসে আমরা সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে উঠি! তখন আকাশের তারা আমাদের করতলগত।—সমুদ্রের রত্ন আমাদের আয়ত্বাধীনে, বাতাসে আলোতে আমরা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি! নিজের সৌভাগ্যে নিজের রোমাঞ্চ হয়।...

তখন আমরা প্রেমে পড়ি। প্রেম—কোনও মেয়ের প্রেমে আমরা উন্মাদ হ'য়ে যাই। তখন পথে যে আমাদের বাধা দিতে আসে সে আমাদের শত্রু! সেই প্রেমের প্রথম অনিশ্চিত মুহূর্ত্তগুলি—সেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব প্রখর রোমাঞ্চের প্রথম দিনগুলি—কল্পনা করুন সেই প্রথম চোখে চোখে চাওয়া—চেয়ে থাকা—অপলক দৃষ্টিতে দণ্ডের পর দণ্ড দু'জনের দিকে চেয়ে থাকা—সেই দীর্ঘ চাহনি, যে চাহনি নিবিড়তম স্পর্শের চেয়েও রোমাঞ্চকর—যে চাহনির কেবল মাত্র একটি অর্থ আছে—আত্মদান! সেই চুরি ক'রে চাওয়া—অস্পষ্ট অথচ নিস্তরঙ্গ নদীর জলের মত স্বচ্ছ—সেই সবার চোখ এড়িয়ে একটি পলক দেখে নেওয়া—সে-সব লেখক আপনারা, ভালো করে' বর্ণনা করতে পারবেন—এক কথায় বিজনের সঙ্গে শ্রীলতার বিয়ের ঠিক—

কেমন করে বর্ণনা করবো জীবনের সেই প্রথম বসন্তোদয়ের কথা! যত পারো দুই চোখ দিয়ে দুই চোখের আলো নিঃশেষ ক'রে দেওয়া—কল্পিত আলিঙ্গনের স্বপ্নে শিউরে ওঠা—চিন্তায় আর কল্পনায় বিয়ের পরের সমস্ত ঘটনাগুলোর আনুপূর্ব্বিক চিত্র আঁকা—সে সব আর আমি কত জানি বলুন—

পাকাপাকি কথা হ'য়ে গেছে। সবাই জানে তা'দের দু'জনের বিয়ে হবে। জিনিষপত্রের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি দিনের শেষে আর একটি নবাগত দিনের উদয়—নিকটতম শুভমিলনের আগ্রহে তারা আগ্রহান্বিত। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফেরার পথে বিজন বললে—আর দু'দিন—

দু'দিন! শ্রীলতা বাড়ী ফিরে যেতে যেতে বললে—দু'টো দিন দেখতে দেখতে যাবে—

সত্যি সত্যিই আর মাত্র দু'টি দিন! কিন্তু সে দুটো দিন কী দীর্ঘ! কত অসহ সেই দুটি দিনের দীর্ঘসূত্রতা।—দু'টো দিন—আটচল্লিশ ঘণ্টা! পৃথিবীর ক্রম পরিণতির ইতিহাসে ওই দু'টি দিনের মূল্য কত অকিঞ্চিৎকর! প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের গতি কত বিলম্বিত! সূর্য্য আর চন্দ্রের আকর্ষণ বিকর্ষণ—গ্রহমণ্ডলীর সুপরিচালিত গতিবিধি··· সমস্তের যদি নিয়মিত কার্য্যক্ষমতা সক্রিয় থাকে তবেই তো দু'টো দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটবে। বিজনের এই ঘর দেখছো—এই টেবল্ চেয়ার, আয়না, চিরুনি, লাইব্রেরী সমস্ত জিনিষ দু'দিন পরেও ঠিক এমনি থাকবে। যেমন এখন আছে—অপ্রতিহত অবাধ! তবু ও জিনিষগুলোর অস্তিত্ব দু'দিন পরেই কত সুসমঞ্জস্ ঠেকবে—কত সুন্দর ঠেকবে! শ্রীলতা তখন এই ঘরের চারটি দেয়ালের অবরোধে বন্দী হবে! এক ঘরে, এক প্রতিবেশে! শ্রীলতার দেহ স্পর্শ করলে তখন আর বে-আইনী বলা চলবে না! সে তার হবে—একান্ত তা'র! নিতান্ত নিরিবিলি ঘরে শ্রীলতা যখন ওই বিছানার ওপর শুয়ে থাকবে—সমুদ্রের ফেনার মত সাদা বিছানার ওপর বাঁকান দেহখানা এলিয়ে—তখন তা'র কাছে গিয়ে পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে' অলস মধ্যাহ্নের আবহাওয়া বিলাসিতায় কাটিয়ে দিতে পারে! কিম্বা শ্রীলতা যখন ওই আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চুলের বিনুনি করবে, অথবা দু'টো হাত উঁচু করে' তুলে খোপার ওপর আঘাত করে' করে' খোপাকে যথাস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে,—তখন আর বিজনকে চোখ বুজিয়ে ঘুমোবার ভান করতে হবে না! কেবল মাত্র দু'টি দিন! এখন যে বাতাস তা'র ঘরে বইছে সে বাতাস তখনও বইবে, কিন্তু তখন তা' হবে নূতনতর প্রতিস্পর্শে রোমাঞ্চকর!

সে দুটো প্রতীক্ষমান দিনের বর্ণনা দিতে পারবো তেমন আশা করবেন না আমার কাছে। সে বয়সও নেই—সে অভিজ্ঞতাও নেই! তবু এটুকু বলতে পারি সেই দু'টো দিনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের পদধ্বনি বিজন কান পেতে শুনতে লাগলো! আজ যে-সূর্য্য আকাশে জ্বলছে, এখন থেকে অবিশ্রান্ত জ্বলার পরও সে আবার জ্বলবে! নূতন উজ্জ্বলতা নিয়ে, পরিপূর্ণ প্রাখর্য্য নিয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেও সে উঠবে এই আকাশে। শ্রীলতা তা'র—মানে বিজনের অনিবার্য্য ভাগ্যকে অতিক্রম করে' অন্তর্ধান হ'তে পারবে না!

দিনের সমস্ত পরিশ্রমের শেষে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি নিয়ে

বিজন নিজের নতুন বাড়ীতে ফিরে এল। নতুন একটা বাড়ী সে এই উদ্দেশ্যে ভাড়া নিয়েছে।

শ্রীলতা একটু আগেই বিজনকে বলে' গেছে···"এখন আর ভাগ্যকে ভয় করবো না...ভাগ্য যদি অস্বীকারও করে তবু তুমি আর আমি পরস্পরের..."

আরো বলেছে..."আমরা দু'জনকে পেয়েছি, তখন দরকার হ'লে ভাগ্যকে অপমান করতেও দ্বিধা করবো না...আমি তোমার সঙ্গে আছিই..."

স্তরাং বিজন যখন বাথরুমে ঢুকলো তখন তা'র মনকে পরিতৃপ্তই বলতে হবে! বিকেল হয়েছে। পশ্চিমদিকের শার্সির ভেতর দিয়ে সূর্য্যের জাজল্যমানতার প্রমাণপত্র বাথ-রুমের মেঝের উপর এসে পড়েছে! বিজন এখনি তা'র সমস্ত শ্রান্তি টাবের ভেতরে ধুয়ে ফেলবে! বাঁ হাত দিয়ে কলের মুখটা খুলে ডান হাত দিয়ে জামার বোতামটা খুললে! ছড় ছড় করে' জল পড়ছে...

সমস্ত বাথরুমটা সেই শব্দে মুখর হ'য়ে উঠলো!

জামাটা খুলে বিজন সেটা পাশের আলনায় রাখতে উপরে হটাৎ কেমন করে' একটা হাতের দিকে তার নজর পড়লো! নজর পড়তেই সে চমকে উঠেছে! তা'রই নিজের হাত! কাঁধ আর হাতের সংযোগস্থলের একটু নীচে...বিজনের দৃষ্টি হটাৎ তীক্ষ্ণ নিবদ্ধ হয়ে উঠেছে! দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় সমস্ত ইন্দ্রিয় তা'র ভয়-সচকিত হয়ে উঠলো! সারা শরীরের কলঙ্কহীন শুভ্রতার পাশে অধিকতর সাদা একটি দাগ আরো যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে!

ওটা কী, কী ওটা?

সূর্য্যের সেই আলোটুকুর কাছে হাতটা এনে বিজন দেখতে লাগলো ওটা কী, কী ওটা?

দু'টি চোখের সম্মিলিত দৃষ্টি দিয়েও যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না! তা'র কি চোখ খারাপ হ'য়ে এসেছে...তবে হয়ত ঘর অন্ধকার! সহসা সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরতে সুরু হোল। বাথরুম থেকে সেই অর্দ্ধ-অনাবৃত অবস্থায় বেরিয়ে এসে বিজন ঘরের ভিতর গিয়ে বসলো। চারি-দিকে যেন সমুদ্রের গর্জ্জন, উন্মত্ত আলোড়ন চলছে। একটি ভীরু ভেলায় কে যেন একটি শঙ্কিত প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়েছে। ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে বার বার সে দাগটিকে ঘষছে! মনে হোল: যেন চিরস্থায়ী দাগ...উঠবে না! শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে আঙ্গুলের ডগায় এনেছে এনে সেই দাগটির ওপর সে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলে! জোরে আরো জোরে! উঠবেনা! ঘষতে ঘষতে যখন সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে...তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে!

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী ব্যেপে এক মহা কলরব উঠলো! সারা জগৎ কল-কল্লোলময়! বিজনের চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মত সমস্ত ভেসে উঠছে। একটি নির্জ্জন জাহাজের ডেকের ওপর সে দাঁড়িয়ে...জাহাজ মাটির সংস্পর্শ ছাড়িয়ে মৃদুগতিতে দূরে চলে' যাচ্ছে! দূরে দূরে দূরে একটি দু'টি লোকের ক্ষীণাতিক্ষীণ আকৃতি দেখা যায়! কলশব্দ ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে! বিজন সারা ডেকের মধ্যে ছট্‌ফট্ করে' ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সে মাটির পৃথিবীতে ফিরে যাবে! সে নির্ব্বাসন চায়না···বৈরাগ্য চায়না···লোকালয়ের সহস্র বন্ধনের মাঝে বন্দী হ'য়ে বেঁচে থাকবে। ধীরে ধীরে তীরের ওপর ক্ষীণ মনুষ্যমূর্ত্তিগুলি অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে...শ্রীলতা, তা'র বা'বা, মা...অস্পষ্টতার কুয়াশায় তারা মিলিয়ে গেল, বিজনের দু'চোখ জুড়ে কান্না এল...তার নির্ব্বাসন হয়েছে···সে অস্পৃশ্য —তা'র কুষ্ঠ হয়েছে···

বিজন স্বপ্ন দেখলে: আকাশের এক কোনে একটা পাখী উড়ে যাচ্ছে, অদৃশ্য এক ব্যাধ তা'কে তীর ছুঁড়লে—বিষ মাখানো তীর! সে-তীর ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে লাগলো পাখীর পাখায়। অপ্রত্যাশিত আঘাতে পাখী মাটি লক্ষ্য করে' পড়তে লাগলো—আর তা'রই পাখা থেকে একটা পালক খসে' এসে উড়তে উড়তে পড়লো বিজনের গায়ে···সে পালকে মরাপাখীর রক্তের দাগ তখন ঘন হ'য়ে এসেছে।

বিজন ভাবলে: আর দু'টো দিন! শ্রীলতা জানবেনা, কেউ জানবে না, বিয়ে তা'দের হ'য়ে যাক্। সামান্য একটু দাগ সে কোনও রকমে লুকিয়ে রাখবে। শ্রীলতা তা'র। ভাগ্যের প্রবল প্রতিবন্ধকতা সে সইবে না কখনও। বিজনের একবার মনে হোল: কে আর জানছে—বিয়ে হোয়ে যাক্। আর একবার মনে হোল: সে শ্রীলতাকে সমস্ত খুলে বলবে। —শ্রীলতা কি এত হৃদয়হীন হবে? বিজন নিজের মনের স্বীকৃতি পেলে না।

সে রাত্রে কি বিজন ঘুমিয়েছিল? নিস্তব্ধ রাত্রের আবহাওয়া সচকিত চমকিত করে' দিয়ে একটি প্রাণীর বুকফাটা কান্না উর্দ্ধে উঠে আকাশে গিয়ে মিলিয়েছিল। এ-কান্না সেই কান্না—শ্রাবণ রাত্রে বর্ষা য' কাঁদে কেয়াবনে! অশ্রান্ত—অস্পষ্ট—অস্থির। সে-কান্না ব্যর্থতার পরিহাসে করুণ।

সেই রাত্রের অন্ধকারে বিজন বেরিয়ে এল পৃথিবীর প্রাঙ্গনে। উলঙ্গ বাস্তবতার মুখোমুখি। আত্মীয়, বন্ধু, সমস্ত ছেড়ে সেই রাত্রে সে বেরিয়ে পড়লো অপরিচয়ের রাজ্যে। সেই দিন থেকে সমস্ত ভারতবর্ষ সে ঘুরে বেড়ায়—তার বিরাম নেই। কত লোকই তা'কে দেখেছে, কত লোকের সঙ্গেই তা'র পরিচয় হয়েছে—কিন্তু তা'র বুকের মধ্যে কত লোকের সমাধি আত্মগোপন করে' আছে তা' যদি কেউ দেখতো! অর্থহীন উদ্দেশ্য নিয়ে কতজনই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়—সেও তাদের একজন। যদি কখনও এমন লোকের সাক্ষাতে আসে, এমনি আত্মভোলা—পাগল-পাগল—পৃথিবীর স্নেহ-মমতা বিচ্ছিন্ন এমনি একটী প্রাণী, নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বয়ে' ক্লান্ত—উদাসীন দৃষ্টি—পথকে আশ্রয় করে' জীবনের দিন অতিবাহন করছে—যদি এমন লোকের সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ হয় আপনার—তা' হ'লে ভাববেন: সে-ও মানুষ হ'তে পারতো—মানমর্য্যাদাবান সম্পূর্ণ মানুষ হ'তে পারতো···এটুকু মনে করে' তা'কে কৃপা করবেন যে অনেক দুঃখ পেয়েই সে অমন ঘরছাড়া—

গল্প শেষ করে প্রসাদবাবু চুপ করলেন।

বীচের ওপর রাত্রি ঘন হ'য়ে এসেছে। চঞ্চল সমুদ্র চঞ্চলতর হ'য়েছে···পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে আবহাওয়া যেন ঝিমিয়ে এল। যেন কল্পলোকের আকাশ বেয়ে এসে পৌছুলাম প্রাত্যহিকতার মর্ত্ত্যে।

বললাম—তারপর?

প্রসাদবাবু বললেন···তারপর পূর্ণচ্ছেদ। কমা, সেমিকোলন্ পেরিয়ে একেবারে পূর্ণচ্ছেদে এসে পরিসমাপ্তি। মৃত্যু সুকঠিন, সুপরিচিত, সুশৃঙ্খল মৃত্যু। তবে পরলোকের মাঝে তা'র আত্মা তৃপ্তি পেয়েছে কি না, কি জানি—

হোটেলের কাছে এসে পড়েছি। বললাম—পরলোক কি আপনি মানেন—?

প্রসাদবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। হোটেলের ভেতর নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন। বাইরে সমুদ্রের গর্জ্জন তখনও অশ্রান্ত। নিজের ঘরে এসে মনের মধ্যে সমুদ্র-কল্লোলের সঙ্গে সমস্ত স্মৃতি-বিস্মৃতির আনুপূর্ব্বিক ঘটনাগুলো আবার মুখর হ'য়ে উঠলো।···

পরদিন সকালে দেখি: প্রসাদবাবু যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। বাক্সটা বিছানাটা বাঁধা। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন—কাল একটা কথার উত্তর দেওয়া হয়নি আপনার—দেখুন পরলোক যদি না মানি—তা' হ'লে কিছুই যে মানতে পারিনে।···পরলোক মানবোনা—ভগবান মানবোনা—তা' হ'লে নিজেকেই অবিশ্বাস করতে হয় যে—

তারপর আমার কাছে সরে এসে জামাটা খুলে দেখালেন··· এই দেখুন—বিজন মরেনি—শারীরিক মৃত্যু তা'র হয়নি···সে বেঁচে আছে—এখন তা'র নাম শুধু বদলে হয়েছে—প্রসাদ।··· আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন—কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই··· নিজের চোখে দেখুন একটা দাগ পর্য্যন্ত আর শরীরে নেই—আজ আমি মুক্ত—কলঙ্কমুক্ত। কিন্তু এখন মুক্ত হ'য়ে কী হলো? এখন আর বেঁচে কী হবে? যখন ব্যাধি সারলে শ্রীলতাকে পেতুম···পেতুম বাবাকে···পেতুম পৃথিবীকে তখন সারল না। ···আজ সত্তর বছর বয়স, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার দিন··· এখন আমি রোগ-মুক্ত,—বেঁচে থাকতে যাকে পেলাম না মৃত্যুর পরে তা'কে পাবো এই আশ্বাসেই যে বেঁচে আছি। পরলোক যদি না মানি, তা' হ'লে যে ভগবানকেও মানতে পারিনে আমি?···আর সব সইতে পেরেছি কিন্তু পরলোক নেই এ-কথা সইতে পারবো না প্রাণে।

বিদায় নিয়ে প্রসাদবাবু চলে' গেলেন—

হোটেলের বারান্দায় চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হোল: আকাশের এক কোনে একটা পাখী উড়ে যাচ্ছে, অদৃশ্য এক ব্যাধ তা'কে লক্ষ্য করে' তীর ছুঁড়লে—বিষ মাখানো তীর। সে-তীর ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে লাগলো পাখীর পাখায়;···অপ্রত্যাশিত আঘাতে মাটি লক্ষ্য ক'রে পাখী পড়তে লাগলো···আর তা'রই পাখা থেকে একটা পালক খসে' এসে পড়লো পায়ের ওপর...সে-পালকে মরাপাখীর রক্তের দাগ তখন ঘন হ'য়ে এসেছে······

শ্রীবিমল মিত্র

শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

বিশ্রাম

বিচিত্রা
ভাদ্র, ১৩৪০

নব বরষায়

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই, সি, এস্

দক্ষিণের দ্বার দিয়ে চঞ্চল শিশুর মতো সচকিত হাওয়া
সহসা কহিয়া কানে 'বর্ষা এলো, ওঠো ওঠো ত্বরা'
গেল নিজে মিলাইয়ে ;—তার আসা-যাওয়া
সাগর দোলার মতো নৃত্যছন্দে ভরা।

জলধির দীর্ঘশ্বাস ধরণীর তরে
প্রতিদিন তারি বার্ত্তা আনে মোর ঘরে !
বাতায়নে চাহি দূর দিগন্ত ওপারে—
কেয়াঘন বালুতটে তালীবন পারে
নীল সাগরের ঢেউ স্বপ্নে আসে মম,—
কত প্রিয়নামে-ডাকা প্রণয়িনী সম !

পূবের আকাশ পথে কে এলো বিজয় রথে দুন্দুভি বাজায়ে
ধরণীরে দিল ডাক, "এসেছি, মঙ্গল শাঁখ দাও গো বাজায়ে !"
বিদ্যুৎ-কিরীট চূড়ে ব্যাকুল মিলন সুরে মেঘরাজ প্রসারিল হাত—
আলিঙ্গন-মৌন সুখে ধরণী পাণ্ডুর মুখে ছল্‌ছল আঁখির প্রপাত

চেয়ে দেখি, বনস্পতি—মূর্ত্তি যার ধেয়ান মগন
খসেছে গাম্ভীর্য্য তার, পত্রশাখে একী আন্দোলন !
মাখে জল সারা গায়, তরু কয়, 'ঢালো আরো,—আরো সুধাধার !'
এতদিন যার লাগি পিপাসিত, দয়িত সে এসেছে তাহার।

গেরুয়া যোগিনীবাসে ঢাকা ছিল শ্যামল কামনা,
সে আজি বসন টুটে
বাহিরিয়া এলো ছুটে,
তৃণাঙ্কুরে রূপ নিল ধরণীর সকল বাসনা।
সবুজের প্রাণের বেদন
কামনার ব্যথা নিবেদন
কে শুনেছে, কে দেছে অভয় ?—
দিকে দিকে ওঠে তার জয় !

আমার মনের বাস, গৈরিকের বল্কল অঞ্চল
ওগো নব আষাঢ়ের বর্ষণের প্লাবন চঞ্চল
ছিন্ন কর, সিক্ত কর, লুপ্ত কর তায়—
সবুজের রঞ্জিত পন্থায়
যাত্রা সুরু নব বরষায় !

আমার মনের মাঝে বহুশত যুগান্তের পারে
গৌরবের সৌধচূড়ে বনচ্ছায়ে রেবার কিনারে
কত কাব্যে কালিদাস ভবভূতি কবি
আঁকিয়াছে বিরহিণী প্রেয়সীর ছবি !

ঘন-মেঘ-মেদুর অম্বরে
জয়দেব যে উদাত্ত স্বরে
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ দিগন্তের তমাল বিপিনে
সেথা মোর অভিসারী মন
কল্পনার আনন্দে মগন
যেতে চায় অন্ধকারে পন্থা চিনে চিনে !

তারপর পুণ্য দিনে বর্ষা-কবি রবি
চিরন্তন বিরহের শ্রেষ্ঠতম ছবি
রচিয়াছে ছায়াঘন কাব্য-উপবনে
গানে সুরে চিত্রে ভরা বিচিত্র স্বপনে !

এই মতো যুগে যুগে বরষে বরষে
কত কবি বেদনার তুলিকা পরশে
আমার মনের মাঝে যে-সুর বাজায়ে
প্রাণের গোপনলোক দিয়েছে সাজায়ে—
সে আজ নিদাঘ-তপ্ত অবলুপ্ত তৃণাঙ্কুর সম
ছন্দহীন বাস্তবেতে আত্মহারা, তাই চিত্তে মম
হে আষাঢ়, নবীন আষাঢ়
ঢালো জল নব বরষার !
গলে যাক্ অনুর্ব্বর কঙ্করের বাধা
জন্ম নিক পুনর্বার যেই সুর যুগে যুগে সাধা
চিরকাব্য উপবনে
মানসী প্রিয়ার সনে
আমি যাহে বাঁধা !

যে আকুল অতৃপ্ত প্রণয়
কত লক্ষ যুগ বহি আনে তার উন্মত্ত সঞ্চয়—
সে আজি কদম্ব বনে
আষাঢ় কল্লোল সনে
ছেয়ে যাক এ অন্তরময় !

হে প্রিয়া, তোমার রূপে পুনর্বার করি আবিষ্কার
মালবিকা শকুন্তলা মঞ্জুলিকা নব সুনন্দার !

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

কক্ষচ্যুত

এ, জেড, আব্দুল্লাহ

—আর কত দূর বাবা—

—এই যে আর একটুখানি পথ মা।

—আমার যে বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, বাবা।

আজর রুষ্ট হয়ে উঠে বলে,—ছিঃ! বানু, অমন করিসনে মা, চল।

—কিন্তু চলতে যে আমি পারছিনে গো।

ক্ষণিকের জন্য আজরের মন বেদনায় ভরে উঠে।

আহা, এই নিষ্পাপ নিষ্কলুষ বালিকা, এরো ভাগ্যে এমন দুর্দ্দশা কেন? কিন্তু নিজের মনের ভাব গোপন করে সে বলে উঠে,—আর কতটুকুইবা পথ, চল মা, চল, একটু শীঘ্‌গীর কোরে চল।

বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা আসে। নীল আকাশে তারা ফুটতে আরম্ভ করে। কিন্তু এদের এই 'একটুখানি' পথের আর পরিসমাপ্তি ঘটে না।

* * *

তিনটী জীবনের সে এক করুণ ট্রাজেডী।

তিনটী জীবন—বানু, আজর আর শহীদ।

আজর আর বানু—পিতা এবং কন্যা। রসুলপুরের সাধারণ বাসিন্দা এরা। শহীদ, ঐ গাঁয়েরই প্রতাপান্বিত জমীদার।

জমীদারের তিন মহলার পার্শ্বে আজরের সুখ এবং শান্তিতে ভরা খড়ো ঘরখানি দাঁড়িয়েছিল তা'র পূর্ব্বতন আট পুরুষের আমোল হ'তে। আজর ছিল সুখী। ভোরে সে যেত মাঠে,—ফিরত বেলা করে'। এই অবসরে বানু তুলতো তার ক্ষুদ্র সংসারখানিকে রঙীন করে'। ঘরে ফিরে আজরের বুক ভরে উঠতো তৃপ্তি এবং আনন্দে।

মাঠ ওদের সবুজ থেকে পরে হয়ে আসত সোনালী। বাড়ীখানি উঠত ধানে ধানে ভরে। পিতা পুত্রী তাই দেখে যেমন খুশী হ'ত, পাড়া পড়শীরা তেমনি জলে মরতো হিংসার জালায়।

বানু রূপসী। রূপ ওর এমন যে তেমনটী সচরাচর চোখে পড়ে না। গাঁয়ের তরুণীরা এর জন্য মনে মনে ব্যথা পায়। তারা ভাবে—গরীবের ঘরে এত রূপের কি প্রয়োজন ছিল।

শহীদ তখনো জমীদার হয়নি। কলকাতার কলেজে সে পড়ছিল, আর সহরের আবহাওয়ার সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে মিশিয়ে ওর জীবনে কল্পনার রঙ ধরিয়ে তুলছিল।

পৃথিবী চলছিল এমনি। এর মধ্যে সহসা এল এক ঝড়। যার ফলে এই তিনটী প্রাণীর জীবনের ধারায় ঘটে গেল এক আমূল পরিবর্ত্তন।

* * * *

রসুলপুরের জমিদার একদিন মারা গেলেন। যাবার বয়স তাঁর হয়েছিল, কিন্তু তবু বিনা নোটিশে এমন হঠাৎ যে তিনি চলে যাবেন তা' কারো মনে হয়নি কোন দিন।

পিতার মৃত্যু সংবাদে শহীদ সেই যে কলকাতা ছেড়ে এলো, আর সে মুখো হয় নি সে—অন্ততঃ পড়ার উদ্দেশ্যে। সংসারের যাবতীয় ভার এসে পড়ল তার উপর। শহীদ দুদিনেই পুরাদস্তর জমীদার হয়ে উঠল।

পূর্ব্বদিগন্তে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে তা'র স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। দূরে থেকে দেখা যায় একটা সর্ব্বগ্রাসী কালোছায়া যেন পৃথিবী গ্রাস করতে করতে পশ্চিমের দিকে ছুটে চলেছে। আর একেই ব্যঙ্গ করে বেলা শেষের রক্তরাগ টুকরো মেঘকে স্পর্শ ক'রে তা'কে রঙীন করে তুলছে। আলো আঁধারের এই সন্ধিক্ষণে বন্দুকটা হাতে করে শহীদ বন বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বাড়ী ফিরছিল। নদীর বাঁকে দেখা হয়ে গেল বানুর সঙ্গে। কলসী ঘাটে রেখে ও একমনে নিরীক্ষণ করছিল ঢেউয়ের চূড়ায় গোধূলির রঙীন হাসিটুকু। আকাশে যে রঙ প্রতিফলিত হয়েছে, তার একটা আভা এসে পড়েছিল এই রূপসী পল্লীবালার অঙ্গে। বানুর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে সেই

রক্তিমা আরও একটু বাড়িয়ে দিয়েছে যেন! শহীদের চোখ এদৃশ্যে ঝলসে গেল। স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে বান্নু যখন ঘরের দিকে পা বাড়ালে, সে ও চলল পিছে পিছে। উদ্দেশ্য এর গৃহের ঠিকানা জেনে রাখা।

বান্নু নিজের ঘরে ঢুকল। সে হয়তো ভুলেও মনে করতে পারলে না যে, একজন তা'কে অনুসরণ করে' বাড়ীর সামনে পর্য্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে। ওর চলে যাওয়ার পরও শহীদ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

তার মনে তখন কি কথা উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল, সে খবর আমাদের জানা নেই। হয়তো সে নিজেই তা' ঠিক করে বলতে পারতোনা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শহীদ ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলে গেল। সে সঙ্গে মনে নিয়ে গেল—এক অপূর্ব্ব রঙের ছাপ, এক অজানা অনুভূতি।

এর পর আরও দিন কয়েক কেটে গেছে। ছল করে বধূদের ঘাটে যাওয়ার অপবাদ শুনে আসছি এতদিন যাবৎ, কিন্তু এবার দেখছি যে পুরুষরাও এ দোষ থেকে রেহাই পায়নি সম্পূর্ণরূপে। সে দিন বান্নু ঘাটে জল আনতে গেছে, শহীদও গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো। বান্নু চোখ তুলে চাইলে, দেখলে তরুণ প্রাণের অপূর্ব্ব দীপ্তি নিয়ে তরুণ জমীদার তার সামনে দাঁড়িয়ে। শহীদের অপলক দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টির বিনিময় হয়ে গেল। বান্নু চোখ নামিয়ে নিলে লজ্জায়, কিন্তু তার ঠোঁঠের উপর স্পষ্টই দেখা গেল একটা ক্ষুদ্র হাসির বিদ্যুৎ চমকে গেছে। কানের ধারটা, গালের উপরটাও হয়তো বা একটু রাঙা হয়ে উঠে ছিল।

দুই তরুণ প্রাণের কোণে যে গোপন ধারা বইছিল, সহসা তার মিলন হয়ে গেল। তরুণ তরুণীর জীবন-পথের এই অপূর্ব্ব পুণ্য সঙ্গমে দাঁড়িয়ে এরা দেখতে লাগল কত স্বপ্ন সুখের—আনন্দের।

বান্নুর নিকটে যতক্ষণ থাকতে পারে, শহীদের মন ততক্ষণ গর্ব্বে পুলকে ভরে উঠে। নানা প্রকার ছল করে তাই সে যখন-তখন এসে দাঁড়ায় এদের আঙিনায়।

রাত একটু ঘনিয়ে এসেচে। বাইরে আঁধার পড়েছে হয়তো। শহীদ প্রাঙ্গণে এসে ডাকে,—বান্নু!

শহীদের কণ্ঠস্বর বান্নুর কানে মধু ঢেলে দেয়। ও বেরিয়ে এসে' বলে,—আপনি...

—হ্যাঁ, ওদিকে যাচ্ছিলুম, ভারী আঁধার হয়ে এসেচে, একটু বাতিটা দেখাও না আমাকে।

এ অনুরোধ বান্নু এড়াতে পারে না। লণ্ঠন্ হাতে বাইরে এসে দাঁড়ায়। এক পা এক পা করে এগিয়ে চলে, এমনি করে, হয়তো বা সে রাস্তায় এসে পড়ে।

বান্নু বলে,—এবার আসি।

শহীদ উত্তর দেয়,—চল না আর একটু।

একটু একটু করে বান্নু এসে দাঁড়ায় শহীদের বাড়ীর ফটকে। বিদায় নিতে গিয়ে শহীদ চায় তার প্রতি আপনার করুণ দৃষ্টি তুলে। তারপর একটা নিঃশ্বাস চেপে ঢুকে পড়ে ফটকের ভিতর। বান্নুও মুহূর্ত্তখানেক্ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে চলে আপনার ঘরের দিকে।

কোন দিন দুপুরে শহীদ এসে জিজ্ঞাসা করে—তোমার বাবা এসেচেন, বান্নু?

বান্নু বলে,—না।

শহীদ দাওয়ার উপর বসে পড়ে। বান্নু তা'কে ঘরে উঠে আসতে অনুরোধ করে, পরে আদেশের সুরেই বলে,—"কি, না, না, করচেন। উঠে আসুন বলছি!

শহীদ মাথা নেড়ে উত্তর দেয়,—না, তা' হ'বে না।

বান্নু বলে,—কি হবেনা—হবেনা কি?

শহীদ বলে,—"না, আমি উঠবো না।" ওর কণ্ঠস্বরে অভিমান ভর করে উঠে।

বান্নু হেসে বলে,—রাগ হয়েচে বুঝি!

শহীদ কোন কথা কয়না। বান্নু বলে উঠে,—আর রাগ করে কাজ নেই! আসুন ভিতরে, বাইরে যা গরম পড়েছে। আমি ডাব কেটে দিচ্ছি।

শহীদ তবু নড়ে না। বলে,—না, আমি উঠব না।

বান্নু হেসে উঠে। হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করে, "রাগটা কিসের শুনতে পারি।" একটুখানি চুপ করে থেকে শহীদ কথা কয়, কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম অভিমান মিশিয়ে বলে, "রাগ হবেনা কেন? কথা না শুনলে কার না হয়।"

বান্নু এর কোন উত্তর দেয় না। শুধু বড় বড় দুই চোখের তীব্রদৃষ্টি হেনে চেয়ে থাকে।

শহীদ বলে,—"আমি কত কোরে বললুম, এই সারা দিন

'আপনি, আপনি,' আমার ভাল লাগেনা। আমি যে এত পর সে কথাতো আগে কোন দিন ভাবতেও পারিনি।"

শহীদের এ অভিমান ভরা কথায় বান্নুর মনে হয় তো আঘাত লাগে। কিন্তু নিজের মনের ভাব গোপন করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে উঠে, "ওঃ এর জন্য রাগ।" একটু চুপ করে পুনরায় কহে,—"কিন্তু লোকে কি বলবে বলো দেখি!"

শহীদ তার দুই চোখ ফিরিয়ে বান্নুর দিকে চায়। এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কথা কয়। বলে, "লোকে এমনিইতো অনেক কিছু বলতে পারে বান্নু।"

শেষ পর্য্যন্ত দু'জনের একটা রফা হয়ে যায়। কথা থাকে যে বান্নু সব সময় ওকে তুমি বলে ডাকবে—সত্যি, কিন্তু বাইরের লোকের সামনে যদি তা' না পারে, তার জন্য শহীদ কোন অপরাধ নেবে না।

বান্নু নদীতে যায় জল আনতে। পথে শহীদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। দু'জনেরই মুখে হাসির একটা শিহরণ জাগে। বান্নু বলে "সারাদিন এমন করে আমার সঙ্গে থাক কেন বলোত।"

শহীদ হেসে বলে, "কি জানি ছাই এত সব বুঝিনে বাপু।"

—বুঝনা, ইস।

—ইস কি আবার,—সত্যি বুঝিনে।

—সত্যি বুঝনা! আচ্ছা লোকতো যাঁহোক।

দু'জনেই প্রায় এক সঙ্গে হেসে উঠে। বান্নু জল ভরে ঘরের পথে হাঁটতে থাকে। শহীদ তার সঙ্গে চলে গল্প করতে করতে। খানিকটা অগ্রসর হয়ে বান্নু সহসা বলে ফেলে, "এবার তুমি সরে পড় দেখি, লোকে দেখলে কি বলবে।"

—'কি বলবে?' একটু চুপ ক'রে থেকে শহীদ সুর করে গেয়ে উঠে—

"বলুক বলুক লোকে মন্দ যার যত আছে মনে,
দিবা নিশি নিদ্রা নাই আমার নয়ানে।"

—ছিঃ, পথের মধ্যে অমন ক'রে গান করতে হবে না তোমাকে, দোহাই তোমার, এবার থামো দিকি। সঙ্গে সঙ্গে সে তীব্র কটাক্ষ করে শহীদের প্রতি। যৌবনের উদ্দাম স্রোতে এমনি সোনালী স্বপনে এরা ভেসে বেড়াল আরো অনেক দিন।

* * *

কথাটা চার দিকেই রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। আজর মানা করে দিলে বান্নুকে শহীদের সঙ্গে মিশতে। জানতো সে এদের এই মেলা মেশা নিষ্পাপ, সুন্দর। কিন্তু তবু লোকের মুখ চেয়ে তা'কে দিতে হ'ল এই নিষ্ঠুর আদেশ। কথা বলতে গিয়ে তার বুকে কান্না ভীড় করে এল, কিন্তু তবু আজর বল্লে বান্নুকে, "তুই আর ওর সঙ্গে মিশিসনে মা। জানি তোদের এ ঘনিষ্ঠতা নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ। কিন্তু তবু মা, সমাজতো এসব মানবে না। জানি এ তোর কত বড় ব্যথার কথা, কিন্তু তবু নিজেকে, বিশেষ কোরে ওকে তো লোক লজ্জার ভয় থেকে বাঁচানো উচিত বান্নু। মা আমার, এ তোর সব চাইতে শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এরই নির্ম্মমতার ভিতর দিয়ে তোর নিজেকে আজ যাচাই করে নিতে হবে।"

পিতার এ আদেশ বান্নুর বুক ভেঙ্গে দিল, কিন্তু তবু সে এর ব্যতিক্রম করলে না। ভাবলে, আপনার সকল দুঃখ দৈন্যের ভিতর দিয়ে সে তার প্রেমাস্পদকে বাঁচিয়ে নেবে। বান্নু চাইল, মহতের উদ্দেশ্যে অনুচ্চের বলিদান। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে করলে অমরত্বের বিরাট আকাঙ্ক্ষা।

শহীদকে তার মা, মামা, চাচা এরা সবাই বুঝালেন অনেক। কিন্তু হাসি মুখেই সে শেষ পর্য্যন্ত বলে গেল এ' হবেনা। নিজের মনকে খর্ব্ব ক'রে স্বর্গের ঐশ্বর্য্যেরও আমি প্রার্থী নই।

বলা হ'ল—তোমার সমাজ, তোমার আত্মীয় বন্ধু? শহীদ হাসিমুখে বললে,—চাইনে সমাজ, চাইনে বন্ধু, চাইনে কোন আত্মীয় স্বজন।

—কিন্তু তোমার পিতার ওকফের সর্ত্ত?

—জানি, যদি মা, মামা আর চাচার ইচ্ছামত না চলি এ জমীদারীতে আমার কোন দাবী থাকবে না।

—তবু তোমার মত ফিরবে না?

—না, জমীদারী আমি চাইনে। নিজের স্বাধীনতা, কর্ত্তব্য নিষ্ঠার বিনিময়ে জমীদারী অতি তুচ্ছ জিনিষ।

শহীদকে কোন মতেই বাগমানানো যায় না। বান্নু পিতার আদেশের পর সহজে আর বাইরে আসে না। যদি বা হঠাৎ কোন দিন কোন ফাঁকে ওদের দেখা হয়ে যায়, বান্নু কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে শহীদকে এড়িয়ে চলে।

শহীদ কি ভাবে, কি যে চিন্তা করে কারো কাছে তার কোন খবর দেয় না। আনমনা হয়ে পথ চলে সে। চোখ তার খুঁজে ফেরে যেন কোন গোপন লোকের মানসীকে।

শহীদ যাকে খোঁজে তাকে সে পায় না, যদি বা পায়—মনের মত করে পায় না। মন তার গভীর ঔদাস্যে ভরে উঠে। কিন্তু তবু সে পথ চলে। তার স্বপন-লোকের মানসীর ধ্যান করেই সে পথ চলে।

আরও দিন কয়েক চলে গেছে। প্রতিপক্ষ ততদিনে ষড়যন্ত্র করে ফেলেছে—বানু আর আজরকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবার। কথা রয়েচে আসচে পূর্ণিমার রাত্রে ঘরে আগুন দিয়ে এদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হবে সর্ব্ব প্রথম।

* * *

পূর্ণিমার রাত্রে শহীদের ঘুম পাচ্ছিলনা কিছুতেই। বাইরের নির্ম্মল উদার জ্যোৎস্নায় তার মনে বেজে উঠেছিল এক অপূর্ব্ব রাগিণী। শহীদ শয্যা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। ওর মনে কি যে ভাব এসেছিল, নিজেও তা' জানতে পারে না। সম্পূর্ণ আত্মভোলার মত সে বানুদের বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করলে। তারপর এক সময় তেমনি আনমনা হয়ে গান ধরে বসলে,—

ঐ যে ভরা নদীর বাঁকে
কাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে
দেখা যায় যে ঘরখানি, বন্ধু সেথায় থাকে গো।
সকাল বেলা লয়ে ধেনু
যায় সে মাঠে বাজিয়ে বেণু
চলে থাকি জলের ঘাটে দেখব বলে তাকে।
দুপুর বেলায় বনের ছায়ায়
আকুল করা সুরের মায়ায়
পরাণ চলে তারি ঘাটে বেন্ধে দেব তাকে॥

কত সাধে বাঁধিয়ে চুল
কপালে টিপ, খোঁপাতে ফুল,
দাঁড়িয়ে থাকি বঁধুর পথে কলসী লয়ে কাখে।
নিদয় বঁধু চায়না ফিরে,
রাতে ভাসি আঁখি নীরে
চাঁদ হাসে মোর দশা হেরে ভাঙ্গা মেঘের ফাঁকে॥

আকাশে তখন মেঘের টুকরাগুলি চাঁদের সাথে লুকোচুরি করছিল। গানের সুর পর্দ্দার পর পর্দ্দায় উঠে জ্যোৎস্না-ধৌত পৃথিবীর বুকে এক অপূর্ব্ব মায়ার সৃষ্টি করলে।

বানুর চোখেও ঘুম আসছিল না সারা রাত ধরে। একখানি উদাস রাগিণী বহুদূর থেকে ভেসে আসছিল তার কানে। সেই সুর এগিয়ে এসে ক্রমে তার বাড়ীর পাশ দিয়ে নদীর দিকে চলে গেল। বানুর মনে কি যেন এক অনুভূতি সাড়া দিয়ে উঠল। ওর বুক দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগল। বানু উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে দোর খুলে যে দিক থেকে গানের সুর ভেসে আসছিল সে দিকেই চলতে আরম্ভ করলে। কেমন করে যে সে পথ চলেছে, বানুর এ খেয়ালটুকু পর্য্যন্ত রইল না। নদীর পারে শহীদের বাহুপাশে আত্মসমর্পণ করে, সর্ব্ব প্রথম অনুভব করলে যে, কোথায় সে এসে দাঁড়িয়েছে। শহীদের উদাস মনে বানুর স্পর্শ টুকু এক অপূর্ব্ব রঙের আমেজ এনে দিল। তাকে বাহুপাশে অনেকক্ষণ জড়িয়ে রেখে শহীদ কথা কইলে। বললে,—তুমি এসেচ—আমার সাধনা, আমার রাত্রি জাগা তবে বিফল হয়নি বানু।

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে বানু বললে,—তুমি কি রোজ রাতে এমনি করে জেগে থাক?

—রোজ, প্রত্যেক দিন। এই রাত্রি জাগরণ আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে বানু।

বানু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলে, তারপর ধীরে ধীরে বললে,—'একটা কথা বলব?'

—'কি?' শহীদ আদর করে উত্তর দিলে।

বানু বললে,—এখানে বোধ করি বেশীদিন আমরা থাকতে পারব না। আমরা দরিদ্র, আমাদের রক্ষা করবার কেউ নেই। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা আমাকে দেবে? —বলো অমত কোরবে না।

শহীদ কহিল,—একটা কথা ছাড়া আমি সব পারব বানু। কিন্তু সে কথা পরে বলবে, বলবার অনেক সময় আছে। কিন্তু এই জোৎস্না রাত্রে তুমি ওসব কথা তুলে মিছিমিছি মন খারাপ করো না।

—কিন্তু আর যদি দেখা না হয়, বলবার যদি অবকাশ আর না পাই!.

মেঘমুক্ত পূর্ণিমার চাঁদের দিকে শহীদ একবার ত'ার চোখ তুলে চাইলে। তারপর বললে,—কেন সময় হবে না, বানু?

—আগেইতো বলেছি, যত শীঘ্র পারি আমরা এ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাব। আমাদের চার দিকে শত্রু। এদের মধ্যে থেকে কে আমাদের রক্ষা করবে?' বানু উদাস কণ্ঠে উত্তর দিলে।

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে শহীদ বলে উঠল,—সে তো সত্যি বানু। এখানে সবাই তোমাদের শত্রু; কিন্তু আমি, আমার সম্বন্ধে…

শহীদের কথা শেষ হতে না হতে বানু দুই হাতে তার মুখ চেপে ধরলে। জোর করে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললে,—ছিঃ, ও কথা বল না গো। তোমার চাইতে আপনার লোক দুনিয়াতে আমার কেউ নেই। কিন্তু এই এতগুলো লোকের ভিতর থেকে আমাকে রক্ষা করতে তো তুমি পারবে না।

শহীদ একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললে। তারপর ধীরে ধীরে বললে,—না, আমার কোন শক্তি নেই, এদের ভিতর থেকে নিজকেই আমি রক্ষা করতে পারব কি না সন্দেহ। কিন্তু তবু আমার সত্যকে আমি নষ্ট হতে দেব না বানু। আজকের এই মিলনকেই আমি শেষ বলে স্বীকার করতে পারবো না। আমাদের মধুমিলনের এই প্রথম রজনী।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে শহীদ একটু দম নিলে। পরে গলাটা আরও পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে লাগল,—'তোমরা চলে যাও বানু, এখানে তোমাদের সর্ব্বনাশের একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে। তোমরা চলে যাও, কিন্তু মনে রেখো—দুনিয়ার যেখানেই থাক না কেন, আমি তোমাকে খুঁজে নেবই।—এদেশে মানুষ নেই বানু, এদের বিশ্বাস…

শহীদের মুখের কথা আর শেষ হ'ল না। বানু সহসা চীৎকার করে উঠল,—আগুন, আগুন, আগুন !!

শহীদের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলে উঠল,—সর্ব্বনাশ তোমাদেরই হয়ে যাচ্ছে বানু—চল!—প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়তে দৌড়তে শহীদ বলল,—এমন একটা কাণ্ড যে ঘটবে সে আমারও মনে ছিল। কিন্তু এত শীঘ্র যে এমন হবে তাতো ভাবতে পারি নি।

* * *

এক গাঁ লোকের সামনে একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেল, অথচ কেউ একটু সহানুভূতিও প্রকাশ করলে না। মানুষের চোখের সামনে দরিদ্রের যথাসর্ব্বস্ব জ্বলে ছাই হয়ে গেল।

* * *

পরদিন সন্ধ্যার ক্লান্ত আলোকে লোকে অবাক হয়ে দেখলে, কাল শেষ রাত্রে যে পথে মেয়ের হাত ধরে পিতা গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেছে, সেই পথেই আজ তা'দের তরুণ জমীদার ভিখারীর বেশে ছুটে চলেছে। চলতে চলতে সে গাচ্ছিল—

কাল যে ছিল নয়ন আলো
তার পানে আজ চাইতে মানা,
জ্যোৎস্নালোকে চাইলে যাকে—
উষায় তারে যায় না চেনা।
যৌবনেরই ফাগুন বনে
রইল যে জন বিভল মনে,
কেমনে তায় আজ শাওনে রইব দূরে সরে।

সন্ধ্যার রক্তলেখা তখন মুছে গেল। দূর দিগন্তের দিকে যে তরুণ সন্ন্যাসী চলেছিল, ক্রমশঃ তার গানের স্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে বিস্মিত গ্রামবাসীকে তা' নীরবে জানিয়ে গেল যে, শহীদের এ যাত্রার গতি আর ফিরবার নয়।

এ, জেড্, আব্দুল্লাহ

সাঁতার—"কাঁচি-পাড়ি"

শান্তি পাল

শোনা যায় মিঃ ট্রাজান প্রবর্ত্তিত কাঁচি-পাড়ি ১৮৯৫ সাল হইতে ইংলণ্ডে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। ও দেশের সাঁতারুবৃন্দ ট্রাজান প্রবর্ত্তিত কাঁচি-পাড়ির পূর্ব্বে তাহারা এক-হাতি ও বুক-পাড়ির চর্চ্চা করিতেন। বলা বাহুল্য কলিকাতা সুইমিং এসোসিয়েশনের দ্বার উদ্ঘাটন হইবার বহু পূর্ব্বে ঐ কায়দার পাড়িতে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে সাঁতার কাটিতে দেখিয়াছি। মিঃ জেফর্ড, উপেন্দ্রলাল, জীতেন্দ্রলাল, শচীন্দ্রলাল প্রভৃতি তখনকার দিনে ঐ ধরণের পাড়িতে সাঁতার দিয়া এসোসিয়েশনের নাম উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ১৯১৫ সালে শ্রীযুক্ত মুরলীধর মুখোপাধ্যায় ঐ পাড়ির সম্যক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিলেন। বলা বাহুল্য আমাদের দলের কোন সাঁতারুই চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে মুরলী বাবুকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। মিঃ জেফর্ড ও মুরলীবাবুর পাড়ির কায়দা প্রায় একই ধরণের ছিল। উঁহারা বাম দিকে মুখ রাখিয়া ডান হাত ও ডান পা একত্রে টানিতেন। এই কায়দার পাড়িতে পায়ের কাঁচি আঘাত ও হাতের টান যুগপৎ টানিয়া ডান্ কাঁধ দিয়া জল কাটিয়া যাইতেন। ফলে প্রতিক্ষেপে পাড়ি মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া যাইত এবং সাঁতারুকে পুনরায় নূতন করিয়া পাড়ি সুরু করিতে হইত। বাম হাতের ক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পন্ন হইত না। ইহা

কাঁচি পাড়ির প্রথম ভঙ্গী

অনেকটা পার্শ্ব-পাড়ির ন্যায় ফল প্রদান করিত। ১৯১৫ সালে আমি ঐ পাড়ি অনুকরণ করিয়া ডান্ পায়ের কাঁচি আঘাতের সহিত (ডান্ দিকে মুখ রাখিলে বাম পা চলিবে) বাম হাত প্রথমে জলে নিক্ষেপ করিয়া ডান হাতের সহিত টানা অভ্যাস করিলাম। ইহা আয়ত্ব করিতে প্রায় তিন চারি মাস সময় লাগিয়াছিল। এই কায়দায় জল অল্প পরিমাণে কাটিত বটে, কিন্তু উভয় হাতের ক্রিয়া পরিষ্কার হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম স্বচ্ছন্দ গতিবেগ লাভ করিতাম। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। সাঁতারের প্রচলন দেশ বিশেষে আবদ্ধ নহে, এবং ইহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় মোটামুটি একই ধরণের হয়। দেশ ভেদে বিশেষত্ব কিছু যে না থাকিতে পারে, এমন বলি না; কিন্তু মূলতঃ সাধারণ রীতি, নিয়ম, পদ্ধতি ও কলা-কৌশল সমস্তই এক এবং অভিন্ন। আমি এই প্রবন্ধের মধ্যে সাঁতারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিতেছি, অপরাপর দেশের অনুসৃত ও লিপিবদ্ধ নিয়মের সহিত তাহার কোন কোন অংশে মিল্ থাকিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া প্রয়োজনীয়তা ইহার যে সামান্য নহে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। ১৯১৮ সালে মে মাসে আমি এই নূতন ধরণের পাড়িটি সর্ব্বপ্রথম শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার ও বীরেন্দ্র নাথ পাল (ভূতপূর্ব্ব সেণ্ট্রাল, বর্ত্তমান ন্যাশনাল) উভয়কে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিই। ১৯২২ সালে শ্রীযুত আশু দত্ত ও ২৩ সালে কিম্বা ২৪ সালে শ্রীযুত জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সন্তরণবিশারদদিগকে ঐ ধরণের পাড়িতে সাঁতার কাটিতে দেখিয়াছি। মনে হয় উঁহারা প্রফুল্লকুমারের অনুকরণ করিয়া-

চলেন। অবশ্য জ্ঞানবাবু পাড়ির উৎকর্ষের জন্য মাঝে মাঝে আমার সহিত পরামর্শ করিতেন।

মোটকথা প্রচলিত পাড়ি সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে বলা যায়, কাঁচি-পাড়ি সর্ব্বাপেক্ষা কম ক্লান্তিদায়ক কেন না ইহাতে বরাবর পায়ের সাহায্য পাওয়া যায়। বহুদূর পথ অবলীলাক্রমে যাইতে পারা যায়। ঝড় তুফানের সময় এই পাড়ি যেমন ফল দেয় তেমনটি অন্য পাড়ি দেয় না। প্রতি পাড়ির সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রামও পাওয়া যায়—অবশ্য আজকালকার দিনে প্রতিযোগিতায় বিশেষ ফল দেয় না কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য অদ্বিতীয়। মহিলা সাঁতারুবৃন্দকে এই পাড়ি শিক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

এই পাড়ি শিক্ষা করিবার সময় সাঁতারুর সরল প্রণালীর সাহায্য লওয়া আবশ্যক। গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য সাঁতারু দরকার মত কাঁচি আঘাতের অব্যবহিত পরে বিপরীত পায়ের অতিরিক্ত একটি ছোট সোজা আঘাত দিতে পারে; তাহাতে ফল ভালই হয়। শিক্ষার্থী প্রথমত পায়ের উৎকর্ষ পরিষ্কার রূপে আয়ত্তের মধ্যে আনিবে। উহা স্থলে কিম্বা জলে উভয় স্থানেই চিত্রানুযায়ী অনুশীলন করা যায়। যদি কোন সাঁতারুর এক-হাতি পার্শ্বপাড়ির সহিত পরিচয় থাকে, তাহা হইলে কেবল মাত্র হাত পাড়ির ক্রিয়া অভ্যাস করিলেই চলিবে। কারণ এক-হাতি পাড়ির-সাঁতারকুশলীরা কাঁচি-পায়ের সহিত বিশেষ পরিচিত। পায়ের উৎকর্ষের জন্য তাহাদিগকে নূতন করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে না। শিক্ষার্থী প্রথমত পায়ের উৎকর্ষ, পরে উভয় হাতের, পরিশেষে হাত, পা, ও নিশ্বাস প্রশ্বাস একত্রে অভ্যাস করিবে। পাড়ি সন্নিবেশিত হইবার পর ক্ষিপ্রতা, গতিবেগ প্রভৃতি আনুষঙ্গিকে ক্রিয়াগুলি চর্চ্চা করিবে। স্মরণ রাখা বিধেয়, একটি পাড়ি পরিষ্কাররূপে যে পর্য্যন্ত না আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় সে পর্য্যন্ত অন্য কোন নূতন পাড়ি শিক্ষা করা অত্যন্ত ভুল ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

পাড়ি অনুশীলন

হাতের ক্রিয়ার জন্য পূর্ব্ব পৃষ্ঠার চিত্রের ন্যায় জলের উপর যথাযথ দেহ স্থাপন করিয়া, কনুই ঈষৎ বাঁকাইয়া, হাত দু'টি সোজাভাবে নিক্ষেপ করিবে। জল টানিবার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি জুড়িয়া, তালু দিয়া উরু দেশের শেষ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ যতদূর পিছন দিকে লইতে পারা যায় (সাঁতারুর সুবিধা-মত) ততদূর পর্য্যন্ত গভীর ভাবে টানিবে। হাত-পাড়ির ইহাই—বিশেষত্ব। যে সময় হাতের তালু জল স্পর্শ করিবে—অর্থাৎ যে মুহূর্ত্তে হাত নিক্ষেপ করিয়া জল ধরিবে সেই মুহূর্ত্তে শরীরকে কিঞ্চিত গড়াইয়া দিয়া, টানের সহিত মাথা হেলাইয়া, মুখ জলের উপর আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস গ্রহণ করিবে। অপর হাত নিক্ষেপ ও টানের সহিত প্রশ্বাস ত্যাগ করিবে। সাঁতারকুশল-দিগের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, জল টানিবার সময় হাতের কনুই দু'টি শক্ত রাখিবে। যে ভঙ্গীতে হাত দু'টি নিক্ষেপ করা হয় অবিকল সেই ভঙ্গীতে জলের ভিতর টানিবে। কোন ক্রমে হাত বড় কিম্বা ছোট করিবে না। হাত দু'টি জলে নিক্ষেপ করিবার সময় শরীরকে কিঞ্চিত এলাইয়া দিবে। এই সমস্ত ক্রিয়া সাঁতারু নিজের সুবিধামত করিবে। কঠিন পেশীযুক্ত সাঁতারুর পক্ষে একমাত্র কাঁচি-পাড়ি সুবিধাজনক ও অধিক ফলদায়ক।

—পদানুশীলন—

পায়ের ক্রিয়ার জন্য যদি ডান্ দিকে মুখ রাখা হয়, পাড়ি সুরু করিবার পূর্ব্বে পা দু'টি পৃথক করিয়া সজোরে একটি আঘাতের সহিত ডান হাত জলে নিক্ষেপ করিয়া বাম হাত দিয়া জল টানিতে সুরু করিবে। পায়ের আঘাতের পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাতের টান চলিবে ততক্ষণ দেহটি একখানি কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ঋজুভাবে যতদূর সম্ভব ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। পিছনের পা-টি এমন ভাবে পৃথক করিয়া টানিবে, যাহাতে গোড়ালি পশ্চাদ্দেশের কাছাকাছি আসে। সোজা এই সমস্ত ক্রিয়া নিজের সুবিধামত পৃথক-ভাবে অনুশীলন করিতে পারিলেই ভাল হয়। পায়ের ক্রিয়া ভালরূপে সম্পন্ন হইলেই নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রণালীর দিকে মনোযোগ দিবে। সাঁতারের এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি কোন ক্রমে উপেক্ষা করা উচিত নয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার প্রণালী আমি পূর্ব্বে অতি সরলভাবে বলিয়াছি এবং এখানেও বলিতেছি।

প্রথমত জলের উপর দেহটি ঋজুভাবে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ যে ভঙ্গীতে আমরা সাঁতার দিই, সেই ভঙ্গীতে জলের নীচে নাসিকার দ্বারা ফুসফুস্ হইতে ধীরে ধীরে ও সহজে নিশ্বাস ফেলিয়া বাতাস বাহির করিয়া দিবে।

সজোরে নিশ্বাস ফেলিয়া কখনই ফুসফুস্ হাল্কা করিতে চেষ্টা করিবে না। এই নিশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে কিছু-ক্ষণ সময় লাগাইবে। এই প্রণালীতে পাড়ির গতির সহিত একহাতে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া অপর হাতের গতির সহিত ত্যাগ করিবে। এই নিয়মে অভ্যাস করিতে পারিলেই সাঁতারের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ আয়ত্ত হইবে।

শান্তি পাল

করুণী

শ্রীমতী গীতা দেবী

মেঘ-মন্থর নিভৃত রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণ করে হঠাৎ কোন্ কুকুর শাবক আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল।

শুভার ঘুম ভেঙে গেল। সমস্ত মন আকুল হ'য়ে উঠ্‌ল "আহা, গাড়ী চাপা পড়ল বুঝি!" তখনও কুকুর ছানাটার করুণ রোল জমাট বাঁধা অন্ধকারে অসহায়ের মত ঘুরে মরছিল। শুভা স্থির থাকৃতে পারলে না, নিদ্রিত স্বামীকে জাগাতে সঙ্কোচ হ'ল, তবু সাহস করে মিনতিপূর্ণ স্বরে বল্লে, "শুনছ?" অর্দ্ধমুদিত চক্ষে শৈবাল চেয়ে দেখ্‌লে, "কি বলছ?"—কুণ্ঠিত অনুনয়ে শুভা বল্লে, "একটা কুকুর ছানা চাপা পড়ল বোধ হয়, কি রকম কাঁদ্‌ছে শোন! লক্ষ্মীটি!"

"আঃ কি মুস্কিল, তা আমি কি করব? ওকে নিয়ে এত রাত্রে মেডিক্যাল কলেজে ছুটতে হ'বে নাকি? তার চেয়ে তোমার পাগলামীর চিকিৎসা করা দরকার!"

শৈবালকে আবার পাশ ফিরে শুতে দেখে শুভা চোখ মুছে জান্‌লায় এসে দাঁড়াল, সে ঘুমোতে পারবেনা কিছুতেই! কুকুরের কান্না আর শোনা যাচ্ছে না—এতক্ষণে মরে গেছে নিশ্চয়ই!

গ্যাসের আলোয় বৃষ্টি-ধোয়া অন্ধকার পথে কি যেন আব্‌ছা রহস্য সৃষ্টি হ'য়েছে! রিক্সওয়ালার ক্লান্ত ঘণ্টার ঠিন্ ঠিন শব্দ দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। এত রাত্রেও বেচারা হয়তো যাত্রীর আশায় চলেছে; ব্যর্থ প্রতীক্ষায় থেকে থেকে ও হয়তো রিক্সর মধ্যেই কোন রকমে একটু জায়গা করে ঘুমিয়ে পড়বে। ভাব্‌লেও গা শিউরে ওঠে। এক জনের জন্যে দামী খাটে ধব্‌ধবে নরম বিছানা—আর একজনের ফুট পাথের ব্যবস্থা! ভারী অবিচার ভগবানের!

আবার বৃষ্টি সুরু হ'ল। আকাশের কান্নার যেন আর শেষ নেই।—গ্যারাজের টিনের চালে টুপ্, টাপ্, বৃষ্টির সুরে কেমন যেন মোহ এনে দিচ্ছে।

অসংবদ্ধ চিন্তায় অকারণ ব্যাকুলতায় শুভার চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, থম থমে আকাশের মতই। ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে সুর মিলিয়ে সে প্রাণ ভরে কাঁদে—। জুতোর শব্দ শুনে হাতের সেলাই ফেলে শুভা উঠে দাঁড়ালো। দুইহাত পেছনে লুকিয়ে রেখে কৌতুকোজ্জ্বল চোখে শৈবাল বল্লে, "কি এনেছি বলত?" প্রীতি-মধুর হেসে শুভা বল্লে, "তা ঠিক বলতে পারিনা, তবে সকাল থেকে আমার বাঁ চোখ নাচ্‌ছে।"

"ওঃ, তাই নাকি? আচ্ছা চোখ বোজ—ওয়ান্—টু—থ্রী—," চোখ খুল্‌তে সম্মুখে প্রসারিত সুদৃশ্য শাড়ীখানা দেখে চমৎকৃত হ'লেও শুভার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সে দিকে লক্ষ্য না করে শৈবাল সোৎসাহে বলে যেতে লাগল, "উঃ, কাপড়টার জন্যে সমস্ত সহর আজ তোলপাড় করেছি, শেষ কালে হোয়াইট ওয়েতে পেলুম।—আড়াই শো টাকার পক্ষে খুব চমৎকার না?"

সামান্য সখের জন্য অত টাকা! অসাবধানে শুভার একটা নিঃশ্বাস পড়ল। ম্লানমুখে বল্লে, "কিন্তু খাঁটি বিলিতী।" উৎসাহে বাধা পেয়ে শৈবাল চটে গেল; উত্তেজিত স্বরে বল্লে, "এ দেশের বাবার ক্ষমতা আছে এমন ফাইন্ জিনিষ তৈরী করার? মিঃ চৌধুরীর পার্টিতে এই কাপড় পরেই যেতে হ'বে তোমাকে! মাস গেলে নিয়মিত যে মোটা মাইনেটা আসে সেও তো বিলিতী গভর্ণমেণ্টের দেওয়া, তা'হলে সে টাকায় তোমার খাওয়াও উচিৎ নয়!" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে সে সজোরে সিগারেট টান্‌তে লাগল।

রবিবারের সন্ধ্যা। শুভার সাজ সজ্জা অভিনিবেশ সহকারে দেখে নিয়ে রিষ্ট ওয়াচ লক্ষ্য করে শৈবাল ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। "আর দেরী কোর না শুভা, আঃ পেছনে কেন সামনের সীটে বোস, আর দেখ, বেশ সপ্রতিভ ভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ করবে, বুঝ্‌লে?" যন্ত্র-চালিতের মত শুভা সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়লে।

পেট্রোল পাম্পের কাছে মোটর থাম্‌তেই কোথা থেকে একটা ভিখারিণী এসে জুটলো, কোলে তার একটি কানা শিশু। শৈবালের তাড়না অগ্রাহ্য করে সে বার বার করুণ আবেদন জানাতে লাগল, "এ মায়ি, আমার বাছাকে কিছু দে—তুই রাণী হবি মায়ি।" ওর শত জীর্ণ মলিন আচ্ছাদনের পাশে নিজের বহুমূল্য সজ্জার তুলনা করে শুভার সমস্ত মর্ম্মস্থল পীড়িত হয়ে উঠ্‌ল। রত্নালঙ্কার যেন তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল। নিজেকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছেনা।

ভিখারিণীর ছেলেটা হঠাৎ নিতান্ত অর্থহীন ভাবে একচক্ষু বুজে শুভার দিকে চেয়ে হাস্‌লে। আহা বেচারী জানে না তো, হাসবার অধিকার তার নেই!

আর্দ্রস্বরে শুভা বল্লে, "আহা, দাওনা কিছু ওকে।" সবিরক্তি অবজ্ঞায় শৈবালের ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল, "হ্যাঁঃ, থামো, তোমায় বাড়ী থেকে বার করতেই আমার ভয় করে।—সাত হাত মাটি খুঁড়লেও একটি পয়সা পাওয়া যায় না। হাত পা আছে খেটে খাক্‌। ওদেশে ভিক্ষা করাটা অপরাধ বলে গণ্য হয় তা জানো?" ক্ষিপ্রহস্তে সে মোটরে ষ্টার্ট দিয়ে দিলে।

পিছনে ঝুঁকে শুভা দেখলে ক্ষুধাতুর শিশুটা মা'র বুকের আঁচল নিয়ে টানাটানি করছে, নিরুপায় মা আহার্য্যের অভাবে তার গালে ঠাস্ করে চড় কসিয়ে দিলে।—শুভা আর দেখতে পারলে না, স্বামীর অলক্ষ্যে রুমাল দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে উদাস দৃষ্টি মেলে বাইরে চেয়ে রইল।

হাসি গান মুখরিত আলোকোজ্জ্বল উৎসব-গৃহের তোরণে মোটর থামতেই মিঃ চৌধুরী সাগ্রহে অভ্যর্থনা করতে ছুটে এলেন।—এত অপর্য্যাপ্ত সমারোহ—মিঃ চৌধুরীর মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে।—শুভার যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল।

বাল্য সখী নীলা ছুটে এল, কুহেলিময় জ্যোৎস্না রাত্রির মত শুভার অপরূপ মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে বল্লে, "ওঃ কতদিন পরে তোর দেখা পেলুম বল্‌তো, সত্যি,—তুই খুব Lucky শুভা।—রাজরাণীই হয়েছিস্।" লুব্ধ দৃষ্টিতে সে শুভার হীরার কঙ্কণ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগ্‌ল।—শুভার ওষ্ঠপুটে ক্ষীণ হাসির চমক খেলে গেল। নীলা তো আর জানেন না, এই রাণীত্বের আড়ালে কত দৈন্য।

প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অলঙ্কার মোচন করতে করতে শুভা কেবল ভাবছিল কত দরিদ্রের মুখের অন্নে বুকের রক্তে গড়া এই সব হীরা মাণিক!

শৈবালের ছায়া আরসীতে পড়তে সে একটু চমকে জোর করে ক্লিষ্ট হাসি হাস্‌ল। শৈবাল মুগ্ধ, প্রশংসমান চোখে চেয়ে বল্লে, "সত্যি, শুভা আজ তোমাকে যা দেখাচ্ছিল—গ্র্যাণ্ড! তার ওপর একটু যদি Jolly থাকতে, তা হ'লে তো তুলনাই হয় না। যাই বল, তোমার খদ্দর পরলে কি এমন beauty হ'ত?" নিজের প্রশংসা শুভার কানে গেল কিনা কে জানে, সেই কানা শিশুর অহেতুক হাসি জলন্ত শ্লেষের মত তার বুকে বাজছিল, এতক্ষণের সযত্ন রুদ্ধ অশ্রু হঠাৎ বাঁধ ভেঙে তার কালো চোখের দুই তীর ভাসিয়ে দিলে।

তার এই আকস্মিক ভাব বিপর্য্যয়ে শৈবাল বিস্ময় বোধ করলে। তার পর তাকে কাছে টেনে নিয়ে সহাস্যে বল্লে, "এঃ, সামান্য খদ্দরের নিন্দে শুনে কেঁদে ফেল্লে! কি ছেলেমানুষ তুমি? কিম্বা,—ও—বুঝতে পেরেছি রূপের প্রশংসায় আনন্দাশ্রু, না শুভা?"

শ্রীগীতা দেবী
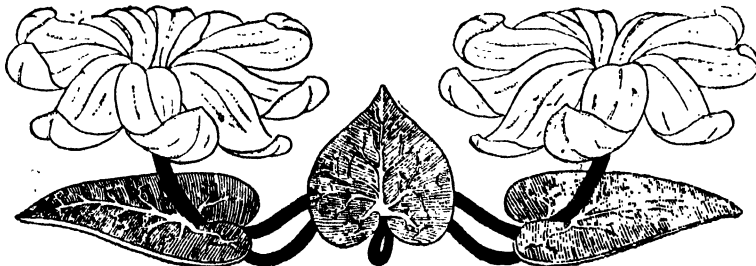
২

আজ নিখিলবন্ধুর পালা, আমি চুপচাপ।

নিখিল বলিতে লাগিল—

পুরী সমুদ্রের তীরে বসিয়া আছি, এক অমাবস্যার রাত্র। দেখিলাম আকাশে মেঘ নাই, অনেকগুলি উজ্জ্বল তারা দেখা যাইতেছে। বায়ু স্থির, হঠাৎ ঝড়ের মত একটি দমকা বাতাস উঠিল। সেই বাতাসের গতি উত্তর হইতে দক্ষিণের দিকে, এমনই মনে হইল। গ্রাহ্য না করিয়াই বসিয়া আছি। লক্ষ্য রহিয়াছে সমুদ্রের জলের দিকে, তরঙ্গের রঙ্গ-ভঙ্গ দেখিতেছি;—যেমন তরঙ্গ সাধারণতঃ সমুদ্রের তীরের দিকে থাকে, সেইরূপ তরঙ্গেরই খেলা; অন্ধকারও ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে। সমুদ্রতীর এখন প্রায় নির্জ্জন, দূরে ক্বচিৎ দুই একজন চলাফেরা করিতেছে।

বালুময় তীরভূমির অতি নিকটেই জলরেখার কতকটা দূরে চঞ্চল জলের উপর যেন জোনাকীর গাদি লাগিয়াছে। একটা তরঙ্গ আগাগোড়াই জ্যোতিষ্মান্, তারপর সেইরূপ একটি, তারপর আর একটি। তিনটি পর পর আসিয়া যখন সৈকতের বালুতলে মিলাইয়া গেল তখন দেখিলাম,—চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারার ছড়াছড়ি; তাহার মাঝে একখানি শ্বেতবর্ণ-প্রায় চতুষ্কোণ পদার্থ, যেন একখানি স্থূল কাষ্ঠাসন, তাহার উপরে গোলাকার একটি পদার্থ। অন্তরে দীপ্ত কৌতূহল, সুতরাং অনুমান করিতে কল্পনার প্রশ্রয় না দিয়াই উঠিলাম। জল হইতে সেটি যখন সৈকতের নিকটে আসিয়াছে, তখন নিকটে যাওয়া কঠিন নয়। তাহার নিকটে গিয়া হেঁট হইয়া পরীক্ষায় মন দিয়াছি, এটি কোন পদার্থ! হঠাৎ যেন ঝড়ের সঙ্গে একজন কেহ পশ্চাৎ হইতে একটি ধাক্কা দিয়া আমায় তাহার উপর ফেলিয়া দিল। আমার কোন আঘাত লাগিল না; কিন্তু তাল সামলাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই আর একটি ধাক্কায় আমায় তাহার উপর বসাইয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশাল তরঙ্গ আসিয়া সেই আসনশুদ্ধ আমাকে ভাসাইয়া জলের দিকে লইয়া চলিল। তখন একটু ভয় পাইলাম। কি করিব, না করিব, বিচারে ঠিক করিবার অবকাশও পাইলাম না। দেখিলাম—সেই আসন আপনবেগে ক্রমাগত গভীর জলের দিকেই চলিল।

স্বপ্নাবিষ্টের মতই দেখিতেছি, এতক্ষণ যেন তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছিলাম, কিন্তু তীর হইতে যখন গভীর জলে প্রায় দুই শত গজ দূরে আসিয়াছি, তখন আর একটি বিশালায়ত প্রবল তরঙ্গ আসিয়া সেই আসনকে বায়ুবেগে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণের দিকে লইয়া চলিল। তখন আমি নিরুপায় হইয়া, পা গুটাইয়া স্থির হইয়াই সেই আসনে বসিলাম।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। জলের উপর মাঝে মাঝে তরঙ্গের তুষারধবল পুঞ্জীকৃত ফেনরাশি মধ্যে মধ্যে আমার চক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিলাম, এখনও জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে বোধ হয় সাঁতার দিয়া কোনও রকমে তীরে উঠিতে পারিব; কিন্তু আসনের সঙ্গে যেন এমনভাবে বাঁধিয়া দিয়াছে, আমার নড়িবার সাধ্য নাই—সুতরাং হাল ছাড়িয়াই দিলাম। ভয় যথেষ্টই আছে; কিন্তু বিস্ময় যেন তাহার উপরে। আমি এতটা বিস্মিত হইয়াছি, আমার সবটুকু অস্তিত্ব যেন সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। কি হইল? এটা কি দৈব ব্যাপার! আসন ক্রমশঃ তীরের সম্পর্ক ছাড়াইল, আর পশ্চাতে ফিরিয়া তীরের চিহ্নও দেখিতে পাইতেছি না, কেবল একটি ক্ষুদ্র তারার মত লাইটহাউসের

আলোটুকু নড়িতেছে। আসনের গতি ক্রমশঃই বাড়িতেছে। কানে হাওয়া ঢুকিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে; বোঁ বোঁ শব্দ অবিরাম, আর কোনও শব্দ নাই। কি উপায় হইবে, অভ্যাসবশতঃ মনে মনেই একবার শব্দ হইল—হা ভগবান!

আসনটী প্রথম হতেই দেখিতেছি অদ্ভুত—কাঠের একখানি পিঁড়া জলে ভাসাইলে যেমন দোলে, অসমান ভারে যেমন এ-দিক ও-দিক উঁচুনীচু হয়, এই অপূর্ব্ব আসন সেভাবে কোনও দিকেই তিলমাত্র হেলিতেছে না বা দুলিতেছে না, ঠিক সমান-ভাবেই রহিয়াছে, যেন সমতল ক্ষেত্রে স্থির বসিয়া আছি। একটু এ-দিক ও-দিক করিলে বা চঞ্চল হইলেও সে আসন অচঞ্চল, স্থির। প্রথম হইতেই এটা লক্ষ্য করিয়া আমি আরও আশ্চর্য্য হইয়াছি। কি বস্তুটি ইহা! কাঠও নয়, পাথরও নয়, এদিকে খুব পুরু—আমার অঙ্গুলির প্রায় দুই পর্ব্ব হইবে, কোণ অনেকটা গোলাকার। ঝিনুকের ভিতর পিটের মত উপরটি তাহার উজ্জ্বল এবং মসৃণ, কেবলমাত্র এইটুকু অনুভব করিতে পারিলাম। কতক্ষণ এই আসনের উপর বসিয়া চলিয়াছি, মনে নাই; ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ যেন এক হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম, যেন আসনের গতি অনেকটা মৃদু হইয়া গিয়াছে। তখন কল্পনা করিতেছিলাম—এইভাবে চলিতে চলিতে ক্রমে এবার আসনটী কোথাও স্থির হয়ত হইবে।

ঘটিলও তাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য তার গতির নিয়ন্ত্রণ। ঠিক এটি মনুষ্যচালিত কোনও যন্ত্রের মত ব্যাপার নয়, একেবারেই দৈব গতি তার, যে ক্রমে কমিতে লাগিল তাহা আমার ধারণার অতীত। সে আসন থামিতে থামিতেই প্রায় দুই দণ্ডের উপর চলিল। বায়ুও এখন ঠিক আসনের গতির সঙ্গে মিলিত, ক্রমে একেবারেই নিস্তব্ধ, অন্ধকারের মাঝে যেন আসনখানি স্থির, গতিহীন হইল।

আমার অবস্থা এখন বর্ণনার অতীত। অসীম জল, চারি-দিকেই অন্ধকার বটে; কিন্তু আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো; সেই আলোর সম্মুখে সমুদ্রের জল-বিস্তৃতির কতকটুকু লক্ষ্য হয় মাত্র, বাকি সবটুকুই ক্রমে তরল অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে। কি অপূর্ব্ব শূন্যতা, তার মধ্যে আমি একমাত্র জীব। ভয় আর বিস্ময়—এই দুইটি ঘনীভূত ভাবেই আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে—আমি সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থবর্জ্জিত একটি জীবমাত্র!

অকস্মাৎ একটি শব্দ যেন কানে আসিল। শব্দটা জলের নয়, যদিও জলের মধ্যে আমি রহিয়াছি। বীণাতে ষড়জের তারে জোরে ঘা দিলে যেমন ধ্বনি উঠে, এ শব্দ সেইরূপই অনুমান করিলাম। স্তম্ভিত অবস্থায়ই আসনে ছিলাম, এই আকস্মিক শব্দে চমকিত হইলাম। কোন একটি দিক্ হইতে শব্দ আসে নাই, ঠিক আমার মাথার অনেকটা উপর আকাশ হইতেই এই শব্দ উঠিয়া ক্রমে ক্রমে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে মণ্ডলা-কারে দিগন্তে মিলাইয়া গেল; চমকের রেশও সেই সঙ্গে ক্ষীণ হইয়া গেল। যেখানে শব্দ অনুমান করিয়াছিলাম, সেইখানেই আবার অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার যাহা ঘটিল, তাহার প্রভাবও আমার মধ্যে কিছু কম হইল না।

দেখিলাম—অনেকটা ঊর্দ্ধে আকাশের কতকটা স্থান মণ্ডলাকারে আলোকিত। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, তারও কেন্দ্র ঠিক আমার মাথার উপরে বহু ঊর্দ্ধে আকাশে, অনুমান হয় যে স্থান হইতে ধ্বনি উঠিয়াছিল, ঠিক সেইখানেই জ্যোতির কেন্দ্র। কেন্দ্রীভূত কতকটা ছায়া, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় অন্ধকারময় মণ্ডলাকার স্থান হইতে উজ্জ্বল জ্যোতির বিস্তার। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রথমে ঘনীভূত হইয়া, পরে তরল হইয়া ক্রমশঃ দিগন্তে বিলীন হইয়াছে। সেই নয়নাভিরাম জ্যোতির্দ্দর্শনে আমার অন্তরের যত ভয়, যতটা সঙ্কোচ, যত কিছু অশান্তির ছায়া একেবারেই চলিয়া গেল এবং আমার অন্তরক্ষেত্রও যেন জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিল। কি অপূর্ব্ব ব্যাপার, যেন সমস্তটুকু জীবন দিয়াই এই অপার্থিব আনন্দরস গভীরভাবে আস্বাদন করিলাম! কিন্তু সে আনন্দ আমার বেশীক্ষণ ভোগ হইল না; কারণ ক্রমে ক্রমে অল্প সময়ের মধ্যেই উহা ম্লান হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের জ্যোতিঃও ম্লান হইতে লাগিল, কেমন একটা নিরানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। তবে আর আমার ভয় রহিল না। কিন্তু তারপর ক্রমে যেন আমার এই সন্দেহ উপস্থিত হইল—যথার্থই কি জ্যোতিঃ দর্শন করিলাম, না অন্ধকার রাজত্বে জ্যোতির মরীচিকা দেখিলাম! স্বপ্নাবিষ্টের মত হইয়া গিয়াছি, আমার যেন কোন প্রকার নির্দ্ধারণের শক্তি

নাই। যাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তাহাতেও আমার সন্দেহ হইতে লাগিল। এ অবস্থা যে আমার কতক্ষণ ছিল, মনে নাই। তখন মৃদুমন্দ সমীরণস্পর্শে যেন আবার আমি একটু সচেতন হইলাম। কি প্রাণমুগ্ধকর গন্ধ এই মৃদু-পবনে ভাসিয়া আসিতেছে! এমন গন্ধ জীবনে কখনও আস্বাদন করি নাই। উহার একটা উন্মাদনা আছে—যতই সেই গন্ধপূর্ণ বায়ুতে শ্বাস লইতে লাগিলাম, এক প্রকার নেশায় মন প্রাণ আমার স্থির হইয়া যাইতে লাগিল—ক্রমে আমি আসনে বসিয়াই অচৈতন্যের মত হইতে লাগিলাম, বাহ্যজ্ঞান একেবারেই লোপ পাইল, তাহা বলিতে পারি না; কারণ তখন শরীরে পবনের স্পর্শ অনুভূত হইতেছিল; সেই গন্ধের রেশ প্রাণে অনুভব করিতেছিলাম, তবে ক্রমশঃই যেন ক্ষীণ হইয়াই আসিতেছে। বেশ বুঝিতে পারিলাম, ঐ গন্ধের মধ্যে এমন একটা মাদকতা আছে, যাহাতে আমার ঐরূপ অবস্থা ঘটিতেছে। ক্রমে আমার স্মৃতিলোপ হইল, ঠিক যেন সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছি।

কতক্ষণ পর যেন আবার একটি স্বপ্নময় অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইল, আমি যেন কোন শান্তিময় অবস্থা হইতে জাগ্রত হইতেছি, এমনই ভাবটি। তখন দেখিলাম—তমসাবৃত রাত্রির আঁধার যেন ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কিম্বা সূর্য্যাস্তের পরে প্রদোষকালে যেমন মেঘমুক্ত আকাশে আলো থাকে। বেশ দেখিতে পাইতেছি, সে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোতে তীব্র ভাব নাই; অথচ সকল বস্তুই স্পষ্টভাবে দেখা যায়, ক্রমে ক্রমে এমনই আলোকে দিক সকল পূর্ণ হইল, তখন দেখিলাম—সমুদ্রটী নিস্তরঙ্গ, বায়ু গতিশূন্য অবস্থায় পুষ্করিণীর জল যেমন স্থির থাকে, তেমনই স্থির। সেই স্থির জলরাশির অনন্ত বিস্তৃতির উপর অপূর্ব্ব দৃশ্য! অসংখ্য উজ্জ্বল আভাময় দীর্ঘ শরীর সকল ইতস্ততঃ গতিমান। শরীর ত বটে! অনেকক্ষণ স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া কৃত-নিশ্চয় হইলাম। শরীর ব্যতীত আর কি বলিব।

এ শরীর আশ্চর্য্য রকমের; মানুষের মত রক্ত-মাংস-অস্থি-নির্ম্মিত নয়; আমাদের শরীরে যেমন স্থুলতা ও গুরুত্ব আছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেদে বিভিন্ন আকারের অস্থি মাংসপেশী সমূহের উপর স্থুল চর্ম্মে আচ্ছাদনে মিলিত একটা আকারের সঙ্গে নানা প্রকার বর্ণ, তাহার উপর বস্ত্রাদির আচ্ছাদন আছে, এ সকল শরীর সে রূপ নয়, আকৃতি এবং বর্ণ ইহাদের নীলাভ, স্বচ্ছ এবং দীর্ঘ। শরীর মধ্যে হস্ত পদাদি অঙ্গের সংস্থান নাই। একটি মানুষের শরীর যদি সোজা হইয়া দাঁড়ায়, হাত পা সোজা ফেলিয়া রাখিলে মোটামুটি সবটা লইয়া যে আকৃতি হয়, তাহাদের আকৃতি অনেকটাই সেইরূপ। মানুষের শরীরের আকৃতি যেমন স্পষ্ট রেখায় নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাদের শরীরের বাহ্য আকৃতি সেইরূপ হইলেও স্পষ্ট রেখায় নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না—যেন শেষের দিকে সীমা রেখা ক্রমে ক্রমে তরল বাষ্পাকারে মিলাইয়া গিয়াছে। মানুষের আকার যতটা দীর্ঘ, তাহাদের শরীর দৈর্ঘ্যে তাহাপেক্ষা অনেকটাই বেশী, সেটা নিরীক্ষণ করিলেই দেখা যায়! অসীম জলের বিস্তার সেখানে তুলনা করিবার মত কোন বস্তু না থাকায়, প্রথমে ততটা লক্ষ্য হয় না।

সেই সকল শরীর নিঃশব্দে নিস্তরঙ্গ জলের উপর নড়াচড়া করিতেছে। মুণ্ডের আকৃতি তাহাদের আছে; কিন্তু তাহার মধ্যে কেশ, কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, মুখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারের কোন চিহ্নই নাই। মানুষের যেমন গলা শরীর ও মুণ্ডের সংযোগস্থল, তাহাদের গলা নাই—মুণ্ডের সঙ্গেই শরীরের আকৃতি নামিয়া আসিয়াছে, পায়ের দিকটা যেন মিলাইয়া গিয়াছে। তাহাদের গতি স্থির, ধীরে ধীরে সরিতেছে বোধ হয়। কোথাও চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই বা পরস্পর বাক্যবিনিময়ের শব্দ নাই।

ক্রমে ক্রমে সেই সকল আকৃতিগুলি আমার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; অপূর্ব্ব বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক কিছু তাহাদের শরীরে দেখিতে পাইলাম—ঐ নীলাভ বলিয়া প্রথমে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার মধ্যেও নানা বর্ণের আভা আছে বিশেষ-রূপে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়। কোনটিতে পীত বর্ণের আভা, কোনটি গোলাপী, কোনটি সিন্দুর বর্ণের, কোনটিতে পিঙ্গল, কোনটিতে বেগুণী, কোনটি বা হরিৎ—এইরূপ এক একটি বিশিষ্ট বর্ণের ঘনীভূত আভায় যেন সকল শরীরই নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রথম দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য হয় না, মনে হয় যেন

সকলকার একটি বর্ণের আভা, কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। আমরা যেমন চক্ষুর দৃষ্টিতে সম্মুখে দেখিয়া চলি এবং ফিরিবার সময়ে শরীরকে ঘুরাইয়া তবে ফিরিয়া আসি অর্থাৎ প্রত্যেক কর্ম্মটি শরীরকে ফিরাইয়া, দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, তাহাদের তাহা নয়। তাহাদের গতির সঙ্গে শরীরকে ফিরাইতে হয় না। একটি শরীর একদিকে অগ্রসর হইল, ফিরিবার সময়ে শরীরকে না ফিরাইয়াই আবার সেই দিকে আসিতে লাগিল। সম্মুখে পশ্চাতে, দুই পার্শ্বে, যেদিকেই হোক না কেন, তাহাদের গতি শরীরকে না ফিরাইয়াই সম্পন্ন হয়। অপূর্ব্ব ব্যাপার—যেন তাহাদের সকল দিকেই চক্ষু অথচ চক্ষু বলিয়া কোন ইন্দ্রিয়ের লক্ষণই নাই। সুতরাং তাহাদের মানুষ বলিব কিম্বা আর কিছু বলিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। যাহাদের শরীর নাই অথচ শরীরের আকার এবং স্বচ্ছভাবের নানা বর্ণের আভা আছে, গতি আছে অথচ আয়াস নাই—এমন বস্তুকে কি বলা যায়! মানুষের সঙ্গে তার তুলনা কোথায়? তাহারা প্রাণী কিম্বা জীব, এটা ঠিকই; কিন্তু কি বলিব তাহাদের!

দেখিলাম, তাহাদের উর্দ্ধগতিও আছে। তবে সেই গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের তরল লঘু শরীর যেন আরও তরল হইয়া মিলাইয়া যায়। আমি ভাবিতেছিলাম যে, স্থূলের জীব, একটি স্থূল শরীরবিশিষ্ট প্রাণী, মানুষ আমি, চক্ষের সম্মুখে এ কি দেখিতেছি। অপূর্ব্ব ব্যাপার। সেই আসনে বসিয়া,—একি, কোথায় সে আসন! কোথায় আমার রক্ত, মাংস, অস্থি, হাত, পা সংযুক্ত শরীর? কৈ আমার সে শরীর ত নাই, এত লঘু যেন কোনও ভারই নাই, বায়ুর মত লঘু হইয়া গিয়াছি। কোথায় আমার হাত, পা, চোখ মুখ নাক, কান? আমার মুণ্ডই বা কোথায়? আমি ঘাড় না ফিরাইয়াই সকল দিকই দেখিতে পাইতেছি। আমার মুণ্ডের স্থানে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি যাহা স্থূল শরীরে হৃদয়ে অনুভব করিতাম। আমার এখন সবটাই চক্ষু, সবটাই কান, সবটাই নাক, সবটাই স্পর্শ।

চিন্তার কোন অবসর নাই, এরাজ্য পৃথিবীর জীবের অগোচর। যাহাকে আমরা লবণ-সমুদ্র বলিয়া জানিতাম, যাহার উপরে আকাশ, নীচে নানাবিধ অসংখ্য জলজীবপূর্ণ সমুদ্রজল, সেই জলাধারের উপর এক অসীম, উন্নত জীবরাজ্য—যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, যাহার কথা কখনও শুনি নাই!

স্থলরাজ্যে যেমন বৃক্ষলতাপূর্ণ বিস্তীর্ণ ভূমিতে আমরা নানাপ্রকারের স্থূল শরীর লইয়া নানা জাতীয় মানুষ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উদ্ভিদ্ বাস করি, বিশাল এই সমুদ্রজলের উপর-তলে, তরল আধারের উপযুক্ত শরীর লইয়া এখানে কেবল মাত্র উন্নততর সূক্ষ্ম বর্ণময় শরীরধারী একশ্রেণীর জীব বাস করে। সমতল ভূমিতে বা প্রস্তরপূর্ণ কঠিন পর্ব্বতভূমির উপর নানা জাতীয় মানুষ আমরা, দেশের জীবসকল কত ভাবে মনোমত উপাদান সংগ্রহ করিয়া যেমন নিজ নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করি, এখানে সেরূপ স্থূল জীবও নাই, আর কোন প্রকার বাসস্থান বলিয়া কিছু চিহ্ন কোথাও দেখিতেছি না। দেশের কঠিন মাটির উপর আমরা সভ্যতা-গর্ব্বিত জীবসকল নানাভাবে পরস্পর সম্বন্ধ পাতাইয়া, যানবাহনাদি লইয়া কতমত হাবভাব ভঙ্গীতে যাতায়াত করি, বিচিত্র কোলাহলময় অশেষবিধ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, নানা প্রকার দ্বন্দ্বময় অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, এখানে তাহার কিছুই নাই। এখানকার অধিবাসীরা সূক্ষ্ম আভাময় শরীরে নিঃশব্দে এক বিশাল কর্ম্ম-রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, সর্ব্বপ্রকারেই স্থূলভূতের সম্পর্কশূন্য হইয়া এক মহান উদ্দেশ্যে অভিনিবিষ্ট—যাহার খবর বুদ্ধিগর্ব্বে উন্নত মস্তক সভ্য মানবসমাজের গোচর নহে।

৩

কঠিন ভূপৃষ্ঠবাসী জীব সকলের মধ্যে যেমন জীবসৃষ্টির সূত্রে একটা উন্মাদ তৃষ্ণা বা মোহ, উদ্দাম সম্ভোগেচ্ছা অবিরাম প্রেরণা দিতেছে এবং তাহার ফলে জন্ম ও মৃত্যুর লীলা, নানাপ্রকার ব্যাধি বহুবিধ অশান্তি, সদাচার কদাচার অবিরাম মানুষ-সমাজকে আলোড়িত করিতেছে; এখানে সে সকল সম্ভোগের কোন আভাষ নাই, আর জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারও নাই। যতটুকু বুঝিলাম, এখানে স্থূল শরীর লইয়া যৌন সম্পর্কের কল্পনা নাই, সুতরাং এখানে কেহ জন্মগ্রহণ করে না। এখানকার জীবগণ আমাদের মত কোন স্থূললোক হইতে উৎকৃষ্ট বা উন্নত কর্ম্মফলেই আসিয়া থাকে।

যেইমাত্র দেখিলাম, আমার মানুষের শরীর নাই, আমার সেই ঘন, আভাময় শরীরের মধ্যে একটি আনন্দের প্রবাহ খেলিয়া গেল, যেন পর পর তাড়িৎশক্তির দুই তিনটি তরঙ্গ বেশ বুঝিতে পারিলাম শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আমার চারিদিকেই সেই আভাময় শরীর সকল নিজ নিজ ভাবে বিভোর, আপনাতে আপনি সমাহিত হইয়া অজ্ঞাত কোন কর্ম্মের মধ্যে অভিনিবিষ্ট। সে কর্ম্মের কথা পরে বলিতেছি।

এখন আমার এই রূপান্তর, এই অভাবনীয় ভিন্নলোকে আগমন ও অবস্থান, আমাকে যেন সত্তায় পর্য্যন্ত পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের স্ফুরণ হইতেছে। কোন পুণ্যফলে আমার সজ্ঞানে এই অবস্থা ঘটিল, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। ক্রমে দেখিলাম, আলোকে দিঙ্‌মণ্ডল আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে অতীব সূক্ষ্ম, মধুর সুরের আভাষ সেই আলোক-রশ্মির সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যাপ্ত শ্রবণ পূর্ণ হইতে লাগিল। সূক্ষ্ম তারের যন্ত্রের ঝঙ্কারের সঙ্গে তুলনা করিলে ঠিক হয় না; কারণ তাহার রেশ অত্যল্পকাল স্থায়ী; এই সুরের রেশ অবিরাম, অতীব তীক্ষ্ণ, এবং পুনঃ পুনঃ অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঝঙ্কারে উদ্ভাসিত। সে সূক্ষ্ম সুরের রেশ সূর্য্যকিরণ-রশ্মির সঙ্গে সংযুক্ত, তার ঝঙ্কার-মাধুর্য্য বর্ণনার ভাষা নাই। স্থূল শব্দের মধ্যে এমন শক্তি নাই, যাহার সাহায্যে সেই অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুরধ্বনির কতকাংশও বর্ণনা করা যায়। পার্থিব যন্ত্রধ্বনি এতই স্থূল, তাহার সঙ্গে তুলনা করা বিড়ম্বনা। আমাদের কান কেবল স্থূল শব্দই গ্রহণ করিতে পারে, তাহার সূক্ষ্ম-শব্দ গ্রহণে শক্তি নাই; কারণ আমরা স্থূল রাজ্যের মানুষ, কেবল স্থূল শব্দই গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিয়াছি—এই অপার্থিব সূক্ষ্ম-ধ্বনি গ্রহণ করিবার যোগ্যতা কোথায়? মাত্র এইটুকু বলা যায়, যে ইহা অপূর্ব্ব এবং আনন্দময়।

ক্রমে দেখিতেছি, আলো আর সুর একযোগে রশ্মির আকারে, অনন্ত রশ্মি আলোক এবং সুর একত্র মিলিত উদীয়মান সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, যেন আলোকমিলিত সুর-রশ্মির বৃষ্টি হইতেছে, যাহাতে দিঙ্মণ্ডল মধুময় করিয়া দিয়াছে, আমরা তাহাতে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়াছি। অসীম পবিত্রতার মুক্তলোক, তাহাতে অপার্থিব আনন্দের আকাশ যেন অনন্তে মিলিয়াছে। স্থূল শরীর ধরিয়া যাহারা এই কঠিন ধরাপৃষ্ঠে নিজ নিজ ক্ষুদ্র অধিকার লইয়া নিজ নিজ জীবন দ্বন্দ্বে মাতিয়া রহিয়াছে, কি করিয়া তাহাদের এই স্বর্গীয় সুর-আলোকে মিলিত আনন্দধারার কথা বুঝাইব!

একজন মানুষ যদি ঐ রাজ্যে তাহার ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত স্থূল শরীর লইয়া আসে, তাহার পক্ষে এ সকল বিচিত্র অনুভব অসম্ভব। যে রাজ্যে আসিয়া আমি এই অপূর্ব্ব নানাবর্ণের আভাময় শরীরগুলি দেখিতে পাইতেছি, স্পষ্টরূপে এই বায়ু-মণ্ডলের মধ্যস্থিত সকল অনুভবগুলি গ্রহণ করিতে পারিতেছি, সে রাজ্যের শরীর স্বতন্ত্র, বৃত্তি স্বতন্ত্র, সবই স্বতন্ত্র। এখানে স্থূল শরীরে আসিলে তাহার কিছুই অনুভব করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না, কারণ মানুষের সবটাই স্থূল—তাহার দেখা, তাহার শুনা, তাহার স্পর্শ, তাহার গন্ধাঘ্রাণ, তাহার রসাস্বাদন, সবটুকুই স্থূলকে অবলম্বন করিয়া। স্থূল-জগতে যাহারা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন, তাঁহাদের মধ্যে কল্পনার প্রবণতা থাকায় সত্য অনুভব সকল নিস্তেজ। আশ্চর্য্য এইটুকু, এখানে সত্যের আলোকে সবটাই উদ্ভাসিত; সকল দেখা, সকল শুনা, সকল স্পর্শ, সকল গন্ধ, সকল আস্বাদনই সত্য, এবং সেই অনুভব জাগ্রতভাবেই সত্য, স্বপ্নময় অথবা ক্ষীণ নহে—এইটুকু বলা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নাই, ইহা পরিষ্কার বুঝাইবার।

আমার স্থূলশরীর-পরিবর্ত্তনের কথাটি আরও আশ্চর্য্য। সেই আসনে বসিয়াই ছিলাম। এই আব্‌হাওয়ার মধ্যে কি ভাবে যে এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনটি সাধিত হইল, তাহা আমার অজ্ঞাত। যে সময়ে আমি এখানে প্রথম শব্দ শুনিয়াছিলাম, তখন হইতে যে সময়ে আমি এই পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম, সেই পর্য্যন্ত এই কালটুকুর মধ্যেই এই পরিবর্ত্তন বা আকস্মিক রূপান্তর সম্ভব হইয়াছিল, ইহা ব্যতীত আর কিছুই বোধ করিতে পারি নাই! বিস্ময়জড়িত আমার অস্তিত্ব বহুক্ষণ এই সকল আলোচনায় অভিভূত ছিল, ততক্ষণ আমি অন্য কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই, ক্রমে এই সকল ঘনীভূত বিস্ময়ের হাওয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল; শেষে আমার পৃথিবীর কঠিন মাটি ও জলের স্মৃতি একেবারেই যেন

মূছিয়া গেল—তখন এখানকার সকল ব্যাপার যে ভাবে চৈতন্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল, এবার তাহাই বলিব।

এই সকল আভাময় শরীরের গতি ধীর, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন দেখিতেছি, এই ধীর ভাবের মধ্যেও বেশ স্বচ্ছন্দ গতি আছে, যাহা স্থূল জগতের তুলনায় অনুমান করা কঠিন। কারণ সেখানকায় স্থূল শরীরের গতি চঞ্চল—অবশ্য শরীরের লঘুত্ব ও গুরুত্ব হিসাবেই সেটা বুঝিয়া লইতে হইবে। এখানকার শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যন্ত কম হওয়ায়, তাহার গতি লঘু হওয়াই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া স্থূল মানুষের শরীরকে গতিমান্ করিতে হইলে প্রথমে ইচ্ছা, তাহার পর শক্তি-প্রয়োগ বা আয়াস করিতে হয়; কিন্তু এ শরীরকে গতিমান্ করিতে শুধু ইচ্ছাই যথেষ্ট, তারপর কোন আয়াসের প্রয়োজনই হয় না। মানুষের শরীর যখন হাঁটে তখন দুই পা একটির পর একটি মাটিতে ধরিয়া তবে গতিমান্ হয়; এখানকার শরীরে দুইটি পা ত নাই—কাজেই ইহার গতি সরল ঋজুভাবেই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। যেমন বেশীদূর হইতে রেল-পথের দিকে চাহিলে প্রসারিত লৌহময় রেখার উপর দিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ট্রেণটি নড়িতে বা এক ধারায় একদিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়, অনেকটাই সেইরূপ। পার্থক্যের মধ্যে ট্রেণ-শরীরটি অনেকটা লম্বা এবং কঠিন বস্তুতে নির্ম্মিত, আর এখানকার শরীর সূক্ষ্ম মনুষ্যাকৃতি, আভাময় এবং নিঃশব্দগতি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানকার শরীরগুলি মানুষের শরীরের তুলনায় খুব হাল্কা বা অত্যন্ত লঘু; তুলনা করিলে তা বলিয়া আকাশ ত দূরের কথা, বায়ু অপেক্ষাও লঘু বোধ হয় না—বরং এখানকার শরীরগুলি বাতাসের তুলনায় বেশ কতকটা স্থূল সেটি বুঝিতে পারা যায়; কারণ তাহা না হইলে সশরীরে শূন্যে অবাধ গতি হইত। এখানকার অধিবাসীরা জলের উপরেই গতিবিধি করে, তবে সময়ে সময়ে—তখন জানিতাম না কি ভাবে—আধারভূত জলতলের বেশ কতকটা উপরেও যাইতে পারে; কিন্তু সেই উর্দ্ধগতির সঙ্গে সঙ্গেই শরীরটিও অদৃশ্য হইয়া যায়, শূন্যে তাহাদের শরীর লক্ষ্য হয় না।

সাধারণতঃ এখানকার বায়ুমণ্ডল স্থির, তরঙ্গহিল্লোল নাই, এরূপই অনুভব হয়; কিন্তু কখনও কখনও এমনও দেখা যায়, উচ্চে তরল মেঘের গতাগতি এবং বায়ুর প্রবল গতি, তাহাতে স্বাভাবিক সূর্য্যকিরণরশ্মি-উদ্ভাসিত সুরের বেশ কতকটা প্রতিহত হয়, কিন্তু এ রাজ্যে অধিবাসীগণের শরীর গতির কোন ব্যতিক্রম হয় না। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে কোন কারণেই হোক এ শরীরের উপর বায়ুর কোনও ক্রিয়া বা প্রভাব নাই—ঝড়ের মধ্যেও ইহা স্থির থাকে।

এখানকার প্রাণিগণের কর্ম্মের কথা বলিবার পূর্ব্বে অন্যান্য বিষয়ে আর কিছু বলিবার আছে। এখানকার বায়ুমণ্ডলে দিবাভাগে সুরধ্বনি-মিলিত আলোক-রশ্মির কথা বলিয়াছি। এখানে উহারই কেবল মাত্র শব্দ নয়, ক্রমে ক্রমে যতই এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হইতেছি, ততই আরও বিচিত্র শব্দের আভাস পাইতেছি—উহা সুর নয়, শব্দ বলাই ঠিক। সে সকল শব্দ চারিদিক্ হইতেই আসিতেছে, আর অসংখ্য জীবপূর্ণ মানব-রাজ্য হইতেই যেন আসিতেছে, স্পষ্টতর বুঝিতে পারিতেছি। ক্রমে ক্রমে সেই সকল শব্দের অনুভব বেশ তীব্রভাবেই হইতে লাগিল! সেই সকল শব্দ অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার অধিবাসীর গতির পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। শব্দ সকল এক একটি ভাব লইয়া আসে; সেই শব্দের বিচিত্র প্রভাব এখানকার প্রাণিগণের উপর কতটা গভীর এটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখানকার অধিবাসীদের এখন হইতে আপ্-দেব বলিয়াই বলিব, তাহাদের অন্য কিছু বলিতে মন চায় না।

এই আপ্-দেবগণের গতিবিধি দুই, তিন, চারি, অথবা আরও অধিক সংখ্যায়—এক একটি দলে মিলিত। কোথাও একটি দেখিতেছি না। উহা নয়নের পক্ষেও বড় মনোরম। প্রত্যেকের ঘন বর্ণপ্রভায় উদ্ভাসিত শরীরের শীর্ষদেশ এবং হৃদয় এই দুই অংশ অপেক্ষাকৃত জ্যোতির্ম্ময়। কোনও একটি বিশেষভাবে ভাবিত হইলে, ঐ দুই অংশই বিচিত্র আভাময় হইয়া উঠে। সেই সকল উজ্জ্বল বর্ণাভাস তরঙ্গের মতই চঞ্চল বা ক্রিয়াশীল—যেন ঢেউ খেলিয়া গেল, এইরূপ বোধ হয়। বিশেষ একটি ভাবের অস্তিত্ব, বর্ণময় তরঙ্গাকারেই তাহার অভিব্যক্তি! আমার চৈতন্যের মধ্যে এই সকল বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রভাব, সঙ্গে সঙ্গে দিব্য শরীরের মধ্যে আনন্দ-ঘন উজ্জ্বল তরঙ্গহিল্লোলে আকুল করিয়া তুলিল। তখন এখানকার সকল ভাবের সঙ্গে পরিচয় ঘটে নাই। পরে ক্রমে ক্রমে এমন সকল ভাবের পরিচয় পাইতে লাগিলাম, যাহা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ক্ষোভ, অসন্তোষ বা অপ্রিয় ভাবসমূহ নির্দ্দেশ করে। সে সকল ভাবের বর্ণাভাস উজ্জ্বল নহে বরং বিপরীত; সে বর্ণের তরঙ্গসকল ম্লান, ধূম্রবর্ণ, গাঢ়, অস্বচ্ছ ভাবের তারতম্যানুসারেই ঔজ্জ্বল্যহীন বা মাধুর্য্যবর্জ্জিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

কাব্য-বিড়ম্বনা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

নিরালাতে বল্‌ল এসে—
"এতও মনে ছিল শেষে,
এত-ও তুমি জানো !
যা-কিছু ছাই লিখ্‌ছ কবি
মনে তো হয় সত্যি সবই,
আমি জানি ফাঁকি তোমার
কোন্‌খানে মিশানো !
ঐ যে তোমার চিত্রলেখা
পুঁথিতে যার পাইগো দেখা,
কথায় কথায় যারে বল্‌ছ—"প্রিয়ে",
উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে
ভর করেছে যাহার ভূতে,
যে ছায় তোমার আঁখির আলো
ছায়ার কালো দিয়ে,—
"নাই তুটি আর অমনতরো,"—
যতই না এ গরব করো,
ছবি যতই রাঙাও অনুরাগে,—
মন্‌গড়া সব কথার ফুলে
মালা জড়াও খোঁপার মূলে,
—সে তো বটেই, আনাড়িদের
দেখতে সে বেশ লাগে !
শুনাও যখন মনের কথা
বুঝি তোমার আকুলতা,
হাসি আসে, দুঃখও হয় আরো,
"মাথা নাই তো মাথা ব্যথা,"—
এ যে দেখি তোমারো তা,
বলো তো কী বুঝাতে চাও
মন বুঝেছ কারো ?

কী যে তোমার লেখার ছিরি,
ইচ্ছা করে ফেলি ছিঁড়ি' !
—বল্‌তে পারো, আছে বুকের পাটা ?
এই মাসেরি 'শিখায়' সত্ত
বেরিয়েছে যে নূতন পদ্য
সত্যি বলো, কার উপরে
লেখা সেই লেখাটা ?
কল্পকুঞ্জে নবাগতা
কে তোমার ঐ খব্‌সুরতা,
"সুলতা"—কে, কোথায় পেলে তারে ?
চুলের গোছ তো ঘন কালো ?
তবেই জানি লাগবে ভালো,
তার উপরে আঁখি ডোবায়
আঁখির পারাবারে—
তবে তো আর কথাই নাহি
মন পাইতে কী উৎসাহী,—
বর্ণনাতেই নিয়েছ তিনপাতা,
ছিঁচ্‌কাঁদুনীর লম্বা ধুয়ো
কী একঘেয়ে,—তুয়ো ! তুয়ো !
একটু যাদের মাথা আছে
প'ড়ে ধরবে মাথা।
মেয়েটাই মা, কী নির্লজ্জ
ঢঙেরই কী আতিশয্য—
পথে চল্‌বি চল্‌না বাপু সোজা,—
তা নয় তো সে এঁকে বেঁকে
চল্‌বে, চাইবে থেকে থেকে,—
দেখতে নেহাৎ ভালোমানুষ
মুখটি সদাই বোজা ;

এ সব মেয়ে হাড়ে দুষ্ট,
শুনে' তুমি হওনা রুষ্ট,
বয়ে গেল ;—আমরা ওদের চিনি ;
পড়ো যদি ওদের ফেরে
জ্যান্তে মেরে দিবে ছেড়ে,
ডাইনি ওরা—পরাণ নিয়ে
খেলবে ছিনিমিনি।
তোমার প্রাণের সহকারে
কী শোভা ও আন্‌তে পারে ?
"সুলতা"—ও পর্‌গাছারই মতো,
তোমার লেখার ছন্দে ব'সে
বাড়ছে আরো রূপে রসে
পরের ধনেই পোদ্দারি ওর,—
দেখি অমন কত !
নইলে,—সে যে কী অপরূপ,
—কী গো, বড়ো রইলে যে চুপ্ ?—
মহিমা তার খুবই জানা আছে,
মুক্তামালা মনের ভুলে
ভালো পাত্রেই দিলে তুলে,'
বলো দেখি তোমার দানের
কী মূল্য ওর কাছে !
বলছ যখন—"ভালোবাসি"—
ঠোঁট বাঁকিয়ে চাপে হাসি,
উপহাসে থাক্‌ত যদি হুঁষ্ !
আপন মনেই আত্মহারা,
পাওনি তো ওর প্রাণের সাড়া,
তাই তো অমন লেখাগুলি
লাগছে যেন তুঁষ !

দিব্যি ! যদি ও-ছাই লেখো,
"লতারে" আজ পাই বারেক-ও
ডালে মূলে ঝেঁটিয়ে ফেলি ওকে।
বুনো মানুষ মন বোঝ না,
কেন কাব্য বিড়ম্বনা ?
—এই-না ব'লে অম্‌নি দেখি
আঁচল দিল চোখে !
মুখখানি তার তুলি' ধীরে
বলি তখন সুগম্ভীরে
"ক্ষমো দাসে, আর দিয়োনা তাপ !
অধুনা যার চরণ সেবি,
সেই নবীনা তুমিই দেবি,
পুরাণোরি নাম ভাঁড়ায়ে
করেছি যা-পাপ !
বিশ্বাসে লও কথা যদি,
দেখব এ সাধ পূর্ব্বাবধি
আরেক তোমায় কেমন দেখো নিজে,
আর যাই থাক্ কাব্যপটে
মনে সে এক তুমিই বটে" ;
শুনে' সে কয়—"পারিনে যাও,
দুষ্টু তুমি কী যে !"
কথা কয়টি ভাঙা ভাঙা
এমনিতেই তো কপোল রাঙা
আরো রাঙা অভিমানের দাহে ;
হঠাৎ সে সব গিয়ে উবে'
ঊষা যেমন মিলায় পূবে,
তেমনি দেখি লজ্জারুণা
মুখ লুকাতে চাহে !

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

গতিশীল আলোকচিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীরণজিৎ সান্যাল

সৃষ্টির প্রারম্ভ হতেই মানুষ চেয়ে এসেছে অমরতা। সেই জন্য যুগে যুগে মানুষের দ্বারা সংঘটিত স্মরণীয় যুদ্ধের বীরত্বময় কীর্ত্তি কাহিনী অধিকার করল—ইতিহাসের অধ্যায়, মানুষ রচনা করল কাব্য সৃষ্টি, করল সাহিত্য, আত্মনিয়োগ করল ধর্ম্মপ্রচারে; এই ভাবে যুগে যুগে মানুস রেখে গিয়েছে নিজের অস্তিত্ব একথা আজ স্বীকার না করে পারি না। জীব জগতে আমরা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পেরেছি তার প্রধান কারণ আমাদের আছে ভাষা তৈরি করবার ক্ষমতা এবং যন্ত্র নির্ম্মাণ করবার সৃষ্টি করবার প্রতিভা। অমরতা লাভ করবার জন্য মানুস কেবলই কাব্য সাহিত্য বা ধর্ম্ম প্রচারে ব্যস্ত না থেকে নিত্য অভিনব যন্ত্রের জন্ম দান করে চলেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর যবনিকার অন্তরালে অনেক কিছু চলে গেছে, কিন্তু তার দান বিংশ শতাব্দীর দানের মতো মহান নয়, 'ছায়ালোক' এই নূতন শতাব্দীর চরম উৎকর্ষ, ছায়ালোকের মধ্যে যে রহস্য যে অদম্য শক্তি আছে তার সন্ধান পেয়েছিলেন যে কয়েকজন ভাগ্যবান তাঁদের কীর্ত্তি কলাপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

গতিশীল আলোকচিত্র বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি চলচ্চিত্র অথবা Cinematograph। এ সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের আলোচনার বিষয় হবে দৃষ্টি-বিজ্ঞান অর্থাৎ Persistence of Vision। ১৩০ খৃষ্টাব্দে একজন গ্রীস দেশীয় দার্শনিক এই সম্বন্ধে এক বই রচনা করেছিলেন। কোনও প্রকার আলো আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হলে সে আলো সরে যাবার পরও এক সেকেণ্ডের কিছু অংশ পর্য্যন্ত তার অস্তিত্ব আমাদের চোখে স্থায়ী হয়, এই অনুভূতিকেই বলা হয় Persistence of Vision। কথাটি বৈজ্ঞানিক।

ইতিহাস আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব ছিল এবং নৃত্য ও অভিনয়ের প্রচলন ছিল। তৃতীয় উইলিয়ামের রাজত্বকালে লণ্ডন সহরে 'প্যারী' হতে সুন্দরী নর্ত্তকীদের আনিয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় এবং ব্যালেট নৃত্যে নিযুক্ত করা হয়, ইতিপূর্ব্বে মহিলারা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্যাদি প্রদর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে 'মার্ক রিজে' (Mark Roget) নামক একজন বৈজ্ঞানিকের 'সচল পদার্থ' এবং 'দৃষ্টিশক্তির অনুভূতি' সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা সে সময়কার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য আনে। এই বক্তৃতাগুলি অনুসরণ করে সে সময়কার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Sir John Harshell এ সম্বন্ধে গবেষণা করে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু ভাগ্য তাঁর প্রতি বিরূপ ছিল বলে তিনি বৈজ্ঞানিকদের নিকট সম্মান লাভ করতে পারেন নি।

এইবার আরম্ভ হোলো চলচ্চিত্র ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় কারণ এইবার হতে লোকেরা practical কাজে হাত দিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আজ হতে প্রায় একশত দুই বৎসর পূর্ব্বে Dr. Joseph Plateau এবং Dr. Simon Ritter Von Stamper নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক 'Zoetrope' অর্থাৎ 'জীবনের চাকা' নাম দিয়ে এক যন্ত্র প্রস্তুত করেন; পরে এই যন্ত্রটি পেটেণ্ট করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই যন্ত্র সম্বন্ধে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আমার নাই তবে যতদূর জানা গিয়েছে এই যন্ত্রটি ছিল এক ফাঁপা নল বিশেষ, চারদিকে ঘুরতো একটি উর্দ্ধগ দণ্ডের সাহায্যে, নলটির ছেঁদার মধ্য দিয়ে অনেক দৃশ্য দেখা যেত এবং নলটি ঘূর্ণায়মান থাকায় কোনও জীবজন্তু অথবা মানুষের ছবি সচল বলে বোধ হোতো। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে যে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক গতিশীল আলোকচিত্র সম্বন্ধে নানারকম গবেষণা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন জার্ম্মাণ ভদ্রলোক Tachyscope

নাম দিয়ে এক যন্ত্র প্রস্তুত করেছিলেন। এই যন্ত্রের সাহায্য নিয়েই অনতিবিলম্বে এক নূতন ধরণের ক্যামেরা তৈরি করা সম্ভবপর হয়েছিল। যদিও এই Tachyscope যন্ত্রের মূল্য সামান্যই ছিল কিন্তু এই যন্ত্রের সম্বন্ধে একজন বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন......but it is a link in the historic past and was adopted in a more or less modified forms by many inventors.

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে Edward Maybridge নামক যুক্তরাষ্ট্রের Geodetic Surveyতে নিযুক্ত একজন প্রবাসী ইংরাজ কর্ম্মচারী জীবন্ত ছবি তোলবার উপায় আবিষ্কার করেছিলেন, এ সম্বন্ধে এক কাহিনী আছে—একবার কয়েকজন রেস খেলোয়াড়দের মধ্যে তাদের ঘোড়ার পদবিক্ষেপ নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হোলো, এবং এই বিরোধই জীবন্ত ছবি তোলবার সূচনা দিয়েছিল সর্ব্বপ্রথম। এই বিরোধ মেটাতে Edward Maybridge wet collodion plateএর সাহায্যে চলন্ত ঘোড়ার ছবি তুললেন কিন্তু তাতে তর্কের মীমাংসা না হওয়াতে তর্কবাগীশরা চাঁদা দিয়ে চব্বিশটি ক্যামেরা কিনে এনে রেস খেলার মাঠের একধারে পর পর সাজিয়ে রেখে চলন্ত ঘোড়ার ছবি নিলেন, এই ভাবে ছবি তোলবার পর দেখা গেল যে প্রথম এবং শেষ ক্যামেরার তোলা ছবিতে যথেষ্ট প্রভেদ এবং প্রত্যেক ক্যামেরার তোলা ছবিতেই কিছু কিছু প্রভেদ থেকে গিয়েছে।

Maybridgeএর পর Praxoscope নাম দিয়ে প্রক্ষেপণ যন্ত্র অর্থাৎ Projector তৈরি করছিলেন, এই নিয়ে বৈজ্ঞাপন মহলে সাড়া পড়ে গেল, এই সম্মান পূর্ব্ব উল্লিখিত Sir John Harshellএর পক্ষে সহজলভ্য হয়নি।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে Dr. E. J. Marey এক রকম Photographic বন্দুক তৈরি করেছিলেন যা'র সাহায্যে তিনি উড়ন্ত পাখীর দ্রুততা পরীক্ষা করতেন। তাঁর বর্ণনাপ্রসঙ্গে একজন গ্রন্থকার বলেছেন—In addition of his photographic gun he also invented a very ingenious cinematograph camera capable of recording exposures as brief as half to hundred part of a second.

জগৎবরেণ্য বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসনের হাতে পড়ে চলচ্চিত্রের অনেক উন্নতি হোলো। প্রথম চেষ্টাতেই তিনি ফনোগ্রাফ রেকর্ডের মতো ছোট আকারের এক ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর তিনি কলোডিয়ন এবং সেলুলয়েড নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন। আজও অনেকে বল্‌তে গর্ব্ব বোধ করে যে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ম্যান কোডাক ক্যামেরার যে সর্ব্বপ্রথম ফিল্ম প্রস্তুত হোলো তার নির্ম্মাতা —এডিসন। এই ফিল্ম আবিষ্কৃত হবার পর তিনি Kinetoscope নাম দিয়ে প্রক্ষেপণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করেছিলেন, সম্ভবতঃ এই যন্ত্রই সর্ব্বপ্রথম বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হয়েছিল, একটি ম্যাগ্‌নিফাইং কাঁচের সাহায্যে এই যন্ত্রের ছবিগুলি বড়ো আকারে পর্দ্দার উপর ফেলা হোতো।

ইতি পূর্ব্বে প্রক্ষেপণ যন্ত্র (Projector) নিয়ে কেহই বিশেষ মাথা ঘামান নি, এডিসনের Kinetoscope আবিষ্কৃত হবার কিছুকাল পরেই 'লুমিয়ের' নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোক--Cinemetrography নাম দিয়ে এক প্রকার প্রক্ষেপণ তৈরি করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় জনসাধারণের সমক্ষে সর্ব্বপ্রথম ছবি দেখান সি, এফ, জেনকিন্‌স (C. F. Jenkins) ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। যতদূর সম্ভব জানা গিয়েছে এই বৎসরের আগষ্ট মাসে কোনও এক প্রদর্শনীতে এ যন্ত্রটি সর্ব্বসাধারণ দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

এর পর আরম্ভ হোলো চলচ্চিত্রের প্রগতির যুগ; রূপের সাথে বাণীর সঙ্গম হোলো। এডিসন নির্ব্বাক ছবিকে ভাষা দেবার জন্য নীরবে সাধনা করে চলেছিলেন, সুতরাং তাঁকে একাজের pioneer বলে স্বীকার করতে হবে। প্রথমে তিনি চলচ্চিত্র-ক্যামেরার সাথে গ্রামোফোন রেকর্ড সংযোগ করে দিতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি, অতঃপর এডিসন মোমের উপর কথা লিপিবদ্ধ করে এক যন্ত্র তৈরি করেছিলেন; কিন্তু দুঃখের সাথে বল্‌তে হোলো এই যন্ত্রটি মানুষকে আশানুরূপ তৃপ্ত করেনি।

সবাক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যাঁর নাম সর্ব্বপ্রথম লেখা থাকবে তাঁর নাম ইউজীন লস্তে (Eugine Lauste)। শব্দ

কম্পনকে বৈদ্যুতিক কম্পন ও মৃদু তীব্র আলোক তরঙ্গের সাহায্যে পরিবর্ত্তিত করে মুখের ছবি তোলা সম্ভব, এই থিয়োরী'র উপর নির্ভর করে লস্তে একটি যন্ত্র তৈরি করে পেটেণ্ট করে নিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে দেখা গেল শব্দ অতি ক্ষীণ, অতঃপর বেতারের Valve Amplifierএর সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

এই সময়েই ইংলণ্ডে মিঃ হেপওয়ার্থ নামক একজন যন্ত্রী 'ভিভাফোন' নামক এক যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি এই যন্ত্রেরই উন্নত সংস্করণ তৈরি করলেন, ছবি দেখান ও রেকর্ড চালাবার কাজ এক সাথে যুক্ত করে। কিন্তু এই যন্ত্রটি অধিক দিন সচল ছিল না। হেপওয়ার্থ তাঁর এই যন্ত্রটিকে বিক্রয় করে দিলেন এক ব্যবসায়ীর নিকট, তাঁরাও এই যন্ত্রের এক উন্নত সংস্করণ তৈরি করলেন। বেতার valveএর আবিষ্কর্ত্তা ডাঃ ফরেষ্ট এক অভিনব Phono film তৈরি করেছিলেন, সবাক ছবি হিসাবে যা প্রথম দেখান হয়। হলিয়ডের প্রসিদ্ধ ফিল্ম প্রস্তুতকারক 'ওয়ার্ণার ব্রাদার্স' (Warner Bros) ডাঃ ফরেষ্ট আবিষ্কৃত ফিল্ম প্রস্তুত হবার পূর্ব্বেই তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে শব্দমুখর ছবি তুলেছিলেন।

মুখর চলচ্চিত্রের প্রায় শতাধিক নাম আছে, যাদের মধ্যে অনেকগুলি আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিনি, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—অডোফোন, ওরাল ফিল্ম, গ্রাফোটোন ইত্যাদি।

চলচ্চিত্রের আবিষ্কর্ত্তা সম্বন্ধে আজও আমাদের অনেকের ভুল ধারণা আছে বলে মনে করি; নির্ব্বাক ও মুখর চলচ্চিত্রের আবিষ্কারে একই সময়ে অনেক লোক পরিশ্রম করেছেন সুতরাং সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের আবিষ্কারে কোনও ব্যক্তিবিশেষের সাফল্যের দাবী থাকতে পারে না। অবশ্য মুখর ছবির ইতিহাসে এডিসন এবং ইউজীন লস্তের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।*

শ্রীরণজিৎ সান্যাল

* এই প্রবন্ধ লেখবার সময় আমাকে যে সকল পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Popular cinematography (Lengland), Motion pcture photography (Gregory), Amateur cinematography (Talbot), ছায়ালোক (বরেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়)।

সনেট

শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়

লভিতে কি চাহ, বন্ধু, ঘনিষ্ঠ আশ্লেষ
তব মুক্ত জীবনের। জানিতে কি চাহ—
কোথা বহে গুপ্ততোয়া প্রাণের প্রবাহ
তব—উছল, শাশ্বত। কোথা অনিমেষ
বুভুক্ষু আকাশ-পটে ধ্রুবতারা সম
একাকী দীপিছ নিত্য স্থির মহিমায়।
কোথা তুমি চিরসত্য মর বসুধায়;
কোথা গুপ্ত জীবনের রহস্য পরম।

তবে এস, নেমে এস—নিক্ষেপিয়া দূরে
তব ছদ্ম-পরিচয় চিত্ত-রসাতলে;
নেমে এস কামনার ভোগবতী-জলে—
তরঙ্গে বাসনা-স্তব জাগে মত্ত সুরে
যার। স্নান-তৃপ্ত তা'হে দেহের দর্পণে
জীবনের রূপ, হের, সে-মাহেন্দ্রক্ষণে।

শরৎচন্দ্রিকা *

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

নির্জ্জন তমসা-তীরে কোন্ এক আদিম উষায়
ক্রৌঞ্চের বিরহ-দুঃখে বিগলিত ঋষির হিয়ায়
জেগেছিল আদি-গীতি ভারতের ; করুণায় কম,
ব্যথায় বিহ্বল সেই সুধা-উৎস—সেই অনুপম
প্রেমকথা, আজিও সে উদ্বেলিত নিত্য চিত্ততটে
অজস্র উচ্ছ্বাস-ভরে—আজিও সে হৃদয়ের পটে
আঁকিছে আলেখ্য তার বিচিত্রবরণ ; সেই হ'তে
আনন্দপ্রবাহ বহে বিষাদের অশ্রু-সিক্ত পথে !
হে পূর্ণ শরৎচন্দ্র, স্নিগ্ধ কম কৌমুদীধারায়
ভরেছ নিখিল বিশ্ব, সঞ্জীবিয়া প্রতিভা-প্রভায়
প্রসুপ্ত চেতনা বক্ষে , জাগাইয়া প্রাণস্পন্দ নব—
অলক্ষ্য নেপথ্য হ'তে অজ্ঞাতের অসীম বৈভব !
তোমার বেদনা-গানে ফুল্ল আজি পল্লীর পল্বল,
জীর্ণ এ প্রাচীনা ধরা প্রাণরসে করে টল্‌মল্ !
অন্তর্গূঢ় করুণার কমনীয় 'রঞ্জন-রশ্মিতে'
মর্ম্মের অমৃতবার্ত্তা উদ্‌ঘাটিলে সহসা চকিতে
প্রকাশি' নূতন বিশ্ব ; কল্‌পনার কোন্ ইন্দ্রজালে
সৃজিলে নবীন করি' প্রবীণা ধরণী ? কালে কালে
দিব্য তব অবদান দীপ্যমান রবে এ ধরায়
অনন্ত কালের ভালে রবে লেখা অক্ষয় রেখায় !

তুচ্ছ যাহা নহে তুচ্ছ, বাহিরের রূপ সে তো মায়া,
গ্রন্থের বন্ধনে তব লভিল সে অপরূপ কায়া
ভাব-ঘন সত্যমূর্ত্তি ; দিব্যদৃষ্টি হে ঐন্দ্রজালিক,
সৃষ্টির অন্তরে তব বিশ্বচিত্ত হারাইল দিক্ !
যুগে যুগে নারীচিত্তে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
প্রেমের যে পুণ্যতীর্থে পথ-যাত্রী আছিল বঞ্চিত
হাত ধরে লয়ে গেছ অজানিত সে রহস্য-লোকে
গভীর তিমির হ'তে বিস্ময়ের প্রদীপ্ত আলোকে !
সুদূরপ্রসারী তব কল্‌পনার স্বপন সঙ্গীতে
প্রত্যহের পথ-চলা ভরি' দিলে নৃত্যের ভঙ্গিতে,
করিলে কুসুমকীর্ণ জীবনের সঙ্কীর্ণ সরণি,
নন্দিলে বিচিত্রছন্দে স্বার্থক্ষুব্ধ, বিধুর ধরণী !
ছায়াভীত মূঢ় অন্ধে পরাইলে প্রেমের অঞ্জন
ঝঙ্কলে দীপকরাগে সুরহারা মূর্চ্ছিত চেতন।
ছিন্ন করি' আঁখি-আগে বিস্মৃতির ঘন যবনিকা
দেখালে এ বিশ্ব দৃশ্যে,—আছে তাহে কি রহস্য লিখা।
প্রকাশিলে অসংশয়ে সেই কল্প-স্বপ্ন অভিরাম
লহ লহ, তীর্থবন্ধু, পথিকের প্রথম প্রণাম !

* শান্তিপুর সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে পঠিত

শ্রীসুশীলকুমার বসু

হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ

হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ যাহাতে আইন অনুসারে সিদ্ধ হইতে পারে, সেই মর্ম্মে আইন পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটি বিল উত্থাপন করিবেন বলিয়া আইন পরিষদের অন্যতম সদস্য ডাঃ ভগবান দাস একটি নোটীশ দিয়াছেন। ১৯১৮ সালে পরলোক গত নেতা ভি, জে, প্যাটেল কর্ত্তৃক বিলটি উত্থাপিত হইয়া পরিশেষে পরিত্যক্ত হয়। হিন্দুদের কোন বিবাহে উভয়পক্ষ এক জাতির লোক না হইলেও, এবং প্রথা বা হিন্দু আইনের কোন ব্যাখ্যা বিপক্ষে গেলেও, এই আইন অনুসারে কোন হিন্দুবিবাহ অসিদ্ধ হইবে না।

নানাদিক দিয়া এই আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে; তাহার মধ্যে সংক্ষেপে কয়েকটির আলোচনা করা গেল।

মানুষের সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যাহাতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষুন্ন থাকে, তাহাই সকলের লক্ষ্য এবং কাম্য হওয়া উচিত। কিন্তু, যাহাতে কাহারও স্বাধীন ব্যবহার অপর কাহারও স্বাধীনতাকে নষ্ট বা খর্ব্ব না করিতে পারে এজন্য প্রত্যেকেরই স্বাধীনতার একটা সীমারেখা টানিয়া দিবার প্রয়োজন হয়। এই সীমারেখাই আইন এবং সামাজিক ও পারিবারিক প্রথা ও রীতিপদ্ধতির আকারে সামাজিক ও রাষ্ট্রীক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে বলিয়া লোকের নিরাপদ জীবনযাত্রা এবং দেশের সর্ব্ববিধ অগ্রগতি সম্ভব হয়। ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সময়ে সময়ে সমষ্টির ইচ্ছা এবং নিয়ম শৃঙ্খলার পায়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অনেকদূর পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়। যদিও বিশেষ সময়ের এবং বিশেষ অবস্থার জন্য এই প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় তবুও, অনেক সময় আমাদের অহেতুক ভয় ও দুর্ব্বলতার জন্য ইহার অনেকগুলি স্থায়ী হইয়া লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া রাখে।

মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সমাজের ক্ষতি না করিয়া যতটা দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে, পৃথিবীর কোন দেশেই মানুষ ততটা স্বাধীনতার অধিকারী আজও হইতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ, পৃথিবীর সব দেশেই ক্ষমতান্ধ শাসক সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং পুরোহিত, ধর্ম্মযাজক ও শাস্ত্রকারেরা নিজেদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার জন্য জনসাধারণকে রাষ্ট্রিক আইন, শাস্ত্রিক অনুশাসন এবং সামাজিক প্রথা প্রভৃতির সাহায্যে দাস করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সব দেশেই জনসাধারণকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আদায় করিয়া লইতে হইয়াছে। নানা ঘাত প্রতিঘাত ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া এই চেষ্টা এখনও চলিয়াছে।

নানা কারণে—তাহার মধ্যে পরাধীনতা, অজ্ঞতা, গণ-চেতনার অভাব এবং প্রাচীন-জাতি-সুলভ সংস্কারান্ধতাই প্রধান,—আমাদের দেশে লোকের ব্যক্তিগত অধিকারের সীমা অন্য অনেক স্বাধীন দেশ অপেক্ষা সংকীর্ণতর। রাষ্ট্রিক পরাধীনতার জন্য যে-সকল অধিকার সঙ্কুচিত হইয়াছে, সে সকলের বিস্তৃতি সাধন সহজ নহে, যদিও সেজন্য চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু, রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের সহিতই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর; প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে ইহার প্রভাব ও শক্তি অনুভব করিতে হয় এবং ন্যায় অন্যায় সকল প্রকার নির্দ্দেশ মানিতে বাধ্য হইতে হয়। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সম্ভবতঃ আমাদের দেশে লোকের ব্যক্তিগত জীবনের উপর সমাজের প্রভুত্ব দৃঢ়তর এবং

অধিকতর শক্তিশালী। ইহার প্রধান কারণ, রাষ্ট্রের সহিত দেশের জনসাধারণের সম্পর্ক আমাদের কোন দিনই বিশেষ নিকট ছিল না। বহুদিন ধরিয়া রাষ্ট্র বিপর্য্যয়ের অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করিতে হওয়ায়, স্বভাবতঃই মানব প্রকৃতি এখানে সমাজের নিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে আত্মরক্ষার পথ খুঁজিয়াছে। তদুপরি রাষ্ট্রশক্তির শিথিলতার সুযোগে গ্রাম্য জমিদার মহাজন প্রভৃতি ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকেরা রাষ্ট্রিক ক্ষমতার কতকটা আত্মসাৎ করিয়া সাধারণ লোকের উপর অন্যায় প্রভুত্ব চালাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। ইঁহারাই অধিকাংশ স্থানে সমাজের কর্ত্তা হইয়া সমাজিক শক্তিকেও নিজেদের ক্ষমতাধীনে আনিবার সুযোগ পাইয়াছেন। এই উভয়বিধ শক্তি পরস্পরের আশ্রয়ে এখনও কিছু পরিমানে টিকিয়া আছে এবং সাধারণ লোকের কার্য্যকলাপ কিছু পরিমানে, আইনের সীমা অতিক্রম করিয়াও নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয়।

রাষ্ট্রিক প্রভুত্বের অসঙ্গত অন্যায়ের প্রতিকার চেষ্টা যেমন সকলেরই কর্ত্তব্য, তেমনই রাষ্ট্র-শক্তি যাহাতে দেশের আভ্যন্তরীণ অন্য সকল প্রকার বে-আইনি শক্তিকে নষ্ট করিয়া সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতে পারে, অন্য সকল প্রভুত্বের হাত হইতে আমাদের ব্যক্তিগত কার্য্যের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে পারে, আমাদের ব্যক্তিগত কার্য্যের আইনসঙ্গত অধিকারকে ক্রমেই বাড়াইয়া দিতে পারে, সে বিষয়ে রাষ্ট্রকে সচেতন ও সচেষ্ট করিবার এবং সাহায্য করিবারও দায়িত্ব স্বাধীনতা ও প্রগতিকামী সকল ব্যক্তিরই আছে। আলোচ্য আইনটি আমাদের নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত কার্য্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে কিছু দূর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিবে, কাজেই ইহা সমর্থনযোগ্য এবং ইহার উত্থাপক প্রশংসা ও ধন্যবাদ ভাজন।

বিবাহ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় অনেকটা পারিবারিক ব্যাপার। মানুষের সমগ্র জীবনে ইহাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন ব্যাপার বোধ হয় আর নাই। জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র নিতান্ত সীমাবদ্ধ হওয়া বিশেষ দুঃখের কথা। ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং রুচি অনুযায়ী কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা যাহাতে এক্ষেত্রে লোকের থাকে, তাহার ব্যবস্থা হইবার প্রয়োজন আছে। এই আইনটির দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ না হইলেও, কিছু পরিমাণে হইবে এবং ইহার প্রয়োগ-ক্ষেত্র শুধুমাত্র হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া, ইহা বিশেষ কোন জটিল অবস্থারও সৃষ্টি করিবে না। মুসলমান ও খৃষ্টানেরা ইচ্ছা করিলে, নিজেদের সমাজের সর্ব্বস্তরের মধ্যে বিবাহাদি ত করিতে পারেনই, ভিন্ন সমাজের লোককেও বিবাহ করিয়া নিজেদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারেন। ইহাতে সুবিধা ব্যতীত তাঁহাদের অসুবিধা কিছু হয় নাই। এইরূপ কার্য্যের সামাজিক ও আইনগত বাধা না থাকিলে আমাদেরও সুবিধা ব্যতীত অসুবিধার কারণ ছিল না। হিন্দু সমাজের যে সকল নারী ও পুরুষের সহিত অন্য ধর্ম্মের লোকের বিবাহ হয়, তাঁহারা সর্ব্বক্ষেত্রেই সমাজ এবং অনেকক্ষেত্রে ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। হিন্দুধর্ম্মও সমাজের যদি অন্যান্য ধর্ম্ম ও সমাজের ন্যায় উদারতা থাকিত (আইনগত বাধা এক্ষেত্রে অবশ্য থাকিত না), তাহা হইলে ইহাদের অনেকেই হিন্দু থাকিতেন, এবং ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট অপর পক্ষীয়েরা অনেকে হিন্দু হইতেন। বর্ত্তমান আইনে অধিকার এতটা প্রশস্ত না হইলেও, নানা দিক দিয়া ইহা হিন্দু-সমাজের কল্যাণ সাধন করিবে এবং শুধু হিন্দুদের মধ্যে প্রযুক্ত হইবে বলিয়া বিবাহের সময় ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন উঠিবে না। বর্ত্তমানে বিবাহের পর কন্যার যেমন গোত্রের পরিবর্ত্তন হয়, সেই প্রকারে গোত্রের সহিত পাত্রীর বর্ণেরও পরিবর্ত্তন হইবে মাত্র।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুর মধ্যে বিবাহের প্রচলন থাকিলে, আমাদের গোচরে এবং অগোচরে যে সকল ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া অনেক লোকের জীবন ব্যর্থ হইতেছে, তাহার অনেকটা অবসান হইবে। এক প্রকার শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহার ও রুচি বিশিষ্ট নরনারীর মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। শিক্ষিত ও ভদ্র নামধারী হিন্দুদের কয়েকটি জাতির শিক্ষা দীক্ষা, জীবনযাত্রা একই প্রকারে এবং অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের মেলামেশা, পারিবারিক বন্ধুত্ব প্রভৃতি খুব ঘনিষ্ট ধরণের। অথচ, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় অল্পাধিক আশাভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া,

মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডি পর্য্যন্ত নানাপ্রকারের করুণ ব্যাপার বহু ঘটিয়া থাকে। বহুক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া উচ্চশিক্ষিত পরিবার সমূহের মধ্যে—এইরূপ বিবাহ কিছু কিছু ঘটিতেছে—যদিও তাহার ফলে এই প্রকার দম্পতীদের হিন্দুসমাজের বাহিরে গিয়া পড়িতে হয় এবং আইনগত নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

আলোচ্য আইনের ফলে, বর্ত্তমানে এই সকল লোকই সুবিধা পাইবেন মাত্র; ইহার ফল সমাজের সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইতে এখনও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে।

কিন্তু, তাহা হইলেও, আইনগত অসুবিধা দূর হইলে, প্রয়োজনের চাপে, সমাজ-সেবীদের প্রচেষ্টায় এবং ঘটনার আঘাতে ইহা সমাজে ক্রমেই ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারিবে। সাধারণতঃ সমান স্তরের লোকের মধ্যে বিবাহাদি হইয়া থাকে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, ক্ষেত্র অনেক বেশী বিস্তৃত হওয়ায়, যোগ্য পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা বাড়িবে এবং বরপণ ও কন্যাপণ প্রভৃতি প্রথা আপনা হইতে উঠিয়া যাইবে।

এই সকল কারণে, বৈবাহিক পরিধিগুলি যে বাড়াইবার প্রয়োজন আছে সে কথা, প্রায় সকলেই বুঝিয়াছেন এবং এক শ্রেণীর বিভিন্ন উপশ্রেণীর মধ্যে যাহাতে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহার জন্য প্রায় প্রতি শ্রেণীর মধ্যে অনেকদিন ধরিয়া চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু, একই শ্রেণীর বিভিন্ন উপশ্রেণী সাধারণতঃ দেশের একাংশে বাস করেন না বলিয়া ইহার উপযোগিতা সকলে স্বীকার করিলেও, কার্য্যতঃ এ সকল চেষ্টা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইবার পক্ষে এই বাধা নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, নানাভাবে প্রচলিত কৌলিন্য প্রথার জন্য, এক সম্প্রদায়ের মধ্যেও যোগ্য পাত্রপাত্রীর বিবাহে নানা বাধা উপস্থিত হয়। ইহাতে আইনের বাধা নাই, অনেকস্থলে সমাজচ্যুত হইবারও ভয় নাই তবু, লোকে বংশ মর্য্যাদার মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারে না; অথচ অসবর্ণ বিবাহের ন্যায় সংস্কার-বিরোধী কাজ লোকে করিতে চাহিবে কেন?

ইহার উত্তরে প্রথমত বলা যাইতে পারে যে অনেক লোকে বংশমর্য্যাদা উপেক্ষা করিয়া বিবাহ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা বংশ মর্য্যাদাকে লঘু করিলেও, সমাজকে আঘাত করে না, এবং কোন প্রকার চাঞ্চল্য সৃষ্টি না করায়, অন্য লোককে এই পথ অনুসরণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। এখানে সংস্কার অতিক্রম করিয়া নূতন কাজ করিবার প্রয়োজন হয়, অথচ কাজ খুব বড়ও নহে এবং বিশেষ কিছু দুঃখ ভোগও করিতে হয় না। কাজেই, নূতন কাজের জন্য আত্মদানের প্রয়োজন হইতে লোকে নূতন কাজ করিবার যে শক্তি পায়, নূতন কোন বড় কাজ করিবার যে মোহ অনেক লোককে নূতন পথের পথিক করে এ ক্ষেত্রে তাহা থাকিলে, হয়ত আরও অনেক লোকে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেন।

কিন্তু, অসবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে, পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী সাহসী লোকেরা এবং অন্য নানা কারণে আরও কতক লোকে এই কার্য্যে প্রথম অগ্রসর হইবেন। ইঁহাদের কার্য্য সমাজে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিবে, তাহা এবং নূতন বড় কাজ করিবার মোহ আরও অনেককে এদিকে আকৃষ্ট করিবে; পণপ্রথা, যোগ্য পাত্রপাত্রীর অভাব প্রভৃতি প্রয়োজনের চাপ কার্য্যকে ক্রমেই অগ্রসর করিয়া দিবে। অবশ্য ইহার প্রথম অগ্রগমন নির্ভর করিবে সংস্কার প্রয়াসীদের চেষ্টার উপর।

কৌলিন্য প্রথা প্রভৃতি দূর করিবার প্রত্যক্ষ চেষ্টা করিয়াও ফল পাওয়া যায় নাই কিন্তু, অসবর্ণ বিবাহ কিছু দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গেলে, সে সকল সহজেই বিলুপ্ত হইবে।

সমাজের কোন কোন স্তরে, বিশেষ করিয়া নবশাকদিগের মধ্যে, বিবাহাদি একশত, দেড়শত করিয়া পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, গোপ, প্রামাণিক প্রভৃতি জাতিরা সাধারণত একগ্রামে অধিক সংখ্যায় বাস করেন না (যদিও ব্যতিক্রম নাই, এমন নহে)। কারণ, ইঁহারা ব্যবসায়ী ছিলেন এবং এখনও অনেকে আছেন—অথচ, একগ্রামে অধিক লোকের ব্যবসায়ের স্থান নাই। ইঁহাদের মধ্যে কন্যাভাব একেই তীব্র, বিবাহের গণ্ডীগুলি এই প্রকারে ক্ষুদ্র হওয়ায়, এই তীব্রতা আরও অনেক বেশী উপলব্ধি হইতেছে। ইঁহাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির জীবনযাত্রা অনেকটা এক প্রকারের, কাজেই ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহের প্রচলন হইবার পক্ষে কোন প্রকৃত অসুবিধা সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইঁহাদের বিবাহের গণ্ডী এই-

ভাবে বাড়িয়া গেলে দ্রুত মৃত্যুর হাত হইতে ইঁহারা রক্ষা পাইতে পারিবেন।

হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন হইলে, তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ এই হইবে যে, যে-বৈষম্য ও বিভেদ হিন্দুসমাজের নানাপ্রকার দুর্ব্বলতার কারণ হইয়া রহিয়াছে, ইহার দ্বারা তাহার তীব্রতা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়া, কালক্রমে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতে পারিবে। একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে একভাষায় কথা বলিয়া, এক প্রকারে জীবন যাপন করিয়া যাহারা পাশাপাশি বাস করিতেছে, বাঁচিতে হইলে তাহাদের একজাতি হইয়া গড়িয়া উঠা ব্যতীত উপায় নাই। কিন্তু, ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকের বাস হওয়ায় সেদিক দিয়া খুব অসুবিধা হইয়া রহিয়াছে। তবে হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যাতীত উপবিভাগ থাকায় তাঁহারা যে অতিরিক্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে তাহা দূর করিবার চেষ্টা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই চেষ্টা ভারতীয় জাতিগণের পথও যে অনেকটা সুগম করিয়া দিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ইহার ফল সমাজের পক্ষে ভাল হইবে কি না

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, অসবর্ণ বিবাহের ফল আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের দেহ মনের উপর ভাল হইবে না। খুব দূরবর্ত্তী ভিন্ন জাতীয় লোকদের মিশ্রণের ফল যে ভাল হয় না, সম্ভবতঃ সে সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞদিগের মত উদ্ধৃত করা যাইবে। কিন্তু, ইঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলার কোন জাতিই বিশুদ্ধ নহেন, এবং সকলের মধ্যেই নানাবিধ মিশ্রণ রহিয়াছে। কাজেই ইঁহাদের পরস্পরের মিশ্রণে, নূতন বিশেষ কিছু ঘটিবে না। বাংলার জাতিগুলি মূলত যদি এক নাও হন, তবুও তাঁহারা এত দূরবর্ত্তী নহেন, যাহাতে বিবাহের ফল খারাপ হইতে পারে। অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন হইলে, প্রধানতঃ সমপর্য্যায়ের জাতিগুলির মধ্যেই বিবাহ ঘটিবে—অন্য যাহা ঘটিবে তাহার সংখ্যা তুলনায় অনেক কম হইবে। সমপর্য্যায়ের জাতিগুলির মধ্যে মূল বংশগত কোন পার্থক্য নাই। দেশের আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত বর্ত্তমানের স্তরগুলি অবশ্য কালক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন এবং আর্থিক পরিবর্ত্তন এই উভয়ই কার্য্যে পরিণত হইতে এতটা সময় গ্রহণ করিবে যে, ইহার অতি ধীর গতির মধ্যে আমাদের দেহ ও মন নূতন অবস্থার উপযোগী হইতে পারিবে এবং আমাদিগকে কোন আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে না।

কেহ কেহ এমন কথা মনে করেন যে, সমাজের উচ্চস্তরের সহিত নিম্নস্তরের বিবাহাদি হইতে থাকিলে, বাঙ্গালীদের কৃষ্টি, মার্জ্জিত-বুদ্ধি এবং প্রতিভা বিশেষভাবে ম্লান হইয়া পড়িবে। কিন্তু আমরা সে সম্ভাবনাও দেখি না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমান সমান লোকের মধ্যেই বিবাহ হইয়া থাকে। তবে সমাজের বর্ত্তমান বিভাগ অনুসারে যাঁহারা সমাজের নিম্নস্তরে আছেন, অথচ শিক্ষা দীক্ষায় যাঁহারা সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের সমপর্য্যায়ভুক্ত, তাঁহাদের সহিত উচ্চস্তরের লোকদের বিবাহাদি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইহাতে কাহারও অবনতির সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ, তথাকথিত অনুচ্চ-সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকেরা তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজের মানসিক মানের প্রতিনিধি নহেন। বিশেষ সুযোগ সুবিধার ফলেই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, তাঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বাছাই করা লোক এবং মানসিক উৎকর্ষের দিক দিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকদেরই অধিকতর নিকটবর্ত্তী। ইঁহাদের সহিত বিবাহের ফলে অবনতি ঘটিবার সঙ্গত কারণ নাই। বরং একদিক দিয়া উন্নতির আশা আছে। বর্ত্তমানে জাতি, বংশমর্য্যাদা ও কৌলিন্যের খাতিরে খুব শিক্ষিত ও মার্জ্জিত পরিবারের সহিত অশিক্ষিত পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক নিতান্ত বিরল ঘটনা নহে। ইহাতে যেমন একদিকে ব্যক্তিগত দুঃখ ও ক্ষোভের কারণ থাকে, অন্যদিকে তেমনই যোগ্য মিলনের ফলে যেরূপ মানসিক উৎকর্ষ আশা করা যাইত, এরূপ ক্ষেত্রে তাহা কখনই যায় না—(অবশ্য যদি বুদ্ধি ও মন বংশগত ধরিয়া লওয়া যায়)। কিন্তু, অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইলে, সর্ব্ববিষয়ে সমান লোকের মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা বাড়িবে। ইহাতে ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার সঙ্গে যোগ্যতর সন্তান হইবার সম্ভাবনাও বাড়িবে।

যাঁহারা বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মিলনের ফলে বংশগত অবনতি আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের আরও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। বর্ত্তমানে, হিন্দুদের মধ্যে যে ছোট ছোট বৈবাহিক মণ্ডলীগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে রক্তস্রোত ঘুরিয়া ফিরিয়া অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। পণ প্রথা, কন্যাভাব, অসমবয়সের মিলন প্রভৃতি এই সব ক্ষুদ্রগণ্ডীর পরোক্ষ ফল, আমাদের শরীর মনকে অব্যাহতি দেয় নাই। আর, হিন্দুদের নির্জ্জীবতা, আপেক্ষিক হীন স্বাস্থ্য, ক্ষয়িষ্ণুতা প্রভৃতির মূলে ইহার প্রত্যক্ষ ফল, নিকট রক্তসম্বন্ধ আছে কিনা তাহাও বিশেষজ্ঞদিগের ভাবিবার বিষয়।

যদি অসবর্ণ বিবাহে, নানাশ্রেণীর মিশ্রণের ফলে কিছু ক্ষতি হইবে ধরিয়া লওয়া যায় তবে, বর্ত্তমানের এবং সম্ভাবিত ক্ষতির মধ্যে কোনটি সমাজের বাঁচিবার দিক দিয়া বিচার করিলে, গুরুতর বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

আরও অন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে

এই আলোচিত আইন এবং সংস্কারমূলক অন্য কোন কোন আইনকে কার্য্যকরী করিতে হইলে, আরও একটি আইন প্রণয়ন নিতান্তই অপরিহার্য্য। আমাদের সমাজের হাতে এবং এক সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী লোকের হাতে, অন্যায় করিয়া লোকের আইনসঙ্গত কার্য্যে বাধা দিবার ক্ষমতা আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কাহারও কোন কার্য্য কোন লোকের কাছে অন্যায় বলিয়া মনে হইলে, তিনি নিজে তাহাতে যোগ না দিতে পারেন, এবং সেই কার্য্য আইনসঙ্গত হইলে, যাহাতে সেই কার্য্যের বিরুদ্ধে আইন প্রণীত হইতে পারে তাহার জন্য আন্দোলন করিতে পারেন। কিন্তু, কোন আইনসঙ্গত কার্য্যের জন্য, কাহারও বিরুদ্ধে দল গঠন করা, প্রকাশ্যভাবে সেই কার্য্যের জন্য তাঁহার নিন্দা করিয়া তাঁহাকে লোকচক্ষে হেয় করিবার চেষ্টা করা, তাঁহাকে সাধারণ অধিকার সমূহ হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করা কথনই সমর্থনযোগ্য নহে। ইহার ফলে আইনত কোন অধিকার লাভ করা গেলেও কার্য্যত তাহা আমাদের বিশেষ উপকারে আসে না।

বিধবা বিবাহের আইন অনেক দিন পূর্ব্বে পাশ হইয়াছে, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের সহিত আহারাদি করা আইন বহির্ভূত কার্য্য নহে; কিন্তু এই সকল কার্য্য করিয়া লোকে এখনও সমাজচ্যুত হন, অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়, এবং ক্ষৌরকর্ম্ম প্রভৃতি বন্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে সাধারণের ভোগ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। প্রবল লোক এবং সমাজের শক্তি একত্র মিলিত হইতে পারে বলিয়া, নবপথগামীদের উপর আরও নানা অত্যাচার সহজে এবং বিনা প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় সাধারণ আইন আশ্রয়দান করিতে পারে কি না; জানি না; তবে পারিলেও সাধারণ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই প্রকার অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া বিশেষ দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সমাজের অন্ধশক্তির কাছে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যতটা নির্ভরশীল, তাহাতে কোন আইনসঙ্গত কাজের জন্য দলবদ্ধভাবে কোন লোকের বিরুদ্ধতা করিলে যাহাতে আইন অনুসারে তাহা দণ্ডনীয় হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজনীয়। বিশেষ করিয়া সমাজ-সংস্কারমূলক যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে যাইয়া যাহাতে কেহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সংঘবদ্ধ শক্তির দ্বারা নির্য্যাতীত না হন, তাহার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে, কার্য্যক্ষেত্রে আইনগুলির পূর্ণ সুবিধা পাইবার পক্ষে অনেক বিলম্ব ঘটিবে। কথিতপ্রকার আইন হইলে অন্যান্য সংস্কার-প্রচেষ্টা সমূহও,—যাহা স্বভাবতঃই আইনসঙ্গত এবং যাহার জন্য নূতন আইন প্রণয়ণের প্রয়োজন হয় নাই,—দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে। এদিকে আমরা আইন পরিষদ এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সংস্কারপ্রয়াসী সদস্যদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রস্তাবিত হিন্দু মন্দির

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রাচীন হিন্দুস্থাপত্যের আদর্শে একটি

মন্দির নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়াছেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনে ধর্ম্মভাব জাগরূক রাখিবার জন্য যদি মন্দিরের প্রয়োজন থাকে তবে তাহার জন্য অল্পব্যয়ে স্বল্পায়তনের মন্দির নির্ম্মাণ করিলে চলিতে পারিত। বহু অর্থব্যয়ে বিপুল আকারের জাঁকাল মন্দির নির্ম্মাণের সহিত ধর্ম্মভাবের অবশ্য সম্বন্ধ নাই,—তাহার উদ্দেশ্য অন্য প্রকারের। শিল্প, শিক্ষা ও সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং শিক্ষা ও সভ্যতার পরিপোষণের পক্ষেও ইহা বিশেষভাবে আবশ্যক। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষেত্রে যেখানে মানব মনের আত্মপ্রকাশ, সেখানেই যে শিল্পের উৎপত্তি সে কথাও সত্য। কিন্তু, সকল জিনিসের মধ্যেই পরিমাণ সামঞ্জস্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। ফুলের মূল্য আছে সত্য কিন্তু সময়বিশেষে তদপেক্ষা ভাতের মূল্য অনেক বেশী হইয়া পড়ে।

দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থায়, শুধু হিন্দুদের কথাও যদি ধরা যায় তবে তাঁহাদের বহুবিধ কঠোর প্রয়োজনের সম্মুখে, মন্দির নির্ম্মাণের জন্য বিপুল অর্থব্যয় সামঞ্জস্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। বিরাট কীর্ত্তির মধ্যে মানুষ তাহার সৌন্দর্য্য ও রসবোধকে পরিতৃপ্ত করিতে চায়; অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ের মধ্যে তাহা সম্ভব হইলে কাহারও আপত্তির কারণ হইত না। এই বিপুল অর্থের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষ বাড়ান যাইত, নূতন বিভাগের প্রতিষ্ঠা করা যাইত; দরিদ্র ছাত্রদের পড়িবার সুবিধা করিয়া দেওয়া যাইত, শিক্ষার বিস্তার-সাধন করা যাইত, অথবা এই প্রকারের অন্য কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য করা যাইত।

স্বরাট্ ভারতের সামরিক নীতি

বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা মিঃ এস সত্যমূর্ত্তি কোন এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে স্বরাজের আমলে সমর বিভাগ বর্ত্তমানের অর্দ্ধেক খরচায় চলিবে; কারণ, ভারতবর্ষ অন্য দেশ জয় করিতে চাহিবে না এবং তাহারাও তৎপরিবর্ত্তে ভারতকে শান্তিতে থাকিতে দিবে।

ভারতের সামরিক ব্যয় যে অত্যধিক, স্বরাজের আমলে তাহা যে অনেক কমান যাইতে পারে (বর্ত্তমানের উৎকর্ষ বজায় রাখিয়া), তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই,—যদিও জলপথ ও শূন্যপথ রক্ষার জন্য ভারতকে নূতন কিছু খরচ করিতে হইবে। তবে, ভারতবর্ষ কাহারও দেশ জয় করিতে না চাহিলেই যে, তাহারা ভারতকে শান্তিতে থাকিতে দিবে, মানুষের এই ধর্ম্মবুদ্ধি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি এবং আরও কোন কোন নেতার ন্যায় আমরা ততটা আশান্বিত নহি।

চীন গণতন্ত্র, জাপান বা আর কাহারও দেশ জয় করিতে চাহে নাই, কিন্তু, তাই বলিয়া চীন কি শান্তিতে থাকিতে পারিতেছে? আবিসিনিয়াও জগতের শান্তিভঙ্গ করে নাই, কিন্তু তাহারও ত আত্মরক্ষা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরাও ভারতবর্ষে বহুশত বৎসর ধরিয়া যে পরাধীন রহিয়াছি, তাহাও নিশ্চয়ই জগতের শান্তিভঙ্গ করিবার অপরাধে নহে। অথচ, অন্যদিকে যাহারা বহুদিন ধরিয়া সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীনতা হরণ করিয়া বসিয়া আছে, যে জন্যই হউক তাহাদের শান্তিহরণ করিতে কেহ সাহস করে না। আমরাও নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে শান্তির প্রয়াসী তবে, ইতিহাসের শিক্ষা উপেক্ষা করিবার পক্ষপাতী নহি।

হিন্দীকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা

হিন্দীভাষাকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিবার জন্য বম্বেতে একটি কোম্পানি গঠিত হইতেছে। এই পত্রিকা খানিতে ভারতের সকল প্রদেশের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলির হিন্দী অনুবাদ থাকিবে। কোম্পানীর অফিস বম্বে থাকিলেও, পত্রিকাখানি কাশী হইতে প্রকাশ করিবার কথা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কে-এম মুন্সী ইহার অন্যতম সম্পাদক হইবেন এবং মহাত্মাজীকে ইহার পরিচালক বোর্ডের সদস্য করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

হিন্দীভাষাকে জনপ্রিয় করিবার পক্ষে, এ প্রচেষ্টা বিশেষ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় এবং যাঁহারা হিন্দী পড়িতে পারেন ও যাঁহারা ইহা পড়িতে শিখিবেন, এই পত্রিকা তাঁহাদের বিশেষ উপকারে আসিবে।

বর্ত্তমানে ইংরাজীর মধ্যবর্ত্তিতায় সমগ্র ভারতের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দীর সাহায্যে এই সংযোগকে ঘনিষ্ঠতর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে; এই চেষ্টা যে কতকটা সফল হইবে তাহা হিন্দীভাষীদের উদ্যম দেখিয়া

অনুমান করা যাইতে পারে। যাঁহারা লেখা পড়া শিখেন, এমন প্রত্যেক ভারতবাসী যদি নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত অপর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করেন তবে, সম্পর্ক নিঃসন্দেহ আরও অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ হইবে।

বাঙ্গালীরা অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সংবাদ বিশেষ কিছু রাখেন না। ইংরাজীর মধ্য দিয়া অন্যান্য প্রদেশের বড় লোকদের বিবিধ জরুরি ও প্রবল সমস্যা (তাহাও আবার প্রধানতঃ রাজনীতিক) সম্বন্ধীয় মতামত আমরা জানিতে পারি। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের বুদ্ধি মনের গতি ও ঝোঁকের সহিত অধিকতর পরিচয় থাকা আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বাংলার সাময়িক পত্রিকাগুলি উদ্যোগী হইলে, তাঁহারা এদিক দিয়া কিছু কিছু কাজ করিতে পারেন। অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের ভাল গল্প প্রবন্ধের কিছু কিছু অনুবাদ যদি ইঁহারা প্রকাশ করেন তবে, কিছু পরিমাণে উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। প্রস্তাবিত হিন্দীপত্রিকাখানির অনুযায়ী একখানা পত্রিকা বাংলায় প্রকাশ করা সম্ভব কিনা, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালীদের বোধ হয় আরও একদিকে সাবধান হইবার আছে। বাংলা সাহিত্যের অনেক ভাল জিনিস অন্যান্য সাহিত্যে গৃহীত হইতেছে এবং সম্ভবতঃ সর্ব্বত্র ঋণ স্বীকৃত হইতেছে না। যাহাতে কালক্রমে বাংলার মৌলিকত্বের দাবী উপেক্ষিত না হইতে পারে সে জন্য, যথাসময়ে এই সকল ব্যাপারের প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন আছে। এখনও যে বাংলার নিকট অন্যান্য প্রদেশের ঋণ আছে সেদিকে সকল প্রদেশের পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ভাল; তাহাতে বাংলার বাহিরে বাংলা-সাহিত্যানুরাগীর সংখ্যা বাড়িতে পারে।

দেশীয় রাজ্য ও কংগ্রেস

সমগ্র ভারতের মোট আয়তন	১৮,০৮,৬৭৯ বর্গ মাইল
সমগ্র ভারতের মোট জন সংখ্যা	৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮
ব্রিটীস ভারতের আয়তন	১০,৯৬,১৭১ বর্গ মাইল
ব্রিটীস ভারতের জন সংখ্যা	২৭,১৫,২৬,৯৩৩
দেশীয় রাজ্যগুলির মোট আয়তন	৭,১২,৫০৮ বর্গ মাইল
দেশীয় রাজ্যগুলির মোট জন সংখ্যা	৮,১৩,১০,৮৪৫

অর্থাৎ সমগ্র ভারতের মোট আয়তনের শতকরা ৩৯ ভাগ দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত এবং মোট জন সংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী।

দেশীয় রাজ্যগুলির কোন স্বতন্ত্র ভৌগলিক অবস্থান বা বৈশিষ্ট্য নাই; ইহার সবগুলিই ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত; সর্ব্বাংশে এগুলি ব্রিটিস ভারতের সহিত অভিন্ন। ইহার অধিবাসীদেরও কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে ইঁহারা ব্রিটীস ভারতের অধিবাসীদের সহিত এক। ঘটনাক্রমে ইঁহাদের রাজনীতিক ভাগ্য অন্যপ্রকার হইয়া যাওয়ায়, ব্রিটীস ভারত ও ইঁহাদের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের ঐক্যের জন্য, উন্নতি ও শক্তির জন্য, ক্রমে যাহাতে এই ব্যবধান যথাসম্ভব দূর হইয়া যায়, এবং ইঁহারা ব্রিটীশ ভারতীয়দের সহিত একই রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন, প্রগতিকামী সকল রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানেরই তাহা লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহার জন্য প্রাথমিক অসুবিধা যে অনেক আছে, ইহা দূর করিবার জন্য যে, কয়েকটি ধাপ বিশিষ্ট, কর্ম্মপদ্ধতির প্রয়োজন হইবে তাহা সত্য। কিন্তু একথা সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে, ভারতের স্বার্থ যাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী, তাহারা এই ব্যবধানকে রক্ষা করিবার, বাড়াইবার এবং বাড়াইয়া দেখাইবার চেষ্টা করিবে। কাহাকেও খুসী করিবার অথবা কোন আপাত অসুবিধা এড়াইবার জন্য সমগ্র ভারতের অখণ্ড ঐক্যের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও চাপা দেওয়া অথবা দেশীয় রাজ্যগুলির দায়িত্ব কার্য্যত অস্বীকার করা কোন রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমর্থনযোগ্য কাজ হইবে না।

কিন্তু, দেশের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস এবিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সম্পর্কে কংগ্রেসের বিশেষ কিছু কর্ত্তব্য নাই, শ্রীযুক্ত দেশাইএর এই মর্ম্মের একটি উক্তির পর বিষয়টির উপর অনেকের দৃষ্টি পতিত হয় এবং ব্যাপারটি লইয়া বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ওয়ার্কিং কমিটির গত অধিবেশনে ব্যাপারটি আলোচিত হইবার পর ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে কংগ্রেস মনোভাব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিবার জন্য একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতিটি দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের প্রতি কংগ্রেসের যদিচ্ছার পরিচায়ক বটে তবে, এই সহানুভূতি অনেকটা সম্পর্কহীন তৃতীয় পক্ষের সহানুভূতি প্রকাশের ন্যায় হইয়াছে। স্পষ্টতঃ এ সম্বন্ধে কোন সঠিক কথা বলার ঝুঁকি এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে, বরং পরোক্ষভাবে নানা গোঁজামিলের মধ্যে ইহাঁদের সম্পর্কে প্রকৃত দায়িত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। কংগ্রেস মুখে বলিয়াছেন বটে, রাজন্যদের সমর্থন ক্রয় করিবার জন্য তাঁহারা দেশীয় রাজ্যের প্রজাসাধারণের স্বার্থ উৎসর্গ করিবেন না, তবে, খুব স্পষ্ট করিয়া সেই প্রজাসাধারণকে বলিয়া দিয়াছেন যে, **দেশীয় রাজ্যগুলিতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালাইবার দায়িত্ব ও বোঝা তাঁহাদিগকেই বহন করিতে হইবে।** কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যগুলির উপর নীতির ও মৈত্রীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন মাত্র!

ব্রিটিস ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে একই কর্ম্মপদ্ধতি বা একই নীতি অবলম্বিত না হইতে পারে। কিন্তু, কংগ্রেস বলিতে পারিতেন এবং একমাত্র তাহাই তাঁহাদের বলা উচিত ছিল যে কংগ্রেস সমগ্র ভারতবাসীর দেশীয় ও ব্রিটিস নির্ব্বিশেষে, রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান; ৩৫ কোটি ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক মুক্তিই ইহার কাম্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের পক্ষে, তাঁহাদের বিশেষ অবস্থার জন্য, এই বিশেষ কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু, মুখে অন্যপ্রকার বলিলেও, রাজন্যদের মুখের দিকে চাহিয়াই কংগ্রেস সত্য কথা বলিতে পারেন নাই। কংগ্রেস যদি মনে করিয়া থাকেন, সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তাঁহারা কাজ চালাইবেন তবে, সকলকে সন্তুষ্ট রাখা চলিলেও কাজ নিশ্চয়ই বন্ধ হইবে। মুক্তি আন্দোলন চালাইবার সময়, কংগ্রেস রাজন্যদের নিকট হইতে কিপ্রকারের সহানুভূতি লাভ করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমানে একবার খতাইয়া দেখিতে পারেন এবং যদি কংগ্রেস মনে করিয়া থাকেন যে, আগামী সংস্কৃত শাসনের সময় তাঁহারা দেশীয় রাজ্যের সদস্যদের সমর্থন পাইবেন, তবে তাঁহাদের স্বপ্ন ভাঙ্গিতে অধিক বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কংগ্রেস রাজন্যদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যে সর্ব্ব প্রথম সম্ভবযোগ্য সুযোগে পূর্ণ দায়িত্বশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়াছেন এবং ইহা তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূলে যাইবে সে-কথাও বলিয়াছেন। ইংরেজ সরকারকে এই প্রকার একটা পরামর্শ দিয়া ব্রিটিসভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের দায়িত্ব শেষ করিতে পারিতেন কিনা, সেকথা কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা একবার ভাবিয়া দেখিতে পারেন!

এই প্রসঙ্গে এই প্রকারের কথা উঠিয়াছে যে, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের কথা যদি ভাবিতে হয় তবে, পর্ত্তুগীজভারত এবং ফরাসীভারত সম্বন্ধেও সেই একই কথা উঠিয়া পড়ে। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য এবং অপ্রাসঙ্গিক কথা আমরা আর শুনি নাই। মানুষের সকল ব্যাপারে সংখ্যা, পরিমান, মাত্রা প্রভৃতির গুরুত্বের কথা আমরা কোন সময় ভুলিতে পারি না। নীতির দিক দিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পর্ত্তুগীজ বা ফরাসীভারতের কয়েক সহস্র অধিবাসীর কথা আমরা আপাততঃ বাদ রাখিতে পারি কিন্তু, তাই বলিয়া এক চতুর্থাংশ অধিবাসীকে বাদ দিলে জাতি-গঠনের কার্য্যই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সংখ্যার কথা যে একটা বড় কথা, তাহা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসেও পরিস্ফুট। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে খৃষ্টানদের অপেক্ষা ভারতীয় মুসলমানদের গুরুত্ব সংখ্যার জন্য অনেক অধিক। অথচ অন্যদিকে দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের সংখ্যা মুসলমানদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক হইলেও, তাঁহাদিগকে ফরাসী বা পর্ত্তুগীজভারতীয়দের সহিত এক বলিয়া ধরিতেছি। দেশীয় রাজ্যগুলির অন্য এক দিক দিয়াও, পর্ত্তুগীজ বা ফরাসীভারতের সহিত গুরুতর প্রভেদ আছে। দেশীয় রাজ্যের রাষ্ট্রগুলির শেষ আশ্রয় ব্রিটিস সরকার এবং এদিক দিয়া একটু পরোক্ষভাবে ইহারাও ব্রিটিস ভারতের অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য এক্ষেত্রে কংগ্রেসকে নূতন কোন বৈদেশিক শক্তির সংস্পর্শে আসিতে হইবে না।

ভারতবর্ষের ভাগ্যক্রমে প্রায় সমগ্র ভারত ব্রিটিস সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষ যদি ২।৩টি প্রবল বৈদেশিক শক্তির মধ্যে বিভক্ত হইত তবে, আমাদের জাতীয় মুক্তির আশা আরও অনেক দূরবর্ত্তী থাকিত এবং সমস্যা বিশেষভাবে জটিলতর হইত।

কংগ্রেস ও বৈদেশিক প্রচার কার্য্য

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশে প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। যাহাদের শক্তি আছে, পৃথিবী-ব্যাপী সাম্রাজ্য আছে, পৃথিবীর জনমতের আনুকূল্য তাঁহারাও উপেক্ষা করিতে পারেন না। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল অসহায় জাতির পক্ষে সমগ্র জগতের নৈতিক সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা ইহা হইতেই অনেকটা অনুমান করা যাইবে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কাজ করিবার অনুমতি চাহিয়া কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের নিকট সুভাষ বাবুর প্রস্তাবের পর, কংগ্রেস ব্যাপারটিকে গ্রহণ করিবেন, এরূপ আশা করা গিয়াছিল। অর্থ এবং সঙ্ঘের অভাবে অনেক প্রয়োজনীয় কাজও করা যায় না। আবার যে কোনও লোককেই কোন প্রতিষ্ঠানপ্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতে দিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছেন এবং তাঁহার চেষ্টার ফলে বিষয়টির প্রতি ভারতীয় জনসাধারণের দৃষ্টিও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি কংগ্রেসের নামে এই কাজ চালাইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কাজের মূল্য অনেক বাড়িয়া যাইত। ইহাতে কংগ্রেসের পক্ষে নূতন কোন প্রচেষ্টা বা অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইত না। তবে, সুভাষ বাবুকে কংগ্রেসের নামে কাজ চালাইবার অনুমতি না দিবার কারণ কি এই যে, সুভাষবাবুকে কংগ্রেস পুরাপুরি বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

মহাত্মা গান্ধী ও অহিংস নীতি

একটি বিশেষ ঘটনায়, অত্যাচারীর ভয়ে কতকগুলি লোকের আতঙ্ক ও পলায়নকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী অহিংসা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "অনেকে অকপটে এই কথা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন যে বাধাপ্রদানের তুলনায়—বিশেষ করিয়া যখন ইহাতে প্রাণভয় থাকে বিপদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করা ধর্ম্মবিশেষ। অহিংসার শিক্ষকরূপে, এই কাপুরুষোচিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, আমাকে অবশ্যই যথাসম্ভব সতর্ক হইতে হইবে।"

"—আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে অহিংসা সম্বন্ধীয় সত্য, অসহায়কে শিক্ষা দেওয়া যায় না। তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করার শিক্ষাই দিতে হইবে।"

—"এবং ভবিষ্যতে যখনই এই প্রকারের ঘটনা ঘটে তখনই তাহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি তাহারা আত্মরক্ষা বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য অপরকে আঘাত না করিয়া অত্যাচারের সম্মুখীন হইতে পারে তবে তাহা নিশ্চয়ই অনেক ভাল এবং ইহা তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় জয় বলিতে হইবে। কিন্তু, দুর্ব্বলতা হইতে নহে, শুধুমাত্র শক্তিমত্তা হইতে এই ক্ষমাগুণের প্রয়োগ সম্ভব। এই শক্তি যতদিন আয়ত্ত না হয় ততদিন তাহারা শক্তির দ্বারা অত্যাচারীকে বাধা দিবার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকিবে। অহিংস মতবাদ দুর্ব্বল এবং কাপুরুষের জন্য নহে; সাহসী এবং শক্তিমানই ইহার ব্যবহার করিবেন।"

লণ্ডনে বর্ণ বিদ্বেষঃ আমাদের নিজেদের দেশের অবস্থা

প্রকাশ, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্র হোম অফিস ও ইণ্ডিয়া অফিসে এই বলিয়া এক অভিযোগ আনিয়াছেন যে, লণ্ডনের বহির্প্রান্তে সন্তরণের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটি জলাশয়ে তাঁহাদিগকে গাত্র বর্ণের জন্য প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। জলাশয়ের পরিচালক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, অশ্বেত লোকদিগকে প্রবেশ করিতে দিবার আইন না থাকায় তাঁহাকে ঐরূপ ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

অশ্বেত জাতির লোকদের বিরুদ্ধে শ্বেতজাতীয় সভ্য মানুষদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের এই পরিচয় নূতনও নহে, এইরূপ ঘটনা বিরলও নহে। তবুও, প্রত্যেক নূতন ব্যাপারই আমাদিগকে আমাদের অসহায় অবস্থার কথা মনে করাইয়া দেয়। এই প্রকার অপমানকর ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন, যদিও আমরা শক্তির অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের দিকে কিছু নৈতিক লাভ ব্যতীত, অবস্থার আর বিশেষ কিছু উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইওরোপের যে সকল দেশে বর্ণবিদ্বেষ অপেক্ষাকৃত কম বিদেশগামী ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সম্ভবমত সেই সকল দেশে যাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, অপরের নিকট হইতে যে-প্রকার ব্যবহার পাইয়া আমাদের আত্মাভিমান ও জাতীয় সম্মান ক্ষুণ্ণ হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করিতেছি, সেই প্রকারের ব্যবহার কোটি কোটি দেশবাসীর প্রতি আমরা নিত্য নানাভাবে করিতেছি।

অস্পৃশ্য এবং অনুন্নত হিন্দুরা হিন্দুসমাজের লোক হইয়াও, হিন্দুদের হোটেল, মেস, খাবারের দোকান প্রভৃতিতে (যাহাকে কতকটা সাধারণভোগ্য অধিকার বলা যায়) সমান অধিকার পান না, এমন কি এক ছাত্রাবাসেও একত্রে থাকিতে পান না।

মুসলমানদের নিজেদের মধ্যের অবস্থা অবশ্য এতদূর শোচনীয় নহে। তবে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যের যে সম্পর্ক তাহা ইহার চেয়েও অনেকগুণে শোচনীয়। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ঐক্য ও বন্ধুত্ব তাহা এখনও সভাসমিতির বাহিরে আত্মীয়তার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই সম্পর্কে মুসলমান সমাজের দোষের কথা সে সমাজের চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা ভাবুন। কিন্তু, আমরা হিন্দুরা, যাহারা নিজদিগকে সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে বলিয়া মনে করিয়া থাকি, যেন এ বিষয়ে আমাদের নিজেদের দায়িত্বের কথা না ভুলি। হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে যেরূপ আমূল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সমাজ সংস্কারের সময় আসিয়াছে হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক সম্বন্ধে এখনও সম্ভবতঃ তেমন সময় আসে নাই। এবং হয়ত বা হিন্দুদের মধ্যের এই সংস্কার-প্রচেষ্টা কতকটা পরিণতি লাভ না করিলে, হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ককে কোন নির্দ্দিষ্ট পথে ঘনিষ্ঠতার দিকে লইয়া যাওয়া যাইবে না।

কিন্তু, খুব বড় কোন ব্যাপারের কথা বলিতেছি না, নিতান্ত ছোট ২।১টি ব্যাপারের মধ্য দিয়া আমাদের এমন শোচনীয় মনোবৃত্তি মাঝে মাঝে বাহির হইয়া পড়ে, যাহার জন্য লজ্জায় মাথা হেট করিতে হয়।

এমন কথা আমাদের কানে আসিয়াছে যে, কয়েকটি শিক্ষিত মুসলমান যুবক তাঁহাদের হিন্দু বন্ধুদের সহিত মিশিয়া কোন হিন্দুর দোকানে চা খাইতে যাইতেন। কিন্তু, শিক্ষিত হিন্দু খরিদ্দারদের আপত্তির ফলে, দোকানদারকে বাধ্য হইয়া মুসলমান ভদ্রলোক কয়েকটিকে আসিতে নিষেধ করিতে হইয়াছে। ধিক আমাদের জাত্যভিমানে!

এমন কথা হয় ত উঠিবে যে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যখন এখনও সামাজিক মিলনের প্রচলন হয় নাই তখন, আপত্তি না করিলে শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেক মুসলমান এখানে আসিতেন, এবং তাহার ফলে অনেক হিন্দুই অসুবিধা বোধ করিতেন। কিন্তু ব্যাপারটি শুধু তর্কের দিক দিয়া দেখিলে চলিবে না; কার্য্যতঃ এরূপ সম্ভাবনা ছিল না এবং খুব কম ক্ষেত্রেই তাহা থাকে। কারণ হিন্দু ও মুসলমানের বর্ত্তমান সামাজিক সম্পর্ক যে প্রকারের তাহাতে, বন্ধুত্ব বা ঐ প্রকারের কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত এক সম্প্রদায়ের লোকের, অন্য সম্প্রদায়ের লোকের চা বা খাবার প্রভৃতির দোকানে যাইবার সম্ভাবনা কম।

আমাদের নিজেদের মধ্যে যখন এত ত্রুটি তখন যে আমরা অপরের নিকট লাঞ্ছিত হইব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমাদের জাতীয় মনোবৃত্তির আর একটা দিক

ফুটবল খেলাটা অনেকটা আমাদের জাতীয় ক্রীড়ায় পরিণত হইয়াছে। ইহাকে উপলক্ষ করিয়া যে উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহাতে শুধুমাত্র দর্শকের সংখ্যা না বাড়িয়া যদি খেলোয়াড়দের সংখ্যাও বাড়ে অর্থাৎ এই শ্রমসাধ্য ক্রীড়ার, যদি আমাদের ন্যায় শ্রমকাতর জাতির মধ্যে বহুল প্রচলন হয় তবে, নিঃসন্দেহ তাহা আশা ও আনন্দের কথা।

কিন্তু, ইহারও একটা ছোট ব্যাপারের মধ্যে আমাদের জাতীয় মনোবৃত্তির একটা বড় দিকের প্রতি পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শক্তিশালী বিদেশী টীমগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কোন টীম জয়লাভ করিলে, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীরই গৌরবের বিষয় হয়। কিন্তু, এখানেও সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার অন্ত নাই। মোহনবাগান দল যেদিন পরাজিত হইলেন, শুনিয়াছি মুসলমান ক্রীড়া-মোদীদের অনেকে সেদিন আনন্দিত হইয়াছিলেন। আবার

মহমেডান স্পোর্টিংএর পরাজয়ের দিন, অনেক হিন্দু ক্রীড়ামোদীর সম্বন্ধে ঐ প্রকারের কথা শুনিয়াছি। অবশ্য মোট ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে এই সকল লোকের সংখ্যানুপাত কত তাহা জানি না,—বেশী নহে বলিয়াই আশা করি। অপরে জয় লাভ করে সেও ভাল তবু, প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেদের লোক যেন এই সম্মানের অধিকারী না হয়, এই সংকীর্ণ মনোভাব, আমাদের দুর্ব্বলতার বহুবিধ কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ।

কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ

নূতন শাসনতন্ত্রের অধীনে কংগ্রেসীসদস্যেরা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবেন কি না, তাহা লইয়া কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র মত-বিরোধ দেখা দিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির গত অধিবেশনে ব্যাপারটি লইয়া দুই পক্ষের অনেক বক্তৃতা ও তর্কযুদ্ধ হইয়া গেলেও, ওয়ার্কিং কমিটি এ-সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, এবং কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশনের সিদ্ধান্তের উপর ব্যাপারটি ছাড়িয়া দিয়াছেন। যখন সময় আছে তখন, এ ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। বিষয়টিসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কংগ্রেস ও বাংলা

কংগ্রেসে বাংলার কেলেঙ্কারির অবসান কিছুতেই হইল না। কয়েকজন সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি মেকি সদস্যদের লইয়া গঠিত, এইরূপ অভিযোগ আনয়ন করায়, ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে যথোচিত অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রিক ব্যাপারে বাঙ্গালী যে আর কোন দিন তাহার স্থান ফিরিয়া পাইবে না, দেখিয়া শুনিয়া আমরা সে সম্বন্ধে অনেকটা নিঃসন্দেহ হইয়াছি।

শ্রীযুক্তশরৎচন্দ্র বসুর মুক্তি

বাংলার রাজনীতিক ক্ষেত্রে এ মাসের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা শ্রীযুক্তশরৎচন্দ্র বসুর বিনা সর্ত্তে মুক্তিলাভ। এই সম্পর্কে বিনা বিচারে আটক বাংলার অন্যান্য রাজবন্দীর কথা মনে না করিয়া পারিতেছি না।

ইটালি ও আবিসিনিয়া

আবিসিনিয়া রাজ্যটি উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকায় অবস্থিত। আফ্রিকার মধ্যে এই একটিমাত্র রাজ্যই এতদিন ইওরোপীয় প্রভুত্বের বাহিরে ছিল। এবার সম্ভবতঃ ইটালির সাম্রাজ্য-লিপ্‌সা ইহাকে আর স্বাধীন থাকিতে দিবে না। রাজ্যটির আয়তন ৩,৫০,০০০ বর্গ মাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা এক কোটি বা তদপেক্ষা কিছু অধিক। এখানকার জীবন যাত্রা খুব অল্প ব্যয়-সাপেক্ষ; ভূমি উর্ব্বরা; তুলা, ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং লৌহ, কয়লা ও পটাস এখানকার প্রধান খনিজ সম্পদ; সম্প্রতি নাকি প্লাটিনামেরও খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। জাতিসঙ্ঘের চেষ্টা বা শালিসি প্রভৃতির দ্বারা মিটমাট হইবে এমন মনে হয় না। তবে, কোন কোন শক্তিশালী জাতির স্বার্থ যদি জড়িত থাকে, তাহা হইলে মিটমাটের জন্য প্রকৃত চেষ্টা হইবে এবং তাহা সফলও হইতে পারে। প্রথমে আবিসিনিয়াকে যতটা অসহায় মনে করা গিয়াছিল, পরে দেখা গেল ঠিক ততটা নহে। তাহাকেও সাহায্য করিবার লোক আছে।

সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

ইউনাইটেড প্রেসের সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসুর মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন যেমন আকস্মিক, তেমনই শোকাবহ। এই অত্যল্প বয়সের মধ্যেই তিনি বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করি।

ভারতবর্ষের ভাবী রাজ-প্রতিনিধি

লার্ড্‌ইস-অব-লিন্‌লিথ্‌গো আগামী এপ্রিলের পর ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারি কমিটি এবং কৃষি সম্বন্ধীয় রয়াল কমিশনের সভাপতিরূপে তাঁহার নাম ভারতবাসীদের নিকট সুপরিচিত।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

নাছোড়বান্দা

বিজ্ঞানের যুগের আমরা লোক। আমরা চাই তথ্য। আমরা চাই শুষ্ক হিসাব। পরিচিত সত্যেরও অনেক সময় আমরা প্রমাণ দাবী করি। অবশ্য অত্যন্ত কষ্টার্জ্জিত হলেও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অন্ধবিশ্বাসের চেয়ে সব সময়েই মূল্যবান; সে অন্ধবিশ্বাস যত গভীরই হোক, রূঢ় বাস্তব সত্যকে জানবার এই আগ্রহ আমাদের যুগের মানুষেব একটি বৈশিষ্ট্য।

চা-পান সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তার গুণগান করবার জন্যে দীর্ঘ কোন প্রবন্ধের প্রয়োজন হয় না। নিজগুণেই সে সমাদৃত। এ বিষয়ে চা-রসিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তা না হ'লে এ দেশে বৎসরে বৎসরে হাজার হাজার নতুন লোক চায়ের প্রতি আকৃষ্ট হ'ত না।

চা সম্বন্ধে কুসংস্কারের বশে যারা নিন্দা করে তাদের কথা শুনে সাধারণ দেশবাসী একটু বিস্মিতই হয়। সন্দেহ হয় যে এই সমস্ত সমালোচক বোধ হয় কোনো দিন একটু কষ্ট করে ভালো দেশীয় চায়ের স্বাদ জানবার চেষ্টা করে নি। সুখের কথা এই যে এ-সমস্ত নিন্দুকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং তাদের বাতিকগ্রস্ত বলেই ধরা হয়। শুধু একবার যদি তারা সুস্বাদু ভারতীয় চা পান করে বুঝত, বিশুদ্ধ ও মধুর পানীয় হিসাবে চা আমাদের জীবনে কি সৌভাগ্য এনে দিয়েছে!

মনে একবার স্থান পেলে কোন ধারণাকে দূর করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু চা-পানের অভ্যাস ভারতবাসীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর কিনা এ প্রশ্ন যখন ওঠে তখন চায়ের উপকারিতায় যথেষ্ট সুবিদিত প্রমাণ থাকা স্বত্বেও, সে বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা এখনো নির্ম্মূল হয়নি দেখে বিস্মিত হতে হয়। পানীয় হিসাবে ভারতীয় চায়ের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকা কি সম্ভব? যে ফুটান জলে চা তৈরী হয় সে জল ত ফোটাবার দরুণই সমস্ত রোগ-বীজাণু থেকে মুক্ত হয়। স্বাস্থ্যের দিক থেকে শরীরযন্ত্রের জন্য বিশুদ্ধতম জল গ্রহণের সব চেয়ে ভাল উপায় হ'ল দিনে-রাতে নিয়ামতভাবে কয়েকবার চা পান করা। কৃষিজাত আর কোন জিনিষকে মানুষের গ্রহণযোগ্য করার জন্যে এত সূক্ষ্মভাবে যত্ন যে নেওয়া হয় না, এ কথা ত সবাই জানে।

কুসংস্কারের বশে চায়ের যারা অখ্যাতি করে, সহজে তাদের বিলোপ না হ'লেও, যুক্তি বা সত্য কিছুই তাদের পক্ষে নেই। চা-পান সম্বন্ধে যে উৎসাহের বন্যা ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবল বেগে ছড়িয়ে পড়ছে তার বিরুদ্ধে বৃথাই তারা দুর্ব্বলভাবে দাঁড়িয়েছে। জ্ঞানের আলোকে কুসংস্কারের অন্ধকার দূর হবেই। সত্যকে কেউ প্রতিষ্ঠা থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

যেমন খুসী তেমন

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'আপরুচি খানা, আর পর রুচি পর না।' কথাটা খাঁটি; ব্যাপারটা এই রকমই হওয়া উচিত। আমরা প্রত্যেকেই নিজের পছন্দমত খাদ্য ও পানীয় বেছে নিয়ে নিজের রুচি অনুযায়ী তা তৈরী করিয়ে গ্রহণ করে থাকি। আহার ও পানীয়ের ব্যাপারে 'আপরুচি খানা'র নীতিই অনুসৃত হয়ে থাকে; সে নীতি থেকে একচুল কেউ নড়তে রাজী নয়।

যেমন কেউ কেউ হাল্কা চা খেতে ভালবাসে। কেউ ভালবাসে কড়া। কেউ চায়ে প্রচুর দুধ ও চিনি মিশিয়ে খায়, কেউ বা দুধ দেয়, চিনি একেবারে বাদ দিয়ে। চিনি ও দুধ

কিছুই না দিয়েও অনেকে চা পছন্দ করে। আর সব উপকরণ সম্বন্ধে রুচি-ভেদ যতই থাক, চা সম্বন্ধে অনুরাগের তারতম্য কোথাও নেই। সকল রকমের রুচিকে তৃপ্ত করতে চায়ের মত আর কোন পানীয় পারে না। নিজের খুসী মত যেমন ভাবে ইচ্ছা চা তৈরী করা যাক না কেন, পানীয় হিসাবে তার বিশেষ গুণ ও উপকারিতার কোন তফাৎই হবে না। আসল জিনিষ হ'ল চা—সেইটিই সকলের কাম্য; তার অনুপান কি হ'ল না হ'ল সেটা বাহ্যিক। মিষ্টি করে চা খাওয়া যার অভ্যাস, কোন সময়ে হাতের কাছে দুধ চিনি না পেলে চা খাওয়ার আনন্দ থেকে নিজেকে সে বঞ্চিত রাখবে এ কথা ভাবা ভুল। যথা সময়ে পেলে দুধ চিনি বাদ দিয়েও চায়ের পেয়ালা সে সমান আগ্রহে গ্রহণ করবে।

দুধ ও চিনি দিয়ে খাওয়াই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রচলিত রীতি। কিন্তু চা খাওয়ার আরো অনেক পদ্ধতি আছে। পানীয় হিসাবে চা যত বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, নানা নতুন ধরণে তা পান করবার পদ্ধতিও তত লোকে খুঁজে বার করছে। দেহ ও মনের তেজস্কর পানীয় হিসাবে চা যদি গ্রহণ করা যায়, তাহ'লে দুধ বা চিনি বাদ দিলে তা উপভোগের কোন দিক দিয়ে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয় বলে মনে হয় না। এক পেয়ালা চা, সামান্য 'স্বতার' করবার জন্যে একটু টাট্‌কা নেবুর রস দিয়ে পান করেই আমরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারি।

আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালের পক্ষে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা চা আদর্শ পানীয়। ঠাণ্ডা চা তৈরী করা অত্যন্ত সহজ। আধ সের জলের জন্য দু চামচ চা নিলেই হবে। যথারীতি চা তৈরী করে, একটি পাত্রের ভেতর বরফের ওপর সেই গরম চা ঢালতে হবে। তারপর পছন্দমত দুধ ও চিনি মিশিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হবার পর সে চা পান করা উচিত।

চা যে রকম ভাবে ইচ্ছা তৈরী করে পান করা যায়, শুধু আসল জিনিষটি যেন ভারতবর্ষের নিজস্ব হয়, কারণ ভারতের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর চা কোথাও পাওয়া যায় না।

ম্যালেরিয়া

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ মিত্র

স্বাস্থ্যই সম্পদ—শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নয়—জাতিগত ভাবেও একথা বলা চলে। আজ বাঙ্গালী সে সম্পদে বঞ্চিত। ইহার কারণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অন্যান্য কারণের মধ্যে ম্যালেরিয়া অন্যতম। যাঁহারা পল্লীগ্রামের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে কত সমৃদ্ধিশালী, শ্রীসম্পন্ন গ্রাম ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে। প্রতি বৎসর বাংলা দেশে যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার অর্দ্ধেকের উপর মারা যায় ম্যালেরিয়া জ্বরে। যাহারা কোনরূপে মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা পায়, তাহারাও ভুগিয়া ভুগিয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকে। তাহাদের জীবনীশক্তি প্রায় নষ্ট হইয়া যায় এবং অন্য কোন সংক্রামক ব্যধির আক্রমন প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা থাকেনা। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া উঠিলে যাহাতে তাড়াতাড়ি নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হয় তাহার চেষ্টা করা বিশেষ ভাবে উচিৎ। পুষ্টিকর খাদ্য নষ্ট স্বাস্থ্যে পুনরুদ্ধার করিতে বিশেষ সাহায্য করে। কিন্তু দেখা যায় যে, কিছুদিন রোগ ভোগের পর, হজম শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কোন খাদ্যই বিশেষ কাজে-লাগে না। এ অবস্থায় এমন কোন ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিৎ, যাহা আহার্য্য দ্রব্য উত্তমরূপে হজম করাইয়া, তাহা হইতে সার অংশ গ্রহণ করিতে সাহায্য করে। সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত "রচিটোন" ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ম্যালেরিয়ার পর ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে ইহা অদ্বিতীয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিশেষজ্ঞগণ ম্যালেরিয়ার পর ইহা সেবনের ব্যবস্থা দিতেছেন। ইহা রক্তস্থিত ম্যালেরিয়া বীজাণু ধ্বংস কবিতে সাহায্য করিয়া নবজীবনের সঞ্চার করে ও তাড়াতাড়ি নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিয়া কর্ম্মঠ ও স্বাস্থ্যবান করে। আর ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়।

অপরিবর্ত্তন

শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

হারাধন মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছিল ···। ডাক্তার বলিয়া গেল "নিউমোনিয়া" এবং যদিও যথারীতি বলিতে ভুল করে নাই "ভয়ের কিছু নয়", তথাপি সকলেই বুঝিয়াছিল হারাধনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন! তাহার পিতা মাতা সশঙ্কিত চিত্তে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পুত্রের সেবা করিয়া চলিয়াছিলেন; এবং বিশেষ করিয়া তাহার মাতার করুণ প্রার্থনা বোধ হয় ভগবানের নিকট পৌছিয়াছিল—কারণ সে যাত্রা হারাধন বাঁচিয়া উঠিল···।

···সে আজ দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা! দশ দশটি বৎসর দেখিত দেখিতে কাটিয়া গিয়াছে। স্নেহশীলা মা তাহার আর বাঁচিয়া নাই—স্বামীর নিকট তাঁহার শেষ অনুরোধও যে বিশেষ সম্মান পায় নাই, পুত্রের প্রতি পিতার রূঢ় আচরণই তাহা সপ্রমান করিয়া দেয়। কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসেনা, হারাধন বড়লোক হইতে না পারিলেও বড় হইয়াছে; সংসার নজরের উপরেই কাল দেহটীর উপর মাংসের স্তূপ চাপাইতে সক্ষম হইয়াছে এবং উপরন্তু খারাপ দলে মিশিয়া বিড়ি টানিতে সুরু করিয়াছে...!

* * * *

"এই পানুয়া! দুটো বিড়ি দে দেখি! উঃ···" হারাধন পানুয়ার দোকানের সামনের বেঞ্চিতে নিজের বিরাট বপুটিকে স্থাপন করিয়া, কাপড়ের খুঁট দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিতে থাকে "জ্বালালে—! আচ্ছা মুস্কিলেই পড়েছিরে···"

···পানুয়া ভাবিয়াছিল এইবার বিড়ি চাহিলেই হারাধনকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিবে—স্পষ্ট বিড়ির দাম চাহিয়া লইবে, কিন্তু হঠাৎ সে কেমন থতমত খাইয়া গেল। কারণ ছিল, অর্থাৎ সে ভাবিতে পারে নাই হারাধনকে আবার কেহ. জ্বালাতন করিতে পারে—অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্বালাতন করিবার লোক যদি কেউ থাকে তাহা হইলে সে যে একমাত্র হারাধন এইরূপ এক উদ্ভট কল্পনা মনে মনে পানুয়া বহুদিন হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছে; সেই জন্য সে দুইবার ঢোঁক গিলিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল:

"তোমায় জ্বালালে? কে?"

চটাং করিয়া হাঁটুতে দুই চড় মারিয়া হারাধন হাসিয়া উঠিল—

"দে-দে-বিড়ি দিয়ে তারপর সব শোন্! ভারি মজারে ভা-রি মজা!—"

পানুয়ার জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল;—বিড়ি আগাইয়া দিতে দিতে সে বলিয়া উঠিল: "চাকরী মিলল বুঝি হারুবাবু! খাইয়ে দিতে হবে কিন্তুক...অল্পে ছাড়ব না···।"

...হাসিতে হাসিতে হারাধনের বিষম লাগিয়া যায়—খক্ খক্ করিয়া পাঁচ সাতবার কাশিয়া—গলা খাকারি দিয়া সে সুরু করে—

"আরে না না, চাক্‌রিত পরের কথা; সে সব সাহেব টাহেবের কাণ্ড, বল্‌লেই কি আর চট্ করে হয়। রীতিমত ইংরেজিতে চিঠি আস্‌বে জানিস! তোকে দেখিয়ে যাব এসে—দেখিস তখন।" বিড়ি জ্বালাইয়া হারাধন ধীরে সুস্থে একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া দেয়; মাথা ঘাড় চুলকাইয়া বক্তা এবং বক্তব্যের কদর বাড়াইতে থাকে।...হারাধন কিন্তু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে; তাহা হইলে মজার কথা কিরূপ না জানি হইবে ভাবিতে ভাবিতে পানুয়া হারাধনের অতি নিকটে সরিয়া আসে—"তা'হলে!"

"বল্‌ছি অত ব্যস্ত হলে কি চলে" গম্ভীর ভাবে হারাধন বিড়ি ফুঁকিতে থাকে—তাহার পর জ্বলন্ত বিঁড়ির টুকরাটি দূর করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া বলিতে সুরু করে—

"বিয়েরে—বিয়ে !! কি বিপদ বল দেখি! এমন ফ্যাসাদে মাইরি কোন কালে পড়িনি!"...

বিবাহের ব্যাপার এত জটিল হইতে পারে পানুয়া স্বপ্নেও

তাহা কখনও ভাবে নাই—সুতরাং তাহার কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে—

"কেন—টাকা চায় বুঝি হারুবাবু! তা দু-দশ টাকার জন্যে—

"আরে দূর বোকা" হারাধন পান্নুয়ার পিঠে ঠেলা দিয়া বলে—"পয়সা দিয়ে হারাধন বিয়ে করে না; মেয়ের বাপ স্বয়ং এসে হাতে পায়ে ধরাধরি বুঝলি?" সগর্ব্বে হারাধন বিমূঢ় পান্নুয়ার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় হাসিয়া ফেলে—"আর মেয়ের রঙ্‌ কি রকম বল দিকি?"

পান্নুয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলে "আপনার মতন হবে আর কি!" সজোরে বেঞ্চি চাপড়াইয়া হারাধন চেঁচাইয়া ওঠে—"দুধে-আল্‌তা রঙ! একেবারে মেমসাহেব! বিয়ে হলে তোকে একদিন দেখাতে নিয়ে যাব, দেখিস তখন!"

"তাহলে আপত্তি কেন করছেন সেইটেত বুঝ্‌তে নারছি বাবু!"...পান্নুয়া অবাক হইয়া হারাধনের মুখের দিকে চায়; সদ্য স্ত্রী হারাইয়া বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে তাহার উৎসাহের আর অন্ত নাই! সে বুঝিতে পারেনা কেমন করিয়া একজন বিবাহ করিতে গিয়া আবার মুস্কিলে পড়িতে পারে; বিবাহের সহিত বিপদের যে কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহার মাথায় কোন দিনই এ চিন্তা আসে নাই! হঠাৎ আজ তাই হারাধনের কথা শুনিয়া তাহার কেমন যেন মোহ লাগিয়া যায়; বিড়ি না চাহিতেই আরও দুইটি বিড়ি হারাধনের হাতে গুঁজিয়া দিয়া সে বলে—

"মুস্কিল কি আছে বাবু?"

"আরে মুস্কিল নয়? বিয়ে করলেইত হলনা—কত খরচ! এসেই যদি আবদার ধরে 'গয়না গড়িয়ে দাও'—তখন!!" হারাধন একটু কি ভাবিয়া লয় তাহার পর পুনরায় আরম্ভ করে —"অবিশ্যি চাকরিটা হলে—সব বজায় থাকে—! আরও মজা শোন্—" ফিস্ ফিস্ করিয়া পান্নুয়ার কানের নিকট সে বকিয়া চলে—"মেয়ের নাম লক্ষ্মী; সেও—বুঝ্‌লি কিনা—একেবারে আমায়" হাত ঘসিয়া-মাথা নামাইয়া বিনয়ের চূড়ান্ত করিয়া হারাধন বলে "বুঝলি কিনা—ভা-রি পছন্দ করে ফেলেছে; এই আমায় ছাড়া বিয়ে আর কাউকে সে করবেই না—" হেঁ হেঁ করিয়া আবার হাসির ধুম! হাসি থামিলে "কিন্তু এই যে আরামে হাত পা ছড়িয়ে বসে আছি—যেখানে যতখুসী যাচ্ছি —বিয়ে হলে সেটি যে আর হবেনারে! আর নেশা!" বুড়ো আঙুল নাড়াইয়া হারাধন বলে "নেশা করেছ কি সব্বনাশ! হুঁ হুঁ আজ কালকার মেয়ে বাবা—নেশা করলেই নাক সিঁটকে গায়ে থুতু দেবে! কানে বিড়ি গুজে চলেছ কি—বিড়ির সঙ্গে কানটিও থাকবেনা—চালাকি নয়—চালাকি নয়! তা,-ওসব চেষ্টা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—কি বলিস্! শুধু যদি চাকুরিটা হয়ে যায় তাহলেই সব বজায় থাকে...!" হারাধন আবার নীরব হয়—ফস্ করিয়া হাতের ফাঁকে দিয়াশালাই জ্বালাইয়া বিড়ি ধরাইবার ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে। পান্নুয়া ততক্ষণে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—

"তা বিয়ে হলে সব ঠিক হয়ে যাবে বাবু! এইত আমার বউটা কত জ্বালাতনই না করত—তবু যখন সে মরে গেল..." পান্নুয়ার চোখের কোনেও বুঝি জল আসিয়া পড়ে..."তখন বাবু বুঝ্‌লুম—বৌটা ভালই ছিল!" একটু থামিয়া "ও সব ঠিক হয়ে যাবে; দেখে নিও—পান্নুয়ার কথা মিথ্যি হবে নাই কিছুতেই..." স্বস্থানে গিয়া পান্নুয়া বসিয়া পড়ে!

"আচ্ছা আচ্ছা...এখন যাই তা হলে-" হারাধন আড়া-মোড়া ভাঙ্গিয়া উঠিতে উঠিতে বলে—"বিকেলের দিকে-আরও সব বল্‌ব এসে..."

* * * *

একেবারে মিথ্যা না হইলেও—হারাধনের কথা যে অনেকাংশে মিথ্যা—এ কথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলিতে পারা যায়। বিবাহের জন্য কেহই তাহাকে তাগাদা করে নাই—স্বয়ং লক্ষ্মীর বাপ একদিনের জন্যও তাহাদের বাড়ীর দরজা মাড়ায় নাই—এবং হারাধনকে না পাইলে—অন্য কাহাকেও যে সে বিবাহই করিবে না—এমন প্রতিজ্ঞার যথার্থতা লক্ষ্মী কখনই স্বীকার করিবে না! তথাপি হারাধনের মনে কেবলই এই কথাটাই উঁকি ঝুঁকি মারে—হয়ত লক্ষ্মী তাহাকে পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছে!—পৃথিবীতে কত জিনিষই ত ঘটিতেছে—আকাশে উড়িয়াছে মানুষ—জলে ভাসিয়াছে জাহাজ—বন বাদাড় ভাঙিয়া রেলগাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর লক্ষ্মী যে তাহাকে পছন্দ করিবে—এ এমন কি অসম্ভব কথা হইতে পারে। হারাধনের বিশ্বাস দৃঢ় হইতে

দৃঢ়তর হইতে থাকে—লক্ষ্মী হারাধনকে না পাইলে-অন্য কাহাকেও বিবাহই করিবে না !!······

···একদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পৃথিবীকে ভিজাইয়া একশা করিতেছিল ; সে বাদলে হারাধন আর বাহির হয় নাই ; আপনার অপরিচ্ছন্ন বিছানায় শুইয়া—অপরিষ্কার একটি চাদরে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া—গুন গুন করিয়া আপনার মনে গান গাহিতেছিল ; হঠাৎ কানে আসিল সৎমার গলা—"হ্যাগা—হারুর বিয়ের বয়েস ত হল—বিয়ে দাওনা এবার"—

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কান পাতিয়া বাপের উত্তর শুনিবার জন্য সে প্রতীক্ষা করিতে থাকে,—"কার বিয়ে—হারুর !" বাপের কথাও স্পষ্ট হারাধন শুনিতে পায়—"ঐ-ত রূপ—আর গুণেরও শেষ নেই—কে মেয়ে দেবে ওকে ? আর মিথ্যে জঞ্জাল বাড়িয়ে লাভই বা কি ?"...হারাধন সটান শুইয়া পড়ে—; কাল মোটা ডান হাত চোখের সম্মুখে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতে থাকে—সে কি সত্যই কুশ্রী...। মা—ত মরিবার আগের দিন পর্য্যন্ত সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন—; "কত বড়টিই হারু আমার হয়েছে ! দেখ দেখ চোখ দুটি কি সুন্দর !" স্বামীকে বার বার দেখাইয়া রুগ্না তাহার মাথায় কতবারইত হাত বুলাইয়া দিয়াছেন—সে কি একেবারেই মিথ্যা ? মা কি এতবড় মিথ্যা কথাটা বলিতে পারেন কখনও—হারুর বিশ্বাস হয় না ! বাবা তাহাকে দেখিতে পারেন না বলিয়া নিশ্চিতই অমন কথা বলিয়াছেন। মনে মনে আপনাকে সান্ত্বনা দিয়া হারু নিশ্চিন্তে সৎমার কথা শুনিতে থাকে—

"আহা অত কড়া হলে চলে ! চারু ঘোষের মেয়ে লক্ষ্মী বেশ ডাগরটি হয়েছে—আর বুড়োর পয়সাও প্রচুর। একমাত্র সন্তান যে সবই পাবে—এ কথা ভুলে যাও কেন ? একবার বলেই দেখনা"·· ব্যস্...প্রচণ্ড বৃষ্টি ধারার মধ্যে তাহাদের অন্য সব কথাই মিলাইয়া যায় ! হারাধনের তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই—যাহা শুনিবার সে তাহা শুনিয়াছে ! লক্ষ্মী—লক্ষ্মী !! বেশ নামটি ! হারাধন মনে মনে লক্ষ্মীর রূপের কল্পনা করিয়া লয়—টানা ভুরুর নীচেই সুন্দর দুইটি পটল-চেরা চোখ—সারা অঙ্গ ঘেরিয়া অদ্ভুত সৌন্দর্য্য !! আর রঙ্ ? লক্ষ্মী নাম যাহার তাহার রঙ্ দুধে-আলতা না হইয়াই পারে না ! হারাধন লক্ষ্মীর চিন্তায় বিভোর হইয়া যায়...। কেবলই তাহার মনে হইতে থাকে—লক্ষ্মী যেন তাহার ক—ত পরিচিত—যেন অনেককালই লক্ষ্মী তাহার একান্ত আপনার হইয়া গিয়াছে—কেবল বিবাহ বলিয়া বাহিরের একটা অনুষ্ঠান মাত্র বাকি ! দিনের পর দিন তাহার চিন্তা গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে এবং ফস্ করিয়া একদিন সে বিশ্বাস করিয়া বসে লক্ষ্মী তাহাকে পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছে—ভয়ানক পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছে—তাহাকে না হইলে লক্ষ্মী কাহাকেও আর বিবাহই করিবে না ! এবং এতবড় একটা কথা লোককে না জানাইয়াই বা কি করিয়া স্বস্তি পাওয়া যায়—আর তাহার কথা ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিবার মত লোক পানুয়া ছাড়া আর কেইবা আছে ? সুতরাং সবিস্তারে হারাধন পানুয়াকে সমস্ত কথা না বলিয়া পারে না।...

...মিথ্যা কথা হারাধন কখনই বলে নাই—! তাহার নিকট যাহা সত্য একান্ত সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে—আইনের মার প্যাঁচে—যুক্তিতর্কের দোহাই দিয়া তাহাকে মিথ্যা বলিবার অধিকার কাহারও নাই ! যুক্তি তর্কের খাতিরে যাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লই তাহাই যে যথার্থ সত্য—সেই বা কে বলিতে পারে ? আর যুক্তি তর্কের জন্য ত বিশাল পৃথিবী পড়িয়াই রহিল ! কথায় হারাইতে পারিলেইত তুমি মস্ত যোদ্ধা হইয়া পড়িলে—দর্শনের সূক্ষ্মতম প্যাঁচে বিপক্ষকে পরাস্ত করিয়া বাহাদুরির পরাকাষ্ঠা দেখাইলে ! ধরণীত যুক্তি তর্কেরই রাজ্য !! বিশ্বাসকে শুধু অন্দর মহলে থাকিতে দাও—রাতের অন্ধকারে শুধু বিশ্বাসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লও—মানুষের স্বপ্ন, দোহাই তোমার, রূঢ় যুক্তি দিয়া ভাঙিও না !...তাই বলিতেছিলাম—হারাধন মিথ্যা কথা বলে নাই—মিথ্যা বলিতে হারাধন কিছুতেই পারে না ! এতটুকু বেলা হইতে সে তাহার মার কাছে শিখিয়াছে—"সদা সত্য কথা বলিবে"—এবং মার প্রতিটি কথা তাহার নিকট বেদবাক্য—স্বয়ং ভগবান আসিয়াও যদি বলিয়া যান—তাহার মার কথা মিথ্যা—ভুস্ করিয়া একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া তাঁহার মুখের সামনে ছাড়িয়া দিতেও সে পিছপাও হইবে না ! পাগল হারাধনের গুণের সীমা নাই !!

* * *

"ওরে পানুয়া বড় গোলযোগ রে—বড় গোলযোগ"··· হাসিতে হাসিতে সকাল বেলায় হারাধন আসিয়া হাজির! খাতির করিয়া বসাইয়া—বিড়ি দিয়া পানুয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিতে ছাড়ে না! পানুয়ার নিকট হারাধন এক মস্ত লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে! যাহার বিবাহ লইয়া এত গোলযোগ বাধিতে পারে—যাহার জন্যে এক দুধে-আল্‌তা রঙের মেয়ে পাগল হইয়া উঠিয়াছে—সে অসাধারণ না হইয়াই পারে না! দুইটি পান সাজিয়াও সে দেয়—বলে "কবে বাবু কবে? নিমন্তন্ন করতে হবে কিন্তুক··· !"

"এই সামনের ফাগুনেইরে! নেমন্তন্ন হবেই তোকে আর অত করে মনে করিয়ে দিতে হবে না" তাহার পর হাতের আঙুলে গুণিতে থাকে—"এই হল গে অগ্রহায়ণ—তারপর পোস—তারপর মাঘ—আর তারপর···" হেঁ হেঁ করিয়া হারাধন হাসিয়াই খুন!

"মেয়েকে তুমি দেখেছ বাবু?" বহু বুদ্ধি খরচ করিয়া পানুয়া প্রশ্ন করিয়া বসে—"একে-বারে দুধে আল্‌তা—অ্যাঁ?"

হটাৎ ধাক্কা খাইয়া হারাধন কেমন থতমত হইয়া যায়—কিন্তু সাম্‌লাইয়া পরক্ষণেই বলে, "আরে না-না, নিজের বউ বুঝি কেউ নিজে দেখে? আচ্ছা পাগল ত! এই আমার ছোট মা—বুঝলি ছোট মা— নিজে দেখে এসেছে—অমন সুন্দরী এই সারা গ্রামে আর একটিও নেই! হাস্‌লে সে মেয়ের মুখ দিয়ে মুক্ত ঝরে...এখন তোদের ইচ্ছেয় চাকরিটা হলেই—বুঝলি কি না—সব বজায়··· !"

···পানুয়ার মোহ কাটিতে থাকে। সেও যেন বুঝিতে পারে হারাধনের বিবাহের গোলযোগ যথেষ্ট! সৎমা যে সতীনপুত্রের জন্য দুধে-আল্‌তা রঙের বধূ আনিয়া দিবে, পাকা ব্যবসায়ী পানুয়া তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না! অজান্তে তাই সে বলিয়া ফেলে

"দেখ আবার না কোন ব্যাগড়া বাধে—আমার কিন্তুক বিশ্বাস হয় না···!"

"ব্যাগড়া! কিসের ব্যাগড়া?" হারাধন চটিয়া ওঠে—"তোর যেমন বুদ্ধি—না হলে চিরজীবন এই দোকানদারি করেই মরলি—! হুঁ!"

দোকানদার বলিয়া তাহাকে তাচ্ছিল্য করা—রাগে পানুয়াও অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল—"মুরোদত নিজের কত—বিনি পয়সায় বিড়ি খেতে এই দোকানদারের কাছেই ত যখন তখন হাত পাততে এস! এই বলে দিলুম বাবু! তিনি টাকা বিড়ির দাম নিয়ে তবে এদিক পানে আসবে! দোকানদার! দোকানদার !!" বিড় বিড় করিতে করিতে পানুয়া চাল মাপিতে থাকে—।

বহুবার ঝগড়া লাগিয়াছে—এবং প্রতিবারেই স্বার্থের খাতিরে হারাধন নরম হইয়া পানুয়ার রাগ ভাঙাইয়াছে! কিন্তু আজ তাহার যেন কি হইল! লক্ষ্মীর সহিত বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিতেই তাহার আত্মসম্মান জ্ঞানটাও যেন কিঞ্চিৎ বাড়িয়া গিয়াছে—দুই হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিয়া সেও চেঁচাইয়া উঠিল "ভা-রি দুপয়সার বিড়ি দিস্ বলে যেন মাথা কিনে রেখেছিস! হক্ চাকৃরি—ঝনাৎ করে তোর টাকা ওইখানে ফেলে দিয়ে যাব! আস্পদ্দা—ছোটলোক কোথাকার!" বলিয়াই হন্ হন্ করিয়া সে বাড়ীমুখো রওয়ানা। বাড়ী আসিতেই ছোট মা হাঁকিয়া বলেন—

"কি-হে এত সকাল সকাল যে আজ!" তাহার পরই মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলেন—"চারু ঘোষের মেয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে এবার বিয়ের চেষ্টা করছি—অত টো টো করে ঘুরে বেড়ান একেবারে বন্ধ হবে এবার!"

একগাল হাসিয়া হারাধন যথানিয়মে বলে "ধ্যেৎ" এবং তাহার পর ছোটমার নিকট দুইটি পয়সা চুল ছাঁটিবে বলিয়া চাহিয়া লয়।

"হ্যাঁ হ্যাঁ চুল ছাঁট—একটু সেজে গুজে থাক—মস্ত বড়-লোকের মেয়ে সে—শেষকালে এসে ঘেন্না করবে"—পয়সা দিতে দিতে ছোটমা বলিতে থাকেন "উনি গেছেন সম্বন্ধ নিয়ে এই ফাগুণেই যাতে হয় তারই চেষ্টা করা হচ্ছে!"

···হারাধন আদ্যপান্ত খুসী হইয়া—পয়সা লইয়া নাপিতের সন্ধানে বাড়ী ছাড়িয়া আবার পথে বাহির হয়। কিন্তু চুল ছাঁটা আর হইয়া উঠিল না—মনোহারী দোকান হইতে ছোট একটি আয়না কিনিবার লোভ সে সাম্‌লাইতে পারিল না কিছুতেই! এবং সেইদিন সাবান দিয়া স্নান করিয়া—আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া টেরি বাগাইতে বাগাইতে—তাহার কেমন

যেন মনে হইল—চোখ দুইটি তাহার সত্যই ভা-রি সুন্দর—মা তাহার ভুল বলেন নাই—এতটুকু !

* * *

…দিনের পর দিন চলিয়া যায়-! যথানিয়মে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠিয়া পশ্চিমে নামিয়া পড়ে…মাঝে মাঝে বৃষ্টি আসিয়া বাঁশবনের ভিতর তুমুল আন্দোলন বাধাইয়া তোলে…ফুলহীন শেফালি গাছের পাতা শুকাইয়া ঝরিতে থাকে…ধীরে ধীরে শীতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া গা হাত পা কাঁপাইয়া দেয় …যথানিয়মে সব কিছুই ঘটিতে থাকে ! শুধু হারাধন বুঝিতে পারে না চাকরি এবং বিবাহ লইয়া যে আন্দোলন বাড়ীতে তাহার উঠিয়াছিল—হঠাৎ তাহা একেবারে চুপ হইয়া গেল কেন ? বিবাহের কথা ছোটমাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার কেমন লজ্জা লজ্জা করে—কিন্তু চাকরির খবরত সে নিজেও লইতে পারে ! হ্যাঁ আজই-এই মুহূর্ত্তেই-সে আফিসের ছোট বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবে—তাহার চাকরির আর কত দেরি !…ধড়মড় করিয়া উঠিয়া হারাধন সার্টটা গায়ে আঁটিয়া বাহির হইয়া পড়ে !…তিন মাইল পথ ভাঙিয়া বিপিন বাবুর বাড়ী আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রশ্ন করে—

"বাবু ! চাকরির কি হল ? অনেকদিন ত কেটে গেল…"

"আরে-আরে তুই বুঝি কিছুই জানিস না" বিপিনবাবু তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া ফেলেন "তোর বাপ্‌কে সবই বলেছি আমি। হলনারে তোর হলনা, সাহেব পছন্দ করলে ঐ সস্ত ছোঁড়াকে, বললে 'একজন চট্‌পটে ছেলের দরকার, ও সব হারুফারুর কর্ম্ম নয়'-তা আর কি হবে—ভারিত এক পনেরো টাকার কাজ—তুই দুঃখু করিসনি যেন।" সস্নেহে বিপিন বাবু তাহাকে বুঝাইতে থাকেন "এবারে খালি হলেই আবার আমি চেষ্টা করব বুঝলি… !"

"হুঁ—নমস্কার আসি তাহলে" হারাধন চলিতে থাকে। সমস্ত বিশ্বাস তাহার যেন শিথিল হইয়া আসে ; এতকাল ধরিয়া যত কল্পনা সে নিজের সম্বন্ধে করিয়া আসিয়াছে একনিমেষে যেন সমস্তই চৌচির হইয়া যায়। সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইতে থাকে লক্ষ্মীও তাহাকে কখনই পছন্দ করিবেনা—না কখনই নয়—পছন্দ করিবার মতন তাহার যে কিছুই নাই ! নিজের কাল মোটা হাতখানি দেখিতে দেখিতে সে বুঝিতে পারে, মা তাহার ভুল বলিয়াছিলেন,—বড় সে হইয়াছে বটে —কিন্তু বড়লোক সে হইবেনা কখনও………।

…পথে আসিতে আসিতে পান্তুয়ার দোকানের নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া—অতিকষ্টে তাহার রাগ ভাঙাইয়া একটি বিড়ি চাহিয়া ফুঁকিতে ফুঁকিতে যখন সে বাড়ী পৌছাইল—বারটা তখন বাজিয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই ছোটমা বলিতে থাকেন,

"এই যে তোমাকেই খুঁজছিলুম। লক্ষ্মীর বিয়ে কাল, নেমন্তন্ন করে গেছে। ওঁর শরীর ত তত ভাল নয়—তুমি বাপু কাল নেমন্তন্ন রক্ষে করে এস"—ঠিক এই কথাটি শুনিবার জন্যই যেন সে এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল—এইরূপ অবিচলিত ভাবে এবং অম্লান বদনে হারাধন বলিয়া ওঠে—"আচ্ছা" তাহার পর নিজের ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের দেরাজ হইতে দুইপয়সার আয়না বাহির করিয়া নিজের মুখ দেখিতে বসে—। …সৌন্দর্য্যের চিহ্নমাত্র নাই…প্রকাণ্ড কাল মুখের উপর—বিপুল চেপটা নাকটি বেঢপ ভাবে লাগিয়া রহিয়াছে…মোটা মোটা ঠোঁট দুইটি কানের কাছাকাছি গিয়া তবে থামিয়াছে—চোখ দুইটির চারিপাশে মাংসপিণ্ড ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে ‥ কোথাও এতটুকু সৌন্দর্য্যের চিহ্নমাত্র নাই…।

…জানালা গলাইয়া দুই পয়সার আয়না রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পুরাতন অর্দ্ধদগ্ধ বিঁড়িটি টানিতে টানিতে হারাধন তাহার অপরিচ্ছন্ন বিছানায় সটান্ শুইয়া পড়ে।……

শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায়

মুক্তি

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী

ছাড়া পেল আজ আমার বন্দী
ভাবনাগুলি,
মানসে মাখিল তোমারি রঙ্গের
রঙীন তুলি,
পাখায় পাখায় অতি বিচিত্র—
আঁকিয়া চলিল গতির চিত্র,
তব অভীপ্সা-অভিসার তার ডানায় ডানায়
উঠিল দুলি'।
ছাড়া পেল আজ আমার বন্দী
ভাবনাগুলি।

তুঙ্গ-শিখর লঙ্ঘিয়া চলে
রঙ্গভরে,
ঊর্দ্ধ-আরতি—সুর-উৎসার
কণ্ঠে ঝরে,
তার উজ্জ্বল-বর্ণ বিভাসে
আকাশ আজিকে কোন্ হাসি হাসে,
বেলাগুলি তার পলকে পলকে তোমারি লীলার
খেলারে ধরে।
তুঙ্গ-শিখর লঙ্ঘিয়া চলে
রঙ্গভরে।

তোমার পরশ-মণির পরশে
প্রদীপ জ্বলে—
পুলক-কনকে ঝল-মল-রথ
বহিয়া চলে,
প্রেমের দীপক-রাগীণী রাগিয়া
চলে প্রদীপ্ত-মাধুরী মাখিয়া,
প্রলয়-বাধার বজ্রবহ্নি ভাঙিয়া চলে সে
বক্ষতলে।
তোমার পরশ-মণির পরশে
প্রদীপ জ্বলে!

তোমারি হাসির উদয়-কিরণে
বিকীর্ণিত—
সূর্য্য-মুখীর মত তার তনু

ইন্দ্র-লোকের বৈভবরাজি
দীপ্তিতে তার তুচ্ছ যে আজি,
তব প্রণয়ের প্রসাদ শোভিত শোভায় সে বুক
সুরঞ্জিত।—
তোমারি হাসির উদয়-কিরণে
বিকীর্ণিত।

সুদূর নিম্নে সুর মূর্চ্ছায়
করুণ রোলে—
তোলে মর্ম্মর নদী, নির্ঝর,
—সাগর দোলে;
বেদনা-বাদল-মেঘেরে ডুবায়
তার প্রোজ্জ্বল-রূপের রূপায়,
বিরহের স্মৃতি স্তিমিত-তারার অতীত-নিশীথে
আপনা ভোলে।

সুদূর নিম্নে সুর মূর্চ্ছায়
করুণ রোলে।

চলে জাগ্রত-দ্রুত-চেতনার
সূক্ষ্ম-গতি,
চলে সার্থক-অধিরোহিনীর
শরণ-ব্রতী,
চলে সে তীক্ষ্ণ-তীরের ফলকে
লক্ষ্য-কেন্দ্রদীর্ণ ঝলকে,
ব্যর্থতাহীন বক্ষে বহিয়া
চলে সে রবীশ্বরের জ্যোতি।
চলে জাগ্রত-দ্রুত-চেতনার
সূক্ষ্মগতি।

মসী-বিকীর্ণ সঙ্কীর্ণতা
অন্ধকারে
লুণ্ঠিত আজ ধূলি পুঞ্জিত
দৈন্যভারে;
এখন কেবল মোর বাসনার
সৃজন-সরণী স্বচ্ছ-সোনার,
এখন কেবল মুক্তিছন্দ ঝঙ্কৃত সুর
তন্ত্রীতারে।
ধূলি-কামনার পন্থা লুটায়
অন্ধকারে।

চলে উন্নত—শপথের পথে—
চলে সে ছুটি'
বন্দী আলোর গ্রহতারকার
গণ্ডী টুটি',
সূর্য্যের মোহ—চন্দ্রের মায়া—
উদয়াচলের ক্ষণিকের কায়া—
ছায়া সমতার নয়নে মিলায় তিমির-অস্ত-
অয়নে লুটি'।
চলে উন্নত-শপথের পথে—
চলে সে ছুটি'।

তব প্রমুক্ত প্রেমের বহ্নি-বিহঙ্গরে
কে পারে রুদ্ধ-পিঞ্জর মাঝে
রাখিতে ধ'রে?
যত যায় তত তোমারে সে জানে
মুখরিয়া উঠি অসংখ্য গানে—
তোমারি দীপ্তি-গলিত রতন-ফলিত-নিঝরে
অঝোরে ঝরে।
কে পারে তোমার শিখা বিহঙ্গে
রাখিতে ধরে?

কোন্ অলক্ষ্য-লক্ষ্যেরে তার
বক্ষে বাঁধে,
কোন্ অনাহত কল্লোলরাশি
চিত্তে গাঁথে,
কোন্ অনন্ত কপোলের তলে
চুম্বন রচি চলে পলে পলে,
কোন্ অতন্দ্র নয়নে চাহিয়া শুভদৃষ্টির
লগ্ন সাধে।
কোন্ অলক্ষ্য-লক্ষ্যেরে তার
বক্ষে বাঁধে।

প্রাণের প্রতিটি স্পন্দনে লভে
যারে সে চায়,
চির-বাঞ্ছিত নন্দনে তার
গতি মিলায়,
দুর্ল্লভে আজি সুলভ করে সে,
অধরারে কত আদরে ধরে সে,

অনাস্বাদিত-সুধা-রস-ধারা বাণী হ'য়ে ঝরে
সে রসনায়।
প্রাণের প্রতিটি স্পন্দনে লভে
যারে সে চায়।

বিগত এখন মলিন মনের
বিলোল তৃষা,
নাই রাহু রবি, নাই কলঙ্কী
শশীর নিশা,
নাই ধূমকেতু ধূমায়িত বেলা—
দুর্দ্দৈবের বিদ্রোহী-খেলা ;
এখন কেবল রাধার সাধনা বঁধুর মধুর
অধরে মিশা।
বিগত এখন মলিন মনের
বিলোল তৃষা।

প্রিয়তম, তব মুক্তি মন্ত্রে
দীক্ষা দিলে,
তোমার স্বচ্ছ নীল স্ফটিক
—নিলয়ে নিলে,
তব আনন্দ-লীলা-লাস্যের,
তব প্রশান্ত-সুখ-হাস্যের
মাঝে আজি মোর প্রতিটি পলক গভীর আলোকে
বিরঞ্জিলে।

প্রিয়তম, তব মুক্তি মন্ত্রে
দীক্ষা দিলে।

সবার সমুখে আমার প্রেমের
বিকাশ জাগে,
সত্তায় মোর আকর্ষণের
শক্তি লাগে,
সে-আকর্ষণে প্রতি মুহূর্ত্ত
সত্যেরে মোর করে যে মূর্ত্ত,
প্রস্ফুটি ওঠে জীবন-কমল তোমারি অমল
কিরণ রাগে।
সবার সমুখে আমার প্রেমের
বিকাশ জাগে।

ছাড়া পেল আজ আমার বন্দী
ভাবনাগুলি,
মানসে মাখিল তোমারি রঙের
রঙীন তুলি,
পাখায় পাখায় অতি বিচিত্র
আঁকিয়া চলিল গতির চিত্র ;
তব অভীপ্সা অভিসার তার ডানায় ডানায়
উঠিল দুলি'।
ছাড়া পেল আজ আমার বন্দী
ভাবনাগুলি।

নিশিকান্ত
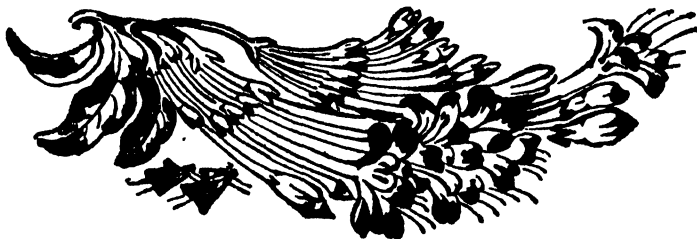
চিঠি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসগুপ্ত

ইউরোপের পথে—
ভূমধ্যসাগর

রাণু,—

হাজার হাজার মাইল দূর থেকে তোমাকে আজ চিঠি লিখছি। কাল এমনি সময় এশিয়া আর আফ্রিকার মাঝামাঝি সরু সুয়েজ খাল দিয়ে আসতে আসতে রক্ত-সন্ধ্যায় হঠাৎ-ই তোমার কথা আমার মনে পড়ে গেল। পশ্চিম আকাশ-প্রান্তে ফাগ ছড়িয়ে দিনান্তের সূর্য্য তখন আফ্রিকা দিকের এক সার পাহাড়ের আড়ালে ধীরে ধীরে গেল ডুবে। এশিয়ার দিকে তখন ঘন কালো অন্ধকার তার এলো চুল দিয়েছে এলিয়ে। রঙের আলো-ছায়ার এই মনোরম খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল—দার্জ্জিলিঙে বার্চ্চ হিলের সেই ঢালু জায়গাটায় বসে আমার কাঁধে মাথা রেখে এম্‌নি এক প্রশান্ত সন্ধ্যায় অতি সঙ্গোপনে আমার আঙ্গুলগুলো নাড়তে নাড়তে বলেছিলে—তুমি যতো দূরেই থাক না কেন পরি, প্রতিটি সন্ধ্যায় এম্‌নি করে আমি পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐ অস্ত সূর্য্যের দিকে অনিমেষ চেয়ে চেয়ে একান্তে যে নম্র প্রণতিটি নিঃশব্দে জানাবো, সে জেনো পরি শুধু তোমার জন্যই। এই সময়টিতে পৃথিবীর কোন বড় মোহ-ই আমাকে ভুলিয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না—পারবে না। ...আরও বলেছিলে—জানো পরি, মেয়েরা যখন ভালবাসে, বন্যার জলের মতন দুকূলে আনে প্লাবন, দু'হাতে সব বিলিয়ে দিয়ে চলে, ফিরে তাকায় না, চায় না প্রতিদান, ভাবে না ভবিষ্যতের কথা।...আরো কত কি! মোট কথা বক্তৃতাটা সেদিন ভালোই দিয়েছিলে। সময়টা ছিল কবিত্ব করবার, জায়গাটার তো তুলনা-ই নেই; ওরকম সময়, বিশেষ করে ওরকম জায়গায়, প্রেমের গান ছাড়া আর কিই বা মানুষে গাইতে পারে। প্রেমে পড়বার মত ওরকম স্থান কাল দুনিয়ায় আর দুটো আছে কিনা সন্দেহ। তারপর পাহাড় দেশের সূর্য্যাস্তের একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে...নেশা ধরায়। নেহাৎ অকবিকেও করে তোলে কবি, নির্ব্বাককে করে মুখর। আমাকে যে প্রেমিক করে তুল্‌বে তার আর বিচিত্র কি! তারপর ছিল ঠাণ্ডা হাওয়া...মিষ্টিরিয়াস্ ফগ (fog), তুমি আওড়াচ্ছিলে Browning-এর May Moon। সত্যি কথা বলতে কি রাণু, সেদিন তুমি আমার চোখের সাম্‌নে কি অনির্ব্বচনীয় হয়েই না ফুটে উঠেছিলে! অতি দুর্লভ বলে তোমাকে মনে হয়েছিল। তোমাকে পাওয়ার মধ্যে সেদিন আমি প্রকাণ্ড যুদ্ধজয়ের মতোই আনন্দ ও গৌরব অনুভব করছিলাম। পৃথিবীর সাম্‌নে নিজেকে আমার কত বড় মনে হ'ল...ফোর্ডের চাইতেও ভাগ্যবান পুরুষ আমি, রক্‌ফেলার আমার সাম্‌নে ছোট হয়ে গেল!

কিন্তু কি মিথ্যা সব! মনে করো না ছেঁড়া সুতো নিয়ে বা ছেঁড়া পাপড়ি কুড়িয়ে আমি আবার নতুন করে মালা গাঁথতে বসেছি। ভেবো না অতীতের দিনগুলার...ঘটনাগুলার...খণ্ড খণ্ড স্মৃতি-গাথা লিখে ইনিয়ে বিনিয়ে আমি আবার তোমার মনের কোণে অতি অলক্ষ্যে আমার আসন পাতবার আয়োজন উদ্যোগ করছি, ফন্দি ফিকির খুঁজছি। পুরাতন দিনের গান করুণ সুরে গেয়ে...'একদা তুমি প্রিয়ে' বলে তোমার মন ভেজাতে আসি নি, সে অভিসন্ধিও নেই... একথা ভুলো না যেন।

...ইস্! নারী কি অনর্থই না সৃষ্টি করতে পারে! পুরুষের জীবনের অর্দ্ধেক দুঃখ-কষ্টের পিরামিড...আমার তো মনে হয়...একা নারীই গড়ে তোলে। পলকে তোলে প্রলয়। প্রকাণ্ড ভূমিকম্পের মত সব দেয় ওলট-পালট করে, ছারখার

করে। যাক্, নারীজীবনের···নারী-তত্ত্বের...থিসিস্ লিখতে আমি বসি নি। সে প্রবৃত্তিও আমার নেই। নারীর মনের গহন-বনে আত্মহারা হয়ে যারা বিচরণ করে শেষে হয়রাণ হয় ...সে বেচারাদের জন্য আমার, আর কিছু না, দুঃখই হয়। এবং তাদের আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্যই মনে করি।···

মনে পড়ে রাণু, ট্রামে ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁজরে চোট খেয়ে একেবারে মনণাপন্ন হ'য়ে হাস-পাতালে এসে আশ্রয় নিই। তারপর চললো যমে মানুষে প্রাণপণ টানাটানি ...টাগ-অফ-ওয়ার। তুমি রোজ বিকেলে আস্‌তে, আমার মাথার পাশে বসে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে কত আশার কথা শোনাতে। তারপর যখন একটু বাড়াবাড়ি হল, ডাক্তার বললে আমার মাথার যে যায়গায় চোট লেগেছে, তার ফলে দৃষ্টিশক্তি চিরদিনের জন্য হারাতেও পারি হয় তো; ···সুতরাং এখন থেকেই আমি যেন সে চরম আঘাতের জন্য বীরের মতো প্রস্তুত হয়ে থাকি, সে কথা শুনে সেদিন তুমি কি বলেছিলে আমাকে? আমার হাতে ছিল তোমার হাত, বলেছিলেঃ ডাক্তার জানে না কিছু, তুমি ভেবোনা পরি। তেমন দুর্দ্দিন যদি আসেই, আমি তোমার পাশে আছি। ভয় কি? তুমি আমার এম্‌নি করে হাত ধরে থেকো। সমস্ত পৃথিবী থেকে একলা করে, অতি আপনার করে, নিবিড় করে সেদিন তোমাকে আমি পাবো···পাবোই পাবো।...

উঃ! সেদিন তোমার হাতখানা কপালে চেপে ধরলাম। তারপর সরিয়ে আন্‌লাম আমার বুকে। দুর্ব্বল শরীরে অতো আনন্দ সেদিন সইতে পারি নি, তাই কাঁপছিলামও একটু। ভাবলাম এমন নিশ্চিন্ত বুঝি আর কিছু নেই, এমন নিরাপদ আশ্রয় জীবনে আর কোথায় পাবো? চোখের সাম্‌নে থেকে পৃথিবী যদি মুছে যায়-ই,···যাক্, রাণুর হাত ধরে আমি সব ভুলতে পারবো। সব আঘাত সহজ করে নিতে পারবো।

আমাকে নিয়ে সে তোমার কি ব্যস্ততা! কী আকুলতা! সকালে বিকালে খোঁজ খবর নেবার সে কী অধ্যবসায়! যেদিন আস্‌তে পারবে না, সেদিন ফোনে নিতে খবর···আমার পালস্‌ রেস্‌পিরেশন কত? টেম্‌পারেচার বেড়েছে না কমেছে? রাতে ঘুম হয় কিনা? কি খেয়েছি? তারপর যখন একটু আরাম হ'লাম, ভয়ের আশঙ্কা কিছু কম্‌লো, মাথার ঘা আস্‌লো শুকিয়ে, তখন আস্‌তে লাগলো তোমার চিঠি···দু'একদিন পর পরই:

...কাল রাতে হঠাৎ যে ঠাণ্ডা পড়েছিল সে সময় তোমার গায় কিছু ছিল কিনা, ভোরের দিকে আজকাল প্রায়ই ঠাণ্ডা পড়ে, গায়ে চাদর খানা যেন রেখো, ডাক্তার নার্সের কথা শুনো, লক্ষ্মীটি আমাকে আর কাঁদিয়োনা...

ইস্‌! কতখানি জল ফেলেছিলে সেদিন রাণু? ক' ঘটি?

কত খবরদারী! আবার লিখেছিলে···বুকের ব্যথাটা কেমন আছে? জানো এখন তোমার প্রধান কাজ সেরে ওঠা, আর কোন চিন্তা না। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করতে বড় ভালবাস না?...কেন তোমার অসুখটা আবার বাড়লো? নিশ্চয়ই উঠে চলা ফেরা করেছো বড় বেশী রকম। নয়তো ডাক্তার নার্সের কথা না শুনে অনেকক্ষণ বই পড়েছো।···কেন পাগলামী কর বল তো? কেন এমন কর? দেউলে কার্ত্তিক, বই পড়া তোমার পালিয়ে যাচ্ছে না, আবার তুমি সব পারবে। আচ্ছা মানুষ! একটু ধৈর্য্য নেই, একটু ধৈর্য্য ধরে থাকৃতে পার না? আমি পারি আর তুমি পারনা !···কাল তোমার নামে পূজো দিয়েছি ···।

ঘটা করে আবার পূজো-ও দিয়েছিলে রাণু? এতো-ও জানো! পূজোয় কার কামনা করেছিলে রাণু?—নিশ্চয়ই আমার নয়···।

তুমি যখন আস্তে আস্তে আমার কাছ থেকে সরে যেতে লাগ্‌লে, তখন আমি হ'য়ে উঠলুম অধৈর্য্য। ডাক্তার বল্‌লে আর মাস খানেকের মধ্যেই আমি সম্পুর্ণ সেরে উঠতে পারবো, এক্স-রে নিয়ে দেখা গেছে পাঁজরার এব্‌নরমিলিটি (abnormility) কিছু নেই।...বিকেলে তুমি না আসলে ভাব্‌তাম নিশ্চয়ই সন্ধ্যার পর আস্‌বে একটা ফোন, কিম্বা কাল সকালেই পাব একখানা চিঠি। বিকেল হয়, তুমি আর আস না—৫টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত কী উৎকণ্ঠা না নিয়েই আমি বারান্দার দিক চেয়ে থাকৃতাম। এমনি উৎকণ্ঠায় প্রায় সপ্তাহ গেল কেটে—আমার খোঁজ-খবর নেওয়া তুমি অকস্মাৎ বন্ধ করে দিলে—বিস্ময়ের আর আমার অবধি রইল না···

তার দিন কয়েক পর তোমার হ'য়ে গেল বিয়ে মহা

সমারোহে। শুনলাম তোমার মামাতো ভাইয়ের কাছে। এও শুনলাম তোমরা গেছো শিলং-এ—হনিমুন ভুঞ্জনে।

জানো রাণু, সেদিন কি হয়েছিল, কত বড় আঘাত তুমি দিলে? ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সেদিনকার যে আঘাতটা আমাকে প্রাণান্ত করেছিল, এ আঘাতের কাছে সে আঘাতটা মনে হ'ল কিছুই নয়। দিনটা কোন রকমে কাটে তো রাতটা নিয়ে আসে নানা চিন্তার বিভীষিকা।

ঘুম···ঘুম...ঘুম দিয়ে সব চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবো মনে করে প্রতি রাতে নার্সের কাছ থেকে নানা ওজর আপত্তি করে ঘুমের ওষুধ চেয়ে চেয়ে খেতে লাগ্‌লাম। একদিন রাতে ঘুম গেল ভেঙ্গে, ঘুম কিছুতেই আর আসে না। মনে করলাম আর না, হাঁসপাতালের চারতলা থেকে এই অন্ধকারে যদি লাফিয়ে পড়ি...। থাক্, সে কথা বলে কাজ নেই। দু'হাত তুলে ভগবানকে আজ ডাক্‌ছি...ভগবান, তুমি আমার পাগ্‌লামীকে প্রশ্রয় দাও নি, আমায় সেদিন বড় জোর তুমি বাঁচিয়েছো। জীবনে তোমাকে পেলাম না বলে নিজেকে ধ্বংস করবো, বেমালুম ধুয়ে মুছে সাফ্ করে দেবো···সে রকম Rubbish sentimentalism আমার মধ্যে নেই রাণু। অবসর সময়ে তুমি যে তোমার বিলাসী মন নিয়ে ভাব্‌বে...তোমারই জন্য এই বাংলা দেশের এক যুবক অকাতরে প্রাণ দিয়েছে...আমি অমানুষ,···তোমাকে সে আত্ম-প্রসাদ আমি দিতে পারবো না।

...মনে পড়ে রাণু...আমার বুকে মাথা রেখে লতার মত এক হাত আমার গলায় জড়িয়ে আধ আধ ভাষে একদিন কি বলেছিলে···ওগো, তোমার বুকে এম্‌নি করেই যেন মিশে থাক্‌তে পারি, বলো তুমি আমায় ঠেলে ফেলবে না কোনদিন?... ···

রাণু সাপেরও বিষ আছে, কিন্তু তোমার বিষের কাছে সে বিষ কত তুচ্ছ, সে বিষের জ্বালা কত কম!

জীবনের পথে পথে মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। জীবনের পাতায় পাতায় তারই কাহিনী ওঠে জমা হয়ে। অভিজ্ঞতার ধাপে ধাপে চলতে চলতেই মানুষের বাড়ে শিক্ষা, ঠক্‌তে ঠক্‌তে তার মনের বাড়ে বিচার শক্তি, একই ভুল সে আর বার বার করে না। তোমার হাত দিয়ে এ জীবনের চলার পথে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার অপরূপ স্বাদ পেলাম··· ভাবি তারও বুঝি বিশেষ দরকার ছিল। পৃথিবীতে নিরর্থক কিছুই নয়। শুধু দেখবার ভঙ্গীর দোষে আমরা কষ্ট পাই। সব ভালবাসা যে ভালবাসা নয় এ আমি যেমন করে আজ বুঝেছি তেমন করে আর ক জনই বা বুঝেছে?

আচ্ছা জিজ্ঞেস করি রাণু, তোমার ভদ্র মনের তলে তলে এরকম একটা খল প্রবৃত্তি কেমন করে আত্মগোপন করে থাকে? দশ জন মানুষের সাম্‌নে কেমন করেই বা তুমি সমানে মুখ তুলে হাস গাও চলাফেরা কর? পৃথিবীতে নিষ্ঠা শুচিতা বলে কি কিছু নেই রাণু? ধন্যবাদ রাণু···ধন্যবাদ, তুমি আমাকে মস্ত জিনিষ শিখিয়েচো। তোমার আঘাতে আমি জেগে উঠেছি। নিজেকে চিন্‌তে পেরেছি। বুঝেছি জীবন হেলা ফেলা করবার নয়।

* * *

আশ্চর্য্য! আচ্ছা রাণু, তোমার কোথাও বাধে না? আমার বুকে মাথা রেখে কাণে কাণে যে সব কথা যেম্‌নি ভাবে গুঞ্জন করতে, আকাশে জ্যোৎস্নার দিক চেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে যেমন করে বলে উঠ্‌তে—

Full she flared it lamping Sanminiats.
Rounder 'twixt the Cypresses and rounder
Perfect, till the nightingales applauded !···

সেই একই কথা একই ভাবে বলতে আজ তোমার কোথাও একটুও আটকায় না? বল, বুকে হাত দিয়ে বল একটুও বাধে না কোথাও? কী অভিনয়ই না করতে পার রাণু! আচ্ছা রাণু, নতুন মানুষটি যখন তোমাকে আদর করে একান্ত কাছে টে ; নেয়, তখন তার বুকে মাথা গুঁজে অতীতের আর এক জনের কথা মনে পড়ে অকস্মাৎ তোমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে না? তার চোখে চোখ রেখে ভালবাসি একথা বলতে জিব জড়িয়ে আসে না কখনো? গলা শুকিয়ে ওঠে না?...

যদি লিখতাম···রাণু তুমি যে আমার কি ছিলে তা' বলতে পারি না। তোমার স্মৃতি আমার বুকে দাবানলের মত জলচে। আমি পাগলের মত ছুটে চলেছি সাত সমুদ্র তের নদীর পারে, অজানার সন্ধানে। এ জীবনে তোমাকে আমি পেলাম না। পরজন্ম মান তো? পরজন্মে নিশ্চয়ই তুমি আমার হবে। হবে না রাণু? অপেক্ষায় রইলাম···।

জানি এ রকম করে চিঠি লিখ্‌লে তুমি মনে মনে ভারী খুশীই হতে। দুর্ভাগ্য আমার! তোমাকে খুশী করবার ব্রত তো আমি নিইনি রাণু। আমি বিলাসীও নই···অবসর সময়ে তোমার কথা মনে করে একটা মিনিট খরচ করাকে আমি বিরাট অপচয় বলেই মনে করি। তোমাকে কিছুই আজ আমার বলবার নেই। শুধু এই টুকু অনুরোধ জানাই দোহাই রাণু! আমার নাম আর তুমি মুখে এনো না। আমাকে যে চিন্‌তে, দয়া করে তা'ও ভুলে যেও। তোমার মুখে আমার নাম উচ্চারণ আমার মস্ত বড় অপমানের—এ কথা স্পষ্ট করেই আজ তোমাকে জানিয়ে রাখি। আর এ কথা বলবার জন্যই আজ তোমার কাছে আমার এ চিঠি লেখা। বিদায়— পরিমল

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসগুপ্ত

"শাঙন ধারা"

শ্রীমতী মাধুরী ঘোষ

১

এসেছে বর্ষা শ্রাবণের মেঘ গুরু গুরু ঐ ডাকে,
জমাট বেদনা এতদিন পরে,
অশ্রুর রূপে পড়িলগো ঝরে,
চেয়ে দেখ ঐ রূপসী ধরার নীল নয়নের ফাঁকে।
এসেছে বর্ষা শ্রাবণের মেঘ গুরু গুরু ঐ ডাকে॥

২

বিরলেতে বসি একাকিনী আজ কাঁদিছে অভাগী মেয়ে,
প্রিয়তম তার বসন্ত শেষে
ফিরে চলে গেছে আপনার দেশে,
কাটেনাক দিন আর যে তাহার আশাপথ চেয়ে চেয়ে।
বিরলেতে বসি একাকিনী তাই কাঁদিছে অভাগী মেয়ে॥

৩

ঢেকেছে গগন ঘন কালো তার এলায়িত কেশ পাশে,
যূথীকা-খচিত সবুজ আঁচল,
করেছে সিক্ত নয়নের জল,
ব্যথিত বক্ষ কাঁপিয়া উঠিছে আকুল দীরঘশ্বাসে।
ঢেকেছে গগন ঘনকালো তার এলায়িত কেশপাশে॥

৪

ক্ষণে ক্ষণে জাগে আশার আলোক তড়িতের রূপধরি,
প্রিরতম তার এলো বুঝি অই,
চমকি উঠে সে, "কই প্রিয় কই"—
কোথা প্রিয়তম? হৃদয় আবার আঁধারে গিয়াছে ভরি।
ক্ষণে ক্ষণে জাগে আশার আলোক তড়িতের রূপধরি॥

৫

কবে ফিরে এসে মুছাবে বধুর নয়নের জলরাশি—
নিজ অঙ্গের উত্তরী দিয়া,
কহিবে "আবার আসিয়াছি প্রিয়া"—
বিরহ-বিধুরা ধরণীর মুখে ফুটিবে সলাজ হাসি॥
কবে ফিরে তুমি মুছাবে বধুয়া নয়নের জলরাশি॥

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী এম্-এ

ফুটবল

এ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সব চেয়ে পুরাতন ফুটবল টুর্ণামেণ্ট আই, এফ, এ শীল্ডে প্রতি বছরই অনেক নামজাদা সিভিল ও মিলিটারী টীমের সাক্ষাৎ ঘটে। সে আজ বহুদিনের

বছরই সর্ব্বপ্রথম রয়েল আইরিস শীল্ড বিজয়ী হয়। এবার সুদূর পেশোয়ার, রাওলপিণ্ডি, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি জায়গা হতে বিশিষ্ট টীম সকল যোগ দিতে বর্ত্তমান এ দেশের ফুটবল ষ্ট্যাণ্ডার্ডের একটী সামান্য আভাস পাওয়া গেল। শীল্ড

আই-এফ-এ শীল্ড-বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্ক (১৯৩৫)
ফটো—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

পাকা বন্দবস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম দেখা গেলনা। মাত্র ১৯১১ সালে গোরা দল ইষ্ট ইয়র্ককে হারিয়ে মোহনবাগানের অপূর্ব্ব বিজয়ের পর আজ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় দল এই উচ্চ সম্মান লাভ করেনি। মোহন বাগানের বহু আগে এবং পরে স্থানীয় সিভিল টীমদের মধ্যে ক্যালকাটা ৯ বার, ডালহৌসী ও কাষ্টমস্ শীল্ড জয়ী হয়ে বাংলার ফুটবল খেলার অপূর্ব্ব গৌরব ক্রীড়ামহলে স্থাপিত করেছিল। কিন্তু গত সাত আট বছর ধরে এই সিভিল টীমদের দুর্দ্দশার সীমা নেই। আগেকার সেই মোহনবাগান, ক্যালকাটা, ডালহৌসী, কাষ্টমস্, রেঞ্জারস্ ও এরিয়ানসের মুগ্ধকর ক্রীড়ানৈপুণ্য আজ শুধু লোকমুখে শোনা যায়। মিলিটারী দলের বহু সুদক্ষ খেলোয়াড়ের অভাব না থাকাতে এবং খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড পূর্ব্বেকার চেয়ে অতি নিম্নস্থানে এসে পৌছতে বিশিষ্ট কলিকাতার টীম সকলকে অতি অনায়াসে পরাজিত করতে গোরা দলের বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

ইষ্ট ইয়র্ক বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ম্যাচ-এ গোলকিপার পটারকে রহিম চার্জ্জ করছে।

এবার সাংহাই হতে বিখ্যাত চৈনিক টীম শীল্ডে যোগ দেবার গুজব উঠতে ক্রীড়ামহলে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিল। অভিজ্ঞ Criticদের মতে বিলেতের ফুটবল ষ্টাণ্ডার্ডের পরেই সাংহাইএর উচ্চাঙ্গের ফুটবল খেলা চোখে পড়ে। এই চৈনিক দল বার্লিন অলিম্পিকে যোগ দিচ্ছে। সুতরাং সকলেই এক বাক্যে মেনে নিয়েছিল যে এবার শীল্ড শুধু বাংলার বাহিরেই নয়, ভারত ছাড়িয়ে চীনদেশে পৌছবে। "চাইনিজ টীম missing" হঠাৎ এই ভয়াবহবার্ত্তা একদিন সংবাদ পত্র বহন ক'রে নিয়ে এল। তখন শীল্ডের গোড়ার দিকটা আরম্ভ হয়ে গেছে। এই দুঃসংবাদে সকলেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। আর আই এফ এ কর্ত্তৃপক্ষদেরও জনসাধারণের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়া অন্য পথ রইল না। শীল্ডের গোড়ার দিকে কলিকাতার বিভিন্ন জুনিয়ার টীমগুলি, যেমন বৌবাজার, জর্জ্জটেলিগ্রাফ, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, টাউন প্রভৃতি প্রতিবছরই অতি সহজে বিদায় নিয়ে কাহারও মনে বিশেষ কিছু দাগ রেখে যায় না। জামসেদপুর প্রথম দিন ড্র করে পরের দিনে স্পোর্টিংএর কাছে হেরে যায়। সেই স্পোর্টিং আবার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা প্রমাণ করল লিস্টারের কাছে ৫ গোলে হেরে গিয়ে।

ঢাকার তিনটী দল উয়ারী, ভিক্টোরিয়া ও ঢাকা ফার্ম্ম সকলকে ক্ষুব্ধ করেছে। অতীতের কীর্ত্তির কলাপ সব বিস্মৃত হ'য়ে এরা কলিকাতার মাঠে নিজেদের এমন ভাবে অযোগ্যতা প্রমাণ করবে তা' অতি-বড় শত্রুও মনে করেনি। ভয় ও দুর্ভাবনায় জড়সড় হয়ে প্রায় বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই এই প্রথম নামজাদা টুর্ণামেণ্টে খেলতে নেবেছে তাদের খেলার চালচলনই তা প্রমাণ

করেছিল। একদিন এই উয়ারী ও ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্রীড়ামহলে কেবল উচ্চস্থান অধিকার করেই নয়, মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল টীম সকলকে খেলোয়াড় দিয়ে পুষ্ট করেছিল। সেই উয়ারী টীমকে "বি" ডিভিসনের ভবানীপুর দল ৪ গোলে পরাজিত করে। ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিংকে ২ গোলে হারাতে লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং বেশ বেগ পেয়েছিল। একাধিক টিম না পাঠিয়ে পূর্ব্ববঙ্গের উৎকৃষ্ট খেলোয়াড়দের

ইষ্ট ইয়র্ক-এর গোলকিপার পটার একটী অনিবার্য্যপ্রায় গোল বাঁচাচ্ছেন।
(এডভান্সের সৌজন্যে)

যোগাড় করে একটি উন্নত টিম পাঠালে ঢাকা ক্লাব সকলের কর্তৃপক্ষরা সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। এদের অগৌরবজনক পরাজয়ের পর নামজাদা West Kentকে ২ গোলে হারিয়ে [illegible]না স্পোর্টিং সকলকে বিস্মিত করে দেয়। দ্বিতীয় রাউণ্ডে মোহনবাগান সাক্ষাৎ করল পূর্ব্ব শত্রু ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাশায়ারকে। এক ম্যাচটি চ্যারিটি ম্যাচে পরিণত হয়েছিল। আগেকার সেই আশ্চর্য্য ক্রীড়া নৈপুণ্য ফিরে পেয়ে মোহনবাগান বিপক্ষ দলকে ৬ গোলে হারিয়ে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করে।

এতদ্দ্বারা ডুরাণ্ডের বিজেতা দলের বিশিষ্ঠ রেকর্ড ম্লান হয়ে যায়। সেদিনকার ম্যাচে নন্দ চৌধুরী, কুমার, করুণা ও হামিদের অতি চমৎকার খেলা দেখা গিয়েছিল। তৃতীয় রাউণ্ডে ভিজেমাঠে খুলনার আপ্রাণ চেষ্টাতেও দুর্দ্দান্ত মোহনবাগান ১ গোলে জয় লাভ করে। এবারের বাহিরের সিভিল টিমদের মধ্যে খুলনা তার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এদিকে আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ডকে হারিয়ে ভবানীপুর হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে উঠ্‌ল। সাদারল্যাণ্ড শীল্ড বিজয়ী হতে পারে এ ভুল ধারণা অনেকেরই ছিল। শুধু খেলার দোষেই তারা সেদিন হেরে গেল। চতুর্থ রাউণ্ডে ভবানীপুর শুকনো মাঠ পেয়েও ক্যালকাটার কাছে ৪ গোলে হেরে যায়। ই, বি, আরকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ক্যামেরনিয়ান তৃতীয় রাউণ্ডে পৌঁছল। প্রতি বিভাগে ভাল খেলে এবং বিপক্ষদল ই, আই, আর কে অধিকাংশ কাল বিপর্য্যস্ত করেও শেষ পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গলের পরাজয় ঘটল। শীল্ড খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের ভাগ্য কোনদিনই সুপ্রসন্ন নয়। প্রতি বছরই উত্তম টিম নিয়েও ২য় বা ৩য় রাউণ্ডে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। তৃতীয় রাউণ্ডে ক্যামেরনিয়ান চতুর ই, আই, আর এর নিকট হেরে যায়। কিন্তু ই, আই, আর ভয় ও ভাবনায় কাবু হয়ে পড়ল মহমেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলতে নেবে। কত নিকৃষ্ট খেলতে পারে ই, আই, আর ৪ গোলে হেরে গিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছিল। মহমেডান এই প্রথম শীল্ডে সেমিফাইনালে পৌঁছল। অন্যদিকে শুকনা মাঠে অসংখ্য জনসাধারণের প্রবল উৎসাহ নিয়ে ৪র্থ রাউণ্ডে মোহনবাগান

লিষ্টারের সঙ্গে খেলতে নাবে। মাঠে এত জনসমাগম হয়েছিল যে বেলা ২টার সময়ে গেট বন্ধ করতে হয়। সকলেই অন্তরে প্রবল আশা পোষণ করছিল যে, মোহনবাগান বুঝি আবার ফাইনালে উপনীত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ অসুস্থতার জন্য হামিদ খেলতে না পারায় টিমটি একটু দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। তারপর গোলকিপার কে, দত্তের অবিমৃষ্যকারিতাবশতঃ গোলপোষ্ট ছেড়ে বল ধরতে আসায় খালি পোষ্টে লিষ্টার গোল দেবার সুযোগ পায়। আপ্রাণ চেষ্টাতেও এই গোলটি শোধ করতে না পারায় মোহনবাগান ২-১ গোলে হেরে যায়। ইষ্ট ইয়র্ক বনাম ক্যালকাটা ম্যাচে রেফারী এস, ঘোষের কৃপায় ক্যালকাটা শেষের দিকে দুইটি পেনালটি পেয়ে দুইটি গোল শোধ করে। রেফারীর অন্যায় দানের বিরুদ্ধে ইষ্ট ইয়র্ক প্রবল প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। পরদিন ইষ্ট ইয়র্ক অনায়াসে ক্যালকাটাকে হারিয়ে উক্ত টিমের মেম্বারদের অন্যায় উৎসাহকে নিস্তেজ করেছিল। ভারতীয় নির্ব্বাণপ্রায় উৎসাহকে তখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিল মহমেডান স্পোর্টিং। সেমিফাইনাল চ্যারিটি ম্যাচে বিরাট জনসাধারণের সমক্ষে মহমেডান দল ইষ্ট ইয়র্ক দলের সম্মুখীন হয়। সেদিন বিরাট জনতার উৎসাহ ও উদ্দীপনা কলকাতায় মাঠে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠেছিল। ধৈর্য্য সাহস ও অসামান্য নৈপুণ্য সহকারে ইষ্টইয়র্কের অপরাজেয় গোলকিপার পটার সেদিন বিজয়োন্মত্ত মহমেডান স্পোর্টিংদের দুর্নিবার্য্য গোলগুলি রোধ করে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। মহমেডান স্পোর্টিং-এর সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল কিন্তু পটার বশ্যতা স্বীকার করেনি। খেলা শেষ হবার দশ মিনিট আগে মহমেডান গোলকিপার কালু খাঁকে আহত হয়ে মাঠ থেকে বিদায় নিতে হয়। তার পরেই মহমেডান স্পোর্টিং-এর শেষ প্রবল আক্রমণে ইষ্টইয়র্ক প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল।

মোহনবাগান বনাম লিষ্টার ম্যাচ-এর পূর্ব্বে দুই দলের ক্যাপ্টেন করমর্দ্দন করছেন। মধ্যস্থলে রেফরি ফ্লেচার।
(অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

খেলা শেষ হবার দু মিনিট আগে একটি পেনালটি কিক্ রোধ করতে রহিম অকৃতকার্য্য হওয়ায় হাজার কণ্ঠে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ উত্থিত হয়। ইষ্টইয়র্ক শেষ পর্য্যন্ত একগোলে জয়লাভ করে ফাইনালে যায়। অন্যদিকে মোহনবাগান-বিজয়ী লিষ্টার অতি নিকৃষ্ট খেলার ফলে ৩ গোলে লয়েলসের কাছে হেরে

যায়। প্রায় ২৫ বছর পরে সেই ১৯১১ সালে মোহনবাগানের হাতে পরাজয়ের পর পুর্ণ বিশ্বাস ও সাহস নিয়ে ইষ্টইয়র্ক এবার লয়েসকে ফাইনালে সাক্ষাৎ করে। সেদিন লয়েলস ক্রীড়া চাতুর্য্য হারিয়ে বসেছিল। প্রথমার্দ্ধে দুর্দ্দান্ত পটার দুই একটি বল রোধ করা ছাড়া নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। উভয় বিভাগেই উত্তম খেলে ইষ্ট ইয়র্ক এক গোলে লয়েলসকে পরাজিত করে শীল্ড জয়ী হয়। খেলার শেষে মাননীয় ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন পারিতোষিক বিতরণ করেছিলেন।

কাষ্টম বনাম এইচ্-এল-আই খেলায় কাষ্টমের গোলকিপার একটি সাংঘাতিক শট প্রতিরোধ করলেন। (এডভান্সের সৌজন্যে)
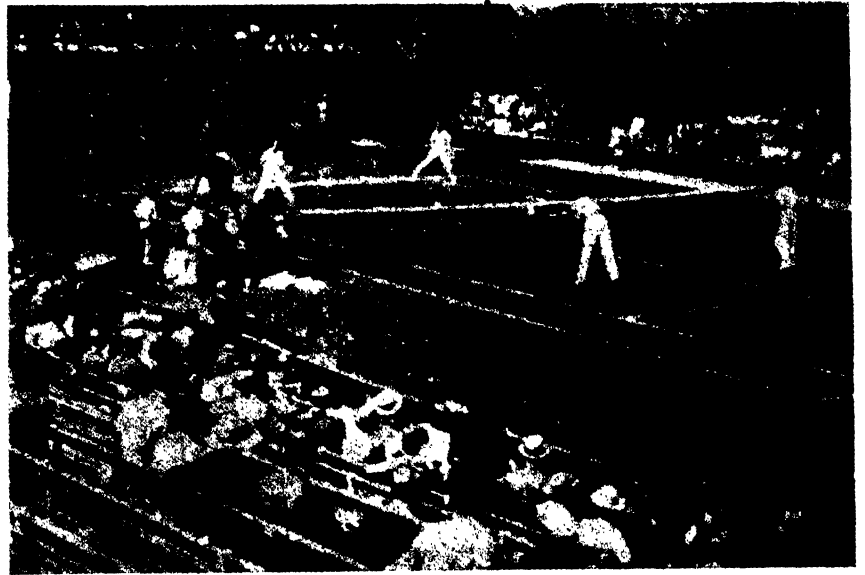
উইম্বলডন-এ ডেভিস কাপের খেলায় ইউনাইটেড ষ্টেটস-এর এ্যালিসান এবং ভ্যান্ রিণ-এর বিরুদ্ধে জার্ম্মেনীর ভন্-ক্র্যাম এবং লাগু খেলছেন।

টেনিস

ডেভিসকাপ—এবার ইউরোপ ইন্টার জোন ফাইনালে উঠেছিল জার্ম্মানী ও আমেরিকা। গত বছর ডেভিসকাপ বিজয়ী ফ্রান্স আমেরিকার কাছে হেরে যায়। অদ্বিতীয় ল্যাকোস্ত কোশে এবং সিঙ্গলস টুর্ণামেন্ট হতে বরোত্রা বিদায় নেওয়ায় ফ্রান্স টেনিস জগতে তার পূর্ব্ব কৃতিত্ব আর নূতন করে প্রতিষ্ঠা করতে পারছেনা। অতি উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তরুণ জার্ম্মানী দল এবার আমেরিকার বিরুদ্ধে খেলতে নেবেছিল। আমেরিকার তরুণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলোয়াড় বাজ´ উইম্বলডনের সেমিফাইনাল খেলায় জার্ম্মান বীর ভন ক্র্যামের কাছে হেরে গিয়েছিল। এবার বাজ´ প্রতিশোধ নিতে ভুল করলোনা ভন ক্র্যামকে ০—৬, ৯-৭, ৮-৬, ৬-৩ গেমে হারিয়ে। তারপর তরুণ হেন্‌কেলকে ৭-৫, ১১-৯, ৬-১, ৬-১ গেমে হারাতে বাজ´কে তত বেগ পেতে হয়নি। ভন

ক্র্যাম কিন্তু এ্যালিসনকে ৮-৬, ৬-৩, ৬-৪ গেমে অতি সহজে হারিয়ে দেয়। আবার এ্যালিসন ৬-১, ৭-৫, ১১-৯ গেমে হেঙ্কেলকে হারিয়ে জার্ম্মানীর সব আশা ভেঙ্গে দিল। আমেরিকা তখন ৩-১ গেমে জিতে চলেছে। ডাবলসে আমেরিকার চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড় এ্যালিসন ও ভ্যানরায়নকে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সাক্ষাৎ করেছিল ভন ক্র্যাম আর ল্যাণ্ড। সেদিন ৬০ গেমের পরও দুই দেশের যোদ্ধাদ্বয়ের খেলা শেষ হ'তে চায় না ; শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার বিজয়ী এ্যালিসন

এইচ ডাব্লিউ অষ্টিন ডেভিস কাপে ইংল্যাণ্ড-এর পক্ষে খেলছেন।

ও ভ্যান রায়ন ৩-৬, ৬-৩, ৫-৭, ৯-৭, ৮-৬ গেমে হারিয়ে দিয়ে ডেভিসকাপ চ্যাম্পিয়নে ইংলণ্ডের সাক্ষাৎ করল। ফাইনেল ম্যাচে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান পেরী ৬-০, ৬-৮, ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারিয়ে বার্জ্জকে নিরুৎসাহ করে দেয়। কিন্তু তার পর এ্যালিসনকে ৪-৬, ৬-৪ ৭-৫, ৬-৩ গেমে হারাতে পেরী সমস্ত ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিল। ইংলণ্ডের দুই নম্বর খেলোয়াড় অষ্টিন বনাম বার্জ্জের খেলার ফলাফলের উপর আমেরিকার সব আশা নির্ভর করছিল। বিজয়-নেশায় বিভোর হয়ে অষ্টিনের চমৎকার খেলা ডেভিসকাপের সব খেলাকে ম্লান করে দিয়েছিল। প্রথম দুইটী সেট অতি অনায়াসে অষ্টিন নিতে বার্জ্জের চৈতন্য হল। তৃতীয় সেটটী বার্জ উত্তম খেলে জেতে কিন্তু চতুর্থ সেটে অষ্টিনের প্রবল আক্রমণের কাছে দাঁড়াতে পারলনা। অষ্টিন ৬-২, ৬-৪, ৭-৫ গেমে জয় লাভ করে। তার পরেই এ্যালিসনকে পরাজিত করতে অষ্টিন অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেয়। খেলার ৪র্থ ও ৫ম সেটে হঠাৎ এ্যালিসন দুর্ব্বল হয়ে পড়তে অষ্টিন ৬-২, ২-৬, ৪-৬, ৬-৩, ৭-৫ গেমে অতিকষ্টে জয় লাভ করল।

ডাবলস্ ম্যাচেও আমেরিকার অবস্থা প্রায় সেইরকম দাঁড়াল। ব্রীটিস খেলোয়াড়দ্বয় হিউজেস ওটীকে এবারকার উইম্বলডনের ডাবলস্-ফাইনেলিষ্ট এ্যালিসন ও ভ্যান রায়ন ৬-১, ১—৬, ৬—৮, ৬—৩, ৬—৩ গেমে হারিয়ে এক অভিনব শক্তির পরিচয় দিল। ইংলণ্ড ৫—০ গেমে আমেরিকাকে ডেভিস-কাপে হারাল। এই রকম নিদারুণ পরাজয় আমেরিকার হাতে ইংলণ্ডের তিন চারবার ঘটেছে। তবে সেই বিজয়ী আমে-রিকার দলের টিলডেন, রিচার্ড, জনসন আজ আর কেউ নেই। ইংলণ্ডের খেলোয়াড় ফ্রেঞ্চচ্যাম্পিয়ানশিপ, উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশিপ এবং ডেভিসকাপে বিজয়ী হ'য়ে জগতে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়ের দেশ হিসেবে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাচ্ছে।

প্রফেসনাল চ্যাম্পিয়ানশিপ—

সাউথ পোর্ট ভিক্টোরিয়া পার্কে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুই বিখ্যাত প্রফেসনাল খেলোয়াড় ভাইনস্ ও টিলডেনের সাক্ষাৎ হয়। টেনিসে একদিন টিলডেন এক যুগান্তর এনেছিল। বহুবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান হয়ে আজও টিলডেন যে-কোন বিশিষ্ট খেলোয়াড়কে পরাজিত করতে অক্ষম নয়। টিল-ডেনের বয়সের অনুপাতে ভাইনস্ অনেক তরুণ সন্দেহ নাই। এই খেলায় নিজের চাতুর্য্যবলে ভাইনস্ ৬-১, ৬-৮, ৪-৬, ৬-২ ৬-২ গেমে টিলডেনকে পরাজিত করেছিল।

ক্রীকেট—

লর্ডস্ গ্রাউণ্ডে দ্বিতীয় টেষ্টে সাউথ আফ্রিকার কাছে পরাজয়ের পর ইংলণ্ডকে এক দারুণ দুর্ভাবনায় ভাবিয়ে তুলেছে। কাগজ কলমে যথেষ্ঠ আলোচনা হল, ইংলণ্ডের টীম সিলেক্‌সন নিয়ে। সুতরাং তৃতীয় টেষ্টে হোমস্, ফেরীমণ্ড ল্যাংগ্রীজ প্রভৃতি খেলোয়াড়েরা বিদায় নিল। তাদের স্থানে ইংলণ্ডের তরুণ খেলোয়াড়রা যেমন স্মিথ, বারবার, হার্ডষ্টাফ্ এই প্রথম টেষ্ট খেলার সুযোগ পেল। লীডস্ গ্রাউণ্ডে তৃতীয় টেষ্ট সুরু হয়। ইংলণ্ডের ক্যাপটেন ওয়াট টস্ জিতে স্মিথকে নিয়ে সাউথ আফ্রিকার ভিন্‌সেণ্ট ও ক্রীপসের মারাত্মক বোলিং-এর বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নাবল। যাদুকর ক্রীপসের হাতে ওয়াটের ১ রান না হতেই শেষ! বারবার আর অদ্বিতীয় হ্যামণ্ড এই দুঃসময়ে ইংলণ্ডের প্রাণে আশা ফিরিয়ে আনল সুন্দর খেলা দেখিয়ে। হ্যামণ্ডের ৬৩ রান সেদিনকার খেলায় একটী বিশিষ্ট ঘটনা। মিচেলের খেলাও বেশ প্রশংসাজনক হয়েছিল। তারপরই ইংলণ্ডের নিম্নগতি আরম্ভ হল। পর পর মূল্যবান পাঁচটি উইকেট মাত্র ২৫ রানে স্পিন্ বোলার ভিনসেণ্ট এবং ল্যাংটনের প্রচণ্ড বলে শেষ হয়। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে রান হল ২১৬। ইহার প্রত্যুত্তরে সাউথ আফ্রিকার স্কোর হল আরও চমৎকার। মিচেলের ৪ রানে আউট হবার পর সিভেল ও রোয়ানের মুগ্ধকর খেলা কিছুক্ষণের জন্য সকলকে আনন্দ দিয়েছিল। কিন্তু ওয়েড্ ক্যামেরন ডালটন ভিন্‌সেণ্ট প্রভৃতি ইংলণ্ডের দুর্দ্ধর্ষ বোলারের কাছে অতি সহজেই বিপর্য্যস্ত হতে হয়। সেই দুর্দ্দিনে রোয়ানের ৬২ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম ইনিংসে রান হল মাত্র ১৭১। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড ক্রিকেটের সত্যিকার পরিচয় দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াল। স্মিথের ৫৭ মিচেলের ৭২ আর বারবারের ৪২ রানে আফ্রিকার বিশিষ্ট বোলারদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল। এই উচ্চ স্কোরকে আরও বাড়িয়ে দিল হ্যামণ্ড এসে। হ্যামণ্ড ৮৭ নট্ আউট আর ওয়াটের ৪৪ রান সেদিনকার খেলায় ছিল সবচেয়ে বিশিষ্ট ঘটনা। ৭ উইকেটে ২৯৪ রান ইংলণ্ড ডিক্লেয়ার করে। তখন পরাজয়ের বিভীষিকা

লিডস্-এর টেষ্ট ম্যাচ-এ মিচেল অত্যাশ্চর্য্যরূপে সাউথ-এফ্রিকার ক্যাপ্টেন ওয়েড-এর বল লুপছেন।

সাউথ আফ্রিকার মন আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সাহস ও ধৈর্য্যের বলে সাউথ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে এক আশ্চর্য্যকর সাফল্যের পরিচয় দিলে! বিপক্ষ দলের বোলারদের দমন করে সাউথ আফ্রিকা ৫ উইকেটে ১৭৪ রান করে। মিচেল ৫৮ ওয়েড ৩২ নট্ আউট আর ক্যামেরনের ৪৪ রানের প্রভাবে সেদিন সাউথ আফ্রিকা পরাজয়ের হাত থেকে বেঁচে যায়। তার ফলে তৃতীয় টেষ্ট অমীমাংসিত থাকে।

তৃতীয় টেষ্টে ড্র করার ফলে ইংলণ্ডের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। এই টেষ্টে ইংলণ্ডের পরাজয় ঘটলে সাউথ আফ্রিকা রাবার পেয়ে যায়।

৪র্থ টেষ্টে ইংলণ্ড টীমে বেশ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। বহু টেষ্ট বিজয়ী ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় সাট্‌ক্লিফ ও অলরাউণ্ডার এমস্ দুঃখের বিষয় স্থান পেলোনা। বহুদিন পর টেট ও ডাকওয়ার্থ যোগ দিতে সকলে বিস্মিত হয়েছিল! প্রথম ইনিংসে ম্যাঞ্চেষ্টার ফিল্ডে ইংলণ্ডের মোট স্কোর হল ৩৫৭। বেকওয়েলের ৬৫ ও স্মিথের ৩৫ রানে ইংলণ্ডের সুদৃঢ় গোড়াপত্তন হয়। তারপর হ্যামণ্ড ও লেলাণ্ডের উচ্চস্কোরে সাউথ আফ্রিকার বোলাররা ক্রমে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। সপ্তম ব্যাটসম্যান রবিনস্ ক্লান্ত বোলারদের সব আক্রমণ ব্যর্থ করে ১০৪ রান করে এক অভিনব কৃতিত্ব প্রদর্শন করলে। কিন্তু ইংলণ্ডের এই উচ্চ রানের যোগ্য উত্তর দিতে সাউর্থ আফ্রিকা পশ্চাৎপদ হল না। ইংলণ্ডের দুর্দ্দান্ত বোলারদের অবজ্ঞা করে ভিলজেন অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিল ১২৪ রান করে। ক্যামেরণের ৫৩ ও ডালটনের ৪৭ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম ইনিংসে সাউথ আফ্রিকার রান হল ৩১৮। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডের অভিনব খেলায় জয়ের সম্ভাবনা দেখা গেল। মাত্র ৩ উইকেটে—২৩০ রানে ইংলণ্ড ডিক্লেয়ার করে। এবারও হ্যামণ্ডের উৎকৃষ্ট খেলা সকলকে মুগ্ধ করেছিল। সময় তখন খুব অল্প। সাউথ আফ্রিকায় ব্যাটস্‌ম্যানদের উপর এই টেষ্টে জয় পরাজয় নির্ভর করছে। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র দুই উইকেটে ১৬৯ রান করে সাউথ আফ্রিকা সকলকে বিস্মিত করে দিল। এই উচ্চ স্কোরই প্রমাণ করল ইংলণ্ডের খেলা শুধু ভাল বোলারের অভাবে কত হীনবল হয়ে পড়েছিল।

সাউথ এফ্রিকান ব্যাটসম্যান সিভ্যাল (ক্যাপ্টেন) এবং ওয়েড ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ষ্টেট-এ ব্যাট করতে যাচ্ছেন।

ইংলণ্ডের আশা এই খেলা অমীমাংসিত থাকায় নিষ্ফল হয়ে যায়।

সুইমিং প্রতিযোগিতা

সাঁতারে বাংলা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গত কয়েক বছর ধরে ওর্য়াল্ড অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বাংলার কৃতী সাঁতারুরা

মিচেল (সাউথ এফ্রিকা)

নির্ব্বাচিত হয়ে আসছেন। এই সেদিন পাঞ্জাবের বিশিষ্ট সাঁতারুদের নিয়ে লাহোর কলেজ কলকাতায় এসেছিল। স্থানীয় কয়েকটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুইমিং ক্লাবের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। এই প্রতিযোগিতায় কলেজ স্কোয়ারের সঙ্গে নিজেদের গৌরব পাঞ্জাব রাখতে অক্ষম হয়েছিল। কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের তরুণ ডি, দাসের অসামান্য সাফল্য এবারকার একটা বিশিষ্ট ঘটনা। মাত্র একমিনিট ৮½ সেকেণ্ডে ১১০ গজ ফ্রি ষ্টাইল সাঁতার এবং ৫ মিনিট ২৫⅗ সেকেণ্ডে ৪৪০ গজ ফ্রি ষ্টাইল সাঁতারে শীর্ষস্থান অধিকার করে। এক মাইল প্রতিযোগিতায়ও ডি, দাস প্রথম স্থান অধিকার করেন। দাসের এই সাফল্যে আশা করা যায় যে আগামী বছরে Berlin World Olimpic এ দেশের পক্ষ হতে এই তরুণ সাঁতারু নিশ্চয়ই নির্ব্বাচিত হইবেন। ২২০ গজে মামুদ আলি জয়ী হয়ে পাঞ্জাবের মান রাখেন। ব্যাক ষ্ট্রোক সাঁতারে সম্প্রতি পাঞ্জাবে অল ইণ্ডিয়ায় নূতন রেকর্ড করে মাজার আলি স্বপ্নেও ভাবেননি যে তরুণ জি, দের হাতে এমন ভাবে বশ্যতা স্বীকার করবেন। ওয়াটার পলো গেমেতেও বাংলা অদ্বিতীয়। ভারতে খুব অল্প দলই আছে যে বাংলার কোন বিশিষ্ট পলো টীমকে হারাতে পারে। খুব কম করে ১৩ গোলে কলেজ স্কোয়ার পাঞ্জাবকে হারায়।

কয়েকটি ফলাফল—

১১০ গজ ফ্রি ষ্টাইল—১। ডি, দাস, ২। ডি, মুখার্জ্জি
সময়—এক মিনিট ৮½ সেকেণ্ড।
১১০ গজ ব্যাকষ্ট্রোক—১। জি, দে ২। এল, ঘোষ
সময়—১মিনিট ৩০ সেকেণ্ড।
ওয়াটার পলো-বিজিতদল—ডি, মূলজী (৪ গোল), ডি দাস (৫ গোল), পি, কিকা (২ গোল), ডি, মুখার্জ্জী (১ গোল), এম, দে (১ গোল) পি, ঘোষ এন, দাস।
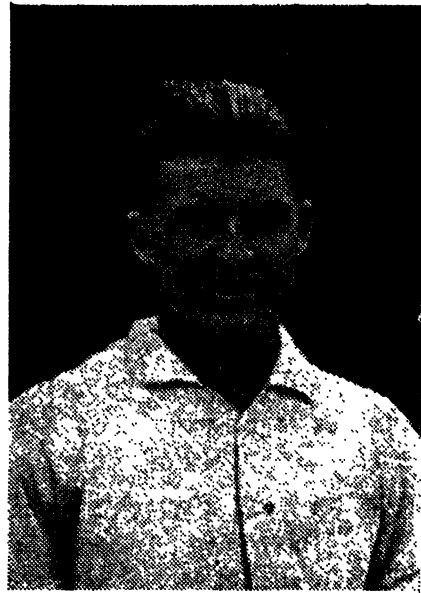
ব্যালাস্কাস (সাউথ এফ্রিকা)

ক্রীড়া জগতের খবর

অষ্ট্রেলিয়ার ক্রীকেট বোর্ড ভারতে অষ্ট্রেলিয়া টিমের কয়েকটি বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের অনুমতি না দেওয়াতে ক্রীড়ামোদীরা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছেন। ভারতের দূত ট্যারাণ্ট ভারতীয় ক্রীকেট বোর্ডকে জানিয়েছেন যে অষ্ট্রেলিয়া বোর্ডের নামঞ্জুরী বাতিল হবার সম্ভাবনা আছে। এ অবশ্য মন্দের ভাল। শিয়ালকোটের সন্নিকটে এক হকি ম্যাচে শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষেরা গণ্ডগোলের জন্য পুলিস ডাকতে বাধ্য হন। এই গোলযোগের ফলে ১৬ জন খেলোয়াড় এখন হাঁসপাতালে ভুগছেন। এইরূপ ব্যাপার কোথাও যাতে না হয় পাঞ্জাব হকি এসোসিয়েসন তার ব্যবস্থা করছেন। বোম্বের হারউড লীগ এতদিন পর শেষ হলো। লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ডারহাম টীম। লীগে কোন দলই ডারহামের বিরুদ্ধে গোল করতে সক্ষম হয়নি। ডারহামের কৃতিত্ব লীগের একটি রেকর্ড।

কলম্বো রোইং ক্লাব মাদ্রাজে এক বাইচ প্রতিযোগিতায় তিন লেংথে বিপক্ষ দলকে পরাজিত করেছে। তারপর এক মাইল বাইচ প্রতিযোগিতায় কলম্বো চ্যাম্পিয়ান ডে, পেরী ৪ লেংথে এ, হিলকে হারিয়ে দেন। ঐ দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে পেরীর সময় লেগেছিল ৭ মিনিট ৪৩ সেকেণ্ড।

সেদিন ইংল্যাণ্ডের হোয়াইট সিটি ষ্ট্যাডিয়ামে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ, ইউলে, হারভার্ড ভারসিটির বিশিষ্ট এ্যাথেলিটদের প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। এই প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশ ভারসিটি-৫ পয়েণ্টকে ডিঙ্গিয়ে আমেরিকা ইউনিভারসিটি—৬ পয়েণ্টে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ১০০ গজ দৌড়ে অক্সফোর্ডের ডানকান ১০ সেকেণ্ডে প্রথম স্থান ও ২২০ গজ দৌড়ে কেম্ব্রিজের স্থলিভান ১ মিনিট ৭½ সেকেণ্ডে জয়ী হয়েছেন। লংজাম্পে হারবার্ড ভারসিটির গ্রীন ২৩ ফিট ১১½ ইঞ্চ লাফান। পোলভল্টে ইউলের ব্রাউন ১৪ ফিট লাফান; একটা নূতন রেকর্ডে পরিণত হলো।

দুই মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় কুপার মাত্র ১২ মিনিট ৩৮½ সেকেণ্ডে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে জগতে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ১৯১১ সালে ডেনমার্কের রাসমুসেন ১২ মিনিট ৫৩½ সেকেণ্ডে পৌছে প্রথম রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

বাংলোরে জগৎ-বিখ্যাত "কোষে" "কয়েকটি একজিবিসন টেনিস ম্যাচ খেলেছিলেন। এই একজিবিসন খেলা কেবল ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রফেসনাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে হয়। স্থতরাং খেলা তত উচ্চাঙ্গের হয়নি। মাত্র দশ মিনিটে প্রথম সেটে রামশিয়াকে ৬-০ গেম দিয়ে ভারতীয় টেনিস ষ্ট্যাণ্ডার্ড কত নিম্ন পর্য্যায়ে পড়ে আছে তা স্মরণ করিয়ে দিল। পরের সেটে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ খেলা অমীমাংসিত থাকে।
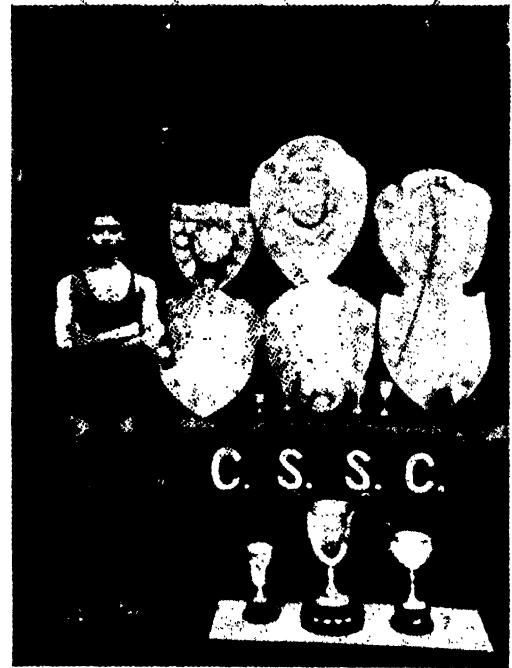
মাষ্টার দুর্গাদাস
ইনি কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবে সন্তরণে ১ মাইল ½ মাইল এবং ¼ মাইল এবং ২২০ গজ রেস-এ রেকর্ড স্থাপিত করেছেন।

নিউজিলাণ্ডে ভারতীয় হকি দলের সাফল্যের পরিচয় পেয়ে আই, এফ, এ এসোসিয়ানকে একটি বিশিষ্ট ভারতীয় দল কিছুদিনের জন্য পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছে। এই সাধু প্রস্তাব মঞ্জুর হলে ভারতের ফুটবলের স্থদিন এসেছে বুঝতে হবে।

বিলেতে ভারতীয় বনাম ব্রীটিস পলো দলের একটি এক্‌জীবিসন ম্যাচ হয়। ব্রীটিস দল কাশ্মীর টিমকে ৮-৬ গোলে

হারিয়েছে। কাশ্মীর দল পরাজয় স্বীকার করলেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

রজার্সকে ৬-৩, ৬-৩ গেমে পরাজিত করেছেন। মহিলা সিঙ্গলস্ ফাইনলে মিস্ লীলা রাও অসামান্য প্রতিভা প্রদর্শন করেছেন।

এমেরিকার ম্যানহাটান বীচ-এ মিস্ মারজুরীস স্মীথ।
(অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

জাপানে ডেভিসকাপ খেলোয়াড় জুরো আমাগিটান ইষ্ট অফ ল্যাণ্ড টেনিস টুর্নামেণ্টে ফাইনালে আইরিস চ্যাম্পিয়ান জর্জ্জ গতবছরের বিজয়িনী মিস ফেডার স্কটকে ৬-৩, ৬-২ গেমে পরাজিত করে এতদিন পর নিজের নাম রাখলেন।

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী

১১

বর! বর!

ঠাহর করিয়া দেখিয়া ভানুচাঁদ বলিল—হ্যাঁ, বরই বটে। বরের পাল্কী, কনের পাল্কী—আর ঐ শেষের পাল্কী মেরে চলেছেন বোধ হয় ওদের পুরুত মশায়—

ঘাটে ছিল একখানা ডিঙি, সেইটাই ঠেলিয়া সে স্রোতে ভাসাইয়া দিল। ঝুপঝাপ করিয়া তখন আরও আট দশজন জলে ঝাঁপাইয়া আসিয়া ডিঙিতে চড়িয়া বসিল। অত লোকের ভরে ডিঙি জলের উপর আঙুল তিনেক মাত্র জাগিয়া আছে। একটু এপাশ ও-পাশ করিলেই জল উঠে।

আকাশে চতুর্থীর ক্ষীণ চাঁদ। অনতিস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় রঘুনাথও ওপারের দিকে খানিকক্ষণ নজর করিয়া দেখিল। তারপর কহিল—বর না হাতী। না বাজনদার, না একটা বরযাত্রী—···আরে, একটা বোঠেও নিতে পারিস নি তোরা কেউ, হাত দিয়ে কাঁহাতক উজোন ঠেলে মরবি? বর—তা তোদের এত তাড়াতাড়ি কিসের? বরের ত দুটো শিং বেরোয় নি মাথায়!

ভানুচাঁদ মাঝনদী হইতে কহিল—বাজনা-টাজনা সব আগে ভাগে রওনা করেছে। বোঠে খোঁজাখুঁজি করতে গেলে এরাও সরে পড়ত ততক্ষণ। চুপি চুপি চলেছে কেমন—বারোয়ারীর চাঁদা-টাঁদা বলে পথে কিছু না দিতে হয়। মানুষ আজকাল কম সয়তান হয়ে উঠেছে!

কিন্তু আশ্চর্য্য, পাল্কী না পলাইয়া, ওপারের খেয়াঘাটে বটতলায় নামিল। ক্রমশঃ দেখা গেল, তিনখানাই পাশাপাশি খেয়ার উপর উঠিয়াছে। ভানুচাঁদেরা ডিঙি লইয়া আর আগাইল না; এবারেই আসিতেছে, তখন মোলাকাৎ ত নিশ্চয় হইয়া যাইবে।

খেয়া আগাইয়া আসিলে তাড়াতাড়ি পাশে ডিঙি লাগাইয়া দেখে, আগের বড় পাল্কীর মধ্যে চৌধুরী মহাশয় চুপচাপ বসিয়া। চৈত্র-সন্ধ্যায় মৃদু মধুর হাওয়া দিতেছে। জ্যোৎস্না-ধূসর নদীজল ছলছল করিয়া নৌকার নীচে আহত হইতেছে, নৌকা নাগর-দোলার মতো দুলিতেছে···ঢালিপাড়ার ঘাটে অনেক লোকের জটলা, তাদের প্রত্যেকটি কথাবার্ত্তা বেশ স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে; কিন্তু নরহরির লক্ষ্য কোনদিকে নাই, পাল্কীর মধ্যে স্থানুর মতো বসিয়া, ডিঙিটা আসিয়া খস্ করিয়া খেয়া-নৌকার গায়ে তাঁহার ঠিক পাশে লাগিল, তাহাও বোধকরি টের পাইলেন না। পিছনে শ্যামকান্ত ও মালাধর বাহিরে নৌকার গলুয়ের দিকে কাছাকাছি বসিয়াছিল। তাহারা ডিঙির দিকে একবার তাকাইয়া দেখিল, কিছু বলিল না।

খেয়া ঢালিপাড়ার ঘাটে গিয়া লাগিতেই কয়েকজনে কলরব করিয়া উঠিল।—কে?-কে? ভানুচাঁদ লাফাইয়া কূলে গিয়া নামিল। ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া সকলকে থামাইয়া দিল। ফিস ফিস করিয়া বলিল—চুপ চুপ!—চৌধুরী মশায়। অসুখ করেছে ওঁর।

সকলকে সরাইয়া রঘুনাথ আগে আসিয়া দাঁড়াইল। পাল্কী ঘাটের উপর নামাইতেই তাহাতে মুখ ঢুকাইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—খবর কি?

আর খবর! নরহরি খানিক ঠায় বসিয়া রহিলেন।—তারপর ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া পাল্কী ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। কি যে বলিবেন, কি করিতে হইবে, কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

চাঁদ অস্ত গিয়া ইতিমধ্যে চারিদিকে ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে নরহরির মুখের ভাবটা ঠিক ঠাহর হইল না বটে, কিন্তু দাঁড়াইবার সেই নির্ব্বাক ভঙ্গিতে রঘুনাথের বুকের মাঝখান অবধি মোচড় দিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—চৌধুরী মশায়, আমরা আছি কি করতে? তুমি বল, কি করতে হবে?

—কিছু না। বলিয়া নরহরি নিশ্বাস ফেলিলেন। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—শিবনারায়ণের বউ মেয়েমানুষ হয়েও এমন তদ্বির করে রেখেছে—কিছু আর করবার নেই, সর্দ্দার। পরের ভরসায় লড়তে গিয়ে আমার এই দশা।

সামনে অন্ততঃ পঞ্চাশ জোড়া চোখ নিঃশব্দে জ্বলিতেছে। মুখ তুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া নরহরি বলিলেন—হাঁ, পরের ভরসা বই কি। লাঠি ছাড়া আর সব কিছু আমার কাছে পর। আমায় ধরে নিয়ে গেল মামলা করতে। ওরা শিখিয়ে দিল, হলপ করে আদালতে বলে এলাম—তিন পুরুষ ধরে আমাদের চকের দখল—আমরাই আদায়-পত্তোর করছি—

ঢালীর দল একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—করছিই ত!

মৃদু হাসিয়া নরহরি বলিলেন—তা করছি; কিন্তু একটা কাছারী বাড়ী নেই। অথচ বলে আসা হল, চরের উপর মস্ত কাছারী বাড়ী—

—নেই, তা হতে কতক্ষণ?

নরহরি কহিলেন—কাল সকালেই তদন্তে আসবে, এই রাতটুকু পোহালে।

শ্যামকান্ত ম্লানভাবে কহিল—তদন্ত একটা হপ্তা সবুর করাবার চেষ্টা করা হল—তাও হল না।

রঘুনাথ পিছনে দলের দিকে একবার তাকাইয়া বলিল—তবু পুরো একটা রাত রয়েছে ত—কি বলিস তোরা? আচ্ছা ···চৌধুরী মশায়, আমরা চল্লাম।

তাহারা চলিল। পিছন হইতে নরহরি বলিতে লাগিলেন—অনেকদিনের কাছারী বাপু, রীতিমত পুরাণো। ঝাড়ের টাটকা বাঁশের চাল, আর নতুন খড়ের ছাউনী হলে হবে না। অনর্থক খাটনি—ওসব করতে যাসনে তোরা—। বলিতে বলিতে হঠাৎ কিন্তু এত উদ্বেগের মধ্যেও নরহরি হাসিয়া ফেলিলেন—বলিলেন,—মালাধর কাছারী পুরাণো করা যায় কেমন করে বলতে পার? দলিল পত্তোর ত চালের কলসীতে রাখ, কাছারী বাড়ী ত ঢুকবে না তোমার কলসীর মধ্যে।

চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঢালীরা নরহরির কথা শুনিল। মুখ ফিরাইয়া রঘুনাথ কহিল—চৌধুরী মশায়, মালাধর পারবে না, বলতে আমরা পারি—

নরহরি মুখ চাহিতে তার তীব্র চোখ দুটার দিকে নজর পড়িল।

রঘুনাথ বলিতে লাগিল—ঐ যে গাবগাছের ধারে আট-চালা ঘর দেখা যায়—ঐটে আমার। আমার ঠাকুরদাদা দক্ষিণের কারিগর এনে বড় সখ করে ঐ ঘর তৈরী করেছিলেন। পল-তোলা সুন্দরীর খুঁটি, রঙ-করা সাজ-পত্তোর, সেকেলে কাজকর্ম্ম—অমন আর হয় না আজকাল—

শ্যামকান্ত বলিল—তাতে কি হবে?

রঘুনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—তিন' শ ভূতে ঐ ঘর কাঁধে নিয়ে রাত্রের মধ্যে চরের উপর বসিয়ে দিয়ে আসবে।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে নরহরি কহিলেন—তারপরে?

—ঘরের পুরাণো বেড়া, পুরানো ছাউনী,···চাই কি মেজের উপর পুরাণো ভিটের মাটি আলগোছে বসিয়ে রাখা যাবে। হবে না?

এতক্ষণে মালাধরের কথা ফুটিল। বলিল—হবে না কেন? খুব হবে ফড় ফড় ত বলে গেলে, এখন পেরে উঠলে, নিশ্চয় হবে।

নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন—কিন্তু তোমার কি হবে?

—ভালই হবে। সহজ প্রশান্ত হাসি হাসিয়া রঘুনাথ বলিল—আমার লাভই হবে, পুরাণো দিয়ে নতুন পেয়ে যাবো। তুমি আমার নতুন ঘর বানিয়ে দিও।

শ্যামকান্ত তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তা দেব, নিশ্চয় দেব।

—আর, দেও দেও; না দেও না-ই দেও। ক্ষতি নেই বড়।

হঠাৎ কেমন এক ধরণের অর্থহীন হাসি হাসিয়া রঘুনাথ বলিল —কোন অসুবিধে নেই, কর্ত্তা। পরিবার মরেছে ওবছর, আর মেয়েটা গেল বর্ষার জলে ডুবেছে—ঘর দিয়ে আমার কি হবে বল?

তাজ্জব কাণ্ড। সকালে পথ-চলতি লোকেরা দেখিয়া অবাক হয়, কবে কখন এত সব ব্যাপার হইল। হঠাৎ বিশ্বাস হয় না, চক্ষু কচলাইয়া দেখিতে হয়, ব্যাপারটা স্বপ্ন কি না। কাল দেখা গিয়াছে, দিগন্তবিসারী বালুক্ষেত্র, আজ সেখানে প্রকাণ্ড কাছারী ঘর, চারিদিক ফিটফাট, মেজের আগাগোড়া সতরঞ্চি বিছানো, তার একপাশে নীচু তক্তাপোষ, জাজিম পাতা, হাতবাক্স,···সেহা, রোকড়, খতিয়ান, দাখিলার বহি... মালাধর এসব লইয়া মহা ব্যস্ত, হুঁকা-দানে সাজা তামাক পুড়িয়া যাইতেছে, একটা টান দিবার ফুরসৎ হইতেছে না। পৈঠার দক্ষিণে ডালপালা মেলানো কামিনীফুলের গাছ, দু-এক করিয়া ক্রমে কৌতূহলী গ্রামের লোক তাহার চারিপাশে ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় মাঠের মধ্যে পাল্কী।

—কে আসে? হাকিম?

—না না। ঐ যে হাঙ্গরমুখো ডাণ্ডা। ও ঠিক চৌধুরী মশায়।

পাল্কী হইতে নামিয়া ধীর মন্থর পদে কামিনীতলা দিয়া নরহরি চৌধুরী ফরাশে আসিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন। নূতন করিয়া তাওয়া চড়িল। খানিকক্ষণ নিবিষ্টমনে ধূমপান করিয়া গুড়গুড়ির নলটা নামাইয়া রাখিয়া চারিদিকের লোকজনের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া আবার তিনি পাল্কীতে চড়িলেন। পাল্কী এবার গ্রামের দিকে চলিল। তারপর আর এক কাণ্ড,— বেলা প্রহর খানেক হইতে আর এক ধরণের মানুষ গ্রাম হইতে ঢালিপাড়ার দিক হইতে আসিতে লাগিল। ইহারা সব কাজের মানুষ। কেহ আসিয়াছে খাজানার টাকা লইয়া, কেহ জমির সীমানার গণ্ডগোল মিটাইতে···মুহুরী দাখিলা লেখে, মালাধর টাকা বাজাইয়া হাত বাক্সে ফেলিয়া হুঁকার মাথা হইতে কলিকা নামাইয়া তাদের হাতে দিয়া বলে— তারপর? মোড়লগাতির বকনাজোড়া এনেছ নাকি, হরেকৃষ্ট? বেয়াই আজকাল বলে কি? মেয়ে পাঠাবে না পূজোতে?

নানা কথাবার্ত্তা কাজ কর্ম্মে ঘর গমগম করিতে থাকে।

—বা-রে কাছারী জমিয়েছে! পাতাল ফুঁড়ে উঠল নাকি?

যারা কাজকর্ম্মে আসা যাওয়া করিতেছে, পথের লোকের মন্তব্য শুনিয়া তারা রাগিয়া ওঠে।—কোথাকার লোক হে তোমরা! তিন পুরুষ ধরে এখানে খাজনার লেন দেন হচ্ছে··· আর বলে কি না—

বড় জোর দুপুর নাগাত হাকিম মহাশয় পৌছিয়া যাইবেন, এই প্রকার কথা ছিল। শ্যামকান্ত সেই দুপুর হইতে বসিয়া আছে। হাকিমের পৌছিতে কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গেল। এবং সম্বর্দ্ধনার প্রথম প্রস্থ শেষ হইতে রাত্রি এক প্রহর।

খুশীমুখে ডেপুটি বলিলেন—এ কি করেছেন শ্যামকান্ত বাবু! না, না, এ ভারী অন্যায়। এত সবের কি দরকার ছিল বলুন তো!

কিছু না—কিছু না—শ্যামকান্ত বিনয়ে ঘাড় নাড়িতে লাগিল। বলিল—নানান অসুবিধে এ জায়গায়। মনে ত কত ইচ্ছে হয়, কিন্তু সে কি হবার জো আছে?···মালাধর, আর দেরী কোরো না, কাগজপত্তোর বের করে ফেল—একটা একটা করে সব দেখিয়ে দাও। আমি এখানে কিন্তু বেশী রাত করতে দেব না স্যর, তা আগে থাকতে বলে রাখলাম। পাল্কী-বেহারা ঠিক রয়েছে, হুকুম হলেই ডাকবাংলায় পৌছে দিয়ে আসবে।

ডেপুটীর মুখে হাসি আর ধরে না। বলিলেন—পাল্কী আছে নাকি? আপনার সব দিকে লক্ষ্য শ্যামকান্ত বাবু। সত্যি বড় ভাবনা হয়েছিল, এই ঘুরকুট্টি অন্ধকার—ঘোড়ার পিঠে এই সময় এতদূর যাওয়া...আর রাস্তাঘাটের যা দশা দেখে এলাম—বড় মুস্কিল হত তাহলে। ডাক বাংলায় গিয়ে একবার পৌছুতে পারলে আর অসুবিধে নেই—লোকজন সমস্ত নিয়ে এসেছি—

শ্যামকান্ত বলিল—সে জানি। সমস্ত খবর এসেছে আমার কাছে। আপনার খানসামা বেয়ারারা নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে এতক্ষণ।

—ঘুমুচ্চে ? তার মানে ?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া শ্যামকান্ত বলিল—বসে বসে কি করবে বলুন। ডাকবাংলা সরকারের ; কিন্তু আশপাশের এলাকা ত আমার। আমার লোকজন গিয়ে শাসাতে লাগল—'পড়েছ শমনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' রান্নাঘর থেকে ওদের তাড়িয়ে দিয়ে, আমরাই সব দখল করে ফেলেছি। খানিকক্ষণ বসে বসে অবাক হয়ে তারা কাণ্ড কারখানা দেখল, শেষে হাই উঠতে লাগল, আমার লোক তাড়াতাড়ি বিছানা করে দিল, ওরা ক্ষিদে করবার জন্য একটু একটু আদা জল খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

বলিয়া নিজের রসিকতায় সে সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু মালাধর কাগজপত্রে হাত না দিয়া অকস্মাৎ ত্রস্তভাবে উঠিয়া বরকন্দাজদের হাঁকাহাঁকি লাগাইল।

—কি হল ?

—ঘোর হয়ে গেছে, হুজুর এইবার কাজে বসবেন। এখনো মশালগুলো জ্বালাচ্ছে না। দেখুন ত বেটাদের কাজ—

কিন্তু বসিবেন কি, হুজুর অবাক হইয়া দেখিতেছেন, সমস্ত মাঠ আলো করিয়া একের পর এক বিশ-পঁচিশটা মশাল জ্বলিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন—ব্যাপার কি শ্যামকান্ত বাবু ?

নিতান্ত লজ্জিত হইয়া শ্যামকান্ত বলিতে লাগিল—ঐ যে বললাম আগে, একটু তাড়াতাড়ি করে নিতে হবে। জায়গাটা বড্ড খারাপ। রাত্তিরে বাদার যত কেউটে সাপ উঠে এসে ঐ মেজের উপর, খাটের পায়ার কাছে, দেয়ালের উপর···সমস্ত জায়গায় কিলবিল করে বেড়ায়। সেবার হল কি,···নিবারণ মুহুরী রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ঢ্যাড়স কুটছে ; ঝুড়ির মধ্যে মা মনসা; তরকারী বের করতে গেছে, অমনি দিয়েছে ঠুকে। সে বিষ মোটে সাহায্য হল না। সাবধানের মার নেই, তাই ঐসব আলোর ব্যবস্থা করেছি। না না স্যর আপনি ব্যস্ত হবেন না···আলো দেখে সাপ বাদা থেকে না-ও উঠিতে পারে।

হাকিম ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতার ফিতা বাঁধিতে লাগিয়াছেন। বলিলেন—পাল্কী ডাকুন। আজকে এসব থাক। কাল এসে সমস্ত তদারক করা যাবে।

মালাধর অতি সাবধানে আগে আগে আলো লইয়া চলিল। শ্যামকান্ত হাকিমকে বড় পাল্কীতে তুলিয়া নিজে ছোটটায় উঠিয়া বসিল। সে রাত্রি শ্যামকান্তও ডাকবাংলায় কাটাইল।

সকাল বেলা মিনিট দশেকের মধ্যে তদন্ত হইয়া গেল। উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া সাক্ষ্য লইয়া ডেপুটি ঘোড়ায় উঠিতে যাইতেছেন, শ্যামকান্ত আসিয়া নিবেদন করিল—পাল্কী রয়েছে, আর একবার সরেজমিনে কাছারী বাড়ীর দিকে গেলে হত না ?

হাকিম বলিলেন—কেন, কাল ত তদন্ত সেরে এসেছি।

নমস্কার করিয়া তিনি ঘোড়া ছুটাইলেন। হাকিমের সাঙ্গোপাঙ্গেরাও বিদায় হইল। শ্যামকান্ত ও মালাধরের মধ্যে চোখোচোখি হইল একবার। মালাধর বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ,—এইবার ঠিক হয়েছে, বড় বাবু—ষোল আনা তদ্বির হয়েছে—সৌদামিনী ঠাকরুণ পেরে উঠলেন না এবার—

ফলেও হইল তাই। মামলা ডিশমিশ হইল। যেহেতু বরণডাঙার তরফ হইতে সখীসোনা নামক চক একটা কেনা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জমি এসমস্ত নয়। নরহরি চৌধুরীর পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি মিথ্যা করিয়া ঐ চকের মধ্যে পুরিয়া যোগ-সাজসে তাহারা নিরীহ নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে হয়রানি করিতেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোজ বসু

আধুনিক পোর্ত্তুগীজ্ কবিতা

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

বিশ্বকে ঘরের মধ্যে এনে পুরে রাখার আগ্রহটা বর্ত্তমানে বাঙালি মনের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেচে। এটা সুস্থ ও সবল মনের লক্ষণ একথা বল্‌তেই হবে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যের মধ্য দিয়েই এই ভাবের প্রকাশ অধিক পরিমাণে দেখ্‌তে পাই। দেখ্‌তে পাই—জাতি-দেশ-কাল-পাত্র সব সেখান থেকে ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে প্রাণ প্রসারতা লাভ করুচে, একটা অনন্তের—অসীমের অভিব্যঞ্জনা জন্মলাভ করুচে। দুই পক্ষপুট বিস্তার করে সমগ্র বিশ্বকে সে আলিঙ্গন করুতে চায়; বল্‌তে চায়—আমার বাণী তুমি লও, তোমার বাণী আমার মর্ম্মকোষে শতদলের মতো বিকশিত হয়ে উঠুক্।

এই যে একটা সার্ব্বজনীন ভাব, বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতানোর আগ্রহ—এই হলো এ-যুগের সাহিত্যের বিশেষত্ব। বিংশ-শতাব্দীর তরুণ বাঙালি-মন এই বিশেষত্বকে কেন্দ্র করে'ই আপনার সমস্ত সৃজনীশক্তি বিনিয়োগ করেচে। কিন্তু পোর্ত্তুগীজ সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলা-সাহিত্যের কোনো বিশেষ যোগ আছে,—এসঙ্গে একথা বল্‌তে পারুলে সত্যি আনন্দ হতো। আজ পর্য্যন্ত গুটি কয়েক ছোটগল্প বা এক-আধটি কবিতার অনুবাদ করেই আমরা একটা দেশের গোটা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের বড়াই করুচি। অথচ বর্ত্তমান পোর্ত্তুগীজ্ সাহিত্য—বিশেষ করে পোর্ত্তুগীজ্ কাব্য-সাহিত্য আলোচনা করুলে দেখা যাবে, ফরাসী বা রুষ কাব্য-সাহিত্যের চেয়ে তা ঢের ঐশ্বর্য্যশালী।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন উঁচু-দরের পোর্ত্তুগীজ কবি পৃথিবী থেকে সরে পড়েন। Anthero de Quental-এর অসামান্য প্রতিভা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। তারপর প্রায় তিন চার বছরের মধ্যে Francisco Gomes de Amorim, Joao de Deus, Thomas Ribeiro প্রভৃতি ক্ষমতাশালী কয়েকজন কবি লোকান্তরিত হন (১৮৯৬—১৯০০)। যা হোক্—পোর্ত্তুগীজ্ কাব্য-সাহিত্যের এই প্রভূত ক্ষতির পরও তার কাব্য-জগতে দৈন্য উপস্থিত হয়েচে—একথা কিছুতেই বলা চলে না। পোর্ত্তুগীজ্‌রা চিরদিন তাদের কাব্য-সাহিত্যের বড়াই করে' এসেচে এবং করবার ক্ষমতা রাখে। কথা সাহিত্যে তারা স্পেনিশ্‌দের মতো উঁচুদরের সৃষ্টির অধিকারী হ'তে পারে নি বটে, কিন্তু কাব্য-সাহিত্যে তারা যে স্পেনিশ্‌দের ছাড়িয়ে যেতে পেরেচে, একথা স্পেনের একজন বড়ো সমালোচকই (Don Miguel de Unamuno) স্বীকার করেচেন। তিনি জোরের সঙ্গে পোর্ত্তুগীজ সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগটিকে 'Golden Age of Portuguese Literature' বলে আখ্যা দিয়েচেন। বর্ত্তমান কবিদের ভেতর Joao de Deus কিম্বা Quental-এর মতো উঁচুদরের কবি প্রতিভার অভাব হতে পারে, কিন্তু পোর্ত্তুগীজ কাব্য-সাহিত্যের বর্ত্তমান পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করুলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে' কাব্য-সাহিত্যের যে ধারাটি সুন্দরভাবে প্রবাহিত হয়ে আস্‌চে, সে-ধারা একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

সমসাময়িক পোর্ত্তুগীজ কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা করুতে গেলে প্রথমেই Abilio Guerra Junqueiro-র নাম করুতে হয়। তিনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে অনেকে 'পোর্ত্তুগীজ্ ভিক্তর্ হ্যুগো' বলে' অভিহিত করে' থাকেন। তাঁর ভেতর এই শ্রেষ্ঠ ফরাসী-কবির কতকগুলো দুর্ব্বলতা আছে, একথা সত্য; কিন্তু তাঁর প্রতিভার অংশও তিনি বিশেষভাবে লাভ করেচেন। অনেক সময় তিনি

তাঁর কবিতার ভেতর political revolutionary ideas এনে তাঁর আসল কাব্য-রসকে ডুবিয়ে মারেন। একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক এ-সম্বন্ধে বলেচেন—"He declaimes against the 'brigand called the Law', against the 'crass *bourgeoisie*', against priest and King. At such times no word or expression is too ugly, too vulgar, to be admitted by his undiscerning Muse...But when least expected, true poetry breaks once again into being, as a flowing almond-tree in a grey February.' এই ভাবটি *A Velhice do Padre. Eterno*-র মতো দু' একটি লম্বা Satire-এর ভেতর মাঝে মাঝে দেখা যায়। তাঁর *Patria*-র মতো 'gloomy political play' পড়্তে পড়্তেও হঠাৎ এক এক জায়গায় পোর্ত্তুগ্যালের সুন্দর সজীব চিত্র আমরা পাই—,

Campos claros de milho moco e trigo loiro
Hortas a rir, vergeis noivando em fructa d'oiro,
Trilos de rouxinoes, revoada de andorinhas,
Nos vinhedos pombaes, nos montes armi-
dinhas," ইত্যাদি।

এ রকম বহু চিত্র আমরা দেখ্তে পাই *Finis Patria*-তে। সারল্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতি Junqueiro-র একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, সেইটিই তার প্রত্যেক কথার ওপর এক অনুপম মাধুর্য্যের ছাপ রেখে দিয়েচে। *Finis Patria*-কে কবি নিজে তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েচেন, যদিও *A Musa em Ferias, A Morte de Dom Joaõ, Os Simples* বলে' তাঁর আরো ক'খানা ভালো কবিতার বই আছে।

"E negra a terra, e negra a noite, e negro o luar,
Na escuridaõ, ouvi! ha sombras a fallar."

এই দু'টি লাইন দিয়ে *Finis Patria*-র সুরু করা হয়েচে এবং এই অনন্যকরণীয় আরম্ভের সুরটি সমস্ত বই-খানার ভেতর ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাতে আছে—দরিদ্র কৃষাণের বেদনার সুর, মজুরের দুঃখের গান, জেলে, বেদে, জেলের কয়েদী, কয়লার খাদের কামীনদের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস,—রুগ্ন পঙ্গু, শীর্ণ মানবাত্মার সকরুণ আর্ত্তনাদ। তাতে আছে—ধ্বংসোন্মুখ দুর্গ, পাঁজর-বার-করা মন্দির, ঝড়ে-পড়া কুটীর, ভূমিকম্পে-বসে'-যাওয়া সমাধিস্তম্ভের কাহিনী; কত যুগযুগান্তরের বিদ্যাপীঠের কথা, ধর্ম্ম-বিহারের কথা,—আরো কতো কী!

Junqueiro-র কাব্যে কেবল অন্তঃপ্রকৃতির নয়, বহিঃপ্রকৃতিরও খণ্ড খণ্ড চিত্র আমরা সন্নিবিষ্ট দেখ্তে পাই, এবং তা থাকাই স্বাভাবিক। কেননা বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির নিত্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান। মানব আজন্মকাল ধরে বহিঃপ্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাত সয়ে আস্চে। কেবল মানব-দেহ নয়, তার মন, তার আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সমস্তই বহিঃ-প্রকৃতির দ্বারা কতক পরিমাণে নিয়মিত হ'য়ে আস্চে। অতএব গীতিকাব্যে অন্তঃপ্রকৃতির ছবি আঁক্তে হলে' বহিঃ-প্রকৃতিকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। উপেক্ষা কর্লে সে-চিত্র অসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম হয়ে পড়ে।

বলা বাহুল্য Junqueiro-র চিত্রগুলো সুসম্পূর্ণ; তাতে যে প্রকৃতির বর্ণনা আছে, তার ভেতরে কবি-অন্তরের ছায়া মিশিয়ে আছে। *A Morte de Dom Joaõ*-তে জল-স্থল-অন্তরীক্ষের যে-বর্ণনা আছে,—তা সমস্তই প্রায় কবিহৃদয়ের দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে একসুরে বাঁধা।

A Morte de Dom Joaõ-র শেষ লাইন কটিতে আছে,—

"Parou a Ventania.
As estrallas, dormentes, fatigadas,
Cerram a' luz do dia
As mysteriosas palpebras doiradas.
Vae despontando o rosicler da aurora;
O azul sereno e vesto
Eempallidece e co'ra,
Como se Deos lhe desse
Um grande beijo luminoso e casto.
A estrella da manha
Na altura resplandece;

Ea cotovia, a sua linda irma,
Vae pelo azul um cantico vibrando,
Tao limpido, tao alto que parece
Que e a estrella no ceo que esta cantando."

ঝড়ের মাতন থেমেছে।
রাত্রির বিনিদ্র প্রহর জেগে' জেগে' শ্রান্ত-ক্লান্ত তারাগুলি আলোর আগমনে ঘুমিয়ে পড়েচে। তাদের মায়া-ভরা সোনার চোখের পাতাগুলি নিবিড় শান্তিতে মুদে' আছে।
রাত্রির কালো যবনিকা পার হয়ে' ধীরে ধীরে আলোর শিশুগুলি হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আস্‌চে, আকাশের ও-পার বেয়ে।
এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশের অতল নীল-সমুদ্র আলোর চুম্বনে রঙের আবীর-মাখা হয়ে উঠ্‌লো।
আকাশ-অঙ্গনে যখন এই নরম আলোটি ছড়িয়ে পড়্‌ছিল, তখনো একপাশে প্রভাতের শুকতারাটি মিট্ মিট্ করে' জ্বল্‌ছে।
ছোট্ট একটি গেয়ো-পাখী—শুকতারাটির ছোট বোন্‌টি যেন—নীল-আকশের তলে উড়ে' উড়ে' সঙ্গীতের অমৃত-ধারা পরিবেশন কর্‌চে;
—সে বাতাসের অনেক ওপরে আছে, আকাশের কাছাকাছি;
তবু সে-সুর শোনা যায়—অতি সুস্পষ্ট;
মনে হয় যেন প্রভাতী-তারার গান শোনা যায় বুঝি!

Finis Patria-র গম্ভীর সৌন্দর্য্য-ভরা গোড়ার পঙ্‌তি কয়টি বইখানা পড়্‌তে গেলে বার বারই পাঠকের মনে ঘুরে-ফিরে' বাজ্‌তে থাকে,—হ্যুগোর *Les Miserables*এর সেই বুড়ো মালীর গভীর রাতের ঘণ্টাধ্বনির মতো। খুব সম্ভব পোর্ত্তুগীজ্ জীবিত কবিদের মধ্যে Guerra Junqueiro-র মতো কেউ নিরাশা ও বেদনার গান এমন উদাত্ত সুরে গাইতে পারেননি। তাঁর নর নারীরা দরিদ্র, নিরন্ন, অসহায়—কিন্তু এই অসহায়তার জন্য কোনো বড়ো অভিযোগ নেই। তিনি কেবল জলো তিক্ত দুঃখবাদই প্রচার করেন নি, এই দুঃখ মানুষকে কত বড়ো করেছে, তারই গান করেছেন। Junqueiro-র কবিতা, পরাভূত ব্যর্থ মানুষের বৃহৎ চিত্র; Junqueiro বিফল জীবনের কবি। মানুষের সমস্ত বিফলতার প্রতি তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি; দুর্ব্বলতার প্রতি অপার করুণা। তাঁর নর-নারীরা জানে, তাদের কী অবস্থা, বৃহৎ মানব সমাজের তারা কোন্ পঙক্তির পর্য্যায়ভুক্ত; কিন্তু তা নিয়ে কোনো অ-দেখা বিধাতার কাছে প্যান্ প্যান্ করে অভিযোগ জানায় না। তারা ছেঁড়া কম্বল গায়ে জড়িয়ে, রুটিশূন্য থালা, মদ্যশূন্য পাত্র সাম্‌নে রেখে কাষ্ঠ অভাবে অগ্নিশূন্য চুল্লীর ধারে বসেও গান গায়,—আর সে-গানে যে আশার সুর থাকে, তাকে আদৌ দুঃখের আবেদন বলা চলে না।

এক জায়গায় তিনি মজুর জীবনের যে মর্ম্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছেন, তার খানিকটা এরূপ:

"A fome e o frio, a dor e a usura,
O vicio e o crime...ignobil sorte!
Oh vida negra! Oh vida dura!
Deus, quem consola a desventura?
A Morte."

অনাহারে, শীতে আর শোকে,
অন্যায় পথে অর্থোপায়ের দুঃসাহসে,
ব্যাধি, ব্যভিচার আর পাপের মাঝে
তারা অতিকষ্টে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি আগ্‌লে আছে!
তাদের এই অন্ধকার দুঃসহ জীবনের মাঝে কি কোনো শান্তির পরিসমাপ্তি নেই?
আছে—আছে; সে মৃত্যু!

এমনি তাদের জীবন; মৃত্যু এসে যদি তার তুহিন-শীতল স্পর্শ না ছোঁয়ায় তাদের জীবনে, তাহলে তারা চিরদিন এমনি করেই বাঁচবে, জীবনের কারাগারে বসে' মৃত্যুর উপাসনা কর্‌তে কর্‌তে; আর কোনো প্রতিকার নেই।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, বাঙ্‌লা কাব্য সাহিত্যে আজকাল যে একটি নতুন সুর বাজ্‌ছে, Junqueiro-র কবিতার সুরের সঙ্গে তার অনেকখানি ঐক্য আছে। পীড়িত ও অবনমিত মানবাত্মার আর্ত্তনাদ আজ সকল দেশের শিল্পী মনকেই আঘাত করেছে; তাই সকল দেশের সাহিত্যের মাঝেই আমরা দেখ্‌তে পাই,—ভুয়ো ক্লাসিসিজ্‌মের মন্থরতা, স্থবিরতা ও অসার বৈরাগ্য সাধনা নেই; জীবনের অদম্য পিপাসা, অপ্রকাশকে প্রকাশ করার আকুল আকূতিতে আপনাকে প্রসারিত করে দেবার বিপুল প্রয়াস,—দুঃখভোগের নয়, দুঃখবোধের গভীরতার ভেতর দিয়ে জীবনের রহস্যের সন্ধান।

Junqueiro সামুদ্রিক শীকারীদের যে ভয়শঙ্কুল জীবনের চিত্র এঁকেছেন, তাতে আমরা দেখতে পাই,—অপূর্ব্ব কাব্য-রসের সঙ্গে শিকারিদের বৈচিত্র্যময় জীবনের সুর সুন্দরভাবে মিশে' আছে। এক জায়গায় এরূপ :

"Mar de tormenta, mar que rebenta,
Convulso mar!
Noites inteiras, noites inteiras,
Nas praias tristes ha lareiras
Com maes e noivas a resar.

হে অশান্ত অম্বুধি! ঝটিকা ক্ষুব্ধ সমুদ্র!
হে চঞ্চল জলধি!
রাত্রির পর রাত্রি—রাত্রির পর রাত্রি
তোমার বেলা-ভূমে বসে' প্রসারিত জীবনের স্বপ্ন দেখেছি;—
সে-বালুবেলায় মিশে' আছে কত মাতা ও স্ত্রীর ভীরু অন্তরাত্মার মিনতিব্যাকুল প্রার্থনা।

Eugenio de Castro আর Junqueiro-র কবিতা সমগোত্রের নয়, সম্পূর্ণ আলাদা। কাস্ত্রোর কবিতার মধ্যেও একটা অশান্ত ভাব, একটা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মত্ততা আছে বটে, কিন্তু সে মত্ততা বর্ত্তমানের কোনো Problem বা সমস্যা নিয়ে নয়, বর্ত্তমানের কোনো প্রশ্ন তার কাব্যে বড়ো হয়ে ওঠেনি। কাস্ত্রোর কাব্য-জীবনের সুরু থেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত আমরা বহু বিভিন্নতা ও বিচিত্রতার ভেতর দুটি ধারা স্পষ্ট দেখতে পাই। এই দুটি ধারা ঠিক গঙ্গা যমুনার মতো এক সময়ে পাশাপাশি বয়ে চলেছে। এক ধারাতে কাস্ত্রোকে দেখতে পাই—নিজের অন্তরের মায়ামরীচিকার শীকারি কাস্ত্রো; আর এক ধারাতে দেখতে পাই—তার সমস্ত মনটি একটি সূর্য্যমুখী ফুলের মতো অতীতের পানে মুখ ফিরিয়ে আছে। এই শেষোক্ত মন নিয়েই তিনি বহুসংখ্যক Greek epigram ও গ্যেটের কবিতার অনুবাদ করেছিলেন।

কাস্ত্রোর প্রথম কবিতার বই ১৮৮৪ সালে বেরোয় এবং তার পর থেকে প্রতি বছরেই অন্ততঃ একখানা করে ছোট বই বেরোচ্ছে। আধুনিক পোর্ত্তুগীজ কবিদের মধ্যে লেখার প্রাচুর্য্যের দিক দিয়ে কাস্ত্রোর স্থান সর্ব্বপ্রথমে বলে কথিত। অথচ, প্রাচুর্য্যের স্রোতে তাঁর বৈশিষ্ট এতটুকুও ভেসে যায়নি। তিনি এত ছোট-বেলা থেকে কবিতা লিখতে সুরু করেন যে, তখন তাঁর বানান-জ্ঞানও অপর্য্যাপ্ত ছিল।

কাস্ত্রোর কবিতা বেশীর ভাগই sensuous ও vibrating with passion,—দু'টোই শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রধান লক্ষণ, যদি তার ব্যবহারিক-ক্ষেত্রে সংযমযুক্ত থাকে। কাস্ত্রোর কবিতাই তার প্রমাণ। ফরাসী কবি-ঔপন্যাসিক থিওফিল গ্যতিয়ে-র (Theophile Gautier) *Mademoiselle de Maupin* গদ্য-কাব্যের মতো কাস্ত্রোর বর্ণনাগুলোও চিত্র-করের বিশেষ মুহূর্ত্ত-প্রসূত, জীবন্তবৎ প্রতীয়মান আলেখ্যের চেয়েও সজীব ও শক্তিশালী বলে বোধ হয়। এক কথায় বলা যায়, কাস্ত্রোর কবিতা আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় সজাগ করে। কোনো ভূষাড়ম্বর নেই, বর্ণচ্ছটা নেই,—আছে একটি সুমধুর নিবিড়তা, আছে appeal।

কাস্ত্রো *Oaristos* এর ভূমিকায় বর্ত্তমান পোর্ত্তুগীজ কবিতার 'hackneyed' আস্থার জন্য, তার 'thinness of themes' ও 'Franciscan poverty of rhymes' এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, Originality র খাতিরে Vulgarity-কেও ক্ষমা করা যায়। ("Mon verre est petit mais je bois dans mon verre")। কাস্ত্রো পোর্ত্তুগীজ্ কবিতাকে গতানুগতিকতার হাত থেকে রক্ষা করেছেন গঠনে, ভাবে, ভঙ্গীতে ও কল্পনায় অনেক বৈচিত্র্য এনে।

তাঁর *Oaristos*-র অনেক কবিতায় বদ্‌লেয়ার্-এর (Baudelaire সুস্পষ্ট প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। যেমন *A ombra do Quadrante* শীর্ষক সনেটের প্রথমাংশ :

Not for myself I ask: useless and vain,
Lord then were all my prayer.

Oaristos-এ এ-রকম আরো অনেক জায়গা আছে, যা একেবারে পুরোদস্তর বদ্‌লেয়ার, যথা—

"Sonho uma casa branca a beira d'agoa,
um palmo
De terreno onde eu, compestremente calmo,
Cultivasse rozaes e compozesse idyllios,
Celebrando em abril os alados concilos

Das vespas no estellar Vaticano das flores,
Sob um irideo ceo colmado de fulgores ;" etc.

আমি স্বপ্ন দেখছি, জলার ধারে আমার ক্ষুদ্র কুটীর খানা ;—
এক টুক্‌রো জমি, নিরালা বনের মতো স্তব্ধ।
আমার গোলাপগুলি ফুটে উঠ্‌তো, আর আমি তাদের পাশে বসে' গেঁয়ো-গাথা রচনা কর্‌তাম।
এক খণ্ড আলো-ভরা, রূপ-ভরা স্তব্ধ নীল-আকাশের নীচে পাখ্‌না-ওলা পোকাদের সভা বস্‌তো ;
নানান্ সুরে তারা গান গাইত…
তোমাকেই আমি স্বপ্নে দেখেছি, হে আমার নিঠুরা প্রিয়া!
তোমার গান, তোমার কণ্ঠের ওঠা-নামা, উদ্দাম্ কণ্ঠস্বর—
এ সবই যে আমার কবিতায় ধরে' রেখেছি ;
তোমার সুরের শিউলি-তলায় আমার মনখানি মেলে' দিয়েছি…

কাস্‌ত্রো-র পরিণত বয়সের রচনায় আমরা দেখি, বাইরের কোলাহল থেকে তাঁর মন অন্তরের অতল গুহাতলে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেচে ; যৌবনের দুরন্তপনা শান্ত সমাহিত রূপ ধারণ করেচে। একদিন সবারই এমন হয় ; সমস্ত কোলাহল পার হয়ে এসে মন অন্তরের অনন্ত নীরবতার মধ্যে তলিয়ে যায়। তখন আর মনে হয় না—

জীবনকে উপভোগ কর্‌তে চাই—
নানান্ দিক দিয়ে, সকল দিক দিয়ে ;
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতেই জীবনের সার্থকতা।
জীবনের সুধা ও গরল সমান আগ্রহে পান কর্‌বো ;
শুষ্ক ও অসংস্কৃত সংস্কারকে নয়,—
সরস ও সবল মনের সহজ প্রবৃত্তির প্রকাশকেই বেশি সম্মান কর্‌বো ;
মদের মতো জীবনকে নিঃশেষে পান কর্‌বো…

তখন মনে হয়,—
চাই নীরবতা,
যে-নীরবতা অন্তরকে স্পর্শ করে ;
ধন্য নীরবতা, অখণ্ড নীরবতা,—
যার ভেতর দিয়ে নতুন-ভোরের আলোর মতো জীবনের সকল সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে,
পরিষ্কার হয়ে ওঠে চোখের জলের মতো,
হয়ে ওঠে পবিত্র—নির্ম্মল!

কবি-মনের যখন এই পরিবর্ত্তন সুরু হয়, তখন তাঁর ভেতর এক বিচিত্র অনুভূতি জন্মলাভ করে। বলা বাহুল্য, কাব্য মানুষের অনুভবেরই সৃষ্টি। কাস্‌ত্রোর পরিণত-জীবনের নবতম অনুভূতি তাঁর কাব্যে আর একটি নতুন রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো,—

আমার চারিধারে অনন্ত জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে।
তারা ভালোবাসে, কাড়াকাড়ি করে,
তারা বেঁচে থাকে, তারা প্রেমের অপমান করে,
আবার একদিন স্রোতে মিশে যায়—
যে স্রোত জীবন থেকে' মৃত্যুর সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ;
আমার সামনে এই গতি-পরিণতির দৃশ্য সহজ হয়ে' ফুটে উঠ্‌ছে—
আমি আমাকে তার সঙ্গে মিশিয়ে অনুভব করি।

পেছনে-ফেলে-আসা জীবনটা তখন পুঁথির পাতার মতো সহজ হয়ে যায়, কবি তা চোখের ওপর দেখতে পায়। এই 'আধ্যাত্মিক' মন নিয়ে সে নিজের অতীত-জীবনকে analyse কর্‌তে বসে—

লতা-ফুল-ঢাকা পুরানো ইঁদারাকে যেমন বাগান বলে মনে হয়,
(যদিও তা একদিন ভেঙ্গে' পড়ে' আবার গহ্বরের সৃষ্টি করে)
তেম্‌নি—জীবন যখন তরুণ থাকে,
মনের অন্তরালে যখন নানান দিক দিয়ে অতৃপ্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্যের জাল-বোনা সুরু হয় না,
তখন, সারা-বছরে কেবল চারিটি ঋতু চোখে পড়ে
এবং তারা সকলেই রূপ-ভরা, আনন্দ-ভরা।
গ্রীষ্ম, বর্ষা বসন্ত ও শীত—
এই চারিটি ঋতু-কুমারী তাদের সুন্দর পদ্মহস্ত ও পূর্ণ প্রেমদৃষ্টি নিয়ে বিরাজ করে…

কাস্‌ত্রোর কবিতা তার মনোজগতের ইতিহাস ; সেখানকার প্রতিটি স্বপ্ন, প্রতিটি জাগরণ, প্রতিটি চিন্তা—কবিতার আকারে গলে' গলে' পড়্‌ছে। জীবন আর মৃত্যুর ব্যবধান তাঁর কাছে অতি সামান্য…হয়তো একটুখানি অন্ধকার, এক লহমার আত্মবিস্মৃতি ; তারপর আবার নতুন আলোর প্লাবন, অনন্ত চেতনার রাজ্য! তাই তিনি উদাত্তস্বরে বল্‌তে পেরেছেন—

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌চে।
আমার সন্ধ্যা, আমার জীবনের গোধূলি-লগ্ন।
মরণ! মরণ! ওগো আমার রুদ্র-মধুর মরণ!
এই যে নীরবে পা ফেলে' পলে পলে আমার কাছে এগিয়ে আস্‌চে ;
এগিয়ে আস্‌চে আলোয় আলোময় আর একটি নব প্রভাতের সন্ধান নিয়ে,

এগিয়ে আস্‌চে—এ সন্ধ্যার ও-পারে আরেক প্রভাতের দুয়ারে আমায় পৌঁছে দিতে ;
আস্‌চে আমার প্রিয়তম !—
গভীর ঘন আলিঙ্গনের মতো আমার প্রিয়তম দু'বাহু বাড়িয়ে দিয়েচে !

আর একজন উঁচুদরের পোর্ত্তুগীজ্‌ কবি সম্বন্ধে দু'এক কথা বলেই এই প্রবন্ধ শেষ কর্‌বো। তাঁর নাম Teixeira de Pascoaes ; সম্ভবতঃ আধুনিক কবিদের মধ্যে পার্ত্তুগ্যালের বাইরে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন। কোনো সমালোচক প্যাস্‌কোয়া-র সম্বন্ধে বলেছেন—"He has the immense distinction in modern times of being a poet who is content to feel the poetry of Earth and Heven without being taunted by the fear that he will be found deficient in rhymes and metres sufficiently clever to express it."

প্যাস্‌কোয়া-র কবিতায় মৌলিকতার গোঁড়ামি নেই। তাঁর মতে স্বাভাবিক যা', স্বতোৎসারিত যা, তা-ই কবিতা—জীবনই কবিতা। এই জন্যে তাঁর কবিতায় "জীবন-মহাদেবের নৃত্য" শুন্‌তে পাই। যাঁরা কবিদের কাছ থেকে তাদের কাব্যকে 'polished marble' বা মণিমুক্তাখচিত হওয়ার দাবী রাখেন, তারা প্যাস্‌কোয়া পাঠ ক'রে নিরাশ হবেন। প্রকারান্তরে, যারা খাঁটি কবিতার সমজদার, যাঁদের Wordsworth ও Willium Barnes এর কবিতা *Imitatio* এবং *Fioretti* ভালো লাগে, তারা তাঁর কবিতা পড়ে' সেই তৃপ্তি পাবেন। অথচ, প্যাস্‌কোয়া-র কবিতা খাঁটি পোর্ত্তুগীজ ; তাঁর দুঃখবোধ, তাঁর বেদনার গান, ভালবাসার গান,—সবতেই তাঁর দেশের মাটি-জল-হাওয়ার গন্ধ পাওয়া যায়।

"O Amor
E irmao da Dor, e a Morte e irma da vida."

প্রেম ?—সে তো দুঃখের অনুজ।
জীবন ?—সে তো মৃত্যু-বৃন্তের শ্রেষ্ঠ কুসুম।

একথা কেবল পাস্‌কোয়ার মতো পোর্ত্তুগীজ্‌ কবিই বল্‌তে পারেন। এই সুর যখন নানান্‌ ভঙ্গীতে তাঁর গানের মাঝে বাজ্‌তে থাকে, তখন মাঝে মাঝে লিওপার্দ্দির (Leopardi) কথা পাঠকের স্মরণ হয়।

প্রকৃতিকে প্যাস্‌কোয়া একান্তভাবে আপন করে নিয়েছেন। তাঁর প্রাকৃতিক কবিতার প্রতি ছন্দে অনন্তের সঙ্গতৃষ্ণা ফুলের মতো দল মেলে আছে ; সেই তৃষ্ণা—সেই আকুতি প্রতি-মুহূর্ত্তে বস্তুর জগতের সঙ্গে আমাদের অতীন্দ্রিয় মনোজগতের একটা নিগূঢ় যোগ সাধন করে দেয়। মানব-অন্তরের পরম সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতাকে তিনি অপূর্ব্ব শক্তিময় বলে অনুভব করেছেন। মেটারলিঙ্কের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন, প্রতি মানুষের সঙ্গে প্রতি-মানুষের একটা অদৃশ্য নিত্যকালের পরিচয় রয়েচে,—আমাদের সীমাবদ্ধ প্রাত্যহিক জ্ঞানের দ্বারা তাকে ধর্‌তে পারিনে।

পৃথিবীর মূক-প্রাণীদের প্রতি তাঁর অসীম করুণা। তিনি তাদের মূক-অন্তরের ভাষাকে মুখর করে' তোলেন, তাদের অভাব অভিযোগ দুঃখ বেদনার রূপ দেন। প্রকৃতি ও প্রাণী জগতের প্রতি তার এই নিবিড় ভালোবাসা বার বারই স্পেনিশ কবি গ্যালান্‌ কে (Gabriel y Galan) স্মরণ করিয়ে দেয়। গ্যালান্‌ আর আইরিশ-কবি ইয়েটস্‌ এর (Yeats) কবিতাতেই একসঙ্গে এই তন্ময়তা ও দরদ দেখেছি।

রেঁালা ও ইয়েটস্‌-এর মতো প্যাস্‌কোয়াও কোলাহল ভালোবাসেন না। আধুনিক নাগরিক জীবনের গ্লানি ও বীভৎসতা তাঁর মনকে এত পীড়া দেয় যে, তিনি তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চল্‌তে সততই ব্যস্ত থাকেন। মানুষের কদর্য্যতায় ও নির্দ্দয়তায় আহত হয়ে' হয়ে' সংসারের অনেক কিছুর ওপরেই তিনি মনে মনে চটা। তাই তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাক্‌বার জন্য সহরের কোলাহল ও পঙ্কিলতা থেকে দূরে—নির্জ্জন Tamega ভ্যালিতে (Traz-os-Montes) আশ্রয় নিয়েছেন ;

"Essa vide de cega maldicao
Entur as furbas vivida e na cidade ;"

এবং ঝরণার সুর ও দূরবিস্তার অরণ্যপ্রান্তরের ঘন ছায়া, কুয়াসাচ্ছন্ন পর্ব্বত-প্রান্তর তার অন্তরের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে মায়া বিস্তার করেছে। এই পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে তিনি নিরালা বসে' আলো-ছায়া-মাখা মায়াজাল রচনা করেন এবং তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টি হয়ে ওঠে—

An idyll made of shadows there afar
In distant forests ;

তখন তাঁর প্রেমেরও কোনো উজ্জ্বল রূপ থাকে না—

"Amor que tudo val annuviando"

এমন কি তাঁর নিজের সত্তাও তাঁর কাছে ছায়াময়—মায়াময় পৃথিবীর একটী বিশেষ মায়া হয়ে ওঠে :

"Sombras que vejo em mim
E em tudo quanto existe"
(*Sempre*)

প্যাস্‌কোয়ার কবিতায় কোথাও উদ্দামতা নাই, উন্মত্ততা নাই—নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখা। তার ভেতর আছে একটি সুমহান্ সৌন্দর্য্যের লীলা, সন্ধ্যার মতো করুণ একটি সুর,—মাঝে মাঝে শরতের মেঘলা-আকাশের রোদের মতো ছোট্ট একটি ইসারা! সে-ইসারা বাইরেকে নয়, মানুষের গোপন-অন্তরালকে হঠাৎ একটুখানি মুক্ত করে দেয়; মানুষ 'কী পেলাম' বলে চমকে ওঠে!

প্যাসকোয়া-র জীবনের Philosophyটি বুঝলেই তাঁর কাব্য অনেকটা সহজ হয়ে আসে। তিনি বলেন, "The Kingdom of Heaven is in the heart of man, and so, too, is the Kingdom of Earth. God is in everything and everything is one and one is everything" তাই তাঁর *As Sombras*-এর এক কবিতায় দেখতে পাই :

"Por isso, se quero ver-te,
Olho as aves e as estrellas,
As montanhas e os rochedos,
Coracao !"

আমার অন্তর্লোকে যখন আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাই,
তখনি আমি তাকাই গাছের পাখীর পানে,
আকাশের তারার পানে,
দূর-পাহাড়ের ধূসর শীষের পানে!

প্যাস্‌কোয়া-র Philosophy-র মর্ম্মকথা তাঁর সমগ্র কাব্য-সৃষ্টির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তিনি বলেন, "In spirit man can stay the sun and stars in their courses, and transform a stone into a sentient thing" তাই তাঁর কবিতায় পাই,—

"Yes, for the living spirit's force can master
The very sun ; a single word or gesture
Can stay the sun in heaven, and the light divine
Before the dream of men is turned to darkness.

"Tudo e milagre e sombra, o Natureza"—নদী সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, উপত্যকা-ভূমি পাহাড়ের থেকে আলাদা নয়,—

A valley climbs and climbs,and now is hill,
A spring flows on and on, and now is sea.

আরো আছে—

Eternity is embraced in one Heaven sent moment ;
The sun is reflected in a drop of dew ;

প্যাস্‌কোয়া বলেছেন, স্বর্গ এবং পৃথিবী মানুষের (in spirit of man) মাঝেই আছে এবং in this pragmatism God is man's creature :

"O nosso Deus e nossa creatuna ;
E so nas minhas obras posso crer.
Cada homem e um mundo de ternura ;
E Deus e a eterna flor que d'elle nasce,
Que o inspira, perfuma e eleva aos astros ;
Sua expressao perfeita, a sua face
Eterna e projectada no Infinito.
Ama o ten Deus ; isto e, adora em ti
A creatura ideal que concebeste."

আমাদের ভগবান আমাদেরই সৃষ্টি।
আমার নিজের শক্তিতে আমি বিশ্বাস করি—
এবং বিশ্বাস করি প্রতি মানবের অন্তরে একটি সুন্দর জগৎ আছে।
ভগবান একটি চিরন্তন ফুল,
এবং মানুষের সেই সুন্দর জগতেই সে সৃষ্টিলাভ করে,
মানুষের আত্মাকে অপমান থেকে বাঁচায়,

মাধুর্য্যে ভরে' তোলে মানুষের অন্তর—
সকল পতন থেকে তাকে রক্ষা করে'
আকাশের তারার মতো তাকে উর্দ্ধে তুলে' ধরে।
তোমার ভগবানকে তুমি ভালোবাসো —
তার অর্থ, পূজা কর তোমার সৃষ্টির স্বপ্নকে, তোমার আদর্শকে।

ভগবান মানুষেরই সৃষ্টি—একথা প্যাস্কোয়া-ই বল্‌তে পেরেছেন। কারণ, আমরা দেখেছি, তাঁর কাব্যের ভেতর দিয়ে তাঁর মনের—তাঁর বন্দী ইন্দ্রিয়ের মুক্তি ঘটেছে। তাঁর চোখে পাথর আর রক্তমাংস, আকাশ আর পৃথিবী—সব একাকার হয়ে গেছে। সেই একীভূত সৌন্দর্য্য-সায়রের মাঝে কবি তাঁর লীলা-কমলের কল্পনা করেছেন। সেই কল্পনার বাস্তব-রূপই তাঁর কবিতা। তাই তিনি বলেন,—

সমস্ত সৃষ্টি ভেঙে' আমি আমার নবসৃষ্টির পত্তন করি;
সমস্ত সৌন্দর্য্য একীভূত করে'—
তারি উপরে আমার লীলা কমলটিকে দোলাই।
কোনো খণ্ড সৌন্দর্য্যের কামনা আমি করি না.
আমার আকাশে একটিমাত্র তারা—
তারি পানে চেয়ে চেয়ে আমার পৃথিবীর পথ চলা।

প্যাস্কোয়ার কবিতা শুধু মুখে-পড়ে' দু'দণ্ডের আমোদ উপভোগ করবার জিনিষ নয়,—শিশুর খেলাঘরের সামগ্রী নয়। তাঁর কবিতাকে পড়তে হয় অন্তর দিয়ে, অনুভব করতে হয় সমস্ত অনুভূতি দিয়ে; তবেই আনন্দ পাওয়া যায়। সুন্দরের অন্তরে জীবনকে জাগিয়ে তুলবার একটি মাত্র মন্ত্র আছে—সেই মন্ত্রটিই হলো কবির সমস্ত তপস্যার মূলে বীজ-মন্ত্র। পাঠককে সেই বীজমন্ত্রটি ধরতে হবে—তবেই তাঁর কাব্যের মূলসূত্রটি ধরা হলো।

প্যাস্কোয়ার As Sombras-এ আছে,—

আমার গান,—নব-সূর্য্যোদয়ের গান,
নব-সূর্য্যের আলোর গান।
আমার গান,—নিশীথরাতের ঘুমে-পাওয়া হাওয়ার গান;
—শরৎ আকাশের মেঘ শিশুদের লঘুচঞ্চল গতির গান;
—অনন্ত রাত্রির নিস্তব্ধতার গান।

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মতো জড়শক্তিকে মুক্ত করার, জীবন্ত করার শক্তি আছে প্যাস্কোয়ার ভেতর। ছোট তুচ্ছ একটি জিনিস—মানুষের দৃষ্টিতেও যা পড়ে না, তারো প্রতি কবির সদাজাগ্রত দৃষ্টি রয়েছে, সহানুভূতি রয়েছে; তিনি তাঁকে রূপ দিয়েছেন, ভাষা দিয়েছেন, মানুষের মনের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

উপসংহারে কবির একটি কবিতার অংশবিশেষের ইংরাজী অনুবাদ তুলে দিই,—

What solitude! What silence of the night!
Vague distance of sky, where in secret and in
shadow stars are born;
The wind upon the mountain-tops was sleeping;
And one might almost feel upon the rocks
The moonlight's plaintive radiance, and hear
Night moving in a murmur of fears and shadows.

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

দাম্পত্য-ব্যাধি

শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র

রান্না ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বধূ তরকারি কুটিতেছিল। বিবাহের পর সবেমাত্র দ্বিতীয় বার সে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। স্বামী ও শ্বাশুড়ী ব্যতীত আর কোন প্রাণী বাড়ী না থাকায়, তাহাকে একটু ডাগর দেখিয়াই শ্বাশুড়ী ঘরে আনিয়াছেন। নিজে বৃদ্ধ—কবে হঠাৎ চোখ বোজেন ঠিক নাই। তবু ছেলের একটা হিল্লে করিয়া গেলেন।

শ্বাশুড়ী ঘরের ভিতর রাঁধিতেছিলেন। বাড়ীর সকল কাজকর্ম্ম স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন এমন শক্তি তাঁহার নাই। কিন্তু নতুন বউকে রাঁধিতে দিলে বা ভারী কাজকর্ম্ম করিতে দিলে পাড়ার লোকে মন্দ বলে তাই এখনও তিনি কষ্টে-স্বষ্টে বাড়ীর প্রায় সকল কাজকর্ম্মই করেন।

বধূ তরকারি কুটীতে কুটীতে কেবলই হাসিতেছিল। আচ্ছা, লোকে এমন ছেলে-মানুষও হইতে পারে। কাল রাত্রে কিনা বলিতেছিল, দেখ সু তোমাকে জন্ম জন্মান্তর ধরে খুঁজছিলাম। একথা শুনিয়া বধূ হাসি থামাইতে পারে নাই। খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, তাই নাকি গো! আমি শুনেছিলাম, আমার বাবাই তোমাদের কত অনুরোধ উপরোধ করে বিয়ে দিয়েছেন। এই সামান্য কথাটায় কিনা তাহার রাগ হইল। পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, আজ বুঝলুম তুমি আমাকে ভালবাসোনা। তাহার পর অর্দ্ধেক রাত্রি ধরিয়া কত সাধ্যসাধনা করিয়া বধূকে তাহার রাগ ভাঙ্গাইতে হইয়াছে। এমনও ছেলে-মানুষ, ঠিক তাহার ছোট ভাই রামের মত। একবার মুখ আঁধার করিল ত মুখে হাসি ফুটাইতে কতো আবোল তাবোলই না বকিতে হইবে, কত ছেলে মানুষীই না করিতে হইবে।

সুমির কাছে তাহার বরের কতো গল্পই ত সে শুনিয়াছে। কিন্তু সুমির বর যে এমন ছেলে-মানুষ তাহাত সুমি বলে নাই। যাহোক্ ছেলে-মানুষীই তাহার ভাল লাগে—স্বামী যখন তাহাকে কত কি কথা বলিয়া আদর করেন তখন তাহার বেশ লাগে। অথচ এই বিবাহে ভাঙ্‌চি দিবার জন্য ত পাড়ার কান্ত পিসির দেওর কত কি-ই না বলিয়াছিল।

বৌমা খেলে খেলে, লাউর ডগাটা গেলে—বলিতে বলিতে শ্বাশুড়ী রান্নাঘর হইতে খুন্তি হাতে করিয়াই বাহিরে আসিলেন। ওদিকে স্বামী হিতেশও "ধেই ধেই" করিতে করিতে উপর হইতে ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়। বধূর অন্যমনস্কতার সুযোগ লইয়া কোথা হইতে একটা বাছুর আসিয়া ঝুলিয়া-পড়া লাউর ডগাটীতে মুখ দিতে গিয়াছিল। ছেলে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া শ্বাশুড়ী ঘরে ঢুকিলেন। হিতেশ বাছুর তাড়াইয়া দিয়া বধূর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সকালবেলা হইতে সু-কে একবারও দেখিতে না পাইয়া সে উপরের ঘরে বসিয়া হাঁফাইয়া উঠিতেছিল; অথচ বধূর কাছে যাইবার জন্য কোন ছল ছুতোও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। ভাগ্যে বাছুরটা বাড়ীর ভিতর আসিয়াছিল!

সামান্য ক'দিনের পরিচয়েই বধূর প্রতি হিতেশের কেমন একটা দুর্ব্বলতার ভাব আসিয়াছে। তাহার মনে হইত, সু যেন একমুঠো দুর্ব্বলতা—ভারী কোমল ও ভারী মিষ্টি—তাহাকে ভর না করিয়া যেন সু কোন দিনই দাঁড়াইতে পারিবে না। কিন্তু, তাহার দুষ্টামিরও অন্ত নাই। তাহার সহিত নির্জ্জনে একটু দেখা হইলেই বাপের বাড়ীর বিড়ালটা হইতে আরম্ভ করিয়া বুড়ো বাপের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এমনি গল্প জুড়িয়া দেয় যে, হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাওয়া যায় না। অথচ, একটু যদি অমনোযোগ দেখাইল তবে গল্প থামাইয়া বড় বড় করুণ দৃষ্টিতে এমন করিয়া চায় যে অভিমান দূর করিতে হিতেশকে তৎক্ষণাৎ তৎপর হইতে হয়। তবুও সু-কে হিতেশের ভারী ভাল লাগে। সু-র দিকে চাহিলেই তাহার কেমন একটা আবেগ আসে—সে না পারে চোখ ফিরাইতে, না পারে সেখান হইতে যাইতে।

কিন্তু মা রান্নাঘরে রহিয়াছেন। বেশিক্ষণ চুপ করিয়া বধূর কাছে দাঁড়াইয়া থাকা ভাল দেখায় না। ওদিকে বধূও আবার লজ্জায় ঘাড় গুঁজিয়া তরকারি কুটীতে লাগিল। অথচ হিতেশের এখান হইতে যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। বউকে উপদেশ দিবার ছলে মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, দেখ মা, তোমার বৌমাকে বলে দিও সে চারিদিকে দৃষ্টি না রাখলে, তুমি বুড়োমানুষ একা আর কতদিকে পেরে উঠবে। এইত সে যদি উঠোনের দিকে একটু দৃষ্টি রাখত তবে তোমাকে কি আর রান্না ফেলে সকড়ি হাতে বাইরে আসতে হতো,—না, আমাকেই বাছুর তাড়াতে উপর থেকে দৌড়ে নীচে আসতে হতো। এখনও বুকটা ধড়ফড় কচ্ছে—বুকের ব্যামো হলো নাকি! বলিয়া জোরে একটা নিশ্বাস টানিল। বধূর উদ্দেশে বলিল, দাও ত একখানা পিঁড়ি পেতে, না জিরিয়ে এখান থেকে নড়বার আর বল নেই। মা পুত্রের বুকের ব্যামোর এমন ভয়াবহ প্রকোপ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, বৌমা, একখানা পিঁড়ি পেতে দিয়ে শীগ্‌গীর পাখা এনে বাতাস কর। কি জানি কি হলো আবার! হিতেশ দেখিল, মা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাহিরে আসিলে হিতে বিপরীত হইবে। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, বাতাস দিবার দরকার নেই—এক্ষুণি সেরে যাবে। তুমি ব্যস্ত হয়োনা মা।

বধূ বাতাস করিতে লাগিল। হিতেশ নিজের দুষ্টবুদ্ধির প্রাখর্য্যে বধূর মুখের দিকে চাহিয়া মিটি মিটি হাসিতেছিল ও মাঝে মাঝে বধূকে রাগাইবার উদ্দেশ্যে চোখ ও হাতের সাহায্যে বধূকে ভালভাবে বাতাস দিবার ইঙ্গিতও করিতেছিল। ঘরের মধ্যে শ্বাশুড়ির অবস্থিতে স্বামীর দুষ্টামির প্রত্যুত্তর দিতে না পারিয়া বধূ অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; অবশেষে বধূ রাগিয়া পাখা ফেলিয়া বঁটির উপরে গিয়া বসিল।

বধূকে অনুসরণ করিয়া হিতেশের দৃষ্টি গিয়া কোটা তরকারির থালার উপরে পড়িল। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, ওকি করেচ, বীচেকলা বুঝি ওই রকম করে কোটে?

তরকারি কুটিতে বসিয়া কালরাত্রির কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে ভাজিবার জন্য কাঁচকলার পরিবর্ত্তে বীচে-কলা কুটিয়া দিয়াছে তাহা বধূ নিজেই জানিতে পারে নাই। এখন স্বামী ও শ্বাশুড়ীর কাছে ভুল ধরা পড়িল দেখিয়া তাহার মুখখানি অপ্রতিভ হইয়া এতটুকু হইয়া গেল। হিতেশ মুহূর্ত্তের মধ্যে বধূর অপ্রস্তুতের পরিমাণটা বুঝিতে পারিল। পুনরায় বলিল, না, ঠিকই করেচ, দেখচি। আমি দূর থেকে প্রথম দেখে ভাবলাম বুঝি বীচে কলা কুটেচ।

একমাত্র পুত্রের সাংসারিক জ্ঞানের খর্ব্বতা সম্বন্ধে মাতার চিরকালই নিঃসংশয়। এ স্থলেও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। মা ঘরের ভিতর হইতে কহিলেন, তুই ত বুঝিস কতো! তরকারির থালাখানা ঘরের ভেতর নিয়ে এসতো বৌমা, দেখি কি করেচো। বধূর লজ্জার আর অবধি রহিল না। হিতেশের প্রতি একটা কোপদৃষ্টি হানিয়া সে আড়ষ্টভাবে তরকারির থালাখানা ঘরের ভিতর লইয়া চলিল। হিতেশও সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিল না—তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের ভিতর গিয়া আশ্রয় লইল।

হিতেশের কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। স্ত্রীর কাছে নিজেকে ভয়ানক অপরাধী মনে হইতে লাগিল; হাজার হৌক্ সু ছেলেমানুষ। সংসার করিবার মত বা বুঝিয়া সুঝিয়া তরীতরকারি কুটিবার মত বুদ্ধিশুদ্ধি তার আসিবে কোথা হইতে! তাহার উচিত সংসারের সকল লজ্জা, ভয়, দায়িত্ব হইতে তাহাকে আড়াল করিয়া রাখা। অথচ সেই কি-না মার নিকট সুর আনাড়িত্ব প্রমাণ করিয়া তাহাকে অপ্রতিভের একশেষ করিল। বাড়ীর ভিতর তো মোটে এইটুকু হইল। কিন্তু একথা যদি বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, শিবি, বিন্তে, রমা প্রভৃতি পাড়ার ক্ষুদে ননদরা কি তাহাকে আস্ত রাখিবে! সু'ই বা তাহাকে কি ভাবিবে! 'প্রীতিলতা' উপন্যাসের সুন্দরী প্রীতিলতার মদ্যপ ও অত্যাচারী স্বামী নিশীথের সহিত তাহাকে পৃথক করিয়াই বা দেখিবে কেমন করিয়া? "প্রীতিলতা" উপন্যাস ত সু পরশুদিন পড়িতেছিল —দু' দিনের ভিতর ভুলিয়া যায় নাই সে নিশ্চয়। হায় হায় কোথায় নিশীথ আর কোথায় সে! তবুও সু হয় ত দু' জনকেই এক সঙ্গে করিয়া দেখিবে। ভাবিবে তাহার কাজের সামান্যমাত্র ত্রুটিবিচ্যুতি হইলেই স্বামীর হাতে লাঞ্ছনার শেষ থাকিবে না। সে যে শুধু মাত্র সু'র কাছে বসিবার জন্যই উপদেশ দিবার ছল ধরিয়াছিল, এটুকুরও কদর্থ হয় ত সু করিবে। উঃ—হিতেশের বুকের ভিতর অনুশোচনায় এক রকম ব্যথা করিতে লাগিল। হে ভগবান্......

হিতেশের ইচ্ছা করিতেছিল, কৃত কর্ম্মের জন্য স্থ'র কাছে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে; শপথ করিয়া স্থ'কে বিশ্বাস করিতে বলে যে, সে মন্দ ভাবিয়া কিছু করে নাই। স্থ'কে একবার আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করে, নিশীথের সহিত তাহার যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে কি না।

কিন্তু কোনটাই সে লজ্জার জন্য এখন করিতে পারিল না। একে ব্যাপারটা সদ্য ঘটিল, তাহার পর স্থ এখনও রান্নাঘরের আওতার মধ্যে। নিরিবিলিতে এক সময় স্থ'কে সব বলিবে ঠিক করিল।

স্থ'র সহিত নিরিবিলিতে দেখা হইলও কয়েকবার, কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনা কোনবারই সে করিতে পারিল না। প্রত্যেক বারই তাহার মনে হইতে লাগিল, এবারও স্থ'কে কিছু না বলাতে ব্যাপার আরও খারাপ দাঁড়াইল। বলিবে সে কি? স্থ'র দিকে চাহিতে গেলেই তাহার চোখ আপনিই নত হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, নারীর দুর্ব্বলতার স্থযোগ লইয়া তাহাকে গভীর লজ্জায় অভিভূত করাতে, সে তাহার সমস্ত পৌরুষ খোয়াইয়া নিশীথের পর্য্যায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঘোর অপরাধীর মত চোখ নীচু করিয়া তাহাকে খাওয়া-নাওয়া সব সারিতে হইল। খাওয়ার পর অভ্যাসমত তাস পাশার আড্ডায় যাইবার সময় তাহার মনে হইল, না:—এ রকম করিলে আর চলিবে না। বিকাল বেলা নাগাত হয় ত একথা ননদ্ মহলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং তখন স্থ'র একগুণ লজ্জা পৌরুষ হইতে তাহাকে দশগুণ নীচে ঠেলিবে;—তাহার তুলনায় নিশীথকেও হয় ত স্থ'র দেবতা বলিয়া মনে হইবে। সে ঠিক করিল, আজ আর সে খেলিতে যাইবে না। কাজকর্ম্ম সারিয়া স্থ যখন বিশ্রামের জন্য এই ঘরেই আসিবে তখনই যা হোক্ কিছু হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলিবে। সে শুধু চায়, স্থ বিশ্বাস করুক সে অমানুষ নয়......

কাজকর্ম্ম সারিয়া বিশ্রাম করিতে ঘরে গিয়া হিতেশকে দেখিয়া বধূ ফিরিতে উদ্যত হইল। হঠাৎ পায়ের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া হিতেশ চোখ তুলিয়া কহিল,—ফিরে চল্‌লে কেন? এসনা এধারে। বধূ কোনও কথা কহিল না দেখিয়া, হিতেশ পুনরায় কহিল,—যাচ্ছো কোথায়, এস না এদিকে। এবারও উত্তর না দিয়া বধূ চলিতে লাগিল। হিতেশ তাড়াতাড়ি আসিয়া পিছন দিক হইতে হাত ধরিয়া কহিল,—শোন লক্ষ্মীটি—। বোধ করি স্বামীর উপর অভিমান তখনও বধূর দূর হয় নাই। 'ছাড় বল্‌চি" বলিয়া এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া নিয়া বধূ বলিল—আমি ও ঘরে মার কাছে শোব। দুপুর বেলায় সমিতির কাজে হিতেশের গরুহাটী যাইবার কথা ছিল;—একথা কাল রাত্রেই হিতেশ বধূকে বলিয়াছিল। কিন্তু স্থ হিতেশকে রৌদ্রে অতটা পথ হাঁটিতে দিতে রাজী হয় নাই; —মাথার দিব্য দিয়া অভিমান করিয়া মুখ আঁধার করিয়া হিতেশকে নিরস্ত করিয়াছিল। সেই কথারই দোহাই পাড়িয়া হিতেশ কহিল, যদি না এস, আমি সেই কাজটা সারার জন্য এখনই গরুহাটীতে বেরিয়ে পড়ব বলচি—। এ কথারও কোনও ফল দেখা দিল না। বধূ কহিল—যাওনা তোমার যেখানে ইচ্ছে—ঘরে থাক্‌তে তোমাকে কে সাধচে?

তাহার কথা না শুনিয়া বধূ শ্বাশুড়ীর ঘরে চলিয়া গেল দেখিয়া হিতেশের দুঃখ হইল। হায়রে, এ জগতে কে কার? সত্যকার ভালবাসার সম্বন্ধ, সত্যকার স্নেহের সম্বন্ধ এ জগতে কাহারও সহিত গড়িয়া উঠে কি? যত ভালবাসার কথা, যত মধুর দাম্পত্য জীবনের কথা সে বইয়ে পড়িয়াছে সব মিথ্যা—ছেলে ভুলানো ছড়ার মতই মিথ্যা। স্ত্রীকে ভালোবাসা দাও, কাপড়চোপড় গহনাগাটী দাও, সে তোমার জন্য রাঁধিবে, কাজ করিবে, বিশ্রাম সময়ে তোমার কর্ণকুহরে শত ভালবাসার গুঞ্জন তুলিবে। একটু যদি ভুল করিলে, তাহার স্বার্থ সাধনের পক্ষে একটু মাত্র শিথিলতা যদি তোমার আসিয়া পড়িল, দেখিবে অমনি সে বলিবে—যাওনা যেখানে তোমার ইচ্ছা, তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নাই। এই ভালবাসা—হায় ভগবান্...

এই গ্রীষ্মের দুপুর বেলায় যে আজ গরুহাটীতে যাইবে। নিশ্চয় যাইবে। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পথে ডোবা হইতে পঙ্কিল জল পান করিবে। কেন করিবে না? পঙ্কিল জল খাইয়া কলেরা হইয়া কালই যদি সে মারা যায়, তাহাতে কাহার কি? কেহ কি তাহার জন্য একফোঁটা চোখের জল ফেলিবে?...

একটা জামা গায় দিয়া খালি পায়ে খালি মাথায় মায়ের ঘরের সম্মুখে আসিয়া মায়ের উদ্দেশে হিতেশ কহিল,—আমি গরুহাটীতে চললুম মা। সমিতির বিশেষ কাজ আছে। বলিয়াই সে চলিতে আরম্ভ করিল। মা কি একটা বলিলেন, কিন্তু সে কর্ণপাত করিল না।

খানিকটা পথ চলিয়া তাহার মনে হইল, সে ত আচ্ছা বোকা। সু'র বয়স পনর আর তাহার বয়স তেইশ—সু'ত তাহার তুলনায় ছেলেমানুষ। আর সে কিনা সু'র উপর রাগ করিয়া এই দুপুর রৌদ্রে চলিল গরুহাটীতে। পাগল আর কি? সু নয় অবুঝ হইতে পারে, কিন্তু সে অবুঝ হইল কি করিয়া? যদি কেহ শোনে, একটা পনর বছরের মেয়ের উপর রাগ করিয়া একটা তেইশ বছরের যুবক এই দুপুর রৌদ্রে তিন মাইল পথ হাঁটিয়া রোগ বাধাইল তাহা হইলে তাহার কি আর বাহিরে মুখ দেখাইবার যো থাকিবে? এখন নয় সু মুখ আঁধার করিয়া তাহার কাছে আসিল না, কিম্বা রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় যখন বাহিরের গাছে ভুতুমের ডাক শুনিবে তখন ত সে তাহাকেই জড়াইয়া ধরিবে। সাধে কি আর মা তাহাকে কোন কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না! সে বোধ হয় এখনও ছেলেমানুষ!

হিতেশ ফিরিল। কিন্তু এখন ফিরিলে সু যে তাহাকে টিট্‌কারি দিয়া অস্থির করিয়া তুলিবে। কেন তুলিবে? তাহার বুঝি পেট কামড়াইতে নাই। এই দুপুর রৌদ্রে ঠিক ভাত খাওয়ার পরে যদি কেহ হাঁটে তবে ত তাহার পেট কামড়াইবেই।

হিতেশ ঘরে ঢুকিয়া ধুলা পায়েই বিছানায় শুইয়া খানিকটা ছট্‌ফট্ করিয়া পরে কাতর কণ্ঠে কহিল, মা শীগ্‌গীর একটু নুন সরষে এনে দাও—বড় পেট কামড়াচ্চে—উঃ গেলুম,—গেলুম। মা শুনিয়া বিড় বিড় করিতে লাগিলেন, বারণ করলে ত শুনবে না—বুড়ো হ'তে গেল তবু নিজের শরীরের দিকে একটু দৃষ্টি নেই। বধূকে ডাকিয়া দিয়া কহিলেন, ওঠো ত বৌমা, শোন ত কি বল্‌ছে। বধূ কি বুঝিল সেই জানে, সে স্বামীর চেয়েও কাতর কণ্ঠে বলিল, মাথা একদম ছিঁড়ে পড়চে মা, মোটে মাথা উঁচু করতে পারচি না।

* * * *

বধূ আসিল না। বাস্তবিক কি স্নেহ মমতা বলিয়া পৃথিবীতে কোনো কিছু নাই। হিতেশ ভাবিয়া পাইল না, যদি স্নেহ মমতা বলিয়া সত্যই কিছু থাকে তবে যে লোক অগ্নি-দেবতা সাক্ষী করিয়া নিজের সুখ দুঃখের ভাগী করিল, তাহার অসুখেয় সময় একবার চোখের দেখা দেখিবার জন্যও বিচলিত হইতেছে না। হইলই বা পেট-কামড়ানি সাধারণ অসুখ। কিন্তু এই গ্রীষ্মের দুপুরে ইহার হঠাৎ আক্রমণ কি একেবারেই উপেক্ষা করিবার জিনিস! আর কিছু না হউক লোকে যন্ত্রণার চোটে ত হার্টফেল ও করিয়া থাকে। উঃ—পাষাণ পাষাণ—হৃদয় বলিয়া বুঝি মানুষের কোন কিছু নাই।...

......সু তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম—ইচ্ছা হয়ত যে সাত পাকে তুমি আমাকে বাঁধিয়া ছিলে তাহাও খুলিতে পার। যেখানে থাকো সুখে থাকো সু...

পেট-কামড়ানি বাড়িয়াই চলিল। মা নুন সরিশা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথায় জল পটি পর্য্যন্ত দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ব্যাধি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল......

মাথার ব্যথা তুলিয়া বধূ এতক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছে।...পেট-কামড়ানি হয়ত সত্য। স্বামী কি মনে করিবেন? হয় ত ভাবিবেন, আমার এমন অসুখে সু একবার কাছে আসিল না।......

তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, একবার ছুটিয়া স্বামীর কাছে যায়...একবার স্বামীর গায়ে হাত বুলাইয়া দেয়......অভয় দিয়া বলে, ভয় কি? এই ত আমি আসিয়াছি। ব্যামো তোমার এখনই সারিয়া যাইবে।...কিন্তু যাইবে সে কেমন করিয়া? শাশুড়ী কি মনে করিবেন? হয় ত ভাবিবেন, দেখনা একবার বেহায়াপনা...এই ত সামান্য অসুখ।—সুর চোখে জল দেখা দিল। সে যুক্তকর মাথায় ঠেকাইয়া মনে মনে প্রার্থনা করিল, হে ভগবান—

অনেক করিয়াও কমিলনা দেখিয়া মা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কপাল যখন ভাঙ্গিবার হয়, তখন ঠুন্‌কো আঘাতেও ভাঙে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ...নন্দ ঠাকুরপোকে ত ডাকিয়া আনি—সে দেখিয়া শুনিয়া যাহা ভাল হয় করুক। বধূর নিকটে গিয়া বলিলেন, বৌমা

তুমি হিতেশের কাছে গিয়া বস। আমি নন্দকে গিয়ে ডেকে আনি—চুপ করে আর বসে থাকতে পারিনে।

শ্বাশুড়ীর কথা শুনিয়া বধূরও প্রায় চেতনা লোপ পাইল। সে খানিক ক্ষণের ভিতর না পারিল উঠিতে না পারিল কিছু ভাবিতে...পৃথিবীতে বুঝি কিছু নাই—কেবল শূন্য আর অন্ধকার...

তার পর চেতনা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন আস্তে আস্তে স্বামীর পাশে গিয়া বসিয়া স্বামীর মাথায় হাত বুলাইতে গেল। হিতেশ কাতরানি ভুলিয়া গিয়া ভাঙা কান্নার গলায় বলিল, যাক্, তোমার আর আসতে হবে না সু। আমি মরে গেলে তোমার কি?...বধূ তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া স্বামীর মুখ চাপা দিল। সে আর সামলাইতে পারিল না। ছি—ও কথা বল্‌তে নেই' বলিতে গিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল......

* * * *

নন্দকে লইয়া মা যখন উঠানে পা দিলেন তখন কাতরানি আর শোনা যাইতেছিল না। মা ভাবিলেন, পেট কামড়ানি হয়ত কম পড়িয়াছে—পরক্ষণেই মনে হইল, হয়ত' বা বেশি রকম বাড়িয়াই গিয়াছে, তাই একেবারে চুপচাপ। উদ্বিগ্ন চিত্তে নন্দকে লইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিতেই বধূ লম্বা ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

নন্দ-ঠাকুরপো অভিজ্ঞ লোক। দেখিয়াই বুঝিলেন, ভয়ের কোন কারণ নাই। বৌদিদিকে আশ্বস্ত করিয়া ঘর ছাড়িয়া আসিবার সময় খুড়শ্বশুর মহাশয় বৌমার উদ্দেশ্যে বলিলেন, এসব পেট-কামড়ানি আর মাথাধরা বউমা, আপনিই হয় আর আপনিই ভাল হয়ে যায়। এসব অসুখের জন্যে বুড়ো শ্বাশুড়ীকে ব্যস্ত করতে নেই। শুনিয়া বৌমা ঘোমটাটা আর একটু লম্বা করিয়া টানিয়া দিলেন।

শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র

চিরন্তনী

হিতেশ চক্রবর্ত্তী

যতই বলি

এ সব পুরাতন,
সবই চিরন্তন;
সেইত বর্ষা কালো,
আবার শরৎ আলো;
সেইত শীতের জরা,
ফাগুন পুলক ভরা।
হায় কোথায় নূতনত্ব,
তবু এরাই চিরসত্য!

যতই বলি

এ সব ছিল জানা
মিথ্যা আনাগোনা,
এ সব শুধু ফাঁকি,
আসল চির বাকি;
এই যে রাত্রি দিন
অসার অর্থ হীন,
হায় কোথায় গূঢ় তত্ত্ব
তবু এরাই চির সত্য!
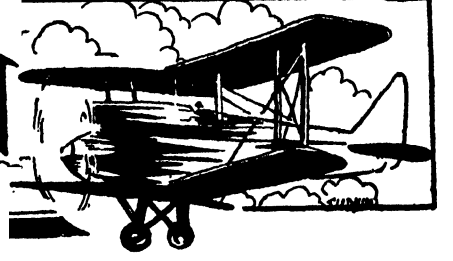
ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড্‌ প্রুডেন্‌সিয়াল এসিওরেন্স কোঃ লিঃ

এই কোম্পানীর ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত Balance sheet দেখে আমরা সুখী হয়েছি। বীমাকারীদের যত রকমের সুবিধা দেওয়া সম্ভব সমস্তই দিয়ে যে সতর্কতার সহিত ইহার কার্য্য পরিচালনা করা হয়, তা' বিশেষ সন্তোষের বিষয়। ডিরেক্টরদের মধ্যে সকলেই খ্যাতনামা ব্যবসায়ী অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত। তার উপর এই কোম্পানীর একটা বিশেষত্ব এই যে, বীমাকারীরা স্বয়ং তাঁদের মধ্য থেকে দু'জন ডিরেক্টর নির্ব্বাচন করতে পারেন। তার ফলে এই কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনায় বীমাকারীদেরও কিছু হাত থাকে। এই কোম্পানীর আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ধনী ও মধ্যবিত্তদের জন্য সাধারণ পলিসি ছাড়াও দরিদ্রদের জন্য আর এক রকম আড়াইশত টাকার পলিসির প্রচলন আছে। এর ফলে উপার্জ্জন যাঁদের নিতান্ত সামান্য, তাঁরাও বীমার সুখ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হ'ন না।

আলোচ্য বর্ষে অংশীদারদের শতকরা ৮½ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমান সময়ে লভ্যাংশের এই হার বিশেষ সন্তোষজনক। ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানীতে আলোচ্য বর্ষে প্রস্তাবিত আনুমানিক এক কোটি চুরাশি হাজার টাকার কাজের মধ্যে আটাত্তর লক্ষ সাতাত্তর হাজার টাকার নূতন কাজ হ'য়েছে। প্রস্তাবিত বাকী কাজের মধ্যে কতকটা প্রত্যাখ্যাত হ'য়েছে, কতকটা এখনো সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে নি। দরিদ্রদের জন্য আড়াইশত টাকা পলিসির বিভাগে তিন হাজার দু'শ' পঞ্চাশটাকার কাজ হ'য়েছে। প্রস্তাবিত বাকী কাজ এখনো শেষ হয়নি। এই কোম্পানীর টাকা সমস্তই নিরাপদ গভর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপাল বণ্ডে লগ্নি করা হয়।

এই ধরণের ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির সাহায্যে দেশের আর্থিক মেরুদণ্ড দৃঢ়ীকৃত হয়। আমরা এঁদের উত্তরোত্তর প্রভূত উন্নতি কামনা করি।

নারী-শিক্ষাপরিষদ্‌ ও বাণীপীঠ

দেশে প্রচলিত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, যেখানে প্রধানতঃ অবসর সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে, মধ্যবিত্ত পরিবারের কুমারী, সধবা ও বিধবাগণ, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করে সংসারের আর্থিক সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান করতে পারেন।

"বাণীপীঠ", নামে নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। শিক্ষার্থিনীগণের অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের বেতন ও ছাত্রীনিবাসের ব্যয়ের হার যথা-সম্ভব সুলভ করা হয়েছে। বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম অবস্থা থেকেই কয়েকটী অনাথা মেয়েকে বিনাব্যয়ে ছাত্রীনিবাসে ও বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হ'য়েছে। বিদ্যালয় স্থাপনের সূচনা থেকেই কয়েকজন অভিজ্ঞ অধ্যাপক বিনা বেতনে অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন।

দেশে এখন উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর যথেষ্ট অভাব এবং শিক্ষিতা নারীগণের উপার্জ্জনের পথ সেই দিকেই সমধিক প্রশস্ত, সেই জন্য এই নব প্রতিষ্ঠানে, প্রধানতঃ উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবারই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিক্ষারও আয়োজন করা হয়। প্রথমতঃ মাত্র দুইটী ছাত্রী লইয়া এই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু ছাত্রী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় এপ্রিল মাসে ৬।১ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে একটী ত্রিতল গৃহে, বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাস স্থানান্তরিত

করা হয়, পরে এখানেও স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে উক্ত বাড়ীর সংলগ্ন ৬নং বাদুড়বাগান লেনে ২টা বাড়ী ভাড়া লওয়া হয় এবং তথায় শিল্প বিভাগ এবং প্রথমিক শ্রেণী ইত্যাদি স্থানান্তরিত করা হয়।

গত বৎসর এই বিদ্যালয় থেকে ৩০টী ছাত্রীকে বিভিন্ন ট্রেনিং বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হ'য়েছিল। তারা সকলেই উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ট্রেনিং বিদ্যালয় সমূহে উচ্চতন স্থান অধিকার করেছে।

সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর নেতৃত্বে ছাত্রীদিগকে নানাবিধ হাতের কাজ, ফার্ষ্ট এড্ ও হোম নার্সিং প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। শিল্প, ফার্ষ্ট এড্ ও হোম নার্সিং-এ অনেক ছাত্রী দক্ষতা লাভ করে পদক ও প্রশংসাপত্রাদি লাভ করেছে। বর্ত্তমান বৎসরে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক মহিলাগণকে অল্প সময়ের মধ্যে ম্যাট্রিক পাশ করাবার জন্য বিভিন্ন কোচিং ক্লাশ খোলা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে উন্নততর প্রণালীতে শিক্ষা দানের নিমিত্ত এই বৎসরে শিশুশ্রেণী সমূহও খোলা হ'য়েছে। কলিকাতা কর্পোরেশন এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্বর্ত্তী শিল্পবিভাগের জন্য অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। দেশপূজ্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই বিদ্যালয়ের কার্য্যাবলী দেখে সন্তুষ্ট হ'য়ে ইহার পৃষ্ঠপোষক হ'য়েছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে "বাণীপীঠের" ক্রমিক উন্নতি তথা মেয়েদের শিক্ষার জন্য আকুল আগ্রহ দেখে ইহার কর্ম্মীগণ দেশে ব্যাপক ভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং মাতৃজাতির গৌরব শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর পরিচালনায় গত ৩০শে জানুয়ারী এক সভায় "নারীশিক্ষা-পরিষদ্" নামে একটী সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সভায় পরিষদের ভবিষ্যৎ কার্য্যসূচীর পরিকল্পনা করা হয়। পরে, একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত করে পরিষদের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী প্রভৃতি প্রণয়ন করা হয়।

এরূপ প্রতিষ্ঠান দেশে যত বেশি হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। সহৃদয় দেশবাসীর সহানুভূতির উপর এই একান্ত প্রয়োজনীয় শিশু প্রতিষ্ঠানটীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশা করি দেশবাসীর সহায়তা লাভে দিন দিন এই প্রতিষ্ঠানটী উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে দেশের তথা মাতৃজাতির একটী বিশেষ অভাব দূরীকরণে সমর্থ হ'বে। যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানটীর সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় জানতে ইচ্ছা করেন এবং প্রতিষ্ঠানটীকে সাহায্য করতে ইচ্ছা করেন তাঁরা বাণীপীঠের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন লাহিড়ীর নিকট পত্রাদি ব্যবহার করতে পারেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

পরলোকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনেন্দ্রনাথের সহসা অকাল মৃত্যুতে বাংলা দেশের সঙ্গীত-জগৎটা একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গিয়েছে। এ শূন্যতা আর ভরবে না—অন্ততঃ তাঁদের কাছে, বাংলা দেশে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রথম বন্যার স্মৃতি যাদের মনের মধ্যে থাকবে। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে,—দিনেন্দ্র-নাথের মৃত্যু তাঁদের কাছে একজন পরম আত্মীয়-বিয়োগের মতই বেজেছে। দেশের একটী মস্ত ক্ষতি হ'য়ে গেল, শুধু এই কথাই তাঁরা ভাবছেন না,—নিজেদের একটা দারুণ ব্যক্তি-গত ক্ষতি হ'য়ে গেল,—এই বেদনাই তাঁরা বেশি করে অনুভব করছে'ন।

দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে স্বভাবতঃই যে সুরের বন্যা খরস্রোতা নদীর মতই উচ্ছলিত হ'য়ে উঠ্‌ত, সেই বন্যায় তিনি পরিচিত, অপরিচিত সকলকেই আপনার মধ্যে আকর্ষণ করেছিলেন। তার উপর তাঁর চরিত্রগত মাধুর্য্য ও অমায়িকতা তাঁর ব্যক্তিত্বকে এমন একটা কমনীয়তা দান করেছিল, যে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর সাহচর্য্য লাভ করবার সৌভাগ্য যাঁদের হ'য়েছিল, তাঁরা সে আনন্দ-স্মৃতি জীবনে কখনো ভুলবেন না। রবীন্দ্র-সঙ্গীত যে আজ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে বাঙালীর জীবন-যাত্রাকে একটা অপরূপ মাধুর্য্য আনন্দ ও শ্রী দান করেছে,—তার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট যতখানি, দিনেন্দ্রনাথের নিকটও ঠিক ততখানি কৃতজ্ঞ। মৌলিক সুর-রচনাতেও দিনেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল অসাধারণ।

আমরা দিনেন্দ্রনাথের পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করি, ও তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা নিবেদন করি।

শিল্পী শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা এখানে শ্রীমান সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত দু'খানি তাম্র ফলকে উৎকীর্ণ ছবির প্রতিলিপি দিলাম।

শিল্পী সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি এ দুটির মতো আরও অনেক ছবি তাম্র ফলকে উৎকীর্ণ ক'রে তাতে মীনার কাজ সংযুক্ত করেছেন। লক্ষ্ণৌয়ে গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্ট্স্ এণ্ড ক্রাফ্ট্সে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের নিকট সন্তোষকুমার শিক্ষা লাভ করেছেন। সোনার উপর মীনার কাজও তিনি তথায় শিখেছেন। বিভিন্ন

ঠাকুর রামকৃষ্ণ

শিল্প-প্রদর্শনীতে তাঁর এই সকল কারুশিল্প বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। লক্ষ্ণৌ স্কুল অব্ আর্ট্সের ঠিকানায় ছবি প্রেরণ করলে যে কোনো ধাতু ফলকে তিনি তা উৎকীর্ণ ক'রে মীনার কাজ ক'রে দিতে পারেন। আমরা কামনা করি সন্তোষকুমার তাঁর শিল্প-সাধনায় উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুন।

রাজা রামমোহন রায়

পরলোকে সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বিগত ২৫শে শ্রাবণ ৭৫ বৎসর বয়সে সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা তিনি দেশের অনেক জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত করেছিলেন। বিশেষতঃ কলিকাতার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই ছিলেন সর্ব্বপ্রথম বে-সরকারী ভাইস্-চান্সেলর। ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে তিনি একবার জেনিভা ও আর একবার দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী তিনি দু'খানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন,—সে বই দু'খানি বাংলা-সাহিত্যের ভ্রমণকাহিনী বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রসিদ্ধ সর্ব্বাধিকারী বংশে দেবপ্রসাদের জন্ম হ'য়েছিল। এই বংশের অনেক কৃতী সন্তান বাংলাদেশের মুখোজ্জল করেছেন। আমরা পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করি ও তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা নিবেদন করি।

পরলোকে মনোরমা দেবী

সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী মনোরমা দেবী পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬১ বৎসব হয়েছিল। মনোরমা দেবী বহুগুণ-সম্পন্না নারী ছিলেন এবং 'প্রবাসী' পরিচালনার প্রথম ভাগে রামানন্দবাবু তাঁর শ্রদ্ধেয়া সহধর্ম্মিণীব নিকট হ'তে বহু সাহায্য, এমন কি অফিসের আয়-ব্যয় হিসাবের রক্ষণাবেক্ষণ পর্য্যন্ত, লাভ করেছিলেন।

শ্রীযুক্ত বামানন্দ বাবুর এবং তাঁব পুত্র কন্যাগণেব এই শোকে আমরা আমাদেব আন্তবিক সমবেদনা জ্ঞাপন কবছি।

পরলোকে কবি হেমেন্দ্রলাল রায়

গত ২৭শে আষাঢ় ১৩৩২ খ্যাতনামা কবি ও কথা-সাহিত্যিক হেমেন্দ্রলাল বায় দেড মাস কাল টাইফয়েড জ্বরে ভুগে মাত্র ৪৩ বৎসব বয়সে পবলোক গমন কবেছেন। হেমেন্দ্রলাল একজন প্রকৃত স্বদেশভক্ত ছিলেন এবং তৎ-সম্পর্কে খদ্দর প্রচার কার্য্যে তাঁব পরিশ্রম এবং কার্য্যকুশলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হেমেন্দ্রলাল সাপ্তাহিক 'মহিলা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং অধুনালুপ্ত দৈনিক 'হিন্দুস্থান', সাপ্তাহিক 'বাঁশরী', রাষ্ট্রবাণী', 'হরিজন' প্রভৃতি পত্রিকাব সহকারী কিম্বা সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। কবি ও কথা-শিল্পী হিসাবে হেমেন্দ্রলালেব স্থান যথেষ্ট উচ্চে ছিল, এবং তাঁর রচিত 'ঝড়েব দোলা' উপন্যাস, 'মায়াজাল' 'মণিদীপা' প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ, 'আরব্য উপন্যাস', 'মায়াপুবী', প্রভৃতি শিশু-সাহিত্য পুস্তকে তাঁর সাহিত্যশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে বাঙলা ভাষা সে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তদ্বিষযে সন্দেহ নেই। হেমেন্দ্রলাল নিঃসন্তান ছিলেন।

আমরা হেমেন্দ্রলালেব শোক-সন্তপ্তা বিধবা পত্নী এবং অপরাপব আত্মীয়বর্গকে আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পরলোকে সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

প্রতিভাবান সাংবাদিক সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসুব মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে অকাল মৃত্যু সত্যই শোচনীয় দুর্ঘটনা। সম্প্রতি তিনি দিল্লী ও শিমলায় ইউনাইটেড্ প্রেসের প্রধান সম্পাদক-রূপে কার্য্য করছিলেন। কোয়েটার ভূমিকম্পের পর তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী যিনি বিধ্বস্ত কোয়েটার অবস্থা পরি-দর্শন করতে তথায় যান। সত্যেন্দ্রনাথের মতো উদ্যমশীল প্রতিভাবান সাংবাদিকের অকাল মৃত্যুতে বাঙালী জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পরলোকে অশ্রুমতী দেবী

কলিকাতা ইটালী নিবাসী প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় কেশব-লাল অধিকারী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা অশ্রুমতী দেবী গত ১০ই জুন বাত্রি দুই ঘটিকার সময়ে মাত্র ৩২ বৎসব বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। বাল্যকাল হ'তেই সঙ্গীতে বিশেষরূপ

স্বর্গীযা অশ্রুমতী দেবী

অনুরাগ এবং অধিকার থাকায় অল্প বয়সেই উক্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কালক্রমে সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশযের পত্নীরূপে তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে পবিদর্শিতা অর্জ্জন কবেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা আন্তবিক দুঃখিত হয়েছি এবং শ্রদ্ধেয় গোপেশ্বর বাবু এবং তাঁর আত্মীয়বর্গকে আমাদেব গভীব সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

প্রবেশিকা পরীক্ষা ও শ্রীমতী মঞ্জরী দাসগুপ্তা

গত শ্রাবণ মাসের বিচিত্রায় ভ্রমক্রমে লেখা হয়েছিল 'এবারকাব ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কুমারী আরতি সেন এবং অর্চ্চনা সেনগুপ্তা উভয়েই সমান নম্বর পেয়ে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।' দ্বিতীয় নামটি অর্চ্চনা সেনগুপ্তা না হয়ে মঞ্জরী দাসগুপ্তা হবে। শ্রীমতী আরতি সেন ও শ্রীমতী মঞ্জরী দাসগুপ্তা উভয়ে সমান নম্বর পেয়ে মহিলা ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন। শ্রীমতী মঞ্জরী দাসগুপ্তা অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ভিজিয়ানাগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তর কন্যা।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at the Sahitya Bhaban Press, 26, Sitaram Ghose Street, and published by the same from 27-1, Fariapooker Street, Calcutta.

সঙ্গত

শ্রীইন্দু রক্ষিত

নবম বর্ষ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৪২ | ৬য় সংখ্যা

"হৈ হৈ"-সঙ্ঘের জাতীয় সঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

না-গান-গাওয়ার দল রে আমরা
না-গলা-সাধার।
মোদের ভৈঁরো রাগে রবির
রাগে মুখ আঁধার॥
আমাদের এই অমিল-কণ্ঠ-
সমবায়ের চোটে
পাড়ার কুকুর সমস্বরে
ভয়ে ফুক্‌রে ওঠে,
আমরা কেবল ভয়ে মরি
ধূর্জ্জটি দাদার॥

মেঘ-মল্লার ধরি যদি
ঘটে অনাবৃষ্টি,
ছাতিওয়ালার দোকান জুড়ে
লাগে শনির দৃষ্টি,
আধখানা সুর যেমনি লাগাই
বসন্ত বাহারে
তৎক্ষণাৎ আহা রে-
সেই হাওয়াতে বিচ্ছেদতাপ
পালায় শ্রীরাধার॥

অমাবস্যা রাত্রে যেমনি
বেহাগ গাইতে বসা,
কোকিলগুলোর লাগে দশম দশা।
শুক্ল কোজাগরী নিশায়
জয়জয়ন্তী ধরি,
অমনি মরি মরি
রাহুলাগার বেদন লাগে
পূর্ণিমা চাঁদার ॥

৫ই ভাদ্র, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

২

কাঁটাবনবিহারিণী সুর-কাণা দেবী,
তাঁরি পদ সেবি, করি
তাঁহারি ভজনা
বদ্‌কণ্ঠলোকবাসী
আমরা ক’জনা ॥
আমাদের বৈঠক
বৈরাগীপুরে
রাগরাগিণীর বহু দূরে,
পূর্ব্বের সাধনেই
বিদ্যা এনেছি এই
নিঃসুর-রসাতল-
তলায় মজনা
আমরা ক’জনা ॥

সতেরো পুরুষ গেছে,
ভাঙা তম্বুরা
রয়েছে মর্চ্চে ধরি’
বেসুর-বিধুরা

বেতার সেতার ছুটো
তবলাটা ফাটাফুটো
সুরদলনীর করি
এ নিয়ে যজনা
আমরা ক'জনা ॥

৪ ভাদ্র, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,
হৈ হৈ-পাড়াটা ছেড়ে
দূর দিয়ে যাইয়ে।
হেথা 'সা-রে-গা মা পা'-য়ে
সুরাসুরে যুদ্ধ,
শুদ্ধ কোমলগুলো
বেবাক্ অশুদ্ধ,
অভেদ রাগিণীরাগে
ভগিনী ও ভাইয়ে,
শোনো ভাই গাইয়ে

তার ছেঁড়া তম্বুরা,
তাল-কাটা বাজিয়ে
দিন রাত বেধে যায় কাজিয়ে।
ঝাঁপতালে দাদ্‌রায়
চৌতালে ধামারে
কে কোথায় ঘা মারে,
তেরেকেটে মেরেকেটে
ধাঁ-ধাঁ-ধাঁইয়ে ॥

৬ ভাদ্র, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

৪

ও ভাই কানাই, কারে জানাই
দুঃসহ মোর দুঃখ।
তিনটে চারটে পাশ করেছি
নই নিতান্ত মুংখ॥
তুচ্ছ 'সা-রে-গা-মা'য়
আমায় গলদ্‌ঘর্ম্ম ঘামায়।
বুদ্ধি আমার যেমনি হোক
কান দুটো নয় সূক্ষ্ম—
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই-রে
এই বড়ো মোর দুঃখ॥

বান্ধবীকে গান শোনাতে ডাক্‌তে হয় সতীশকে—
হৃদয়খানা ঘুরে মরে গ্রামোফোনের ডিস্কে।
কণ্ঠখানার জোর আছে তাই
লুকিয়ে গাইতে ভরসা না পাই,
স্বয়ং প্রিয়া বলেন তোমার
গলা বড়োই রুক্ষ—
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই রে,
এই বড়ো মোর দুঃখ॥

৬ ভাদ্র, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

বন্যায় সাহায্যার্থে ৭ই ভাদ্র, শনিবার, (১৩৪২) শান্তিনিকেতনে
হৈ হৈ সঙ্ঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'ভরসামঙ্গলে'র পালা গান।

বাংলা বইয়ের দুঃখ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর কিছু না হোক অন্ততঃ একটি উপকার আমরা পেয়েচি। ইউরোপের নানা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তিনি যা বললেন হয়ত তার অনেক কথাই আমাদের মনে থাকবেনা। কিন্তু আজ তাঁর বক্তৃতা শুনে আমাদের মনে জেগেচে একটা আকুলতা। ইউরোপের গ্রন্থাগারের অবস্থা যে রকম উন্নত, সে রকম অবস্থা যে আমাদের দেশে কবে হবে—তা' কল্পনাও করা যায় না। তবে যেটুকু হওয়া সম্ভব, তার জন্যে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। চারদিক থেকে অভিযোগ ওঠে, আমাদের গ্রন্থাগারে ভাল বই নেই,—আছে কেবল বাজে নভেল। আমাদের লেখকেরা জ্ঞানগর্ভ বই লেখেন না। তাঁরা কেবল গল্প লেখেন। কিন্তু তাঁরা লিখবেন কোথা থেকে? এই অতি-নিন্দিত গল্পলেখকদের দৈন্যের সীমা নেই। অনেকেরই উপন্যাসের হয়ত দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না। যা বা লাভ হয় সে যে কার গর্ভে গিয়ে ঢোকে তা না বলাই ভালো। অনেকের হয়ত ধারণাই নেই, যে, এই-সব লেখক সম্প্রদায় কত নিঃস্ব, কত নিঃসহায়।

বিলাতে কিন্তু গল্পলেখকদের অবস্থা অন্যরকম। তারা ধনী। তাদের এক একজনের আয় আমরা কল্পনা করতেও পারিনে। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পুস্তকের সংস্করণের পর সংস্করণ হয়। কারণ ওদেশে অন্ততঃ সামাজিকতার দিক থেকেও লোকে বই কেনে। কিন্তু আমাদের দেশে সে বালাই নেই। ওদেশে বাড়ীতে গ্রন্থাগার রাখা একটা আভিজাত্যের পরিচয়। শিক্ষিত সকলেরই বই কেনার অভ্যাস আছে। না কিনলে নিন্দে হয়,—হয়ত বা কর্ত্তব্যেরও ত্রুটি ঘটে। আর অবস্থাপন্ন লোকদের ত' কথাই নেই। তাঁদের প্রত্যেকেরই বাড়ীতে এক একটা বড় গ্রন্থাগার আছে। পড়ার লোক থাকুক বা না থাকুক—গ্রন্থাগার রাখাই যেন একটা সামাজিক কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগা জাত আমরা। আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যেও পুস্তকের প্রচলন নেই। অনেকে হয়ত মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সমালোচনার ছলে শুধু গালি-গালাজের উপকরণ সংগ্রহ করে নেন। যদি খোঁজ নেন ত' দেখতে পাবেন, তাঁদের অনেকেই মূল বইখানা পর্য্যন্ত পড়েননি। আমি নিজেও একজন সাহিত্য-ব্যবসায়ী। নানা জায়গা থেকে আমার ডাক আসে। অনেক বড়লোকের বাড়ীতে আমি গেচি। খোঁজ নিয়ে দেখিচি, তাঁদের আছে সবই—নেই কেবল গ্রন্থাগার। বই কেনা তাঁদের অনেকের কাছেই অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যাঁদের বা একান্তই আছে, তাঁরা কয়েকখানা চক্‌চকে বই বাইরের ঘরে সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু বাংলা বই মোটেই কেনেন না।

তাই বাংলায়—যাকে আপনারা জ্ঞানগর্ভ বই বলছেন—সে হয় না কারণ বিক্রী নেই। বিক্রী হয় না বলেই প্রকাশকেরা ছাপাতে চান না। তাঁরা বলেন, ও সবের কোন চাহিদা নেই—নিয়ে এস

গল্প। লোকে ভাবে, গল্প লেখাটা বড়ই সোজা। শুভানুধ্যায়ী পাড়ার লোকে যেমন অক্ষম আত্মীয়কে পরামর্শ দেয় তোকে দিয়ে আর কিছু হবে না, যা তুই হোমিওপ্যাথি করগে' যা। অথচ হোমিওপ্যাথির মত শক্ত কাজ খুব কমই আছে। এর কারণ হচ্চে, যে জিনিষটা সকলের চেয়ে শক্ত, তাকেই অনেকে সবচেয়ে সহজ ধরে নেয়। ভগবান সম্বন্ধে কথা বলা যেমন দেখি ; তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে কারও কখনো বিদ্যে বুদ্ধির অভাব ঘটে না।

গল্পলেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কি হবে ? টাকার অভাবে কত ভাল ভাল কল্পনা—কত বড় বড় প্রতিভা যে নষ্ট হয়ে যায়,—তার খবর কে রাখে ? যৌবনে আমার একটা কল্পনা ছিল,—একটা উচ্চাশা ছিল যে "দ্বাদশ মূল্য" নাম দিয়ে আমি একটা volume তৈরী করব। যেমন, সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, মৃত্যুর মূল্য, দুঃখের মূল্য, নরের মূল্য, নারীর মূল্য—এইরকম মূল্য-বিচার। তারই ভূমিকা হিসাবে তখনকার কালে "নারীর মূল্য" লিখি। সেটা বহুদিন অপ্রকাশিত পড়ে থাকে। পরে "যমুনা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সেই "দ্বাদশ মূল্য" আর শেষ করতে পারিনি,—তার কারণ অভাব। আমার জমিদারী নেই, টাকা নেই, তখন এমন কি দুবেলা ভাত জোটবার পয়সা পর্য্যন্ত ছিল না। প্রকাশকেরা উপদেশ দিলেন, ওসব চলবে না। তুমি যা তা করে তার চেয়ে দুটো গল্প লিখে দাও,—তবু হাজার খানেক কাটবে। আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্যই বলুন কিংবা দুর্ভাগ্যই বলুন,—বই কিনে আমরা লেখকদের সাহায্য করিনা। এমন কি যাঁদের সঙ্গতি আছে—তাঁরাও করেন না। বরং অভিযোগ করেন, গল্প লিখে হবে কি ? অথচ আজ অন্তঃপুরের যেটুকু স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েচে, তা' এই গল্পের ভেতর দিয়েই।

কত বড় বড় কবি উৎসাহের অভাবে নাম করতে পারেননি। পরলোকগত সত্যেন দত্তর শোক-বাসরে গিয়ে দেখেছিলুম, অনেকে সত্যিই কাঁদচেন। তখন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলুম,—কড়া কথা বলা আমার অভ্যাস আছে, এরকম ক্ষেত্রে কড়া কথা মাঝে মাঝে বলেও থাকি—সেদিন বলেছিলুম, এখন আপনারা কেঁদে ভাসাচ্ছেন কিন্তু জানেন কি যে বারো বছরে তাঁর পাঁচশখানা বই বিক্রী হয়নি। অনেকে বোধকরি তাঁর সব পুস্তকের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। অথচ, আজ এসেছেন অশ্রুপাত করতে।

আমাদের বড়লোকরা যদি অন্ততঃ সামাজিক কর্ত্তব্য হিসাবেও বই কেনেন, অর্থাৎ যাতে দেশের লেখকদের সাহায্য হয়—এমন চেষ্টা করেন, তাতে সাহিত্যের উন্নতিই হবে। লেখকেরা উৎসাহ পাবেন, পেটে খেতে পাবেন,—নিজেরা নানা বই পড়বার অবসর পাবেন। এর ফলে তাঁদের জ্ঞানবৃদ্ধি হবে, তবেত' তাঁরা 'জ্ঞানগর্ভ' বই লিখতে পারবেন।

রায় মহাশয়েয় বক্তৃতা শুনে আর একটা কথা বেশী করে আমাদের নজরে পড়ে যে, ওদেশের যা কিছু হয়েচে, তা করেচে ওদেশের জন-সাধারণ। তারা মস্তলোক। তাদেরই মোটা মোটা দানে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেচে। আমরা প্রায়ই সরকারকে গালাগালি দিই। কিন্তু এই আমাদেরই দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডার ভরল কতটুকু ! তিনি দেশের জন্যে কত করেচেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্যে কত আবেদনই

না বেরুল। কিন্তু সে ভিক্ষাপাত্র আজও আশানুরূপ পূর্ণ হল না; অথচ ইংলণ্ডে "ওয়েষ্ট মিনষ্টার এবি"র এক কোণে যখন ফাটল ধরে, সেখানকার ডীন কুড়ি লক্ষ পাউণ্ডের জন্যে এক আবেদন করেন। কয়েকমাসের মধ্যে এত টাকা এল যে শেষে তিনি সেই ফণ্ড বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ দাতারা নাম বাজাবার জন্যে যে দান করেননি তা স্পষ্ট বোঝা যায় কারণ কাগজে কারোরই নাম বেরোয়নি। এতটা সম্ভব হয় তখনই যখন লোকের মধ্যে স্বদেশ সম্বন্ধে একটা প্রবুদ্ধ মন গড়ে ওঠে।

আমার প্রার্থনা, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় দীর্ঘজীবী হোন। তাঁর এই প্রারব্ধ কাজে উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করুন। ওঁর কথা শুনে আমাদের মনে জাগে আকুলতা। যাঁর যে পরিমাণ শক্তি লাইব্রেরী আন্দোলনের জন্যে তাই দেনত' দেশের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে। আমাদের নিজেদের দেখার হয়ত অবসর ঘটবে না। কিন্তু আশা হয়, আজকের দিনে যাঁরা তরুণ,—যাঁরা বয়সে ছোট, তাঁরা নিশ্চয়ই একাজের কিছু ফল দেখতে পাবেন।

"কোন্নগর পাঠচক্রের" চেষ্টায় এই যে সব মূল্যবান কথা শোনা গেল, তার জন্যে বক্তা এবং সভ্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। আজ বড় আনন্দ পেলাম,—শিক্ষা পেলাম,—মনের মধ্যে ব্যথাও পেলাম। কোথায় ইউরোপ আর কোথায় আমাদের দুর্ভাগা দেশ! যুগযুগান্তরের পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে। একমাত্র ভগবানের বিশেষ করুণা ছাড়া পরিত্রাণের আর ত' কোন আশা দেখি না।

* কোন্নগর পাঠ-চক্রে সভাপতির অভিভাষণ।

শরৎচন্দ্র

কাব্যে রবীন্দ্রনাথের দুই রূপ—মধ্যযুগের আরম্ভ

শ্রীসুখরঞ্জন রায় এম্‌-এ

মানসী

মানসী হইতেই কবির কাব্য-জীবনের মধ্যযুগ আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। কবির কিশোর বয়সের সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন "কড়ি ও কোমলের" প্রথম যৌবনে একদিকে দেহতন্ত্রতার জমিয়া আসিবার অপেক্ষা ছিল, কারণ এই বস্তুসম্পর্কিত প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই কবির পক্ষে প্রেমে মানসতার (Intellectualityর) প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে—অশরীরী ছায়া'র উপর নয়। "কড়ি ও কোমলেই" দেখিতে পাই কবির উদ্বুদ্ধ হৃদয়বল ও মহত্ব সেই কাব্যের দেহতন্ত্রতাকে যেমন একদিকে সংযত করিয়াছে, তেমনই কবির চিরন্তন মানসতা অন্যদিক দিয়া এই দেহতন্ত্রতার বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। নিছক দেহ-সৌন্দর্য্যকে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিবার সময়ই কবির দুই একটি ইঙ্গিতে এমনি একটা মানস (Intellectual) আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে দেহের সঙ্গে দেহাতীত কিছুও আমাদের চক্ষে না পড়িয়া যায় না। প্রেমের এই মানসতা "মানসী" কাব্যের মধ্যেই প্রথম রূপ পরিগ্রহ করিয়া উঠিয়াছে। "মানসীতে" বেশীর ভাগই প্রেমের কবিতা, কিন্তু "কড়ি ও কোমল" হইতে এই এক পাদমাত্র অগ্রসর হইয়া দেখি এখানে প্রেম-ব্যাপারে দেহ জিনিসটা সম্পূর্ণ আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে। অথচ ইহা ঠিক Platonic Loveও নহে। কবি তাঁর মনের কল্পনাকে রূপ দিয়াছেন, তিনি অসীমের সীমা রচিয়াছেন, আশা দিয়া ভাষা দিয়া আর ভালবাসা দিয়া মানসী প্রতিমা গড়িয়া তুলিয়াছেন। সেই মানস-প্রতিমাখানি আকুল কবিকে "দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে" বাঁধিয়াছে। কিন্তু এই মানসী এখনো মানবীই; পৃথিবীর সুখে দুঃখে বিরহে মিলনে ভুলে সংশয়ে পার্থিব নারীকে অবলম্বন করিয়াই এখনো তাঁর মানস তৃপ্তি। এই নারীর নয়নেই তিনি দেখিতেছেন আত্মার রহস্য—

> বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
> স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
> ওই নয়নের
> নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
> আত্মার রহস্যশিখা। (নিষ্ফল কামনা)

নারী আছে অথচ নারীদেহ সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু কবি সেটা আশঙ্কার জিনিষ করিয়া তুলেন নাই।

> শত দল উঠিয়াছে ফুটি,—
> সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
> তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
> লও তার মধুর সৌরভ,
> দেখ তার সৌন্দর্য্য বিকাশ,
> মধু তার কর তুমি পান,
> ভালবাস, প্রেমে হও বলী,
> চেয়ো না তাহারে,
> আশঙ্কার ধন নহে আত্মা মানবের।

"সুরদাসের প্রার্থনায়" দেহের ভিতর দিয়াই প্রেমের দেহহীন জ্যোতি কবি হৃদয়-আকাশে জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

এখন এই প্রেম দুইটি হৃদয়কে ছাপাইয়া জগতে গিয়া ছাইয়া পড়িতেছে।—

> তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
> পড়িবে জগতে,
> মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
> সংসারের পথে, ('সংশয়ের আবেগ')

শুধু তাই নয়, জগৎ ছাপিয়া তাহা অসীমের পানে পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে।

> শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, বাধা নাই পথে,
> জীবন ব্যাপিয়া যায় জগতে জগতে,
> দুটি প্রাণতন্ত্রী হতে পূর্ণ একতানে
> উঠে গান অসীমের সিংহাসন পানে। ("আকাঙ্ক্ষা")

এই প্রেমকে কবি 'অনন্ত প্রেমে' কালের সীমা লঙ্ঘন করিয়া সুদূর অতীতে এবং অসীম ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, "ধ্যানে" উদার আকাশ এবং অসীম পাথারের মাঝখানকার আকুল আনন্দ-পূর্ণিমার মধ্যে তার স্বরূপ কল্পনা করিয়া প্রেমকে এমনি একটা সমুন্নত মহিমা দিয়া দিয়াছেন জগতের প্রেম-কবিতায় যাহার তুলনা নাই। প্রেম-কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিছক প্রেমের কবিতায়ও শুধু সম্ভোগ আবেগ ও আবেশেরই ছবি আঁকেন নাই, বরং প্রেমকে এমনি এক লোকে আনিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন যেখানে তাকে "যোগ বলিলেও বলা যায়", যেখানে তার উপর সত্য ও মঙ্গলের দ্যুতি আসিয়া পড়িয়াছে।

নিম্নে শুধু কোলাহল খেলা ধূলা হাস,
উপরে নির্লিপ্ত শান্ত অনন্ত আকাশ;
আলোকেতে দেখ শুধু ক্ষণিকের খেলা,
অন্ধকারে আছি আমি অসীম একেলা।

প্রেমিক-হৃদয়ের এই যে ছবি তার উপরে সত্য, নিম্নে সুন্দরের খেলা, উপরে "সত্য আছে শুদ্ধ ছবি, যেমন উষার রবি", "নিম্নে তারি ভাঙাগড়া মিথ্যা যত কুহক কল্পনা", এই প্রেমকেই কবি আবার মানব-সংসারের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন, মানবের সেবায় তাকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহা হইতে কল্যাণের আলো বিচ্ছুরিত করিয়া দিয়াছেন।

সত্য ও মঙ্গল হইতে কতকটা বিচ্যুত হইয়া কবি যেখানে শুধু সুন্দরের পূজা করিতে চাহিয়াছেন, যেখানেই তিনি শুধু আবেগ শুধু আবেশে গা ঢালিয়া দিতে চাহিয়াছেন সেখানেই ভিতরে ভিতরে একটা অসোয়াস্তি থাকিয়া তাঁকে পীড়া দিয়াছে। একদিকে এই আবেগ, অন্যদিকে নিষ্ঠা ও সংকল্প, একদিকে জগৎ-ব্যাপারে উদাসীন হইয়া শুধু বংশী-বাদন, অন্যদিকে জগতের কাজের আকর্ষণ এই দুইয়েয় দ্বন্দ্ব "ভৈরবী-গানে" মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কবি শেষে হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের উপর জয়ী হইয়াছেন, কাল ও মন হইতে ভৈরবী গানের কুহক মুছিয়া ফেলিয়া বলিতেছেন—

থাম, শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া।
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসার-পথ
তরিয়া
যত মানবের গুরু মহৎ জনের
চরণচিহ্ন ধরিয়া।

"মানসী" কাব্যের মধ্যে পুরাপুরি অধ্যাত্মোপলব্ধির কবিতা একমাত্র "জীবন-মধ্যাহ্নকেই" বলা চলে। জীবন-মধ্যাহ্নে যখন পথ কুটিল হইয়া উঠিয়াছে, জীবন হইয়াছে, জটিল, ধরণীর ধূলিমাঝে গুরু আকর্ষণে কবির "পতন হইল কতবার" তখনই কবি আকুল হইয়া "নিখিল নির্ভরকে" ডাকিলেন, তখনই প্রকৃতির ভিতর দিয়া "চির-স্বপ্রকাশ" কবিকে সান্ত্বনা দিলেন, কবি অনুভব করিলেন—

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল।

অনুভব করিলেন—

শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর
বেড়ে যায় জীবনের গতি,
ধূলি ধৌত দুঃখশোক শুভ্র শান্ত বেগে
ধরে যেন আনন্দ-মুরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি' জীবন কুহরে
মঙ্গল আনন্দ-ধ্বনি বাজে।

চিত্তে মহত্ত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের কাজে লাগিবার সংকল্পও কবির মনে আসিল। তাই "কড়ি ও কোমলের" যুগ হইতেই দেশ-প্রেমের কবিতা তাঁর কাব্যে স্থান পাইয়াছে দেখিতে পাই, "মানসীতে"ও কয়েকটি দেশ-প্রেমের কবিতা আছে। "দুরন্ত আশাতে" দেখি কবি বিপদের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শোণিত ফুটাইয়া তুলিতে, সর্ব্বদেহে সর্ব্বমনে জীবন জাগাইয়া তুলিতে চাহিতেছেন, দেখি "আম্রবনছায়ে" ক্ষুদ্র শান্তি লইয়া বঙ্গপল্লীসন্তানের মত তিনি আর তৃপ্ত থাকিতে পারিতেছেন না। যেখানে

সত্য পথে আপন বলে
তুলিয়া শির সকলে চলে,
মরণ ভয় চরণ তলে ("দেশের উন্নতি")

"দলিত হয়ে রয়" কবি কর্ম্মীরূপে সেইখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

মহত্ত্ব-উদ্বোধক গাথা শ্রেণীর কবিতা যা 'কথা' কাব্যে চরম রূপ নিয়াছে তাহার প্রথম আবির্ভাব এই "মানসীতেই"

দেখিতে পাই—"নিষ্ফল উপহারে" এবং "গুরুগোবিন্দে"। রাষ্ট্রনেতার যে সাধনা থাকা উচিত রবীন্দ্রনাথ জীবনের কল-কোলাহলের কতকটা বাহিরে তাহা অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি এতদিন নির্জ্জনে আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছেন, এখন কার্য্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রনায়করূপে তিনি নামিয়া যাইতে পারিতেন।

হায়, সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি'
হাতে লয়ে জয়-তুরি
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি!

কবির কর্ম্মীচিত্তের এই ইচ্ছা, তাঁর জীবনের রাষ্ট্রীয় সম্ভাবনা গুরুগোবিন্দের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। "গুরুগোবিন্দের" সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর সেই সম্ভাবনাকে জীবনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল করেন নাই, তিনি অন্য ক্ষেত্রে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন; এই রাষ্ট্রক্ষেত্রে শুধু তপস্যা ও আয়োজন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই যেন সুসময়ে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে গান্ধীর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যেন খৃষ্ট ও চৈতন্যের পূর্ব্বে জন্‌ ও অদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাবের মতই।

"হেনকালে আইল যুগাবতার সময়।
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন;
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

সোনার তরী

"সোনার তরীর" মধ্যে মহত্ত্ব উদ্বোধক গাথা, দেশপ্রেমের কবিতা কিম্বা নিছক আধ্যাত্মিকতার সুর একেবারেই নাই, কিন্তু কাব্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা ইহাতে দেখিতে পাই। এই কাব্যে জীবনের সহিত কবির পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে, তাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধ বেশী করিয়া সত্যের সহিত যুক্ত হইয়াছে, কবির মানসতা বাড়িয়া গিয়াছে। এখানে সৌন্দর্য্য সত্যোপেত, চিন্তা সুশোভন, প্রকাশভঙ্গী সুসংযত ও ঘনীভূত, কাব্যের শিল্পলক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। কবি সৌন্দর্য্যের "দেউল"—তাঁর "Palace of Art"—রচনা করিয়া ত্রিভুবনকে বাহিরে রাখিয়া বিশ্বজনকে ভুলিয়া সৌন্দর্য্যের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন—ললিতকলার আভিজাত্যে একা প' ছিলেন—আজ সেই দেউলের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে, বিশ্বভুবন আসিয়া সেখানে প্রবেশ করিয়াছে।

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি'
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি।

আজ "বিশ্ব-নৃত্যে" যোগ দিতে ছুটিয়াছেন;

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে,
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন অমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে।
জগৎ-মাতানো সঙ্গীত তানে
কে দিবে এদের নাচায়ে?
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে?
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজাল পাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিবে মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীবন-খাঁচা এ।

এখানে দেশপ্রেম ও বিশ্বমানবতা সকলই আছে, জীবনের কবি পরিপূর্ণ আলিঙ্গনে জীবনকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। "মায়াবাদ" হইতে "আত্ম-সমর্পণ" পর্য্যন্ত সনেটগুলিতে আমরা সেই সংবাদই পাই। কবি বলিতেছেন—

চাহিনা ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।

মানব ও বিশ্ব ছাড়িয়া তিনি মুক্তিও চাহেন না।

বিশ্ব যদি চ'লে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে?

মানব-পূজারী কবি "বৈষ্ণব কবিতায়" "প্রিয়জনকে যাহা দিতে পারি, দিই তাহা দেবতারে" বলিয়া দেবতাকে আনিয়া মানবের সহিত এক করিয়া দিয়াছেন। "বসুন্ধরায়" দেশে দেশান্তরে সর্ব্বলোক সনে স্বজাতি হইয়া যাইবার ইচ্ছার মধ্যে কবির বিশ্ববোধের আকাঙ্ক্ষা নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই।

বাহিরের দিকে বিশ্বের সঙ্গে মানবের সঙ্গে যোগ, অন্ত দিকে অন্তরের নিভৃত কোণে সৌন্দর্য্যের পূজা, প্রেমের সাধনা, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই দুই রূপ গায় গায় লাগিয়া আছে। কবির কাব্যে এই দুই রূপ বহুরকম সংযোগে বিয়োগে সমন্বয়ে এবং দ্বন্দ্বে দেখা দিয়াছে। জীবনের সঙ্গে যেখানে কবির যোগ সেখানে দেশসেবা মানবসেবায় নানা কর্ম্মচেষ্টা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে সত্যের শাশ্বত দীপ্তি ফুটিয়াছে, নিষ্কলঙ্ক কল্যাণের মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; সেটা সুপরিস্ফুট, নিতান্ত অন্ধ না হইলে সেটা চোখে না পড়িবার কথা নয়। কিন্তু কবির সৌন্দর্য্য-সাধনার মধ্যেও যে সত্যের ধ্রুবত্ব রহিয়াছে এবং মঙ্গলের শুভ্র দীপ্তি আসিয়া পড়িয়াছে সেটা অনুধাবন-সাপেক্ষ। "মানসীর" প্রেমের ধারণায় আমরা সেটা দেখিয়াছি, "সোনার তরীতে"ও তাহা দেখিতে পাই। "সোনার তরীতে"ও মানসীর প্রেমের কবিতার মত নিছক প্রেমের কবিতা অনেকগুলি আছে। "অচলস্মৃতি" কবিতাটি 'মানসীর' "ধ্যানের" পাশেই বসিবার যোগ্য। ইহাতে পাই "ধ্যানেরই" প্রেম-সমুন্নতি।

> শিখর গগনলীন
> দুর্গম জনহীন;
> বাসনা-বিহগ একেলা সেথায়
> ধাইতেছে নিশিদিন।
> চারিদিকে তার কত আসা যাওয়া
> কত গীত কত কথা,
> মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন
> নিশ্চল নীরবতা।

"মানস-সুন্দরীর" ধ্যানে কবির প্রেমের কবিতা তার চরম রূপ পাইয়াছে, তার স্বাভাবিক মানস (intellectual) পরিণতিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। "কড়ি ও কোমলের" সম্ভোগ্যা নারী "মানসী"তে দেহহীন জ্যোতিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কবি মানসী-প্রতিমা গড়িতে চাহিলেও সেখানেও তা নারীই। সোনার তরীর মানস-সুন্দরী সম্পূর্ণ মানস বা intellectual। এ কবিতাটি হইতেছে রবীন্দ্রনাথের "Ode to Intellectual Beauty"। এই কবিতার "সুন্দরী" এবং "নিরুদ্দেশ যাত্রার" সুন্দরী, যিনি কবিকে যেখানে "ঝলিতেছে জল তরল অনল, গলিয়া পড়িছে অম্বরতল" "তারও ওপারে—"beyond the sunset, and the baths of all the western stars"—লইয়া যাইতেছেন, তিনি হইতেছেন কবির যৌবনারম্ভের কবিতাবধূ, যৌবনান্ত-কালের "জীবনদেবতা" ও "অন্তর্যামী," যাকে বার্দ্ধক্যের শেষ প্রান্তে আসিয়া কবি "লীলাসঙ্গিনী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই কবিতাসুন্দরীর সঙ্গে মর্ত্ত্যের নারীও আসিয়া কখন যুক্ত হইয়া গিয়াছেন, কারণ দেখিতে পাই যাকে কবি কবিতা-রাণী বলিয়া কল্পনা করিতেছেন তাকেই পূর্ব্বজন্মের প্রেয়সী বলিয়া মনে করিতেছেন।

> গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
> বিশ্বেয় কবিতা রূপে হয়েছ উদয়।

মিলনে যিনি পূর্ব্বজন্মে এক ঠাঁই বাঁধা ছিলেন তিনিই আজ বিরহে বাধা টুটিয়া বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছেন; ধূপ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, গন্ধ তার আজি চারিধার পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। যাকে বিরহে আজ তিনি ত্রিভুবনে খুঁজিতেছেন, তাকেই আবার মর্ত্ত্যনারীরূপে বাহুর বন্ধনে লাভ করিবেন কবি এই আশা করিতেছেন। কারণ—

> এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
> জ্বলিছে নিবিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
> কখনো বা ভাবময়, কখন মুরতি।

এই ধারণার মধ্যেই কবির দার্শনিকতা বর্ত্তমান, বিশ্ব-সত্যকে এখানে কবি উপলব্ধির রাজ্যে হৃদয়ের জিনিষ করিয়া তুলিয়াছেন, প্রেমকে দিয়া দিয়াছেন সত্যের সমুচ্চ মহিমা, সত্যের ললাটে দিয়াছেন সৌন্দর্য্যের তিলক। জলে স্থলে নীলাকাশে যে মানসী কবির বাহুবন্ধন এড়াইয়া দূরে দূরে সরিয়া যাইতেছেন তাকে কবি বলিতেছেন—তোমাকে আবার যখন আমার গৃহের বনিতারূপে পাইব তখন—

> বাজিবে তোমায় সুর
> সর্ব্ব দেহে মনে। জীবনের প্রতি সুখে
> পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
> পড়িবে তোমায় অশ্রুজল, প্রতি কাজে
> র'বে তব শুভ হস্তদুটী, গৃহ মাঝে
> জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি

দেখিতে পাই—"নিষ্ফল উপহারে" এবং "গুরুগোবিন্দে"। রাষ্ট্রনেতার যে সাধনা থাকা উচিত রবীন্দ্রনাথ জীবনের কল-কোলাহলের কতকটা বাহিরে তাহা অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি এতদিন নির্জ্জনে আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছেন, এখন কার্য্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রনায়করূপে তিনি নামিয়া যাইতে পারিতেন।

হায়, সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি'
হাতে লয়ে জয়-তুরি
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি!

কবির কর্ম্মীচিত্তের এই ইচ্ছা, তাঁর জীবনের রাষ্ট্রীয় সম্ভাবনা গুরুগোবিন্দের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। "গুরু-গোবিন্দের" সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর সেই সম্ভাবনাকে জীবনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল করেন নাই, তিনি অন্য ক্ষেত্রে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন; এই রাষ্ট্রক্ষেত্রে শুধু তপস্যা ও আয়োজন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই যেন সুসময়ে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে গান্ধীর পূর্ব্বে রবীন্দ্র-নাথের আবির্ভাব যেন খৃষ্ট ও চৈতন্যের পূর্ব্বে জন্ ও অদ্বৈতা-চার্য্যের আবির্ভাবের মতই।

"হেনকালে আইল যুগাবতার সময়।
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন;
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

সোনার তরী

"সোনার তরীর" মধ্যে মহত্ত্ব উদ্বোধক গাথা, দেশপ্রেমের কবিতা কিম্বা নিছক আধ্যাত্মিকতার সুর একে-বারেই নাই, কিন্তু কাব্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা ইহাতে দেখিতে পাই। এই কাব্যে জীবনের সহিত কবির পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে, তাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধ বেশী করিয়া সত্যের সহিত যুক্ত হইয়াছে, কবির মানসত্তা বাড়িয়া গিয়াছে। এখানে সৌন্দর্য্য সত্যোপেত, চিন্তা সুশোভন, প্রকাশভঙ্গী সুসংযত ও ঘনীভূত, কাব্যের শিল্পলক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। কবি সৌন্দর্য্যের "দেউল"—তাঁর "Palace of Art"—রচনা করিয়া ত্রিভুবনকে বাহিরে রাখিয়া বিশ্বজনকে ভুলিয়া সৌন্দর্য্যের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন—ললিতকলার আভিজাত্যে একা পড়িয়া ছিলেন—আজ সেই দেউলের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে, বিশ্ব-ভুবন আসিয়া সেখানে প্রবেশ করিয়াছে।

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি'
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি।

আজ "বিশ্ব-নৃত্যে" যোগ দিতে ছুটিয়াছেন;

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে,
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন অমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে।
জগৎ-মাতানো সঙ্গীত তানে
কে দিবে এদের নাচায়ে?
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে?
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজাল পাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিবে মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীবন-খাঁচা এ।

এখানে দেশপ্রেম ও বিশ্বমানবতা সকলই আছে, জীবনের কবি পরিপূর্ণ আলিঙ্গনে জীবনকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। "মায়াবাদ" হইতে "আত্ম-সমর্পণ" পর্য্যন্ত সনেটগুলিতে আমরা সেই সংবাদই পাই। কবি বলিতেছেন—

চাহিনা ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।

মানব ও বিশ্ব ছাড়িয়া তিনি মুক্তিও চাহেন না।

বিশ্ব যদি চ'লে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে?

মানব-পূজারী কবি "বৈষ্ণব কবিতায়" "প্রিয়জনকে যাহা দিতে পারি, দিই তাহা দেবতারে" বলিয়া দেবতাকে আনিয়া মানবের সহিত এক করিয়া দিয়াছেন। "বসুন্ধরায়" দেশে দেশান্তরে সর্ব্বলোক সনে স্বজাতি হইয়া যাইবার ইচ্ছার মধ্যে কবির বিশ্ববোধের আকাঙ্ক্ষা নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই।

বাহিরের দিকে বিশ্বের সঙ্গে মানবের সঙ্গে যোগ, অন্ত দিকে অন্তরের নিভৃত কোণে সৌন্দর্য্যের পূজা, প্রেমের সাধনা, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই দুই রূপ গায় গায় লাগিয়া আছে। কবির কাব্যে এই দুই রূপ বহুরকম সংযোগে বিয়োগে সমন্বয়ে এবং দ্বন্দ্বে দেখা দিয়াছে। জীবনের সঙ্গে যেখানে কবির যোগ সেখানে দেশসেবা মানবসেবায় নানা কর্ম্মচেষ্টা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে সত্যের শাশ্বত দীপ্তি ফুটিয়াছে, নিষ্কলঙ্ক কল্যাণের মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; সেটা সুপরিস্ফুট, নিতান্ত অন্ধ না হইলে সেটা চোখে না পড়িবার কথা নয়। কিন্তু কবির সৌন্দর্য্য-সাধনার মধ্যেও যে সত্যের ধ্রুবত্ব রহিয়াছে এবং মঙ্গলের শুভ্র দীপ্তি আসিয়া পড়িয়াছে সেটা অনুধাবন-সাপেক্ষ। "মানসীর" প্রেমের ধারণায় আমরা সেটা দেখিয়াছি, "সোনার তরীতে"ও তাহা দেখিতে পাই। "সোনার তরীতে"ও মানসীর প্রেমের কবিতার মত নিছক প্রেমের কবিতা অনেকগুলি আছে। "অচলস্মৃতি" কবিতাটি 'মানসীর' "ধ্যানের" পাশেই বসিবার যোগ্য। ইহাতে পাই "ধ্যানেরই" প্রেম-সমুন্নতি।

> শিখর গগনলীন
> দুর্গম জনহীন;
> বাসনা-বিহগ একেলা সেথায়
> ধাইতেছে নিশিদিন।
> চারিদিকে তার কত আসা যাওয়া
> কত গীত কত কথা,
> মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন
> নিশ্চল নীরবতা।

"মানস-সুন্দরীর" ধ্যানে কবির প্রেমের কবিতা তার চরম রূপ পাইয়াছে, তার স্বাভাবিক মানস (intellectual) পরিণতিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। "কড়ি ও কোমলের" সম্ভোগ্যা নারী "মানসী"তে দেহহীন জ্যোতিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কবি মানসী-প্রতিমা গড়িতে চাহিলেও সেখানেও তা নারীই। সোনার তরীর মানস-সুন্দরী সম্পূর্ণ মানস বা intellectual। এ কবিতাটি হইতেছে রবীন্দ্রনাথের "Ode to Intellectual Beauty"। এই কবিতার "সুন্দরী" এবং "নিরুদ্দেশ যাত্রার" সুন্দরী, যিনি কবিকে যেখানে "ঝলিতেছে জল তরল অনল, গলিয়া পড়িছে অম্বরতল" "তারও ওপারে—"beyond the sunset, and the baths of all the western stars"—লইয়া যাইতেছেন, তিনি হইতেছেন কবির যৌবনারম্ভের কবিতাবধূ, যৌবনান্ত-কালের "জীবনদেবতা" ও "অন্তর্যামী," যাকে বার্দ্ধক্যের শেষ প্রান্তে আসিয়া কবি "লীলাসঙ্গিনী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই কবিতাসুন্দরীর সঙ্গে মর্ত্ত্যের নারীও আসিয়া কখন যুক্ত হইয়া গিয়াছেন, কারণ দেখিতে পাই যাকে কবি কবিতা-রাণী বলিয়া কল্পনা করিতেছেন তাকেই পূর্ব্বজন্মের প্রেয়সী বলিয়া মনে করিতেছেন।

> গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
> বিশ্বের কবিতা রূপে হয়েছ উদয়।

মিলনে যিনি পূর্ব্বজন্মে এক ঠাঁই বাঁধা ছিলেন তিনিই আজ বিরহে বাধা টুটিয়া বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছেন; ধূপ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, গন্ধ তার আজি চারিধার পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। যাকে বিরহে আজ তিনি ত্রিভুবনে খুঁজিতেছেন, তাকেই আবার মর্ত্ত্যনারীরূপে বাহুর বন্ধনে লাভ করিবেন কবি এই আশা করিতেছেন। কারণ—

> এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
> জ্বলিছে নিবিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
> কখনো বা ভাবময়, কখন মুরতি।

এই ধারণার মধ্যেই কবির দার্শনিকতা বর্ত্তমান, বিশ্ব-সত্যকে এখানে কবি উপলব্ধির রাজ্যে হৃদয়ের জিনিষ করিয়া তুলিয়াছেন, প্রেমকে দিয়া দিয়াছেন সত্যের সমুচ্চ মহিমা, সত্যের ললাটে দিয়াছেন সৌন্দর্য্যের তিলক। জলে স্থলে নীলাকাশে যে মানসী কবির বাহুবন্ধন এড়াইয়া দূরে দূরে সরিয়া যাইতেছেন তাকে কবি বলিতেছেন—তোমাকে আবার যখন আমার গৃহের বনিতারূপে পাইব তখন—

> বাজিবে তোমায় সুর
> সর্ব্ব দেহে মনে। জীবনের প্রতি সুখে
> পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
> পড়িবে তোমায় অশ্রুজল, প্রতি কাজে
> র'বে তব শুভ হস্তদুটী, গৃহ মাঝে
> জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি

"Spirit of beauty that dost consecrate
With thy own hues all that thou dost shine upon
Of human thought and form."

বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী জ্যোতির্ময়ী বালা

"প্রেমের অভিষেকে" ইনিই "মহীয়সী মহারাণী" রূপে কবিকে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন "সৌন্দর্য্যের সে নন্দনভূমি অমৃত-আলয়ে," যে অন্তর-অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ না পাইয়া সমস্ত জগৎ বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, যেখানে "মহারাণী" কবিকে "সম্রাট" করিয়াছেন, পরাইয়াছেন "গৌরব-মুকুট"।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য মোটামুটি "নারী" ও "মানব" এই দুই দিক অবলম্বন করিয়া দুই ধারায় ছুটিয়াছে। নারীর ধারা মর্ত্ত্যনারী হইতে সুরু করিয়া মানসসুন্দরীর ভিতর দিয়া জীবন-দেবতার ধারণায় আসিয়া ঠেকিয়াছে; মানবের ধারা দেশ-জীবনের ভিতর দিয়া বিশ্ব-জীবনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নারীর দিকে রবীন্দ্রনাথ একা, বিশেষ করিয়া সৌন্দর্য্যেরই উপাসক—নিছক কবি; মানবের দিক দিয়া তিনি দশের সঙ্গে যুক্ত, বিশেষ করিয়া মঙ্গলের উদ্বোধক। সত্য মোটামুটি দুই ধারার যোগসূত্র গড়িয়াছে। কিন্তু আগেই বলিয়াছি এই দুই ধারা নানারূপ সংযোগে বিয়োগে মিলনে দ্বন্দ্বে দেখা দিয়াছে, সমগ্রতার সাধক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাই অর্গলবদ্ধ পৃথক কোঠায় সত্য সুন্দর ও মঙ্গলকে শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভব নয় এবং সে ভাবে দেখা কবি সম্বন্ধে ঠিক দেখাও নয়। "মানস—সুন্দরী", "নিরুদ্দেশ যাত্রার" সুন্দরী, "চিত্রার" বিচিত্ররূপিণী, জ্যোৎস্নারাত্রের "বিশ্ব-সোহাগিনী লক্ষ্মী" ও "প্রেমের অভিষেকের" "মহীয়সী মহারাণী" কবির সৌন্দর্য্য-বোধেরই সৃষ্টি। কিন্তু নিছক সৌন্দর্য্যবোধ ছাপাইয়া তাতে অন্য একটা সুরও জায়গায় জায়গায় ফুটিয়াছে দেখিতে পাই। বাহিরে যিনি বিচিত্ররূপিণী অন্তর মাঝে তিনি শুধু একা-একা একাকী, তিনি অন্তরব্যাপিনী। সেখানে—

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি
একটী ভক্ত করিছে নিত্য আরতি।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো জিনিষ বিচ্ছিন্ন, একক, কিম্বা আংশিক হইয়া থাকে না; সবই যুক্ত এবং সমগ্র হইয়া তার চরম পরিণতিতে গিয়া ঠেকে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাই "যারে বলি ভালবাসা তারে বলি পূজা," "দেবতারে যা দিতে পারি দিই তাহা প্রিয় জনে।" নারী-প্রেম সম্ভোগ হইতে আরম্ভ করিয়া মানসতার ভিতর দিয়া একেবারে অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতির মধ্যে আসিয়া ঠেকিয়াছে, ভক্তের নিত্য আরতির মধ্যে তার চরম রূপ নিয়েছে। "জ্যোৎস্নারাত্রে" দেখি কবি আনিতেছেন—"অর্ঘ্যভার অন্তর-মন্দিরে অজ্ঞাত দেবতা লাগি।" এই "চিত্রা" বা "বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মীর" ধারণায় যে মঙ্গলের স্ফুরণ দেখিতে পাই তারি চরম অভিব্যক্তি ফুটিয়াছে "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায়। কবি এই যে "ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত" সারাদিন আর বাঁশি বাজাইয়া কাটাইতে চাহিতেছেন না, মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া বিজন বিষাদ-ঘন অন্তরের নিকুঞ্জছায়ায় আর বসিয়া না থাকিয়া মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দিয়া শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে আশা ধ্বনিয়া তুলিয়া কবি তাঁর দ্বিতীয় রূপ ফুটাইয়া তুলিলেন সে কার প্রেরণায়? কবি বলিতেছেন—"কে সে? জানি না কে! চিনি নাই তারে।"

শুধু এই টুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব-যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি!

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২০

সন্ধ্যা আসন্ন। মানদার গৃহ থেকে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে প্রমথ সন্ধ্যার সহিত তার নব-নিযুক্ত গৃহে উপস্থিত হ'ল। গৃহটি ছোট, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। দ্বিতলে তিনটি শয়নকক্ষ এবং পূর্ব্বদিকে একটি সুপ্রশস্ত বারান্দা। পাশে একদিকে কল-পায়খানার ব্যবস্থা। বারান্দার এক প্রান্ত দিয়ে নীচু ধাপের সীঁড়ি, যা কাশীতে খুব সুলভ নয়, নীচে নেবে গিয়েছে।

মানদার কার্য্যতৎপরতার গুণে এই অল্প সময়ের মধ্যে ধোয়া মোছা, উপরের তিনটি ঘর ও বারান্দা চুনকাম করা থেকে আরম্ভ ক'রে ঘরে ঘরে আসবাব-পত্র সাজানো, ভাঁড়ার ঘরের দ্রব্যাদি সংগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে। তার নিজ গৃহে প্রমথর তিনটি ঘরে আসবাব-পত্র নিতান্ত অল্প ছিল না, তার অধিকাংশই আনিয়ে নিয়েছে। বাকি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কতক সে নিজের থেকে উপস্থিত দিয়েছে, এবং বাকি প্রমথের অর্থে ক্রয় করেছে।

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে চতুর্দ্দিকের শৃঙ্খলা এবং পরিচ্ছন্নতা দেখে প্রমথর মন প্রসন্ন হ'য়ে উঠল। রান্নাঘরের সম্মুখে বারান্দায় ব'সে বিশুয়া নব-নিযুক্তা পরিচারিকা কামিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বিস্তারে মনোযোগী ছিল, প্রমথ ও সন্ধ্যাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে কামিনীকে বললে, "বাবু এসেছেন!"

কামিনী উঠানে নেমে প্রমথ ও সন্ধ্যাকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাকে সম্বোধন ক'রে বললে, "মা, চায়ের জল চড়িয়ে দোব কি?"

যে ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে এই মাতৃ-সম্বোধন উদ্ভূত, তার কথা স্মরণ ক'রে সন্ধ্যা প্রথমটা ক্ষণকাল লজ্জায় মূক হয়ে রইল, কিন্তু সমস্ত দিনের নানা প্রকার হাঙ্গামা এবং পরিশ্রমের পর গৃহে এসে দু-এক পেয়ালা চা, অন্ততঃ প্রমথর পক্ষে, এতই প্রয়োজনীয় বস্তু যে, সে-বিষয়ে কোনো প্রকার আদেশ না দিয়ে নিরুত্তর থাকার লজ্জাটাও কিছু কম নয় মনে ক'রে মৃদুস্বরে বললে, "দাও।"

কামিনী বললে, "চায়ের সঙ্গে খাবারের কি ব্যবস্থা করব মা?"

সন্ধ্যা চিন্তিত হ'ল। এ প্রশ্ন পূর্ব্বের প্রশ্নের মত সরল নয়, এবং দু-একটি বাক্যের সাহায্যে উত্তর দিয়ে এর মীমাংসা করা শক্ত। প্রমথ দয়াপরবশ হয়ে সন্ধ্যাকে তার সঙ্কট থেকে উদ্ধার করলে। কামিনীকে সম্বোধন ক'রে বললে, "মাসী কোথায়?—মানদা মাসী?"

"দোতলায় আছেন বাবা।"

"তা হ'লে কিছু ভাবতে হবেনা, তিনি সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।" ব'লে সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, 'চল উষা, আমরা উপরে যাই।"

প্রমথ ও সন্ধ্যা দ্বিতলে উপনীত হ'লে পদধ্বনি শুনতে পেয়ে মানদা দক্ষিণ প্রান্তের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উভয়কে দেখে সহাস্যমুখে বললে, "এলে? সারাদিন ঘুরে ঘুরে খুব কষ্ট হয়েছে?"

প্রমথ বললে, "কষ্ট কি মাসী? খুব আনন্দেই কেটেছে।"

মাসী স্মিতমুখে বললে, "তোমার ত আনন্দে কাটবেই বাবা, অমন লক্ষ্মী-পিরতিমের মতো বউ পাশে থাকলে কি আর কষ্টকে কষ্ট বলে মনে হয়?"

প্রমথ বললে, "লক্ষ্মী-পিরতিমের মতো কি মাসী? কাশীতে কি ওকথা বলতে আছে?"

বিস্মিত-স্মিত মুখে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মানদা বললে, "কেন?—কি বলতে হয়?"

"বলতে হয় অন্নপূর্ণোর মতো।"

মানদা বললে, "সে কথা সত্যি! পিছন দিকে একটা চাল-

চিত্তির রেখে দিলে তা-ই ব'লেই মনে হয়! এ জিনিস তুমি কোথা থেকে খুঁজে বার করলে বাবা?"

প্রমথ বল্‌লে, "সেকথা তোমাকে আর একদিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে বল্‌ব মাসী, এখন তাড়াতাড়ি চা-টার একটু ব্যবস্থা করে দাও।"

মানদা বল্‌লে, "কামিনীকে বলা আছে, তোমরা এলেই সে চায়ের জল চড়িয়ে দেবে। তোমরা এই তিনটে ঘর দেখ্‌তে দেখতেই সব এসে পড়বে অখন। ততক্ষণ এস, এই ঘরটা থেকেই আরম্ভ করি। এইটে তোমাদের শোবার ঘর।" ব'লে মানদা দক্ষিণ দিকের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

প্রমথ মানদার পিছনে পিছনে ঘরে প্রবেশ করলে, কিন্তু সন্ধ্যা বারান্দার রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

মানদা দেখতে পেয়ে দ্বারের কাছে এসে বললে, "বউমা, একা ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে এস। এ ত তোমার ঘর তোমার সংসার, নিজে দেখে শুনে নাও।"

অগত্যা সন্ধ্যা ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে।

ঘরটি প্রশস্ত, কিন্তু সমস্ত ঘরের মধ্যে মাত্র তিনটি আসবাব,—একটি পালঙ্ক, ছোট একটি কাঠের আলনা এবং ঘরের এক কোণে একটি ড্রেসিং টেবল,—অর্থাৎ কেবলমাত্র নিশা-যাপনের জন্য যা একান্ত প্রয়োজনীয়; তা-ই। সুবৃহৎ পালঙ্কে দুগ্ধশুভ্র শয্যা; তদুপরি দুইটি মাথার এবং তিনটি পাশের বালিশ পাশাপাশি রাখা। শয্যা রচনা তখনো শেষ হয়নি, একজন পশ্চিমা ভৃত্য আস্তরণের বিলম্বিত অংশ গদীর তলায় মুড়ে দিচ্ছিল।

মানদা বল্‌লে, "এ-ই তোমাদের চাকর থাক্‌বে। বিরিঞ্চি, আমার জানা লোক, বিশ্বেসী,—তবে একটু বোকা।"

বিরিঞ্চি বাঙলা বল্‌তে পারে না ভাল, কিন্তু বুঝতে পারে অনেকটা; তাই এ দোষারোপ সে একেবারে অপ্রতিবাদে পরিপাক করলে না, জিহ্বা-তালুর সংযোগে একটা মতভেদ-সূচক শব্দ নির্গত ক'রে বললে, "নেই, নেই, মায়জী! চলাক্ জী আছে।"

মানদা হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠল,—"চালাক্ জী আছে, না তোর মাথা আছে! পই পই ক'রে ব'লে দিলাম যে, নীল ফুলওয়ালা ওয়াড়ের বালিসটা ডানদিকে দিবি, আর লালফুলেরটা বাঁ দিকে; তা না, ভেবে চিন্তে ঠিক উল্টোটি ক'রে রেখেছে! একটু নড়েচি কি অমনি ভুল!"

ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে ক্ষণকাল বালিস দুটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ক্ষিপ্রগতিতে বিরিঞ্চি পালঙ্কের পাদদেশে এসে দক্ষিণ ও বাম হস্ত সম্মুখে প্রসারিত ক'রে যা বল্‌লে তা শুনে মানদা হেসে লুটিয়ে পড়ল।

বিরিঞ্চির কৈফিয়তের মর্ম্ম কিছুমাত্র বুঝ্‌তে না পেরেও মানদার হাসির ভঙ্গী দেখে প্রমথ হেসে ফেলে বললে, "কি বলে ও মাসী?"

মানদা তেমনি হাসতে হাসতে বললে, "বলে, পাছতলায় দাঁড়িয়ে দুই হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে নীলফুলওয়ালা বালিস ডানদিকে পড়বে আর লালফুলওয়ালা পড়বে বাঁ দিকে! ডান-বাঁয়ের কি টনটনে জ্ঞান দেখ দেখি বাছা!"

শুনে প্রমথ হাসতে লাগল; বললে, "সে যাই বল মাসী, বিরিঞ্চি আজ তোমাকে হারিয়েছে!"

"হারিয়েছে ব'লে হারিয়েছে, বিষম হারিয়েছে!" ব'লে মানদা নিজে বালিস দুটো উল্টে দিয়ে বিরিঞ্চিকে বললে, "খুব হয়েছে! এখন যা, নীচে গিয়ে তুই আর কামিনী দুজনে মিলে চা আর খাবার নিয়ে আয়,—ঠাকুরের কাছে খাবার ঠিক করা আছে।" তারপর প্রমথকে সম্বোধন ক'রে বললে, "এ খাটটা চিন্‌তে পারছ ত বাবা? এ তোমারই নিজের খাট, ও বাড়ি থেকে আনিয়েছি। খুব চওড়া, দুজনের শুতে একটুও কষ্ট হবে না।"

একটু অপ্রসন্ন সুরে প্রমথ বললে, "এ-সব হাঙ্গামা আজই করবার দরকার ছিল কি মাসী, পরে হ'লেই ত হোত।"

মানদা সবিস্ময়ে বললে, "শোন কথা! নিজের এমন পালং থাক্‌তে ভুঁয়ে শুতে হবে না কি? চাবি দিয়ে খাটখানা খুলে কুলীরা এখানে এনে খাটিয়ে দিয়েছে—হাঙ্গামা ত' এই!" তারপর হঠাৎ বিরিঞ্চির কথা মনে প'ড়ে গিয়ে আবার হাস্‌তে লাগল; বললে, "বিরিঞ্চিটা আজ কিন্তু ভারি হাসিয়েছে! ডান-বাঁয়ের মর্ম্ম খুব বুঝেছিল যা হোক!"

এ কথার উত্তরে কোনো কথা না ব'লে চকিতে একবার

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "চল মাসী, এবার ও ঘরটা দেখিগে।"

বিরিঞ্চিকে নিয়ে যখন হাস্যকৌতুকের একটা অভিনয় চলছিল তখন তারই মধ্যে এক সময়ে সন্ধ্যা নিঃশব্দে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক পালঙ্কের উপর পাশাপাশি ছুটো মাথার বালিস দেখে আতঙ্কে তার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল! তবে আর বাকি কী রইল! মাকড়সা যখন এক পাকে জড়িয়েছে, তখন দেখতে দেখতে শত পাক সম্পূর্ণ হ'য়ে যাবে। আজ আর রেলগাড়ির কক্ষে রাত্রি-যাপন নয়,—আজ সে প্রমথর অচল অনড় গৃহ-কারাগারে বন্দিনী। আজ রাত্রে যথার্থ পদ-মর্য্যাদায় তার অভিষেক হয়ে যাবে! হায় ভগবান, কপালে এতও ছিল! নিজের অবনত অসহায় অবস্থা উপলব্ধি ক'রে সন্ধ্যার ছুই চক্ষু ফেটে অশ্রু ঝ'রে পড়ল।

"উষা!"

তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে ফেলে সন্ধ্যা ফিরে চাইলে।

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রমথ বল্‌লে "এবার ও ঘরটা দেখিগে চল।" তারপর সন্ধ্যা নিকটে এলে তার কানের অতি-নিকটে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "ভয় পেয়োনা,—নিশ্চিন্ত থাক।"

ঘরের ভিতর দিয়ে দিয়ে তিনটে ঘরেই যাওয়া যায়। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করতেই মানদা বল্‌লে, "এইটে তোমাদের বসবার আর কাজকর্ম্ম করবার ঘর।"

কক্ষের মধ্যস্থলে একটা টেবিল, তার চার দিকে চারটে চেয়ার, ঘরের এক পাশে ছুটো ইজি-চেয়ার এবং অপর দিকে একটা প্রশস্ত সোফা।

তৃতীয় ঘরে স্যুটকেস্, বাক্স ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সজ্জিত, এবং নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদির জন্য ছুটো কাঠের আলনা।

সব দেখে শুনে প্রসন্নমুখে প্রমথ বল্‌লে, "না মাসী, তোমার বাড়িটিও পছন্দসই,—আর ব্যবস্থাপত্র যা করেছ তার মধ্যেও ত্রুটি ধরবার কিছু নেই।"

প্রমথর প্রশংসা শুনে মানদা আনন্দিত হ'ল; বল্‌লে, "পরিশ্রমের মর্য্যেদা তুমি বোঝো বাবা, তাই তোমার কাজে পরিশ্রম ক'রে সুখ আছে।" তারপর বারান্দার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে "ওই তোমাদের চা-টা বোধ হয় নিয়ে এল,—কলের ঘরে গিয়ে চট্ ক'রে হাত মুখ ধুয়ে এস।" ব'লে মানদা বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

চা পান শেষ হ'লে প্রমথ মানদাকে বল্‌লে, "মাসী, অনেক পরিশ্রম তুমি করেছ, এবার বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর।"

মানদা বল্‌লে, "মনে করছিলাম তোমাদের খাইয়ে-দাইয়ে তারপর যাব।"

প্রমথ মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না, না, মাসী, তার এখনো অনেক দেরী আছে। আমার অনুরোধ রাখ, বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম করো। কাল সকালে একবার না-হয় এসে বাকি যা করবার আছে শেষ ক'রে যেয়ো।"

মানদা প্রমথর ধাতও জান্‌ত, সুরও চিন্‌ত; বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, অনুরোধের আকারে হ'লেও বস্তুত এ আদেশ; বল্‌লে, "ওমা, কাল সকালে আস্‌ব বই কি। কিন্তু বাবা, তোমার টাকার হিসেবটা?"

"করেছ?"

"এখনো ত সব জিনিসের দাম দেওয়া হয় নি, তাই করা হয় নি।"

প্রমথ বল্‌লে, "যদি বেশি খরচ হ'য়েছে ব'লে মনে হয় তা হ'লে হিসেব ক'রে কাল বাকিটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়ো,—আর যদি তা না হয়, তা হ'লে কেন আর মিছে কষ্ট ক'রে হিসেব করতে যাবে?"

"আচ্ছা, সে যা হয় কাল হবে" ব'লে মানদা প্রস্থান করলে, কিন্তু সিঁড়ির কাছ থেকে পুনরায় ফিরে এসে প্রমথর কানে কানে মৃদুস্বরে একটা কথা বল্‌লে।

শুনে প্রমথ একটু উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠ্‌ল, "এ তুমি কেন করেছ মাসী?—ও জিনিস কিন্‌তে ত' আমি তোমাকে বলি নি! ও তুমি এখনি এখান থেকে নিয়ে যাও।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে মানদা বল্‌লে, "কিন্তু হঠাৎ যদি দরকার হয়—"

"তখন তোমার কাছ থেকে চেয়ে পাঠাব।"

"তা হ'লে আমার কাছেই ও-টা রেখে দোবো?"

প্রমথ বল্‌লে "তা রাখ্‌তে পার; আর যদি তার চেয়েও ভালো একটা কাজ করতে চাও তা হ'লে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ ক'রে বিশ্বনাথকে দান কোরো।"

কপালে যুক্ত কর স্পর্শ ক'রে মানদা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "বিশ্বনাথ!" তারপর তৃতীয় কক্ষে গিয়ে গা-আলমারী খুলে একটা বোতল বার ক'রে বস্ত্রাঞ্চলে ঢেকে নিয়ে সীঁড়ি দিয়ে নেবে গেল।

নিকটেই কোনো গৃহে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। পাঠের মাঝে মাঝে যে গান হচ্ছিল তার অস্পষ্ট ধ্বনি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, গায়ক একজন উচ্চশ্রেণীর গুণী। মানদা প্রস্থান করলে সঙ্গীতের দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে সন্ধ্যা উত্তর প্রান্তের কক্ষের জানালার ধারে উপস্থিত হ'ল। সেখান থেকে গান আরও একটু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

মিনিট দশেক পরে প্রমথ সেখানে এসে দাঁড়াল। তখন অন্য একটা গান আরম্ভ হয়েছে। প্রমথ বললে, "বেশ গাচ্ছে, না উষা?",

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "চমৎকার গাচ্ছে!"

প্রমথ বল্‌লে, "সবিতা-বউদিদির মুখে শুনেছি তুমিও চমৎকার গাও। কাল তোমার গান-বাজনার সমস্ত যন্ত্রপাতি কিনে দোব, তারপর তোমার গান শোনা যাবে। কিন্তু সমস্ত দিন ঘোরা-ফেরা ক'রে তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ উষা, তোমার ঘরে গিয়ে বিছানায় গা-টা একটু এলিয়ে দাও; সেখান থেকেও গান শুন্‌তে পাবে।"

পরিশ্রান্ত সে সত্যই হয়েছিল,—শুধু দেহে নয়, মনেও। সমস্ত দিনটা নানাবিধ কার্য্যকলাপের মধ্যে প্রমথর একান্ত সান্নিধ্যে অতিবাহিত ক'রে একটা কোনো নির্জ্জন কক্ষের শয্যার উপর লুটিয়ে পড়বার জন্য সমস্ত দেহটা অবসন্ন হ'য়ে এসেছিল। এরূপ অবস্থায় প্রমথর প্রস্তাব লোভনীয়,—কিন্তু মানদার লালফুল নীলফুল বালিসের ব্যবস্থার কথা স্মরণ হয়ে মনটা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠ্‌ল! দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "আমার ঘর কোন্‌টা?"

"কেন, মানদা মাসী প্রথম যে-ঘরটা দেখালে, সেইটে। দক্ষিণের ঘরটা।"

সঙ্কুচিত হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "সে ঘরে ত' আপনার বিছানা হয়েচে—আপনি শোবেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ হাস্‌তে লাগল; বললে, "তুমি শুধু বয়সেই ছেলেমানুষ নও উষা, বুদ্ধিতেও তাই। স্বয়ং পুলিস-কমিশনার যখন তোমার সহায় তখন কনষ্টেবলের কাজ দেখে ভয় পাও কেন? তা ছাড়া, মানদা মাসীর দোষ কোথায় বল? যে ভুল ধারণা ওঁর মনের মধ্যে রয়েছে তা'তে ও-ভাবে বিছানা করা বিশেষ ভুল হয়েছিল কি? কিন্তু এখন দেখবে এস ত।" ব'লে প্রমথ দক্ষিণদিকের ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

প্রমথর পিছনে পিছনে এসে সন্ধ্যা দেখলে পালঙ্কের উপর শয্যায় শুধু সেই লালফুলযুক্ত মাথার বালিস এবং তিনটের পরিবর্ত্তে দুটো পাশ-বালিস। সকৌতূহলে সে জিজ্ঞাসা করলে, "এখানে কে শোবে?"

"তুমি।"

"আর আপনি?"

"দেখ্‌বে এস।"

প্রমথর পিছনে পিছনে পাশের ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা দেখলে সোফার উপর সেই নীলফুলের বালিস। সবিস্ময়ে বললে, "আপনি এই সোফায় শুয়ে রাত কাটাবেন?"

প্রমথ স্মিতমুখে বললে, "কাটাব।"

এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক থেকে সন্ধ্যা বললে, "না, তা কিছুতেই হবে না, আমি এঘরে শোব, আপনি ওঘরে খাটে শোবেন।"

প্রমথ তেমনি স্মিতমুখে বললে, "তুমি আমার অতিথি উষা। মনে মনে আশা রাখি, শেষ পর্য্যন্ত তোমার কাছ থেকে আতিথেয়তার একটা ভাল-রকম সার্টিফিকেট আদায় করব। তুমি কি তার হন্তারক হ'তে চাও? এ বাড়ি যদি তোমার বাড়ি হোত তাহ'লে আমাকে এঘরে শুইয়ে তুমি ও-ঘরে শুতে পারতে? কখনই পারতে না। তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। এদিক থেকে লাগাবার জন্যে দরজায় ছিটকিনি কিম্বা হুড়কো নেই, কিন্তু ও ঘর থেকে হুড়কো লাগিয়ে দেওয়া যায়। আমার ঘরে হঠাৎ ভুল ক'রেও কেউ এসে পড়তে পারে না, মনের মধ্যে এ নিশ্চয়তা থাকা ভারি আরামের জিনিস—বিশেষতঃ তোমাদের—মেয়েদের পক্ষে। কাল তোমার সঙ্গে অনেক দরকারি কথা আছে, আজ কিন্তু আর একটাও নয়। যাও, শুয়ে পড়। রাত্রে খাবার তয়ের হ'লে আমি তোমাকে ডাক্‌ব অখন।"

সন্ধ্যা একবার প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে ধীরে ধীরে ও ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলে। প্রমথ একটু অপেক্ষা ক'রে দেখলে হুড়কা লাগাবার শব্দ হ'ল না,—দরজা একটু ঠেলে দেখলে নিকটেই সন্ধ্যা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। বললে, "হুড়কো লাগালে না?"

সন্ধ্যা বললে, "রাত্রে শোবার সময়ে লাগাব অখন।"

"তখন লাগিয়ো, এখনো লাগাও।" ব'লে প্রমথ দরজার পাল্লা দুটো টেনে দিলে।

ভিতরে খট্‌ ক'রে একটা শব্দ হোল। তখন পকেট থেকে সিগার-কেস বার ক'রে একটা সিগার ধরিয়ে প্রমথ সোফায় গিয়ে ব'সে নিঃশব্দে টান দিতে লাগ্‌ল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব্ব

১

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে, আমার এই সৃষ্টিছাড়া হতভাগা জীবনের কাহিনী কেন যে লিখতে বসেছি আমি নিজেই জানিনা। আমার এই তুচ্ছ জীবনের ইতিহাস লিখি বা নাই লিখি, এত বড় জগৎটার তাতে কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না, আমি তা বিলক্ষণ জানি। শুধু তাই নয়, এটাও আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝি যে, আমার এই অভিশপ্ত জীবন যতশীঘ্র বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যায়—ততই জগতের কল্যাণ। এর স্মৃতি বাঁচিয়ে না রাখাই ভাল।

লিখতে বসেছি কেন? কোনও কৈফিয়ৎ নাই। লিখতে বসেছি, কেন-না আমাকে লিখ্‌তেই হবে। ভাবি, চিরন্তন সৃষ্টি-লীলার আদি অনুপ্রেরণার ঢেউ কি শেষ পর্য্যন্ত আমারও ভাঙ্গা বুকে এসে লাগ্‌ল? মনে ত হয় না। আজ যে আমার প্রাণ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। ঢেউ লাগ্‌বে কোথায়?

অথচ মনে পড়ে, একদিন ত সবই ছিল। জীবনের প্রথম প্রভাতে বড় বড় চোখ তু'লে যখন পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখেছিলাম, ইচ্ছে হয়েছিল সমস্ত জগৎটাকে একদিন জয় করে আমারই প্রাণের মধ্যে বেঁধে ফেলব; আকাশ বাতাস গাছপালা নদী মাঠ—সবই যেন সৃষ্টি হয়েছে আমারই জন্য। আমার প্রাণের আনন্দ-দানের মধ্যেই যেন তাদের সার্থকতা। জগৎটার উপর হেঁটে বেড়িয়েছি যেন আমারই লীলাভূমি।

বড় লোকের ঘরে জন্মেছিলাম, দুঃখ কষ্ট—কৈ প্রথম জীবনে ত কিছুই পাইনি।

পিতা স্বর্গীয় রতনচন্দ্র সাহাচৌধুরী ছিলেন মাধবপুর গ্রামের স্বনামধন্য প্রতাপশালী জমিদার। বাংলা দেশের খুলনা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে আজও তাঁর নাম লোকের মুখে মুখে।

খুলনা সহর থেকে বরাবর দক্ষিণে জেলাবোর্ডের যে পাকা রাস্তা চলে গিয়েছে, সেই রাস্তায় দশ বারো ক্রোশ পথ গেলেই আমাদের মাধবপুর গ্রাম। গ্রামের দক্ষিণেই ছোট নদীটী বয়ে গিয়েছে—নাম বেগবতী। রাস্তাটী নদীর ওপার দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে চলেছে, দূরে দূরে ভিন্ন গ্রামে। মাধবপুর গ্রামে রাস্তাটীর শেষ প্রান্তে এপার ওপার পার হওয়ার খেয়া।

এই "বেগবতী" নামটীর একটী ছোট্ট ইতিহাস আছে। নামটী আমারই আবিষ্কার। ছেলেবেলা থেকেই সকলের মুখে শুনেছি আমাদের গ্রামের নদীর নাম "শুক্‌না"। মনে পড়ে ছেলেবেলায় নামটী আমাকে পীড়া দিত। মনে হত অমন সুন্দর ছোট খরস্রোতা নদীটী, কত আম বাগান, বাঁশ বাগান, কত ঝোপ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে কেমন এঁকে বেঁকে বয়ে গিয়েছে—তার কিনা অমন একটী কুৎসিৎ নাম "শুক্‌না"। ছেলেবেলায় বাংলা দেশের ভূগোল পড়তে পড়তে যখনই সব নদীর নাম দেখতে পেয়েছি—পদ্মা, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মধুমতী, রূপনারায়ণ, ইছামতী ইত্যাদি—তখনই মনটা দুঃখে ভরে উঠ্‌ত,—আমার গ্রামের নদীর নাম "শুক্‌না" হল কেন? কেন রূপনারায়ণ হল না, কেন ইছামতী হল না?

একদিনের একটা ছোট গল্প মনে পড়ে। তখন আমি বোধহয় বছর দশেকের বালক। ইস্কুলে আমাদের ক্লাসে মাধবপুর বাজারের দোকানদার জগবন্ধু ময়রার ছেলে ননী ময়রা পড়ত। বেশ গোলগাল চেহারা, গায়ের রং কালো, বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ, মাথার উপর সোজা সোজা চুল। মাধবপুরের বাজার ছিল ঠিক নদীর ওপরেই এবং ননী ময়রার বাড়ী ছিল তাদের দোকানঘরের ঠিক পিছনে একেবারে নদীর গায়ে। বেচারী প্রায়ই ক্লাসে পণ্ডিতের কাছে মার খেত—কেননা কোনদিনই পড়া সে তৈরী করে আসত না। একদিন পণ্ডিতমশাই তার কান দুটো মলে দিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলেছিলেন, "শুক্না নদীর জল খেয়ে খেয়ে আমাদের ননী ময়রার বুদ্ধি সুদ্ধি সব শুকিয়ে গেছে"।

বেশ মনে আছে কথাটা আমার বুকে গিয়ে বাজল। ননী ময়রার দুর্দ্দশার জন্য নয়, আমাদের গ্রামের নদীটীকে বিদ্রূপ করার জন্য। পণ্ডিতমশাই ছিলেন বিদেশী। মনে মনে শপথ করেছিলাম, আমি যখন বড় হয়ে গ্রামের জমিদার হব, সর্ব্বাগ্রে এই পণ্ডিত মশাইটীকে বরখাস্ত করব। আমার বাবা ছিলেন স্কুলের সর্ব্বময় কর্ত্তা। রাত্রে বাবার কাছে নালিস্‌ও করেছিলাম পণ্ডিতমশাইএর নামে। বলেছিলাম "রসিক পণ্ডিতমশাই কিছু পড়াতে পারেন না, উল্টে ছেলেদের ধরে ধরে মারেন।"

যাই হোক সেই দিন থেকে উঠে পড়ে লাগ্‌লাম বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রমাণ করার জন্য যে, আমাদের নদীটীর নাম শুক্না নয়। ওটা একটা ভুল চলতি নাম। আসলে আমাদের নদীটীর নাম "চিত্রা"। ক্লাসের ছেলেদের কাছে জোর করে বল্‌লাম যে, আমার এক মামা যিনি কলকাতার কলেজে বি-এ পড়েন, তিনি বড় ইংরেজী ভূগোল প'ড়ে এ-কথা আমাকে বলে গেছেন। এবং একদিন রসিক পণ্ডিত মশাইএর কাছেও ক্লাসে একথা জোর করে বলতে পিছপাও হইনি। কথাটার মধ্যে যে মোটেই সত্য ছিল না এমন নয়। আমার এক মামা কলকাতার কলেজে বি-এ পড়তেন এটুকু সত্য। কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল এবং শুনেছিলাম যশোর জেলায় "চিত্রা" নদী দিয়ে নৌকা করে তাঁর শ্বশুরবাড়ী যেতে হয়।

যাই হোক, পাঁচজন বন্ধু বান্ধবের কাছে একথা জোর করে জাহির করলেও মনের মধ্যে জোর পেলাম কৈ? "শুক্না" নামটা মাঝে মাঝে মনটাকে পীড়া দিতে লাগলো। এবং 'চিত্রা' নামটা এত চেষ্টা করেও কিছুতেই চালিয়ে দিতে পারলাম না। এমন সময় হঠাৎ একদিন আমাদের গ্রামের নদীটির সত্য নাম্‌টি আমার কাছে ধরা পড়ল।

আমি তখন বোধহয় তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। বাবা তখন সবে জেলাবোর্ডের মেম্বর হয়েছেন। সদর থেকে ফিরে এলেন সঙ্গে খুলনা জেলার একটা মানচিত্র নিয়ে। খুলনা জেলার মানচিত্র পেয়েই আমি সোৎসাহে দেখ্‌তে লাগলাম আমাদের গ্রামটীর নাম তাতে লেখা আছে কিনা। খুঁজে খুঁজে গ্রামটির নাম যখন বের করলাম তখন দেখলাম যে, আমাদের গ্রামের নীচে যে নদীটী বয়ে গিয়েছে একটু পূবের দিকে গিয়ে তার নাম লেখা রয়েছে "বেগবতী"। শুক্না নাম কোথাও লেখা ছিল না।

উঃ সে কী আনন্দ! কী তৃপ্তি! এখনও মনে পড়ে। আমার এতদিনের একটা বুকের কাঁটা আজ যেন খসে গেল। ভাবলাম আজই বিকেলে খেলার মাঠে এ কথা মিটিং করে জাহির করতে হবে।

কবে কোন শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে এই নদীটীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল—আমি ঠিক জানি না। তবে খুব শৈশব হতেই এই নদীটীর সঙ্গে আমার প্রাণের একটা নিবিড় যোগ হয়েছিল একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি।

মাধবপুর গ্রামের নদীর পার দিয়ে পূব-পশ্চিমে যে রাস্তাটী চলে গিয়েছে, খুলনা জেলা বোর্ডের রাস্তাটী সোজা এসে সেই রাস্তায় মিশেছে ঠিক খেয়াঘাটের উপরে। এইখান থেকেই মাধবপুরের বাজার আরম্ভ—নদীর ধারে ধারে পূবের দিকে। এই বাজার ছাড়িয়ে আরও পূবে ঠিক নদীর উপরেই আমাদের স্কুল।

পশ্চিমের দিকে নদীর পার দিয়ে খানিকটা দূর বেশ ফাঁকা। গ্রাম্য রাস্তাটী চলে গিয়েছে, একদিকে মাঠ ও নানান রকমের গাছ ঝোপ ও ঝাড়, আর একদিকে বেগবতী নদী। আমাদের বাড়ী ছিল এই পথটীর ধারেই গ্রামের একটু বাহিরে। নদীর ধারের এই পথ থেকে একটী সরু পথ চলে গিয়েছে, সামান্য

একটু উত্তরে শেষ হয়েছে আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গণে। এটী আমাদেরই বাড়ীর পথ, লাল কাঁকর দিয়ে বাঁধান, দু পাশে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী। এই পথটীর পশ্চিমে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, তার চার পারেই বাঁধা ঘাট। এবং এই পুষ্করিণীর ঠিক উত্তরের দিকে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ী, ঠাকুর দালান, বাহির মহল, অন্দর মহল। পুষ্করিণীর দক্ষিণ এবং পশ্চিম পারে আমাদেরই প্রশস্ত ফল ফুল এবং তরি তরকারীর বাগিচা।

বাহির মহলে দোতালার উপর দক্ষিণ দিকের একটী ছোট ঘরে আমি পড়তাম। দুবেলা মাষ্টারমশাই এসে আমাকে পড়িয়ে যেতেন। এই ঘরটীর দক্ষিণ দিকে দুটী জানালা ছিল, খুলে দিলে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায় এবং ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখতাম, কেমন যেন একটা আনন্দ পেতাম, স্পষ্ট মনে আছে। আমাদের বাড়ীর পুকুর পাড়ের গাছগুলির মাথার উপর দিয়ে সারি সারি নারিকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেত দূরে বেগবতী নদী, তার দুই পার, ওপারের একটা নুয়ে-পড়া বাঁশঝাড়, তারপরে একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছের মাথা ফুলে লাল হয়ে আছে এবং তার চারিপাশে এদিকে ওদিকে সেদিকে ছোট বড় নানান রকমের বৃক্ষরাজি এবং তারও ওধারে মনে হত যেন কী একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা, মিশে গিয়েছে দিগন্তের সীমানায়, যেখানে নীল আকাশ নুয়ে পড়ে এসে ধরা দিয়েছে ধরণীর বুকে।

এই যে ছবি, আমার পড়বার ঘরের জানালা দিয়ে এই ছবি নিত্য আমার চোখে ধরা দিয়েছে সকালে, বিকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় প্রকৃতির নানান ঋতুতে, নানান রূপে, নানান-রঙে—এর যে এতখানি মহিমা, এ যে কেমন করে ধীরে ধীরে—বালক আমি,—আমার সমস্ত প্রাণটা একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—তখন ত কিছুই বুঝিনি। আজ ভাবি আর অবাক হই।

তবে একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমার পড়বার ঘরের ঠিক গায়ে লাগান পূবের বড় ঘরটায় ছিল বাবার বৈঠকখানা। দোতালায় দক্ষিণের দিকে পাশাপাশি এই দুটী ঘর। আর উত্তর দিকেও ঠিক ঐ রকম দুটী ঘর, সামনেরটীতে আমার দাদা পড়তেন। পিছনেরটিতে কতগুলো অকেজো জিনিষ পড়ে থাকৃত, যথা—গোটা দুই ভাঙ্গা বাতির ঝাড়, পায়া-ভাঙ্গা একটা প্রকাণ্ড টেবিল, কতগুলো পুরানো দেওয়ালগিরি, এবং কতকগুলি কাঁচ ভাঙ্গা ছিঁড়ে-যাওয়া ছবির ফ্রেম ও ছবি এবং একপাশে ভাঁজ করা গোটা তিনচার বড় বড় সতরঞ্চ। মাঝে একটা প্রকাণ্ড ঘর ছিল বিলাতি ধরণের গদী-আঁটা কৌচে সাজান, দেওয়ালে বড় বড় বিলাতি দৃশ্যের ছবি এবং মাঝখানে ঝুলত একটা প্রকাণ্ড মোমবাতির ঝাড়। এইটাকে আমরা বলতাম "সাজান ঘর,"—বিশিষ্ট অতিথি অভ্যাগত-দের বসবার স্থান। বৈঠকখানা বাড়ীর একতালায় ছিল জমিদারীর সেরেস্তা। কর্ম্মচারীরা কাজ করত।

হঠাৎ বাবা একদিন হুকুম দিলেন, আমার পড়বার ঘর সরিয়ে নিয়ে দাদার ঘরের পিছনদিকে সেই অকেজো ঘরটীতে বন্দোবস্ত করে নিতে। কারণ শুনলাম, তাঁর ঠিক বৈঠক-খানার পাশের ঘরেই দুজন কর্ম্মচারীর সেরেস্তা হওয়া দরকার।

শুনে প্রথমটা খুব আহ্লাদ হলো। বাবার বসবার ঘরের পাশেই পড়ার ঘর হওয়ার দরুণ আমাকে সব সময়ই একটু সন্ত্রস্ত ভাবে থাকৃতে হোত। আশা করেছিলাম, পড়ার ঘর একটু দূরে হ'লে আমার স্বাধীনতা একটু বাড়বে বই কমবে না। হয়ত এটা একটা নূতনত্বের আনন্দ। মহা উৎসাহের সঙ্গে চাকর বাকরদের নিয়ে আমার পড়বার ঘর নূতন করে সাজাতে সুরু করলাম। অকেজো জিনিষগুলো বেশীর ভাগই ছাদের উপর চালান হয়ে গেল, কেবল বড় টেবিলটা রাখা হোল কোণ-ঠেসা করে। আর ভাঁজকরা সতরঞ্চগুলোর স্থান হোল এই টেবিলটার উপরে। কিন্তু পড়তে বসে আমার যেন কেমন উৎসাহ চলে গেল। কেমন যেন ভাল লাগে না। পায়া-ভাঙ্গা ধুলোপড়া ঐ টেবিলটা এবং তার উপরে ঐ ময়লা সতরঞ্চগুলো সর্ব্বদাই চোখের সামনে রয়েছে—কেমন যেন ব্যথা দেয়। একটী মাত্র জানালা ঐ ঘরটীর, তাকালে দেখা যায় আমাদের ঠাকুর দালানের বড় বড় স্তম্ভ। বাহিরের দিকে তাকাই, আর মন যেন আমার বসে যায়।

অল্প কিছুদিন পরেই একদিন মাষ্টারমশাই পড়াশুনার অবহেলার জন্য যখন আমাকে তিরস্কার করলেন—আমার চোখে জল এল। বললাম এ ঘরটাতে আমার মোটেই পড়তে ভাল লাগে না। মাষ্টারমশাই তিরস্কারের সুর আরও

একটু তীক্ষ্ণ করে বললেন "ছেলের কথা শোন! পড়বে ঘর, না পড়বে বই"! কথাটার যুক্তি অকাট্য। উত্তর দেওয়া চলে না।

কিন্তু কেন যে আমার মনের অবস্থা ওরকম হতে লাগলো তখন ত নিজে কিছুই বুঝতে পারিনি। ও ঘরটাতে গেলেই আমার বুকটা যেন কী রকম হাঁপিয়ে উঠত,—কী রকম যেন দমবন্ধ ভাব।

এই ভাবে কিছুদিন যায়। থেকে থেকে আমার যেন মনে হত, কোথায় যেন আমার কি একটা লোকসান হয়েছে; কি যেন আমার হারিয়ে গেছে—এই রকমের একটা মনোভাব। এর আবার আরও একটু কারণ ছিল। বাবার কড়া হুকুম ছিল তাঁর আফিসে কিম্বা সেরেস্তায় ছোট ছেলেরা কেউ কখনও যাবে না। এরকম হুকুমের যে কী কারণ ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে ভেবে দেখেছি কিছুই পাইনি। তবে এখন ভাবলে মনে হয়। বাবা ছিলেন অত্যন্ত সোজা, কড়া ধরণের মানুষ। চাকর বাকর থেকে আরম্ভ করে আমলা কর্ম্মচারী, ছেলেমেয়েরা—এমন কি মা পর্য্যন্ত তাঁকে বিশেষ ভয় করে চলতেন। নিয়ম কানুনের এতটুকু ব্যতিক্রম বা লঙ্ঘন তিনি সইতে পারতেন না, সেইজন্য সবাই ছিল সব সময় তটস্থ। তাঁর মতে এ সংসারে যে যে-অবস্থাতেই থাকুক না—সকলেরই জীবনের বিচরণ-ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ।—এই সীমা-রেখার বাইরে যাওয়ার কারুরই অধিকার নেই। এবং এ গণ্ডীর বাইরে গেলেই পরস্পর পরস্পরের বিরোধের সৃষ্টি হয়—সংসারে অঘটন ঘটে। তাই, তাঁর মতে পরিবারের যিনি কর্ত্তা তাঁর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সংসারে কি বড় কি ছোট সকলেরই জীবনের চারিদিকে সীমানা টেনে দেওয়া। তাই বোধহয় তাঁর মত ছিল, বড়দের আফিস সেরেস্তা ছোট ছেলেদের বিচরণ ক্ষেত্রের বাইরে। সেখানে গেলে ব্যাঘাতই ঘটবে, অনর্থই হবে, সুফল ফলবে না।

যাই হোক ফলে হল, সেই যে আমার পুরাণো পড়ার ঘর ছেড়ে দিয়ে এসেছি, তারপর থেকে বেশ কিছুদিন আর সে ঘর-মুখো হইনি। বেগবতী নদীর তীরে বেড়াতে আমার বাধা ছিল না, দুবেলাই ত নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে স্কুলে গিয়েছি এসেছি, রোজই বিকেলে নদীর ধারে মাঠে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতাম, রোজই ত চোখে পড়ত আমাদের বাড়ীর সোজা সেই নুয়ে-পড়া বাঁশ-ঝাড়টা ও ওপারের শিমুলগাছের মাথায় লাল লাল শিমুল ফুল, রোজই কতবার আমাদের বাড়ীর বাগানে ছুটো-ছুটী করে বেড়াতাম, নারিকেল গাছের সারির মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়েছি এসেছি রোজই—কিন্তু তবুও আমার সেই দোতালার পড়বার ঘরের জানালা দিয়ে যে ছবিটা আমার চোখে ধরা দিয়েছিল, সে ছবিটা হারিয়েই গেল। সে লোকসান পূরণ হোল না।

আমার সেই ঘরটীতে যে দুজন কর্ম্মচারীর সেরেস্তা হয়েছিল তাদের মধ্যে একজনার কথা একটু বিশেষ করে বলা দরকার। এই কর্ম্মচারীটীর নাম ছিল বাহার আলী নস্কর। আমরা সবাই তাঁকে আলী মিঞা বলে ডাক্‌তাম। এই আলী মিঞার বাড়ী ছিল আমাদেরই গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আর একটী ছোট গ্রামে, প্রায় মাইল খানিক দূরে—গ্রামটীর নাম "ভগতী"।

যে সময়ের কথা লিখ্‌ছি তখন আলীমিঞার বয়স ছিল বছর ২৪।২৫। চেহারাখানা আজও চোখের সামনে ভাস্‌ছে। একহারা লম্বা চেহারা গায়ের বর্ণ গৌর, ঘন কালো একরাশ চুল মাথায়, সব সময়ই যেন একটু উস্ক-খুস্ক! মুখে পাতলা পাতলা দাড়ী ও গোঁফ। কিন্তু বিশেষ করে সে বয়সেই ভাল লাগত আমার আলীমিঞার চোখ দুটো। বড় বড় কালো চোখে সব সময়েই যেন একটু বিষণ্ণতা মাখান, কেমন যেন একটু উদাস চাহনি। অত্যন্ত স্বল্প-ভাষী, এবং উঁচু গলায় আলীমিঞাকে কখনও কথা কইতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। পুকুরের ঘাটে এখানে ওখানে পাঁচজন কর্ম্মচারীর হাসি-গল্পের মধ্যেও আলী-মিঞাকে মাঝে মাঝে দেখেছি, এবং বিশেষ আমোদে উল্লসিত অন্য কর্ম্মচারীরা যখন হো হো করে উচ্চ হাস্য করে উঠেছে তখনও লক্ষ্য করেছি আলীমিঞার বিষণ্ণ চোখের নীচে ঠোঁটের উপর একটু মৃদু হাসি খেলে গিয়েছে মাত্র। তার বেশী কিছু নয়।

সেই বয়সে সমস্ত লোকজনের মধ্যে আলীমিঞাকেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগত, বোধ হয় আলীমিঞার চোখ দুটোর জন্য। বেশ মনে পড়ে, সেই বয়সেই চোখদুটো আমাকে মুগ্ধ করেছিল এবং কতবার ভেবেছি বড় হলে আমার চোখ

দুটো যদি আলীমিঞার মত হয় ত না-জানি কি ভালই আমাকে দেখাবে। আর্সির সামনে দাঁড়িয়ে দু-একবার চেষ্টাও করেছি চোখের চাহনি আলীমিঞার মত করা যায় কি না।

এই আলীমিঞা আমাদের বাড়ীতে বেশীদিন আসেননি। বোধহয় যখনকার কথা বল্‌ছি তার মাস ৫।৬ আগে হবে। তার আগে তিনি বাবারই অধীনে কর্ম্মচারী ছিলেন মফঃস্বলে। শুনেছিলাম মফঃস্বলে কি একটা কাজে তিনি নিজের প্রাণের মমতা তুচ্ছ করে বাবার একটা মস্ত বড় উপকার করেছিলেন, এবং অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন; তাই বাবা তাঁর পদোন্নতি করে সদরে এনেছেন।

কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আলীমিঞাই কর্ম্মচারীদের মধ্যে আমাকে সব চেয়ে ভালবাসেন। এরই মধ্যে একদিন তিনি বাবাকে বলে আমাকে তাঁর ভগতীর বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বাড়ীর মেয়েরা আমাকে কত আদর যত্ন করেছিল আজও মনে আছে। ভেলভেটে জরির কাজ করা পোসাক পরে, জরির টুপী মাথায় দিয়ে, গলায় মোটা একছড়া সোনার হার চড়িয়ে বরকন্দাজের কাঁধে উঠে আমি আলীমিঞার সঙ্গে তাঁর বাড়ী গিয়েছিলাম একদিন বিকেল বেলা—আজও ভুলিনি। যাই হোক, আমার পড়ার ঘর বদল হওয়ার মাস দুই পরে বাবা একদিন সকালবেলা বাড়ীতে ছিলেন না, সদরে গিয়েছিলেন। মাষ্টারমশাই চলে যাওয়ার পর কেমন ইচ্ছে হল বাবা বাড়ীতে নাই ঘরটায় একবার বেড়িয়ে আসি। ধীরে ধীরে সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। ঘরের দরজা খোলাই ছিল, দূর থেকে দেখলাম আলীমিঞা একটা তক্তাপোষের উপর বসে একটা উঁচু কাঠের চৌকী তক্তাপোষের উপরেই নিজের সামনে বসিয়ে কি যেন লিখ্‌ছিলেন। আমি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই আলীমিঞা একটু মৃদু হেসে, 'এসো খোকাবাবু এসো' বলে ডাকৃতেই আমার যেটুকু ভয় ছিল কেটে গেল। আমি ঘরের ভিতর গিয়ে পাটীপাতা তক্তাপোষের উপর বসে পড়লাম।

জানালা দুটো খোলাই ছিল। বাহিরের দিকে তাকাতেই বুকের মধ্যে আমার কেমন যেন শিউরে উঠল—যেন কী একটা অমূল্য হারিয়ে যাওয়া জিনিষ আজ হঠাৎ বহুদিন পরে ফিরে পেলাম। নিজেকে সাম্‌লাতে পারলাম না—আমার চোখ জলে ভরে গেল।

কেন যে চোখে জল এসেছিল, কোনও কারণ খুঁজে না পেয়ে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। বড় লজ্জা হল। ভাবলাম ছুটে পালাই। কিন্তু লজ্জায় ছুটে পালাবার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছি।

আলীমিঞা চট্‌ করে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে জিজ্ঞেস করলেন "কি হয়েছে খোকাবাবু, কাঁদছ কেন?" কি বলব উত্তর খুঁজে পেলাম না। "কেউ বকেছে বুঝি?" চুপ করেই রইলাম। "বল আমাকে খোকাবাবু! কে বকেছে তোমায়?" আলীমিঞার মুখ যেন সত্যিই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ বলে ফেললাম "আমার ওঘরটায় পড়তে ভাল লাগে না। আমি এই ঘরটায় পড়ব।" আলীমিঞা একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন। পরে বল্লেন "এই-জন্যে? তা সব ঘরই ত তোমার খোকাবাবু! তোমার বাবা আসুন, আমি বলে ব্যবস্থা করে দেবো।"

বাবা ফিরে এলেন। আলীমিঞা বাবাকে কি বলেছিলেন জানিনা। কিন্তু পরের দিনই আমি আমার হারান ঘর ফিরে পেলাম। প্রাণ আলীমিঞার প্রতি শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল।

২

আমার দাদার নাম ছিল শ্রীপ্রশান্ত চন্দ্র সাহা। আমার চেয়ে তিনি ছিলেন পাচ বছরের বড়। তিনিও আমাদেরই গ্রাম্যস্কুলে উঁচুক্লাসে পড়তেন। তাঁকেও দুবেলা এক মাষ্টার এসে পড়িয়ে যেত।

দাদার বিষয় একটা কথা, স্কুলেই বোধ হয় একদিন আমার কাণে এলো—"বাবুর বড় ছেলেটা মানুষ হবে না"। কথাটা কে কাকে বলেছিল মনে নাই কিন্তু কথাটা আমার বুকের মধ্যে গিয়ে যেন তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধল। তারপর দুদিন পর্য্যন্ত কথাটা উঠতে বস্‌তে শুতে আমাকে ব্যথা দিয়েছে আজও মনে আছে। এই কথাটা পরে অনেক বার অনেকের মুখে শুনেছি এবং যখনই শুনেছি, বেশ মনে পড়ে, প্রাণে একটা কষ্ট অনুভব করতাম।

একদিন শীতকালের সকালবেলা আমি আমাদের বৈঠকখানা দালানের সদরে বাড়ীর সামনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে-ছিলাম। এমন সময় দেখি আমাদের স্কুলের হেড মাষ্টার-

মশাই আমাদেরই বাড়ীর দিকে আস্‌ছেন। সে দিনটা ছিল আমাদের স্কুলের বাৎসরিক প্রমোশনের দিন। তাই হেড-মাষ্টারমশাইকে দেখেই আমার বুকটা কেমন দুর দুর করে কেঁপে উঠল। তিনি আমাদের বাড়ীতে ঢুকেই আমাকে সামনে পেয়ে হেসে আদর করে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বল্লেন "এবারও তুমি ফাষ্ট হয়েছ সুশান্ত! তোমার বাবাকে সেই খবরটা দিতে যাচ্ছি"। আনন্দে আমার বুকটা নেচে উঠ্‌ল। হঠাৎ দাদার কথা মনে পড়ল, জিজ্ঞাসা করলাম "দাদা! দাদার কি হলো?" তিনি গম্ভীর হয়ে বল্লেন "তোমার দাদার বোধহয় এবারও হলো না। দেখি তোমার বাবা কি বলেন"। এই বলে তিনি বৈঠকখানা বাড়ীর ওপরে উঠে গেলেন।

শুনে বেশ মনে পড়ে, এক মুহূর্ত্তে যেন আমার সমস্ত আনন্দ একেবারে নিভে গেল। গত বছরের কথা মনে পড়ল। দাদা থার্ডক্লাস থেকে সেকেণ্ড ক্লাসে প্রমোশন না পেয়ে তিন দিন বিছানায় শুয়ে কেঁদেছিলেন। এবারও হলো না।

দাদার জন্য মনটা বড়ই অবসন্ন বোধ হতে লাগল। আমি আমাদের পুকুরের উত্তরের পারের বাঁধা ঘাটের উপর গিয়ে বস্‌লাম—একটা পাতিলেবু গাছের তলায়। এমন সময় চেয়ে দেখি—বাগানের ভিতর দাদা কোথায় ছিলেন জানি না—পুকুর পাড় দিয়ে হন্ হন্ করে আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছেন। দাদার পায় এক জোড়া চটী এবং গায়ে একটা সবুজ রঙের আলোয়ান। চোখ দুটোর দিকে চেয়ে দেখি, একটা বিশেষ আকুল চাহনি। দাদার মুখের দিকে চেয়েই আমার মনটা কেমন হু হু করে উঠ্‌ল।

দাদার সেই বয়সের চেহারা আজ আমার মনে যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সব সময়ই জলছে। একখানি সহজ সরল মুখের উপর বড় বড় ভাসা ভাসা চোখে সব সময়ই একটা গভীর বিশ্বাসের ছায়া। চোখ তুলে যাই দেখতেন, তারই মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাসে আত্মনিবেদন করতেন —এইটেই ছিল যেন তাঁর প্রাণের সহজ ধর্ম্ম, এবং তারই অভিব্যক্তি ছিল তাঁর সমস্ত অবয়বের মধ্যে, সমস্ত ভঙ্গিমার মধ্যে। একটু হৃষ্ট-পুষ্ট গড়ন, শ্যামবর্ণ গায়ের রং এবং এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—এ সমস্তই ফুটিয়ে তুল্‌ত দাদার মুখ খানার উপরে এমন একটা মমতা, যে তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা—সে যেন অসম্ভব। তাঁর মুখের দিকে চাইলে কেমন যেন মায়া হয়, তাঁকে ব্যথা দেওয়া যায় না।

দাদার মুখখানার গড়ন ছিল বড় সুন্দর। দাদার মুখের প্রশংসা ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি এবং মুখের দিকে তাকিয়ে অতি সহজেই বিশ্বাস করেছিলাম, দ্বিধা করিনি। মুখের কোন একটী প্রত্যঙ্গের বিশেষ প্রশংসা না করা গেলেও সমস্ত মিলিয়ে এমন একটা পরিপূর্ণ সমাবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যে দাদার মুখের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত ছিল -এমন কথা বলা চলে না।

ছেলেবেলা থেকেই দাদা ছিলেন একটু বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চলতি কথায় যাকে বলে 'বাবু'। আমার যতদূর মনে পড়ে ছেলেবেলা থেকে বরাবরই দেখেছি কোঁকড়া চুলে মাঝখানে সীঁথি কাটতেন—সব সময়ই সযত্ন-রক্ষিত। জামা কাপড় সব সময়ই ছিল ফিটফাট এবং আমার মতন খালি পায়ে কখনও বেড়াতেন না।

ছেলেবেলা থেকে বড় শান্ত ছিল দাদার স্বভাব। ছেলেদের ছুটোছুটী হৈ-হৈ খেলা-ধূলোর মধ্যে দাদাকে খুব কমই দেখেছি, এবং খেলার মাঠে যদিও বা কোনও দিন এলেন—চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতেন, যোগ দিতেন না। অতি স্বল্পভাষী, কথাবার্ত্তা খুব কমই বলতেন, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছিপ হাতে করে পুকুরে বসে থাক্‌তে কখনও ক্লান্তি দেখিনি।

দাদা এবারও ফেল করেছেন কিন্তু পড়াশুনায় দাদার যে কিছু অবহেলা ছিল—তা নয়। দুবেলা মাষ্টার মশাইএর কাছে ত পড়তেনই এবং তা ছাড়া মাষ্টার চলে গেলেই আমার মতন বই খাতা এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালাতেন না। মাষ্টার চলে গেলেও দাদা অনেকক্ষণ ঝুঁকে পড়ে হয় পড়তেন না হয় লিখ্‌তেন না হয় অঙ্ক কষতেন। পরীক্ষার আগে ত দাদাকে দিনরাত পড়তে দেখতাম—পড়া ছাড়িয়ে আন্‌তে মাকে অনেক বার বাইরে লোক পাঠাতে হত। তবুও দাদা পরীক্ষায় যে কেন পাশ করতে পারতেন না এটা ভেবে আমার সত্যই বড় আশ্চর্য্য বোধ হত।

একটা কথা মাঝে মাঝে তখন প্রায়ই শুনতাম, "প্রশান্তর মোটে মাথা নাই, সুশান্তর খুব মাথা"। কথাটা প্রথম প্রথম ঠিক বুঝতে পারিনি। সময় সময় ভেবেও দেখেছি মনে আছে এবং ভেবে সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে আমার মাথার গড়নটা বোধ হয় দাদার চেয়ে বড়, তাই পড়া শুনা আমার মাথায় ধরে বেশী। কিন্তু অত পড়াই বা তা হলে কেন—ধরবে কোথায়?

তাই বোধহয় আমার একটু রাগ হত যখন দেখতাম ছুটির দিন দুপুর বেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাদা চুপটী করে মার কাছে বসে রামায়ণ কি মহাভারত শুন্‌তেন। বেশ মনে পড়ে সে ছবি—ভিতরের বাড়ীর দোতালার পূবের বারান্দায় একটা মাদুর পেতে মা উপুড় হয়ে শুয়ে বুকের নীচে একটা বালিশ দিয়ে সুর করে মহাভারত পড়তেন। আর দাদা পাশেই চুপ করে বসে থাকৃতেন। আর কেউ বড় একটা থাকৃতনা, কেবল মাঝে মাঝে ও পাড়ার 'সাবির মা' শুন্‌তে আস্‌তেন। একদিন এইরকম সময় আমি হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার মত ছুটে উপরে গিয়েছি, বোধহয় কোন একটা খেলাধূলার জিনিষ আন্‌তে। মা আমাকে দেখে পড়া বন্ধ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন "ছেলেটার মুখখানা দেখ না, রোদে একেবারে লাল হয়ে গিয়েছে। কোথায় ছুটোছুটী করে বেড়াচ্ছিস্ এই দুপুর বেলা?" সাবির মা বল্লেন "আহা! সত্যিই ত চোখ দুটো পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে।"

আমি এসব কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে আমার প্রয়োজনীয় জিনিষটী নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে গেলাম। যাবার সময় কানে গেল সাবির মা বল্‌ছেন "ছেলে তোমার এই বড়টি দিদি! আহা! যেন সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির। এমন ছেলে পাওয়া অনেক জন্মের পুণ্যের ফল।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবলাম "মাথায় ত লেখা পড়াই ধরেনা, তার উপর আবার এত মহাভারতের গল্প শোনা কেন?"

মার কথার উত্তর দিলাম না, কেননা মাকে আমি মোটেই ভয় করতাম না। আমার মা ছিলেন অসাধারণ প্রকৃতির মানুষ। কখনও তাঁকে রাগতে দেখিনি। প্রাণখানা তাঁর সকলের জন্যই সব অবস্থায় দয়া ও দাক্ষিণ্যে ছিল ভরা। "আহা! বেড়ালটাকে আজ বোধহয় তোরা কেউ খেতে দিসনি, তাই বোধহয় অমন করে ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে; আহা! মন্নুয়া চাকরটিকে তোরা কেউ ডাকিস না, আজ বেচারীর সকাল থেকে মাথা ধরেছে বোধহয় জ্বর আসবে; আহা! অমন করে মাগুর মাছটাকে আছড়ে আছড়ে মারিস না শৈলি! তার চাইতে একেবারে কেটে ফ্যাল—এইরকম ধরণের কথা সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত মার মুখে শুনতাম। একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছি, মা আমার পাশে বসে হাতপাখায় হাওয়া করছেন, এমন সময় ঐরকম ধরণের কি একটা কথায় আমি মাকে বলেছিলাম "আচ্ছা মা, গরু যখন বাগানের গাছ খাবে, তুমি গরুর জন্য আহা কর্ব্বে, না গাছের জন্য আহা কর্ব্বে?" "ছেলের কথা শোন।" এই বলে মা একটু মৃদু হাসলেন।

আমার মার নামও ছিল দয়াবতী—সার্থক করেছিলেন তিনি নিজের নাম। আমার মা দেখতে ছিলেন কতকটা দাদার মত, কেবল দাদার চাইতে ছিলেন আরও একটু মোটা এবং গায়ের রং ছিল অনেক বেশী ফর্সা। ছেলেবেলা থেকে সকলের কাছেই শুনেছি যে, আমার মার মত সুন্দরী নাকি আমাদের সমাজে আর ছিল না। আমার ঠাকুরদাদা নাকি সাত গ্রাম খুঁজে বাবার জন্য ঐ মেয়ে পছন্দ করেছিলেন।

* * * *

আমাকে ঘাটের পারে দেখতে পেয়ে দাদা যখন আমার দিকে হন্ হন্ করে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লেন, দাদার চোখের দিকে চেয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। এখন দাদাকে কি বলি। ফেল হয়েছেন----একথা দাদার মুখের উপর বল্‌বার নিষ্ঠুরতা আমার ছিল না। একবার ভাব্‌লাম দাদা এখানে আমার কাছে এসে পৌঁছবার আগেই ছুটে পালাই। আবার ভাব্‌লাম দাদা তাহলে ভাব্‌বে কি!

দাদা আমার কাছে এসে ব্যাকুলকণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন "হ্যাঁরে সুশন্, হেডমাষ্টার মশাই এলেন না? কেনরে?" বল্লাম "কি জানি! বোধহয় বাবার সঙ্গে কি দরকার।" আবার জিজ্ঞাসা করলেন "তোর সঙ্গে কোন কথা হলো?" এই বার কি বলি। মিথ্যাকথা বলে দাদাকে ঠকাতেও ভাল লাগছেনা। আবার দাদার মুখের উপর অত বড় নিষ্ঠুর সত্যও বল্‌তে বুকে লাগে। আস্তে আস্তে বল্লাম

"হ্যাঁ"। "কি বল্লেন ? প্রমোশনের কথা কিছু বল্লেন ?"

বল্লাম "আমি এবার 6th ক্লাশে উঠেছি"। ক্লাসে প্রথম হওয়ার কথাটা বল্‌তে কি রকম বাধল।

ব্যাকুল ভাবে দাদা বল্লেন 'আমার কথা ? বলেছেন কিছু ?' চট করে একটা বুদ্ধি মাথায় এসে গেল। বল্লাম "তোমার বিষয় বাবার কাছে বলবার জন্য উপরে উঠে গেলেন। তুমি এইখানে বসো, আমি শুনে আসছি।"

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে ছুটে সেখান থেকে চলে গেলাম। উপরের বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম দাদা চুপটি করে লেবুগাছ তলায় বসে আছেন—আমারই প্রতীক্ষায়। দাদার কাছে গিয়ে কি ভাবে সাজিয়ে কি সব বলব—এই ভাবছি এমন সময় হঠাৎ আলীমিঞা এসে আমার হাত ধরলেন। আমি চম্‌কে উঠলাম।

"খোকাবাবু! দাদাবাবু—কোথায় ?"

"কেন ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"বাবু ডাক্‌ছেন।"

শুনে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। এত বড় নিষ্ঠুর খবর না জানি কি নিষ্ঠুর ভাবেই ওর কাছে প্রকাশ হবে। তারপর বাবার কাছে বেচারীর দুর্দ্দশার সীমা থাকবে না। মনে পড়ল গত বছর বাবা শাসিয়েছিলেন "আস্‌ছে বছর যদি ক্লাসে উঠতে না পার—তোমায় বাড়ী থেকে দূর করে দেবো।" সবাই বলে বাবার যে কথা সেই কাজ। তাইত, কি হবে!

আলীমিঞাকে সত্যকথা বল্‌তে পারলাম না; বললাম 'কি জানি'। আলীমিঞা দাদাকে খুঁজতে চলে গেলেন।

এখন কি করি! একবার ভাবলাম ছুটে গিয়ে দাদাকে বলি 'পালাও'। কিন্তু কেমন যেন ভরসা হলো না। হঠাৎ মার কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম যাই মাকে গিয়ে সব বলি যদি দাদাকে দুর্দ্দশার হাত থেকে একটু বাঁচাতে পারেন। ছুটে বাড়ীর ভিতর চলে গেলাম।

মা তখন পূজো করেছিলেন—পূজোর ঘরে। আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে ভয়ত্রস্ত সুরে মাকে সব বললাম। মা আমার মুখের দিকে একটু চেয়ে বল্লেন "আচ্ছা, প্রশনকে এইখানে ডেকে নিয়ে আয়।" মার শান্ত সুরে কেমন যেন বুকে একটা ভরসা পেলাম।

ছুটলাম পুকুর ঘাটের দিকে। গিয়ে দেখি দাদা নেই। চেয়ে দেখি খানিকটা দূরে দাদা আলীমিঞার সঙ্গে বৈঠকখানা বাড়ীর দিকে যাচ্ছেন। এখনও স্পষ্ট মনে আছে—পিছন দিক থেকে দাদার চলে যাওয়ার ভঙ্গীটা যেন বড় করুণ, কেমন যেন আমার বুকের মধ্যে গিয়ে বাজলো। কেমন যেন দয়ায় সমস্ত প্রাণটা কেঁদে উঠল। চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখতে পেলাম দাদার সেই মমতা-মাখা মুখখানার সম্মুখে বাবার রুদ্রমূর্ত্তি—দাদা চোরের মত দাঁড়িয়ে আছেন, চোখ ছল ছল করছে, বড় কাতর চাহনি। আমি সইতে পারলাম না। আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। ঘাটের পারে সেই লেবুগাছ তলায় এদিক ওদিক চাই আর কোঁচার খুঁটে চোখ মুছি—পাছে কেউ দেখে ফেলে!

*   *   *   *

যাই হোক শেষ পর্য্যন্ত ফলে, দাদাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হল। বিদেশ থেকে একজন বি-এ পাশ মাষ্টার এলো—আমাদের বাড়ীতেই থাকবেন ও দাদাকে তিন বেলা পড়াবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

সুন্দরী রমা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সুন্দরী রমা, রূপে অনুপমা
ভুলায়ো না মোরে আর,
নয়ন-প্রদীপে আরতির পালা
শেষ কর এইবার।

অন্তরে এস অন্তরলীনা,
হাতে তুলে নাও এ মুখর বীণা
ঝঙ্কারে তার করগো নীরব
এ প্রলাপ বেদনার।

ও তনু তনিমা নয়নের মোহ
অতনুর পূজা করি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াল
মোর দিবা সর্ব্বরী—

কাছে ছিলে তুমি দূরে গেলে সরে',
অর্ঘ্য-কুসুম পড়ে যায় ঝরে',
চির পূজারীর পূজার বিঘ্ন
সেই বেদনায় মরি।

সেদিন শারদ জ্যোৎস্না-আলোকে
যেমন দাঁড়ালে প্রিয়া,
আর একবার তেমনি দাঁড়াও
দেখি আঁখি নিমিলিয়া।

চিত্ত-মুকুরে পড়িয়া সে ছায়া
ঘনায়ে তুলুক সিন্ধুর মায়া,
আমি ডুবে যাই নিতল গভীরে,
তুমি থাক দাঁড়াইয়া।

তোমার পরশ সব দেহ দিয়ে
যদি বা সহিতে পারি,
সুদূর-বিধুর আহ্বান তব
সহিতে পারি না নারী—

দূর দুরান্ত মেঘমালা নদী—
বন কান্তার—কাল নিরবধি
বিপুলা পৃথ্বী ছায়াছবি সম
সরে যায় সারি সারি।

আড়াল হইতে এমনি করিয়া
বাঁধিয়া কঠিন ডোরে
কতকাল বল আর কতকাল
এড়ায়ে চলিবে মোরে ?

আশা নিরাশার দোলনায় দুলি
পথ চাহি মন উঠিবে আকুলি,
সন্ধ্যার মালা অভিমান ভরে'
কত যে ছিঁড়িনু ভোরে।

তোমার রূপের অনল-প্রভায়
ঝলসিয়া আঁখিতারা
নীল গগনের সন্ধ্যাতারায়
বরষি স্নিগ্ধ ধারা,—

ইঙ্গিতে তব অকথিত বাণী
ভুলায়ে আমারে নিয়ে যায় টানি,
অশরীরী মায়া নয়নমোহন
করিল আত্মহারা।

খুঁজিয়া বেড়াই বাহিরে তোমায়,
তুমি অন্তরপুরে
হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কারি গান
গাও অনাহত সুরে—

সুরের আগুনে মেঘমল্লার
তৃষিত-নয়নে আনে বারিধার,
হৃদয় বাহির করি একাকার
কেন সরে যাও দূরে ?

দেখা দিয়ে কেন সরিয়া দাঁড়াও—
পরশ করিয়া ছিলে
নয়ন মুদিয়া নেহারিব, তুমি
তোমারে ফিরায়ে নিলে।

হে ছলনাময়ী, তোমার ছলনা
কতকাল আর সহিব বলনা ?
নিত্য আমার পূজা-উপচার
হেলায়ে ফিরায়ে দিলে ?

ইন্দ্রধনুর স্বপ্ন ভাঙ্গিলে
নব আষাঢ়ের মেঘে,
ধ্যানের ছবিতে মূর্ত্তি তোমার
উঠিবে কি পুন জেগে ?

———

কবিতা পাঠ—(৪)

শ্রীনবেন্দু বসু এম্‌-এ

[অলঙ্কার]

ভাবরূপ কে আঙ্গিক পরিণতি দিতে ছন্দের পর আসে অলঙ্কার।

প্রথম প্রবন্ধে আমরা বলেছি যে কবি শরৎকালের বর্ণনার মধ্যে মাতৃরূপের অবতারণা করেছেন। মাতৃরূপ আমাদের সকলের সর্ব্বকালে পরিচিত। অতএব ঐ রূপের পরিভাষায় ভাবকে প্রকাশ করতে পারলে সর্ব্বসাধারণের সেটা উপলব্ধি করতে দেরী হয় না। তার মধ্যে সকলেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ দেখতে পায় বলে সেটা যে ভাবে অন্তরকে স্পর্শ করে, যেমন প্রবল ভাবে আবেগকে বিচলিত করে, এক কথায় যেমন মুগ্ধ করে, সে রকম পাতার পর পাতা সূক্ষ্ম অবাস্তব যুক্তিতর্ক আর আলোচনার দ্বারা হ'তে পারে না। অতএব অলঙ্কার শিল্পরচনার একটা মূল প্রয়োজন। যতক্ষণ শিল্পকে রূপের মধ্যে ভাবের বিকাশ আর প্রকাশ বলে জানবো ততক্ষণই বাহন স্বরূপ তার অলঙ্কারের প্রয়োজন হবে। অলঙ্কার কল্পনার আশ্রয়। তাতে ফুটেই কল্পনা নিজেকে বিকাশ করে। বাক্য কি? ভাষার মধ্যে ভাবের প্রকাশ। অর্থাৎ কতকগুলি সম্বন্ধযুক্ত শব্দ সমষ্টির সাহায্যে ভাবকে ইন্দ্রিয়গোচর রূপ দেবার চেষ্টা; এক দফা তাকে কানের মধ্যে সঞ্চার করে দ্বিতীয় দফা তাই থেকে দৃষ্টিগোচর বাস্তব রূপ রচনা করা। আমাদের দৈনিক খাওয়া পরার ভাষাতেও আমরা কত সময়ে এই রকম রূপ রচনা করে' চলি তার কি হিসাব রাখি? আমরা সাধারণ কথ্যভাষায় বলে' থাকি "মন টলে না।" এর অর্থ সম্যক বুঝতে হ'লে বাড়ীর ভিত্তি বা দেওয়াল কি রকম করে' টলে তা জানা থাকা চাই। গত ভূমিকম্পের শোচনীয় অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছে সেই ভুক্তভোগীরাই বুঝেছেন 'টলা' কথার অর্থ কতখানি। এই জন্যেই বলা হয় যে শিল্প আর কাব্যের আস্বাদ গ্রহণ সেই পর্য্যন্তই সম্ভব যে পর্য্যন্ত রসিক তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা আর কল্পনার সাহায্য নিতে পারেন। এই আদান প্রদানের বৃত্তি যাঁর যে পরিমাণে সক্রিয় তিনি সেই পরিমাণেই রসিক। আমরা অনেকেই কবি, কেউ সুপ্ত বা অন্যমনস্ক, কেউ বা জাগ্রত আর চোখে কানে সচেতন। রূপরসের অনন্ত প্রবাহ চোখের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে; যার ঢেউ গোণা অভ্যাস আছে সেই জানছে সে তরঙ্গশীর্ষে কত আলোছায়া আর রঙের বৈচিত্র্য, সেই শুনছে তার মধ্যেকার মন্দ্রগীতি। আমরা একবার একটি অল্পবয়স্কা বালিকাকে, যার শিল্পকলা বা কাব্যের কোন অনুশীলন ছিল না, বলতে শুনেছিলুম "কি রকম এক ঝলক হাওয়া এলো।" ও ক্ষেত্রে অনায়াসে "ঝলক" নামক অলঙ্কৃত শব্দটি কেমন করে তার মনে এলো? রৌদ্রের ঝলকের মতন হঠাৎ হাওয়ার একটা তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা দোলাকেও কেন সে ঐ নামে অভিহিত করলে? এ একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে আমাদের মধ্যে শিল্পী কার্য্য করে। হয়ত ঝলক কথাটি সেই বালিকার শ্রুতিস্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। অনুকূল অবস্থায় সহজেই মনে উদয় হয়েছে। কিন্তু এই সহজ উদ্রেকই প্রমাণ করে যে শিল্পের রূপ রস স্বতঃপ্রণোদিত। যা' হোক এটা দেখা যায় যে আমাদের দৈনিক ভাষা ব্যবহারের মূলেও শিল্পধর্ম্মী একটা অলঙ্করণ প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ কাজ করে। আর তার প্রয়োজন ভাবকে রূপে পর্য্যবসিত করা যাতে সেটা অন্যের মধ্যে স্পষ্ট আর সম্পূর্ণভাবে সঞ্চারিত হয়, যাতে শ্রোতা বক্তার কথা নিখুঁত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সময়ে সময়ে আরো ইচ্ছাকৃত ভাবে আমরা দৈনিক ভাষায় অলঙ্কার প্রয়োগ করে' থাকি। হয়ত বল্লুম "তোমার এ যুক্তি ধোপে টেঁকে না।" কথাটার রূপক সঙ্কেত সহজবোধ্য। অন্যভাবেও কথাটা প্রকাশ করা চলতো. কিন্তু যে গৃহস্থ নিত্য ধোপার হাতে বস্ত্রাদি সম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পক্ষে কথাটা হৃদয়স্পর্শী। একটা ইঙ্গিতে সে কথাটার অর্থ যতটা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলে ততটা হয়ত অনেক টেঁকসই যুক্তিতে হোতো না।

অতএব আমরা দেখছি যে শিল্পরচনায় অলঙ্কারের প্রয়োগ কোন চেষ্টাকৃত ভঙ্গী বা "বুজরুকী" নয়। বরং অলঙ্কারে রচনায় অচ্ছেদ্য বন্ধন। অলঙ্করণের প্রবণতা মানুষের ভাষা-ব্যবহারের সহজাত। অলঙ্কারের ব্যবহার থেকেই কবির দৃষ্টির স্পষ্টতা আর কল্পনার মৌলিকতা বোঝা যায়। অলঙ্কারের সাহায্যেই সে কল্পনা আমাদের চিত্তপটে রূপ গ্রহণ করে। একের স্বপ্ন অন্যের সত্য আর স্মৃতিতে পরিণত হয়।

আমরা এইবার কাব্যে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রধান অলঙ্কারের পরিচয় দেবো যা থেকে ওপরে লেখা তথ্যগুলির প্রয়োগ বোঝা যাবে।

(১) মানুষের কল্পনা স্বভাবতঃ মানুষের প্রসঙ্গেই সব চেয়ে বেশী উত্তেজিত হয়। আনন্দ আর সহানুভূতির জন্যে মানুষ শেষ পর্য্যন্ত মানুষের দিকেই চেয়ে দেখেছে। অতএব মানুষের কল্পনা যখন কিছু সৃষ্টি করে তখন তাতে মানুষের রূপ বা মানুষের জীবনেরই কোন একটা ছবি আঁকবার দিকে তার একটি বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রবণতার ফলে কাব্যের মূল একটা অলঙ্কার পাওয়া যায় যাকে বলতে পারি মূর্ত্তিরচনা।

মূর্ত্তিরচনা নানাভাবে হয়। এক রকম হয় বাস্তব বর্ণনা-মূলক। যেমন :—

মুক্তমেঘ বাতায়নে বসি
এলোকেশী কে এ রূপসী
জলযন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে।

*　　　*　　　*

এ যে সেই সতত সরসা
ভুবনমোহিনী ধনী, রূপসী বরষা।

(দেবেন্দ্রনাথ সেন—শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী)

এ কবিতার বিষয় বর্ণনামূলক। কবির উদ্দেশ্য বর্ষায় বাইরের জগতের একটি দৃশ্য আঁকা। কিন্তু বর্ষাকালের সাধারণ একখানি প্রাকৃতিক ছবি না এঁকে বিশিষ্ট একটি নারীরূপ চিত্রিত করে' তার মধ্যে ভাব ফোটানো হ'ল।

দ্বিতীয় ধরণে মূর্ত্তিরচনা করা যায় ভাবকে রূপ দান করে'। যেমন :—

আজ আসিয়াছে ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যামসমারোহে
হৃদয় সাগর উপকূল ;
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

(রবীন্দ্রনাথ—"আবির্ভাব")

এখানে বর্ষার চোখে দেখা রূপ বর্ণনীয় নয়। ভাবপ্রবণ রসপিপাসু মনের ওপর বর্ষার দুষ্ট লক্ষণগুলি যে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করেছে, তার যে একটা নিবিড় স্পর্শ বা সাহচর্য্যসূচক রোমাঞ্চ আছে, সেই ভাবটিই এখানে মূর্ত্তির মধ্যে ঘনীভূত করা উদ্দেশ্য।

আর এক ধরণের মূর্ত্তিরচনার উদাহরণ দিচ্ছি। এর একটু নাটকীয় মূল্য আছে। এখানে একটি মূল রূপ রচিত হয়। তার আশে পাশে ছোটখাটো আরো মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। সকলকে ঘিরে থাকে একটা দৃশ্য, খানিকটা ঘটনা। মনে করা যাক কবি তাঁর ভাবদৃষ্টিতে দেখলেন যে প্রেমই সকল সৌন্দর্যের উৎস. আর কাজেকাজেই জগতে যা কিছু দৃশ্যতঃ সুন্দর সবেতেই প্রেমের প্রভাব বা স্পর্শ আছে। এই ভাবে প্রবুদ্ধ হয়ে কবির কল্পনা বলতে চাইলে যে একা প্রেমের দেবতাই এককালে বহু হয়ে দিকে দিকে বিরাজ করছেন। এই কথা বলতে গিয়ে কিন্তু কবির কল্পনাদৃষ্টির ওপর একা প্রেমের দেবতার রূপ ছাড়া আনুষঙ্গিক আরো ঘটনা আর চরিত্র ফুটে উঠলো। তিনি বল্লেন :—

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে,
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,
চরণ কার কোমল তৃণ শয়নে।
পরশ কার পুষ্পবাসে পরাণ মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মত জড়ায়ে,
পঞ্চশরে ভস্ম করে' করেছ এ কি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছো তারে ছড়ায়ে ?

(রবীন্দ্রনাথ—"মদনভস্মের পর")

এখানে মূল রূপ হ'ল কামদেবের, যার বসন, নয়ন, বদন, চরণ দেখা গেল, যার পরশ পাওয়া গেল। এই মূল রূপকে ঘিরে আরো সব ক্ষুদ্রতর রূপ ফুটে উঠলো, অর্থাৎ নীরব গগন, তৃণের শয়ন, পরশের লতা, হৃদয়ের বৃক্ষ। দৃশ্যের এই বিক্ষিপ্তির মধ্যে কতকটা ঘটনাও অভিনীত হ'ল। বিশ্বের সমস্ত রমণীয় শ্রীর ওপর নটরাজকে দেখা গেল মন্ত্রপূত মদনভস্ম নিক্ষেপ করতে।

আর এক ধরণের মূর্ত্তিরচনা হ'তে পারে যেখানে বর্ণনীয় ভাবকে কোন বিশিষ্ট রূপে পরিণত না করে' তাতে শুধু মানব-সুলভ গুণাবলী আরোপ করে' তার চারিদিকে একটা বাস্তব পরিবেষ্টন সৃষ্টি করা হয়। যেমন :—

স্নিগ্ধ সজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে।

(রবীন্দ্রনাথ—"বর্ষামঙ্গল")

এখানে বর্ণনীয় বিষয় ক্ষান্তবরষণ মেঘভারগ্রস্ত দিনে সময়ের যে একটা মন্থরতা অনুভব করা যায় তাই। কিন্তু এই বর্ণনার নায়ক প্রহরকে এখানে প্রহর ভাবেই দেখা যায়, কেবল ঐ মন্থরতার ভাবটুকু ঘনীভূত করে' সঞ্চার করবার জন্যে তাকে শিথিল, স্খলিত, অলস, আবিষ্ট প্রভৃতি বলে' মানব-সুলভ গুণে ভূষিত করা হয়।

কৌতূহলী পাঠক এইভাবে তাঁর কাব্য পাঠনার মধ্যে নানা ধরণের মূর্ত্তিরচনার সঙ্গে পরিচয় করতে করতে চললে তাঁর রূপরসের আস্বাদন আরো গাঢ় হবে। এখানে আমরা মাত্র আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করবো যেটি শুধু মূর্ত্তিরচনারই সুন্দর নিদর্শন নয়, যাতে ঐ অলঙ্কার কি ভাবে রূপ সৃষ্টির সহায়তা করে তারও একটা রূপক বর্ণনা পাওয়া যায় :—

চেয়ে দেখ চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে।
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী?

তার পরে—

অতি ত্বরা গড়ি ধনী দৈব মায়া বলে
বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি
কনক কঙ্কণ হাতে স্বর্ণমালা গলে।

কাব্যের অলঙ্কারে এই "দৈব মায়া বল" হ'ল আবেগ আর কল্পনা। তাদের কার্য্য এই ভাবে :—

সাজাইবে গজ বাজী, পর্ব্বতের শিরে
সুবর্ণ কিরীট দিবে; বহাবে অম্বরে
নদ-স্রোতঃ উজ্জ্বলিত স্বর্ণ-বর্ণ-নীরে।
সুবর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহগ থোবে। এ বাজীকরীরে
শুভক্ষণে দিনকর কর দান করে।

(মধুসূদন দত্ত—"সায়ংকাল")

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান অলঙ্কার হ'ল রূপক। রূপকের তত্ত্ব অলঙ্কার শাস্ত্রেরই তত্ত্ব। গোড়ায় আমরা যে, সাধারণ মন্তব্যগুলি করেছি রূপক সম্বন্ধে সেই সকল কথাই খাটে। আমরা দেখেছি কত রূপক আমাদের সাধারণ কথোপকথনে থেকে গেছে। সেগুলিকে বলতে পারি মৃত রূপক। অতি ব্যবহারের ফলে তাদের মধ্যেকার ছবিলতা আর অর্থ সম্বন্ধে আর আমরা সচেতন নই। অভ্যাস মত ব্যবহার করে' যাই মাত্র। কাব্যের ব্যবহারে রূপক বর্ণনীয় বিষয়কে বিশেষ করে' চোখে দেখা রূপের স্পষ্টতা দেয়।

নীল আকাশে খণ্ড মেঘের গতি দেখে কবির কল্পনা তাঁর স্মৃতির মধ্যে উদ্রেক করলে নদী আর নৌকার সমধর্ম্মী সুপ্ত অভিজ্ঞতাকে। মেঘ আকাশের গায়ে সাবলীল ভাবে এগিয়ে চলে, নৌকাও অনায়াসে জলে ভেসে যায়। এই যোগসূত্র অবলম্বন করে' মেঘের দৃশ্য কবির অনুভূতিকে তেমনি প্রবল আর ঘনিষ্ঠভাবে নাড়া দিলে যেমন সেই চোখে দেখা আর হাতে ছোঁওয়া নৌকা নদী দিয়েছিল। কবি তাই মেঘের গতি বর্ণনা করতে গিয়ে নদীতে নৌকা ভেসে যাওয়ার ছবির আশ্রয় নিলেন। তাঁর লেখনী লিখলে :—

"নীল আকাশে কে ভাসালে শাদা মেঘের ভেলা"।

(রবীন্দ্রনাথ)—

এই ভাবে রূপকের উৎপত্তি হ'ল।

রূপকেরও প্রকার ভেদ আছে। "শাদা মেঘের ভেলা" হ'ল রূপকের প্রাথমিক সরল রূপ। কিন্তু এ ছাড়া এখানে

"ভাসালে" নামক একটি ক্রিয়া রূপক রয়েছে যা'র কাজ আর একরকমে হচ্ছে'। "ভাসালে" কথাটি থাকার ফলে "নীল আকাশ," "নীল আকাশ" নামে অভিহিত হয়েও, নদীর স্থান গ্রহণ করেছে। নাম রইল কিন্তু পরিচয় বদলে গেল। তৃতীয়তঃ সম্পূর্ণ ছত্রটি হ'ল একটি রূপক-ক্রম। মেঘ হ'ল ভেলা, তার গতি হ'ল ভাসা, আকাশ হ'ল নদী। ইচ্ছা করলে ক্রম আরো বাড়ান যায় :—

"শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি
আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণ শুভ্র মেঘের ভেলায় ॥
গেল বিস্মৃতির ঘাটে ?

(রবীন্দ্রনাথ—"তপোভঙ্গ")

এখানে নদীতে ভাসমান ভেলাকে বিস্মৃতির ঘাটে এসে লেগে ছবি সম্পূর্ণ করতে হ'ল। এমনিই এগিয়ে চললো কল্পনা। বিন্যাসে কোথাও অসঙ্গতি রইল না।

অসঙ্গত রূপকও হয়। যদি বলা যেত "আকাশ পথে কে ভাসালে শাদা মেঘের ভেলা," তা হ'লে এক চতুর্থ প্রকারের মিশ্ররূপক পাওয়া যেত। কেননা "পথে ভাসান" তত সুলভ নয় যত "পথে বসান"। যদিও শাদা কথায় অনেক সময়ে দুরকমেই বলি তাহ'লেও রসালংকারের সঙ্গতি রাখতে হ'লে "পথে ভাসান" খুব শুদ্ধ উক্তি বলে' মনে হয় না কিন্তু রূপকের আর একরকম প্রয়োগ ধারণা করা যেতে পারে যাতে "পথে ভাসান" কথাটিই হবে বেশী অর্থপূর্ণ। "বসান"র চেয়ে "ভাসান"তে অসহায়তার ভাব বেশী। সেই হিসাবে রসিক বক্তা পথে না বসিয়ে একেবারে ভাসিয়েই দেবেন যাতে উঠে দাঁড়াবার আর উপায় না থাকে। এখানে তত্ত্বকথা হ'ল এই যে স্পষ্ট বর্ণনার প্রয়োজনে একটি ক্রিয়ার ধর্ম্ম অন্য ক্রিয়ায় আরোপ করা হ'ল।

এইবার দেখা যাক বিশেষণ ব্যবহার করে' কেমন করে' রূপক সৃষ্টি করা যায়।

"বৃষ্টি করে' পুলক স্বর্ণালোকে"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—"কে")

এখানে উজ্জ্বল সোনার সঙ্গে আলোকের তুলনা করা হ'ল। "স্বর্ণ" এখানে বিশেষণ স্থানীয়। তেমনি :—

"কমল-চোখে কোমল চেয়ে কৃজন ভুলাবে"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত— 'বর্ষানিমন্ত্রণ")

এখানে "কমল চোখে" ঐ রকম একটি রূপক।

বিশেষণ বা সংজ্ঞা-রূপকের সাহায্যে সময়ে সময়ে মানব-সুলভ গুণাগুণের অবতারণা ক'রে রূপককে মূর্ত্তি রচনার সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে ফেলা হয় :—

"সেই ধ্বনি ধায় বকুল শাখায়
প্রভাতবায়ুর ব্যাকুল পাখায়"

(রবীন্দ্রনাথ—"তুমি")

এখানে পাখাকে ব্যাকুলতা দান করে' তাকে মনুষ্যপদবাচ্য করে' তোলা হ'ল। আবার প্রভাত বায়ুকে পাখা দান করে' মূর্ত্ত করা হ'ল। প্রথম ক্ষেত্রে বিশেষ্য রূপায়িত হয়েছে রূপক বিশেষণের সাহায্যে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশেষণ রূপায়িত হয়েছে রূপক সংজ্ঞার সাহায্যে।

বিশেষণের আর একরকম প্রয়োগ দেখা যাক :—

"ছায়াঘন যেথা তব আকাশ অরুণ
আষাঢ়ের আভাষে করুণ।"

(রবীন্দ্রনাথ—"জন্মদিন")

এখানে আকাশের করুণতা সবটা কবির আরোপিত না'ও হতে পারে। ও অবস্থায় আকাশের যে একটা হালকা, ধূসর, কোমল রং হয়, তাকে বৈজ্ঞানিক ভাষাতেও হয়ত করুণ বলে' বর্ণনা করা যায়। যেমন ইংরাজী "tender light" কথাটিতে ইচ্ছা করলে কতকটা বাস্তব বর্ণনারও সঙ্কেত আছে বলে' মনে করা যেতে পারে। কিন্তু যখন বলা হয় :—

"সেই ধ্বনিটি ক্ষুব্ধ পথের পাশে
গোপন শাখার ফুল গুলিরে
দিল আপন বাণী"।

(রবীন্দ্রনাথ—"চিরন্তন")

তখন দেখা যায় যে "পথ" কোন রকমেই ক্ষুব্ধ হ'তে পারে না। বরং ঐ পথ যে কবিকে প্রবাসে টেনে এনে তাঁর ক্ষোভের কারণ হয়েছে সেই কবিরই ক্ষোভ পথকে ম্লান বিবর্ণ করে' তুলেছে। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে "ব্যাকুল পাখার" "ব্যাকুল", আর "ক্ষুব্ধ পথের" "ক্ষুব্ধ", মানবরূপ সৃষ্টি করলেও দুয়ের রূপক মূল্যে একটু পার্থক্য আছে। "ব্যাকুল" এর ব্যাকুলতটুকু প্রভাতবায়ুর ব্যবহার থেকেই বোঝা গেছে, কেননা সে অত্যন্ত আগ্রহভরে ধ্বনি নিয়ে

ছুটেছে। কিন্তু "ক্ষুব্ধ পথের পাশে" যে ধ্বনিটি চলেছে সে ধ্বনির কারণে পথ ক্ষুব্ধ নয়। পথের ক্ষোভ একেবারে অন্য কারণে।

আর একরকম রূপক হয় যেখানে এক সংজ্ঞার গুণাগুণ অন্য সংজ্ঞায় আরোপ করা হয়।

"মধ্যদিন তন্দ্রাতুর
শুনিছে রৌদ্রের সুর
মাঠে শুয়ে আছে ক্লান্ত ধেনু"
(রবীন্দ্রনাথ—আশীর্ব্বাদী)

রৌদ্রের সুর হয় না। বীণারই সুর হয়। কিন্তু বীণার সুর একাগ্রভাবে শুনলে যে স্বপ্নাবেশ হবার কথা তেমনি অলস নিস্তরঙ্গ অবস্থায় মধ্যদিনের রৌদ্রে পৃথিবী বুক পেতে দিয়ে পড়ে' আছে বলে' কবির কল্পনা দুয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পায়। তাঁর কানে বাজে রৌদ্রদগ্ধ নিঝুম দুপুরে সাপুড়ের বীণ-গুঞ্জন।

(৩) বর্ণনার মধ্যে উপমা আর উপমেয়কে বিচ্ছিন্ন করে' দেখালে পাওয়া যায় সাধারণ উপমা অলঙ্কার। যেমন "নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা" না বলে' যদি বলা হয় "নদীতে-ভেলা ভাসান'র মতন করে নীল আকাশে সাদা মেঘের খণ্ডগুলিকে কে চালিত করলে," উপমায় রূপকের জমাট রূপ একটু তরল করে' আনা হয়। তার গঠনসংস্থান একটু শিথিল করে' দেখান হয়। মনে করা যাক বলা হ'ল :—

"অঙ্গের বরণ কস্তুরী চন্দন
আমি হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি"
(চণ্ডীদাস)

এখানে অঙ্গের বরণকে কস্তুরী চন্দন রূপে দেখে চন্দনেরই মতন হৃদয়ে মাখা হ'ল। কেন সেটা কস্তুরী চন্দন তা' বলা হ'ল না। এ রূপক। কিন্তু যখন কবি বলেন :—

"কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি
ঘসিতে সৌরভময়"
(চণ্ডীদাস)

তখন পীরিতিকে একেবারে চন্দন বলা হ'ল না। বলা হ'ল পীরিতি চন্দনের রীতি। দুটোর মধ্যে তুলনার সূত্রটি ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। রসরূপকে পূর্ব্বের চেয়ে তরল করে' ফেলা হ'ল।

অনেক সময়ে তুলনার সূত্রটি অত স্পষ্টভাবে ধরিয়ে দেওয়া থাকে না। যেমন :—

"যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি"। (বিদ্যাপতি)

এখানে গোধূলির আশ্রয়ে ধনির চলে' যাওয়া আর মেঘের পটভূমির ওপর বিদ্যুতের একটি রেখা চমক মেলে যাওয়ার ছবি দুটি পাশাপাশি রেখে দেখান হ'ল মাত্র। তুলনার সাহায্যে রসিক নিজেই দুটিকে যুক্ত করে' নেবেন।

উপমার প্রয়োগে বর্ণনা আর অলঙ্কার সমধর্ম্মী হওয়া উচিত। তবেই উপমার রস গাঢ় হয়। উপমার মূল ধর্ম্মের সঙ্গে যদি এমন কোন আনুসঙ্গিক গুণ থাকে যার কোন মিল বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে পাওয়া যায় না, তা হ'লে বিরোধী রসের আভাস লেগে অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যহানি ঘটে। এ কথাটা রূপক আর উপমা দুয়েরই সম্বন্ধে বলা যায়। যখন বলা হয় :—

"নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয় চাঁদ"
(জ্ঞানদাস)

তখন নয়নের অঞ্জনের সঙ্গে বা অঙ্গের ভূষণের সঙ্গে কালিয় চাঁদের তুলনা দুই বেশ সঙ্গত। দুয়েতেই নিবিড় স্পর্শের ভাব জাগান হয়। কিন্তু যখন পাই :—

"নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল"
(বিদ্যাপতি)

তখন প্রশ্ন জাগে যে নয়নের অঞ্জন যে হিসাবে সেই হিসাবেই কি মুখের তাম্বুল? নয়নে অঞ্জন স্পর্শ করে' থাকে বটে—কিন্তু তাম্বুল মুখে স্পর্শ ক'রে থাকা ছাড়া চর্ব্বিতও হয়। অতএব এ ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শিত হ'তে হ'লে ন্যায়তঃ চর্ব্বিতও হ'তে হয়। কবি বলতে পারেন যে রসিক তাম্বুলের ঐ লক্ষণটুকু বাদ দিয়ে রসগ্রহণ করবেন। কিন্তু কবির পক্ষেও যথাসাধ্য বিরোধী উপমা বর্জ্জন করে' চললে ভালো হয়। "মুখর তাম্বুল" না বলে' "অধরক তাম্বুল" বললে বোধ হয় বেশী সঙ্গত হয়। মুখে তাম্বুল লেগেও

থাকে আর চর্ব্বিতও হয়; অধরে তাম্বুল রস শুধু লেগেই থাকে একটি মনোহর বঙ্কিম রেখায়।

এই থেকেই আর একটা কথা উঠে যে উপমার মূল ভাবের সঙ্গে এমন আর কোন ভাব সংশ্লিষ্ট থাকবে না যেটা বর্ণনার গাম্ভীর্য্য বা মর্য্যাদাকে নষ্ট করে। বাংলার কোন লেখিকার উপন্যাসে নবোদিত খণ্ড চন্দ্রের তুলনা দেওয়া আছে কলিকাতার বাজারে বিক্রীত এক পয়সা দামের কুমড়ার ফালির সঙ্গে। বর্ণনা স্পষ্ট হলেও কুমড়ার ফালির উল্লেখে প্রসঙ্গটি নিতান্ত রূঢ়, স্থূল আর হাস্যকর ভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের তুলনা চলে না। নিখুঁত উপমা বর্ণনার অর্থে আরো সাঙ্কেতিক প্রসার এনে দেয়। সাধারণ বিষয়ও অসাধারণ হয়ে ওঠে। একটি উদাহরণ :—

"সেই প্রবাহের পরে উষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া
পড়ে চন্দ্রালোক রেখা জননীর অঙ্গুলির মতো"।
(রবীন্দ্রনাথ—"পান্থ")

সাধারণতঃ উপমার কাজ সূক্ষ্ম ভাবকে দৃষ্টি-গোচররূপে ফুটিয়ে তোলা। সময়ে সময়ে কিন্তু বিপরীত প্রয়োগও হয়। যেমন :—

মরুবুকে দীর্ঘপথ
পড়েছিল অন্তহীন
হৃদয়ের দুরাশার মত।

ইংরাজ কবি টেনিসন জল-প্রপাত থেকে যে কণাগুলি উঠে বাতাসে ধোঁয়ার মতন এলোমেলো হয়ে মিলিয়ে যায় তার বর্ণনা করেছেন এই ভাবে :—

"Their thousand wreaths of dangling water smoke
That like a broken purpose waste in the air"

উপরোক্ত প্রধান অলঙ্কারগুলি ছাড়া ক্ষুদ্রতর অন্যান্য অলঙ্কার বারান্তরে আলোচ্য।

শ্রীনবেন্দু বসু

সাগরিকা

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তোমার শ্যামল স্নিগ্ধ দেহখানি ঘিরি,
মৃত্যু-নীল যে আঁচল লইয়াছ টানি;
মনে হয় অপ্সরা কী? স্বরগের রাণী?
পেতেছে বাসরশয্যা ধরা বক্ষ চিরি?
বাতাসে তুলিছে ঢেউ—ও কুন্তল ভার,
কাঁপি' কাঁপি' উঠিতেছে বুকের বসন
সংক্ষুব্ধ বাসনা যেন না মানি শাসন,
—জড়িমা ভাঙ্গিয়া ওঠে আজি বার বার।
আজি এ-আঁধার রাতে চুপি চুপি প্রিয়ে
প্রশান্ত বুকের' পরে রচিব শয়ন।
নয়ন যুগল' পরে রাখিয়া নয়ন—
লইয়ো টানিয়া বক্ষে বাহুখানি দিয়ে।
অসহ-পুলকে প্রিয়ে পাতি দুই কান,
নীরবে শুনিয়া যাব অ-গীত সে গান।

———

সুভদ্রাঙ্গী

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্‌-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

৬

ফাল্‌গুন মাসের পূর্ণিমাকে বৎসরের শেষ দিন বলে' ধরা হয়—পরদিন নব বর্ষারম্ভ। পূর্ণিমার দু একদিন আগে থেকেই বসন্তোৎসব আরম্ভ হ'য়ে যায় এবং দু একদিন পর পর্য্যন্ত চলে। সুভদ্রা চার বৎসর থেকে এই পূর্ণিমার দিন সামান্য একটী উৎসব ক'রে আস্‌ছে—এবারে তার শেষ। উৎসবটী আর কিছুই নয়—তার সখীদ্বয়কে নিয়ে তার বাড়ীতে একটী প্রীতি-সম্মিলনী করা—অনেকটা সময় একত্র কাটান, সখীদের চিত্ত বিনোদন করা, পরিচর্য্যা করা এবং এক একখানি নূতন শাড়ী পরিয়ে সাধ্যমত কিছু খাওয়ান।

প্রত্যুষেই সখীদের বাড়ি গিয়ে সুভদ্রা দুই জেঠাইমার কাছে কমলা ও মালতীর নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছে। নারায়ণ শর্ম্মা কাল গোয়ালা-পাড়ায় গিয়ে নন্দর পিসীকে দু'সের ভাল দই আর আধসের শুক্‌নো ক্ষীর দিতে ব'লে এসেছিলেন। তাই আজ এক প্রহর বেলা হ'তে না হ'তে নন্দর পিসী দই ও খোয়া নিয়ে হাজির। নন্দর পিসী এ বাড়ির বড় অনুগত। সুভদ্রার মা বেঁচে থাক্‌তে দুজনে ভারি ভাব ছিল। তখন গোয়ালা ঠাকুজ্‌ঝীর এ বাড়ীতে প্রায়ই যাতায়াত ছিল। কখনো কোনো দ্রব্যের প্রয়োজন হ'লে যথা সময়ে খাঁটি জিনিসটী দিত। তাকে দেখে সুভদ্রা বল্‌লে, "এই যে গোয়ালা পিসী। এর মধ্যেই দই-ক্ষীর এনে ফেল্‌লে দেখছি। ভাল আছ ত তোমরা, পিসী?"

নন্দর পিসী—আর, মা, ভাল থাকা! তোমার মার যাওয়ার পর আর এ বাড়িতে আস্‌তে ইচ্ছে করে না। কার কাছে আস্‌ব?

এই বল্‌তে ব'লতে তার চোখ ছল্‌ ছল্‌ ক'রে এল। তার সত্যকার ভালবাসা ছিল—সুভদ্রার মা'কে মনে পড়াতে তার প্রাণটা উথ্‌লে উঠ্‌ল। পাছে সাম্‌লাতে না পারে এই ভয়ে ব'ললে, "এখন আসি, মা। এখনো অনেক বাড়ীতে দুধ দিতে বাকি আছে।" এই বলে বেরিয়ে গেল।

সুভদ্রা সখীদের খাওয়ানর জন্য চিঁড়া, দই, কলা, গুড় ও কিছু মিষ্টান্ন—এই ফর্দ্দ করে রেখেছিল। ডেলা ক্ষীর ও শর্করা দিয়ে কয়েকটা খোয়ার লাড্ডু তৈরী ক'রে ফেল্‌লে। তারপর জলে গুড় গুলে ফোটাতে চড়িয়ে দিলে। গুড় উনানের উপর থাক্‌তে থাক্‌তে, তাতে পরিমাণমত আটা ক্রমশঃ মেশাতে আরম্ভ কর্‌লে। যখন বেশ ঘন হয়ে এল, তখন নামিয়ে ঠাণ্ডা করে সেটাকে বেশ করে চটকে নিয়ে শক্ত ক'রে ফেল্‌লে। তাই লেচির মত ছোট ছোট ক'রে কেটে গোল করে নিয়ে থেবড়ে কতকটা পাতলা ক'রে ফেল্‌লে। তাওয়ার উপর একটু একটু ঘি দিয়ে এক একখানি বেশ উল্‌টে পালটে ভেজে নিলে।* বেলা দেড় প্রহরের কাছাকাছি সুভদ্রার ভিয়েন্‌ শেষ হ'তে হ'তেই কমলা ও মালতী এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠল। মালতী ঘরে উঁকি মেরে দেখে বল্‌লে, "ভদ্রা, তোর রান্নার কাজ এর মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে? তুই মন্তর জানিস্‌ নাকি"?

দাওয়ায় চেটাই পেতে তাদের বসিয়ে সুভদ্রা বল্‌লে, "রান্নার কাজ বেশী ত কিছু ছিল না, ভাই—কেবল কিছু খাবার তৈরী করেছি। আর, আজ তোদের নিয়ে আনন্দ ক'রব, না, রান্না নিয়ে থাক্‌ব"?

কমলা—তা হ'লে, তুই এখন আমাদের কাছে বস্‌।

সুভদ্রা—বেশী ব'স্‌লে চ'ল্‌বে না, ভাই। বাবার আস্‌বার আগেই তোদের নিয়ে আমার যা কাজ আছে, তা সার্‌তে হবে। প্রথমে তোদের হাতের পায়ের নখ কেটে দিয়ে,

* আজকাল দক্ষিণ বিহারে 'ঠুকুয়া' নামে যে খাদ্য পর্ব উপলক্ষে তৈয়ার হয়, তা গরীব লোকদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে চ'লে আস্‌ছে। এই খাদ্যে পুয়া (পুপ) অপেক্ষা ঘি কম লাগে।

পায়ের তলার মাস অল্প অল্প চেঁছে দিতে হ'বে। তারপর পা ধুয়ে ও মুছে দিয়ে আল্‌তা পরাতে হ'বে। তারপর আপটান * দিয়ে রগ্‌ড়ে তোদের মুখের, হাতের, গায়ের, পায়ের ময়লা তুলে দিয়ে, ভিজে কাপড় দিয়ে মুখ, গা, হাত, পা বেশ ক'রে মুছে ফেল্‌তে হ'বে। তারপর তোদের চুলের পাট কর্‌তে হবে—তেল দিয়ে ভিজিয়ে, আঁচ্‌ড়ে, বিউনী করে, বাঁধতে হ'বে। অনেক সময় লাগবে—কাজ আরম্ভ ক'রে দেওয়া যা'ক্।

এই বলে' সুভদ্রা শোবার ঘর থেকে একটা কড়ির পেতে নিয়ে এসে, তা থেকে নরুন, মাস-ছোলা ও আলতা বা'র কর্‌লে, এবং নিজের ফর্দমত দুজনের পরিচর্য্যা ক'রলে। এই করতে করতেই দুপর পেরিয়ে গেল, এবং নারায়ণ শর্ম্মা বাড়ি এসে পৌঁচলেন। সখীদ্বয়কে বসিয়ে রেখে, পিতার সমস্ত খাবার সাজিয়ে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে সুভদ্রা তাঁকে খাইয়ে এল। তিনি সামান্যমাত্র বিশ্রাম করেই ওঘর থেকে চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "আজ বিকালে এক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে বসন্তোৎসব আছে—সেখানে আমাকে যেতে হ'বে—আমি চল্লাম।"

সুভদ্রা শোবার ঘরে সখীদের নিয়ে গেল। ঘরখানি দুটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত—একটীতে সুভদ্রা শোয়, অপরটীতে তার পিতা। ঘরের সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সুভদ্রা দু তিনদিন অন্তর দেয়াল তুলে ঘরটী নিকোয়। মেঝে খট্‌ খটে, ঝর্‌ঝরে। একটী কড়ির আল্‌নায় দুচার খানা কোঁচান কাপড় ঝুল্‌ছে। এই আলনার কড়িগুলি সুভদ্রা নিজের হাতে নক্‌সা করে বসিয়েছে। একখানা চালীর উপর সামান্য কিছু বিছানা ও পাট করা দুটী লেপ গুছিয়ে রাখা। দেয়ালের কোলে দুটী কাঠের সিন্দুক এবং তাদের পাশে জলচৌকীর উপর ঘড়া, ঘটী, বাটী, থালা ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে। ঘরে সামান্য যা কিছু জিনিস আছে, তা শৃঙ্খলার সহিত রক্ষিত।

সুভদ্রা একটী সিন্দুক থেকে দুখানা নূতন কাপড় বার ক'রে কমলা ও মালতীকে প'রতে দিলে। পৌরোহিত্য ক'রে নারায়ণ শর্ম্মা যে সব কাপড় পেতেন, তার দুখানিতে সুভদ্রা নানারঙ্গের সুতো দিয়ে ফুল, লতা, পাতা এঁকে পাড় তৈরী ক'রেছে। এর পর তাদের রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে পীঁড়ি পেতে খেতে বসালে, আর ব'ল্‌লে, "দেখতে দেখতে ভারি বিলম্ব হ'য়ে গেল, ভাই—তোদের ভারি কষ্ট দিলাম।"

মালতী ব'ললে, "তুই খেতে ব'স্‌বি নে?"

সুভদ্রা—না ভাই, তোদের না খাইয়ে কি আমি খেতে পারি? তোদের দেবে থোবে কে?

কমলা—তুই আমাদের সঙ্গে খেতে না ব'স্‌লে আমরা খাবনা। তিন খানা থালায় তিনজনের খাবার রাখ। যে-সব জিনিষ পরে দরকার হ'তে পারে, তা সাম্‌নে রেখেদে—আমরা ইচ্ছে মত তুলে নেব। আমাদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ীতে ত আর কোনো দোষ হ'বে না।

সুভদ্রা অগত্যা তাই ক'রলে—খেতে ব'সে গেল।

মালতী বল্‌লে, "তোরও আমাদের মত নতুন কাপড় পরা উচিত ছিল।"

সুভদ্রা—আর, নখ ফেলা, পায়ের তলা ছোলা, আর আল্‌তা পরান?

মালতী—কেন, আমরা ক'রে দিতাম।

সুভদ্রা—ছিঃ ভাই, বলতে নেই—তোরা যে আমার দিদি।

হাস্য পরিহাসে ভোজন সমাপ্ত হ'ল। রান্নাঘর বন্ধ ক'রে সুভদ্রা শোবার ঘরে তার সখীদের নিয়ে গেল। বেলা আড়াই প্রহর উত্তীর্ণ হ'য়ে' গিয়েছে। তারা মেঝের উপর চেটাই পেতে বস্‌ল। সুভদ্রা বললে, একটু গা গড়িয়ে নে-না—কথা-বার্ত্তাও সেই সঙ্গে চলবে এখন। শীতকালে দিন ছোট ও রাত বড় চিল—ঘুম অনেক বেশী হ'ত—দিনে ঘুমবার সময়ও পাওয়া যেত না, দরকারও হ'ত না, এখন দিন বা'ড়ছে, আলিস্যিও বাড়ছে।

কমলা—তুইও একটু শোনা—শুয়ে শুয়ে কথা বল না।

সুভদ্রা—আচ্ছা। অনেক দিন পরে আকাশের দিকে সে দিন নজর পড়ল। শীতকালে রাত্রে ঠাণ্ডায় বেরোন যেত না। তাই আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকাবার সুবিধে হ'ত না। আজ কাল আকাশ নির্ম্মল। সে দিন কৃষ্ণ পক্ষ ছিল। নির্ম্মল আকাশে নানা রকমে সাজান অসংখ্য তারার ভারি বাহার হয়েছিল।—অনেকক্ষণ চেয়ে থাক্‌লাম—চোখ

* হিন্দী 'উবটন্', সংস্কৃত উদ্বর্ত্তন।

ফেরাতে ইচ্ছে হ'ল না—যেন একখানা প্রকাণ্ড নীল চাদরের ওপর সোনা-রুপোর ফুল তোলা বলে বোধ হ'ল। আজকাল চাঁদ উঠলে, তার আলোয় মাঠ ঘাট, গাছপালা, বাড়িঘর ঝক্‌ঝক্‌ করে—সে শোভা দেখেও মন প্রফুল্ল হয়।

মালতী—হ্যাঁ ভাই, এই সময়টাতে লোকে বসন্তোৎসব করে কেন?

কমলা—বসন্তকাল এসেছে ব'লে।

মালতী—বসন্তকাল এসেছে ব'লে আনন্দ কর্‌তে হবে কেন?

কমলা—লোকে জোর ক'রে আনন্দ করে না—মনে আনন্দ আপনা আপনি এসে পড়ে।

মালতী—আনন্দ আপনা হ'তে আসে কেন?

কমলা—গাছপালা, আকাশ ও চারি দিক্‌টা এমন সুন্দর হয় যে, তা দে'খে মন প্রফুল্ল হয়।

মালতী—সকলের মনই কি প্রফুল্ল হয়?

সুভদ্রা—প্রায় সকলের মনই। তবে, যার মনে আনন্দ নেই, বাইরের শোভা দেখে তার মনে আনন্দ আস্‌বে কি ক'রে? এই সময়ে যার ছেলে মরেছে, তার মনে কি আনন্দ আস্‌তে পারে? বরং এই শোভা দেখে তার মনে পড়ে যায় যে, এই আনন্দের দিনে তার বাছাকে সে হারিয়েছে—তার শোক উথ্‌লে ওঠে।

মালতী—তা হ'লে দেখ্‌ছি যার মনে সুখ আছে, সেই বাইরের শোভা দেখে সুখী হয়—সকলের মনে আনন্দ হয় না।

সুভদ্রা—অধিকাংশ লোকের মনে বাইরের একটা প্রভাব পড়ে। এই সময়টার এমন একটা গুণ আছে, যাতে ক'রে, প্রায় লোকের মন প্রফুল্ল হয়। শীতকালে লোক ঠাণ্ডায় জড়-সড় হ'য়ে থা'কৃত, ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লা'গ্‌লে শিউরে উঠত, ঠাণ্ডা জলে দাঁত কন্‌কন্‌ ক'র্‌ত, হাতে পায়ে ঠাণ্ডা জল লাগ্‌লে ছ্যাক্‌ ক'রে উঠ্‌ত। এখন বাতাসও ঠাণ্ডা নেই, জলও কন্‌কনে নেই। বরং এখন অল্প ঠাণ্ডা বাতাস ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিক্‌ থেকে এসে গায়ে লাগ্‌লে বেশ আরাম বোধ হয়। এই সময় নানা প্রকারের ফুল ফোটে। তাদের গন্ধ ব'য়ে নিয়ে এসে এখনকার বাতাস সুগন্ধ হয়।

মালতী—আমাদের মনটাও কেন প্রফুল্ল হয়েছে, তা বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি। এটা কতকটা সময়ের গুণ। আমরা তিন জন একত্র হ'য়ে কথাবার্ত্তা ক'য়ে তাই আনন্দ পাচ্ছি।

সুভদ্রা—দেখ্‌, ভাই, পাঁচ ছ' বছর হ'ল বাবা এমন দিনের এক ভোরে ওপারে তাঁর অড়রের ফসল কেমন হ'য়েছে দে'খ্‌তে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে যাব ব'লে আব্দার ধরা'তে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। মা তখন বেঁচে। নদী পার হ'য়ে নদীর ধারের বনের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হ'ল। দেখ্‌লাম সেখানে সব গাছই নতুন কচি পাতায় ঢেকে গিয়েছে, আমগাছগুলো বোলে ভ'রে গিয়েছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিমূল গাছগুলোকে বড় বড় লাল ফুলে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে, অশোক গাছের ডালে ডালে অসংখ্য লাল কুঁড়ি ধ'রেছে, বড় বড় গাছগুলোকে জড়িয়ে যে সকল লতা উঠেছে, তাতে কল্‌মির ফুলের আকারের অনেক ফুল ফুটেছে—কোনোটা সাদা, কোনোটা নীল, কোনোটা বেগ্‌নে, কোনোটা বা হল্‌দে। এখানে সেখানে গাছে কোকিল কুহু কুহু ক'রছে—আর কত পাখী ডাক্‌ছে। প্রজাপতিরা এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে যাচ্ছে—ভ্রমরেরা এ ফুল থেকে উড়ে ওফুলে [illegible] আর গুন্‌গুন্‌ শব্দ ক'রছে। আমরা জঙ্গল পেরিয়ে মাঠে গিয়ে পড়্‌লাম। রাস্তার ধারে ধুতরো ফুটে রয়েছে, আর যে দু-তিনটে পুকুর পাওয়া গেল, তাতে অনেক পদ্মের কুঁড়ি ও ফুটন্ত ফুল দেখ্‌তে পেলাম। যে চাষা ভাগে বাবার জমি করে, তার বাড়িতে গিয়ে দেখি যে দুটো ডালিম গাছে অনেক লাল লাল ফুল ফুটে র'য়েছে, আর একটা কুঁদ ফুলের গাছ সাদা সাদা ফুলে ভরে গিয়েছে। তখনকার সে শোভা দেখে আমার মনে যেমন একটা ভাব হয়েছিল, তেমন আর কখনো হয় নি। এখনো মাঝে মাঝে তা মনে পড়্‌লে, একটা মধুর বেদনা জেগে ওঠে। আজ এই আনন্দের দিনে, আয়, ভাই, আমরা তিন জনে মিলে বসন্তের গান গাই।

বসন্ত—ঝাঁপতাল

জগত জাগিল আজি কার করপরশনে!
গীত গন্ধে এ আনন্দ আনিল কে মনো-বনে!
পিকবধূ কুহুতানে
কি অমৃত ঢালে প্রাণে;
খুলিল হৃদয়দল অপরূপ হরষণে!

কার প্রেম অনুরাগে
অশোক কিংশুক জাগে!
ভরিল বিধুর ধরা কার সুধা বরষণে!
কেটেছে কুহেলী ঘোর,
শ্যামরূপে প্রাণ ভোর;
যৌবনের জয়গীতি ধ্বনিছে মোহন স্বনে!
নমো নমো, হে অনন্ত,
তব রূপ এ বসন্ত,
বাসনা-প্রসূন-রাশি নিবেদিনু ও চরণে!

গান শেষ হ'লে মালতী ব'লে উঠ্‌ল; "বেলা যে পড়ে গিয়েছে। চল্, কমলা, বাড়ি যাই।

কমলা—দিনটে আজ বেশ আনন্দে কা'ট্‌ল, ভাই।

৭

নারায়ণ শর্ম্মা পাটুলীপুত্র-গমনের সুযোগের সন্ধানে নিয়ত ফির্‌ছেন। ক্রমশঃ আবার বর্ষা এসে পড়ল। একদিন তিনি বাজারে যাচ্ছেন, এমন সময় দেখ্‌তে পেলেন যে গঞ্জের একস্থানে কয়েকখানা গোরুর গাড়িতে মাল বোঝাই হ'চ্ছে। অনুসন্ধানে জান্‌তে পা'রলেন যে, ঐ মাল চম্পার প্রধান মহাজন ধনপতি শেঠের, এবং নৌকায় পাটলীপুত্র চালান দেওয়ার জন্য গোরুর গাড়ি ক'রে ঘাটে পাঠান হ'চ্ছে। শেঠজী স্বয়ং মালের সঙ্গে যাবেন। নারায়ণ শর্ম্মা দেখ্‌লেন এই ত পাটলীপুত্র যাওয়ার বেশ সুবিধা। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তিনি সেই দিনই সন্ধ্যার পর শেঠজীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌লেন, এবং তাঁর নৌকায় নিজের ও কন্যার পাটলীপুত্র যাওয়ার ইচ্ছা জানালেন। শেঠজী সজ্জন ও পরোপকারী ব্যক্তি—দেবে-দ্বিজে তাঁর অশেষ ভক্তি। তিনি সম্মত হ'লেন।

রাত্রিতে আহারের পর নারায়ণ শর্ম্মা সুভদ্রাকে বল্‌লেন, পাটলীপুত্র মগধের রাজধানী ও অপূর্ব্ব নগর। আমি কখনো পাটলীপুত্র দেখিনি—তুইও দেখিস্‌নি। আমি ভাব্‌ছি তোতে আমাতে গিয়ে রাজধানী দেখে আসি। এখানকার প্রধান মহাজন ধনপতি শেঠ কতকগুলি নৌকায় মালপত্র নিয়ে কাল দুপুর বেলা পাটলীপুত্র যাবেন। তিনি তাঁর নৌকায় আমাদের দুজনকে নিয়ে যেতে সম্মত আছেন। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তুই যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নে।

সুভদ্রা—এযে হটাৎ যাওয়া হ'চ্ছে, বাবা। এত তাড়াতাড়ি কেমন করে সব গোছান যাবে?

নারায়ণ—কোন রকমে গোছাতে হ'বে। এ সুবিধাটী ছা'ড়লে আর কখনো যাওয়া ঘ'ট্‌বে না।

সুভদ্রা চম্পানগর ছেড়ে কখনো কোনো স্থানে যায়নি। বাড়ি-ঘর, বন্ধু-বান্ধব ফেলে তাকে এত দূরদেশে যেতে হবে? শুয়ে শুয়ে সে এই কথা ভাব্‌তে লাগ্‌ল। তার মার কথা মনে প'ড়্‌ল—সে ক্রন্দন সম্বরণ ক'র্‌তে পার্‌লে না। কিন্তু সে পিতার উপর নির্ভরশীল ছিল—ভাব্‌লে, বাবা আমার চেয়ে অনেক ভাল বোঝেন—তিনি ভালই ক'র্‌ছেন। এই ভেবে তার মনে সান্ত্বনা এল। কিছুক্ষণ পরে তার নৌকায় চড়ার সাধ জেগে উঠ্‌ল, এবং নৌকাযাত্রা ক'র্‌তে পাবে বলে খুসী হ'ল। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় শেঠজীর সাতখানা নৌকা শুভ মুহূর্ত্তে বাজারের ঘাট থেকে রওনা হ'ল, এবং ব্রাহ্মণ-পাড়ার ঘাটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শেঠজীর নিজের নৌকায় নারায়ণ শর্ম্মা ও তাঁর কন্যাকে তুলে নিলে। তাঁরা কিছু আগে থেকেই ঘাটে অপেক্ষা ক'র্‌ছিলেন। কমলা ও মালতী তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে ঘাটে এসেছিল। তারা সুভদ্রার বাল্য-সহচরী—এ পর্য্যন্ত সুভদ্রা ও তাদের মধ্যে কখনো ছাড়াছাড়ি হয়নি—তাদের পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসা। সুভদ্রা চ'লে যাচ্ছে দেখে তাদের বুক ফেটে যেতে লা'গল এবং তারা কেঁদে অধীর হ'ল। সুভদ্রার দশা আরো করুণ—সে যে আবাল্যের জন্মভূমি, যার সঙ্গে তার সহস্র স্মৃতি জড়িত, ত্যাগ ক'রে কোথায় যাচ্ছে তা জানে না। নৌকা ছাড়ল—যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সে সখীদের দিকে চেয়ে রইল।

আষাঢ় মাস—জলের স্রোত প্রবল। চম্পানগর হ'তে গঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত জলের টান অনুকূল ছিল, কিন্তু গঙ্গায় প্রতিকূল। একটানা নদীর বেগের বিপরীত যেতে শেঠজীর নৌকাগুলি নিতান্ত মন্দ গতিতে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল। তবে একটু সুবিধা এই ছিল যে বায়ু পূর্ব্বদক্ষিণ থেকে চল্‌তে

থাকাতে অনেক সময় পালের ভরে নৌকা চালান যেত। বাতাস প'ড়ে গেলে নদীর ধারে যেখানে সুবিধা মত 'পাওটা' পথ পাওয়া যেত সেখানে নৌকাগুলি গুণ টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ত।

নৌকার দোলনে প্রথম দুচার দিন সুভদ্রার কিছু ভয় হয়েছিল, কিন্তু পরে সেটা অভ্যস্ত হয়ে গেল—আর ভয় ক'র্‌ত না। যে সব বস্তু সে কখন দেখেনি, তা গঙ্গাবক্ষে ও তীরে তার নয়ন গোচর হ'তে লাগ্‌ল। কত ছোট বড় নৌকা বাতাসের জোরে স্রোতের বিপরীত দিকে, আবার কত নৌকা অনুকূল স্রোতের জোরে স্রোতের অভিমুখে খরবেগে চ'লে যাচ্ছে। কত স্থানে গঙ্গাগর্ভে জেলেরা ছোট ছোট ডিঙ্গীতে চ'ড়ে মাছ ধ'র্‌ছে। প্রায়ই বাতাস স্রোতের বিপরীত দিকে প্রবাহিত থাকাতে, ক্রমাগত বড় বড় ঢেউ উঠ্‌ছে। কোথাও উঁচু পাড় ভেঙ্গে প'ড়ছে, আর তার নিকটের ঘরগুলি পড়' পড়' হ'য়ে র'য়েছে। গঙ্গাতীরস্থ মোদগিরি ইত্যাদি কত নগর, কত ছোট খাট গ্রাম, কত বাগান, কত ছোট বড় গাছ, কত প্রকারের বিচিত্র বর্ণের পক্ষী সুভদ্রা দেখ্‌তে পেলে। ঘাটে কোথাও পূর্ব্বাহ্ণে লোকেরা স্নান ও পূজাপাঠ করছে কোথাও অপরাহ্ণে স্ত্রীলোকেরা কলসীতে জল ভ'রে নিয়ে যাচ্ছে।

শেঠজীর নৌকাগুলি রাত্রিতে চালান' হ'ত না—কোন নিরাপদ স্থানে ভিড়িয়ে নোঙ্গোর ক'রে রাখা হ'ত—জলদস্যু-ভয় যথেষ্ট ছিল--সেই জন্য শেঠজীর প্রত্যেক নৌকায় দুজন ক'রে বর্শা ও তলোয়ারধারী সেপাহী রাখা হয়েছিল।

নারায়ণ শর্ম্মা, সুভদ্রা ও শেঠজীর ভোজনের ব্যবস্থা এক সঙ্গেই হ'ত। যে দিন সুবিধা মত স্থান পাওয়া যেত, সে দিন চড়ায় বা পাড়ের উপর উঠে তাড়াতাড়ি ডাল, ভাত ও একটী মাত্র তরকারী, অথবা সময়-সংক্ষেপ ক'রবার জন্য কেবল খিচুড়ি রাঁধা হ'ত। শেঠজী চম্পানগর থেকে যথেষ্ট চাল, ডাল ও ঘৃত, লবণ, হলুদ ও লঙ্কা এবং কিছু কিছু তরকারী ও আচার সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। রন্ধন-কার্য্য সুভদ্রাই করত। শেঠজী তার রন্ধনের ভারি প্রশংসা করতেন। যে দিন রাঁধার সুবিধা হ'ত না, সে দিন দিনের আহার ছিল—হয়, যব বা ছোলার ছাতু, লবণ ও লঙ্কা ; নয় চিঁড়া ও গুড়। কোন দিন তটবর্ত্তী কোনো গ্রাম থেকে দধি এবং আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল সংগ্রহ করা হ'ত। সে দিনও তার পরদিন আহারটা ভালই হ'ত। চম্পা হ'তে যাত্রা ক'র্‌বার পূর্ব্বে শেঠজী দুদিনের মত নিম্‌কী ও সাত আট দিনের মত গজা ও মেঠাই তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। যে কয়েকদিন চ'ল্‌ল, রাত্রিতে তাই খাওয়া হ'ত। মাঝে একদিন মধ্যাহ্নে কোন কারণে নৌকাগুলিকে একটা ঘাটে এক প্রহর অপেক্ষা ক'রতে হয়েছিল। সে দিন শেঠজী তাঁর পাচক ব্রাহ্মণকে দিয়ে কিছু মিষ্টান্ন তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। তাতেও সাত আট রাত্রি চলেছিল।

মৌর্য্য বংশের রাজত্বকালে শোণ-নদ ও গঙ্গা-নদীর সংঙ্গম-স্থল আজ কালকার পাটনা সহরের পূর্ব্বে ছিল—পরে উহা দানাপুরের পশ্চিমে স'রে গিয়েছে। পাটলীপুত্রের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে শোণ এবং উত্তরে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। দুই নদীর মধ্য-বর্ত্তী ভূখণ্ডকে অধিকার ক'রে পাটলীপুত্র নগর অবস্থিত ছিল —দৈর্ঘ্যে শোণের ধারে ধারে, প্রায় পাঁচ ক্রোশ, কিন্তু প্রস্থে দেড়-দুই ক্রোশের অধিক নয়। গঙ্গা ও পাটলী পুত্রের মধ্যে শোণ ও গঙ্গার সংযোগ-স্থলে একটী দুর্গ ছিল এবং দুর্গের পশ্চিমে পাটলী নামক একটী গ্রাম। নগর থেকে পাটলীর ঘাট পর্য্যন্ত একটী এক ক্রোশ বা তদধিক দীর্ঘ প্রসস্ত রাজপথ ছিল।

শ্রাবণের প্রথমভাগে একদিন দিবা এক প্রহর হ'তে হ'তেই শেঠজীর নৌকাগুলি শোণের মোহানা পার হ'য়ে কেল্লার নীচে দিয়ে পাটলীর ঘাটে পৌঁছিল। এখান হ'তে শেঠজীর কুঠি কতকটা নিকট—এক ক্রোশের কিছু অধিক।

৮

ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের জীবন কালে মগধের রাজা ছিলেন শিশু-নাগ বংশীয় বিম্বসার। সে সময়ে মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। বৃজি নামক এক পাহাড়ী জাতি হিমালয় থেকে নেমে এসে সে সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে উৎপাত ও লুট্‌পাট ক'রত। বৃজিরা এখনকার মোজঃফরপুর জেলায় বৈশালী নামক একটী উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এই নূতন জাতির আক্রমণ থেকে মগধ রাজ্যকে রক্ষা ক'রবার জন্য রাজা অজাত-শত্রু খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৬ বর্ষে গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে পাটলী গ্রামের পূর্ব্বে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। মৌর্য্য-সম্রাট্‌দের রাজত্বকালের পূর্ব্বেই পাটালীপুত্র নগর নির্ম্মিত

হয়েছিল ; এবং শোণ তীরস্থ এই নূতন নগরে রাজগৃহ হ'তে রাজধানী উঠে এসেছিল। বিন্দুসারের সময় পাটলীপুত্র নগর উপকণ্ঠ সহ দৈর্ঘ্যে পাঁচ ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় তুই ক্রোশ ভূমি অধিকার ক'রে বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ-কীলক-নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাকারের বাহিরে জলপূর্ণ পরিখা এবং উহার চৌষট্টি তোরণ-দ্বার পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ। শ্রেণী-বদ্ধভাবে অবস্থিত অসংখ্য দেবালয় ; অট্টালিকা ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুন্দর ভবন-সমূহ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট নগরটীকে সুদৃশ্য ও মনোহর করেছিল। নগরোপকণ্ঠের নানা স্থানের উদ্যান ও পুষ্পবাটিকা সমূহে সদ্য-প্রস্ফুটিত নানা জাতীয় পুষ্প-সম্ভার নগরের রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত ক'র্‌ত। এইজন্য পাটলী-পুত্রের আর একটা নাম ছিল কুসুমপুর।

পাটলীপুত্রে পৌঁছে নারায়ণ শর্ম্মা ও সুভদ্রা ধনপতি শেঠের এখানকার কুঠিতেই আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লেন। শেঠজী ধনী-ব্যক্তি হৃদয়ও তাঁর উদার। অতএব বাসস্থান ও আহারাদি সম্বন্ধে তাঁদের কোন অসুবিধাই হ'ল না। কুঠির এক কোলাহলহীন প্রান্তে তাঁদের জন্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল।

নারায়ণ শর্ম্মা নিত্য পথে পথে ঘুরে নগরের নানা স্থান ও অধিবাসীদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ ক'রে বেড়াতে লাগলেন। দেখলেন যে নগরের এক একটা অংশ যেন এক একটা বড় বাজার—প্রত্যেক রাস্তার ধারে নানা বস্তুর ছোট বড় দোকান। নিত্য প্রয়োজনের বা বিলাসের কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। অধিবাসীদের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা চাঞ্চল্যের ভাব বিদ্যমান। অসংখ্য যান-বাহন পথ দিয়ে সর্ব্বদাই চলাচল ক'র্‌ছে। অহ-রহঃ ক্রয়-বিক্রয় চল্‌ছে, বিক্রেতারা প্রায়ই দোকানে বসে বেচছে, কেহবা ফেরি ক'রে বেড়াচ্ছে।

নগরের অধিকাংশ স্থানে শ্রম-শিল্পের কাজ হ'চ্ছে—চিত্র-করেরা চিত্র আঁক্‌ছে ; লেখকেরা লিখন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। মণিকারেরা মণির সংস্কার ক'রছে ; স্বর্ণকারেরা অলঙ্কার নির্ম্মাণ কর্‌ছে ; তন্তুবায়েরা কার্পাস ও রেশমের বস্ত্র বয়ন ক'রছে ; সৌচিকেরা সূচিকার্য্যে ব্যাপৃত আছে ; ভেষজ্য ব্যবসায়ীরা ঔষধী মিশ্রণ, দ্রাবণ, পেষণ ও নিষ্কর্ষণ দ্বারা ভৈষজ্য প্রস্তুত ক'রছে ; কর্ম্মকারেরা অস্ত্রাদি ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ কর্‌ছে ; সূত্রধারেরা কাষ্ঠের গৃহোপকরণাদি উৎপাদন ক'রছে ; কাংস্যকারেরা কাঁসা ও পিতলের বাসন ঢা'লছে ; কুম্ভকারেরা মৃৎভাণ্ডাদি গঠন কর্‌ছে ; চর্ম্মকারেরা পাদুকা নির্ম্মাণ করছে ; তৈলিকেরা ঘ্রাণিকা চালিত কর্‌ছে ; মোদকেরা মিষ্টান্ন পাক্‌ ক'রছে ; পেষণোপজীবীরা ঘরট্ট দ্বারা তণ্ডুল, গোধূমাদি পেষণ ক'রছে ; শৌণ্ডিকেরা মদ্য চোলাই ক'রছে ; স্থপতিরা গৃহ-নির্ম্মাণ ক'রছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ শ্রমিকেরা নিজ নিজ ব্যবসায়ানুযায়ী কর্ম্মে নিযুক্ত আছে ; শকট-চালকেরা শকট চালাচ্ছে ; গোপেরা গো-দোহন ক'র্‌ছে ; নাপিতেরা ক্ষৌর-কার্য্য কর্‌ছে ; জালিকেরা জাল বুন্‌ছে ও নদী ও পুষ্করিণীতে মাছ ধ'র্‌ছে ; নাবিকেরা নৌকা চালাচ্ছে ; রজকেরা বস্ত্র ধর্ষণ করছে।

এতদ্ব্যতীত বড় বড় মহাজনদের গদীতে লক্ষ লক্ষ মন মাল ওজন হ'চ্ছে—কতক অন্যান্য স্থান থেকে আমদানি হয়েছে, এবং কতক গোরুর গাড়িতে বোঝাই হ'য়ে গঙ্গা বা শোণের ঘাটে নৌকাযোগে চালান যাচ্ছে। অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা হৈ হৈ করছে, আর টাকার ঝনুঝনানি শব্দ হ'চ্ছে।

দেব-মন্দিরে ও বৌদ্ধ মঠে শঙ্খ-ঘণ্টা নিনাদীত হচ্ছে এবং ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পঠন, পাঠন ও ধর্ম্মচর্চ্চা ক'রছেন, এবং ধর্ম্মোপদেশ দিচ্ছেন।

নারায়ণ শর্ম্মা এক একদিন রাত্রিতে নগরে বাহির হ'য়ে দেখতেন যে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অনেক পণ্যশালা খোলা থাকে, এবং রাস্তাগুলি আলোক-মালায় সমুজ্জ্বল হয়। তখন পর্য্যন্ত লোক চলাচল বন্ধ হয় না। সন্ধ্যার পর হ'তেই শৌণ্ডিকালয়ে, জুয়ার আড্ডায়, বারাঙ্গনা-পল্লীতে, পান ও ফুলের দোকানে খুব ভীড়। মিষ্টান্নের দোকানগুলি বিশেষ ভাবে সজ্জিত ও আলোকিত হয়। ফেরীওয়ালারা তারস্বরে নিজ নিজ প্রশংসা ক'রে ক্রেতৃগণকে প্রলোভিত করবার চেষ্টা করছে। চানাচুরওয়ালা তার মুড়মুড়ে ছোলা মটর ভাজার কথা, ডাল-মুটওয়ালা তার খাস্তার ঝুরি ও ডাল ভাজার কথা, গাণ্ডেরীওয়ালা তার সুমিষ্ট আকের টিক্‌লীর কথা রেউড়ীওয়ালা তার স-তিল মুচ্‌মুচে রেউড়ীর কথা, কুমড়ার-মেঠাইওয়ালা তার সরস মোরব্বা ও লচ্ছের কথা, পেড়াওয়ালা তার সু-তার পেড়ার কথা, ফলওয়ালারা তাদের নানা প্রকার

সুস্বাদ ছাড়ান ফলের কথা ব'লে ক্রেতার সন্ধানে ফিরছে। রাবড়ী ও দইবড়া-ওয়ালারা নিজের নিজের স্থানে ব'সেই খদ্দের ডা'কছে।

স্থানে স্থানে নৃত্যগীতের আসর হ'য়েছে, এবং দর্শক ও শ্রোতারা ঐ স্থান গুলিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আনন্দ উপভোগ ক'রছে। সময়ে সময়ে এখানে ওখানে বচসা ও মারপিট হ'চ্ছে। সর্ব্বত্রই নগর-রক্ষক সিপাহীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং যাতে শান্তিভঙ্গ না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখছে। বিলাসী যুবকেরা সাজ-সজ্জা ক'রে, চন্দনানুলিপ্ত হ'য়ে মাল্য পরিধান ক'রে, তাম্বুল চর্ব্বন করতে করতে এই সময় পদব্রজে বা অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণে বহির্গত হয়েছে।

অনেক স্থানে ধর্ম্মচর্চ্চা ও সদালাপের অনুষ্ঠানও আছে। সেখানে সদ্‌গ্রন্থ পঠিত ও ব্যাখ্যাত হচ্ছে', এবং গভীর বিষয়ের আলোচনা চ'লছে।

নগরের শাসন ও পরিদর্শনের জন্য রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যা যথেষ্ঠ ছিল। সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীরা মহামাত্র নামে অভিহিত হতেন। তাঁদের নীচের পদাধিকারিগণের নাম ছিল যুক্ত ও উপযুক্ত। স্ত্রীলোকদের পর্য্যবেক্ষণের জন্য মহিলা-পরিদর্শিকাগণ নিযুক্ত ছিল। রাজান্তঃপুরের পর্য্যবেক্ষণের জন্যও মহিলা পদাধিকারিণীরা ছিল—তাদের নাম সৌবিদা। সৌবিদারের উপর একজন পুরুষ নায়ক ছিল যাকে সৌবিদ বলা হ'ত। সে অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রত না, কিন্তু তার দ্বারা রাজাধিরাজের আদেশ অন্তঃপুরে প্রেরিত হ'ত।

যে স্থানে আজকাল কুমরাহার নামক গ্রাম, সেই স্থানে রাজপ্রসাদ অবস্থিত ছিল। এই প্রাসাদ মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা নির্ম্মিত হয়েছিল। এই ভবনটা অতীব বিশাল ও সুশোভন ছিল। ইহাতে আরামের সকল উপকরণই বিদ্যমান ছিল। রাজ সভার ঐশ্বর্য্য অবর্ণনীয়। রাজসভা ও মহারাজের শরীর রক্ষার জন্য সশস্ত্র রমণীযোদ্ধগণ পাহারা দিত। অন্তঃপুরের রক্ষার জন্যও রমনী প্রহরিণীদের নিযুক্ত করা হ'ত। এই প্রহরিণীরা দৃঢ়কায়া বলিষ্ঠ যুবতী-যোদ্ধা—এদের কটিবন্ধে কোষ-বদ্ধ অসি এবং হস্তে তীক্ষ্ণ-ফলক বর্ষা থাকৃত।

নারায়ণ শর্ম্মা নিত্য নগরের রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করতেন এবং সুভদ্রাকে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করাবার উপায় অনুসন্ধান ক'রতেন, কিন্তু কোন সুবিধাই দেখতে পেতেন না। ভয়ে অন্তঃপুরের দেউড়ীতে যাওয়ার তাঁর সাহস হ'ত না, কারণ তিনি শুনেছিলেন যে সেখানে ভীমকায়া নির্দয় প্রহরিণীরা পাহারায় থাকে এবং অন্তঃপুরের নিকট সামান্য অপরাধের জন্যও পুরুষের প্রাণদণ্ড হ'তে পারে। অতএব তিনি ক্রমশঃ হতাশ হ'তে লাগলেন।

এর মধ্যে দু একদিন প্রত্যুষে তিনি সুভদ্রাকে পাটলীর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়ে এনেছেন এবং একদিন ডুলি ক'রে নগরের খানিকটা দেখিয়ে দিয়েছেন।

৯

প্রাচীনকাল থেকেই শ্রাবণ মাস পশ্চিম প্রদেশের স্ত্রীলোক-দের আনন্দের সময়। রমণীরা পাড়ার প্রশস্ত-প্রাঙ্গণযুক্ত কোনো বাড়িতে একত্র হ'য়ে কোনো গাছে দোলা টাঙ্গিয়ে পর্য্যায় ক্রমে দোল খায়, এবং সেই সঙ্গে তাদের গীত বাদ্যও চলে। শেঠজীর পাড়াতেও এইরূপ একটা উৎসব-স্থান ছিল। কতকগুলি স্ত্রীলোক শেঠজীর কুঠির যে অংশে সুভদ্রারা থাকৃত তার পাশ দিয়ে অপরাহ্নে উৎসব-স্থানে যেত, এবং সুভদ্রাকে একৃলাটী ঘরে বসে থাকৃতে দেখত। তার অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখে তারা মোহিত হয়ে গিয়েছিল। একদিন তারা সুভদ্রার সঙ্গে আলাপ ক'রে তাকে ঝুলনের স্থানে নিয়ে যেতে চাইলে। তখন তার পিতা বাড়িতে ছিলেন না বলে সে যেতে পারৃলে না, কিন্তু পরদিন তার পিতার অনুমতি নিয়ে সেই মহিলাদের সঙ্গে উৎসব-স্থানে গেল। সকলেই তার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখে এবং কোমল স্বভাবের পরিচয় পেয়ে পরম পরিতুষ্ট হ'ল।

এই প্রকারে সুভদ্রা প্রতিদিন অপরাহ্নে ঝুলন-স্থানে যেত। সমস্ত দিন অলসভাবে বাসায় আবদ্ধ থাকার পর এই আনন্দে যোগ দিতে পারায় সে আরাম বোধ করৃতে লাগল। চার পাঁচ দিন পরে এক মহিলা-পরিদর্শিকা স্বীয় কর্ত্তব্য পালন-অনুরোধে এই উৎসব-স্থানে উপস্থিত হ'ল। এর ওর সঙ্গে কথা ক'ইতে ক'ইতে সুভদ্রাকে দেখে সে বিস্মিত হ'ল, এবং তার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রলে।

সুভদ্রা বল্‌লে, "আমার বাড়ি চম্পা নগরে। কোন কার্য্য বশতঃ আমি আমার পিতার সঙ্গে এখানে এসেছি এবং ধনপতি শেঠের কুঠিতে আছি।"

এই পদাধিকারিণীর রাজান্তঃপুরে প্রবেশাধিকার ছিল, এবং কোনো কার্য্যের জন্য সেদিন সেখানে তার যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। রাণীদের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে সে সুভদ্রার আশ্চর্য্য রূপের বর্ণনা করলে। তাই শুনে রাণীদের তাকে দেখবার কৌতূহল হ'ল এবং তাঁরা আদেশ করলেন, "কাল তাকে সঙ্গে নিয়ে এস।" পরদিন ঐ পদাধিকারিণী শেঠজীর কুঠিতে গিয়ে সুভদ্রার পিতার নিকট রাণীদের ইচ্ছা জানালে। নারায়ণ শর্ম্মা ত তাই চাচ্ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সুভদ্রাকে পাঠাতে সম্মত হলেন। পদাধিকারিণী নিজের পাল্‌কিতে সুভদ্রাকে ব'সিয়ে নিয়ে অন্তঃপুরে উপস্থিত হ'ল।

রাণীরা সুভদ্রাকে দেখলেন--নিঃসন্দেহই সে অসাধারণ রূপবতী। কিন্তু রাণীদেরও নিজ নিজ রূপের অভিমান ছিল —তাঁদের মনে ঈর্ষা উৎপন্ন হ'ল। তাঁরা যখন শুনলেন যে সুভদ্রা দরিদ্রা, তখন তাঁরা তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখতে লাগলেন, এবং এক রাণী তাকে ব্যঙ্গ করে বললেন, "হ্যাঁলা, তুই নখ কাটতে জানিস্? পায়ে আলতা পরাতে পা'রবি? মাথা ঘসা দিয়ে চুল পরিষ্কার করে দিতে পা'রবি?" সুভদ্রা বল্‌লে, "আপনারা যেসব কাজ বল্‌ছেন, তা ত কঠিন নয়।" আর এক রাণী বল্‌লেন, "তা বেশ। আমাদের নাপতিনী সেদিন মারা গিয়েছে। সে কদাকার ছিল। তোর বয়স কম, আর তুই দেখতে শুন্‌তেও কতকটা ভাল। তোকে ঐ কাজের জন্য আমাদের এখানে থাক্‌তে হবে।" তাঁরা পদাধিকারীণীকে বল্‌লেন, "এ গরীব---আমাদের এখানে থাক্‌লে, এর ভরণ-পোষণের জন্য এর পিতার ভাবতে হবে না। সেইজন্যে একে এখানে রেখে দেওয়া হ'ল। এর বাপকে খবর দিও।"

পদাধিকারিণী শেঠজীর কুঠিতে গিয়ে তার পিতাকে এই সংবাদ দিলে। ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল, তিনি ভাবলেন, "অনেক দূর এগিয়েছে। এখন নারায়ণ কি করেন দেখা যা'ক্।"

আশ্বিন মাস পড়তেই শেঠজী নৌকায় মালপত্র নিয়ে চম্পানগর রওনা হ'লেন। নারায়ণ শর্ম্মা সেই সুযোগে চম্পানগর ফিরে গেলেন।

সুভদ্রা রাজান্তঃপুরে বন্দিনী হ'য়ে দাসীবৃত্তি ক'রে কালাতিপাত ক'র্‌তে লা'গল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল
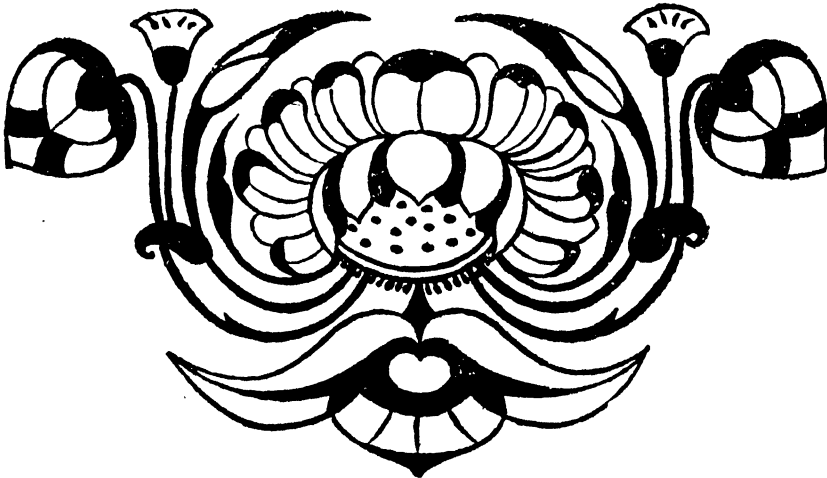
টিশিয়ান-পরিচয়

শ্রীমতী স্নিগ্ধপ্রভা মিত্র এম্-এ

মধ্যযুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী টিশিয়ানের অঙ্কিত কতকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হলো। এই প্রবন্ধে আমরা টিশিয়ানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

তাঁর জন্ম হয়েছিল ফ্রীউলী জেলার পিব দি কাডোর (Pieve de Cadore) নামে একটি ছোট্ট নির্জ্জন গ্রামে। গ্রামটির চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমালায় ঘেরা। কোন্ খৃষ্টাব্দে যে তাঁর জন্ম হয়েছিল সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে লিখিত একখানা চিঠিতে তিনি তাঁর বয়স ৯৫ বৎসর বলে উল্লেখ করেন। তা থেকে অনুমান করা যায় যে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে।

শোনা যায় টিশিয়ান শিশুকালেই ফুলের রস সংগ্রহ করে দেয়ালের গায় ম্যাডোনার ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর পিতা বুঝতে পেরেছিলেন যে অনুকূল আবহাওয়ায় বাস করলে এবং সুযোগ্য শিক্ষকের সাহায্য লাভ করলে উত্তরকালে টিশিয়ান একজন প্রতিভাসম্পন্ন চিত্রকর হতে পারবে। ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রতিভা নিয়ে হয়ত অনেক লোকই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু অনুকূল আবহাওয়া ও যথোপযুক্ত অনুপ্রেরণা না পেলে কোন প্রতিভারই বিকাশ সম্ভব হয় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হয়ত রবীন্দ্রনাথ হতে পারতেন না যদি না তিনি মহর্ষির ঘরে জন্ম নিতেন। হয়ত তার আগে বা পরে কত রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কোন্ কোণে শুকিয়ে গিয়েছে কেউ খোঁজও রাখেনি। শিল্পী টিশিয়ানের প্রতিভাও অনুকূল আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হবার সুযোগ না পেলে ক্ষুদ্র গ্রাম কাডোরের একটি সামান্য কুটিরেই শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যেত, আজ কেউ তাঁর নামও জান্‌ত না।
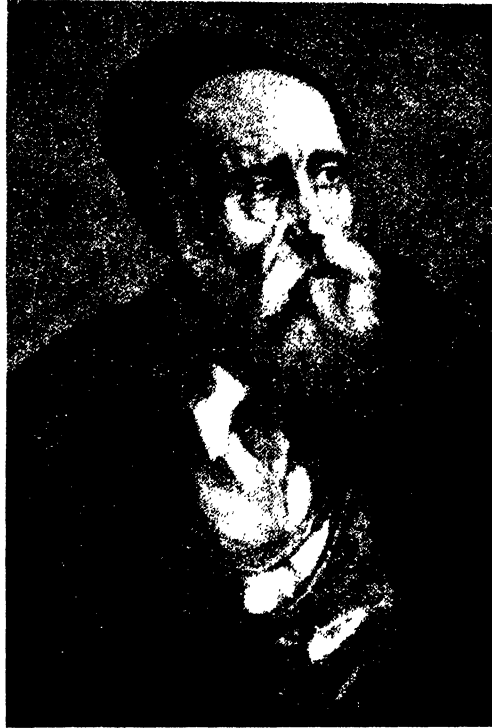
সিনিয়র টিশিয়ান্
পরিণত বয়সে ভেনিসের একজন বরীয়ান্ ব্যক্তি

টিশিয়ানের পিতা টিশিয়ানকে বাল্যকালেই ভেনিসে প্রেরণ ক'রে যোগ্য গুরুর নিকট শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি সেবাষ্টিয়ানো জুকেবাটো নামক একজন চিত্রকরের কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিছুকাল পর তিনি জেনটাইল বেলিনি এবং গিয়োভেনি বেলিনি নামীয় দুজন চিত্রশিল্পীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। সে সময়ই তাঁর বৈশিষ্ট্যের ও মেধার পরিচয় বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। জেনটাইল ভ্রাতাদের

অঙ্কন-প্রণালী তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করতে পারেনি, তিনি তাঁর নিজের মতে নূতন ধারায় অঙ্কন আরম্ভ করেন।

ভেনিস
প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র ভেনিস বালক টিশিয়ানের শিল্পী-মনে সুগভীর রেখাপাত করেছিল।

এই সময় জিয়োরজিয়ন নামে তাঁর এক সতীর্থের সঙ্গে তাঁর যোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। বেলিনিদের নিকট শিক্ষা সমাপ্তির পর টিশিয়ান জিয়োর-জিয়নের অংশীদাররূপে কাজ আরম্ভ করেন। জিয়োরজিয়নের অসামান্য মেধার সংস্পর্শ তাঁর নিজের প্রতিভা-বিকাশে বিশেষ সহায় হয়েছিল। ১৫০৭—৮ খৃষ্টাব্দে জিয়োরজিয়ন ষ্টেট-কর্ত্তৃক জার্ম্মাণ বণিকদের মালগুদামের কাঁচা দেয়ালের গায়ে চিত্রাঙ্কন করবার জন্য নিযুক্ত হন। টিশিয়ান সে সময় তাঁর সঙ্গে কাজ করেন। সেই দেয়ালের চিত্র এখনও দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে।

পিব্ ডি ক্যাডোর
ইটালীর একটি পার্ব্বত্য প্রদেশের এই ক্ষুদ্র গ্রামে টিশিয়ানের জন্ম হয়েছিল।

তাঁর আঁকা বহু ছবি ইউরোপের বড় বড় যাদুঘরে রক্ষিত আছে, এই ছবিগুলি তাঁর জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনার পরিচয় দিচ্ছে। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি ম্যাডোনার যে চিত্র এঁকেছিলেন তা ভিয়েনার যাদুঘরে আছে। তার প্রায় দুবছর পরে "Ecce Home"নামক চিত্র অঙ্কন করেন। মাত্র দুবছরে তাঁর চিত্রবিদ্যায় কত উন্নতি হয়েছিল সেই ছবিখানা তার সাক্ষ্য প্রদান করে। ঐ ছবিখানাতেই তাঁর বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে টিশিয়ান পাদুয়াতে গিয়ে Senola di S. Antonioর দেয়ালে সেই মহা-পুরুষের জীবনের ধারাবাহিক কতগুলো চিত্র অঙ্কিত করেন। তখন তাঁর বয়স ৩৪ বৎসর। সেই ছবিখানাতে অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিণতির সমন্বয়ের ফল পরিলক্ষিত হয়।

ইতিপূর্ব্বেই ভিয়েনাতে রক্ষিত "Holy Family" ছবিখানাতে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সে ছবিখানা "Madonna of the Cherries" নামে সাধারণে পরিচিত। ছবিখানাতে রং-এর অপরূপ সমাবেশের মধ্যে রক্তমাংসের যে সুস্পষ্ট উজ্জ্বল ইঙ্গিত আছে তা টিশিয়ানের একেবারে নিজস্ব।

১৫১২ খৃষ্টাব্দে পাদুয়া থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নাম ভেনিসের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ল। তার পরের বৎসর তিনি চিত্রশিল্পীদের পক্ষে বিশেষ সম্মানের চিহ্ন broker's patent লাভ করেন এবং সরকার বিভাগে সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাজে নিযুক্ত হয়ে ডিউকের কাউন্সিল প্রাসাদের অসমাপ্ত চিত্রাঙ্কন সমাধা করবার ভার প্রাপ্ত হন। তারই গুরু জিয়োভেনি বেলিনি সে কাজ আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। এই বিশেষ সনন্দপত্র পাওয়ার দরুন তিনি ১২০ ক্রাউন করে বার্ষিক বৃত্তি লাভ করলেন, তাছাড়া তাঁকে কতগুলো করদান থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সে সময়ই তিনি তাঁর ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেন। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে Frari churchএর বেদীর জন্য "The assumption of the madonna" নামক ছবি আঁকেন। ছবিখানা চতুর্দ্দিকে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

পীব্ ডি ক্যাডোরে টিশিয়ানের স্মৃতি-মূর্ত্তি

টিশিয়ান অসামান্য প্রতিভাশালী চিত্রকর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ ৯৯ বৎসরের জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সিসিলিয়া নাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁর সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। টিশিয়ানের তিনটি সন্তান ছিল, দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। মেয়েটির নাম ছিল ল্যাভিনিয়া। টিশিয়ান ল্যাভিনিয়ার অনেক ছবি এঁকেছিলেন, তাতে মনে হয় মেয়েকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দেই তাঁর পত্নী সিসিলিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তারপর টিশিয়ান আর বিবাহ করেন নাই। পত্নীবিয়োগের পরই তিনি ভেনিস নগরের প্রান্তে একটি চমৎকার বাড়ীতে উঠে গেলেন। সে সময় তিনি শিল্পী হিসাবে এত প্রসিদ্ধি লাভ করলেন যে নগরে যত সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের আগমন হতো সকলেই তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করবার জন্য তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হতেন। শোনা যায় তৃতীয় হেন্‌রী পোলাণ্ড থেকে ফ্রান্স অধিকার করতে যাবার পথে বিস্তর অনুচর সহ টিশিয়ানের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। এই অনন্যসাধারণ রাজসম্মানলাভের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি হেন্‌রীকে তাঁর কতগুলো উৎকৃষ্ট ছবি প্রদান করেছিলেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট পঞ্চম চার্লসের একখানা আলেখ্য অঙ্কিত করেন।

এসময় তিনি রাজা, মহারাজা, পোপ ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এত প্রিয় হয়ে উঠলেন যে তাঁর কাউন্সিল প্রাসাদের কাজে শৈথিল্য দেখা যেতে লাগ্‌ল। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে সরকার থেকে ঐ কাজের জন্য প্রাপ্য টাকা প্রত্যর্পণ করার আদেশ এলো এবং তাঁর জায়গায় অন্য একজন চিত্রকর নিযুক্ত হলেন। কিন্তু এক বৎসর পরই সে চিত্রকর মারা যান, তখন আবার তাঁকেই সে কাজের ভার দেওয়া হলো।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে টিশিয়ানের অত্যন্ত আদরের কন্যা ল্যাভিনিয়ার মৃত্যু হয়।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিত্রাঙ্কনের বিষয় বস্তুর পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ১৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১০ এই দশ বৎসর তিনি Madonna ও Holy Familiesএর ছবি আঁকতেই বেশী ভালবাসতেন। তারপর দশ বৎসর যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ছবি আঁকতেন তার মধ্যে বৈচিত্র্য ও নাটকীয় আবেদন

সম্রাট পঞ্চম চাল্‌স্

বহু রাজা মহারাজা আমীর ওমরাহের ছবি টিশিয়ানের শিল্প-নৈপুণ্যে অঙ্কিত হয়েছিল। এইটি তাদের অন্যতম।

অনেক বেশী ছিল। এর পর দশ বৎসরকাল তিনি তাঁর বিশেষ বিখ্যাত কয়েকখানা প্রথম শ্রেণীর চিত্রের সৃষ্টি করেন। তারপর প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কনে মনোনিবেশ করেন। জীবনের শেষ অবস্থায় আবার নৈপুণ্য প্রচার করছে। মূক প্রকৃতিকে যাঁরা তুলির সাহায্যে সজীব করে তুলেছেন তিনি ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। মানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির উপর যে এই মূক প্রকৃতি কি অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে তা টিশিয়ানের ছবি থেকে স্পষ্টই

Assumption of the Madonna.

এই চিত্রটি টিশিয়ানের একটি বিখ্যাত মাতৃ-মূর্ত্তি—ভিনিসিয়ান্ এ্যাকাডেমিতে ইহা রক্ষিত আছে।

গভীর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়বস্তুতে ফিরে আসেন। তিনি তাঁর প্রায় সুদীর্ঘ একশত বৎসরের জীবনে নানাবিষয়ে ছবি এঁকে চিত্রশিল্পের একনিষ্ঠ পূজা করে গিয়েছেন। এখনও নানা যাদুঘরে রক্ষিত হাজারখানারও বেশী ছবি তাঁর তুলির প্রতীয়মান হয়। তাঁর অঙ্কিত ছবি দেখলেই বোঝা যায় সেই ক্ষুদ্র গ্রাম কেডোরের পর্ব্বতশ্রেণী থেকে আরম্ভ করে সমৃদ্ধিশালী এড্রিয়াটিক নগরী তাঁর কবি-চিত্তের ওপর কী গভীর ছাপ দিয়েছিল।

এমন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হয়েও তাঁর মনে আত্মম্ভরিতা ছিল না। তিনি ছবি আরম্ভ করে শেষ করবার আগে মাসের পর মাস ফেলে রেখে দিতেন। পরে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজেই সেগুলোর সমালোচনা করে তবে শেষ করতেন। সে জন্য তিনি একই সঙ্গে অনেক ছবি আরম্ভ করতেন। জীবনের শেষ অবস্থায় এসে তিনি বলে গেছেন যে ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে রোমে যাবার পর তাঁর চিত্রাঙ্কনে অনেক উন্নতি হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর অল্পদিন আগে নিউটনের ন্যায় বলেছিলেন মাত্র তখনই নাকি তিনি চিত্রশিল্প কি বস্তু তা বুঝতে আরম্ভ করেছিলেন।

ভেনিস—গ্র্যাণ্ড ক্যানেলের উপর রায়েলটোব্রীজ

ভেনিস—Doges' Palace.

তাঁর সর্ব্বশেষ অঙ্কিত ছবি 'Pieta'। সেখানা তিনি

Saint Catherine and the Holy Child.

টিশিয়ান অঙ্কিত এই অপূর্ব্ব মাতৃ-মূর্ত্তিটি ম্যাড্রিডের প্যাড্রো-এ রক্ষিত আছে

The Madonna and Child.

টিশিয়ান-অঙ্কিত এই মাতৃমূর্ত্তিটি লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারীতে রক্ষিত আছে।

শেষ করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর Palma Giovane লেখানা শেষ করেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট তারিখে ৯৯ বৎসর বয়সে ভেনিস নগরেই প্লেগে আক্রান্ত হ'য়ে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন।

ভেনিস্—গ্র্যাণ্ড-ক্যানাল

ভেনিস্—The Bridge of Sighs.

শ্রীমতী স্নিগ্ধপ্রভা মিত্র
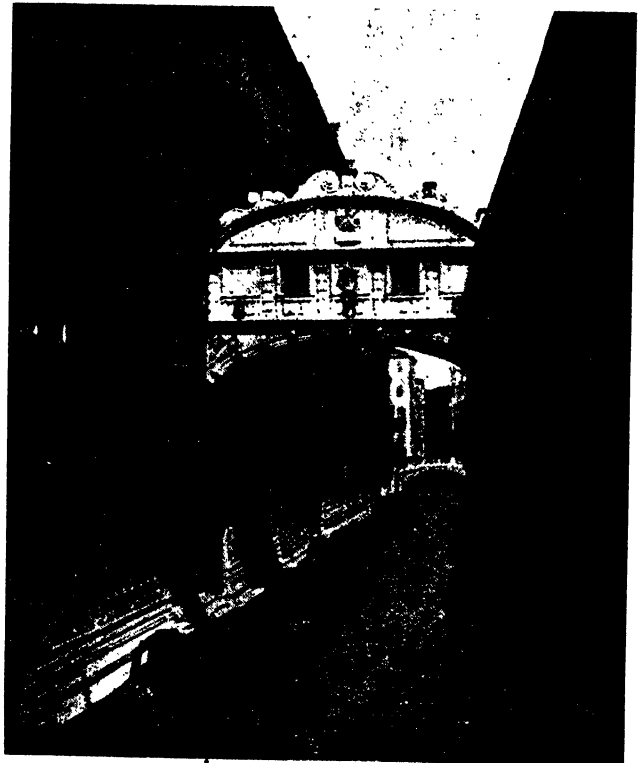
কল্যাণ সাধনে নারীকল্যাণ আশ্রম

"নারী কল্যাণ আশ্রমের সহিত বাংলার সকল নারীরই সংশ্রব রাখার প্রয়োজনীয়তা আমি অন্তরের সহিতই স্বীকার করি,—আমার মনে হয় বাংলার সমস্ত মেয়েদের এইরূপ নারী সেবাব্রত গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে, তাঁরা যদি নিজের জাতির বিপন্নাদের কথা না ভাবিবেন তবে কে ভাবিবে? বেশি কিছু বলিবার নাই, কাজের প্রয়োজন আছে।"

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী
৫।৭।৩৫

আশ্রমবাটী

সমাজের কল্যাণ ব্রতে যাঁহারা ব্রতী তাঁহারা সকলেই জানেন, বর্ত্তমানে বাংলার সমাজে দ্রুত পরিবর্ত্তন চলিয়াছে। পুরাতন সংস্কার ভাঙ্গিয়া নূতন সংস্কার সৃষ্ট হইতেছে। এই সৃষ্টি ভাল কি মন্দ, তাহা আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু পরিবর্ত্তনের সময়, ভাঙ্গাগড়ার মাঝখানে নারীজাতির সামাজিক অবস্থার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজও হয় নাই। তাহা ছাড়া নারীহরণ, নারীনির্য্যাতন প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উৎপাত তো আছেই। এই সমস্ত কারণে সমাজের স্নেহ-সমাদর-বঞ্চিত মেয়েদের সাময়িক আশ্রয়ের জন্য নারী-কল্যাণ আশ্রমের মত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান সমাজের অঙ্গ। হিন্দুর বহুকালের একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, গ্রামের সমাজ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, অর্থলোভে চরিত্র বিক্রয় হইতেছে, আর্থিক ও অন্যান্য কারণে বিবাহিত জীবনে অশান্তি আসিতেছে, শিক্ষা প্রসারে ক্ষমতার অভাব, প্রভৃতি কতকগুলি কারণে বাঙ্গালী জাতি বিপন্ন। এই দুর্ভাগ্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের উপর হইলেও, মেয়েরাই বিশেষভাবে এই বিপদে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং যতদিন না পর্য্যন্ত সমাজে নব আদর্শ গৃহীত ও আদর্শ অনুযায়ী সমাজ গঠিত হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই আশ্রমের মত প্রতিষ্ঠান বাংলার বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া ওঠা প্রয়োজন।

নারীকল্যাণ আশ্রম হঠাৎ গঠিত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অবলা আশ্রমে একবার গোলমাল হয় এবং সেই সময় গোলমালের সূত্র ধরিয়া বাংলার মেয়েদের জন্য বাঙ্গালীদের পরিচালনায় একটী মেয়েদের আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নারীকল্যাণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন। বাগ-

আশ্রমের অভ্যন্তরে সাময়িক প্রয়োজনের জন্য হাসপাতাল

বাজারে শ্রীযুত পশুপতিনাথ বোসের বাড়ীতে এক জনসভায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণের উদ্যোগে ও ঐকান্তিকতায় নারীকল্যাণ আশ্রম স্থাপিত হয়। প্রথমে কুণ্ড লেনে একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া

আশ্রমবাড়ীর ভিতরের দৃশ্য
:পাকা বাড়ীর দ্বিতলে, যাহারা আইনের হেফাজত কর্তৃক প্রেরীত হয় তাহাদের রাখা হয়

আশ্রম চলিতে থাকে। পরে আশ্রম বাটীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বর্ত্তমান ঠিকানায়, ৪নং রাজকুমার চ্যাটার্জ্জী রোড, টালায় আশ্রমটী তুলিয়া আনা হয়। আশ্রমের দ্বার যে-কোন অবস্থায় বিপদে পতিত নারীর জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত। ভর্ত্তির জন্য এইরূপ উদার মত অবলম্বন করার ফলে সমাজের সর্ব্ব-স্তরের সর্ব্ব অবস্থার নারী ও শিশু আশ্রমে আসিয়া থাকে। মোটামুটী ধরিতে গেলে নিম্নলিখিত উপায়ে আশ্রমে মেয়েরা ভর্ত্তি হইয়া থাকে।

(১) মামলায় জড়িত মেয়েদের পুলিশ বা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ আশ্রমে পাঠাইয়া থাকেন।

(২) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষরা বিশেষ কারণে মেয়েদের পাঠাইয়া থাকেন।

(৩) জনসাধারণ নিজেরা আসিয়া মেয়েদের ভর্ত্তি করিয়া

যাঁহাদের সাহায্য করিবার মত অবস্থা আছে, তাঁহাদের নিকট হইতে যৎসামান্য সাহায্য আশ্রমে লওয়া হয়।

আশ্রমে মেয়েদের শিক্ষাদানই কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ মেয়েই অব্যবস্থিতচিত্তে আশ্রমে আসে। মনের এই অবস্থায় কোন প্রকার কাজ বা শিক্ষার দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিতে সহজে পারে না। এমন কি আশ্রমের সাধারণ নিয়ম ও শৃঙ্খলা তাহারা মানিতে চায় না। অনেকের মধ্যে পলাইয়া যাওয়ার প্রবৃত্তিও থাকে। কিছুদিন আশ্রমে বাস করিবার পর, উপদেশ লাভ করিয়া এবং অন্যান্য মেয়েদের সংস্রবে আসিয়া তাহারা যখন আশ্রম বাসের উপযুক্ত হয় তখন দেখা যায়, কেহ কেহ অধিক বয়সেও একেবারে অজ্ঞ। অনেকে চেষ্টা দ্বারাও শিক্ষা পাইবার অনুপযুক্ত। অধিক বয়স পর্য্যন্ত অশিক্ষিত থাকিয়া সহজে পড়াশুনায় মন বসাইতে পারে না।

আশ্রমের উদ্দেশ্যই হইল, মেয়েদের ততদিন পর্য্যন্ত আশ্রমে রাখা যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা যে-কোন উপায়ে সমাজে ফিরিয়া না যায়। সুতরাং প্রথম সুযোগেই তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কেহবা অসুবিধা দূর হইলেই আত্মীয়-স্বজনকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, কেহ কেহবা মামলা মিটিলে চলিয়া যায়—যাহারা আশ্রমে বাস করে অর্থাৎ বাড়ী ফিরাইয়া লইবার মত যাহাদের অবস্থা নয় বা আত্মীয়-স্বজন সকলেই যাহাদের ত্যাগ করে, তাহাদের শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ দিয়া সমাজে এবং সংসারে
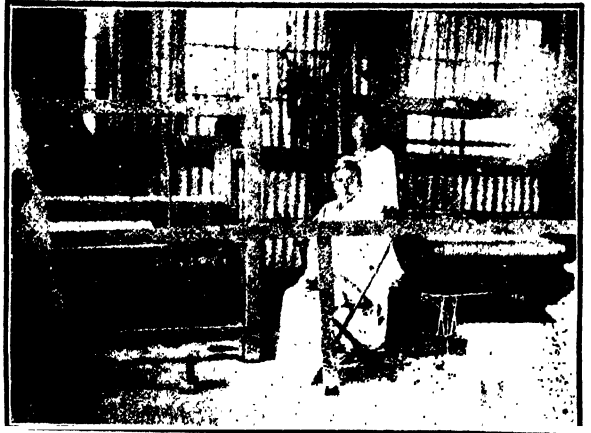
কয়েকটী কালা ও বোবা মেয়ে তাঁতের কাজ করিতেছে।

স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। গত তিন বৎসরের মধ্যে আশ্রমে ৫১টী বিবাহ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪৯টী বাঙ্গালী বাঙ্গালীর সহিতই বিবাহ হইয়াছে। দুইটী হিন্দুস্থানী, তাহারা হিন্দুস্থানীর হাতেই পড়িয়াছে। ৫১টী

বিবাহের মধ্যে একটী মাত্র বিবাহ পণ্ড হইয়াছে, একজন মারা গিয়াছে এবং বাকী সকলেই সুখে সংসার করিতেছে। যাহাদের

এই বালিকাত্রয় শ্রীরামপুর সরকারী তাঁতশালায় তাঁতের কাজ শিখিয়া থাকে।

বিবাহের উপযোগী পাত্র জুটে নাই বা বিবাহে মত নাই তাহাদের আশ্রম হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা যে কত অসুবিধাজনক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আশ্রমে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রাতঃকালে ক্লাস বসে এবং যাহারা লিখাপড়া কিছুই জানেনা, তাহাদের বাহিরে বিদ্যালয়ে পড়িবার মত শিক্ষা এখান হইতে দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে বা প্রাথমিক শিক্ষা থাকিলে যে সব মেয়েদের বাহিরে পাঠাইলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম, তাহাদের স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়িতে পাঠান হয়। সাবিত্রী বিদ্যালয়ে দুইটী মেয়ে উচ্চশিক্ষা পাইতেছে। আশ্রমের নিকটবর্ত্তী করপোরেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েরা পড়িতে যায়।

সাধারণ শিক্ষা দ্বারা স্বাবলম্বী হওয়া আজকালকার দিনে একরূপ অসম্ভব। সেইজন্য মেয়েদের স্বাবলম্বী করিবার জন্য তাঁতের কাজ, নার্সিং এবং ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। আশ্রমের মধ্যে দুইটী সাধারণ তাঁত ও একটী কার্পেট বোনা তাঁত আছে। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক এই তিনটী তাঁত লইয়া মেয়েদের শিক্ষা দিয়া থাকে। আশ্রমের বাহিরে তিনটী মেয়ে শ্রীরামপুর সরকারী উইভিং স্কুলে পড়িয়া থাকে। নার্সিং ও ধাত্রী বিদ্যাশিক্ষার প্রাথমিক ব্যবস্থা আশ্রমেই আছে। আশ্রমবাসিনীদের চিকিৎসার জন্য একটী ছোট খাট ডিস্পেন্সারী এবং ছোঁয়াচে রোগগ্রস্তদের জন্য প্রাথমিক হাসপাতাল আশ্রমের মধ্যেই আছে। জনৈক অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রত্যহ আশ্রমে আসিয়া মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া ঔষধ পত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া যান। তাঁহার সাহায্যকারিণী হিসাবে আশ্রমের কয়েকটী মেয়ে সেবা ও ধাত্রীবিদ্যা শিখিয়া থাকে। তাহা ছাড়া একজন অভিজ্ঞা ধাত্রী আশ্রমে থাকেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে মেয়েরা শিক্ষা পাইয়া থাকে। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর কলিকাতার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মেয়েরা শিক্ষা পাইয়া থাকে। নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা শিক্ষা পায় :—

(১) কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ
(২) মেডিকাল কলেজ
(৩) অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতাল।

আশ্রমের অধিবাসিনী কয়েকটী পাগল

(৪) কলিকাতা মেডিকেল স্কুল

(৫) বিশ্বনাথ আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতাল

এই মেয়েটী যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসা করিয়া রোগমুক্ত হওয়ার পর, আশ্রমে পৃথক ঘরে বাস করিতেছে। সেলাই এবং চিত্রাঙ্কণ ভালরূপে শিখিয়াছে।

(৬) মহারাজা কাশীমবাজার গোবিন্দসুন্দরী হাসপাতাল

(৭) চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল

(৮) চিত্তরঞ্জন সেবাসদন

(৯) মাণিকতলা মেটারনিটী হোম

আশ্রমের ভিতরে সেলাই এবং সূচের কাজ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। অনেকগুলি মেয়ে অবসর সময়ে একাজ শিখিয়া থাকে। প্রদর্শনীতে এই সমস্ত কাজ দেখানো হয় এবং কয়েকটী মহিলা-প্রদর্শনীতে এইপ্রকার হাতের কাজ দেখাইয়া মেয়েরা প্রশংসাপত্র পাইয়াছে। কলাবিদ্যা হিসাবে চিত্রশিল্প এবং মাটীর মডেল প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে শিখান হইয়া থাকে। জনৈক অভিজ্ঞ শিক্ষক সপ্তাহে দুই দিন শিক্ষা দিয়া থাকেন।

আশ্রমের মধ্যে সমস্ত কাজই মেয়েরা নিজেরা করিয়া থাকে। জনৈকা অভিজ্ঞ সুপারিণ্টেনডেণ্ট, আশ্রমবাসিনী-দের সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথমতঃ স্তোত্র পাঠ হয়, তাহার পর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মেয়েরা যে যার কাজে লাগিয়া যায়, কয়েকজন রন্ধন কার্য্য করিতে যায়, কয়েকজন আশ্রমবাড়ী পরিষ্কার করে, কয়েকজন সেবাকার্য্যের জন্য কাহার কি অসুখ করিয়াছে তাহা তদারক করে এবং আশ্রমের চিকিৎসক আসিলে তাঁহাকে অসুখের কথা জানায় এবং তাঁহর ব্যবস্থা মত ঔষধ পত্রাদি দিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে আশ্রমের মধ্যেই একটী ছোট ডিস্‌পেনসারী আছে। অন্যান্য সকলে পড়াশোনা বা সেলাইএর কাজে ব্যাপৃত হয়। সারাদিন এই ভাবে আশ্রমের কাজ চলে।

ধীরে ধীরে নারীকল্যাণ আশ্রম মেয়েদের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে আশ্রমবাসিনীর সংখ্যা ১১৫ জন এবং শিশু ২১টী। এই প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে চালাইবার জন্য বিপুল অর্থ এবং বাংলার নারীদের সাহায্যর প্রয়োজন। বাংলাদেশে সৎকার্য্যে অর্থের অভাব আজও নাই। সকলে সাধ্যমত সাহায্য করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়িয়া তুলিলে বাংলার একটি বৃহৎ অভাব দূর করা হইবে।

আশ্রমের এই মেয়েরা বাহিরে উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে পড়িয়া থাকে।

গৃহহারা

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

পুরীর সমুদ্রতীরে যাহাদের বাড়ী থাকে, তাহারা যে বড়লোক সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বি, এন, আর হোটেলের কাছে এমনি একটা বাড়ী। সামনে শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা নীলিমা-কুটির—সমুদ্রের নীল জল ও আকাশের নবঘন শ্যামলতার মধ্যে যেন নিজের অস্তিত্বকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ছোট্ট বারান্দায় ইজিচেয়ার টানিয়া বসিলে প্রথমেই চোখে পড়ে কয়েকটা ফনি-মনসার গাছ, তারপরে ধূসর বালুকারাশি, তার প্রান্ত-সীমারেখা হইতে নীল ফেনিল উন্মাদ জলরাশি দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার এস, মিত্র কয়েকদিন হইল তাঁহার পত্নী নীলিমা, এবং দুই কন্যা করুণা ও তৃপ্তিকে লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছেন—উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই নাই। কলিকাতার একঘেয়ে জীবনের মধ্যে নীলিমা যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, তাই পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছে এই মাত্র।

সেদিন প্রাতঃকালে সকলে সমুদ্রের ধারে ধারে স্বর্গদ্বারের দিকে যাইতেছিলেন। একদল জেলে সমুদ্রের তীরে তীরে মাছ ধরিয়া যাইতেছে। তৃপ্তি ও করুণা পিছনে পিছনে সামুদ্রিক রঙিন ঝিনুক কুড়াইয়া ফিরিতেছে।

সাম্‌নে তাকাইয়া নীলিমা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এত বড় দীর্ঘদেহ লোক সচরাচর দেখা যায় না। বালুকায় সমস্ত শরীর ভরিয়া গিয়াছে, গৈরিক বসন পরিহিত সন্ন্যাসী বোধহয় নিদ্রিত। মিঃ মিত্র বলিলেন,—এত বড় দীর্ঘলোক এই আমি প্রথম দেখলাম—

নীলিমা নীরবে সম্মতি জানাইল—সে চাহিয়া চাহিয়া শ্মশ্রুবহুল মুখখানাই বার বার দেখিতেছিল।

তৃপ্তি ও করুণার প্রগল্‌ভ হাসিতে সন্ন্যাসী চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। করুণার বয়স হয়ত এই চৌদ্দ, কৈশোরের চপলতা এখনও অসতর্ক মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সন্ন্যাসী ডাকিলেন—করুণা, শোন ত'—

করুণা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ সন্ন্যাসী তাহাকে কি করিয়া চিনিলেন। করুণা বিস্মিত হইয়া ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী কোটরগত চক্ষু দিয়া ভাল করিয়া একবার করুণাকে দেখিলেন। তার পরে মৃদুস্বরে বলিলেন—ওই যে যাচ্ছেন, উনি তোমার মা নীলিমা নয়—

করুণা তাহার মায়ের নাম ধরিয়া ডাকিতে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। করুণার এই সামান্য জীবনে সে সন্ন্যাসীর অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনিয়াছে; ভয়ে ভয়ে বলিল—হ্যাঁ—

ওকে ডেকে নিয়ে এস ত।

করুণা ছুটিয়া তাহার মাকে ডাকিয়া আনিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—নীলিমা, কতদিন পুরী এসেছ?

মিঃ মিত্র বিস্ময়াবিষ্টের মত দাঁড়াইয়াই ছিলেন। নীলিমা জবাব দিল—প্রায় পনরদিন হ'ল।

—বেড়াতেই বোধ হয়?

—হ্যাঁ।

—পুরীতে আসার কথা শুন্‌লে আমার ভয়ও হয় কিনা, হয়ত বা কারও অসুখ বিসুক কিছু হ'য়েছে। সন্ন্যাসী নিজেই খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিলেন, তোমার দাদা কোথায়?

—নির্ম্মল?

—ক'লকাতায়ই আছে।

—ব্যারিষ্টারীতে কিছু হ'চ্ছে?

—হ্যাঁ, তার বেশ নাম হয়েছে।

—তা আমি কল্পনা ক'রেছিলাম। অরুণা, খুকু, কিন্তু কোথায়?

নীলিমা আড়ষ্টের মত জবাব দিয়া যাইতেছিল, বলিল,—অরুণা ও খুকুর বিয়ে হয়ে গেছে।

অরুণার বিয়ে হয়েছে শোভাবাজারের বোসেদের ঘরে,

খুকুর বিয়ে হ'য়েছে ডাঃ এম দত্তের সঙ্গে। কিন্তু এখন বিলেতে বেড়াতে গেছে, এরোপ্লেন ইঞ্জিনিয়ারিং শেখবার ইচ্ছে আছে।

সন্ন্যাসী খুশী হইয়া বলিলেন,—বেশ, বেশ। তৃপ্তিকে দেখাইয়া বলিলেন, এ বোধহয় তোমারই মেয়ে, নয়?

নীলিমা বলিল,—হ্যাঁ।

—করুণা ত এখন রেস্‌পেক্টেবল্ লেডি হ'য়ে পড়েছে। কি বল করুণা—ওহো মিঃ মিত্র নমস্কার। আপনার উপস্থিতি আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

মিঃ মিত্র এত বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে কোনমতে প্রতিনমস্কার করিয়া ভদ্রতা বজায় রাখিলেন।

নীলিমা বালুকার উপর বসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, সন্ন্যাসী বলিলেন—আমার এগুলো খুব ভালো লাগে, বড়লোকের ঘরের মেয়েরা যখন এমনি বালির উপর নিঃসঙ্কোচে বসে তখন আমার মনে হয়—

নীলিমা হাসিয়া বলিল,—আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে—

মনে আমি কিছু ক'রবো না। বল না, কি বল্‌বে।

—আপনাকে আমি এখনও চিন্‌তে পারিনি, সেটা আমার পক্ষে খুবই লজ্জাকর সন্দেহ নেই। আপনি যেই হোন্ আপনি যে আমার নিকটাত্মীয় তা আপনার পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা দেখেই বুঝেছি। আপনি কে ব'লবেন কি?

—ও কথাটা আমি ব'লতে পারবো না, কারণ বলবার উপায় নেই—

—এখানে কোথায় আছেন?

হাঃ হাঃ, আমাদের কি তোমাদের মত বাড়ী আছে যে থাকবার স্থিরতা থাকবে। কাল রাত্রি দশটায় এখানে পৌঁছেছি, প্রায় পনর মাইল হেঁটে বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম তাই বেশ বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছি—

—এখন থাকবেন কোথায়?

—ধর্ম্মশালায়।

—আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমাদের বাড়ীতে—আপনার খাবার কোন অনাচার হবে না।

সন্ন্যাসী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, ছাখো, নীলি, তোমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার অনেক তফাৎ, সেটা ঠিক মিলবে না, আর তোমরা এসেছ কয়েকদিনের জন্যে আনন্দ করতে তার মধ্যে এ বিড়ম্বনাকে টেনে ঘরে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?

—আমরা সত্যিই আনন্দিত হব।

মিঃ মিত্র বলিলেন,—আপনি আমাদের অতিথি হ'লে আমরা খুবই আনন্দিত হব—আপনি আত্মীয়, শিক্ষিত।

—আত্মীয় আমি নই, যাদের আত্মীয় তারা হয়ত আজ কেউ বেঁচে নেই, থাকলেও অন্ততঃ আত্মীয়তাটা বেঁচে নেই।

নীলিমা বলিল,—এ আমাদের পক্ষে গৌরবেরও বটে—

—তোমার দেখি তোমার মায়ের মতই আবর্জ্জনা কুড়িয়ে ঘরে নেবার একটা হবি (hobby) আছে...

সন্ন্যাসী দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপে নীলিমার অনুবর্ত্তী হইলেন।

কয়েক দিন পরে—

সন্ন্যাসীর পরিচয়-রহস্য এখনও ভেদ হয় নাই।

সামনের সমুদ্র ও ধূসর বালুকারাশি মেঘলা নিষ্প্রভ-জ্যোৎস্নায় তন্দ্রাগত। আকাশের বুকে ক্লান্ত শ্লথ মেঘগুলি যেন মাতালের মত ঝিমাইতেছে। বারান্দায় সকলেই আসিয়া জড়ো হইয়াছে; তন্দ্রাগত জগতের মাঝে অকারণ জাগিয়া থাকার নেশা যেন আজ সকলকে পাইয়া বসিয়াছে।

তৃপ্তি আসিয়া বলিল,—আপনি ত অনেক দিন ঘুরেছেন, দেশ বিদেশের গল্প করুন না।

সন্ন্যাসী হাসিয়া উঠিলেন। তৃপ্তি বলিল,—আপনি হাস্‌ছেন যে—

—এমনি।

নীলিমা বলিল—বলুন না, গল্প আমরাও শুনি। আর আপনাকে কি বলে ডাক্‌বো, আলাপ করতে যেন কেমন বাধা পাই।

—হ্যাঁ, একটা কিছু বলা দরকার, সন্ন্যাসীদা বল্‌লেই হল।

শ্রোতাগণ ঘেরিয়া ধরিল। সন্ন্যাসী আরম্ভ করিলেন, তোমরা বোধ হয় তোমার বাবার মুখে শুনে থাক্‌বে, ব্যালজাকের দি প্যাশান অব দি ডেজার্টের গল্প। কেমন করে একটি ফরাসী সৈনিক বাঘের সঙ্গে একাকী মরুভূমিতে

বাস করেছিল, আমার জীবনেও প্রায় অমনি একটা ঘটনা হয়েছিল—

সন্ন্যাসী যখন বন মধ্যে একরাত্রিব্যাপী ব্যাঘ্র সহবাসের কাহিনী বলিয়া শেষ করিলেন তখন সকলেরই দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে বলিলেন—এ স্মৃতি পুষ্করের সেই এস্কাবনের বিবির মত আজও আমাকে বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দেয়।

মিঃ মিত্র বলিলেন,—আপনি শুধু শিক্ষিত নন, পণ্ডিতও বটে। আপনার কি মনে হয় আপনার জীবনে আপনি আমাদের চেয়ে বেশী সুখী।

সন্ন্যাসীর মুখ সহসা ম্লান হইয়া গেল। ক্ষণিক-চিন্তা করিয়া বলিলেন আমি আজও তা ভেবে পাইনে। তবে এইটুকু বলতে পারি যে সংসারে আমার ফিরে যাবার উপায় নেই। ভগবান প্রাপ্তির ইচ্ছে আমার নেই, এই পৃথিবীর সংসর্গ আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছিল—জগতের মধ্যে দীনতম হয়ে বাস করার চেয়ে বনবাসকেই আমি শ্রেয় মনে করেছিলাম। গল্পের সঙ্গে রাত্রি ধীরে ধীরে গভীর হইয়া ওঠে—

সন্ন্যাসীর চরিত্র এত সুন্দর, ব্যবহার এত অমায়িক যে অনাত্মীয়ও দুদিনে আত্মীয় হইয়া উঠে! তাঁহার প্রত্যেকটি কথা যেন মনের গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত আন্দোলিত করিয়া দেয়।

তৃপ্তি ও করুণা হইয়াছে তাহার সহচরী। যতক্ষণ সন্ন্যাসী জাগ্রত থাকেন ততক্ষণ তৃপ্তির অষ্টমবর্ষসুলভ কৌতূহলী প্রশ্ন ও করুণার আগ্রহ তাঁহাকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলে। সন্ন্যাসীর বিরক্তি নাই, অক্লান্ত ভাবে প্রশ্নের জবাব দিয়া যাইতেছেন। সেদিন সকালে মিঃ মিত্র চা'র টেবিলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা সন্ন্যাসীদা এ জগতে অনেক ঘুরেছেন, আপনি সব চেয়ে সুন্দর কি দেখেছেন বলতে পারেন?

—সুন্দর কিনা জানিনা তবে সবচেয়ে যে দৃশ্যটা আগে আমার মনে পড়ে সেটা বলতে পারি।

—বলুন না।

—একদিন এক সাঁওতাল পল্লীতে একটা বিবাহ দেখেছিলাম। তার মধ্যে বধূকে আমার মনে হয় খুব সুন্দর; পূর্ণ স্বাস্থ্য, নিটোল যৌবন, কাল পাথর থেকে যেন কোন নিপুণ ভাস্কর তাকে কতদিনের পরিশ্রমে সৃষ্টি করেছে—এমনি তার সুঠাম দেহ। বিবাহ সভায় কে তাকে ঠাট্টা করায় সে একটু ম্লান হাস্‌লে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো জলে ভরে উঠ্‌ল। জানিনা এর পিছনে কোন ইতিহাস আছে কিনা, তবে সৌন্দর্য্য কল্পনা কর্‌তে গেলে এই জলে ভরা চোখ দুটিই আমার আগে মনে পড়ে—

পিয়ন কয়েকখানা চিঠি দিয়া গেল—

একখানা চিঠি পড়িয়া মিঃ মিত্র যেন অনেকটা গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। নীলিমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—নির্ম্মলের স্ত্রীর খুব অসুখ, ডাক্তার দত্ত তাকে নিয়ে কাল সকালে এখানে পৌছবেন।

একটা দিন ও একটা রাত্রি নানারূপ শঙ্কায় ও দ্বিধায় কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে মিঃ দত্ত নির্ম্মলের স্ত্রীর রুগ্ন শীর্ণ দেহখানাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। মিসেস্ মঞ্জরী ঘোষের দেহ ট্রেণের কষ্টে আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী তালিকা করিয়া শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। দিনের বেলায় নীলিমা, মিঃ মিত্র, করুণা সকলে শুশ্রূষা করে; রাত্রি দশটার পর হইতে ভোর পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীদা। সন্ন্যাসীর ক্লান্তি নাই, রাত্রির পর রাত্রি ক্রমাগত জাগিয়া যাইতে এমন লোক সহসা পাওয়া যায় না। ডাঃ দত্ত তাহার সেবা দেখিয়া রোগিণীর সমস্ত ভার তাহার উপরেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

নির্ম্মলকেও আসিতে টেলিগ্রাম করা হইয়াছে।

সেদিন রাত্রি নিশীথে, রোগিণীর শিয়রে বসিয়া সন্ন্যাসী বাহিরের স্তব্ধ নিঃশব্দ রাত্রির পানে চাহিয়া ছিলেন। সহসা মিসেস্ মঞ্জরী চাহিয়া বলিল,—উঃ—

—কি হয়েছে, মিসেস্ ঘোষ—

—আমার হাত পা যেন কেমন হিম হ'য়ে আস্‌ছে।

সন্ন্যাসী নাড়ী দেখিয়া একটু চিন্তিত হইলেন। তাহাকে একটু ব্রাণ্ডি দিয়া বলিলেন, ভয় নেই দুর্ব্বলতার জন্যে অমন মনে হচ্ছে।

মিঃ দত্তকে ডাকিয়া সমস্ত সংবাদ জানাইলেন। দত্ত পরীক্ষা করিয়া ম্লান মুখে বলিলেন, বসুন, দিদিকে ডাকি।

—কেন, বলুন না?

দত্ত তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন,—এখন অন্ততঃ ২০ সি, সি, রক্ত দরকার নইলে দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

—তার জন্যে নীলিমাকে ডাকবার দরকার নেই। আমি দিচ্ছি। এ আর এমন কি কথা যে ওদের ঘুম ভাঙাতে হবে।

মিঃ দত্ত সন্ন্যাসীর মুখের দিকে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—২০ সি সি রক্ত নিলে যে আপনার বড় কষ্ট হবে—

—হোক্, ক্ষতি কি? কবে বাঘে ভালুকে খাবে, তার চেয়ে মানুষে খাওয়া অনেক ভাল—

ডাঃ দত্ত সন্ন্যাসীর দেহের উষ্ণ ২০ সি সি রক্ত মঞ্জরীর দেহে সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। শেষরাত্রে মঞ্জরী ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া বলিল,—আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না, সন্ন্যাসীদা আপনি ক রাত্রির ঘুমোন নি, একটু ঘুমিয়ে নিন।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন,—কষ্ট অনুভব করলে বিশ্রামের দরকার। কষ্ট আমার সত্যিই হচ্ছে না। ডাঃ দত্ত আপনি বরং একটু ঘুমিয়ে নেন।

পরদিন মঞ্জরীর অবস্থা খুবই ভাল দেখা গেল।

নির্ম্মল টেলিগ্রামে জানাইয়াছে কাল সকালে পুরীতে পৌঁছিবে।

কিন্তু দুপুরের পরে সন্ন্যাসীদার বেশ একটু জ্বর হইল। ডাঃ দত্ত তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—কালই আপনাকে বললুম এতটা রক্ত নেওয়া ভাল হবে না, আপনি শুনলেন না—

সন্ন্যাসীদা হাসিয়া জবাব দিলেন,—আমার রক্তের এর চেয়ে সদ্ব্যয় আর কি হতে পারে—একটু জ্বর হয়ত হয়েছে, কাল ভাল হয়ে যাবে—

—কিন্তু এতে যে—

পরদিন ভোরের ট্রেণে নির্ম্মল আসিয়া উপস্থিত হইল।

মঞ্জরী কয়েকটা আঙ্গুর চিবাইতেছিল, নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন আছ মঞ্জরী?

—এখন ত খুবই ভাল—সন্ন্যাসীদাই এবার আমাকে বাঁচিয়েছেন।

মিঃ দত্ত বলিলেন—সন্ন্যাসীদার যা কৃশ দেহ, ভেবেছিলাম, ২০ সি সি রক্ত নিলে বোধ হয় ফিট্ হ'য়ে যাবে, কিন্তু তার দেহ খুবই শক্ত দেখলাম—

নীলিমা সন্ন্যাসীদার কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে নির্ম্মল বলিল,—আমারই বোধ হয় কোন ভুলে যাওয়া বন্ধু! কোথায় তিনি, তাঁকে ডাকো না।

পূর্ব্বের দিকের বারান্দায় এককোণে সন্ন্যাসী থাকিতেন। তৃপ্তি দৌড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিতে গেল। কিন্তু সন্ন্যাসী তাঁহার শয্যায় নাই। নীলিমা বলিল,—উনি প্রায়ই খুব ভোরে উঠে কোথায় যান, আসতে একটু বেলা হয়। শিগ্‌গিরই এসে পড়বেন।

বেলা অনেক হইয়া গেল, সন্ন্যাসী ফিরিলেন না। নীলিমা তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল, শিয়রের কাছে একখানা কাগজ পড়িয়া আছে—সন্ন্যাসীরই বিদায় বাণী। তৃপ্তির উদ্দেশ্যে একখানা পত্র—

স্নেহের তৃপ্তি—

তোমার সন্ন্যাসী মামা আজ চ'লল। জীবনে বোধ হয় আর দেখা হবে না, কিন্তু তোমাদের স্মৃতি অতীতেও যেমন সুন্দর হ'য়ে ছিল আজও তেমনি তোমাদের স্মৃতির ভাণ্ডার নিয়ে আমি ফিরে চললুম। তুমি যেমন আমার গল্প এ কয়দিন শুনেছ, এমনি আগ্রহে তোমার মা'ও একদা শুনতো—

যাবার বেলায় আমার পরিচয় দিতে আপত্তি নেই। তোমার মামা নির্ম্মল আমার বন্ধু ছিল। নীলিমার বোধ হয় আজও মনে আছে, তার বয়স যখন করুণার মত তখন তারা গিরিডিতে চেঞ্জে গিয়েছিল, তার সঙ্গে তার দাদার এক বন্ধু ছিল। নীলিমা ডেক-টেনিস্ খেলতে খেলতে বলত—আস্তে সার্ভ করুন নইলে আপনার সার্ভ ধরতে পারবো না। আমি সেই রমেন দা—তারপর আজ প্রায় আঠার বৎসর চ'লে গেছে। কিন্তু আমার বন্ধুর মায়ের সে স্নেহ আজ আমার কাছে অমূল্য সম্পদ হ'য়ে রয়েছে।

তোমাদের স্নেহ আর স্মৃতি একত্র মিশে আমাকে যেন পুরাতন পৃথিবীর পানে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। নির্ম্মলের সঙ্গে দেখা করতে তাই ভয় করেছি। তোমাদের সংসর্গের লোভ আমার কাছে দুর্দ্দমনীয় হ'য়ে উঠেছে, তাই আমাকে আজ যেতে হ'ল। ভয় হয় মনের কাছে বোধ হয় আমায় পরাজয় ঘটবে। আত্মগোপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠছিল।

লক্ষ্মীটি, আসি। যদি কোন অন্যায় করে থাকি ক্ষমা করো—ইতি।

নীলিমা নির্ম্মলের হাতে পত্রখানা দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নির্ম্মল চিঠি পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলিল,—রমেন! বিলেত যাবার আগে সে কোন ইস্কুলে চাকুরী ক'রতো,—তার পায়ে কি—

বিগত বন্ধুর প্রতি করুণায় সে সহসা যেন মূক হইয়া গেল।

নীলিমা ভাবিতেছিল—যে রমেনদা একদা সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়া টেনিস খেলিত, সেদিন মুক্ত আকাশের নীচে, বালির মধ্যে সেই রমেনদাই তাহার শীর্ণ কৃশ দেহ এলাইয়া দিয়া শুইয়া ছিল, একথা যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না—এ দৃশ্য যেন সহ্য হয় না।

নির্ম্মল বলিল—যাবে যাক্, অমন দুর্ব্বল রুগ্ন শরীর নিয়ে যাবার কি দরকার ছিল? হয় ত বা পথে—

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণশক্তি ও প্রচ্ছন্নভাব

শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ

সম্মিলিত সাধুগণের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার আরম্ভে বুদ্ধ বলিয়াছেন :—

সব্বপাপস্‌স অকরণং কুশলস্‌স উপসম্পদা

সচিত্ত পরিয়োদপনং এতং বুদ্ধন সাসনং ॥

সকল প্রকার পাপের বর্জ্জন, কুশল-কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং চিত্তকে নির্ম্মল করা, ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন।

যে ধর্ম্ম মানুষের অন্তরে প্রাণশক্তি রাখে তাহাই বিশ্বের শাশ্বত মহাকালের ধর্ম্ম। জীবন্ত ও মহৎ আদর্শকে মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। মহাপুরুষেরা নির্জ্জীব সত্যগুলিকে জীবন্ত করিয়া উপস্থিত করেন। মহাপুরুষের বাণী বীজমন্ত্রের মত ভক্তের সরস চিত্তোদ্যানে দেহ, মন ও প্রাণকে জুড়াইয়া দেয়। সে জ্ঞান সূর্য্যরশ্মির মত দীপ্ত, সন্ধ্যার সমীরণের ন্যায় শান্ত, মহাপুরুষ তাহার সন্ধান দেন। মৃত্যুহীন সাধনা, মহতী আশা ও আকাঙ্ক্ষা সাধককে প্রাণশক্তি দেয়।

মানুষের হৃদয়ে যে পাপ ও চঞ্চলতা জমে, তাহাই তাহাকে সত্য হইতে দূরে রাখে। অর্থহীন আচার ও মিথ্যা আড়ম্বর মানুষের মনকে মলিন করে। ভিতর হইতে মানুষ ভাল না হইলে সে ভাল হওয়ার কোন ফল নাই। বৌদ্ধ নীতি জোরের সহিত এই কথাই প্রচার করে যে, মনের দিক হইতে মলিনতা বা অবিদ্যাকে নাশ করিতে পারিলেই মানুষ অপাপবিদ্ধ হয়।

ততো মলা মলতরং অবিজ্জাপরমং মলম্।

এতং মলং পহন্তান নির্ম্মলা হোথ ভিকুখবো॥

মানুষ যখন স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি করে তখন তাহার মন প্রেয় চায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে এই তৃষ্ণাকে মার বলা হইয়াছে। এই তৃষ্ণাই মানুষের দুঃখের কারণ। এই তৃষ্ণা মিটাইবার ইচ্ছায় মানুষ যতদিন ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে ফুলাইয়া তুলিবে ততদিন সে শান্তি পাইবে না। বুদ্ধ বলেন, যে-অহং-বুদ্ধি মানুষের বোধকে জাগরিত করিবার পক্ষে অন্তরায় তাহা ত্যাগ করিয়া নিখিল বিশ্বের সহিত নিজের ঐক্য অনুভব করিবে। এই ঐক্যানুভূতিই সকল সত্যের সার। সেইদিনই মানুষ বোধি লাভ করে যেদিন সে ক্ষুদ্র সত্তার সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন এবং বিরাট সত্তা অনুভব করে। এই বিশ্বাত্মবোধই বুদ্ধের বাণী। এই বিশ্বাত্মবোধের রিপু (শত্রু) আত্মবিস্মৃতি। জীব নির্ম্মল মন নিয়া জন্মগ্রহণ করে। চারিদিকের পরিবেষ্টনের প্রভাব এবং প্রবৃত্তির জঞ্জাল মানুষের সহজাত শক্তির উপর অনাস্থা নিয়া আসে। ফলে আপনাকে মানুষ কল্যাণ-কর্ম্মে দান না করিয়া শ্রেয়লাভের শক্তি নষ্ট করে। পাঁচটী শীল পালন করিতে যে গভীর সংযম আবশ্যক তাহা দ্বারা আত্মশক্তি লাভ হয়।

নীচবৃত্তিগুলি প্রশমিত হইয়া মানুষের মনে কল্যাণকর সদ্‌গুণ জন্মে এবং চিরসত্য ও চিরমঙ্গলের জন্য লুব্ধতা আসে। অচ্ছিদ্র ও অখণ্ডশীল অধ্যাত্মবোধ সঞ্চার করে ও ভিতর হইতে মানুষকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করে ; এবং ইহারই পরিণতি বুদ্ধত্বলাভ। অর্থাৎ আপনার ভিতরের বৃহৎ সত্য সম্বন্ধে বোধিলাভ।

অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে সকলের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্র মানবত্মাকে সকলের উচ্চ আসনে স্থান দিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মে মানুষের মহদ্দুঃখের নিবৃত্তির উপায় কোন দেবতার অনুগ্রহে নয়, জ্ঞানমূলক প্রেমের সাধনা দ্বারা। বৌদ্ধ সেবক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড বিশ্বাস করেন না। গুরু, পুরুৎ ও কল্পিত দেবতার পায়ে ধন্না দেন না। আপনি ভিন্ন অন্য কাহারও উপর নির্ভর করিতে বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশাসন নাই। গভীর সংযম এবং মঙ্গলব্রতের দ্বারা জীব সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে।

দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।
ভূতো বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা॥

দেখা, অদেখা, দূরবাসী বা নিকটবাসী, অতীতকালের বা ভবিষ্যৎকালের সকল প্রাণীই সুখী হউক। এই জ্ঞানমূলক প্রেমের সাধনা বিশ্ব-প্রেম বা বিশ্বমৈত্রী মানবজাতির ইতিহাসে বৌদ্ধদর্শনেই অতি উজ্জ্বলরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বৈদিক-মতে মুখ্যধর্ম্ম যজ্ঞ, এখানে গো আলম্ভনীয়। বুদ্ধ এই প্রচলিত বেদবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। হিংসার সহিত অহিংসার তুমুল আন্দোলন সুরু হইল। বৈদিক আর্য্যের আদর্শ ছিল গৃহীর জীবন এবং পরকালে স্বর্গবাস। মূলতঃ কলোনাইজেসনের (Colonization) স্পিরিট ছিল তাহাদের অন্তরে। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল আদিম অধিবাসীদিগকে মেরে কেটে নিজের সুখের ব্যবস্থা করা।

আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতার আদর্শ ছিল মানুষের মহদ্দুঃখ নিবৃত্তির বাণী। বুদ্ধদেব এই মানবসত্যের প্রতীকরূপে সর্ব্বজীবের হিতার্থ স্বার্থান্ধতার পরিবর্ত্তে নিরবশেষ আত্মত্যাগের ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। অবশ্য বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদের বিরুদ্ধে তিনি একটি কথাও বলেন নাই। যে বেদের ঋষিরা বিবাহ কালে গবালম্ভন করিতেন তাহারাই শেষে বলিলেন :—

"মা গাং অনাগাং অদিতিং বধিষ্ট।" গোবধ করিয়া লাভ নাই (সামবেদ মন্ত্র-ব্রাহ্মণ—গোভিল গৃহসূত্র)। বৈদিক কর্ম্মধারার এমন পরিবর্ত্তন হইল,—ভারতে গোমেধ লুপ্ত হইল। এমন কি গবালম্ভনের চিন্তাও কেহ মনে আনিতে সাহস পায় না। এখন বৈদিক ধর্ম্মের প্রধানব্রত গো-রক্ষা। বহুব্যাপক হিংসার পরিবর্ত্তে বুদ্ধদেব ভারতে অহিংসা ও মৈত্রীর মন্ত্র প্রচার করিলেন। বুদ্ধদেব মানুষকে প্রাণহীন যজ্ঞানুষ্ঠান যাহা কতকগুলি বিধির অচলগণ্ডী তাহার পরিবর্ত্তে শীল আচরণের উপদেশ দিয়া বহির্ম্মুখীন জাতিকে অন্তর্ম্মুখীন করিলেন। বুদ্ধদেব মানুষকে নিজের মঙ্গলকর কার্য্য ঠিকমত জানিয়া নিবিষ্ট হইতে উপদেশ দিলেন। বুদ্ধদেব কেহ বিচারবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া তাঁহার বাণী স্বীকার করে এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। এমন কি তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন—'যদি কেহ বলেন, আমি স্বয়ং বুদ্ধের মুখে এই বাণী শুনিয়াছি; ইহাই সত্য, ইহাই বিধি, ইহাই তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা; তোমরা কখনো এইরূপ উক্তির নিন্দা বা প্রশংসা করিওনা। ঐ উক্তির প্রত্যেক বাক্য প্রত্যেক শব্দ অভিনিবেশ সহকারে শুনিবে। উহার তাৎপর্য্য সম্যক বুঝিবার চেষ্টা করিবে। এই বাণী ধর্ম্ম ও বিনয়ের নিয়মের সহিত মিলাইয়া দেখিবে। যদি কোনরূপে সামঞ্জস্য বিধান না করিতে পার তাহা হইলে বুঝিবে ঐ বাণী আমার নহে কিংবা ঐ ব্যক্তি আমার বাক্যের নিগূঢ় অর্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই।" বুদ্ধের বাণী (১) সম্যক-দৃষ্টি, (২) সম্যক্ সঙ্কল্প (৩) সম্যক্‌বাক্ (৪) সম্যক কর্ম্মান্ত (৫) সম্যক্ জীবিকা (৬) সম্যক্-ব্যায়াম (৭) সম্যক্-স্মৃতি (৮) সম্যক্-সমাধি এই আষ্টাঙ্গিক সাধনা। সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সঙ্কল্প বাক্য :—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্ল্ভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া যায় যাক্—ত্বক্, অস্থি, মাংস, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় হউক, তথাপি বহুকল্পদুর্ল্লভ বোধিলাভ না করিয়া আমার শরীর এই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবেনা। বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্ম্মুখীনতা, বিচারবুদ্ধির প্রাধান্য, স্বাধীনচিন্তা এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় বৌদ্ধযুগকে ভারতের স্বুবর্ণময় যুগ বলা অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচীনযুগের বুদ্ধ ও জিন মূর্ত্তির অন্তর্ম্মুখীনতা ভাস্কর্য্যের আদর্শ। নির্ব্বাণেচ্ছু সন্ন্যাসী ভিক্ষুদের নির্ম্মিত অজন্তা ও এলোরা গুহার চিত্র আজও সারা বিশ্বের আদর্শ। বুদ্ধদেবের সার্ব্বভৌমিক বাণী উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলকেই অর্হৎ হওয়ার যোগ্যতা দিয়াছে। এই মৈত্রীর বেদী জগতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব অধ্যায় রচনা করিয়াছে। কপিলবাস্তুর রাজপুত্র বেদবিরুদ্ধ পৈশাচী প্রাকৃতে ধর্ম্মপ্রচারে দ্বিধা করেন নাই। ক্ষৌরকার উপালি হীনজাতি হইয়াও মহাপুরুষ বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত ছিল। মুক্তির এক উদার রাজপথে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধদেব বিশ্বের সকল মানবকে আহ্বান করিয়াছেন। মানব সভ্যতা যাহাতে মিথ্যাচারে মুমূর্ষু না হয়, অন্যকে ফাঁকি দিতে

গিয়া নিজে না ঠকে তাহারই পথ বলিয়াছেন। বারাঙ্গনা আম্রপালী, নীচজাতিদের সকলের জন্য সংধর্ম্মের দ্বার খোলা ছিল। বৌদ্ধ নীতির আচার, কার্য্য ও ভাবনা সকল চেষ্টাই মানবের কল্যাণের নিমিত্ত। মঙ্গল ভাবনা দ্বারা সমস্ত চিত্তকে আচ্ছাদিত রাখিতে হইবে।

যথাগারং সুচ্ছনং বুট্‌ঠী ন সমতি বিজ্ঝাতি।
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগোন সমতি বিজ্ঝাতি ॥

বুদ্ধের আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসের এক নূতন যুগ। প্রাণহীন নীরস যজ্ঞ, অবাধ পশু হত্যা, পৌরহিত্য ও শাসনের উৎকট উচ্ছ্বাসের পরিবর্ত্তে মহান্ করুণা, বিশ্বমৈত্রী এবং গণতন্ত্রের অভ্যুদয়। উপনিষদের জ্ঞান ও সত্য জনকয়েক মহাপুরুষের মধ্যে অরণ্যে লুক্কায়িত ছিল। বেদের শ্রেষ্ঠাংশ আরণ্যক সভ্যতা। উপনিষদের ঋষির সহিত বাস্তব দেশ ও সমাজের সঙ্গে সংশ্রব ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ জ্ঞানের রাজ্যে পংক্তি ভোজন করিবার সুযোগ পাইল বুদ্ধের অপার করুণায়। অসঙ্গ, নাগার্জ্জুন, সঙ্ঘমিত্রা, বসুমিত্র, দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞানভিক্ষু, বুদ্ধভদ্র, অশ্বঘোষ প্রভৃতি সেবাব্রতধারী ভিক্ষুসম্প্রদায় এই বাণী বহন করিয়া মানবসভ্যতাকে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাধারণকে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দানের ফল হইল তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, অজন্তা প্রভৃতি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় (বিহার)। অজন্তা গুহার সুঠাম কারুকার্য্য, সাঞ্চির স্তূপ, সারনাথের বুদ্ধমূর্ত্তি এক সুবর্ণময় যুগের ইতিহাস। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের দ্বাদশ গির্ণার অনুশাসন আজও সমস্ত মানবজাতির লক্ষ্য। অতীতের অন্ধকার গুহা হইতে যতই ইতিহাসের আলোকরশ্মি আসিতেছে ততই আমরা বৌদ্ধযুগের জ্ঞানবৈভব ও বিদ্যাবিভবে সম্মোহিত হইতেছি। বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির কর্ম্মোন্নতির মূলে বৌদ্ধধর্ম্ম। আর্য্যঋষিরা এবং তাহাদের বংশধরেরা বাঙ্গালীর সম্মান দিয়াছেন এম্নি করিয়া,

"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রেষু চ মগধে।
তীর্থযাত্রাং বিনাগচ্ছন্ পুনঃ প্রায়শ্চিত্তমর্হতি ॥"

তীর্থযাত্রা ভিন্ন বাংলাদেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হেমাদ্রি লিখিয়াছেন, শ্রাদ্ধের পংক্তিতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে বসিতে দিবে না। এর কারণ বাঙ্গালীরা আর্য্য নহে, দ্রাবিড়দের বংশধর। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরাও এই মত পোষণ করেন। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ আগমন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব সেন রাজবংশের কল্যাণে। মুসলমান বিজয়ের এক বা দুই পুরুষ পূর্ব্বে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের যে সেন্সাস্ হইয়াছিল সেই মতে ৭০০ ঘর রাঢ়ীবারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিল। এর উপরে কিছু সাতশতী পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণও ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বাঙ্গলায় তখন দুই সহস্র ঘরের বেশী ব্রাহ্মণ ছিল না। অখণ্ড সমাজের উপর তাহাদের প্রভাব অল্পই ছিল।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম কবে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এখনও ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলস্থানও বাংলা হইতে দূরে নয়। বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেই দেশময় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। নির্ব্বাণের দিনে বুদ্ধ নিজেই বলিয়াছেন "বাংলার রাজকুমার আজ সিংহলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিংহলে আমার ধর্ম্ম স্থায়ী হইবে।" আমরা বর্ত্তমানে যাহারা হিন্দুধর্ম্মের ভক্ত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই প্রায় বৌদ্ধ ছিলেন। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি বৌদ্ধগ্রন্থের দ্বারা। বাংলার গৌরব বৈষ্ণব পদাবলীর মূল হরিদ্বার "বৌদ্ধগান ও দোঁহা।"

"পঞ্চ তথাগত কি অ কেডুয়াল।"

আফগানিস্থানের খিলিজিরা যেদিন বাংলায় আসিয়া সমস্ত বৌদ্ধ বিহার ভাঙ্গিয়া দিলেন, সহস্র সহস্র ভিক্ষুকে বধ করিলেন তখনই বৌদ্ধধর্ম্মেরও নাশ হইল। এদিকে ব্রাহ্মণেরা সুযোগ বুঝিয়া সামাজিক নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া বৌদ্ধদিগকে অনাচরণীয় করিলেন। দেশশুদ্ধ লোক হিন্দু হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। বৌদ্ধ-দেবতা ধর্ম্মঠাকুর হিন্দুর দেবতা; নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অনেক দেবতারা এখনও ব্রাহ্মণদের কাছে পূজা পাইতেছেন। একজটা বা মহাচীন তারা ব্রাহ্মণদিগের হাতে পড়িয়া তারা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই তারার সাতটী রূপভেদ:—উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী ও কামেশ্বরী। ইহারা কিন্তু সকলেই বৌদ্ধদেবতা। সরস্বতী বৈদিক দেবতা হইলেও আমরা সরস্বতীকে অঞ্জলি দেই ভদ্রকালীকে নমস্কার করিয়া।

"ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমোনমঃ।"

দশমহাবিদ্যার সকল দেবতাই বৌদ্ধধর্ম্মগত দেবতা। বৌদ্ধ দেবতা বাশুলী বিশালাক্ষী নাম ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের হাতে পূজা পাইলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি, মর্ত্ত্যভূমে স্বর্গের গায়ক চণ্ডীদাস বাশুলীর শিষ্য।

"বাশুলী চরণে শিরে বন্দি আ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে। —শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

চণ্ডীদাস সহজিয়াদের আদি-গুরু। সহজিয়া ধর্ম্মেরঅর্থ ভগবান্ বুদ্ধ যখন সহজভাবে থাকেন, যখন তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন এবং শক্তির সন্তান সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তখনই তাঁহার করুণার পরমা স্ফূর্ত্তি। এই সময়ই ভক্তের উপাসনার প্রশস্ত সময়। এই সরস মধুর ভাব কালক্রমে সকল ধর্ম্মেই ছড়াইয়াছে। বৈষ্ণবের যুগলমিলন সহজধর্ম্মের রূপান্তর। তবে একটু তফাৎ আছে। বৌদ্ধ সহজ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপক। এই রূপকের পরীক্ষা বা experiment নিজের উপর দিয়া ফলান। বৈষ্ণবেরাও রূপকেরই উপাসনা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ যশোদার পালিত পুত্র। তবে চণ্ডীদাসের যুগে একটু ভক্তিরস মিশ্রিত হইয়া নিজের দেহে রাধাভাবের অভিব্যক্তির পরিবর্ত্তে ঠাকুরালীর দেহেও experiment চলিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও দেশ হইতে যায় নাই, নাম পরিবর্ত্তন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে।

শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য

যৎকিঞ্চিৎ

স্বর্গীয় সুকুমার সান্যাল

ভোরের বেলায় পড়ল চোখে
তরুণ রবির অরুণ আলো,
উষায় নিশায় মেশামিশি
লেগেছিল বড়ই ভালো।
রক্ত-রবির সেই কটাক্ষ
ঢালবে পরে এমন দাহন,
বিরল-কেশ এই বুড়োর মাথায়
হায় কে বলো জান্‌ত তখন।
ঠকে ঠকে ঠিক করেছি—
যথেষ্ঠ তাই যা জুটে যায়,
রক্তজবার রঙ্‌টা ভাল
চাঁপার সুবাস মিল্‌বে না তায়।
এই দুনিয়ার মুসাফিরির
যে কটা দিন রইলো বাকি,
ভবিষ্যতের ভরসা কিসের
অতীত পানেই চেয়ে থাকি।
একটুখানি স্নেহের বাঁধন
একটু খানি ভালবাসা,
তুষ্ট দুটো মিষ্ট কথায়
তার বেশি আর নাই দুরাশা॥

বিপত্তি

শ্রীনবগোপাল দাস আই-সি-এস্

অণিমার উৎসাহেই অবনীশের কোণারকে আসা। পুরীতে সে আসিয়াছিল কয়েকটা দিন বিশ্রাম করিতে, কিন্তু অণিমা আসার পর হইতেই জেদ ধরিল, কোণারক যাইতে হইবে।

অবনীশ স্ত্রীকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। বলিল, কোণারকে ইটপাথরের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নাই, শুধু শুধু পয়সা খরচ ক'রে ওসব দেখে লাভ কি?

অণিমা মুখ ভার করিয়া বলিল, আমার কোন একটা ইচ্ছাও ত এ পর্য্যন্ত তুমি পূর্ণ করলে না! এত দূরদেশে এসেছি, কোণারকটাও কি দেখ্‌তে দেবে না?

স্ত্রীর মুখ গম্ভীর দেখিলে কোন স্বামীই স্থির থাকিতে পারে না। অবনীশ, যে স্ত্রীকে এত ভালবাসে, সে যে স্থির থাকিতে পারিল না তাহা বলাই বাহুল্য। অণিমার গালে মৃদু একটা আঘাত করিয়া মুখে হাসি টানিয়া অবনীশ বলিল, আহা, দেখ্‌তে দেবনা আমি ত বলিনি'! আমি বলেছিলুম কল্‌কাতার মিউজিয়মের মধ্যেও ত এসব জিনিষ যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, তবে আর হাঙ্গাম করা কেন? তা যাব নিশ্চয়ই...

স্বামীর মুখের কথা শেষ না হইতেই অণিমা বলিল, কী যে তুমি বল! কোথায় মিউজিয়মের প্রাণহীন পাথরের মূর্ত্তি আর কোথায় কোণারকের সজীব মন্দির! তুমি ত আছ রসহীন রসায়নের মধ্যে ডুবে, তুমি কোণারকের মর্য্যাদা কী আর বুঝবে?

কোণারকের মর্য্যাদা যে সে বুঝিবেনা তাহা অবনীশ মনে মনে স্বীকার করিলেও মুখে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু স্ত্রীজাতির সহিত তর্ক করা মূর্খের কাজ এই মহা জ্ঞান. অবনীশের ছিল। সে শুধু বলিল, বেশত, যাওয়া যাবে—কাল কিংবা পরশু, কেমন?

অণিমার মুখের মেঘ কাটিয়া সোণালি রৌদ্র ফুটিয়া উঠিল।

গরুর গাড়ীর মন্থর বুদ্ধিহীন চালনায় অবনীশ অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিল, কিন্তু সেকথা স্ত্রীর কাছে বলিবার মত সাহস তাহার ছিল না। কারণ অণিমা উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে ঠিক তখনই বলিতেছিল, ওগো, ভারী ভালো লাগ্‌ছে গো এম্‌নি ক'রে আসায়! মনে হচ্ছে যেন কোণারকপ্রতিষ্ঠার যুগের মানুষ আমরা—বহু দূরদেশ থেকে আসচি মন্দিরে পূজো দিতে!

একটা বালুর ক্ষেত অতিক্রম করিয়া ঝপাং করিয়া গাড়ীটা একটা নালার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কোন মতে বীভৎস একটা মুখভঙ্গী দমন করিয়া অবনীশ কাতরকণ্ঠে বলিল, সত্যি অনু, কিন্তু পূজোর আগে তপোকষ্টটা কম হচ্ছে না!

অণিমা স্বামীর রসবোধের অভাবে মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, আমি জানি তুমি আমার সাথে কোথাও এসে সুখ পাওনা। তাই যদি মনে ছিল তবে আমায় আগে বল্‌লে না কেন? আমি তাহ'লে কিছুতেই তোমাকে এর মধ্যে টেনে আন্‌তুম না।...আমার অদৃষ্ট!

অদৃষ্ট নামক রহস্যময় দেবতাকে অবনীশ চিরকালই ভয় করে—বিশেষ করিয়া স্ত্রী যখন অদৃষ্টদেবতাকে আহ্বান করে। সে শশব্যস্তে বলিল, না অনু, তেমন কিছুই কষ্ট হচ্ছে না আমার—ভারী সুন্দর লাগ্‌ছে বালুর উপর দিয়ে এম্‌নি চলাটা···

বলিতেই গরুর গাড়ীর বিশ্রী একটা ঝাঁকুনিতে অবনীশ হুড়মুড় করিয়া অণিমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া অবনীশ বলিল, ভারী সুন্দর দুল্‌ছে কিন্তু, না অনু?

দুপুরের খররৌদ্রে তাহারা কোণারকের মন্দিরের সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইল। রসায়নের ছাত্র অবনীশও স্বীকার করিতে বাধ্য হইল মন্দিরটা একটা দেখিবার মত জিনিষ বটে।

অণিমা তখন অক্রান্ত আনন্দের প্রবাহে মন্দিরের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মন্দিরের গাইড্ তাহার বিচিত্র ভঙ্গীতে মন্দিরের ইতিহাস, খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির ব্যাখ্যা প্রভৃতি বলিয়া যাইতেছিল আর অণিমা গোগ্রাসে সে সব কথা গিলিতেছিল। মাঝে মাঝে সে বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া অবনীশের দৃষ্টি মন্দির গাত্রাস্থিত ছবিগুলির দিকে আকর্ষণ করিতেছিল।

অবনীশের নেহাৎ খারাপ লাগিতেছিল না।...কলেজের ল্যাবোরেটারীতে সে যখন ডিমনষ্ট্রেশন্ দেখাইতে সুরু করিত তখন প্রায়ই কোন কুগ্রহের ফলে এক্সপেরিমেণ্টগুলি ব্যর্থ হইয়া যাইত এবং তাহা দেখিয়া গ্রাম হইতে নবাগত বিজ্ঞানের প্রথম বর্ষের ছেলের দলও হাসি সম্বরণ করিতে পারিত না। আজ এখানে ডিমনষ্ট্রেশনের বালাই নাই, শুধু দুই চোখ ভরিয়া দেখিবার ও অন্তর দিয়া অনুভব করিবার আকুল আহ্বান। পাথরের মৌন মূর্ত্তিগুলি তাহার রসবোধের অভাব দেখিয়া হাসিবে না নিশ্চয়ই।

অণিমার সাহস দেখিয়া অবনীশের তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল। অবলীলাক্রমে সে গাইডের পিছনে পিছনে সঙ্কীর্ণ বিসর্পিল পথ দিয়া মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিতেছিল। রৌদ্রের তাপে তাহার যেন একটুও শান্তিবোধ হইতেছিল না। অবনীশ চুপ করিয়া অণিমার পেছনে আসিতেছিল।

হঠাৎ অবনীশের চোখ পড়িল নীচের দিকে। কী ভীষণ উঁচু মন্দির—একবারটি যদি মন্দিরের গায়ের পথ হইতে পিছলাইয়া তাহারা পড়িয়া যায় তবে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে নিমেষমাত্রও বোধ হয় লাগিবে না।...অবনীশ ভয়ানক উৎফুল্ল ভাবে নীচের মাটি হইতে তাহারা যেখানে আছে সেখানকার উচ্চতার একটা ধারণা করিতে চেষ্টা করিতেছিল যদি নেহাৎ পড়িয়াই যায় তাহা হইলে বালুর প্রশস্ত ক্ষেত্রের উপর পৌছিতে কয় সেকেণ্ড লাগিতে পারে!

অণিমা ক্রমাগত কেবল কথাই বলিয়া যাইতেছিল। গাইড্টি অণিমার ব্যবহারে এবং তাহার প্রশ্নের তীক্ষ্ণতায় যেন তাহার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিতেছিল, মা, আর সে দিনও নেই সে লোকও নেই।... একদিন এখান দিয়েই কত নৌকা জাহাজ চলে যেত, তার যাত্রীসব নাবত এই ঘাটেই, দেবতাকে দর্শন করতে, দেবতার সাম্‌নে নিজের সুখ দুঃখ, কামনাবেদনা নিবেদন করতে।...আজ সে সব দিন কোথায় চলে গেছে!

অশ্রুসজল চোখে অণিমা অবনীশের দিকে তাকাইয়া বলিল, ওগো, তুমি এসে আমায় একটুখানি ধরোনা...আমার ভারী বিশ্রী লাগছে এসব ভাবতে।

অবনীশ অবাক্। ইহার মধ্যে কাঁদিবার কি আছে তাহা তাহার মাথায় মোটেই ঢুকিতেছিলনা। রোষকষায়িত নেত্রে গাইডটার দিকে তাকাইয়া সে অণিমার হাত ধরিল।

মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। একটু পরেই অণিমা অবনীশের মুঠি হইতে নিজের হাতটি মুক্ত করিয়া উল্লাসসূচক একটা চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল সুন্দর একটি মূর্ত্তির কাছে। নিজের সমস্ত অঙ্গ দিয়া সেটি জড়াইয়া ধরিয়া সে ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

অবনীশের কাছে এসমস্তই প্রহেলিকাময় বোধ হইতেছিল অথচ রোরুদ্যমানা স্ত্রীর উচ্ছ্বাস প্রকাশে বাধা দিবার মত সাহস তাহার হইতেছিলনা। নিতান্ত হতভম্বের মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়া সে স্ত্রীর গায়ে হাতটা রাখিয়া বলিল, ওগো, কী পাগলামি করছ, চলো···

গাইডটা বলিতেছিল, মার খুব দুঃখ হয়েছে সেকালের কথা ভেবে, তাই কাঁদছেন···

অবনীশের ইচ্ছা করিতেছিল গাইডটার গালে ঠাস্ করিয়া একটা চড় বসাইয়া দেয়, কিন্তু মাটি হইতে অন্ততঃ দেড়শ ফুট উঁচুতে একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, এই ভাবিয়া সে কোনক্রমে নিজের হাতটাকে নিবৃত্ত করিল।

অণিমা আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে মূর্ত্তিটাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিল।

একটু দূরে একটা মোড় ঘুরিতে যাইবে এমন সময় হঠাৎ পা ফস্কাইয়া অণিমা পড়িয়া গেল। আরেকটু হইলেই বোধহয় সে নীচে গড়াইয়া পড়িয়া যাইত। অবনীশ শশব্যস্তে অগ্রসর

হইয়া গেল অণিমাকে ধরিতে, কিন্তু দেখিল তাহার আগেই গাইডটা হাত দিয়া অণিমাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। অণিমা কাতর শব্দ করিয়া উঠিল।

অবনীশ উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিল, বড্ড লেগেছে কি অণু?

অণিমা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না, কিন্তু বড্ড ভয় হয়েছিল···

গাইডটা দন্তবিকশিত করিয়া অবনীশের দিকে তাকাইয়া বলিল, মা খুব ভালো লোক কিন্তু, কষ্ট পেলেও কিছু বলেন না!

অবনীশের একবার মনে হইল গাইডটার চুলের মুঠি ধরিয়া ঝাঁকাইয়া তাহাকে জানাইয়া দেয় যে মার স্বভাবের খবর সে তাহার চেয়ে অনেক বেশী জানে। কিন্তু দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

নীচে নামিয়া আসিয়া অণিমা বলিল, ওগো, আমার যে এখান থেকে কিছুতেই যেতে ইচ্ছে করছেনা! কেবলই মনে হচ্ছে যদি যুগযুগান্তর ধরে এই পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে পার্‌তুম···

অবনীশ কি বলিবে বুঝিতে পারিতেছিলনা।

গাইডটা বলিল, এদিকে মিউজিয়ম আছে, মা, এখানে অনেক মূর্ত্তি আছে—নবগ্রহ, সূর্য্যদেব, বৃহস্পতি, আরও অনেক দেবতা...

সোৎসাহে স্বামীর দিকে তাকাইয়া অণিমা বলিল, আমার কিছুতেই আশ মিটছেনা যে!···আচ্ছা এখানে ছোট খাট একখানা বাড়ী কিনে থাকা যায়না গো? সত্যি বলোনা!

অবশেষে পুরী বেড়াইতে আসিবার ফল হইবে এই! কোথায় কলিকাতার প্রোফেসারি, আর কোথায় ধূলাচ্ছন্ন প্রান্তরে প্রাণহীন প্রস্তরস্তূপের মধ্যে নীড় বাঁধা!...অবনীশ বিস্ফারিতলোচনে স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

অণিমা স্বামীর মনের অবস্থা খানিকটা বুঝিয়া সান্ত্বনা-সূচক কণ্ঠে বলিল, নাঃ, তুমি ভয়ানক ছেলেমানুষ! আমি কি বল্‌ছি যে যাবজ্জীবন এখানে থাক্‌তে হবে? আমি বল্‌ছি পুরীতে বসে না থেকে এখানে কয়দিন থাকা যায় না?

অবনীশকে পরিত্রাণ করিল গাইডটা। সে বলিল, না মা, এখানে থাক্‌বেন কি ক'রে? এখানে না আছে ঘর, না আছে জনমানব। তারপর এখানে খাবেন কি, শোবেন কিসের উপর?

সত্যকথা। অণিমা চুপ করিল। অবনীশ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মিউজিয়ম হইতে বাহির হইতেই কোথা হইতে এক মালী আসিয়া অবনীশ ও অণিমার গলায় দুই ছড়া গাঁদা ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া প্রায় আভূমি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। অবনীশ বিস্মিতভাবে বলিল, এ আবার কি?

অণিমা হাসিয়া বলিল, ওগো, বুঝছনা? কিছু বক্‌শিশ চায়।

মালী একগাল হাসিয়া বলিল, আপনি রাজা মানুষ, বাবু, আপনি রাণীমা···গরীব মালীকে প্রতিপালন করতে আজ্ঞা হয়।

অবনীশ হাসিবে কি রাগ করিবে স্থির করিতে পারিতে-ছিল না। অবশেষে সে ব্যাগ খুলিয়া একটা সিকি বাহির করিয়া মালীর হাতে গুঁজিয়া দিল। মালী খুসী হইয়া আবার সুদীর্ঘ একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

মন্দির প্রাঙ্গণের একপাশেই সুন্দর একটী ঝাউবন। বালুর উঁচুনীচু স্তূপ এবং ছোটবড় পাথরের সমাবেশ জায়গাটাকে রীতিমত একটা প্রেমকানন করিয়া তুলিয়াছিল। আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে অণিমা সেদিকে ছুটিয়া গেল।

গাইড তখনও অবনীশের সাথে। অবনীশের দিকে তাকাইয়া বলিল, মা কিন্তু খুব খুসী হয়েছেন মন্দির দেখে।

দুইটা ঘণ্টা দুপুরের খররৌদ্রে তপ্তবালুকা ও প্রস্তরের উপর ঘুরিয়া অবনীশ ভয়ানকভাবে ক্লান্ত বোধ করিতেছিল, সে গাইডএর কথার কোন জবাব দিলনা। নিঃশব্দে সে অণিমা যেদিকে চলিয়া গিয়াছিল সেদিকে হাঁটিয়া চলিল।

খানিকদূর গিয়া দেখে পাথরের স্তূপের মধ্যে অণিমা কি খুঁজিতেছে। অবনীশ জানে অণিমার মত অসতর্ক ও চঞ্চল মেয়ে দুনিয়ায় বোধহয় আর মিলেনা। সে ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, কি খুঁজছ অণু? কিছু হারালে নাকি?

—না গো না, আমি পাথর খুঁজছি।

—পাথর?

—হ্যাঁ, পাথর। একটা পাথর আমি বাড়ীতে নিয়ে যাবো।

এ কি অসঙ্গত আবদার! এ যে রীতিমত সর্ব্বভুক্ পেটুকতা! অবনীশ প্রমাদ গণিল।

অণিমা পাথরের গাদা হাতড়াইতেছিল। একটা পাথর বালুর মধ্য হইতে তুলিয়া আনে, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, আবার সরাইয়া রাখে। আবার আরেকটা পাথর তুলিয়া আনিয়া বিশ্লেষণ করে।...এইভাবে অন্ততঃ প'চিশ ত্রিশটা পাথর অণিমার হাতের স্পর্শলাভ করিল।

অবনীশ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গাইডটা অদূরে বোধ হয় অণিমার কাণ্ড দেখিতেছিল। অণিমা বলিল, ওগো, আমায় সাহায্য ক'রো না...

স্ত্রী সাহায্য চাহিতেছে! অবনীশ কাছে গিয়া বলিল, কি করতে হবে অনু?

—আমায় ভালো একটা পাথর খুঁজে দাও না গো, খুব সুন্দর খোদাই করা কারুকার্য্য থাকা চাই কিন্তু।

অবনীশ সন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে অনেক পরিশ্রমের পর ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে একটা পাথর বাহির করিয়া অবনীশ স্ত্রীর সাম্‌নে ধরিল।

অণিমা খানিকক্ষণ সেটা বিশ্লেষণ করিয়া আনন্দে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তুমি সত্যি একজন জহুরী গো···কি সুন্দর পাথরটা তুমি খুঁজে বের করেছ! এটা আমাদের গাড়ীতে তুল্‌তে হবে।

অবনীশ এবার বুকে সাহস আনিয়া প্রশ্ন করিল, এটা দিয়ে কি হবে অনু?

—আমাদের বস্‌বার ঘরে এটা রাখব।...কোণারকের শিল্পীদের হাতে গড়া জিনিষটি থাক্‌বে আমার এস্রাজ এবং সেতারের মাঝখানে। আমি যখন গান গাইব, বাজনা বাজাব, তখন আমার মন চলে যাবে সেই কোন্ সুদূর যুগে যখন শিল্পীর হাতের প্রত্যেকটি আঁচড় থেকে বেরুত রূপরেখা!...ওগো, আমি যে আর ভাবতে পারছিনা। বলিয়া অণিমা অবণীশকে আরও নিবিড়, আরও দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিল।

অবনীশ সত্যই কথা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কবিতাময়ী স্ত্রীকে সে সত্যই খাণিকটা সম্ভ্রম করিয়া চলিত, কোন নিরক্ষর লোক নিজের বুদ্ধির অতীত পুঁথির জ্ঞানসম্ভার দেখিয়া যেমন করে।...কিন্তু কবিতা যে অবশেষে তেমন অদ্ভুত বাস্তব ব্যবহারে পরিণতি নিবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

স্বামীকে নির্ব্বাক দেখিয়া অণিমা প্রশ্ন করিল, তোমার ভাবতে একটুও খুসী লাগছে না গো? আমার ঘরে আস্‌বেন কোণারকের ঋষিগণ, তাঁদের পদরেণুতে আমার ঘরটা হয়ে উঠবে পূত, শুভ্র···একথা ভাবতেও যে আমি শিউরে উঠি!

একবার অবনীশের মনে হইল তাহার তীব্র বিতৃষ্ণাটা সে খোলাখুলি অণিমাকে জানাইয়া দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই অণিমার চোখের আলো, ঠোঁটের হাসি এবং আনন্দ উৎসাহে স্নাত মুখখানার দিকে তাকাইয়া সে চুপ করিয়া গেল। মুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিল, নিশ্চয়ই অনু···এমন জিনিষ পেলে আনন্দ না হয়ে কি পারে?

সমস্যা হইল পাথরটাকে কি করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া নেওয়া যায়। অণিমা বলিল, মোটেই ভারী নয়, আমি নিজেই তুলে নিতে পারব।

বলিয়াই সে দুই হাতে পাথরটা তুলিতে গেল। কিন্তু অসম্ভব—পাথরটা একটু নাড়িয়া উঠিল মাত্র, অণিমা কিছুতেই সেটা হাতে তুলিতে পারিল না। করুণনেত্রে সে অবনীশের দিকে তাকাইল।

অবনীশ এতদিন রসায়নের চর্চ্চাই করিয়া আসিয়াছে—পাথর কেমন করিয়া তুলিতে হয় তাহা সে জানে না। কিন্তু স্ত্রী যে তাহার সাহায্যভিক্ষা করিতেছে! পাঞ্জাবীর আস্তিনটা গুটাইয়া সে পাথরটা তুলিতে গেল।

পাথর ত নয়, যেন বিশমণ ঢালাই লোহা! গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবরে অবনীশ পাথরটা তুলিয়া লইল, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়, হাঁটুর কাছে উঠাইতে না উঠাইতেই পাথরটা হাত হইতে ফস্কাইয়া ধপ করিয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল। চারিদিকের বালুকণা ছিটিয়া আসিয়া অবনীশের মুখ চোখ ভরিয়া দিল।

গাইডটা এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের কাণ্ড দেখিতেছিল। সে এবার অগ্রসর হইয়া বলিল, বাবুজী, এ আপনাদের কাজ নয়···আমাকে দিন, আমি গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

অণিমা খুসী হইয়া বলিল, তাই তুলে দেওনা, গাইড···

এত কষ্ট ক'রে পেয়েছি, একে এখানে ফেলে যেতে আমার বুকের পাঁজরগুলো ভেঙ্গে যাবে!

গাড়ীর উপর পাথরটা তুলিয়া দিয়া গাইড মস্ত বড় একটা সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল। অবনীশ একটি আধুলী তাহার হাতে দিল।

আধুলীটি পকেটস্থ করিয়া অর্থসূচক চোখে অবনীশের দিকে তাকাইয়া সে বলিল, বাবুজী, কোণারকের মন্দির থেকে পাথর নিয়ে যাচ্ছেন, সরকার বাহাদুরের মানা আছে, তা' আমি কিছু বল্‌বে না, তবে বক্‌শিশ চাই, বাবুজী!

অবনীশ প্রমাদ গণিল। অবশেষে কি কবিতাময়ী স্ত্রীর পাল্লায় পড়িয়া তাহাকে বে-আইনী একটা কাজ করিতে হইবে? যদি তাহার প্রিন্সিপ্যালের কানে একথা পৌঁছায়!...পাথরটা তুলিতে যাইয়া অবনীশ যতটা না ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল এখন তাহার চেয়ে অনেক বেশী ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিল।

অণিমা সমস্ত দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া দিল এক নিমেষে। স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিল, ওগো, ওর হাতে একটা টাকা দিয়ে দাও...এমন পাথর পেয়েছি, এর জন্য আমার গায়ের গয়না বিলিয়ে দিতেও আমার দুঃখ হবেনা।

কি আর করে! রোষে, দুশ্চিন্তায়, দুঃখে ফুলিতে ফুলিতে অবনীশ একটা টাকা বাহির করিয়া গাইডটার হাতের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। লোকটা আবার সেলাম করিয়া মায়ীজির অজস্র প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আবার বালুর উপর দিয়া গরুর গাড়ী চলিতেছে। অবনীশ একেবারে চুপ...সে ভাবিতেছিল এই পাথরটার কথা, তার মত রাজভক্ত প্রজা যে এত বড় একটা বে-আইনী করিয়া ফেলিবে স্ত্রীর উচ্ছ্বাসের বশীভূত হইয়া, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই!

অণিমা স্বামীকে নীরব দেখিয়া প্রশ্ন করিল, ওগো, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

অবনীশ কি বলিবে?—রাগ? না, রাগ সে করে নাই। তবে সে অসন্তুষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই—স্ত্রীর বুদ্ধিহীনতায়, তাহার অদূরদর্শিতায়।...সে কোন জবাব দিলনা।

অণিমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। গরুর গাড়ীর অতি অপ্রসর ছইএর মধ্যে কোনো প্রকারে স্বামীর বুকের কাছে মাথাটা আনিয়া সে বলিল, ওগো, পাথরটা এনেছি বলে যদি তুমি রাগ ক'রে থাক তাহলে বলো, এক্ষুনি ফেলে দিই।

চোখে তার অশ্রুর রেখা। এত আশা-আনন্দে সংগৃহীত পাথরটাই তাহাদের দুঃখের কারণ ভাবিতেও তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

অবনীশ মরিয়া হইয়া ভাবিল, দূর হোক্‌ গে ছাই! নিয়ে যখন এসেছি তখন আর ফেলে দেওয়া যায় না। গরুর গাড়ীর লোক দুটোই বা কি বল্‌বে?

অণিমার মুখখানি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না, অনু, রাগ করিনি, তবে পাথরটা খুব সাবধানে নিয়ে যেতে হবে, বুঝলে ত? অণিমা আশ্বস্ত হইয়া চোখ মুছিল।

গরুর গাড়ী হইতে মোটরে পাথরটা তুলিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ড্রাইভার শুধু বলিয়াছিল, বাবু, কোণারক থেকে পাথর নিয়ে এলেন, একটু সাবধানে রাখবেন।

অবনীশ খুব জোরগলায় জবাব দিয়েছিল, আইনকানুন আমার জানা আছে, তোমাদের ভাবতে হবে না, তোমরা গাড়ী চালাও।

কিন্তু মুস্কিল হইল হোটেলে। হোটেলের কুলী গাড়ীর ভিতর হইতে মালপত্র তুলিতে যাইয়াই অস্ফুট একটা চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গেল ম্যানেজারের কাছে।

ম্যানেজার শশব্যস্তে আসিয়া বলিল, এ কি করেছেন, অবনীশবাবু? কোণারক থেকে পাথর নিয়ে এসেছেন আপনি, অনুমতি পেয়েছেন কি?

অবনীশ রীতিমত ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়াছিল। নূতন রকমের বিপদের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

অণিমা ছিল অবনীশেরই ঠিক পিছনে। সে সম্মুখে আসিয়া বলিল, আপনি চিন্তিত হচ্ছেন কেন, ম্যানেজার বাবু? আমার স্বামী হচ্ছেন প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক। তিনি কালেক্টারের কাছ থেকে আগেই অনুমতি নিয়ে রেখেছেন। দায়িত্ব যদি কিছু থাকে সে আমাদের, আপনার নয়......

ম্যানেজার অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না, না, সেকথা বল্‌ছি না।...তা বেশ ত, সুন্দর জিনিষটি নিয়ে এসেছেন কিন্তু! কোথায় পেলেন বলুন ত?

—পেয়েছি এক বালুর স্তূপে। অনেক কষ্টে একে উদ্ধার করেছি।...কল্‌কাতায় নিয়ে যাব।

চাঞ্চল্য প্রশমিত হইয়া আসিল। কুলী পাথরটা উপরে অবনীশদের শোবার ঘরে তুলিয়া দিল।

অণিমা ফিস্ ফিস্ করিয়া স্বামীকে বলিল, ওগো, কুলীটাকে আটগণ্ডা পয়সা দাও, খুসী হয়ে যাবে।

রাত্রিবেলা অণিমা আর অবনীশের মধ্যে গভীর জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। অণিমা বলিতেছিল, সত্যই পাথরটাকে নিয়ে এসে বুদ্ধিমানের কাজ করিনি'...এখন কি করা যায় ভাবছি।

অবনীশ প্রায় কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, কেন তুমি নিয়ে এলে ?

—বাঃ, তুমি ত আমায় একটুও বারণ করলে না তখন ! আমি কি এসব গোলমালের কথা বুঝি ? আমার বুদ্ধিই বা কতটুকু ?

কি করিয়া অবনীশ বলিবে যে সে অনেক আগেই বারণ করিত, কিন্তু পাছে অণিমার চোখে অশ্রুরধারা বয় এই ভয়েই সে কিছু বলে নাই !

বলিল, যাক্, যা হয়ে গেছে ভেবে কি হবে, এখন এটাকে বিদায় করতে হবে ।

অবনীশ বলিল বটে পাথরটাকে বিদায় করিতে হইবে কিন্তু বিদায় করা ত মুখের কথা নয় ! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক কিছু জল্পনা চলিল, কিন্তু সম্ভাব্য কোন উপায় বাহির হইল না।

অবশেষে অণিমা বলিল, ওগো, এক কাজ করলে হয় না ?

—কি ?

—এই সামনেই ত বিশাল সমুদ্র...এর ভেতরে ফেলে দিলে কোথায় চলে যাবে, আপদ্ বিদায়ও হবে !

আইডিয়াটা খুবই চমৎকার, কিন্তু সমুদ্রের কাছে পাথরটা নিয়া যাইবে কে ? কত কষ্টে যে সে পাথরটা হাঁটু পর্য্যন্ত তুলিয়াছিল তাহা ত সে ভোলে নাই !...তা ছাড়া নিয়া যাইবার সময় যদি হোটেলের চাকর বাকর কেহ দেখে তাহারা ভাবিবে কি ? দন্তপাটি বিকশিত করিয়া তাহারা কি পরস্পরের দিকে তাকাইয়া হাস্যবিনিময় করিবে না ?

কিন্তু পাথরটাকে সরাইতেই হইবে। ঘরে রাখা চলিবেনা, কখন কে আসিয়া অভদ্রভাবে প্রশ্ন করিয়া বসিবে কে জানে ? অবনীশ সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু ঈষৎ হাসি হাসিয়া অর্থসূচক ইঙ্গিতে তাহাকে কেহ পাথরটার কথা জিজ্ঞাসা করিবে তাহা তাহার পক্ষে অসহনীয়।

অণিমা সান্ত্বনা দিয়া বলিল, রাত একটু বেশী হলে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন তুমি আর আমি উঠে আস্তে আস্তে পাথরটা নিয়ে টুপ করে জলে ফেলে আস্ব, কেমন ?

অনন্যোপায় হইয়া তাহারা স্থির করিল ঐ ভাবেই তাহাদের সমস্যার সমাধান করিবে।

কথা ছিল রাত বারোটার পর উভয়ে মিলিয়া সমুদ্রতীরে যাইয়া পাথরটা বিসর্জ্জন দিয়া আসিবে। কিন্তু রাত এগারোটার পরেই কখন যে নিদ্রাদেবীর মোহন অঙ্গুলীস্পর্শে তাহাদের উভয়েরই চোখ জড়াইয়া আসিল তাহা তাহারা নিজেরাই টের পাইল না।

ঘুম ভাঙ্গিল রাত প্রায় একটার সময়। সভয়ে অবনীশ শুনিল, দরজায় কে ধাক্কা মারিতেছে।

শঙ্কায় অবণীশের মুখ শুকাইয়া গেল। স্ত্রীকে ঠেলা দিয়া বলিল, ওগো, শুনছ ?

অণিমা তখন শান্ত সোনালি স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল। স্বামীর আঘাতে উঠিয়া বলিল, কি হয়েছে গো ?

—এত রাতে কে দরজা ঠেল্ছে...পুলিশের লোক নয়ত ? এতক্ষণ পর্য্যন্ত বুকে সাহস টানিয়া আনিয়া অণিমা কোনক্রমে স্বামীকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ঘটনা-সমাবেশের আকস্মিকতায় সেও বিহ্বল হইয়া পড়িল। বলিল, তাই ত, কি করা যায় ?

অবনীশ আরেকটু হইলেই হয় ত দুঃখে অপমানে কাঁদিয়া ফেলিত, কিন্তু উপস্থিত বিপদে ভয়াতুর হইলে চলিবেনা, সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, ঘর থেকে পাথরটা বের করে ফেল্তেই হবে, এক্ষুনি...

দরজায় তখনও ভয়ানকভাবে কড়া নড়িতেছিল। কে যেন ডাকিতেছিল, বাবু...

অবনীশ তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে নামিল। অণিমা তাহার শ্লথ শাড়ীর আঁচলখানা গুটাইয়া নিয়া বলিল, এসো...

অবনীশ ছাদের দরজা খুলিল। অদূরে সমুদ্র-কল্লোল শোনা যাইতেছিল, ঢেউগুলা মাটির বুকে আছড়াইয়া পড়িয়া যেন বলিতেছিল, ওগো, আর যে পারি না, তোমার কোলে

আমাদের নাও, তোমার স্নেহ-শীতল স্পর্শে আমাদের সব বেদনা সব দুঃখ মুছে দাও।...একাদশীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না যেন টুক্‌রা হইয়া আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

অবনীশ ও অণিমা অনেক কষ্টে পাথরটা ছাদের উপরে আনিয়া এককোণে ফেলিয়া রাখিল। তারপর ছাদের দরজা বন্ধ করিয়া অবনীশ পাংশুমুখে ঘরের দরজা—যেখানে করাঘাত হইতেছিল—খুলিল।

ডাকিতেছিল হোটেলের চাকর বিজু। তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম। সে বলিল, বাবু, এতক্ষণ আপনি কি কর্‌ছিলেন? ডেকে ডেকে আমি হয়রাণ হয়ে গেছি!

অবনীশের বুকের উপর হইতে একটা জগদ্দল পাথরের বোঝা নামিয়া গেল। সে টেলিগ্রামখানা খুলিয়া দেখিল তাহার বাবা লিখিয়াছেন তাহাকে সত্বর কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে, বেশী মাহিনায় একটা প্রোফেসারি খালি হইয়াছে, তাহার জন্য উমেদারী করিতে হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে কালবিলম্ব না করিয়া অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

অবনীশ ভাবিয়াছিল এখনই বুঝি দারোগাবাবু আসিয়া তাহার হাতে লৌহকঙ্কণ পরায়! আশু বিপদ্ হইতে মুক্তি পাইয়া সে এত খুসী হইয়া গেল যে তৎক্ষণাৎ ব্যাগ হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বিজুর হাতে দিয়া বলিল, যা, এই বক্‌শিশ নে...

বিজু ত অবাক্। তাহার সতেরো বছরের ভৃত্য-জীবনে এমন অসম্ভাবিত সৌভাগ্য কখনও হয় নাই। সে কি-যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অবনীশ আর কোন কথার অপেক্ষা না রাখিয়া সশব্দে তাহার মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

অণিমা টেলিগ্রামের মর্ম্ম শুনিল। বলিল, ওগো, তাহ'লে কালই কল্‌কাতায় চ'লো, কেমন?

অবনীশ আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হইয়া অণিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, নিশ্চয়ই, আর এক মুহূর্ত্তও দেরী নয়।

—কিন্তু পাথরটা?

সত্যই ত, পাথরটার কি গতি করিবে? এই রাত্রে কি উভয়ে যাইয়া সেটা সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়া আসিবে?

এতক্ষণ উত্তেজনায় অবনীশ লক্ষ্যই করে নাই যে ঘর হইতে ছাদে পাথরটা সরাইতে গিয়া তাহার একটা আঙ্গুল ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি এখন সেদিকে পড়িল—রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য সে আঙ্গুলটা মুখে পুরিল।

অণিমা উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিল, ওকি?

—কিছু নয়, একটুখানি আঁচড় লেগেছে, সেরে যাবে'খন।

অনুতপ্তস্বরে অণিমা বলিল, ওগো আমি যে ভয়ানক অপরাধী বোধ কর্‌ছি আজ। আমারই জন্যে তোমার এই দুর্ভোগ...আমি যদি পাথরটা তোমাকে আন্‌তে না বল্‌তুম!

অবনীশ ভাবিল বলে, গতস্য শোচনা নাস্তি। কিন্তু উপস্থিত মুহূর্ত্তে সমস্যা যে আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। মাত্র তাহারা দুইজনের পক্ষে পাথরটাকে ছাদ হইতে ঘরে এবং ঘর হইতে হোটেলের বাহিরে সমুদ্রে নিয়া ফেলা যে নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয় তাহা সে বেশ বুঝিতেছিল।

অণিমা বলিল, ওগো, নিয়েই চলনা ওটাকে কল্‌কাতায়...

অবনীশ শিহরিয়া উঠিল। অসম্ভব.. দুষ্টগ্রহকে নিজের গৃহপরিমণ্ডল হইতে যত শীঘ্র বিদায় করিয়া দেওয়া যায় ততই সে স্বস্তিবোধ করিবে। কলিকাতায় রাখা? কখন কে দেখিয়া ফেলে তাহা বলা যায়? আর অণিমা ত জানেনা সংসার কতখানি বক্র এবং কুটিল—হয় ত বা তাহার উপর-ওয়ালার কাণে কোন্‌দিন কে এই নিদারুণ আইনদ্রোহিতার কথা পৌছাইয়া দিবে! তখন?

বলিল, না, না, সে হয় না, অনু। পাথরটা হয়েছে আমাদের শনি, ওকে মানে মানে সরাতেই হবে যে!

আবার জল্পনা সুরু হইল। অবশেষে অবনীশ স্থির করিল একটা কাঠের বাক্সে ওটাকে প্যাক্ করিয়া গাড়ীতে নিয়া যাইবে এবং ট্রেণের বাথরুমে নামগোত্রহীন বাক্সটাকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবে।

খুব সাবধানে বাথ্‌রুমের ভিতরে বাক্সটা ফেলিয়া দিয়া সেকেণ্ডক্লাসের কামরা হইতে অবনীশ ও অণিমা যখন হাওড়া ষ্টেশনে নামিল তখন অণিমা গাড়ীর দিকে শেষবারের মত কাতরনেত্রে তাকাইয়া উদ্গত অশ্রুরাশি তাহার আঁচলের কোণে মুছিল।

ষ্টেশনে ফিরতিপথের যাত্রীর ভীড় সেদিন ছিল ভয়ানক।

অনেক কষ্টে সুটকেশ-তোরঙ্গবাহী কুলীর সাথে ষ্টেশনের বাহির হইয়া একটা ট্যাক্সির মধ্যে অবনীশ ও অণিমা যখন উঠিল তখন অবনীশ মুক্তির দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক্, বাঁচা গেছে।...ট্যাক্সি, চলো ভবানীপুর...

শিখ ড্রাইভার গাড়ীর ষ্টার্ট দিবে এমন সময় একটা কুলি চীৎকার করিয়া বলিল, বাবুজী।

বিস্মিত ভাবে অবনীশ সেদিকে তাকাইল। বিস্ফারিত-লোচনে সে দেখিল, ষ্টেশনের নীলকুর্ত্তিপরা একটা কুলী সেই কাঠের বাক্সটা নিয়া ছুটিয়া আসিতেছে তাহারই দিকে।

হাঁফাইতে হাঁফাইতে কুলী বাক্সটা ট্যাক্সির উপর তুলিয়া দিয়া বলিল, আপনার বাক্সটা আপনি ভুলে যাচ্ছিলেন, বাবুজী, ভাগ্যিস্ আমি দেখতে পেলুম একটু পরেই! যাক্ আপনার গাড়ীতে যে তুলে দিতে পেরিছি আমার বহুৎ ভাগ্যি...অনেক বক্‌শিস্ আশা করি, বাবুজী ..

ক্লান্ত অবসন্ন অবনীশ সাম্‌নে মহাকালের বিরাট নৃত্যচ্ছন্দ শুনিতে পাইতেছিল। তাহার অন্তরাকাশ উন্মথিত হইয়া উঠিল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস।

অনিমার দিকে তাকাইয়া বলিল, নিয়তির শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যে কতখানি বাতুলতা তা' আজ বুঝলুম গো।...কুলীটা দাঁড়িয়ে আছে, অনু, আমার কাছে খুচরো পয়সা আর নেই, তুমি ওকে কিছু দিয়ে দাও...

শ্রীনবগোপাল দাস

অমৃত-দরশে

শ্রীঅনিলা দেবী

পরিদ্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়ম্
উপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।
—বেদ।

নিখিল দ্যুলোক ভূলোক আজিকে
ভ্রমিয়া হাস্যমুখে,
দাঁড়ানু আসিয়া প্রথমজাত-সে
অমৃতের সম্মুখে!

আবিঃ

শ্রীঅনিলা দেবী

আবির্বৈ নাম দেবতর্তে নাস্তে পরীবৃতা
তস্যারূপেনেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ।
—বেদ।

দেবতা সে আবিঃ—ছড়ায়ে তাহার
পড়েছে রূপের আলা,
রূপের আলোয় সবুজ বৃক্ষ
পরি' সবুজের মালা।

৪

এখানকার কর্ম্মজীবন অপূর্ব্ব, অসাধারণ এবং বিস্ময়কর। এ রাজ্যের কর্ম্মরীতি বুঝিতে গেলে প্রথমে স্থূল-জগতের কর্ম্মধারার সঙ্গে আকাশ-তরঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা জানিতে হয়। তার আসল ব্যাপার এই যে, যা কিছু কার্য্য ধরাতলের নানাস্থানে জীবরাজ্যের মধ্যে ঘটিতেছে, নানা অবস্থার মধ্যে নানা লোক-সমাজের মধ্যে অবিরাম অনুষ্ঠিত হইতেছে, উহার সকল অংশই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অর্থাৎ আকাশে তরঙ্গ তুলিতেছে, কিছুই বাদ যাইতেছে না। শুধু শব্দ নয়, প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গে যে তরঙ্গ উঠিতেছে, সেই তরঙ্গের প্রভাব সূক্ষ্মরাজ্যে এখানকার অন্তরীক্ষে খুব বেশী। সাধারণভাবে স্থূল বুদ্ধিতে ধরিবার যো নাই—এ সকল কি ভাবে সম্ভব হইতেছে! আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে যদি আকাশ-তরঙ্গের রূপ দেখা যাইত, তাহা হইলে যে অদ্ভুত ছবি নয়নগোচর হইত, তাহা দেখিয়া মানুষের জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যাইত। সজীব তরঙ্গের রেখায় রেখায় আকাশের সর্ব্বস্থান পরিপূর্ণ। এই বিশাল আকাশ-মহাসমুদ্রে যেন তিলমাত্র স্থান বাদ নাই; অথচ প্রত্যেকটি পৃথক্, কোনটির সঙ্গে কোনটি মিশিয়া যাইতেছে না, অবিরাম এই তরঙ্গেরই খেলা চলিতেছে।

শব্দটা স্থূল, তাহার তরঙ্গও অপেক্ষাকৃত স্থূল, এখনকার দিনে যন্ত্রের সাহায্যে ধরা যায়; কিন্তু চিন্তা অথবা ভাব-বস্তু সূক্ষ্ম, উহা যন্ত্রের মধ্য দিয়া ধরিবার শক্তি চিরদিনই অভাব থাকিবে। কারণ ভাব বা চিন্তাপ্রবাহ জড়ধর্ম্মী নয়; তাহাকে ধরিতে চিৎসত্তা ব্যতীত অপর কাহারও সাধ্য নাই, সম্ভাবনা নাই। জীবরাজ্যে এই যে অনুসন্ধিৎসা, যাহাকে আমরা চিন্তা নামে অভিহিত করি, সেই চিন্তাধারার মধ্যেও বিশেষ তারতম্য আছে। বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষীণ চিন্তাপ্রসূত তরঙ্গ বা স্পন্দন ক্ষীণ হইয়া থাকে, উহা বহু দূর প্রবলভাবে প্রসারিত হইতে পায় না। আবার তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন প্রবল চিন্তাধারা প্রবল তরঙ্গ উৎপন্ন করে এবং বহুদূর প্রসারিত হইয়া পড়ে। চিন্তা ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত দুই ভাবেই চলে; এখন ব্যক্তিগত চিন্তা বা ভাবধারার কথাই আমাদের আলোচ্য। তারপর সমষ্টির কথা।

মানুষের জাগ্রত অবস্থায় দুইটি কাজ আছে—এক হাত, পা প্রভৃতি কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া কাজ, আর চিন্তা। আবার চিন্তা করিতে করিতেও কর্ম্ম চলে। আসলে মানুষের চিন্তা ও কর্ম্ম, এই দুইটির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। কর্ম্মের পূর্ব্বে চিন্তা আছে; কাজেই প্রত্যেক কর্ম্মেই আকাশে স্পষ্ট হিল্লোল তুলিয়া বায়ুমণ্ডল আলোড়িত করিতেছে। বিক্ষিপ্ত না হইলে তরঙ্গের প্রবাহ স্পষ্ট হয়। একটি ভাব বা চিন্তার ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে চিত্তক্ষেত্রে তরঙ্গ তুলিতে না তুলিতেই আর একটি চিন্তার সূত্র আসিয়া আকাশে অসম্পূর্ণ এক প্রবাহ সৃষ্টি করিল। ইহাই হইল বিক্ষেপ। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন, সুস্থ যে চিত, তাহাই সম্পূর্ণ ধারায় প্রবাহ সৃষ্টি করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র; কিন্তু মানুষের বিপদ্ এবং প্রাণ-ভয় সর্ব্বাপেক্ষা গভীর এবং ঘন তরঙ্গ তুলিয়া আকাশমণ্ডল আলোড়িত করিতে পারে। বিপদ্ এবং ভয়ের তুল্য এমন শক্তিশালী তরঙ্গ তুলিতে ব্যবহারিক জগতে আর কিছু দেখা যায় না।

তারপর দ্বিতীয় কথা এই, যে এখানকার শরীর এমন সূক্ষ্ম, এমন অপূর্ব্ব উপাদানে, আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত, যে জীব-জগতের প্রত্যেক স্পন্দনের তরঙ্গে সাড়া দেয়। যত কিছু ঘটনা, যত কিছু চিন্তা এবং কর্ম্মব্যাপার, ভিতরেই হোক বা

বাহিরেই হোক, এ রাজ্যের কিছুই অগোচর থাকে না। ধরাতলবাসী মানব-মনের অন্তরতম প্রদেশ হইতে সূক্ষ্মভাবে কোনও চিন্তার স্পষ্ট অভিব্যক্তি মাত্রেই এখানে তাহার সাড়া পৌঁছায়। এখানকার সকলেই অন্তর্য্যামী, তাহা হইতেই এখানকার কর্ম্মপ্রেরণা আসে এবং কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে সহায়তা করে। সংক্ষেপে এটুকু জানিয়া রাখা ভাল, যে এই সকল অব্যক্ত ক্রিয়াশক্তির মূল হইল আদিত্য। এই সৌর-দেবতার কিরণরশ্মি ধরিয়াই এখানকার জীব-কোটী, শুধু এখানকার কেন সমগ্র সৌরজগতের অধিবাসী জীবসমষ্টির প্রাণশক্তি, চিন্তা, কর্ম্ম, জ্ঞান, সিদ্ধান্ত, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ নির্ব্বিশেষে যাহা কিছু হইতে পারে, তাহা এই আকাশ-তরঙ্গ অবলম্বন করিয়াই অবিরাম প্রেরণা দিতেছে, কখনও ক্ষণেকের জন্যও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না।

ইহার পর প্রকৃতির সহজ নিয়মের বিষয় আর একটু জানিবার কথা আছে। আমাদের এই জীব-জগতে দুইটি শক্তির ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে দেখা যায়; তাহা প্রত্যক্ষের মতই স্পষ্ট—আকুঞ্চন ও প্রসারণ নামেই তাহাদের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি। এই দুইটি শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কাণ্ড অবিরাম চলিতেছে। ব্যষ্টিগত জীব-প্রকৃতি ও সমষ্টিগত জীব-প্রকৃতি এই দুইটি ক্রিয়াশক্তির প্রত্যক্ষ ফল। আকুঞ্চনে জীব কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়; কেন্দ্র হইল চৈতন্য বা আত্মা, আর প্রসারণে কেন্দ্র হইতে দূরে প্রসারিত হয়। ইহার প্রত্যক্ষ ক্রিয়াফল যাহা আমরা সহজ বুদ্ধির সাহায্যে ধরিতে পারি তাহারই আকুঞ্চনে অর্থাৎ কেন্দ্রাভিমুখী গতির ফলে তত্ত্বজ্ঞানের অনুভূতি, নিষ্ঠা, যোগ, গভীর তন্ময়তা এবং মৃত্যু; আর প্রসারণের ফলে অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে বহির্গতির ফলে কর্ম্মপ্রবৃত্তি, ভোগবিলাস, আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ অধিকার এবং জীবন।

এখন ইহার মধ্যে এইটুকু বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার আছে যে যখনই জীবের চৈতন্যশক্তি কেন্দ্র হইতে প্রসারিত হইতেছে তখন কেন্দ্র হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে না, কেন্দ্রের সঙ্গে তাহার সূক্ষ্ম যোগ থাকিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবেই প্রসারিত হইতেছে;—আবার যখন আকুঞ্চিত হইতেছে তখন তাহার প্রসারের সীমা হইতে বিস্তৃতির অনুভব অচ্ছেদ্যরূপে লইয়াই ফিরিতেছে তাহাই আমাদের জীবন।

এই শক্তির ক্রিয়া অবিরাম জগৎ জুড়িয়া অবাধ চলিতেছে, কোথাও ইহার অভাব নাই; কাজেই সৃষ্টির অদ্ভুত কৌশলেই সৃষ্টিকে বাঁচাইবার উপায় ইহার মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে, যাহা বাহিরে কোনও সাহায্যের অপেক্ষা রাখিতেছে না।

এই অপূর্ব্ব লোকের অধিবাসী—দিব্যদেহধারিগণের এসকল অনুভব আমাদের পৃথিবীর জীবগণের শ্বাস প্রশ্বাসের মতই সহজ এবং স্বভাবগত। সেই কারণে তাঁহাদের কর্ম্ম, সর্ব্বক্ষেত্রেই কল্যাণকর, শুভপরিণামশীল এবং অশেষ আনন্দ উদ্দীপক। তাঁহাদের উদ্দিষ্ট সেই কল্যাণ জগতের চক্ষে বিরুদ্ধভাবের কিম্বা আরও কত কিছুই মনে হইতে পারে। এই দ্বন্দ্বময়জীবন মনুষ্যসমাজের বিচারের কথায় আর কাজ নাই, এইটুকু কেবল পুনরুক্তি করিয়া পাঠকের স্মরণে রাখিবার সাহায্য করিতেছি, যে এ লোকের, এই আনন্দময় কর্ম্মরাজ্যের কেন্দ্রস্থ দেবতা, যাঁহার প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশই এখানকার প্রেরণা, তিনি হইলেন আদিত্য;—যাঁহার অধিকারে কোনও দিক্ দিয়াই অমঙ্গল বলিয়া কিছু কল্পনার কল্পনাও এখানে অসম্ভব।

অবশ্য এই সৌরজগতের সকল গ্রহনক্ষত্রের কেন্দ্র হইল আদিত্য; সকল লোকেরই কর্ম্মশক্তি এই আদিত্যকেন্দ্র হইতেই নিরন্তর সঞ্চারিত হইতেছে—তবে এ লোকের কথা এত বিশেষ করিয়া বলিবার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য আছে, তাহা বলিতেছি। এই পৃথিবীর কথাই ধরা যাক্, যেহেতু আমাদের অন্যে অধিকার নাই। এই ধরণীর মানুষসমাজই প্রাণীজগতে শ্রেষ্ঠ। এই মানুষসমাজের মধ্যে নানা স্তরের মানুষ ত আছে, তাহার মধ্যে কত অল্পসংখ্যক মানুষ সূর্য্য হইতে স্থূলভাবে যেটুকু উপকার সাধারণে পায়, তাহার অতিরিক্ত কিছু ভাবিতে পারে—বোধহয় সংখ্যার হিসাব করিলে মনটি আমাদের ছোট হইয়া যাইতে বাধ্য।

এখানকার লোকে, দিব্যদেহধারিগণের সূর্য্যের সঙ্গে সম্বন্ধ এতটা প্রত্যক্ষ এবং সহজ অনুভূতির বিষয়, যে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষরাজ্যের সঙ্গে তার তুলনাই হইতে পারে না—পূর্ব্বেই ইহা আভাষে কিছু বলিয়াছি। ভূমণ্ডলের মানুষ-সমাজের যত কিছু উন্নতি হউক না কেন, বিশ্ব-

শক্তির কেন্দ্র বলিয়া আদিত্যের কোন অনুভূতি সে মানুষ-সমাজের নাই, তাহা আমরা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারি; অথচ যত কিছু কল্যাণ, যত কিছু সুখ সুবিধা সূর্য্য হইতে পাওয়া যায় তাহা জগদ্বাসী স্বভাবগত আত্মীয় সম্পর্কে এবং অনায়াস-ক্রমেই পাইয়া থাকে এবং তাহাতে নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। তবে এক শ্রেণীর অতীব অল্পসংখ্যক মানুষ আছেন, ভারতীয় মতে যাঁহারা জড়বিজ্ঞানবিদ্, পাশ্চাত্য-ভাষায় সায়ান্টিষ্ট, বঙ্গানুবাদে বৈজ্ঞানিক নামে প্রচলিত, সেই ক্ষুদ্রতম অনুসন্ধিৎসু অধ্যবসায়শীল সমাজ আদিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া থাকেন, ইহা সত্য। কিন্তু এই পাশ্চাত্যজাতীয় মানুষে এখনকার জগতে শ্রেষ্ঠ এবং ভারতের আদর্শ হইলেও জড়ব্যবসায়ী অর্থাৎ বিরাট প্রকৃতির অধিকার মাত্র জড়রাজ্যের একান্ত অনুরক্ত এবং তাহার উপাসনায়ই নিমজ্জমান বলিয়া স্বভাবতই স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন। সেই কারণেই দূরবীক্ষণের সাহায্যে আদিত্যের স্থূল প্রকাশ লইয়াই ব্যস্ত। অন্য সময় সূর্য্যের দিকে টেলিস্কোপ ফিরানো একেবারেই অসম্ভব, কাজেই গ্রহণকালীন কেন্দ্রস্থ নিস্তেজ ছায়ায় সূর্য্যের মণ্ডলপ্রান্তে জ্যোতিঃ'র মধ্যে বিশেষভাবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আবিষ্কারেই তাঁহাদের সূর্য্যতত্ত্ব-সংগ্রহের চেষ্টা—যেহেতু অন্য উপায় সে রাজ্যে অনাবিষ্কৃত। তবে অধুনা সূর্য্যের রোগ আরোগ্যকারী শক্তির সহিত পরিচিত এমন কেহ কেহ আছেন দেখা যায়। সভ্য সমাজের অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই এ তত্ত্ব বিদিত।

তারপর এদিকে ভারতবাসী-সাধারণের কথা এখনকার দিনে পাশ্চাত্যের একান্ত অনুকরণে সঞ্জীবিত হইলেও তাহাদের মধ্যে প্রাচীন সনাতনপন্থী কেহ কেহ সূর্য্যোপাসনা করেন। আদিত্য উপাসনায় মন্ত্রজপ, স্তোত্রপাঠাদি নিয়ম তাঁদের মধ্যে বলবৎ থাকিলেও, আসলে সূর্য্যসম্বন্ধে স্বার্থপ্রণোদিত ভক্তি-মূলক একটি ভাব ব্যতীত মহান্ সত্যের প্রতি লক্ষ্য এতই অস্পষ্ট, যে তাহার প্রভাব নিকটস্থ কাহারও কোনও কাজে আসে না, তাহা এতটা প্রাণহীন। সুতরাং নবীন সভ্যতা-গর্ব্বিত পাশ্চাত্যই হোক, এবং প্রাচীন সভ্যতাবর্জ্জিত সনাতন ভারতবাসীই হোক, আদিত্য সম্বন্ধে উভয়েই সমান-ফলভাগী। কারণ উভয়পক্ষেই যথার্থমার্গে তত্ত্বানুসন্ধানে ঐকান্তিকতার অভাব সুস্পষ্ট। বিরাট জনসমষ্টির কথায় কাজ নাই। কিন্তু এই দিব্যরাজ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে আদিত্য-দেব-তত্ত্ব প্রাণে প্রাণে ওতঃপ্রোতঃ বর্ত্তমান থাকে, যাহার কখনও অন্যথা হয় না এবং হইবার নয়। ইহাতেই তাঁহারা মহাশক্তিমান্। আসলে এখানকার সকলেই যথার্থ আদিত্য-তত্ত্বে সঞ্জীবিত এবং তাহাতেই সর্ব্বক্ষণ অনুপ্রাণিত। একথা বলিলে কিছুমাত্র ভুল হয় না, যে পৃথিবীর মানুষ সূর্য্য সম্বন্ধে কতকাংশ কল্যাণভোগী হইলেও, অজ্ঞান এবং শক্তির অপব্যবহার হেতু নিয়ত দ্বন্দ্বময়, যথার্থ আনন্দ ও শান্তিবিমুখ, আর এখানকার দিব্যদেহধারিগণ সূর্য্য বা আদিত্য-তত্ত্বে সমাহিত বলিয়া মহাশক্তিমান, আনন্দ ও শান্তিময়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে সূর্য্যরশ্মির মধ্য দিয়া যে দিব্য সুরের রেশ আমরা পাইয়া থাকি, সেই রশ্মির মধ্য দিয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহুবিধ শব্দতত্ত্ব এবং এক অপূর্ব্ব স্পর্শের পুলকও অনুভূত হয় মাত্র, সেই পুলকপ্রবাহ এই দীপ্তিমান্ শরীরে মহানন্দের সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তির অনুভূতি আনিয়া দেয়, তাহাতেই এখানকার কর্ম্মপ্রবাহ চলিতেছে।

উপরে ঘন মেঘ বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত থাকিলে রশ্মি ক্ষীণ থাকে। তাহাতে অনুভূতির উপর আবরণ পড়ে, কিন্তু কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে যুক্তাবস্থায় তাহাতে নিরানন্দ বোধ হয় না; কিন্তু এখানকার ভোগই হইল ঐ সূর্য্যরশ্মিমিলিত দিব্যতত্ত্ব-সকলের অনুভব। কর্ম্মশূন্য অবস্থায় সূর্য্যের আনন্দময়-রশ্মির অপ্রকাশ কোনও আবরণ এখানকার দিব্য-অধিবাসীগণের সহ্য হয় না, তখন স্থানান্তরে অবশ্য এই অন্তরীক্ষেরই স্থানান্তরে উর্দ্ধে অথবা অপর অংশে, যেখানে আদিত্যের পূর্ণ প্রকাশ সেইখানেই যাইতে হয়। এই দিব্যপ্রাণীগণের অন্তরীক্ষে অবাধ গতি। ঋতুপরিবর্ত্তনের ব্যাপার বড়ই চমৎকার এবং আনন্দময়, তাহা পরে যথাসময়ে বলিব। এখন কর্ম্মের কথা।

এখানকার দেবদূতগণের কর্ম্ম-ক্রম আমার মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে লাগিল। যে ভাবে বিকশিত হইয়াছিল, আমি ঠিক সেই ভাবেই বলিব, যদিও আমার আকস্মিক অনুভূতির সকল কথা বলা সম্ভব হইবে না। আমার রূপান্তরের পর, বিস্ময়ের প্রবল বেগ প্রশমিত হইলে, প্রথমে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি আমার হৃদয়দেশে ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল।

কোনও একদিকে যেন বিশেষ অশান্তি অথবা সঙ্কটভীতির বার্ত্তা ;—বিপদ্-কাতর হইয়া যেন কাহারা গভীর দুঃখ পাইতেছে, বড় কাতর আহ্বান। এইটি যেন সংবাদের কাজ করিল। তখনই প্রবৃত্তি হইল, সেই স্থানে যাইয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিতে। হৃদয়ে সহানুভূতি প্রবলভাবেই জাগিয়া উঠিল এবং একটি অপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভূত হইল। অবশ্য এই আর্ত্তি সেইস্থানের সর্ব্বত্রই প্রসারিত হইয়া পড়িল, তাহাতে সেখানকার উপস্থিত আপ-দেবগণের কাহারও জানিতে বাকী রহিল না। কিন্তু দেখিলাম—ইঁহাদের মধ্যে নির্ম্মল-ক্ষীণ-লোহিতাভ-শরীর দুই জন ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন। আমার অন্তঃকরণ প্রবল সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল, আমিও উঠিলাম এবং তাঁহাদের সঙ্গে মিশিলাম। উর্দ্ধে উঠিয়া অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষ মধ্যেই আমরা যথাস্থানে উপনীত হইলাম।

সিংহলের দক্ষিণে সমুদ্রতীর হইতে কিছু দূরে দুইখানি নৌকা, একখানি হইতেই এই বিপদের বার্ত্তা। এক বণিক মহাজনের নৌকায় দস্যু পড়িয়াছে। মহাজনের সেই নৌকায় অতীব সুন্দরী দুইটি যুবতী নারী, তিন চার জন দস্যু মিলিয়া তাহাদের বলপূর্ব্বক অপর নৌকায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কাতর আর্ত্তনাদ তাহাদেরই, যাহাতে আমাদের বিচলিত করিয়াছিল এবং যাহাদের ব্যাকুলতায় আমাদের এখানে আনিয়াছে। অপর দস্যুগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কয়েক-জন লোককে বাঁধিয়াছে, তাহারা ভীত এবং মুহ্যমান্। ধনরত্ন লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া অপর কয়েকজন ব্যস্ত। অধিকারী একজন যুবক, বদ্ধাবস্থায় পড়িয়া আছে, তাঁহার অবস্থাও ভয়ে মুহ্যমান।

আমাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ব্বৃত্তগণের মধ্যে একটা আকস্মিক ভয় এবং আর্ত্তগণের মধ্যে একটা সাহস সঞ্চারিত হইল। দেবদূতগণের আবির্ভাবের ইহাই প্রথম পরিচয়। আমরা কিন্তু অন্তরীক্ষেই রহিলাম, সেইখানেই সকল ব্যাপারই দেখিলাম। কর্ত্তব্য আমাদের স্থূলভাবে কিছু নাই, যেহেতু আমাদের স্থূল-শরীর নয়। প্রবলভাবে অভয় ইচ্ছাশক্তি আর্ত্তগণের প্রতি প্রয়োগ এবং দস্যুগণের অপকর্ম্মের প্রতিবাদে তাহাদের পাতকের অশুভ ফলাফলের বিষয়, দুষ্ট প্রবৃত্তির নিশ্চিত অমঙ্গল তাহাদের অন্তঃকরণে প্রবলভাবে আমাদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জাগ্রত করাই হইল আমাদের প্রথমতঃ প্রধান কর্ম্ম। পশু-শক্তির প্রাবল্যে ভয়ানক উত্তেজনা-বশে এবং লোভের প্রভাবে তাহাদের মধ্যে আমাদের এই সকল চেষ্টা প্রথমে প্রতিহত হইলেও, সত্যের প্রভাবে মধ্যে মধ্যে তাহাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা আসিতে লাগিল।

আর্ত্তগণের হৃদয়ে বল সঞ্চারিত হইলে, তাহার ফল এই হইল, যে যাহাদের সুযোগ ছিল তাহারা সাহস করিয়া পুনঃ পুনঃ দস্যুগণকে আক্রমণ করিতে এবং তাহাদের সঙ্গীগণের বন্ধনমোচনে সচেষ্ট হইল। আমাদের মধ্যে দুই জনের লক্ষ্য নারীদ্বয়ের প্রতি বিশেষ ক্রিয়া করিতে-ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের আবির্ভাবের সঙ্গেই তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে সাহস এবং বিপদুদ্ধারের আশা যুগপৎ ক্রিয়া করিল। তাহারা এমন অপূর্ব্ব কৌশলে, বলপূর্ব্বক যাহারা তাহাদের ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহাদের প্রতিবাদে এমন প্রবলভাবে আত্মরক্ষার জন্য বাহুদ্বয় চালনা করিল যে, তাহাতে একজন নৌকার কিনারায়, অপর জন সমুদ্রের জলে পড়িয়া গেল। ক্রমে মহাজনের দলের মধ্যে মুহ্যমান্ অবস্থাটি কাটিয়া গেল এবং প্রাণপণ শক্তির প্রয়োগে তাহারা নিজ নিজ আপদুদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত দেখা গেল। তারপর যাহা হইল তাহার মধ্যে বিশেষত্ব এইটুকু, যে নারীদ্বয়ের বিপদুদ্ধারের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা এবং দস্যুদল নিজেদের শক্তিহীন বিবেচনা করিয়া আপনাদের নৌকায় আশ্রয় লইয়া দ্রুতগতি পলায়নের চেষ্টা। একজন দস্যু অত্যন্ত আঘাত পাইয়া মুমূর্ষু হইয়াছিল, আরও চার জন আহত হইয়াছিল; দলের লোকেরা তাহার শুশ্রূষায় সচেষ্ট হইল। এই আহবে নারীগণের যে অসীম সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেল, তাহার প্রধান কারণই আমাদের সঙ্গী দুইজন দেবদূতের বিশেষ শক্তিপ্রয়োগ। তিনটি বিষয় এক্ষেত্রে আমার এই নবজীবনের কর্ম্মারম্ভে লক্ষ্য করিলাম।

প্রথম—দেবদূতগণের শক্তি মানুষের বুদ্ধির উপর প্রযুক্ত হয়, ভীত মুহ্যমান্ অবস্থায় তাঁহাদের শক্তি ক্রিয়া

বিশেষভাবেই অনুভূত হয়। তাঁহারা অভয়দাতা। দ্বিতীয় —দুষ্ট অভিপ্রায় যাহাদের, তাহাদের পশুবলের উত্তেজনার প্রাবল্য হেতু প্রথমে তাহারা শক্তিমান্ বোধ হইলেও, পরে তাহারা দেবদূতগণের শক্তিপ্রভাবে দুর্ব্বল হইতে বাধ্য। তৃতীয়—দেবদূতগণের শক্তির ক্রিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত আর্ত্তের ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়াই প্রকাশ হয়; কোনও ক্রমে পৃথক্‌ভাবে অনুভূত হইবার নয়। এই ভাবে যাঁহারা এই দেবদূতগণের কৃপায়, অভয়শক্তি-প্রয়োগের ফলে বিপন্মুক্ত হন, তাঁহারা সাধারণতঃ নিজ শক্তিতে উদ্ধার পাইলেন, এই মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন—অহঙ্কার তাঁহাদের প্রবল হয়, তাহাতে সুপ্তশক্তি জাগ্রত হইবার পক্ষে সহায়তা করে। এই সকল বুঝিতে পারিলে সহজেই ধারণা হইতে বাধা থাকে না যে, অন্তরীক্ষবাসী দেবদূত-গণের **কর্ম্ম** এই জগতের মানুষের পক্ষে সকল দিকেই মঙ্গলময়, তাঁহাদের সংস্পর্শে অমঙ্গলের নামটি নাই। যাঁহারা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, তাঁহারা এইভাবের বিপদুদ্ধারের পর সংস্কারবশে ভগবানের কৃপায় বিপন্মুক্ত হইলেন মনে করিয়া অজ্ঞাত কোন এক মহান্ অস্তিত্বের কল্পনায় নিজ বুদ্ধিকে পরিচালিত করেন। তাহাতেও কিছু কল্যাণ অবশ্যই আছে।

(ক্রমশঃ)

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

আগমনী

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

রাঙা হ'য়ে গেছে গগনের বুক
তোমার চরণ-আলোকে;
শুধাই, সহসা মরম ভরিয়া
সোনার কিরণ জ্বালো কে?
হাসে দিগ্বধূ, বলে চেয়ে দেখ
জগৎ-জননী এলো যে;
সুপ্ত প্রকৃতি স্নেহের মন্ত্রে
নিমেষে জীবন পেল যে।

আবাহন গান ধ্বনিয়া উঠিছে
সুরের মাধুরী ধরাতে,
আয় আয় ছুটে মার পদযুগে
ভক্তির মালা পরাতে
সম্পদহীন বলিয়া রে দীন,
রস্‌নে ধূলায় লুটিতে,
দুর্গতিহরা দুর্গা এসেছে
সকল কুণ্ঠা টুটিতে।

দা-ঠাকুর

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ

সকালবেলা এক বন্ধুকে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে গিয়াছি, দেখি বেনারস এক্সপ্রেস হইতে দা-ঠাকুর নামিতেছেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার, ছাঁপোষা ক্লাবকে ফেলিয়া ঠাণদিদিকে ফেলিয়া তিনি আসিলেন কি করিয়া?

আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, তুমি এখানে? ভালোই হল। প্রতুলের সঙ্গে এসে পড়লাম কাশীতে। শুনেছি শীতকালে কাশীতে খাওয়াদাওয়ার খুব সুবিধে, জিনিষ-পত্তর অসম্ভব সস্তা। তাই লোভে লোভে এসে পড়েছি। এখন পথ দেখাও ত' কোন্ পথে যাই। আরেব্বাসরে! ঐ উঁচুতে উঠতে হবে? ঐ ওভারব্রীজ চড়তে গেলেই যে হার্টফেল হয়ে যাবে, ব্রীজগুলো একটু নীচু করতে পারে না গাধারা! ভায়া এসো, তোমার কাঁধে একটু ভর্ দেওয়া যাক্। প্রতুল কোথা হে, চল, মোট্‌মাটগুলো দেখে শুনে দিয়ে এসো।

ব্রীজ পার হইয়া গাড়ীর ষ্ট্যাণ্ডে আসা গেল। প্রতুলদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল খালিসপুরা।

দশাশ্বমেধের কয়েককখানা এক্কা করা গেল। এক্কায় চড়া দা-ঠাকুরের এই প্রথম, বলিলেন কেমন ক'রে উঠতে হবে আগে দেখাও, তারপর কোন জায়গাটা ধরতে হবে বাৎলাও, তবে ত চড়া, নয়ত কি অম্‌নি উঠে পড়লেই হল? শেষকালে পাড়াগেঁয়ে লোকের উল্টোদিকে মুখ ক'রে ট্রাম থেকে নাবার মতন এক কাণ্ড ঘটুক্।

সব দেখিয়া শুনিয়া এক্কায় উঠিলেন বটে, কিন্তু মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, মোটেই পছন্দসই হয় নাই! এক একটা ঝাঁকানী দেয় আর দা-ঠাকুর জয় বিশ্বনাথ বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠেন। প্রতুল বলে, ভয় কি দা-ঠাকুর, যদিই হঠাৎ পড়েন আর মরেন, সোজা স্বর্গলাভ; কাশীর সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, যমদূতে ছোঁবে না, শিবদূত আস্‌বে।

দা-ঠাকুর বলেন, কোনো দূতের দরকার নেই, এখনও আমার কাশীর মালাই খাওয়া হয়নি। তোরা ওসব অলক্ষুণে কথা কোস্‌নে। কৈলাসে মালাই পাওয়া যায় কিনা সে খবর পাইনি। তাছাড়া সস্তার কপি কড়াইশুঁটি এন্তার খাব যে!

গোধুলিয়ার কাছ বরাবর আসিয়া দা-ঠাকুর পড়িলেন না, কিন্তু তাঁর পুঁটলী গড়াইয়া পড়িল, তার মধ্যে হুঁকা ছিল ফাটিয়া গেল। আমরা সান্ত্বনা দিলাম, হুঁকো এখানে যথেষ্ঠ; না পাওয়া যায়, মাটির হুঁকো আছে। কিন্তু খবর পাওয়া গেল হুঁকোটা দা-ঠাকুরের নয়, ট্রেনের কামরায় কার পড়িয়া ছিল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। আর একবার এম্‌নি করিয়া একটা ভালো ছাতা যোগাড় করিয়াছিলেন। উনিই পান, আমরা কখনো পাই না।

বাড়ী আসিয়া আমি নামিয়া বিদায় লইতে দা-ঠাকুর বলিলেন, আছিস্ কোথায়?

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে, শ্রীমন্দিরে।

কয়েকটা মামুলী প্রশ্ন করিয়া তিনি বলিলেন, যাব একদিন তোমার ওখানে।

যাইতে হইলনা, পরদিন আমিই আসিলাম। আসিয়া দেখি উপরের ঘরে দা-ঠাকুর হামাগুড়ি দিতেছেন, ছোট ছেলেদের মত।

ব্যাপার কি দা-ঠাকুর?

আরে নূতন থিয়োরি বেরিয়েছে হামাগুড়ি দিলে ভাত হজম হয় শিগগির। তাই একটু প্র্যাক্‌টিশ করছি, খাওয়াটা একটু বেশী হয়ে গেছে কিনা!

খাওয়ার ফিরিস্তি শুনিলাম এইরূপ:—উঠিয়াই চা এবং দুটি নিষিদ্ধ ডিম্ব সহযোগে কচুরীগলির পুরী, বিশ্বনাথগলির ছানার পোলাও, কালীতলার সন্দেশ, বাঙ্গালীটোলার দই, এবং ঘুগনীদানা দশাশ্বমেধ বাজারের।

তারপর ঘি-ভাতের সহিত খান-কতক লুচী প্রায় একটা বাঁধাকপির তরকারী ও আলুবেগুন ভাজা, তিনটে টোম্যাটোর চাটনী, মাছের কালিয়া এবং মূলো চচ্চড়ী ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ভোজ্য।

বিকালে ফুলকপির শিঙাড়া খান আষ্টেক, কড়াইশুঁটির কচুরী খান দশেক এবং চা দুকাপ।

আরো খাইবার বাসনা আছে তাই হামাগুড়ি দিতেছেন।

আমাকে পাইয়া বলিলেন, চলো একটু গঙ্গার হাওয়া খেয়ে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। রাত্রে যাঁতা-ভাঙ্গা আটার লুচী বলেছি, আর মাংস; আর কিছু না, শুদ্ধু ঐ।

বলিলাম, কলকাতায় থাকতে শুনেছিলুম আপনার ডিসেণ্ট্রি হয়েছিল, কি ইন্‌জেক্‌শন নিলেন যে এর মধ্যেই—

দা-ঠাকুর বলিলেন, দেখো, ইঞ্জেক্‌শন মাগগি করে দিয়ো না। একটা কমলানেবুর খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে তিনি চলিলেন। এক চক্র ঘুরিয়া আসিয়া দা-ঠাকুর বলিলেন—খানিকটা ছানা খাওয়া যাক। কেন্‌-না পোয়াটাক, আর আধপো মাখন নে, বেশ সরেস্।

কিনিতেই হইল। আমাকে খা-না খা-না করিতে করিতে তিনিই শেষ করিয়া দিলেন।

পরের দিন সকালবেলা দেখি দা-ঠাকুর এক নোটবুক খুলিয়া মুখস্ত করিতেছেন—

কদ্দু—গোল নাউ
লৌকি—লম্বা নাউ
কোঁহড়া—কুমড়ো
গোহিরী—ঘুঁটে
সন্তরা—কমলালেবু
আমরুৎ—পেয়ারা
নাটাই—গলা
পেঁড়—বৃক্ষ

জিজ্ঞাসা করিলাম—ওকি দা-ঠাকুর?

দা-ঠাকুর বলিতে বলিতে মুখ ফিরাইলেন—

কাড়া—পুং মোষ
ছিমি—কড়াইশুঁটি
আয়নক—চশমা
আচনক—হঠাৎ
পিষান্—আটা

আর বলো কেন ভায়া, কাল চাকরটাকে বল্‌লাম একটা নাউ নিয়ে আয় সে এক নাপিত এনে হাজির করলে। তাছাড়া হিন্দীমিন্দি না জান্‌লে মনে করে নতুন লোক, ঠকিয়ে দেয় বাজারে। কাজেই উঠে পড়ে কতকগুলো কথা শিখে নিচ্ছি।

আচ্ছা দিন্, আমি আপনার পড়া নিই, বলুন দিকি, সন্তরা মানে কি?

দা-ঠাকুর খানিকটা ভাবিয়া বলিলেন, ঘুঁটে।

হলনা।

আরে, একদিনে কি হয় রে, এখন কতোদিন লাগ্‌বে।

নোটবুকে দেখিলাম আরো লেখা আছে—

শিঙাড়া—পানফল
বিশ্‌বিদ্যালে—বিশ্ববিদ্যালয়
দশাশ্‌মেধ—দশাশ্বমেধ
বেনিয়া পার্ক—কুইন্‌স্ পার্ক

বলিলাম—এগুলো লিখেছেন কেন দা-ঠাকুর, বিশ্‌বিদ্যালে দশাশ্‌মেধ?

উচ্চারণটা জেনে না রাখলে এক্কাওলা ব্যাটারা নতুন লোক ভাবে যে!

দা-ঠাকুরের স্নানের সময় হইয়াছিল, তেল মাখিতে মাখিতে বলিয়া চলিলেন—কদ্দু—গোল নাউ।
লৌকি—লম্বা নাউ।

গঙ্গায় যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন, মূলই করনা—কেনা, গর্দ্দা—ধূলো, জমাদার—মেথর...

সেই থেকে দা-ঠাকুরের সঙ্গে যখনই দেখা হয়, দেখি মন্ত্রোচ্চারণের মত বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়াছেন—ডিব্বা—গাড়ী মহাবরা—অভ্যেস্, ভাবীজী—বৌদিদি···

হঠাৎ থামিয়া বলেন, কিরে কেমন আছিস্, চল একটু ঘুরে আসি···পসিনা—ঘাম, পরেশানি—পরিশ্রম, আক্‌বর—কাগজ

মাথা খারাপ হইল নাকি? ভাবি, একটা স্ক্রু নিশ্চয় আলগা হইয়া গেছে।

দিন সাতেক হইয়া গেল দা-ঠাকুর আসিয়াছেন তবু এখনো বিশ্বনাথদর্শন হয় নাই।

বলিলাম, চলুন, কাশীবিশ্বনাথ দর্শন করে আসা যাক।

দা-ঠাকুর বাজারে ঢুকিলেন, সে কথা কানেই তুলিলেন না। কপির গাড়ী তাঁর নজরে পড়িয়াছে!

অবশেষে একদিন রাজী হইলেন, কাশীতে পাওয়া যায় এমন সব রকম খাদ্যেরই আস্বাদ যখন গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঢুণ্ডিগণেশের সাম্‌নে আসিতে এক পাণ্ডা বলিল, এইখানে জুতা খোলেন, ফুল নিয়ে নিন।

মন্দিরের মত দরজা দেখিয়া দা-ঠাকুর জুতা খুলিতেছিলেন, আমি বলিলাম, খবদ্দার, এখনি নতুন লোক ঠাউরে নেবে, ওধারে জুতো খোলবার জায়গা আছে।

পাণ্ডা তবুও আগে আগে চলে দেখিয়া আমি বলিলাম, কুছভি জরুরৎ নেই, হামলোগ যাত্রী নেহি হ্যায়, হিঁয়াকা রহেনে-ওয়ালা—

দা-ঠাকুর চলিতে চলিতে লিখিয়া লইলেন জরুরৎ। মানেটা কি হে?

লিখুন প্রয়োজন। আর জরু মানে লিখুন গিন্নী। গোলমাল করে ফেলবেন না।

বিশ্বনাথের মন্দিরে ঢুকিবার সময় এক কুঁজো বুড়িকে ঢুকিতে দেখিয়া বলেন, দেখো ত, বয়সে পিঠ ভেঙ্গে গেছে এত বয়স! আশী বছরের কম না। একে কেন ঢুকতে দিয়েছে, মারা টারা যাবে শেষটা—

বলিলাম, ওর জন্যে চিন্তিত হবে না, কাশীর জলহাওয়ায় হাড় পেকে গেছে। নিজেকে সাম্‌লান।

বিশ্বনাথ দেবের মাথায় হাত বুলাইতে গিয়া ঘটিল এক কাণ্ড। সেই বুড়ীটা যার জন্য দা-ঠাকুর অতিমাত্রায় চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ফিরিতে গিয়া দা-ঠাকুরকে মারিল এমন এক কনুইয়ের ধাক্কা যে দা-ঠাকুর আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িলেন, আমি গিয়া পড়িলাম কাছা-কোঁচা আঁটা এক মাদ্রাজী মেয়ের ঘাড়ে। বিরাট চেহারা তার, সে ত রাগিয়া আমাকে প্রায় পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিয়া গালি দিল, আন্দেউটলে চিন্তারপাণ্ডুড়ু সান্দুরমিট্ট!

সেদিন ন্যাড়া বিধবারই ভিড় বেশী, তিথিটা একাদশী কিনা। কোনরকমে পূজা সারিয়া সরিয়া পড়িতে গিয়া এক নেড়ীর পা মাড়াইয়া দিয়াছি, সেও মারিল এম্‌নি ঠেলা যে ছিট-কাইয়া গিয়া চাহিয়া দেখি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি। ওদিকে দা-ঠাকুরের দাঁত দিয়া রক্ত পড়িতেছে, কে এক অবলা নাকি ঘটি দিয়া মারিয়াছে তাহার গঙ্গাজল পড়িয়া গেছে বলিয়া।

দা-ঠাকুর বলিলেন, ভাগ্যিস্ ক'দিন খেয়ে একটু গায়ে জোর ক'রে নিয়েছিলুম, নইলে ত এই ভিড়ে হয়েছিল আর কি!

কিন্তু মুস্কিল হইল এই, দা-ঠাকুর কাশীতে রীতিমত জমিয়া গেলেন, ছুটি ফুরাইয়া গেলে আবার ছুটির দরখাস্ত করিলেন—নড়িবার নাম করেন না।

খাওয়ার আয়োজন বিপুল হইতে বিপুলতর হইতে লাগিল, দেহে মেদ সঞ্চার হইয়া বৃদ্ধ বয়সে যেন যৌবন ফিরিয়া আসিল, এদিকে সে হাতীর খোরাক সরবরাহ করা বেচারা প্রতুলের পক্ষে সুবিধাজনক হইতেছিলনা। নিজের পরিবার সাম্‌লাইবে, না দা-ঠাকুরের বিরাট ভোজের ভোজ্যসংগ্রহ করিবে?

বাজার হইতে কিছু কিনিয়া দিয়া সাহায্য করা তাঁহার অভ্যাস নাই। একদিন একটা কুলী-কামিনের বাজরা হইতে কিছু কমলানেবু আর কড়াইশুঁটি তুলিয়া লইয়াছিলেন—সে তাঁহার নিজের ভোগে লাগিয়াছে।

প্রতুল ত একদিন স্বপ্ন দেখিয়া বসিল, দা-ঠাকুর এমন খাওয়া খাইতেছেন, যে প্রতুলের ভিটামাটি বাঁধা পড়িয়াছে। ভয় পাইয়া সে ত' পরদিন সকালেই দুঃস্বপ্নের দেবতা ৺কুরকুটি মহাদেবের পূজা দিয়া আসিল।

একদিন মতলব করিয়া প্রতুল বলিল, দা-ঠাকুর, কাশীতে বড় বেরি-বেরি হচ্ছে।

দা-ঠাকুর বলিলেন, তাহলে আজ থেকে দুবেলাই আমি লুচি খাব, আর তেলেভাজা কিচ্ছু না, ভাজা তরকারী সব ঘি দিয়ে হবে। নুনটা একেবারেই খাব না।

লবণকর থাকা সত্ত্বেও নূনটা তত মহার্ঘ্য নয় যত ঘৃত, কিন্তু দা-ঠাকুরের শাস্ত্রে ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

দারুণ শীতেও দা-ঠাকুরের ঘন ঘন গঙ্গাস্নানের কারণটা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিনাই। একদিন দেখি কার এক নূতন নামাবলী গায়ে দিয়া আসিতেছেন! তারপরদিন থেকে অবশ্য গঙ্গাস্নান দূরের কথা গঙ্গার ঘাট মাড়াইতেন না।

টম্যাটো খাইয়া খাইয়া খাইয়া টম্যাটের দরই দা-ঠাকুর বাড়াইয়া দিলেন। রসচর্চ্চা বন্ধ হইয়াছে, এখন উদরচর্চ্চায় দা-ঠাকুর মনঃসন্নিবেশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুই বন্ধুতে রীতিমত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম।

অবশেষে আমি এক খবর আনিলাম। দা-ঠাকুর বলেন বেরি বেরি বাঙ্গালীরই হয় কেননা তারা ভাত আর সর্ষের তেল খায়, হিন্দুস্থানীদের কাছে বেরিবেরির বাবাও ঘেঁসতে পারেনা!

কিন্তু বেরিবেরির পিতৃ-সংবাদ রাখিনা, উপস্থিত বেরিবেরি স্বয়ং ধরিয়াছে অহল্যাবাঈ ঘাটের এক নিরীহ পুরোহিতকে। এ খবরটা দা-ঠাকুরের কাছে নিতান্তই দুঃসংবাদ, কারণ তিনি অবাঙ্গালীর খাদ্য খাইয়াও ত তবে আর নিস্তার পাননা।

সেদিন বিকালে বাজারের সাম্‌নে দা-ঠাকুর একটা ছোকরার হাতে এক প্রকাণ্ড প্ল্যাকার্ড দিয়া তুলিয়া ধরিতে বলিলেন, তাহাতে লেখা ছিল

—'যদি কোন অসুস্থ রোগী কিম্বা অভিভাবকহীন বয়স্ক বিধবা লোকাভাবে কলিকাতা ফিরিতে পারিতেছেন না, এমন হয়—তবে একজন প্রবীণ লোক সঙ্গী হইতে পারেন, যদি তাঁহাকে যাতায়াতের খরচ দেওয়া হয়।"

বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া অনেকেই হাসিল, কেহ বা ভাবিল, কেহ বা টিপ্পনী কাটিল, কিন্তু লোক অবশেষে মিলিয়া গেল।

একটি বিধবার সত্যই ফিরিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

যাতায়াতের ভাড়া হইতে একপিঠের টাকা দিয়া দা-ঠাকুর ঠান্‌দিদির জন্য বিরাট এক বোকনো কিনিলেন আর জর্দ্দা; ছেলেমেয়েদের জন্য লইলেন কাঠের রংবেরংএর খেলনা—জীবজন্তু ব্যাটবল ইত্যাদি।

আমাদের দিয়া গেলেন শুধু নিজের পদরজঃ। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, সম্ভবামি যুগে যুগে।

আমরা মনে মনে বলিলাম—অন্ততঃ আমাদের ঘরে নয়।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল, প্রতুল বলিল, লোকটা গেল যেন ভাস্কো-ডি গামা।

আমি বলিলাম, ভাস্কো-ডি-গামার যাওয়া দেখেছ?

প্রতুল বলে—দেখিনি, কিন্তু কথাটা শোনালো কেমন?

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

ধান-কাটা

শ্রীসাধনা কর

গা তোল রে রাজু ভাই, ছাড়ো রে শিথান,
চলো চলো পাথরেতে, হোলো যে বিহান।
ঘরে আর কত সুখ, আমরা যে চাষা
খেটে খাই হাতে পায়ে, মাঠেই তো বাসা।
তুমিও খাটিতে শেখো, কাস্তে লও হাতে,
কালই বিয়ে দেবো নাতি রাঙা-বৌ সাথে।
বাবাজান সে তোমার, নায়ে গেছে আগে,
উঠে চলো, সুখ দেখো মাঠেও কী লাগে!
আগুনের মালসা লও, লও কিছু টিকে,
টোকাটিও নিয়ো সাথে, মেঘ চারিদিকে!
মাথার উপরে দাদা, শোনো গুরু গুরু,
চলো চলো ধান কাটা করি গিয়ে সুরু।
দেখিবে কী কালো জলে ডোবা খাল বিল্
সোনালি আউষ ধান হাসে খিল্ খিল্।
ঢলিয়া রয়েছে শীষ এ উহার গায়ে।
কোচ হাতে কত লোক ফিরে ডিঙি নায়ে,
মাছের শীকারে আছে খাড়া একটানা,
যেখানে নড়িল পাতা সেথা দিল হানা;
পাথরেতে গেলে দেখো কত খেলা পাই,
ডুবে ডুবে ধান কাটি কোন দুখ নাই।
পান কৌড়ি ডুব দেয় এপার ওপার,
ডেকে ডেকে জলপিপি নাহি মানে হার।
সাপলা ফুটিয়া আছে বড়ো বড়ো পাতা,
সে সকল দেখ যদি মনে রবে গাঁথা।

ওদিকের ক্ষেত হ'তে আসে জারী-সুর;
এদিকেতে কাটা-ধানে ডিঙি ভরপুর।
গলুয়ের নীচে ঢাকা থাকে পান্তাভাত,
দুপুরেতে বসি খেতে সবে একসাথ।
সান্‌কির পাশেই রাখি শুকনো বাসি ডাল,
ছাড়ানো পেঁয়াজ আর লঙ্কা একটাল;
কাগজে কিছুটা নুন।—
খেতে ব'সে দেখি—
দূরেতে গাঁয়ের ঘাটে ভীড় জমে সে কী!
নৌকাটি সাজানো, দিদি যায় স্বামী-ঘর,
তারি আয়োজন নানা, পৈঁঠার উপর
ছোট ভাই ডাকে তুলি' কচি হাত দুটি,
পারে না দাঁড়াতে ভালো, পড়ে লুটি' লুটি'
মার পা'র কাছে, উঠে' হাটে টলোমলো,
সে সব দেখিবে যদি চলো দাদা চলো।
খাওয়া হলে তামাকটি সেজে দিবে বেশ
কেচ্ছা শোনাবো কত; হবে বেলা শেষ।
হাওয়া দিবে অল্প অল্প—দেখা যাবে খালে
পাট-ভরা বড়ো বড়ো নৌকা চলে পালে।
সাঁঝেতে ফিরিতে ঘরে দেখো বউ ঝিয়ে
কলসী ডুবায়ে ঘাটে, যায় জল নিয়ে।
ঘরে ঘরে জ্বলে বাতি, গোয়ালেতে ধোঁয়া,
সারাদিন খেটে এসে যেই একটু শোয়া
রাত্রিতে ঝরিবে জল—লাগিবে কী ভালো,-
চলো দাদা, বৌ দেবো রূপে ঘর আলো॥

বাবু ইংরিজির গোড়ার কথা

শ্রীদেবকমল চক্রবর্ত্তী

"বাবু ইংলিশ" কথাটার সৃষ্টি হইয়াছিল অনেক আগে—যখন এদেশের ইংরিজি ভাষাভিজ্ঞরা মনের ভাবটিকে ইংরিজিতে ফুটাইয়া তুলিতে শিখিয়াছে। কথাটা এদের ইংরিজি শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচলনেরই সমসাময়িক।

কিন্তু বাবু ইংরিজির অস্তিত্ব এখনও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই—বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে। বাঙ্গালীর ইংরিজি ভাষাজ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ হয় না, এই রকম একটা অভিযোগ সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। শুধু ইংরেজের কাছ থেকেই যে এই রকম অভিযোগ আসে তা-ই নয়, ইংরেজ ছাড়াও অবাঙ্গালী ভারতীয় অনেকেরই অনুরূপ অভিমত।

বিশেষ করিয়া অবাঙ্গালী ভারতীয়ের এ-প্রকার মন্তব্য মূলতঃ বিদ্বেষ প্রণোদিত হইলেও ইহার সত্যতায় সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। অন্যদিকে যাই হোক, শিক্ষিত বাঙ্গালী সাধারণের জ্ঞানভাণ্ডার ইংরিজি ভাষাজ্ঞানের দিক থেকে সত্য সত্যই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। চাকুরীর দরখাস্ত, ব্যবসার বিজ্ঞাপন এবং সাহিত্যিক অসাহিত্যিক সর্ব্বব্যাপারে বাঙ্গালীর এই ইংরিজি বিমুখতার প্রকাশ ধরা পড়ে। পূর্ব্বতনত্ব (priority) হিসেবে বাঙ্গালীই ইংরিজি ভাষা শিক্ষাকে সকলের আগে স্বাগত করিয়াছিল। তাই বাঙ্গালীর ইংরিজি জ্ঞানের এই স্বল্পতার কারণ খুঁজিয়া দেখিবার সার্থকতা আছে; কারণ ইন্‌টেলিজেন্‌ট্ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে এটা গৌরব কি অগৌরবের বিষয় তা এখনও স্থির হইয়া যায় নাই।

ইংরিজি ভাষা শিক্ষার পথে যে সমস্ত অন্তরায় বর্ত্তমান, তাদের দুরতিক্রম্য বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদাহরণটি চমৎকার। "Horse is a noble animal বাঙ্গালায় তর্জ্জনা করিতে বাংলারও ঠিক থাকে না ইংরেজীও ঘোলাইয়া যায়……ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া অতি উঁচুদরের জানোয়ার, ঘোড়া জন্তুটা খুব ভালো—কথাটা কিছুতেই তেমন মনঃপুত হয় না...।"

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ভার যাঁদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, স্কুলের সেই নীচের শ্রেণীর শিক্ষকদের নিজেদের অজ্ঞতা পর্ব্বতপ্রমাণ। মফস্বলের স্কুলের সঙ্গে যাঁর একটুও পরিচয় আছে তিনিই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষার ভিত্তি-ভূমি বলা যাইতে পারে। এই কাঁচা ভিত্তির উপর পরবর্ত্তী উচ্চশিক্ষার সৌধটিকে তাই কোনও রকমে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার এই গলদ মফস্বলের স্কুলেই বিশেষ করিয়া অনুভূত হয়। সহরের স্কুলগুলির অবস্থা ঠিক ততটা সঙ্কটাপন্ন না হইলেও বিশেষ আশাপ্রদ নয়।

তাছাড়া বিজাতীয় ভাষাকে নিজেদের শিক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য কোনও বিশেষ সিস্‌টেম আমাদের নাই। মাদ্রাজীদের ইংরিজি উচ্চারণ শুনিয়া আমরা অনেকেই হাসিয়া গড়াইয়া পড়ি। কিন্তু যে মাদ্রাজী ছেলেরা বাল্যকাল থেকেই Hকে 'হেইচ্' আর Earthকে 'ইয়ার্থ' বলিতে শেখে, তাদের ইংরিজি বানান সমস্যার কতটা সমাধান হইয়া গিয়াছে, তা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

ইংরিজি ভাষার মূলকথা যে জোর accent—সেদিকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য নাই। যেমন তেমন করিয়া ইংরিজি বলিতে পারিলেই আমাদের চলিয়া যায়। অনেকেই বেশ কায়দা দোরস্ত ভাবে ইংরিজি বলা আর ব্যয়বাহুল্য করিয়া বাবুগিরি করাকে একই পর্য্যায়ে ফেলেন। এই কায়দা-বাহুল্যের ধারণাটি ছেলে বেলা থেকেই আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। যদি কেউ বেশ ভালো করিয়া ইংরিজি বলিতে চেষ্টা করে সমপাঠীদের বিদ্রূপ তাহাকে অমনি থামাইয়া দেয়। বাল্যের এই ক্রমবর্দ্ধমান অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তী জীবনে স্বভাবজ

হইয়া পড়ে ; এবং চিরকাল কোনও রকমে ইংরিজি বলিতে পারাটাই তাহার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

আসল কথাটি এই যে আমরা ইংরিজি শিখি পেটের দায়ে। ইংরিজি শিখিতে হইলে ইংরিজিতে লিখিতে, বলিতে, পড়িতে এমন কি চিন্তা করিতে এবং স্বপ্ন দেখিতেও শিখিতে হইবে—বিখ্যাত শিক্ষাপ্রসারক ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এই উপদেশবাণী এখন আমাদের হাস্যের উদ্রেক করে। শিক্ষিত এবং জ্ঞানী হইবার জন্য শিক্ষা—এই নীতি মানিয়া অতি অল্পলোকেই ইংরিজি শেখেন। পড়িয়া পাশ করিব এবং তার পরই চাকুরী—এই ধারনাই আধুনিক শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীদের ভিতর বর্ত্তমান। কোনও রকমে কাজ চালাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করার দিকেই আমাদের লক্ষ্য থাকিয়া যায় চির কাল। কাজেই যে অর্থকরী শিক্ষাটুকু আমরা দখলে আনিতে সক্ষম হই, তা আর যা-ই হোক না কেন ভাষাশিক্ষা হইয়া উঠে না কোনও কালেই।

এই সমস্ত ছাড়া আরও একটি বিশেষ কারণ রহিয়া গিয়াছে। সেটির মূলে আছে স্বাভিমান এবং আত্মচেতনা। যে আত্মচেতনার অভাব বাঙ্গালী সাধারণকে একদা পৈতা ছিঁড়িয়া গির্জ্জায় যাইতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল—তাহার পোষাক পরিচ্ছদ বদলাইয়া দিয়াছিল, তাহারই পুনরুদ্বোধন কালে বাঙ্গালী সৃষ্টি করিল ব্রাহ্ম সমাজ, পুনঃপ্রচলন করিল ধুতি ও চাদর। এই আত্মচেতনাই বাঙ্গালীর বঙ্গেতর ভাষার প্রতি ঔদাসীন্যের কারণ। বাঙ্গালীর সাহিত্যিক প্রতিভা প্রথমে আপন ভাষাজননীর দ্বারস্থ হইতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল বটে ; কিন্তু বাংলাভাষার আকর্ষনী শক্তির বিরুদ্ধে সেই কুণ্ঠা বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারে নাই। আজিকার বাংলাভাষা আর রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ের বাংলাভাষার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেদিনের বঙ্গভাষায় লোভনীয় আহরনীয় বিশেষ কিছুই ছিল না। কাজেই ভাষার সলিপ্সুর সমগ্র মন পড়িয়া থাকিত ইংরিজির দিকে—যে ইংরিজি তাহার জ্ঞান চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে। প্রজ্ঞাপ্রকাশের জন্য তাই ইংরজিরই শরণ লইতে হইত। কিন্তু আজিকার বাংলা ভাষার আর সেদিন নাই। বহু প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া বাংলা আজ তার নিজের ভাষার জন্য জগৎ-ভাষা-সভায় একটি আসন সংগ্রহ করিয়াছে। সেটি হীরা-মণিমুক্তা খচিত না হইলেও অন্ততঃ স্বর্ণনির্ম্মিত নিশ্চয়ই। বাঙ্গালীর লেখা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইয়াছে ; বাঙ্গালীর সৃজনী-প্রতিভা জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে ; বাঙ্গালীর ধারণা যোগাইয়াছে নূতন চিন্তার খোরাক। বাঙ্গালী শিক্ষার্থী তাই আজ বাংলার দিকেই বেশী মন দেয়। সে ইংরিজি শেখে নেহাৎই প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু সেই প্রয়োজনের শিক্ষার ফাঁকে তার লুব্ধ মন পড়িয়া থাকে বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অনুরূপা, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার এবং আরও অনেক বাঙ্গাল। লেখকের বাংলা বইয়ের পাতায় পাতায়। মোটের উপর অন্ততঃ তার সাহিত্যিক শিক্ষাবৃত্তি বঙ্গভাষাকেই মনে প্রাণে বরণ করিয়া নেয়। ফলে, সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইংরিজি ভাষা শিক্ষার পথে ভাটার টান লাগিয়াই থাকে—আর কাজেই তা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

এই সুযোগে বাঙ্গালীর ইংরিজি ভাষা শেখা আদৌ দরকার কি না সে কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কারণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নূতন বিধান অনুসারে শীঘ্রই মাতৃভাষাই হইবে বাংলার শিক্ষার বাহন। প্রাদেশিক প্রয়োজনীয়তার কথা ছাড়িয়া দিলেও সমগ্র ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ইংরিজির বদলে হিন্দিকে স্থান করিয়া দিতে হইবে—এই রকম একটা ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিয়েছে।

হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য মাথাব্যথা আর কারই থাকুক না কেন বাঙ্গালীর নাই। কৃষ্টি হিসেবে বাংলা ভাষার স্থান হিন্দির নীচে নয় ; আর সেই হিসেবে বাংলা ভাষারও অন্ততঃ সমান দাবী বর্ত্তমান। আর যদি ভাষার বর্ত্তমান ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় ত ইংরিজিরই স্থান সর্ব্বাগ্রে। যে দেশে শতাধিক ভাষা পাশাপাশি চলিতেছে—সেই বহুভাষিনী ভারতে সুবিধাজনক ও সার্ব্বজনীন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ইংরিজিরই দাবী বজায় থাকিবে চিরকাল, হোক তা বিদেশী, অভারতীয়। সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই ভারতকে থাকিতে হইবে এবং থাকা প্রয়োজন—যাঁরা অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয়ের আকাঙ্ক্ষা না করেন তাঁরাই একথা স্বীকার করিবেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সহিত পারস্পরিকতা এবং সদিচ্ছা স্থাপন করিতেও এই ইংরিজিই হইবে প্রধান সহায়।

ইংরিজি ভাষা আমাদের বহু বহু শতাব্দীর অজ্ঞানতা ও বন্ধন হইতে মুক্তির অগ্রদূত হইয়া আসিয়াছিল। সেই অগ্র-দূতকে প্রথমে বরণ করিয়া লইয়াছিল বাঙ্গালী। যে ভাষার সাহায্যে আমরা বর্ত্তমান জগতের শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি, যে ভাষা এ দেশে রেনেসাঁস—যুগ পরিবর্ত্তন —আনিয়া দিয়াছে, তাকে দূরে ঠেলিয়া রাখা শুধু অন্যায় নয়, অকৃতজ্ঞতা।

আমেরিকানরা ইংরিজি ভাষাকে গড়িয়া পিটিয়া লইয়া-ছিল। তাতে সে দেশের ভাষার নাম হইয়াছে আমে-রিকান ইংরিজি। এই নামেরও আদিতে ছিল বাবু ইংরিজির মতই বিদ্রূপ। কিন্তু তারা তাদের বিদ্রূপের ভাষাকেই বাঁচাইয়া রাখিয়াছে প্রয়োজনের অনুরোধে। বাবু ইংরিজিও বাঁচিয়া থাকিবে ; কারণ এ ক্ষেত্রেও ভিতরের তাগিদ বর্ত্তমান।

দেবকমল চক্রবর্ত্তী

বাপের বাড়ির যাত্রী

শ্রী নলিনী কর্ম্মকার

নাইটিঙ্গেল-কাহিনী

শ্রীরজত সেন

পাসের লোকটিকে শ্রীমোহন চেষ্টা করলে হয়ত চিনতে পারে, কিন্তু কোথায় পুর্ব্বে দেখেছে তা মনে আনবার ধৈর্য্য ওর আপাততঃ নেই। ছবি আরম্ভ করবার আরও কতক্ষণ দেরী আছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। সস্তা ইংরেজী গানগুলো শুনিয়ে শুনিয়ে এরা স্বভাব নষ্ট করবার বন্দোবস্ত করেছে। এর মধ্যে তিনটি সিগারেট শ্রীমোহন পুড়িয়ে ফেলেছে।

'দেখুন!' পাশের যুবকটি অনেক সঙ্কোচের সহিত শ্রীমোহনকে উদ্দেশ ক'রে বললে, 'কিছু মনে করবেন না'—শ্রীমোহন আর একটা সিগারেট ধরালো, যাক্ বাঁচা গেল! এখনও ফিল্মটা আরম্ভ হবার দীর্ঘ সাত মিনিট বাকি! প্রশ্নকারীর সুন্দর প্রশস্ত কপালটা ঘেমে উঠলো; আলগোছে রুমালটা মুখের উপর বুলিয়ে—'দেখুন'—ও বললে—'আমি আপনাকে কয়েকটি কথা বল্‌বো ভাবছি।' ও যে শ্রীমোহনেরই সহপাঠী সেটা সে বুঝ্‌তে পারেনি চট্ ক'রে। এম-এ পড়াটা সুলভ বিলাসিতা, প্রকাশ্যে ডিসেণ্টলি সময়-ক্ষেপণ। আহ্বান-কারীকে এম-এ ক্লাসে দেখেছে শ্রীমোহনের স্পষ্ট মনে হ'ল এবার। সার্টের ওল্টানো কলারটা উন্নত গ্রীবার সঙ্গে মানিয়েছে। চুলের রাশি সযত্নে পশ্চাত-চালিত। সিগারেটে আরাম ক'রে একটা টান দিয়ে শ্রীমোহন বল্‌লে—'কি বলুন না! এত সঙ্কোচ কিসের?' ওর হাতের আংটিটা দীপালোকে ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠলো, বললে—'কিন্তু বল্‌তে পারছিনা—'

'তা হ'লে' শ্রীমোহন বললে, 'কি আর করবেন—বলবেন না—' অকস্মাৎ প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত আলো নিভে গিয়ে চারি পার্শ্বে অন্ধকার জমাট বেঁধে গেল।

কয়েকটা টুকরো বাজে ফিল্ম দেখিয়ে ছবিটা আরম্ভ হ'ল। এটা আরও রদ্দি, উঠে আসবে কিনা শ্রীমোহন ভাবছিলো; কানের কাছে শুনতে পেলো—'আপনার সঙ্গে যিনি রোজ ইউনিভারসিটিতে আসেন—তিনি আপনার কি কোন আত্মীয়া'?

'ও'—শ্রীমোহন হেসে উঠলো, 'তাই বলুন—তিনি আমার এক তুতো বোন—কাজিন,—কিন্তু—

'তিনি ইদানীং আসছেন না কেন?' প্রশ্ন বর্ষিত হ'ল।

প্রশ্নোত্তর অবশ্য যথা সম্ভব অনুচ্চ স্বরেই হচ্ছিল, ফিল্মটার দিকে তাদের মনোযোগ বা দৃষ্টি ছিলো না। শ্রীমোহনের সিগারেটটা শেষ হয়ে এলো।

'শরীরটা নাকি তাঁর ভালো নেই' শ্রীমোহন মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'কিন্তু আসল কথাটা বলে ফেলুন দেখি! ভূমিকায় আর লাভ কি? Interested?"

'দেখুন আমি—আমি ওঁকে—কি বলব?" ও থামলে, শ্রীমোহনের ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল বিদ্যুতালোকে ওঁর মুখাবয়বটা একবার নিরীক্ষণ ক'রে।

'ভালবাসা নাকি? হায় ঈশ্বর!' শ্রীমোহন হেসে উঠলো অনুচ্চস্বরে; শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিলে; আগুনের ফুলঝুরির, সেই মুহূর্ত্ত-বিদ্যুৎলীলার দিকে তাকিয়ে হতাশ কণ্ঠে অপরজন বললে—'কি করব বলুন? তাই ব্যাপার—আপনি কি—'

'না—রাগ করিনি,' শ্রীমোহন বললে, 'কিন্তু এ বিষয়ে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো বলে আপনার মনে হচ্ছে?'

'না—হ্যাঁ। কি করা যায় বলুন তো—আমি ত—'

'কি আর করবেন', শ্রীমোহন বললে, 'দেখুন একবার কপাল ঠুকে, হয় ত লেগেও যেতে পারে।'

'কিন্তু যদি হেরে যাই'

'তবে অন্যত্র।'

'আপনি বড্ড হাল্কা ত! কিছু মনে করবেন না।"

'না ভারি হয়ে কোন লাভ নাই।' শ্রীমোহন বল্‌লে।

অনাত্মীয় আলাপের আয়ু কম। বায়োস্কোপ শেষ হবার আগে ওদের কথা শেষ হোল।

তারপরে এর পরের সপ্তাহের একদিনের কথা।

সেনেট্ হাউসের গোড়া থেকে একটি মেয়ে বাসে উঠে পড়লো, সপ্রতিভ ভাবে। দুখানা বই, একখানা খাতা (বাঁধানো) বুকের কাছে অযত্নে নিয়ে। বাসে উঠ্তেই যুবকবৃন্দ একসঙ্গে যায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সবাই কলেজের ছাত্র। কেউ স্কটিশ্, কেউ বিদ্যাসাগর, আর কেউ পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের। সাড়ীর আঁচল থেকে একটা আঙ্গুল দিয়ে ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে এম-এ ক্লাশের মেয়েটি বস্‌লো যে-কোন একটি আসনে। ছেলেরা কেউ বা বস্‌তে ভুলে গেল, কেউ বা স্থান পরিবর্ত্তন করলে।

নেক্সট্ ষ্টপেজে যে ছেলেটি নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে বাসে উঠ্‌লো তার বৈশিষ্ট্য আছে। প্রোফাইল অতি চমৎকার, সুবিন্যস্ত চুলের শৃঙ্খলাটা চোখে পড়বার। একে একদিন আমরা ছবি দেখ্তে গিয়ে দেখেছি শ্রীমোহনের সঙ্গে। কলেজে উপস্থিত থাকলে শ্রীমোহনকেও আমরা দেখ্তে পেতাম ললিতার সঙ্গে। মেয়েটির নাম ললিতাই; সবাই ওরা পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র। একটি আসন দখল ক'রে বস্‌লো আমাদের এই নবাগত। হাতে যে বইখানি ছিল সেটি পাঠ্যপুস্তক নয়—একখানি ইংরাজী কাব্যের বই।

মেয়েটির শুকনো মুখের উপর চুলের রাশি উড়ে উড়ে পড়ছে—স্পষ্ট টিকোলো নাক। সাড়ীটা ওর অঙ্গসৌষ্ঠবকে পরিস্ফুট করেছে, পরিপূর্ণতা দিয়েছে ওর দেহের সুশ্রীতাকে, যাদের দেখবার ক্ষমতা আছে তাদের চোখে পড়ছিল বাসের দ্রুতগতির সঙ্গে ওর দেহ-কম্পন। চঞ্চল রক্তের উর্ম্মিমালা ওর দেহতটে আছাড় খেয়ে পড়ছে।

এলগিন রোড—বাজার—চড়কডাঙ্গা—বাসটার আর অপেক্ষা করিতে হোলনা কোথাও। বোধ হয় ড্রাইভারের সুবিধার জন্যই সকলের এক স্থানে অবতরণ ঘটে। ললিতার হাজরার মোড়েই নামবার কথা।

ললিতা উঠে দাঁড়ালো। বাসটা ষ্ট্যাণ্ডে এসে থামবার দরকার হোলনা, ললিতা ঈষৎ পশ্চাতে হেলে নেমে পড়লো। স্কটিশের ছেলেটি এলগিন রোডে থাকে। বিদ্যাসাগরের ছেলেটি চেতলায়; পোষ্টগ্র্যাজুয়েটের ছাত্রটি চাউলপটিতে, সেণ্ট-জেভিয়ার্সের ছেলেটি থাকে চড়কডাঙ্গায়। কিন্তু ওরা সবাই হাজরার মোড়েই নামে।

ললিতা এগোচ্ছিল দৃঢ় দীর্ঘ পদক্ষেপে। পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি দেবার আগ্রহ ওর বিন্দুমাত্র নেই।

'দেখুন!' ললিতা ফিরে দাঁড়ালো। আহ্বানকারীকে শ্রীমোহনের সঙ্গে আমরা দেখেছিলাম সত্য একদিন, এবং বাসে তার সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্যও করা হয়েছে।

বইগুলি হাত বদল করে-'আপনাকে চিন্‌তে পারলামনা বলে কিছু মনে করবেন না'—ললিতা বল্‌লে। কপালের উপর থেকে এক গোছা চুল সরিয়ে—'আপনি কি আমাকে চেনেন?'

প্রেমতোষ বলে ফেল্‌লে—'চিনি, আমি—' ওর কথা আট্‌কে গেল। কয়েকটা ভালো কথার জন্যে ও নিতান্ত মরিয়া মত মনের ভিতর হাতড়াতে লাগলো। 'আমি আপনার—আপনাদের সঙ্গে পড়ি।'

'ও,—আমার বাড়ী আর দূর নেই—ওই যে, আমি কি অন্য রাস্তা দিয়ে একটু ঘুরে যাবো? আপনার কথা কি অনেক?'

কৃতজ্ঞতায় প্রেমতোষের বাকরোধ হোল, বললে—'সত্যি আপনাকে যে কষ্ট দিচ্ছি তার জন্যে আমার দুঃখের সীমা নেই—আমি নিতান্তই লজ্জিত।'

ললিতা হাসলো, উত্তর দেবার নেই বোধ হয় কিছু। হাসবার ভঙ্গিটা ওর চমৎকার! 'শ্রীমোহন আমায় চেনে' প্রেমতোষ আরম্ভ করলে—'তার কাছে আপনার কথা শুনেছি—এবং যেটুকু শুনেছি তার চাইতে বলেছি অনেক বেশী। শ্রীমোহনকে বলেছিলাম—কিন্তু ও যা বল্‌লে তা আপনার কাছে কেমন করে প্রকাশ করি? আপনার মধ্যে একটা বিশিষ্টতা আমাকে ভয়ানক আকর্ষণ করে'—প্রেমতোষের জড়তা কেটে গেছে। উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে; ললিতা বুঝ্‌লে। ওর হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে সে টেনে নিলে অনুভব করত ঠাণ্ডা—হিমশীতল। প্রেমতোষের কথা কোথাও আটকালো না। 'সাধারণ মেয়ে থেকে আপনি যে আলাদা এ কথাটা আমার সব সময়েই মনে হয়,—আপনাকে প্রশংসা না করে থাকতে পারিনে, আপনাকে—I like you very much—believe me—আপনার—'প্রেমতোষ চুপ করলে; প্রথম শিক্ষার্থীর মত ও অনেক ভয় এবং দ্বন্দ্বের

মধ্যে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলে। ও শ্রান্ত হোল ; বললে—'রাগ করলেন ?'

ললিতা ঠিক তেমনি দীর্ঘ পদক্ষেপে চল্‌ছিল। চোখের উপর থেকে বাঁ হাত দিয়ে চুল সরিয়ে দিয়ে ও বল্‌লে—'নাঃ—কথায় রাগ করলে কি মেয়েদের চলে ? কথা গায়ে লাগেনা।' শ্রীমোহন হলে বল্‌ত—'গায়ে লাগেনা কিন্তু মনে লাগে।' কিন্তু প্রেমতোষ আর শ্রীমোহনে তফাৎ আছে। প্রেমতোষ বল্‌লে—'না-না আপনি সত্যি করে বলুন যে রাগ করেননি, কিছু মনে করেননি, আপনার উত্তরের উপর অনেকখানি নির্ভর করছে।'

'না-রাগ করিনি ত! এই যে এসে গেছি, আপনি আসুন না—একটু চা কিংবা আর কিছু—আমার সৌভাগ্য!' প্রেমতোষের মনে হোল এত সম্পদ রাখবার ঠাঁই তার নেই ; বল্‌লে—'না-না, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা'—

ললিতার কথার মাঝখানে বাধা দেবার অভ্যাস নেই, শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা ও করে। প্রেমতোষ কৃতজ্ঞতায় থামলো ; ললিতা বল্‌লে—'কৃতজ্ঞ হবার কিই বা আছে ? আচ্ছা—অনুমতি করেন ত'—'ললিতা যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

প্রেমতোষের গতি আজ মন্থর নয়, ওর চলার মধ্যে ছন্দ বেজে উঠছে।

কিন্তু প্রেমতোষ-ললিতা প্রসঙ্গটা কেমন করে হঠাৎ সবাই জেনে গেল সেটাই আশ্চর্য্যের ব্যাপার। ছাত্রেরা নূতন জিনিষ আলোচনা করবার রসদ পেয়েছে, মেয়েরা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছে, খোলাখুলি আলোচনা ওরা মোটেই পছন্দ করেনা, বড় বেশী hintএর পক্ষপাতী। তবে মেয়ে ছাত্রীরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌছায়নি, সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে ওদের দেরী হয়। ছেলেরা এসব বিষয়ে খুবই তৎপর। ওদের প্রসঙ্গকে ওরা এই বলে শেষ করেছে যে—প্রেমতোষের একমাত্র advantage হচ্ছে ওর কিউপিডের মত চেহারাখানা—আর ললিতা হাজার হোক old maid তথাপি ললিতার মত অলরাউণ্ড মেয়ের প্রেমতোষকে চিন্‌তে দেরী হবে না। তখন পরের chanceটা কার সেটাই ওরা ঠিক করতে পারেনি। কিন্তু মুস্কিল হোল প্রেমতোষের। হৃদয়ে এত বিপুল ঝড় নিয়ে ওর শান্ত হ'য়ে থাকাটা বৈদিক ব্রহ্মচর্য্যের সামিল বৈ কি!

ক্লাসে বেলা হালদার ললিতাকে একটা খোঁচা দিয়ে বল্‌লে—'এই, অমন হাঁ করে লেক্‌চার গিল্‌তে হবে না, আরও সরে বোস, মজার খবর আছে।' অন্য কোন কাজ বা মনোযোগ দেবার কিছু থাকলে ললিতা কখনও পুরানো কথা শোনবার পক্ষপাতী নয়। বেলার গা ঘেঁসে ও বললে—'যাক বাঁচালি তুই—খবর কিন্তু interesting না হ'লে তোর ওই গোলাপি গাল টিপে রক্ত বার করে দেবো।'

বেলা বল্‌লে 'আগে শোন না—দারুণ interesting। হ্যাঁরে তোর দাদা কলেজে আসেনা কেনরে ?'

'মুখপুড়ি এই তোর খবর ? মরেছো ত ?' ললিতা হাস্‌তে লাগল।

'শোন্‌না—বল্‌না আসেনা কেন ?' বেলা উৎগ্রীব দৃষ্টিতে তাকালো।

'এমনি ; বলে কলেজে না এলে ও সুস্থ থাকে। বাড়ীতে বসে ছাইভস্ম যত বাজে বই হজম করে আর সিগারেট পোড়ায়। কাল কলেজে আস্‌বার সময় ডাক্‌তে গিয়ে দেখি বই নিয়ে বসেছে—সাম্‌নে একটিন সিগারেট ; বল্‌লে যাবোনা। বিকেলে গিয়ে দেখি টিনও খালি বইও শেষ! জিজ্ঞাসা করলাম এতগুলো সিগারেট খেলে কি করে ? ষ্টাইল মেরে বলা হোল—তুমি কি বুঝিবে নারী ?'

'এ রকম অবস্থায় ওঁর বিয়ে করা উচিত'—বেলা হেসে বল্‌লে—'তুই কি বলিস ?'

'আমারও তাই মত। ও ত রাজী, বলে—যে মেয়ে ওকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে চাইবে তাকে ও বিয়ে করতে রাজী হতে পারে—কিন্তু সে নিজে কাউকে যেচে বিয়ে করবে না।'

'Silly!' বলে বেলা ঈষৎ উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। পাশের মেয়েরা এবং ছেলেরা সহসা সচকিত হ'য়ে উঠলো। কি যে বিষয় বস্তু সেটা কেউ ঠিক করতে না পেরে অত্যধিক মাত্রায় লেক্‌চারে মনোযোগী হবার চেষ্টা করলে। ললিতা ও বেলার কথাবার্ত্তা এবং চালচলন প্রসিদ্ধ।

বেলা জিজ্ঞাসা করলে—'তোদের ওখানে আজ বিকেলে আস্‌বে ত ?'

'আস্‌তে পারে, তুই আস্‌ছিস্ নাকি?'

'হ্যাঁ—আলাপ করা যাবে।' বেলার চোখের পাতা দুটো ক্ষণিকের জন্যে নেচে উঠল।

'বেশ!'

ছুটির পর বেলা বাস ধরলো। ললিতা চেঁচিয়ে বল্‌লে 'আসিস্ কিন্তু—

'হ্যাঁ আস্‌বো—তুই'—আর কিছু শোনা গেলনা।

ললিতার বাস থেকে নেমে আর হাঁটতে ইচ্ছা করছিলোনা, একটা গাড়ী ডাকবে কি না ভাবছিলো; সৌভাগ্যক্রমে একটা গাড়ীও মিলে গেল। ও উঠে বস্‌ছিল—পিছনে 'একটু দাঁড়ান' শুন্‌তে পেলো। ফিরে দেখ প্রেমতোষ। ললিতা অবশ্য ওর নাম জানে না, সে বিস্মিত হ'ল, বল্‌লে—'আমার আর হাঁট্‌তে ইচ্ছা করছে না, আপনি গাড়ীতে আস্‌তে পারেন।'

প্রেমতোষের সঙ্কোচ বোধ হ'লনা আজ। গাড়ীতে ললিতা যে দিকে বস্‌লো প্রেমতোষ তার উল্টো দিকে বস্‌তে যাচ্ছিল —ললিতা বল্‌লে—'এদিকে বসুন না, জায়গা ত রয়েছে।' কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞাসা করে গাড়োয়ান কোন হদিস্ পেলোনা—চালাতে আরম্ভ করলো। প্রেমতোষের হাতে একটা চকচকে বই ছিলো। বই খানা এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে —'বইখানা আমার খুব ভালো লেগেছে, আপনি নিলে সুখী হবো।' ললিতা বইখানা হাতে নিয়ে মলাট উল্টে প্রেমতোষের নামটা দেখতে পেলো, এককোণে সযত্নে ললিতার নামটাও লেখা। প্রেমতোষ হঠাৎ বলে উঠ্‌লো—'দেখুন, আপনার কোন কাজে উৎসাহ নেই কেন বলুন তো?'

'কি জানি।' প্রেমতোষের আঙ্গুলগুলো ইস্পাতের মত ঠাণ্ডা, লক্ষ্য করলে ললিতা দেখ্‌তে পেতো শুকনো পাতার মত সেগুলো কাঁপছে। অকস্মাৎ অসংলগ্ন ভাবে প্রেমতোষ বলে উঠ্‌ল, 'Do you believe I could love you?'

'Yes!' ললিতা বল্‌লে।

'ললিতা!' প্রেমতোষের মনে হোল ললিতার আঙ্গুল-গুলো আগুনের শিখা, ললিতার হাত ও নিজের হাতে তুলে নিলে—'ললিতা, আমার কি সৌভাগ্য আজ!'

নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে ললিতা রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। 'ললিতা, এসো কাল আমরা কোথাও যাই।'

'কোথায়?'

'যেখানে হয়! যেখানে তোমায় একা পাবো যেখানে পড়াশুনো নেই, কোন উপদ্রব নেই, কোলাহল নেই।' প্রেমতোষের দুটো চোখে বোধ হয় জল এলো। তার চারিপার্শ্বে তাকে আঘাত দিয়ে যাচ্ছে 'yes' কথাটি। ওর সততা দেখে ললিতার কষ্ট হোল। মৃদু হেসে বল্‌লে—'কি হবে? পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি ত'?'

প্রেমতোষ ঘা খেলে, স্বপ্নভঙ্গের আঘাত; বললে—'কি বলছো ললিতা, তুমি কি রাগ করেছো'?

'না রাগ করবো কেন? কিন্তু আপাততঃ কলেজ কামাই করবার ইচ্ছে আমার নেই।—প্রেমতোষ বাবু, আমি আপনার জন্যে দুঃখিত, আমার মন ভালবাসা পাবার জন্যে প্রস্তুত নয়, তবে আপনি যে আমায় ভালোবাসেন—অন্ততঃ ভালবাসতে চেষ্টা করছেন সে কথা আমি বিশ্বাস করি। আমার সৌভাগ্য মনে করতাম—কিন্তু মোটেই আমি প্রস্তুত নেই। আপনি ভালবাসা দিতে চেয়েছিলেন একথা আমার মনে থাকবে।' ললিতা শেষ করলে।

তারপর উভয়পক্ষের আর কোন আলাপ হয়নি। গাড়োয়ান কয়েকটি রাস্তা জরিপ করে অবশেষে ললিতার কাছে ঠিকানা জেনে ওকে বাড়ী পৌছে দিলে। প্রেমতোষ সে গাড়ীতে বাড়ী ফিরলো।

শোবার ঘরে ললিতা ঢুকে দেখে মোহন ওর বিছানায় আরাম করে নাক ডাকাচ্ছে। ও আশ্চর্য্য হোল—লোকটার কি সব সময়েই ঘুম পায়?

ললিতা নীচে এলো; হাতমুখ ধুলে, মায়ের সঙ্গে গল্প করলে অনেকক্ষণ—তারপর উপরে এসে দেখে মোহন তেমনি নিদ্রিত—আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

হঠাৎ নীচে শুন্‌তে পেলো বেলার কণ্ঠ। ললিতা বললে —'এই জলদি আয় মজা দেখবি ত—এক সেকেণ্ডও দেরী নয়।' ললিতার পেছন পেছন ওর ঘরে এসে দেখে শ্রীমোহন শুয়ে আছে—ওর গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ললিতা আস্তে বললে—'there is a surprise for you' বেলা হাসলে।

শ্রীমোহন পাশ ফিরলো, একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে উঠে

বসলো; হঠাৎ বেলাকে দেখে ও আশ্চর্য্য হয়ে গেল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলে ঘুমের মধ্যে কোন যাদুকর তাকে স্থানান্তরিত করেছে কি না! জিজ্ঞাসা করলে—'কি ব্যাপার? অনধিকার প্রবেশ কেন? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত রকম মুখভঙ্গি করেছি হয়ত—'

বেলা বললে—'আমরা এইমাত্র আসছি, অকালে আপনার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য আমরা বাস্তবিক লজ্জিত—ক্ষমা চাইছি।'

শ্রীমোহন উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটো উপর দিকে তুলে আলস্যজড়িত কণ্ঠে বললে—'আচ্ছা—আপনাকে ক্ষমা করা গেল—প্রথম অপরাধ।'

বেলা অবশেষে বললে—'অনেক আলাপ আলোচনা তর্কবিতর্ক হোল, এবার ওঠা যাক্ কি বল্?' বেলা উঠে দাঁড়ালো।

'কেমন করে যাবি—রাত হোল যে?'

'ওঃ—কি আর রাত—বাসেই যাওয়া যাবে।'

'অনুমতি করেন ত পৌঁছে দেবার ভার নিই'—শ্রীমোহন বললে।

'চলুন না—তা হলে বেশ হবে, গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।'

ওরা দু'জনে রাস্তায় এসে নামলো, বাসে বসে কিন্তু গল্প করবার কথা খুঁজে পেলো না বেলা; বললে—'জারনিটা বেশ—কি বলেন?'

'মন্দ নয়।'

দু'জনে দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে যন্ত্রযান সবেগে ছুটে চলেছে। রাস্তাটা যেন সহরের নাড়ী—চঞ্চল-কোলাহলময়। বেলা বল্লে—'আপনার সময় নষ্ট করলাম।'

'না, কোন কাজ ত ছিল না।'

'বাব্বাঃ আপনি এতও ঘুমোতে পারেন, রাত্রে চোখ বোজেন না বুঝি?'

'একটু দেরী হ'য়ে যায় ঘুমোতে। বাজে কাজ আর কি!' মোড়টা ঘোরবার সময় শ্রীমোহন সাম্‌লাতে পারলেনা, আচম্‌কা বেলার গায়ের ওপর হেলে পড়লো। জিজ্ঞাসা করলে—'লাগ্‌লো নাকি?"

'না, শুনুন—আসুন এখানে নামা যাক—ওদিকে যাবো একটু—' বেলা উঠে দাঁড়ালো। ওর অসংলগ্ন বাক্যগুলি শ্রীমোহনের কানে বেসুরো ঠেক্‌লো।

বাস থেকে নেমে শ্রীমোহন জিজ্ঞাসা করলে হঠাৎ নেমে পড়লেন যে? এদিকে কোথায় যাবেন? রাত হল যে!

'হোকনা', মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠে বেলা বললে 'When the stars whisper we meet, when the dawn peeps ws depart—God knows where' বেলা হেসে উঠ্‌লো; আশ্চর্য্য-অদ্ভুত-ক্ষিপ্ত হাসি! কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শ্রীমোহনের কান এড়ালো না। 'চলুন না যাওয়া যাক মাঠের মধ্যে' বেলা বললে, 'ঐ দূরে কেল্লাটা না? ও পাশেই ত গঙ্গা! আপনার আপত্তি আছে নাকি?' বাতাসে উড়তে লাগল ওর অঞ্চল প্রান্ত, আর—শিথিল কবরীমুক্ত কয়েক গোছা চুল; সেদিকে তাকিয়ে শ্রীমোহন বললে, 'না আপত্তি আর কি?'

অন্ধকার নির্জ্জন মাঠের উপর ওরা দুজন বসলো, বলবার অপেক্ষা রাখলোনা কেউই, দূরে মহানগরীর আলোর শ্রেণী; জনতার অস্পষ্ট কোলাহল এখানেও ভেসে আসছিলো মাঝে মাঝে, আর—মিলিয়ে যাচ্ছিলো মৃদু থেকে মৃদুতর হ'য়ে; সভ্য-জগৎ এখনও বেঁচে আছে। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, শ্রীমোহন আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে তারাদের প্রশ্ন খুঁজছিলো।

শ্রীমোহন মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—'কি?'

বেলা চুপ করে রইলো। এতো মৃদু কণ্ঠ—প্রায় অব্যক্ত। প্রশ্নের কি উত্তর দেবে? প্রশ্নটা কার উদ্দেশে? মহানগরীর কোলাহল থেমে আসছে ধীরে ধীরে—কিন্তু ওদের অন্তরের কোলাহলের আর বিরাম রইলোনা।

শ্রীমোহন পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো—'কি?—বলুননা!'

এক মিনিট চুপ করে থেকে হঠাৎ বেলা বলে উঠ্‌লো, 'হ্যাঁ বলব বই কি কিছু, বলতেই ত হবে।'

আবার কয়েকটি মুহূর্ত্তের ছেদ।

'আচ্ছা শ্রীমোহনবাবু, আপনি নাকি পণ করেছেন যতদিন না কোন মেয়ে আপনাকে যেচে বিয়ে করতে রাজি হয় ততদিন আপনি বিয়ে করবেন না?'

'তাই নাকি ?' শ্রীমোহন আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কিন্তু কার কাছে শুনলেন আপনি ?'

একটুখানি ছেদ। কয়েকটা মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হল।

'যার কাছেই শুনিনা কেন' বেলা বললে, 'সেটা অবান্তর—কিন্তু তাই কি আপনার পণ নাকি ?'

শ্রীমোহন অন্ধকারে অনুভব করল তার মুখের ওপর এক জোড়া ব্যাকুল চোখের দৃষ্টি!

'কেন ?' শ্রীমোহন বললে, 'তেমন মেয়ে পাওয়া যাবে না ?'

দূরে মাঠের ওপর দিয়ে একখানা ট্রাম খিদিরপুর অভিমুখে ছুটে চলেছে, একখানা মোটারের অপসৃয়মান লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে রইলো শ্রীমোহন।

বেলা হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে আশচয্য করুণ কণ্ঠে বলে উঠ্‌লো—'আমি রাজি—আমি রাজি—আমি—আপনার পণ পূর্ণ করতে—'ওর কণ্ঠ রোধ হ'ল; শান্ত করে আনলো সে তার হৃদয়ের বাত্যাকে।

আর—শ্রীমোহন বিস্মিত হল। ওর মনে হল কে যেন তার কানের উপর মুখ রেখে কাঁদছে। শ্রীমোহন বললে—'মোহানার এক নিস্তরঙ্গ নদী আমি, আমায় ক্ষমা করুন—'

অন্ধকারে দেখা গেলনা বেলার মুখ। রাত্রি গভীর হ'ল, আকাশে তারার দল কানাকানি আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ বেলা দাঁড়িয়ে বললে—'চলুন, ইস্ অনেক রাত্রি হ'য়ে গেল!'

ওরা নিঃশব্দে রাস্তায় এসে পড়লো।

একটা বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে বেলা বললে—'আচ্ছা!—আমি যেতে পারবো, আপনি আর কেন কষ্ট করবেন ?'

বাস এসে পড়লো, বেলা এগিয়ে গেল।

'চলুন না—পৌছেই দিই আপনাকে' শ্রীমোহনও এগিয়ে গেল।

বেলা অনেককে ফিরিয়েছে; কিন্তু ওকে কেউ ফেরায়নি। এ ভাবে মূল্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে সে চায়নি। ও কলেজে যাওয়া কমিয়েছে, ললিতার ওখানে আর যায়নি, শ্রীমোহন একদিন ললিতাকে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছিলো বেলার আস্‌বার জন্য; তাতেও সে যায়নি।

ভাবান্তর ঘট্‌লো ললিতার মনে। সে একদিন ছুটির পর গোয়েন্দার মত প্রেমতোষের অনুসরণ করে ওকে পাকড়াও করলে; জিজ্ঞাসা করলে—'কেমন আছেন ? আজকাল আপনার দেখা পাইনা যে ?' ললিতার মনে হোল প্রেমতোষের মুখখানা আশ্চর্য্য রকম করুণ, চোখের উজ্জলতায় অত্যধিক আকর্ষণ। প্রেমতোষ বল্‌লে—'দেখা পাননা এমনিই, কলেজে রোজ আস্‌তে ইচ্ছে করেনা, আপনি কেমন আছেন ?'

'ভালো, ধন্যবাদ। দেখেছেন ছেলেগুলো কি আরম্ভ করেছে ? এ পাশদিয়ে ছাড়া ওদের যাবার অন্য রাস্তা যেন নেই, চলুন যাওয়া যাক্ আপনার কোন কাজ নেই ত ?'

'না, কাজ আর কি! চলুন।'

ওরা এমন স্থানে এলো যেখানে তাদের বাক্যালাপে বাধা দেবার কেউ নেই, বা ছড়ানো কথা কারুর কানে যাবার সম্ভাবনা অল্প।

ললিতা নানা কথার পর বল্‌লে—'চলুন সিনেমায় যাওয়া যাক্ আজ রাত্রে।'

'কিন্তু'—প্রেমতোষ বল্‌লে—'আমার ভালো লাগ্‌বেনা।'

'কোনটা, সিনেমা না আমার সঙ্গ ?'

'দুটোই'—

'আপনার স্পষ্ট কথার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

'ও!'

কিন্তু মুস্কিল হ'ল শ্রীমোহন এবং বেলাকে নিয়ে। শ্রীমোহনের অবস্থিতি কোন প্রকারেই বেলার মনে প্রাধান্য বিস্তার করবে এটা সে সহ্য করতে পারছে না; কিন্তু তার কাছে সহজ হ'য়ে থাকৃতে পারছেনা বলেও ওর আফসোষের অন্ত নেই।

একদিনের কথা আপনাদের বল্‌ছি।

বেলাকে একদিন একান্তে পেয়ে শ্রীমোহন বললে, 'কিন্তু একদিন ত আমার পণ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন—'

একটু কাছে সরে এসে অদ্ভুত একটা গ্রীবাভঙ্গি ক'রে বেলা হালদার বল্‌লে—'তা ত ছিলই না—কিন্তু আজ ত আর সেদিন নয়। সময়-সমুদ্রে অনেক উর্ম্মি চুরমার হ'য়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে অনেক বুদ্‌বুদ; একটু কাব্যি করে ফেললাম বুঝি!' বেলার ভ্রূযুগল উপর দিকে ক্ষণিক নেচে

উঠ্‌লো ; আশ্চর্য্য এক টুকরো হাসি ওর প্রজাপতির পাখার মত পাতলা ঠোঁটের উপর দিয়ে চমকে গেল বিদ্যুতের মত।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে—আর একবার সেই আশ্চর্য্য হাসি হেসে বেলা হালদার ছুঁড়ে দিলে—'Good Luck !'

'Thank you !' শ্রীমোহনের শীতার্ত্ত কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হল, পকেট হাতড়ে দেখে একটিও সিগারেট নেই।

কয়েকদিন পরের কথা।

প্রেমতোষ পার্ক ষ্ট্রীট থেকে একটা বাসে উঠে দেখে বড্ড ভীড়। সমস্ত আসন অধিকৃত, শুধু একটা সিটে একাকী এক মেয়ে—কোলে বই। প্রেমতোষের এতখানি রাস্তা দাঁড়িয়ে যাবার ধৈর্য্য ছিল না ; স্থানাভাবে সে মেয়েটির পাশে বসে পড়লো এবং এক মিনিটের মধ্যেই আবিষ্কার করলো যে পার্শ্ব উপবিষ্টা তাহারি সহপাঠিনী বেলা হালদার। কোনদিন পরিচয় ছিলনা ওর সঙ্গে—কিন্তু আজ যেন ওর সাড়ীর প্রান্ত, সুন্দর পা, কবরীগুচ্ছ প্রেমতোষের মনে হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে গেল।

বাসটা ভবানীপুর এসেছে—প্রায় খালি। বেলা যাচ্ছিলো বালীগঞ্জে ওর এক আত্মীয়ের বাড়ী। প্রেমতোষ ভাবছিল অন্য সিটে উঠে যাবে কিনা। শুনতে পেলো বেলা হালদার তাকে বলছে—'আপনি অন্য সিটে গিয়ে বসুন, আমার অসুবিধে হচ্ছে।'

'আপনার অসুবিধে হচ্ছে !'—প্রেমতোষ বললে—'আপনি অন্য সিটে গিয়ে বসুননা।'

'আপনি উঠ্‌বেন না ?'

'তাই ত ভাবছি।'

'Brute Swine ! ভদ্রমহিলার সঙ্গে কি করে ব্যবহার করতে হয় জানেন না।'

'আপনি কি সে বিষয়ে শিক্ষা দেন ? স্কুলের ঠিকানাটা পেলে গিয়ে শিখে আস্‌তে পারি।'

চুপচাপ।

পরের ষ্টপেজে মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। প্রেমতোষ দাঁড়িয়ে ওকে যাবার সুবিধে করে দিলে ; নেবে যাবার সময় প্রেমতোষ অনুচ্চস্বরে বল্‌লে—'আপনি একটি perfect ছোট লোক।' বেলা হাতের পেন্সিলটা তাক করে প্রেমতোষের নাকের ওপর ছুঁড়ে মেরে নেমে গেল।

বাস থেকে নাম্‌বার সময় নাকে হাত দিয়ে দেখলে ব্যথা হয়েছে।

বাড়ী এসে প্রেমতোষ ঘোষণা করে দিলে—ও বিয়ে করবে, tired। লেখাপড়া জানা মেয়ে না হলেও ওর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। মাকে বল্‌লে—'মা, আর্জ্জিটা ম্যানেজার সাহেবের কাছে পেস করে দাও।'

ঘটক এসে প্রেমতোষের ম্যানেজারকে জপিয়ে গেল। সব পাকাপাকি, যাবার সময় পাত্রের কাছ থেকে পাঁচটা টাকাও নিয়ে গেল।

মরসুমটা বিয়ের এপিডেমিক বল্‌লেও অসঙ্গত হয় না ; চারিদিকে সানাই বাজছে। এদিকে হঠাৎ একদিন ললিতাও বেলার বিয়ের এক নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে একেবারে বিস্মিত হয়ে গেল। মুখপুড়িটা একবার জানায়ওনি—একবার আস্‌তেও পারলোনা। কিন্তু সেদিনই বেলা হাজির হোল ; ললিতাকে এবং বিশেষ করে শ্রীমোহনকে বলে গেছে—ওরা না গেলে ও বিয়ে করবে না—বরকে ভাগিয়ে দেবে।

বরকে ভাগাতে হয়নি, ওরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিল। কিন্তু বরকে দেখে ওরা দু'জনেই বিস্ময় দমন করতে পারলে না। বরাসনে উপবিষ্ট সুসজ্জিত প্রেমতোষ, গলায় মালা, আর—কপালে চন্দন-তিলক।

শ্রীরজত সেন

বিচিত্রা

শ্রীমতী তরলিকা দেবী

জীবন-মরুর পথে প্রান্তরে
এ কী রূপে দিলে দেখা,
প্রাণের পরতে এঁকে দিলে মোর
গোধূলি আলোর রেখা !
আনমনা হ'য়ে চলেছিনু ধীরে
বেলা শেষে কোন্ বালুকার তীরে,
বিস্ময়ে হেরি আননে তোমার
উষার কর্ম্মলেখা,
সান্ধ্য-উষার লীলাতরঙ্গে
নির্ব্বাক আমি একা !

চঞ্চল মন কম্পিত আজি
অপরূপ শিহরণে
জাগিয়া উঠিল উন্মাদনায়
বসন্ত বনে বনে !
চৈতালি শেষে উদাসী হাওয়ায়
তীব্র তোমার চোখের চাওয়ায়
প্রতিভা দেখেছি শান্ত কখনো
অশান্ত ক্ষণে ক্ষণে,
নির্ভরতার ফাঁকে ফাঁকে কোন্
ঝড়ের ঝঞ্ঝাস্বনে !

আঁধার এসেছে ঘেরি চারি ধার
ব্যাকুলিয়া ওঠে প্রাণ,
নূতনপথের সন্ধানী তুমি
দিতে চাও তব দান !
সোনার কাজল যুগল নয়নে
পরালে আসিয়া, জড়িত চরণে
শীর্ণ পথের কাণ্ডারী সনে
অজানার অভিযান,
বিস্মরনীর তীরে তীরে কোন্
চেতনার বহমান !

লঘু ক্রিয়া

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

এক মাসের মাইনের টাকা পকেটে ফেলিয়া আপিস হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে বিজন হঠাৎ স্থির করিয়া ফেলিল, সাংসারিক খরচ-পত্র অসম্ভব রকম কমাইয়া ফেলিতে হইবে।

পকেট হইতে খালি সিগারেটের বাক্সটা ফেলিয়া দিয়া সে মোড়ের একটা দোকোনে এক পয়সার বিড়ি কিনিল। দড়ির আগুনে বিড়ি ধরাইয়া ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে গিয়া উঠিল। সাধু সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব করা সুবুদ্ধিসঙ্গত নয়। সে ইহা লক্ষ্য করিয়াছে, এ সব কাযে ভাবিবার সময় নিলেই যত রাজ্যের দ্বিধা, বিঘ্ন এসে জোটে, শেষ পর্য্যন্ত সংকল্প, ইচ্ছার কল্পলোক ছাড়িয়া আর কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে না।

একজন হ্যাটকোটপরা পুরোদস্তর বাঙালী সাহেবকে বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চাপিতে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত ভাবে চাহিয়া দেখিল। পাশের লোকটী সসম্ভ্রমে অনেকখানি যায়গা ছাড়িয়া দিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বসিল। কিন্তু এসব দিকে বিজনের দৃষ্টি ছিল না। খরচের কোন্ কোন্ অঙ্গে কি রকম কুঠার নিক্ষেপ করিতে হইবে, সে মনে মনে তাহারই একটা খস্ড়া তৈরি করিয়া ফেলিতেছিল। অণুর হাত ভীষণ বাড়িয়া গিয়াছে। টাকাটা খরচ করিয়া ফেলিতে এতটুকু ভাবে না, একটা টাকার মূল্য যেন তার চোখে একটা পয়সার চেয়েও কম! এ চলিবে না। এখন হইতেই একটু একটু করিয়া হাত গুটাইতে হইবে, কখন কি হয় কে বলিতে পারে? এই তো আপিসের শ্রীপতি বাবু, চাকুরি থাকিতে, আজ পার্টি, কাল সিনেমা, পরশু পিক্‌নিক্, রোজ উৎসব এবং দুই হাতে টাকা উড়াইয়াছে। দুই মাস চাকরি গিয়াছে, এখন ছেলেপুলে নিয়া দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। থিয়েটার সিনেমা যাক্ চুলোয়! —না অণুকে এটুকু বুঝিতেই হইবে।

অবশ্য সে জানে, প্রথম অণুর একটু কষ্ট হইবে। বড় লোকের মেয়ে সে, চিরদিন না চাহিতেই প্রয়োজনের বেশী জিনিসপত্র পাইয়া আসিয়াছে। কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত সে নয়, তবু, অণু তো অবুঝ নয়, সে জানে তার স্বামীর নেহাৎই চাকুরীগত প্রাণ, আনিয়া-নিয়া খাইতে হয়। তাহাদের খরচও করিতে হইবে অনেক বুঝিয়া শুঝিয়া।

বাড়ী গিয়া সে অন্যদিনের মত চাকরকে ডাকিল না। নিজেই একটা চেয়ারে বসিয়া জুতোর ফিতে খুলিতে লাগিল। স্ত্রী অণিমা ঘরে ঢুকিয়া এ নূতন ব্যবস্থা দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—এ আবার কি, জগা কি অপরাধ করলে?

বিজন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—জগা কোন অপরাধ করেনি। কিন্তু তুচ্ছ একটা জুতোর ফিতে খুলতে চাকরকে ডাকতে যাবো কেন?

অমিতব্যয়ী অণিমার উপর স্বাবলম্বন ও মিতব্যয় সম্বন্ধে একটা সারগর্ভ বক্তৃতা ঝাড়িয়া দিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়া উঠিল। কিন্তু চপলচিত্ত অণু তার উপদেশবাণী শুনিতে এতটুকু আগ্রহ দেখাইল না। মাঝখানেই সে তার বড় বড় চোখ দুটোকে আরো বড় করিয়া বলিয়া উঠিল—ও, তাই বল, আমি ভাবছিলুম বুঝি—

মনের বিরক্তি চাপিয়া রাখিয়া বিজন কোটটা খুলিয়া আলনায় ঝুলাইয়া রাখিল, তারপর নেক্-টাই খুলিতে খুলিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আমি বলছিলুম কি, অণু—এই—, জানি প্রথম ক'দিন তোমার একটু কষ্ট হবে,—কিন্তু তবু—

কথাটা শেষ করিতে পারিল না। রাস্তায় যদিও অনেকবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে মক্স করিয়া আসিয়াছে কেমন করিয়া অণিমাকে পথে আনিতে হইবে—প্রথম সানুনয় অনুরোধ, তারপর মৃদু অনুযোগ, তাতেও

না হইলে শেষ পর্য্যন্ত অল্প এতটুকু ক্রোধ—কিন্তু মুখোমুখি আসিয়া তার বাছা বাছা যুক্তিগুলি সব যেন পেটের ভিতর তলাইয়া গেল। কিছুতেই তার বক্তব্যগুলো সে গোছাইয়া বলিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অণিমা বলিল—কথাটা কি খুলেই বল না। বিজনের উৎসাহ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল, বলিল—না, তেমন কিছু নয়, বলছিলুম কি আমাদের এই—ইয়ে—খরচগুলো একটু বেশী বেড়ে গেছে, নয় কি? তা—যদি এখন থেকে একটু বুঝে সুঝে—

—ও এই কথা,—অণিমা হাসিয়া বলিল,—তা এতো অতি ভালো কথা, আর সত্যিই তো, এখন থেকে আমাদের একটু বুঝে সুঝে খরচ করা উচিত, সংসার বাড়তে চললো—

বিজন উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া স্ত্রীর দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া মৃদু একটু চাপ দিয়া বলিল—সাবাস্ অণু, এই তো চাই, আমি জানি তোমার সাহায্য আমি পাব। এখন ছুট্টে যাও দিকি লক্ষ্মীটি, এক শিট কাগজ নিয়ে এসো, বাজেটটা ঠিক করে ফেলা যাক্।

—এখনই? আপিস থেকে এলে খেটেখুটে, একটু জিরোও, জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হও। বাজেট তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।—

—না, এসব কাজে দেরি করতে নেই,—তা খেতে যদি হবেই, তবে না হয় নিয়ে এসো এক কাপ চা—খান দুই লুচিও দিতে পার, খালি পেটে চা-টা আর খাব না, কিন্তু ঐ দু'খানা, তার বেশী নয়,—হাঁ, আর যদি পেঁপে থাকে, তবে এক টুক্‌রো না হয় দিয়ো—

অণিমা একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেল। খানিক বাদে একটা রেকাবিতে সাত আট খানা লুচি, কিছু হালুয়া, আটখানা পেঁপে, এক গ্লাস জল আর এক কাপ চা লইয়া আসিল। ইহা দেখিয়াই বিজন লাফাইয়া উঠিল—করেচ কি অণু, তুমি কি আমায় রাক্ষস ঠাওরালে নাকি? এত কি খেতে পারি?

—চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? ব্যয়সংক্ষেপ খুবই ভালো, কিন্তু উপোস থেকে অসুখ করলে ব্যয়সংক্ষেপ না হয়ে তার উল্টোটা হওয়ারই বেশী সম্ভাবনা।

তাও ঠিক। অগত্যা বিজন ক্ষুণ্ণমনে খাইতে বসিয়া গেল। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়া যখন সে পকেট হইতে বিড়ি খুলিয়া ধরাইল, তখন দেখা গেল রেকাবিতে আহার্য্যের অবশিষ্টাংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু পড়িয়া নাই। বিড়ির ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হইয়া উঠিল। প্রবল বিবমিষা সত্ত্বেও অণিমা নাকে কাপড় দিল না। দগ্ধাবশিষ্ট বিড়িটা জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া বিজন কাগজ কলম নিয়া বাজেট ঠিক করিতে বসিল। অণিমাও একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া গভীর সহানুভূতির সহিত তাহার কাজে সহায়তা করিতে লাগিয়া গেল।

বিজন বলিল—প্রথম বড় বড় দাগগুলো ধরা যাক্।—আচ্ছা, অণু, এখন আমাদের একজন ঠাকুর একজন চাকর আছে, না? দুজনার মাইনে দিতে হয় কুড়ি টাকা, আমি বলি কি, ঠাকুরকে ছাড়িয়ে দিলে হয় না,—আমাদের তো সে সব প্রেজুডিস্ নেই। জগা দু'জন লোকের রান্না করতে পারবে না?

অণিমা যেন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—পারবে হয়তো, কিন্তু সে কি রাজী হবে?

—কেন রাজী হবে না, এখন আট টাকা পাচ্ছে, না হয় দশ টাকা করে দেব, খুসী হয়ে যাবে, আর কাযই এমন কি বেশী? না হয় একবেলা বাজার আমিই করবো।

অণিমা মুগ্ধ হয়ে গেল, বলিল—হলে তো ভালই হত, কিন্তু আমাদেরই যেন প্রেজুডিস্ নেই, ধর, যদি দেশ থেকে কেউ আসেন, তখন? তারা তো চাকরের রান্না খেতে চাই-বেন না!

অকাট্য যুক্তি, বিজন দমিয়া গেল, প্রারম্ভেই হতাশা। দশটা টাকা বাঁচিয়া যাইত। অদৃশ্য অভ্যাগতদের প্রতি তার মন বিরূপ হইয়া উঠিল।

গম্ভীর মুখে কতক্ষণ কলমটা নাড়া চাড়া করিয়া সে আবার বলিল—আচ্ছা এটা না হয় গেল, বাড়ী ভাড়ার টাকা থেকে তো অনায়াসে কিছু সেভ্ করা চলে। উপরে নীচে এখন আমাদের পাঁচটা ঘর আছে, মানুষ তো সবে দু'জন, আর ওই ছোট্ট দু'বছরের খোকন, আমি বলি উপরের তিনখানা ঘর আমাদের রেখে নীচের ঘর দু'খানা ভাড়া দিয়ে দিলে হয় না?

অণিমা সোৎসাহে বলিল—নিশ্চয় হয়, কেন হবে না? দুখানা ঘরেই আমাদের যথেষ্ট হওয়া উচিত। ইচ্ছা করলে উপরের একখানা ঘরও ভাড়া দেওয়া যেতে পারে।

বিজন পরম ঔদার্য্যভরে বলিল—তা পারে বটে, কিন্তু তার আর দরকার নেই। অতিথি অভ্যাগত এলে তো একখানা ঘরের দরকার হতে পারে।

—ও পাটটা একেবারে উঠিয়ে দিলে হয় না? অনেক খরচ বেঁচে যেত।

অণিমা কি ঠাট্টা করিতেছে? অতিথি অভ্যাগতের পাট উঠিয়া গেলে বিজনের পক্ষ হইতে আপত্তি করিবার কিছুই ছিল না, অন্ততঃ তার বর্ত্তমান মনের অবস্থায়। ব্যয়সংক্ষেপ করিতে সে কৃতসংকল্প, ফল তার যাই হোক্। কিন্তু অতটা অগ্রসর হইতে তাহার সাহস হইল না, অণু মুখে যাই বলুক, মনে মনে হয়তো—

সে বলিল—এমাস থেকেই একটা ভাড়াটে যোগাড় করে ফেল্‌তে হবে। যাক্‌গে তাহলে এদিকে অন্ততঃ পনেরো-কুড়ি টাকা বেঁচে যাবে।—

তার মনের মেঘ অনেকটা কাটিয়া গেল, প্রফুল্ল মুখে বলিল—আর দেখ, ছোট ছোট দাগগুলো থেকেও কিছু কিছু করে সেভ্ করতে হবে। গয়লা ক'সের করে দুধ দিচ্ছে?

—দু'সের।

—কাল থেকে পৌনে-দু'সের করে নিয়ো। দুবেলা দুধ আমার সহ্য হয় না, কদিন ধরে অম্বলটা আমার বেড়ে উঠেচে।

—দেড় সের করে নিলেই হবে, আমারও কলিকৃটা—

বিজন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—না না, তোমাদের বরাদ্দ থেকে কম করলে চ'লবে না, তা এ গয়লা কত করে দিচ্ছে?

—টাকায় চার সের।

—টাকায় চার সের! বিজন দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল,—গলা টিপে পয়সা নিচ্চে বল। যত সব গলাকাটা এসে জুটেচে। কালই ওর সব পাওনা চুকিয়ে ওকে বিদেয় করে দিয়ো। আমি নূতন গয়লা আনবো, খাঁটি দুধ, টাকায় পাঁচ সের। কাগজে বড় বড় আঁচড় কাটিয়া লিখিতে লিখিতে বলিল—আর দেখ, অণু, রোজকার বাজার খরচের দিকে তোমায় একটু নজর রাখতে হবে। ঐ জগা বেটা হচ্চে, জানলে কিনা, যাকে বলে চোরের সর্দ্দার। সুবিধে পেলেই টাকায় চার আনা মেরে দেবে। ওর ওপর কড়া দৃষ্টি রাখবে। এক পয়সার জন্যে ওরা গলায় ছুরি দিতে পারে, ওদেরও বিশ্বেস করে!—

দিন তিনেকের মধ্যে নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়া নীচের ঘর দুইখানা দখল করিয়া বসিলেন। ছোট পরিবার—কর্ত্তা, গিন্নি আর আট নয়টী ছেলে মেয়ে মাত্র। বাড়ীতে চাঁদের হাট বসিয়া গেল। 'খিদে পেয়েছে মা', 'আমার কাপড় কোথা', 'এঁ্যা, এঁ্যা, পটলা আমায় মেরেচে', 'ভাল হবেনা ভূতি',—প্রভৃতি বিচিত্র কলরবে দুইদিন আগে শান্ত নিস্তব্ধ বাড়ীখানা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মায়াযষ্টির সংস্পর্শে বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। সকাল হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত একটানা চেঁচামিচি, ডাকহাঁক, ছুটোছুটি, মারামারি, চীৎকার, কান্না চলিতে থাকে। উপরে তরুণ দম্পতী তাদের নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রার ছন্দোবদ্ধ গতিপথে এই উচ্ছৃঙ্খল, চাঞ্চল্যময় পরিবারের সান্নিধ্যটুকু বেশ উপভোগ করিতে লাগিল।

বিজন তার প্রথম প্রচেষ্টার আশাতিরিক্ত সাফল্যে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। অণিমার মনে মনে যদিও স্বামীর এ প্রবল উৎসাহের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় ছিল, তবুও বাহিরে সে যথাসম্ভব সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ক্রটী করিল না। ভাড়াটিয়ার বড় ছেলে মাখনলালের বয়স বছর কুড়ি একুশ, বব্ করা চুলের উপর সযত্নে কাটা টেড়ি। গায়ে সিল্কের গেঞ্জি, পরনে কোঁচানো ধুতি, পায়ে বার্ণিশ করা পম্পশু। স্কুল কলেজের ধার ধারে না! বছর দুই আগে স্কুলের একটা বিশেষ ক্লাসের গণ্ডী পর পর কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও ডিঙ্গাইতে না পারিয়া সে স্কুল ছাড়িয়াছিল, আর সে দিকে যায় নাই। কাজকর্ম্মও বিশেষ কিছু নাই।—বাপ মাঝে মাঝে রুখিয়া উঠিয়া বলেন এত বড় ধাড়ি ছেলেকে বাড়ীতে বসাইয়া খাওয়াইবার সামর্থ্য এবং ইচ্ছা কোনটাই তাহার নাই। মা মধ্যস্থ হইয়া বলেন ইস্কুলের পোড়া মাষ্টারগুলো যদি তাহার ছেলের অসীম গুণাবলী সম্বন্ধে অন্ধ হইয়াই রহিল, আর আপিসের চোক্‌খেগো সাহেবগুলোও যদি এহেন মাখনলালকে চাকুরি দিতে মোটেই আগ্রহ প্রকাশ না করিল তবে ছেলে করিবে

কি ?—মাখনলাল কিছুই বলে না। পিতা ও মাতার মতান্তরের নিরাপদ ফাঁকটিতে আত্মগোপন করিয়া সে, হাসিয়া, খেলিয়া আড্ডা দিয়া দিন কাটাইয়া দেয়।

সকালবেলা যখন পিতার আপিস গমনের উদ্যোগ আয়োজনে মায়ের হাতের কাজ এবং মুখের বাক্যস্রোত সমানবেগে চলিতে থাকে, মাখনলাল তখন ঘরের এক কোণে মাদুরের ওপর আড় হইয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত আরামে চোখ বুজিয়া বিড়ি ফুঁকিতে থাকে। স্নানান্তে পিতা ব্যস্তভাবে আহার করিতে বসিয়া যান, মাতা এক রাশ ফরমাসের সঙ্গে ভাতের থালা সম্মুখে ধরিয়া দিয়া ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে লইয়া পড়েন, মাখনলাল একই অবস্থায় বসিয়া শিষ দিয়া গান করে—'পরদেশী বঁধূ'—

পিতা আপিসে চলিয়া গেলে এবং ছোট ভাইবোনগুলো চারদিকে ছড়াইয়া পড়িলে ছোট একটা টিনের সুটকেস্ হইতে বাহির হয় গন্ধতেল, সাবান, ক্রিম প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্য, ধীরে সুস্থে স্নানাহার পর্ব্ব শেষ করিয়া, সস্তা চীনাসিল্কের জামাখানা গায়ে দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে মাখনলাল বাহির হইয়া যায়। রাত্রি দশটার আগে প্রায়ই ফেরা হইয়া ওঠে না।

আপিস হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বিজন শুনিতে পাইল নীচে যেন একটা খণ্ডপ্রলয়ের পূর্ব্বাভাস চলিয়াছে। গর্জ্জন, বর্ষণ সমান অপ্রতিহতবেগে চলিতেছে, ঝড়ের প্রলয়ঙ্কর মাতামাতিরও অভাব নাই। গিন্নি কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া ক্রন্দন বিজড়িত স্বরে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কি যেন বলিতেছেন, তাহা যে স্বামী-স্ত্রীর প্রীতিসম্ভাষণ নয়, ইহা উপর হইতেও স্পষ্ট বোঝা যায়।

কর্ত্তা মৃদু শাসনের সঙ্গে অনুনয় মিশাইয়া বলিলেন—থাম এবার যথেষ্ট হয়েচে, আর লোক হাসিয়ে কায নেই, উপরে ভদ্রলোক বাড়ী ফিরেচেন, কি বলবেন এসব শুনলে ? গিন্নি ক্রন্দন ছাড়িয়া খেঁকাইয়া উঠিলেন—ওঃ, কে কি বল্‌বেন তাই ভেবে আমি মরচি আর কি! কেন ওরা বলবার কে ? আমরা কারো খাই, না পরি, না কারো তালুকে বাস করি ? ভাড়া দিই, ঘরে থাকি, এক কথা বললে দশকথা শুনে যেতে হবে না ?

—আচ্ছা, আচ্ছা খুব হয়েচে এবার চুপ কর দিকি—

—ইস্ চুপ কর দিকি! কেন কারো ভয়ে নাকি ? বলবো না ? একশো' বার বলবো—রাস্তার লোক ডেকে এনে শুনিয়ে বল্‌বো। কেন আমার একখানা জিনিষ আনতে হলে লোকের টাকায় আগুন লেগে যায় কেন ? অমি কিছু বুঝি না আর —এই নেড়ি, ভাল হবে না বলচি, আস্‌বি কিনা এদিকে ? —হাঁ আমি যেন ন্যাকা, কিছুই বুঝি না, না ? তবে ভাঙ্গবো হাটে হাঁড়ি ?—

কর্ত্তা যেন করুণ মিনতি ভরা সুরে কি বলিলেন, গিন্নী তাহা কানে না তুলিয়াই বলিয়া চলিলেন—সেদিন পাঁচ টাকার কাপড় কিনে নিয়ে কোথায় দিয়ে আসা হল ? বলি কে সে ? এতই যদি দরদ তবে সেখানে গিয়ে থাক্‌লেই হয়, এখানে আবার মরতে আসা কেন ?

ক্রোধপূর্ণ স্বরে কর্ত্তা বলিলেন—বড্ড বাড়িয়ে তুলচো, ভাল হবে না বলে দিচ্চি। গিন্নি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—ইস্ আবার ভয় দেখান হচ্চে, 'ভাল হবে না! কেন কি হবে ? হক্ কথা বলবো না ? বলে 'বামনের পাতে গুড় আর ধোবার পাতে চিনি,' নিজের মাগ-ছেলের হাতে একটি পয়সা দেবার মুরোদ নেই !···তারপর যাহা হইল তাহা সনাতন দাম্পত্যলীলার একটা অতি সাধারণ, নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। উপরে বিজন শিহরিয়া উঠিয়া একবার চকিতে অণিমার মুখের দিকে চাহিয়া গভীর মনোযোগের সহিত চায়ের পেয়ালায় ঘন ঘন চুমুক দিতে লাগিল।—

রাত্রে খাইতে বসিয়া দুধের বাটীতে মুখ দিয়াই বিজন মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল—একি দুধ, অণু, এ যে একেবারে জল। তোমায় বার বার করে বললুম ও হতভাগা গয়লাকে ছাড়িয়ে দিতে—

অণিমা বলিল—তাকে তো কাল থেকেই ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েচে, এযে নতুন গয়লার দুধ—সেই খাঁটি দুধ, টাকায় পাঁচ সের।

বিজন অপ্রতিভ হইয়া বলিল—ওঃ, তা দুধটা আদতে মন্দ নয়, জ্বাল একটু কম হয়েচে তাই—জগা, জগা, ঠাকুরকে বলে দিবি কাল থেকে দুধটা যেন ঘন করে জ্বাল দেয়।

অণিমা বলিল—হাঁ আর বলে দিস্ ঐ সঙ্গে আধপোটাক্ চিনিও যেন বেশী দেয়—

বিজন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—চিনি ? কেন চিনি বেশী দিতে হবে কেন ?

—নইলে দেড় সের দুধকে জ্বাল দিয়ে দিয়ে আধ সের করলেও, সেটা খেতে মোটেই মুখরোচক হবে না।

পাকশালার খুঁটিনাটিতে বিজনের জ্ঞানের পরিধি মোটেই বিস্তৃত ছিল না, কাজেই আর নিরর্থক কথা না বাড়াইয়া সে এই ব্যবস্থাই মানিয়া লইল।

দিন কয়েক পর এক দিন প্রাতে বিজন দেখিল তাহার দেড়শো টাকা মূল্যের সোনার ঘড়ীটি ডেস্কের ভিতর হইতে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তিনটী ঘরের সমস্ত বাক্স, দেরাজ পাতি পাতি করিয়া খোঁজা হইল, ঘড়ী পাওয়া গেল না। সঙ্গে সঙ্গে অণিমা আবিষ্কার করিল যে তাহার জড়োয়া ব্রূচ খানাও বাক্স সমেত ঘড়ীর অনুগমন করিয়াছে। এক সঙ্গে দুই দুইটী দামী জিনিষের অন্তর্ধান! মিতব্যয়পন্থী বিজন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

দুঃখের প্রথম বেগটা প্রশমিত হইয়া গেলে পর চাকর জগবন্ধুর ডাক পড়িল, সে কাঁদ কাঁদ স্বরে জগড়নাথের নাম লইয়া বলিল সে ঘড়ী এবং ব্রূচ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। উপরন্তু সে ইহাও বলিল যে কাল সন্ধ্যায় দাদাবাবু এবং দিদিমণি বায়স্কোপে যাওয়ার পর নীচেকার কর্ত্তাবাবুর বড়ছেলে—অর্থাৎ মাখনলাল—একবার দাদাবাবুর খোঁজ করিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যার পর সে মাখনলালকে উপর হইতে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে দেখিয়াছে। অবশ্য বাবু এমন প্রায়ই উপরে যাওয়া আসা করিয়া থাকেন ইত্যাদি।—

এ ব্যাপারের এখানেই শেষ হইল। বিজন বা অণিমা কেহই হারানো জিনিষ সম্বন্ধে আর কোন কথা তুলিল না। কিন্তু অণিমা লক্ষ্য করিল ব্যয়সংক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই যেন বিজনের মনে এতটুকু খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছে তাহার পূর্ব্বের সেই অদম্য উৎসাহের স্রোতে যেন ভাটা পড়িয়া আসিয়াছে। অণিমা মনে মনে একটা স্বস্তি অনুভব করিল।

আপিস হইতে ফিরিয়া খোকাকে আদর করিতে গিয়া বিজন শিহরিয়া উঠিল। শিশুর কচি কোমল মুখখানা অস্বাভাবিক রকম ফুলিয়া উঠিয়াছে। চোখের নীচে বড় বড় আঁচড়ের দাগ, রক্ত জমাট হইয়া আছে।

বিজন ডাকিল—অণু—

অনিমা আসিলে সে সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নীরব প্রশ্নভরা চোখে তাহার দিকে চাহিল।

অনিমা একটু হাসিয়া বলিল—ও কিছু নয়, নীচে থেকে ভূতো এসেছিল খোকনের সঙ্গে ভাব করতে, তারই একটু চিহ্ন—

বিজন আর কিছু বলিল না, কিন্তু তার মুখে চোখে অপরিসীম ব্যথার সঙ্গে একটা করুণ অসহায় ভাব ফুটিয়া উঠিল।

সকালবেলা নীচে একটা চেঁচামিচি শুনিয়া বিজন ও অণিমা দুই জনেই বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল ভাড়াটিয়াদের রান্নাঘরের সম্মুখে জগা খোকনকে কোলে করিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া আছে, আর গিন্নি তাহার মুখের উপর হাত নাড়িয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছেন।

জগা ভয়ে ভয়ে বলিল—কিন্তু আমি তো ঘরে ঢুকিনি মা—

গিন্নি রুখিয়া উঠিলেন—মর্ হতভাগা, আবার মিছে কথা, আমি ঐখেনে দাঁড়িয়ে দেখলুম, তুই ওই ছেলেটাকে কোলে নিয়েই চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ঘর থেকে বলটা তুলে নিলি, আবার বলচে 'ঘরে তো ঢুকিনি', চৌকাঠটা বুঝি ঘর নয় ?

এমন সময় কর্ত্তা বাড়ী এলেন, হাতে বাজারের থলি। গিন্নী জগাকে ছাড়িয়া তাহাকে লইয়া পড়িলেন: এসেছ ? দেখ এসে তোমার নিজের কীর্ত্তি! আমি তখনই বলিনি ? কিন্তু তুমি তো শুনলে না, আর শুনবেই বা কেন ? কথায় বলে গরীবের কথা কাজে লাগে বাসি হলে, এবার কর, কি করবে।—

কর্ত্তা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কেন কি হল আবার ?

—হবে আবার কি ? যা হবার তাই হয়েচে। তোমার কি, তুমি তো আছ শুধু মজা দেখবার বেলা, যত ঝক্কি আমার—

কর্ত্তা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতভম্বের মত একবার জগার দিকে একবার গিন্নির দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। গিন্নির ভিতরের রোষবহ্নি কথার তুবড়ি হইয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল।

—তখনই বলেছিলাম 'ওগো এ খিষ্টানি বাড়ীতে আমাদের

থাকা চলবে না, তুমি আরেকটা বাড়ী দেখ। টাকার জন্য তো আর জাতজন্ম খোয়াতে পারবো না'—কিন্তু তোমার ঐ কথা 'এত কম টাকায় এর চাইতে ভাল বাড়ী পাব কোথায়' এখন ? জাতজন্ম খুইয়ে এবার ভাল বাড়ী ধুয়ে খাও আর কি ? না বাপু, এ সব অনাচার আমি সইতে পারবো না, আমার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর—

কর্ত্তা এবার অসহিষ্ণুভাবে বাজারের থলিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—কি হয়েচে খুলেই বলনা ছাই, দিনরাত এসব প্যানপ্যানানি আমার আর সহ্য হয় না।

গিন্নি এক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত ভাবে কর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিলেন—আঃ মরে যাই, আবার রাগ দেখ না, যেন যত অপরাধ আমার! তোমার কি ভীমরতি হয়েচে, না চোখের মাথা খেয়েচ। বলচি, জাত গিয়েচে, এবার প্রাচিত্তির করে তবে জাতে উঠতে হবে। কর কোথা থেকে করবে এ ছেরাদ্দের আয়োজন।—বলিয়াই তিনি মুখ ঝামটা দিয়া রণস্থল পরিত্যাগের উদ্যোগ করিলেন।

কর্ত্তা একান্ত অসহায়ের মত জগবন্ধুর শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন—ওরে জগাই, তোর তিনগুষ্টির পায়ে পড়ি, সাদা কথায় বল দিকি বাবা ব্যাপারখানা কি হয়েছে? কর্ত্তার অনুনয়ের উত্তরে জগবন্ধু যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপে এরূপ দাঁড়ায়। সে খোকনকে নিয়া ছোট একটা রবারের বল লইয়া খেলা করিতেছিল। এক অসাবধান মূহুর্ত্তে বলটা গিয়া পড়িল ভাড়াটিয়াদের রান্নাঘরে, তখন সে খোকনকে কোলে করিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া আলগোছে বলটা তুলিয়া আনিয়াছে, সে ঘরে ঢোকে নাই, কারণ সে জানে নীচের গিন্নিমার স্পষ্ট আদেশ, ও বাড়ীর কেউ যেন তাদের রান্নাঘরে না ঢোকে।

কর্ত্তা হতভম্বের মত বলিলেন—কিন্তু তাতে আমাদের জাত গেল কেন ?

গিন্নি চলিয়া যাইতেছিলেন, কর্ত্তার এ নির্ব্বোধ প্রশ্নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন—শোন কথা, কায়েতের রান্নাঘরে খিষ্টান ঢুকলে জাত যাবে না, তবে কি জাতের মুখে ফুল চন্দন পড়বে ?

—কিন্তু এরা তো খিষ্টান নয়, এরা যে সৎকায়স্থ গো।

'সৎকায়স্থ!' গিন্নি রুখিয়া উঠিলেন,—'মিন্সের যেন ভীমরতি হয়েছে। কায়েতের ঘরের বউ-ঝি এমন জুতো-মোজা পায়ে দিয়ে স্বামীর হাত ধরে ঘেট্ ঘেট্ করে রাস্তায় বেরিয়ে যায়? বাপের জন্মে যা শুনিনি, দেখিনি তুমি আজ তাই শোনালে।—

বিজন ও তার স্ত্রীর খ্রীষ্টানত্বের প্রমাণ স্বরূপ গিন্নি অনেক যুক্তির অবতারণা করিলেন। তাহা এমন সঙ্গত ও অকাট্য যে শেষে হয়তো কর্ত্তাও তাদের বিজাতীয়ত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন এবং প্রায়শ্চিত্তের খরচান্তের কথা ভাবিয়া আকুল হইলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার ধৈর্য্য বিজন ও অণিমার ছিল না। তাহারা নিঃশব্দে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

অণিমা বলিল—তুমি অমন মুস্ড়ে গেলে কেন? সৎকার্য্যে অনেক বিঘ্ন, ব্যয়সংক্ষেপ করতে গিয়ে এসব কথায় কান দিলে তো আমাদের চল্‌বে না।

বিজন এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া অণিমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি আমায় ঠাট্টা কচ্চো?

অণিমা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না, না, তা কেন ?—

বিজন স্থির প্রতিজ্ঞার স্বরে বলিল—যথেষ্ট হয়েচে অণু, আর নয়, ব্যয়সংক্ষেপের ভূত আমার ঘাড় ছেড়ে পালিয়েচে। আজ থেকে আমরা আবার ঠিক আগেকার মত Two young prodigal—

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অণিমা বলিল—যাক্ বাঁচালে।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

প্রাচীন শিল্পকলা

শ্রীবীরেশ্বর বসু

অতি প্রাচীনকালের শিল্পকলার প্রত্যক্ষ প্রমাণতার বা ভৌতিকরূপ পাওয়া যায় না, কালের করালে লুপ্ত হয়েচে, কেবল মাত্র তার স্মৃতি ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের সুন্দর পদাবলীতে পাওয়া যায়।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে ভারতীয় শিল্পবিদ্যা ও শিল্প-জ্ঞান য়ুনান এবং ঈরাণদেশ থেকে এসেছিল। তাঁদের মতে মৌর্য্যদের সময় থেকেই ভারতীয় শিল্পকলা ও শিল্পবিদ্যা আরম্ভ হয়। মৌর্য্যদের সময়ে ভারতবাসীদের সঙ্গে পশ্চিম-এসিয়ার য়ুনানী ঈরাণী প্রভৃতি দেশবাসীদের সংঘর্ষ হয় এবং তারই ফলে তাদের সভ্যতার প্রভাব ভারতবাসীদের ওপর আসে এবং ভারতবাসীরা শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করে। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐতিহাসিকদের বিশেষ অনুসন্ধানের ও গবেষণার ফলে জানা যায় যে ভারতবর্ষের শিল্পবিদ্যা ও শিল্পজ্ঞান অতি প্রাচীন। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজ্ঞানের উত্থান ও উন্নতি হয়েছিল। বৈদিক সাহিত্য ও বৈদিক সভ্যতার মত শিল্পবিদ্যাও পুরাতন। বৈদিক কালে ভারতবাসীদের শিল্প-কলার জ্ঞান ছিল তার প্রমাণ বৈদিক মন্ত্র হতে পাওয়া যায়। বৈদিক আচার বিচার ও সংস্কারের প্রভাব বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় কলা-ইতিহাসের মুখ্য নির্ম্মাতা স্বরূপ ছিল। Havell সাহেব তাঁর A Handbook of Indian Art নামক বইয়ে লিখেছেন "Vedic thought Vedic traditions and customs dominate the art in India in the earliest times" সুতরাং বর্ত্তমান গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্ত হয়েচে যে ভারতীয় শিল্পকলার উত্থান ও ভারতীয়দের শিল্পবিদ্যার জ্ঞান শুধু মৌর্য্যকালেই হয় নি তার বহু পূর্ব্বে অভ্যুদয় হয়েছিল, মৌর্য্যদের সময় কেবলমাত্র উন্নতির সীমায় পৌছেছিল। মৌর্য্য-কালের পূর্ব্বের শিল্পজ্ঞান আমরা সেইকালেরই মূর্ত্তি থেকে পাই। এই মূর্ত্তিসমূহ দেবতাদের বা পূজার সামগ্রী নয়—এ-সকল মৌর্য্যকালের পূর্ব্বেকার রাজাদের। প্রাচীন ভারতে রাজাদের মূর্ত্তি তৈরী করে স্মৃতি রক্ষা করা একটি নিয়ম ছিল। সেই প্রথা অনুসারে সেই সময়ের রাজাদের মূর্ত্তি স্ফুটরূপে আজ আমরা দেখতে পাই এবং সেই সকল মূর্ত্তির দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষে শিল্পকলার চর্চ্চা মৌর্য্যদের বহু পূর্ব্বে হয়েছিল।

ভারতীয় ইতিহাসজ্ঞদের মতে ভারতীয় কলার প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ যা ভৌতিকরূপে ঐতিহাসিকেরা পেয়েছেন—মথুরা মিউজিয়মে সুরক্ষিত কূনিক অজাতশত্রুর একটি মূর্ত্তি। কূনিক অজাতশত্রু ঈশাব্দের প্রায় ৬১৮ বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন; সুতরাং এই মূর্ত্তি মৌর্য্যদের অন্ততঃ ৩০০ বৎসর পূর্ব্বেকার। এই রকম দুটি মূর্ত্তি পাটনায় পাওয়া গেছে যা কলিকাতার মিউজিয়মে রাখা হয়েচে। এই মূর্ত্তিগুলি স্বর্গীয় Alexander Cunningham সাহেবের নজরে পড়ে। তিনি বিচার ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এই মূর্ত্তিগুলি যক্ষ ও যক্ষিনীদের এবং মৌর্য্যদের সময়ে নির্ম্মিত। কিন্তু ১৯১৯ সালে শ্রীযুক্ত কে-পি জায়সওয়াল মহাশয় এই মূর্ত্তিগুলি দেখে এবং মূর্ত্তিগুলির নিম্নভাগের লেখা পাঠ ক'রে জানতে পারেন যে এই মূর্ত্তিগুলি যক্ষ ও যক্ষিনীদের নয় এবং মৌর্য্যদের সময়ের নির্ম্মিতও নয়—মৌর্য্যদের বহু শত বর্ষ পূর্ব্বেকার শিশুনাগ বংশের উদয়িন ও নন্দিবর্দ্ধন নামে দুই রাজার প্রতিকৃতি। এই মূর্ত্তিগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল দেখে জানা যায় যে মৌর্য্যদের বহুপূর্ব্বে ভারতবাসীরা পাথরের গায়েও মূর্ত্তিনির্ম্মাণ আদি শিল্পচাতুর্য্যে যথেষ্ট নৈপুন্য ও যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়েছিল। মূর্ত্তিগুলির গঠন ও পালিশ দেখে তৎকালীন ভাস্করের শিল্পজ্ঞানের উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায়। মূর্ত্তিগুলির নির্ম্মান কাটছাঁট পালিশ ও ভাবপ্রদর্শন সমূহ অতি সুন্দর। Cunningham সাহেব তাঁর বর্ণনায় বলেছেন "the easy attitude the calm dignified repose of the figures

are still conspicuous and claim for them a high place amongst the best specimens of early Indian Art.

মৌর্য্যকালের উন্নত শিল্পকলার নমুনা আমরা অশোকের শিলালেখ ও স্তম্ভলেখ এবং ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত বড় বড় অট্টালিকা থেকে পাই। পাথরের কাজের চেয়ে কাঠের কাজের প্রচলন মৌর্য্যদের সময় বেশী ছিল। পাথরের কাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে কাঠের কাজের নৈপুণ্যের পরিচয় আমরা সাঁচী-স্তূপের কার্য্যকলাপ থেকে পাই। মৌর্য্যকালের দুর্গের এবং প্রাসাদের অবস্থা Megasthenes বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় জানা যায় যে সম্রাটদের দুর্গসমূহ অতি সুন্দর ও শক্ত ভাবে তৈরী হত। Megasthenes পাটলিপুত্রের বর্ণনায় বলেছেন যে পাটলিপুত্রের চারিধারে একটি কাঠের বেড়া ছিল এবং তার দ্বারা কাঠের ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। পাটলিপুত্রের মতন সুবিস্তৃত নগরের চারি পাশে কাঠের দেওয়াল তৈরী করা অল্প শিল্পজ্ঞান ও শিল্পকলার পরিচায়ক নয়।

মহাত্মা অশোকের রাজত্বকালে ভারতে সুখ ও শান্তি ছিল। অশোকের মত প্রজাপালক ও প্রবল শাসক পেয়ে তৎকালীন সমাজের স্থিতি যে-প্রকার হওয়া উচিত সেই রকমই ছিল। ভারতবাসীরা শিল্পজ্ঞান প্রদর্শনে অন্য বিষয়ের মত সমভাবে যত্নবান ছিল। য়ুনানী লেখকের দ্বারা জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ পারস্য রাজমহলের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। অশোকের নির্ম্মিত স্তূপ ও গুহা সমূহের দ্বারা আমরা তৎকালীন শিল্পবিদ্যার উন্নতির বিশেষ পরিচয় পাই এবং এই সকলের কারুকার্য্য দেখে প্রমাণিত হয় যে অশোকের বহুপূর্ব্বে কলাবিদ্যার চর্চ্চা ছিল এবং অশোকের সময়ে তা পূর্ণতা লাভ করেছিল মাত্র। স্তূপের মধ্যে সাচীর স্তূপ অতি প্রসিদ্ধ। অশোক এই স্তূপ নির্ম্মাণ করান। এই স্তূপের স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায় না, বর্ত্তমানে যা দেখতে পাওয়া যায় তা তার বিকশিত রূপমাত্র। এই স্তূপ ঈশাব্দের ২০০ শত বৎসর পরে আরও সুন্দরভাবে এবং পরিবর্ত্তিত রূপে নির্ম্মাণ করান হয়। অশোক যে সকল গুহা নির্ম্মাণ করান তার মধ্যে লোমশঋষির গুহা অতি প্রসিদ্ধ। এই গুহা অশোক ঈশাব্দের ২৫৭ সাল পূর্ব্বে আজীবকদের দান করেছিলেন। এই গুহার ভেতর পাথর কেটে একটি বৃহৎ বিস্তৃত ঘর নির্ম্মিত হয়েছিল। ঘরটির উপর নিচে ও আশে পাশের দেওয়াল সকলই মসৃণ ও চিক্কণ পালিশ করা। পশ্চিমদেশের ঘাটসমূহে অনেক সুন্দর গুহা দেখতে পাওয়া যায়, ঐ সকলকে বৌদ্ধকালীন চৈত্য বলা হয়। এই সকল চৈত্য তখনকার বৌদ্ধ মন্দির ছিল এবং সাধুদের ও ভিক্ষুদের সভাসমিতির ও ধর্ম্মচর্চ্চার স্থান ছিল। এই সকল গুহায় যে শিল্পকলা প্রদর্শিত হয়েচে এবং তার দ্বারা যে শিল্পবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় তা অবর্ণনীয়। এই শিল্প-বিদ্যার চরম উৎকর্ষ মৌর্য্যদের ৮০০ শত বৎসর পরে অজন্তার গুহায় সুপ্রদর্শিত।

সারনাথে অশোকের সময়ের প্রচারের যে কারীকুরী দেখতে পাওয়া গেছে সেগুলি আরও আশ্চর্য্যজনক। সারনাথের পাথরের তৈরী সিংহমূর্ত্তি দেখে John Marshall সাহেব বলেছিলেন "Both bell and lions are in excellent state of preservation and masterpieces in point of both style and technique—in finest carvings indeed that India has ever produced and unsurpassed, I venture to think by anything of their kind in the ancient world."

মৌর্য্যদের সময়ে পাথর ও কাঠের গড়ন করা, খোদাই করা ও অক্ষর লেখা অতি সুন্দরভাবে হ'ত। তাতেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে তার পূর্ব্বে এই সকল কার্য্যের বিশেষ চর্চ্চা ছিল এবং তা-ই মৌর্য্যদের সময়ে এতটা উন্নতিলাভ করেছিল। কিন্তু একথা সত্য নয় যে মৌর্য্যদের সময় থেকেই ভারতে শিল্পকলার চর্চ্চা সুরু হয়েছিল।

বীরেশ্বর বসু

"অজা যুদ্ধে, ঋষি শ্রাদ্ধে—"

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায় বি-এ

বিয়ে হওয়ার পর অনেক দেখা-শোনা হইয়াছে, কিন্তু অগোচরেও দেখা-সাক্ষাৎ কম হয় নাই, এ-কথা একজনে জানে, অপরে জানে না! বৌদি কম দুষ্ট নয়, দাদাও তার চেয়ে কম নয়, এই কথা মনে মনে ভাবিয়া রাণুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ঘাটে নৌকা ভিড়িতেই দেশ-বিদেশের যত লোক হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিল, পীরগাছার দশ-আনির জমিদার রমাকান্ত গাঙ্গুলী কন্যা, স্ত্রী, পুত্রবধূসহ নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিতেই হালফ্যাসানের পুত্রবধূ সুধাকে দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেল! সাধারণতঃ হাটে-বাজারে দোকান-পাটে পেচার ওপর লক্ষ্মীর যে মনোরম ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, তার চেয়ে এই মা-লক্ষ্মীর চেহারা আরো শতগুণে ভাল। গাঙের পাড়ে যেন চাঁদের হাট বসিয়া গেল। নিতাই আগাইয়া আসিয়া কর্ত্তার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিতেই রমাকান্ত মৃদু হাসিয়া সকলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, ভাল ত সব! সমাগত লোকজন, ইতর-ভদ্র সকলেই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিত, এমন সদাশিব লোক সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না! গ্রামবাসীরা উপস্থিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া যে যার দিকে চলিয়া গেল!

পূজার ভীড়ের অন্ত নাই। সহসা গ্রামের লোকসংখ্যা ত বাড়িয়াছেই, হাট-বাজারের মাছ-দুধ, তরি-তরকারীর দাম দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বেচাকেনা আগের চেয়ে অনেক জোরে চলিয়াছে। এখন আর মহেন্দ্র পাঠক, নারায়ণ-দাদা, বগলা গাঙ্গুলী, চন্দ্রমোহন মুখুয্যের হাট-বাজারে প্রতাপ-প্রতিপত্তি নাই। দোকানীরা নগদ দামের খরিদ্দার পাইয়া হাতে আকাশ পাইয়াছে। এ অবস্থা চিরদিন থাকে না। কালীপূজার পর হইতেই গ্রামে আবার লোকের যাতায়াতের মড়ক লাগিয়া যায়।

বাগানে এত ফুল ফুটিয়াছে যে, রাণী দু'সাজি ভরিয়া ফুল তুলিয়াও তাহার আশা মিটাইতে পারে নাই। জ্যোৎস্না রাত্রিতে ছাদের ওপর বসিয়া গল্প শুনিতে শুনিতে ছোটরা ঘুমের কথা ভুলিয়া যায়, বৌদির সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া দুরন্ত ছেলেরাও দস্যিপনা ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হয়, কিন্তু রাণীর দাদা অমলের বিষম তাগাদায় বৌদিকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও উঠিয়া যাইতে হয় দেখিয়া কিশোরী মেয়ে রাণী রাগে গজ গজ করিতে করিতে বলিয়া ওঠে, কি ঘুম বাবা তোমাদের, দশটা না বাজতেই ডাকাডাকি।

সুধা মৃদু হাসিয়া জবাব দেয়, তোরও এমন একদিন আসবে, যে, চাঁদের আলোয় বসে আর বেশীক্ষণ গল্প বলা চলবে না...

কি অসভ্য বৌদি, বলিয়াই রাণী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল—তোমার মত যেন সবাই।

—আমিও এমন ছিলুম না রাণী।

—তবে এমনি হ'লে কেন?

—তোমার ওই গুণধর দাদাটিকে জিজ্ঞাসা করো।

—আমার বড় বয়ে গেছে জিজ্ঞাসা করতে। আর দাদার কথা আমরা জানি না। বিয়ের রাত্রিতেই না পালিয়েছিল রাগ করে। কত সাধ্যসাধনা করে দাদাকে এবার আনিয়েছে।

সুধা স্মিতমুখে জবাব দিল, তা'হলে তো বাঁচতুম, না এলে আমার কি মজা হ'ত!

—অত বড়াই করো না বৌদি, আমরা জানি না কিছু, সবই মনে আছে।

—তোমার মনে থাকবে না তো কার মনে থাকবে। তুমি যে এখন রিহার্শেল দিচ্ছো, বলি, বর আসবার আর ক'দিন বাকী। বাবাকে বলবো, এবার আসছে-ফাগুনেই যেন একটি ঠাকুরজামাই দেখে আনেন।

রাণীর গাল দুটি সহসা আপেলের মত লাল হইয়া

উঠিল, কহিল, ও-সবে আমার কাজ নেই, বৌদি। তোমার জামাই নিয়ে তুমিই থাকো।

সুধা রাণীর গাল দুটি টিপিয়া দিয়া কহিল, সবাই বিয়ের আগে ওকথা বলে, শেষে কাজ কার থাকে বেশ বোঝা যায়।

রাণী রাগতভাবে কহিল, ভাল হবে না বল্‌ছি বৌদি, আমি দাদাকে বলে দিচ্ছি দাঁড়াও।

—ওরে বোকা, তোর বলতে হবে না, আমি নিজেই বল্‌ব—বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া সুধা রাণীর কানে কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, রাঙা বর ত, আমি ভুলে যাবো না, কক্ষণোও না।

রণে ভঙ্গ দিয়া রাণী দুমদাম করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া ছুটিয়া পলাইল। ছেলেমেয়ের দল বিষম হল্লা করিতে করিতে নামিয়া গেল।

পরদিন সকাল বেলা অমল ঘুম হইতেই উঠিয়া দেখে, ঘরে-বাহিরে, পথেঘাটে লোকজন গম্ গম্ করিতেছে। ঘোষাল-মশায় এই ভোরেই স্নান আহ্নিক সারিয়া গায়ে রক্ত নামাবলী দিয়া কি একটা সংস্কৃত শ্লোক অস্ফুটকণ্ঠে আওড়াইতে আওড়াইতে খড়ম পায়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া কাসিয়া অন্দরে ঢুকিয়াই কহিলেন, কবে এলে অমল?

অমল প্রণাম করিয়া কহিল, কাল এসেছি।

—বৌমা আসেনি?

কৌতুক করিয়া অমল জবাব দিল, জানি না, দেখা হয়নি।

কাদম্বিনী-মাসী কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন। একগাল হাসিয়া কহিলেন, দেখা আবার হয়নি!

ঘোষাল ফিরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, তুই কবে এলি কাদু?

কাদম্বিনী আগাইয়া আসিয়া কহিলেন, এই তো এলাম আজ সাত দিন। আপনি কেমন আছেন?

—আছি কাদু প্রাণগতিক, শৈলেশ আমাকে কাঁদিয়ে এবার বর্ষাকালে চলে গিয়েছে।

কাদম্বিনী বিস্ময়ে, দুঃখে চোখ দুটি কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, বলেন কি ঘোষাল-কাকা? এমন সর্ব্বনাশও কারো হয়? এমন সময় মহিম পাঠক ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, অনিত্য সংসারে খলু ধর্ম্মসার বলিয়াই সকল কথা চোখের নিমিষে উড়াইয়া দিয়া পুনরায় কহিলেন, ঘোষাল-বাড়ীর উমাকান্ত এখনো আসেনি, তাই সেখানে সতীশদাদাকে বড় মন-মরা দেখলাম, চলুন দাদা একবার ওপাড়া হয়ে আসি!

নদীর তীর দিয়া পথ। সে পথ ধরিয়া খানিকটা যাইতেই মহিম পাঠক হর্ষোৎফুল্ললোচনে দূরের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ঐ যে উমাকান্ত এসেছে না, ঐ যে নৌকায় বসে... সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। তীরে নামিতেই ছেলে-বুড়োর দল তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল। ঘোষাল খুশী হইয়া কহিলেন, এসেছ বাবা, বেশ করেছ; এত দেরী হ'ল কেন?

—আর বলবেন না কাকা সরকারের চাকুরীর কথা। বড়বাবুর স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়েছিল ব'লে আমাদের কারও ছুটি পাওয়ার আশা ছিল না।

—বলো কি হে, এজন্য তোমাদের ছুটি একেবারে বন্ধ।

—খোসমেজাজ না হ'লে কি ছুটি মেলে। শেষে শুনলাম স্ত্রীর সাথে ভাবও হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ছুটি।

—বেশ, বেশ, ভালই হয়েছে। তোমাদের সাহেব বুঝি "দৌড়ায়" থাকেন বেশী।

মহিম পাঠক সায় দিয়া কহিলেন, সাহেবরা আর কি কাজ করে, খায় দায়, ফূর্ত্তি করে, মোটা মাইনে পায়, তাদের আবার কাজকর্ম্ম!

নবীনখুড়ো ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, ওদের দাঁতের একটু বুদ্ধি আমরা রাখি।

মহিম পাঠক প্রতিবাদের সুরে কহিলেন, দাঁতের বুদ্ধি না রাখি সত্য, কিন্তু কি পাস ওরা। বিলাত থেকে এলেই হয়ে গেলেন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট। এই ধরো আমি, ঈশান-কাকা, ভগবান-দাদা, আমরা বিলাতে জন্মালে এক একজন দিগ্‌গজ হ'তাম কি না তুমিই বলো নবীন-খুড়ো!

ছেলেবুড়ো সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিল। নবীনখুড়ো কোন উচ্চবাচ্য করিল না দেখিয়া সনাতন মুদী গম্ভীর সুরে কহিল, কর্ত্তা আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা কি কম। লোকে বোঝে না, এই যা দুঃখ! তা না হ'লে আপনি থাকৃতে লোকনাথ মাইতে হয় স্কুলের সেক্রেটারী আর মদন ঘোষাল স্কুলের হেডমাষ্টার!

মহিমের কাছে সনাতন কিছু টাকা ধারিত এবং এই সেদিন মাইনে অনেক দিন না-দেওয়ার দরুণ সনাতনের থার্ড ক্লাশের পড়ুয়া ছেলেটির নাম মদন ঘোষাল হঠাৎ কাটিয়া দেওয়ায় সনাতন গ্রামে গ্রামে লোকনাথ আর মদনের দুর্নাম করিয়া বেড়ায়। এক সময়ে সে পয়সা-ওলা লোক ছিল, কিন্তু একটা স্বদেশী ডাকাতি হওয়ায় সনাতন একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল।

মহিম বিজ্ঞের মত হি হি করিয়া হাসিয়া জবাব দিল, তোরই কি কম বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল। দিন থাক্‌লে তোকে আমরা সেক্রেটারী করে দিয়ে তোর বাবার নামে স্কুল চালাতাম, কি বলো খুড়ো ?

নবীন-খুড়ো বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, সনাতন কি কথার লোক ? আমি সে-বছরও বলেছিলাম 'সনাতন হাজার তিনেক টাকা দিয়ে স্কুলের বড় ঘরটা তুই বানিয়ে দে, তোর বাপের নামে আমরা স্কুল করি'; ওকি আর কথা শোনবার লোক। এখন তোর টাকা-পয়সা বারভূতে মিলে লুট করে নিয়ে গেল।

সনাতন ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আগে জান্‌লে আমি ব্রাহ্মণসেবাতেও...

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মহিম পাঠক লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, এই একটা কথার মত কথা বলেছিস। আর এই গাঁয়ের চৌকিদার-ব্যাটারা কি চশমখোর, একবার খবর পর্য্যন্ত নিলে না।

—আর চৌকিদার। কাল তারিণী-দাদার কালো হৃষ্ট-পুষ্ট পাঁঠাটি মাধব দফাদার বেমালুম গাফ্‌ করেছে ? নবমী পূজার পাঁঠা খেয়ে কেউ কখনও হজম করতে পারে। তাই তো চব্বিশ ঘণ্টা পার না হোতেই মেয়েটার বিষম কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে, আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি! কলিতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য এখনো যায় নি।

সনাতন আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেল পাণিকাউর কৈবর্ত্তকে দেখিয়া। পাণিকাউর মাধবের ভগ্নীপতি, সুতরাং এই প্রসঙ্গ এখানেই চাপা পড়িয়া গেল।

বৈকালে সুধা, রাণী, সকলেই প্রতিমা দেখিতে বাহির হইয়াছিল। গ্রামদেশে অত বাঁধাবাঁধি নিয়ম এখন আর নাই। সুধা বেথুন কলেজে আই-এ পড়ে, শুধু লোকলজ্জার খাতিরে একটু ঘোমটা টানিয়া বেড়াইতে গিয়াছিল। কখনো ঘোমটা অনভ্যাসের বশে খসিয়া যাইতেছিল, আবার তাড়াতাড়ি টানিতে গিয়া বিষম অসুবিধা বোধ হইতেছিল। তাহার সুন্দর ঢল-ঢলে মুখখানি, নিখুঁত, নিটোল, স্বাস্থ্য গ্রামের বৃদ্ধদের দু'চার জনের যে চোখে না পড়িয়াছিল এমন নয়। ভগবানদাদা চোখেমুখে গিলিবার মত ভাবে চাহিয়া কহিলেন, মেয়েটি কে হে খুড়ো, বড় নির্লজ্জ দেখ্‌ছি। দু'পাতা ইংরেজী পড়ে মেয়েদের চালচলন আজকাল ..

নবীন-খুড়ো জিভ কাটিয়া চুপি চুপি কহিলেন, বড়বাড়ীর অমলের বউ।

অমনি ভগবান-দাদা সুর নামাইয়া কহিলেন, বেশ তো হাসি-খুশী, কোন দেমাক-টেমাক নেই দেখছি। আমি ভেবেছিলুম নেপালের মেয়ে ননী বুঝি! খাসা বউ এনেছে কিন্তু।

—তা আর বল্‌তে, যেন দুর্গাপ্রতিমাখানি, আমি বারে বারে চেয়ে তাই দেখছিলাম।

পাড়ার মেয়েরা নূতন বৌকে দেখিয়া মুখখানি মলিন করিয়া ফিরিয়া গেল। স্ত্রীলোক সুন্দরী হইলে অপরাপর মেয়েদের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব! কারণ বাংলা দেশের তেলে-জলে অমন রূপ, চেহারা কদাচিৎ দু-একটী দেখা যায়। তাই স্বভাবসুলভ ঈর্ষাপ্রযুক্ত ওপাড়ার কাঞ্চন-মাসী সুর চড়াইয়া কহিলেন, সুন্দরী বউ ঢের ঢের দেখেছি, তোদের পীরগাছায় এই নূতন হ'তে পারে। আমার মেজঠাকুরের ঠাকুরঝিকে দেখলে ওকে বল্‌তে হবে একেবারে কালো!

মল্লিক-বাড়ীতে বৈঠক বসিয়াছিল। পানের খিলি মুখে পুরিয়া বোস্‌দের গিন্নিমা কাত্যায়নী চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া গলা ঝাড়িয়া কহিলেন, এ আর কি বউ দেখছিস্, নাটোরের নাম শুনেছিস্ তো, তারই কাছে বীর-কুৎসার জমিদারদের বউ-এর কথা আর কি বলব। চোখ দুটি যেন আকাশের তারা, আর চুলের গোছা পিঠ অবধি ছাড়িয়ে তো গেছেই, পায়ের কাছাকাছি...আর নাচগানের

কথা যদি বলিস ত আসুক মিত্তিরদের মল্লিকা, কেমন গলা দেখে নেবো!

কাঞ্চনমাসী গলা ছাড়াইয়া কহিলেন, আমার পানুর বউয়ের রঙ যদি আর একটু ফরসা হ'ত তোমরাই তাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী বল্‌তে কি না বলো।

বিমলা মৃদু হাসিয়া কহিল, অমলের বউয়ের মত সুন্দরী বউ খুব কমই দেখেছি, যে যা-ই বলো না কেন!

কাঞ্চনমাসী চোখ ফিরাইয়া কহিলেন, কি বললি লা, তোরা কয়টি সুন্দরী বউ চোখে দেখেছিস্ আর কয়টি সুন্দরীর নাম করতে পারিস। জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখতে গিয়ে ঢাকায় পুতুলকে দেখে এসেছি, তার মত সুন্দরী আর হয় না!

—না হয়, না হোক, আমাদের তাতে কি মাসী, আমরা তো এক রকম বয়স কাটিয়েই গেলাম। এইরূপ নিয়েই তো যত গোলমাল শুনি, তার চেয়ে রূপ না থাকাই ঢের ভাল।

মুখুর্য্যেদের মেজবউ সৌদামিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, অমলের বিয়েতে কি যে কাণ্ড হয়েছিল, শোনেননি বুঝি, এ-কথা তো সবারই জানা—বলতেই পাড়ার মেয়েরা 'এ' ওর গায়ে 'ও' তার গায়ে ঢলাঢলি করিয়া হাসিতে হাসিতে একেবারে লুটপাট হইয়া গেল!

* * * *

সুধার বাবা ছিলেন ঢাকা কলেজের প্রফেসার। অমলের সাথে যখন বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়, সুধা তখন টিকাটুলির স্কুলে পড়িত। ছোটবেলা থেকেই সে ভয়ানক দুষ্টু, এবং স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল বলিয়া তাহাকে তেরোতেই পনরোর মত দেখাইত। সুধার সমপাঠী ছিল বীণা। বীণা বয়সে বড়, একটু উঁচু ক্লাশে পড়িত, তাহাকে একদিন সুধা ধরিয়া বসিল, বীণাদি, আমি আমার বরকে একটু দেখতে চাই!

—বিয়ের আগে? বিয়ের আগে কেউ কি কখনো বরকে দেখে, ধেৎ বোকা!

—না বীণাদি, আমি তার চেহারাটি শুধু দেখ্‌ব। কালো চেহারা হলে চলবে না বীণাদি! আমি তো আর কুৎসিত নই!

বীণা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, সুধা, তা'হলে এক কাজ করতে হ'বে। মেজদাকে বলে একদিন আমাদের বাড়ী আনালেই চলবে।

—বেশ তো, বলিয়াই সুধা সোৎসাহে চুপি চুপি কহিল, অমল গাঙ্গুলী, থার্ড ইয়ার।

ও থার্ডইয়ার⋯মেরী ইয়ার—বলিয়াই বীণা নোটবুকে টুকিয়া রাখিল।

ঢাকা কলেজে বি-এ ক্লাশে তখনো প্রায় দেড়শ ছাত্র পড়ে। বীণার মেজদা' দ্বিজপদ অমলকে অনেক কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিল, কিন্তু অমলের সাথে তাহার তেমন জানাশোনা ছিল না। কি করিবে, বাসায় আসিয়া বীণাকে সব কথা খুলিয়া বলিতেই, বীণা কহিল, এক কাজ করো না মেজদা,' বাসায় নাই বা এলো, আমরা রমনার পথের ধারে যেন বেড়াতে গিয়েছি, ঠিক এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, আর তুমি ইসারায় আমাদের দেখিয়ে দেবে। অমল বাবু তো আর কলেজ হোষ্টেলে থাকেন না!

—না, বলিয়াই দ্বিজপদ মৃদু হাসিয়া কহিল, কাল তাহ'লে সব ঠিক কিন্তু। আমি রোজরোজ এ-সব কর্‌তে পারব না।

পরদিন ঠিক কথামত শীতের অপরাহ্নে বীণা ও সুধা রমনার ধারে বেড়াইতে গেল, সাথে হিন্দুস্থানী চাকর গিরিধারী।

দ্বিজপদের ক্লাশ অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গেছে, সে অমলের অপেক্ষায় চুপ করিয়া লেবরেটারীতে বসিয়াছিল। ঘণ্টা বাজিতেই একে একে সব ছাত্র চলিয়া গেল, অমলও আসে না, দ্বিজপদও তাহাকে খুঁজিয়া পায় না।

সুধার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কি দেখিতে আজ কি দেখিয়া বসে, সারা জীবনের আধিপত্য দিয়া যাহাকে পতিরূপে মনোরাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়া লইতে হইবে, তাহাকে দেখিয়া মন খুশী না হইলে চলিবে কেন! এদিকে শাস্ত্রের দোহাই চারিচক্ষুমিলন শুধু মুখচন্দ্রিকার শুভ মুহূর্ত্ত ছাড়া হইতে পারে না, কিন্তু পৃথকভাবে যদি এক জোড়া চোখ অপরের অলক্ষ্যে তাহার দিকে চাহিয়া দেখে, তাহা হইলে তো আর শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করা হইবে না। তাহার মনে এইরূপ নানা কথা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময় দ্বিজপদ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া চোখের ইসারায় যে-ছেলেটিকে দেখাইয়া দিল, অমল বলিয়া যদি

কিছু তাহার দেহের বর্ণে থাকে! সুধা মুখখানি ভার করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। সেই দিন থেকে তাহার মুখে কেহ কোন দিন হাসি দেখে নাই। মায়ের মনে বিষম ভাবনা হইল, অথচ সুধা মুখ ফুটিয়া সে কথা কাহাকেও বলিতে পারিল না, আর কোন্ বাঙালী মেয়েই বা পারে?

বিবাহের দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, সুধা ততই মনমরা হইয়া গেল! বীণা আভাস-ইঙ্গিতে এ-কথাটি একদিন সুধার জননীর কর্ণগোচর করিয়া ফেলিল। কিন্তু জননী তো হাসিয়াই খুন। ছেলে কালো হইলে এমন কি আসে যায়, অথচ অত বড় বুনিয়াদী ঘরের ছেলে সহজে হাতছাড়াও করা যায় না। তবু বীণার কথায় তাহার একটু খটকা বাধিল। তিনি একদিন কর্ত্তার কাছে সেই কথা উত্থাপিত করিলেন। নিরীহ প্রফেসার, সদাশিব লোক, কোনমতে টাল সাম্‌লাইয়া কহিলেন, তুমিও ক্ষেপেছ নাকি, তা'হলে আমিও কালো, কি বলো! কর্ত্তার ভ্রূকুটি দেখিয়া গৃহিণী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হ'ন নাই।

বিবাহের দিন রাত্রিতে সুধা তেমন-কিছু মূল্যবান কাপড়-চোপড় পরিতে রাজী হইল না, এ যেন এ করকম জোর করিয়াই তাহাকে বিবাহ দেওয়া হইতেছে। তাহার মুখের রক্ত কোথায় উবিয়া গিয়াছে এবং কাহারও সাথে কোন কথাবার্ত্তা বলা সে আদৌ পছন্দ করিল না। বীণা ইচ্ছা করিয়াই আসে নাই, এবং পাড়ার সাথীরা অযথা ধমক খাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সে এমন ধীর, স্থির হইয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল যে, যেন পার্ব্বত্য কল্লোলিনী উপলখণ্ডে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া বিরাট বিপুল বাঁধের কাছে তাহার আকুল, উদ্দাম গতি একেবারে প্রতিহত হইয়া গিয়াছে।

মুখচন্দ্রিকার সময় সে চোখ বুজিয়া রহিল। নতুন জামাই বেচারী সব দেখিয়া শুনিয়া যেন একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। পুরোহিত ঠাকুর, পাড়াপড়শীরা, সমপাঠীরা বার বার বলিয়া উঠিল, চোখ খোল, চোখ খোল, কিন্তু সুধার চোখ দুটি সহসা একবার বিদ্যুতের মত খেলিয়া গিয়া আবার মেঘের কোলে লুকাইয়া গেল।

গ্রামময় কানাকানি সুরু হইল। রমাকান্ত রায় গোঁফের ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, ওসব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা এসব করি নি। আমি ওর মার বিয়েতে কি রকম কট্‌মট্‌ চোখে চেয়েছিলাম, আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। বরযাত্রী ভগবান-দাদা কাঁচের চশমার ভিতর দিয়া চাহিয়া কহিলেন, ঢের হয়, ঢের হয়, আমি বিবাহের ভয়ে পনরো বছরে বিয়ের আসর ছেড়ে পালিয়েছিলাম!

আসরে একটা মৃদু হাসির ধ্বনি শোনা গেল। কন্যাযাত্রী ঈশান ঘোষাল কাংসবিনিন্দিত কণ্ঠে কহিলেন, ছেলে-মেয়েরা সব হ'ল কি, বিয়ের সময় মুখ পেঁচা করে থাক্‌তে এই প্রথম দেখলাম! সদুর মা আমার দিকে কিরকমভাবে তাকিয়েছিল, একবার জিজ্ঞাসা করো না ওঁকে, আমার এখনও মনে পড়ে! সদুর মা দূর হইতে অন্দরে সরিয়া পড়িয়া কহিলেন, বুড়োর কাছে যাব এখন সাক্ষ্য দিতে! মরণ আর কি!

এতেও কিছু হইত না, কিন্তু ভোর রাত্রিতে বরের হঠাৎ অন্তর্ধানে পাড়াময় ঢি-ঢি পড়িয়া গেল।

থানায় খবর দেওয়া হইল, এবং চারিদিকে লোক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ছেলে শেষে মনে একটা আঘাত পাইয়া কিছু না করিয়া বসে এজন্য রমাকান্ত রায় পুলিসে খবর দিলেন। চারিদিকে রেলওয়ে ষ্টেশনে, ষ্টীমার ঘাটে সি-আই-ডি পুলিস মোতায়েন হইল, কিন্তু কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না। পুলিসসাহেব তদন্তে মহকুমায় আসিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর রমাকান্তের নাম শুনিয়া 'কনকসার' হইয়া গেলেন। এই গ্রামে প্রফেসার মহাশয়ের বাড়ী। পুলিসসাহেব সদলবলে আসিলেন, সাথে পুলিস, পেয়াদা, চৌকিদার, দফাদার, কনেষ্টবল, দারোগা কেহই বাদ পড়িল না।

মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে বিরাট বৈঠক বসিয়াছিল, এমন সময় পুলিসসাহেব আসিয়া উপস্থিত। ভগবান-দাদা পিছনের দরজা দিয়া লাফাইয়া পড়িলেন, সূর্য্যকান্ত গ্রামের প্রবীণ লোক, সেকালের মাইনর পাস, ইংরেজী কিছু কিছু জানেন, গুডমর্ণিং বলিয়া এক রকম বাঁকিয়া পড়িলেন। গদাধর কবি-ভূষণ পৈতা বাহির করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সাহেব মৃদু হাসিয়া কহিলেন, ছেলে কেন পলাইয়া গেল, গোসা করেছে নাকি? আজকালের দিনে ছেলেরা বাড়ী না থাকিলে ডাকাতি করিতে যায়।

রমাকান্ত বিবর্ণমুখে জবাব দিলেন, বিবাহ করিতে আসিয়া পলাইয়াছে।

—বিবাহ করিতে আসিয়া মেয়ে নিয়া পলাইয়াছে, elopement নিশ্চয়ই।

ভগবান-দাদা মৃদু হাসিয়া শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, হুজুর, আলাপ করেনি, এমনিই গিয়াছে।

রমাকান্ত চোখ টিপিয়া চুপি চুপি কহিলেন, আলাপ না, ইলোপ, এটা একটা খারাপ ইংরেজী কথা।

দাদা তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাইয়া কহিলেন, আলাপ-টালাপ হলে কি হুজুর পালায়!

সাহেব কহিলেন,—মেয়ে বুঝি beautiful না?

আজ্ঞে মেমসাহেবের মত সুন্দরী—বলিয়াই ঈশান পাঠক আগাইয়া আসিলেন।

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, কহিলেন, বোধ হয় ঝগড়া হইয়াছে, শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে।

ঈশান পাঠক মাথা নাড়িয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তা'-তো যাবেই। আমাদের শাস্ত্রেও আছে—অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে—দম্পতী কলহেশ্চৈব—উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, সাহেব ও সঙ্গে সঙ্গে রসিকতা মনে মনে অনুভব করিয়া নির্ব্বোধের মত পরে একটু হাসিলেন। দারোগা সাহেব বকাউল্লা ইংরেজী করিয়া বলিতে গিয়া হয়রাণ হইয়া উঠিল। অনুবাদ বোধ হয় এই রকম করিয়াছিল...
Goats fighting, Sradh ceremony of Rishis, and morning clouds, quarrel between husbands and wives are mere farce.

সাহেব কি বুঝিয়াছিলেন, আমরা তাহা ভাল জানি না।

পরে অমলের খোঁজ পাওয়া গেল। সে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িত। কিন্তু সুধার বাবা এ-খবর ভাল করিয়া জানিতেন না। তিনি তখন বদ্‌লী হইয়া বেথুন কলেজের প্রফেসার হইয়া আসিয়াছিলেন। বৈবাহিকের পত্রে কুশলপ্রশ্ন মাঝে মাঝে পাইতেন সত্য, কিন্তু অমলের বিষয়ে কোন সংবাদ তিনি ইচ্ছা করিয়াই লিখিতেন না। রাগ, অপমান, ক্ষোভও তাঁহার কম হয় নাই। তিনি রমাকান্ত গাঙ্গুলী—পীরগাছার প্রকাণ্ড জমিদার, তাঁহার এত বড় একটা অপমান হইয়া গেল। কতকগুলি নগণ্য পল্লীবাসীর সুমুখে, তাঁহার মনেপ্রাণে এই অসহ্য ব্যথা বড় বাজিল, কিন্তু আপাততঃ কোন উপায় নাই ভাবিয়া বাঘের শিশু চিড়িয়া-খানার লৌহপিঞ্জরে বন্দী হইয়া মনে মনে আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

সুধা ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বেথুনে আই-এ পড়ে। অমলের কথা সে কোন দিন মুখে আনে নাই। ক্লাশের সমবয়সীরা তাহার সিঁথিতে সিঁদুর দেখিয়া বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বিষম ক্ষেপিয়া উঠে। কেহ কেহ ঠাট্টা করিতেও ছাড়ে না। একদিন অমিতা জিজ্ঞাসা করিল, ঝগড়া করেছ বুঝি, বলো না ভাই, আমরা সব মিটিয়ে দি'।

নিভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, ও আবার ঝগড়া কি? বীণার কথা মনে নেই? দু-দিন বাদেই আবার অজ্ঞান!

কমল হাসিয়া কহিল, মিলনে বিরহ না থাক্‌লে তত মধুর হয় না।

সুধা মলিন মুখে জবাব দিল, ওসব কিছু নয় ভাই, তোমরা আমায় জ্বালাতন করো না, আমি কখনো বলেছি যে, ঝগড়া হয়েছে? আমার সাথে একদিনও দেখা হয় নি।

—ওমা বল কি, বলিয়াই সকলেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

নিভা সমঝদার মেয়ে, আসল ব্যাপারটি যেন মনে মনে অনুধাবন না করিয়া কহিল, তাইতো তোমাকে অত মনমরা দেখি, বর বিলেত গিয়েছে বুঝি!

—তা' আমি কি জানি?

—তুমি জান না তো, কি আমরা জানি?

—আচ্ছা, তোমার বাবাকে জিজ্ঞাস করে খবর নেব।

সুধা কথা কহিল না, শুধু একটু রঙিন আভা তাহার মুখের ওপর হঠাৎ খেলিয়া আবার চোখের নিমিষে কোথায় উবিয়া গেল।

অমলের ওপর সুধার রাগের কারণ এবং এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব নিভা এখনো ভাল করিয়া বোঝে নাই, এবং জানে না। অথচ সুধা অপূর্ব্ব সুন্দরী, এমন বউয়ের কথা কোন্ না যুবক ভাবিয়া থাকিতে পারে? সে ইহার একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিল এবং তাহার

ছোট বোন রাণুর কাছে সুধার বাবার ঠিকানার জন্য চিঠি লিখিয়া দিল। সে অভিমান করিয়াই বিয়ের রাত্রিতে চলিয়া আসিয়াছিল। এই অভিমান তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ বিবাহের সময় যদি মেয়ে ঘৃণায় তাহার দিকে চোখ মেলিয়া চাহিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করে, এ কি কম অপমানের কথা, আর কেনই বা করিবে,—সে কি তার চেয়ে কম? রূপে, গুণে, বিদ্যায়, ধনে-জনে অমলের মত একটি ভাল ছেলে বাংলা দেশে নিতান্তই বিরল।

নিভা সুধার বাবার কাছ থেকে বেশী কিছু খবর সংগ্রহ করিতে পারে নাই, কিন্তু তার দাদা সমর একদিন কথায় কথায় বলিয়া ফেলিল, আমাদের সাথে পীরগাছার জমিদারের ছেলে অমল গাঙ্গুলী বলে একজন পড়ে, তুমি কি তারই কথা আমার কাছে বলছিলে সে দিন? ওর সাথে আমার খুব ভাব, কিন্তু ষ্টুপিড বলে, বিয়ে করেনি, আমি ভেবেছিলাম—

নিভা হাতে আকাশ পাইয়া কহিল, হ্যাঁ দাদা, অমল গাঙ্গুলীর কথাই বল্‌ছি, ওদের বাড়ী আমাদের ঢাকায়, ওরা খুব বড়লোক।

সমর একটা ভাবিয়া কহিল, বিয়ে তা'হলে হয়ে গেছে।

—না, তোমার জন্য বাকী আছে!

—কিন্তু তাকে বড় আন্‌মনা দেখি! তোর সঙ্গে এক দিন আলাপ করিয়ে দেব?

—শুধু আলাপ করিয়ে নয়, একদিন আমাদের এখানে চায়ের নেমন্তন্ন করো। আর সুধাকে আমার বোন বলে ওর কাছে পরিচয় দেবে, সাবধান দাদা, কখনো সত্যি পরিচয় দিয়ো না কিন্তু।

—আহা বেচারীকে তোর কথা একদিন বল্‌তেই কত সুখ্যাতি করলে তোর।

—এই না দেখেই!

—না রে বোকা দেখার কথা তো ওঠেনি। তুই যে রেডিয়োতে গান গেয়েছিস্, সে কথা শুনে একেবারে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল।

—তুমি বড়ো বাইরের ছেলেদের সাথে ইয়ারকী দাও দাদা, আমি এ সব পছন্দ করি না। মেয়েদের কথা নিয়ে তোমরা এত অসভ্য আলাপ করো, এ কিন্তু তোমাদের ঠিক নয়।

—আর তোমরা ছেলেদের নামে কম বলো, আমরা কলেজের মেয়েদের কথা জানি না। আচ্ছা, তুমিই বলো কি না?

—অত তীব্র আলোচনা করি না, এ-কথা তুমি ঠিক জেনো—বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিল, কি অসভ্য অমল বাবু, নিজের স্ত্রী থাকৃতে—

সমর বাইকে ছুটিয়া গেল অমলের মেসে চায়ের নেমন্তন্ন করতে।

সুধা শুধু আসিয়াছিল চায়ের নিমন্ত্রণে। ঘরখানি অতিশয় সুশ্রী ভাবে সাজানো হইয়াছিল। ফুলের গন্ধে, তীব্র আলোকে, রঙীন পর্দ্দায় চতুর্দ্দিক ঝলমল করিতেছিল। অমল আসিয়া বসিতেই সমর পরিচয় করাইয়া দিল, এই দুটি তার বোন, এবং মেয়েদের কাছে অমলের কথা শুধু বলিল, ইনি আমার সহপাঠী এবং কবি।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি আষাঢ়ের নবঘন মেঘ দেখিয়া সে দুই-চারিটি বিরহের কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছিল। এ-ব্যাসিলি আজকাল স্কুলে, কলেজে এমন কি পল্লীর আনাচে-কানাচেও সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে।

নিভা দু-একটা গান গাহিয়া অমলকে শোনাইল। অমল একেই গানের নামে পাগল, সে সমরের দিকে চাহিয়া ইসারা করিতেই সমর সুধার দিকে চাহিয়া কহিল, সেই গানটি তোমার মুখে খুব ভাল লাগে। সমর সুধাকে নিভার সমপাঠী হিসাবে "তুমি" সম্বোধন করিত।

সুধা গান ধরিতে নিভা মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল,

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া;
দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া'

অমল নিভার দিকে চাহিয়া তাহাকে একরকমভাবে মুখ টিপিয়া হাসিতে দেখিয়া কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। তবু সে একটুও ঘাবড়াইবার ছেলে নয়, কবির মত উদাসভাবে সুধার দিকে বার বার চাহিয়া দেখিতেছিল। সমর ভাব-সাব বুঝিয়া নিজেই অর্গানটি টানিয়া লইয়া জলদগম্ভীর স্বরে গান ধরিল। তবে তার গলা তেমন মিষ্টি নয়, সে এক-আধটু গাহিতে জানে,—

'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে...'

নিভা মুখে রুমাল দিয়া হাসি চাপিয়া রাখিল। সুধা ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারে নাই, সে অমলের দিকে একবার চোখ ঘুরাইয়া আবার সমরের গান গাহিবার ভঙ্গীতে মনে মনে হাসিতে লাগিল।

রাত্রি অধিক না হইতেই যে যার দিকে পারিল বিদায় লইল। সমর অমলের মেসে গিয়া সে-রাত্রির মত আশ্রয় গ্রহণ করিল, বাসায় বলিয়া গেল, কাল ভোরে ফিরিয়া আসিবে। সারা রাত্রি ধরিয়া দুই বন্ধুতে নানা আলাপ-আলোচনা চলিল।

সমর ইচ্ছা করিয়াই সুধার কথা তুলিল, কহিল, আমার বড় বোনটিকে তোমার পছন্দ হয়?

—বা রে, ফাজলামি করার আর জায়গা পাও না! বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সীঁথিতে সিঁদুর, তুমি তো আচ্ছা লোক হে!

—রাখো না ভাই, বলতেই দাও না, ওর বিয়ে হয়নি, তবু বেচারী সীঁথিতে সিঁদুর দেয় কেন জানো? বলে আমি মনে প্রাণে একজনকে ভালবাসি, কিছুতেই নাম বলে না, শেষে দেখি চিত্রা পত্রিকায় তোর যে সেই কবিতাটি বেরিয়েছিল, সেই যে—পল্লীপ্রিয়ারে স্মরি—সেই কবিতার লেখককে ও মনেপ্রাণে ভালবেসে ফেলেছে। এমন ভালবাসায় যে কতখানি risk তা' ও কি করে বুঝবে বলো তো। ধরো না, প্রথম, লেখক বুড়ো না যুবক বোঝা ভার; তারপর বিবাহিত হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু ও বলে কি জানো,...বুড়ো হতেই পারে না, কারণ এ রকম কবিতা বুড়োদের পক্ষে লেখা অসম্ভব, আর বিয়ে হ'লে কি কেউ কখনো পল্লীপ্রিয়ারে স্মরিয়া অত বিরহের কথা লিখতে পারে···

—খুব পারে ভাই, এ-কথার কোন মূল্য নাই। আমার বিশ্বাস হয় না ভাই।

—কি বিশ্বাস হয় না,...ও যে তোকে ভালবাসে, এই কথা?

অমল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এ কিন্তু ভারি অন্যায় সমর, তুমি আমায় ক্ষমা করো ভাই, আমার বিয়ে হয়ে গেছে এ-কথাটি তুমি ওকে ভাল করে বুঝিয়ে বলে দিয়ো!

সমর তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, বলিস্ কি, সর্ব্বনাশের কথা, আমি ওকে বলে রেখেছি, এ-বিষয়ে অমলের মত নিশ্চয়ই হবে, আর তোমাকে এতো মেলামেশা করিয়ে তুমি এখন বলো কিনা তুমি বিয়ে করেছ। আমি ভাই এ-সব বল্‌তে পারব না। তুমি একদিন বুঝিয়ে বলে এসো!

এই কথা শোনার পর অমল একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার মনে হইল সত্যই তো সমরকে সে বিষম ফ্যাসাদে ফেলিয়াছে, এখন কি করিয়া পিতামাতার অগোচরে সে সমরের বোনকে বিবাহ করিয়া বসে! রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেলে পর তাহার চোখে ঘুম আসিয়াছিল। সমর খুব ভোরে উঠিয়া মেস হইতে চম্পট দিয়াছিল, শুধু মেসের ঝি তাহাকে সদর দরোজা খুলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল।

কলেজের ক্লাশে সুধা নিভাকে কহিল, ছেলেটি কিন্তু বেশ শান্ত, শিষ্ট অমায়িক।

নিভা মুচকি হাসিয়া কহিল, আমার বর তা'হলে ভালই হবে ভাই কি বলো, কেমন সুন্দর চেহারাখানি, না?

—সে কথা আর বল্‌তে। তোমার অদৃষ্ট ভাল, না হ'লে এমন সুন্দর বর...

বাধা দিয়া নিভা কহিল, আর তোমার কপাল বুঝি মন্দ। তোমার বরও তো এমনি সুন্দর, সেদিন যে মাসীমা বল্‌লেন।

যাও ভাই, আর কাটাঘায়ে নূনের ছিটে দিয়ে লাভ কি বলো ত?

—আমি সত্যি বল্‌ছি ভাই, পরে কথাটি ঘুরাইয়া কহিল, কাল আমাকে দেখতে এসে তোমাকেই পছন্দ করে গেছেন। দাদা যেমন বললেন, ওর বিয়ে হয়ে গেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মূর্চ্ছা আর কি! আজও নাকি খুব কান্নাকাটি ক'রছেন! দাদা আজও তাকে নিয়ে আসবেন আমাদের এখানে। তুমি ভাই আমার কথা একটু বুঝিয়ে বল্‌বে ওকে!

সব কথা শুনিয়া সুধা জবাব দিল, কেন বলবো না ভাই, ওঁকে আমি তোমার সামনেই সব কথা বুঝিয়ে বলবো।

—বলো কিন্তু ভাই, এ-বিষয়ে তোমার কাছে আমরা হার

মানি। পুরুষদের সাথে টেক্কা দিতে তোমার মতো মেয়েই চাই।

প্রত্যুত্তরে সুধা আর কিছু বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সন্ধ্যায় আবার সেই চায়ের মজলিস। নিভা ভাবের আবেশে গান ধরিল,

"সন্ধ্যা রাণী, সন্ধ্যা রাণী
এই ত মোদের গোপন মিলন, কেউ জানে না আমরা জানি।"

সমর সেদিন এদিক-সেদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কখন ঘরের ভিতরে আসিয়া বসে, আবার বাহিরে গিয়া গুণ গুণ করিয়া গান ধরে···

"সন্ধ্যা রাণী, সন্ধ্যা রাণী,
এই ত মো'দের গোপন মিলন, কেউ জানে না আমরা জানি।"

গান থামিয়া গেলে অমল কিছু কথা বলিবে, এমন ভাব প্রকাশ করিতেই সুধা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আপনাকে যেন একটু আনমনা দেখছি আজ।

অমল ঢোঁক গিলিয়া কোনমতে মাথা নীচু করিয়া কহিল, আপনার প্রেম কামনার বস্তু নিশ্চয়ই কিন্তু আমার কোন অপরাধ নেবেন না, আমি—বি—বা—হি—ত—বলিতেই তার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল, পরে আবার কহিল, সমর আপনাকে ভুল বলেছে......

সুধা আগাগোড়া না বুঝিয়া কহিল, তার ম'ানে?

—আপনি যে আমাকে এত ভালবাসেন, আমি সে ভালবাসার অযোগ্য···

অমল এ-কথা বলিতেই সুধা বিষম ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, কাকে কি বলছেন আপনি, আমার নাম নিভা নয়, আমি আপনাকে কোনদিন ভালবাসি নি, আমার স্বামী আছেন।

সুধার চোখের দিকে আর তাকাইতে না পারিয়া অমল ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া করজোড়ে কহিল, সমর বলেছিল, আপনি নাকি—

—ওসব বাজে কথা, আপনি কি বলছেন পাগলের মত!

নিভা হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, ঠিকই বলছেন অমল বাবু এই যে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী সুধা। সুধা, স্বামীকে তুমি চিনতে পারো নি, এঁর নাম অমল গাঙ্গুলী, পীরগাছায় এঁদের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ীর কথা ভুলে গেছ···

সুধা ফ্যালফ্যাল চোখে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কে স্বামী, ভুল বলছ নিভা, আমি নিজের চোখে দেখেছি···

ছাই দেখেছ তুমি, ওদের ক্লাশে দুইজন অমল গাঙ্গুলী ছিল, সেসব খবর আমরা পেয়েছি। তোমার চেয়ে আর দ্বিতীয় বোকা পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ।

সুধা থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে লজ্জায় দুঃখে ক্ষোভে একেবারে উপুড় হইয়া অমলের পায়ের কাছে ধপ করিয়া পড়িয়া গেল।

অমল যেন ভ্যাবাচ্যাকা গঙ্গারামের মত বায়স্কোপের চলচ্চিত্র দেখিতেছিল, বলিল, এ-সব ব্যাপার কি ভাই সমর?

সমর পর্দ্দার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া সুর ধরিয়া কহিল,

'ছিলে কালাচাঁদ হ'লে গোরামণি
তোমারে না দেখা ভালো—সখিরে......
যুগে যুগে তুমি হও অবতার
ভানুর কিরণে আলো······সখিরে।'

* * * *

সকল ব্যাপার শুনিয়া দেখিয়া অমল আনন্দে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সমর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া আবার গাহিয়া উঠিল, 'ধৈর্য্যং রহু, ধৈর্য্যং রহু...'

* * * *

এখনো পীরগাছা গ্রামে লক্ষ্যার তীরে বাঁধা-ঘাটে বসিয়া কোন তরুণ তরুণীর মনোমালিন্যের কথা উঠিলে ভগবান-দাদা বিজ্ঞের মত উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠেন······

অজাযুদ্ধে, ঋষি শ্রাদ্ধে······

ঈশান ঘোষাল ফোড়ন দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠেন, দম্পতী কলহেশ্চৈব·····

একটা বিষম হাসির হর্‌রা ছুটিয়া যায়। মহিম পাঠক শান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া'। এর পরে আর গল্প কি! গল্প অতি সহজ, সরল এবং সংসারের দৈনন্দিন ঘটনার মাঝে গিয়া আপনাকে নিমেষে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

অপরিহার্য্য

চায়ের অতীত ইতিহাস যদিও রহস্যমধুর, যদিও তাকে কেন্দ্র করে অনেক মনোহর গল্পের জাল বোনা হয়েছে, তবু কল্পনা-বিলাস এখন থাক। এখন নেমে আসা যাক বাস্তবতায়।

পানীয় হিসাবে চা সম্বন্ধে স্থূল সত্য কি? সে সত্য এই যে চা আমাদের জীবনের একটি সাধারণ প্রয়োজন। কেমন করে জল বাতাস বা নূণের মত চা আমাদের জীবনের অপরিহার্য্য প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে তা নিয়ে বাগ্‌বিস্তারের প্রয়োজন নেই। এ কথা সত্য যে নিত্যকার পানীয় হিসাবে চা আমাদের প্রগতিশীল যুগের অপরিহার্য্য অংশ হয়ে আছে। কে এ কথা অস্বীকার করবে?

যে কোনো ঋতুতে, যে কোনো সময়ে, যেখানেই আমরা থাকিনা কেন, বন্ধুর সঙ্গের মত আমরা এই পরম তৃপ্তিকর পানীয় কামনা করি। চা দুর্লভ-ও নয় মহার্ঘ্য-ও না; চা সম্বন্ধে ধ্রুব সত্য এই যে, চা না হ'লে আমাদের চলে না।

বিখ্যাত কোনো ইংরাজ লেখক ঠিকই বলেছেন যে চায়ের সঙ্গে সত্যের প্রগতির তুলনা হয়। প্রথমে সবাই করেছে সন্দেহ, তারপর পরিচিত হবার চেষ্টায় দিয়েছে বাধা। খ্যাতির প্রচারের সঙ্গে রটিয়েছে কুৎসা। কিন্তু তবু শেষে কালের অপ্রতিহত প্রভাবে নিজস্ব মাহাত্ম্যেই তার হয়েছে জয়।

সুপটু হাতে তৈরী চায়ের প্রথম স্বাদ কখনও ভোলবার নয়। মনে হয়, এত সুন্দর যার স্বাদ তা আগে কেন জানতে পারি নি! অবাক হতে হয় এই ভেবে এমন পানীয়ের সঙ্গে এতদিন পরিচিত হইনি!

সবিস্ময়ে ভাববার কথাই বটে। আমাদের দেশের মৃত্তিকাতেই চায়ের জন্ম। আমাদের দেশের লোকেরাই তা চাষ করে। ব্যবহারের যোগ্য করে তোলেও তারাই। ভারতে উৎপন্ন চা পৃথিবীর সর্ব্বত্র লক্ষ লক্ষ লোক সমাদরে পান করে। পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশকে সত্যই আমরা এই অপূর্ব্ব জিনিষ উপহার দিয়েছি।

সাধারণ সহজ একটি পানীয় হিসাবেই চা সকলে গ্রহণ করলেই যথেষ্ট। চা শ্রান্তিহর ও তেজস্কর সত্য, কিন্তু সাধারণতঃ লোকে শুধু সেই কারণেই চা পান করে না। লোকে পরম তৃপ্তিকর বলেই চায়ের প্রতি এত অনুরক্ত। সকল ঋতুতে সকল সময়ে ব্যবহার করা যায় বলে, অব্যর্থ-ভাবে মেজাজ ভালো করে তোলে বলেই চায়ের এত আদর। চা আমাদের জীবনের একটি প্রয়োজন বটে, কিন্তু ওটা মধুর প্রয়োজন।

অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী

কনফুসিয়াস্ তাঁর শিষ্যদের একবার বলেছিলেন: "তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যদি তোমার দ্বারে আসে তাকে একপাত্র চা দিও বিনামূল্যে"। পিপাসায় যে কাতর তাকে স্নিগ্ধ সঞ্জীবনী সুধার মত চায়ের পাত্র দেবার মত আতিথেয়তার শোভন নিদর্শন আর কি হতে পারে! তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে চায়ের পাত্র দান করবার জন্যে তাই কনফুসিয়াস্ শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিয়াছিলেন। মানবতার ধর্ম্মপ্রচারক হিসাবে সেই মহান দার্শনিকের নাম আজ সমস্ত বিশ্বে সমাদৃত।

চা-পানের নিত্যকার অনুষ্ঠান যেখানেই পালিত হয় সেখানেই দেখা যায় মানবতার প্রেরণা তার সঙ্গে জড়িত আছে। সেই জন্যেই চা পান আমরা সামাজিকতার মধুর অঙ্গ বলে আজকাল মনে করি। চায়ের প্রধান গুণ এই যে তাতে আমাদের দেহ ও মন সজীব হয়ে ওঠে। শুধু নিজের জন্যে নয়, পরিচিত বন্ধু ও অপরিচিত অতিথি সকলকেই আমরা চায়ের আনন্দের ভাগ দিতে চাই। কোন বিখ্যাত

চা-রসিক বলেছেন—"এই অমূল্য পানীয় মর-জীবনের দুঃখের পাঁচটি কারণেরই মুলোচ্ছেদ করে।" কথাটা ঠিক কাব্যময় অত্যুক্তি নয়। যে পানীয় আমাদের জীবনে আনে পরম পরিতৃপ্তি তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

শরীর যখন ক্লান্ত, মন বিচলিত, তখন এক পেয়ালা চা খাওয়া প্রয়োজন। কি গভীর আরাম যে তাতে পাওয়া যায় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়? দেহ ও মন অবিলম্বে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে ; এক সঙ্গে পাওয়া যায় তৃপ্তি ও উদ্দীপনা।

কাঁচা অবস্থায় কিংবা পানের উপযোগী করে প্রস্তুত হবার পর চায়ে কোন প্রকার মাদক গুণ বিন্দুমাত্র থাকে না। তা সত্ত্বেও চাকে নেশা হিসাবে গণ্য করে অনেকে অত্যন্ত ভুল করেন। চা নেশা ত নয়ই বরং অন্যান্য মাদক দ্রব্যের অস্বাস্থ্যকর পিপাসা জয় করতে চা সাহায্য করে। ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদের ভেতর চা-পানের অভ্যাস ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাড়ি-সেবকের সংখ্যা যে কমে গিয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

সঙ্গতি যতই সামান্যই হোক বা রুচি যত সূক্ষ্মই হোক, সকল রকম লোকের মনস্তুষ্টি করবার মত নানা ধরণের প্রচুর চা একমাত্র ভারতবর্ষেই উৎপন্ন ও প্রস্তুত হয়। নামমাত্র ভারতীয় চা থেকে আমরা অপকারহীন, হিতকর একটি পানীয় পাই। এ কথা বলাই বাহুল্য যে চা-পানের অভ্যাস প্রসার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর স্বাস্থ্য ও শক্তি যেমন বাড়বে জাতীয় সম্পদও তেমনি প্রাচুর্য্য লাভ করবে।

দীপ ও ধূপ

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ধূমায়িত ধূপ অস্ফুটে কয় আমার কানে
নিজেরে দহিয়া ভুবন মাতায়ো গন্ধ দানে,
নিভৃতে কহিছে আমারে দীপ্ত দীপের শিখা
নিজে করি ক্ষয় বিশ্বে ছড়ায়ো জ্যোতির লিখা

আমি শুধু ভাবি আঁখি দুটী মেলি হায়
যে গান তোদেরই চিত্তটী ছুঁয়ে যায়,
শিখাল' ধরি ত্যাগী বৈরাগী সাজ
সে গানের সুর হারায়ে ফেলেছি আজ।

মহালয়া

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

যে গৃহে নিত্য মহারিক্ততা মহশূন্যতা কাঁদিয়া মরে,
সেথায় কি তুই সত্য এলি মা, পূর্ণতা-থালি বহিয়া করে ?
ধন্য কি হ'ল অর্ঘ্য দীপিকা,
ধন্য কি হ'ল পণ্য-বীথিকা ?
বন্ধন জ্বালা ঘুচিল কি মাগো, অন্ধ কি আজ মেলিল আঁখি ?
যারা ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব-মাতাল, তা'রা কি প্রেমের পরিল রাখী ?

শারদ-কৃষ্ণা অমানিশীথিনী বিভীষিকাময়ী আর্ত্তনাদে,
শূন্য আলয়ে ব্যথিত আত্মা মহা-অনশনে নিত্য কাঁদে !
আজি মহালয়া বাজে আগমনী,
কই কোথা রথচক্রের ধ্বনি ?
কেশরীর ভীমগর্জ্জন কই, মহিষাসুরের রক্তপানে ?
কেন রোমাঞ্চ জাগেনাকো দেহে জাগে না হর্ষ ভক্তপ্রাণে

যে গৃহে নিত্য অভিমান ভরে গুমরিয়া মরে আঁধার-রাশি,
যেথায় আত্মহত্যা চলেছে স্বেচ্ছায় গলে টানিয়া ফাঁসী,
সেথায় কি তুই এলি মহামায়া,
ঋদ্ধিরূপিনী রুদ্রের জায়া ?
তোর আগমনে ধন্য কি হ'ল চির লাঞ্ছিতা জন্মভূমি ?
ঝরিল কি তব শুভাশীষ ধারা ক্ষুধিত জনের মর্ম্ম চুমি ?

কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র

এ, হাকিম এম্‌-এ, বি-এল্‌

শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই কাঁদে। এই তার আত্ম-প্রকাশ। সে কৈশোর ও যৌবনে উপনীত হয়। সর্ব্বত্র তার আত্ম-পরিচয়। মানবজীবন ছাড়িয়া প্রকৃতির দিকে তাকাইলেও দেখি এই একই অভিব্যক্তি। পার্থক্য এই, প্রকৃতি আত্ম-প্রকাশ করে নীরব ভাষায়, আর মানুষ—নিজেকে প্রকাশ করে শিল্প ও সাহিত্যে। প্রতি শিল্পের পশ্চাতে আছে—একটী মানুষ—প্রতি মানুষের পশ্চাতে বিশাল মানবজাতি; এই মানবজাতির পশ্চাতে আবার তার নৈসর্গিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিক। মানুষের অতীতের শিক্ষা, বর্ত্তমানের সাধনা ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন আত্মপরিচয় দেয় শিল্প ও সাহিত্যে। মানুষ চায় অমরত্ব। যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর তাহাকেও করিতে চায় অমর। অতীত যুগে মানুষের এই সনাতন বাসনা আত্মপ্রকাশ করিত প্রস্তরগাত্রে। তার সাক্ষী সৃষ্টির বিস্ময় পীরামীড। কত প্রস্তরমূর্ত্তি বর্ত্তমানে আনয়ন করে অতীতের বাণী! মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, কিন্তু শিল্পীর তুলির অভাব হয় নাই। শ্বেত প্রস্তরে কল্পনার উর্ব্বশীসৃষ্টি, মোহন তুলিকায় দুলাল চিত্র অঙ্কন, পর্ব্বত গাত্রের নীতিমালা, বৃক্ষপত্রে মাশুকের প্রেমলিপি, সবারই মূলে একই আদিম সত্য—মানুষের বাসনার ইতিহাস!

> "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
> মানবের-মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
> এই সূর্য্যকরে, এই পুষ্পিত কাননে,
> জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যেন ঠাঁই পাই।
> ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত
> বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,
> মানবের—সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত,
> যেন গো লভিতে পারি অমর আলয়।"

বিশ্ব কবির নিজের পরিচয় লিপি এই! সকল আর্টের সাধনা ও সাফল্য এই খানে!!

কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রকে চিনিতে হইলে আর্টের কয়েকটি লক্ষণ জানা আবশ্যক। লেখক পাই আমরা অনেক, কিন্তু তার মধ্যে আর্টিষ্ট কয়জন? জীবনকে সত্য ও সুন্দরের মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতে যে না পারিল, বৃথা তার শিল্প-সাধনা! মানুষের দৈনন্দিন জীবনের স্তরে স্তরে ঢাকা থাকে যে অপূর্ব্বতা তাহাকে আবরণমুক্ত করিয়া সুধীসমাজে পরিচিত করা শিল্পীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। শিল্পের এই লক্ষণকে 'প্রকাশ' বলিতে চাই। আত্মপ্রকাশের দুইটি অবস্থা; একটি 'প্রকাশ', অপরটি 'ইঙ্গিত'। যেটুকু স্পষ্ট প্রকাশ সেখানে শিল্পীর তুলিকা "Finishing touch" দিলে, শিল্প-সৃষ্টি সত্যই অসম্পূর্ণ থাকে। নগ্নতা সৌন্দর্য্যদর্শনের প্রতিবন্ধক—রূঢ় তিরস্কারে সে দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনে। মেঘের পেছনে চপলার লীলা-লাবণ্য ও তাহার Sudden Shock' সমান উপভোগ্য নহে। সৃষ্টি নিজেকে প্রকাশ করিয়া তার মধ্যে রেখে যায়—"Cloudy symbols of a high romance," এইখানে শিল্পসাধনা সার্থক। শিল্পীর সাধনা সমজদারের অন্তঃকরণে এক "রাঙা অলকা" সৃষ্টি করে। সেই "Lordly Pleasure House" সাহিত্য-সাধনার সিদ্ধি! শিল্পের এই গুণকে তার 'ইঙ্গিত' বলে। শিল্প ও সাহিত্যের তৃতীয় লক্ষণ উল্লিখিত দুইটার মহাসমন্বয়। ধ্বংস সৃষ্টির মত আর একটি বিরাট সত্য। বস্তুতঃ, সৃষ্টি ও ধ্বংসের অনন্ত লুকো-চুরিতে জীবন ভরপুর। এই সৃষ্টি-অভিযান ও ধ্বংস-লীলার একটা moral আছে। সুন্দরকে কেহ আপন ইচ্ছায় নষ্ট করে না। তবে কালের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, তার "Universal appeal" চাই,—"Felicity of Expression" থাকা চাই। শিল্পের এই তৃতীয় লক্ষণকে বলিতে চাই এর অমরত্ব।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি উক্ত 'মাপ কাঠিতে' বিচার করিবার

পূর্ব্বে কয়েকটি কথা বলিব। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বুকে একই যুগে 'ফিক্‌শন্' সৃষ্টির স্পন্দন অনুভূত হয়, কিন্তু ইহা বিশেষ ভাবে গড়ে উঠে ইংরাজি-সাহিত্যে। বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে গল্প সাহিত্যকে আসিতে হইয়াছে বহু অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া। শিশু ভূত, প্রেত ও পরীর কাহিনী শুনিতে ভালবাসে। অসম্ভব যা কিছু মহানন্দে হজম করে!

> "সহস্রদল জাগে,
> চম্পাদল জাগে,
> পক্ষীরাজ ঘোড়া জাগে!"

এই মন্ত্রের ওলট-পালট হইলে কাঁটা দিয়া উঠে তার গা! ঘর ভরিয়া ফেলে রাক্ষসের "হাউ মাউ, খাঁউ"। পরিণত মানুষ থাকিতে পারে না শৈশবের 'দেও', 'পরী' ও 'যাদুকর' লইয়া। "Weird Sisters", 'মিরাক্‌ল্‌স্', 'সোনার নৌকা' ও 'পবনের বইটি' লইয়া তাহার দিন চলে না। সে নিজেকে চিনিয়াছে, পৃথিবীকে জানিয়াছে, তার চোখের-পরদা অপসৃত হইয়াছে। আজ সহসা আসিয়াছে তার নূতন দৃষ্টি, দেখিতেছে সে! শিশু ও যুবক মনের এই ব্যবধান সত্ত্বেও নভেলের 'লীলা-অংশ' সকল সৃষ্টির সার ভাগ। আখ্যান বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও অনবদ্যতা উপন্যাসের প্রাণ। মানুষের মন স্বতঃই উপাখ্যান শুনিতে চায়। শিশু শিশুর মতো শোনে। যুবক যুবকের মতো শোনে। একই "Fundamental principles" উভয়ের বনিয়াদ। শিশু-মন নিছক 'রোমান্স' ছাড়িয়া কে জানে, কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে বাস্তবজগতে পৌঁছিয়াছে, কবে মানবের অনন্ত ঘরকন্নার সহিত পরিচিত হইয়াছে, কোন্ গোধূলি লগ্নে খেলার সঙ্গিনীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে বরণ করিয়াছে। আমরা জানি, এই নূতন মানুষ সংসারের ভাল মন্দ, ছোট বড়, জয় পরাজয়ের মধ্যে খুঁজিয়া পায় নূতন 'রোমান্স'। Hob-goblins সে হারায় এবং "Moving accidents by flood and field" তাকে ততো মুগ্ধ করে না বটে, কিন্তু সে দেখিতে পায়, চিনিতে পায় ও আলাপ করে এমন বাস্তব মানুষের সঙ্গে যারা তারই মতো "Move and act and have their being." আর্থারের 'রাউণ্ড টেবল' চূর্ণ হইয়াছে, সেখানে এখন নূতন চায়ের টেবিল 'ট্রে'তে চা ও রুটি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জেন অষ্টেন উপন্যাসে রোমান্সের পরিবর্ত্তে আমদানী করেন বাস্তব চিত্র। তাই তাঁর সম্বন্ধে স্কট বলেছিলেন, "That young lady has a talent for describing the involvements and feelings and characters of ordinary life which is to me the most wonderful I ever met with. The big bow wow strain I can do myself, like any now going; but the exquisite touch which renders ordinary commonplace things and characters interesting from the truth of the description and the sentiment, is denied to me. বাঙ্‌লা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্ব প্রথম প্রবেশ করেন রোমাণ্টিসিজ্‌মের 'Faery land'এ। তাঁহার উপন্যাস স্কটের "Bow wow strain" বর্ত্তমান যুগের কথা সাহিত্যের অগ্রদূত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। সার ওয়ালটার যে "Exquisite touch', এর উল্লেখ করেছেন, তাহা আমরা রবীন্দ্রনাথে সৃষ্টিতে প্রথম দেখিতে পাই। গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহজ প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য, সাধারণ জীবনের সাধারণ ঘটনা তাঁহার "প্লট"। অতিরঞ্জন নাই, কষ্টকল্পনা নাই। ভাব ও ভাষা নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। পূর্ব্বে কিছু লিখিতে হইলে প্রকৃতিকে 'ব্যাক্ গ্রাউণ্ড' করা হইত। প্রকৃতি কখন জ্যোৎস্নাময়ী, কখন বা ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া দেখা দিত মানুষের সুখ দুঃখের প্রতিচ্ছবি রূপে। অলঙ্কারের ভারে ভাষা তার গতি হারাইত, ভাব মারা পড়িত। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ভাষা ও ভাবকে আনয়ন করে মুক্ত বাতাসে, সহজের সাধনায়। শরৎচন্দ্র গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন মানব-জীবনের সহজ প্রকাশে। কথা-শিল্প তাঁহার হাতে অপরাজেয় হইয়াছে। মানব-হৃদয় তাঁহার লীলা অংশ। সে আত্মপ্রকাশ করে বিচিত্র অবস্থাপরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া। শরৎচন্দ্রের ভিতর "Beating about the bush" মোটেই নাই। তাঁহার চরিত্রগুলি পরস্পর মোলা-কাতের সময় অবহেলা করে না কাহাকেও। আড়ষ্ট হইয়া পড়ে না Silence break করিতে। ভূমড়ে পড়ে না ভাবের আতিশয্যে। এদের সহজ পরিচয়, সহজ "আচ্ছালা-

মো—আলায়েকুম্‌"। মানুষের সনাতন "Springs of action" তাহার সৃষ্টির উৎসমুখ। তথাপি যুগের আলোকে তাঁহার চরিত্র উজ্জ্বল। এতো জীবনের চিত্র নয়, জীবন itself. ইহাতে নাই নগ্নতার বীভৎসতা, নাই অতিরিক্ত আবরণের বাড়াবাড়ি। চরিত্রগুলি 'দিগম্বর' হইয়া পীড়া দেয় না দৃষ্টিকে, আবার জুয়েলারীর দোকান সাজাইয়া ঢাকিয়া রাখে না ব্যক্তিত্বকে। 'Art for the sake of art' কথাটির কি কি অর্থ হয় জানিনা। আমার কাছে এর মাত্র একটি অর্থ। 'আর্ট' যদি তাইকে বলি যে সত্য সুন্দরকে প্রকাশ করে, তার রাতুল চরণের আভাস দেয় ও তাকে অমর করে, তাহা হইলে Art-এর কোনো 'উদ্দেশ্য' আছে, না, সে 'for her own sake,' এ প্রশ্ন মোটেই আবশ্যক নহে। "To be true to her own self," শিল্প অসুন্দর অসত্য বা অ-শিব হইতে পারে না। প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছি আত্মপ্রকাশই শিল্পীর মূলসূত্র। এই আত্মপ্রকাশ বহির্জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শে মহিমান্বিত, আর অন্তর্জগতের গভীরতায় পুণ্যপূতঃ। শিল্পী চলে যায়, তাঁর সৃষ্টিকে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য রেখে! নূতন প্রভাতে বিশ্ব-মানবকে দেয় সে অব্যয় সন্দেশ!

"Cold Pastoral!
When old age shall this generation waste,
Thou shalt remain, in midst of other woe.
Than ours, a friend to man, to whom thou say'st,
"Beauty is truth, truth beauty,—"that is all,
Ye know on earth, and all ye need to know.

শরৎচন্দ্রের যে-কোন গ্রন্থ হইতে প্রতিপন্ন হইবে তাঁর অনন্যসুলভ চরিত্রসৃষ্টি-কৌশল। এতে আছে 'প্রকাশ,' এতে আছে 'ইঙ্গিত,' এতে আছে অনন্তকালের চরণ রেখা। চারি যুগের রিপুগণ সকলেই এ আসরে উপস্থিত, কিন্তু প্রত্যেকেই সংযত ও ভদ্র।

"পল্লী-সমাজ" তিনি নিপুণ তুলিকায় এঁকেছেন। কোথাও রং অতিরিক্ত পড়েনি। মহীয়সী বিশ্বেশ্বরীর আশীর্ব্বাদ স্নিগ্ধ করে আমাদিগকে। তাঁর বাণীতে আমরা পাই মহাসত্যের সন্ধান! "না, না, তারও জেল খাটবার প্রয়োজন ছিল। তা'ছাড়া ত জানিনি মা, বাইরে থেকে ছুটে এসে ভাল কর্‌তে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত—সেকাজ এমন কঠিন! আগে যে মিল্‌তে হয়, সকলের সঙ্গে ভালতে-মন্দতে এক না হ'তে পার্‌লে যে কিছুতেই ভাল করা যায় না—সে কথা ত মনে ভাবিনি। প্রথম থেকেই সে তার শিক্ষা, সংস্কার, মস্ত জোর, মস্ত প্রাণ নিয়ে এতই উঁচুতে এসে দাঁড়াল যে শেষ পর্য্যন্ত কেউ তার নাগালই পেলে না।

* * "না রমা, অনুতাপ আমি সেজন্য করিনে। কিন্তু তুইও শুনে রাগ করিস্‌নে মা,—এইবার তাকে তোরা নাবিয়ে এনে সকলের সঙ্গে যে মিলিয়ে দিলি, তাতে তোদের অধর্ম্ম যতই বড় হোক্, সে কিন্তু ফিরে এসে এবার যে ঠিক সত্যটির দেখা পাবে, একথা আমি বড় গলা করেই ব'লে যাচ্ছি। * *

"সে ফিরে এলে তোরা স্পষ্ট দেখতে পাবি যে, যে হাত দিয়ে দান ক'রে বেড়াতো, ভৈরব তার সেই ডান হাতটাই মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েচে। হয় ত ভালই হয়েচে। তার বলিষ্ঠ সমগ্র হাতের অপর্য্যাপ্ত দান গ্রহণ করবার শক্তি যখন গ্রামের লোকের ছিল না, তখন এই ভাঙা হাতটাই বোধকরি এবার তাদের সত্যকার কাজে লাগ্‌বে।"

কী সহজ সত্যের অভিব্যক্তি! কী সহজ প্রকাশ! কী অন্তর্দৃষ্টি!

শরৎচন্দ্র নরনারীর মনোবিজ্ঞানের রহস্যময় পাথারে ডুব দিয়া মুক্তা আহরণ করিয়াছেন। তাঁহার "বড় দিদি"র "Pathos" অপূর্ব্ব মধুর ও "embalmed in tears." সৃষ্টিছাড়া সুরেন্দ্র মাধবীর পিতার বাড়ীতে তার ছোট বোন প্রমিলার 'গৃহশিক্ষক' নিযুক্ত হইল। মাধবী বালবিধবা, সকলেরই 'বড়দিদি,' সুরেন্দ্রও অন্তঃপুরের ব্যক্তিবিশেষকে 'বড়দিদি' বলিয়া জানিল। ঘটনাক্রমে সুরেন্দ্রকে মাধবীদের আশ্রয় ছাড়িতে হইল। সুরেন্দ্র গাড়ী চাপা পড়িল। সে যে বড়লোকের ছেলে, একজন এম, এ, সমস্তই প্রকাশ পাইল। কত বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়া গেল। সুরেন্দ্র জমিদার, মো-সাহেবের দলে পরিবেষ্টিত, জমিদারীর কার্য্যে উদাসীন। এদিকে মাধবীর দাদার আশ্রয়ে থাকা দায় হইল। স্বামীর পৈত্রিক ভিটা গোলাগাঁয় যাওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলেন। গোলাগাঁয় পৌছিলে অপর শরীকে চক্রান্ত করিয়া মায়-

বাস্তুভিটা সমস্ত ভূসম্পত্তি মালেক কর্ত্তৃক নিলাম করাইল। মাধবী গোলাগাঁ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। গোলাগাঁ সুরেন্দ্রনাথের জমীদারীর অধীন। একদিন সহসা তাঁহার নজরে পড়িল গোলাগাঁয়ের মাধবীদেবীর ঘরবাড়ী নিলামে খরিদ করে নিয়েচে। এই 'মাধবী' কে, তাহার জানা ছিল না। কিন্তু তাহার 'বড়দিদি'র নামের সম্মানের জন্য ঐ সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে মনস্থ করিয়া নায়েবকে ডাকিলেন।…জানিলেন সত্যই তাহার 'বড়দিদি'! নতমুখে সুরেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া পড়িলেন। মথুরানাথ ভাব-গতিক দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল?" সুরেন্দ্র সে কথার উত্তর না দিয়া, একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "একটা ভাল ঘোড়ায় শীঘ্র জিন কষিতে বল—আমি এখনি গোলাগাঁয় যাব। এখান থেকে গোলাগাঁ কতদূর জান?"

"প্রায় দশ ক্রোশ।"

চাবুক খাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। গোলাগাঁ পৌছিতে আর দুই ক্রোশ আছে। অশ্বের খুর পর্য্যন্ত ফেনায় ভরিয়া গিয়াছে। প্রাণপণে ধূলা উড়াইয়া, আল ডিঙাইয়া, খানা টপকাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া চলিয়াছে। মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য।

ঘোড়ার উপর থাকিয়াই সুরেন্দ্রের গা বমি বমি করিয়া উঠিল; ভিতরে প্রত্যেক নারী যেন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবে। তাহার পর টপ করিয়া ফোঁটা দুই তিন রক্ত কষ বাহিয়া ধূলিধূসরিত পিরাণের উপর পড়িল।

গোলাগাঁয়ে পৌছিলেন।

"রামতনু সন্ন্যালের বাড়ী কোথায়?"

"ঐদিকে—

আবার ঘোড়া ছুটিল।

"বাড়ীতে কে আছেন?" "কেউ না।"

"কোথায় গেলেন?"

"ভোরেই নৌকা ক'রে চলে গেচেন।"

"কোথায়—কোন্ পথে?" "দক্ষিণ দিকে"—

"নদীর ধারে ধারে পথ আছে? ঘোড়া দৌড়িতে পারবে?" "বোধহয় নেই!"

পুনর্ব্বার ঘোড়া ছুটিয়া চলিল। ক্রোশ দুই আসিয়া আর পথ নাই। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজে চলিলেন। ওষ্ঠ বাহিয়া তখনও রক্ত পড়িতেছে। পায়ে আর জুতা নাই—সর্ব্বাঙ্গে কাদা, মাঝে মাঝে শোণিতের দাগ!

বেলা পড়িয়া আসিল। পা আর চলে না। এ দেহে যতটুকু শক্তি আছে, সমস্ত অকাতরে ব্যয় করিয়া শেষে শয্যা আশ্রয় করিবে, আর উঠিবে না।

একখানা নৌকা না? সুরেন্দ্র ডাকিল, "বড়দিদি।" শুষ্ককণ্ঠে শব্দ বাহির হইল না—শুধু দুই ফোঁটা রক্ত! "বড়দিদি"—আবার দুই ফোঁটা রক্ত। সুরেন্দ্র কাছে আসিয়া পড়িল। আবার ডাকিল "বড়দিদি।"

পুরাতন পরিচিত স্বরে কে ডাকে না! মাধবী উঠিয়া বসিল।

সকলে মিলিয়া সুরেন্দ্রনাথকে ধরাধরি করিয়া নৌকায় তুলিয়া আনিল। একজন মাঝি চিনিত, সে কহিল, "লাল্‌তা-গাঁয়ের জমিদার!"

মাধবী ইষ্টকবচ শুদ্ধ স্বর্ণহার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "লাল্‌তা-গাঁয়ে এই রাত্রে পৌছিতে পার? সবাইকে এক একটা হার দেব।"

সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান হইল। চক্ষু মেলিয়া সে মাধবীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই, শুধু কপালের কিয়দংশ অঞ্চলে ঢাকা। ক্রোড়ের উপর সুরেন্দ্রের মাথা।

"তুমি বড়দিদি?"

অঞ্চল দিয়া মাধবী সযত্নে তাহার ওষ্ঠ-সংলগ্ন রক্তবিন্দু মুছাইয়া দিল, তাহার পর আপনার চোখ মুছিল।

"তুমি বড়দিদি?" "আমি মাধবী।"

"আঃ, তাই।" বিশ্বের আরাম যেন এই ক্রোড়ে লুকাইয়াছিল। এতদিন পরে সুরেন্দ্র তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছে। নিজের অট্টালিকায়, তাহার শয়ন কক্ষে, বড়দিদির কোলে মাথা রাখিয়া সুরেন্দ্র মৃত্যু শয্যায়। পা দুটি শান্তি কোলে করিয়া অশ্রুজলে ধুইয়া দিতেছে।

মাধবীর অন্তরের কথা খুলিয়া বলিতে পারিব না। আমি নিজেও ভাল জানি না, বোধ করি, তাহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়িতেছে। বাড়ী হইতে সে তাড়াইয়া দিয়াছিল,

আর ফিরাইতে পারে নাই ; পাঁচ বৎসরের পরে সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাকে ফিরাইতে আসিয়াছে। সন্ধ্যার পর উজ্জ্বল দীপালোকে সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর মুখপানে চাহিল। পায়ের কাছে শান্তি বসিয়া আছে, সে যেন শুনিতে না পায়, হাত দিয়া তাই মাধবীর মুখ আপনার মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "বড়দিদি, সেদিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে ছিলে? আমি তাই এখন শোধ নিয়েচি, তোমাকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলাম ; কেমন, শোধ হ'ল ত?" মুহূর্ত্তের মধ্যে মাধবী চৈতন্য হারাইয়া লুণ্ঠিত মস্তক সুরেন্দ্রের স্কন্ধের পার্শ্বে রাখিল,—যখন জ্ঞান হইল বাটীময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে।" কিসের Revelation! কিসের ইঙ্গিত! কিসের সৃষ্টি! কোন্ কথা-শিল্পী—শরৎচন্দ্রের মতো এমন অনবদ্য ও অপূর্ব্বভাবে মনস্তত্ত্বের রহস্য দ্বার খুলিয়া দিতে পারে?

ঘরে বাইরে, দেশে বিদেশে, সহরে গ্রামে, জলপথে স্থলপথে, কর্ম্মজীবনের বিচিত্রতার মধ্যে, বিভিন্ন অবস্থায় আমরা একে অন্যের সংস্পর্শে আসিতেছি। সাহিত্য গড়িয়া উঠে—আমাদের জীবনের এই রূপ রস লইয়া। কত তথা-কথিত-শিল্পীকে দেখিতে পাই, দুইটি নরনারীর মোকাবিলা করাইতে অসমর্থ। কিন্তু—"দত্তা"র শিল্পী নরেন ও বিজয়ার যে সহজ মোকাবিলা করাইয়াছেন, তাহার সংযম গভীরতা, সারল্য ও প্রাণময়তা অনন্যসাধারণ। স্বর্গীয় দেবকুমারের মতো নরেন আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত। রাস বিহারী বা বিলাসবিহারীর মুখ দিয়ে যত কথা বাহির হইয়াছে তাহার শতাংশও নরেন বলে নাই ; তবু সেই কয়টি কথাই তাহার অপূর্ব্ব পরিচয়-লিপি।

শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" একখানি Masterpiece। ভিন্ন প্রকৃতির বহু পুরুষ ও নারীকে শিল্পী তাঁহার চিত্রশালায় উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু সৌষ্ঠব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহাতে মানব হৃদয়ের স্বতঃস্ফুরিত প্রেম উচ্ছ্বাস ও সংযমে মিলিয়া আছে। এখানে তাঁহার সিদ্ধহস্তের পরিচয় পাই। ভাষাও ভাবের একটা বাঞ্ছিত 'পর্দ্দা' জ্ঞান আছে। সৃষ্টি কোথাও 'grotesque' হয় নাই। সর্ব্বত্রই "Exquisite Felicity of Expression"। যাঁহারা বাস্তবতার দোহাই দিয়া নগ্নছবি পটের উপর দাঁড় করাইতে চান, তাঁহাদের এই শিল্পী-সম্রাটের কাছে শিখিবার আছে কোথায় 'পর্দ্দা' টেনে দিতে হয়, আর কোথায়ই বা যবনিকা উত্তোলন করিতে হয়। কাপড়খানা একটু সরে গেলে সে হয় নগ্ন ও বীভৎস ; একটু এগিয়ে আসলে সে হয় ধ্যানের সামগ্রী—ত্রিলোকের মানসী! তাই বলিয়া কোথায় আড়াল দিতে হয়—আর কোথায় আড়াল দূর করিতে হয়, কোথায় 'Ludicrous' শেষ হয়, আর 'Sublime' আরম্ভ হয়, সে তত্ত্বের সন্ধান জানিতে হইলে বিশ্বকর্ম্মার শিক্ষানবিশী করিতে হয়।

শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" একটি বিরাট 'জ্যান্ত' মানুষের 'Autobiography'। ইহার মধ্যে আছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, খেয়ালী জীবনের মধ্য দিয়া সত্যসুন্দরের সহজ প্রকাশ, সেই সঙ্গে এডভেন্চার ও রোমান্স। বর্ত্তমান কথা সাহিত্যের আসরে সহসা রোমান্সের সাক্ষাৎ পাইলে দূরাগত বংশী-ধ্বনির মতো যেন একটা আনন্দ ভেসে আসে। তবে কথা এই 'শ্রীকান্তে'র রোমান্স "Arthurian Legends" নহে, এ আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষের রোমান্স ও এডভেন্চার। এর 'wide charity' আমাদিগকে মুগ্ধ করে। "মড়ার কি জাত আছে রে?" কত সহজে এই একটি কথায় মহাসত্য প্রকাশ কর'বে।

"শেষ প্রশ্ন" চিন্তা-রাজ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত করেছে। আমরা ইহার কোন কথাকে ঠেলে ফেলিতে পারিনে। শুনে মনে হয়, "এই-ই ত ঠিক।" আবার দেখি, সে সব আমাদের সনাতন সংস্কারের উল্টো। সত্যই আমরা সংস্কারের কারাগৃহে বাস করছি। বহুকাল বাস হেতু অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মনে হয় না এটা কারাগার। আমাদের মনস্তত্ত্বের রূপ বদ্‌লে গেছে। কায়া ও ছায়া, সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ ভুলে গেছি। 'কমলে'র প্রতি কথা আবহমান কালের 'মাপ কাঠি'কে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে চায়। মুখে যাই বলি, অন্তরের মধ্যে জোরের অভাব অনুভব করি তার কথা উড়িয়ে দিতে। "শেষ প্রশ্নে" কত বিদ্বান, কত পণ্ডিত, কত দার্শনিক, আহূত হইয়াছেন, কিন্তু 'কমলে'র সূক্ষ্মদৃষ্টি সকলকে বিঁধে দেয়। এর জন্মের বিবরণ এর নিজের মুখে শুনে স্তম্ভিত হই। আমাদের গোপন ঘরের সন্ধান, শত দুর্ব্বলতা, সব এই মেয়েটি ধ'রে ফেলেছে ; শুধু ধ'রে ফেলেছে তাই নয়,—প্রকাশ্য আদালতে সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। সুনীতির মুখোস প'রে ছিলাম, দিলে তা ভেঙে। এ যে-মানুষের অন্তর মহাসমুদ্রের তল দেশে কি আছে তার সন্ধান জানে। 'কমল' শরৎচন্দ্রের 'ভয়ানক' সৃষ্টি। সমস্ত সমাজ-শরীর কেঁপে উঠেছে এই স্পষ্টবাদিতায়। তবু 'কমল' একজনের কাছে পরাজিত হয়েছে। সে সত্যাশ্রয়ী, কর্ম্মী, ত্যাগী। সে সুন্দর!

কথা-শিল্পী-শাহান শাহ্! একী Revelation! তোমার "শেষ প্রশ্নের" শেষ কোথায়?

এ, হাকিম

প্রেম নয়

শ্রীপ্রতাপ সেন

মাধবী নিশীথ মর্ম্মরি উঠে, বাতাস হয়েছে লঘু,
স্তব্ধ আকাশে চলেছে তারার লীলা,
আমার মনের মুকুরে পড়েছে চন্দ্রলোকের ছায়া,
জাগিয়া উঠিছে পৃথিবীর বুকে শিলা।

ভাঙন ধরেছে দেহে ও মানসে, ক্ষীণ হয় অনুভূতি,
চেতনাও যেন সুপ্তিতে নিমগন ;
এমন সময়ে কবিতায় নামে মৃদু -মন্থর গতি,
গানে নামিতেছে অবসাদ অনুখন।

আধো-আলো আধো ছায়া নেমে আসে, চাঁদও পড়িছে ঢলে'
বিরহীর চোখে ঘুম নাই, ঘুম নাই ;
প্রেম-অপঘাতে শীতল দু'চোখ চাঁদের পাহাড় সম,
ভুলিয়াছে তা'রা আপন সত্তা তাই।

মন বলে আজ,—"মিথ্যা জগৎ, মিথ্যা প্রেমের গাথা,
মায়ালোক এই, হেথা সবই অভিনয় ,
দেহে বিঁধিতেছে ক্ষুধা-অঙ্কুশ, মনে কামনার জ্বালা,—
প্রেম যারে বল, প্রেম নয়,—প্রেম নয় !"

পট ও মঞ্চ

আনন্দ

পীঠ প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার রঙ্গালয় নিয়ে চিন্তা একটা বিলাসে পরিণত হয়েছে। বিলাস মানে যার জন্য চিন্তা করা (অবসরক্ষণ অলস কল্পনায় রাঙিয়ে তোলা নয়) সে তোমার আমার ভাব ভাবনাকে অল্পই আমল দিয়ে থাকে। কিন্তু মঞ্চ-সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা কি নিজেদের কথা ভেবে দেখেন না? অবশ্যই তাঁরা ভাবনা ক'রে থাকেন কারণ সেখানে তাঁদের স্বার্থ আছে। এঁরা ভেবেছেন ব'লেই মঞ্চের রূপ আজ অন্যবিধ হ'তে চলেছে।

মঞ্চে আজ অভিনয়ের ধারা বদলে গেছে, নাটকের রূপান্তর ঘটেছে, কিন্তু তবু বলা শক্ত পরিচালনা ও নাট্যাভিনয়ের কোন পন্থা বাংলার রঙ্গালয় আজ অনুসরণ করছে। প্রাক্তন পরিচালন-নীতি পরিত্যক্ত হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের সুরেন্দ্রনাথের, অমৃত মিত্রের, অমর দত্তের, রসরাজের প্রাণ-তুল্য রঙ্গালয়ে কোথাও বসেছে যাত্রার আসর, কোথাও চলছে সস্তা Sentiment জাগিয়ে-তোলা Sob stuff এর খেলা— আসলে আজ যাট বছর পরে বাংলার রঙ্গালয় Experimental stage-এর মধ্য দিয়ে চলছে। আজ বাংলায় এমন কোনো অভিনেতা নেই যিনি রঙ্গাবতরণ করবেন শুনলেই প্রেক্ষাগার পূর্ণ হয়ে ওঠে। নাট্যাভিনয়ের অর্থকরতা সম্পূর্ণ নির্ভর করেছে নাটকের উৎকর্ষাপকর্ষের পরে। ভূমিকার গুণে, অভিনয় দেখাবার সুযোগের পরিমাপে নটের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। এবার দেখা যাক Fxperimental stageটা কি রকম।

মোহিনী Marlene Dietrich সেদিন Devil is a Womanএ তার শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছে কেন জানেন? কারণ 'she is never better than when she plays one who is really bad.'

অতি বিলম্বে রঙ্গালয় দেখলে কেবল Class নিয়ে থিয়েটার চলে না, Class-এর—পয়সা দিয়ে আবার থিয়েটার দেখবো কি—মনোবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠলো; সস্তা তামাসা সবাক ছবি এল, এসে, Massএর মধ্যে যারাও বা পীঠের patron ছিল তাদের ভুলিয়ে নিয়ে গেল। অতএব সহজ লজিক ও ইকনমিক্স অনুযায়ী ঠিক হোল সবাক ছবির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে রঙ্গালয়কে সস্তা ক'রে ফেলতে হবে, এবং সত্যি রঙ্গালয় সস্তা হয়ে গেল—

এত সস্তা ও ব্যবসাদারি যে ছোট ছেলেরা ও প্যাঁচপ্রিয় সাধারণ লোক সেখানে যেতে ভালবাসবে কিন্তু রসিক জন দূরে সরে থাকবে চিরন্তরে। কিন্তু প্রধান জিনিষ পয়সা মিলছে ত, রসিক জন ত' আর পয়সা দেবে না। সহজ সিদ্ধান্ত খেটে গেল এবং ফলে রঙ্গালয়ে, জাতি গঠনের অপরিহার্য্য অঙ্গ রঙ্গালয়ে, বসলো সস্তা তামাসার আসর। ভাল জিনিষ কেনবার ক্ষমতা যে Elastic অর্থনীতির এই নীতি অনুসৃত হোল না। Fascination-এর যুগ কেটে গেছে, সত্যি; Criticism ও Discretion এর যুগ এটা, এও স্বীকার করছি; 'গৃহ প্রবেশ' শ্রেণীর জিনিষ

Lilian Harvey প্রথম Congress Dances-এ অসামান্য নাম করে। তারপর শ্রীমতী আমেরিকায় একাধিক সাধারণ ছবি তুলে সুনাম হারায়। সম্প্রতি কলম্বিয়ার Let's live to-night ছবিতে Harvey পূর্ব্বযশ আংশিক উদ্ধার করেছে।

পূর্ব্বে চলেনি আজ হয়ত' নাও চলতে পারে, এ কথা মেনে নিচ্ছি, কিন্তু একথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে এককালে উক্তরূপ নাটকই চলবে—হ্যাঁ 'গৃহপ্রবেশ' যথাকালের বহুপূর্ব্বেই হয়েছিল। Intelligentiaর Patronage ছাড়া কারুকলার

Loretta Young এ বছর প্রত্যেকটী ছবিতে সু-অভিনয় ক'রে আমাদের মুগ্ধ করেছে। এখানে শ্রীমতীকে Call of the Wild-এর নায়িকারূপে আমরা দেখছি।

চর্চ্চায় উদরপূর্ত্তি হয় না, কিন্তু সেই Intelligentia কি পাদপ্রদীপের সামনে যাত্রাভিনয় দর্শকের থেকে আসবে; না, Sob stuffএ অশ্রুকলঙ্কিতগণ্ড শ্রোতার থেকে আসবে? যখন চীৎকার ওঠে—জাতি গঠনের, জাতীয় জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ রঙ্গালয়কে বাঁচাও—তখন অতি দুঃখের মাঝেও আমার হাসি পায়। বর্ত্তমান রঙ্গালয় জাতীয় জীবনের প্রতীক নয়, হতে পারেনি।

কিন্তু সে দোষ কার? প্রধানতঃ রঙ্গালয়ের হলেও তার একলার নয়, সহানুভূতিহীন আমাদেরও। হালফিল রঙ্গালয়ে নাম করবার মত এক আধখানা বই ভিন্ন নাটক অভিনীত হয়নি। আমাদের রঙ্গালয় অত্যন্ত গতানুগতিক। হাঁড়ি হেঁসেল আর Sob stuffএ একবার পয়সা আসছে যেই দেখা গেল অমনি চললো পর পর তারই অভিনয়। কিন্তু এসব নিতান্ত সাধারণ জিনিষের—গল্পকথার নূতনত্ব ও আকর্ষণ ক্ষণস্থায়ী। কারুণ্যের পোষাকে ওসব জিনিষ অত্যন্ত পুরাণো হয়ে গেছে বলে বিচক্ষণ নাট্যকার হাস্যরসের সাহায্যে গল্পকথার অভিনয় জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করছেন। এভাবে হয়ত' আপেক্ষিক অধিক কাল চলবে, কারণ হাসির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নেই এবং তা সহজে পুরাণো হয়ে যায় না। কিন্তু এটা হোল রুদ্ধদ্বার গৃহে বসে ঝড়কে অস্বীকার করা—পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া, পরাভূত করা নয়। তবে ক পন্থাঃ?

এদেশে দেখা যাচ্ছে পটের কাছে মঞ্চ সম্পূর্ণ পরাভূত হয়েছে। পাদপ্রদীপের শিল্পীর চোখ আর্ক ল্যাম্পের আলোয় ঝলসে গেছে—পীঠের হাটে পট এসে ইচ্ছা মত শিল্পী কিনে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দোকানে নূতন মাল আমদানি না করলে দোকান দেওয়া কতদিন চলবে? সেলুলয়েডের তামাসাকে আমি খেলো মনে করি। চিত্রশিল্প আর নয়, চিত্রব্যবসায়। Commercialization সূক্ষ্ম কলাসৃষ্টির প্রচণ্ড অন্তরায়—একথা আমেরিকার শিল্পীরা অন্তরের সঙ্গে মেনে নিয়েছে। ছবির কাজে অনেক বেশি অর্থ মেলে এবং অতি লাভের লোভ যে-সব কলাকমলার পূজারী ত্যাগ করতে পেরেছে তারা ফিরে এসে পাদপ্রদীপের আলোয় অভিনয় করছে। ওদেশে ষ্টেজ টকির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে—ট্রেণ, জাহাজ, বাস, বড় রাস্তার মোড় ষ্টেজও দেখায়; ষ্টেজ শুধু টকির সঙ্গে যুদ্ধ করেনি, তাকে জয়ও করেছে অনেক স্থলে। কন্টিনেণ্টে অবশ্য টাকার থাঁই যাদের মেটেনি (এবং প্রায় সব নামজাদা নটনটীরই মেটেনি) তারা ছবির আকর্ষণ প্রতিরোধ করতে পারেনি। আমেরিকার ছায়ারাজ্যের নূতন আমদানি আজ প্রধানতঃ কন্টিনেণ্টের ষ্টেজ থেকে—আমেরিকার ষ্টেজ থেকে নয়। কিন্তু থাক এখন এ কথা।

আমাদের মঞ্চকে জাতীয় জীবনের প্রতীক ক'রে তুলতে হলে অনেক কিছুরই দরকার, কিন্তু প্রধানতঃ যা প্রয়োজন তা হচ্ছে নাটক ও তার finished production। আমরা যে ষ্টেজের প্রতি সহানুভূতিহীন হয়েছি তার কারণ আর্থিক দুর্দ্দিনে প্রমোদার্থ ব্যয় সম্বন্ধে আমাদের discretion বেশ টনটনে হয়ে উঠেছে। আর তা ছাড়া এ যুগে ষ্টেজ প্রেস

বা পাব্লিক কারুর সঙ্গেই সৌহার্দ্য স্থাপনে তেমন আগ্রহ না দেখিয়ে আজ এমন জায়গায় এসে পৌচেছে যে সংবাদপত্র ও সাধারণের সহানুভূতি ও প্রীতি ব্যতীত তার বাঁচবার উপায় নেই। থিয়েটারগুলি পাবলিশিটি অর্থে বোঝে কেবল সংবাদপত্রে ও প্রাচীরে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা। আমরা কদাচ তার খবর পাই না, তার খবর নেবারও আমাদের আগ্রহ হয় না। রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ভাবতে থাকুন, বিচক্ষণ পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জেনে নিন—কি করে তাঁরা নাটক নির্ব্বাচনে সফলকাম হতে পারেন এবং কি ভাবে চললে রঙ্গালয় লাভজনক চারুকলাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। আর আমরা রঙ্গপ্রিয়রা এবার শারদীয়ার চরণে প্রার্থনা জানাই তিনি পথ কোন্ দিকে ব'লে দিন।

তখন ও এখন—সাধারণ পর্য্যালোচনা

এককালে এ দেশের চিত্রব্যবসায়ে একচ্ছত্র প্রভুত্ব ছিল ম্যাডান থিয়েটার্সের। সারা ভারতে ম্যাডানের শতাধিক ছবিঘর ছিল, কলকাতায় ম্যাডানের প্রভুত্ব ছিল অসীম—তিন চারটী বাদ সব ছবিঘরই ছিল তাদের, সমস্ত নামকরা আমেরিকান ছবি ছিল তাদের হাতের মধ্যে। দেশী ছবির বাজারে রাজত্ব ছিল ম্যাডান থিয়েটার্সের—নাম করা সমস্ত শিল্পী তাদের দলভুক্ত ছিল, চিত্র নির্ম্মাণ ব্যাপারে তারা ছিল অগ্রগণ্য, লোকের দেশী ছবি দেখার মোহ বা নেশার তারা সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ শিক্ষানবিশির যুগে তারা ছবি তুলে ও সেগুলি নিজেদের ছবিঘরে দেখিয়ে তারা প্রচুর অর্থ লাভ করেছিল।

সে যুগে সমালোচকদের স্বাধীনতা ছিল, কারণ ছবিকারদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি; আর কারণ ছবিকাররা সমালোচনাকে বড় একটা গ্রাহ্য করতো না। অথচ তখন পাবলিশিটির কাজ অর্দ্ধেকের বেশি সমালোচনাতেই সম্পন্ন হোত এবং বাকীটুকু করতো দর্শকরা।

সে যুগে দর্শকরা একাধিকবার একই বাংলা ছবি দেখাটাকে বাহাদুরির বিষয় ব'লে মনে করতো এবং দেশী ছবি লোকে দেখতে যেতো প্রধানতঃ খানিকটা রোমান্টিক গল্প গেলবার জন্য এবং তাই নিয়ে বন্ধুমহলে গল্প ও গর্ব্ব করবার জন্য। দর্শকের অসুবিধার অন্ত ছিল না, অল্প মূল্যের টিকিট কেনার থেকে যুদ্ধ জয় করা অনেক সহজ ছিল, আসনের ও পাখার ব্যবস্থা ছিল জঘন্য এবং দর্শকদের প্রতি দুর্ব্যবহারেরও অন্ত ছিল না; গুণ্ডাদের অত্যাচার সে যুগে অল্পবিস্তর ছিল। তখন ছবি তোলা ছিল সোজা। অভিনয় ব'লতে তখন বিদেশী নটের অনুকরণে ষ্টাইলের মাথায় খানিকটা ঘাড় ঘুরিয়ে, বুক ফুলিয়ে হাত পা নেড়ে চলতে পারলেই ভাল হোত, ক্লোজ-আপে স্মরণীয় রকম পোজ দিতে পারলে হাততালি পাওয়া যেতো এবং প্রয়োজনায় যে যত জাঁক-জমক ও চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখাতে পারতো বা চোখের জল টেনে বার করতে পারতো অর্থাৎ mass appealএর সাহায্যে যে যত অর্থ আমদানি করতে পারতো সে ছিল

Clark Gable তার বিশ্বজিৎ হাসি হাসছে। এটা call of the wild-এর ছবি। Gable-এর আগামী ছবি China Seas.

তত বড় প্রযোজক। চিত্র নির্ম্মাণ তখন বাঙালীর কাছে বিশেষ ব্যবসাগত ছিল না। অতীতে বিদেশী ছবি সরবরাহকদের স্থানীয় আফিস না থাকলেও এবং ম্যাডান থিয়েটার্সের কথামত তাদের চলতে হলেও তাদের আর্থিক দাবী ছিল অত্যধিক ও অসঙ্গত।

কলম্বিয়ার নবীনা নটী Florence Riceকে দেখতেই মিষ্টি এবং শ্রীমতীর অভিনয়ও ভাল।

আজ আর চিত্রশিল্পে অবাঙালী প্রধান নয়। বাঙালী প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্স সারা ভারতে চিত্রনির্ম্মাণ বিষয়ে অগ্রগণ্য। কালী ফিল্মস প্রভৃতি আরও একাধিক বাঙালী প্রতিষ্ঠান ছবি তোলার ব্যবসায়ে ক্রমশঃ উন্নতি করছে। অ-বাঙালী চিত্র-প্রতিষ্ঠানগুলি বহু অর্থব্যয়ে বাঙালীর সাহায্যে ছবি তুললেও কলাকৌলীন্যে তাদের ছবি বাঙালীর ছবির কাছে দাঁড়াতে পারে না। অধিকাংশ ছবিঘরই আজ বাঙালীর অধীন কিন্তু বিদেশী ছবি সরবরাহকদের স্থানীয় আফিস হওয়াতে বিদেশী ছবির ব্যাপারে ছবিঘরের মালিকদের বিশেষ কোনো প্রভুত্ব নেই। চিত্রনির্ম্মাণ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঝে প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ায় ছবির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাঙালীর ছবি ভারতের সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হচ্ছে ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করছে। এ যুগে সমালোচকদের স্বাধীনতা নেই কারণ অতি লাভ-লোভাতুর পত্রিকা-সম্পাদকের ফরমায়েস মত, বিজ্ঞাপনের দৈর্ঘ্যের পরিমাপে সমালোচনা লিখতে হয়। চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও অভিনেতৃসংক্রান্ত নানা কারণবশতঃ সমালোচনায় সাধুতা নেই। ছবিঘরের কর্ত্তা বিজ্ঞাপনক্রীত সাপ্তাহিকে নিজেদের ছবির প্রশংসা ত' ছাপাবেনই, ভাইপো ম্যাট্রিক পাশ করলে তাও ছাপার অক্ষরে পত্রিকায় দেখতে চান। পাঠকদের রঙ্গ-জগতের সংবাদ জোগাবার জন্য এখনও সাংবাদিকদের ছুটাছুটি করতে হয়। প্রত্যেক ষ্টুডিয়োর চার পাঁচ জন প্রচারক আছেন, কিন্তু আফিসে তাঁরা কখন আসেন তা জানা যায় না। সংবাদ সরবরাহের অনুরোধ জানালে আনন্দে সম্মতি দেন কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। এখন ছবির দর্শকসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে—বিশেষতঃ দেশী ছবির। কিন্তু দর্শকরা আজ ছবির গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করে, বাজে ছবিকে তার প্রাপ্য অনাদর দেখাতে ভোলে না—তা পত্রিকাগুলি যতই ঢাক বাজাক না কেন। এখন ছবির সব বিভাগের কাজের পরে দর্শকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; সুতরাং লোকে আর এখন ছবি দেখে মোহিত হয় না। এখন আসনের সুব্যবস্থা হয়েছে, পাখারও কতকটা, কিন্তু অগ্রিম টিকিট ক্রয়ের ব্যবস্থা থাকলেও আজও কম দামের টিকিট কিনতে গিয়ে গা হাত পা ছ'ড়ে যায়, জামা কাপড় ছিঁড়ে যায় এবং গুণ্ডার অত্যাচার বাঙালীর ছবিঘরে নিয়মিত। দর্শকদের নিরীহত্ব কিন্তু ঘোচেনি। সরকার নূতন প্রমোদকর বসালে প্রদর্শক সঙ্ঘ দর্শকদের প্রতি দরদ দেখিয়ে খুব প্রতিবাদ করলে (বলা বাহুল্য, এসবে সরকারের কিছু এসে যায় না) কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঐ চালাকি ক'রে ট্যাক্সের বোঝা দর্শকদের ঘাড়ে চাপালে—টিকিটের দাম কমিয়ে ট্যাক্সের বেড়াজালের বাইরে গেল না বা নিজেদের লভ্যাংশ থেকে কাণা কড়িও কম করতে রাজি হোল না।

Halen Hayens ও Robert Montgomeryকে এখানে আমরা Vanessa : Her love storyতে দেখতে পাচ্ছি। Helen-এর এই শেষ ছবি বলে মনে হচ্ছে কারণ শ্রীমতী Hayes এখন Broadwayতে অভিনয় করা স্থির করেছে।

এ কালে ছবি তোলা শক্ত। মুদির দোকান খোলার মত মূলধন নিয়ে সবাক ছবি তোলা হয় না, কিন্তু তবু ব্যাঙের ছাতার মত অনেক কোম্পানী প্রত্যহ গজিয়ে উঠছে, কারণ খেয়াল, খুসী ও ফ্যূর্ত্তির সখ অনেকের মেটেনি; আর কারণ অনেক স্বপ্নবিলাসী বা ফন্দীবাজ লোক পাঁচ জনের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ফলাফল দেখতে চায়। অভিনয়ের ধারা বদলালেও অভিনয় একান্ত কৃত্রিম এবং Mass appealময় কারু-কলাবিহীন, অর্থপ্রসূ ছবির প্রযোজক ষ্টুডিয়োর মালিকের কাছে আদরণীয়। ছায়াশিল্প আজ ছবির কারবারে পরিণত হয়েছে—চিত্র প্রদর্শন ত' বরাবর ব্যবসায় আছেই। এখন Qualityর থেকে দৃষ্টি সরে এসে তা সম্পূর্ণ নিবদ্ধ হয়েছে Box-officeএ।

বর্ত্তমানে বিদেশী ছবি সরবরাহকরা বিশেষ শক্তিশালী হয়েছে। এরা সবাই এদেশে কেন্দ্রীয় সহরগুলিতে আফিস খুলেছে। এরা প্রদর্শকদের কাছ থেকে অসঙ্গত পরিমাণ অর্থের দাবী না করলেও চিত্রপ্রদর্শন বিষয়ে ষোল আনা হুকুমজারি করে। এরা মোটা টাকার বিজ্ঞাপন দেয়; সুতরাং পত্রিকাগুলিকে এদের কি পরিমাণ দাসত্ব করতে হয় তা সহজেই অনুমেয়। এরা চোখ রাঙালে সম্পাদক চোখে অন্ধকার দেখেন। এরা এখানে জমি নিয়ে আফিস খোলে ও ছবিঘর তৈরি করে। দেশী ছবিকাররা ও ছবিঘরের মালিকরাও ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছেন, কিন্তু বিদেশী ছবির সরবরাহকরা যে ভাবে শক্তি সঞ্চয় করছে তাতে অচিরেই ছায়াছবির বাজারে আধিপত্য নিয়ে উভয় পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হবে। আমরা নিজেদের ছবির বিক্রি চাই, আমেরিকানরা তাদের অপস্রিয়মাণ শতকরা ৯৯ ভাগ ছবি দেখাবার দাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়, এর মাঝে ব্রিটেন আবার ব্রিটিশারদের অন্ধ স্বাদেশিকতার সদ্ব্যবহার ক'রে চিত্র রাজ্যে বহুল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে অতুল শক্তিসম্পন্নদের হাত থেকে বাজার কেড়ে নিতে হলে তাদের ছবি বয়কট করা উচিৎ, কিন্তু বর্জ্জন সম্ভব নয় কেন তা পূর্ব্বেই বলেছি।

এখানে আমরা Mystry of Edwin Drood ছবিতে Heather Angel, Douglass Montgomery ও Claude Rainsকে দেখতে পাচ্ছি। Claude Rains এই ছবিতে অনুপম অভিনয় করেছে।

চিত্র পরিচয়

মাঝে একমাস বাদ প'ড়ে যাওয়ায় এবার অনেকগুলি ছবির পরিচয় দিতে হচ্ছে। বিশদ পরিচয় দেওয়া না হলেও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করলাম। পাঠকের, আশা করি, মনে আছে আমাদের মতে (ক) শ্রেণীর ছবি অসাধারণ, (খ) শ্রেণীর ছবি সুন্দর, (গ) শ্রেণীর ছবি উপভোগ্য এবং (ঘ) শ্রেণীর ছবি সাধারণ। 'ছ' চিহ্নিত ছবি ছেলেরাও দেখতে পারে।

গত দু'মাসে একখানিও প্রথম (ক) শ্রেণীর ছবি মুক্তিলাভ করেনি। নিম্নলিখিত ছবিগুলি (খ) শ্রেণীর :—
রবার্টা (আইরিন্ ডানের গান এবং ফ্রেড্ এষ্টেয়ার ও

জিন্‌জীর রজার্সের অভিনয়); লিট্‌ল্ কর্ণেল্ (ছ) (সার্লি টেম্পল্ ও লায়োনেল্ ব্যারীমোরের অভিনয় এবং য়্যানি ফেলোস্ জন্‌ষ্টনের আখ্যানভাগ); নটি ম্যারিয়েটা (নেল্‌সন্ এডির গান ও অভিনয়); ক্লাইভ্ অব্ ইণ্ডিয়া (ছ) (রিচার্ড বোলেস্লাভ্‌স্কির প্রযোজনা, রোণাল্ড কোল্‌ম্যানের অভিনয়, R. J. Minney ও W. P. Lipscombএর চিত্রনাট্য। **ছবিটির থেকে ভারতের পক্ষে আপত্তিকর অংশ ছেঁটে এখানে দেখানো হয়েছে, তবু দেখা গেল মিরজাফর পাশারঘুঁটি মেয়েদের অকারণে চাবুক মারবার মত নীচ ছিল।**), রেক্‌লেস্ (জীন্ হার্লোর নাচ গান ও অভিনয় এবং উইলিয়াম্ পাওয়েল্ ও অপর সকলের সু-অভিনয়); মিষ্ট্রি অব্ এডুইন্ ড্রুড্ (ছ) (ক্লড্ রেন্‌সের অভিনয়); গোল্ড ডিগার্স অব ১৯৩৫ (ডিক্ পাওয়েল ও উইনিফ্রেড্ শ'র গান। যাঁরা নাচের ঘুমুরের কর্ম্মকারের নাক নিয়ে মারামারি করেন তাঁদের বাসবি বার্কলের, শুধু এই ছবির নয়, যে কোনো ছবির নৃত্যপরিকল্পনা ও পরিচালনা দেখতে বলি); কল্ অব্ দি ওয়াইল্ড (ক্লার্ক গেব্‌ল্ ও লরেটা ইয়ঙ্গের সু-অভিনয়) ও কার্ডিন্যাল রিচ্‌লুড (ছ) (W. P. Lipscombএর সংলাপ ও জর্জ্জ আলিসের উৎকৃষ্ট বাচন)।

এই সব ছবি (গ) শ্রেণীর :—ভ্যানেসা : হার লাভ্ ষ্টোরি (হেলেন্ হেইজ্ মে রব্‌সন ও অটো ক্রুগারের অভিনয়); ক্যাপ্‌চার্ড (লেস্‌লি হাওয়ার্ড ও পল লুকাসের অভিনয়) প্রাইভেট্ ওয়ার্লডস্ (জোয়ান্ বেনেট ও ক্লডেট কলবার্টের অভিনয়); ম্যান্ হু নিউ টু মাচ (চমকপ্রদ আখ্যানভাগ)

এই মেয়েটিকে একাধিক রোমাঞ্চকর ছবিতে দেখেছেন। Fay Wray এখন কলম্বিয়ায় কাজ করছে।

ড্রেক্ অব ইংলণ্ড (ছ) (ম্যাথিসন্ ল্যাবয়ের অভিনয় ও গল্পোৎকর্ষ); ডেবিল ইজ এ ম্যান্ (মার্লিন্ ডিয়েট্রিশের শ্রেষ্ঠ অভিনয় এবং প্রযোজকপ্রবর জোসেফ্ ভন্‌ষ্টার্ণবার্গের অতুলনীয় প্রয়োগকৃতিত্ব ও অত্যুৎকৃষ্ট আলোকচিত্র); সুইট মিউজিক (প্রচুর হাস্যরস এবং রুডি ভ্যালি ওয়ান্ ষ্টোরা-

কের গান) ; স্কাউণ্ড্রেল (বেন্ হেক্ট ও চার্লস্ ম্যাকার্থারের অবিশ্বাস্য গল্প ও সুন্দর প্রযোজনা ; নট-নাট্যকার, গীতিকার, প্রযোজক ও পরিচালক নোয়েল কাওয়ার্ডের প্রথম চিত্রাভিনয়) ; প্যারিস ইন্ স্প্রিং (লিউইস্ মাইলষ্টোনের প্রযোজনা, প্রচুর হাস্যরস এবং মেরি এলিসের গান ও টুলিও কার্মিনেটির অভিনয়) ; নাইট লাইফ অব দি গডস্ (লাওয়েল স্যারমানের অপূর্ব্ব প্রযোজনা) ; লেট দেম্ হ্যাভ ইট (দস্যুতার বিরুদ্ধে গোয়েন্দার রোমাঞ্চকর আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলী ও ব্রুস্ ক্যাবটের অভিনয়)।

(ঘ) শ্রেণীর ছবিগুলির উল্লেখ না করলেও চলে কারণ এখানে উল্লিখিত ছবিগুলিই পাঠকরা দেখবেন।

Jeanette Mc Donald ও Nelson Eddy সুন্দর teamed হয়েছিল Naughty Mariettaতে। ওরকম গানের ছবি কচিৎ দেখা যায়।

'বিদ্রোহী'—ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মসের বাংলা ছবি। চিত্রনাট্য বিশেষ দুর্ব্বল এবং সম্পাদনা ও পারম্পর্য্য অক্ষমতার পরিচায়ক। ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় বহুস্থানে শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া গেলেও প্রয়োজনা উন্নত ধরণের নয়—যুদ্ধ, অত্যাচার, বিদ্রোহ প্রভৃতির বৃহৎ দৃশ্যগুলি বিশ্বাস্য হয়ে ওঠেনি। সবচেয়ে হতাশ হয়েছি অভিনয় বিষয়ে। অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়ে আন্তরিক চেষ্টার অভাব দেখা গেল। ভূমেন রায়কে ভাল মানালেও তাঁর অভিনয় আদৌ সন্তোষজনক নয়। শ্রীমতী ডলির অভিনয় বিশেষ নিন্দার্হ নয় এবং গানটী ভালই। শ্রীমতী জ্যোৎস্নাকে কিছুটা-সীরিয়াস ভূমিকায় আদৌ মানায়নি ; শ্রীমতীর সীরিয়াস অভিনয় দেখে ও বাচন শুনে হাসি পায়। অপরাপর সকলেই প্রায় যাত্রা করেছেন। কুমার শচীনের ও অনুপম ঘটকের গান অতীব তৃপ্তিকর। চিত্রগ্রহণ সুন্দর, শব্দগ্রহণ দোষাবহ। হাস্যরসের খোরাক জোগাবার চেষ্টা সফল হয়নি। রাজ-পুতানার মনোরম দৃশ্যাবলী ও টিফ্রাঙ্গোপোলোর নেপথ্য সুর সংযোজনা ছবিটীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্।

প্রয়োজনা ও বিচিত্র গল্প) ; ফোর আওয়ার্স টু কিল (রিচার্ড ব্যার্থেল মেসর অভিনয়) ; ষ্টোলেন হার্মনি (জর্জ্জ রাফ্ট ও গ্রেস্ ব্রাডলির নাচ, গ্রেসের গান ও বেন্ বার্ণির সুরসঙ্গীত) ; বুলডগ জ্যাক (জ্যাক হালবার্টের হাসিভরা অভিনয়) ; ড্যান্স ব্যাণ্ড (ভ্যালপ্যারাইসো নামে নাচ) ; মার্ক অব দি ভ্যাম্পায়ার (ছ) (বেলা লুগোসি ও লায়োনেল ব্যারীমোরের অভিনয়। টড ব্রাউনিঙ্গের ভৌতিক কাহিনীর effective treatment); সিক্স ডে বাইক রাইডার (ছ) (জো ই ব্রাউনের হাসিভরা অভিনয়) ; নো মোর লেডিজ (রবার্ট মণ্টগোমারি ও জোয়ান ক্রফোর্ডের অভিনয়) ; ব্রাইড্ অব ফ্রাঙ্কেনষ্টেন্ (ছ) (বরিস্ কার্লফের অভিনয়, ভয়ঙ্কর আখ্যানভাগ ও জেমস্ হোয়েলের

রাতকাণা—ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মসের ছোট বাংলা ছবি।

যথাপূর্ব্ব লেখকের যতীন দাসের সিচুয়েশন সৃষ্টি ও রসাল সংলাপের গুণে ছবি দেখে লোকে হাসে। প্রযোজনা চলনসৈ কিন্তু দাস মশায়ের চিত্রগ্রহণ সুন্দর, শব্দগ্রহণ প্রশংসার অযোগ্য। নায়ক নায়িকার অভিনয় ভালই এবং অপর সকলের চলনসৈ। রায় নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের লেখায় যে ছ্যাবলামি আছে ছবিতে তা পরিত্যক্ত হওয়া উচিৎ ছিল।

মন্ত্রশক্তি—পপুলার পিকচার্সের প্রথম বাংলা ছবি। প্রযোজক সতু সেন বিপুলকায় গ্রন্থের চিত্ররূপদানে ছৈবিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন—অবশ্য সর্ব্বত্র নয়, এ কারণে ছবির মধ্যভাগ প্রায় বিরক্তিকর লাগছিল। প্রযোজনা স্থানে স্থানে প্রশংসার্হ। আসামের প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্পদ ক্যামেরাম্যান সুরেশ দাসের গুণে মনোরম হয়ে পর্দায় ফুটেছে, দাস মশায়ের কাজ আনন্দ-দায়ক। শব্দযন্ত্রী মধু শীলের কাজ যথাপূর্ব্ব প্রথম শ্রেণীর; পারম্পর্য্য নির্দ্দোষ ও সম্পাদনা বেশ ভাল। অভিনয়ে মনে রেখাপাত করবার মত কিছুই নেই। ওর মধ্যে শ্রীমতী শান্তি, শ্রীমতী চারুবালা, মনো-রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী ও রতীন বন্দ্যো-পাধ্যায় অল্পবিস্তর আনন্দ দিয়েছেন। শ্রীমতী লাইট ও নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী অ-চ-ল। গীতি সন্নিবেশ স্থান ও সংখ্যা-জ্ঞানের আদৌ পরিচয় মেলে না। কৃষ্ণচন্দ্র দের সুরসংযোজনা ভালই।

Jean Harlow এবার Reckless ছবিতে Joan Crawford-এর উপযোগী নৃত্যগীতিবহুল ভূমিকায় চমৎকার উৎরেছে।

অবশেষে—নিউ থিয়েটার্সের ছোট বাংলা ছবি; বাংলার প্রথম খাঁটী **কমিক ছবি**। সৌরীন্দ্রমোহনের গল্পে হাস্যকর সিচুয়েশন ও রসাল সংলাপ (যা দিয়ে বাংলা 'কমিক ছবি' তৈরি হয়) নেই, কিন্তু প্রযোজক দীনেশ দাস ছবির প্রাণ হাস্যকর চলাফেরা ও action দিয়ে হাসির চোটে আমাদের রুদ্ধশ্বাস ক'রে তুলেছিলেন। ক্যাবলাকান্ত প্রেমিকের ভূমিকা প্রমথেশ বড়ুয়ার কাছে একেবারে মাপ মাফিক জামা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাঁর ক্লোজ-অপ নেওয়া সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়, এটা প্রযোজক বোঝেননি। শ্রীমতী মলিনা রোমান্টিক এবং শীলার চরিত্র একান্ত কাল্পনিক ব'লে শ্রীমতীর অভিনয়ে আদৌ হাসি পায় না। অমর মল্লিক ও বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অভিনয় মোটের ওপর ভালই। চিত্রগ্রহণ আগাগোড়া ঝাপসা, এবং তাতে উল্লেখ-যোগ্য কিছুই নেই। রসায়নাগারের কাজ ভাল নয়। অপরাপর বিভাগের কাজ সন্তোষজনক। অবশেষে বাংলা ছবি সত্যি একটা কমিক ছবি হয়েছে।

এবার গ্রীণ পিকচার্সের ছোট বাংলা ছবি 'শেষপত্র' সমালোচনার অযোগ্য।

পরলোকে উইল রজার্স—হাস্য রসিক উইল্ রজার্স বৈমানিক ওয়াইলি পোষ্টের সঙ্গে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। উইল্ কেবল চিত্রাভিনেতা, লেখক বা বেতারশিল্পী ছিলেন না, আমেরিকায় প্রথম পাঁচজন জনপ্রিয় ব্যক্তির মধ্যে তিনি অন্যতম; তাঁকে Unofficial Ambassardor বলা হোত। উইল্ প্রথমাবধি ফক্স ফিল্মসের তারকা ছিলেন। ১৯৩২ সালের প্রারম্ভে তিনি আমাদের সহরে এসেছিলেন; তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় Wherever he went and he went everywhere....A Connecticut Yankee, Young as you feel, So this is London, They had to see Paris, Handy Andy প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত ছবি। তাঁর আগামী ছবি Life begins at 40। আমরা মৃতের আত্মার কল্যাণ কামনা করছি।

প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর—কিছুকাল পূর্ব্বে আমি বলেছিলাম মেয়েদের লেখায় নাটকের বিষয়বস্তু নেই, বিষয়-বৈচিত্র্য নেই, অধিকাংশ চরিত্র একবিধ এবং বাস্তবতার অভাব আছে। আমার লেখা প'ড়ে দেখলাম এক ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ হয়েছেন এবং তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু ভদ্রলোক মেয়েদের গল্পের সঙ্গে শরৎ-সাহিত্যের সামঞ্জস্য ও তুলনা না করলেই ভাল করতেন, কারণ ব্যাপারটা হাস্যকর। আর তিনি সমালোচকদের বিদ্বেষবুদ্ধি প্রণোদিত anti-propagandists ব'লে চিনলেন কি ক'রে তা তিনিই জানেন।

যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে লেখকের genius, talent এবং সরস ক'রে গল্প বলবার ক্ষমতা চাই। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখায় geniusএর পরিচয় আছে। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ ক'রে তারাশঙ্কর ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখায় বিষয়বস্তুর নূতনত্ব ও অতুলনীয় techniceএর পরিচয় মেলে অর্থাৎ তিনি talented। আর শৈলজানন্দের মত মিষ্ট ক'রে গল্প বলবার ক্ষমতা ক'জনের আছে জানি না। এবং মেয়েদের লেখায় এ তিনটির একটাও আছে ব'লে জানি না। তাঁরা গল্প বানাতে পারেন, মন-গলানো অযথা উচ্ছ্বাসের ঢেউ তুলতে পারেন কিন্তু সাহিত্যে প্রয়োজন স্বাভাবিকতা ও ওজন ক'রে কথা বসানো। তাঁরা মামুলি নীতি ও ধর্ম্ম নিয়ে গল্প করতে পারেন কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। সর্ব্বজনবোধ্য গল্প অবশ্যই রসিকজনরঞ্জন সাহিত্যের থেকে বাজারে বেশি বিকোবে। উচ্ছ্বাস অবশ্য প্রবোধকুমারের মত কাব্যময় হলে তার চেয়ে আনন্দকর কিছুই থাকতে পারে না।

সাহিত্য যতই realismএর বড়াই করুক, নিছক realism নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। Idealismকে বাদ দিয়ে সাহিত্য চলতে পারে না। শরৎচন্দ্রের যে সব গ্রন্থে সমাজের ঘোঁট আর হাঁড়ি হেঁসেলের কথা আছে গল্পের শেষেই তার সমাপ্তি নয়—ঐ সব গ্রন্থ মানুষকে ভাবিয়ে তোলে সমাজের সমস্যার কথা, তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুচ্ছ দৈনন্দিন হানাহানির উর্দ্ধে উঠে কল্যাণের কথা চিন্তা করতে এবং সহজ, সুন্দর আর কল্যাণকর হয়ে বেঁচে থাকতে; আর একেই আমি বলি মহত্তর ও বৃহত্তর জীবনের ইঙ্গিত। যোল আনা realism প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' বা শৈলজানন্দের 'খরস্রোতা' মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। সাহিত্য 'পড়লাম আর শেষ হয়ে গেল' নয়, কিন্তু গল্প পড়াতেই তার সমাপ্তি। মতামতটা আমার নিজস্ব এবং আলোচনাটা সাহিত্যগত হলেও বাধ্য হয়ে আমায় করতে হোল।

আনন্দ
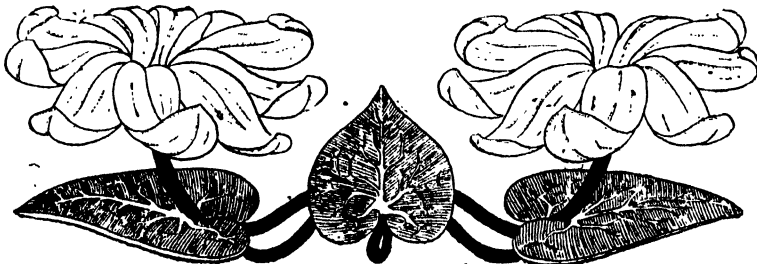
শ্রীসুশীলকুমার বসু

মেয়েদের শিক্ষা ও জীবন সংগ্রামে বর্দ্ধিত প্রতিযোগিতা

মেয়েদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার বিস্তার হইলে, আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, তাঁহাদের অধিকাংশ জীবিকার্জ্জনের দিকে না ঝুঁকিয়া যে, এখনকার ন্যায়ই গৃহধর্ম্ম করিবেন সেকথা, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইঁহাদের এই বিদ্যার্জ্জন, অর্থার্জ্জনের কার্য্যে না লাগিলেও, তাহার দ্বারা যে, নানা দিক দিয়া আমরা প্রচুর লাভবান হইব, জীবন যাত্রা অনেক সুখের হইবে, সে কথাও বলিয়াছি।

কিন্তু তবু, একথাও সত্য যে, অনেকে স্বাবলম্বিনী হইতে চাহিবেন এবং অনেককে বাধ্য হইয়া অর্থার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হইবে। বর্ত্তমানে না হইলেও, সময়ক্রমে মেয়েরা জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্রে, পুরুষদের প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইবেন এরূপ সম্ভাবনাও রহিয়াছে। মেয়েরা পুরুষদের প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইলে, দেশের আর্থিক জীবনের উপর তাহার ফল কি প্রকার হইবে, সে সম্বন্ধে অনেকের মনেই সন্দেহ আছে। কারণ, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসারিত নহে; কর্ম্মাভাবে যথেষ্ট সংখ্যক পুরুষ এখনই বসিয়া আছেন, ভবিষ্যতে ইঁহাদের সংখ্যা আরও বাড়িবে। ইহার উপর যদি মেয়েদের সংখ্যা যুক্ত হয়, তবে দেশে বেকারের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইবে।

কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরাই জাতীয় কর্ম্মশক্তির একমাত্র প্রতিনিধি নহেন। জাতির প্রাপ্তবয়স্ক সকল নরনারীর যে মিলিত কর্ম্মশক্তি, তাহাকেই জাতির পূর্ণ কর্ম্মশক্তি বলা যাইতে পারে। জাতির কর্ম্মভাব দূর করিতে হইলে, এই সমগ্র কর্ম্মশক্তিকে নিযুক্ত করিবার মত উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র থাকা চাই। অর্থাৎ প্রত্যেক সমর্থ নরনারীকে কাজ দিতে পারিবার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। তাহা না থাকিলে, যাঁহারা বসিয়া থাকিবেন, তাঁহারা নারীই হউন বা পুরুষই হউন, তাঁহাদের সমস্যা তাদৃশ উৎকট হউক বা না হউক, তাঁহারা বেকারই থাকিয়া গেলেন। কিন্তু, নারীরা পর্দ্দার অন্তরালে থাকায়, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সচেতন নহি এবং আমাদের সমস্যার কথা হিসাব করিবার সময় জন সংখ্যার এই অর্দ্ধেকের কথা সাধারণতঃ ভুলিয়া থাকি, যদিও, তাহাতে ভুল হিসাবের ফলে সমস্যা জটিলতর হইতে থাকে মাত্র। যদি আমরা মনে করিয়া থাকি যে, বাজার এবং বস্ত্রের হিসাব রাখিতে পারিলেই মেয়েদের শক্তির যথোচিত সদ্ব্যবহার হইল এবং গৃহস্থালির কার্য্য ও রন্ধনের ফর্দ্দ দীর্ঘ করিয়া তাঁহাদের সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাতে নিযুক্ত রাখিতে পারিলেই সকল ব্যবস্থা করা হইল তবে তাহাতে আমাদের বিবেক শান্ত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান কিছু মাত্র হইবে না। ইহাতে আমাদের সংসার যাত্রার বর্ত্তমান রূপ ও ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইলেও দেশ হইতে গার্হস্থ্য জীবন উঠিয়া যাইবে, এমন আশঙ্কা করিবার অবশ্য সঙ্গত কারণ নাই।

সম্ভবতঃ একথা বলা যাইবে যে দেশের সকল সমর্থ নর-নারীকে কাজ দিবার মত কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারণ আমাদের যত দিন না হইতেছে, ততদিন মেয়েরা বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলে বেকার সমস্যা বাড়িয়া যাইবে এবং মেয়েরা যে সকল স্থলে কাজ পাইবেন, সেই সকল স্থলে যেসব পুরুষ কাজ পাইতেন, তাঁহারা দেশের সমস্যাকে জটিলতর করিয়া ফেলিবেন।

কিন্তু মেয়েরা বাহিরের কোনও স্থান হইতে আসেন নাই। তাঁহারা আমাদেরই দেশের এবং পরিবারের লোক। যদি ধরিয়া

লওয়া যায় যে, সমগ্র দেশে মাত্র দশ জন লোকের করিবার মত কার্য্য আছে তবে, সেই কাজ দশজন পুরুষ লোকের পাওয়া অথবা ছয়জন পুরুষের এবং চারিজন স্ত্রীলোকের সেই কাজ পাওয়া দেশের পক্ষে একই কথা। ইহাতে দেশের আর্থিক অবস্থা একই প্রকার থাকিবে ; দেশের পরিবারগুলির গড় অবস্থারও কোন বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইবে না। শুধুমাত্র মেয়েদের কর্ম্মহীন অবস্থাকে আমরা তাঁহাদের বেকার অবস্থা বলিয়া মনে না করায়, মেয়ে বেকারের সংখ্যা কমিয়া পুরুষ বেকারের সংখ্যা বাড়িলে, অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতেছে মনে করিয়া অধিকতর চঞ্চল হইব মাত্র। অবশ্য ইহার ফলে, এই অবস্থা দূর করিবার জন্য চেষ্টা দেখা দিবার এবং তাহাতে অবস্থার উন্নতি হইবার বরং কিছু আশা আছে।

ইহার উত্তরেও কেহ হয়ত বলিবেন যে, দেশের আর্থিক অবস্থার ইহাতে পরিবর্ত্তন হইবে না বটে, এবং মোট কর্ম্ম-প্রাপ্তদের সংখ্যাও সমান থাকিবে বটে, কিন্তু এই সবক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য (বাহিরের কাজের পক্ষে) মেয়েরা যৎকালে কাজ করিতে থাকিবেন তখন, যোগ্যতর পুরুষদের কাজের অভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে। এ অবস্থা যেমন বাঞ্ছনীয় নহে, তেমনই ইহাতে লাভেরও বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু, কাহারও যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রথম হইতে কিছু ধরিয়া না লইয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখিলে যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রকৃত পরীক্ষা হইতে পারিবে। স্ত্রীলোকেরা যদি বাহিরের কার্য্যের পক্ষে অনুপযুক্ত হন বা বাহিরের কোন কোন কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত হন তবে, হয় তাঁহারা নিজেরা যে সব ক্ষেত্রে যাইতে চাহিবেন না বা, লোকে যে সব ক্ষেত্রে পুরুষের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে লইতে চাহিবে না, ইহা কতকটা পরীক্ষা সাপেক্ষ হইলেও, অপেক্ষাকৃত কম শ্রমসাধ্য কার্য্যে যে তাঁহারা পুরুষের সমকক্ষ এবং বালক বালিকাদের শিক্ষাদান প্রভৃতি দুই একটি কার্য্যে যে তাঁহারা অধিক দক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজের নিম্ন কোন কোন স্তরে স্ত্রীলোকেরও শ্রমসাধ্য বাহিরের কাজ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এসকল স্থানে স্ত্রীলোকের অযোগ্যতা বা সংসার যাত্রার বিশেষ কোন অসুবিধা প্রকাশ পায় না।

দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে এমন ঘটনা প্রায়ই দেখা যাইবে যে, স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর উপার্জ্জন ক্ষমতা বা উপার্জ্জনের সুযোগ অধিক থাকিবে। অনেক ক্ষেত্রে উভয়েরই সুযোগ থাকিবে। এরূপ স্থলে নিজেরা অর্থার্জ্জনে নিযুক্ত হইয়া বেতন-ভুক অন্য লোকের দ্বারা গৃহস্থালির কাজ করাইয়া লওয়া ক্ষতির, অসুবিধার বা অসুখের কারণ হইবে না।

শিক্ষাবিহীন পুরুষেরাও কাজ করিয়া থাকেন এবং অর্থার্জ্জন করিতে না পারিলে বেকার বলিয়া গণ্য হ'ন। কাজেই, শিক্ষার প্রসারের পূর্ব্বেও নারীদের বাহিরের কাজের সমস্যা সমানই রহিয়াছে। তবে শিক্ষা ব্যতীত সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইবে না বলিয়া, একমাত্র শিক্ষার মধ্য দিয়াই নূতন আদর্শ ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আসিতে পারে বলিয়াই, শিক্ষাপ্রসারের সহিত এই সমস্যা জড়িত রহিয়াছে।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিক সম্মেলন

সকল সভ্য স্বাধীন দেশেই জনসাধারণের মতামতের উপর সংবাদ পত্র বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে জন-সাধারণের স্বাধীন মতামতও সংবাদ পত্রেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। দেশের শাসন ব্যবস্থা যাঁহাদের হাতে থাকে তাঁহারা সব সময় ভ্রম-প্রমাদ শূন্য ভাবে নিজেদের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না, কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনসাধারণ ও অধিক ব্যক্তির অভিমত সব সময় নিজেরা নির্ণয় করিতে পারেন না। এক দিকে যেমন জনমত নির্ণয়ের জন্য সংবাদপত্রের উপর দেশের সরকারকে নির্ভর করিতে হয়, অপর দিকে সরকারের ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া দিয়া সংবাদপত্র দেশের শাসন সুপরি-চালনায় সরকারকে তেমনি সাহায্য করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সংবাদপত্র জনসাধারণ ও সরকারকে দেশের সকল প্রকার মঙ্গল কার্য্যে উদ্বোধিত করিয়া থাকে। বস্তুতঃ সংবাদপত্র ব্যতিরেকে অধুনা সকল সভ্যদেশেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কার্য্য ও সু-শাসন এক প্রকার অসম্ভব।

মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপেক্ষা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল্য ও প্রয়োজন অনেক অধিক। 'ইণ্ডিয়ান ভার্ণা-কুলার প্রেস অ্যাক্ট সম্বন্ধে 'হাউস্ অব কমন্সে' বক্তৃতা করিতে উঠিয়া স্বনামখ্যাত বাগ্মী ও রাজনীতিক গ্লাডষ্টোন বলিয়াছিলেন :

I cannot think that the law relating to the Press of India is less than a fundamental branch of the law relating to the liberty and general conditions of the country."

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যাহাতে কোন প্রকারে খর্ব্ব না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও যেমন সরকারের কর্ত্তব্য, তেমনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সর্ব্বদিক দিয়া অক্ষুণ্ণ রাখাও সরকারের কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে ও পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটী দেশে যেমন, জার্ম্মানীতেও ইটালীতে-দেশের গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিতে তৎপর। অবশ্য ইহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থাই বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ। এ দেশে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবার পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতেই গবর্ণমেণ্টের শ্যেন দৃষ্টি সংবাদপত্রের উপর রহিয়াছে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ উইলিয়াম বোণ্টস্ নামে এক ভদ্রলোক কলিকাতায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে প্রথম জাহাজে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে এবং সেখান হইতে ইউরোপে যাইবার আদেশ করা হইল। তৎপরে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মিঃ জেমস্ আগাষ্টাস্ হিকি নামক এক ব্যক্তি 'বেঙ্গলী গেজেট' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু, প্রকাশের দশমাসের ভিতরেই জেনারেল পোষ্টাফিসের মারফৎ বেঙ্গলী গেজেটের প্রচার নিষিদ্ধ হয়। হিকি দমিলেন না;—তিনি পত্রিকাখানি অন্য উপায়ে প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহার উপর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা কল্পে হিকি গবর্ণমেণ্টের সহিত যে অসমসাহসিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা সবিস্তারে বলিবার আবশ্যকতা নাই;—সংবাদপত্রের ইতিহাসের কৌতূহলী পাঠক মাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন। ইদানীং মিঃ সদানন্দ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া যাহা করিয়াছেন তদপেক্ষা হিকির কার্য্য কম প্রশংসনীয় নহে—পরন্তু অধিকতর গৌরবময়। সময় সময় যেরূপ অশোভন দ্রুততার সহিত গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঘোর কলঙ্কজনক। গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ও পরে অর্ডিনান্সের কথা সকলেই অবগত আছেন। আমরা পূর্ব্বের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ কল্পে "ইণ্ডিয়ান ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট" নামে একটি আইন প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্যে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ্চ তারিখে তারযোগে লর্ড লিটন তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী (Responsible minister for India) লর্ড সালিসবারির (Salisbury) অনুমোদন চাহিয়া পাঠান। ১৪ই মার্চ্চ প্রাতঃকালে তারযোগে লর্ড সালিসবারি তাঁহার অনুমোদন প্রেরণ করেন, ঐ ১৪ই মার্চ্চ তারিখেই ২া১ ঘণ্টা আলোচনার পর আইনের খসড়াটি পাকা আইনরূপে পরিণত হয়। বিনা কারণে ও যেরূপ অশোভন দ্রুততার সহিত এই আইনটী পাশ হইয়াছিল ২৩শে জুলাই তারিখে হাউস্ অব কমন্সে গ্লাডষ্টোন্ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে সংবাদপত্রের বিশেষতঃ দেশীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত সংবাদপত্রের মস্তকের উপর গবর্ণমেণ্টের বজ্রমুষ্টি আপতিত হইবার জন্য সমান ভাবেই উদ্যত রহিয়াছে: মধ্যে মধ্যে সে মুষ্টি কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে বটে কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। এ দেশে সংবাদপত্র পরিচালনার কথা স্মরণ করিয়া বিখ্যাত 'ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস' প্রণেতা হাণ্টার সাহেব বলিয়াছিলেন, এ দেশে সংবাদপত্রগুলি "uttered their feeble voices in peril of deportation and under menace of censor's rod'। অদ্যকার ইতিহাস-লেখকও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া হাণ্টার সাহেবের কথাতেই ভারতীয় সংবাদপত্র পরিচালনার কথা লিখিতে পারেন।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার আবশ্যকতা যেরূপ অনুভূত হইতেছে সেরূপ আর কখনও হয় নাই। চারিদিক হইতে বিভিন্ন প্রকারের আইনের নাগপাশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যেরূপ ভাবে হরণ করা হইয়াছে, তাহাতে দেশীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত কোন সংবাদপত্রই নির্ভীক ও স্বাধীন মতামত প্রকাশে সাহসী হন না। এ সময় নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলনের অধিবেশন সময়োপযোগীই হইয়াছে। উক্ত সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু ও মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত সি, ওয়াই

চিন্তামণি তাঁহাদের অভিভাষণে সংবাদপত্রের ও সাংবাদিকগণের অভাব অভিযোগ ও অসুবিধার কথা বিস্তৃতভাবে ও উপযুক্ত যোগ্যতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় সংবাদ পত্রের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীকে আনন্দ দিবে।

ভারতের বাহিরে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যে কুৎসা প্রচার হইতেছে তাহার প্রতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও ডাঃ আঙ্কেল সারিয়া দেশবাসীর ও দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। জনসাধারণ ও সংবাদপত্র সমূহ এরূপ কুৎসা প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন; আইন সভার ভিতর দিয়া ব্যবস্থাপকগণও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। সুখের বিষয় সম্মেলনে সাংবাদিকগণ একটি প্রস্তাবে এরূপ কুৎসার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়িবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন; এবং ঐ প্রস্তাব ধার্য্য করিয়া সাংবাদিকগণ ভারতবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। প্রস্তাবটি আমার এখানে উদ্ধৃত করিলাম—"ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে বিদেশে নিয়মিত ভাবে যে কুৎসা প্রচার করা হইতেছে, এই সম্মিলন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন; এবং অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে এরূপ কুৎসার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করা হউক এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সুগঠিত ও সুপরিচালিত প্রচার বিভাগ বিদেশে প্রতিষ্ঠা করা হউক।" উপরি-উদ্ধৃত প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে উঠিয়া ডাঃ আঙ্কেল সারিয়া যাহা বলেন সে দিক দৃষ্টি দেওয়া ভারতবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ডাঃ আঙ্কেল সারিয়া বলেন:—

"আমেরিকাবাসিরা ভারতবাসী ও তাহাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরা খুব সুচতুর উপায়ে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে আমেরিকাবাসিদের মন বিরূপ করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই স্বার্থবাহী দল নিজেদের খরচায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিল এবং এই সকল অধ্যাপক দেশে ফিরিয়া ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করিয়াছেন। এজন্য ঐ ব্যক্তিরা প্রতিবৎসর ২ কোটি ডলার ব্যয় করিতেছিল। এদিক দিয়া ৩৫ কোটী ভারতবাসীরও কিছু করিবার আছে। দেশীয় বড় বড় ব্যবসায়ীদের স্মরণ রাখা উচিত যে এরূপ কুৎসাপ্রচারে বিদেশে তাঁহাদের ব্যবসায়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি সাধিত হইতেছে।"

শুধু আমেরিকাতেই নয় ইউরোপের সকল সভ্যদেশেই ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অবিরত কুৎসা প্রচার চলিতেছে। এরূপে কুৎসা প্রচার চলিতে থাকিলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামেরও যেরূপ ক্ষতি হইবে, বড় বড় ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়েরও সেরূপ ক্ষতি হইবে।

বিদেশে যে শুধু আমাদের দেশেরই বা আমাদের মত পরাধীন দেশেরই নিজেদের কথা, নিজেদের সভ্যতা সংস্কৃতির কথা প্রচারের আবশ্যক আছে তাহা নহে, পৃথিবীর সকল সভ্য স্বাধীন দেশও এবিষয়ে পরস্পরের সহিত পাল্লা দিতেছে। ইউনাইটেড প্রেসের নিকট সুভাস বাবুর এক পত্রে প্রকাশ, চায়না এরূপ প্রচার কার্য্য চালাইয়া প্রভূতসুফল লাভ করিয়াছে। প্রিন্স অব ওয়েলসের পৃষ্ঠপোষকতায় "দি বৃটিশ কাউন্সেল ফর রিলেশনস্ উইথ ফরেন কান্ট্রীজ" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং এই সমিতি সরকার হইতে ৬০০০ পাউণ্ড সাহায্য লাভ করিয়াছে। ইহার উপর ডেলি টেলিগ্রাফ ২৩শে জুলাই যে মন্তব্য করিয়াছে তাহাতে বলিয়াছে, ইটালী ও ফ্রান্স এইরূপ প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য প্রতিবৎসর ১ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া যাবে, আগামী বৎসরে জাপানও ১লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। জার্ম্মানি ত তাহার Ministry for propoganda'র ভিতর দিয়া প্রচার কার্য্য পুরাদমে চলাইতেছে।

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ও কংগ্রেস

জনগণের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত মুষ্টিমেয় শিক্ষিত কংগ্রেসসেবীর পক্ষে দেশের স্বাধীনতা লাভ যে অসম্ভব এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। সহরে বসিয়া বক্তৃতা করিয়া খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া, কংগ্রেস শিবিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কূট আইনগত প্রশ্নের মীমাংসায় অতিবাহিত করিয়া বা আইন সভায় মন্ত্রীদিগকে বা ভারপ্রাপ্ত সদস্যদিগকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিয়া দেশের লোককে বিশেষ করিয়া মূক ও অশিক্ষিত জনগণকে স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে আগ্রহশীল করা বা তদ্ বিষয়ে তাহাদের সমানুভূতি আকর্ষণ ও সাহায্য লাভ

করা যে অসম্ভব এ কথা ছোট বড় অনেক কংগ্রেস নেতাই বলিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের যথার্থ ও প্রধান কর্ম্মের ক্ষেত্র সহরেও নহে আইন সভাতেও নহে ;— বর্ত্তমান কর্ম্মের ক্ষেত্র হইতেছে পল্লীতে পল্লীতে জনগণের মধ্যে।

আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করা যে কংগ্রেসের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক, এ কথা আমরা বলিতেছি না ; পরন্তু, আইন সভাগুলির ভিতর কংগ্রেসের কাজ করিবার ক্ষেত্র রহিয়াছে। বস্তুতঃ গত আন্দোলনের সময় কংগ্রেস আইন-সভাগুলি ত্যাগ করিয়া আসাতেই আইনসভাগুলিতে জন-সাধারণ ও কংগ্রেসের পক্ষে অনিষ্টকর আইনগুলি পাশ হইয়াছে ; এবং তদ্বারা, ভারতবাসীরাই ঐ অনিষ্টকর আইনগুলি চাহে, এই বলিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রচার করিবার সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় যে সকল কংগ্রেস সেবীদের মধ্যে কিছুমাত্র কাজ করিবার ইচ্ছা দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের প্রায় সকলের ভিতরেই আইন সভাগুলির ভিতর দিয়া যে টুকু ধরা যায় সেই টুকু করিবার আগ্রহই দেখা যাইতেছে ; আইন সভার বাহিরে দেশের জন-গণের মধ্যে কাজ করিবার যে বিস্তৃততর ও প্রধান ক্ষেত্র রহি-য়াছে, সে দিকে খুব অল্প সংখ্যক কংগ্রেসসেবীই ঝুকিতেছেন। সমস্ত কংগ্রেসসেবীর কথা সাধারণ ভাবে বিবেচনা করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, বর্ত্তমান কংগ্রেসের আইনসভাগুলির বাহিরে কার্য্য করিবার কোন মনোভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না। গোড়ায় কংগ্রেস কর্ম্মীরা বোধ হয় কতকটা এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া এবং কতকটা আইন সভার ভিতর দিয়া কংগ্রেস শুধু কালক্ষয় ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিবে না এই মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আইনসভাগুলিতে কংগ্রেসের প্রবেশের আদৌ পক্ষপাতী নহেন।

আইনসভাগুলিতে প্রবেশ না করিলে বা প্রবেশ করিবার পক্ষে বাধা জন্মাইলে যদি কংগ্রেসের বর্ত্তমান মনোভাব দূর হইত অর্থাৎ যদি জনগণের সেবা করিবার ইচ্ছা বা আগ্রহ কংগ্রেসসেবীদের বর্দ্ধিত হইত, তাহা হইলে অবশ্য আইন-সভায় প্রবেশ কংগ্রেসের পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু, তাহা হইবে না তাহা যে স্পষ্ট। সাধারণতঃ যাঁহাদের মতানুবর্ত্তী হইয়া, উপদেশ লইয়া কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য-সমূহ পরিচালিত হয়, যাঁহারা কংগ্রেসের আদর্শকে অনুপ্রাণিত বা পরিচালিত করিয়া থাকেন, বা গত আন্দোলনের সময় অসংখ্য কংগ্রেসের কর্ম্মীর পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়া অশেষ দুঃখ ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর খুব কম ব্যক্তিই আইন সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। যে সকল কংগ্রেস কর্ম্মী আইনসভার কার্য্যে অংশ গ্রহণে দক্ষ, সপটু বাগ্মী, বা আইনসভার ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেই সর্ব্বাধিক পছন্দ করেন, অথচ বাহিরে থাকিয়া জনগণের ভিতর কার্য্য করিতে ততটা আগ্রহান্বিত নহেন, তাঁহারাই আইন সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। নূতন শাসন তন্ত্রানুসারে গঠিত আইন-সভাগুলিতে (যদি আইনসভাগুলিতে প্রবেশ করা স্থির হয়) যে ইহাঁরাই কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবেন ইহা নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং কংগ্রেস আইন সভায় প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া যে, কংগ্রেসের জনসাধারণের ভিতর গঠনমূলক কার্য্য করিবার যে ইচ্ছা ছিল তাহা ব্যাহত হইয়াছে বা নূতন শাসনতন্ত্রানুসারে গঠিত আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করিলে ব্যাহত হইবে, এমন কথা বলা যায় না।

নূতন আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করিবার পক্ষে আর একটি বাধা উপস্থিত হইতেছে। গত পূর্ণ অধিবেশনে কংগ্রেস নূতন শাসনতন্ত্রকে বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করিলে কার্য্যক্ষেত্রে সে প্রস্তাব নাকচ করা হইবে কিনা এ প্রশ্ন অনেকে করিতেছেন। অবশ্য কংগ্রেস যদি আগামী লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে নূতন শাসনতন্ত্র বর্জ্জনমূলক প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন তবে, সব গোলই চুকিয়া যায়। কিন্তু, কংগ্রেসের সভাপতি বলিতেছেন, "আগামী লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে বম্বে কংগ্রেসের প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হইবার সামান্যতম সম্ভাবনাও নাই।" বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের ন্যায় অভিজ্ঞ কংগ্রেস কর্ম্মীর উক্তি সত্য হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। সুতরাং একদিকে বর্জ্জন এবং অন্যদিকে আইন সভাতে প্রবেশ, আপাতদৃষ্টিতে এই অসংলগ্ন ব্যাপারটি লইয়া আগামী অধিবেশনে হয়ত প্রশ্ন উঠিবে এবং আইন সভাগুলিতে প্রবেশ, পূর্ব্ব প্রস্তাবের ফলে কংগ্রেসের পক্ষে নিষিদ্ধ হউক ইহাও হয়ত অনেকে চাহিবেন।

বন্দের প্রস্তাব বলবৎ থাকুক বা না থাকুক, দেশের ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের মনোভাব কংগ্রেস সভাপতি ঠিকই নির্ণয় করিয়াছেন :—

"দেশের বর্ত্তমান মনোভাব আমি যতদূর নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাতে মনে হয়, কংগ্রেসকর্ম্মীরা নূতন আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক।" পরে কংগ্রেসের আইন সভাগুলিতে প্রবেশ সম্পর্কে সমস্ত সন্দেহ অপনোদন করিয়া বলিতেছেন, উপরিউক্ত বিষয়ে সমস্ত সন্দেহের অবসানকল্পে বলিতেছি, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কংগ্রেস আইনসভাগুলিতে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সপক্ষে মত দিবেন।"

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যেরূপ বলিয়াছেন, কংগ্রেসের অধিকাংশ কর্ম্মীর মনোভাব যদি সেরূপ নাও হয়, তাহা হইলেও অন্য দিক দিয়া বিবেচনা করিবার আছে। কংগ্রেস রাজনীতির ক্ষেত্র; এখানে ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও চলা উচিত নহে। নূতন শাসনতন্ত্র যাহাতে দেশের উপর চাপাইয়া না দেওয়া হয় সে বিষয়ে কংগ্রেস যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছেন। নূতন শাসনতন্ত্র দেশের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং কংগ্রেস কোন সহযোগিতা না করিলেও দেশের এক শ্রেণীর লোক গবর্ণমেণ্টের সহিত সাহায্য করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র সু-পরিচালিত হইতে সাহায্য করিবেই। সুতরাং কংগ্রেস দূরে থাকিলেও সর্ব্বশ্রেণীর দেশবাসীর পূর্ণ ও আন্তরিক সহযোগিতা না পাইলেও নূতন শাসনতন্ত্র পরিচালনা অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কংগ্রেস নূতন শাসনতন্ত্র বর্জ্জন করিলেও নূতন শাসনতন্ত্র বর্জ্জিত হইবে না। এতদ্‌ভিন্ন গভর্ণমেণ্ট হয়ত বুঝিয়াছেন পদে পদে দেশবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া, দেশীয় মন্ত্রী ও ব্যবস্থাপকদিগকে অবিশ্বাস করিয়া, দেশবাসীর পক্ষে অনিষ্টকর আইনসমূহ পাশ করিয়া, রক্ষা-কবচ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাসমূহকে সচল রাখিয়া দেশ শাসন চলিবে না। সুতরাং নূতন আইনসভাগুলিতে মন্ত্রিগণ ও ব্যবস্থাপকগণ বিস্তৃততর ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার, দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসমূহে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবেন বলিয়া মনে হয়; এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা যে দেশবাসীর নিকট-সংস্পর্শে আসিবেন, দেশবাসীর উপর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিবার সুযোগ পাইবেন তাহা সুনিশ্চিত। কংগ্রেস দেশবাসীর অনেকটা নিকট-সংস্পর্শে আসিয়াছেন—কংগ্রেসের উপর দেশবাসী এখনও শ্রদ্ধা হারায় নাই; ফলে কংগ্রেস আইনসভায় প্রবেশ করিলে অন্যান্য ব্যবস্থাপকগণের তুলনায় দেশবাসীর ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে আসিবেন ও দেশবাসীর উপর অধিকতর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইবেন। আর যদি কংগ্রেস আইন সভায় প্রবেশ না করেন একদিকে যেমন তাঁহারা এদিক দিয়া দেশবাসীর ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন, তেমনি বিপরীত পক্ষে অন্যান্য সদস্যেরা এদিক দিয়া জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া কংগ্রেসের বর্ত্তমান প্রভাবের লাঘব ঘটাইবেন।

এ পর্য্যন্ত সাধারণভাবে সকল আইন সভাতেই কংগ্রেসের প্রবেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। যে সকল সভাতে, যেমন বঙ্গদেশীয় আইনসভাগুলিতে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রাধান্য বা প্রাবল্য ঘটিবার আশঙ্কা আছে, সেখানে কংগ্রেসের উপস্থিতির অধিকতর প্রয়োজন। কংগ্রেসের যে খ্যাতি ও অসম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া যে প্রতিপত্তি রহিয়াছে তাহা কংগ্রেসের বাহিরের কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের নাই। সুতরাং অন্যান্য ব্যবস্থাপকগণের বা সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের বিরোধিতা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক-বুদ্ধি সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাহায্যে শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যে দেশে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির অনুকূলে ও জাতীয়তা বৃদ্ধির প্রতিকূলে আইন সভাগুলির ভিতর দিয়া সংগ্রাম চলাইবার যতটা সুযোগ পাইবেন, কংগ্রেস সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও ঐ সকল আইন সভাতে প্রবেশ করিলে ততটা সুযোগ পাইবেন না। কংগ্রেস সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসের খ্যাতি দেশ অতিক্রম করিয়া বিদেশেও কিছু কিছু পৌছিয়াছে, সুতরাং কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও কোন অন্যায় কার্য্য হইলে একদিকে যেমন গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বভারতীয় আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হইবে, অপর দিকে তেমনি বিদেশে গবর্ণমেণ্টের সুনামের হানি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে, ফলে কোন গবর্ণমেণ্টই কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বে শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যে কোন অন্যায় কার্য্য করিতে বা জাতীয়তার মূলে প্রকাশ্য কুঠারাঘাত করিতে সামান্য কারণে সাহসী হইবেন না। সুতরাং এদিক দিয়া বিবেচনা করিলেও বলিতে

হয়, যদি জাতীয়তার আবহাওয়াকে দেশে সজীব রাখিতে হয়, চারিদিককার বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতার আবহাওয়ার মধ্যে এখনও যেটুকু অসাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাকে যদি রক্ষা করিতে হয় তবে কংগ্রেসের আইনসভাগুলিতে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। শুধু আইনসভাতে প্রবেশ ব্যাপারে নয়, আইন সভাতে প্রবেশ করিলেও কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবে কিনা এ বিষয়ে তর্ক ও আলোচনা সুরু হইয়াছে ; এবং প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টীতে সমস্যা জটিলতর হইয়াছে। প্রথমটী সম্পর্কে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ মাদ্রাজ হইতে ৩রা আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত বিবৃতিতে যাহা বলিয়াছেন তাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। দ্বিতীয়টি সম্পর্কে বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে চুড়ান্ত নিষ্পত্তি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে হইবে কিন্তু, বিবৃতিতে এক স্থলে বলিয়াছেন ; শাসনতন্ত্র বর্জ্জন অর্থে (প্রকারান্তরে) মানিয়া লওয়া বুঝায়না ; এবং সেই মানিয়া লওয়ার দরুণ শাসনতন্ত্রকে কার্য্যকরী করা বুঝায় না।" এবং উদ্ধৃতাংশটুকু হইতে এবং কোন কোন প্রদেশে, যেমন মাদ্রাজে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সপক্ষে কংগ্রেসী জনমত সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা করিয়া কোন কোন নেতা যে শক্তিহীনতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। যদি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণের স্বপক্ষে প্রস্তাব ধার্য্য না করেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ নিম্নে আলোচিত তিনটী প্রস্তাবের যে কোন একটী গ্রহণ করিতে পারেন। (১) কংগ্রেসী সদস্যদিগকে আইন সভার ভিতর থাকিয়া নূতন শাসনতন্ত্র পরিচালনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া নূতন শাসনতন্ত্রকে অকার্য্যকরী করিতে বলা হইতে পারে অর্থাৎ জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূলেই হউক বা প্রতিকূলেই হউক গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক প্রস্তাবের প্রত্যেক আইনের খসড়ার নির্ব্বিচারে বিরোধিতা করিতে বলা হইবে। নির্ব্বিচারে গবর্ণমেণ্টের সকল প্রকার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে গেলে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। প্রথমতঃ আইন সভার ভিতর গবর্ণমেণ্টের সকল প্রকার কার্য্য প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং কংগ্রেস এই প্রস্তাব অবলম্বন করিতে গিয়া এক দিকে যেমন নিজের শক্তিহীনতার পরিচয় দিবেন, অপর দিকে তেমনি অপর পক্ষ কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের হিতকর প্রস্তাব সমূহের বিরোধিতা করিয়া দেশের ক্ষতি করিতেছেন বলিয়া প্রচার কার্য্য চলাইবার সুযোগ পাইবে। উপরন্তু যখন জনসাধারণ দেখিবে নূতন শাসনতন্ত্র পরিচালনার কোন বিশেষ বাধা উপস্থিত হইতেছেনা অথচ কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের ভাল কার্য্যেরও বিরোধিতা করিতেছেন, তখন কংগ্রেসের উপর তাহাদের শ্রদ্ধা স্বভাবতঃই হ্রাস পাইতে থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট যে নূতন শাসনতন্ত্রকে কার্য্যকরী করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাহার পরিচয় ইতি পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং নির্ব্বিচারে প্রতিরোধ পন্থায় যদি নূতন শাসনতন্ত্রকে চূর্ণ করা সম্ভবপর হয় তাহার জন্যও যথেষ্ঠ সময়ের আবশ্যক হইবে। এ দিকে নানান প্রকার বিশেষ আইনের অসুবিধায় পড়িয়া উৎপীড়িত জনসাধারণ যতশীঘ্র তাহাদের উৎপীড়নের লাঘব হয় তাহাই চাহিতেছে ; সুতরাং নির্ব্বিচারে প্রতিরোধ পন্থাকে সবল করিতে যতটা সময় আবশ্যক হইবে ততটা সময় জনসাধারণ ধৈর্য্যাবলম্বন নাও করিতে পারে।

(২) যে সমস্ত বিশেষ আইনের কবলে পড়িয়া জনসাধারণ উৎপীড়িত হইতেছে সেগুলি নাকচ করিবার চেষ্টা ও জাতীয়তাবিধ্বংসকারী কোনও পরিকল্পনায় গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিলে তাহার বিরোধিতা করা ভিন্ন অন্যকোন কার্য্যে অংশ গ্রহণ হইতে কংগ্রেসী সদস্যদিগকে বিরত থাকিতে বলিয়া শাসনতন্ত্রকে বর্জ্জন করিতে বলা হইতে পারে। অর্থাৎ কংগ্রেসকে আইনসভার ভিতর শুধু আত্মরক্ষামূলক কার্য্য ব্যতীত অন্য সর্ব্ব কার্য্যকে বর্জ্জন করিতে বলা হইবে। সকল দেশেই নির্ব্বাচকমণ্ডলী সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন না, যাঁহাদের প্রতি নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকে তাঁহাদেরই নির্ব্বাচকমণ্ডলী নিজেদের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করে, এবং প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তাহারা মনে করে তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি তাহাদের বর্ত্তমান স্বার্থ যাহাতে সংরক্ষিত থাকে তাহারই চেষ্টা করিবেনা, পরন্তু প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচকমণ্ডলীর আশু মঙ্গলকর নানাবিধ কার্য্যে ও চেষ্টায় যথাসম্ভব আত্মনিয়োগ করিবেন। কংগ্রেসপক্ষ তাঁহাদের মনোভাব

নির্ব্বাচনের প্রারম্ভে যতই স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করুন না কেন, নির্ব্বাচকমণ্ডলী তথা জনসাধারণ তাহা দেখিবেনা। তাহারা শুধু দেখিবে তাহাদের প্রতিনিধিরা তাহাদের আশু মঙ্গল-কার্য্যে কতটা অংশ গ্রহণ করিতেছেন বা আত্মনিয়োগ করিতেছেন। ফলে যখন কংগ্রেসী সদস্যেরা আত্মরক্ষামূলক কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবেন না, যখন নির্ব্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থ অন্য সদস্যদের বা সরকারের হস্তে অবহেলিত হইতে থাকিবে তখনই জনসাধারণের উপর কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকিবে।

(৩) কংগ্রেসী সদস্যদিগকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ব্যতীত সাধারণ সদস্যদের মতই অংশ গ্রহণ করিতে বলা হইতে পারে। এইরূপ বলা হইলে কংগ্রেসের প্রকারান্তরে নূতন শাসনতন্ত্রকে মানিয়া লওয়াই হইবে। এবং এইরূপই যদি করা হয় অর্থাৎ প্রকারান্তরে যদি শাসনতন্ত্রকে মানিয়া লওয়াই হয় তবে মন্ত্রীত্ব বর্জ্জনের কোন কারণ নাই,—পরন্তু মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করাই উচিত। কারণ মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলে কংগ্রেস আইন সভার ভিতর দিয়া দেশবাসীর খুব ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইবেন ; এতদ্‌ভিন্ন কংগ্রেসের জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিকূল কার্য্য ও প্রস্তাব সমূহের বিরোধিতা করিবার ক্ষমতা দ্বিগুণিত হইবে। জাতীয়তা গঠনের অনুকূলে সরকারী আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেও হয়ত কোন কোন শক্তিশালী মন্ত্রী সক্ষম হইবে।

আইন সভায় প্রবেশ করিলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করিবার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলে কংগ্রেস জাতীয়তাগঠনমূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপের বর্দ্ধিত সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন।

বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশে সংবাদপত্রের বিপদ

আমাদের দেশে সংবাদপত্র পরিচালনের বিপদ ও অসুবিধার কথা সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি রাজনৈতিক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ পি, বানার্জ্জির প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা হইতে এই বিপদ ও ঝুঁকির পরিমাণ কতকটা উপলব্ধি করা যাইবে।

জরুরী প্রেস আইন অনুসারে (Press Emergency Powers Act) বঙ্গদেশে ১৯৩২ সালে সর্ব্বসমেত ৪৩টী প্রেস ও পত্রিকার নিকট হইতে জামিন চাওয়া হয়, তন্মধ্যে ২২টী প্রেস ও পত্রিকা সর্ব্বসমেত ২৪,৩০০৲ টাকা জামিন দিয়াছিল। ১৯৩৩ সালে ২১টী প্রেস ও পত্রিকার ভিতর ১৪টী প্রেস ও পত্রিকা ১৫০০০৲ টাকা জামিন দিয়াছেন ; ১৯৩৪ সালে ৮টী প্রেস ও পত্রিকার ভিতর ৬টি ৭৫০০৲ টাকা ও ১৯৩৫ সালে ৭টি প্রেস ও পত্রিকার ভিতর ২টি ১০০০৲ টাকা জামিন দিয়াছেন। প্রেস ও পত্রিকাসমূহ যত জামিন আমানত করিয়াছে তন্মধ্যে ১৮০০০৲ টাকা সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে সর্ব্বসমেত ৪৪টি প্রেস ও পত্রিকার ৪৫,৮০০৲ টাকা জামিন দিতে হইয়াছে।

এতদ্‌ভিন্ন সরকার ১৯৩২ সালে ৫৭টী সংবাদপত্রকে সর্ব্বসমেত ১৩৪ বার—

১৯৩৩ সালে ৪১টি সংবাদপত্রকে সর্ব্বসমেত ৭৫ বার
১৯৩৪ সালে ৪২টি সংবাদপত্রকে সর্ব্বসমেত ৯০ বার
১৯৩৫ সালে ২৩টি সংবাদপত্রকে সর্ব্বসমেত ৪২ বার

সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

সাধারণ আইনের বলে (পিনাল কোড) ১৯৩২ সালে ৬টি সংবাদপত্র ও ১৯৩৫ সালে ৩টি সংবাদপত্র দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ত গেল বঙ্গদেশের কথা। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের অবস্থা বঙ্গদেশ অপেক্ষা ভাল হইলেও সংবাদ-পত্রসমূহ প্রেস আইনের কবল হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। নিখিল-ভারত সংবাদিক সম্মেলনের অধিবেশনে বক্তৃতায় মিঃ এ, আর, ভাট পশ্চিমভারতের কথা বিবৃত করিয়াছেন ; 'মারহাট্টা' পত্রিকার নিকট হইতে ৩ বার জামিন চাওয়া হইয়াছে এবং একবার জামিন বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। 'কেশরী' পত্রিকাকেও জামিন দিতে হইয়াছে ও 'চিত্রশালাকে' প্রেস আইনের দরুণ বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই পত্রিকাগুলির কথা বলিয়া মিঃ ভাট বলেন আমি আর দৃষ্টান্ত দিতে চাহিনা। গত কয়েক সপ্তাহের ভিতর পশ্চিম ভারতে প্রেস আইনের কার্য্যাবলীর কথাই বলিব। তাহার পর বক্তা বলেন, ফ্রি-প্রেস সর্ব্বসমেত ৪৬০০০৲ টাকা জামিন দিয়াছিল, ঐ জামিন বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর ফ্রি-

প্রেসের প্রচার বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। সম্প্রতি 'সকল' নামে পুনার একটি দৈনিক পত্রিকার নিকট জামিন তলব করা হইয়াছে এবং নাসিকের সনাতনী পত্রিকা 'লোক-সত্তকে' (Lokasatta) জামিন আমানত করিতে হইয়াছে।

অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

গৌহাটিতে ছাত্রীদের বিপদ

সংবাদপত্রে প্রকাশিত একখানি পত্রে এই বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে যে, একশ্রেণীর লোকের গুণ্ডামির জন্য (ইহাদের মধ্যে স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরাও আছেন) গৌহাটিতে ছাত্রীদের স্কুল ও কলেজে যাওয়া বিশেষ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। স্কুলে যাইবার জন্য বালিকাদল রাস্তায় উপস্থিত হইলে, ছাত্রাবাস, রাস্তার মোড় এবং দোকান হইতে নানাপ্রকার শব্দ, শিস্ এবং প্রেম সঙ্গীতের দ্বারা তাঁহারা অভ্যর্থিত হন। নানাপ্রকার বীরত্বপূর্ণ কথা, অঙ্গভঙ্গী এবং ইঁহাদের চারিপাশে ঘুরিতে থাকা প্রভৃতিও আনুষঙ্গিকভাবে আছে।

কলেজ হোস্টেলের সম্মুখস্থ রাস্তায় কলেজের ছাত্রদের দ্বারা দুই দল ছাত্রীর এইরূপ অপমানের একটি বিশেষ বিবরণও পত্র লেখক দিয়াছেন।

এই ব্যাপার সত্য কিনা জানি না। সত্য হইলে, ইহাপেক্ষা গভীরতর লজ্জার কথা আর কিছু হইতে পারে বলিয়া আমরা জানি না। অশিক্ষিত লোকেরা এইরূপ অসভ্যতা করিলে, তাহাতে ক্ষোভের কারণ থাকা সত্ত্বেও এই মনে করিয়া কতকটা সান্ত্বনা পাওয়া যাইত যে, শিক্ষা-বিস্তার ও ভদ্রতাজ্ঞানবৃদ্ধির সহিত এইরূপ বর্ব্বরতা লোপ পাইবে। কিন্তু, যাঁহাদিগকে লোকে দেশের আশাভরসাস্থল বলিয়া মনে করে, যাঁহাদের ভদ্রতাবুদ্ধি, প্রকৃত বীরত্ব ও চরিত্রের দৃঢ়তার উপর নারীদের সহজ গতিবিধির নিরাপত্তা অনেক পরিমানে নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের নিকট হইতে এইরূপ ব্যবহার নিতান্তই মর্ম্মান্তিক। যেস্থানে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে সেখানকার সব ছাত্র বা অধিকাংশ ছাত্র কখনই এইরূপ কাপুরুষতার সমর্থক হইতে পারেন না। আশা করি তাঁহারা সংঘবদ্ধভাবে ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন এবং যাহাতে এই প্রকার অশিষ্টতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন। অন্যান্য স্থানেও ছাত্রীদের উপর এবং যে সব মহিলা বাহিরে অসঙ্কোচে চলাফেরা করেন তাঁহাদের উপর অল্প বিস্তর অশিষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে। আমরা সকল স্থানের ছাত্র, শিক্ষিত ও সাধারণ-ভদ্রব্যক্তিদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। সমাজের সাধারণ ভদ্রতাবুদ্ধি এবং নৈতিকশক্তি জাগ্রত হইলে অশিষ্ট কাপুরুষেরা কখনই এই প্রকার অসদ্ব্যবহারে সাহসী হইবে না। একথা কেহ যেন ভুলিয়া না যান যে, নারীর প্রতি ব্যবহারকে ব্যক্তি এবং জাতির সভ্যতার পরিমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ও আমাদের রাষ্ট্রিক ভবিষ্যৎ

আইন পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি সার আবদার রহিম, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ইউনাইটেড প্রেসের প্রতি-নিধির নিকট বলিয়াছেন,—

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমরা শুধু হিন্দু মুসলমান সমস্যার মীমাংসা করিতে পারি, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নূতন শাসনতন্ত্রে, রক্ষাকবচ ও সংরক্ষণের আকারে যেসমস্ত বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেগুলি অপসারিত করিতে বা অব্যবহৃত রাখিতে তাঁহারা অতিমাত্রায় আগ্রহশীল হইবেন।"

প্রসিদ্ধ সীমান্তনেতা (যাঁহাকে লোকে গুণাবলীর স্মরণে সীমান্ত গান্ধী আখ্যা দিয়াছে) আবদুল গফ্ফর্ খাঁ, সবরমতি জেল হইতে ডেরা-ইস্মাইল খানের দুইজন মুসলমান নেতাকে লিখিয়াছেন, "আমি আপনাদের অথবা আপনাদের জেলাকে কখন ভুলি নাই; **যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ভারতের অধীনতা ও দাসত্বের জন্য দায়ী তাহারই কেন্দ্র বলিয়া আপনাদের জেলার কথা আমার মনে আছে।**"

সাম্প্রদায়িক অনৈক্য, বিরোধ এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস যে আমাদের. রাষ্ট্রিক প্রগতির পথে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা, সম্ভবতঃ সে কথাটা বুঝিতে আজ আর কাহারও বাকি নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উপরে আমরা

অনেকেই উঠিতে পারি না বলিয়া এই পাপ দেশ হইতে দূর হইতেছে না।

শিক্ষক নিয়োগে সাম্প্রদায়িকতা

শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থই যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহাদের দিক হইতে বিচার করিলেও, কোন বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের সময় কোন প্রকারের সাম্প্রদায়িক নীতি কখনই শুভকর হইতে পারে না। সকল ছাত্রের পক্ষেই যোগ্যতম শিক্ষকের নিকট হইতে (তা তিনি যে সম্প্রদায়েরই লোক হউন না কেন) শিক্ষালাভের সুযোগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভের। শিক্ষালাভের সময় শিক্ষক কোন সম্প্রদায়ের লোক সেটা বিশেষ বিবেচনার বিষয় নহে; কিন্তু, ছাত্রের শিক্ষার উৎকর্ষ শিক্ষকের যোগ্যতার উপর যে বিশেষভাবে নির্ভরশীল তাহা সুনিশ্চিত। শিক্ষক কোন্ ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের লোক, শিক্ষা-প্রসঙ্গে সেটা অবান্তর হইলেও, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান যোগ্য পাওয়া গেলে, অন্যান্য চাকুরির শিক্ষকতাও না হয় সব সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার কথা উঠিতে পারিত বা কতকটা সঙ্গত হইত।

রাজসাহীর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলেজে একজন অধ্যাপকের পদ খালি হওয়ায়, উক্ত কলেজের পরিচালক সমিতি, উক্ত পদের জন্য দুইজন প্রথম শ্রেণীর হিন্দুর নাম সুপারিশ করিয়া পাঠান। এইরূপ ক্ষেত্রে, পরিচালক সমিতির মতই সরকার গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু, এখানে ইঁহাদের মত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সরকার একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমান প্রার্থীকে এই পদে নিয়োগ করিয়াছেন। ফলে, পরিচালক সমিতির দুইজন সদস্য প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন। মুসলমান প্রার্থীটি যদি হিন্দু প্রার্থীদের ন্যায় যোগ্য হইতেন, তবে অবশ্য আমাদের আপত্তির কারণ থাকিত না। পূর্ব্বে হুগলি ও প্রেসিডেন্সি কলেজেও এই প্রকারের ব্যাপার ঘটিয়াছে।

বাংলা সরকারের শিক্ষানীতি

বাংলা সরকারের শিক্ষাপরিকল্পনা সম্বন্ধে দেশের জনমত এলবার্ট হলের জনসভায় যথাযথভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা দেশের সর্ব্বপ্রকারের বিদ্যালয় প্রধানতঃ দেশবাসী জনসাধারণের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশের শোচনীয় দারিদ্র্য ও বহু প্রকারের বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যে এগুলির উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে, তাহাই ইহাদের প্রয়োজনীয়তার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ। ইহাদের কোন প্রকার সঙ্কোচ সাধনের দ্বারা দেশের কিছুমাত্র মঙ্গল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। ইহাতে উৎকর্ষ কিছু বাড়িবে কিনা, সন্দেহের বিষয়; আর বাড়িলেও বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষার নিম্নবিভাগে উৎকর্ষ অপেক্ষা প্রসারের মূল্য যে অনেক অধিক তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানের কিঞ্চিদধিক ৬১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে মাত্র ১৬ হাজার বিদ্যালয় রাখা হইবে এবং এগুলিকে দেশের মধ্যে কতকটা সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিবার চেষ্টা হইবে।

মধ্য ইংরেজী স্কুলের পরিবর্ত্তে মধ্য বাংলা স্কুল গড়িয়া তুলা হইবে। ইহার ফলে বর্ত্তমানের ন্যায় শিক্ষার নিম্নবিভাগ হইতে ছাত্রেরা উচ্চ বিভাগে যাইতে পারিবে না।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা হ্রাসের চেষ্টা হইবে, এবং সেগুলিকেও দেশের মধ্যে কতকটা সমভাবে বণ্টন করিয়া দিবার চেষ্টা হইবে। জনসংখ্যা বা স্থানের আয়তন যাহাকে ভিত্তি করিয়াই এগুলিকে বণ্টনের চেষ্টা হইবে, তাহার ফলই মারাত্মক হইবে। তাহার কারণ, দেশের সকল শ্রেণীর লোক আজও উচ্চশিক্ষার জন্য সমানভাবে ঝুঁকেন নাই এবং কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্য হইতেই প্রধানতঃ ইহাদের ছাত্র সংগৃহীত হইয়া থাকে।

কিন্তু, এই শিক্ষানীতির সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক দিক হইতেছে, ইহার পশ্চাতে যে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক নীতি রহিয়াছে তাহাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে কতকটা মক্তাবের ছাঁচে ঢালিবার এবং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলির বর্ত্তমান পার্থক্য লোপ করিবার চেষ্টা হইবে। ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়গুলি তুলিয়া না দিয়া যদি বর্ত্তমানের সাধারণ বিদ্যালয় ও ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়গুলির পার্থক্য লোপের চেষ্টা করা হয় তবে সাধারণ বিদ্যালয়গুলিকেই কিছু পরিমাণে ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে ইহাপেক্ষা ক্ষতিকর জিনিষ আর কিছু হইতে পারিবে না।

আগামী সংখ্যায় এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ধূর্জ্জটীপ্রসাদ ও অধিকার-ভেদ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

শুনেছি বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অর্ব্বাকচল্লিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার আর উত্তরচল্লিশ পৌরস্ত্রী। কথাটা সত্য হলেও আশ্চর্য্যজনক নয়। কারণ ইচ্ছানিদ্রাও সাধনা সাপেক্ষ; এবং মধ্যমশ্রেণীর রুদ্ধশ্বাস লোকারণ্যে প্রভাতী তন্দ্রার জন্য যতখানি অভ্যাস দরকার, তার পক্ষে চল্লিশ বৎসর ত নিমেষ-মাত্র বটেই, এমন কি ইতিমধ্যে রূপকথার সাহায্যে দিবাস্বপ্ন দেখাও সেই শিক্ষানবিসীরই অঙ্গ। কিন্তু মেয়েদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। গৃহস্থমাত্রেই অবগত আছেন যে শাশুড়ীর পদে উন্নীত না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির চিত্তশুদ্ধি দুর্ঘট; এবং অগ্নি-পরীক্ষাই যেহেতু সংস্কৃতির সনাতন উপায়, তাই গল্পগুজব নামক পরচর্চ্চার গুরুতর দায়িত্ব ধুরন্ধরীদের উপর ছেড়ে দিয়ে বাঙালী বধূ সেই পরাকাষ্ঠার দিকে এগোয় পাক-প্রণালীর প্রজ্জ্বলিত পথে। সে যাই হোক, এতে সন্দেহ নেই যে নভেল আমাদের অবসরবিনোদনের সাথী, এবং সেই জন্যই তার অবস্থা বাংলা কাব্যের চেয়েও শোচনীয়, প্রায় বাংলা প্রবন্ধের মতোই সঙ্গীন। কারণ অর্থবিজ্ঞানের টান-যোগান শিল্পরাজ্যেও অকাট্য; এবং স্বয়ং ভগবানই যেকালে নিরুদ্দিষ্ট আত্মপ্রকাশে অপারগ বা অসম্মত, তখন নিরপেক্ষ মৌলিকতা বাংলা উপন্যাসে নিশ্চয়ই দুর্লভ।

অবশ্য লেখক পাঠক কোনো পক্ষই ও-নিয়মের অস্তিত্ব মুখে মানেন না। দুর্মর রক্ষণশীলতা বাঙালীর মজ্জাগত. হওয়াতে আমরা আমাদের স্বকীয়তার অভাব ঢাকি স্বল্পাঙ্গ সমাজব্যবস্থার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে। কিন্তু সাধারণ জীবনযাত্রা অন্য দেশেও অবিচিত্র, আষ্টপ্রহরিক সংসারে রোমাঞ্চ চিরদিনই বিরল এবং অমানুষ বা অতিমানুষ কাল্পনিক জীব। উপরন্তু আধুনিক কালে য়ুরোপীয় ঘটনাপ্রবাহ যদি বা অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়, তবু প্রাচ্য মানুষের মনও পাশ্চাত্যের মতোই জটিল; এবং এ দেশে টলষ্টয়ের জন্মে নানাপ্রকার বাধা থাকতে পারে কিন্তু দস্তোয়েভ্স্কির অভ্যুদয় অব্যাহত হওয়াই উচিৎ। তবে আমরা সাহিত্যকে অনুশীলনের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করি না। আমাদের মধ্যে যারা গম্ভীর প্রকৃতির, তাদের চিত্তবৃত্তি ধর্ম্মানুরক্ত, এবং অন্যেরা উপজীবিকার অন্বেষণে এমনই ব্যতিব্যস্ত যে আমোদপ্রমোদ ছাড়া অপর কিছুতে মেধার অপব্যয় তাঁদের অনভিপ্রেত। তাই বাংলা দেশে মনীষী একাধিক থাকলেও মনস্বী সাহিত্যের, বিশেষতঃ মনস্বী কথা-সাহিত্যের, অত্যন্ত অনটন।

সৌভাগ্যক্রমে খ্যাতি আর শ্রেয়োবোধের তুলাদণ্ড প্রায়ই আলাদা; এবং যে-বই লিখে নির্ব্বিচার পাঠকের মন পাওয়া যায়, তাতে সাহিত্যিক বিবেক সচরাচর খুশি হয় না। সেই জন্যেই অধিকাংশ পশ্চিমী সাহিত্যসেবীই তাঁদের স্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বহুলপ্রচারকে সভয়ে দেখেন। তাঁরা প্রাণপাত ক'রে যে-শিল্পসামগ্রীর জন্ম দেন, তার উপভোগও সমান আয়াসসাধ্য হোক এইটেই তাঁদের স্বাভাবিক ইচ্ছা। তাই তাঁদের লুব্ধ দৃষ্টি সহজেই ধায় অষ্টাদশ শতকের দিকে, যখন বেশীর ভাগ মানুষই নিরক্ষর ছিলো বটে, কিন্তু যারা পড়তে জানতো, তারা অধ্যয়নকে স্বার্থসিদ্ধির ব্রহ্মাস্ত্র বা অনিদ্রানিবারণের মহৌষধ ব'লে ভাবতো না। অবশ্য সেই চিত্তোৎকর্ষ যে-আভিজাতিক অধিকারভেদ ও নিরীহ-নিগ্রহের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তার পুনরুজ্জীবনে একালের আপত্তি আছে অথবা কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ছিলো। তা হলেও গড্ডলিকা স্রোতে আত্মবিসর্জ্জনে কোনো আধুনিক লেখকই প্রস্তুত ন'ন। তাঁরা বরং নির্ব্বাসনে যাবেন তবু ভারতীর সভায় অনধিকার প্রবেশের প্রশ্রয় দেবেন না, এই তাঁদের দৃঢ় পণ। ফলত

"অন্তঃশীলা"—

শ্রীধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—

(ভারতীভবন)

সাম্প্রতিক সাহিত্যের অনেকখানিই ব্যাসকূট এবং বাকীটা শ্লেষ আর দুরুক্তি যার উদ্দেশ্য নির্ব্বোধের দুঃসাহসকে আটকানো। প্রাণীজগতে তার উপমা খুঁজলে আপনা থেকেই মনে আসে সজারু আর শামুকের কথা, অথবা সেই প্রাক্-পুরাণিক কৃকলাস-জাতির যারা বৈশিষ্ট্যের মোহে স্বভাববিচ্যুত হয়ে শেষকালে মৃত্যুবরণ করেছিল।

বলাই বাহুল্য যে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপারটা এখনো এতদূর গড়ায়নি। এই অদ্বৈতবাদের দেশে জন্মেও আমাদের সুমনা সাহিত্যিকেরা কখনো ভোলেননি যে শিল্প একটা বিনিময়-ক্রিয়া এবং ললিতকলার কল্পলোকে স্রষ্টার আসন সর্ব্বোচ্চে হলেও দ্রষ্টার স্থান তার নাতিনিম্নে। কিন্তু জাতি-গত সংস্কার শিশুশিক্ষার চেয়ে দুর্ব্বল; এবং আমাদের আধুনিক ভাবুকেরা যেহেতু পাশ্চাত্য আবহাওয়াতেই মানুষ, তাই তাঁরা সকলেই পূর্ব্বোক্ত অসামান্যতার ভক্ত। অবশ্য মাইকেলের সময়েও বিদেশী আদর্শ কবিদের অনুপ্রাণিত করতো। কিন্তু যন্ত্র-সভ্যতার কল্যাণে মামুলী মানুষের অবসর-সঙ্কোচ সে-যুগে চরমে গিয়ে পৌছোয়নি ব'লে প্রত্যাখ্যান তখনো সংসাহিত্যের লক্ষণ হয়ে ওঠেনি; কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে পরিগ্রহণই ছিল ভাব-রাজ্যের মৌল বিধান। তাই মাইকেলের অনুস্বর-বিসর্গ-বর্জ্জিত সংস্কৃত একখানা যে-কোনো অভিধানের সাহায্যেই আপামর সাধারণের বোধগম্য; অথচ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিতান্ত চল্‌তি বাংলা বহুভাষাবিদ্ পাঠকের অপেক্ষা তো রাখেই, এমন-কি একাধিক বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হলে বীরবলী সাহিত্যের গূঢ় তাৎপর্য্য অনাস্বাদিতই থেকে যায়। তার মানে এ নয় যে চৌধুরী মহাশয় হরিজন আন্দোলনের বিরুদ্ধে, তার মানে শুধু এই যে প্রমথনাথ অর্জ্জিত বিদ্যাকে কাজে লাগাতে পারেন। তাঁর আজীবন অধ্যয়ন নামের পরে কতকগুলো নিরর্থক অক্ষরের বহর বাড়িয়েই থামেনি, পাণ্ডিত্য তাঁর সক্রিয় ব্যক্তিস্বরূপের সমগ্রতাকে সমৃদ্ধতর ক'রে তুলেছে। কাজেই তাঁর রচনা স্বভাবতই সমধর্মীর মুখাপেক্ষী; এবং তাঁর প্রতিভা ও সৌভাগ্য যেহেতু অল্প বাঙালীর ক্ষেত্রেই জোটে, তাই সমসাময়িকদের কাছে তিনি যে শ্রদ্ধাঞ্জলিই পেলেন না, তা হয়তো নিরবধিকালই তাঁকে দেবে। কিন্তু তিনি যদিও পাঠকের দরদে বঞ্চিত, তবু এখনকার লেখক-মাত্রেই বোধ হয় তাঁর অনুকম্পায়ী; এবং ধূর্জ্জটিপ্রসাদ প্রমুখ যাঁদের সাহিত্যজীবন তাঁরই সংস্পর্শে বিকশিত তাঁদের মনোভাবে বীরবলী ব্যক্তিবাদের প্রকোপ অন্ততঃ আমার চোখে সুস্পষ্ট।

উপরে যা বললুম, তার মধ্যস্থতায় ধূর্জ্জটিপ্রসাদের বিপক্ষে চিন্তাচৌর্য্যের অভিযোগ আনা আমার অভিপ্রায় নয়; বরং তাঁর অত্যধিক স্বাবলম্বনেই আমি ধাক্কা খাই। কারণ আমার মতে তাঁর স্বাধীন মননক্রিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত যুক্তিসূত্রের ধার ধারে না, তিনি সাধারণতঃ ভাব থেকে ভাবান্তরে যান স্বকীয় অনুষঙ্গের পথে। ফলে তাঁর প্রবন্ধাদির সিদ্ধান্তে আমি অনেক সময়েই বাধ্য হয়ে সায় দিই বটে,—কিন্তু যে প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায়, সেখানে প্রায়ই আমার পা পিছলোয়। কারণ সাহিত্যে আমি নৈরাত্মরীতির পক্ষপাতী; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আমার আস্থা এত গভীর যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জ্ঞাপনের ব্যর্থ চেষ্টায় আমার কোনো উৎসাহ নেই; এবং অনুষঙ্গ যেহেতু নিজস্ব উপলব্ধির ধ্বংসাবশেষ, তাই তার সংসর্গ আমাকে স্বপ্নাবিষ্টই করে, নিঃসংশয় সত্যের সাক্ষাতে আনে না। সেই জন্যই আমার বিবেচনায় এই নৈপথ্য-প্রকরণ প্রবন্ধে চলেনা, রসরচনাতেই তার প্রয়োগ প্রশস্ত। কারণ রস সম্ভোগের সামগ্রী, তার স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হয়ত অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তার সংঘাতে অবিচল থাকা রসিকের পক্ষে দুষ্কর; এবং কাব্যাদি সাহিত্য যেকালে পাঠক-চৈতন্যের উদ্বোধনেই সন্তুষ্ট, তখন আত্মরতিতে কবিতার তেমন ক্ষতি হয় না, যেমন হয় সত্যসন্ধানী প্রবন্ধের। অবশ্য সত্যও বিসংবাদের আশ্রয়, তার চতুর্দ্দিকে তার্কিকের এমন ভিড় যে অনেকের বিচারে কৈবল্য লোকযাত্রার লক্ষ্যই নয়, মনুষ্যসংসার হিতবাদী। কিন্তু তাহলেও সত্যের রাজ্যে আমি স্বপ্রাধান্যের প্রয়োজন দেখিনা। হয়ত আমার মনের গঠন প্রাগৈতিহাসিক বলে আমি এখনো ন্যায় শাস্ত্রের উপরে বিশ্বাস রাখি; অন্ততঃ তার নঙর্থক নির্দ্দেশে যে অসত্যকে চেনা যায়, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কারণ স্বতোবিরোধের অনুভূতি দেহীর পক্ষে অসম্ভব; এবং আমরা সকলেই যেহেতু দেহী তাই অস্বীকার এই প্রাথমিক নিয়মটি আমাদের প্রত্যেকের

ক্ষেত্রেই অমোঘ। সুতরাং আকাশের প্রকৃত বর্ণ সম্বন্ধে যতই বাদ-বিতণ্ডা ঘটুক না কেন, আকাশ যে একই সময় নীল ও অনীল নয়, এ প্রসঙ্গে আবালবৃদ্ধবনিতা একমত।

কিন্তু ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সমাজতাত্ত্বিক; তাই অপবাদ-ন্যায়ের নেতিবচনে তাঁর মন ওঠেনা, তিনি এমন নির্ব্বিকল্প সত্য খোঁজেন যার শাসনে সমাজের বর্ত্তমান নৈরাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আসবে। কিন্তু ব্যবহারিক-উপাধি এই রকম সত্যেরই প্রাপ্য; এবং আচার আর আসক্তি হরিহরাত্মা হওয়াতে এ বিষয়ে মতান্তর সহজেই মনান্তরে গিয়ে ঠেকে। কারণ এ-ক্ষেত্রে সত্য আর নিজগুণে মর্য্যাদাবান নয়, অভিজ্ঞের অধ্যাসও তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার হয়ত দেহাতে জন্ম; হোলির এক পক্ষ আগে থেকে বিশ পঁচিশজন গ্রামবাসীর সঙ্গে ভাঙ্গের নেশায় মেতে খোল করতাল নিয়ে চীৎকার না করলে আমি হয়ত আনন্দ পাই না। কিন্তু তাতে সঙ্গীতজ্ঞ প্রতিবেশীর কান ফাটবার উপক্রম হয়, তারা তখন লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে। অথচ এখানে ন্যায়বিচারে দুপক্ষই সমবল, আমার আমোদ করার অধিকার যেমন নিঃসন্দেহ, তাদের বিরক্ত হবার হেতুও তেমনি তর্কাতীত। কাজেই বিবাদ বাধলেই তুল্যমূল্যের কথা ওঠে। প্রতিবেশীরা বলেন তাঁদের চিৎপ্রকর্ষের ওজন যেকালে বেশী, তখন আমাদের দলে ভারী মাৎলামি তাঁদের চোখরাঙানীকে মানতে বাধ্য, এবং এ-কলহে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সেই স্বল্পসংখ্যক দলেই যোগ দেন; তাঁর উচ্চতর শিক্ষাদীক্ষার অনুগ্রহে তিনি অনায়াসেই পাঠোদ্ধার সহকারে প্রমাণ করেন যে অধিকাংশ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও সাধক আমাদের মতো ইতর সাধারণ-কে দূরে রেখে তাঁদের মতো উত্তম-বিশেষকেই ভজেছেন। কিন্তু তিনি যতই সাক্ষী ডাকুন না কেন, তাঁরা যেহেতু প্রত্যেকেই আত্মোপলব্ধির গুণগানেই শতমুখ, তাই সে সকল জবানবন্দিতেই আমার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠা পায়; এবং ধূর্জ্জটিপ্রসাদের বিনয় যে পরিমাণ কমে আমি ঠিক সেই অনুপাতেই বুঝি যে তাঁর যুক্তিতে ফাঁক না থাকলে তিনি প্রামাণ্য সম্বন্ধে অতখানি নিশ্চয় হতে পারতেন না। সেই জন্যই "আমরা ও তাঁহারা"র বিজ্ঞানসম্মত মতামতেও আমি কান পাইনি এবং "চিন্তয়সি"র সুচিন্তিত তত্ত্বসমূহ আমার প্রতিবাদ জাগিয়েছে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আছে বলেই জানি যে ওই বই দুটির লেখক দাম্ভিক নন, যথার্থ মানব-প্রেমিক; সারা জীবন হিতৈষণার চেষ্টায় কাটিয়ে আজ যদি তিনি আমার মঙ্গল সম্বন্ধে আমার চেয়েও বেশী বোঝার দাবি করেন, তবে সে দাবিকে না মানতে পারি, কিন্তু তাতে ধৈর্য্য হারানো নিতান্ত মূর্খতা।

আসলে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ বুদ্ধিমান হলেও বুদ্ধিসর্ব্বস্ব নন, তিনি হৃদয়বান ও আশুচেতন। সেই জন্যই তাঁর সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাসের নায়ক খগেনবাবু শেষ পর্য্যন্ত আর অগাধ পাণ্ডিত্যে তুষ্ট রইলেন না, প্রজ্ঞাপারমিত সমর্পণেই আত্মসমর্পণের ছেদ টানলেন, কিন্তু সমাপ্তিটি যদিও ভাবপ্রধান, তবু "অন্তঃশীলায়" ভাবালুতার নামগন্ধ নেই। জ্ঞান যে একটা কৃত্রিম প্রক্রিয়া, তার নির্দ্দেশে যে পরমার্থের সাক্ষাৎ মেলে না, এবং বুদ্ধিই যে সর্ব্বত্র বিরোধ বাড়ায় এই বের্গ্‌সনী সিদ্ধান্তে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ পৌঁচেছেন বুদ্ধিরই পরামর্শে, আবেগের তাড়নে নয়। কিন্তু বুদ্ধির অবৈকল্য কিংবদন্তী মাত্র; অন্তত-পক্ষে সব বুদ্ধিজীবীই বৈনাশিক নন। মানুষের মধ্যে যেমন দেহ ও মনের দ্বিত্ব আছে, মনকে যেমন ভাব ও চিন্তায় ভাগ করা যায়, তেমনি বুদ্ধিও দ্বিমুখী, এবং তার একটা বিকলনে ব্যস্ত, অন্যটা সঙ্কলনে নিরত। ধূর্জ্জটিপ্রসাদের বুদ্ধি এই শেষ ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু সঙ্কলন ন্যায়াতিরিক্ত কর্ম্ম, যে-সমগ্র-তাকে ভগ্নাংশের সংযোগে পাওয়া যায় না, তা অখণ্ড ভূমার মতো অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয়, বুদ্ধি শুধু তার দূত, তার সখা বোধি অথবা মরমী অনুভূতি। সম্ভবত সেই জন্যেই এই অন্ত-রঙ্গ উপন্যাসে বাস্তবতার বহিরাশ্রয় নেই; প্রাতিভাসিক প্রত্যক্ষজগৎ বিচ্ছিন্ন বুদ্‌বুদের মতো—অন্তঃশীল চৈতন্যস্রোতের উপরে ভাসমান। উপরন্তু চৈতন্য যেহেতু চিরদিনই ব্যক্তি-প্রভব এবং অনুভূতি সর্ব্বত্রই স্বোহংবাদী, তাই আপাতত খগেনবাবুই যদিও গল্পটির নায়ক, তবু প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তাই পুস্তকখানির মুখ্যপাত্র। কিন্তু ধূর্জ্জটিপ্রসাদের মন এমন অকপট, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ এত ব্যাপক, তাঁর অনুসন্ধিৎসা এরূপ মর্ম্ম-স্পর্শী যে এই আত্মচরিতও আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতীক হয়ে উঠেছে। খগেনবাবু ও তাঁর পার্শ্বচরিত্রগুলি আমাদের সকলেরই প্রতিভূ; তাঁদের মতোই আজকের মানুষ বিশেষ

ও সাধারণ, মস্তক ও হৃদয়, প্রেম ও প্রভুত্ব ইত্যাদি উভয়-সঙ্কটের সম্মুখীন ; এবং এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে আমরা অনেকেই তাঁদের বিপরীতগামী বটে, কিন্তু তাঁদের মতো নির্দ্বন্দ্ব হওয়াই যে আমাদের কাম্য, তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। সেই জন্যেই কথাসাহিত্য হিসেবে বইখানিতে দু চারটে স্খলন পতন ত্রুটি থাকলেও, অন্তঃশীলা-কে আমি স্মরণীয় মনে করি। চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধের মত প্রকাশের সময়ে যে স্বকীয়তার জন্যে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ পাঠকের সমর্থন হারান, এখানে সেই ঐকান্তিক রীতিই পুস্তকটির মূল্য বাড়িয়েছে। কারণ সত্য যেমন সামান্য না হলে অগ্রাহ্য, তেমনি সার্থক অভিজ্ঞতা মাত্রেই প্রামাণ্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, তার বিরুদ্ধে নাস্তিকের প্রতর্ক খাটেনা, তাকে সবিনয়ে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

এতক্ষণ যে-বাক্‌বিস্তার করলুম, তার অনেকখানিই হয়ত অনাবশ্যক, কিন্তু তার ফলে এ কথাটা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে "অন্তঃশীলা" ঠিক শিশুপাঠ্য উপন্যাস নয়, বইখানি ভাবুকের জন্য লেখা এবং ভাবুকের দ্বারা। কিন্তু তা হলেও এর আখ্যানভাগ চমৎকার, এবং সাধারণ কথক যেখানে এসে থামেন, সেইখানেই ধূর্জ্জটি প্রসাদের প্রস্তাবনা।

প্রথম পৃষ্ঠাতেই খগেনবাবুর চরম ট্র্যাজিডির উপরে যবনিকা নামে ; তাঁর আত্মঘাতিনী স্ত্রী সাবিত্রীর সংকার শেষ ক'রে তিনি আশ্রয় নেন রমলাদেবীর বাড়িতে যাঁর কুমন্ত্রণাই সাবিত্রীকে আত্মহত্যার পথে চালিয়েছিলো। এই থেকে যে সম্পর্কের সূত্রপাত হয়, তারই অন্তঃপ্রেরণায় খগেন-বাবুর অহঙ্কৃত অবিদ্যা কাটে এবং তিনি ক্রমে ক্রমে বোঝেন যে সাবিত্রীর মৃত্যুর একটা ঘৃণ্য দিক থাকলেও আসলে সে দুর্ঘটনাটা হচ্ছে, তারই অমানুষিক আদর্শের সঙ্গে মনুষ্যধর্ম্মের সাংঘাতিক সংঘাত। তাঁর আদর্শনিকষে রমলাদেবীই খাঁটি সোনা আর সে নিজে রাংতা, সাবিত্রীর অবচেতনা এই সত্যটাকে অস্পষ্টভাবে জেনেছিলো বলেই তাঁদের দাম্পত্য জীবন বিষিয়ে ওঠে ; খগেনবাবুর মাসতুতো বোন যার সম্বন্ধে ঈর্ষ্যাই এই দারুণ দ্বন্দ্বের প্রকাশ্য কারণ, বস্তুত সে বেচারা উপলক্ষ্যমাত্র, নিতান্ত নগণ্য ও অতিশয় নিরপরাধ। সুতরাং খগেনবাবু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, প্রথমটা রমলাদেবীর সংসর্গ থেকে পালিয়ে এবং শেষকালে সুপ্রাচীন সাধকী পদ্ধতিতে বিপদকে বিঘ্নকে কায়মনোবাক্যে মেনে নিয়ে। ফলে তাঁর ভারসাম্যহীন বুদ্ধিগত বিরস জীবন হঠাৎ অধ্যাত্ম সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে,—শুধু তাঁর একলার নয়, রমলা দেবী ও তাঁর পরম ভক্ত আত্মত্যাগী সুজনেরও ; এবং তাঁরা তিন জনেই এই যন্ত্রঘর্ঘরিত বিংশ শতাব্দীতে পুনরাবিষ্কার করেন যে বিদেহ-মিলন কেবল মরমীদের অসার স্বপ্ন নয়, দেহাত্মবাদী সাম্প্রতিক মানুষও সে অঘটন সংঘটনে সিদ্ধহস্ত। এই অদ্বৈত-সিদ্ধির পরে তাঁরা সকলে সংস্কারমুক্ত হন কিনা, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার কোনও সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেন নি, তবে আমার বিশ্বাস যে অতঃপর তাঁদের অঙ্গ থেকে সমাজবন্ধনের নাগপাশ খ'সে পড়বে, এই রকম একটা ইঙ্গিতই "অন্তঃশীলা"র উপসংহারে বর্ত্তমান।

আমার সারসংগ্রহে "অন্তঃশীলা"কে হয়ত রূপকের মতোই দেখাচ্ছি ; তাই পরিশেষে বলা দরকার যে পুস্তকখানির দার্শনিক ভূমিকা যাই হোক না কেন, গল্পটি উপাদেয় এবং চরিত্রগুলি জীবন্ত। তবে এ উপাখ্যানের সম্পূর্ণ রস পাবেন তাঁরাই, আধুনিক পাশ্চাত্য কথাসাহিত্য যাঁদের নখদর্পণে। কারণ এ-কাহিনীতে ঘটনা বৈচিত্র্য নেই, অবস্থান পরিকল্পনা কোনো অব্যর্থ পরিণতির ধার ধারেনা, একটা সুচিন্তিত প্লটকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে ফুটিয়ে তোলা লেখকের উদ্দেশ্য নয়, তিনি চান দুটি চরিত্রের বিকাশ ও বৃদ্ধি দেখাতে। সুতরাং নভেলের সংজ্ঞা সম্বন্ধে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ আঁদ্রে মোরোয়ার সঙ্গে একমত ; তাঁরা দুজনেই ভাবেন যে সাবেকী দৃষ্টান্তে কতকগুলো ছাঁচে-ঢালা প্রতিমার পুতুলনাচে জীবনের অনুকরণ আধুনিক ঔপন্যাসিকের কাজ নয়, তার কর্ত্তব্য স্বসমুখ পাত্র পাত্রীর বিবর্ত্তনের ছবি আঁকা। এই চেষ্টায় তিনি বিশেষ সাফল্য পেয়েছেন। অবশ্য লেখকের সঙ্গে খগেনবাবুর জীবন-গত সাদৃশ্য না থাকলেও, চরিত্রগত ঐক্য যে খুব বেশী, তা পূর্ব্বেই বলেছি ; এবং তাই হয়ত এই চিত্রের জন্য অতি-প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য নয়। কিন্তু রমলা দেবীর মত গতানু-গতিক বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা সত্যই বিস্ময়কর। এই দিক থেকে দেখলে বইখানি একেবারে বাহুল্যবর্জ্জিত ; কারণ আলেখ্যের কোন রেখাই নিরুদ্দিষ্ট নয়, সকল আচরণই সার্থক, চরিত্রটি যেখানে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, সেইখানেই পুস্তকের

পরিসমাপ্তি। খগেনবাবুর চিত্র সর্ব্বত্রই বিশ্বাস্য। ধূর্জ্জটি-প্রসাদের পাঠাভ্যাসের প্রসাদে তিনি মাঝে মাঝে হয়ত একটু ভারাক্রান্ত; কিন্তু লেখকের অন্যান্য রচনার এই দোষটি এখানে গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তাদের সম্বন্ধে নায়কের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা কোথাও অসামঞ্জস্য আনেনি, এমন কি তত্ত্বসঙ্কুল উদ্ধারগুলোও চরিত্র-চিত্রণেরই উপাদান জুগিয়েছে। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ খগেনবাবুর মারফতে আমাদের জানিয়েছেন যে প্রুস্‌ৎ, জয়েস, ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ ইত্যাদি অন্তর্মুখীন ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত। সে খবর না পেলেও তাঁর আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের ভুল ঘটতনা। কিন্তু তা হলেও "অন্তঃশীলা" বাংলা উপন্যাস, এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে একা ধূর্জ্জটিপ্রসাদই বোধ হয় এই উপন্যাস প্রণয়নে সক্ষম। কারণ, অর্জ্জিত বিদ্যায় যদিও তিনি বৈদেশিক, তবু তাঁর প্রবৃত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে বিশুদ্ধ স্বদেশী; এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রগাঢ় বটে, কিন্তু তিনি যে স্বভাবতই বিশ্লেষণ বুদ্ধির অনুর্ব্বর মার্গের প্রতিকূল, তার ভূরি প্রমাণ "অন্তঃশীলা"র প্রতি পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। সেই জন্যেই আধুনিক কাল তাঁর কথকালির প্রশস্তি গেয়েই থামবে, তাঁর মতো দু নৌকায় পা দিয়ে উভয় সঙ্কট পেরিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

শেষের কবিতা

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১

শেষের কবিতা শেষের
দিনেতে লেখা,
ললাটে তাহার জয়যাত্রার
টীকাটী আঁকা।

২

যত স্মৃতি কথা সোনার স্বপন
মনেতে জাগে,
চলার পথের পথিক আজিকে
বিদায় মাগে।

৩

জীবনের গান কোথা হ'ল সুরু
তাহা না জানি,
শেষের গানটী গাওয়া হয় হবে
চেতনা মানি।

৪

জীবনদেবতা একি কর খেলা
হৃদয় নিয়া?
বিরামবিহীন একি অপরূপ
তোমার চাওয়া!

শরৎচন্দ্রের ষষ্টিতম জন্মদিন

ষাট বছর আগে ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ষষ্টিতম জন্মদিনে আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। এই অভিনন্দন শুধু আমাদের তরফ থেকে নয়। বিচিত্রার পাঠকদের তরফ থেকেও। শরৎচন্দ্রের নূতন নূতন রচনার সঙ্গে পাঠকের প্রথম পরিচয় আজকাল হয় বিচিত্রারই মধ্যবর্ত্তিতায়। তাই সমগ্র বাংলাদেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্ঘ্য আমরা এই শুভ উপলক্ষে শরৎচন্দ্রেব নিকট নিবেদন করি।

কিছুদিন যাবৎ শরৎচন্দ্র মাথার রোগে একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। সমগ্র দেশবাসীর কল্যাণকামনায় তিনি শীঘ্রই রোগমুক্ত হ'য়ে উঠুন, ভগবানের নিকট আমাদের এই ঐকান্তিক প্রার্থনা। এই রোগের মধ্যেই বিচিত্রার পাঠকদের জন্য তিনি নূতন উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। আশা করি তিনি একটু সুস্থ থাকলে আমরা তাঁর উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আগামী মাসে পাঠক পাঠিকাদের উপহার দিতে পারব।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

বাঙালী পরিচালিত এই হিন্দুস্থান বাংলাদেশের গৌরব;—একথা বল্‌লে বেশি বলা হয় না। এই হিন্দুস্থানের উন্নতিতে জাতীয় উন্নতি, এর পতনে জাতির পতন, একথা উপলব্ধি করতে বেশি বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, এবং যত না আশ্চর্য্য তার চেয়েও বেশি লজ্জার বিষয়, জনকয়েক ঈর্ষ্যাপরায়ণ ব্যক্তি গোপনতার অন্তরাল থেকে এই হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসার বাণ নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করেছে। অবশ্য আমরা আশা করি, এবং শুধু আশা কেন,—আমরা এবিষয়ে সুনিশ্চিত যে এতে হিন্দুস্থানের কিছু আসবে যাবে না,—গত সাতাশ বছরের অদম্য অধ্যবসায় সুদক্ষ পরিচালনা এবং চমকপ্রদ উন্নতির ফলে দেশের জাতীয় চেতনার উপর হিন্দুস্থান এমনই একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

কুৎসাগুলোর আলোচনার মধ্যে আমরা যেতে চাই না।—সেগুলো ঘৃণ্য। তবে দু একটা কথায় হাসি পায়। হিন্দুস্থানের সম্পত্তি নাকি সব সাধারণ-অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের নামে বেনামী করা আছে! নলিনীরঞ্জনের মাইনেটা না-কি বেজায় বেশি! নলিনীরঞ্জনের মাসিক বেতন কত আমরা জানি না, তবে এটা জানি যে হিন্দুস্থানের ব্যয়হার (Expense ratio) বেশ কম। নলিনীরঞ্জনের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য দেশের যে প্রভুত উপকার সাধিত হ'চ্ছে, তার জন্য তাঁকে যথোচিত পুরস্কার দিতে দেশ কখনো কুণ্ঠিত হ'বে না।

আমরা জানি হিন্দুস্থানের বীমাকারীদের স্বার্থের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের ষোল-আনা দৃষ্টি আছে। বছরে বছরে বীমাকারীদের যে বোনাস দেওয়া হয় সেইটেই তার প্রমাণ। সাধারণ অংশীদারদের অবশ্য এখন কিছু লভ্যাংশ দেওয়া হ'চ্ছে না। কিন্তু তার কারণ এ নয় যে লাভ কিছু হ'চ্ছে না, তার কারণ এই যে হিন্দুস্থানে অংশীদারদের টাকা আর বীমাকারীদের টাকা আলাদা রাখা হয়। লভ্যাংশ যা থাকে, তার অঙ্কটা বেশ বড় হ'লেও বিশেষ অংশীদারদের দাবি মেটাতেই তা খরচ হ'য়ে যাচ্ছে, সাধারণ অংশীদারদের জন্য কিছু থাক্‌ছে না। আশা করা যায় ১৯৩৭ সালের মধ্যে এই বিশেষ অংশীদারদের দাবি সব মিটে যাবে। তখন সাধারণ অংশীদারদের মধ্যে বিতরণের জন্য লভ্যাংশ থাকবে। সাধারণ অংশীদারদের লভ্যাংশ দেওয়া না হ'লেও ত সেয়ারের বাজারে হিন্দুস্থানের সেয়ারের কাট্‌তি কিছু কম নয়।

১৯১২ সালে যে বীমাকোম্পানিতে মোট চল্‌তি কাজ

ছিল আনুমানিক সাতাত্তর লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার, সেই কোম্পানিতে ১৯৩৪ সালে মোট চলতি কাজ দেখা যায় আট কোটি পঁচাশী লক্ষ একাত্তর হাজার টাকার। এর উপর কিছু বলবার আছে?

মঞ্জরী দাস গুপ্ত

এবার ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল—এই মেয়েটি, বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকারা তা' জানেন। কয়েকদিন আগে মাত্র দু'দিনের জ্বরে মেয়েটি ইহলোক ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। শুধুই যে লেখাপড়ায় সে ভাল ছিল তা' নয়, চরিত্রের কোমলতায় ও মাধুর্য্যে সে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব শিক্ষয়িত্রী সকলের মনোহরণ করেছিল। আমরা তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা নিবেদন করি। অকালে এই যে ফুলটি ঝরে গেল, এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কিছু হ'তে পারে না; এর জন্য দেশ যে কি হারালো, তার হিসাব কেউ করবেও না, করার প্রয়োজনও নেই। মঞ্জরীর আত্মার শান্তি হোক!

পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা

কালীঘাটের মন্দিরে বলি নিবারণের জন্য পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা গত ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে অনশন ব্রত গ্রহণ করছেন। পূজার জন্য নৃশংস জীব-হত্যা উন্নত মানুষের নীতিবোধেও বাধে, ধর্ম্মবোধেও বাধে। অথচ এই আচরণ আজও যে কেমন করে চলে আসছে তা ভাবলে হিন্দুর সনাতনী মনোভাবকে দোষারোপ না করে পারা যায় না। বর্ত্তমান যুগের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা সকলেই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মহামহোপাধ্যায়, একবাক্যে বলিদান-প্রথাকে ধর্ম্মবিগর্হিত বলে ঘোষণা করেছেন। তথাপি এই বলিদান প্রথা নিবারণের জন্য পণ্ডিত রামচন্দ্রের মত মহাপ্রাণ যুবককে মরণব্রত গ্রহণ করতে হ'য়েছে, এটা হিন্দুধর্ম্মাচারীদের পক্ষে লজ্জার কথা। পণ্ডিত রামচন্দ্রের জীবন থাকতে যদি এই বলিদানপ্রথা পরিহার করা হয়, এবং এত বড় একজন মহাপ্রাণ যুবকের প্রাণরক্ষা হয়, তবেই বল্‌ব যে হিন্দুদের ধর্ম্মবোধ আছে এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ আছে।

Les Amis des Paris

গত ৩০শে জুলাই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চন্দ্রের বাড়ীতে একটা বৈঠকে "Les Amis des Paris" নামে একটি সম্মিলনী গঠিত হয়, উদ্দেশ্য ফরাসীদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে ভাববিনিময়ের সাহায্যে একটী যোগসূত্র স্থাপন করা। এই সম্মিলনীর ভিতরকার অনুপ্রেরণা এসেছে জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক সিলভাঁ লেভির নিকট থেকে। তাঁরই ইচ্ছানুসারে কলিকাতার ফরাসী বাণিজ্য-পরিদর্শক লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত এম্‌-বোনো (M. M. Bonnaud) ফরাসী দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যে সব ভারতবাসী গিয়েছিলেন তাঁদের নিকট আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছিলেন। কলিকাতাকেই এই সমিতির প্রধান কেন্দ্রস্থল করা হ'বে, স্থির হ'য়েছে,—এবং ডাক্তার কালিদাস নাগ নিযুক্ত হ'য়েছেন এঁর কর্ণধার। আমাদের বিশ্বাস ডাক্তার নাগের সুদক্ষ পরিচালনায় এই সম্মিলনী ক্রমশঃ সার্থকতা লাভ করবে।

আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময়ের যাঁরা অনুরাগী, মুসোঁ বোনো, ডাক্তার নাগ ও শ্রীযুক্ত চন্দ্র তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত চন্দ্র চন্দননগরের অধিবাসী এবং সেইখানেই শিক্ষালাভ করেন,—এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী ভাষার অধ্যাপক। তাঁরই বৈঠকখানায় এই সমিতির প্রতিষ্ঠানের জন্য সেদিন উপস্থিত ছিলেন, ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকীল, ডাঃ প্রবোধ বাগচী, ডাঃ রাম ভট্টাচার্য্য, ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ, ডাঃ সুশীল মিত্র, ডাঃ সহায়রাম বসু, ডাঃ এস্‌ চক্রবর্ত্তী, মিঃ যতীন চক্রবর্ত্তী, ডাঃ বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ডাঃ এস্‌ চক্রবর্ত্তীকে এই সমিতির পরিচালনা প্রণালী ও নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করার ভার দেওয়া হ'য়েছিল। এই নিয়মাবলীর প্রথম খস্‌ড়া গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত চন্দ্রের বৈঠকখানায় আলোচিত হ'য়েছে। যথাকালে তা' প্রকাশিত হ'বে। আমরা আগ্রহের সহিত এই সমিতির কর্ম্মজীবন লক্ষ্য করব।

বিচিত্রার শততম সংখ্যা

আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা বিচিত্রার শততম সংখ্যা। মানুষের জীবনে শতবর্ষের আয়ু আজকাল বিরল; মাসিক পত্রের জীবনেও শত মাসের আয়ু প্রায় সেইরূপই। সুতরাং এই শততম সংখ্যায় বিচিত্রার পক্ষে আশ্বাস এবং আনন্দের কারণ বর্ত্তমান আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই উপলক্ষ্যে প্রথমে মঙ্গলময় ভগবানের, এবং তৎপরে আমাদের পাঠক ও হিতৈষিগণের আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা আমরা ঐকান্তিক চিত্তে কামনা করি।

কার্ত্তিকের বিচিত্রা আগামী ৯ই আশ্বিন প্রকাশিত হবে; এবং উক্ত সংখ্যার জন্য ৪ঠা আশ্বিন পর্য্যন্ত নূতন বিজ্ঞাপন নেওয়া চল্‌বে।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at the Sahitya Bhaban Press, 26, Sitaram Ghose Street, and published by the same from 27-1, Fariapooker Street, Calcutta.

পদ্মার কূলে (রঙিন উড্-কাট)

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নবম বর্ষ, ১ম খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৪২ | ৪র্থ সংখ্যা

নিঃস্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা উৎসবের দল !
অশোক তরুতল
অতিথি লাগি রাখেনি আয়োজন।
হায় সে নির্দ্ধন
শুকানো গাছে আকাশে শাখা তুলি'
কাঙাল সম মেলেছে অঙ্গুলি ;
সুরসভার অপ্সরার চরণঘাত মাগি'
রয়েছে বৃথা জাগি'॥

আরেক দিন এসেছ যবে সেদিন ফুলে ফুলে
যৌবনের তুফান দিল তুলে।
দখিন বায়ে তরুণ ফাল্গুনে
শ্যামল বনবল্লভের পায়ের ধ্বনি শুনে'
পল্লবের আসন দিল পাতি' ;
মর্ম্মরিত প্রলাপ-বাণী কহিল সারারাতি॥

যেয়ো না ফিরে, একটু তবু রোসো,
নিভৃত তার প্রাঙ্গণেতে এসেছ যদি বোসো।
ব্যাকুল তার নীরব আবেদনে
যেদিন গেছে সেদিনখানি জাগায়ে তোলো মনে।
যে দান মৃদু হেসে
কিশোর করে নিয়েছ তুলি' পরেছ কালোকেশে,
তাহারি ছবি স্মরিয়ো মোর শুকানো শাখা আগে
প্রভাতবেলা নবীনারুণরাগে।
সেদিনকার গানের থেকে চয়ন করি' কথা
ভরিয়া তোলো আজি এ নীরবতা॥

২৭ ভাদ্র ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হস্তলিখিত রবীন্দ্রপরিচয় পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার
(১৩৪২) জন্য লিখিত।
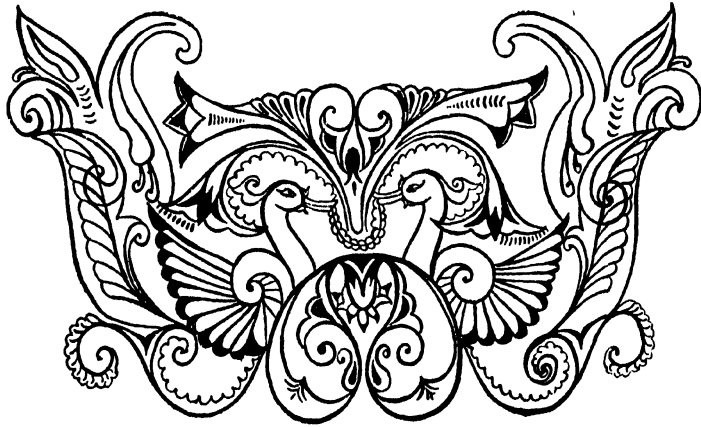
পূজায় পশুবলি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

আশ্বিনের বিচিত্রায় "নানাকথার" মধ্যে "পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা" শীর্ষক আপনারা যে মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন, "পূজার জন্য নৃশংস জীবহত্যা উন্নত মানুষের নীতিবোধেও বাধে, ধর্ম্মবোধেও বাধে।" যিনি "উন্নত মানুষ" তিনি পূজার জন্য জীবহত্যা করিবেন না, নিজের রসনা তৃপ্তির জন্যও জীবহত্যা করিবেন না। কিন্তু যিনি উন্নত মানুষ নহেন,---রসনা তৃপ্তির জন্য যিনি নিত্য জীবহত্যা করিয়া থাকেন,—তিনি পূজার জন্য জীবহত্যা করিবেন কি না, ইহাই সমস্যা। হিন্দুধর্ম্মে এই সমস্যার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়াছে যে, যিনি নিজ রসনা তৃপ্তির জন্য জীবহত্যা করিতে পশ্চাৎপদ নহেন, তিনি পূজার জন্য জীব হত্যা করিবেন। হিন্দুধর্ম্ম ইহাও বলিয়াছেন যে, পূজা ভিন্ন অন্যত্র জীবহত্যা,—কেবলমাত্র নিজ রসনা তৃপ্তির জন্য জীবহত্যা—পাপকর্ম্ম। এই বিধানের ফল কিরূপ হয় তাহা বিবেচনা করিবার বিষয়। যিনি উন্নত মানুষ তিনিত জীবহত্যা হইতে সম্পূর্ণ বিরত রহিলেন। যিনি উন্নত নহেন, তিনি কেবলমাত্র পূজার জন্য জীবহত্যা করিয়া মাংস ভোজন করিলেন, অপর কোনও কারণে জীব হত্যা হইতে বিরত হইলেন। ফলে সমগ্র জীব হত্যার পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। আজকাল বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে "বৃথা" মাংসভোজন খুব প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে পূজায় বলি দেওয়া ভিন্ন অন্য মাংস প্রায় কেহই গ্রহণ করিতেন না। "নৃশংস জীবহত্যা" তখন বেশী হইত, না, এখন বেশী হয়? এখন অলিতে গলিতে মাংসের দোকান তাহার পরিচয় দিতেছে। একজন বিহারী ভৃত্যকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম সে মাংস খায় কি না। সে বলিল, "যব্ দেবীকা পাস্ খাসী চঢ়াতা হ্যায়, ওই মাস্ খাতা হ্যায়। দুসরা মাস নেহি খাতা হ্যায়।" অর্থাৎ কালে-ভদ্রে মাংস খায়, সাধারণতঃ খায় না। একজন নেপালী ব্রাহ্মণকে (সে মালীর কার্য্য করে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সেও এই কথা বলিল। হিন্দু মা-কালীর নিকট পাঁঠাবলি দেয় সত্য। কিন্তু ভোজনের জন্য জীবহত্যা হিন্দুর জন্য বেশী হয়, না অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য বেশী হয়? অহিংসা-মূলক বৌদ্ধধর্ম্ম যে সকল দেশে প্রচলিত (ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, তিব্বত) সেই সকল দেশে ভোজনের জন্য যে পরিমাণে জীবহত্যা হয়, তাহার তুলনায় হিন্দুদের দ্বারা জীবহত্যা হয় অনেক কম।

কথা এই যে, অপর বিষয়ের ন্যায়, জীবহত্যা বিষয়েও হিন্দুধর্ম্মে সকল মানবের জন্য এক ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই,... অধিকারীভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। উচ্চ অধিকারী মাংস ভোজন করিবে না, জীবহত্যা করিবে না। নিম্ন অধিকারী মাংস ভোজন হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিতে পারেনা, তাহার প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল, মধ্যে মধ্যে সে মাংস ভোজন করিবে। তাহাকে বলা হইল—"তুমি যদি বলির মাংস ভিন্ন অন্য মাংস ভোজন কর তাহা হইলে তোমার পাপ হইবে।" ইহাতে তাহার মাংস-ভোজনপ্রবৃত্তি যথেষ্ট পরিমাণে সংযত হইল। পূজাতে বলি দিবে, ইহার উদ্দেশ্য অন্যত্র জীবহত্যা করিবে না। যাহার প্রবৃত্তি খুব প্রবল, তাহাকে নিবৃত্তি অভিমুখে লইয়া যাওয়াই এই বিধানের অভিপ্রায়।

যে ব্যক্তি নিজ রসনা তৃপ্তির জন্য যথেচ্ছভাবে জীবহত্যা করিতে অথবা মাংস ভোজন করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহার প্রকৃতি নিষ্ঠুর হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট পশুবলি দিয়া, ঈশ্বরের প্রসাদ মনে করিয়া মাংস ভোজন করে, তাহার প্রকৃতি তত বেশী নিষ্ঠুর হয় না। এ জন্য হিন্দুধর্ম্ম বলে যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির পাপ বেশী।

কেহ কেহ বলেন, "জীবহত্যা অন্যায় কর্ম্ম ইহা স্বীকার

করি ; কিন্তু ঈশ্বরের সম্মুখে, বা ঈশ্বরের নামে জীবহত্যা করা কুসংস্কার। ইহাতে বেশী পাপ হয়। ইহাতে ঈশ্বরকে অপমান করা হয়।" কিন্তু একথা সত্য নহে। ইহা বলা যায় না যে, কালীমূর্ত্তির সম্মুখে যে জীবহত্যা হয়, তাহাই ঈশ্বরের সম্মুখে হয়, অন্যত্র যে জীবহত্যা হয়, তাহা ঈশ্বরের সম্মুখে হয় না। যে যাহা করে সকলই ঈশ্বর দেখিতে পান,...

For God's all seeing eye surveys

Thy inmost thoughts, thy secret ways.

অতএব কালীমূর্ত্তির সম্মুখে জীবহত্যা করিলে বেশী পাপ হয়, কারণ তাহা ঈশ্বরের সম্মুখে হয়, অন্যত্র জীবহত্যা করিলে কম পাপ হয়, কারণ তাহা ঈশ্বরের সম্মুখে হয় না,...ইহা স্বীকার করা যায় না। ঈশ্বরের নামে জীবহত্যা করিলে বেশী পাপ হইবে ইহাও সত্য নহে। যে ব্যক্তি মনে করে (হয়ত সে ভ্রান্ত) যে ঈশ্বর-প্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থে ছাগবলির ব্যবস্থা আছে, অতএব আমি ছাগবলি দিতেছি ; যে মনে করে রামপ্রসাদ সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি সাধক যে ভাবে পূজা করা সমর্থন করিয়াছেন, আমি সেইভাবে পূজা করিতেছি,... তাহার পাপ বেশী হইবে ? না, যে ব্যক্তির ছাগমাংস মুখরোচক লাগে কেবল এই কারণে জীবহত্যা করে, তাহার পাপ বেশী হইবে ?...নিশ্চয় শেষোক্ত ব্যক্তির।

অতএব হিন্দুর পূজায় পশুবলি প্রথা থাকার ফলে, মোট জীবহত্যা হিন্দুদের মধ্যে কম হয় ; কেবল উদর-তৃপ্তির জন্য জীবহত্যা করা অপেক্ষা পূজায় পশুবলি দিলে পাপ কম হয়।

আমি যে সকল কথা বলিলাম তাহা আমার কল্পনা-প্রসূত নহে। শাস্ত্রে এই সকল কথা আছে। দেবী ভাগবতে বলা হইয়াছে,

মাংসাশনং যে কুর্ব্বন্তি তৈঃ কার্য্যং পশুহিংসনম্।

৩।২৬।৩২

"যাহারা মাংসভোজন করিবে তাহারা পূজায় পশু বলি দিবে।"

ন হি কৃৎস্নাঃ বেদাঃ তথা তদ্বোধিতাঃ যজ্ঞাশ্চ পুরুষং হিংসায়াং প্রবর্ত্তয়ন্তি, কিন্তু পরিসংখ্যা বিধিনা নিবৃত্তিম্ এব বোধয়ন্তি।

(মহাভারত অনুশাসন পর্ব, ১১৫ অধ্যায় নীলকণ্ঠের টীকা)

"বেদসকল এবং বৈদিক যজ্ঞসকল মানবকে হিংসাতে প্রবর্ত্তিত করে না ; কিন্তু পরিসংখ্যা বিধির দ্বারা নিবৃত্ত করে।" (যজ্ঞ ভিন্ন অন্যত্র পশুবধ পাপ কার্য্য,...অতএব অন্যত্র পশুবধ করিবে না,...ইহা পরিসংখ্যা বিধি)।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

যৎ করোষি যৎ অশ্নাসি যৎ জুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

"যাহা ভোজন করিবে * * * তাহা আমাকে অর্পণ করিবে।" অতএব যে ব্যক্তি মাংসভোজন করিবে তাহার কর্ত্তব্য পূর্ব্বে সেই মাংস নিবেদন করা। কালীপূজায় পশুবলি দেওয়ার অর্থ,...মাংস নিবেদন করা।

করুণাময় ভগবান কেবল উত্তম অধিকারীর সাত্ত্বিক পূজাই গ্রহণ করেন ইহা যথার্থ নহে। তিনি নিম্ন অধিকারীর রাজসিক পূজা, তাহার নিবেদিত পশুমাংসও গ্রহণ করেন। কারণ তিনি বলিয়াছেন,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং

"আমাকে যে ব্যক্তি যে ভাবে পূজা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি।"

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ

গীতা ১৬।২৪

"কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।"

বলা বাহুল্য কালীপূজায় পশুবলি প্রদান করিবার স্পষ্ট ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। সে ব্যবস্থার ফলে যে মোট জীবহত্যা কম হয় এবং মাংস ভোজনকারীর পাপ কম হয়,—ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

যাঁহার উদ্দেশ্য হইবে সমাজে জীবহত্যা কমাইয়া দেওয়া, এবং মাংস ভোজনকারীর পাপ লঘু করা, তিনি সমাজে এই বিশ্বাস দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিবেন যে, পশুমাংস ভোজন করা অন্যায়, যদি কেহ একান্ত মাংস ভোজন হইতে বিরত হইতে অক্ষম হন তাহা হইলে তিনি পূজায় পশুবলি দিয়া কেবল সেই মাংসই ভোজন করিবেন। এই বিশ্বাস প্রচলিত হইয়া জীবহত্যা কমিয়া যাইবে।

এই প্রসঙ্গে আপনারা লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান যুগের শাস্ত্রজ্ঞ

পণ্ডিতেরা সকলেই একবাক্যে বলিদান প্রথাকে ধর্ম্মবিগর্হিত বলে ঘোষণা করেছেন।" কিন্তু ইহা যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা ও বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্যসংঘ একবাক্যে বলিদান প্রথাকে ধর্ম্মসম্মত বলিয়াছেন। এই দুই সভাতে কি কোনও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নাই? পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ বলিদান প্রথাকে ধর্ম্মসম্মত বলিয়াছেন। ইঁহারা কি শাস্ত্রজ্ঞ নহেন? কলিঘাটের মন্দিরে গত ভাদ্র মাসে কাঞ্চীকামকোটি পীঠের জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যকে অভিনন্দন করিবার জন্য যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে সমবেত পণ্ডিতগণ বলিদান প্রথা ধর্ম্মসম্মত বলিয়াছিলেন এবং শঙ্করাচার্য্য মহোদয় তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন। ইঁহারা কি কেহ শাস্ত্রজ্ঞ নহেন?

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শত মাসিকী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ

আজি তুমি শতপর্ব্বা, রাকা কোজাগরী
শত তন্বী ইন্দুরেখারচিত মণ্ডল,
শতেক মাসের দলে ফুল্ল শতদল,
অথবা বাণীর কণ্ঠে তুমি শতনরী।
শতায়ু হয়েছ তুমি ওগো আয়ুষ্মতী,
তোমার জীবন-বেদ রচি' শত মাসে।
হে বিচিত্রা, আপনার অম্লান আয়তী
অক্ষুণ্ণ রাখিও শিবসুন্দরের পাশে।
শতপর্ণা বর্হিণীর বিচিত্র কলাপে
ভারতীর চালচিত্র দাও প্রসারিয়া,
শততন্ত্রী নিনাদিত মঞ্জুল আলাপে
রাগিণীর ইন্দ্রজালে মুগ্ধ কর হিয়া।
শতক্রতু বাসবের ইন্দ্রাণীর সমা
যজ্ঞ-বেদিকার পার্শ্বে তুমি মনোরমা।

টাকার কথা

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্

শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল বাবু ইতস্ততঃ মাসিকে ছড়ান তাঁর অর্থনীতির প্রবন্ধগুলিকে পুঁথির আকারে ছাপিয়ে বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলা সাহিত্যের উপকার করেছেন। অনাথবাবু বইখানির নাম দিয়েছেন 'টাকার কথা'। কারণ এ প্রবন্ধগুলিতে ধনতত্ত্বের নানা কথার আলোচনা থাকলেও তাদের প্রধান আলোচ্য হচ্ছে ধনের সৃষ্টি ও বণ্টনের কাজে মুদ্রার মধ্যস্থতা যে সব ব্যাপার ও বিভ্রাট ঘটায়, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ঘটাচ্ছে।

এ পুঁথির দ্বিতীয় সন্দর্ভ 'স্বর্ণমান' প্রবন্ধটি যখন 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ হয় অনেক পাঠক তখনি বুঝেছিলেন যে, বাঙ্গলায় একজন শক্তিশালী অর্থশাস্ত্রের লেখকের আবির্ভাব হ'ল, মাথা যার শাফ্ এবং হাতে যার সাহিত্যের কলম। গ্রন্থের পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে অনাথবাবু সে ধারণাকে সত্য বলে প্রমাণ ক'রেছেন। অর্থশাস্ত্রের মুদ্রাতত্ত্ব অধ্যায়টি জটিল, এবং অব্যবসায়ী সাধারণ পাঠকের কাছে অনেকাংশে নীরস। এই মুদ্রাতত্ত্বের অনেক গোড়ার কথা এবং ভারতবর্ষের মুদ্রাতত্ত্বে তার বিশেষ প্রয়োগ অনাথবাবু এমন পরিষ্কার ও সুখপাঠ্য আলোচনায় ক'রেছেন যা দেশে-বিদেশে কোথাও সুলভ নয়। অর্থশাস্ত্রের শাস্ত্রীগিরি অনাথবাবুর ব্যবসা নয়, এবং বঙ্গভাষায় ও-শাস্ত্রের পরিভাষা আজও গ'ড়ে ওঠে নি,- খুব সম্ভব এই দুই কারণে বাচোর বদলে বাক্য দিয়ে নিজেকে ও পাঠককে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা থেকে অনাথবাবু রক্ষা পেয়েছেন। আধা-সাহিত্য এই শাস্ত্রকে পুরোপুরি বিজ্ঞান বানাবার ব্যর্থ চেষ্টায় পাণ্ডিত্যের কসরৎ-এ যে ধুলো ওড়ে অনাথ বাবুর চিন্তা ও লেখাকে কোথাও তা আচ্ছন্ন করে নি।

মুদ্রাতত্ত্বের গহনে অনাথবাবু স্বর্ণপন্থী। সব দেশের মূল মুদ্রা সোনার হ'লে অথবা বদলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনা দেবার কড়ার থাকলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বাজার-দর ভিন্ন ভিন্ন রকমে ওঠানামার অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেয়ে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ও দেনা-পাওনার হিসাবের যে সুবিধা হয় অনাথবাবু তা বিশদ ক'রে বুঝিয়েছেন। পৃথিবীর বাজারে সোনার দর ওঠাপড়ায় একটা অনিশ্চয়তা অবশ্য থেকেই যায়, কিন্তু যে কোনও সম্ভবপর ব্যবস্থাতেই ও রকম অনিশ্চয়তা অপরিহার্য্য, এবং পাঁচটা অনিশ্চয়ের জায়গায় একটা অনিশ্চয় নিয়ে ঘর করা অনেক সহজ। সোনার সঙ্গে মুদ্রার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য হ'লে দেশে প্রয়োজন মত মুদ্রা সমষ্টির সংকোচ প্রসারে বাধা ঘটে। কিন্তু তাতে যা অহিত হয় বোধহয় অনাথবাবুর মতে অবাধ সংকোচ প্রসারের ক্ষমতার এক রকম অবশ্যম্ভাবী অপব্যবহারের অহিতের চেয়ে তা অনেক কম। অনাথবাবু মুদ্রাতত্ত্বের যাচাই করেছেন প্রধানতঃ অন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মাপকাঠিতে। তাঁর পুথির শেষ "যে দেশে টাকা নাই" প্রবন্ধে রুশিয়ার মুদ্রা বা অমুদ্রা-তন্ত্রের আলোচনায় অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন রকমের মুদ্রাব্যবস্থার কথাটা উঠেছে; কিন্তু অন্যান্য দেশেও ও ব্যবস্থার সাধারণ প্রয়োগ কতটা সম্ভব এবং তার ফলাফল কি হ'তে পারে অনাথবাবু সে আলোচনায় হাত দেন নি। আশা করি ভবিষ্যতে দেবেন। কারণ বর্ত্তমান পৃথিবীতে সব দেশেই বহির্বাণিজ্য খুব বড় কথা হ'লেও অনেক দেশেই, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের মত প্রকাণ্ড দেশে, অন্তর্বাণিজ্য তার চেয়েও বড় কথা। এই অন্তর্বাণিজ্যের দিক থেকেও মুদ্রাতত্ত্বকে পরীক্ষা না ক'রলে আলোচনা কেবল অসম্পূর্ণ থাকে না, খুব জটিল সমস্যার অতিরিক্ত রকম সহজ মীমাংসা করা হয়।

দেশের মুদ্রাকে স্বর্ণমান থেকে বিচ্যুত ক'রে তার দর কমিয়ে কমিয়ে কেমন ক'রে প্রায় সব দেশ নিজের দেশের মাল পৃথিবীর বাজারে অন্যের চেয়ে শস্তায় কাটাতে চাচ্ছে, ও দেউলিয়াগিরির এই প্রতিযোগিতা যে পৃথিবীর বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির কোনও স্থায়ী মীমাংসা নয়, আর সে দুর্গতি ঘুচাবার যথার্থ উপায় কি অনাথবাবু তার খাসা আলোচনা করেছেন; এবং সে উপায় অবলম্বন যে কত অসম্ভব তারও ইঙ্গিত ক'রেছেন। পৃথিবীর বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশা দূর হয় যদি

প্রত্যেক দেশ ধনের সৃষ্টি ও বিভাগের কাজে হাত দেয় নিজের দেশের বিশেষ স্বার্থে নয়, সব দেশের সাধারণ স্বার্থে। অর্থাৎ এ আর্থিক দুর্গতি মোচনের উপায় বিশ্ব-মানবতার আবির্ভাব। মানব-সমাজে বিশ্বমানবতা হয়ত একদিন আস্‌বে। কিন্তু সে যে আস্‌বে অর্থনীতির তাগিদে এ ভরসা বা ভয়ের কারণ নেই।

"ভারতে মুদ্রানীতি" ও "আমাদের রেশিও সমস্যা" দুটি প্রবন্ধে অনাথবাবু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান মুদ্রানীতির বিশেষ আলোচনা করেছেন। আমাদের টাকা রূপার, এবং তাতে যে রূপা থাকে তার বাজার দর টাকার দরের চেয়ে অনেক কম। এই প্রতীক মুদ্রা নিয়ে যে সব দেশের সঙ্গে আমাদের প্রধানতঃ কারবার ক'র্‌তে হয় তাদের টাকা সোনার। এ ব্যবস্থার ফলাফল এবং যে দেশের সঙ্গে আমাদের দেন-লেন সব চেয়ে বেশী সেই রাজার দেশের মুদ্রার সঙ্গে আমাদের টাকার বিনিময়ের হার নির্দ্দেশ ও রক্ষার চেষ্টায় ভারতবাসিকে কি পরিমাণ ক্ষতি ও দুর্গতি ভোগ কর্‌তে হচ্ছে তার যে বিবরণ অনাথবাবু দিয়েছেন তার চেয়ে সুখে ও সংক্ষেপে সে আলোচনা শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠক কোথাও পড়তে পাবেন না। 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং' যে কত বড় দুঃখ তা অনাথবাবুর শুদ্ধমাত্র ঘটনা বিবৃতির কৌশলে যেমন ফুটে উঠেছে কোনও চড়া ও কড়া রাজনৈতিক বাগ্মীতায় তা সম্ভব হ'তো না।

"আমাদের রেশিও সমস্যা"য় অনাথবাবু '১শিলিং ৪ পেনি' বনাম '১ শিলিং ৬ পেনি' মামলার বিচার করেছেন। তাঁর এ প্রবন্ধ যুক্তিতর্কের সহজ ও পূর্ণ প্রকাশে প্রসাদগুণে যেমন ভরপুর, পরিহাসকুশলতায় তেমনি উজ্জ্বল। "আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এবং আরও দুই চার জন বাঙালী ছাড়া সারা ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। অধ্যাপক সরকারের অভিমতে আমরা বিস্মিত হই নাই। সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্যে তিনি সাধারণতঃ আস্থাবান নহেন। তিনি নূতন সত্যের সন্ধানী। তাঁহার পক্ষে নূতন কিছু বলাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ব্যাপারে জনসম্মুখে আচার্য্য রায় মহাশয়ের মত লোকের অকস্মাৎ আবির্ভাবে আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম।" এর Neatnessএ অধ্যাপক সরকার পর্য্যন্ত খুসি না হয়ে পারবেন না। আচার্য্যদেবের কথা অবশ্য বলা কঠিন।

এ পুঁথির প্রথম প্রবন্ধে অনাথবাবু দুঃখ ক'রেছেন যে, শিক্ষিত বাঙ্গালী পলিটিক্সে মশগুল কিন্তু অর্থনীতির শ্রবণ-মননে পরাঙ্মুখ। অথচ, 'ভূমিকায়' শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কথায়, "এ যুগের নব পলিটিকাল সমস্যা...সবই বর্ণচোরা ইকনমিক্ সমস্যা"। শিক্ষিত বাঙ্গালীর আজ গঞ্জনার অন্ত নেই। সে মাদ্রাজীর মত পরীক্ষা পাস ক'রতে পারে না, বোম্বেওয়ালার মত শিল্প-বাণিজ্যে পটু নয়, টাকা চায় কিন্তু মাড়োয়ারীর মত টাকৈক প্রাণের সাধনা নাই। নিতান্ত আত্মরক্ষার খাতিরেই একটা কথা বলি। প্রথম প্রবন্ধ 'রাজ-নীতি বনাম অর্থ নীতি-"র পর বই-এর বাকী ছয়টি প্রবন্ধে অনাথবাবু বার বার এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে, এ যুগের পলিটিকাল সমস্যা যদি চ বর্ণচোরা ইকনমিক সমস্যা, সে ইকনমিক সমস্যার সমাধানের উপায় হচ্ছে পলিটিকাল উপায়। মুদ্রার বিনিময়ের হার বাড়ান কমান, 'টারিফের প্রাচীর উঁচু নীচু করা, দেশের পণ্যকে 'বাউন্টির' হাইড্রোজেনে লঘু ক'রে পৃথিবীর বাজারে ছেড়ে দেওয়া—এর কিছুই সম্ভব নয় হাতে পলিটিক্যাল ক্ষমতা না থাকলে। সুতরাং পলিটিকালি যে ম'রে রয়েছে সে ইকনমিক্ নিমতলার ঘাটে চলেছে না কাশী মিত্রের তাতে যদি উদাসীন হয় তবে তার প্র্যাকৃটিকাল বুদ্ধির দোষ দেওয়া যায় না। অর্থাৎ অনাথবাবু যে ইকনমিকসের আলোচনা ক'রেছেন আজ শিক্ষিত ভারতবাসির তা আলোচ্য প্রধানতঃ নিষ্কাম বিদ্যা হিসাবে, সকাম কর্ম্মের প্রয়োজনে নয়। যে সকল 'অবাঙ্গালী' ব্যবসায়ীর তিনি উল্লেখ করেছেন যাঁদের "অনেকে ইংরাজী অনভিজ্ঞ হইয়াও পৃথিবীর টাকার বাজারের সমস্ত সংবাদ নখাগ্রে রাখিতেছেন এবং আমদানী রপ্তানী ব্যবসা ও Share speculation করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে-ছেন" ইক্‌নমিক্‌সে তাঁদের জ্ঞান ও ঔৎসুক্য নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের নাকের ডগা ছাড়িয়ে যায় না। ওসব খবর তাঁরা রাখেন ঘোড়দৌড়ের জুয়াড়ী যেমন 'রেশের' ঘোড়ার আদ্যন্ত বংশ পরিচয় আয়ত্ত করে, 'জু-লজি' বিদ্যার প্রতি প্রীতিবশতঃ নয়। তাঁদের দেশের অব্যবসায়ী শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ইকন-মিক্‌স্ বিদ্যায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর চেয়ে বেশী অবহিত তার প্রমাণাভাব। সম্ভব ভারতবর্ষের আর কোনও ভাষায় অনাথ-বাবুর 'টাকার কথা'-র মত বই লেখা হয় নাই। যদি হ'তো তবে সে সব দেশের ধনকুবের ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই তা কিনে ও প'ড়ে টাকা ও সময় নষ্ট করতেন না। শিক্ষিত বাঙ্গালী Share speculationএ টাকা করে নাই। আশা করা যায় অনাথবাবুর পুঁথির তাঁরা সমাদর করবেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

টাকার কথা—শ্রীঅনাথগোপাল সেন প্রণীত। মডার্ণ বুক এজেন্সী—১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।
মূল্য—পাঁচ সিকা।

বাংলা বইয়ের দুঃখ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্বিনের 'বিচিত্রায়' উক্ত শিরোনামায় শরৎবাবুর ছোট্ট কয়েকটি কথা মস্ত কয়েকটি কথা খুলে দিয়েছে। জ্ঞান-গর্ভ বইয়ের অভাবে যে কেন, নভেল আর গল্পের প্রতি অভিযোগ, লেখক সম্প্রদায়ের অবস্থা, প্রকাশকের বিজ্‌নেস্ বজায়, অবস্থাপন্নদের বাংলা বই কেনার অনভ্যাস, প্রভৃতি সত্যের সংবাদ দিয়েছেন। আবার কড়া কথা বলা যে তাঁর অভ্যাস আছে, সেটাও এমন ক্ষেত্রে শুনিয়ে দিয়েছেন যেখানে সেটা মিঠেকড়া বলেই লোকে উপভোগ করে থাকবে।

তাঁর মত লোকের মুখে এসব কথার মূল্য আছে। তাই, পড়ে আনন্দ পেলুম। তবে, তদতিরিক্ত পাবার আশা করতে পারলে সুখীই হতুম।

কথাগুলি মধ্যে মধ্যে মনকে ছুঁয়ে যায়। নিশ্বাসের দ্বারাই তাদের কুলোর বাতাস দিয়ে, কর্ত্তব্য সমাধা করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবেশলাভ ঘটায়, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ভাইস্-চ্যানসেলার কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার লেখকদের কাছে সাহিত্যের ও অন্যান্য বিভাগের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে পুস্তকাদির প্রয়োজনের কথা শুনিয়ে তাঁদের সাহায্য আহ্বান করেছেন। সেই সম্পর্কে, গত "প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলন" ক্ষেত্রে একটা আক্ষেপের কথা না বলে থাকতে পারিনি। বাধ্য হয়েই বলেছিলুম—"বাণীর সেবকেরা প্রায়ই অবস্থাপন্ন নন। তাই ইচ্ছা ও শক্তি সত্ত্বেও তাঁরা এমন রচনায় হাত দিতে পারেন না—যার প্রকাশক জুটবেনা, কারণ সে সব পুস্তকের চাহিদা কম! সে জন্য অনেক বিশেষজ্ঞকেও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পুস্তক লেখা বন্ধ রাখতে বাধ্য হতে হয়েছে"।—এর বেশী বলতে সাহস পাইনি। শরৎবাবু কথাটা এগিয়ে দিয়ে ভাল করেছেন। সাহিত্যিকদের নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান যতদিন না গড়ে ওঠে ততদিন লেখকদের 'জ্ঞানগর্ভের' ক্ষেত্র বিদর্ভ। মহাজনদের লাভ লোকসান খতাতে হয়। তাই 'জ্ঞানগর্ভের' মত সর্ব্বনেশে দেবতাকে তাঁরা দূর থেকে নমস্কার করেন—ঘরে ঢোকাতে ভয় পান। Dead-Stock বাড়াতে চান না!

জ্ঞান সঞ্চয় করবার আগেই 'জ্ঞানগর্ভের' হোয়ে ওকালতী করে এক বন্ধুকে ডুবিয়েছিলুম। কথাটা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের। কিন্তু সে কথা মনে হলে আমার বুদ্ধির বাহাদুরীর বাহবাব্যঞ্জক তাঁর সেই সুমধুর উপহাসের হাসি আজো আমাকে লজ্জা দেয়।

সেটা ছিল কেরাণিগিরির নব মোহের যুগ। বন্ধুর সৌভাগ্যে তাঁর হস্তাক্ষর ছিল—বাংলা কি ইংরাজি, কি উড়িয়া সেটা মাথা খুঁড়িয়া উদ্ধার করা লোকের সাধ্যাতীত ছিল। অথচ সে যুগে হাতের লেখাই ছিল চাকুরির পাস্‌-পোর্ট।

গ্রাম ছেড়ে কলকেতায় ভরন্তর করেও, সুবিধা না হওয়ায় প্রয়োজনই তাঁকে উপার্জ্জনের পথ দেখালে। তিনি লেখক ধ'রে তাঁদের সামান্য কিছু দিয়ে, যৌবন রুচির নাড়ী বুঝে বই লিখিয়ে Catchy (চিত্তাকর্ষক) নাম দিয়ে, তার প্রকাশ আরম্ভ করলেন, এবং উদীয়মান বঙ্গবাসী পত্রিকায় তার মোহ-উৎপাদক বিজ্ঞাপন দিয়ে হু হু করে মফস্বলে ভিঃ পিঃ আরম্ভ করলেন। টাকা কুড়ুবার জন্যে তাঁকে মাইনে করা লোক রাখতে হয়েছিল—জানি। বইগুলি ঠিক উপন্যাস ছিলনা, ডাক্তারী ও যুবকযুবতীর মনোহারী বিষয়ের সংমিশ্রণে—দরকারী বলে তারা তাঁর ভাগ্যে প্রবল বেগে চলে গিয়েছিল।

তিনি কলকেতায় থাকতেন, দেখা কমই হত। একদিন গ্রামে তাঁকে পেয়ে, কথাপ্রসঙ্গে কাজটার অনেক নিন্দা করলুম।—"একি করচো?"

"কেনো, অর্থ উপার্জ্জন করছি। ধর্ম্ম করতে তো বসিনি।"

"কিন্তু অনিষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে।" (তখন সে ধরণের লেখা আমাদের অপরিচিতই ছিল।)

—"আমি তো জোর করে, মাথার দিব্যি দিয়ে, কি হাতে পায়ে ধোরে কাকেও কেনাচ্ছিনা। যাদের ভালো লাগে তারাই নেয়, তারা নিতান্ত কম নয়,—লিষ্ট দেখলে চমকে যাবে। তুমি বুঝি ভাবো-'বৈরাগ্যশতক' পড়বার জন্যে দেশ হাঁ করে আছে? পল্লীগ্রামে থাকো কত রকমের লোক আছে তার কিছুই Idea নেই। আনন্দ না পেলে লোক পয়সা দিয়ে নেয়"?

"তোমার 'সময়টা' তাদের নেওয়াচ্ছে"।

"মানলুম,—তবে এটা মানবেনা কেনো যে সময়ই আমাকে এই Idea দিয়েছে।"

আমার চড়া সুর নেবে গেল। বললুম, "তা হোক্ ভাই, যখন এই কাজই করছো, তখন একখানা ভালো বইই বার কর না"।

একটু ভেবে বললেন—"তুমি বাল্য বন্ধু, তোমার একটা কথা রাখতে এখন পারি। চারখানাতে কিছু দিয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞাপনেও কম দিইনি। যাক, ভেবে দেখি, যদি একখানা এমন বই পাই যা গল্পচ্ছলে ভালো কথা (জ্ঞানের কথা) শোনায়, তাহলে ছাপাবো। সেরেফ 'যোগাম্বুধি' চলবেনা, বরং 'উজ্জল নীলমণি' চলে। কলকেতায় না থাকলে নাড়ীজ্ঞান হয় না।" সেদিন ওই পর্য্যন্ত কথাই হয়।

বন্ধুর কলকেতার বাড়ীতেই একদিন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বলে একটি যুবাকে দেখে আকৃষ্ট হই। সাদাসিদে দীনভাবাপন্ন, উদাস প্রকৃতি, অল্পভাষী, সদাপ্রসন্ন মূর্ত্তি। তিনি মোহনলাল মিত্র মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে থাকতেন। চিরকুমার অবস্থায় সেইখানেই ভগবৎচিন্তা নিয়ে কাটিয়ে গিয়েছেন। সদাপ্রফুল্ল, আড়ম্বরহীন, সদালাপী ও সহৃদয় ছিলেন। সময়ে সময়ে খেয়াল মত ধর্ম্মবিষয়ক কথা রূপকচ্ছলে লিখতেন। কয়েকখানির মধ্যে তাঁর "জীবন পরীক্ষা" বা "ভীষণ স্বপ্ন চতুষ্টয়" বলে পুস্তকখানি পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদর পেয়েছিল। বঙ্কিমবাবুও বইখানির সুখ্যাতি করেছিলেন। বিষয়টি আগাগোড়াই জ্ঞানগর্ভ; কিন্তু গল্পচ্ছলে ব্যক্ত হওয়ায় তখনকার দিনের পাঠকদের সুখপাঠ্য হয়েছিল, বইখানির নামও হয়েছিল। তার প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ায়—আমার বন্ধু সেইখানির (সম্ভবতঃ) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন। বইখানির আকার বৃহৎ, ছাপাতে ব্যয়ও তদনুরূপই হয়েছিল,—অধিকন্তু বিজ্ঞাপনের খরচ।

বছর দুই পরে একবার বন্ধুর কলকেতার বাড়ীতে যাই। অন্যান্য কথার পর বন্ধু বললেন—"তোমার কথাও রেখেছি, এবং নিত্য স্মরণে থাকবে বলে তা আলমারি পুরেও রেখেছি। আর কিছু না হোক্, তাতে জীবে দয়া হিসেবে পরোক্ষে বেশ কিছু পুণ্য সঞ্চয়ও করছি। সেইটাকেই এখন লাভ বলে মনে করি।"

বললুম—"বুঝতে পারলুমনা যে"। বললেন, "বুঝে ফল নেই, আমায় একাকেই বুঝতে দাও।—পড়ে ছিলুম "স্বপ্ন সত্য নয়" আমার ভাগ্যে তা কিন্তু সত্য হয়েছে—আর প্রিয়নাথ ভায়া তার নামকরণে 'ভীষণ' বলে তো দেগেই রেখে-ছিলেন। সেটা তখন আক্কেলে আসেনি।"

তারপর একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে দুটি আলমারী আর দোর জানলার খিলেনের নীচে ঠাশা 'ভীষণ স্বপ্ন চতুষ্টয়' দেখিয়ে বললেন, "মুস্কিল এই ফেলতেও পারিনা, আলমারিও দরকার।—ঘরটি বাল্মিকির আশ্রম দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই উয়ের খোরাক যে কত দিনে শেষ হবে তাও জানিনা। ঘর ভাড়া লাগেনা—তাই হাজার দুইয়েই রেহাই পেয়েছি।" ইত্যাদি—

হাসি তামাসায় কথাটা শেষ হলেও লজ্জায় মাথা হেঁট করে ফিরেছিলুম। ভায়া পরলোক প্রস্থান করলেও, মরলোকে সে কথা আজো আমি ভুলতে পারিনি।

যাক্, এটা আমার নিজের দুর্ব্বুদ্ধির কথা ছিল। এর মানে এমন নয় যে, আমাদের জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের আবশ্যক নেই বা তার পাঠক নেই বা তার দরকার নেই। তবে, কিনে পড়বার বা রাখবার লোক যাঁরা আছেন, তাঁদের কথা শরৎবাবু খুলেই শুনিয়েছেন। তাঁদের ভরসায় মহাজনদের উৎসাহ বা সাহস বোধহয় জাগে না।

জ্ঞানগর্ভ বই সাপটা ভাবে গ্রহণ করবার যুগ এটা নয় বলেই মনে হয় ভেবে বোঝবার সময় কম। তাকে সাময়িক রুচিসম্মত প্রণালীতে,—স্বচ্ছ রূপ দিলে যে চলে না, এমন কথা বলতে পারি না। ইতিমধ্যে অনেক না হলেও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক যে বেরয়নি তাও নয়। বঙ্কিম বাবুর অনুশীলনের মত

কঠিন জিনিষও পাঠক সাগ্রহে নিয়েছিল। পরে শ্রীম কথিত ঠাকুরের কথা, বিবেকানন্দ স্বামীজির কথা, অমিয় নিমাই চরিত, অশ্বিনী বাবুর ভক্তিযোগ, স্যার্ গুরুদাসের "জ্ঞান ও কর্ম্ম" প্রভৃতি না থাকলে কোনো পুস্তকাগারই সম্পূর্ণ নয়। হীরেন্দ্রবাবুর পুস্তককয়খানি যে-কোন 'জ্ঞানগর্ভকামীর' আদরের সামগ্রী এবং পুস্তকাগারের রত্ন বিশেষ। এইরূপ আরও আছে। তারা সময়োচিত সুরে জ্ঞানের কথা শুনিয়েছে বলেই বোধ হয় আদর পেয়েছে। বিজ্ঞানের ভালো ভালো বই, অল্প হলেও, কিছু কিছু বেরুচ্ছে। আরো অনেক পেতে পারি। চাহিদা সৃষ্টির অপেক্ষা। Adventure লেখার দিকে আমাদের অবকাশ রয়েছে কম নয়। গল্পাদি অপেক্ষা তা কম চিত্ত-প্রিয় বলে মনে হয় না। শরৎ বাবুর ইন্দ্রনাথের সামান্য একটু কথা কে না সাগ্রহে পড়ে?

উপন্যাস বা গল্পের একটা ঢালা নিন্দে অনেকেই করেন। ভালো মন্দ সকল জিনিষেরই থাকে ও আছে। উপন্যাস ও গল্প জ্ঞানগর্ভের কোটায় পড়ে না, আর তা আশা করেও সেসব কেউ পড়েন না। তারা জীবনানুভূতির কথা কয়,—আনন্দ দেয়। তাতে শিক্ষার বা পাবার বস্তু যথেষ্ট থাকা সত্বেও, এবং ক্ষমতাশালী লেখক তা প্রচুর পরিমাণে দেবার প্রয়াস পেলেও, তা উপন্যাসের মহলেই থাকবে। কিন্তু নিন্দাটা যদি না পড়েই শুধু 'নভেল' শুনেই করা হয়, সেটা কেবল ক্ষোভের কথাই হয় না, তাতে জাতীয় সাহিত্যকে বাড়তে দেওয়াও হয় না। আবার বই না কেনার কারণ স্বরূপ সেটা যখন ব্যক্ত হয়—তখন সত্যই হতাশ হতে হয়—বিশেষ সমর্থেরা যদি ওই ওজুহাতের আশ্রয় নেন। যেখানা যার কাছে মন্দ সেখানা তিনি নাই কিনলেন;—ভালও যে নাই এমন কথা বলা যায় কি? ভালো বই ও ভালো লেখা যে জাতীয় সম্পদ। সেটা বাদ পড়লে ক্ষতি আছে।

এখানে নভেলের কথাও একটা বলি। বঙ্কিম বাবুর 'রাজসিংহ' যখন প্রথম বেরয় তখন তার আয়তন ছিল এখনকার 'রাজসিংহের' আধখানা। তখন শিক্ষিতদের পড়বার মত এত বাংলা বই ছিল না, এবং শিক্ষিতদের বাংলা বই পড়বার অভ্যাস ছিল কম।

বঙ্কিম বাবু তার দাম রেখেছিলেন দেড় টাকা,—(বোধ-হয় ভেবেছিলেন ৵৹ আনাই হওয়া উচিত)—তাই ভূমিকায় যা লিখেছিলেন তার মর্ম্মটা ছিল—দামটা যাঁর বেশী বলে মনে হবে তিনি কিনবেন না। বাংলা দেশে বই কিনে পড়ার অভ্যাস কম। কোন গ্রামে একখানা কেউ কিনলে যাঁর কেনবার সামর্থ্য আছে তিনিও চেয়ে পড়েন। এরূপ স্থলে কম দাম করবার কোনো সার্থকতা নেই,—ইত্যাদি।

অনেক দুঃখেই এই কথা তিনি বলেছিলেন। আজ তিনি বেঁচে থাকলে দেখতেন—লেখকের একটু নাম থাকলে তা আড়াই টাকায় উঠেও থামচেনা। বোধ হয় আনন্দই পেতেন।

কিন্তু বই কেনা বেড়েছে কি? যদি কিছু বেড়ে থাকে তো সেটা মালক্ষ্মীদের কৃপায়। শরৎ বাবু যে দুঃখের কথা জানিয়েছেন—এবং লেখকদের প্রকৃত অবস্থা শুনিয়েছেন তা চাক্ষুষ সত্য। তাঁরা যে কতটা চিন্তা সময় শ্রম ব্যয় কোরে দেশকে ও জাতিকে কিছু দেবার প্রয়াস পান, শরৎ বাবুর চেয়ে কে আর সেটা বেশী জানেন। এটা তো তাঁর অনু-মানের কথা নয়। সব বই সকলের মনে না ধরতে পারে। এ কথাটা কোন্ বিষয়ে বা কোন্ জিনিষ সম্বন্ধে না খাটে। কিন্তু তাঁদের বাঁচিয়ে রাখলে তবে না তাঁরা ভালো বই দেবার চেষ্টা পেতে পারেন। আমি রুচিবিরুদ্ধ বই কিনতে কা'কেও বলচি না। ভালোর জন্যে চেষ্টা পাওয়াই তো সকলের স্বভাব ধর্ম্ম! কেউ কি চান—"আমার লেখার নিন্দে হোক্?" কিন্তু অনশন বরণ করে তো কেউ লিখতে বসতে পারেন না। আমি সেই কথাই বলছি।

তাই সমর্থরা একটু ত্যাগ স্বীকার কোরে এ বিষয়ে সাহায্য করাটা কর্ত্তব্য বলে ভাবলে ভালো হয়। এ সাহায্য কেবল লেখকদেরই করা হবে না, পরোক্ষে উন্নতিকামী দেশ ও জাতিকেই করা হবে।—আমরা স্বরাজের জন্য আশা করছি; কিন্তু বড় কিছু আশা করতে হলে তার পূর্ব্বে ঘরের সর্ব্বাঙ্গীন আয়োজন ঠিক রাখতে হয়, ভাণ্ডার সমৃদ্ধ থাকা চাই। বাইরে 'বর্ব্বর' বলেই প্রসিদ্ধি রটছে। সাহিত্য যে ভাণ্ডারের একটা শ্রেষ্ঠ উপকরণ এ কথা ভুললে যে আজ চলবে না।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ-সাহিত্যে হিউমার

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

শরৎ-সাহিত্যে হাস্তরস যেমন গভীর তেমনি সঙ্কেতময়। হাল্কা হাসি বা নিছক রঙ্গের (fun) অবসর শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্যে মেলে খুব কম। "শ্রীকান্তে" দত্তদের বাড়ীতে সখের গ্রাম্য থিয়েটারের চিত্রাঙ্কনে আছে, "মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্য্যয় কাণ্ড। তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা সাড়ে-চার হাত! সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ী ছাড়া উপায় নাই।...ড্রপসিন উঠিয়াছে। বোধকরি বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন—অল্পস্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত ষ্টেজটা মড় মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল—ফুটলাইটের গোটা পাঁচ ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাঁহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহবা সভয় চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহবা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল—কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ কাহারও কোনও কথায় বিচলিত হইলেন না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেণ্টুলানের মুট চাপিয়া ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।" অথবা, মেজদার "দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার" কেমন করে শেষে "ছিনাথ বউরূপীত" পরিণত হল এবং সেই সুযোগে ভটচার্য্যিমশায় যখন তার পিঠের ওপর খড়মের এক ঘা বসিয়ে দিয়ে রাগের মাথায় হিন্দির অপশ্রাদ্ধ করতে লাগলেন, "এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া।" এই সব চিত্র পড়তে পড়তে যে প্রবল হাসির বেগ অতি সহজেই স্ফূর্ত্ত হয়ে ওঠে—সে রকম ফাঁকা অট্টহাসির চিত্র শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসে অল্পই আছে। এই আমোদ-সর্ব্বস্ব হাস্তরস নির্ভর করে আমাদের জৈবপ্রাণের আনন্দপ্রবণতার (animal spirits) ওপর। এ না পারে আমাদের কল্পনায় বিশেষ সাড়া জাগাতে,—না বা পেঁছয় অন্তরের গভীর স্তরে। এ রকম হাস্যরস উপভোগ অথবা সৃষ্টি করার জন্যে খুব সূক্ষ্ম চিত্তের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শরৎসাহিত্যে পাওয়া যায় অনবদ্য হিউমারের প্রাচুর্য্য। তার জাত সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের জীবনে দুর্ব্বলতার অন্ত নেই। জগতের দিকে দিকে আছে অপসামঞ্জস্য, বিকৃতি ও উদ্‌ভ্রান্তি (Eccentricity)। সেই সব হাস্যকর মাল-মসলা নিয়েই হিউমারের কারবার বটে—কিন্তু হিউমারের স্পর্শে তার আর হাল্কা হাসির উপভোগ্য বস্তু থাকে না। হিউমারের মধ্যে নেই শুধু আমোদের অট্টহাসি অথবা ব্যঙ্গের মর্ম্মান্তিক আঘাত। এর উৎপত্তি সেখানেই—যেখানে রস-বোধের সঙ্গে এসে মেশে অনুকম্পা। হিউমার-শিল্পীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দরদমিশ্রিত, সূক্ষ্ম, সুকোমল (Delicate) হাস্যরস সৃষ্টি করা। হিউমারের হাসি শরৎপ্রভাতের মেঘের মত লঘু নয়। তা' বর্ষার বারিদের মত গভীর, গুরু এবং সঙ্কেতময়। এর সৃষ্টির জন্যে যেমন দরকার—পূর্ণভাবে একে উপভোগ করতে হলে তেমনি চাই—সংস্কারমুক্ত, সূক্ষ্ম, সজাগ দরদীচিত্ত। রঙ্গরস এবং করুণরসের শিল্পায়িত মিশ্রণে হিউমারের উদ্ভব। ইংরাজ কথাশিল্পী মেরিডিথের কথায় বলতে গেলে, "If you laugh all around him (i.e. the ridiculous person), tumble him, roll him about, deal him a smack, drop a tear on him, spare him as little as you shun, pity him as much as you expose, it is the spirit of humour that is moving you."

দরদী শরৎচন্দ্র মানুষের দুর্ব্বলতা ও দুর্গতি নিয়ে কোথাও নির্ম্মমভাবে ব্যঙ্গ করতে পারেন নি। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জীবনের অপসঙ্গতির বিশেষ সন্ধান পাননি—একথা সত্য নয়। তাঁর শিল্পপ্রতিভার আছে মানব জীবনের সঙ্গে সহজ,

নিগূঢ়, আন্তরিক পরিচয়। কিন্তু তাঁর অন্তরের অমেয় রস-বোধ মানুষের অপসামঞ্জস্যকে শ্লেষের কটুকটাক্ষে জর্জ্জরিত না করে তাকে সহৃদয়তা দিয়ে উপলব্ধি করেচে। তাই তাঁর কাছে হিন্দুস্থানী মুদির নিদ্রালুতার দুর্ব্বলতা নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েচে, "এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী. সে কথা যাহার জানা নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অম্লরোগী, নিষ্কর্ম্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত, কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙ্গালী গৃহস্থও নয়। সুতরাং ঘুমাইতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া খুটিয়া রাত্রিতে একবার 'চারপাই' আশ্রয় করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া, শুদ্ধমাত্র চেঁচাচেঁচি ও দোর নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জ্জুন জয়দ্রথবধের পরিবর্ত্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিজ্ঞাপাশে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।" শ্রীকান্ত, প্রথমপর্ব্বে মেজদার প্রচণ্ড শাসনের ইতিহাস যখন পড়ি, "আমাদের পড়ার সময় ছিল ৭॥০ হইতে ৯টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিয়া মেজদার 'পাশের পড়া'র বিঘ্ন না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া ২০। ৩০ খানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে,' কোনটাতে 'থুথুফেলা,' কোনটাতে 'নাক-ঝাড়া,' কোনটাতে 'তেষ্টা পাওয়া,' ইত্যাদি। যতীনদা একটা 'নাকঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদার সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—'হুঁ,—৮টা তেত্রিশ মিনিট হইতে ৮টা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্য্যন্ত' অর্থাৎ, এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটী পাইয়া যতীন দা টিকিট হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারি করিয়া মিনিট দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টাপাওয়া' আর্জ্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন,—হুঁ—৮টা একচল্লিশ মিনিট পর্য্যন্ত। পরওয়ানা লইয়া ছোড়দা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজসরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুদ থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ত তলব করা যাইত।" অতি-সাবধানী মেজদার এই বোকামী নিয়ে আমরা যতই হাসাহাসি করি না কেন, তবু মনের কোণে একবিন্দু সহানুভূতি তার আগেই জমা হয়ে ওঠে। কারণ, "মেজদার দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্ব্বোধ পরীক্ষকগুলো তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে বারংবার ফেল্ করিয়াই দিতে লাগিল।"

"চরিত্রহীনে" মাতাল মোক্ষদা যখন সাবিত্রীর কথার উত্তরে গর্ব্ব করে বলে ওঠে, "না হলে আর এত কাণ্ড করলে কে? কিন্তু তাও বলি খাও বলিলেই খাব কেন? মান ইজ্জত নেই কি?" তখন একদিকে যেমন আমরা প্রবল হাসির বেগ চেপে রাখতে পারিনা আর একদিকে তেমনি মানুষের এই নিদারুণ অজ্ঞতায় চিত্তের কাণায় কাণায় করুণা ভরে ওঠে। 'দত্তা'য় পরেশ যখন এগার গণ্ডার স্থানে কত কৌশলে বার গণ্ডা বাতাসা সওদা করে এনেও তার 'মাঠান'কে প্রসন্ন করতে পারে না তখন তার ব্যর্থতায় আমরা যে অট্টহাসি করে উঠি তা শুধু অবিমিশ্র আমোদের উল্লাস নয়। নন্দ মিস্ত্রির "বিশবছরের পরিবার" টগর যখন রেগে শাসিয়ে ওঠে, "হলোই বা বিশ বচ্ছর! পোড়া কপাল! জাত বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবর্ত্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বচ্ছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি? সে কথা কারও বলবার যো নেই! টগর বোষ্টমী মরে যাবে, তবু জাতজন্ম খোয়াবে না—তা জানো?" সে কথা শুনে আমাদের মুখে ঠিক শ্লেষের হাসি আসে না,—যে হাসি আসে তার মধ্যে থাকে অনুকম্পা। মানুষের দুর্ব্বলতাকে শিল্পী শরৎচন্দ্র কোথাও শ্লেষ করতে পারেন নি। সুনিপুণ স্বর্ণ-তুলিকা দিয়ে যেখানে নিছক ব্যঙ্গচিত্র এঁকেচেন, সেখানেও শুধু মধুই ঝরেচে, হুল ফোটার সম্ভাবনা ঘটেনি। "শ্রীকান্ত" দ্বিতীয় পর্ব্বে বর্ম্মী স্ত্রীর স্বামী চট্টগ্রামবাসী বাবুটির দাদার মুখে যখন শুনতে পাওয়া যায়, "আপনি যে অবাক করলেন মশাই। পুরুষ বাচ্চা, বিদেশ-বিভুঁয়ে পুরুষ এসে বয়েসের দোষে না হয় একটা সখ করেই ফেলেচে। কোন্ মানুষটাই বা না করেন

বলুন ? আমারত' আর জানতে বাকি নেই, এর না হয় একটু জানাজানি হয়েই পড়েচে,—তাই ব'লে বুঝি চিরকালটা এমনি করেই বেড়াতে হবে ? ভাল হয়ে সংসারধর্ম্ম করে পাঁচজনের একজন হতে হবে না মশাই ? এ বা কি ! কাঁচা বয়সে কত লোকে হোটেলে ঢুকে যে মুর্গী পর্য্যন্ত খেয়ে আসে। কিন্তু বয়স পাকলে কি আর তাই করে, না করলে চলে ? আপনি বিচার করুন না, কথাটা সত্যি বলচি, না মিথ্যে বল্‌চি।"—এর মধ্যে মানুষের নির্ব্বোধ সংস্কারের বিরুদ্ধে নিছক শ্লেষের গন্ধ আবিষ্কার করলে মনে হয় শরৎচন্দ্রকে ভুল বোঝা হবে। তৃতীয় পর্ব্বে "মধুডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ" চিত্রটির ব্যঙ্গ যেমনি অনবদ্য, তেমনি কটাক্ষহীন, সুস্থ, সুন্দর এবং সুখ-পাঠ্য। তাঁর হাসির মধ্যে কোথাও বিদ্বেষ জমে ওঠে নি। বর্ম্মাগামী জাহাজের উদরের মধ্যে "কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র ও কুমারিকা হইতে চীনের সীমানা পর্য্যন্ত যত প্রকারের সুরব্রহ্ম আছেন" তাঁদের আরাধনার অপরূপ চিত্রে অথবা, "যাই বলুন বাবু, কাবলি জাতটাকে নেমকহারাম বলা যায় না। ওরা রসগোল্লাও যেমন খায়, ওর কাবুলদেশের মোটা রুটীও অমনি বেঁধে দেয়। ফেলিসনে টগর তুলে রাখ, তোর মালসাভোগে লেগে যেতে পারে।"—নন্দ মিস্ত্রির এই মতামতে কোন দ্বেষের পরিচয় নেই, আছে শুধু হাস্যশিল্পীর সজাগচিত্তের অপরিমেয় রসবোধ।

শরৎসাহিত্যে হিউমারের বিশেষত্ব হচ্চে হাস্যকর চরিত্রের প্রতি ইংরেজ সাহিত্যিক ল্যামের (Charles Lamb) মত শিল্পী শরৎচন্দ্রের অনন্যসাধারণ অনুকম্পা। কোনো চরিত্র-কেই তিনি পুরোপুরি হাস্যাস্পদ হতে দেন নি। যে মুহূর্ত্তে কারো দুর্ব্বলতা বা অপসঙ্গতি নিয়ে হেসেচেন পরমুহূর্ত্তেই তার অন্তরের এমন একটা বিশিষ্ট চিত্র আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেচেন যে, আপনা থেকেই আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়েচে। "অরক্ষণীয়া"র 'পোড়াকাঠে'র বাইরেটা যতই 'তাড়কা'র মত হোক, অন্তরটা কিন্তু পোড়া-কাঠ ছিল না। শম্ভু যখন ভাগ্নীর বিয়ের জন্যে জোর করে দুর্গাকে রাজী করাবার চেষ্টা করছিল তখন হঠাৎ "রঙ্গস্থলে পোড়াকাঠ দেখা দিলেন। দুই হাত গোবর-মাখা, বোধ করি তখনো গোয়াল ঘরের ব্যবস্থাই করিতেছিলেন। উঠানের উপর আসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া অকস্মাৎ ভাঙ্গা কাঁসীর মত খ্যান্ খ্যান্ করিয়া বাজিয়া উঠিলেন,—'বলি, সুপাত্তরটি কে গা ঠাকুর ? একবার শুনতে পাইনে ?" এই এক নিমিষেই 'পোড়াকাঠ' তার বিকট চেহারা এবং ততোধিক বিকট হাসি এবং কর্কশ কণ্ঠস্বর নিয়ে আমাদের হৃদয় জয় করে ফেলে। "শ্রীকান্ত" তৃতীয় পর্ব্বে চক্রবর্ত্তী গৃহিণীর প্রথম পরিচয়ে যে হাসি ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়, ঘটনা পরম্পরায় শেষে তাঁর রমণী-হৃদয়ের মাধুর্য্য যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন আমাদের অশ্রু আর চেপে রাখা যায় না। "পণ্ডিতমশাই" উপন্যাসে কুঞ্জর সমস্ত দুর্ব্বলতা ও বিভ্রান্তিকে ছাপিয়ে ওঠে তার প্রতি আমাদের অনুকম্পা। আপাত দৃষ্টিতে সে অনুকম্পা যতই অহেতুক বলে মনে হোক্, শিল্পীর লেখনই যে এর প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। "বৈকুণ্ঠের উইলে" গোকুলের উদ্‌ভ্রান্তিই তার চরিত্রের সম্পদ। মাতামহের বিত্তলাভের সুদীর্ঘ আশায় নির্ভর-শীল শশীর কাহিনী শেষ হলে পূর্ব্বেকার হাসির বদলে চোখের কোণে অশ্রুকণা জমে ওঠে। সমগ্র শরৎসাহিত্যের মধ্যে মনে হয় কেবল মাত্র একটী হাস্যাস্পদ চরিত্র লেখকের হাতে বিশেষ কোন অনুকম্পা পাবার সৌভাগ্য লাভ করেনি। তা হচ্চে "ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা'র গায়ক, দর্জ্জিপাড়ার মাসতুতো ভাই। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে, এই ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে কোথাও কোনও দরদহীন শ্লেষের ভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। কটাক্ষ যদিও বা থাকে কিন্তু তাতে মর্ম্মান্তিক জ্বালা নেই।

শিল্পী ল্যামের আরো একটী চারিত্রিকতা শরৎচন্দ্রের হিউমারে দেখা যায়। মনে হয়, এই বিশিষ্টতার জন্যেই বাঙলাসাহিত্যে হিউমার-শিল্পীদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের স্থান অনেক উচ্চে। কথাশিল্পীর হিউমারের মধ্যে অনেক সময় হাসি ও অশ্রুর আলোছায়া একসঙ্গে গ্রথিত হয়ে থাকে। যেখানে শুধুই হাসি প্রত্যাশা করা যায়, সেখানে হঠাৎ এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। আবার যেখানে অশ্রু ঝরাই স্বাভাবিক সেখানে অকস্মাৎ ঠোঁটের কোণে একফালি স্নিগ্ধহাসি ভেসে ওঠে। এই একসঙ্গে হাসি কান্নার রেশমী সুতো দিয়ে বোনা হিউমার খুব উঁচুস্তরের প্রতিভার পরিচয় দেয়। সাহেবের লাথি খেয়ে যারা উঁচুপিপার আড়ালে গিয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁত বার করে হাসে, তারাই আবার যখন স্বদেশী

ডাক্তারবাবুর কথায় আত্মসম্মানবোধে আঘাত পেয়ে চড়াকণ্ঠে বলে, "তুমি ডাক্তারবাবু, ব্যাটা বলবার কে? কারো কর্জ্জ করে খায়ে হাসতেচি মোরা?" তখন হাসি ও অশ্রু একসঙ্গে আমাদের চিত্ত তোলপাড় করে তোলে। "অরক্ষণীয়ার" দুর্গা যখন হরিপালের দাশু পিয়নকে বলে, "না দাশু, তোমার ব্যাগটা একটু ভাল ক'রে দেখো—আসতেও পারে। তিন তিনখানা চিঠির জবাব দেবেনা,—আমার অতুল ত তেমন ছেলে নয়।"—তখন সেই হাস্যরসের মধ্যে মাতৃহৃদয়ের পুঞ্জিত আশা ও বেদনার ফল্গুধারা কি আমাদের অন্তর স্পর্শ করেনা? ব্যাণ্ড সাহেবের মৃত্যুদৃশ্যের বিভীষিকার মাঝে স্নিগ্ধহাসির দীপ্তি কে কল্পনা করতে পারে? "আমি যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। মেয়েটির নাম কালিদাসী, জিজ্ঞাসা করিলাম, কালী কারও দু'একখানা বিছানা পাওয়া যাবে?

কালী কহিল, না।

কহিলাম, দুটী খড়টড় যোগাড় করে আনতে পারো? কালী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, এখানে কি গরু আছে?

কহিলাম, বাবুকে তা'হলে শোয়াই কোথায়?

কালী নির্ভয়ে মাটি দেখাইয়া কহিল, হেথাকে। উ কি বাঁচবেক্। তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া মনে হইল এমন নির্ব্বিকল্প প্রেম জগতে সুদুর্লভ। মনে মনে বলিলাম, কালী, তুমি ভক্তির পাত্র। তোমার কথাগুলি শুনিলে আর মোহ-মুদ্গর পাঠের আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু আমার সেরূপ বিজ্ঞানময় অবস্থা নয়, লোকটা এখনও বাঁচিয়া; কিছু একটা পাতা চাই-ই।"

শরৎচন্দ্রের হিউমার-সৃষ্টি সময়ে সময়ে নিগূঢ় ব্যথায় সকরুণ হয়ে উঠেচে, "ভিতর হইতে জবাব আসিল, হ্যাঁ, সবাই আসে পথ ভুলে! মুখপোড়া অতিথের আর কামাই নেই। ঘরে না আছে একমুঠো চাল, না আছে একমুঠো ডাল,—খেতে দেবে কি উনুনের পাঁশ?

আমার হাতের হুঁকা হাতেই রহিল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন, আহা কি যে বল তুমি! আমার ঘরে আবার চাল ডালের অভাব; চল চল, ভেতরে চল, সব ঠিক করি দিচ্চি।

চক্রবর্ত্তী গৃহিণী ভিতরে যাইবার জন্য বাহিরে আসেন নাই। বলিলেন, কি ঠিক করে দেবে শুনি? আছেত' খালি মুঠোখানেক চাল, ছেলেমেয়ে দুটোকে রাত্তিরের মত সেদ্ধ করে দেব। বাছাদের উপুসি রেখে ওকে দেব গিলতে মনেও কোরোনা।

মা ধরিত্রি, দ্বিধা হও। ব্যাকুল হইয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে চক্রবর্ত্তী সজোরে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, অতিথি নারায়ণ। বিমুখ হয়ে গেলে গলায় দড়ি দেব।

গৃহিণী কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, তৎক্ষণাৎ চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করিয়া কহিলেন, 'তা হলেত' বাঁচি। ভিক্ষেসিক্ষে করে বাছাদের খাওয়াই।' নিঃস্ব নিঃসম্বল গৃহস্থের সৎকামনা ও অবস্থা-বিপর্য্যয়ের এই অসঙ্গতির চিত্র পড়তে পড়তে পাঠকের চিত্তে হাসিকান্নার রৌদ্র-বৃষ্টি শেষে নিদারুণ বেদনার স্পর্শে ঘন অশ্রুবর্ষণে পরিণত হয়। আমাদের হাসিকান্না একই বস্তুর এ-পিঠ ও-পিঠ। উভয়ের মধ্যে বিভেদ রেখা খুবই সূক্ষ্ম। গভীর বিষাদের পটভূমিতে যিনি এরূপ হাস্যরস রূপায়িত করে তোলেন, তাঁর শিল্প-প্রতিভা যে খুব উঁচুস্তরের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্রথম রাত্রি

শ্রীনীলিমা দাস

প্রদীপ নিভায়ে দাও, খোলো সব গৃহ-বাতায়ন ;
বাহিরে রজনী আজি রজত বরণ !
বাতাসে সুরভি ভাসে, জ্যোছনায় মদমধু ক্ষরে ;
এ-রাত বরিয়া লও তোমাদের মধুর বাসরে !

ক্ষণেক দাঁড়াও আজ মুক্ত ওই বাতায়ন-পাশে,
বাতাস মরিয়া যাক্ তোমাদের তনুর সুবাসে ,
উঠুক উথলি বুকে উতরোল বাসনা-জোয়ার,
আজিকার রাত পরম চমৎকার !
চুলে আর চোখে পড়ুক ঝরিয়া জ্যোছনার যুইফুল,
জ্যোছনা নয়—এ শ্বেতবলাকার পাখা !
নাগরিকা অভিসারিকা এ-রাতে,নগর ঘুমে আঢুল ;
তোমাদের চোখে মদিরার মোহ-মাখা !

* * *

হাজার তারার ভারে মু'য়ে পড়ে আকাশ-আঙন,
বাহিরে রজনী আজি রজতবরণ !
বাতাসে ভাসিয়া আসে মদশ্বাস সুরভি হেনার ;
এ-রাত জীবনে কভু নাহি ফিরে আসে দুইবার !

চরম প্রতীক্ষা-শেষে পরমসুন্দর এই রাত ;
অনেক আশার শেষে দুয়ারে বন্ধুর করাঘাত !
জ্যোছনায় মধু ক্ষরে, বাতাসে সুরভি আসে ভাসি,'-
দুটি প্রাণ যাপে পরম পৌর্ণমাসী !
জীবনে প্রথম স্বাদ ; বাসনার স্বফল স্বপন ;
নয়নের নভে ইন্দ্রধনুর রাগ !
অতনু লভিবে তনু,—এলো তার পরম লগন !
দু'জনার বুকে উথলে প্রেম-সোহাগ ।

আজ আলো-জ্বালা নয় ; খুলে দাও গৃহ-বাতায়ন,
বাহিরে রজনী আজি রজতবরণ !
বাতাসে সুরভি ভাসে, জ্যোছনায় মদমধু ক্ষরে ;
এ-রাত বরিয়া লও তোমাদের মধুর বাসরে।

জীবনে প্রথম-রাত, বাসনার প্রথম বাসর ;
অতনু লভিবে তনু,—এল তার পরম প্রহর !
শিশিরমুকুতা ঝলে ফুলদলে, শিয়রে পাতার ;
এ-রাতে আকাশ দেখে মুখ তার পৃথিবী-প্রিয়ার !
দাঁড়াও আজিকে দোঁহে মুখোমুখি আর হাতে-হাত,
জেগে থাক্ চোখে বাণীহীন বিস্ময় :
করগো চঞ্চল আজ মধুময় বসন্তের রাত,—
এ-রাত জাবনে দুর্লভ সঞ্চয় !

*
* *

প্রথম বাসর রাত, বাসনার সফল স্বপন !
বাহিরে রজনী আজি রজতবরণ !
তারকা ঝরায় প্রেম, বসুধা শিহরে সুধা পিয়া ;
সুদূর তনুর তীরে এই রাত তৃষ্ণা-জাগানিয়া !

বাতাসে সুরভি ভাসে, আকাশে এখনো মধুরাত !
আবেগে অধর কাঁপে, তবু কি রহিবে হাতে-হাত ?
মহার্ঘ মাহেন্দ্রখন এল, তারে করগো বরণ,
দেহের আধারে আজি দেহাতীত লভুক্ জীবন !
হাজার তারার চোখে পৃথিবীর প্রথম প্রণয় ;
শবরী শিহরি ওঠে, যৌবন চঞ্চল !
কামনার ধূপধূমে হোক আজি প্রেমের বিলয়,—
ঊর্দ্ধমুখী হোক্ শুধু দেহ-শতদল !

*
* *

হাজার তারর ভারে নুয়ে পড়ে আকাশ-আগুন,
বাহিরে রজনী আজি রজতবরণ !
বাতাসে সুরভি ভাসে, জ্যোছনায় মদমমধু ক্ষরে।
এ-রাতে দু'জন বুঝি দু'জনার দেহে ডুবে মরে !

বনে বনে প্রসূনের অপরূপ রূপের উৎসব,
তনুর তর্পন তরে তারা বুঝি রচে কোন স্তব !
আকাশের কূলে কূলে উথলে দুধের পারাবার,
আজিকার রাত পরম চমৎকার !
অধরে চুম্বন কাঁপে, আলিঙ্গন বক্ষে আছে থামি,'—
আঁখিতে উথলে অকথিত বিস্ময় !
সফল সফরী যাপে আজ তারা দু'টি দেহকামী ;—
এ-রাত জীবনে দুর্লভ সঞ্চয় !

৩

প্রায় বছর পাঁচেক কাট্‌লো। আমি তখন সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ি; পড়াশুনায় ভাল ছেলে বলে আমার একটা সুনামে তখন চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছে। বরাবর ক্লাশে ফার্ষ্ট হয়ে উঠে এসেছি এবং গ্রামের সকলের কাছেই আদর যত্ন খাতির—আমার যেন নিত্য পাওনা হয়ে উঠেছিল।

দাদার পড়াশুনা বাড়ীর মাষ্টারের কাছে বেশ ভালই হচ্ছিল—শুন্‌তাম। ইংরেজী ভাষার উপর দাদার দখল কোনও কালেই হয়নি—হলোওনা। কিন্তু বাংলা ভাষা, সংস্কৃত, অঙ্ক—ইত্যাদি বিষয়ে দাদা নাকি বেশ শিক্ষালাভ করেছেন।

শুধু তাই নয়, শুনে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম, হিন্দু শাস্ত্রের উপর দাদার নাকি এরই মধ্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মেছে। দাদার বয়স তখন ২০ কি ২১ বৎসর। কিন্তু এই বয়সেই দাদার স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিলাম। কথা এখন প্রায় বলেনই না, সমস্ত দিনে রাত্রে একটি-দুটি ছাড়া। দুবেলা ভাত খেতে বসে দাদা কারও সঙ্গে কথা বলতেন না, এবং কি শীত কি গ্রীষ্ম রোজই তিনবেলা পুকুরের ঘাটে অবগাহন স্নান করতেন। এবং স্নান করে উঠেই ভিজে কাপড়ে মার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিতেন। রোজ দুবেলা মার পূজো করে গিয়ে কি সব জপ্‌ তপ্‌ করতেন এবং অমন যে চুলের বাহার ছিল সেগুলোকে ছোট ছোট করে ছেঁটে ফেলেছেন।

এ-সমস্ত শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণা দাদা যে কোথা থেকে পাচ্ছিলেন—সে খবরও আমার কানে এল। দাদার গ্রাজুয়েট মাষ্টারটীও ছিলেন ঐ দলেরই লোক। তাঁর নাকি কলকাতায় কে একজন সন্ন্যাসী গুরু আছেন, এবং সেই গুরুর শিক্ষা দীক্ষায় তিনি দাদাকে তৈরী করে তুলছিলেন। মাংস বড় একটা বাড়ীতে রান্নাও হত না এবং দাদা কোনকালেই খান না, এবং বাবার ভয়ে স্পষ্ট "মাছ খাইনা" একথা না বল্লেও আমি লক্ষ্য করতাম দাদার ঝোলের বাটীতে প্রায়ই মাছ পড়ে থাকৃত—স্পর্শও করতেন না। দাদার মাষ্টারটীও অবশ্য যখন থেকে এলেন, তখন থেকেই শুনেছিলাম নিরামিষাশী।

যাই হোক, বাইরের এসব জিনিযের মূল্য কিছু থাক্‌ বা নাই থাক—ভিতরের দিক দিয়ে দাদার প্রাণের প্রসারতা যে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল, তারও স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। গ্রামের লোকের অসুখে বিসুখে বিপদে আপদে দাদা ছিলেন সর্ব্বাগ্রণী। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর হাত থেকে রোগীকে বাঁচাইবার জন্য দাদার অক্লান্ত সেবা একটা দেখার জিনিষ ছিল—সে যেখানেই হোক্‌ না কেন। শুধু আমাদের গ্রামের নয়, আসে পাশের গ্রামেরও কোন দুস্থ পরিবারের এই রকম কোনও বিপদের কথা শুনলে, কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি রাত, কি দিন দাদা যেন অস্থির হয়ে উঠতেন, ছুটে যেতেন সেবা করবার জন্য।

একদিন একটা ব্যাপারে বিশেষ করে বুঝতে পেরেছিলাম দাদার প্রাণে প্রেমের গভীরতা কতখানি। তখন বর্ষাকাল। সকাল থেকে থেকে-থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। সমস্তদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল তবু বৃষ্টির বিরাম নাই। এমন সময় আলী মিঞার গ্রাম থেকে একটী লোক ছুটে এল, মাথায় ছাতি হাতে একটা লাঠি ও হ্যারিকেন। ছুটে এসে খবর দিলে

আলী মিঞার বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীতেই একটা ছেলেকে সাপে কামড়েছে। আলী মিঞা অবশ্য তৎক্ষণাৎ নিজের বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এবং দাদারও বিশেষ ইচ্ছে হল আলী মিঞার সঙ্গে যান। কিন্তু দাদার সকাল থেকে শরীরটা ভাল ছিল না, জরভাব হয়েছিল—তাই আমি দাদাকে এই বাদলায় বেরুতে বারণ করলাম। বললাম "তুমি যখন সাপের ওঝা নও তখন তুমি গিয়ে আর বেশী কি করবে।" আমার যুক্তিযুক্ত নিষেধ শুনেই হোক বা বাবা বাড়ীতে ছিলেন তাঁর ভয়েই হোক, দাদা চুপ করে গেলেন।

আমি আর দাদা এক ঘরে শুতাম। উপরে ভিতর মহলে পাশাপাশি চারখানা ঘর এবং সামনে পূবে বারান্দা। দক্ষিণের ঘরটাতে বাবা ও মা শুতেন, তার পাশের ঘরটাতে কেউ শুত না, তার পাশের ঘরটাতে শৈলি ঝি শুত, এবং উত্তরের ঘরটাতে শুতাম আমি এবং দাদা। রাত্রে খেয়ে দেয়ে শুয়েছি—বাইরে বনে বনে গাছে গাছে ঝুম্ ঝুম্ একটা বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার ঘরে চোখ বুজে সেই শব্দ সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে শুন্তে শুন্তে শরীর এলিয়ে ঘুম এল। এমন সময় দাদা হঠাৎ বিছানায় উঠে বস্লেন। আমাকে ঠেলে বল্লেন, "দেখ সুসন, একটা বড় ভুল হয়ে গেছে।"

আমি বল্লাম "কি হলো আবার?"

"আলী মিঞাকে বলে দেওয়া হয়নি, ছেলেটাকে যেন ঘুমুতে না দেওয়া হয়। তাহলেই সর্ব্বনাশ! ঘুমুলেই সাপের কামড়ে রক্ষে নেই।"

আমি বল্লাম "সে যা হওয়ার এতক্ষণে হয়ে গেছে। এখন আর ভেবে লাভ কি?"

দাদা বল্লেন, "তা বলা যায় না। দেখ্, আমি একবারটী যাই। যাব আর আসব। কেউ টের পাবেনা।"

আমি বল্লাম, "তুমি কি পাগল হলে নাকি; তোমার জর, বাইরে এই বৃষ্টি পড়ছে, আর তুমি এই রাত্রে জল-কাদায় অন্ধকারে ভগতী যাবে?'

দাদা বল্লেন, "হয়ত আমি গিয়ে পড়লে ছেলেটা বেঁচে যেতে পারে।"

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গানর দরুণ আমার একটু রাগও হয়েছিল। একটু রুক্ষস্বরে বল্লাম "সে হয়না দাদা। তুমি চলে গেলে আমি এ ঘরে একলা শুতে পারবনা। আর তোমারও অন্ধকারে দু মাইল রাস্তা একলা যাওয়া হতে পারে না।"

বেশ মনে আছে, দাদা আর কিছু বল্লেন না, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লেন।

পরের দিন সকালবেলা শুনেছিলাম ছেলেটী শেষরাত্রে মারা গিয়েছে। শুনলাম ছেলেটী বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। মা শোকে প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠেছে। শুনে কেমন যেন একটা লজ্জা হল আমার, দাদার কাছে। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। সমস্ত দিনটা দাদার সামনে থেকে একটু একটু দূরে দূরে বেড়াতে লাগলাম। দাদা অবশ্য এ বিষয় আমাকে আর—কিছুই বলেন নি।

* * * * * * *

মুকুন্দ একদিন আমাকে বল্লে শুনেছ শান্তদা, বড়দার সঙ্গে যে মন্টির বিয়ে? শুনে আমি অবাক হয়ে মুকুন্দর মুখের দিকে চাইলাম। কৈ এতবড় খবরটা কিছুই আমি শুনিনি।

মুকুন্দর একটু পরিচয় দি। মুকুন্দচরণ সাহা জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার ভাই হয়। বেশী দূরেরও সম্পর্ক নয়। শুনেছি নাকি মুকুন্দর বাড়ীতে কেউ মারা গেলে আমাদের এখনও একমাস অশৌচ প্রতিপালন করা বিধি।

মুকুন্দরাও জমিদার। আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঠিক নদীর পারেই মুকুন্দদের বাড়ী। একতালা থেকে আমাদের পুকুর পাড়ের বাগান আড়াল করে, কিন্তু আমাদের বাড়ীর দোতালা থেকে মুকুন্দদের বাড়ীর বারান্দায় মোটা মোটা থামগুলি দুটো বড় বড় কদম্ব গাছের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। মোটের উপর আমাদের বাড়ীর চেয়ে ছোট হলেও, মুকুন্দদের বাড়ীটি দেখতে অনেক সুন্দর। বিশেষ করে সব চেয়ে আমাকে মুগ্ধ করত নদীর পার থেকে মুকুন্দদের বাড়ীর ছবিটী। বেগবতী নদীর পারের রাস্তাটীর ধারে ধারে বড় বড় দেবদারু গাছের মধ্য দিয়ে দেখা যায় মুকুন্দদের বাড়ীর মোটা মোটা থামওয়ালা বারান্দা—বাড়ীর তিনদিকে ঘুরে গিয়েছে।

বেশ মনে পড়ে ছেলেবেলায় অনেক সময় নদীর কিনারা হতে মুকুন্দদের বাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে আমি ভেবেছি—মুকুন্দদের বাড়ীটা যদি আমাদের হত।

গ্রামের লোকেরা মুকুন্দদের বাড়ীকে 'ছোটবাড়ী' ও আমাদের বাড়ীকে 'বড়বাড়ী' বলত। আমার বাবা ছিলেন গ্রামের 'বড়বাবু' এবং 'ছোটবাবু' ছিল মুকুন্দর বাবার পরিচয়। শুনেছিলাম জমিদারীর দশআনি অংশ আমাদের এবং ছআনি মুকুন্দদের।

ছেলেবেলা থেকেই মুকুন্দ আমার বড় অনুগত। আমার চাইতে দু তিন বছরের ছোট ছিল সে—আমাদের গ্রামের স্কুলেই পড়ত। মুকুন্দ এখন চতুর্থ শ্রেণীতে (ফোর্থ ক্লাশে) পড়ে এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেশীর ভাগই ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। আমার মত মুকুন্দের বাড়ীতে পড়াবার জন্য তার কোনও মাষ্টার ছিল না এবং সেইটে ছিল আমার সঙ্গ পাওয়ার তার সব চেয়ে বড় সুবিধা। "শান্ত-দার কাছে পড়া বুঝে আসি—এই কৈফয়তের জোরে আমাদের বাড়ীতে যখন তখন তার গতিবিধিতে কোনও বাধা ছিল না। এবং লেখা পড়ায় গ্রামে আমার অসামান্য সুযশের দরুণ আমার কাছে 'পড়া বোঝার' মূল্যটা পিতা কেশবচন্দ্র সাহা চৌধুরীকে বোঝাতে মুকুন্দর বিন্দুমাত্র ক্লেশ পেতে হয়নি।

মুকুন্দ ছেলেটীকে আমি বড় ভালবাসতাম। মিষ্টি মিষ্টি কথা, মেয়েলী ধরণের চেহারা এবং মিহি গলার স্বর। মোটের উপর তাকে দেখলেই কেমন যেন ভাল লাগত আমার। রোগা ছোট হালকা ধরণের গড়ন, ফর্সা গায়ের রঙ, ছোট ছোট চোখ, লম্বা ধরণের মুখ, পাতলা পাতলা ঠোঁটে সব সময়ই একটা হাসি লেগে থাকৃত। এ ছাড়া তার গুণও ছিল অনেক, বড় মিষ্টি গান গাইত সে—অন্তত সে বয়সে আমার বিশেষ ভাল লাগত। মনে পড়ে, নদীর ধারে কতদিন সন্ধ্যাবেলা স্কুলের খেলার মাঠ হতে বাড়ী ফিরবার পথে আমি ও মুকুন্দ নদীর কিনারায় জলের একেবারে ধারে গিয়ে খানিকক্ষণ বসতাম, মুকুন্দ গান গাইত আমি শুন্তাম। উচ্চকণ্ঠে গলা কাঁপিয়ে মুকুন্দ গান গাইত—

"আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা"

শুন্তে শুন্তে ওপারের ঐ দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কী যে আমার মনে হত, আমি যেন কেমন এক রকম হয়ে যেতাম, আজও মনে পড়ে। তারপর মনে পড়ে ধীরে ধীরে ওপারের ঐ নুয়ে পড়া বাঁশঝাড়টা অন্ধকারে একটা সহস্র-হস্ত দৈত্যের মত দেখাত—যেন আমাদের ধরবার জন্য ঝুঁকে এগিয়ে আস্ছে। মুকুন্দ ভয় পেত, আমারও শরীর শিউরে উঠ্‌ত। দুজনে উঠে পড়তাম।

* * * *

বেশ মনে আছে, দাদার সঙ্গে মণ্টীর বিয়ে—কথাটা শুনে আমি মোটেই খুসী হতে পারিনি।

মণ্টী মেয়েটীকে আমি দু-একবার দেখেছি। মণ্টী মুকুন্দেরই মামাত বোন। মাঝে মাঝে মুকুন্দদের বাড়ীতে বেড়াতে আস্‌ত। আমাদের গ্রামের দশ বারো ক্রোশ পশ্চিমে ত্রিকলা গ্রামে তাদের বাড়ী। বেগবতী নদী দিয়ে নৌকা করে তাদের বাড়ী যাওয়া যায়।

মণ্টী মেয়েটীকে শেষ দেখেছিলাম, বছর খানেক আগে। বেশ ভাল করে যে লক্ষ্য করেছিলাম, এমন কথা বলতে পারি না, তবে তাকে দেখে আমার যা ধারণা হয়েছিল তাতে তাকে 'সুন্দরী' কোনও দিক দিয়েই বলা চলে না। গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ না হলেও—কালো। একহারা লম্বা গোছের গড়ন, মুখের কোথাও কিছু বিশেষত্ব ছিল বলে মনে পড়ে না।

তাই বোধ হয়, মণ্টীর সঙ্গে দাদার বিয়ে, কথাটা আমার ভাল লাগেনি। আমার দাদা, মাধবপুরের সা চৌধুরীদের ঘরের ছেলে, রতনসার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তার সঙ্গে কিনা একটা অতি সাধারণ কালো মেয়ের বিয়ে হবে। কথাটায় আমার মন মোটেই সায় দিল না।

শুধু তাই নয়, বছর খানেক বছর দেড়েক থেকে একটী রঙ্গিন সাড়ী পরা, মুখের উপর অর্দ্ধেক ঘোমটা টানা, টুকটুকে ফর্সা, পায় আলতা মাখান, একটী ছোটখাট বোঠান আমাদের বাড়ীর অন্দরে বিদ্যুতের মত ত্বরিতপদে এঘরে-ওঘরে বারান্দায় একটা রূপের লীলায়িত তরঙ্গে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে, তার চাপা হাসিতে চাপা কথায় সমস্ত অন্দরমহলটা একটা নতুন রসের শিহরণে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে—এই রকম একটা কল্পনা আমার মনটাকে পেয়ে বসেছিল। যখন এই ছবি আমার মনে ভেসে উঠ্‌ত তখনই তাকে আমার প্রাণের রঙ্গে রঙ্গিন করে তুলেছি—প্রাণভরা প্রীতির নব নব রসে।

কথাটা যেদিন প্রথম শুনেছিলাম সেদিনের কথাও

ভুলিনি। একদিন দুপুর বেলা, এই বেলা ১টা আন্দাজ, আমি আমাদের একতালার একটা ঘরে জানালার উপর উঠে বসে একটা গল্পের বই পড়ছিলাম। খানিকটা বই পড়তে পড়তে কখন যে বই বন্ধ করে এক দৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে—ঝাঁ ঝাঁ শুব্ধ দুপুরের রোদ, আমাদের বাড়ীর পিছনে একটা খোলা প্রান্তরের উপর ছড়ান কতকগুলি বাব্‌লা গাছ এবং আরও কিছু দূরের প্রকাণ্ড একটা তেঁতুল গাছের চারিধারে ছড়ান ছড়ান বাঁশ ঝাড়ের বন—এই সব দেখতে দেখতে একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গেছি, নিজেই জানি না; এমন সময় হঠাৎ টের পেলাম ঘরের বারান্দায় বাবা ভাত খেতে বসেছেন, আর মা একখানা হাতপাখা নিয়ে বাবাকে বাতাস করছেন। একটা কথা আমার কানে এল।

মা বাবাকে বল্লেন, "বড় ছেলেটার এই বেলা একটা বিয়ে দাও, নৈলে যে রকম ওর মতিগতি দেখছি, শেষ অবধি একেবারে বিবাগী না হয়ে যায়।"

কথাটা শুনে কেমন যেন আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। বিয়ে, দাদার বিয়ে, আমার একটী বোঠান! ব্যাস্! সেই থেকে সুরু হল আমার কল্পনা। নানান রূপ নিয়েছে এই বছর দেড়েক ধরে।

তাই, মণ্টী হবে আমার বোঠান—কথাটা কেমন যেন অসম্ভব ঠেক্‌ল। মুকুন্দকে বল্লাম "দূর যত বাজে কথা।"

মুকুন্দ বল্ল—"সত্যি বলছি শান্তিদা! আজ সকালেই রাঙামামীর পত্র এসেছে মার কাছে।"

আমি বল্লাম, "চল ত ভেতরে মাকে জিজ্ঞাসা করি।"

আমি আর মুকুন্দ ভেতরে গেলাম। মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি প্রাঙ্গণ থেকেই চেঁচিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলাম—"হ্যাঁ মা, দাদার সঙ্গে নাকি মুকুন্দর বোন মণ্টীর বিয়ে?"

মা একটু হেসে বল্লেন—"হ্যাঁ, সেই রকম ত কথা হচ্ছে।"

নেহাত মুকুন্দ সামনে ছিল। নৈলে আমি তখুনই মার কাছে জোর করে বলে বস্‌তাম—"তা কিছুতেই হতে পারে না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
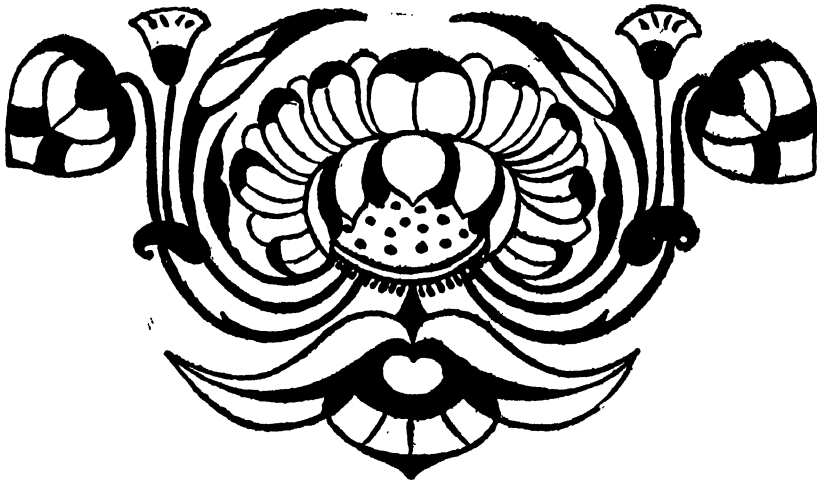
বিজয়োৎসব

অধ্যাপক শ্রীকালীচরণ শাস্ত্রী এম্‌-এ

সজল জলদ আঁধার মাঝারে যেমতি বিজলি হাস,
তেমতি জননি ! অতি সুমধুর তব চারু পরকাশ।
সারাটি বরষ
দুখের পরশ,
তিনটি দিবস মোহন সাজে,
সজ্জিত তনু
গর্ব্বিত অসু
তনয়-হৃদয়ে প্রমোদ রাজে।

উজ্জ্বল তব অঙ্গ আলোকে,
পূর্ণিত দিক্ পুণ্য পুলকে,
লজ্জিত তাপ,
দুঃখিত পাপ,
নির্ম্মল চির নীল আকাশ।
ছড়াইছে তব হাস্য সুষমা প্রান্তরে নব কুসুমকাশ,
উচ্ছল চল মত্ত অনিল আনিছে বহিয়া সুরভি শ্বাস।

গণপতি-মাতা সিদ্ধি-দায়িনী,
শক্তি-ধারক-স্কন্দ-জননী,
লক্ষ্মী-রূপিণী,
বিদ্যা-বাদিনী,
ভক্ত-হৃদয়ে সদা বিলাস।

কামাদি অসুরে
দলি বাম পদে,
পশুরাজ 'পরে
পরম সম্পদে,
অপর চরণ
করিয়া স্থাপন
জানাইছ লোকে পাদ-তাড়নায়—
পাশবিক রীতি
দল নিতি নিতি
কর গো সকলি যাহা করে মায়।

যে মূরতি হেরি'
দূরে যায় সরি'
ঘন হৃদয়েরি
কালিমা সবারি,
নয়নের বারি
রোধিতে কি পারি
সঁপিতে সে-ধনে সলিলের মাঝে ?
উপায় বিহীন
সুতগণ দীন
হৃদি-শতদলে সতত বিরাজে।
সান্ধ্য অনিল আনিল শান্তি, প্রেম বন্যায় প্লাবিত ধরা,
শত্রু মিত্র নাহিক ভিন্ন, দশ দিশি আজি মিলন ভরা।

দুখঃ দৈন্য
পাপ শূন্য
পুণ্য পূরিত ভুবনাকাশ,
ক্লেশ ক্লিষ্ট
বেদনা পিষ্ট
ফুল্ল হরষে শোকেরি ভাষ।

একাঙ্কিকা

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

[দক্ষিণের বারান্দাসংলগ্ন ছোট একখানি ঘর। গৃহস্বামী সুকোমল চৌধুরী বলেন এটি তাঁর গুহা। সাজসরঞ্জামে মনে হয় এখানে চিন্তা ও কর্ম্মের সমুদ্রমন্থন চলিতেছে। অনতিবৃহৎ লিখিবার টেবিলের উপর স্তূপাকারে কাগজপত্র জমিয়া লিখিবার স্থান প্রায় রাখে নাই। কাঁচের আলমারীগুলিতে ঠাসা বই, তাহাদের বিষয়-নির্ব্বাচনে কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব নাই। এ গুলি সুকোমল চৌধুরীর মস্তিষ্কের দৃশ্যমান সংস্করণ,—বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন চিন্তা ঘেঁসাঘেসি ঠাসাঠাসি করিয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীর সঙ্গে রসায়ন সমপংক্তিতে রস পরিবেশন করিতেছে এবং তাহারি গায়ে হেলিয়া আছে "হোমিওপাথিক মহাকাব্য"। চিকিৎসক মহাকবির দুইটিমাত্র ছত্র উদ্ধৃত করিলেই তাহার অন্তঃস্থিত রস পরিস্ফুট হইবে—

"চোখ জ্বালা কুট্ কুট্ চিড়্ বিড়্ তায়
এক ফোঁটা নাক্স দিলে ফল পাবে হায়!"

কবিতায় লেখা চিকিৎসকের মুখস্থের সুবিধার জন্য, এবং শেষছত্রের 'হায়' কথাটি নিরর্থক মিলপ্রয়াসী নয়, চক্ষুরোগাক্রান্ত রোগীর প্রতি সুগভীর সহানুভূতিব্যঞ্জক।

ঘরের এক কোণে দান্তের আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি। মূর্ত্তির গলায় সদ্যমেরামত করা একটা মোটরের টিউব ঝুলিতেছে। দেখিলে ভ্রম হয় অমর কবি পালোয়ান গোবরের মতো পাথরের হাঁসুলি পরিয়া ব্যায়াম-তৎপর। ডিস্‌রেলি দেখিলে ভাবিতেন বৃটিশ কলোনীর কথা, 'millstone round our neck!'

দেয়ালের তাকে একটা বোতলের মধ্যে সামুদ্রিক মৎস স্পিরিটে ডুবানো আছে। তাহার পাশে একটা ব্যাটারি, একটা ভোল্টমিটার, একটা বেহালার ছড়ি, খানিকটা সিরিস্ কাগজ এবং গোটা দুই তিন খানি সিগারেটের টিন। আশ্বিনের মহাঝড় কিম্বা কোয়েটার ভূমিকম্পও এতগুলি বিভিন্নধর্ম্মী জিনিষের একত্র সমন্বয় করিতে পারে নাই

সুকোমল চৌধুরী ঘরে ঢুকিয়া মাথা হইতে টুপিটা দান্তের মর্ম্মর মূর্ত্তির মাথায় চাপাইয়া দিলেন। পিছনে পিছনে তাঁহার স্ত্রী সুনন্দা প্রবেশ করিলেন]

সুনন্দা। ঘরটাকে কি করে রেখেছ দেখ ত! একি তোমার কলেজের ল্যাবরেটরি! পা বাড়াবার পর্য্যন্ত জায়গা রাখ নি।

সুকোমল। দেখ সুনন্দা, দান্তে যদি সোলার হ্যাট্ পরতেন, তাঁকে কবি না দেখিয়ে রাস্তামাপকারী ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারের মতন দেখাত।

সুনন্দা। ঐ কি তোমার টুপি রাখবার জায়গা?

সুকোমল। জায়গা বলে কিছু নেই, মানুষকে পৃথিবীতে জায়গা করে নিতে হবে—হের হিট্‌লার থেকে হেল সেলাসি সবাই এই কথা বলছেন।

সুনন্দা। এই রে:, আবার লেকচার সুরু হল। আমি কি তোমার পোষ্টগ্রাজুয়েটের ক্লাস্?

সুকোমল। একটু সর দিকি, এই বেহালার ছড়িটা চট্ করে মেরামত করে ফেলি।

সুনন্দা। দোহাই তোমার, মিস্ত্রীগিরিটা একটু পরেই কোরো। এখন খুঁজে দাও দিকি আমার চাবির রিংটা—এইখানেই কোথাও ফেলে গেছি।

সুকোমল। দিনে দুশোবার করে তোমার চাবির রিং হারাচ্ছে, কাঁহাতক আর খুঁজি বল। বেহালার ছড়িটা আজই মেরামত করা চাই। Procrastination is the thief of time.

সুনন্দা। তা হলে procrastination না করে সঙ্গে সঙ্গে এক্ষুনি ছোট্টদেখে একটি দাড়ী গজিয়ে ফ্যালো, বুঝেছ মিস্ত্রী মশাই, আর একটি যৎপরোনাস্তি-খাটো ফতুয়া পর। কানের পাশে গোঁজা থাকবে আধপোড়া বিড়ি, আর সবাই ডাকবে 'এ খয়রাতি মিস্তিরি!'—নামকরণটি হচ্ছে তোমার বিনাপয়সার মিস্ত্রীগিরির সামঞ্জস্যে। কেমন?

সুকোমল। আমার চেহারা দেখে তোমার বুঝি কোথাকার কোন্ খয়রাতি মিস্ত্রীর কথা মনে পড়ে?

সুনন্দা। হায় রে পুরুষমানুষের Vanity! তবু দেখতে যদি হরেনদাকে!

সুকোমল। দেখ সুনন্দা, কতবার তোমাকে বলেছি তোমার হরেনদার সঙ্গে আমার তুলনামূলক সমালোচনাটা আমার একেবারে প্রীতিকর নয়।

সুনন্দা। এটা তোমার হিংসে। হরেনদার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল কি না, তাই তোমার হিংসে।

সুকোমল। হিংসে হবে নাই বা কেন শুনি?

সুনন্দা। হিংসে হবেই বা কেন শুনি?

সুকোমল। আমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হওয়াটাও ত গুরুতর দোষের।

সুনন্দা। ওঃ ভারি জুলুম দেখছি। বিয়ের আগে থেকেই আমার ওপর তোমার দখল জন্মেছে নাকি?

সুকোমল। নিশ্চয়, ভবিতব্যের দখল। 'তোমায় চোখে দেখার আগে তোমার স্বপন চোখে লাগার' দখল।

সুনন্দা। আর ন্যাকামি করতে হবে না, ঢের হয়েছে। দখল! পুরুষমানুষগুলা কী ভয়ঙ্কর primitive হয় তার প্রমাণ তুমি। বনমানুষের যুগ থেকে আরম্ভ করে আজো তোমাদের গায়ের লোম সমানে গজিয়ে আসছে। তুমি হচ্ছ Galsworthyর Soames Forsyte—'man of property' —তুমি হচ্ছ "যোগাযোগের" মধুসূদন—

সুকোমল। আমি ভাবছি মস্ত একটা বই-লিখব। Galsworthy আর কবি আমাদের ওপর যে অবিচার করেছেন তার শোধ নিতে,—বই-এর নাম হবে "মধুসূদন speaks"।

সুনন্দা। বৃথা পণ্ডশ্রম কোরো না। সবাই ত তোমার মতো primitive নয়, কেউ পড়বে না। কী চমৎকার চরিত্র দেখ দিকি Jolyon—ওদিকে Jolyon—আর এদিকে হরেন দা।

সুকোমল। বটে বটে, ওদিকে Jolyon আর এদিকে হরেন দা,—ওপারে গঙ্গা এপারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর, আমি হচ্ছি সেই চর, না?

সুনন্দা। সব সময় 'আমি,' 'আমি,' 'আমি'। একেবারে typical egotist বাঙালী স্বামী। তুমি হচ্ছ শরৎবাবুর শ্রীকান্ত, প্রচ্ছন্ন আত্মগরিমাতেই মসগুল। মুখে বলো, 'আজ্ঞে, আজ্ঞে, আমি কিছু না, আমি একেবারে নগণ্য'—কিন্তু পান থেকে চুনটি খস্‌লেই হাতে মাথা কাটতে আসো। মুখে মস্ত মস্ত কবিতা আউড়ে বলো নারীর সম্ভ্রম, কিন্তু মনে মনে চাও নারী দাসী বাঁদীর সামিল হয়ে থাকুক।

সুকোমল। আমাকে যা খুসী বলতে পার, কিন্তু বেচারা শরৎবাবুকে রেহাই দাও।

সুনন্দা। এমন একজনকেও দেখলুম না যে, মেয়েদের জন্যে সত্যি দরদ দেখায়। সবাই শিকারী বেরালের মতো গোঁফ ফুলিয়ে বসে আছে, কেবল এক হরেনদা ছাড়া।

সুকোমল। তোমার হরেন দা হচ্ছেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

সুনন্দা। আমর বেশ মনে আছে একদিন রাত্তির বেলা আমাদের পাঁচীল থেকে লাফ দিতে যেয়ে তৈলক্ষ্যর পা ভেঙে গেল—

সুকোমল। তৈলক্ষ্য? তৈলক্ষ্যটা আবার কে? তোমার আর এক বাল্যবন্ধু বুঝি? রাত্তির বেলা তোমাদের বাড়ীর পাঁচীল টপকায়—এতো ভাল কথা নয়!

সুনন্দা। ন্যাকামি কোরো না, তৈলক্ষ্য আমার বেরালের নাম।

সুকোমল। বেরালের নাম তৈলক্ষ্য! 'হে বিজয়ী বীর তরুণ উষার প্রাতে!'

সুনন্দা। তার মানে?

সুকোমল। ও কথায় কান দিয়ো না। ওটা আমার আশ্চর্য্যাত্মক উচ্ছ্বাস। বলে যাও, তারপর কি হল।

সুনন্দা। হরেনদা আমার চীৎকার শুনে একেবারে আইডিনের শিশি হাতে করে দৌড়ে এল। কী দরদ! এমন দরদ তুমি দেখেছ?

সুকোমল। দেখেছি বইকি। সেবার আমাদের কালু জমাদার মদ খেয়ে পা ভেঙেছিল। বললে ভয়ানক দরদ। স্বচক্ষে দেখেছি তার হাঁটুটা কুমড়োর মতো ফুলে উঠেছিল।

সুনন্দা। তোমার মাথা! সেবার মহীন্দরের যখন গলায় মাছের কাঁটা ফুটে গেল—

সুকোমল। এক বেরালের নাম তৈলক্ষ্য আর এক বেরালের নাম মহীন্দর। সংখ্যাও যেমন অগুন্‌তি, নামও তেমনি অভিনব।

সুনন্দা। ন্যাকামি কোরো না।

বেরালের নাম হয়। মহীন্দর আমার মাসতুতো ভাই। হরেনদার তুলনা হয় না। তৈলক্ষ্যর বেলাও যেমন—

সুকোমল। মানে, তোমার মাস্‌তুতো ভাইয়ের বেলা—

সুনন্দা। না, না, বেরালের বেলা—

সুকোমল। ও হাঁ—

সুনন্দা। মহীন্দর, মানে আমার মাসতুতো ভাইয়ের বেলাতেও তেমনি, হরেন দা—

সুকোমল। তার গলায় আইডিন ঢেলে দিলে, এই ত? নিশ্চয় কোনো মৎলব ছিল। সুস্থলোকের গলায় কখনো মানুষে আইডিন ঢালে!

সুনন্দা। তুমি একটা ভূত, একটা Callous brute!

সুকোমল। দুভাষায় গালাগালি, যেন double-barrelled gun! এই জন্যেই Dr. Johnson বলেছিলেন যে one tongue is good enough for a woman!

[সুনন্দার মাতা প্রবেশ করিলেন]

সুনন্দার মাতা। কই তোমরা বেড়াতে যাবে না? আমি ত তৈরি। [দুজনেই চুপচাপ] কি হয়েছে তোমাদের? মুখে কথা নেই যে? কি হয়েছে মা?

সুনন্দা। নাঃ এম্‌নি।

সুনন্দার মাতা। কি হয়েছে বাবা?

সুকোমল। নাঃ অম্‌নি।

সুনন্দার মাতা। এ বলে 'নাঃ এম্‌নি' ও বলে 'নাঃ অম্‌নি', —নিশ্চয় তোমাদের আবার ঝগড়া হয়েছে, না? [দুজনেই নীরব] দুদিনের জন্যে তোমাদের কাছে এসেছি বাছা, কোথায় দেখব সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছ, তা নয় কেবলই ঝগড়া, কেবলই ঝগড়া। এর জন্যে আমি সুনন্দাকে কিছুতেই দোষ দিতে পারবনা বাপু, ও আমার তেমন মেয়েই নয়। আমরা ওকে তেমন শিক্ষাই দিইনি। সব জায়গাতে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে এম্‌নি শিক্ষাই দিয়েছি। অমন মিষ্টি স্বভাব, অমন মিষ্টি কথাবার্ত্তা আর কোনো মেয়ের দেখিনি। নিজের মেয়ে বলে বড়াই করছি ভেবো না বাছা। কি হয়েছে মা?

সুনন্দা। (রুদ্ধস্বরে) উনি আমাকে অপমান করেছেন।

সুনন্দার মাতা। সে আমি আগে থেকেই জানি। আমারো কিছু কিছু জ্ঞানগম্যি আছে ত। বিয়ে যখন হয়, পাড়ার বামুন মাসী বলেছিল, জামাইটি তোমার সুবিধের হবে না বোন্‌ঝি। কথাবার্ত্তা বেশী বলে না, অমন চুপচাপ দেখে তখুনি আমার মনে কেমন সন্দেহ সন্দেহ হয়েছিল। ছিঃ বাবা সুকোমল, বিদ্বান হয়ে, পণ্ডিত হয়ে স্ত্রীকে অপমান করেছ! ইংরেজীতে এতগুলো পাশ করেছ বাবা, জান না, ইংরেজরা তাদের স্ত্রীকে কেমন মাথায় করে রাখে!

[সুকোমল চুপ করিয়া রহিলেন]

সুনন্দা। মেয়ে মানুষের বিয়ে করাটাই ভুল।

সুকোমল। তার মানে বিয়ে যদি করতেই হয় ত একা পুরুষ মানুষেই বিয়ে করুক।

সুনন্দা। ঐ ত স্কুল ইন্‌স্পেক্ট্রেস্ মিস্ সরকার রয়েছেন। সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর, কারো তোয়াক্কা রাখেন না। যতদিন পর্য্যন্ত মেয়েরা উপার্জ্জনক্ষম না হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত তাদের বাঁদীগিরি ঘুচবে না। কেন তুমি আমার বিয়ে দিলে মা?—

সুনন্দার মাতা। আমারি ভুল হয়েছে মা। তাঁর কথা না শুনে যদি হরেনের সঙ্গেই তোমার বিয়ে দিতাম! পাঁচ বছর হয়ে গেল, এখনো তোমাদের এই রকম ঝগড়াই চলতে থাকল—

সুকোমল। আপনারা বসে বসে কৃতকর্ম্মের জন্যে অনুতাপ করুন, আমি একটু ঘুরে আসি।

সুনন্দা। দেখছ মা, আমরা ওঁর অসহ্য হয়ে উঠেছি। চল আমরা বেড়িয়ে আসি, উনি থাকুন।

সুনন্দার মাতা। তাইত দেখছি বাছা। চল।

[সুনন্দা ও সুনন্দার মাতা চলিয়া গেলেন—বাহিরে তাঁহাদের মোটর গাড়ী চলিয়া যাওয়ার শব্দ হইল]

[খানিক পরে বাহিরে কলহ ও বচসা শুনা গেল। তাহার পর স্কুল ইন্‌স্পেক্ট্রেস্ মিস্ সরকার ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার গাত্রবর্ণ ঈষৎ পাটল, ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিদধিক রক্তবর্ণ, বেশভূষায় সবিশেষ পারিপাট্য]

মিস্ সরকার। নমস্কার প্রফেসর চৌধুরী। আজকের দিনটি ভারি চমৎকার, নয়?

সুকোমল। এঁ্যা! (অন্যমনস্ক ভাবে) ওঃ নমস্কার, নমস্কার।

মিস্ সরকার। আমি বলছি আজকের দিনটি ভারি চমৎকার।

সুকোমল (কঠিনভাবে মিস্ সরকারের দিকে চাহিয়া) দিন ? কিসের দিন ? কোথাকার দিন ?

মিস্ সরকার। বা রে, আপনি আমার কথায় একদম মনোযোগ দিচ্ছেন না। Indian Review-এ আপনার প্রবন্ধটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি।

সুকোমল। মুগ্ধ হয়েছেন ? অনেক ধন্যবাদ। এই কথাটি বলবার জন্যে গাড়ীভাড়া করে এসেছেন এতটা পথ ! How awfully good of you, how charming !

মিস্ সরকার। মানে, ইয়ে, তা ঠিক নয়, নিজেরও একটু দরকার ছিল।

সুকোমল। হোঃ, তাই বলুন।

মিস্ সরকার। কিন্তু তার আগে আপনার কাছে আমার নালিশ আছে।

সুকোমল। কেন, আমি কি করেছি ?

মিস্ সরকার। আপনার দরোয়ান আমাকে অপমান করেছে।

সুকোমল। কেন, কেন ?

মিস্ সরকার। কি জানি। নিজের পরিচয় দিতেই ও ইকড়ি মিকড়ি কি সমস্ত বলে আমায় অপমান করল। তার মধ্যে 'ঝুটবাৎ' কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম।

সুকোমল। আচ্ছা আমি ওকে ডাকছি। নিশ্চয় কোনো ভুল হয়েছে।

আকবর খান্—

[আকবর খান্ প্রবেশ করিল। প্রকাণ্ড ঢিলে ঢালা চেহারা, ঢিলে ঢালা পায়জামা পরিয়া আছে। জাতে পেশোয়ারী মুসলমান, পায়জামার পা দুইটি পাকাইয়া পাকাইয়া পদযুগলকে বেষ্টন করিয়াছে, মাথায় বাব্‌রিকাটা চুল, তাহার উপর প্রকাণ্ড পাগড়ি, তাহার মধ্য হইতে ব্রহ্মতালুর কাছে জরীর কাজ করা কিংখাব মোরগের ঝুঁটির মতো উঁকি মারিতেছে। পায়ে বিচিত্র ধরণের স্যাণ্ডাল্. দাড়ী-গোঁফ্ কামানো, টক্‌টকে রক্তবর্ণ চেহারা।]

সুকোমল। আকবার খান্—

আকবর। আ-zoor !

সুকোমল। তুম ইন্‌কো গালি দিয়া ?

আকবর। কাব্বি নেহি জনাব। মায় পুছাহুঁ আপ্ কৌন্ হায়, আওরাৎ বোলতী কি (অনুকরণ করিয়া) 'আম্মি নিsh-পেট্টার আচ্ছি।' ঝুটবাৎ কিসিকো বোলনা টিক্ নেহী হায়, ইয়ে ক্যা মারাদ্ আউর কিয়ে আওরাৎ। বেশখ।

মিস্ সরকার। আরে মলো যা, ঝুটবাৎ কেন হবে !

আকবর। 'আরে মালো যা' কৌন্ চীজ হায় ?

মিস্ সরকার। তোমার মুণ্ডু।

আকবর। মুণ্ড্ ! মুণ্ড্ ক্যা ? আওরাৎ কি বাৎ মেরে সমজমে নেহি আতা জনাব।

সুকোমল। মেমসাব ঝুটবাৎ বোলতী ইয়ে তুমারা কেইসে মালুম হুয়া আকবার খান ?

আকবর। আওরাৎ কাব্বি nish-পেট্টার নেহি হো shakti জনাব। মেরে সাভ্‌ভি মালুম হায়। নিsh-পেট্টার কি কাম বিলকুল মারাদ্ কি কাম, য্যায়সা ইয়ে দেকো (হস্তের তালু প্রসারিত করিয়া) আন্‌ওয়ার য়্যাকুব গুর্গান্ কাঁন্ নিsh-পেট্টার পোlish, shahar কোৎওয়ালি, মুল্ক্ peshওয়ার।

সুকোমল। আচ্ছা হামারা মালুম হো গিয়া। তুম যাও।

আকবর। মেরে মুল্ক্‌সে একটো আদমি আয়া জনাব, উয়ো মেরে বাই হোতা। আগর দো মিনিটকো চুট্টি মিল যায় তো মায় মুলাকাৎ করকে আউঙ্গা।

সুকোমল। আচ্ছা যাও, দের মাৎ করনা, হাঁ ?

আকবর। আ-zoor !

[আকবর খান্ চলিয়া গেল]

সুকোমল। আমি ভারি দুঃখিত মিস্ সরকার। ওর ধারণা ইন্‌স্পেক্টার মানে পুলিস ইন্‌স্পেক্টার এবং তাতে পুরুষের birth right—ওদের মুল্ক্ পেশওয়ার এখনো প্রগতির ধার ধারে না। আপনি কিছু মনে করবেন না।

মিস্ সরকার। আচ্ছা, আচ্ছা সে যেন হল। তা দেখুন, আমি যে জন্যে এসেছিলুম তা বলি। মেয়েদের sportsএর জন্যে চাঁদা তুলতে বেরিয়েছি। জানেনই ত, কবি বলেছেন, 'না জাগিলে আর ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগেনা

জাগেনা'—তা যদি আপনি আমাদের sports fundএ কিছু দিতেন—

সুকোমল। অ্যাঁ?—

মিস্ সরকার। আপনি অন্যমনস্ক হবেন না, আমার কথাটা শুনুন দয়া করে। কবি বলেছেন—'না জাগিলে আর—'

সুকোমল। হয়েছে হয়েছে। কিছু চাঁদা চান? পাঁচ টাকা দিলে হবে?

মিস্ সরকার। তাই দিন। [সুকোমল টাকা দিলেন] ধন্যবাদ। শুনলাম আপনার শাশুড়ী এসেছেন। এখন দেখা হল না, বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন। পারি ত সন্ধ্যায় একবার আসব তাঁর কাছে, যদি কিছু চাঁদা দেন।

সুকোমল। তা আসবেন। আপনার নিশ্চয়ই এই রকম বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাঁদা তুলতে বেশ ভালো লাগে।

মিস্ সরকার। দেখুন প্রফেসর চৌধুরী, আপনি যখন জানতে চাইছেন তখন মিথ্যা বলব না। এ সমস্ত আমার একেবারেই ভালো লাগে না।

সুকোমল। সে কি! আপনার একদম ভালো লাগে না!

মিস্ সরকার। একদম না। ঘর নেই, সংসার নেই, সুখেরও বালাই নেই।

সুকোমল। সে ত প্রিমিটিভ্‌দের কথা। আপনি লেখাপড়া শিখে এই প্রগতির যুগে এ সব কথা বিশ্বাস করেন।

মিস্ সরকার। বিশ্বাস এবং অনুভব দুই করি। আপনার দরোয়ান ঠিক কথাই বলেছে 'আওরৎ কিয়া নিshপেক্টার হোগী।'

সুকোমল। ওর কথা ছেড়ে দিন, ও মূর্খ। ঘর সংসার করাটা কি স্বামীর বাঁদীগিরি করা নয়?

মিস্ সরকার। দেখুন, বাঁদীগিরি ত আমরাই করছি। ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করতে গিয়ে পান থেকে চুনটি খসলেই হাজার রকম কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তিনি ত আর স্বামী নন, যে রাগ করে দেবো দুকথা শুনিয়ে। দয়াও নেই, মায়াও নেই, সম্পর্ক শুধু কাজের সঙ্গে। বাড়ীতে এসে কি করে যে সময় কাটাই ভাবতে গেলে কান্না আসে। বাঁদী ত আমরাই।

সুকোমল। "নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস
ওপারেতে সর্ব্বসুখ আমার বিশ্বাস।"

মিস্ সরকার। তার মানে?

সুকোমল। ও প্রলাপ। ওতে কান দেবেন না।

মিস্ সরকার। তাহলে এখন আসি। আজকের দিনটি ভারি চমৎকার নয়?

[প্রস্থান]

সুকোমল। ভারি চমৎকার, ভারি চমৎকার, ভারি চমৎকার।—এ আবার কে?

[যিনি আসিলেন তাঁহার মাথায় টাক, শরীরের মধ্যদেশ স্ফীত, চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ, গলার স্বর জড়ানো জড়ানো, হাত পা ঈষৎ কম্পমান এবং গোঁফ্ দাড়ি কামানো]

আগন্তুক। আপনিই কি প্রফেসার সুকোমল চৌধুরী? খাসা বাড়ী করেছেন ম-অ-শায়, নামটিও দিয়েছেন বেশ পোয়েটিক,—'ড্রিম্'। আপনার সখ আছে দেখছি। আমার যে বাড়ী,—তাকে ড্রিম্ না বলে নাইটমেয়ার বললেই মানায় ম-অ-শায়, আমার পরিবারের গলার আওয়াজ—

সুকোমল। (বাধা দিয়া) আপনার অনুগ্রহ। এখন আপনার বক্তব্যটি—

আগন্তুক। সঙ্ক্ষেপেই বলব। আমি বেশী কথার মানুষ নই, বুইতেরেচেন। আফ্রিক্যান্ মিউচুয়্যাল্ সেন্ট্-পার সেন্ট্ ডেথ্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নাম বোধ করি শুনে থাকবেন। প্রকাণ্ড কোম্পানী ম-অ-শায়, খুব দহরম মহরম।

সুকোমল। না শুনলেও নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে কোম্পানী আপনার স্বনামধন্য। সেন্ট্ পার সেন্ট্ ডেথ্ যখন insured, তখন কোম্পানীর সঙ্গে কারবার করলে মৃত্যু একেবারে অনিবার্য্য; না করলেও অবিশ্যি তাই।

আগন্তুক। আহা-হা, আপনি ভুল করছেন যে—

সুকোমল। ভুল বা নির্ভুল সে নিয়ে তর্ক নয়। আপনিও যেমন সঙ্ক্ষেপে বললেন, আমিও তেমনি সঙ্ক্ষেপে বলব, আমি insurance করতে চাই না।

আগন্তুক। এখনো পর্য্যন্ত চান নি, আমার সঙ্গে dealings করলে চাইবেন। সেই জন্যেই ত কষ্ট করে আসা। তা শুনলুম আপনার শাশুড়ী এসেছেন ম-অ-শায়।

সুকোমল। সে খবরও পেয়েছেন। আমার শাশুড়ী এসেছেন ভবনে, রব উঠেছে ভুবনে; তা দেখুন তিনি যে এই বয়সে life insurance করবেন এমন কথা শুনি নি।

আগন্তুক। আহা-হা, আপনাকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে ম-অ-শায়।

সুকোমল। হঠাৎ আপনার এ করুণা উদ্রেকের কারণ?

আগন্তুক। একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর। শাশুড়ীর ধখোল যদি সইতে চান দাদা, আমার পরামোর্শে নিন, একটু একটু ড্রিঙ্ক করুন ম-অ-শায়।

সুকোমল। এ কি আপনার নিজের অভিজ্ঞতা নাকি?

আগন্তুক। ধরেছেন ঠিক। প্রথমেতে রোগী হয়ে শেষে বৈদ্য হয়েছি।

সুকোমল। আপনি বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন ত!

আগন্তুক। লিখতেও পারি।

সুকোমল। লিখতেও পারেন! একেবারে দশকর্ম্মান্বিত। একাধারে কবি এবং ইন্‌সিওরেন্স এজেণ্ট।

আগন্তুক। আপনি হলেন সমঝ্‌দার লোক। শুনুন তবে আমার প্রথম বয়সের প্রেমের কবিতা—

সুকোমল। এখন থাক।

আগন্তুক। আঃ, গোলমাল করছেন কেন, শুনুন না চুপ করে বসে।

সুকোমল। একেবারে নাছোড়বান্দা—

আগন্তুক। শুনুন—

[খুব আবেগভরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন]

"এসেছিল প্রিয়া আনন করিয়ে নত (চোখ বুজিয়া মুখ নীচু করিলেন)

(হাতের মুঠা দিয়া দেখাইয়া) আধো-জাগন্ত কমল-কলির মতো।

(মাথার চুল টানিয়া নাকে হাত দিতে দিতে) এলায়িত কেশে সুরভি ভরিয়া আছে

(সুকোমলকে জড়াইয়া ধরিয়া) রাখিল মাথাটি আমার বুকের কাছে।"

সুকোমল। আঃ কী আপদ, ছাড়ুন ছাড়ুন, আমার দম আটকে আসছে।

আগন্তুক। (দুইটি আঙুল দেখাইয়া) "দুটি কেশদাম খসিয়ে পড়িল আমার পরশ লাগি"—

সুকোমল। মাত্র দুটি। আমি ভাবছিলাম সমস্ত মাথাটি না খোসে পড়ে!

আগন্তুক। "কেমনে একাকী বিরহ রজনী জাগি!
মথিত করে বিক্ষোভে মোর মন,
হলো নাকো মোর প্রাণের বেদন নিবেদন!"

সুকোমল। আহা, করুণ!

আগন্তুক। নয়ন সলিলে ভাসে বিরহের—

(দাড়ি কামাইবার ভঙ্গীতে হাত দিয়া গাল চাঁচিতে চাঁচিতে)

ক্ষুরধারা নদীকুল—
চিরদিবসের স্মরণচিহ্ন: তার ফেলে যাওয়া
কানের সোনার দুল।

কেমন লাগল ম-অ-শায়?

সুকোমল। চমৎকার। বিশেষ করে বলতে হয় আপনার "ক্ষুরধারা" বর্ণনা করবার ভঙ্গীটি। কিন্তু শেষটা বড় abrupt —এটুকু যোগ করে দিলে কেমন হয়?—

"সোনার দুল্‌টি কুড়ায়ে লয়েছি ফিরায়ে দিইনি তারে
দীনু স্যাক্‌রারে বেচিয়ে পেয়েছি আঠারো টাকার হারে।
তার আগমন হয়নি বিফল একথা বলিতে চাই,
আর কয়বার দুল ফেলে গেলে বড়লোক হয়ে যাই।"

আগন্তুক। (রোষকষায়িত লোচনে) এ কী খেলা পেয়েছেন নাকি ম-অ-শায়। লাইফ অ্যাণ্ড ডেথের কোশ্চেন! জানেন আমার প্রথম প্রেমের কাহিনী? মেয়েটি আমার নবকার্ত্তিকের চেহারা দেখে—

সুকোমল। নবকার্ত্তিকের চেহারা! বাঃ, বেশ, বেশ। আপনার প্রণয়ও যেমন মধুর, বিনয়ও তেম্‌নি প্রচুর।

আগন্তুক। বিশ্বাস না করেন করুন, বুইতেরেচেন, কিন্তু তা বলে ওরকম ঠাট্টা করবেন না, লাইফ অ্যাণ্ড ডেথের কোশ্চেন। মেয়েটি আমায় বলল, হরেন দা—

সুকোমল। হরেন দা! কি সর্ব্বনাশ, কোথাকার হরেন দা—

আগন্তুক। কোথাকার হরেন দা মানে? হরেন দা

কি গোবরের মতন মাঠে ঘাটে অজস্র ছড়ানো আছে নাকি ম-অ-শায়।

সুকোমল। আপনার পুরো নামটি কি?

আগন্তুক। হরেন বোস।

সুকোমল। হরেন বোস! কোথাকার হরেন বোস?

আগন্তুক। সে ত আগেই বলেছি,—আফ্রিকান মিউচুয়্যাল সেণ্ট পার সেণ্ট—

সুকোমল। আরে না, না। আপনার গ্রামের নাম কি?

আগন্তুক। গাঁ গোত্র নিয়ে কি করবেন ম-অ-শায়? ঘটকালির চেষ্টা নাকি? (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) সে আর এখন হয় না। আমার পরিবার বর্ত্তমান। গাঁয়ের নাম মোহনপুর।

সুকোমল। অ্যাঁ, মোহনপুর! কী সর্ব্বনাশ। মেয়েটির নাম কি?

আগন্তুক। আপনি অমন করছেন কেন ম-অ-শায়, কি, গোলাপী নেশা-টেশা কিছু করেছেন নাকি?

সুকোমল। চালাকী রাখুন, মেয়েটির নাম কি বলুন।

আগন্তুক। দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ঝট্ করে কি বলা যায়। কতদিনের কথা হয়ে গেল। কত মেয়ের নাম আর মনে থাকে বলুন। মেয়েটির নাম হল, তোমার গিয়ে,—নাঃ তোমার গিয়ে নয়,—হ্যাঁ—তোমার গিয়ে—নন্দা,—নন্দা—সুনন্দা।

সুকোমল। (প্রায় সঙ্গে সঙ্গে) সুনন্দা। রাস্কেল!

হরেন। কি ম-অ-শায়, আপনি অমন ক্ষেপে উঠছেন কেন? কামড়াবেন নাকি?

সুকোমল। কামড়ানো উচিত। Scoundrel, পাজী, যত নষ্টের মূল তুমি! প্রেমে পড়বার আর পাত্রী পেলে না। সুনন্দা কে জানো? আমার স্ত্রী। কামড়ানো তোমাকে খুব উচিত।

হরেন। অ্যাঁ! বলেন কি ম-অ-শায়! জীবনে এই দ্বিতীয়বার shock পেলুম। প্রথম shock পেয়েছিলুম সিঁড়ি থেকে একবার পড়ে গিয়ে। চোখ ছিল ঈষৎ রাঙা, বুইতেরেচেন, হাঁটু গেল ভেঙে। পরিবার বললেন, হাঁটু ভাঙলে কি করে, হামাগুড়ি দিচ্ছিলে নাকি!

সুকোমল। এই ত তোমার চেহারা, Vagabond, মাতাল, পাজী! কী দেখেছে তোমার মধ্যে সুনন্দা সেই জানে! ধন্য মেয়েদের পছন্দ।

হরেন। কেন, কেন? সুনন্দা কি ইয়ে, আজও আমার—ইয়ে আমার নাম টাম একটু আধটু করেটরে নাকি?

সুকোমল। তোমার মন যে খুসীতে ভরে উঠছে দেখছি!

হরেন। ভয়-মিশ্রিত খুসী ম-অ-শায়। সে সব দিনের কথা ভাবলে আজো আমার গা ছম্ ছম্ করে। আমার বাবা ছিলেন তখন বেঁচে। সমস্ত জানতে পেরে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। বুড়ো ধাড়ী ছেলে আমি ম-অ-শায়, দাড়ি গোঁফ্ গজিয়ে গেছে, সে সব কিছু মানলেন না, দিলেন দড়াদ্দম প্রহার।

সুকোমল। বেশ করেছেন, ঠিক করেছেন।

হরেন। তা ত বলবেনই।

সুকোমল। খুব মার খেলেন ত?

হরেন। মার বলে মার, চোরের মার।

সুকোমল। বেশ হয়েছে, আমি ভারি খুসী হয়েছি।

হরেন। মারের চোটে বুইতেরেচেন আমার প্রেম ছেড়ে গেল ম-অ-শায়। তা দেখুন প্রফেসার চৌধুরী, আপনাকে এমন নরম হলে চলবে না দাদা—

সুকোমল। আপনার বাবার সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলেন নাকি?

হরেন। আহা-হা, আমি কি তাই বলছি নাকি! আপনি আমার পরিবারকে ত দেখেন নি, দেখলে বুঝতেন অমন তেজী মেয়েমানুষ আর হয় না দাদা। যেন কসাক্ ঘোড়সওয়ার। সায়েস্তা খাঁ, হের্ হিট্‌লার, মাসোলিনী কোথায় লাগে রে দাদা। তাঁর হাতে পড়লে আপনার হাড় কখানি আর আস্ত থাকত না।

সুকোমল। বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে আপনার বাবার প্রেতাত্মা আপনার স্ত্রীর ঘাড়ে চেপেছে।

হরেন। তবুও আমি ত টেঁকে আছি ম-অ-শায়, দমি নিত! এই যে আমার পাহারাওয়ালা পরিবারের ধখোল কি করে সহ্য করি জানেন? রোজ একটু করে খাঁটি খাই বলে। আপনি আর ইতস্ততঃ করবেন না, আমার কথাটি শুনুন,—পুরুষমানুষ, এতে আর লজ্জাটা কিসের, রোজ একটু করে ড্রিঙ্ক করুন। দেখবেন সব সয়ে যাবে।

[বাহিরে মোটর থামিবার শব্দ হইল এবং সুনন্দার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল]

হরেন। ঐ রেঃ, সুনন্দা এবং তস্যা মাতার আগমন ধ্বনি শুনছি। চট করে একছিলিম তামাক দিতে বলুন আপনার চাকরকে, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া না দিলে আর চলছে না।

সুকোমল। (নেপথ্যের দিকে) সুনন্দা, তোমার হরেন দা এসেছেন। যাই মোটরটা গ্যারাজে তুলে রেখে আসি।

[সুকোমল চলিয়া গেলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল এবং হরেন তামাক খাইতে লাগিলেন। এমন সময় সুনন্দা ও সুনন্দার মাতা ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহারা ঘোর বিস্ময়ে হরেনকে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু হরেন নির্বিকার চিত্তে তামাক খামিয়া যাইতে লাগিলেন]

সুনন্দার মাতা। ওমা, এই আমাদের হরেন! তোমাকে আর চেনাই যায় না, বাবা।

হরেন। আপনাকেই বা কোন্ চেনা যায় ঠাকরুণ! ঘাটের মড়াটি হয়েছেন!

সুনন্দার মাতা। এঁ্যা!

হরেন। আমি বলছি, ঘাটের মড়াটি হয়েছেন।

সুনন্দার মাতা। ছিঃ, এ তোমার কেমন ধারা কথার শ্রী বাবা। আমি তোমার গুরুজন হই, বয়সে বড়—

হরেন। বড় নয়ত ছোট নাকি? বড় ত বটেই, অনেক বড়, প্রায় তিনগুণ বয়স।

সুনন্দার মাতা। আমার সামনে তুমি ভড়্ ভড়্ করে তামাক খাচ্ছ, লজ্জা করে না?

হরেন। ওঃ, ভারি উনি খড়দার মা গোঁসাই এসেছেন, ওঁর সামনে তামাক খাওয়া বারণ।

সুনন্দার মাতা। কেন তুমি এ রকম করে অনাবশ্যক অপমান করছ বাবা? এই জন্যেই কি সুকোমল তোমাকে ডেকে এনেছেন?

হরেন। ওঃ বটে, আপনি সুকোমল বাবুকে এমনি ধারা ইতর ভাবেন! মোটেই তা নয়। আমি খোস্ মেজাজে বহাল তবিয়তে স্বয়ং সশরীরে নিজে এসেছি, কেউ ডাকে নি। খাসা লোক সুকোমল বাবু, কেবল একটু যা দোষ, ড্রিঙ্ক করেন না।

সুনন্দার মাতা। ওরে বাবা, তাই ত বলি, লোকটা মাতাল! ও সুনন্দা—

হরেন। দেখ ঠাকরুণ গাল দিও না। 'কাণাকে কাণা বলিতে নাই, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই, মাতালকে মাতাল বলিতে নাই'—প্রথম ভাগে পড়নি? গাল দিও না।

সুনন্দার মাতা। ও সুকোমল কোথায় গেলে বাবা, মাতালটাকে দূর করে দাও।

হরেন। (সুনন্দার মাতার স্বর অনুকরণ করিয়া) মাতালটাকে দূর করে দাও। শাশুড়ীগিরি ফলানো হচ্ছে, ধুৎ তোর শাশুড়ীর নিকুচি করেছে—

সুনন্দা। (কঠোর স্বরে) হরেন দা—

হরেন। তুমি এর মধ্যে ফোড়ন্ দিতে এসো না। দেখছ না, লড়াই হচ্ছে ভীম এবং ঘটোৎকচে, আমি হচ্ছি ভীম, আর (সুনন্দার মাতাকে দেখাইয়া) ঐ পিংড়ে খুনখুনে বুড়ী হল ঘটোৎকচ। তুমি হচ্ছ গঙ্গাফড়িং, তুমি এর মধ্যে এসো না।

সুনন্দা। আকবর খান্—

[কেহই আসিল না, কারণ আকবর খাঁর 'বাই'-এর সহিত মুলাকাৎ তখনো শেষ হয় নাই]

সুনন্দার মাতা। লোকটা অমানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, গোল্লায় গেছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এখুনি হয়ত একটা কাণ্ড করে বসবে। চল সুনন্দা, আমরা যাই। আমার ভয়ানক মাথা ধরেছে।

[সুনন্দার মাতা প্রস্থানোদ্যত হইলেন]

হরেন। আহা, যাবেন না, যাবেন না, একটু দাঁড়িয়ে যান। সত্যি সত্যিই আমি কিছু অমন গোল্লায় যাইনি, আমি একটু ঠাট্টা করছিলুম মাত্র।

[সুনন্দার মাতা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন]

সুনন্দার মাতা। তাই বল বাবা। আমারো কেমন কেমন লাগছিল। আমাদের সেই হরেন কি এমন হতে পারে। তাই বল বাবা, তাই বল।

হরেন। আপনার মাথা ধরেছে বললেন না? না ধরাই আশ্চর্য্য। যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ—শাস্ত্রের বাক্য। একটু তামাক খেয়ে যান।—(হুঁকাটি বাড়াইয়া ধরিলেন)

সুনন্দার মাতা। এঁ্যা!

হরেন। দিন দুটো টান, লজ্জা কি। আপনার তামাক খাওয়ার অভ্যাস আছে দেখছি। জামাইবাড়ী এসে লজ্জায় খেতে পান নি তাই মাথা ধরেছে, বুইতেরেচেন?

সুনন্দার মাতা। কী, কী, কী বললে! বিনা কারণে আমায় এই রকম মর্ম্মান্তিক অপমান করছ, হতভাগা, ইতর, মাতাল!

হরেন। তুমি আমাকে মাতাল বলবার কে!

[ক্ষোভে অপমানে সুনন্দার মাতা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, এমন সময় স্কুল ইনস্পেক্ট্রেস্ মিস্ সরকার সেই ঘরে ঢুকিলেন]

সুনন্দার মাতা। তুমি আবার কে? আমায় যেতে দাও,—সরো।

মিস্ সরকার। যাক্, খুব এসে পড়েছি। আর একটু পরে এলে হয়ত দেখা হত না।

সুনন্দার মাতা। আমায় যেতে দাও, সরো।

মিস্ সরকার। যাবার আগে চাঁদাটি দিয়ে যান।

সুনন্দার মাতা। অ্যাঁ! চাঁদা? চাঁদা কি? আমায় যেতে দাও।

মিস্ সরকার। (পথ আগলাইয়া) মেয়েদের Sports-এর জন্যে চাঁদা তুলছি। জানেন ত কবি বলেছেন, 'না জাগিলে আর ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না'—

সুনন্দার মাতা। তোমরা সবাই মিলে আমায় জ্বালিয়ে মারবে! ও সুনন্দা, তুমি কোনো কথা বলছ না কেন বাছা! এতক্ষণ ধরে এই মাতালটা আমাকে যা নয় তাই বলে গাল দিচ্ছিল, তারপর এ একজন কে, একে চিনি না, জানি না, জন্মে কখনো দেখিনি, এ আমাকে এমন করে উৎপীড়ন করছে কেন! (মিস্ সরকারকে) তোমার কাছে আমি কী অপরাধ করেছি বাছা, কেন তুমি আমাকে এমন করে জ্বালাচ্ছ!—

মিস্ সরকার। আহা অপরাধ করবেন কেন, শুনুন, কবি বলেছেন, 'না জাগিলে আর ভারত ললনা—

হরেন। ঠিক হয়েছে। বুড়ী এবার ঠিক জব্দ হয়েছে। কেমন, আর আমাকে মাতাল বলবে? (মিস সরকারকে) আপনি দিদিমণি, ওদিক থেকে বলুন, 'না জাগিলে আর ভারত ললনা'—আর আমি এদিক থেকে বলি, 'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে! (পা ঠুকিতে ঠুকিতে) ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং—খবরদার যেতে দেবেন না বুড়ীকে। আদায় করুন চাঁদা বুইতেরেচেন, আমি আছি আপনার স্বপক্ষে।

সুনন্দার মাতা। (মিস সরকারকে) দেখ বাছা, ভালো চাও ত এখুনি দরোজা ছাড়ো, যেতে দাও। দেবে না যেতে? তবে দেখবে মজা? তবে রে—(মিস সরকারকে ধাক্কা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন)

হরেন। হাঁ হাঁ—গেল গেল, বুড়ী পালালো পালালো ধর্ ধর্—

মিস সরকার। চাঁদা দেবেন না একথা বললেই ত পারতেন।

হরেন। তা বৈ কি দিদি।

মিস্ সরকার। সামান্য একটা কি দুটো টাকার জন্যে মেয়েমানুষ হয়ে ভদ্রমহিলার গায়ে হাত তুললেন।

হরেন। দেখুন দিকি কী অন্যায়!

মিস্ সরকার। আমি এক্ষুণি উকীল বাড়ী যাচ্ছি। নালিশ করব, ওঁর নামে নালিশ করব।

হরেন। আমি সাক্ষী দেব। কুচ্ পরোয়া নেই।

[মিস্ সরকারের প্রস্থান]

সুনন্দা। ওগো তুমি কোথায় গেলে, শীগ্‌গির এসো। আকবর খান্—

[সুকোমল এবং আকবর খান্ প্রবেশ করিলেন]

সুকোমল। কি, কি, কি হয়েছে, এত গোলমাল কিসের?

আকবর খান। ক্যা হুয়া আ-zoor!

সুনন্দা। তুমি গাড়ী গ্যারাজে তুলতে গেছ সেই সুযোগে এই লোকটা মাকে যাচ্ছেতাই বলে অপমান করল। মিস্ সরকার এলেন মার কাছে চাঁদা চাইতে, মা তাঁকে ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন, তাইতে মিস্ সরকার মার নামে নালিশ করবেন বলে শাসিয়ে চলে গেলেন। এ লোকটা বলছে মিস্ সরকারের পক্ষে সাক্ষী দেবে।

আকবর খান। উয়ো আওরাৎ বিল্‌কুল জুট্ বোলনে-ওয়ালী আ-zoor!

সুকোমল। বটে! (হরেনকে দরোজা দেখাইয়া দিয়া) যাও তুমি, এখুনি বেরিয়ে যাও।

হরেন। যাচ্ছি ম-অ-শায়। তামাকটা খেয়ে নিতে দিন।

আকবর খান। বাগো! নেই ত মার দেউঙ্গা।

হরেন। তুমি আবার কে বংশলোচন এলে বাবা! তোমার কথাবার্ত্তা কুছ বুঝতে পারতা নেহি।

আকবর খান। হাম্মি বুল্‌ছে কি তুমি আব্বি পেলিয়ে যাও। না পেলিয়ে যাও হাম্মি তুমাকে টেঙাইয়ে টেঙাইয়ে আড় বাঙ্গি দিবে। মালুম হুয়া?

হরেন। খুব হুয়া, খুব হুয়া। ভজ গোবিন্দং—

আকবর খান। বাজ্জাগো বাজ্জাগো মাং করো (ঘাড় ধরিল) যাও—

হরেন। আর করব না বাবা, দৈবাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তোমাকে দেখে আমার পরিবারের কথা মনে পড়েছে।

আকবর খান। পারিওয়ার কৌন্ চীজ হায়?

হরেন। সে কথা আর একদিন তোমায় বলব খ'ন। আজ বড় তাড়াতাড়ি। (যোড়হাত করিয়া সুকোমলকে) লাইফ্ ইন্‌সিওরের কথাটা তাহলে ভুলবেন না ম-অ-শায়। আমি গরীব লোক, ছাঁপোষা ব্যক্তি। কোম্পানী আমার মস্ত বড়, খুব দহরম মহরম, বুইতেরেচেন?

সুকোমল। তেরেচি, তেরেচি, বুইতে খুব তেরেচি। আপনি এখন বিদেয় হোন। একদিন কলেজে আসবেন, তখন ওসব কথা হবে।

হরেন। আচ্ছা তাহলে আসি সুনন্দা, আসি প্রফেসর চৌধুরী। বলি নি আমি, আমার সঙ্গে dealings হলে insurance না করে পারবেন না। চললুম ম-অ-শায়, কিছু মনে করবেন না।

সুকোমল। কিছুনা, কিছুনা।

(হরেন এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আকবর খান প্রস্থান করিল)

সুকোমল। সুনন্দা, এই তোমার ছেলেবেলাকার 'হরেন দা'?—ওধারে Jolyon আর এ ধারে এই হরেন দা?

সুনন্দা। ভয়ানক ভুল করেছিলুম। তুমি আমায় মাপ্ করো।

সুকোমল। এতদিন শুধু ঝগড়া করেই কাটল। আমাদের কপালে দুঃখ কি ঘুচবে না সুনন্দা? চিরদিন আমাদের কি ঝগড়াতেই কাটবে?

সুনন্দা। না গো, না। তুমি আমায় মাপ করো। আর ঝগড়া হবে না।

সুকোমল। তুমিও আমায় মাপ করো সুনন্দা।

[গানের সুরে]

এবার কাছে ডেকে লও—
ডেকে লও সন্ধ্যাকালে।

[যবনিকা]

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার
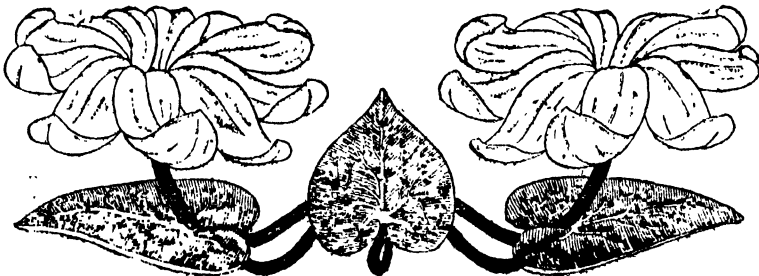
বিচিত্রা

শ্রীবীণা দেবী

কে গুণী সাধক দিলা প্রাণদান
অয়ি বিচিত্রা তোমা,
তিল তিল করি কে তোমা গড়িল
রূপসী তিলোত্তমা।
সুন্দরী উষা বিচিত্র ভূষা
পরাল তোমার দেহে,
করুণারূপিণী সন্ধ্যা যে দিল
অন্তর ভরি স্নেহে,
শরৎ আনিল কুসুম-মালিকা
পরাল তোমার কেশে,
বসন্ত তোমা সাজাল আদরে
পুষ্পরাণীর বেশে।
রবিকররেখা আশীষ-মালিকা
শোভিল মুকুটাকারে,
শিল্পী সাজাল সুন্দর তনু
কত না অলঙ্কারে।
কত গুণী দিল বাঁধি বীণা তার,
মালাকর দিল মালা,
কেহ বা আনিল ফুল-সম্ভারে
বিচিত্র ফুলডালা।

মুকুতা মালায় সাজায়ে অলক
তিলক পরায়ে ভালে,
হেরিতে সে রূপ মুগ্ধ পূজারী
স্বর্ণ প্রদীপ জ্বালে।
ভারতী-চরণ- কমল সুরভি
অঙ্গ ঘিরিয়া রাজে,
বঙ্গবাণীর স্নেহের দুলালী
সেজেছ মোহিনী সাজে।
অঞ্জলি ভরি এনেছ অমিয়া
মিটাতে প্রাণের তৃষা,
নয়নে হাসিছে উষার আলোক
বিনাশি আঁধার নিশা।
বিচিত্ররূপিণী হও বিজয়িনী
বিশ্বের দরবারে,
বাণী-পদ সেবি হও চিরজীবী
মণ্ডিতা যশোহারে।

বাঙ্গলার নিজস্ব শিল্প ও তরুণ শিল্পীর প্রতিভা

শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ

বাউল ভাটিয়ালের মতই মৃত্তিকা-শিল্পকেও বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ ব'লে সম্ভবতঃ নিঃসন্দেহে অভিহিত করা যায়। সভ্যতার আদি যুগ থেকে—এমন কি অসভ্যতার অনাদি যুগ থেকেও শিল্পীদের নিকট প্রস্তরই বিশেষ সমাদর লাভ ক'রে এসেছে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সবদেশেই এ-ব্যাপার

রবীন্দ্রনাথ

সংঘটিত হয়েছে। কাজেই সর্ব্বদেশের আদিতম ইতিহাসের সঙ্গে ভাস্কর্য্য এবং প্রস্তরশিল্প এম্নি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে যে তাকে একরকম অচ্ছেদ্যই বলা যায়। মানবের পূর্ব্ব-পুরুষেরা আপনাদের কীর্ত্তি-অকীর্ত্তির কাহিনী সমস্তই রেখে গেছেন গুহাগাত্রে—প্রস্তরখণ্ডে। সকল দেশের সাহিত্যের পক্ষে যেমন, শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এটা অতি সত্য কথা যে, এ-দুইএর-ই উদ্ভব হয়েছে মানবের সহজাত ধর্ম্ম-প্রেরণা থেকে। এ জন্যেই দেশী-বিদেশী সাহিত্য ও শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শনে দেখতে পাই ধর্ম্মপ্রচারের প্রচেষ্টা, এ-ভাবে জন্মলাভ ক'রে সাহিত্য ও শিল্প রাজ-সহানুভূতির বারি-সিঞ্চনে পুষ্টিলাভ করেছে। যেখানে সে সহানুভূতির অভাব ঘটেছে সেখানেই হয়েছে তাদের মৃত্যু। বৌদ্ধযুগের শিল্পকলা, এমন কি বৌদ্ধ-ধর্ম্মও যে এতখানি সমৃদ্ধি ও প্রচার লাভ করেছিল তার পিছনেও রয়ে গেছে সম্রাট অশোকের রাজশক্তি। মিশর সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে।

বৌদ্ধ এবং হিন্দুরাজত্বের পর দেখতে পাই ভারতীয় শিল্প-কলা ধীরে ধীরে লয় প্রাপ্ত হ'য়ে এসেছে। এ-শোচনীয় পরিণামের একাধিক কারণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণই হচ্চে রাজশক্তির ঔদাসীন্য। তা' না হ'লে ভারতীয় শিল্পকলার যে-বিপুল সম্ভাবনা ছিল সে-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এম্নি করুণভাবে অন্ধকারে অস্তমিত হতো না। ভারতবাসী ভুলে গিয়েছিল তাদের সাধনার কথা, তাদের ধমনী-প্রবাহিত ঐতিহ্যের কথা। তারপর বহুযুগের তমিস্রার পর অতি-সম্প্রতি ভারতীয় শিল্পকলার দিকে রসিকজনের মন আকৃষ্ট হয়েছে। শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ ও হ্যাভেল সাহেবের অদম্য উদ্যম এ অপ্রত্যাশিত সাফল্যের জন্য দায়ী।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাস্কর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই এর অধিকাংশই প্রস্তর-শিল্প। প্রস্তরের কঠোর আধিপত্যের আওতায় ক্ষীণবল মৃত্তিকা বড় বেশি স্থান ক'রে নিতে পারে নি। গুহাগাত্রে বা আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের দেবমন্দিরগুলিতে একমাত্র প্রস্তর শিল্পেরই সন্ধান পাওয়া যায়। পাথরের মন্দির পাথরের মূর্ত্তি-বিগ্রহে-ই পরিপূর্ণ। ইটের মন্দির যেখানে যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে শুধু মাটির

গড়া অল্পসংখ্যক মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। তারও বেশির ভাগ এই বঙ্গদেশের সীমানাতে আবদ্ধ। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ দু'টি। বঙ্গদেশে প্রস্তরের অপ্রতুলতা, আর শস্যশ্যামল প্রকৃতির কোলে পালিত বাঙ্গালী জাতির সহজাত কোমল কমনীয়তা। এ-জন্যেই বোধ হয় বাঙ্গালী বেশি ক'রে ঝুঁকে পড়েছিলো মৃত্তিকা-শিল্পের দিকে। তা-ও মধ্যযুগে একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিলো। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সেই যে ধীমান এবং বিতপাল নামক দু'জন বাঙ্গালী শিল্পীর নাম পাই আমরা, তারপর নিবিড় অন্ধকারে আর কিছু-ই হাতড়ে পাই না। 'দুঃখিনীর সল্‌তে' কোন রকমে জ্বালিয়ে রেখেছিলো বাঙ্গলার নিরক্ষর গ্রাম্য কুমোরেরা। তাদের অপটু হস্তের শিল্পকলা শুধু প্রতিমা ও পুতুলগড়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল। চিত্র-কলা যেমন নেমে এলো পটের রাজ্যে, ভাস্কর্য্য-ও ঠাঁই খুঁজে নিলো পুতুল-খেলার ঘরে।

অতি সম্প্রতি অন্ধকারে আলোক-রেখা দেখা দিয়েছে। অবনত অবলাঞ্ছিত মৃত্তিকা-শিল্পকে অপাঙক্তেয় অবস্থা থেকে উন্নীত করবার সাধুপ্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছে। দু' একজন যথার্থ-শিল্পী ও শিল্পানুরাগীর আত্মনিয়োগের ফলে তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায় একথাটা বুঝতে শিখছে যে বিদেশী শ্বেতপাথরের ভেনাস বা কিউপিড মূর্ত্তি দিয়ে ঘর সাজানোর পরিবর্ত্তে এখন দেশী জিনিষ দিয়েও সে-কাজটা চলতে পারে।

মৃত্তিকা-শিল্পে বাঙ্গালী অনেক শিল্পী-ই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন। তন্মধ্যে তরুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভৌমিকের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য এ-কারণে যে, তাঁর গঠিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অভূতপূর্ব্ব অভিনবত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। পরিকল্পনা, ভাব-সম্পদ, অঙ্গ-সৌষ্ঠব প্রভৃতি সকল বিষয়েই শ্রীযুক্ত ভৌমিক প্রকৃত শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এ-গুণ শিল্পীর সহজাত, কারণ তিনি কখন-ও কোন গুরুর নিকটে এ-বিষয়ে কোন শিক্ষা পান নি।

শ্রীযুক্ত ভৌমিকের জন্মস্থান ত্রিপুরা জেলায়। ত্রিপুরা-জেলার পূর্ব্বদিকে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার শৈল-শ্রেণী। সেখানকার উদয়পুর পাহাড়ের গায়ে কতগুলো অতিপ্রাচীন দেব-মন্দির কাল-স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে এখন-ও দাঁড়িয়ে আছে। সে-সব মন্দিরে বহু-প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত ভৌমিক প্রথম অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত হলেন এ-সব মূর্ত্তির কমনীয়তা উপলব্ধি ক'রে। তাঁর শিল্পীমন সাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। তিনি মূর্ত্তি-গঠনে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু এ-অঞ্চলে প্রস্তর দুষ্প্রাপ্য,

বুদ্ধ ও সুজাতা
শিল্পী—মনোরঞ্জন ভৌমিক

—কাজেই পদ-দলিত মৃত্তিকা-ই হলো তাঁর শিল্প-ব্যঞ্জনার একমাত্র সহায়ক।

নর্ত্তকী
শিল্পী—মনোরঞ্জন ভৌমিক

এ তরুণ-শিল্পী অতি অল্পকালের মধ্যেই বহুসংখ্যক মূর্ত্তি গঠন করেছেন; এবং প্রত্যেকটি-ই সুধী-সমাজের সমাদর লাভ করেছে। শিল্প-সৃষ্টি আর শিল্পগঠন এক জিনিষ নয়। গঠিত শিল্প সার্থক সৃষ্টির পর্য্যায়ে তখন-ই উন্নীত হয় যখন তার সৌন্দর্য্য চক্ষুর সীমানা অতিক্রম করে মানুষের অন্তরকে গিয়ে স্পর্শ করে। যে শিল্প প'ড়ে রইলো শুধু চাক্ষুষ দৃষ্টির আওতায় তাকে একটা সুন্দর সৃষ্টি ব'লে কখন-ই বলবোনা তা' সে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়-ই হোক না কেন। সে-দিক দিয়ে বিচার করলে এ নবীন শিল্পীর মূর্ত্তিগুলিকে শিল্প-সৃষ্টি বলে নিঃসন্দেহে অভিহিত করা যায়। শিল্পী বিষয়-বস্তু আহরণ করেছেন প্রধানতঃ বৌদ্ধযুগের কাহিনী থেকে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা অবলম্বন ক'রেও তিনি কয়েকটি মনোরম ফলক নির্ম্মাণ করেছেন। এ-ফলকগুলির রচনা-চাতুর্য্য-ও বিস্ময়কর। মাটীর Back-ground থেকে মূর্ত্তিগুলোকে Relief ক'রে বা'র করা হয়েছে; এবং বিষয়-বস্তুর ভাব সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে রং দেওয়া হয়েছে। চারদিকের কাঠের ফ্রেমগুলোও সুরুচির পরিচায়ক।

শ্রীযুক্ত ভৌমিকের শিল্পকলার নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি ফলকের পরিচয় দিলে-ই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। 'বুদ্ধ-ও সুজাত'।

ধ্যানী বুদ্ধ
শিল্পী—মনোরঞ্জন ভৌমিক

নামক ফলকটিতে বৌদ্ধযুগের যথাযথ আবেষ্টনী সৃষ্টি ক'রে শিল্পী সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। সব চাইতে

পূজারিনী
শিল্পী—মনোরঞ্জন ভৌমিক

প্রীতিকর হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মুখমণ্ডলের সৌম্য প্রশান্তির পরিকল্পনা। এ-ফলকের ফ্রেমটি গঠিত হয়েছে সাঁচীস্তূপের বহির্দ্বারের অনুকরণে।

'নর্ত্তকী' নামক ফলকটিও বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। তন্বী সুন্দরীর কমনীয় দেহ-লাবণ্যের সুঠাম এবং সুষ্ঠু অভিব্যক্তি হয়েছে এ ফলকে।

'ধ্যানীবুদ্ধ' মূর্ত্তিটিও শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচায়ক। ভগবান তথাগতের ধ্যানস্থ মহিমার পরিপূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষিত হয়েছে এ মূর্ত্তির পরিকল্পনায়।

'বসন্তোৎসব' কলকটিও শিল্পীর সার্থক সৃষ্টি। এতে সাতটি মনুষ্যমূর্ত্তির একত্র সমাবেশ রয়েছে। এদের স্থান সন্নিবেশনে শিল্পী সুকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। বসন্তের অধীর উন্মাদনা প্রত্যেকটি দেহের সাবলীল ভঙ্গীতে সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়েছে। "পূজারিণী" মূর্ত্তিটিও উল্লেখ যোগ্য।

ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত ভৌমিকের অন্যান্য ফলকও রসিক-জনের প্রশংসা দাবী করতে পারে। এ তরুণ শিল্পীর শিল্প-সৃষ্টি থেকে যে আনন্দদায়ক সত্যটি আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি সেটি হচ্ছে এই যে, এ শিল্পীর অন্তরে রয়েছে যাকে ব'লে সত্যিকারের শিল্পানুভূতি—যথার্থ সৌন্দর্য্যজ্ঞান। সুন্দরের উপাসক যিনি তিনিই হচ্ছেন শিল্পী—তিনি হবেন শিল্প-স্রষ্টা। এ তরুণ শিল্পীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং সাফল্যের অপরিসীম সম্ভাবনা দেখে আমরা সবিশেষ আনন্দিত হচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটুকুও জানাচ্ছি যে তাঁর প্রচেষ্টার ফল সাধারণ্যে—
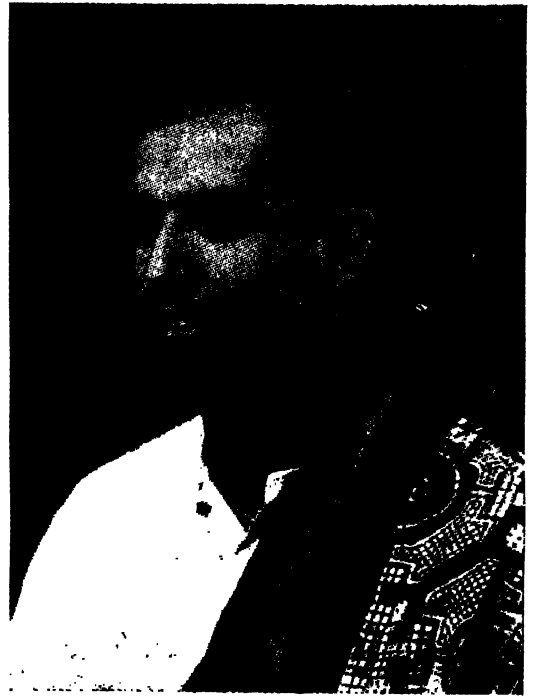
শিল্পী—মনোরঞ্জন ভৌমিক

সকলের ঘরে—সহৃদয় সহানুভূতি লাভ করলে আমরা আরো বেশি আনন্দ লাভ করবো।

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

বর্ষারাতে

শ্রীইলা দেবী

বর্ষা সন্ধ্যা। নক্ষত্রের গৃহে বন্ধুরা জমছে এসে। নক্ষত্রের স্ত্রী মঞ্জরী গাইলে গান;—সুন্দর তার কণ্ঠ, সকলে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল।

আনন্দ বললে, "থামবেন না, আরেকটা হোক।"

নীরদ বললে, "সত্যি, আপনার গানে সন্ধ্যেটা আরো নিবিড় হয়ে উঠল।" মঞ্জরী চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লে, বললে, "বেশী নিবিড় হলে আবার নিশ্বাস বন্ধ হবার সম্ভাবনা।—তার চেয়ে এবার একটা গল্প হোক।"

সকলে এক সঙ্গে কলরব করে উঠল,—কে বলবে, কিসের গল্প। অবিনাশ বললে, "ভুতের গল্প জমবে ভালো।"

সমস্বরে সকলে অনুমোদন করলে। অন্ধকার যখন ঘন হয়ে ওঠে, বাইরের বৃষ্টিধারা জানালার বন্ধ কাচে বিফল অশ্রুপাত করে, তখন আলোকিত কক্ষে সবান্ধবে বসে মানুষের কল্পনা-বিলাসী মন চায় শুনতে—কোন্ জনহীন প্রান্তরের একক তালগাছের নিঃশব্দ মর্মরানি, ঘনবনের মাঝে শ্যাওলা-সবুজ ভগ্নস্তূপের অতীত কাহিনী। এর মাঝে একটা তুলনামূলক আরাম আর ভয়মিশ্রিত সুখ আছে।

অতসী বললে, "নক্ষত্রদা, hostএর কর্ত্তব্য পালন কর। গল্পটা তুমিই বল।"

নক্ষত্র গম্ভীর হবার ভাণ করে বললে, "কর্ত্তব্যটা কিছু কঠিন বটে। শ্রোতামাত্রেই আজকাল সমালোচক কিনা, একটা কথা বললেই—একশ রকম সমালোচনার ধাক্কায় পড়তে হবে।"

নীরদ বললে, "সে কি নক্ষত্র, তুমি আমাদের সমালোচনায় ভয় পাও নাকি?" নীরদের বুকফাটান প্রেমের গল্প সব মাসিকপত্রিকা হতে বারকয়েক ফেরত এসেছে, তবে নিজেকে সে সাহিত্যিক বলেই ভেবে থাকে।

নক্ষত্র বললে, "ভয় না পেলেও ভরসাও বিশেষ থাকে না, যখন দেখি সকলেই ধরে নিয়েছে যে সমালোচনা করাটা হল সব থেকে সহজ ব্যাপার। এর জন্যে সত্যিকারের সংস্কৃতির প্রয়োজনটা নেহাতই বাজে খরচ বলে মনে হয় আজকাল।"

"বাঃ, এ যে সাম্যের যুগ। সকলেরই সবকিছুতে অধিকার আছে।"

"তা থাকুক। কিন্তু সে অধিকার পেয়ে যারা সাধারণ তারা যদি অসাধারণের সমান স্তরে উঠে আসে, গৌরবের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু তা যদি না পারে, তখনও সাম্যের দোহাই দিয়ে যা অসাধারণ তাকে সাধারণের স্তরে নামিয়ে দিতে হবে এর মাঝে সুনীতিটা কোন্‌খানে?"

নীরদ বললে, "অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে বেন্থামী মতে বৃহত্তম লোকের প্রভূততম হিতসাধন এতে হচ্ছে না?"

অবিনাশ চেঁচিয়ে উঠল, "দোহাই তোমাদের। এবার সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি এলো বলে। নীতির বন্যায় ডুবল আমাদের এমন সন্ধ্যাটা।"

নক্ষত্র হেসে অবিনাশের পিঠে একটা আঘাত করে বললে, "নীতির ওপর যখন তুমি চটা, তখন বোঝা যাচ্ছে মানুষ হিসেবে তুমি খাঁটি। সকল নীতির মূল কথা হচ্ছে সেটার যতই অভাব সেটাকে ততই জাহির করতে হবে, যেমন বাঙালীর রাষ্ট্রনীতি। কিছুই বোঝে না কেবল emotion নিয়ে আছে তাই প্রতি দৈনিক কাগজে এতো কথার গলাবাজি। শোনো গল্প। মঞ্জরী দাও ত এদের পেয়ালা-গুলি চায়ে পূর্ণ করে।"

মঞ্জরী ধূমায়িত চায়ে পেয়ালাগুলো ভর্ত্তি করে দিলে, পাত্রে ঢেলে দিলে ডালমুট। সকলে চেয়ারগুলোকে টানাটানি করে কাছাকাছি নিয়ে বসল।

নক্ষত্র বলতে লাগল, "অজয়কে জান ত,—ঘুরে বেড়িয়েই কাটল তার জীবন। পড়াশোনা শেষ করে পর্য্যন্ত ওই করছে। কত দেশ যে ঘুরল তার ঠিকানা নেই। অন্য পাঁচজনে

যেমন আরাম করে ঘোরে, ওর তা থেকে উল্‌টো করা চাই। যেখানে ট্রেণে গেলে সুবিধে ও যাবে সেখানে মোটারে, যেখানে মোটারে যাওয়া চলে সেখানে যাবে বাইকে। এ সব অনিয়মের মাঝে যে-সব অভাবিত অসুবিধের আবির্ভাব হয় তার মধ্যে একটা adventureএর আনন্দ আছে; সে আনন্দ উপভোগ করতে হলে শরীর ও মনের যতখানি শক্তির প্রয়োজন সেটা ওর পুরামাত্রায় আছে।

"সে সময়টাও বর্ষাকাল। কি একটা কাজে বা অকাজে অজয়কে যেতে হল মালদায়। সেখানে যেয়ে হঠাৎ ঠিক করলে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ না দেখে ফেরা হতেই পারে না। বাংলার গৌরব অগৌরব দুয়েরই গৌড় হল স্মৃতিশেষ। এতখানি এসে অজয় সেটা না দেখে ফেরে কেমন করে।

"কার একখানা মোটর সংগ্রহ করে নিয়ে বিকেল বেলা অজয় ধ্বংসাবশেষ দেখতে বেরিয়ে পড়ল। সহর হতে অনেক মাইল দূরে যেতে হয়, ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে একটিমাত্র পথ চলে গেচে, পথ ভোলবার সম্ভাবনা নেই। রৌদ্রহীন দিন, চারিদিক আর্দ্র সজল। ওপরে মেঘমলিন আকাশ লতাজড়ানো শাখাজালে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। নীচের মাটি শোঁয়াপোকার মতো কাঁটাবনে কণ্টকিত। ক্ষীণ পথটি কষ্টে আত্মরক্ষা করে কাদায় কালো হয়ে আছে। মাঝে মাঝে ছোট খাট ভগ্নস্তূপের ভাঙ্গা দেওয়ালে বট অশথের গাছ এঁকে বেঁকে বেরিয়েছে।

"গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদের কাছে পথ এসে শেষ হয়েছে। প্রাসাদের চারিধারে গভীর পরিখা, তারপরে বিপুল দুর্গপ্রাচীর। পরিখার জল ছেয়ে সাদা আর গোলাপী পদ্ম ফুটে আলো হয়ে আছে,—গতগৌরবের পায়ে প্রকৃতির পুষ্পাঞ্জলি যেন এরা। অজয় গাড়ীটিকে একপাশে রেখে দিয়ে পরিখার সেতু পার হয়ে দুর্গদ্বারে এল। অন্যসব ভগ্নস্তূপগুলির চেয়ে এটির অবস্থা এখনো একটু চেনার যোগ্য আছে। দ্বারের গায়ে ইটের ওপর কারুকার্য্যের বাহার এখনো একটু অবশিষ্ট আছে। ওপরের দেয়ালে দুইদিকে খুব সম্ভব সেন রাজ্যের সীলমোহরের প্রকাণ্ড দুই ছাপ। অজয় ভেতরে এসে চারিদিক ঘুরে দেখতে লাগল। কেবলই জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপ,—প্রাসাদ প্রাচীর দেবালয় একাকার হয়ে গুঁড়িয়ে পড়েছে। গৌড়েশ্বরীর মন্দির যেখানে ছিল অজয় সেখানে এসে কতক-গুলো নোট নিলে। মন্দিরের চিহ্নমাত্র নেই, তবে গৌড়ে-শ্বরীর প্রতিমা ওইখানে পাওয়া যায়। গঙ্গা তখন মন্দিরের পাদদেশ স্পর্শ করে যেত। এখন গঙ্গা বহুদূরে দৃষ্টির বাহিরে চলে গেছে।

"অনেকক্ষণ দেখে শুনে অজয় গাড়ীতে ফিরে এল। মেঘলাদিন নিঃস্রোত জলের মতো, গতি অনুভব করা যায় না। অজয় হাতের ঘড়ীতে দেখলে বেলা আর নেই—সাতটা বেজে গেছে। বৃষ্টি তখনো যদিও আসেনি, কিন্তু আকাশের সজল চেহারা দেখে মনে হয় জল ঝরল বলে। ব্যস্তভাবে অজয় গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলে। গাড়ী কিন্তু তার উদ্বেগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নির্ব্বিকার রইল। এঞ্জিন খুলে খানিকক্ষণ এটা ওটা টানাটানি করলে, তাতেও কোনো ফল হল না। অজয় অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠল,—অন্যের গাড়ী, বয়সে বিশেষ প্রাচীন বলেই মনে হয়, বিকল হলে তাকেই দণ্ড দিতে হবে। হঠাৎ মনে হল পেট্রোল আছে ত? তাড়াতাড়ি ট্যাঙ্ক্ খুলে দেখে পেট্রোল একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। স্বস্তি ও অস্বস্তিতে মন হয়ে উঠল দ্বিধান্বিত,—যাক গাড়ী খারাপ করার দণ্ড হতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। কিন্তু ফেরবার কি হবে। কাছাকাছি গ্রাম আছে হয়ত, কিন্তু এমন বিবর্ণ বাদল সন্ধ্যায় ঘরের বাহিরে কেউ নেই আজ,—গরুর পাল নিয়ে রাখালছেলেও অনেক আগে ঘরে ফিরেছে। সামনে কর্দ্দমাক্ত বনপথের জমে ওঠা অন্ধকারের মাঝ দিয়ে হেঁটে ফেরা! সেদিন সকালেই এক শিকারী ভদ্রলোক অজয়কে বলছিলেন যে দুষ্প্রাপ্য কালো বাঘ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। বর্ষায় সব ডুবে যাওয়ায় তারা একেবারে কাছাকাছি এসে আশ্রয় নিয়েছে। সাঁওতালরা কাঠ কাটতে যেয়ে দেখেছে তাদের গাছের ওপর। শুনে তখন অজয়ের শীকারের খুব আগ্রহ হয়েছিল, কিন্তু এখন এ অবস্থায় ব্যাঘ্রদর্শনের সম্ভাবনা তাকে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত করলে না। মোটরের মালিকের ওপর অজয়ের ভয়ানক রাগ হল, লোকটা নিশ্চয় ইচ্ছে করে এরকম practical joke করেছে। অজয় তাকে প্রাণভরে একচোট গালাগালি দিয়ে নিলে।—এতে অন্য কিছু লাভ না হলেও ক্ষোভ মিটল অনেকখানি। গাড়ীতে সাইড্ স্ক্রীন্ নেই, হুড নানা জায়গায় ছিদ্রশোভিত, বৃষ্টি এলে কি করা

যায় অজয় ভাবছিল। তাকে বিশেষ ভাবতে হল না, ভীষণ জোরে বৃষ্টি নেমে এল। অজয় দৌড়ে যেয়ে কোনোমতে ভগ্ন দুর্গদ্বারের তলে আশ্রয় নিলে।

"চারিদিকে ভিজে স্যাঁতসেঁতে উঁচু নীচু,—কোথাও জল জমে আছে। একটা ভ্যাপসা গন্ধের সঙ্গে চামচিকের দুর্গন্ধ দম বন্ধ করে দেয়। বাহিরে বিদ্যুৎদীর্ণ অন্ধকার, মেঘের উন্মত্ত গর্জ্জনে উচ্ছ্বসিত বৃষ্টিধারা। অজয়ের মনে হচ্ছিল পৃথিবীটা আবার বুঝি সেই Cainozoic যুগে ফিরে গেছে, যখন অন্য কোনো বাণী নেই, অন্য কোনো প্রাণী নেই, মেঘমন্দ্রে পৃথিবীর একমাত্র ভাষা, নিত্যবর্ষায় তার একমাত্র ঋতু।

"মশার উৎপাত আর চামচিকের আপ্যায়নে অস্থির হয়ে অবশেষে অজয় উঠে পড়ল। পকেট হতে দেশলাই বার করে জ্বালিয়ে দেখলে রাত তখন বারোটা বেজে গেছে। বৃষ্টি থেমে গেছে, সিক্ত হাওয়া সজোরে বইছে। মেঘমিশ্রিত জ্যোৎস্নার বিবর্ণ একটা আলো ম্লানায়মান স্মৃতির মতো ভরেছে চারিদিকে। অজয় বাইরে এসে দুর্গাপ্রাচীরের সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালে। ভগ্নসোপান বেয়ে সাবধানে ওপরে উঠে এল। খানিকটা ভাঙা ছাদের ওপর জল জমেছে, জলের 'পরে জ্যোৎস্না পড়ে রূপোর মতো জ্বলছে। খানিকটা আলিসার ভাঙা থামে অশথের শিকড় জড়িয়ে রয়েছে। ঠিক নীচে পদ্মভরা পরিখা ফুলে পাতায় আলোয় কালোয় রহস্যে সৌরভে গুম্‌রে রয়েছে। অজয় সেখানটায় বসে পড়ল, জলের পানে চেয়ে চেয়ে কখন সে যে ঘুমিয়ে পড়েছে কিছুই জানে না।

"গভীর একটা তূর্য্যনিনাদে অজয় সচকিতে জেগে শশব্যস্তে উঠে বসল। নিদ্রালস চোখে তীব্র আলো লেগে ক্ষণেকের জন্যে তাকে বিমূঢ় করে দিলে। সম্বিৎ পেয়ে সে যা দেখলে তাতে চেতনা আরো তার আচ্ছন্ন হয়ে গেল। দেখে বিস্তীর্ণ ছাদ জালিকাটা পাথরের আলিসায় ঘেরা; সারি দেওয়া মর্ম্মর-অপ্সরার সংযুক্ত হাতে রৌপ্যদীপাধারে সংস্র দীপ জ্বলছে। ছাদের স্বচ্ছ মসৃণ পাথরের নিকষ কালোর 'পরে সে আলোর শিখা সোনার রেখায় নৃত্য করছে। আলিসা গবাক্ষে আকাশছোঁয়া সৌধশ্রেণী দেখা যায়, নীচে কতলোকের ব্যস্ত কর্ম্মগুঞ্জন, কত রকমের মিশ্র কোলাহল। আবার তূর্য্যধ্বনি হল, রাজপুরীর প্রহরী পরিবর্ত্তন হল, ক্ষিপ্র অশ্বারোহীর দল পদধ্বনি তুলে চলে গেল, কোথায় হাতী গর্জ্জন করে উঠল। আলোর মালা ফুলের মালার মতো প্রাসাদের গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে, পথে প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে আছে। ঠিক সামনেই কালো পাথরের বিপুল মন্দির, বৃহৎ রৌপ্য ঘণ্টা দুলছে ধীরে, মুক্তদ্বারের পাশে রক্তবসন পুরোহিত বসে শাস্ত্র পাঠ করছেন। বহুধূপের নীলাভ ধোঁয়ার আড়াল হতে রক্তাভ দীপশিখা নম্র আলোয় জ্বলছে।

"অজয় বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর নিজেকে জোরে একটা নাড়া দিলে, দেখতে, জেগে আছে কিনা। তার বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তটাকে জোর করে জাগিয়ে দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে সে আন্দাজ করতে চেষ্টা করছিল, এমন সময় কার গলার আওয়াজ শুনে ভয়ানক চমকে উঠলে। ছাদটা যেখানে ঘুরে গেছে তার ওপাশ হতে আওয়াজ এলো। এতরাতে সম্পূর্ণ অপরিচিতকে নিজের গৃহছাদে দেখলে কেউই আনন্দিত হয় না। অজয় তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সরে যাবার জন্যে। কিন্তু যাবে কোথায়। ছাদ হতে নামবার এক তোরণদ্বারে দুপাশে শ্বেতপাথরের হাতী পরস্পরের ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত শুঁড় জড়িয়ে ধরে আছে! তার পাশে দুধারে দুই প্রহরী পাষাণ মূর্ত্তির মতো নিশ্চল। পরণে তাদের আঁট করে বাঁধা লাল কাপড় হাঁটু অবধি নেমেছে, গায়ের হাতকাটা জামা কটি অবধি এসেছে। কণ্ঠে কটিতে বাহুতে মোটা রূপার অলঙ্কার, কানে সোনার কুণ্ডল। বাবরিকাটা মসৃণ কালো চুলে জবাফুল, গলায় গাঁদাফুলের মালা। হাতের বর্শার ফলার ওপর বাতির আলো ঝল্‌কে উঠছে। অজয়কে ফিরতে হল। ছাদের ওপারে যারা ছিল তারা তখন সামনে এসেছে। অজয়ের প্রতি তারা দৃক্‌পাতও করলে না। একটি মেয়ে, পরণে তার উষার মতো অরুণাভ বসন, একটি হাত পাথরের জালির ওপর আল্‌গা ভাবে রেখে সে দাঁড়িয়েছে। কর্ণভূষার, কণ্ঠের, কঙ্কণের হীরে হতে তার শতমুখে আলো ঠিকরে পড়ছে নানা দিকে। অজয় অবাক হয়ে চেয়ে রইল,—কী আছে ওই মেয়েটির দৃষ্টিতে! কতযুগের কত বর্ষার ছায়ামেদুর স্বপ্নলোকের সন্ধান বুঝি ও, কত নিশীথরাতের নিকষকালো আকাশের নিঃশব্দ তারার আহ্বান আছে বুঝি ওর মাঝে। শ্রাবণ দিনের রজনীগন্ধার মতো স্নিগ্ধ ও,—ফাগুনদিনের আগুনলাগা অশোকের মতো

দীপ্ত ওর রূপ। দাঁড়াবার ভঙ্গীটি,—একটি পূরবীর সুর সহসা থমকে যেন দাঁড়িয়ে গেছে।"

অবিনাশ বাধা দিয়ে বলে উঠল, "একি নক্ষত্র, শুনে মনে হয় এর সঙ্গে তুমিই বুঝি বা প্রেমে পড়েছিলে। মঞ্জরী, শুনছ, থমকে দাঁড়ানো গানের সুর।"

নীরদ বললে, "আঃ, রসভঙ্গ কর কেন ?"

নক্ষত্র হেসে বললে, "আমি যদি বলি থম্‌কে দাঁড়ানো গানের সুর, মঞ্জরী জানেন সে তাঁরই উদ্দেশে বলা। আমার প্রাণের ভয়ও ত আছে অন্ততঃ। কিন্তু এগুলো হল অজয়ের কথা। কতটা প্রত্যক্ষ দেখলে এতখানি অনুভব করা যায় সেটা বলার জন্যে কথাগুলার পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। শোনো এখন গল্প।

"মেয়েটির পাশে আরো একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। শুভ্র তার বেশ, জরীর উত্তরীয়-প্রান্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, কানে হীরের কুণ্ডল, গলায় মুক্তার মালা আর মল্লিকার মালা। গর্ব্বোন্নত চেহারা। প্রশস্ত ললাটে রক্তচন্দনের টীকা, বাম ভুরুর পরে কলঙ্ক রেখার মতো একটা বড় কালো তিল। চেহারায় তার অসুন্দর নেই কোনোখানে, তবু তাকে সুন্দর বলতে বাধে। ঠোঁটের একটা বাঁকা নিষ্ঠুরতা, চোখে একটা নীচ সন্দেহের চাহনি তার রাজকীয় আকৃতিকে বিকৃত করে দিয়েছে। ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে সে মেয়েটিকে বললে, "কথার উত্তর দাও পদ্মাসনা।"

'কি বলব ?' বর্ষা পূর্ণিমার চাঁদ যখন মেঘের আড়াল ভেঙে হঠাৎ বেড়িয়ে আসে, পাপিয়ার মধুসুর তখন এমনি আকুল হয়ে উঠে।

'মন্দিরে আরতির সময় কে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ?'

'ও কিশোর, ও আমার খেলার সাথী ছিল ছোটবেলায়—আমার বাপের বাড়ীতে পালিত। দূর হতে এসেছে রাজধানী দেখতে, তাই আমায়ও দেখতে এসেছিল।'

'পালিত বিতাড়িত পরিজনের সঙ্গে রাজবধূর মনের কথা বলার প্রথা এ রাজ্যের অন্তঃপুরে নেই। এ সমস্ত তোমায় বন্ধ করতে হবে পদ্মাসনা। তোমায় আমি সন্দেহ করি তা জানো ?'

"কী নির্ম্মম কণ্ঠ।—

'জানি, জানি। পদে পদে ছুঁচ ফুটিয়ে জানাচ্ছ তা। ছমাস হয়েছে এ অন্তঃপুরে এসেছি আমি, রাজবধূত্বের যা মোহ ছিল সমস্ত নিঃশেষে ঘুচিয়েছ তোমরা। ঐশ্বর্য্যের আড়ালে এত নীচ নিষ্ঠুরতা—এত সন্দেহ থাকতে পারে, এত রকম চক্রান্ত চলতে পারে কে জানত। অন্তঃপুরের অবরুদ্ধ মনের সঙ্কীর্ণতার চাপে নিশ্বাস আমার বন্ধ হয়ে আসে, রুদ্ধ-জলের মতো এ বদ্ধতা অন্তরকে ডুবিয়ে মারে।'

"লোকটির দুই চোখ হিংস্র আলোয় জলে উঠল। ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে সে বললে, 'তাই নাকি! ছিলে ত মেঠো-সামন্তের মেয়ে, রাজঅন্তঃপুরের মর্য্যাদা তুমি বুঝবে কি ? বর্বরদের মতো ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো হয় না, তাই তোমার আক্ষেপ,—প্রেমপাত্রদের নিয়ে প্রেমালাপ হয় না তাই তোমার বিদ্রোহী মন—'

'অন্যায় অপমান কোরোনা, গৌড়েশ্বরী বিমুখ হবেন।'

লোকটি গর্জ্জন করে উঠল, 'কী, আমাকে ভয় দেখান! ভেবেছ আমি কিছুই বুঝিনা। বরাবরই তোমাকে আমি সন্দেহ করছি, এইবার হাতে হাতে ধরা পড়েছ। এর শাস্তি তোমাকেও পেতে হবে।'

'শাস্তি দেবার শক্তি তোমার আছে, ইচ্ছা হলেই দিতে পার। কিন্তু গৌড়েশ্বরী জানেন আমি নির্দ্দোষ। তোমার কোনো শাস্তিই মনকে আমার আহত করবে না।'

"দাঁতে দাঁত চেপে লোকটি বললে, 'স্পর্দ্ধার আর শেষ নেই।—করে কিনা দেখ তবে।'

"হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ করুণ চীৎকার রজনীকে বিদীর্ণ করে দিলে। কী হয়েছে বোঝার আগেই মেয়েটির দেহ বহুনীচে পরিখার গভীর জলে তলিয়ে গেল। লোকটী ফিরে দাঁড়াল, মুখে তার বীভৎস নির্ম্মম নিঃশব্দ হাসি।...

"চারিদিকে কী ভীষণ কোলাহল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সহস্র লোকের চীৎকার, বাজের গর্জ্জন, ঝড়ের আওয়াজ,—দীপ নিভে গেল সব, প্রাসাদ মন্দির গৃহচূড়া কোথায় তলিয়ে গেল তিমিরে। অন্ধকার যেন রুদ্রাণীর রূপ নিয়েছে, উন্মত্ত মেঘে তার উন্মুক্ত কুন্তল উড়ছে, বিদীর্ণ বিদ্যুতে তার বহ্নিময় হাসি।

"অজয় দুহাতে কান চেপে হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে আড়ষ্ঠ হয়ে পড়ে রইল।

*　　　*　　　*

"পরদিন সকালে অজয় গরুর গাড়ী চড়ে মালদায় ফিরে এল। পরিখার বারিবিচ্ছিন্ন পদ্মবনের পানে যতক্ষণ দেখা যায় সে চেয়ে ছিল।—পদ্মাসনা,—রক্ত-পদ্মদলের মতো রক্তাভ বসন, শ্বেতপদ্মের মতো স্নিগ্ধ শুভ্র দেহের রং, পদ্মাসনাই বটে।

"অজয় সহরের নানালোকের কাছে রাতের সে কাহিনীর নানা রকম ব্যাখ্যা শুনল। অনেকেই বললেন কবে কোন্ রাজপুত্র তার সুন্দরী পত্নীকে সন্দেহে অমনি করেই মেরে ফেলেছিল, এমন একটা কিম্বদন্তী আছে বটে।

"তারপর কতদিন কেটে গেছে। স্মৃতির রং সময় লেগে মুছে যায়। লক্ষ্ণৌয়ে অজয় গেছে এক বন্ধুর বাড়ী গানের জলসায়। অনেক খ্যাতনামা ওস্তাদের সঙ্গত চলছে, বহু অতিথি সমাগত হয়েছেন, অনেকে নানারকম বাহাবা দিচ্ছেন, সভা সরগরম হয়ে উঠেছে। এত লোকের মাঝে একজন শুধু সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে বসে আছে,—কোনোদিকে তার দৃক্‌পাত নেই, চেহারায় একটা দাম্ভিকতা, অনবরত তামাকের নল মুখে চেপে রেখে রেখে ঠোঁটের একটা চাপা ভাব মুখকে নিষ্ঠুর করে তুলেছে। গায়ে বহুমূল্য জামিয়ার, হীরার আংটি আঙুলে। অজয় বার বার তার দিকে না তাকিয়ে পারছিল না, কোথায় যেন দেখেছে একে,—বহুবিস্ময়বিজড়িত স্মৃতি-মন্থিত চেহারা ওর। এক নূতন ওস্তাদ মালকোষ ধরল। লোকটি এবার একটু নড়ে তার দিকে ফিরে বসল। মুখ ফেরাতেই তার বামভুরুর ওপর বড় একটা কালো তিল চোখে পড়ল অজয়ের। মুহূর্ত্তে তার মনের মাঝে বিস্মৃতির 'পরে স্মৃতির বিদ্যুৎ খেলে গেল।—গৌড়ের বনে সেই বর্ষারাত, বিজন অরণ্য, ভগ্নপুরী, পদ্মভরা পরিখা—অজয় স্তম্ভিত হয়ে গেল।......

"তাড়াতাড়ি সে উঠে যেয়ে বন্ধুর কাছে লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে। বন্ধু বললেন, 'হাঁ উনি এখানকারই লোক, ভারি বনিয়াদি বংশের ছেলে। এই সম্প্রতি বিয়ে করেছেন এক আধুনিকাকে!"

"আচ্ছা খুব সুন্দর কি সে মেয়ে?"

"শুনেছি খুবই সুন্দর বলে।—সেই জন্যেই উনি ওঁদের ঘোর সনাতনপন্থীয় বংশের বিরোধী এমন বিয়ে করেছেন। কিন্তু উনি স্ত্রীর সম্বন্ধে যেরকম touchy, তোমাকে এসব প্রশ্ন করতে শুনলে এখুনি সন্দেহ করে বসবেন।'

"কেন, এত সন্দেহ কিসের?'

"জানইত ওঁদের ধারণা বাইরের আলোহাওয়ার অধিকার পুরুষের একচেটে। তার মাঝে যে-সব মেয়ে অনধিকার প্রবেশ করে, ওঁদের বিরূপ মন তাদের দোষ দেবার কিছু খুঁজে পায় না, তখন সন্দেহ করেও অন্ততঃ সুখ পায়। উনি অবশ্য ওঁর স্ত্রীকে ভালো করেই পর্দাজাত করে ফেলেছেন, তবে অভ্যাস দোষ আষাঢ়ের অবেলা বেলার মতো, কিছুতেই ফুরতে চায় না।'

"অজয় নির্বাক হয়ে রইল। কী সে বলবে কাকে। বলেই বা হবে কী। কিছু করার উপায় ত কারো নেই। অত্যন্ত অস্বস্তিতে ভরে উঠল তার মন। অন্যমনস্ক ভাবে সে উঠে চলে এল।

"মাস কয়েক পরে কলকাতায় অজয় তার বাড়ীতে বিকেলে একদিন চা খাচ্ছে বসে। তার সে লক্ষ্ণৌয়ের বন্ধু হঠাৎ এসে হাজির হলেন। অজয় কলরব করে অভ্যর্থনা করে উঠল, বললে, 'আচ্ছা যাহোক, একমাস আগে লিখেছিলে কলকাতায় আসবে বলে, এতদিনের পর তোমার আসার সময় হল। তোমাদের লক্ষ্ণৌয়ের দিনপঞ্জী দেখছি lotos-eater-দের দেশ থেকে আনা।'

"বন্ধু হেসে বললেন, 'না, না আমি আসছিলাম, একটা গোলমালে পড়ায় একটু আটকে যেতে হল।' অজয় বন্ধুকে চা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'রেখে দাও ওসব 'খোঁড়া ওজর', কী এমন গোলমাল হল শুনি?'

"না সত্যি ওজর নয়। শুনলে তুমিও একটু interested হবে। আমাদের ওখানে সেই গানের মজলিসে একজনের পরিচয় চেয়েছিলে মনে আছে?'

"হ্যাঁ, সে আমার ভালো করেই মনে থাকবে। কেন, তিনি আমার নামে কোনো case এনেছিলেন নাকি?'

"না, তাঁর বাড়ীতে একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে। তাঁর স্ত্রী ছাদ থেকে পড়ে যেয়ে মারা গেছেন।'

"অজয়ের হাত হতে পেয়ালাটা পড়ে যেয়ে শতখণ্ডে চূর্ণ হয়ে গেল। সে শুধু বললে, 'যা ভেবেছিলাম।'

"বন্ধু বললেন, 'কি ভেবেছিলে? এঃ, তোমার গরদের পাঞ্জাবীটা একেবারে মাটি হল চায়ের দাগে।—ওখানে এই নিয়ে কতলোকে কতরকম কথা বলছে, কানাঘুসো করছে। যাই হোক, আমার আলাপী, তায় আবার প্রতিবেশী, এ সময় কাছে থাকতে হল, চলে আসা চলে না।'

"তিনি আরো কি বললেন, অজয়ের কানে কিছুই প্রবেশ করল না। বাতায়নের বাহিরের জনাকীর্ণ নগরীর পানে স্তব্ধ হয়ে সে চেয়ে রইল। ভাবছিল, কেমন করে এমন হয়! সন্দেহের অন্ধকার ছায়া কি মৃত্যুতেও জ্বলে নিঃশেষ হয় না। হত্যার তৃষিত পাপ হতে পরিত্রাণ মানুষে জন্ম-জন্মান্তরেও কি পায় না!"......

শ্রীইলা দেবী

ভারত-গাথা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ক্লেশ
শেষ
নাই,
ভাই!

প্রাণ,　　বিনত
মান　　ভারত,
যায়,　　তোমার
হায়!　　অপার

দহন　　অনিবার
কখন　　আঁধিয়ার
বিলয়　　ঘেরে ঘোর,
না হয়?　　নাহি ভোর।

কত দিন
সুখহীন
যাপি রাত?　　মাগো ভারত,
প্রাণপাত?　　তোমার রথ
কত কাল　　বেগে প্রবল
এই ভাল্　　ধরণীতল
পাবে তাপ,　　গিয়াছে মথি'।
অভিশাপ?　　তোমার রথী

*

পার্থ ভীম
বলে অসীম
করিল জয়
প্রদেশচয়।
তোমার আজ
এ কি এ লাজ?

ভারত আমার,
সুষমা-আধার,
অতুলা মোহিনী,
জগৎ-পালিনী,
কত না হাজার
বরষে তোমার
বিপুল বিভব
মহা গৌরব
আজও অবশেষ
রাজে ভরি' দেশ।
বলো, মা ভারত,
ধরি' কোন্ পথ
ফিরাব তোমায়
নিজ মহিমায় ?

*

যে ছিল বলবতী
মহতী বসুমতী,
সে আজি ধূলিলীনা ?
অনাথা দীনহীনা ?
তনয় মোরা তারি
কেবল আঁখি-বারি
করেছি সম্বল
আঁকড়ি ধূলিতল !
এ লাজ রাখিবার
আছে কি ঠাঁই আর ?
নাহি-রে নাহি ঠাঁই,
বাঁচিতে আজি চাই।
বাঁচিতে চাহি বলে,—
হৃদয়ে আশা জ্বলে !
নিরাশা-আঁধিয়ারে
আশার তরবারে
কর রে কর ভিন্,
হাসিবে সুখ-দিন !

বিস্ফোটক

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

বিয়ের পর নতুন স্ত্রীকে ছেড়ে থাকা কঠিন, এমন কথা কলেজের ছেলেরা বলে। অশোক সবেমাত্র কলেজ ছেড়ে ঢুকেছে চাকরীতে। পরিণয়ের প্রথম অবস্থাটার নেশা কিছু পরিমাণে কাটবার আগেই তাকে দেশত্যাগ করতে হোলো। হেতুটা জীবন সংগ্রাম। বীমা কোম্পানীর কাজ নিয়ে কিছু-কাল তাকে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতে হোলো—সমস্তদিনের সর্ব্বক্ষণ সে জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব দুঃখ দুর্ব্বিপাক ইত্যাদির সম্বন্ধে স্থানে অস্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালো। কিন্তু একটা কথা সে ভোলেনি, প্রতি একদিন অন্তর স্ত্রীর কাছে একখানা ক'রে চিঠি তার লেখা চাই—এটা তার স্ত্রী প্রণতির অনুরোধ। পুরণো স্বামীরা সম্ভবত এমন অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত না, কারণ স্ত্রীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠতার দরুণ তাদের মনে আসে ঔদাসীন্য এবং স্ত্রীদের আসে অবসাদ ; উভয়েই উভয়ের কাছে কিছুকালের জন্য নিস্তার পেয়ে বাঁচে। যাই হোক আমাদের অশোক আর প্রণতি আজো সে স্তরে এসে পৌঁছয়নি, তাই চিঠিপত্রে তাদের অতৃপ্তিজনিত প্রচুর কবিত্ব আর উচ্ছ্বাস দেখা যায়। যথেষ্ঠ রং আর মাদকতায় প্রেমপত্রগুলি জল্ জল্ করতে থাকে।

কিছুকালের পর ভ্রমণ শেষ ক'রে অশোক হেড আপিসে একটা খবর দিয়ে জিনিষপত্র প্যাক্ করে সোজা কল্‌কাতায় দাদার বাসায় এসে হাজির। দাদা ইতিমধ্যে বাসাটা বদল করেছিলেন, এ-বাড়ীতে অশোক এলো এই প্রথম। জীবন সংগ্রামের কথাটা পিছনে রইল, নতুন ক'রে স্ত্রীকে পেয়ে কয়েকদিনের জন্য অশোক ঘরে ঢুকল। প্রণতি ঠাট্টা ক'রে হেসে বললে, না থাকলেও জ্বালা, থাকলেও জ্বালা!

দাদা অন্তরালে হাসলেন এবং সম্মুখে এসে বললেন, 'ছ'মাস তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ, এবার কিছুদিন বিশ্রাম নাও।

অশোক সবিনয়ে বললে, যে আজ্ঞে।

প্রণতি ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে, বড়ঠাকুর বিশ্রাম নিতে বলেছেন, পরিশ্রম করতে বলেননি, মনে রেখো।

অশোক উত্তরে বললে, ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধিয়তে!

যাই হোক, দীর্ঘকাল বিশ্রাম নেবার পর নেশা কাটিয়ে অশোক জেগে উঠ্‌ল। চেয়ে দেখলে গতমাসে যে তারিখে সে এ-বাড়ীতে এসেছে, দেয়ালের ক্যালেণ্ডারে সে-তারিখটা আজো বদ্‌লানো হয়নি। প্রণতি খুসীর হাসি হেসে বললে' বছরটা কাটেনি এই রক্ষে। তুমি একটি আস্ত পাগল।

অশোক মাথা চুলকে উঠে বললে, দাদা মা, ওঁরা কিছু মনে করেননি ত?

তুমি ত বিশ্রাম নিচ্ছিলে, এতে মনে করবার কি আছে, শুনি?

অশোক বললে, একটা মাস কোথা দিয়ে কাট্‌ল?

প্রণতি হেসে বললে, আমারি কি ছাই মনে আছে?

অশোক তার উত্তরে বললে, সম্পুর্ণ আইনানুগত এবং অহিংস বিশ্রাম, এতে পাঁচজনে ক্ষুণ্ণ হ'লে দুঃখিত হবো। এবার আপাতত একটু ভদ্র হওয়া যাক্, কি বলো?

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, সকাল বেলাটা কাটুক কাজকর্ম্মে, দুপুর বেলা ঘুমোনো যাক্, বিকেলে বেড়াতে বেরোই—তারপর রাত্রে যথারীতি।

রাত্রে কি চাঁদের আলো দেখবে ব'সে ব'সে?

না। জান্‌লাটা বন্ধ ক'রে রাখ্‌ব। বীমার কাজ নিয়ে বিদেশে যখন ঘুরতুম জ্যোৎস্নাটা লাগত ঘন মদের মতো, এখন চাঁদের আলোটা লাগছে ফিকে। এই মুহূর্ত্তে যদি প্রেম পত্র লিখতে বসি তাহ'লে ভাষায় আর রং ধরাতে পারব না।

প্রণতি বললে, তা হ'লে আবার কিছুকাল কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ক'রে কোনো যোগীর আশ্রমে ঘুরে এসো। বামা ছেড়ে আবার বীমাতেও যেতে পারো।

অশোক বললে, তার আগে চলো একটু বেড়িয়ে আসি, এমন সুন্দর সন্ধ্যা—

বটে! প্রণতি বললে, স্ত্রীলোককে নিয়ে 'সুন্দর সন্ধ্যায়' বেড়াতে বেরোবার প্রস্তাব? রসের ক্ষেত্রে কিছু রসদ এখনো জমা আছে দেখছি। থাক্, সন্নিসি হবার চরিত্র তোমার নয়, চলো বেড়াতেই যাওয়া যাক্। ঘর থেকে বেরোও, আমি মনের মতন ক'রে প্রসাধন করব।

সহরের পথে মোটর বাসের সুবিধা হয়েছে, অল্প খরচে প্রচুর ভ্রমণ করা যায়। সমস্ত বিকালটা তারা ঘুরল, গড়ের মাঠে গিয়ে হাওয়া খেলো, কোনো কোনো পথিক-তরুণের দ্বারা অনুসৃত হোলো, এবং তারপর গিয়ে ঢুকল সিনেমায়। সিনেমা থেকে বেরিয়ে রেস্তোঁরায় গিয়ে ঢুক্‌ল চা খেতে। অবশেষে রাত নটার নাগাৎ প্রণতি বললে, এবারে চলো নতুন জায়গায়।

অশোক বললে, রাত নটার পর আবার নতুন জায়গা?

প্রণতি বললে, এতদিন পরে বেরিয়েছি, ঘরে ফেরার অত তাড়া কেন শুনি? কি মৎলব?

অশোক বললে, পুরুষের মন, নীড় বাঁধতে চায়!

নীড় বাঁধতে চায় তরুণরা বিয়ে না হওয়ায় ব্যথায়, তুমি চাইছ কেন?

তা হ'লে চলো তোমার পক্ষপুট আশ্রয় করি গে?

প্রণতি করুণ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললে, মৎলব তোমার ভালো নয়! হা ভগবান—চলো!

ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে দেখা গেল, স্বদেশী মেলার ভিড়। বাস্ এসে দাঁড়াল। প্রণতি চুপি চুপি বললে, ওগো, চলো না মেলা দেখে যাই। লক্ষ্মীটি, আবার কবে আসব তার ত আর ঠিক নেই!

অশোক বললে, বেশ চলো, তোমাকে খুসী ক'রে বাড়ী নিয়ে যাওয়াই দরকার।

হাসতে হাসতে দুজনে নাম্‌ল। রাস্তা পার হয়ে টিকিট্ কিনে দুজনে ঢুকল স্বদেশী মেলায়। ভিতরের জনতা কিছু কমেছে, দোকানও দু'চারটে বন্ধ হয়েছে, কিন্তু বেড়িয়ে যাওয়াটা যাদের লক্ষ্য, তারা নিজেদের আনন্দ নিয়েই ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগল। এবং আনন্দের চেহারাটা এমন অবস্থায় পরিণত হোলো যে, দুজন লোক না এসে পড়লে হয়ত একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে স্বামী-স্ত্রীর ওষ্ঠাধরের স্পর্শ বিনিময় হয়ে যেতো। লোক দেখে তারা সতর্ক হয়ে গেল।

অপ্রতিভ অবস্থাটা কাটিয়ে অশোক বললে, সংযমটা খুব ভালো জিনিষ, নয়?

প্রণতি বললে, সংযম আর বৈরাগ্য! লোক দুটোর কাছে ধরা পড়লে কতটা লজ্জা হোতো বলো দেখি? হয়ত ওরা মনে ক'রে যেতো তুমি চরিত্রহীন এবং আমি পথের একটা—

চলতে চলতে অশোক গভীর চিন্তা করতে লাগল। তারপর এক সময়ে বললে, হৃষিকেশ আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, তিনি আমাদের যে কাজে নিযুক্ত করেন, আমরা তাই করি। তোমার সঙ্গে আমার যা কিছু অন্যায় আচরণ, এবার থেকে তাঁর নামে সঁপে দেবো।

প্রণতি হেসে বললে, থামো, তোমার দুর্নীতির চেয়ে নীতিজ্ঞানটা বেশি বিপজ্জনক। তোমার ঠিক সময়ের চেহারাটা আমি জানি, আমার কাছে ধার্ম্মিকের মুখোস প'রো না।

অতএব অশোক চুপ ক'রে গেল।

রাত দশটার পর তারা চারিদিক দেখে শুনে পথে বেরোবার উপক্রম করছে, এমন সময়ে প্রণতি ধ'রে বসল, এই ত সাবান রয়েছে এখানে, কিন্‌বে এক বাক্স?

সাবানের দোকানে মেয়েদের ভিড় বেশি। না কিনলেও তারা নাড়াচাড়া করে, দরদস্তুর করে। প্রণতি তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

ভিড় ক'রে যারা সাবানের আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত তাদের চটুল হাসি আর কথালাপে দোকানটা মুখরিত। তারা যেন নিজেদেরই ছড়িয়ে বিতরণ করছে। প্রসাধন সম্বন্ধে এমন বিচিত্র আলাপ আলোচনা অশোক আর কখনো শোনেনি। প্রণতি একবার স্বামীর দিকে চেয়ে এক বাক্স সাবান কিন্‌লে।

একটি মেয়ে এদেরই মাঝখানে নীরবে দাঁড়িয়ে এদের এই চটুল চাঞ্চল্যটা পর্য্যবেক্ষণ করছিল। অত্যন্ত সাদাসিধে তার বেশভূষা, মুখশ্রী শান্ত নির্লিপ্ত, আলাপ ও আচরণে সংযত। মুখখানি তার মাধুর্য্যে ও নম্রতায় ভরা। সম্ভবতঃ কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। পিছনে একজন হিন্দুস্থানী দারওয়ান

মাথায় উর্দ্দি প'রে লাঠি নিয়ে তার অপেক্ষা করছে। প্রণতি তার দিকে সসম্ভ্রমে একবার চেয়ে চ'লে যাচ্ছিল।

মেয়েটি অতি বিনীত কণ্ঠে বললে, আজ আপনাকে ভারি সুন্দর মানিয়েছে, প্রণতি দেবী।—অতি পরিচিত বন্ধুর মতো তার কণ্ঠস্বর।

প্রণতি মুখ ফিরিয়ে বললে, আমাকে? আমাকে কি আপনি চেনেন?

চিনি বৈ কি, পাশেই ত থাকি।—ব'লে সে হাসলে।

পাশে? মানে, আমাদের বাড়ীর গায়ে?

মেয়েটি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের উত্তর দিকের বাড়ীটার একটা অংশ আমরা ভাড়া নিয়েছি, প্রায় একমাস হয়ে গেল।

প্রণতি বললে, কই আমি দেখিনি ত আপনাকে?

মেয়েটি বললে, বোধ হয় কাজে কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন কিনা। একদিন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আসবেন, চায়ের নেমন্তন্ন রইল। আমার নাম সরোজিনী। মনে থাকবে ত?

খুব থাকবে। ওগো শোনো, এসো আলাপ করবে এঁর সঙ্গে।—সরোজিনীর সঙ্গে অশোকের আলাপ করিয়ে দিয়ে প্রণতি বললে, ইনি আমার স্বামী অশোক রায়, আর ইনি সরোজিনী দেবী।

অশোক বললে, এত কাছে থাকি অথচ আপনাকে একবারো দেখিনি?

সরোজিনী মৃদু শোভন ভদ্র হাসি হাসলে। পরে বললে, খুব কাছে থাকলেও দেখা যায় না অনেক সময়ে।

চোখের কালো তারার ভিতরে মেয়েটির যেন একটি অপরূপ গভীরতা রয়েছে। বয়স আন্দাজ প্রায় পঁচিশ। সিঁথীর রেখায় আজো এয়োতির চিহ্ন ওঠেনি। বৈধব্যের কোনো ইঙ্গিত নেই, হাতে মিহি সোনার চুড়ি, পরণে ফরাসডাঙার সাধারণ একখানা সাড়ী, গলায় একগাছি বিছাহার চিক্‌চিক্ করছে। রূপের বন্যায় অশোকের চোখ দুটো যেন ভেসে গেল।

অশোক বললে, একমাস আছেন অথচ...এর নাম কল্‌কাতা শহর, কেউ কারো খোঁজ রাখে না। এ যে আমাদের পক্ষে কতদূর অন্যায় হয়েছে সরোজিনী দেবী...আপনারা ভাড়া নিয়েছেন ও বাড়ীটা কতদিনের জন্যে?—যেন রাজ্যের মিষ্টতা তার কণ্ঠে ফুটে উঠ্‌তে লাগল।

মাথা হেঁট ক'রে সরোজিনী বললে, লেখাপড়া কিছু হয়নি, তবে থাকতে পারব বেশিদিন এমন মনে হয় না, নানা অসুবিধে আছে।

প্রণতি বললে, নিশ্চয় আমরা যাবো বেড়াতে আপনার কাছে। বাস্তবিক, আপনি যে দয়া ক'রে ডেকে আলাপ করবেন এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, এমন মিষ্টি স্বভাব আপনার।—উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সে গিয়ে সরোজিনীর একখানা হাতই ধ'রে ফেললে।

অশোক বললে, আমার স্ত্রীর সারল্যে আপনাকেও মুগ্ধ হ'তে হবে। নিজের স্ত্রী ব'লে বলছিনে, কিন্তু ওর সঙ্গে যতই আলাপ হবে দেখবেন—

থামো তুমি। প্রণতি তাকে ধমক দিলে। সরোজিনী সস্নেহে দুজনের দিকে একবার চেয়ে বললে, আপনাদের রাত হয়ে যাচ্ছে, আর দাঁড় করিয়ে রাখব না—

অশোক সাগ্রহে বললে, চলুন না, একই ত রাস্তা—না, আমি একটু অন্য কাজ সেরে যাবো। আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। আচ্ছা নমস্কার। ও রামশরণ পিছুনে প্রতীক্ষমান দারোয়ান বললে, মাইজি—বিদায় নিয়ে সরোজিনী চ'লে গেল।

প্রণতি বললে, লজ্জা হয় ওকে দেখলে। সাজগোজ এতটুকু নেই, অথচ কী রূপ! কাপড় পরার ধরণ দেখলে, শরীরের কোথাও কিছু দেখা যায় না, এখনকার মেয়েদের মতন অসভ্যতার ইঙ্গিত করে না।

অশোক কথা বলছে না। প্রণতি পুনরায় বললে, আমার চেয়ে ও অনেক ভালো। সেজেগুজে ওর কাছে দাঁড়াতে কী লজ্জাই আমার করছিল! চেহারায় কী শ্রী দেখলে? এর নাম সংযম, দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে। হ্যাঁ গা, তুমি কথা বল্‌ছ না কেন?

অশোক চিন্তিত মুখে একটু হাসলে। তার ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে প্রণতি বললে, প্রেমে পড়ে গেলে নাকি?

অনেকটা।

চোখ পাকিয়ে প্রণতি বললে, ও সব দুর্বুদ্ধি খাট্‌বে না,

প্রেমের ওষুধ আছে ওই রামশরণের ভোজপুরী লাঠিতে, দেখবে মজা!

দুজনেই হাসতে হাসতে গিয়ে মোটরবাসে উঠল। আজকে তারা যেন অপ্রত্যাশিত কিছু লাভ করেছে।

পাশের বাড়ীটা বড়। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে কে যেন এক জমীদার লাখ তিনেক টাকা খরচ ক'রে এই প্রাসাদটিকে খাড়া করেছেন। ছোট বড় মাঝারি, বহু অংশে বিভক্ত। এক একটি অংশ ভাড়া খাটে, যথেষ্ট লাভজনক ব্যবসা। কতকগুলো দরজা কতকগুলো এর প্রবেশ পথ, তার আর ঠিক ঠিকানা নেই। বহু সংখ্যক পরিবার ও লোকজন এই প্রাসাদের অন্ধিতে-সন্ধিতে খণ্ডিত হয়ে বাস করে। এক পরিবার আর এক পরিবারের বিন্দুমাত্রও খোঁজ খবর রাখে না। সাধারণ সিঁড়িটা ছাড়া কারো সঙ্গে কারো দেখা সাক্ষাতও হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বিরাট প্রাসাদেরই কোন্ অলক্ষ্য অন্দর-মহলে একটি গৃহস্থবধূ আত্মহত্যা ক'রে জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছিল, পুলিশ না আসা পর্য্যন্ত এ ঘটনার গন্ধও আস-পাশের কোনো লোক বুঝতে পারেনি।

সকাল বেলা উঠে উত্তর দিকে জানলাটা খুলে প্রণতি বোঝবার চেষ্টা করলে, সরোজিনীর ফ্ল্যাটটা কোন্ দিকে। কিন্তু জানা গেল না। সুমুখের জানলাগুলি খোলা, এদিকটায় এক মাড়োয়ারি পরিবার থাকে। তাদের পাশে দেবেন বাবুরা, সরোজিনী তাদের কেউ নয়। দক্ষিণদিকের দোতলা ফ্ল্যাটের পশ্চিম দিকটায় হিন্দুস্থানীদের বাসা। তাদের গায়ে রাসবিহারী মোড়ল, চাউল ব্যবসায়ী। নীচের তলায় হোমিও-প্যাথি ডাক্তার, এস্ কে দত্ত। তাঁর পাশে পাড়ার ছেলেদের ড্রামাটিক্ ক্লাব। পূবদিকের তিন তলার ফ্ল্যাটে বালকবালিকার ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, সেখানে থাকেন জ্ঞানানন্দ সরস্বতী। প্রণতি খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে এক সময় জানলা বন্ধ ক'রে দিলে।

কাজের অছিলায় অশোক একবার গেল খোঁজ নিতে। কোন্ দরজায় খোঁজ পাওয়া যায়, ঠিক পাওয়া গেলনা। অতএব বড় রাস্তার দিক দিয়ে সে ভিতরে ঢুকল। অন্ততঃ তাঁর ফ্ল্যাটটা একবার দেখেও যাওয়া দরকার, নৈলে সে প্রণতিকে নিয়ে আসবে কেমন ক'রে? কিন্তু এদিক ওদিক চেয়ে, তার কিছুই বোধগম্য হোলো না, যেন একটা প্রকাণ্ড গোলক ধাঁধাঁ। সিঁড়ি দিয়ে সে উপরে উঠে গেল। সেখান থেকে নানা পথ নানা দিকে চ'লে গেছে। অনেকক্ষণ টহল দিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করলে না। ব্যর্থ হয়ে নীচে নামছে, এমন সময় একটি লোক জিজ্ঞাসা করলে, কা'কে খুঁজচেন মশাই?

সরোজিনী দেবীকে।

কার মেয়ে? ফ্ল্যাটের নম্বর কত?

অশোক মুস্কিলে পড়ল। বললে, সেটা ঠিক বলতে পারিনে। তবে—ওই যাঁর দারোয়ান আছে—

লোকটি বললে, দারোয়ানরা ত নীচে থাকে। নীচে গিয়ে খবর নিন্। আচ্ছা, দাঁড়ান্ দাঁড়ান্—সরোজিনী বললেন না? আমাদের রাখাল বাবুর মেয়ে?

তা ঠিক বলতে পারিনে, তবে—তিনি আমার স্ত্রীর বন্ধু...খুব সুন্দরী মেয়ে, বড়লোক—

হ্যাঁ, সবই মিলেছে বটে। দাঁড়ান্, আমি খবর দিচ্ছি।—ব'লে লোকটি সেখান থেকে চ'লে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে বছর ষোল বয়সের একটি মেয়েকে আসতে দেখা গেল। সঙ্গে সম্ভবতঃ তার মা। অশোক সলজ্জে স'রে দাঁড়াল। মেয়েটি এসে বললে, কে আপনি?

অশোক বললে, আমি সরোজিনী দেবীকে চাই।

মহিলাটি বললেন, এর নাম সরোজিনী, আমার মেয়ে।

আজ্ঞে না, আপনাদের নয়।—ব'লেই তৎক্ষণাৎ অশোক পিছন ফিরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কানে এসে তার একটা কথা বাজল, কে একটা লোক এসেছিল মা, আমি মনে করি ধীরেনদা বুঝি।

ভগ্ন হৃদয় নিয়ে অশোক বাড়ী ফিরে এলো। এত নিকটে থাকেন তিনি অথচ এতটা চেষ্টা করা গেল—কেমন একটা পরাজয়ের গ্লানি এলো তার মনে। বিকালবেলা আর একবার চেষ্টা করা যাবে।

কিন্তু বিকালের চেষ্টাতেও কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। প্রণতি বললে, আমাকে নিয়ে চলো, সব ঘরের ভেতর গিয়ে খুঁজে আসব।

অশোক বললে, অত লোকের ভেতর দিয়ে যাওয়াটা ভালো দেখাবে না।

তবে জান্‌লার কাছে কাছে থাকব। তিনি যখন দেখতে পান্ তখন আমরা পাবো নিশ্চয়ই।

অশোক নিশ্বাস ফেলে বললে, বোকা বনে গেলুম।

প্রণতি বললে, তোমার অত আগ্রহ দেখানো ভালো নয়। কিছু মনে করতে পারেন তিনি। ইচ্ছে যদি হয় তবে তিনিই খবর পাঠাবেন। অমন মেয়ে কল্‌কাতা শহরে গড়াগড়ি যায়! —অর্থাৎ সে পছন্দ করে না তার স্বামী কোনো মেয়ের সম্বন্ধে এত উদ্বিগ্ন হয়।

অশোক বললে, সেই ভালো—বুঝলে? কিছুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। একের গরজে বন্ধুত্ব হয় না।—এই ব'লে সেদিন সে স্নানাহার করতে গেল। তার কণ্ঠস্বরে একথা সে কৌশলে প্রকাশ ক'রে গেল যে, পরনারীর প্রতি অতি-আগ্রহটা অন্যায়।

দুপুর বেলা নীচের ঘরে বসে সে আপিস সংক্রান্ত কাগজ পত্র দেখছে এমন সময় একটি ছোক্‌রা এসে দাঁড়াল। একখানা চিঠি অশোকের হাতে দিয়ে বললে, ও বাড়ী থেকে আসছি, মা পাঠালেন। আপনি কি অশোক বাবু?

হ্যাঁ—ব'লে দ্রুত অশোক চিঠি খুলে পড়ল,—স্নেহের প্রণতি দেবী, বয়সে আপনি আমার চেয়ে ছোট, তুমি বললে ক্ষমা ক'রো। আজকে কোনো কাজ নেই, এখন থেকে অপেক্ষায় রইলুম। অশোক বাবুকে নিয়ে চা খেতে এসো ভাই, বিশেষ খুসী হবো। ইতি—তোমাদের সরোজিনী।

উৎসাহ এবং আনন্দ চেপে রেখে অশোক ছোক্‌রাকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি করো ওখানে?

রান্না করি।

আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।—ব'লে সে ভিতরে গেল। উপরে গিয়ে ঘ'রে ঢুকে দেখলে, প্রণতি ঘুমিয়ে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ পুরুষের গোপন দুষ্প্রকৃতি অনুযায়ী তার মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি খেলে গেল। গায়ে একটা পাঞ্জাবী চড়িয়ে চটি জুতোটা পায়ে দিয়ে সে চুপি চুপি নীচে নেমে এলো।

বাইরের দরজায় চাকরটা দাঁড়িয়ে ছিল, অশোক এসে বললে, তোমার মনিব কি করছেন, চলো একবার দেখে আসি। গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে ত? কে কে আছেন এখন তাঁর কাছে? তাঁর মা বাবা, আর কে কে—?

আসুন না আপনি। ব'লে ছোকরাটা সোৎসাহে তাকে নিয়ে চল্‌ল।

একতলা, দোতলা, তেতালা,—ঘরের পরে দালান আর দালানের পরে ঘর। নানাদিকে নানা বাঁক নিয়ে ঘুরে অশোক একটা ছাদের কোলের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। চাকরটা ভিতরে গিয়ে খবর দিলে।

পরমুহূর্ত্তেই বেরিয়ে এলো সরোজিনী। অশোক নমস্কার জানিয়ে হাসলে। তার চোখে মুখে গভীর অনুরাগ। সরোজিনী বললে, আসুন ভেতরে, এঘরে আপনাকে পাওয়া বিশেষ ভাগ্য।

সে কি কথা, লজ্জা দিচ্ছেন আমাকে। আমারও এটা গৌরব!

ইত্যাদি, ইত্যাদি—সামাজিক চল্‌তি বুলি।

সরোজিনী বললে, প্রণতি কই?

ওঃ, তাঁর কথা আর বল্‌বেন না। পি পু, না ফিস্থ! ঘুম কাতুরে মেয়ে। পেটে ধেনোমদ পড়লে আর রক্ষে নেই, একেবারে কলসীর গায়ে কান জুড়ে দিয়ে চোখ বুজলেন। তা হ'লে আপনি এসেছেন তাঁকে না জানিয়ে, কেমন?

অশোক হা হা ক'রে হেসে উঠ্‌ল। বললে, তাঁর সম্পত্তি থাকে লোহার সিন্দুকে, পথে পড়ে থাকলেও ভয় নেই। কিন্তু কই, আপনার এখানে কাউকে দেখছিনে যে?

ক'াকে দেখতে চান্? সরোজিনী হেসে বললে।

মানে, এই ধরুন আপনাকে একা দেখছি কিনা—ধরুন আপনার আত্মীয়স্বজন, কিম্বা ধরা যাক মা বাবা,—আমি বোধ হয় একটু অনধিকার চর্চ্চা করছি, ক্ষমা করবেন:

সরোজিনী বললে, ঢোঁক গিলচেন তবু আমার স্বামী আছেন কিনা এ কথাটা বলতে বাধছে আপনার, এই না? ওসব আমার নেই অশোকবাবু। আর মা বাবা, ভাই বোন? সবাইকে একত্রে চিরকাল দেখা যায় না।

অশোক বললে, বলতে লজ্জা করবনা, সেদিন থেকেই আমি আপনার একজন ভক্ত! নেমন্তন্ন ক'রে এনেছেন. তৃতীয় ব্যক্তি এখানে নেই যে অতিভদ্রতার বালাই থাকবে,—যদি বেফাঁস কিছু বলি ক্ষমা করবেন।

বেফাঁসটা সহ্য হবে কিন্তু বেসামাল হ'লে—বলতে বলতে দুজনেই হেসে উঠ্‌ল।

অশোক বললে, চোখে মুখে আপনার বুদ্ধির দীপ্তি, কিন্তু আপনার মতন এত রূপ আমি জীবনে দেখিনি; আপনি নিশ্চয় কোনো রাজারাজড়ার ঘরের মেয়ে; আপনার সঠিক পরিচয় আমি আজ নিয়ে তবে উঠব।

সরোজিনী বললে, বটে, আচ্ছা সঠিক পরিচয়ই দেওয়া যাবে, এখন বসুন। আপনি সিগারেট খান? আনিয়ে দেবো?

না, ধন্যবাদ।

সরোজিনী পুনরায় বললে, আমার পরিচয় পাবার আগে আপনার সঠিক পরিচয়টা দিন শুনি। বাস্তবিক, ছাদের পাঁচিলে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে আপনাদের ঘরের দিকে চোখ প'ড়ে যেতো। স্বামী আর স্ত্রী আপনারা,—দেখতে এত ভালো লাগ্‌ত! হিংসে হোতো মনে মনে।—বলতে বলতে হেসে সে ঘরখানাকে মুখরিত ক'রে তুললে।

অশোক লজ্জায় একেবারে লাল। তার নিজের ব্যবহারের নানা চিত্র মনে পড়তে লাগল। ছি ছি!

সরোজিনী আবার বললে, একদিন একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি—চিঠিখানা আপনার স্ত্রীর নামে—দেখি আমার কাছে ভুল ক'রে এসেছে। জানা গেল, আপনাদের নাম অশোক আর প্রণতি! স্ত্রী নিশ্চয় আপনার খুব প্রিয়, না অশোক বাবু?

ফস ক'রে অশোক ব'লে ফেললে, প্রিয় না হয়ে আর উপায় কি আছে বলুন, বিয়ে ক'রে যখন আনা হয়েছে। তবে কি জানেন, সেই গড়পড়তা মেয়ে! এরা আনন্দই দেয়, আলো দেয় না। এদেশের ছেলেরা বিয়ের আগে যা আশা করে, বিয়ের পরেই তা ভাঙে। আমাদের কতদিকের আকাঙ্ক্ষা যে চাপা থাকে তা যদি জানতেন···এর চেয়ে বেশি আপনাকে বলাই বাহুল্য!

সরোজিনী উৎকর্ণ হয়ে শুন্‌লে তার সব কথা। শুধু শুনলে না, চেয়েও দেখলে। দেখলে এই ছেলেটির মুখে চোখে যে দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠছে, তা শ্রদ্ধাও নয়, সম্মানও নয়—সে শুধু বাসনার উত্তাপ, অদ্ভুত আকর্ষণের চেহারা। সরোজিনী একটু বিপন্ন বোধ ক'রে বললে, এইবার আপনার স্ত্রীকে ডাকতে পাঠাই, কেমন? এতক্ষণে নিশ্চয় তাঁর ঘুম ভেঙেছে।

অশোক বললে, বাস্তবিক এত কাছে আপনি আছেন এ যদি জানতুম যেমন ক'রেই হোক আলাপ করা যেতো। সেদিন আপনি ডেকে আলাপ করলেন, অবাক হ'য়ে গেলুম।

স্ত্রীকে এখানে আনার কথাটা সে এড়িয়ে গেল। অর্থাৎ এই কথাটা বোঝা যাচ্ছে, একা ব'সে গল্পগুজব করতেই সে চায়, স্ত্রীর উপস্থিতি পছন্দ করছে না। সরোজিনী মনে মনে কৌতুক বোধ করলে। পুরুষের প্রকৃত চেহারা অনেকটা বোধ হয় এই রকম।

এমন সময় বাইরে থেকে তার ডাক পড়ল। ছোকরা চাকরটা খবর দিতেই সে গেল বেরিয়ে। অশোক চুপ ক'রে ব'সে রইল বটে কিন্তু বুকের ভিতরটা তার ধক্‌ ধক্‌ করছে। তার মতো অল্প বয়স্ক যুবক যদি একথা বুঝতে পারে, বেফাঁস কথা বলার পরেও অমুক সুন্দরী মেয়েটি বিরূপ হচ্ছে না, বরং উপভোগই করছে, তবে প্রশ্রয়ের আনন্দে বুকের রক্ত তোলপাড় করবে না কেন? থাক্‌ না স্ত্রী, থাক্‌ না নীতিজ্ঞান,—তারপরেও কি পুরুষের পক্ষে আর কোনো কথা নেই?

বাইরের থেকে হঠাৎ রূঢ় আলোচনার আওয়াজ তার কানে এলো। সরোজিনীর শান্ত আর নম্র কণ্ঠের পাশে কোনো এক পুরুষের চাপা কর্কশ তিরস্কার বেশ শোনা যাচ্ছে। ব্যাপারটা বোঝা গেল না কিন্তু অশোক উদ্বিগ্ন হোলো। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না বটে, বক্তব্যটাও কিছু দুর্বোধ্য, কিন্তু কেউ এসে যে তার এই কল্পকন্যার প্রতি আপত্তিকর আচরণ ক'রে যাবে এ তার সইবে না। এই লাবণ্য আর এই রূপের প্রতি মানুষ নিষ্ঠুর হয়?

তারপরে কিছুক্ষণ চুপচাপ। অশোক কান খাড়া ক'রে রইল। লোকটা কি চায়, বচসার কারণই বা কি, তিরস্কারেরই বা অর্থ কোথায়—এসব কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু এই কথাটাই সে সমস্ত মন দিয়ে ভাবতে লাগল, এমন যে মেয়ে তার মাথার উপরে কেউ নেই! না রক্ষক, না সাহায্যকারী, না কোনো পরামর্শদাতা! অশোক অবাক হয়ে গেল। মনে হলো সমস্তটাই যেন একটি কঠিন রহস্যে ভরা।

কিছুক্ষণ পরে সরোজিনী ফিরে এলো। কেমন যেন ম্লান হেসে বললে, অনেকক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রেখেছি...এক এক সময়ে নানা ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়।

অশোক বললে, গোলমাল শোনা যাচ্ছিল, উনি কে এসেছিলেন বলুন ত ?

উনি হচ্ছেন এ বাড়ীর মালিক।

ওঃ বুঝতে পেরেছি এবার, বাড়ীর ভাড়া পাওনা আছে বুঝি ? বাস্তবিক, আজকালকার বাড়ীওলারা ভয়ানক—

সরোজিনী বললে, না ইনি তেমন্দ নয়, লোকটিকে ভালই বলতে হয়। আগাম এক মাসের ভাড়া দিয়েছিলাম, উনি সেটা ফেরৎ দিতে এসেছিলেন।

অশোক বললে, ফেরৎ দিতে কেন ?

সরোজিনী ঘরের ভিতরে একবার পায়চারি করে নিলে। এটা ওটা একবার নাড়াচাড়া ক'রে বললে, সামান্য কারণ। এ বাড়ীতে আর আমার থাকা হবে না অশোকবাবু।

কণ্ঠস্বর তার করুণ। অশোক বললে, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি বলুন ত ?

সরোজিনী হঠাৎ বললে, চা খেয়ে আমাকে বাধিত করতে পারেন। ওরে অমূল্য, চা হয়েছে ?

হয়েছে মা, নিয়ে যাচ্ছি। বাইরে থেকে সাড়া এলো।

অশোক বললে, এ বাড়ী যদি ছেড়ে দিতেই হয় তবে আমি বাড়ী খুঁজে দেবো আপনার জন্যে। কলকাতা সহরে কি বাড়ীর অভাব ? কিন্তু একটা কথা—

অমূল্য চা ও খাবার নিয়ে এলো। অশোক পুনরায় বললে, আপনার সঙ্গে যদি আত্মীয়রা থাকেন তবে সুবিধে হয়, আপনি একা থাকেন কিনা তাই লোকে—

সরোজিনী হাসি মুখে বললে, আচ্ছা, এবার আপনি খেতে আরম্ভ করুন। যেখানে হোক এক জায়গায় থাকতে পাবোই—এত বড় পৃথিবীতে—

চা খেতে খেতে অশোক বললে, সে হবে না, আপনার কিছু কাজের ভার আমি নেবোই। এতে আমার আনন্দ। পৃথিবী অনেক বড় তা জানি, আপনি বড়লোক, টাকার বদলে সবই পাবেন তাও জানি, তবু আমাকে এ গৌরব থেকে বঞ্চিত করবেন না।

বিবাহিত লোকের পক্ষে এমন কথা বলা উচিত নয়, অশোকবাবু। আপনার স্ত্রী এতে ক্ষুণ্ণ হ'তে পারেন। ব'লে সরোজিনী আবার হাসতে লাগল।

মানলুম আপনার কথা। তা ব'লে কি বিবাহিত লোকের বাইরে আর কোনো কর্ত্তব্য থাকবে না ? স্ত্রীর পায়ে কি তাদের মনুষ্যত্ব শৃঙ্খলিত থাকবে ? বিবাহ মানে কি উদারতার অপমৃত্যু ?—লুব্ধ ব্যাকুল উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অশোক এই একাকিনী রমণীর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

এমন সময় আবার অমূল্য এসে দাঁড়াল। সরোজিনী বললে, আঃ একটু দাঁড়াতে বল্ না অমূল্য আসছি আমি। আপনাকে এবার বিদায় দেবো অশোকবাবু,—দেখছেন ত, বাড়ীওয়ালা বড়ই অধীর হয়ে উঠেছেন, ওঁর নালিশের আর শেষ নেই।

অশোক বললে, ওঁরা কি চান্ আজকেই আপনি এ বাড়ী ছেড়ে দেন্ ?

হ্যাঁ, অনেকটা তাই। অতটা বুঝতে পারিনি—ব'লে সরোজিনী ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। বললে, আপনার সামনেই যে এরা এতটা বাড়াবাড়ি করবে...অপমান আর লজ্জায় আমার মাথা হেঁট ক'রে দেবে,—অমূল্য, ডাক্‌ত বাবা রামশরণকে—

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কি হোলো আপনার সরোজিনী দেবী ?

অধীর কণ্ঠে সরোজিনী বললে, কিছু না, এ অতি সামান্য। আচ্ছা, এবার তাহ'লে আপনাকে যেতে হবে অশোক বাবু। হ্যাঁ, একটা কথা আপনাকে ব'লে রাখি, স্ত্রীর সম্বন্ধে আপনি আর একটু খাঁটি থাকবেন, অন্যকে ফাঁকি দিলে নিজেকেই এক সময়ে ফাঁকি পড়তে হয় অশোকবাবু!

তার মুখের দিকে চেয়ে দেখা গেল, এই রহস্যময়ীর চোখে অশ্রু ভ'রে এসেছে। তার কারণ নেই, তার কৈফিয়ৎ নেই। অশোক বললে, কি বলছেন আপনি সরোজিনী দেবী ?

হঠাৎ সরোজিনীর কণ্ঠ বিদীর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। অস্বাভাবিক কণ্ঠে আরক্ত চক্ষে সে ব'লে উঠ্‌ল, অতি নির্ব্বোধ আপনি, লোভের বশীভূত হয়ে দেখতে পাচ্ছে না যে কোথায় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। ইতিমধ্যেই কি বিদায় নেওয়া আপনার উচিত হয়নি ? আমার অপমানটা কি নিজের চোখে দেখে যেতে এতই সাধ ?—বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত কান্নায় তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল।

মাথা হেঁট ক'রে অশোক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। দ্রুতপদে বারান্দার মহলগুলো পার হ'য়ে সে নীচের সিঁড়ীতে নামবে,—দেখা গেল রামশরণ আর অমূল্যকে সঙ্গে নিয়ে জনচারেক ভদ্রলোক উপরে উঠছেন। তাঁদের মধ্যে একজন আর একজনকে বললেন, কস্তুরীর গন্ধ কতদিন চেপে রাখা যায় হে ?

একজন বললেন, সিনেমার য়্যাক্‌ট্রেস্ বল্‌ছিলে না ?

হ্যাঁ, ওইতে পয়সা ক'রে আজকাল ভদ্রপল্লীতে থাকার চেষ্টা করছে। চেহারাটা ভালো কিনা তাই ধরবার যো নেই! সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে হে,—কিন্তু বুঝলে না, চরিত্র মন্দ হ'লে—হেঁ হেঁ—

অচেতন পদক্ষেপে অশোক ধীরে ধীরে নেমে গেল।

প্রবোধকুমার সান্যাল

ভারতের সাধনা

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী পুরাণরত্ন

যে সর্ব্বোতোমুখী সাধনার বলে কোন সুদূর অতীতকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারত তাঁর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাহার বিষয় আলোচনা করিলে প্রথমেই দেখা যায়, যে জড়-বাদের সাধনায় আজ জগতের নিত্য নূতন রূপ আবিষ্কৃত হইতেছে, ভারতও একদিন এই জড়বাদের সেবাকে তাহার সাধনার অঙ্গরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভই ভারতের চরম উদ্দেশ্য। "অমৃতস্য বিন্দু"-অমৃতের বিন্দু (জীব) তার উদ্ভব স্থান অমৃতের সিন্ধুতে (ব্রহ্মে) বিলীন হইতে পারিলেই তার জন্ম সার্থক, ব্রহ্মই তার সাধনার চরম লক্ষ্য ; কিন্তু জগতকে উপেক্ষা করিয়া অধ্যাত্ম সাধনার পরিকল্পনা ভারত কোন দিন করেন নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগু-বারুণী সংবাদে এই কথার বীজ পাওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভেচ্ছু ভৃগু পিতা বরুণকে ব্রহ্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বরুণ বলিয়াছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান কেহ কাহাকে দিতে পারে না, ইহা তপস্থার দ্বারা লাভ করিতে হয়, তবে আমি এইটুকু বলিতে পারি—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম," যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে যাহার দ্বারা জীবিত রহিয়াছে এবং অন্তকালে যাহাতে বিলীন হইবে তিনিই ব্রহ্ম, তুমি তপস্থার দ্বারা তাহার উপলব্ধি কর। পিতার বাক্যে ভৃগু তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া কিছুদিন পরে বুঝিলেন 'অন্নই ব্রহ্ম' কারণ,—

"অন্নাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে অন্নেন
জাতানি জীবন্তি অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"

অন্ন হইতেই ভূতসকল উৎপন্ন হইতেছে, অন্নের দ্বারাই জীবিত রহিয়াছে এবং অন্তকালে অন্নেতেই বিলীন হইতেছে। ভৃগু ব্রহ্মবিষয়ক এই জ্ঞান লাভ করিয়া বাটী আসিয়া পিতাকে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা বলিলে বরুণ বলিলেন পুনরায় তপস্যা কর। ভৃগু আবার তপস্যা করিতে গেলেন এবং কিছুকাল তপস্যার পর বুঝিলেন "প্রাণই ব্রহ্ম" কারণ প্রাণেই ব্রহ্মের সকল লক্ষণ রহিয়াছে। ভৃগু বাটী আসিয়া পিতাকে বলিলে বরুণ বলিলেন ইহা অংশ মাত্র তুমি পুনরায় তপস্যা কর। ভৃগু পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বুঝিলেন 'মনই ব্রহ্ম' কারণ মনেই ব্রহ্মের সকল লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহাতে ভৃগুর তৃপ্তি হইল না, তিনি পুনরায় পিতাকে ব্রহ্ম বিষয়ক প্রশ্ন করিলে বরুণ বলিলেন,—"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব...তপো ব্রহ্মেতি" তপস্থার দ্বারা ব্রহ্ম জানিবার বিষয়, যতদিন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি না হয় তত দিন তপস্থাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। পিতার কথায় ভৃগু পুনর্ব্বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বুঝিলেন 'বিজ্ঞানই ব্রহ্ম' বিজ্ঞান বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতেই বরুণোক্ত ব্রহ্মের লক্ষণ রহিয়াছে। বিজ্ঞান ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিয়া ভৃগু বাটী ফিরিলেন বটে কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রাণের পিপাসা পূর্ণমাত্রায় মিটিল না দেখিয়া পিতা তাঁহাকে পুনরায় তপস্যা করিতে আদেশ করিলেন। ভৃগু এইবার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বুঝিলেন,—'আনন্দং ব্রহ্মেতি,' আনন্দই ব্রহ্ম। "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"। আনন্দ হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত রহিয়াছে এবং অন্তকালে আনন্দেই বিলীন হইতেছে। এইবার ভৃগু হৃদয়ে পূর্ণ শান্তি লাভ করিলেন, তাঁহার ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল। এই আনন্দ ব্রহ্মের উপলব্ধিই মানব-জ্ঞানের চরম পরিণতি। আনন্দময়কে লাভ করাই ভারতের সাধনার চরম সিদ্ধি।

সাধনার দ্বারা তপস্থার দ্বারা ভারতের ঋষি মানব-জ্ঞানের ক্রম বিকাশের যে স্বরূপ দর্শন করিলেন ঋষি-শিষ্য ভারতও তাঁর ব্যবহারিক জীবনে জ্ঞানের ক্রমবিকাশের জন্য এইরূপ সাধনারই প্রচেষ্টা দেখাইয়াছেন।

সাধনার প্রথম স্তরে ঋষি অন্নকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং অন্ন-ব্রহ্মের সাধনায় সিদ্ধ না হইলে কেহ উচ্চতর সাধনার অধিকারী হইতে পারে না ঋষি শিষ্য-ভারত ইহা উপলব্ধি করিয়া অন্নব্রহ্মের উপাসনাকেই তার সাধনার সর্ব্ব প্রথম স্তররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।—

বর্ত্তমান কালে যে প্রণালীতে ইতিহাস রচনা হয় ভারতের প্রাচীন কালের সে ধরণের ইতিহাস নাই, বেদই ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ—এই বেদের মধ্যেই আর্য্য ঋষিগণ ভারতের ইতিহাসের বীজ রক্ষা করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী মনীষীগণ ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রের মধ্য দিয়া সেই বেদবাক্যের বিস্তৃতি করিয়াছেন। "ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ"—ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা বেদার্থ বিশদরূপে বুঝিতে হয়। অন্নব্রহ্ম বা জড়বাদের (materialism) উপাসনাই যে মানবের প্রথম সাধ্য বিষয়, অন্নকে উপেক্ষা করিয়া অধ্যাত্ম চর্চ্চা সম্ভব নহে, সুতরাং উচ্চতর জ্ঞানাভিলাষী ভারত যে প্রথমেই এই অন্ন-ব্রহ্ম বা জড়বাদের তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন, পুরাণকার ভারতের আদি রাজা পৃথু চরিত্র বর্ণনায় বিশদ-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় দেখা যায় প্রথম মন্বন্তরাধিপতি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে বেন নামে এক অতি দুর্বৃত্ত ও প্রজাপীড়ক রাজা ছিলেন। তাহার উৎপীড়নে প্রজাকুল বিদ্রোহী হইয়া লোকহিতৈষী ঋষিগণের সাহায্যে বেনকে হত্যা করিয়া তৎপুত্র পৃথুকে রাজা করেন; পৃথু রাজা হইয়া দেখিলেন ক্ষেত্র সকল শুষ্ক, পৃথিবী শস্যশূন্য এবং প্রজাকুল অনাহারক্লিষ্ট; রাজ্যের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পৃথিবীই তাহার সমস্ত সম্পদ অপহরণ করিয়াছে ভাবিয়া তৎসমুদায় পুনঃপ্রাপ্তির আশায় পৃথু পৃথিবীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। পৃথুভয়ে ভীতা পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করিয়া পৃথুকে বলিলেন—অত্যাচারী রাজার কুশাসনে আমার শস্য-সম্পদের সদ্ব্যবহার না হওয়ায় আমি তৎসমুদায় নিজদেহে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি এবং এতদিনে তাহা বোধ হয় জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাকে হত্যা করিলে আপনি কিছুই পাইবেন না, বরং "অত্র দৃষ্টেন যোগেন ভবানাদাতুমর্হতি।" আপনি 'যথোচিত উপায়' অবলম্বনে পুনরায় আমা হইতে সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া লউন। গোরূপধারিণী পৃথিবীর মন্তব্য যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করিয়া পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস ও স্বীয় হস্তই পাত্ররূপে প্রয়োগ করিয়া গো-রূপা পৃথিবী হইতে সকল শস্য-বীজ দোহন করিয়া লইলেন, এবং মুনিগণ প্রভৃতি আরও অনেকেই সেই পৃথুর প্রভাবে বশীভূতা পৃথিবী হইতে নিজ নিজ প্রয়োজন মত বস্তুসকল দোহন করিয়া লইলেন। এইরূপে শস্যসম্পদ আয়ত্ত হইলে '(সমাঞ্চ কুরুমাং রাজন্)' "আমার উচ্চ নীচ ভূমি সকল সমতল করুন", পৃথিবীর এই উপদেশে পৃথু ধনুকের সাহায্যে পর্ব্বতাদি ভগ্ন করিয়া যথাসম্ভব তাহাকে সমতল করিয়া গ্রাম নগর হাট বাজার প্রভৃতি নানাবিধ শ্রেণী বিভাগ করিয়া রাজ্য মধ্যে বাস করিবার অতি সুন্দর ব্যবস্থা করিলেন।

পুরাণকারের এই বর্ণনায় একটু কবিত্ব একটু রূপক থাকিলেও পৃথুর এই পৃথিবী-দোহনের কথায় আমরা ভারতের কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ের অনুশীলনেরই ইতিহাস পাই—ইহাই অন্নব্রহ্ম বা জড়বাদের উপাসনা। অন্নব্রহ্মের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে যে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বজগতের ধাত্রী বিধাত্রী ধারিণী ও পোষিণী পৃথিবীকে আয়ত্ত করা প্রয়োজন তাহা যে ভারত বিস্মৃত হন নাই, ভারতের প্রথম রাজা পৃথু-চরিত্রের বর্ণনায় পুরাণকার তাহারই আভাষ দিলেন।

পুরাণবর্ণিত আদ্যক্ষিতিশ্বর পৃথুচরিত্রে যে সাধনার কথা রূপকাকারে বর্ণিত হইয়াছে বর্ত্তমান জগতে আজ আমরা সেই সাধনা ও পৃথিবী দোহন প্রত্যক্ষ করিতেছি। বর্ত্তমান জগতে জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চার ফলে রত্নপ্রসূ বসুন্ধরার বক্ষ হইতে যে বিবিধ রত্নরাজি আহৃত হওয়ায় মানবের ঐহিক সুখের দ্রব্যসম্ভার সৃষ্টি হইতেছে, ইহাকে সেই অন্নব্রহ্মের সাধনার চরমসিদ্ধি বলা যায়। আদ্যক্ষিতিশ্বর পৃথু যে তপস্যা সুরু করিয়াছিলেন জগত আজ সেই তপস্যার ফল ভোগ করিতেছে এবং তাহারই চরম পরিণতি দেখিবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে; কিন্তু ভারতের গুরুর বাণী—'এগিয়ে যাও! আবার তপস্যা কর, তোমার লক্ষ্য ব্রহ্ম, অন্নই ব্রহ্মের পরম ও চরম তত্ব নহে। দেহরূপ গেহকে আশ্রয় করিয়াই মানব অমৃতের উপাসনা করিবে, কাজেই দেহকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যতটুকু অন্নের উপাসনা করা

প্রয়োজন সেইটুকু সিদ্ধ হইলে ইহার উপাসনায় আর অধিক শক্তির ক্ষয় করিও না'। ভারতের এক মুনিপুত্র (১) অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারত্ব লাভ করিয়াও তাহার অসারতা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো।" (২) ধন সম্পত্তি মনুষ্যকে তৃপ্ত করিতে পারে না; কাজেই ভারত তাঁর দেহরক্ষার উপযোগী অন্ন বা জড়বাদের উপাসনা করিয়া ঋষি-দৃষ্ট সাধনার দ্বিতীয় স্তর প্রাণব্রহ্মের তপস্যায় ব্রতী হইলেন। তাই দেখা যায় যখনই এই জড়বাদ প্রতিবন্ধকরূপে তার অগ্র-গমনে বাধা দিয়াছে অর্থাৎ যখনই মানব জড়বাদকে সর্ব্বস্ব-জ্ঞানে তাহার উপাসনায় মগ্ন হইয়াছে তখনই চরম শক্তি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়াছে।—মার্কণ্ডেয় পুরাণবর্ণিত চণ্ডীর অসুরদলন, শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত কংস বধ, রামায়ণে রাবণদমন ও কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসলীলা ইত্যাদিতে এই জড়বাদ-সর্ব্বস্বের দমনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্নব্রহ্মের সাধনায় কৃষি বানিজ্য ইত্যাদি বিষয়ের অনুশীলনের দ্বারা মানুষের দেহরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় অন্নের আবশ্যকতাবোধের পর প্রাণব্রহ্মের সাধনায় মানবের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ুলাভের চেষ্টার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং তাহার জন্য খাদ্যবিচার চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অনুশীলন হইতে দেখা যায়। চরক সুশ্রুত প্রভৃতির চিকিৎসা শাস্ত্র ও বাৎসায়নের কামশাস্ত্র প্রভৃতি ভারতের সাধনার দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ প্রাণব্রহ্মের সাধনার প্রত্যক্ষ ফল বলা যাইতে পারে।

পরে দেখা যায় প্রাণব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়া ভারত নিশ্চিন্ত হন নাই। অর্থাৎ অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ুলাভ করিয়াই ভারত তাঁর তপস্যা শেষ করেন নাই। রাজ্য ঐশ্বর্য্য স্বাস্থ্য ও দীর্ঘআয়ুলাভে প্রলুব্ধ হইয়াও ভারতের মুনি বলিলেন,—

"......অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতি প্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥ (৩)

(বিষয় ভোগ ও তজ্জনিত সুখসমূহ অনিত্য জানিয়াও কে ইহা দীর্ঘকাল ভোগ করিতে চাহে), কাজেই ভারত এইবার ঋষিদৃষ্ট মনব্রহ্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই মন-ব্রহ্মের উপাসনার কথায় শিক্ষার দ্বারা মনের উৎকর্ষতা সাধনের চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ু থাকিলেই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। শিক্ষা-বিহীন হইলে খাদ্য স্বাস্থ্য ও আয়ু মানবের কল্যাণকর হয় না, ভারত যে একথা বিস্মৃত হন নাই তাহার মনব্রহ্মের সাধনার কথায় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। চারিবেদ ছয় বেদাঙ্গ মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ বা সঙ্গীত বিদ্যা, অর্থশাস্ত্র বা নীতি শাস্ত্র (১) এই যে অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যার অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় ইহা মন-ব্রহ্মের সাধনার ফল বলা যায়।

বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যার অনুশীলনে মনের উৎকর্ষতা সাধন হইল বটে কিন্তু ইহাতে ঋষিদৃষ্ট জ্ঞানের চরম তত্ত্ব লাভ হইল না। ভারতের ঋষি বলিলেন ইহা অপরাবিদ্যা, এই অপরাবিদ্যার অনুশীলনে জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর জ্ঞান হয় কিন্তু যে বিদ্যার দ্বারা জগতের মূল কারণ অক্ষরব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বা পরাবিদ্যা। (২) সুতরাং বহুধা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে স্থির করিতে ভারত ঋষিদৃষ্ট বিজ্ঞান ব্রহ্মের বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সাধনায় ব্রতী হইলেন। বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপসনায় ব্রতী হইয়া ভারত বুঝিলেন যে-সাহিত্য শিল্প বা ললিতকলার চর্চ্চায় সেই অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক সুন্দরের পরিচয় পাওয়া যায় না তাহা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য শিল্প বা সঙ্গীত নহে, ইহা কেবল ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তিসাধক। সুতরাং তৎকালীন ভারত-মনীষীগণ মানবচিত্তকে সেই আনন্দময়ের সহিত পরিচয় করাইবার উপযোগী শাস্ত্রাদি প্রণয়নে মনোনিবেশ করিলেন। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভব এই প্রচেষ্টার ফল বলা যায়।

সাধনার চতুর্থস্তর এই বিজ্ঞানব্রহ্মের সাধনায় সিদ্ধ হইতে অর্থাৎ বহুধাবিক্ষিপ্ত বুদ্ধিকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির (৩) ভূমিতে

(১) উদ্দালক মুনিপুত্র নচিকেতা। (২) কঠোপনিষদ-১।১।২৭
(৩) কঠোপনিষদ্—১।১।২৮

(১) অঙ্গানি চতুরোবেদা মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ। পুরাণং ধর্ম্ম-শাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দশঃ॥ আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব যে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্ত বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈবতাঃ॥
(বিষ্ণুপুরাণ-৩।৬।২৮।২৯)

(২) অত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তংছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা-যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ মুণ্ডকোপনিষদ—১।১।৫

(৩) পরমেশ্বর ভক্তৈবধ্রুবং তরিষ্যামিতি একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধিঃ।

উত্তোলন করিতে ভারতকে বহুদিন ধরিয়া তপস্যা করিতে হইয়াছিল। "নাসৌ ঋষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্," নানা মুনির নানা মতবাদের অনুসরণ করিতে যাইয়া ভারতকে অনেক সময় কাটাইতে হইয়াছে। ঋষিগণ আপনাপন অনুভূতি অনুসারে পথ নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন, সকলেরই উদ্দেশ্য এক, সকলেরই উদ্দেশ্য সাধু, সকলেরই চেষ্টা মানব জ্ঞানের উৎকর্ষতাসাধন। কাহারও (মীমাংসক) মতে বেদোক্ত যজ্ঞরূপ কর্ম্মই মানবের মুক্তির উপায়,—"যজতের্জাতম্ অপূর্ব্বম্" যজ্ঞদ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়। "স্বর্গকামোযজেত" স্বর্গ কামনায় যাগ করিবে, ইত্যাদি বেদবাক্যে যজ্ঞের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় দেশময় কেবল যজ্ঞেরই মহিমা প্রচারিত হইল। কর্ম্মবাদের এইরূপ বহুল প্রচারের মুখে আর একদল (সাংখ্য) জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন, "ন কর্ম্মনা ন প্রজয়াধনেন ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশু" অমরত্ব লাভের উপায় কর্ম্ম নহে, সন্তান নয়, ধন নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায়।

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরংযেষুকর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরা মৃত্যুংতে পুনরেবাপি যন্তি (১)

১৬ জন ঋত্বিক যজমান ও যজমান পত্নী এই অষ্টাদশ ব্যক্তি নিষ্পাদ্য যজ্ঞরূপ কর্ম্ম অদৃঢ় ভেলা মাত্র, যে মূঢ় ব্যক্তিরা শ্রেয়ো বিবেচনায় ইহার প্রশংসা করে তাহারা পুনরায় জরা মৃত্যুগ্রস্ত হয়, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কর্ম্মবাদের বিরুদ্ধ মতে মানুষকে নিষ্ক্রিয় জ্ঞানের উপাসক করিয়া তুলিলেন। এই কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদের দ্বন্দ্ব কিরূপ প্রবল হইয়াছিল দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের উপাখ্যানের দ্বারা পুরাণকার তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। কর্ম্ম-বাদের প্রতীক দক্ষ ও জ্ঞানবাদের প্রতীক শিবের দ্বন্দ্ব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস নামে পুরাণ প্রসিদ্ধ ঘটনা। আবার কেহ (২) বলিলেন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক যোগ সাধনা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহার দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেই মানব কৈবল্য লাভ করিতে পারেন। ইহাতে আবার কিছুদিন দেশে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ যোগ সাধনার প্রবাহ চলিল। ইহার মধ্যেই বৈদান্তিকের ব্রহ্ম ও জগৎ বিষয়ক মত প্রচারিত হইল। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই বেদান্ত বাক্য প্রচারিত হইলে ইহার অর্থ লইয়া লোক আবার গোলে পড়িল, কেহ (১) ইহার অর্থ করিলেন ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় সত্য বস্তু, আর-সব অসত্য অবস্তু।—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগত মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে আমি তাহা অর্দ্ধ-শ্লোক দ্বারা বলিতেছি, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; জীব ব্রহ্মই অন্য কিছু নহে। লোকে মহাসমস্যায় পড়িল, তাই যদি হয় ব্রহ্ম ভিন্ন যদি আর কিছু নাই থাকে তবে এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি ইহা কি? তখন আবার শ্রুতিবাক্য হইতে দেখান হইল যে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থে ব্রহ্ম একমাত্র সত্য জগৎ মিথ্যা এরূপ নহে পরন্তু "এক-মেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিৎ প্রকারং নানাত্বেনাবস্থিতম্" এক ব্রহ্ম নানাভূতে চিৎ অচিৎ প্রকার ভেদ। তিনিই নানারূপে (জীব ও জগৎ) অবস্থান করিতেছেন। (২) ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনোক্ত তত্ত্বজ্ঞানও জগৎ বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নাশের ও জীবের মুক্তির উপায় বলিয়া প্রচারিত হইল।

বিজ্ঞান ব্রহ্মের তপস্যায় সিদ্ধ হইবার জন্য অর্থাৎ চিত্তকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির ভূমিতে তুলিবার জন্য এইরূপ বহুবিধ উপায় নির্দ্ধারিত হইল। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত এই ছয় দর্শন শাস্ত্রের প্রচারে মানবের বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল, অনেক অজ্ঞাত জগৎ-রহস্য প্রকাশিত হইল। জীব ও জগৎ বিষয়ক একটা নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল সত্য কিন্তু ইহাতে মানব সেই অতীন্দ্রিয় পারমার্থিকের সন্ধান পাইলেন না। কারণ ধীমান দার্শনিকগণ বুদ্ধির দ্বারা সত্য নির্ণয় করিবার প্রয়াস করিয়াছেন।......দার্শনিকের সম্বল তর্ক,

(১) মুণ্ডকোপনিষদঃ ১।২।৭। (২) পাতঞ্জল দর্শন প্রণেতা ভগবান পতঞ্জলি।

(১) অদ্বৈতবাদী।

(২) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

তর্কের ফল—বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, কলহ। কিন্তু তর্কের দ্বারা কখনও সত্য নির্ণয় হয় না" ।(১)

এইরূপ নানামতবাদযুক্ত দর্শন শাস্ত্রের অকূল সাগরে বিভিন্নমতবাদের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ভারত প্রকৃত শ্রেয় লাভে বঞ্চিত হইলেন, দর্শন সাগর মন্থন করিয়াও অমৃতের সন্ধান না পাইয়া ভারত আকুল প্রাণে পথপ্রদর্শক গুরুর প্রতীক্ষায় রহিলেন।

ভারতের এই সন্ধিক্ষণে "অনুগ্রহায় ভক্তানাং," ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিতে, স্বীয় দিব্য কর্ম্ম ও ভাবধারায় সাধন পথের বিঘ্ন অপসারণ করিয়া মানবের উর্দ্ধগতির তাহার অগ্রগমনে সাহায্য করিতে শ্রীভগবান মনুষ্য মূর্ত্তিতে ভারতের গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রচলিত মতবাদের উপর স্বীয় দিব্য মত প্রচার দ্বারা মানব চিত্তকে সেই আনন্দময়ের উপলব্ধির উপযুক্ত ভাবে ভাবিত করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গণে আত্মীয় নিধনে কাতর অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে গীতা-উপনিষদের প্রচার করিয়া প্রচলিত দর্শনোক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদকে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগরূপে ব্যাখ্যা করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটাইয়া তাহাকে দিব্যকর্ম্ম ও দিব্যজ্ঞানে পরিণত করিলেন।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥" গীতা ৯।২৭

যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে, অশন, যজন, দান, তপস্যা, সমস্তই আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে অর্পণ করিবে। এইরূপ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধনের কারণ হয় না, ইহাই "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" কর্ম্মের এই কৌশলকেই কর্ম্মযোগ বলে। সেইরূপ জ্ঞানবাদীর "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" জ্ঞানেই মুক্তি, একথারও সমর্থন করিলেন, "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" কিন্তু ইহা জ্ঞানবাদীর প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান নহে। এ জ্ঞান "বাসুদেব সর্ব্বমিতি," বাসুদেবই সব।

"যথা প্রকাশয়ত্যেক কৃৎস্নং লোকমিমংরবি।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥"
গীতা-১৩।৩৪

শ্রীভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজিত রহিয়াছেন।

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। গীতা-১০।২০
সকলের বুদ্ধিতে আমি আত্মারূপে বিরাজ করিতেছি "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট।" গীতা-১০।১৫, সকলের হৃদয়ে আমি অধিষ্ঠিত আছি, এই জ্ঞান,—এই জ্ঞানের সাধনে মানব অমৃতের সন্ধান লাভ করিবেন। পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যোগের মধ্যেও যে অভাব ছিল তাহাও তিনি পূর্ণ করিলেন,—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ। গীতা-৬।৪৭

তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ভজনা করেন। বেদান্তদর্শনের মতদ্বৈতের মীমাংসাও ভগবান নিজেই করিলেন,—"মমৈবাংশজীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" গীতা-১৫।৭। জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।" গীতা-৯।৪। অব্যক্তরূপে আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি। "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।" গীতা-৭।৭। সূত্রে যেমন মণিগণ তেমনি আমাতে জগৎ প্রোত রহিয়াছে এইরূপ ঈশ্বরজ্ঞানের আলোকে সর্ব্বদর্শনের অন্ধকার দূর হইল। মতবাদের ঘনান্ধকার দূরীভূত হইয়া সাম্যের আলোক প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই আলোকে মানবের সকল মোহান্ধকার দূর হইল। গীতার শিষ্য ভারত শুনিলেন অদূরে তাঁহার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া শ্রীভগবান বলিতেছেন

"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।
গীতা-১৮-৬৬

তুমি সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। আর শোকের প্রয়োজন নাই। সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবাদ মিটাইয়া একমাত্র আনন্দময় ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই যে মানব জীবনের চরম সার্থকতা শ্রীভগবানের শ্রীমুখে প্রচারিত এই বার্ত্তা লাভ করিয়া ভারত ধন্য হইল। তাহার বিজ্ঞান ব্রহ্মের সাধনা সিদ্ধ হইল।

এইবার শ্রীভগবানুক্ত "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। এই চরম বাণী কার্য্যে পরিণত করাই হইল ভারতের সাধনার শেষ। এইখানে আমরা দেখিতে পাই

(১) গীতায় ঈশ্বরবাদ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীভগবানের আহ্বানে ভারত তার ক্ষুদ্র স্বার্থ ক্ষুদ্র নীতিজ্ঞানের আবেষ্টন ছিন্ন করিয়া সেই বিরাটের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছে, সেই আনন্দসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, অমৃতের সিন্ধুতে মিশিয়া যাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে শ্রীভগবানের মানবীয় লীলা বর্ণনায় সাধকের এই চরম অবস্থার কথা পাওয়া যায়। গীতার শিক্ষাকে রূপদান করাই ভাগবতকারের শ্রীকৃষ্ণ লীলা-তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়, গীতার শেষ বাণীর উপরেই ভাগবতের ভিত্তি স্থাপিত বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা তত্ত্বেই মানবের সাধনার সর্ব্বোচ্চ পরিণতি ব্যক্ত হইয়াছে। জীব ব্রহ্মের মিলন, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার, মিলন তত্ত্বের স্বরূপ দেখিতে পাই ব্রজ-গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা তত্ত্বে। এই রাসলীলা প্রসঙ্গে পুরাণকার দেখাইয়াছেন জীব তার ক্ষুদ্র স্বার্থ ক্ষুদ্র ধর্ম্ম ও ক্ষুদ্র কামনা ত্যাগ দ্বারা তাহার নিত্য শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সচ্চিদানন্দ সাগরে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়া নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাই ভারতের ব্যবহারিক জীবনে ঋষি দৃষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

উপসংহারে বলিতে পারি ভারতের ঋষি যে আনন্দ ব্রহ্মের সন্ধান ভারতকে দিয়াছিলেন এবং সেই আনন্দময়ের সহিত পরিচিত হইবার তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সাধনার যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ভারত অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে তার ব্যবহারিক জীবনকে সেই পথে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে যত্ন করিয়াছে, এবং আজও সে সে পথেরই অনুসরণ করিতেছে। বহির্জ্জগতের বিরাট পরিবর্ত্তনে তার বহির্জীবনের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তরে সে সেই ঋষির গোত্রেই পরিচিত হইতে চাহে। তার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অসংখ্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনে সে আজও সেই ঋষিরই শিষ্য।

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি"। ভগবানের এই বাণী সার্থক করিতে ভারতের বুদ্ধ ভারতের শঙ্কর ভারতের চৈতন্য ভারতের রামকৃষ্ণ যুগে যুগে ভারতের রক্ষাকর্ত্তা ভারতের পথপ্রদর্শক॥ *

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী

* ভারতের সাধনার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের ভাগবদ্ধর্ম্ম, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের গীতায় ঈশ্বর-বাদ, শ্রীঅরবিন্দের গীতা বালগঙ্গাধর তিলকের গীতা রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থের ভাব গ্রহণ করিয়াছি। লেখক॥

অনুবাদ কবিতা

(আরবী হইতে—কবি মুতনব্বী)

নূর আহম্মদ

—সুন্দর মুখেরে দেখি যদি ভাবো তুমি
ইহারে বাসিয়া ভালো আছে বহু লাভ্
দুই দিন পরে তব তৃষিত পরাণ্
সে রূপ্ শিখায় জ্বলে হইবে কাবাব্।

লক্ষ্ণৌ কলা-বিদ্যালয়ের চিত্র-প্রদর্শনী

শ্রীমণিলাল সেন-শর্ম্মা

একথা অবশ্য সত্য যে বাঙ্গলায় যে-ছয়টি ঋতুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, সে-গুলির মধ্যে শরৎকালের স্থান সকলের উপরে। শরতের শান্ত-স্নিগ্ধ অথচ উদাস ভাব যে-আনন্দ দেয়, তেমন মধুর অন্তরঙ্গ ভাব অন্য ঋতুতে পাইনা। এ ঋতুটির সঙ্গে বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যের নিবিড় সংযোগ আছে। কিন্তু অবকাশ-প্রিয় বাঙ্গালীর মন ছুটির দিন না পেলে যেন কোনরূপ আনন্দ করবার প্রেরণাই অনুভব করে না; শত-সহস্র কাজের ভিড়ের মধ্যেও যে আনন্দ করবার প্রয়োজন তা যেন আমরা স্বীকার করতে চাই না। তাই দেখি শীতের সঙ্কুচিত দিনগুলির মধ্যেও কলিকাতা সহরে নানারকম প্রদর্শনীর ভিড় লেগে যায়; নিজেদের একঘেয়ে জীবন-যাত্রার সঙ্গে তখন কয়েকদিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে, বাইরের দিকে দৃষ্টি দিবার সাড়া পাই, কারণ সে-সময় অবকাশের ব্যবস্থা থাকে

খেয়ালিয়া চিত্র-সংগ্রহ হইতে
শিল্পী—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

গত পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে চৌঠা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতার চৌরঙ্গীস্থিত ওয়াই-এম্-সি-য়ে হলে লক্ষ্ণৌ সরকারী কলা-বিদ্যালয়ের এক চিত্র-প্রদর্শনী হয়ে গেছে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা শরৎকালে কোন চিত্র-প্রদর্শনী কলিকাতায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শীতকালে বড়দিনের ছুটির সময়ে, অথবা তার অব্যবহিত আগে কিংবা পরে, এরকম প্রদর্শনী দেখে আমরা অভ্যস্ত। কাজেই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তার নিকট থেকে যখন তা দেখবার নিমন্ত্রণ পেলুম, তখন আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছিলাম; মনে মনে সংশয় ছিল, প্রদর্শনীটিকে সকলে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করবে কি না।

সতীর স্মৃতি
শিল্পী—শ্রীকিরণ ধর

মধুর অনবদ্য শরৎকালে তাঁদের চিত্র-প্রদর্শনী করবার প্রেরণায় লক্ষ্ণৌ কলা-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্র-বৃন্দের যে-সুরুচির ইঙ্গিত পাই তা কলারসিকেই সম্ভব এবং তা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

যুগে যুগে প্রত্যেক দেশেই নানারূপ কলা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে প্রতিভাবান্ শিল্পীদের দিয়ে, এবং এক একটি প্রতিষ্ঠানকে

পর্ব্বতদুহিতা শিল্পী—শ্রীকিরণ ধর

কেন্দ্র করেই সে-দেশের শিল্পের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পেয়ে থাকে। কিন্তু মুঘল আমলের পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে সত্যিকারের কলা-প্রতিষ্ঠান বল্‌তে গেলে কিছুই ছিলনা। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অবশ্য দু'একজন প্রতিভাশালী শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁদের আশ্রয় করে এমন কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান কিংবা শিল্প-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল কি না তা আমাদের জানা নাই। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই যে-অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পীর অভ্যুদয় হয় তিনি আমাদের অতি আদরের অবনীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এ-যুগে যে-সকল সুকুমার কলা-প্রতিষ্ঠান আছে তার দু'একটি ছাড়া সকলগুলির প্রেরণা ও প্রগতির মূলে রয়েছেন এই বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পী-গুরু। আজ ভারতবর্ষের চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে কোন-কিছু আলোচনা কর্‌তে গেলে এই মনীষীর অমূল্য দানের কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে উদিত হয়। তরুণ ভারতের চিত্র-শিল্প বল্‌লে অবনীন্দ্রনাথের রূপ-কল্পনার কথাই বোঝায়।

অধুনা ভারতবর্ষে কলা-প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই। কয়েক-স্থানে সরকারী কলা-বিদ্যালয় আছে; কোন কোন যায়গায়

বেসরকারী চিত্র-শিক্ষায়তনও রয়েছে। এক একটি কলা-বিদ্যালয়কে কলা-সঙ্ঘ বা কলা-প্রতিষ্ঠান বল্‌তে পারি। কারণ এরূপ বিদ্যালয়কে আশ্রয় করেই শিল্পের এক-একটি ধারা জীবন্ত হয়ে উঠবার অবকাশ পায়।

চকিতা শিল্পী—শ্রীপ্রণয়রঞ্জন রায়

একই প্রতিষ্ঠান হতে আমরা চিত্র-কলার সর্ব্বাঙ্গীন অভিব্যক্তি পাইনা; এক-একটি প্রতিষ্ঠান এক-একটি বিশেষ রূপের, এক-একটি বিশেষ ভঙ্গীর চর্চ্চা করে থাকে। এজন্যই যে-কোন দেশের কোন এক সময়ের চিত্রকলার পরিচয় পেতে হলে, সে-দেশের সেই-সময়কার বিভিন্ন কলা-প্রতিষ্ঠানগুলির একত্রিত রূপ-সৃষ্টির আলোচনা করার প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠান সমূহের একই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ রূপ-সৃষ্টির লক্ষ্য, থাকা সত্ত্বেও সে-গুলির দৃষ্টি-ধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয় বলে, তাদের ছবিগুলি হয় বিভিন্ন পদ্ধতির;—এক প্রতিষ্ঠানের ছবিগুলির সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানের ছবিগুলির মূলগত পার্থক্য থেকে যায়; আর সে-ছাপ এত স্পষ্ট, যে যে-কোন ছবি দেখ্‌লেই তা কোন্ প্রতিষ্ঠানের শিল্পীর রচনা বলে দিতে পারা যায়। অথচ প্রত্যেক পদ্ধতির ছবিতেই আমরা আনন্দের সন্ধান পাই।

যদিও ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে-সকল কলা-বিদ্যালয় আছে তাদের দু'একটি ছাড়া প্রত্যেকটির মধ্যেই কাল্‌চার-গত সম্পর্ক বিদ্যমান, কারণ অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত শিল্প-কল্পনার রূপ তাঁর শিষ্য, নাতি-শিষ্য কিংবা তাঁরই দ্বারা অনুপ্রাণিত শিল্পীগণ সে-সব শিক্ষালয়ে নিজেদের এবং ছাত্রদের কাজে
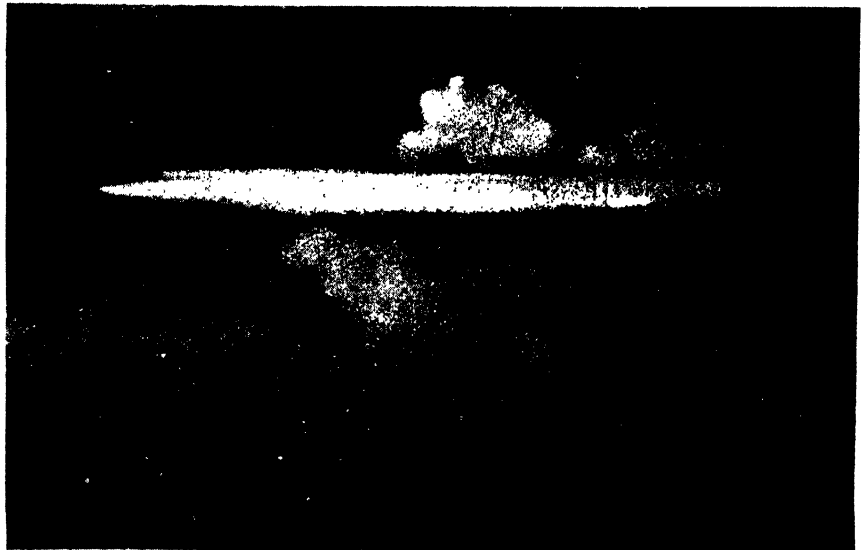
বর্ষার মেঘ
শিল্পী—শ্রীবীরেশ্বর সেন

প্রকাশ করবার চেষ্টা করছেন, তবুও সে-গুলির প্রত্যেকটির সৃষ্টিতেই এক-একটি বিশেষ ছাপ বা রূপ-ভঙ্গী আছে। একই মূল থেকে রস সঞ্চারিত হলেও এই বিদ্যালয়গুলির প্রত্যেকটিরই বৈশিষ্ট্য আছে, নিজস্ব পথ আছে। তার প্রধান কারণ এই যে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও নাতি-শিষ্যদের মধ্যে প্রতিভাবান

লক্ষ্ণৌ চিত্র-বিদ্যালয়ের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটির কথাই বার বার মনে পড়েছে। এই বিদ্যালয়টিকে আশ্রয় করে আমাদের চিত্র-শিল্পে একটি বিশেষ রূপ-ধারা প্রবহমান। কলা-রসিকেরা এটিকে তরুণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গণ্য করে থাকেন।
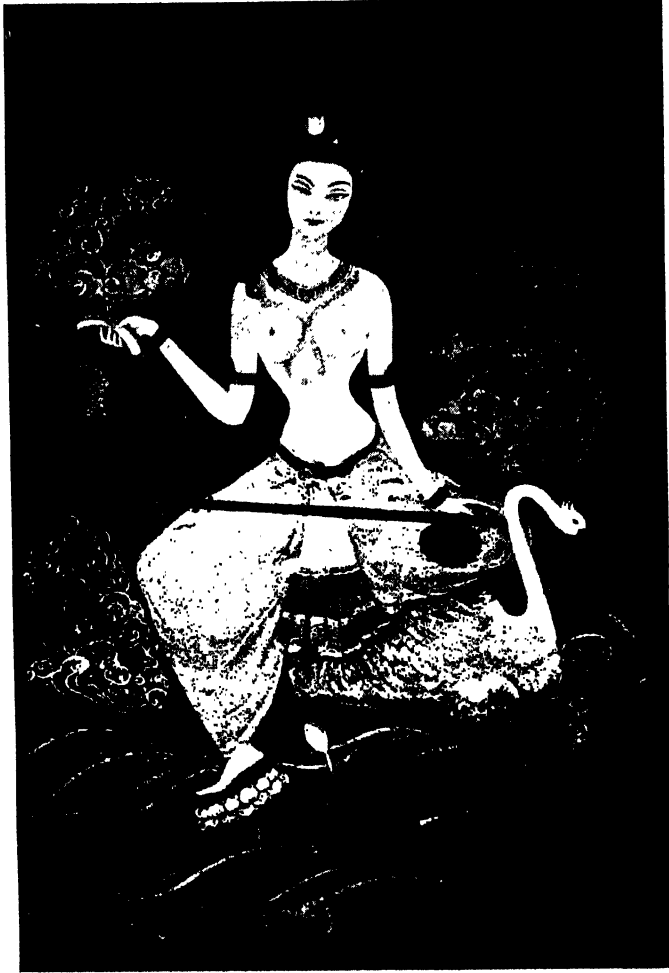
সরস্বতী শিল্পী—শ্রীভবানী গুঁই

শিল্পীর অভাব নাই। তাই শান্তিনিকেতন কলা-ভবনের যে-বৈশিষ্ট্য তা মান্দ্রাজ কলা-বিদ্যালয়ের সৃষ্টিতে পাইনা, আবার মান্দ্রাজ কলা-বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য কলিকাতার সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের কিংবা ভারতীয় প্রাচ্যকলা-বিদ্যালয়ের রূপ-সৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

এখানে বলা প্রয়োজন যে প্রদর্শনীটি লক্ষ্ণৌ বিদ্যালয়ের সম্যক কলা-সৃষ্টির পুরোপুরি প্রদর্শনী নয়। মাত্র দু'জন অধ্যাপকের এবং কয়েকটি ছাত্রের, বিশেষ করে শ্রীযুক্ত কিরণময় ধরের, ছবিই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু তা'হলেও, সে-বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট পদ্ধতি এবং শিল্পের আদর্শ যাচাই করতে যে-ছবিগুলি ছিল তা-ই যথেষ্ট।

প্রদর্শনীর প্রত্যেক ছবিতেই একটি সুসমঞ্জস রূপের ভাব লক্ষ্য করেছি, এবং ছবিগুলির সম্মিলিত রূপের মধ্যেও একটি

অভিসারিকা-নায়িকা
শিল্পী— শ্রীশরদিন্দু সেনরায়

নিবিড় ঐক্য চোখকে তৃপ্তি দিয়েছে,—তাদের যে একটি বিশিষ্ট পথ আছে, একটি বিশেষ কথা বল্‌বার আছে, তা উপলব্ধি করতে একটুও বাধেনি। এরা যে একই প্রতিষ্ঠানের তা বুঝবার অসুবিধা হয়নি। একটির সঙ্গে অপরটির কাল্‌চার-গত সম্পর্ক থাকলেও একটি অপরটির নকল নয়—না ভাব-সুষমায়, না বর্ণ-ব্যঞ্জনায়। অথচ কোথাও আবেগের ছড়াছড়ি নাই, বাহুল্য কোথাও স্থান পায়নি,. ছবিগুলি যেন একটি অনাড়ম্বর সহজ শান্ত শ্রীমণ্ডিত ভাবে ভরপুর। অধ্যক্ষ অসিতকুমার ও তাঁর সহকর্ম্মীগণ যে তাঁদের শিষ্যদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট ভাব-ধারাটির উপর লক্ষ্য রেখে তাদের প্রতিভার বিকাশ লাভে সাহায্য করে থাকেন, তা দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছি।

প্রত্যেক ছাত্রেরই একটি নিজস্ব পথ থাকে। সে-পথে স্বচ্ছন্দগতিতে যাতে সে চল্‌তে শিখে সেই দিকে দৃষ্টি রাখাই হল গুরুর কাজ। গুরুর নিজের পথকে অনুসরণ করবার জন্য শিষ্যদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা করলে, কোন ছাত্রেরই স্বকীয় প্রাতিভা বিকাশ লাভ করবার সুযোগ পায়না;—সে ভাবের প্রচেষ্টায় শিক্ষার হয় অবমাননা, অথচ এরকম চেষ্টা অনেক শিক্ষায়তনে দেখতে পাই! লক্ষ্ণৌ বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি যে কত উচ্চাঙ্গের এবং সেখানকার অধ্যাপকেরা যে শিষ্যদের জন্য কতখানি যত্ন নিয়ে থাকেন, তা প্রদর্শনীটি যাঁরা দেখ্‌বার অবকাশ পেয়েছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন। এই বিদ্যালয়ের পরিচালনায় অধ্যক্ষ অসিতকুমার যে ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

প্রদর্শনীটির উদ্যোক্তা ছিলেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত কিরণময় ধর। তাঁর নিজের ২৮ খানি ছবি ছাড়া মাত্র ৬৯ খানি ছবি প্রদর্শনীর জন্য এনেছিলেন। তার মধ্যে অধ্যক্ষ অসিতকুমারের খেয়ালীয়া সিরিজের ৩৪ খানি এবং ছেলেমেয়েদের সিরিজের ৭ খানি, সর্ব্বশুদ্ধ ৪১ খানি ছবি ছিল; আর অধ্যাপক বীরেশ্বর সেনের ছিল মাত্র ৭ খানি; বাদ্‌বাকী ছবি সবই ছিল ছাত্রদের।

অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা শিল্পী—শ্রীশরদিন্দু সেনরায়

অসিতকুমারের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় নূতন করে দিবার নাই, তিনি আজ বিশ্ববিখ্যাত। তাঁর যে-ছবিগুলি প্রদর্শনীতে দেওয়া হয়েছিল, সে-গুলি এর আগে অন্য কোথাও প্রদর্শিত কিংবা প্রকাশিত হয়নি। তিনি যে কতবড় গুণী খেয়ালীয়ার ছবিগুলি তার নিদর্শন। এক একটি ছবি যেন এক একটি গান ;--স্বরে, ঝঙ্কারে, মাধুর্য্যতায় অপূর্ব্ব। সে-গুলির সৌন্দর্য্য শুধু উপভোগ করবার। ছবিগুলির এমনি মোহিনী শক্তি যে চাইবামাত্রই নয়ন-মন বাঁধা পড়ে যায়, দৈনন্দিন জগৎ লুপ্ত

মহাপ্রস্থান শিল্পী—শ্রীকিরণ ধর

হয়ে যায়, মন তখন অবাধ গতিতে অসীম সৌন্দর্য্যলোকে বিচরণ করতে থাকে। অসিতকুমারের মোহন তুলির এমনি মায়াজাল! তাঁর ছেলেমেয়েদের সিরিজের ছবিগুলিও অপরূপ রূপ-সৃষ্টি। তাঁর খেয়ালীয়া সিরিজের একখানি ছবির প্রতিলিপি এখানে দিলাম, তা থেকেই তাঁর সুগভীর রূপ-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাবে।

অধ্যাপক বীরেশ্বর সেন আমাদের অতি পরিচিত শিল্পী। তাঁর ছবিগুলিও সেইরূপই বার বার মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর সবগুলি ছবিরই বিষয় বস্তু ছিল এক—বিবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্য। কোথাও শৈলশিখরে গলিত তুষারের খেলা, কোথাও বা জলভরা বর্ষার মেঘ ভেসে চলেছে, কোথাও অতুলনীয় সুনীল নিঝুম দীর্ঘিকার রূপ, কোথাও বা খেয়া ঘাট গাঢ় পীতাভ অবারিত মাঠ—প্রকৃতির নানাবিধ অদ্ভুত খেয়াল তাঁর তুলিকায় অপরূপ ভাবে ধরা পড়েছে। ছবিগুলি আকারে বেশ ছোট, অথচ স্বল্প পরিমিত স্থানে রূপের সহজ স্বচ্ছন্দ গতিটি কোথাও ব্যাহত হয়নি। বীরেশ্বর বাবু ছবি আঁকেন কম, কিন্তু একটি ছবিতেই চোখও মনকে সুগভীর আনন্দ দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর একটি ছবির প্রতিলিপি এখানে দেওয়া হল।

ছাত্রদের মধ্যে শরদিন্দু সেন-রায়, প্রণয়রঞ্জন রায়, তারাদাস সিংহ, ভবানী গুঁই এবং কিরণময় ধরের ছবি আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

শরদিন্দুবাবুর ছয়খানি ছবি ছিল, দুখানি ছবির প্রতিলিপি এখানে দেওয়া হল—"অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা" এবং "অভিসারিকা

নায়িকা"। "অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা" তাঁর অতি সুন্দর সৃষ্টি। ছবিখানির গভীর ভাব কোথাও প্রতিহত হয়নি, পরকল্পনাটির

অন্ধ-ভিক্ষু—আদবদরী
শিল্পী—শ্রীকিরণ ধর

রূপভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে নিখুঁত ভাবে। "অভিসারিকা নায়িকা" আর একটি মনোরম সৃষ্টি; বর্ণ-সুষমায়, ভাবে ও রূপে ছবিখানি অনবদ্য। তিনি এখনো লক্ষ্ণৌ বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যতে অনেক কিছু পাব এমন ভরসা রাখি।

প্রণয়রঞ্জন রায়ের তিনখানি ছবির মধ্যে একখানির প্রতিলিপি দিলাম। তাঁর "চকিতা" আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে। ছবিটির প্রকাশ ভঙ্গীতে কোথাও জড়তা বা সঙ্কোচ নাই; প্রতিপাদ্য বিষয়টি চমৎকাররূপে তুলিতে ধরা পড়েছে। তিনি সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ বিদ্যালয়ের পড়া সমাপ্ত করেছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তারাদাস সিংহের ছবি ছিল চারখানি, একখানিও এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। তিনি লক্ষ্ণৌ বিদ্যালয়ের একজন নবীন ছাত্র। ইতিমধ্যেই তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছেন। ১৯৩৪ সালে লণ্ডনে যে ভারতীয় চিত্রের প্রদর্শনী হয়, তাতে তাঁর একখানি ছবি সম্রাজ্ঞী মেরী ক্রয় করেছিলেন।

ভবানী গুঁইয়ের যে একখানি ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল তার প্রতিলিপি এখানে দিলাম। সরস্বতীর ছবি আমাদের কাছে নূতন নয়, অনেক শিল্পীই বাগ্দেবীর ছবি এঁকেছেন। তা হ'লে ও ছবিখানিতে বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। পরিকল্পনাটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনিও লক্ষ্ণৌ বিদ্যালয়ের একজন তরুণ ছাত্র, ইতি মধ্যেই বিদ্যালয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণময় ধরের সামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। তিনি প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ছিলেন বলে নয়, তাঁর মধ্যে যে-প্রতিভা আছে সে-প্রতিভার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হোক্ এটা চাই। তাঁর বয়স এখনো পঁচিশ হয়নি, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিদ্যালয়ের বাইরে নানাস্থানে পুরস্কার এবং প্রশংসা লাভ করেছেন। প্রদর্শনীতে

শকুন্তলা শিল্পী—শ্রীকিরণ ধর

তিনি যে ২৮ খানি ছবি দিয়েছিলেন সেগুলিব প্রত্যেকটিতেই তাঁর শিল্পী-প্রতিভাব স্পষ্ট ছাপ ছিল। আমবা তাঁব ছয়খানি ছবিব প্রতিলিপি এখানে দিলাম। তাঁব কল্পনা বহুমুখী, নানাদিকে তাঁব মন অবাধ গতিতে খেলে বেড়ায়। তাই তাঁব সৃষ্টিতে নানারূপের, নানা বিষয়বস্তুব, বিভিন্নভঙ্গীব বিচিত্র সমাবেশ দেখতে পাই। যে কয়খানি ছবি এখানে প্রকাশিত অঙ্কিত ছবির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকাব কবেন। ১৯৩৪ সালে পাঞ্জাব চারুকলা প্রদর্শনীতে তিনি পাঞ্জাব সরকারেব রৌপ্যপদক লাভ কবেন। এদ্ব্যতীত মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, বাঙ্গালোব প্রভৃতি স্থানেব প্রদর্শনীতে ও তাঁব ছবি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে এবং তিনি পুবস্কাব পেয়েছেন। লণ্ডনের বার্লিংটন গ্যালারীতে ১৯৩৪ সালে ভাবতবর্ষের আধুনিক চিত্রকলাব যে প্রদর্শনী

পাহাড়ী মেয়ে — শিল্পী—শ্রীকিরণ ধব

হল তা থেকে এ কথাব সত্যতা উপলব্ধি হবে। ছবিগুলিব পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, সেগুলি এত পরিস্ফুট। কি বর্ণ-সুষমায়, কি ভাব-গরিমায়, কি অঙ্কনপদ্ধতিতে তাঁর ছবিগুলি নিখুঁত। ১৯৩৩ সালের মহীশূরেব এবং ১৯৩৪ সালেব বেনারসের প্রদর্শনীতে তিনি ভারতীয় পদ্ধতিতে হয় তাতে তাঁব "উর্ব্বশীব জন্ম" শীর্ষক ছবিখানি বিশেষ প্রশংসা লাভ কবে তা' সাম্রাজ্ঞী মেরী ক্রয় কবেন। তাঁব অনেক ছবি ভাবতেব বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় হয়েছে। তাঁর মোহন তুলিকা অক্ষয় হোক এই প্রার্থনা করি।

শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

সাঁওতাল—সখী

শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

সন্দিগ্ধ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

"কেন সে আসে না আর,
কে জানে কী হোলো তার,
কোথা থাকে, কী করে না-জানি !"—
বন্ধু মোর বনমালী,
তারি কথা "লতি" খালি
কথায় কথায় আনে টানি' ॥
কেমনে বা বলি 'ও'রে
মন যে কেমন করে
'ও'র মুখে শুনিলে সে-নাম,
কার কথা কার পাশে !
জানে না তো ওরি আশে
কবে তারে ছেড়ে যে এলাম !
তারে নিয়ে 'ও'র আজ ?
এত কী ভাবার কাজ
সে যেন উহারি বেশি জানা ;
জানাতে পারিনে তবু
পারিবনা বুঝি কভু ;
—একথা সেকথা বলি নানা।
সে যে মোর কত চেনা,
তার কাছে কী যে দেনা,
তার সাথে গেছে কতখানি,
'ও'রে যে পেয়েছি কাছে
এ যোগ-ও সে সাধিয়াছে ;
—'ও'রে তাহা কেমনে বাখানি !

*   *   *   *

তার সাথে ওর ভাই
অনার্স পড়িত, তাই
দুজনাতে ছিল জানাশোনা,
সে-সূত্রে আমারো ক্রমে
আলাপ উঠিল জ'মে,
বাসাতেও যাওয়া বাধিল না।

আসি যাই তারি সাথে,
দেখি 'ও'রে আবছাতে
দিনে দিনে বাড়ে কৌতূহল,—
কী যে হোলো তার পরে
স্মরিতে ধিক্কার ধরে
বলিতে কি পারি সে সকল !

'ও'দের খেলার মাঠে
টেনিসে বিকাল কাটে,
তার সঙ্গে প্রায়ই ছাড়াছাড়ি ;
একদিন খেলাশেষে
বিশ্রস্ত চিন্তায় ভেসে
ফিরিয়া চলেছি একা বাড়ি,
মনে পড়ে সেই সন্ধ্যা,—
ফুটেছে রজনীগন্ধা,
নিরালা প্রাঙ্গণ গন্ধে ভরা,—
লতাকুঞ্জ-পথ দিয়া
চলিতে ফিরিতে গিয়া
অতর্কে সম্মুখে দিল ধরা।

গোলাপের গুচ্ছ করে
বাঁকা বেণী পিঠে প'ড়ে,
বায়ু বহে অঞ্চল বিথারি',
বারেক সলজ্জ আঁখি
মোর মুখ 'পরে রাখি'
ঘরে ফিরে গেল তাড়াতাড়ি।
ভুলে গিয়ে আর সব-ই
ভাবিতেছি সেই ছবি,—
চেয়ে দেখি সম্মুখে 'ও' নাই,
সেদিনের সেই দৃষ্টি
কী মায়া করিল সৃষ্টি,—
বুঝিলাম জীবনে কী চাই!

* * * *

চলি ফিরি একা একা
কখনো যা হয় দেখা
বুঝি যে বন্ধুরও মন ভারী,
এক প্রাণে বাঁধা প্রাণ
সেথায় পড়েছে টান,
সে-ও তাই প্রাণেরি ভিখারী।
বন্ধু থাকে দূরে দূরে
সবই দেখে ঘুরে' ঘুরে',
দেখিতে সে জানে সত্যি বটে;—
সে কথা বুঝেছি পিছু,
কথাচ্ছলে কথা কিছু
শোনা গেল তাহারো নিকটে।
বেশি কিছু বলেনি সে
চেয়েছিল অনিমিষে
দিগন্তে তারাটি যেথা সাজে,
বলেছিল মুখ ফুটি'
"মানুষের আঁখি দুটি
সৌন্দর্য্যের সার সৃষ্টি-মাঝে।"

সে যেন সান্ত্বনা-স্বরে
ইঙ্গিতে বোঝালো মোরে
জেনেছে সে আমারো কাহিনী,
তবু সেই থেকে বেশি
হইল না মেশামেশি
ডেকেছে সে, ফিরেও চাহিনি।
জানি যে ধারণা মিছে
তবু-ও মনের নিচে
থেকে থেকে বিঁধে এ সন্দেহ,—
চোখে দেখে' কে উহারে
রাখিবে চোখেরি পারে! —
প্রাণে কি না চেয়ে পারে কেহ?
ভেবে তারে প্রতিদ্বন্দ্বী
আর নাহি হোলো সন্ধি;
এলাম' 'লতি'-রই কাছে ছুটে;
এ প্রাণে যা-কিছু ছিল
বাকী নাই একতিল-ও
সবই দিনু ওর অর্ঘ্য পুটে।
কিছু দিক্ না-ই দিক্
দান, 'ও' নিয়েছে ঠিক,
তাতেই পরালো জয়টীকা,
চলেছিল সবই ভালো,
আবার যে 'ও' জ্বালালো
ছাই-চাপা আগুনের শিখা!
বন্ধু-মুখে 'ও'র কথা
শুনে বাড়ে দুর্ব্বলতা
সখ্য তার টুটে গেল তায়;
'ও' যে শেষে তারি মতো
তারি কথা বলে অত
তবে কি 'ও' তাহারেই চায়!

———

ম্যাজিক্ বা অভিচার

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

মানুষের যতই জ্ঞান বাড়ে ততই সে পৃথিবীর গভীর রহস্য গুলো বোঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু এখনও এমন অনেক জিনিষ আছে যা কেউ একেবারেই বোঝে না। যা কিছু বুঝবার ছিল পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকেরা সবই যে বুঝে নিয়েছেন তা' নয়। অতএব কোনও কিছু বুঝতে অসুবিধে হলে অথবা সেটা পরিষ্কার না বুঝতে পারলেই যে সেটা অবজ্ঞার বস্তু সে ধারণা ভুল। বরং সেটার স্বরূপ নির্ণয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করাই উচিত।

সমগ্র মানব জাতির মধ্যে প্রায় শতকরা আশী জন 'ম্যাজিকে' বিশ্বাস করে। এখানে ম্যাজিক মানে তাসের খেলা বা ভোজবাজী নয়। অভিচার ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম্মের Sympathetic magicকে আবার দুই ভাগ করা যায়

১। সাহচর্য্য-জাত অভিচারাদি—Magic based on Association.

২। সান্নিধ্য ও সাদৃশ্য-জাত অভিচার—Magic based on Contiguity and Similarity.

সাহচর্য্য, সান্নিধ্য ও সাদৃশ্য—Association, Contiguity আর Similarity, পরস্পর এতই সংশ্লিষ্ট যে এদের বিচ্ছিন্ন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু উদাহরণের সাহায্য নিলে হয় ত ব্যাপারটা একটুখানি পরিষ্কার হতে পারে।

সংক্রামক ম্যাজিক—(Contagious magic)

অনেকেরই বিশ্বাস যে একবার যদি কোনও দুটো জিনিষের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনা হয়, তা হলে পরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র থেকে যায়। তখন একের ওপরে কোনও প্রভাব বিস্তার করলে অন্যটিও প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। সুতরাং কোনও একটি বস্তুর একটি বিশেষ অংশের ওপরে যে আচরণ করা যায়, সমগ্র বস্তুটিতে সেই আচরণ সংঘটিত হবারই সম্ভাবনা।

সেই জন্যই অভিচার ক্রিয়া করতে হলে, যার ওপর অভিচার করতে হবে তার শরীরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও জিনিষ পাবার জন্য 'ষট্কর্ম্মী' প্রাণপণ চেষ্টা করে। দাড়ী বা মাথার কয়েকটি চুল, নখের টুকরা, ভূপতিত একবিন্দু নাকের রক্ত (কিন্তু তা আবার পায়ে দলা হলে চলবে না) দক্ষিণ আফ্রিকার Basuto জাতির অভিচারে প্রয়োজন হয়। ইংলণ্ডের কোনও কোনও প্রদেশে এমন বিশ্বাসও প্রচলিত আছে যে, যদি কোনও পুরুষ কোনও মেয়েকে পরিত্যাগ করে চলে যায় তা হলে পরিত্যক্তা নারী সেই পুরুষের মাথার কয়েকটি চুল চুরী করে কেটে যদি সেগুলো উত্তপ্ত জলে ফুটোতে আরম্ভ করে, তা হলে যতক্ষণ সেটা ফুটতে থাকবে ততক্ষণ সে পুরুষ অন্তরে অন্তরে বিষম জলবে, অবিলম্বে সেই মেয়েটির কাছে তাকে ফিরে আসতে হবেই। জার্ম্মাণী ও অন্যান্য দেশের অনেক জায়গায় নখের টুকরা, ভাঙ্গা দাঁত প্রভৃতি সযত্নে Elder গাছের তলে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়, যেন ডাইন্ সন্ধান না পায়। Patagonia জাতি চুলের বা নখের টুকরা অতি সাবধানে পুড়িয়ে ফেলে। তাদের বিশ্বাস যে, কেউ সেগুলো পেলেই তাদের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করতে পারে।

কোনও কোনও দেশে কেশগুচ্ছ যে কত যত্নের সামগ্রী, একটা উদাহরণ দিলেই তা বেশ বোঝা যাবে। উত্তর অ্যামেরিকার Musquallie রমণী শঙ্খ বা কড়ি খচিত একটি বন্ধনীর দ্বারা (scalp-lock ornament) তার চুলগুলি বেঁধে রাখে। প্রথমে এই বন্ধনী শুধু রক্ষাকবচ রূপেই গণিত হত। কিন্তু ক্রমশঃ এই ধারণা হল যে ঐ বন্ধনীর মধ্যে, যে ধারণ করে তার আত্মা, সংক্রামিত হয়ে যায়। যদি কেউ বন্ধনীটি পায়, তা হলে সে বন্ধনীর মালিককে দাস করে রাখতে পারে। পতিপুত্র ফেলে বন্ধনীহারাকে তারই পেছনে পেছনে সারা

পৃথিবী ছুট্‌তে হবে। তার আত্মার ওপর, যে বন্ধনীটি পায় তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব জন্মে যায়। এই শিরোভূষণ সেই দেশের পুরুষদের মধ্যেও ব্যবহৃত হয়। শত্রু এই শিরোভূষণ পেলে যার শিরোভূষণ তাকে দাস করে রাখতে পারে। আবার কেউ যদি কোনও রূপে শত্রুর ঢাল ও সড়কী হস্তগত করতে পারে তা হলে সে ইচ্ছা করলেই শত্রুকে প্রবল জরে আচ্ছন্ন করতে পারে, উন্মাদ করতে পারে, এমন কি তার প্রাণও নষ্ট করতে পারে।

South Sea Islandsএ অভিচার করতে হলেই যার ওপর অভিচার করতে হবে তার শরীরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও বস্তুর নিতান্ত প্রয়োজন। Hawaiian দ্বীপপুঞ্জে সর্দ্দারের বিশ্বাসী অনুচর সর্ব্বদা তাঁর পাশে 'পিকদান' নিয়ে উপস্থিত থাকে। থুৎকার অতি যত্নে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস যে থুৎকার পেলেই শত্রু তাদের আত্মার ওপরও সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব পায়। Tahitianরা চুল বা নখ কেটেই হয় পুড়িয়ে না হয় পুঁতে ফেলে। থুথু ও মলমূত্রাদির লেশ মাত্র চিহ্ন যাতে না পাওয়া যায় সে বিষয়ে অসভ্য মাত্রেই সচেষ্ট। ওদের শরীর-জাত কোনও কিছু পেলেই নাকি শত্রু ক্ষতি করতে পারে।

ইটালীতে ডাইনী মন্ত্র পড়ে গান গাইতে গাইতে "চারটি ভাগ্যবৃদ্ধির বস্তু" দিয়ে লাল কাপড়ের সৌভাগ্যসূচক পেটিকা বা থলিয়া তৈয়ারী করে দিয়ে থাকে। Luck bag অ্যামেরিকার নিগ্রোদের মধ্যেও দেখা যায়। তারা এইরূপ সৌভাগ্যসূচক 'ব্যাগ্' বা 'বল্'-luck bag, Cunjerin তৈয়ারী করে ব্যবহার করে থাকে। সেই 'ব্যাগ' বা 'বল' যার কাছে থাকে তার সুখ সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

যে মাটিতে পায়ের ছাপ পড়েছে সেইখান থেকে কিঞ্চিৎ ধূলা নিয়েও অভিচার করা চলে। জার্ম্মানীতে এইরূপ বিশ্বাস আছে যে যদি ঘাসের ওপর দিয়ে কেউ হেঁটে চলে যায় (খালি পায়ে হলেত খুবই ভালো কথা) আর তারপর যদি সেই ঘাসের চাপ্‌ড়া তুলে আগুনে ফেলে দেওয়া হয় বা ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে যার পায়ের ছাপ পড়েছিল সে ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়ে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। পদচিহ্নে কাঁটা বা পেরেক ফোটালে সে খোঁড়া হয়ে যায়। কাঁচের টুকরো দিলেও চলতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যদের বিশ্বাস যে যদি কোনও লোকের পায়ের চিহ্নে বা যেখানে সে শুয়েছিল সেই মাটিতে কাঁচ, কয়লা বা Quartzএর তীক্ষ্ণ টুকরা বিঁধে দেওয়া হয়, তা হলে অবিলম্বে ঐ টুকরাগুলি সেই লোকের শরীরে প্রবেশ করে প্রবল জ্বালা ও বেদনা উৎপাদন করে।

অভিচার ক্রিয়ায় বস্ত্রাদিও অতি মূল্যবান্। গায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে বলে কাপড়ও যেন ব্যক্তিরই অঙ্গ বিশেষ হয়ে পড়ে। জার্ম্মানী ও ডেনমার্কে কেউ কখনও শবদেহের ওপরে জীবিত ব্যক্তির পরিধেয় বসনের টুকরাটুকুও ফেলে না। যদি কোনও জীবিত লোকের কাপড় মৃতদেহের কবরে ফেলে দেওয়া হয়, তা হলে ঐ শবদেহ পচ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে যার কাপড় সে ব্যক্তিও ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়ে খুব শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। কোনও মৃতব্যক্তির কাপড়ের টুকরো দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ঝুলিয়ে রাখলে সে ক্ষেতে ফল ধরে না।

এই বিশ্বাসের ফল স্বরূপ দেখা যায় যে সব জাতির মধ্যেই মহাপুরুষদের বস্ত্রাদি অতি যত্নে রক্ষিত হয়। মহাপুরুষদের ঐশী শক্তি যেন তাঁদের পরিধেয় বস্ত্রাদিতেও সংক্রামিত হয়ে থাকে।

Tahitian দলপতির কটিবন্ধের লাল পালকগুলি তাদের দেবমূর্ত্তি থেকে খুলে নেওয়া হয়। সেই জন্যই কটিবন্ধনী অতি পবিত্র বলে তাদের বিশ্বাস। যে সেই বন্ধনী ধারণ করে তাকে তারা দেবতার সমতুল্য বলেই মেনে চলে।

সময়ে সময়ে কোনও কোনও বিশেষ বস্তু সাদরে অঙ্গে ধারণ করা হয়ে থাকে। সেই বস্তুর গুণগুলি যেন ধারণকারীর প্রাপ্ত হয় সেই বাঞ্ছা। কেউ কেউ আবার অনেক রকম জিনিষ খেয়ে ফেলে, যেন সেই জিনিষের গুণগুলি সে পায়। Red Indian শিকারী Grizzly ভালুকের নখ ধারণ করে—যাতে ভালুকের মতই সাহস ও ক্ষমতা তার হয়। Tyrolese শিকারী ঈগল পাখীর পালক টুপীতে পরে—ঈগলের মতই দূরদৃষ্টি ও সাহস পাবে বলে। চিলের পা ছোট ছোট ছেলেদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়; চিল যেমন বিদ্যুৎবেগে উড়ে যায়, তারাও যেন তেমনি অবলীলাক্রমে বিপদ অতিক্রম করতে পারে। কেউ কেউ সিংহের মত

সাহসী হবার আশায় সিংহের থাবা ধারণ করে। মেষের সকৃথি, লোহার আংটি, এ গুলিও ধারণ করা হয়—অপদেবতার দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে।

খাদ্যের বিষয়ও এইরূপই। Dyallsরা ভীরু হয়ে পড়বার ভয়ে হরিণীর মাংস খায় না। Paraguay Abipones মুরগী, ডিম, মেষ, মাছ, কাছিম,—কখনও খায় না। তাদের বিশ্বাস ও সব লঘু খাদ্যে শরীর দুর্ব্বল হয়, মনে জাড্য ও ক্লৈব্য আসে। কিন্তু বাঘের, (চিতাবাঘের) ষাঁড়ের, পুংহরিণের ও শূকর প্রভৃতির মাংস তারা সাগ্রহে খায়, কারণ ও-গুলিতে নাকি বল বীর্য্য বৃদ্ধি পায়।

সংক্রামক ম্যাজিকে এই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ যে কত অমানুষিক, বর্ব্বর আচারের সৃষ্টি হয়েছে তার আর লেখা-যোখা নাই। Torres straitsএ বিখ্যাত যোদ্ধা বা বীরদের ঘামের জল সাদরে পীত হয়ে থাকে। খাদ্যের সঙ্গে বিজয়ী বীরের রক্তমাখা নখের টুকরোগুলি মিশিয়ে খাওয়া হয়—পাষাণের মতই কঠিন ও নির্ভীক হতে পারবে বলে। সদ্যোহত শত্রুর চোখ দুটি ও জিভ্ ছিঁড়ে নিয়ে কিশোরদের খেতে দেওয়া হয়—তাদের সাহস বৃদ্ধি পাবে। অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা বলে যে মানুষের মেদের সঙ্গে তার বলবীর্য্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কোনও মৃত ব্যক্তির মেদ খেতে তারা মোটেই দ্বিধা বোধ করে না—সেই ব্যক্তির সাহস ও ক্ষমতা পাবে এই তাদের বিশ্বাস। শীকারের সময়ও নাকি নরমেদ খুব শুভ। যে বর্শাফলকে মানুষের চর্ব্বি মাখান থাকে সে বর্শা কখনও লক্ষ্যচ্যুত হয় না, যে গদায় চর্ব্বি মাখান হয় কেউ তার আঘাত প্রতিরোধ করতে পারে না। তারা অতি যত্নে নরমেদ সংগ্রহ করে। অভিচার ব্যাপারে নরমেদ অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। যার মেদ তার প্রেতাত্মা এসে অভিচারীর সাহায্য করে যায়।

নিকট আত্মীয় অথবা প্রিয়জনের মধ্যেও যে একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে এ কথা সকলেই স্বীকার করে। Dyall গ্রামে কেউ শীকারে গেলে তার আত্মীয় স্বজন তার অনুপস্থিতিকালে জল বা তেল স্পর্শ করে না—হয়ত শীকারীর হাত নরম হয়ে যাবে, শীকার পালাবে, সেই ভয়ে। Borneoতে পুরুষরা যুদ্ধে গেলে কুটীরে তাদের মা বোন্ আগুন জেলে শয্যা পেতে রাখে। যেন যোদ্ধারা শ্রান্ত, ক্লান্ত না হয়ে পড়ে। অতি প্রত্যুষে কুটীরের চাল খুলে দেওয়া হয় যেন তারা বেশীক্ষণ ঘুমিয়ে না থাকে, শত্রু অতর্কিতে ঘুমন্ত অবস্থায় না আক্রমণ করে। Dyall যুদ্ধে বা বিদেশে কোথাও গেলে তার পত্নী বা ভগ্নী সব সময়ে কটিদেশে একটি তরোয়াল ঝুলিয়ে রাখে—যেন স্বামী বা ভ্রাতা সর্ব্বদা সশস্ত্র থাকে, শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হয়। East Indian Archipelego ও South Americaয় এমন বিশ্বাসও প্রচলিত আছে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই পিতাকে শয্যা গ্রহণ করতে হবে—লঘু পথ্যে থাকতে হবে—নচেৎ নবজাত শিশুর শরীর খারাপ হতে পারে। এই প্রথার নাম Convade। বোর্ণিওতে গর্ভিণীর স্বামী তার সন্তান প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি নিয়ে কোনও কাজ করে না, লতা দিয়ে কোনও জিনিষ বাঁধে না, জীব হত্যা করে না, বন্দুকও ছোঁড়ে না,—গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতি হবে বলে।

হোমিওপ্যাথিক্ ম্যাজিক্

(Homoeopathic Magic)

আদিম মানব কার্য্য আর কারণের প্রভেদটা ঠিক বুঝতে পারে না। কোনও কিছু নকল করলে যেন সত্যি সেই রকমই ফল পাবে এই তার বিশ্বাস। Mimetic, Symbolic, রূপক বা হোমিওপ্যাথিক্ ম্যাজিকের মূলে—আকারসাদৃশ্য থাকলে ফল সাদৃশ্য হবে, এই মনোভাবই দেখতে পাওয়া যায়।

Euphrasia চক্ষু রোগের মহৌষধ কারণ তার পাতায় গোল একটা কালো দাগ আছে, দেখতে অনেকটা চোখের তারার মত। হলুদ বা জাফরানে পাণ্ডুরোগ (ন্যাবা) সারে কারণ দুটোই দেখতে হলদে।

Torres Straits এ Murray Islands এ যাদুবলে বৃষ্টি আনা হয়। 'সট্‌কর্ম্মী' মাটিতে একটা গর্ত্ত করে, পাতা দিয়ে সেটা ঢেকে তার মধ্যে একটা নরমূর্ত্তি তেল মাখিয়ে সুগন্ধি ঘাস দিয়ে ঘষে রেখে দেয়। তারপর নানারকম গাছ পালা জলে ফুটিয়ে সেই জলটা ঢেলে দেয় মূর্ত্তিটার ওপরে। যে দিক থেকে বৃষ্টি আসা দরকার, গর্ত্তের মধ্যে মূর্ত্তিটার মুখ করে দেয় সেইদিকে। তারপর সেটা মাটি চাপা দিয়ে শামুক

ও রং বেরঙের কড়ি জড়ো করে দেয় তার ওপর—আর খুব মৃদু ঘুমপাড়ানী সুরে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র-পড়া ত চলেই। চারটে বড় বড় নারিকেলের পাতার তৈরী পর্দ্দা কবরটার চারিপাশে ঘিরে দেওয়া হয়; এরাই হল চারিধারে মেঘের প্রতীক। পর্দ্দাগুলোর ওপরে লম্বা এক একটা কালো কাপড় বেঁধে দেওয়া হয়—বাজভরা মেঘ। নারিকেলের পাতা নিচের দিকে মুখ করে চারিধারে ঝুলিয়ে রাখে—বৃষ্টি পড়ছে তাই বোঝাবার জন্য। একটা মশাল জেলে কবরটার ওপরে সেটা ধরে ঘোরান হয়। ধুঁয়ো গুলোর মানে মেঘ, আলোর চক্‌মকি মানে বিদ্যুতের ঝিলিক্ আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশে বাঁশে ঠুকে ফটাফট্ আওয়াজ যেন বজ্রের হুঙ্কার।

এমনি করে বৃষ্টি ডাকা, এ কিন্তু সবাই পারে না। কোনও একটা বিশেষ পরিবারের লোকেরাই এ কাজ করে থাকে। আবার তার মধ্যে কারও কারও হাতযশ অন্যের চেয়ে ঢের বেশী।

কারও বৃষ্টির দরকার হলে সে "বৃষ্টি-কারকে"র কাছে গিয়ে বলে, "বৃষ্টি চাই।" অভিচারী হয়ত বলেন, "আমার ঘরে চালের ওপর ভাল করে খড় চাপা দিয়ে দাও।"—বৃষ্টিতে ভেজে না যেন।

যে বৃষ্টি ডাকে তার বুকে সাদা আর পিঠে কালো রং মাখান হয়—মেঘ যেমন পিছন দিকে ঘন কালো আর সামনে সাদা। কখনও কখনও বা সারা গায়ে ছিটে ফোঁটা কাটা হয়—খুব জোরে জল পড়ছে, তাই দেখাতে। ডান হাতে 'মন্ত্রৌষধ'—বার বার হাত নেড়ে মৃদুস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করে। জল থামাতে হলে মাথায় লাল রং আর সারা গায়ে লাল মাটি মেখে আসাই বিধান—খুব কড়া রোদ করে সূর্য্য উঠবে বলে। তারপর অভিচারী জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়েন, তিনটে মাদুর দিয়ে ভালো করে ঘিরে দেওয়া হয় তাঁকে, যেন একটুও বাতাস না লাগে। সবশেষে কয়েকটা পাতা সমুদ্রের জলের ধারে জোয়ারের সময় পুড়িয়ে দিলেই ছুটী। পাতা পোড়া ধুঁয়ো যেমন ধীরে ধীরে হাল্কা হয়ে মিলিয়ে যায়, মেঘগুলোও উড়ে যাবে তেমনি, সমুদ্রের জল এসে ছাইএর রাশি ভাসিয়ে নিয়ে গেলেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

Muralag দ্বীপে লম্বা একটা সুতোর ডগায় একটা চাক্‌তি বেঁধে খুব জোরে ঘুরিয়ে যাদুকর বাতাস জাগিয়ে তোলে। আরও জোর বাতাস দরকার হলে গাছের ওপড়ে চড়ে চাক্‌তিটা ঘুরোন হয়। চাক্‌তিটার ভন্ ভন্ শব্দ যেন জোর বাতাসের স্বন্‌স্বনানি।

Thiiringenএ flax বুন্‌বার সময় গলা থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড একটা থলে ঝুলিয়ে তারই মধ্যে বীজ পুরে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলা হয়। তালে তালে থলেটা দুলতে থাকে, চাষী ভাবে বাতাসে তার পরিপুষ্ট flaxএর মাথা-গুলো তেমনি দুলবে। সুমাত্রায় মেয়েরা ধান বুন্‌বার সময় মাথার চুল এলিয়ে রাখে—ধান যেন এলো চুলের মতই বড় হয়। জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়াতে চাষী মাঠে গিয়ে খুব জোরে লাফায়। Flax ও hemp না কি খুব বড় হবে বলে। Bavariaতে গম বুনবার সময় অনেকে সোনার আংটি পরে থাকে—গমে যেন সোনার মতই রং ধরে।

মাছ ধরতে যাবার সময় নানারকম মাছ ও কাছিমের প্রতিমূর্ত্তি সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার বিধান আছে।—সত্যি মাছ নকল মাছ দেখে আপনি কাছে এসে ধরা দেবে।

পাতলা কাঠ কেটে কোনও লোকের প্রতিমূর্ত্তি তৈরী করে মূর্ত্তিটাকে মোম মাখিয়ে দিয়ে সেটাকে সেই লোকের নাম ধরে ডাকা হয়। তারপর মূর্ত্তিটার হাত পা ভেঙ্গে দিলে সেই লোকটারও হাত ও পায়ে বিষম বেদনা ও ক্ষত হয়—অসহ্য যন্ত্রণায় শেষে সে প্রাণত্যাগ করে। ভাঙ্গা পা মূর্ত্তিটাকে আবার জুড়ে দিলে লোকটাও ভালো হয়ে ওঠে। মাছের বিষাক্ত বা তীক্ষ্ণ কাঁটা দিয়ে মূর্ত্তিটার যেখানে বিঁধে দেওয়া হয়, মাছ ধরবার সময় সেইখানেই মাছে এসে লোকটাকে কাঁটা মারে।

ইংলণ্ডে Corp creagh বলে যে অভিচার প্রচলিত, তাও এইরকমই। কোনও লোকের একটা কাদার প্রতিমূর্ত্তি করে সারা গায়ে কাঁটা বা পেরেক বিঁধে নদী বা নালার জলে সেটা ফেলে দিলেই, যে লোকটার মূর্ত্তি, তার অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে জলে মাটির মূর্ত্তি গলে যায়, লোকটাও ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ে। যদি মাঝে মাঝে সেই মূর্ত্তি-টাতে আরও কতকগুলো কাঁটা ফুটিয়ে দেওয়া হয়, লোকটার যন্ত্রণা আরও বেশী হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি কেউ সেই মূর্ত্তি

corpটা হঠাৎ দেখে ফেলে তা হলেই যাদু ভেঙ্গে যায়—ধীরে ধীরে লোকটা ভাল হয়ে ওঠে।

যদি শত্রুকে খুব কষ্ট দিয়ে ধীরে ধীরে তার প্রাণনাশ করবার ইচ্ছা থাকে তা হলে মূর্ত্তিটাতে অতি সাবধানে কাঁটা বিঁধতে হবে, যেন হৃৎপিণ্ডের জায়গায় কাঁটা না ফোটে, কারণ তা হলে শীঘ্র মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মারতে হলে হৃৎপিণ্ডের ওপরেই খুব ঘন করে কাঁটা ফোটান উচিত। কখনও কখনও মোমের মূর্ত্তি তৈরী করে সেটা ধীরে ধীরে আগুনের তাপে গলান বা একবারে দাউ দাউ করে পুড়িয়ে দেওয়াও হয়।

কতকগুলো ক্রিয়াকর্ম্ম সংক্রামক বা হোমিওপ্যাথিক্ কোনও ম্যাজিক বিভাগেই ফেলা চলে না। সেগুলো খানিকটা সংক্রামক, খানিকটা হোমিও-প্যাথিক্, খানিকটা বা আরও কিছু। যেমন :—

কবচ ও যন্ত্রাদি, মন্ত্রোচ্চারণ বা মন্ত্রস্মরণ, রত্নাদি ধারণ, ব্যক্তিগত বা সাধারণী ক্রিয়া কর্ম্মাদি। সেগুলির কথা পরে আলোচ্য।

নাম বা শব্দের অদ্ভুত ক্ষমতা

কোনও লোকের শরীরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বস্তু পেলে যেমন তার ওপর অভিচার করা চলে, তেমনি সময়ে সময়ে শুধু তার নামের সাহায্যেই তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারা যায়। কারণ নাম আমাদের শরীরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট।

Irelandএর কোনও কোনও প্রদেশে ও Torres Straits এ কেউ সহজে অপরিচিতকে নিজের নাম বলতে চায় না। অন্য কেউ বলে দিলে কোনও আপত্তি নাই; নিজে নিজের নাম বললে যাকে নাম বলা হয় সে ইচ্ছা করলেই সেই নামের সাহায্যে ক্ষতি করতে পারে-এই তাদের বিশ্বাস।

Americaর অধিকাংশ প্রদেশেই 'ব্যক্তি গত' আত্মা (Personal Soul) বিষয়ে একটা দৃঢ় বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। এই আত্মাকে ঠিক জীবনী শক্তি বা মনের ক্ষমতা কিছুই বলা চলে না। এ যেন দুই-এর মাঝামাঝি তৃতীয় কোন ও একটা জিনিষ astral body; এর সঙ্গে সেই ব্যক্তির নামের একটা বিচিত্র যোগাযোগ আছে। নামের সাহায্যে বা নাম নিয়ে কোনও রকম ক্রিয়াকর্ম্ম করে 'ষটকর্ম্মী' আত্মার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।

মানুষই যে শুধু নিজের নামের বিষয়ে এমনি সচেতন, তা নয়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে পরীরাও না কি নাম ধরে ডাকা পছন্দ করে না। তাদের কথা বলতে হলে, বলতে হবে 'wee folk' 'ক্ষুদে মানুষ', good people—'ভালো মানুষ', ইত্যাদি।

স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের জেলেদের মধ্যে এমন বিশ্বাসও দেখা যায় যে Salmon মাছ বা শুয়োরকে নাম ধরে ডাকা অন্যায়। তাদের বলতে হবে 'লাল মাছ, red fish', 'আজব জীব', 'Queer fellow'.

নামের সাহায্যে যদি মানুষকে বশ করা যায় তা হলে পরী ও অপদেবতাদেরও যে বশ করা যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? Torres Straitsএর অধিবাসীরা বলে যে নাম ধরে ডেকে সেই গ্রামের ভূত বা পেত্নীর ছানাকে বশ করা যায়। Dr Frazer তাঁর Golden Bough বইখানিতে বলেছেন যে দেবতারাও নিজেদের নাম খুব সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখেন, মানুষ যেন নাম ধরে ডেকে তাঁদের বশ না করে ফেলে। ইজিপ্টের সূর্য্যদেব 'রা' 'Ra' শাস্ত্রে বলে গিয়েছেন যে তার মা-বাবার দেওয়া নামটি তিনি লুকিয়ে রেখেছেন শরীরের মধ্যে, যেন কোনও যাদুকর তাঁকে বশীভূত করে না ফেলে।

দেবতার নাম উচ্চারণ করলে মানুষও অলোকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। তার পক্ষে তখন অসাধ্য সাধনও সহজ হয়ে ওঠে। অনেক সময় কাগজে বা গাছের পাতায় দেবতার নাম লিখে ছোট ছোট ছেলেদের জামা কাপড়ে এঁটে দেওয়া হয়—যেন কোনও অপদেবতার দৃষ্টি না লাগে। লণ্ডনের পূর্ব্ব সহরতলীতে এখনও ছেলে ভূমিষ্ট হবার ঘরে ধর্ম্মগ্রন্থের বাণী ও দেবতাদের নাম ছাপিয়ে এঁটে দেওয়া হয়। ছেলে হলে আট দিন আর মেয়ে হলে কুড়ি দিন সেই কাগজ রাখা নিয়ম।

বিশেষ বিশেষ শব্দের উচ্চারণে নানাবিধ কাজ সিদ্ধি হয়ে থাকে। E. Clodd 'তাঁর An Essay on Savage Philosophy in Folktale বইটিতে বলেন যে বিশেষ শব্দ উচ্চারণে যে ফল লাভ হয়ে থাকে তা এইরূপ—

১। সৃষ্টিকারী শব্দ—Creative words.

২। মন্ত্র ও তৎসদৃশ শব্দ—Mantrams and their kin.

৩। বিপদ্ নিবারক শব্দ—Pass-words.

৪। মৃতের প্রেতাত্মাকে জাগাবার জন্য, ভূত ছাড়াবার জন্য বা অভিচার ক্রিয়া শান্তির জন্য মন্ত্র ইত্যাদি—

৫। আরোগ্যকারী কবচ ও মন্ত্র—Curative charms in formulae or magic words. অবশ্য এগুলি পরস্পর এতই সংশ্লিষ্ট যে এদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করা দুঃসাধ্য।

পূর্ব্বে Irelandএ মন্ত্রোচ্চারণ যত কার্য্যকরী বলে গণিত হত এমন আর অন্য কোনও দেশে হত কি না সন্দেহ। যাদুকর এক পায়ে দাঁড়িয়ে, এক হাত বাড়িয়ে, একটা চোখ বন্ধ করে, সজোরে মন্ত্র উচ্চারণ করত। শ্লেষমূলক বাক্যই (Satire) ছিল তাদের একমাত্র অস্ত্র। সেই Satireএর বলে মাঠে শস্য নষ্ট হত, দুগ্ধবতী গরুর দুধ শুকিয়ে যেত, শত্রুর মুখের ওপর বিষফোড়া জন্মাত। প্রবাদ আছে যে একদিন ইঁদুরে এমনি এক যাদুকরের খাবার খেয়ে গিয়েছিল। ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে যেই তিনি উচ্চারণ করলেন, "ইঁদুর ইঁদুর তীক্ষ্ণ দন্ত, যুদ্ধ করিতে নারে—Rats, though sharp their snouts, are not powerful in battle"—সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই দশটা ইঁদুর মরে গেল।

Shakespeare প্রভৃতি অন্যান্য ইংলণ্ডবাসী লেখকও বিশ্বাস করতেন যে Irelandএর লোকেরা ছড়া কেটে ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণী বধ করতে পারে।

Irelandএ geis (geas) জেস্ বা গাস্ নাম নিয়ে কোনও কাজ করতে বলা হলে সে আদেশ অমান্য করা অসাধ্য ছিল। নিতান্ত অন্যায় না হলে সে কাজ করতে হতই। এমন কি পূর্ব্বে এমন ধারণাও প্রচলিত ছিল যে, ন্যায় বা অন্যায়, যাই হোক না কেন, geas নাম নিয়ে যে কাজ করতে বলা হবে, সে কাজ করতে হবেই—নইলে বিষম অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। প্রবাদ আছে যে একটি মেয়ে তার প্রেমাস্পদকে geas দিয়ে বলেছিল যে তার সঙ্গে দেশ ছেড়ে তাকে পালাতে হবে। নায়কের বন্ধুরা উপদেশ দিলেন যে অন্যায় হলেও তাকে সে উপদেশ পালন করতে হবেই কারণ geas অমান্য করা মানুষের অসাধ্য। (Grania ও Diarmuidএর কাহিণী দ্রষ্টব্য)

অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য বর্ব্বর সমাজে যে প্রথাগুলি একেবারে নিষিদ্ধ তাকে Tabu ট্যাবু নামে অভিহিত করা হয়। কতকগুলো Tabuর মানে আমাদের বোধগম্য কিন্তু এমন অনেক ট্যাবু আছে যার মানে বা সার্থকতা আমরা একেবারেই বুঝতে পারি না।

কবচ ও স্পর্শমণি

এ-পর্য্যন্ত আমরা যে ম্যাজিক্ নিয়ে আলোচনা করেছি, তাতে মানুষ কোনও বিশেষ উপায়ে মানুষের ওজর প্রভাব বিস্তার করে—তাই লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু আরো এক রকম ম্যাজিক্ দেখা যায়, যেখানে মানুষের কর্ত্তৃত্বের কোনও প্রয়োজন হয় না, দ্রব্যগুণেই সে কাজ হয়ে থাকে। মন্ত্রপূত দ্রব্যাদি, কবচ, স্পর্শমণি প্রভৃতি সবই এই জাতীয়।

সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য যে রত্নাদি ধারণ করা হয় তাকে স্পর্শমণি বা Talisman বলে ও আপদ্-বিপদ্ নিবারণের জন্য যে কবচাদি ধারণ করা হয় তাকে amulet বলে।

প্রায় সব পাথরেরই কোনও না কোনও ক্ষমতা আছে বলে লোকের বিশ্বাস। কতকগুলো পাথর সৌভাগ্যসূচক বলে লোকে সাদরে ধারণ করে, আবার কতকগুলো কারও কারও কিছুতেই সহ্য হয় না বলে একেবারে বর্জ্জনীয়।

Carnelian প্রভৃতি চর্ম্মরোগের Garnet অতি উৎকৃষ্ট কবচ। গ্রীস ও ইজিপ্টে পুরাকালে Amethyst পাথর মাতলামির কবচ বলে পরিগণিত হ'ত। Amethyst পাথরের সঙ্গে মেষ রাশির সম্বন্ধ আছে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। মেষ বা ছাগল দ্রাক্ষার শত্রু; অর্থাৎ আঙ্গুর দেখলেই খেয়ে ফেলে। অতএব Amethyst পাথরও দ্রাক্ষাজাত সুরার শত্রু হবেই।

Amber পাথরের মালা চক্ষুরোগের মহৌষধ। Amber পাথরের ভিতর দিয়ে তাকালে চোখের শক্তি বৃদ্ধি পায় বলে শোনা যায়।

কোনও কোনও ধাতুরও এমনি দৈবশক্তি আছে। Antimony ধাতু সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে। সোনা সব দেশেই ভাগ্যবৃদ্ধিকারক বলে গণিত হয়।

বিভিন্ন রং-এরও অলৌকিক ক্ষমতা আছে। বর্ব্বর সমাজে লাল রং অপদেবতা বা ডাইনীর দৃষ্টি থেকে রক্ষা করে বলে সাধারণের বিশ্বাস। সেইজন্য চুনী অতি আদরের সামগ্রী। প্রায় সব দেশেই লোকে Turquoise ধারণ করে কারণ নীল রংও খুব শুভ। গাধা বা উটের গলায় নীল পাথরের বা নীল কড়ির মালা গেঁথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

কাছিমের চোয়াল ধারণে দাঁতের বেদনা সারে। কাছিমের দাঁত নাই অতএব তার দাঁতের বেদনা হতেই পারে না। সুতরাং তার চোয়াল ধারণে দন্তশূল সারবে তা'তে আর আশ্চর্য্য কি?

সাপের শিরদাঁড়া কোমরে ধারণ করলে পিঠের বেদনা ভালো হয় বলে শোনা যায়।

আফ্রিকায় কবচ ধারণের প্রথা ভারী বিচিত্র।

বাঘ সিংহ প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল বনপথে যাবার সময় সে দেশের অধিবাসীরা সিংহ ও বাঘের নখ, দাঁত, ঠোঁট বা শ্মশ্রু গলায় ধারণ করে—হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে বলে। হাতী শিকারে যাবার সময় হাতীর শুঁড়ের ডগাটুকু ধারণ করাও নিয়ম।

'নজর লাগা' যে শুধু বহুদিনের পুরাণ বিশ্বাস, তা নয়—সব দেশেই সাধারণের মনে এই বিশ্বাস খুব দৃঢ়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও মেয়েমানুষেরই 'নজর লেগে' বেশী ক্ষতি হয় বলে শোনা যায়।

ডান্ বা ডাইনের ভয় সব দেশেই আছে। ইটালীতে নেপ্লসে পথে ঘাটে হঠাৎ Jettatore শব্দ শোনা গেলেই বুঝতে হবে যে সেইপথে ডাইন্ আসছে। দেখতে দেখতে রাজপথ একেবারে নির্জ্জন হয়ে পড়ে। যে যেদিকে পারে ডাইনের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে চায়।

ডাইন্ গৃহপালিত জন্তুদেরও ক্ষতি করে থাকে। গরু শুয়োর প্রায় 'নজর লেগে' মারা যায়। তুর্কী বা আরব দেশে ঘোড়ার অসুখ করলেই বুঝতে হবে যে কেউ 'নজর' দিয়েছে।

এই কু-দৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ইজিপ্টে 'ওসিরিসের চোখ' 'Eye of Osiris' ধারণ করা হত। চোখ-রূপী কবচ ধারণ করলে চোখের 'নজর' থেকে বাঁচতে পারা যাবে—এই বিশ্বাসেই এই জাতীয় কবচের উৎপত্তি। Syria ও Cairoতে আজও চোখের আকারের কাঁচের মালা পথে পথে বিক্রী হয়; কাপড়ে বা ঘোড়ার সাজে চোখের ছবি এঁকে Moor গণ পশুদের জীবন রক্ষা করে।

Plutarch বলেন যে ডাইন্ বা যাদুকরের কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য যে মূর্ত্তি বা পুতুলের সৃষ্টি হয়, সেগুলো প্রায়শঃ কুৎসিত ও কিম্ভূতকিমাকার। কারণ ঐ কিম্ভূত, বিকলাঙ্গ মূর্ত্তিগুলোতেই ডাইন্ বা যাদুকরের প্রথম দৃষ্টিপাত হয়ে থাকে, অন্য লোক বেঁচে যায়।

প্রাচীন রোমে ও অন্যান্য দেশেও পূর্ব্বে সেইজন্য নানা রকমের কিম্ভূত ও অশ্লীল মূর্ত্তি গড়া হত। কু-দৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে লোকে যে সর্ব্বদা সচেষ্ট—দেশ বিদেশের প্রথাপদ্ধতি দেখে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

চাঁদের কলা, শিং, মাছ, সাপ, বাঘের দাঁত, চাবি, কুঁজো লোক, প্রবাল, কড়ি প্রভৃতি প্রায় সব জাতির মধ্যেই কবচ রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

সাধারণী ও ব্যক্তিগত ম্যাজিক্

ম্যাজিক্‌কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সাধারণী বা ব্যক্তিগত। সাধারণের জন্য বা বিশেষ একটি সমাজের মঙ্গলের জন্য যে কাজ করা হয় তা সাধরণী ম্যাজিক্, আর কোনও ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে কাজ করা হয় তাকে ব্যক্তিগত ম্যাজিক্—Public and Pirvate magic বলা যেতে পারে।

Australiaয় Emu সমাজের, (Emu totem), অর্থাৎ যে সমাজে 'এমু' পাখীকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলে মানা হয়, একটা প্রথা লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। সর্দ্দার ও আরো কয়েকজন অনুচর হাতের শিরা কেটে খানিকটা জায়গা রক্তে ভিজিয়ে দেয়। মাটিতে রক্ত শুকিয়ে জমে গেলে তারই ওপরে সাদা হলদে লাল আর কালো রং দিয়ে 'এমু' চিহ্ন (Emu totem) এঁকে দেওয়া হয়।

দু' জায়গায় হলদে রং ছড়িয়ে Emuর মেদের (তাদের প্রিয় খাদ্য) প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়। গোল গোল দাগ এঁকে Emuর ডিম—কোনওটা ফুটব-ফুটব, কোনওটা ফুটেছে—বোঝান হয়। নানা রকম রেখা এঁকে Emuর নাড়ী

ভুঁড়ি চিত্রিত করা হয়ে থাকে। দুটো কাঠের তক্তা এনে ছবিটার পাশে রেখে দিয়ে অতি চাপা স্বরে মন্ত্র পড়া চলতে থাকে। সর্দ্দার ছবির মানে সকলকে বুঝিয়ে দেন। তিনটে লোক মাথায় Emuর মাথার মতন রং করা টুপি পরে হেলে দুলে এগিয়ে আসে—Emuর চলার নকল করে। এমনি করে পূজো ও নাচ হয়ে গেলে সকলে পান-ভোজন করে। এতে নাকি তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা Emu পাখীর বংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

অসভ্যদের মধ্যে এমনি নানা totem পূজা প্রচলিত আছে। সব পূজারই উদ্দেশ্য সেই বিশেষ totemএর বংশ বৃদ্ধি করা। আপন আপন totem আবার তাদের খুব প্রিয় খাদ্য, কাজেই এই totem পূজার উদ্দেশ্য খাদ্য বৃদ্ধি করা—এ কথাও বলা চলতে পারে।

Dr. Frazer Golden Bough বইখানিতে বলেছেন যে অসভ্যদের মধ্যে সাধারণী বা সমাজহিতকরী ম্যাজিকের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ধান বপন করবার সময় উত্তর অ্যামেরিকার Musquakie মেয়েরা দল বেঁধে নাচে; নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে; তিনি যেন প্রচুর খাদ্য দিয়ে ও শত্রু নাশ করে তাদের মঙ্গল বিধান করেন।

কখনও কখনও ভালো উদ্দেশে, কিন্তু বেশীর ভাগই অসদুদ্দেশে ব্যক্তিগত ম্যাজিকের শরণ নেওয়া হয়। অসুখ বা বেদনার প্রতিকারের জন্য নানারকম ম্যাজিকের কথা শোনা যায়। জটুল (জড়ুল) ভালো করতে হলে কাঁচা মাংস দিয়ে সেটা ভালো করে ঘষে, মাংসটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে হয়। মাংসটা যেমন শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়, জড়ুলটাও সেরে যায় তেমনি। মাংসটা কিন্তু চুরী করে পেলে ভালো হয়—তাতে ফল হয় বেশী।

এক যাদুকর তার রোগিনীর দাঁতের বেদনা সারিয়ে দিল অদ্ভুত উপায়ে! রোগিনীর রান্নাঘরের চৌকাঠে একটা পেরেক ঠুকে দিয়ে যাদুকর বললে যে দাঁতের বেদনা আর হবে না। যদি কখনও আবার হয়, বুঝতে হবে যে পেরেকটা ঢিল হয়ে গিয়েছে। আবার ঘা কয়েক দিয়ে মজবুত করে দিলেই বেদনা সেরে যাবে। তারপর থেকে কিন্তু আর তার দন্তশূল হয়নি।

প্রেমের ওষুধ বা বশীকরণ করবার উপায় যে কতরকম আছে তার আর ইয়ত্তা নাই। বিশেষ বিশেষ সুগন্ধি ব্যবহার করলে নারী বা পুরুষ আকৃষ্ট হয়, বিশেষ কবচ ধারণে অভিমানী বা রুষ্ট প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হয়, বিশেষ শেকড় চিবিয়ে তার রস পান করতে করতে দেখাতে পারলে তার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেই মেয়েকে পাওয়া যায়, বিশেষ কাজল চোখে দিয়ে যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় সেই অনুরাগী হয়ে পড়ে।

অমানুষিক বা পৈশাচিক ম্যাজিকের কথা আগেও বলা হয়েছে। আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রবন্ধ শেষ করব। উত্তর অষ্ট্রেলিয়ায় ম্যাজিক 'গান' করা হয়। কতকগুলো লোক একটা হাড়ের টুকরো নিয়ে 'গান' করে সেটা মন্ত্রপূত করে দেয়। তারপর চুপি চুপি সেই হাড়টা শত্রুর শিবিরে নিয়ে গিয়ে তার দিকে লক্ষ্য করে দেখালেই হাড় থেকে মন্ত্রটা শত্রুর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে; কিছুদিনের মধ্যেই সে প্রাণ-ত্যাগ করে। আবার এমনি হাড় মন্ত্রপূত করে লোককে ভালো করাও চলে।

কিন্তু ভালো করার উদ্দেশে ম্যাজিক্ বা অভিচার প্রায়ই করা হয় না। প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যখন কোনও ক্ষমতাই খাটে না তখন ম্যাজিক্ দিয়ে অবৈধ উপায়ে তার সর্ব্বনাশ করবার জন্য অথবা দুষ্প্রাপ্য কোনও জিনিষ সহজে হস্তগত করবার জন্যই ম্যাজিক্ বা অভিচারের সৃষ্টি।

ম্যাজিসিয়ান বা অভিচারী

অভিচার বা ম্যাজিক্ করাই যাদের পেশা, লোকে তাদের নানা রকম নাম দিয়েছে—Medicine men, ঔষধ পণ্ডিত; Magician, যাদুকর; Sorcerer, ষট্কর্ম্মী; Wizard, ডান; Witches, ডাইনী...ইত্যাদি।

মুখে মুখেই তারা নিজের ছেলে মেয়ে অথবা অন্য শিষ্য শিষ্যাকে মন্ত্র-তন্ত্র শিখিয়ে থাকে। এই অদ্ভুত অলৌকিক ক্ষমতা কখনও কখনও বা আপনা আপনি পাওয়া যায়, যেমন ইউরোপে বিশ্বাস যে সপ্তম ছেলের সপ্তম ছেলে জন্মালে (seventh son of a seventh son) সে অতি অলৌকিক ক্ষমতাশালী হয়। কিন্তু বেশীর ভাগই বহু চেষ্টা ও

সাধনা করে এই ক্ষমতা লাভ করতে হয়। অনেক দেশে ডান বা ডাইনীরা দল বেঁধে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে—আবার কোথাও কোথাও বা পরস্পরের কাছ থেকে নিজের বিদ্যা লুকিয়ে রেখে অতি গোপনে তারা আপন আপন কাজ করে যায়।

ম্যাজিকের মনস্তত্ত্ব

মানসিক ইঙ্গিত বা Suggestionই বোধ হয় ম্যাজিকের প্রধান সহায়। তাঁর সঙ্গে Hypnotism বা সম্মোহনের যোগ হলেত কথাই নাই। হিপ্‌নোটিস্ম দ্বারা যে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি ভালো হয়, অনেক কু-অভ্যাস ঘুচে যায় ও নানা প্রকার মানসিক অসম্ভব ব্যাপারের সৃষ্টি করা চলে, এ কথা আজকাল অনেকেই বিশ্বাস করে থাকেন। Hypnotise করে কোনও লোকের শরীরে অসুখ বা প্রবল বেদনা জন্মিয়ে দেওয়া যায়—অবশ্য আবার সেই উপায়ে অনেক বেদনা ও অসুখ সারানও চলে।

শুধু Suggestion বা মানসিক ইঙ্গিতের বলেও যে অসম্ভব সম্ভব করা হয়ে থাকে, এ কথা আধুনিক চিকিৎসক ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌ মাত্রেই স্বীকার করেন। অসভ্যদের বিশ্বাসপ্রবণতা এত বেশী, মিথ্যাকে সত্য বলে কল্পনা করতে তারা এতই নিপুণ যে সিংহের ডাকের নকলকে সত্যি সিংহের হুঙ্কার মনে করে ভয়ে মূর্চ্ছিত হওয়া তাদের পক্ষে বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নয়। শিশুদের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে অসভ্যদের মনস্তত্ত্বের ঐ বিষয়ে অপূর্ব্ব মিল দেখা যায়। উভয়েই make believe বা 'নয় কে হয়' বলে বিশ্বাস করতে পটু।

Tabuর কথা আগেও বলা হয়েছে। ট্যাবু বা নিষিদ্ধ জিনিষের ওপর অসভ্যদের একটা অহেতুকী ভয় আছে। J. Pinkertonএর বইএ তিনি একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা লিখেছেন—কঙ্গো প্রদেশে একটি নিগ্রো রাত্রি কাটাবার জন্য বন্ধুর বাড়ী অতিথি হল। বন্ধুটি বন্য মুরগী রান্না করে খেতে দিলেন, নিগ্রো জিজ্ঞেস্‌ করল যে মুরগী বন্য নয় ত, কারণ বন্য মুরগী খেতে তার ট্যাবু আছে। বন্ধু মিথ্যা করে বললেন যে মুরগী ঘরের পোষা। খাওয়া শেষ করে, রাত্রি প্রভাত হলে পথিক চলে গেল। দীর্ঘ চার বছর পরে আবার একদিন সেই বন্ধুর বাড়ীতেই সে অতিথি হল। এবার বন্ধুটি জিগেস্‌ করলেন, "বন্য মুরগী খাবে?" প্রবল আপত্তি জানিয়ে অতিথি বললে যে বন্য মুরগী তার ট্যাবু। বিদ্রূপের হাসি হেসে বন্ধুটি বললেন, "সেবার যখন খেয়েছিলে ট্যাবুর কথা মনে ছিল না—এখন আপত্তি কেন?" এই কথা শুনে নিগ্রো ভয়ে কাঁপতে লাগল। তার ভয় এতই বেশী হল—নিষেধ লঙ্ঘন করেছে জেনে—যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তার ইহলীলা শেষ।

অষ্ট্রেলিয়ান অসুস্থ ব্যক্তি কখনও সুস্থ আত্মীয়-বন্ধুর শয্যায় শয়ন করে না। W. E. Arinit তাঁর বইটিতে বলেছেন যে একটি অষ্ট্রেলিয়াবাসী তার রুগ্না স্ত্রী তারই কম্বলের ওপরে শুয়েছিল দেখে বিষম ভয় পেয়ে পনের দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে।

যদি Tabuই তাদের এই রকম ভয়ের কারণ হয় তা'হলে ডান্‌ বা যাদুকর যে শতগুণে ভীতিপ্রদ হবে, তা'তে আর আশ্চর্য্য কি।

মন্ত্রের কোনও ক্ষমতা আছে কি না সে কথা বিচার করে দেখবার ধৈর্য্য অসভ্যদের থাকে না। যাদু করা হয়েছে শুনলেই ভয়ে তারা অর্দ্ধেক মরে যায়, ইচ্ছা করেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করে—আত্মহত্যা করে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কখনও বা মানুষের পিছনে একটা দৈবী শক্তির কল্পনা করে নেওয়া হয়। যাদুকরেরা না কি তারই সাহায্য নিয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ করেন।

Melonesianদের 'মানা' (mana) এইরকম একটা দৈবী শক্তি। মানুষের অসাধ্য কাজও এই শক্তি দিয়ে সহজেই সম্পন্ন করা যায়।

পথে যেতে যেতে একটা অদ্ভুত নুড়ি দেখতে পাওয়া গেল; বুঝতে হবে ওতে mana আছে, নইলে ওর আকার অমন অদ্ভুত হবে কেন? প্রমাণ চাইতে হলে একটা গাছের গোড়ায় সেটা পুঁতে রাখতে হবে। যদি গাছে খুব ভালো ফল ধরে, তা'হলে নিশ্চয়ই নুড়িটাতে mana আছে।

বিশেষ বিশেষ কথা বা শব্দেও mana থাকে। কোনও কোনও মন্ত্র বা গানেরও নাকি mana থাকে বলে অসভ্যদের বিশ্বাস।

Mana একটা ঐশী শক্তি হলেও এর সঙ্গে একটা বিশেষ

কর্ত্তার যোগাযোগ আছে। অর্থাৎ এটা শক্তি বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই কারও শক্তি। ভূত, প্রেত, দেবতা, বা মানুষ, যারই হোক না কেন, কোনও একজনার শক্তি একটা বস্তুকে আশ্রয় করলে তাকেই mana বলা হয়।

যুদ্ধে জয়ী হলে বুঝতে হবে যে বীর নিশ্চয়ই কারও 'মানা' পেয়েছে। কবচ, বাঘের নখ, পাথর, কোনও একটা কিছু ধারণ করে সে একটা অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করেছে যার বলে এই অদ্ভুত বীরত্ব তার পক্ষে সম্ভব হল।

Fletcher বলেন যে Omahaদের মধ্যে প্রবল বিশ্বাস আছে যে বিশেষ কতকগুলি গান গেয়ে নিজের ইচ্ছা অপরের মনে সংক্রামিত করা যায়। যা'কে আজকাল আমরা Will power (ইচ্ছাশক্তি) বা টেলিপ্যাথি (মানস-ইঙ্গিত) বলি, এ অনেকটা সেই রকম।

"Wakanda"র ("সকল জিনিষের মধ্যেই যে জীবন স্রোত বয়ে চলেছে" অথবা "গুপ্ত, অলৌকিক শক্তি, যার বলে অসম্ভব সম্ভব হয়,") শরণ নিয়ে কতগুলি বিশেষ ক্রিয়া কর্ম্ম করলে বন্য পশু ও স্বয়ং প্রকৃতি মানুষকে সাহায্য করে যাকে বলে অসভ্যদের বিশ্বাস।

সাধারণতঃ ডান বা যাদুকরকে ভণ্ড ও জুয়োচোর বলেই মনে করা হয়। লোককে ধাপ্পা দেওয়া ও মানুষ ঠকানই তাদের ব্যবসা—এই সাধারণ লোকের ধারণা। কিন্তু অসভ্যদের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করলে মনে হয় যে যারা যাদুমন্ত্র করে, তারা সরল বিশ্বাসেই সে কাজ করে থাকে। সর্ব্বভূতে প্রাণ আছে (Animism) এই তাদের বিশ্বাস, এবং বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা অপর প্রাণবন্ত বস্তুর সাহায্য পাওয়া যায়, এই মনে করেই তাদের যাবতীয় ম্যাজিকের অনুষ্ঠান।

মন্ত্রবলে জড় প্রকৃতিকে বশ করবার এই প্রবৃত্তি আবার কখনও কখনও অন্য রূপ ধারণ করে। মন্ত্রোচ্চারণ তখন প্রার্থনায় রূপান্তরিত হয়। জোর করে কাউকে বশ করবার চেষ্টা না করে, শিশুর মত সরল বিশ্বাসে, সভয়ে, আদিম মানব অজানা শক্তির উদ্দেশে মাথা নত করে।

প্রায়ই কিন্তু দেখা যায় যে ডান্, ম্যাজিসিয়ান্, ষট্‌কর্ম্মী, বা যাদুকর, কেউ অসম্ভব কিছু করবার চেষ্টা করে না। বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা না থাকলে বৃষ্টি আনার যাদু করা হয় না, বাতাস উঠবার সম্ভাবনা না থাকলে বাতাস জাগাবার মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় না। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাদুর পর ঈপ্সিত কাজ হয়ে থাকে বলে তাতে আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কিছু নাই।

যাদু বিফল হলে আবার তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। হয় ক্রিয়াকর্ম্মে কোথাও কোনও খুঁৎ হয়ে গিয়েছে বুঝতে হবে, কিংবা নিশ্চয়ই সেই সময় অন্য কোনও অভিচারী বিপরীত-উদ্দেশ্যে অভিচার করছিল।

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

শরতের মেঘ

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

শুভ্র এক খণ্ড মেঘ,—অমল মরাল
ভাসে নীলসিন্ধুজলে, সুদূরের দিক্‌চক্রবাল
দিগন্তের কোলে ডাকে তারে,
সুমন্থর সন্তরণে তাই সে চলেছে অভিসারে।

পথে যেতে যেতে
দেখে নিম্নে শ্যামাঞ্চল পেতে
বসে আছে বসুন্ধরা উর্দ্ধমুখে চাহি তার পানে
আকুল নয়ানে।

বিদূরগ সে বিহগ জলভরে সহসা অচল
হল দীর্ঘযাত্রা পথে। হ'ল সে যে মেদুরশ্যামল
শ্যামলীর প্রেমে
এল নেমে
আকস্মিক্ পুলক আসারে,
বসুধারে
বাঁধিল সে বারি-তন্তু-জালে,
শূন্য হ'তে আপনারে পৃথ্বীপরে নিঃশেষিয়া ঢালে।

গেল গলিয়া সে
চলিতে চলিতে পথে শ্যামলীর কম্প্রবক্ষবাসে।
আমিও এমনি একদিন
সুদূরের যাত্রা লাগি মুক্তপক্ষে হলেম উড্ডীন
অন্তরীক্ষে নিঃসঙ্গ পথিক,
সহসা হেরিনু তব আঁখি অনিমিক্
প্রাণভরা মুগ্ধদৃষ্টি হানি'
বৃষ্টিভরে নিল মোরে টানি'
বক্ষে তব ওগো নিরুপমা!
শূন্যে গলে গেল মোর অলক্ষ্যের কক্ষ-পরিক্রমা।

বর্ষা মঙ্গল

শ্রীসুবোধ বসু

স্ত্রী চামেলী কহিল, দেখ, নিত্যি নিত্যি এমনতর সর্দ্দি করলে ভালো হবে না, বল্‌চি।

চায়ে চুমুক দিয়া ভারাক্রান্ত গলায় শঙ্কর কহিল, হুঁ।

'কী অদ্ভুত মানুষ,—আচ্ছা যা হোক্‌। ছেলেমানুষের মতন অসাবধান, একটু যদি খেয়াল থাকে।'

পশমী গলাবন্ধটা গলায় আরেক প্যাচ দিয়া তার ভিতর হইতে শঙ্কর জড়িত প্রতিবাদ করিল,—বাঃ রে, ইচ্ছে করে আমি সর্দ্দি করি বুঝি!

'ইচ্ছে করে নয়', কৃত্রিম তর্জ্জন করিয়া চামেলী কহিল, 'রোজ রোজ কে বিষ্টিতে ভিজে আসে, শুনি?'

'ওঃ, কিন্তু তার আমি কি করবো?'

'বেশ যা হোক্‌! আচ্ছা, দেখ,—যার এখনও ইস্কুলে পড়া উচিত ছিল, তার আবার চাকরি করতে যাওয়া কেন?' চামেলী হতাশ হইয়া উক্তি করিল, 'ছাতাটা বাড়িতে আছে কার জন্য? আচ্ছা না হয় ধরলুম ছোট ছেলেটীর মাথায় প্রথমটা তা খেলেনি,—কিন্তু আজ নিয়ে কদিন বল্লুম?'

তাও তো বটে। শঙ্করের মনে করিয়া রাখা উচিত ছিল, এবং চামেলীর উপদেশটা কাজে লাগাইলে এই বিশ্রী পশমী গলাবন্ধটার অন্তরঙ্গতা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত, এবং বারম্বার সর্দ্দি করিয়া বসার অপরাধে এমনটা কুণ্ঠিত বোধ করিতে হইত না। কিন্তু যখন মনে রাখে নাই, রাখে নাই। তা ছাড়া, কেউ এমন বলিষ্ঠ এক যুবককে ইস্কুলে প'ড়ার উপযুক্ত বলিয়া পরিহাস করিবে, তা আর প্রাণ ধরিয়া সহ্য করা যায় না।

'ছাতা?'

'হ্যাঁ গো, বাবু, ছাতা। বুঝতে পেরেছেন?'

'ছাতা দিয়ে আমার চলতো কি করে?'

'মাথায় দিয়ে। ছাতা ব্যবহারটা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়,—একটু দেখিয়ে দিলেই শিখতে পারতে।'

শঙ্কর স্বরটা অবজ্ঞার মত করিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, হ্যাঃ, মেয়েমানুষের বুদ্ধিতে চল্‌লেই হয়েছিল। স্যুটের উপর ছাতা চড়িয়ে যাব অফিসে?—কী বিশ্রী!

চামেলী ঠোঁট উল্টাইয়া একটু মুচকি হাসিল। ভারি তার হাসি পাইল কথাটায়,—কত যেন ওনার বিশ্রী-সুশ্রীর জ্ঞান। চামেলী না থাকিলে ওঁর সাজসজ্জা দেখিয়া অফিসের দরোয়ান চাপরাসীরা হয়তো আর তাকে সেলাম করা আবশ্যক মনে করিত না। কহিল, ছাতা মাথায় দিলে বিশ্রীটা হলো কোথায়, শুনি?

'স্যুট্‌ পরে মাথায় ছাতা?—দূর দূর,—ও পাড়াগাঁয়ে চলে। ধ্যেৎ, সে আমার দ্বারা কোনও জন্মেও হবে না।

শঙ্করের নিঃশেষিত পেয়ালায় আরেকটু চা ঢালিয়া দিয়া শ্লেষের ভঙ্গীতে চামেলী কহিল, তোমাদের গুরুঠাকুর সাহেবেরা বুঝি ছাতা মাথায় দেয় না?

অম্লান বদনে শঙ্কর কহিল, কোন ডিসেণ্ট লোকই স্যুটের ওপর,—ওঃ ভাবলেও হাসি পায়।

বাঁকা চোখে চাহিয়া চামেলী কহিল, সেদিন কাগজে দেখলুম বিলেতের কোন্‌ এক লর্ডের ছবি,—তিনি নাকি ইংলণ্ডে সবার চাইতে সুবেশ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁর বগলে ছিল,—ছাতা।

শঙ্কর কহিল, কাগজগুলোর আর কি,—রাতকে ওরা দিন বানিয়ে ছাড়ে। ওদের কথায় বিশ্বেস করলে আর দুনিয়ায় থাকৃতে হয় না।

'মাইরি?'

'নয় তো কি। নইলে ছাতার মত একটা বিশ্রী জিনিষ বগলে করে নেবে একজন পীয়ার,—কাণ্ড শোনো।'

'কিন্তু ছাতা বেচারীর দোষটা কি মশায়?'

'অজস্র দোষ। এমন হাস্যামাজনক একটা পদার্থ আর ত্রিভুবনে নাই। আর কিছু যদি বৃষ্টি মানে।'

'বৃষ্টি হলে ডিসেণ্ট লোকেরা তবে কি ব্যবহার করে?'

শঙ্কর তাড়াতাড়ি কহিল, কেন, বর্ষাতি,—ওয়াটারপ্রুফ কোট।

চামেলী ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, আহা, কী সুবিধাজনক পদার্থটা।

'নিশ্চয়ই তো।'

'বেশ তো, তবে সুবিধাজনক জিনিষই একটা কিনে নাও।' শ্লেষ করিয়া কহিল, 'হবে না, ছাতার পাঁচগুণ দাম,—হবেই তো।'

দারুণ একটা হাঁচির বেগ সামলাইয়া শঙ্কর কহিল, নাঃ, কিনতেই হলো একটা বর্ষাতি। টাকা বাঁচাবার জন্য ছাতাটা ইয়ুস্ করতে গেলে শর্দ্দিতেই মরতে হবে। হয় বর্ষাতি কেনা, নয় তো ভেজা,—এর মধ্যে আর তৃতীয় নেই।

বর্ষাতি একটা কেনা হইল। অথচ প্রকৃতির কি পরিহাস, সেটা কেনা হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আর এক ফোঁটা বৃষ্টিও কলিকাতা সহরে পড়ে না। কাঁধে ফেলিয়া শঙ্কর সেটাকে অফিসে টানিয়া নিয়া যায়, ও অফিস হইতে টানিয়া বাড়িতে আনিয়া হাঁফ ছাড়ে। কোটের কাঁধের দিক কুঁচকাইয়া যায়, কলার দুই দিন পরে পরেই বদ্‌লাইতে হয়, তা ছাড়া যে কাঁধের উপর বর্ষাতিটা থাকে তার অবস্থা শোচনীয় হইয়া ওঠে। কিন্তু তা বলিয়া আত্ম-সম্মানটা আর বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না,—তাই চামেলীর সমুখে শঙ্কর সেটাকে সগর্ব্বে স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া ছাতাকে বিদ্রূপ জানাইয়া অফিস যাত্রা করে।

যাত্রা তো করে। কিন্তু কোটটা কাঁধে ফেলিলেই চোখে জল আসিবার উপক্রম হয়। ভাদ্রমাসের গরমের মধ্যে একটা ম্যাকিণ্টস্ বহিয়া বেড়ানো যে কী আরামের ব্যাপার, তা ভুক্তভোগীর আর জানিতে বাকী নাই। অথচ দিনের পর দিন পার হইয়া যায়, আকাশটা যদি একবার কালোও হয়।

সেদিন চামেলী কহিল, যথেষ্ট হয়েচে, এই গরমের মধ্যে আর ওটা বোয়ে নিয়ে কাজ নেই।

শঙ্কর কহিল, না না, থাক ওটা সঙ্গে। কখন বৃষ্টি নামে বলা তো যায় না।

'যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েচ,—আর দরকার নেই। বৃষ্টি তো আসবেই না, শুধু শুধু বোঝা বওয়া সার হবে। আর কী যে হাল্কা জিনিষ, যেন শোলা।'

শঙ্কর কহিল, বর্ষাতিও বোঝা? আমি কি মেয়েমানুষ নাকি? ওটা সঙ্গেই থাক্। বর্ষাকাল কিছু বলা যায় না,—হঠাৎ একসময় আরম্ভ হয়ে গেল।

ট্রামে যাইতে যাইতে পূর্ব্বদিকে গভীর শ্রদ্ধাভরে চাহিয়া সেদিন শঙ্কর মনে মনে প্রার্থনা করিয়া গেল, বরুণদেব, দেখ বৃষ্টি দাও। এমন করিয়া অনাবৃষ্টি চলিতে থাকিলে চামেলীর কাছে আর সম্মান থাকে না। তা ছাড়া শুধু আমার বর্ষাতির সার্থকতাই তো আর নয়,—শস্যটস্য ভালো না হইলে গরীব লোকেদের যে বড় কষ্ট হইবে।'

অফিস হইতে ফিরিবার কালে সমস্ত আকাশ তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াও একখানি মেঘ দেখিতে পাইল না।

কিন্তু চামেলীর ব্যঙ্গটাই হইয়া উঠিয়াছে ভাবনার বিষয়। বেশ, তার কাঁধে উঠুক ঘামাচি, তার জামা কুঁচকাইয়া যাক্, সার্ট ঘামে ভিজুক,—শঙ্করের কিচ্ছু কষ্ট তাতে হয় না। অথচ, কী যে মুস্কিল। আর বোঝাটা কে বয়? শঙ্কর নিজেই তো,—তবে চামেলীর অত মাথাব্যথা কেন? মাইরি, এমন ফাজিল হইলে ভালো লাগে না, ছাই।

শঙ্কর পত্রিকার ওপর হইতে মুখ না উঠাইয়াই একটা সহর্ষ অব্যয় উচ্চারণ করিল। পাশেই ছিল চামেলী। কহিল ব্যাপার কি?

শঙ্কর থতমত খাইয়া গেল,—'তোমার গিয়ে ইয়ে—' কি বলিবে? মোহনবাগান জিতিয়াছে, না নাইরোবিতে ভারত-বাসীদের রাস্তার পাশে থুথু ফেলিতে অধিকার দান করিয়াছে, না ঝিলিমপুরের জমিদার বহু অর্থব্যয়ে বিড়ালের বিয়ে দিলেন, না হনলুলুতে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে? কিন্তু প্রশ্নটা হইয়াছিল অত্যন্ত অকস্মাৎ, তার জন্য আটঘাট তখনও বাঁধা হয় নাই। তাই সত্য কারণটাই জিহ্বা দিয়া ছিটকাইয়া পড়িল। কহিল, আব্‌হাওয়ার অফিসের সংবাদ, চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর থেকে ঝড় আর মেঘ এদিকে যাত্রা করেছে, আজ কলকাতায় বৃষ্টি না হয়ে যায়না। যাক্, হয়তো এদ্দিন পরে আমার,—তোমার গিয়ে, সহরটা একটু ঠাণ্ডা হবে।

চামেলী কহিল, আবহাওয়া অফিসের সংবাদ? তবে আর ঠিক না হয়ে যায় না। ইন্দ্রদেবের স্পেশাল কেবল।

শঙ্কর কহিল, বিজ্ঞানকেও তোমার ঠাট্টা। নাঃ, আর পারলুম না।

অফিসে যাইবার সময় সেদিন শঙ্কর বর্ষাতিটা বেশ উৎসাহের সঙ্গে উঠাইয়া কাঁধে তুলিল।

অসম্ভব! বৃষ্টি না হইয়াই যায় না। বিজ্ঞান কি একটা চালাকি নাকি? বৃষ্টির সম্ভাবনায় অফিসের কলম থামিয়া যায়। কী গুরুগুরুম বজ্র ডাকিতেছে। মাঠের ওদিকটা শাদা হইয়া আসিল। হাওয়া হইয়া উঠিল ঠাণ্ডা,—কোথা হইতে একটা ধূলির গন্ধ ছুটিয়া আসিল। লোকজন সব প্রাণপণে ছুটিয়াছে পোর্টিকোর নিচে। তা ছুটুকু,—শঙ্করের কাঁধে আছে বর্ষাতি। সেটা গায়ে পরিয়া টুপিটা পিছন দিকে একটু নাবাইয়া দিয়া বৃষ্টির মধ্যেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে চলিল ট্রামে চাপিতে। তারপর বাড়ি,—চামেলী আসিয়াছে ছুটিয়া। শঙ্কর মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া বলে, বাপ্‌রে, কী বৃষ্টি, আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে। তারপর বর্ষাতিটা খুলিতে খুলিতে,—বাঃ বেশ ভাল বর্ষাতি দেখ্‌চি তো। কোথাও এক ফোঁটা জল লাগতে পারেনি! চামেলীর চিবুকে মৃদু ঠোনা দিয়া বলিল, কেমন, দেখলে তো?

চম্‌কাইয়া চাহিয়া দেখে দোয়াতটা চমৎকার করিয়া টেবিলের উপর উল্টাইয়া দিয়াছে। তাতো হইল, কিন্তু এত যে মেঘ, এত যে মেঘডম্বর, এত যে জোর বর্ষা, কোথায় গেল সব।

ছুটীর পর অফিস হইতে বাহির হইয়া দেখে কাঠফাটা রৌদ্র কটমট করিয়া তাকাইয়া আছে। মনটা বড়ই দমিয়া গেল। কিন্তু বিজ্ঞান কি আর ভুল করিতে পারে! ঠিক এক্ষণই না আসিল, হয়তো একঘণ্টা পরে সমস্ত কিছু বদ্‌লাইয়া যাইবে। তখন মহানন্দে বর্ষাতি গায়ে পরিয়া বাড়িতে বুক ফুলাইয়া প্রবেশ করা যাইবে। বৃষ্টির আশায় তিনঘণ্টা ময়দানে অভুক্ত ও অহস্তপদধৌত অবস্থায় কাটাইয়া দিল। কিন্তু কোথায় বৃষ্টি? বঙ্গোপসাগরের ঝড় ও মেঘ সুন্দর বনে পথ হারাইয়া গেল নাকি? রাত্রের আকাশের দিকে চাহিয়া শঙ্কর সনিশ্বাসে আবিষ্কার করিল আকাশ তারায় ছাইয়া গেছে। তারাগুলিকে আজ সর্ব্বপ্রথম বসন্তের দাগের মত মনে হইতে লাগিল।

সত্য বলিতে কি শঙ্করের শেষে এই নিরপরাধ বর্ষাতিটার উপরই রাগ হইতে লাগিল। নিতান্তই লক্ষ্মীছাড়া জিনিষটা,—এর মধ্যে একদিনও যদি ভিজিতে পারিল। মুরগীর সার্থকতা যেমন ভক্ষিত হওয়াতে, বর্ষাতির সার্থকতাও তেমনি নিজে ভিজিয়া অন্যকে রক্ষা করাতে। তাই যদি না হইবে, তবে বোঝা টানিয়া বেড়ানোয় কোন্ লাভ। এমন হইলে চামেলীর আর দোষ কি। আর ক্রমেই চামেলীর পরিহাসগুলি যা ধারালো হইয়া উঠিতেছে যে হজম করা কঠিন।

অফিসে যাইবার পূর্ব্বে জান্‌লাটা দিয়া শঙ্কর একবার আকাশটা খুঁজিয়া দেখিল। প্রখর রৌদ্রে উপর নিচ সব ধূঁয়া ধূঁয়া দেখাইতেছে। আর কি বদ্‌রকম যে একটা গরম পড়িয়াছে,—এর মধ্যে গলায় দড়ি বাঁধিয়া অফিসে যাওয়া! আর শুধু কি ছাই নেকটাই,—এই হতভাগা বর্ষাতিটাকেও যে নিতে হইবে তার কি!

আর চামেলী যদি ভাঁড়ারে বা অন্য কোথাও ব্যস্ত থাকিত তবে না হয় বর্ষাতিটা ফেলিয়া যাইয়া অফিস হইতে ফিরিয়া বলা যাইত যে, বিষম ভুল করিয়া ওটা ফেলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অন্যদিকে একটু সরিবারও ওর একটু লক্ষণও কি দেখা যায়! বলিল, রসগোল্লা তৈরি করবে বলেছিলে, যাও না এবার চটপট সেরে নাও গিয়ে।

চামেলী ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া কহিল, এখন কি?

'স্নানের আগে সেরে ফেলাই ভাল।'

'হয়েচে, এবার অফিসে যাও তো, কাজ আর শেখাতে হবে না।'

'তবে আর মিছিমিছি দেরি করচো কেন, স্নানটা করে এসো!'

'কৈ, আমার তো আজ অফিস আছে বলে মনে পড়ছে না তো?'

হতাশ হইয়া শঙ্কর বর্ষাতিটার দিকে হাত বাড়াইল। আত্মসম্মান বড় কঠিন জিনিষ। তাকে বজায় রাখিতে হইলে কি কম হাঙ্গামা পোহাইতে হয়?

চামেলী কহিল, ওটা না হয় থাক আজকে।

টানিয়া লইয়া পাট করিতে করিতে শঙ্কর কহিল, হুঁ।

'এই রৌদ্রের মধ্যে কেন মিছিমিছি নিয়ে যাওয়া। সত্যি বলছি, না নিয়ে গেলেও [illegible]'

শঙ্কর গম্ভীর অবজ্ঞায় কহিল, তোমার ঠাট্টার ভয়েই বুঝি আমি ওটা নিই। তাই বুঝি মনে করো তুমি?

চামেলী স্মিতমুখে কহিল, তবে?

'বেশ, তবে নিলুম না', শঙ্কর বর্ষাতিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল, 'কিছুতেই নিচ্ছিনা আজ ওটাকে আমি। যেন কারুর ভয়ে আমি,—হাসি পায়!'

শঙ্কর সেদিন বর্ষাতি না নিয়া পুলকিত স্বচ্ছন্দে অফিসে গেল। এবং অফিসের পরে ভিজিয়া ভূত হইয়া বাড়ি ফিরিল। সত্যি কথা বলিতে, আকাশ যেন তার সঙ্গে ইয়ার্কি সুরু করিয়াছে। এতদিন বর্ষাতিটা বহিয়া বহিয়া কাঁধের চামড়া উঠাইয়া ছাড়িয়াছে, বৃষ্টির আভাসটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু যেদিন আকাশ দেখিয়াই সেটা না নিয়া গিয়াছে অম্‌নি আকাশের দরজা খুলিয়া গেল। এমন শত্রুতার কথা আর শোনা যায় নাই।

বাড়ি ফিরিয়া দেওয়ালকে সম্বোধন করিয়া সে কহিল, মেয়েমানুষের বুদ্ধিতে চল্‌লেই যদি হ'তো, তবে আর ভাবনা ছিল কি। বর্ষাতিটা থাক্‌লে আর এমন দুর্ভোগটা হয়?

পরদিন হইতে আবার বর্ষাতিটা নিয়মিতভাবে অফিসে নেওয়া ও আনা হইতে লাগিল। কিন্তু বৃষ্টি তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া বাংলার অন্যান্য জায়গায় বন্যা করিবার জন্য গিয়াছে। কলিকাতার বরাদ্দ মেঘ সেই সকল জেলায় চালান হইতে লাগিল। বন্যার খবর কাগজে পড়িয়া শঙ্কর প্রকৃতির এই নির্ম্মম পরিহাসে দাপাইতে থাকে। এত সব বেচারীদের ক্ষেতখামার ডুবাইয়া, ঘরদুয়ার ভাসাইয়া তাদের দুর্দ্দশার একশেষ করিবে, অথচ তার এই বর্ষাতিটার জন্য এক ফোঁটা জল নাই।

চামেলীর পরিহাস ক্রমেই বেশি শাণিত হইয়া উঠিতেছে। এই বর্ষাতিটাই তাদের দাম্পত্যের সব চেয়ে বড় শত্রু। কেন যে চামেলীর বিরুদ্ধতা করিয়া ওটা কিনিতে গেল! এদিকে বৃষ্টির ব্যবহারটা নিতান্তই চাষার মত। শঙ্কর যদি গলা দিয়া সাতটা সুর ঠিক মত বাহির করিতে পারিত তবে নিশ্চয়ই কোনও ওস্তাদের কাছে যাইয়া মেঘমল্লার রাগ শিক্ষা করিত। ইতিমধ্যে দু-আনা পয়সা সে গরীবদের দান করিয়া মনে মনে বলিয়াছে, 'ঈশ্বর, দান করিবার জন্য এই যে আমার পুণ্য হইল, অন্তত তার জন্যও অফিস যাওয়া কিম্বা আসার সময় এক পশলা বৃষ্টি দাও।' কিন্তু ঈশ্বর তা শোনে নাই।

শঙ্করের অবস্থা যে কী শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তার দাম্পত্য জীবন যে কী বিপন্ন, তা কি কেউ বুঝিবে? বৃষ্টির অভাবে ফসল হয় না, ব্যারাম হয়, কষ্ট হয়, সর্দ্দিগর্মিতে মানুষ মরে, জলের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, এই সব কথাই লোকে জানে। অথচ বৃষ্টি বিনা যে কাহারো পারিবারিক সুখ অন্তর্হিত হইতেছে তার খবর কি কেউ রাখে? কানুর প্রেমের মত বর্ষাতিটাকে ছাড়াও যায় না, রাখাও যায় না! অথচ কী যে হাঙ্গামার সৃষ্টি হইয়াছে!

অফিসে যাইবার পথে শঙ্কর জোর করিয়া কহিল, আজ ভিজতেই হবে।

আকাশে তখন রৌদ্রের আগুন লাগিয়া গিয়াছে, এবং মেঘের বংশও কোথাও দেখা যায় না।

শঙ্কর কহিল, আজ ভিজতেই হবে। আর চালাকি নয়,—এমন করে আর থাকা যাচ্ছে না, মাইরি।

ট্রামে সমুখের আসনে যিনি বসিয়াছিলেন তাঁর খবরের কাগজে লেখা রহিয়াছে হাওয়া অফিসের খবর,—'কলিকাতায় শীঘ্র বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নাই'।

শঙ্কর কহিল, বর্ষাতি গায়ে দিয়ে আজ ভিজতেই হবে। যেমন করেই হোক।

সারাদিন, সারা সন্ধ্যা সমস্ত কলিকাতায় এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়িল না।

সন্ধ্যার পর শঙ্কর বাড়ি ফিরিল,—ভেজা টুপি; বর্ষাতি দিয়া অজস্র জল চুয়াইতেছে, ভিজা জুতাজোড়া প্যাচ্‌ প্যাচ্‌ করিতেছে।

দেখিয়া তো চামেলী অবাক্। কহিল, একি?

টুপি খুলিয়া ভিজা বর্ষাতিটা টানিতে টানিতে শঙ্কর কহিল, বৃষ্টি। উঃ, বাস্‌রে কী বাদ্‌লা ওদিকটায়।

'বাদ্‌লা? কোন্‌দিকে?' চামেলী কহিল, 'অথচ সত্যি বলচি, এদিকে এক ফোঁটাও তো পড়েনি।'

'তাই দেখে তো অবাক হলুম। অথচ শ্যামবাজারে কি বৃষ্টিটাই হয়ে গেল। জল দাঁড়িয়ে গেছে। ভাগ্যিস ছিল এই বর্ষাতিটা, নইলে পরে—

ভিজা জুতাজোড়া শঙ্কর টানিয়া খুলিল।

চামেলী কহিল, কলকাতায় এইটে ভারি মজার। এক দিকে হয়তো বৃষ্টি হয়ে গেল, অন্যদিক একেবারে শুক্‌নো।

ঘরের ভিতর হইতে শঙ্কর কহিল, যা বলেছ, মিলি। ধর্ম্মতলার এদিকটা একেবারে ঠনঠন করচে। অথচ ওদিকে,—বাসরে। বর্ষাতিটা না থাক্‌লে আজকে জর না হয়ে যায় না।

চামেলী গেল তাড়াতাড়ি চা তৈরি করিতে। তোয়ালে হাতে স্নানের ঘরে যাইবার পথে শঙ্কর চামেলীর চোখে চোখ ঠারিয়া গেল,—অর্থাৎ, জিত্‌ল কে? বিজয়গর্ব্বে সে গা ধুইতে লাগিল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হইল।

চামেলী কহিল, ছোড়দা? তবু রক্ষে, ভুলে যাওনি।

চামেলীর ছোড়দা থাকে মেসে। কেন যে তার দারুণ ব্যস্ততা জানা নাই, কিন্তু চামেলীর বাড়ীতে আসিবার সে সময়ই পায়না,—এমনই নাকি সে ব্যস্ত।

সুধীর ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, জানিসতো মিলি, নানান্ কাজে থাকি। তাছাড়া ফাইনালটা এবার দিয়েই দেব ভাবচি।

চামেলী পেয়ালাতে চা ঢালিতে ঢালিতে কহিল, মাসে তা বলে দুচার দিনও আসতে পারো না? কী যে তোমাদের এত কাজ ভেবেই পাই না।—তোমার জুতোটা বাইরে রেখে এসো বাপু ছোড়দা, ভেজা জুতোয় আমার কার্পেট নষ্ট করবে।

'ভেজা জুতো?' সুধীর বিস্মিত হইয়া কহিল, 'জুতো ভিজতে যাবে কেন?'

'শ্যামবাজার থেকে আসচো তো!'

'হ্যাঁ।'

'কখন বেরিয়েচ?'

'বাসে-এ করে বরাবর এলুম।'

'বৃষ্টি হয়নি ওদিকে?'

সুধীর কহিল, বৃষ্টি? বৃষ্টি আছে নাকি কলকাতায়! শ্যামবাজারে বৃষ্টির জন্য যজ্ঞ হচ্চে দেখে এলুম।

গা ধুইতে সেদিন শঙ্করের দেড় ঘণ্টা সময় লাগিল। তার বহুপূর্ব্বেই চামেলীর কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেছে।

সে রাত্রে শঙ্কর কহিল, ওটা বেচেই ফেলব, ঠিক করলুম।

চামেলী কহিল, কোন্‌টা গো?

গম্ভীর ভাবে শঙ্কর কহিল, বর্ষাতি।

'পাগল হয়েচ', চামেলী কহিল, 'ওটা বেচবার কি অভাবটা পড়েছে তোমার। তবে দয়া করে কলের জলে অমন করে জুতো আর টুপি ভিজিয়ে এনো না, লক্ষ্মীটি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া শঙ্কর কহিল, নাঃ, বেচবই।

'কটাকা তাতে পাবে?'

'তা গোটা তিন সাড়ে তিন কি আর পাবনা।'

'পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনে বিস্তর লাভ হবে। ও সব পাগলামি ছেড়ে দাও।' হাসিয়া কহিল, 'মাইরি বলচি, বর্ষাতি নিয়ে আর কোনও দিন যদি আমি কিছু বলেচি।'

শঙ্কর ভাবিল, মুখে কিছু নাই বলিল, কিন্তু চোখ তো আর সারাক্ষণ বন্ধ করিয়া রাখা যাইবে না। কহিল, নাঃ বেচবই।

তার পরের দিন শঙ্কর এক সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিসের দোকানে বর্ষাতিটাকে নগদ দুই টাকা চৌদ্দ আনা দরে বিক্রী করিয়া আসিল। এবং ঠিক তারপরদিন হইতেই কলিকাতায় সত্যিকারের বর্ষা সুরু হইল।

শ্রীসুবোধ বসু

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি) *

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র এম্-এ ডি-টি

২

রবীন্দ্র-সাহিত্যের উন্মেষ

মহর্ষির আটটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা এই সর্ব্বসমেত তেরোটি সন্তানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অসাধারণ মেধা-সম্পন্ন। এবং তাঁদের খ্যাতি, নিঃসন্দেহই আরো অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়ত, যদি না রবীন্দ্রনাথের যশঃপ্রভার তীক্ষ্ণ প্রখরতায় তা' কতকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেত। জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন ঋষিতুল্য দার্শনিক চিন্তাবীর; দর্শন তাঁর কাছে ছিল শুধু একটা ধ্যানের বিষয় নয়,—একটা জীবন্ত সত্তা যা' তাঁর ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি খুটিনাটি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করত। দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস,—তা'ছাড়া একজন উচ্চ-অঙ্গের কবি। তাঁর রচিত অনেক ভগবদ্-সঙ্গীত এখনো গীত হ'য়ে থাকে। তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা-ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংস্কৃত কাব্য ও ফরাসী ভাষার চর্চ্চা করতেন। পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বড় সুর-রচয়িতা; তা-ছাড়া সাহিত্য-বিষয়ক বই লিখেছিলেন অনেক। য়ুরোপীয় ভাষা থেকে, বিশেষ করে ফরাসী ভাষা থেকে অনুবাদও করেছিলেন অনেক কিছু। মেয়েদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী বাংলা ভাষার প্রথম লেখিকা; অনেক উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। অতএব রবীন্দ্রনাথ শৈশবেই এমন একটা পারিবারিক আব্‌হাওয়ার মধ্যে লালিত হ'বার সুযোগ পেয়েছিলেন, যেখানে তাঁর মনীষার পূর্ণ বিকাশের বিশেষ সুযোগলাভ ঘটেছিল। তা'ছাড়া মহর্ষিকে কেন্দ্র করে নূতন ব্রাহ্মধর্ম্ম চারিদিকে যে জ্যোতি বিকীরণ করেছিল,—তা' দেশের গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিকেই ঠাকুর-পরিবারে আকৃষ্ট করেছিল;—তাঁদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হ'য়েছিল তখনকার যত কিছু আন্দোলন,—ধার্ম্মিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ও জাতীয়। ঠাকুর-পরিবারের অনেকেই তাঁদের নিকট অনেক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন,—এবং তাঁদের সকলেরই মেধা অনন্যসাধারণ সমৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে মিলিত হ'য়েছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।

এমনি করেই,—একটা উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির আব্‌হাওয়ার মধ্যে মানুষ হবার বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হ'য়েছিলেন আমাদের কবি। অতএব, এর বাইরে কোনো শিক্ষাই যে তিনি গ্রহণ করতে চাইবেন না,—তা' আর বিচিত্র কি? একটির পর একটি করে অনেকগুলো স্কুলে তাঁকে পাঠানো হ'য়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকটিতে শিক্ষার চেয়ে তিনি পীড়া পেয়েছিলেন অনেক বেশি। তাঁর মধ্যে 'মানুষটি'ই ছিল সদা জাগ্রত। মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শের জন্যই তিনি ছিলেন নিরন্তর ব্যাকুল। তাই যে-ব্যবস্থায়, এই 'মানুষটি'কেই বাদ দিয়ে একজোটে সকল ছাত্রকে নিয়ে কারবার করা হ'ত,—যেন তাদের মনটা একটা সাদা শ্লেট,—ভাবরাজির অক্ষরগুলো তার উপর দিয়ে লিখে চললেই হোলো,—তেমন ব্যবস্থার অধীনতা তিনি স্বীকার করতে পারলেন না। তখনকার দিনে শিক্ষা দেওয়ার যে প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাতে তিনি মর্ম্মন্তুদ ব্যথা পেয়েছিলেন। স্কুলের ঘরগুলো তার কাছে মনে হ'ত যেন অন্ধকূপ। অতি শৈশবে তাঁকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পাঠানো হয়েছিল। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন,—"সেখানে কি শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই, কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া

* প্রথম পরিচ্ছেদ,—"রবীন্দ্র সাহিত্যের উদ্ভবক্ষেত্র ও পারিপার্শ্বিক" ফাল্গুন ১৩৪১ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি-না তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য" (পৃঃ ৫-৬)। এর পরে যে-সব স্কুলে তাঁকে ভর্ত্তি করা হয়েছিল, সেখানকার স্মৃতিও এর চেয়ে বেশি সুখকর ছিল না। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ছেড়ে নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হ'য়েও তিনি মনের তৃপ্তি কিছু পান নি। সেখানকার স্মৃতিও "কোনো অংশেই লেশমাত্র মধুর নহে।...অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব অশুচি ও অপমানজনক" (জীবনস্মৃতি পৃঃ ২০)। এখান থেকে বেঙ্গল একাডেমিতে গিয়ে কবি একটু আরাম পেয়েছিলেন, কারণ এখানকার ছেলেরা দুর্ব্বৃত্ত হ'লেও ঘৃণ্য ছিল না। "তবু হাজার হইলেও ইহা স্কুল। ইহার ঘরগুলো নির্ম্মম, ইহার দেওয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মত।...কোথাও কোনো সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই।...সেইজন্য সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত—অতএব স্কুলের সঙ্গে আমার সেই পলাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না" (জীবনস্মৃতি পৃঃ ৪৮)। তারপর স্কুল বদ্‌লে বদলে আরো কিছু চেষ্টা করা হ'য়েছিল, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। "দাদারা মাঝে মাঝে এক আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভর্ৎসনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি কহিলেন, আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড় হইলে রবি মানুষের মত হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল" (পৃঃ ৮৫)।

কিন্তু ছোট ভাইটির উপর এমন কঠোর রায় যিনি প্রকাশ করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই ভ্রাতার চিত্তের গহনতলের কোনো খবর রাখতেন না। সে কবিচিত্ত সকল কিছুর স্পর্শেই সচকিত, সকল কিছুর প্রতিই তার অনন্ত কৌতূহল, প্রকৃতির মধ্যে যত কিছু চিত্র তা' দেখবার জন্য এবং যত কিছু ধ্বনি, তা' শোনবার জন্য সদাই উন্মুখ। এমন চিত্তের বিকাশের জন্য স্কুলের কি প্রয়োজন? দেশের সমস্ত স্কুল উজাড় করে যা পাওয়া যেত তার চেয়ে বেশি খোরাক ছিল সে চিত্তের জন্য পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যেই। মনে হ'তে পারে কলকাতার মত একটা বিশাল সহর থেকে কবি-চিত্তের খোরাক কতখানি মিলতে পারে? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মেধা সকল রকমের ভূমি থেকেই রস সংগ্রহ করতে পারত। তাছাড়া ঠাকুর পরিবারের বিশাল প্রাসাদে শিক্ষা ও আলোকপ্রাপ্ত বিদ্বন্মণ্ডলীর সমাগমও যেমন হ'ত,—অবসর সময়ে একাকী চিত্ত-বিনোদনের জন্য নিভৃত অন্তরালও তেমনি ছিল। অতি শৈশবকালেই আপনার মধ্যে আপনি তন্ময় হ'য়ে থাকার আনন্দের আস্বাদ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। যে ভৃত্যের উপর তাঁর রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দেওয়া হ'য়েছিল, সে খড়ি দিয়ে এক চক্র এঁকে তার মধ্যে তাঁকে বসিয়ে দিত আর বলত, খবরদার এই দাগের বাইরে এস না, আসলেই মহাবিপদ। একটি সাধারণ শিশুর উপর এমন ব্যবস্থা হয় ত তাকে অস্থির করে তুলত; কিন্তু আমাদের শিশু-কবি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই খানে বসে, চোখের সামনে যে সব চিত্র উন্মোচিত হ'ত তাই শান্ত চিত্তে দেখ্‌তেন। জীবনস্মৃতিতে (পৃ ৯) এ বিষয়ে কবি লিখ্‌ছেন, "জানলার নীচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনাবট—দক্ষিণ ধারে নারিকেল-শ্রেণী। গণ্ডীবন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মত দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত।... এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলো সারাবেলা ডুব দিয়া গুগ্‌লি তুলিয়া খায়, এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে। পুষ্করিণী নির্জ্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলো ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে।"

শৈশবের এই দিনগুলিতে মুক্তবিচরণের আস্বাদ রবীন্দ্র-নাথ পান নি। কিন্তু সে জন্য তাঁর মানসিক বৃত্তি নিপিষ্ট ত হয়-ই নি, বরং তাঁর স্বভাবজাত কৌতূহল বেশি করে উদ্রিক্ত হ'য়েছিল। জীবনস্মৃতিতে আবার পড়ি, "বাড়ির বাহিরে

যাওয়া আমাদের বারণ ছিল; এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্ব্বত্র যেমন খুসি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।"

এমনি করেই রবীন্দ্রনাথের শৈশবের দিনগুলি কেটে-ছিল। সহরের সঙ্কীর্ণ ও নিরানন্দ জীবন-ধারার মধ্যে কি যেন একটা রহস্যের অনুসরণ করাটাই ছিল তাঁর আনন্দ। সর্ব্বত্রই কি যেন অনুভব করা যায় এবং কখন্ বুঝি বা কী প্রকাশ হ'য়ে পড়ে! "তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কি নিবিড় ছিল সেই কথাই মনে পড়ে। কি মাটি, কি জল, কি গাছপালা, কি আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত, মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই! পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না।"

এমনি করেই শিশু-কবির তীক্ষ্ণ মেধা দিনে দিনে বিকশিত হ'তে লাগল সহরের মধ্যেই; অথচ সহরে চিত্ত-বিকাশের যে সব সুযোগ থাকে, অর্থাৎ একটা বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র ও নানারকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা,—তা গ্রহণ করবার বয়স তখনো পর্য্যন্ত তাঁর হয় নি। এমন কবি-চিত্ত যে কী অনুভব করেছিল, প্রথমবার সহরের গণ্ডীর বাইরে এসে, তা' স্বভাবতঃই জান্‌তে ইচ্ছা হয়। জীবনস্মৃতিতে কবি তা' আমাদের বলেছেন। একবার কলিকাতায় মহামারীর সময় ঠাকুর-পরিবারের কেউ কেউ, কলিকাতার বাইরে গঙ্গার ধারে এক বাগানবাড়ীতে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে,—জীবন-স্মৃতিতে কবি বলছেন,—"প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত যেন দিনটাকে একখানি সোনালি পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মত পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কি অপূর্ব্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার ভাঁটার আসা-যাওয়া। কত রকম রকম নৌকার কত গতিভঙ্গী, সেই পেয়ারাগাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণ-বক্ষ সূর্য্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণ-শোণিত প্লাবন। এক এক দিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ওপারের গাছগুলি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে, নদী ফুলিয়া উঠে, এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলোর মধ্যে যা-খুসি তাই করিয়া বেড়ায়।" (জীবন স্মৃতি পৃঃ ৩৫)

শিশু-চিত্তের উপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এই যে গভীর রেখাঙ্কন, এই খানেই কবির নিবিড় প্রকৃতি-প্রেমের সূচনা। উত্তরকালে যখন প্রায়ই কবিকে কার্য্য-ব্যপদেশে প্রকৃতির ক্রোড়ে চাষীদের নিবিড় সংস্পর্শে আসতে হ'য়েছিল,—তখন এই প্রকৃতি-প্রেমই পরিণত হ'য়েছিল,—একটা বিশ্বপ্রেমে। সে প্রেম শুধু তাঁর কাব্যে একটা অপরূপ প্রাণস্পর্শী প্রকাশ লাভ করেই ক্ষান্ত হয় নি,—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় সত্তার মর্ম্মকথাটিও তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছিল, অর্থাৎ তাঁকে শিখিয়েছিল, বিশ্বের সব কিছুই দেখতে মানুষের চোখ দিয়ে, ব্যাখ্যা করতে মানবিকতার দিক দিয়ে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি,—অতি শৈশব থেকেই কবি তাঁর চারপাশের সঙ্গে কেমন একটা রহস্যময় সম্বন্ধ অনুভব করতেন; ফুলফল, গাছপালা, আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্রতারকা যেন তাঁর আত্মার গোপন মর্ম্মের মধ্যে কী বাণী বলত। পরিণত বয়সে তিনি এই সকল বাণীকে একটা মানবিক অর্থ ও ভাষা দেবার চেষ্টা করেছেন, অথচ কোনো অলীক মায়ারাজ্যে প্রবেশ করেন নি। "ধরায় যেদিন প্রথম জাগিল কুসুমবন,—সেদিন এসেছে আমার গানের নিমন্ত্রণ";—"মিলন-নিশীথে ধরণী ভাবিছে চাঁদের কেমন ভাষা, কোনো কথা নাই, শুধু মুখ চেয়ে হাসা";—"ফুলগুলি যেন কথা, পাতাগুলি

যেন চারিদিকে তার পুঞ্জিত নীরবতা" ;—"লাজুক ছায়া বনের তলে আলোরে ভালোবাসে, পাতা সে কথা ফুলেরে বলে, ফুল তা শুনে হাসে" ;—"আকাশের নীল বনের শ্যামলে চায়, মাঝখানে তার হাওয়া করে হায় হায়" :......এমনি করেই প্রকৃতি কবিকে সম্ভাষণ করেছে চিত্রে, কবি সাড়া দিয়েছেন ছন্দে ও সুরে।

শৈশবের দিনগুলিতে আবার ফিরে আসা যাক্। শিশু-কবির চিত্ত দিনে দিন বিকশিত হ'তে লাগল এবং ক্রমে নানা ভাবধারার স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিল। আগেই বলেছি, যতকিছু নূতন আন্দোলন তখনকার দিনে বাংলা-দেশকে আলোড়িত করেছিল, সে সকলেরই অগ্রণী ছিল ঠাকুর পরিবার। আবার বলি,—এ পরিবার একটা সাধারণ পরিবার ছিল না ; একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দেবার উপযোগী মহত্ত্বের সমস্ত বীজই ছিল তার মধ্যে। তার উপর একটা আকস্মিক ঘটনা এই পরিবারকে বংশপরম্পরায় একটা বিশেষত্ব দান করেছিল, যা' রবীন্দ্রনাথের চিত্ত বিকাশে বড় কম সহায়তা করে নি। তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা মুসলমানের সঙ্গে একত্র ভোজন করায় এই পরিবার গোঁড়া হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হ'য়েছিল। এই কারণে সাধারণ জীবন-যাত্রা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়ে, ঠাকুর পরিবারের মধ্যে একটা অসামান্য আত্ম-নির্ভরতার শক্তি সঞ্চারিত হয়। এরই ফলে তাঁদের এই মহামূল্য শিক্ষাটি হয়েছিল, যে জীবনের যা' চরম উৎকর্ষ, তা' কখনো বাইরে থেকে আসে না, আসে অন্তরের গহন থেকে। বাইরের কোনো জিনিসেরই একটা সত্যকার মূল্য থাকে না, যদি না তা' অন্তরের সোণার কাঠি দিয়ে রূপান্তরিত হয়। এমনি করেই ঠাকুর পরিবার সামাজিক নিপীড়ন থেকেই বেশ কিছু মানসিক সম্পদ লাভ করেছিল। চিত্তের অদম্য স্বাধীনতা, সৃষ্টির অনুপ্রেরণায় বাধাহীন সঞ্চরণ কঠিনতম কার্য্যে নির্ভীক প্রবর্ত্তনা, উদার ইচ্ছাশক্তির বিপুল প্রচেষ্টা, এমনি সব গুণাবলী অলক্ষিতে সঞ্চারিত হ'য়েছিল সমাজ-প্রপীড়িত ঠাকুর পরিবারের মধ্যে। তাছাড়া একঘোরে হওয়ার দরুণ সমাজকে একটু দূর থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল এই পরিবার, এবং সেজন্যই সেই দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল ভারতবর্ষের অন্তরতম অন্তরাত্মার চিরন্তন, নির্ম্মল ও সমগ্র সত্য রূপটি ; তার মধ্যে না ছিল কোনো সঙ্কীর্ণতা,—না ছিল, শতাব্দীব্যাপী কুসংস্কার ও অজ্ঞতাজনিত কোনো মিথ্যা ও ক্ষণিক রূপের আভাস। এই জন্যই ভারতবর্ষের উপবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের প্রথম যুগে যখন গোঁড়া হিন্দুয়ানীর উপর লোকের বিশ্বাস ক্ষীণ হ'য়ে আসার দরুণ, কেউ কেউ ঝুঁকেছিল কঁত্-প্রবর্ত্তিত নিরীশ্বরবাদের দিকে, কেউ কেউ বা খৃষ্টধর্ম্মের দিকে, তখন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারের প্রতি ঠাকুর পরিবারের নিষ্ঠা ছিল অচল :—অবশ্য তার উপর এমন ভাবে যুক্তির আলোক সম্পাত করা হয়েছিল, যাতে করে বর্ত্তমানের বিজ্ঞানালোক-প্রাপ্ত লোকেরও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন তার মধ্যে মেটে। প্রাচীন আদর্শের প্রতি এই অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল ঠাকুর পরিবারের জীবনের একটা দিক, এদিকে সত্যের খাতিরে কোনো দৈহিক বা আর্থিক ত্যাগে তাঁরা পেছ্-পাও ছিলেন না ; অন্যদিকে সৃষ্টির ব্যাকুলতায় সদা-চঞ্চল তাঁদের মন ছিল সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, কলায়—বিশ্বসত্তার সঙ্গে একটা সুস্পষ্ট ও নিবিড় যোগের জন্য সদাই উন্মুখ। সবেমাত্র উচ্চশিক্ষার পাশ্চাত্য প্রণালী দেশে যখন প্রচলিত হ'য়েছে,—তখনই আধুনিক শিক্ষার সেই প্রথম যুগেই মহর্ষির এক ভ্রাতা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে আধুনিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতবর্ষের ধর্ম্মভাব প্রচারের জন্য বাড়ীতেই এক স্কুলের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল,—সেখানে বাড়ীর ও পাড়ার ছেলেদের উপনিষদ্ পড়ানো হ'ত। রোজই বাড়ীতে উপনিষদের মন্ত্র,—এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করা হ'ত। প্রায়ই য়ুরোপীয় সাহিত্য, ধর্ম্ম ও দর্শনের আলোচনা হ'ত। সমাজ, রাষ্ট্র, বাণিজ্য, শিক্ষা, কলা, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে যত রকমের সমস্যা উপস্থিত হ'য়েছিল,—সে সকল সম্বন্ধেই তর্ক বিতর্ক হ'ত। বাংলায় সাধারণ গান ও উপাসনার উপযোগী সঙ্গীত রচনা করা হ'ত,—তাছাড়া অন্যান্য কবিতা, গল্প এবং নানা বিষয়ে প্রবন্ধও লেখা হ'ত। মধ্যে মধ্যে সান্ধ্য-বৈঠকে নাটক রচনা করে অভিনয় করা হ'ত। নূতন নূতন সুরও রচিত হ'ত,—বাংলা স্বরলিপিরও উদ্ভাবনা হোলো। রোজই সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে কলকাতার সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ হোতো। এক কথায় প্রাণশক্তির সেখানে ছিল একটা অফুরন্ত ও বাধাহীন স্ফুরণ !

মানসিক বৃত্তি সকলের এই নিরন্তর চর্চ্চার আব্‌হাওয়ার মধ্যে আমাদের শিশু-কবির কাব্য-লক্ষ্মী ভোর না হ'তেই উঠ্‌লেন জেগে। তখনো তাঁর বয়স সাত বৎসর হয়েছে, কি হয়নি,—তাঁর ভাগিনেয়, তাঁর চেয়ে কিছু বয়ঃজ্যেষ্ঠ,—কিছু ইংরাজি সাহিত্য পড়ে মহা-উৎসাহে হ্যামলেট থেকে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সহসা খেয়াল করলেন,—রবিকে দিয়ে কবিতা লেখাতে হ'বে। আর অমনি তাঁকে ছন্দের প্রথম নিয়মগুলি দিলেন শিখিয়ে। এই বয়সে কবিতা লেখার কথা ভাবা,—সে কি সহজ কথা! ছাপার বইতে ছাড়া কবিতা কখনো দেখেনই নি,—"তার মধ্যে কাটাকুটি নাই, ভাবচিন্তা নাই, কোনোখানে মর্ত্ত্যজনোচিত দুর্ব্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না।" কিন্তু তাঁর প্রথম চেষ্টা যখন উত্‌রে গেল, তখন আর তাঁকে পায় কে? একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করে তাতে পেন্সিল দিয়ে কতকগুলো অসমান লাইন কেটে বড় বড় কাঁচা অক্ষরের আঁচড় কাট্‌তে কাট্‌তে ছন্দ বানিয়ে চললেন। এ সম্বন্ধে কবি জীবনস্মৃতিতে লিখছেন,—(পৃঃ ২৮) "হরিণ-শিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেইরূপ উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষতঃ আমার দাদা আমার এই সকল রচনায় গর্ব্ব অনুভব করিয়া শ্রোতা সংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন।"

স্কুলের পড়াশুনো কবি যতই অবহেলা করুন না কেন, তাঁর চারপাশে একটা সাহিত্যিক নেশা অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে বই পড়বার একটা প্রবল ঝোঁক জাগিয়ে দিয়েছিল। অতি শৈশব থেকেই হাতের কাছে যে-বই পেতেন তাই পড়তেন,—অত বোঝা-না-বোঝার ধার ধারতেন না। যা' কিছু ভালো লাগত, কল্পনা দিয়ে নিজের মত করে তার একটা অর্থ করে নিতেন,—এবং বেশ ভালো করেই হোক বা ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সাই হো'ক,—অল্পবিস্তর তা' আত্মসাৎ করেতেন। এ-প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন,—"কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে,—মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।... মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতে-ছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায় ছিল না—তাহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ঠ ছিল। ছেলেবেলায় যখন ইংরেজি আমি প্রায় কিছু জানিতাম না তখন প্রচুর ছবিওয়ালা একখানি Old Curiosity Shop লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই—নিতান্ত আবছায়াগোছের কি একটা মনের মধ্যে তৈরী করিয়া সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবিগুলা গাঁথিয়াছিলাম—পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম তবে মস্ত একটা শূন্য পাইতাম সন্দেহ নাই—কিন্তু আমার পক্ষে সে পড়া তত বড় শূন্য হয় নাই। একবার একখানি অতি পুরাতন গীত-গোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মত এক লাইনের সঙ্গে আর এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভাল জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীত গোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিষটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।" (জীবনস্মৃতি ৫৯ পৃঃ)

এ সব থেকে কবির কল্পনা-শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো কিছু চিত্র বা ধ্বনি সকল সময়েই তাঁর মনকে অপরূপ ভাবে আঘাত করেছে। অতি শৈশবের কথা কারো মনে থাকে না,—কিন্তু একদিনের একটা ছবি তাঁর মনকে এমনই আঘাত করেছিল যে কোনো দিন তিনি তা' ভুলতে পারেন নি। প্রথম ভাগ পড়তে পড়তে একদিন তিনি পড়লেন,—"জল পড়ে, পাতা নড়ে।" এই সামান্য শব্দ-বিন্যাসটুকু তাঁর মনে বিশ্বের প্রথম কবিতা হ'য়ে চিরদিন জাগরূক আছে। এখনো তাঁর স্মৃতির গহনতলে এই শব্দ গুলির ছন্দ ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে,—একথা প্রেসিডেন্সী কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদের একটা বৈঠকে তিনি সেদিন বলেছিলেন। কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটাকে একটা উচ্চ আসন এই জন্যেই তিনি দিতেন। "মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না, তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার

ঝঙ্কারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে।" (জীবনস্মৃতি পৃঃ ৪)। এ কথা কতখানি সত্য সে আলোচনার এখানে প্রয়োজন নেই,—মিল বর্জ্জন করে কবিতা লেখার পথ বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গ এখানে তুললাম শুধু এই কথাটি বলবার জন্য যে কবি-কল্পনার একটা অপরিমেয় শক্তি না থাক্‌লে সামান্য কয়েকটা শব্দবিন্যাসের ছন্দের ধ্বনিতে মনের মধ্যে যে চিত্র ফুটে ওঠে,—তাকে চিরকাল এমনি সজীব করে ধরে রাখা রাখা যায় না।

এই ত গেল রবীন্দ্র-চিত্তের একটা দিক,—এই অতি সূক্ষ্ম, অতি কোমল স্পর্শভীরুতা যা' বস্তুরাজির বাইরের বিশিষ্ট রূপটিকে অতিক্রম করে তার অন্তর থেকে গোপন মাধুর্য্যটুকু ও চিরন্তন রসটুকু টেনে বের করে নেয়,—এই তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি যার উপর তাঁর মর্ম্মকাব্যের ভিত্তি,—এরই পাশাপাশি দেখতে পাই রবীন্দ্র-চিত্তের আর একটা দিক বিকশিত হ'চ্চে শৈশব থেকেই—এদিকের গোড়ার কথা হ'চ্চে,—সঙ্গতি ও শৃঙ্খলা, বিবেচনা ও যুক্তির উপর এর প্রতিষ্ঠা,—এবং মহর্ষির নিজের হাতের নিয়ন্ত্রণে এর বিকাশ ও পরিণতি। কবির জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব থেকেই মহর্ষি বৎসরের অধিকাংশ সময়টাই ভ্রমণ করে কাটাতেন,—কাজেই অতি শৈশবে পিতার সঙ্গে কবির বেশি পরিচয় ছিল না। কিন্তু যখনই কবি শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে পদার্পণ করলেন, অর্থাৎ যখনই তাঁর চিত্ত-গঠনের সময় এলো তখনই মহর্ষি তাঁর সুনিয়ন্ত্রিত জীবনের কর্ত্তব্যবোধে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভার স্বহস্তেই গ্রহণ করলেন,—এবং তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের সঙ্গে বেড়াতে হিমালয় পাহাড়ে। এই হিমালয় ভ্রমণকালে কবি জীবনে যে শৃঙ্খলার শিক্ষা পেয়েছিলেন,—তার স্মৃতি কোনো দিন তাঁর মনে ক্ষীণ হয় নি। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলছেন, "ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা ও কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনো জিনিষ ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার কাজেও যেমন তেমন করিয়া কিছু হইবার জো ছিল না। তাঁহার প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি তাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্য অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি যাহা সঙ্কল্প করিতেন, তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন।" যে মানুষের জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি নিয়ম কানুন এমনই সুনির্দ্দিষ্ট ও সুপরিস্ফুট, সে মানুষের পক্ষে চিত্তের পরিপূর্ণ পরিণতির জন্যে যে মানসিক বৃত্তির স্বাধীন চর্চ্চার কতখানি প্রয়োজন,—সে সম্বন্ধে কোনো ভুল করা সম্ভব ছিল না। তাই কবি জীবনস্মৃতিতে আবার বল্‌ছেন, "হিমালয় যাত্রায় তাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম একদিকে আমার প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল, অন্যদিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। যেখানে তিনি ছুটি দিতেন,—সেখানে তিনি লেশমাত্র ছিদ্র রাখতেন না।" (পৃ ৬৩).. …"তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইহা দেখিয়াছি তিনি কোনোমতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধ কাজ অনেক করিয়াছি—তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন,—কিন্তু কখনো তাহা করেন নাই। যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমরা অন্তরের সঙ্গে করিব এজন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে আমরা বাহিরের দিক হইতে লইব ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না—তিনি জানিতেন সত্যকে ভালোবাসিতে না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হয় না। তিনি ইহাও জানিতেন যে সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায় কিন্তু কৃত্রিম শাসনে সত্যকে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।" (পৃঃ ৭৬)

হিমালয় ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল এগারো। এই সময় তিনি পিতার নিকট সংস্কৃত ও ইংরেজি পড়তেন,—তা' ছাড়া তাঁর মধ্যে দায়িত্ব বোধ সঞ্চারিত করবার জন্য কিছু কিছু টাকা কড়িও তাঁর কাছে রাখা হ'ত। রবীন্দ্র-চিত্তের মধ্যে যে সুশাসন, সুশৃঙ্খলা, স্থির যুক্তির প্রতিষ্ঠা ও গঠন-ক্ষমতা আছে,—যার ফলে বিশ্ব-ভারতীর মত এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'য়েছে,—সে-সবের বীজ নিহিত হ'য়েছিল এই সময়ে। জীবনস্মৃতি থেকে তাঁর এই সময়কার দিনপঞ্জীর কিছু ধারণা করা যায়—কবি লিখ্‌ছেন, "আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায়

পর্ব্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষার দীপ্তি দেখিতে পাইতাম—জানি না কত রাত্রে—দেখিতাম পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দ সঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন। তাহার পর আর এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে নরঃ নরৌ নরাঃ মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্তবেষ্টন হইতে বড় দুঃখের এই উদ্বোধন। সূর্য্যোদয়-কালে যখন পিতৃদেব প্রভাতের উপাসনা অন্তে একবাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন। তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। ...... ফিরিয়া আসিলে ঘণ্টাখানেক ইংরেজি পড়া চলিত। তাহার পরে দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডা জলে স্নান। ......মধ্যাহ্নে আহারের পর পিতা আমাকে আর একবার পড়াইতে বসিতেন। কিন্তু সে আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। প্রত্যুষের নষ্ট ঘুম তাহার অকাল-ব্যাঘাতের শোধ লইত। অমি ঘুমে বারবার ঢুলিয়া পড়িতাম। আমার অবস্থা বুঝিয়া পিতা ছুটি দিবা মাত্র ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা।" (পৃঃ ৭৪-৭৬)

হিমালয় থেকে ফেরার পর আবার তাঁকে স্কুলে পাঠাবার কিছু চেষ্টা করা হ'য়েছিল,—তবে সৌভাগ্যক্রমে বেশি জোর করা হয় নি। বাড়ীতে গৃহশিক্ষকেরা এসে পড়িয়ে যেতেন,—কিন্তু তাঁরাও বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু মন তাঁর কোনো সময়েই অলস থাকত না। বাংলা সাহিত্য তখনো বেশি সমৃদ্ধ হয়নি, কিন্তু পাঠ্য অপাঠ্য যা' কিছু বই পেতেন, মাসিকপত্র যা' কিছু সংগ্রহ করতে পারতেন সবই পড়ে ফেলতেন। ছেলে-বেলাকার এই সমস্ত পাঠ তাঁর প্রতিভার গঠনে অনেকখানি সহায়তা করেছিল।

এমনি একটা ছোট্ট মাসিক পত্রিকা,—'অবোধ-বন্ধু'র পাতায় কবি বিহারীলালের কবিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। বিহারীলালের প্রতি তাঁর মনটা শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল,—এবং সে কাব্য থেকে তিনিও কবিতা লেখার জন্য অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন প্রচুর। বিশেষ করে বিহারীলালের প্রধান কাব্যগ্রন্থ 'সারদামঙ্গল' (আর্য্যদর্শনে' প্রকাশিত) রবীন্দ্রনাথের উপর একটা প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করেছিল। কাব্য হিসেবে সারদা-মঙ্গলের মূল্য কতখানি তা বিচার করবার অবকাশ নেই আমাদের এখানে,—বইখানাও আজকাল বিস্মৃতির গর্ভে বিলীনপ্রায় ;—বিহারীলালেরও কবি-প্রতিভার বিচারে এখানে প্রবৃত্ত হ'ব না,—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা বিকাশে তাঁর যে কতখানি হাত ছিল, সেটা লক্ষ্য করা প্রয়োজন মনে করি। জীবনস্মৃতিতে এ প্রসঙ্গে কবি বল্ছেন,—"তিনি আমাকে যথেষ্ঠ স্নেহ করিতেন। দিনে দুপুরে যখন তখন তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তাঁহার দেহও যেমন বিপুল, তাঁহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারিদিক ঘিরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত—তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল,—তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনি তাঁহার কাছে গিয়াছি, সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি। তাঁহার তেতালার নিভৃত ছোট ঘরটিতে পঙ্খের কাজ করা মেজের উপর উপুড় হইয়া গুন্‌গুন্ আবৃত্তি করিতে করিতে মধ্যাহ্নে তিনি কবিতা লিখিতেছেন এমন অবস্থায় অনেকদিন তাঁহার ঘরে গিয়াছি—আমি বালক হইলেও এমন একটি উদার হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া লইতেন যে মনে লেশমাত্র সঙ্কোচ থাকিত না। তাহার পরে ভাবে ভোর হইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার খুব বেশী সুর ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরোও তিনি ছিলেন না—যে সুরটা গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত। গম্ভীর গদ্‌গদ কণ্ঠে চোখ বুজিয়া গান গাহিতেন, সুরে যাহা পৌঁছিতনা, ভাবে তাহা ভরিয়া তুলিতেন।" (পৃ ১০৪)

ব্যক্তিগত এই নিবিড় সংস্পর্শ আর বিহারীলালের কাব্যের মধ্যে মানবিকতার একটা গভীর সুর রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে প্রবলভাবে নাড়া না দিয়ে পারেনি। তাছাড়া বিহারীলালের ছন্দের ঝঙ্কার ও রূপ,—ও কাব্যের চিত্র রবীন্দ্র-

নাথের মনকে কিছু কম আঘাত করেনি,—সেই অল্পবয়সেই তাঁকে শিখিয়েছিল,—কবিতার সৌন্দর্য্য-বিকাশে সুমধুর ও সুললিত শব্দচয়নের প্রয়োজনীয়তা কতখানি, বেশ করে উপলব্ধি করিয়েছিল, যে ছন্দের বা শব্দচয়নের এতটুকু ত্রুটিও কাব্যের পক্ষে কী রকম মারাত্মক! যখন ভাবি যে এই রবীন্দ্রনাথই নিজে বাংলা কাব্যের গঠন-রীতিকে কি আশ্চর্য্য পরিপূর্ণতা দান করেছেন,—তখন এমন শিষ্যকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যে গুরু তাঁকে নমস্কার না করে পারি না। এইখানে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর গীতি-নাট্য 'বাল্মিকী-প্রতিভার' মূলভাব ও শব্দবিন্যাস কিয়ৎপরিমাণে 'সারদা-মঙ্গল' থেকে গৃহীত।

শ্রীযুক্ত সারদা মিত্র ও অক্ষয় সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ তরুণ কবি প্রচুর আগ্রহ সহকারে পড়তেন। মৈথিলী ভাষা ছিল তাঁর কাছে দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু ঠিক সেই জন্যই তার ভিতর প্রবেশ করবার জন্য তাঁর অধ্যবসায়ের অন্ত ছিল না। ফলে সে ভাষাটাকে তিনি এমন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছিলেন যে ভারতীতে 'ভানুসিংহের পদাবলী' প্রকাশ করে তিনি ঠকিয়েছিলেন দেশ শুদ্ধ লোককে। এমন কি জার্ম্মানীতে প্রাচীন ভারতের গীতিকাব্য সম্বন্ধে যে গবেষণা করে তখন একজন ভারতীয় ছাত্র ডাক্তার উপাধি পেয়েছিলেন,—সেই গবেষণার মধ্যে 'ভানুসিংহকে' একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হ'য়েছিল।

এই সব বাংলা কাব্যচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ও সংস্কৃত বইও পড়তেন, প্রচুর অধ্যবসায়ের সঙ্গে, অবশ্য সব সময়েই তাঁর নিজের প্রণালীতে,—অর্থাৎ অর্থবোধের জন্য বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে। একবার প্রচুর ছবিওয়ালা টেনিসনের একটা কাব্যগ্রন্থ হাতে এসে পড়েছিল। গ্রন্থটি তাঁর কাছে ছিল "রাজপ্রাসাদেরই মত নীরব।" ছবিগুলির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বাক্যগুলো তাঁর কাছে ঠেকত 'কুজনের' মত। শ্রীরামপুরের পুরাতন ছাপা ডাক্তার হেবর্লিন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত একখানি সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ-গ্রন্থও তিনি কিছুমাত্র বুঝতে পারেন নি, "কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি ও ছন্দের গতি তাঁকে 'কত দিন মধ্যাহ্নে অমরু-শতকের মৃদঙ্গ-ঘাত-গম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়াছে"।

ঠাকুর-বাড়ীতে নিরন্তর যে সাহিত্যের হাওয়া বইত, তার সঙ্গে এই সব কাব্য-অনুভূতি,—নানারকমের বই পড়ে এখান থেকে সেখান থেকে পাওয়া নানা অনুভূতি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে মিশে গিয়েছিল। জীবনস্মৃতিতে কবি তা' এমন চমৎকার বর্ণনা করেছেন যে এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন (পৃঃ ৯২-৯৮)। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে, যে সারা-যৌবনটা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সত্তাটি সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীতের হাওয়ায় রোমে রোমে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা জীবনস্মৃতিতে নেই,—এখানে বলি। একদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর লেখা একটি নাটকের প্রুফ সংশোধন করছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃত পড়াতে এসে-ছিলেন যে পণ্ডিত, তিনি পাশের ঘরে রবীন্দ্রনাথকে পড়া দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করছিলেন। পণ্ডিত উচ্চকণ্ঠে সংশোধিতব্য পাঠ আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন আর পাশের ঘর থেকে তাঁর ছাত্র পড়ার ভাণ করে সেই দিকে কাণ রেখেছিলেন খাড়া করে। করুণ রসাত্মক একটা দৃশ্যে গদ্যে লেখা খানিকটা অংশ তাঁর কবি-কর্ণে বড়ই বেখাপ্পা লাগ্‌ল। পড়ার ভাণ করা আর চল্ল না, জ্যোতিদাদাকে সে কথা না বলে থাকাটা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছোট ভাইএর আপত্তি স্বীকার করলেন,—কিন্তু বললেন, এখন আর পরিবর্ত্তন করার সময় নেই। রবীন্দ্রনাথ তখনি তখনি সেই দৃশ্যের উপযুক্ত কাব্য অংশটুকু রচনা করে সকলকে চমৎকৃত করে দিলেন। সে অংশটা নাটকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। *

'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে একটা সদ্যপ্রকাশিত মাসিকপত্রে রবীন্দ্র-নাথের প্রথম রচনাবলী যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেরো। কোনোদিন হয়ত কোনো নিষ্ঠুর সমালোচক খেয়ালের বশে এই সব বাল্যরচনাগুলিকে বিস্মৃতির অন্তঃপুর থেকে টেনে বের ক'রে লোক চক্ষুর অকরুণ দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত করতে পারেন,—এমন আশঙ্কা জীবনস্মৃতির এক জায়গায় কবি প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ আশঙ্কা যে সত্য —তা' প্রমাণ করবার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আমাদের নেই; তবে এই সব রচনা সম্বন্ধে কবির নিজেরই উক্তি থেকে তাঁর

* বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পৃঃ ১৪৭

এই সময়কার চিত্তবিকাশের কতকটা ধারণা করতে পারা যায়। কবির মতে গদ্যে ও ছন্দে এই সমস্ত রচনা যেমনটি হওয়া সম্ভব ছিল ঠিক তেমনটিই হ'য়েছিল। তখন,—"মনের মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে। সেই বাষ্পভরা বুদ্বুদ-রাশি, সেই আবেগের ফেনিলতা অলস কল্পনার আবর্ত্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে! কেবল টগ বগ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফটিয়া ফাটিয়া পড়া! তাহার মধ্যে বস্তু যাহা কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যেটুকু, সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে, তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা"।

নিজের লেখার উপর পরিণত বয়সের রায়—একটু কঠোর হ'য়েই থাকে। তা' হোক এ রায় স্বীকার করতে কোনো ক্ষতি নেই। তবুও এটা বলতে হ'বে যে যতই অর্ব্বাচীন ও মূল্যহীন হোক না কেন এই সব বাল্যরচনা, তথাপি কবির পরিণত বয়সের রচনার যা' বিশেষত্ব তার বীজ এরই মধ্যে অস্পষ্ট দেখা যায়,—সেই গভীর মানবিকতা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় যোগের সেই একটা জীবন্ত অনুভূতি, সেই বিশ্বপ্রেমের হাওয়া যার মধ্যে আছে নিখিল মানবের ইতিহাসে একটা নব যুগের সূচনা। এই যে অশান্তি,—চিত্তের এই যে অশ্রান্ত আক্ষেপ,—এরই বেদনা থেকে রবীন্দ্র-প্রতিভার জন্ম। সেই শৈশবকাল থেকেই আমরা জানি তাঁর চিত্ত নিরন্তর কিরকম ব্যথিত হ'ত,—বিশ্বপ্রকৃতির আড়ালে-আবডালে কী যেন অনুভব করছেন, অথচ ধরতে পারছেন না,—আর তাই ধরবার জন্য কী তাঁর আকুলি বিকুলি! যা' তখন ধরতে পারেন নি,—তারই আঘাতে খুলেছিল তাঁর অন্তর্দৃষ্টির দুয়ার। যা' তাঁর সঙ্গে এমনি করে সর্ব্বদা লুকোচুরি খেলত,—তারই আহ্বান তিনি শুনতেন সর্ব্বত্র। এই যে রহস্য,—যা' তাঁর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার অনন্ত বৈচিত্র্যকে নিরন্তর আঘাত করত,—এই রহস্য-উদ্ঘাটনেরই অবিশ্রান্ত চেষ্টায় কেটেছে তাঁর সারা জীবন,—রচিত হয়েছে তাঁর সমস্ত গ্রন্থ। সেই জন্য তার নানা গ্রন্থে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা,—তারই আলোক-সম্পাত করতে না পারলে তাঁর প্রতিভার পরিণতির ধারাটি ঠিক অনুকরণ করা বা বোঝা যায় না। আগামী পরিচ্ছেদে আমরা এই পরিণতির ধারা অনুসরণ করবার চেষ্টা করব; এখানে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে কবির এই সব বাল্য-রচনা যার সম্বন্ধে এমন সব তাচ্ছিল্যের উক্তি করা হ'য়েছে,—তা' মোটেই নিরর্থক হয়নি। সে গুলোকে মনে করতে হ'বে গোপন-চিত্তের বিকাশের পথে একটা অপরিহার্য্য আশ্রয়-স্থল, যখন আত্মপ্রকাশের জন্য আকুলতা থাকে অথচ উপায় জানা থাকে না, যখন অনভিজ্ঞতার বেড়াজালে সঙ্কীর্ণীকৃত পারিপার্শ্বিকের সীমারেখা টপ্‌কে বাইরের জগৎটার সঙ্গে একটা মুক্ত যোগ-সাধনে বাধা থাকে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সব বাল্যরচনার অধিকাংশই আজকাল আর পাওয়া যায়না। আমরা এগুলো সম্বন্ধে যা' জানি'—তার জন্য আমরা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবিশের আলোচনার কাছে ঋণী। সে সব রচনার মধ্যে 'বনফুল' বেরিয়েছিল 'জ্ঞানাঙ্কুরে'—১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে; 'কবি-কাহিনী' প্রকাশিত হয়েছিল, 'ভারতীতে' ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে, এবং দুটোই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। জীবন-স্মৃতিতে এই বই দুখানির মধ্যে দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে কবি বলেছেন, —"যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্ত্তিটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিতেছে ইহা সেই বয়সের লেখা। সেই জন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে ইহা তাহাই।" (পৃঃ ১১৮)

সে যা-ই হোক্,—বালকের রচনা সেই হিসাবেই বিচার করতে হবে; এবং এটা নিশ্চিত যে, রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল সুরটি এখন থেকেই অস্পষ্ট টুংটাং আরম্ভ করেছে। ষোলো বছরের বালকের কল্পনাতেই প্রকৃতির ক্রোড়ে কবি-জীবনের আদর্শ বেশ সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে,—তারপর দেখা যায় মানব-সঙ্গলাভের জন্য কবির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তা' যদি বা মিলল,—তার একঘেয়েমির প্রতি জাগ্‌ল বিতৃষ্ণা,—নূতন নূতন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হোলো নূতন নূতন অভিজ্ঞতার। তখন কবি ত্যাগ করল তার প্রণয়িনীকে,—সে-বেচারী অকালে শুকিয়ে

ঝরে গেল। কবি ফিরল,—কিন্তু হায়,—যা' ঘটে থাকে, তাই ঘটল,—অর্থাৎ তখন আর সময় ছিল না। তারপর অনন্ত ভব-ঘুরেমি! শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে বিশ্বপ্রেমের আদর্শের মধ্যে সকল কোলাহলের পরিসমাপ্তি! এই বালক-বয়সেই প্রকৃতি-বর্ণনা ও চিন্তাবেগ-বর্ণনার মধ্যে যে প্রাঞ্জলতা, পরিচ্ছন্নতা ও সতেজ নবীনতা আছে,—তা মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। রচনা যতই কাঁচা হোক না কেন,—এর ভিতরকার অনুপ্রেরণা ছিল খাঁটি ও সত্য, তার মধ্যে মেকি কিছুই ছিলনা।

সতেরো বছর বয়সে আইন-শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বিলাত পাঠানো হোলো। তাঁর মেজ বৌদিদি তখন তাঁর সন্তানদের নিয়ে সেখানে ছিলেন, কাজেই প্রবাসের প্রথম অসুবিধাগুলো তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু আবার সেই স্কুল! হোক্ না তা বিলাতের! বিলাতের স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে যদিও কবির কিছু বলবার ছিল না, তথাপি সেখানেও তাঁর মন বসেনি। ব্রাইটনের একটা সাধারণ স্কুলে অল্প কয়েকদিন নিষ্ফল "শিক্ষালাভের" পর কবি লণ্ডনে রিজেণ্ট পার্কের সামনে একটা বাড়িতে কিছুদিনের জন্য মুক্তিলাভ করেছিলেন। এখানে আবার সেই শৈশবের মত কয়েকটি নিরালা দিন কেটেছিল জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে,—কিন্তু শৈশবের সেই দিনগুলিতে যে একটা হাস্যোজ্জ্বল আহ্বান ছিল,—লণ্ডনের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে তার দেখা মেলেনি।

কিছুদিন তিনি লাটিন শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—ফল অবশ্য বিশেষ কিছু হয়নি। জীবন-স্মৃতিতে তাঁর লাটিন শিক্ষকের একটা চমৎকার ছবি আছে। ছাত্রকে লাটিন শিক্ষা দেবার তাঁর যত না উৎসাহ ছিল,—তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁর উৎসাহ ছিল,—ছাত্রের নিকট তাঁর একটা মত প্রচার করবার,—সেটা হ'চ্ছে এই যে "পৃথিবীতে এক একটা যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানবসমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে; অবশ্য সভ্যতার তারতম্য অনুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, কিন্তু হাওয়াটা একই।" এই বাতিকগ্রস্ত লাটিন-শিক্ষকের নিকট কবির লাটিন-শিক্ষা কিছুই হয়নি,—কিন্তু এঁর মনে যে একটা অদম্য উৎসাহ ছিল,—তরুণ কবির মনে তার একটা প্রতিধ্বনি জেগেছিল, এবং আজও কবির বিশ্বাস যে "সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটা অখণ্ড গভীর যোগ আছে; তাহার এক যায়গায় যে-শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।"

এর পরে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ইংরেজ পরিবারে বাস করেছিলেন,—তার মধ্যে স্কট্-পরিবার সম্বন্ধে তাঁর মনে বিশেষ রকম সুখকর স্মৃতি আছে। এই সময়ে ভারতীতে তিনি কতকগুলি চিঠি প্রকাশিত করেছিলেন,—পরে "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" নামে চিঠিগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই চিঠিগুলি থেকে বেশ বোঝা যায় স্কট-পরিবারে বাস-কালীন সামাজিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর মানসিক দৃষ্টি কেমন প্রসারতা লাভ করেছিল (নবম ও দশম পত্র দ্রষ্টব্য)।

এই "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" সম্বন্ধে জীবন-স্মৃতিতে কবি আক্ষেপ করে লিখ্ছেন, "অশুভক্ষণে বিলাতযাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন আর এগুলিকে বিলুপ্ত করা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্য বয়সের বাহাদুরী।" চিঠিগুলিতে অবশ্য ভাবের গভীরতা ও সংযম বিশেষ না থাকলেও অনুভূতির নবীনতা ও সরসতা এবং তারুণ্যের উৎসাহ ও দীপ্তি এমন আছে যা' বেশ উপভোগের জিনিস। বিশেষ করে এগুলির মধ্যে দেখা যায় কেমন করে কবির চিত্ত ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে শিকড় গেঁথে রেখে য়ুরোপীয় চিন্তাধারা থেকে রস সঞ্চয় করে প্রসারতা ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন। এই সাহিত্যে যে একটা মানবিকতার সুর ও উদ্দাম গতিবেগ আছে তা' তাঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল; তবে এর মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা আছে, ভারতীয় জীবনধারার শান্ত সমাহিত ভাবের তা' বিরোধী। তা মনকে মাদকতা দেয়, উত্তেজনা দেয়, এমন কি মুগ্ধ করে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে হ'য়েছিল যে প্রকৃত ললিত-কলার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় যে জিনিষ,—যা' আবেগের চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয়,—সেই একটা সহজ সংহতি ও সংযম,—সেইটেরই যেন এখানে অভাব।

যা-হো'ক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে অনেক কিছু বিরুদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে হ'য়েছিল,—প্রাণশক্তিতে যার কোনটাই কোনটার চেয়ে কম নয়। এমন অবস্থায় তাঁর প্রথম রচনাবলীতে যে-সব আতিশয্যের জন্য আজ তিনি অনুশোচনা করেন,—সে-সবই ক্ষমনীয়। বাস্তবিক পক্ষে সেগুলো বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আপনাকে উপলব্ধি করবার একটা অশ্রান্ত ও প্রচণ্ড চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা দেখেছি, তাঁর চিত্তের গহন তলে কি-একটা অশান্তি ও বিক্ষোভ নিরন্তরই তাকে একটা অভিজ্ঞতা থেকে আর একটা অভিজ্ঞতার মধ্যে ঠেলে ঠেলে দিয়েছে। অন্যদের কাছ থেকে তিনি হয়ত অনেক কিছু গ্রহণ করতেন,—কিন্তু তাঁর নিজের চিত্তের গতিবেগের সঙ্গে সে গুলোর তাল রাখতে না পারলে বা সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলে তিনি যেন কিছুতেই স্থির হতে পারতেন না। তাই মাঝে মাঝে অনেক কিছু তার হৃদয়কে আঘাত করেছে,—কিন্তু তিনি সে আঘাত প্রতিরোধ করেছেন। বাইরের প্রভাবে উদাসীন তিনি ছিলেন না কখনই, কিন্তু তার মধ্যে নিজেকে কখনো হারিয়ে ফেলেননি। এবং যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তার নিবিড় অনুভূতির মধ্যে সাড়া পেতেন, ততক্ষণ কিছুই গ্রহণ করতেন না। বাইরে থেকে তিনি যা' কিছু গ্রহণ করতেন,—তার চিত্তের সৃষ্টিলীলায় তা' এমনভাবে তাঁর সমস্ত সত্ত্বার সঙ্গে মিশে যেত,—যে এখন বিশ্লেষণ করে আর তার কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে এলেন, তার আত্মীয় স্বজনরা ভাবলেন সেখানে কিছুই করে আসেন নি, সেখান থেকে এমন কিছুই নিয়ে আসেন নি যার মূল্য আছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তার চিত্তটাকে এনেছিলেন অনেক সমৃদ্ধ করে। "ভগ্ন-হৃদয়" নামে একটা কাব্য বিলাতে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন,—ফিরে এসে শেষ করেন। এ বইখানিও আগেকার বই দুখিনির সমজাতীয়। এখানেও এক কবি প্রণয়িণীর কাছে ফিরে এল বড় দেরিতে যখন সে ইহলীলা সংবরণ করেছে। এ কাব্যখানা পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল,—যদিও লেখকের নিজের মতে এখানাও যে-চিত্ত থেকে প্রসূত, সে-চিত্তে তখনো সত্যের আলো প্রবেশ করে নি,—এলোমেলো আবেগের ভিতর দিয়ে এক আধটা রশ্মি স্পর্শ করেছে মাত্র।

এই যুগটাই হোলো রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে শিক্ষানবিশীর যুগ। তাঁর অনুপ্রেরণার পিছনে যে-সব শক্তি কাজ করেছিল, তার মধ্যে সঙ্গীতকে ভুললে চলবে না। আমরা দেখেছি অতি শৈশবেই সঙ্গীত প্রবেশ করেছিল তাঁর জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বিলাতে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের যাকে বলা হয় রোমান্টিসিজ্‌ম,—অর্থাৎ যা' সুরের মধ্যে জীবনের বহু বিচিত্র দিককে প্রকাশ করে,—তাই তাঁকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলছেন, "য়ুরোপের সঙ্গীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায় এই জন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য,—সে যেন বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্ব্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত,—সেই রহস্য লোক বড় নিভৃত নির্জ্জন গভীর—সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে—কিন্তু সেখানে কর্ম্ম-নিরত সংসারীর জন্য কোনো প্রকার সুব্যবস্থা নাই।" (পৃ ১৪২-৫০) য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সঙ্গীতের এই যুগপৎ প্রভাবে বিলাত থেকে ফিরে এসে তিনি পারিবারিক বৈঠকখানায় অভিনয়ের জন্য "বাল্মীকি-প্রতিভা" নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করেন। এর সুরগুলি অধিকাংশই ভারতীয়, কিন্তু তাদের "বৈঠকি মর্য্যাদা" থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে এনে নাটকীয় অভিনয়ের উপযোগী করে তোলা হ'য়েছে। বাল্মীকী-প্রতিভার এইটেই হোলো বিশেষত্ব,—গান ও অভিনয়ের জন্যই বইখানি রচিত পড়ার জন্য নয়।

এমনি করেই য়ুরোপীয় সাহিত্য ও সঙ্গীতের দান রবীন্দ্র-চিত্তের উর্ব্বর ভূমিতে বপিত হ'য়েছিল, সে-চিত্তের নিজস্ব বিশিষ্টতার সঙ্গে তার ঘটেছিল পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। আগে থেকেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রাণশক্তি ও বাধাহীন প্রকাশ-রীতিতে সে চিত্তের মধ্যে জেগেছিল গভীর স্পন্দন,—সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ দর্শন' এনেছিল বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিসিজ্‌ম্‌। তারই সঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্তে এসে মিলল যখন য়ুরোপীয় রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ তখন আপন কল্পনার মধ্যে সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য অন্তরে জাগল একটা তীব্র আবেগ। তখন এসেছিল একটা দিন, যখন 'বাড়ীতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর, সঙ্গীতের অবিরল বিগলিত ঝরণা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে, তখন নবযৌবনে নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে, তখন সকল জিনিষই পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি, কিছু যে পারিব না, এমন মনেই হয় না। তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুর ভাবে ঢালিয়া দিতেছি। এমনি করেই কবি তাঁর সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে পদক্ষেপ করেছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

ঋতুচক্র

বৎসর বৎসর ঋতুগুলি পর পর ঘুরে আসে নির্ভুল নিয়মে। দিনের পর যেমন রাত্রি, শীতের পর তেমনি বসন্ত। ভারতের ছয়টি ঋতুর আসা-যাওয়ার নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম হয় না। বৎসরের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত ঋতুচক্রের সঙ্গে মানুষের জীবন ধারাও পরিবর্ত্তিত হ'তে থাকে।

কোন ঋতুতে কি আহার ও পান করা উচিত সে সম্বন্ধে আমাদের পঞ্জিকায় নির্দ্দিষ্ট বিধি দেওয়া আছে। দেহের স্বাস্থ্য ও মনের শান্তি লাভ করবার জন্যে এখনো ভারতের অনেক লোক নিখুঁতভাবে সে সমস্ত বিধি পালন করে।

এ দেশের লোক এককালে এখনকার মত এত বেশী চায়ের কদর বুঝত না। তখন যারা চায়ের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল তাদের ধারণা ছিল চা শুধু শীত কালেই সেব্য, গরম চায়ের পাত্র নিঃশেষ করার পর যখন উষ্ণতাটি সমস্ত ছড়িয়ে পড়ে ভারী আরাম দেয় সেই জন্য। কিন্তু আজকাল চা-পানের কোন নির্দ্দিষ্ট ঋতু বা সময় আছে বলে কেউ মনে করে না। যে-সমস্ত সংসারে নিয়মিতভাবে চা খাওয়া হয়, সেখানে সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত চায়ের পাট কোন সময়ে বন্ধ থাকে না। আজকাল চা সব সময়েই খাওয়া হয়।

সত্য কথা বলতে গেলে, গ্রীষ্মকালে সমস্ত পানীয়ের মধ্যে একমাত্র চা-ই আমাদের শরীর ঠাণ্ডা রাখতে পারে। গরম যখন অসহ্য তখন ঠাণ্ডা সরবৎ প্রভৃতি খেতে লোভ হলেও, আসলে তাতে শরীর ঠাণ্ডা হয় না। কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মকালে দুপুরে যদি দু-তিন পেয়ালা ভালো স্বদেশজাত চা খাওয়া যায় তাহ'লে প্রচুর ঘাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর কয়েক ঘণ্টা সত্যি শীতল থাকে। বছর ভ'রে দিন রাত যে-কোনো সময়ে শুধু একটি মাত্র পানীয়ই ব্যবহার করা যায়—সে পানীয় হ'ল চা। তার বদলে আর কিছু চলে না, চলতে পারেনা। চা সকল ঋতুতে আদর্শ পানীয়।

তাই নাকি?

সত্য নাকি কখনও কখনও কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর হয়। কোনো সত্য যখন আমাদের কাছে প্রথম প্রতিভাত হয় তখন অন্ততঃ আমাদের সেই রকমই মনে হয়। আপনা থেকেই আমরা বলে উঠি,—"তাই নাকি?"

উত্তর আসে—"হ্যাঁ, তাই।" বয়স বাড়বার সঙ্গেই আমাদের জ্ঞানও বাড়ে।

সাধারণ সুস্থ বুদ্ধিমান অনুসন্ধিৎসু একজন লোকের কথাই ধরা যাক। নিজের যার ওপর হাত নেই এমন কোনো অবস্থার দরুণ হয়ত সে বিশেষ কোনো হিতকর খাদ্য বা পানীয়ের কথা জানবার সুযোগ পায়নি। সম্প্রতি কোন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু তাকে সে খবর দিয়েছে। প্রথমটা তার পক্ষে একটু সন্দিগ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। বন্ধুর লোভনীয় দান গ্রহণ করবার আগে তার গুণ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত হতে চায়। গোড়ায় হয়ত একটু তর্কও উঠতে পারে, কিন্তু সে রকম তর্ক হওয়া ভালো; কারণ চট্ করে কোনো গভীর ধারণা গড়ে উঠা উচিত নয়। দুই বন্ধুতে তাই ভাল মন্দ সব দিক ধরে ব্যাপারটাকে চুটিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করে।

নূতন কোন খাদ্য বা পানীয় সম্বন্ধে তর্কের মীমাংসা করবার সব চেয়ে ভালো উপায় হ'ল জিনিষটিকে একবার নিজে পরীক্ষা করে বিচার করা। অন্ততঃ এদেশে যে শত শত নতুন লোক নিত্য চা-রসিকদের দলে ভিড়ছে তাদের বেলা এ কথা বারবার সত্য হয়েছে বলে আমরা জানি। চায়ের নাম যে সম্ভবতঃ কখনও শোনেনি তাকে হয়ত এক পেয়ালা চমৎকার ভারতীয় চা খেতে দেওয়া হ'ল। একগুঁয়ে বা অবুঝে সে নয়; একটু অনুরোধ করতেই পেয়ালায় একটি

চুমুক সে হয়তো দিলে। তারপর! তারপর আর কি! সে পেয়ালা শেষ করে সে হয়ত আরেকটু চেয়েই বসবে! চায়ের পেয়ালা শেষ না করে উঠে গেছে এমন লোক কোথাও কেউ দেখেছে কি—হোক না কেন সেই তার প্রথম চা-খাওয়া!

চা পানীয় হিসাবে জনপ্রিয় হতে বাধ্য। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে সস্তা অথচ মধুর এবং তেজস্কর পানীয়ের জন্য সকলেই ব্যাকুল, সেখানে চায়ের আদর ত হবেই। এ দেশের চা-প্রীতির প্রসার খুব বেশী দিন আগে থেকে আরম্ভ হয়নি, কিন্তু বহুদিনের মধ্যে এর চেয়ে আশাপ্রদ ঘটনা কিছু আমাদের চোখে পড়েনি।

ভারতীয় চা জিনিষটি আসলে কি, দেশবাসীর সমাজিক নৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের কল্যাণ-সাধনে তার দান কতখানি, এ সমস্ত তত্ত্ব এখন আর শুধু তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। সুদূর গ্রামের অত্যন্ত সরল কৃষকও আজ চায়ের মূল্য সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন হয়ে উঠেছে। চায়ের চেয়ে ভালো বিশুদ্ধ ও সুলভ পানীয় যে আর নেই এ-কথা সে নিজেই আবিষ্কার করেছে। মাত্র একটি পয়সা খরচ করলে সে পাঁচ পেয়ালা চমৎকার পানীয় পেতে পারে। এ পানীয় যা থেকে তৈরী হয় সেই চা সম্পূর্ণভাবে তার দেশজ জিনিষ। দৈনন্দিন জীবনে তাই সে চায়ের এমন কদর করতে শিখেছে।

"তাই নাকি?"

আমরা উত্তরে জোর করে বলি,—"নিশ্চয় তাই।"

কলিকাতায় আয়ুষ্কাল

ডাঃ কে, জি, ঘোষ এম-বি

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তি রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ"

কালচক্রের আবর্ত্তনে বৎসরের পর বৎসর এই শরৎকালে মায়ের আগমনে আমাদের এ রোগক্লিষ্ট বাংলা দেশে একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়। কত বেদনা বিক্ষোভের, কত শোকের ও সন্তাপের, কত মৃত আত্মীয় স্বজনের স্মৃতির মধ্যে কত রোগ ও দৈন্যের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ বনিতা, ধনী বা নির্ধন সকলের মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের বন্যা বহে। কিন্তু এ উৎসবের দিনেও অনেকের মাঝে প্রাণ-ভরা উল্লাস, গাল-ভরা হাসি, বুক-ভরা প্রীতি নাই—কোথায় কোন নিবিড় বেদনায় বা কোন লোকচক্ষুর অজানা ক্ষতে জর্জ্জরিত, তাহা কেহ তো সন্ধান রাখে না।

বাংলা রাজধানী কলিকাতা, ব্রিটিশ রাজত্বে দ্বিতীয় সহর হইলেও এবং বিশাল প্রাসাদ সমূহে সমৃদ্ধিশালী হইয়া গৌর-বান্বিত হইলেও রোগসংখ্যায় এমন কি মৃত্যুসংখ্যায় বিশেষতঃ শ্বাসরোগে, অন্যান্য প্রাদেশিক সহর হইতে অনেক বেশী।

পৃথিবীর বুকে সর্দ্দি কাশি একটী সাধারণ রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রতিরোধের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, উপশমের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। প্রথমাবস্থায় এই সাধারণ সর্দ্দি কাশি নিবারণে সচেষ্ট না হইলে দিনে দিনে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া এমন কি পরিশেষে মারাত্মক যক্ষ্মা রোগে দাঁড়াইতে পারে। শীতের সমাগমে শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই বায়ুনলী ও ফুসফুস্ প্রদাহ জন্য কাশিতে ভুগিতে থাকেন।
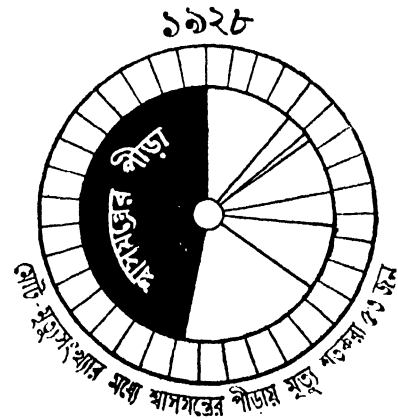
উপরের ১নং চিত্র হইতে দেখা যায় ১৯২৮ সালে

কলিকাতা সহরে মোট মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় মৃত্যু শতকরা ৫৩ জন। শিশুদের মধ্যে মৃত্যু হার কম নয়। ১ সপ্তাহ হইতে ১ মাস বয়স্ক ১০৩১ মৃত্যুর মধ্যে ১৪২ শিশু ব্রঙ্কাইটিস্ ও ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াতে মারা গিয়াছে। ১ হইতে ২মাস বয়স্ক ৫৫০টী শিশু ব্রঙ্কাইটিস্ ও নিউমোনিয়া রোগে, ২ হইতে ৩ মাস বয়স্ক ১৪২টী, ৩ হইতে ৬ মাস ৪৪৩ শ্বাস মারা যায়।
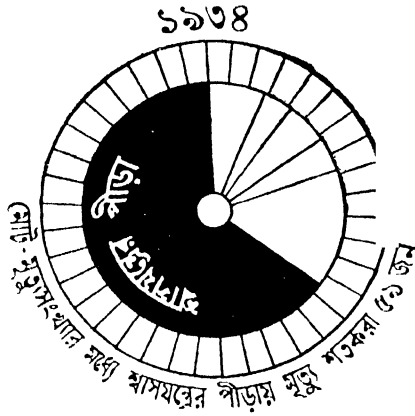
মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতেছে, কলিকাতা সহরে শ্বাস রোগের উপশম হয় নাই। ১৯৩৪ সালে ঐ পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা মৃত্যু সংখ্যা ৫৯ জনে দাঁড়াইয়াছে। এ অবস্থায় রোগের উৎকটতার জন্য আমাদিগকে হতাশ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। রচির সিরোলিন শ্বাস পীড়ায় প্রভূত উপকার করে বলিয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছে, সেজন্য ঘরে ঘরে আজকাল ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যক্ষ্মা রোগের প্রথমাবস্থায় ও অন্যান্য শ্বাসরোগে সিরোলিনের কার্য্যকারিতা অতুলনীয়। পূজা আগমনে এ আনন্দের দিনে অনেক গৃহে সিরোলিন আনন্দ আনিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ডাঃ কে ঘোষ

রিক্ত

শ্রীসুপ্রভা দেবী

শুধু এতটুকু ধন ; এতটুকু স্নিগ্ধ ভালবাসা,
প্রাণপণে বক্ষে চাপি ভেবেছিনু রাখিব লুকায়ে
জগতের দৃষ্টি হতে। সকরুণ হৃদয়ের ছায়ে
কত যত্নে করেছি লালন, শিখায়েছি কত ভাষা,
কত মধু প্রিয় নাম ! দক্ষিণের চঞ্চল পবনে,
বিবশা মাধবী রাতে অন্তরের নিভৃত শিথানে,
সহসা জাগিয়া আজি, সেই আশা অশান্ত ক্রন্দনে
কী কথা কহিতে চায় ! সুদূরের তারা হ'তে আনে
বহি', সে কি বহু পূর্ব্ব জনমের বিস্মৃত তিয়াষা !
বক্ষ হ'তে বাহিরিয়া উড়িবারে চায় পাখা মেলি'
মহাকাশ নীলিমায় ! মোর স্নেহে মিটিলনা আশা,
তাই আজি সুদূর প্রয়াসী হবে, মোরে যাবে ফেলি'।
শূন্য বক্ষে শূন্য কক্ষে নিভাইয়া আশাদীপখানি,
একমনে প্রতীক্ষিব মরণের সর্ব্বশেষ বাণী।

দেবীর নির্দ্দেশ

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

মেসের একটি ছোট ঘরে নরেন যখন তার বিছানা ছেড়ে উঠল, পূর্ব্ব আকাশে সূর্য্য তখন খরতর হয়ে উঠেছে। প্রভাতের কোলাহল সবে সুরু হয়েছে। পাশের ঘরে পরিমল উচ্চস্বরে বিল্বমঙ্গলের একটা অংশ রিহার্সাল দিতে সুরু করে দিয়েছে।

নরেন বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মেসের চাকর নরেনকে একখানি চিঠি দিয়ে গেলো। মনোরমা লিখেছে চিঠিখানি নরেনকে, চিঠির সারাংশ হল এই,—তাকে গ্রামে এসে মনোরমা ও তার প্রতাপপুরের কাকিমাকে নিয়ে মাসীর বাড়ী যেতে হবে, তার মাসতুতো ভাইয়ের বিয়ে, সময় মাত্র তিন দিন আছে।

চিঠি পড়েই নরেনের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অফিসের বড় বাবু ছুটী মঞ্জুর করবে কিনা তখন এই চিন্তা তার মনে উঠল সারা মুখখানা তার হয়ে গেল নিষ্প্রভ।

পাশের ঘর থেকে বিল্বমঙ্গল বইখানা হাতে করে অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত নাড়তে নাড়তে পরিমল বেরিয়ে এসে নরেনের হাত ধরে বলল, বন্ধু অত ভাবছ কেন? হাতে কার চিঠি? কিছু দুঃসংবাদ না কি? এসো এসো ঘরে এসো। মেন পার্ট নিয়ে নামছি, কি রকম পার্ট তৈরী করেছি শুনবে এসো। কাল পরশু মুসলমানদের পর্ব্ব, অফিস ছুটি, তার পরদিন বড় সাহেব যাবে বিলেত, সে দিনও অফিসের বালাই নেই, দুদিন চেপে তৈরী করে নেবো; থার্ড ডে তে প্লে। ষ্টেজে একটা সেন্‌সেশ্যান্ ক্রিয়েট্ করব।

নরেনের মনে ছিলনা যে, কাল থেকে মুসলমান পর্ব্ব উপলক্ষে ছুটি, আর পরশু বড় সাহেব বিলেত যাচ্ছে। সারা মনটা তার আবার হাল্কা সুরে ভরে উঠল। স্মিতমুখে পরিমলকে বলল, ঘরে চল্, তোর পার্ট শোনা যাক্।

ঘরে ঢুকে নরেনকে একটা টুলের উপর বসতে দিয়ে পরিমল হস্ত-সঞ্চালন ও মুখভঙ্গী সহকারে বিল্বমঙ্গলের একটা অংশ বলে যেতে লাগল।

নরেনের মন কিন্তু সে দিকে একবারেই ছিল না, চিঠিখানা হাতে নিয়ে সে জানালার বাইরে অসীম নীল-আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভাবছিল মনোরমার কথা। বিল্বমঙ্গলের একটা লাইনও তার কানে যায়নি।

আজ আট মাস মনোরমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। হঠাৎ কলকাতা থেকে তাকে টেলিগ্রাম করে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। তার বিয়ের তিন দিন আগে বড়দি মনোরমাকে দেখায়। নরেন দেখে, শ্যাম ঘোষেদের বাগানে মনোরমা গন্ধরাজ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে একটা হাতে উপরের একটা ডাল ধরে আর এক হাতে ফুল ছিঁড়ে আঁচলে রাখছে। এক মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ের চোখোচোখি, তারপরেই মনোরমা ছুটে পালিয়ে গেলো।

এক নিমিষের দেখাতেই নরেন মুগ্ধ হ'য়ে গেলো, শ্যাম-পত্র কুঞ্জের মধ্যে মনোরমাকে মনে হ'ল যেন বনদেবী। সুঠাম সুললিত দেহ, উজ্জ্বল রং, আয়ত দুটী চোখ, পরণে নীল শাড়ী। বিয়ের পর আর একদিন কয়েক ঘণ্টা মাত্র মনোরমাকে সে কাছে পেয়েছিল। হঠাৎ তার চিন্তায় বাধা পড়ল। পরিমল তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, খুব শুনছিস'ত?

নরেন লজ্জিত হয়ে বলল, না-না, শুনছিলুম, ভারী চমৎকার, খুব জমবে। পরিমল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলল, দু'দিন আরো সময় পাচ্ছি,—দেখবি, আরো এক্সেলেণ্ট করে তুলব।

একটু থেমে পরিমল আবার বলল, তুই আমার পার্টটা যদি প্রম্পট্ করিস তাহলে খুব ভাল হয়, তোর রিডিং খুব স্পষ্ট।

নরেন হেসে বলল, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমি তোর প্লের দিন উপস্থিত থাকতে পারব না। জরুরী চিঠি, বাড়ী যেতে হ'বে। পরিমলের উৎসাহ যেন কমে গেল।

ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল, বিবাহিত জীবনটাই ঐ রকম, সম্পূর্ণ পরাধীন, নিজের কোনই অস্তিত্ব থাকেনা। ইঙ্গিত পেলেই ছুটতে হ'বে, এক কথায় গোলাম হয়ে যাওয়া। আমরা বেশ আছি।

একতলার ঘরের মৃণাল পরিমলের ঘরে ঢুকে নরেনকে দেখতে পেয়ে বলল্, আরে! নরেনদা যে রয়েছ,—পাগলিনীর গান ক'খ'না শোনত ভাই?

পরিমল মৃণালের কথায় বাধা দিয়ে বলল, কাকে শোনাচ্ছিস? ওর তিল মাত্র ইন্টারেষ্ট নেই, উনি প্রের দিন উপস্থিত থাকবেননা, বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে,—পত্র পাঠ রওনা! একবারে হেন্পেকড্! মৃণাল গম্ভীর ভাবে ব'লে উঠল, নরেনদা একবারে প্রোজাইক্।

সন্ধ্যে ছ'টার সময় নরেন হাওড়া অভিমুখে অগ্রসর হ'ল। প্রশস্ত রাজপথ, দুধারে বৃহৎ অট্টালিকা, দোকানগুলি বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সজ্জিত। নরেনের সে দিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ ছিল না, তার মেস থেকে হাওড়া ষ্টেসনের ব্যবধান মাত্র দেড় মাইল। দ্রুত পদক্ষেপে সে অগ্রসর হ'তে লাগল। মনে হ'তে লাগল ষ্টেশন যেন আরো কয়েক মাইল পেছিয়ে গেছে।

মনোরমার গ্রামের ষ্টেসনে যখন সে পৌছল রাত তখন গভীর হয়েছে। মাথার উপর উদার অনন্তবিস্তৃত আকাশ, দূরে ঘন শালবনের মাথায় তৃতীয়ার চাঁদ। সামনে সরুপথ। পথের দুধারে মটর ও ধানের ক্ষেত, মাঝে মাঝে বনকচু, ভাঁট শেওড়ার বন।

স্থটকেশ হাতে করে নরেন অগ্রসর হ'তে লাগল। বোষ্টম পাড়া পার হয়ে একবার এদিক ওদিক চেয়ে যখন খানিক দূরে মাটীর ঢিপির উপর বুড় বটগাছ দেখতে পেলো তখন তার মন প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল। ঠিক ঐ গাছটার পাশেই মনোরমার বাড়ী।

বাড়ীর সামনে এসে অর্গলবদ্ধ দরজায় আঘাত করল। ভেতর থেকে সাড়া দিয়ে একটী ছেলে দরজা খুলে নরেনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে চেঁচিয়ে উঠল, ও দিদি, আমি ঠিক চিনতে পেরেছি, জামাইবাবু এসেছেন।

নরেনের মুখ লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠল। ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে একজন বল্ল, খোকন আলোটা ধর্, তোর জামাই বাবুকে ভেতরে নিয়ে যা। ছোট পরিচ্ছন্ন একখানি ঘরে নরেন গিয়ে বসল। ঘরের চারিদিকে লক্ষ্য করতেই তার দৃষ্টি পড়ল দেওয়ালের গায়ে বাঁধান একখানি ফটোর দিকে।

ফটোখানি মনোরমার। নরেনের স্মরণ হ'ল আটমাস পূর্ব্বে এই ঘরে সে একরাত কাটিয়ে গেছে। জানালার বাইরে দৃষ্টিপাত করতেই তার নজরে পড়ল কাঁঠালিচাঁপা গাছটী। ঐ গাছ থেকে তিনটে ফুল ছিঁড়ে মনোরমার খোঁপায় গুঁজে দিয়েছিল।

ধীরে ধীরে উঠে সে জানালার কাছে গেল; গাছে তখনও দুটো ফুল ফুটে আছে। একটা খস্ খস্ আওয়াজ শুনে সে পেছন ফিরে দেখল, ব্রীড়ানত মুখে মনোরমা এসে দাঁড়িয়েছে।

নরেন দেখল, আটমাসের ভিতরে মনোরমার অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, আয়ত কৃষ্ণতার দুটি চোখ যেন আরো স্বপ্নাবিষ্ট, সারা দেহটী আরো পুষ্ট, সুললিত, মুখখানি আরো সুষমামণ্ডিত।

নরেনকে প্রণাম করে মনোরমা বিছানার একপাশে বসল। উভয়ের মধ্যে তখন এই ভাবে কথা সুরু হ'ল,—

ব্রীড়ানত মুখে মনোরমা জিজ্ঞেস করল, তুমি কেমন আছ?

হেসে নরেন উত্তর দিল, ভাল আছি মনোরমা।

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক।

মনোরমার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরে নরেন বলল, মনোরমা, আজ আটমাস পর তোমায় দেখলুম, আমার যে কত আনন্দ হচ্ছে, তা তোমায় কি করে জানাব। আমাদের এই মিলনের আনন্দ মাত্র দু'দিন, তারপর তোমাতে আমাতে আবার হ'বে কতদিনের ছাড়াছাড়ি।

আয়ত দুটী চোখ নরেনের মুখের উপর ফেলে মনোরমা বল্ল, আমাকে তোমার মনে পড়ে?

মনোরমার কোমল হাতে একটু চাপ দিয়ে হেসে নরেন বলল, সর্ব্বদাই মনে পড়ে। তোমার চিঠি যখন পাই একবার না একশো বারের উপর আমি পড়ি, তাতেও যেন তৃপ্তি হয় না।

মনোরমা বলল, তুমি মাঝে মাঝে এখানে চলে আসনা কেন? ভাঙ্গা গলায় নরেন বলল, উপায় কই মনোরমা।

গোলামী করে আর অবসর মেলে না। আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার বিকাশ হবার সম্ভাবনা খুবই কম, স্নেহ ভালবাসা আমাদের ভেতর তিলে তিলে অনাহারে মরে যাচ্ছে।

মনোরমা বল্ল, আমায় তুমি কলকাতায় নিয়ে চলো না? ক্ষীণ হাসি হেসে নরেন বলল, কোথায় নিয়ে যাব তোমায়? আমি যেখানে থাকি সে জায়গায় মানুষ খুব কষ্টে বাস করতে পারে। সঙ্কীর্ণ স্যাঁত সেঁতে মেস বাড়ী। আলাদা বাড়ী ভাড়া করবার মত অবস্থা ত আমার নেই। ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরাণী। মাস দুয়েক পর পঞ্চাশ টাকা মাহিনার একটা চাক্‌রী পাবার আশা এক ভদ্র লোক আমায় দিয়েছেন। যদি পাই তখন নিশ্চয়ই তোমায় নিয়ে যাব।

পুলকিত হ'য়ে মনোরমা বলল, ঠিক? ঠিক'ত?

মনোরমার মাথা বুকের কাছে টেনে নিয়ে নরেন বলল, নিশ্চয় ঠিক!

উভয়ে ক্ষণকাল নীরব থাকার পর নরেন বলল, ভোর হ'তে আর বিলম্ব নেই মনোরমা? কাল আবার ত প্রতাপ-পুরে রওনা হ'তে হ'বে।

সময়ের ভ্রূক্ষেপ এতক্ষণ কারোরই ছিল না। জানালার বাইরে দৃষ্টিপাত করতেই মনোরমা বুঝল ভোর হতে আর বিলম্ব নেই।

পরের দিন প্রতাপপুরে যাত্রা আরম্ভ হ'ল।

গ্রামের দক্ষিণ দিকে ময়না গাঙ বরাবর প্রতাপপুরের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে। বুড়ো মাঝি হরিনাথ ও তার পুত্র শশিনাথ নৌকা প্রস্তুত করে রেখেছিল।

নরেন, মনোরমা আর মনোরমার গ্রাম সুবাদে কাকা বৃদ্ধ ঘোষাল মশাই নৌকায় উঠে বসল।

বেলা তখন পাঁচটা।

দূরে ঘন শালবনের মাথায় সূর্য্য তখনও পশ্চিম আকাশে খরতর হয়ে আছে।

মনোরমাদের গ্রামের নাম নন্দনপুর। নন্দনপুর থেকে প্রতাপপুরে নৌকায় যেতে ঠিক চারটি ঘণ্টা লাগে।

ধীরে ধীরে নৌকা পশ্চিম দিকে বইতে সুরু হল।

হাওয়ার গতি বিপরীত দিকে থাকায় নৌকার গতি কোন রকমেই বৃদ্ধি হল না।

শশিনাথকে হাল ও বাঁশ দেবার ভার দিয়ে হরিনাথ দুটো ছোটো কল্‌কেতে তামাক সাজতে বস্‌ল। তামাক সাজার পর একটা কল্‌কে হুঁকায় বসিয়ে ঘোষাল মশায়ের দিকে ধরে বলল, আসুন ঘোষাল দা? এবং দ্বিতীয়টি নরেনের দিকে এগিয়ে ধরতেই হেসে বিনয়ের সুরে নরেন বলল, ধন্যবাদ, আমার চলে না। অগত্যা হরিনাথই হুঁকায় একটা দীর্ঘ টান দিয়ে চিন্তিতভাবে ঘোষাল মশাইর দিকে চেয়ে বলল, দাদা, নৌকার যা গতি দেখছি সাতটার আগে চেতল-পুর মন্দির বোধহয় পার হ'তে পারব না।

ঘোষাল মশাই ভ্রূকুঞ্চিত করে হুঁকায় আর একটা দীর্ঘ টান দিয়ে বলল, তাইত' দেখছি হরিনাথ!

বিশেষ কথা তাদের ভেতরে আর কিছুই হ'ল না। কেবল বিমর্ষ মুখে উভয়ে একবার চোখোচোখি করল মাত্র।

মনোরমা বা নরেনের কানে তাদের কোন কথাই পৌছায়নি। ছইয়ের একধারে বসে উভয়ে মুগ্ধভাবে গাঙের দুধারের শোভা নিরীক্ষণ করছিল। সঙ্কীর্ণ গাঙ, দুধারে বেতবন, কোথাও কেয়াবন, কেয়াফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে। মাঝে মাঝে বিস্তৃত মাঠ, বিচিত্র রঙের ফুলের ঝোপ, রক্তাভ সূর্য্যের আলো পড়ে ঝলমল করছে। কোথাও ঝুমকো লতার দল, তার পাশেই খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটীলেপা একসারি ঘর, আব্রুর বালাই রাখে না, তাদের সংসারের যা কিছু তৈজসপত্র সবই স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হ'চ্ছে।

মেয়েরা গামছা কলসি নিয়ে গাঙে গা ধুতে এসে নৌকা দেখে কেউবা মাথার কাপড় টেনে বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল, কেউবা ফ্যাল ফ্যাল করে মনোরমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তাদের হয়ত' ধারণা এত সুন্দর মেয়ে তাদের পাঁচ সাতখানা গ্রামে নেই। কোন বড়লোক বাবুদের মেয়ে বেড়াতে বেড়িয়েছে।

মনোরমাও কারোর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকে, কারোকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল।

নরেন মনোরমার হাত ধরে হেসে বলল, কি ভাববে ওরা বলত? মনোরমা প্রফুল্লভাবে বলল, কিছু ভাববে না! আচ্ছা, ওরা, বেশ আছে, না?

নরেন বলল, হ্যাঁ, সত্যিই ওরা বেশ আছে। ওদের

ছোট সংসার, ছোট সুখ, বৃহত্ত্বের স্বপ্ন ওরা দেখে না, দেখবার ইচ্ছেও করে না। জীবনে বিফলতা ওদের নেই বললেই চলে, সঙ্কীর্ণভাবে ওদের ঐশ্বর্য্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু মনে আছে উদার শান্তি, স্বাধীনতা, জীবনে যথেষ্ঠ অবকাশও ওদের মেলে। কিন্তু আমাদের জীবনটাকে আশা আকাঙ্ক্ষায় রাঙিয়ে তুলতে চাই বিচিত্র বর্ণচ্ছটায়,—হয়ে পড়ে বিবর্ণ, ব্যর্থ; মনের স্নিগ্ধ অনুভূতি ধুমায়িত হয়ে বিষিয়ে ওঠে। জীবনটা হয়ে যায় বৃহৎ জড়পিণ্ড।

মনোরমা বাধা দিয়ে বলল, আচ্ছা হঠাৎ যদি এখন ঝড় ওঠে?

নরেন হেসে বলল, আর নৌকা যদি যায় ডুবে!

নরেনের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে ছল ছল দুটী চোখে মনোরমা বলল, ছিঃ—সন্ধ্যেবেলায় ওকথা বলতে নেই।

ভীরু নেত্রে সত্যই মনোরমা আকাশের দিকে চাইল।

রক্তাভ গোধূলির স্বচ্ছ আকাশ।

চেতলপুরের কাছ বরাবর নৌকা আসতেই হরিনাথ বিমর্ষ ভাবে ঘোষাল মশাইকে জিজ্ঞেস করল, ঘোষাল দা সময় কত?

বিবর্ণ কোটের পকেট হ'তে ততোধিক বিবর্ণ রূপালী রঙের ঘড়ি বার করে তীক্ষ্ণভাবে অনেকক্ষণ দেখার পর ঘোষাল মশাই বলল, সাতটা বেজে দু'মিনিট।

কিয়ৎক্ষণ উভয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে হরিনাথ বলল, এইখানেই নৌকা রাখা যাক্। ঐ দূরে মন্দিরের মাথায় আলো জ্বলছে।

হরিনাথের শেষ কথাগুলি নরেনের কানে যেতেই বিস্মিত ভাবে নরেন জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে মাঝি, কেন নৌকা এখানে রাখবে? আর ঐ মন্দিরের ব্যাপারটাই বা কি?

হরিনাথ একবার ঘোষাল মশাইর দিকে দৃষ্টিপাত করল, তারপর নরেনের দিকে চেয়ে বলল, তোমার সে বাবু শুনে কাজ নেই।

নরেন হরিনাথের দিকে চেয়ে বলল, তোমায় বলতেই হবে মাঝি!

ঘোষাল মশাই নরেনের পিঠে হাত দিয়ে বলল, নাই বা শুনলে বাবা?

মনোরমা ও নরেন উভয়ে তখন ঘোষাল মশাইর কাছে সরে গিয়ে জেদ ধরল, বলতেই হবে ঘোষাল কাকা!

ঘোষাল মশাই আকাশের দিকে চেয়ে ভগবানকে করযোড়ে প্রণাম করে বলল, ঐ যে দূরে মন্দির দেখা যাচ্ছে, ঐ মন্দির এখন বিরাট ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়েছে। ঐ মন্দিরের ভার এখন কালিদাস কাপালিকের উপর, সে একজন পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক।

মনোরমা ও নরেন ভীত নেত্রে মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করল। অন্ধকারে বিকট দৈত্যের মত দূরে মন্দিরের বিরাট ভগ্নস্তূপ। মন্দিরের ভগ্নচূড়ায় একটা আলো মিট্ মিট্ করে জ্বলছে।

ঘোষাল মশাই বলে চলল, ত্রিশ বছর পূর্ব্বে ঐ মন্দিরের পূজারী ছিল কপিল তান্ত্রিক।

মন্দিরের ভেতর প্রকাণ্ড কালীমূর্ত্তি আছে। দেবী খুব জাগ্রত। কপিল তান্ত্রিক শ্মশান থেকে মড়ার মাথা এনে মালা তৈরী করে দেবীর গলায় পরিয়ে দিতো, দেবীর মূর্ত্তি দেখাত আরো ভয়াবহ, গ্রামের কেহ মুর্ত্তির সামনে যেতে সাহস করত না। দূর থেকে করযোড়ে তাদের মনের কামনা দেবীকে জানাত, কেউ বা কপিল তান্ত্রিককে তাদের মনের বাসনা জানিয়ে অনুরোধ করত দেবীকে জানাতে।

একদিন গভীর রাতে কপিল তান্ত্রিককে দেবী স্বপ্ন দিলেন, তোর পূজায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তুই যদি আমার সামনে মন্দির প্রাঙ্গণে একশ তরুণ দম্পতির দেহ বলি দিস, তবে তুই পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করবি, তুই যা ইচ্ছে করবি তাই হবে। যুবকের বয়স ত্রিশের উর্দ্ধ হবে না আর যুবতীর বয়স বিংশ বৎসরের উর্দ্ধ হবে না। বলিদানের সময় যে কোন দিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটার ভেতরে।

যেদিন স্বপ্ন দেখে তারপর থেকে কত জন দিনের বেলায় গাঙ দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে দেখেছে, মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বা ময়না গাঙের ধারে যুবক যুবতীর রক্তাক্ত দ্বিখণ্ডিত দেহ! কপিল তান্ত্রিক মন্দির প্রাঙ্গণে জ্বলন্ত দুটো চোখ মৃত দেহের উপর নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে! মুখে সফলতার পৈশাচিক হাসি।

শোনা যায় কপিল তান্ত্রিক দেবীর সামনে ষাটটী দম্পতির

দেহ বলিদান দিয়েছে। আজ পাঁচ বছর কপিল তান্ত্রিক মারা গেছে, বাকী চল্লিশটার বলিদানের ভার দিয়ে গেছে কালিদাস তান্ত্রিকের উপর। কালিদাস কপিলের প্রধান শিষ্য।

গুজব কালিদাসের আর পাঁচটী দেহ বলিদানের বাকী আছে। ঠিক সাতটার কিছুক্ষণ পূর্ব্ব থেকে, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত খাঁড়া হাতে কালিদাস মন্দির প্রাঙ্গণে চলা ফেলা করে। কোন নৌকা গাঙ দিয়ে যদি যায়, কালিদাস মুখে এক অদ্ভুৎ আওয়াজ করে গাঙের ধারে এসে দাঁড়ায়! নৌকা আপনি দাঁড়িয়ে যায়। যদি তার ভেতরে দম্পতি থাকে, কালিদাস তাদের দিকে ভীষণ পৈশাচিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিড় বিড় করে কি বলতে থাকে। তারপর দেখা যায় মন্ত্রচালিতের মত তারা নৌকা থেকে নেমে কাপালিকের অনুসরণ করে, কেউ কোন রকম বাধা দিতে পারে না, সকলেই চৈতন্য হারিয়ে ফেলে।

কাপালিক যখন মন্দিরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন সকলের চেতনা আসে ফিরে, কিন্তু কোন উপায় তখন আর থাকে না, কাঁপতে কাঁপতে তারা সে স্থান ত্যাগ করে।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে মনোরমা আর্ত্তনাদ করে নরেনকে জড়িয়ে ধরে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাপালিকের ভয়াবহ মূর্ত্তি। মনে হয় কাপালিক তাদের মন্দিরের ভেতর নিয়ে গেছে।

বিশাল কালীমূর্ত্তি, দেবীর চোখে মুখে তাজা গাঢ় রক্ত। কাপালিক অট্টহাসি হেসে মনোরমার বাহুবন্ধন থেকে নরেনকে ছিনিয়ে নিয়ে বিশাল খাঁড়া দিয়ে আঘাত করল। নরেনের দ্বিখণ্ডিত দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটীতে—সারা প্রাঙ্গণে লাল তাজা রক্ত! মনোরমা আবার আর্ত্তনাদ করে নরেনের কোলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

নরেনেরও সারা দেহ রোমাঞ্চিত! থর থর করে কাঁপছে, মুখ বিবর্ণ। দুহাতে মনোরমার সংজ্ঞাহীন দেহ জড়িয়ে ধরল।

হরিনাথ মাঝি শুষ্ক কণ্ঠে ঘোষাল মশাইকে জিজ্ঞেস করল, ঘোষালদা কটা বেজেছে?

কম্পিত হাতে ঘড়ি বের করে ঘোষালমশাই অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, আটটা বেজে সতের মিনিট হয়েছে।

হরিনাথ উর্দ্ধে করযোড়ে চেয়ে বলে উঠল, মা তুই রক্ষা করেছিস।

ঘোষাল মশাই নরেনের গায়ে হাত দিয়ে বলল, আর কোন ভয় নেই বাবা! মা কালী আমাদের প্রতি প্রসন্না। বৌমার চোখে মুখে জল দাও!

আরো একঘণ্টা কেটে গেছে।

চারিদিকের বিরাট স্তব্ধতার মধ্যে মাঝে মাঝে শুকনো পাতার খস্ খস্ শব্দ ময়না গাঙের জলে হাল ও বাঁশের ঝপ ঝপ আওয়াজ। প্রতাপপুরের কাছ বরাবর নৌকা চলে এসেছে।

ভীতকণ্ঠে মনোরমা বলল—তুমি আমায় কলকাতায় নিয়ে চলো।

নরেন স্নেহার্দ্র কণ্ঠে হেসে বলল,—নিশ্চয়ই—কিন্তু আর তোমায় এখানে আনব না।

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়
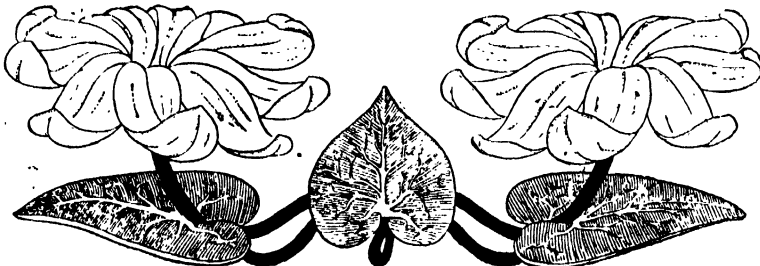
মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া পশুবলি আলোচনা

ডাঃ সরসীলাল সরকার

পশুশ্চেৎ নিহত স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্ব পিতা যজমানেন তত্র কস্মাৎ ন হিংস্যতে॥

জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশুবধ করিলে সে পশু স্বর্গে গমন করে যদি তাহাই হয়, তবে যজমান পশুর পরিবর্ত্তে স্বীয় পিতাকে হত্যা করেনা কেন?

চার্ব্বাক—

উপরের উক্তিটি আমাদের ভারতবর্ষীয় দার্শনিক চার্ব্বাক—যিনি নাস্তিক ছিলেন—তাঁহারই উক্তি। চার্ব্বাক নাস্তিক ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না, এমন কি ভগবানকেও মানিতেন না, সুতরাং তাঁহার মুখেই এইরূপ পরিহাসাত্মক তীক্ষ্ণ উক্তি শোভা পায়। আমরা হিন্দুজাতি, আস্তিক্য আমাদের স্বভাবগত, তদুপরি আমরা ধর্ম্মপ্রাণ ও ভক্ত, এরূপ উপহাস শুনিলে আমাদের হৃৎকম্প হয়। চার্ব্বাকের এই উক্তি শুনিয়া আমরা এই কথাই বলিব, "পাগলে কি না বলে? ও একটা নাস্তিক, নাস্তিকের কথায় কর্ণপাত করিলেই পাপ হয়, তাহা নিয়া আলোচনা করা তো দূরের কথা।" কিন্তু কথাটির ভিতরে যে যুক্তি আছে তাহাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

চার্ব্বাক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "স্বর্গে পাঠানোই যদি কাম্য হয় এবং বলিদানই যদি স্বর্গে পাঠাইবার পথ হয়, তবে পশুকে স্বর্গে না পাঠাইয়া তোমার পরমপূজ্য পিতৃদেবকেই বলিদান করিয়া স্বর্গে পাঠাও না কেন?"

উপরোক্ত মন্তব্যটি চার্ব্বাক কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চার্ব্বাকের এই রহস্যাত্মক মন্তব্যের সহিত আধুনিক মনোবিজ্ঞানে আবিষ্কৃত বলিদান সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। সেইজন্য মনে হয় চার্ব্বাকের একটি স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তাই পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ আদিম যুগে বলিদানের প্রবর্ত্তন ও প্রচলন বিষয়ে বহু গবেষণা ও আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বহু পূর্ব্বকালে চার্ব্বাকের মনে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে রহস্যচ্ছলে সেই কথাই জাগিয়াছিল।

আধুনিক মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে গবেষণকগণের মধ্যে ডাক্তার ফ্রয়েডই সর্ব্বাপেক্ষা মনীষী। নিউটনের সময় যেমন জড়-বিজ্ঞানের এক নূতন যুগ আসিয়াছিল, ফ্রয়েডের গবেষণায় সেইরূপ অধুনা মনোবিজ্ঞানের এক নূতন যুগ আসিয়াছে। মানবজাতির সমাজতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব সমূহের জটিল বিধি-বিধানের ভিতর প্রাচীনকাল হইতেই মানুষের যে গভীরতম মনোবৃত্তিগুলি অন্তর্নিহিতভাবে ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে, আমরা বর্ত্তমান যুগে এই নব্য মনস্তত্ত্বের নির্দ্ধারিত প্রণালীতে তাহার স্বরূপ অনেকটা ধরিতে পারিতেছি। ডাক্তার ফ্রয়েড মানবের আদিম যুগের ধর্ম্মবিশ্বাস, সামাজিক বিধি ও রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া Totem and Taboo নামক বিখ্যাত পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি পূর্ব্বকালে প্রচলিত বলি প্রথার আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য মনীষীগণ আদিম যুগের মানব সভ্যতা সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছেন এই পুস্তকে তাহার কতকটা সারসংগ্রহ আছে। এই সারসংগ্রহগুলির সম্বন্ধে ফ্রয়েড লিখিয়াছেন, "এই সংগৃহীত বিভিন্ন বিবরণগুলির উপর মনস্তত্ত্বের আলোক নিক্ষেপ করিলে আমরা একটি কৌতূহলপ্রদ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। সেই সিদ্ধান্তটি কেবল যে কৌতূহলপ্রদ তাহা নয়, এই বিভিন্ন বিবরণগুলির ভিতর একটি একত্বের অনুভূতি ও সেই সিদ্ধান্ত হইতে আমরা লাভ করি, যাহা অপ্রত্যাশিত। মনস্তত্ত্বের আলোকে এই সমস্ত বিবরণের ভিতরের কথা আমাদের নিকট যেন পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হয়।"

ডাক্তার ফ্রয়েড বলিদান সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ হইতে যে

একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার কথা বলিয়াছেন, তাহার সার কথা এই যে, "বলির পশুগুলি বলিদানকারীগণের পিতৃপুরুষগণেরই প্রতীক।"

বর্ত্তমানকালে সভ্যদেশে ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত বলি হয়, তাহাতে বলিদানের পূরাকালীয় প্রাথমিক ভাব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে এখন অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনকার দিনে, "বলির পশু আমাদের পিতা ও পিতৃপুরুষগণের প্রতীক" এই কথা বলিলে বলিদানকারীর মনে নিশ্চয়ই দ্বিধা উপস্থিত হইবে। তাহা ছাড়া, বাস্তবপক্ষে মানুষের অবচেতন মনের গূঢ়ক্রিয়া সাধারণ জ্ঞানের মধ্য দিয়া কোন সময়ই সহজে ধরা পড়ে না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিকার্য্যের মূলেই অবচেতন মনের যে গূঢ়ক্রিয়া আছে তাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর থাকিয়া যায়। ব্যষ্টি জীবনের অবচেতন মনের ক্রিয়া হইতেও সমষ্ঠি জীবনের অর্থাৎ কোন জাতির জাতীয় জীবনের বা সামাজিক জীবনের অবচেতন মনের ক্রিয়ার স্বরূপ উপলব্ধি করা আরও কঠিন। সেইজন্য জাতির জীবন-বিকাশের ধারা অবলম্বন করিয়া কি ভাবে তাহার প্রাথমিক বিকাশ হইয়াছে ও সেই বিকাশ কোন্ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে তাহা লইয়া গবেষণা করিলে সমগ্র জীবনের অবচেতন মনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সহায়তা হয়। ডাক্তার ফ্রয়েড তাঁহার পুস্তকে সেই প্রণালীতেই গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার সেই গবেষণাগুলি যদি কেহ নিরপেক্ষ ভাবে মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে যে বিশেষ যুক্তি আছে ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

পুরাকালে বলিপ্রথার মূলে একটি ধর্ম্মের সংস্কার ছিল ডাক্তার ফ্রয়েড তাহা তাঁহার আলোচনায় দেখাইয়াছেন। এক সঙ্গে সকলে একত্রে বসিয়া বলির প্রসাদ আহার করা, বিশেষতঃ আহার্য্য দ্রব্য যদি একই প্রকার হয়,—সেই আহার্য্য একসঙ্গে ভোজনে সকলেরই দেহের অঙ্গীভূত হইতেছে এইরূপ ভাব আদিমযুগের লোকের মনে যেন এক পবিত্র একত্বের অনুভূতি আনিয়া দিত। অতি পুরাতন যুগে বলির দ্রব্য সকলে মিলিয়া একত্রে ভোজনের মধ্যে এই অর্থটিই প্রচ্ছন্ন থাকিত। বলিদান দিয়া একটি জীবের যে মৃত্যু ঘটানো হইত তাহার অন্যায় বোধটাও ছিল না যে এমন নয়, কিন্তু সেই অন্যায়বোধ এইভাবে নিরাকৃত হইত যে, যে পশুটিকে বলি দেওয়া হইতেছে সেই পশুটি এবং যে দেবতার নিকট বলি দেওয়া হইতেছে সেই দেবতা সকলের মধ্যে এক একত্বের ভাব আনিয়া দিতেছে, আর সেইটিই আদিমযুগের ধর্ম্মভাব ছিল। বলির প্রাণীটি যেন প্রাণস্বরূপ হইয়া সকলের দেহেই প্রবেশ করিতেছে এবং সকলের মধ্যে সমপ্রাণতার ভাব দান করিতেছে। আর সেই বলির প্রাণীটি, সে যেন তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষের প্রতীক, পূর্ব্বপুরুষই যেন তাহাদের মধ্যে জীবন-স্বরূপে প্রবেশ করিতেছে।

আমাদের ভারতবর্ষে বৈদিকযুগে যজ্ঞে পশুহননের কথা বেদে পাওয়া যায়। সে যজ্ঞ যে সর্ব্বদা হইত তাহা নয়, এবং তাহার বহু বিধিবিধানও ছিল। ইহা ছাড়া বৈদিকযুগে যজ্ঞে যে বলির উল্লেখ বেদে পাওয়া যায় তাহা যথার্থই পশুবলি অথবা শস্য প্রভৃতি যজ্ঞে আহুতি দান এ সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ আছে। যাহা হউক, যদি তাহা পশুবলিই হয় তাহা হইলেও তখনকার আদিম যুগের মনোবৃত্তির সহিত তখনকার ধর্ম্মের সংস্কারের একটা সঙ্গতি ছিল। কিন্তু এ যুগে সেরূপ মনের ভাব সম্ভব নয়, কেননা যুগ পরিবর্ত্তনের সহিত মানুষের মনের চিন্তার ধারারও পরিবর্ত্তন হয়।

ডাক্তার ফ্রয়েড ইহাও দেখাইয়াছেন যে সভ্যযুগে আদিম-যুগ হইতে উপাস্য দেবতা সম্বন্ধেও মানুষের মনের ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আদিমযুগের দেবতাগণ মানুষের মতই নীচপ্রবৃত্তিযুক্ত এবং নীচ আচারব্যবহারপরায়ণ ছিলেন। ক্রমশ সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উপাস্য দেবতাগণেরও চরিত্রগত উন্নতি হইতে লাগিল। ক্রমে দেবতাগণ মাতৃ বা পিতৃস্থানীয় দয়াময়, নিষ্কলুষ এইরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে নানা দেবদেবীর রূপকল্পনা ও উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। এই সকলের সহিত সাময়িক অবস্থা ও প্রয়োজনেরও যে যোগ ছিল না এমন নয়। আমাদের হিন্দুধর্ম্মে দেবী কালিকা অসুরবিনাশিনী অথচ জগজ্জননী। অসুর অর্থাৎ দুর্দ্দান্ত অন্যায়কারী শত্রুর দল। তাহারা বাহিরের শত্রুও বটে, আবার মানসিক শত্রুও বটে। দেবী কালিকা জগতের জননীস্বরূপা, অন্যথা নিষ্ঠুরাচরণ অথবা অসহায় নিরীহ প্রাণীহত্যার দ্বারা তাঁহার যে প্রকৃত

পূজা হয় না এই দেশেরই অনেক পরমধার্ম্মিক কালী উপাসক তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। পরম ধার্ম্মিক মাতৃভক্ত কালী উপাসক রামপ্রসাদ তাঁহার অনেক রচনায় তাহা বলিয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত সঙ্গীত—

"মন, তোমার এ ভ্রম গেল না,
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না।

*　　*　　*　　*

ত্রিজগৎ যে মায়ের সন্তান তুমি জেনেও কি তাও জান না,
ওরে, কোন্ লাজে বলি দিস্ তারে মহিষ আর ছাগল ছানা।
প্রসাদ বলে ভক্তিমন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা,
ও তুই লোক দেখানো করিস্ পূজা
মাতো আমার ঘুষ খাবে না।

রামপ্রসাদের উক্তিতে ইহাই সুস্পষ্ট যে আমরা যে ভাবে কালীমাতার পূজা করিতেছি তাহাতে ইহাই বুঝায় যে মা কালীর স্বরূপ সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান নাই। আর এরূপ পূজায় 'মা'র আগমন ও হয় না।

ভক্ত রামপ্রসাদ ভক্তিমন্ত্র সার করিয়া পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু প্রচলিত পূজায় ভক্তির স্বরূপ যাহা সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"হিংসারে ভক্তির বেশে দেবালয়ে আনে।
রক্তাক্ত করিতে পূজা সঙ্কোচ না মানে।"

আজকাল হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জাগরণ ও গ্লানিমোচন সম্বন্ধে একটা সাড়া পাওয়া যায়। ধর্ম্ম যে অজ্ঞানতার জন্য ক্রমশঃ গ্লানিযুক্ত হয়, তামস মনোভাব বশতঃ মানুষ যে অনেক সময় অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করে শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় তাহা আমরা ভগবানের উক্তি স্বরূপে পাই। ধর্ম্মনামে যাহা প্রচলিত হইয়া আসে তাহাই যে ধর্ম্ম নয় আমাদের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিতেও তাহা আমরা অনুভব করি। সুতরাং কালীঘাটে শ্রীশ্রীকালীমাতার যে ভাবে বলিদান দ্বারা পূজা হয়, হিন্দুধর্ম্মে প্রকৃত আস্থাবান কাহারও মনে তাহাতে যদি আঘাতের বোধ হয় তাহা স্বাভাবিক।

এই পূজার মধ্যে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিবার বিষয় যে নাই তাহা নয়।

প্রথম, মানত করিয়া পূজা। অর্থাৎ আমার মোকদ্দমা জয় হউক, আমার অর্থলাভ হউক, শত্রুপক্ষের ক্ষতি হউক, সন্তান প্রভৃতির পীড়া আরোগ্য হউক, ছেলে হউক, ছেলের চাকরী হউক ইত্যাদি। এই সব জন্য মানত করিয়া যে বলি দেওয়া হয় তাহা কি ধর্ম্মভাব, না নিজের কামনা পূর্ণ করিবার জন্য একটি জীব হত্যা এবং সেই সঙ্গে মাকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা? ইহাতে কি জননী জগন্মাতাকেও অপমান করা হয় না এবং হীন করা হয় না? বাস্তবিক ইহাকে পূজা বলা যায় না, বরং বলা যায় ইহা নিজের অবচেতন মনে যে সমস্ত কু-প্রবৃত্তি সংগুপ্ত আছে পূজার নামে তাহাই চরিতার্থ করা।

দ্বিতীয়, আহারের জন্য পূজা। একটি নধর পাঁঠা দেখিয়া লোভ হইল। তখন খাওয়ার সুখ ও পুণ্য এক সঙ্গেই লাভ করিবার জন্য বাড়ীতে মসলা বাঁটিতে বলিয়া ও বন্ধু বান্ধব-গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঁঠাটি বলিদানের জন্য দেবী মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল।

তৃতীয়, প্রথার বদ্ধমূলতা। বহুযুগ হইতে প্রথাটি চলিয়া আসিতেছে তাহার ভিতর অবচেতন মনের একটি সংস্কার জড়িত রহিয়াছে। জন্মসূত্রে সেই সংস্কার বংশগতভাবে চলিয়া আসে, সেই সংস্কারের ভীতি ও মোহ কাটানো কঠিন হয়। অবশ্য ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া মনের ক্রমশঃ বিকাশও হয়।

বলির মধ্যে যে একটা হিংসাবৃত্তি চরিতার্থতার ভাব আছে (যাহা যথার্থ ধর্ম্মবোধের বিপরীত) আমাদের শাস্ত্র-কারগণ যে তাহা বুঝিতেন না এমন নয়। সেই জন্য বলিদান দ্বারা পূজা কোন শাস্ত্রেই শ্রেষ্ঠপূজার মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ পূজার মধ্যে শ্রেষ্ঠপূজা সাত্ত্বিক পূজায় পশুবলি অবৈধ। তবে সংসারে রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোক অনেক আছে, তাহাদের জন্য পূজায় পশুবলির বিধি আছে বটে, কিন্তু বিধি থাকা সত্ত্বেও অনেক শাস্ত্রকার ধর্ম্মের নামে এইরূপ জীবহত্যা নিন্দনীয় ও তাহাতে নরকগামী হইতে হয় ইহাও স্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

আমাদের বাংলাদেশে দেবী পূজায় পশুবলি ক্রমশঃ যে ভাবে হ্রাস ও পরিত্যক্ত হইতেছে তাহাতে বুঝা যায় বাঙ্গালীর মনের ভাব স্বভাবতঃই পশুবলির বিরোধী। শ্রীশ্রীদক্ষিণেশ্বর

কালী মন্দিরে বলি বন্ধ করিবার জন্য রাণী রাসমণির দৌহিত্র বলরাম দাস মহাশয় বহুদিন হইতে চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তিনি শাস্ত্রনিষ্ঠহিন্দু, শাস্ত্রের অনুশাসন ব্যতীত বলি বন্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এজন্য তিনি শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিবার ভার দেন। সেই অনুসারে শাস্ত্রীমহাশয় ও সংস্কৃত কলেজের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক উভয়ে মিলিয়া এক মাস কাল কাশী ভট্টপল্লী নবদ্বীপ প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের অভিমত ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করেন। পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং তাহার বাংলা অনুবাদও আছে। বাংলা অনুবাদের শেষ এইরূপ :—

"বৈধহিংসা কর্ত্তব্য নহে, বৈধহিংসাও রজোগুণের কার্য্য" এই প্রকার শ্রাদ্ধ-বিবেক টীকাকার গোবিন্দানন্দধৃত বৃহন্মনু-বচনদ্বারা বৈধহিংসাও রজোগুণের কার্য্য অতএব সাত্ত্বিকাধিকারীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ প্রতিপন্ন হওয়ায় বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক এবং শক্তিমন্ত্রোপাসক সাত্ত্বিকাধিকারীদিগের পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত কালিকামূর্ত্তি পূজা ছাগাদি পশুঘাত পূর্ব্বক বলিদান ব্যতীত করিলে কোনই পাপ হয় না, পক্ষান্তরে পূর্ব্ব প্রদর্শিত পদ্মোত্তরখণ্ডীয় পার্ব্বতীর বচনসমূহ দ্বারা ছাগাদি পশুঘাত পূর্ব্বক বলিদানের সহিত দেবতার অর্চ্চনা করিলে অর্চ্চনাকারীদিগের নরকজনক পাপ হয়, এইরূপ অবগত হওয়ায় তাঁহাদের কখনও ছাগাদি পশুঘাতপূর্ব্বক বলিদানের সহিত পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠাপিত কালিকামূর্ত্তির পূজা কর্ত্তব্য নহে ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের উত্তর। শকাব্দা ১৮৩২, ৫ই জ্যৈষ্ঠ।

এই ব্যবস্থাপত্রে উনসত্তর জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় বলিদান একটি প্রথা মাত্র, এবং প্রকৃত ধর্ম্মের ইহা বিরোধী, হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও আন্তরিকভাবে ইহা জ্ঞাত আছেন তবে লোকের সংস্কারে আঘাত দিতে অনিচ্ছাবশতঃ অনেক সময় সেই ধর্ম্মবিরোধীপ্রথাকেই সমর্থন করেন।

শ্রীসরসীলাল সরকার

কালের ডাক

শ্রীদেবরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা

নিরাশার আঁধারে
প্রাণখানা বাঁধারে !
যেথা যাই কিছু নাহি হেরি।
ফুরায়েছে খেলারে নাহি আর বেলারে
বাজিয়া উঠেছে কাল-ভেরী।

চট্‌পট্ বেঁধেনে,
শেষ গান সেধেনে
তুম্ তারে তানা নানা তেরি,
করিসনে দেরি আর ফেলেদে বিষয়-ভার
কখন বিপদ আসে ঘেরি।

লালসার কুহকে
ভেদ্ কর্ এ ব্যূহকে,
ক্ষণিক করিলে পরে দেরি,
পারিবি না যুঝিতে শত্রুরে রুধিতে
যমদূত করে ফেরাফেরি।

মহাবোধনের দিনে

শ্রীমতিলাল দাস

এবার দেশে গিয়ে দেখ্‌লাম সবই বদলে গিয়েছে। যেখানটায় ছিল পতিত জমি, আগাছায় ভর্ত্তি, ঘেটুগাছ আর কচুগাছের বন,—সেখানটায় আজ উঠেছে বড় বড় কোঠাবাড়ী, ইট, কাঠ, চুণ, সুরকী দিয়ে তৈয়েরী হয়ে রাতের বেলায় ইলেকট্রিক আলোয় উজ্জল হয়ে উঠেছে, যেন সবাকারই চক্ষের উপর মানুষের জয়-জয়কার ঘোষণা করছে। ষষ্ঠীর দিন ছেলে মেয়েরা নূতন জামা কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেমন আমরা বেড়িয়েছি—২০।২৫ বছর আগে। তবে তাদের কারুকেই চিনতে পারি না, অথচ মনে হয় কোথায় যেন একটু চেনা আছে। এই যে চেনা এবং না-চেনার সমস্যা এইটার কথাই আমি ভাবছিলাম।

২০।২৫ বছরের মধ্যে আমাদের সভ্যতা ও জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন ঘটেছে অনেক। রাস্তা ঘাটগুলো হয়েছে পিচে মোড়া, ঘরে ঘরে জলছে বিজলী বাতি, মানুষের আলোচনার বিষয় বস্তু, গ্রাম্য এক ঘরে' করা থেকে এসে দাঁড়িয়েছে রায়ের দল এবং গুপ্তের দলের বিরোধিতায়; এমনি ভাবে সব দিক দিয়েই পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ঘটেনি কেবল ঐ ছেলেগুলোর বেলায় যারা এখনও ঠিক সেই আগেকার মতই মুখভরা এবং বুকভরা আনন্দ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তাদের মনের সোনার কাঠির গুণে রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থ নৈতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, এবং পারিবারিক সমস্যা সবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ইংরাজ কবি Mathew Arnold একস্থানে প্রকৃত আর্ট সম্বন্ধে বলেছেন যে, উহা একটি বিশেষ কালেই যে আদৃত হয় তাহা নহে, উহা যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের মনকে রঙ্গীন করে তোলে। ইহার কারণ ঐ কাব্যগ্রন্থগুলো মানুষের মনের এমন একটা ধারাকে অবলম্বন করে সৃষ্ট হয় যা কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় না, যা সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের, যা সার্ব্বজনীন; তাঁর কথায়—"It touches the same heart that beats in every man."

ঐ ছেলেগুলোর মধ্যে আমি দেখলাম সেই শাশ্বত ধারা যা কোন দিন বদলায়না, যা অশোকের যুগ থেকে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত একভাবেই রয়েছে, যা চিরন্তন, যাকে দেখে যুগে যুগে মানুষ তার গোপনহৃদয়ে আনন্দের প্রস্রবণ লাভ করেছে, আশার বাণী শুনেছে, বিশাল দুঃখ যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে জগতের সকল কল্যাণ করেছে। তাই আমি ভাবছিলাম যে এর পরে হয়ত একদিন এই সমস্ত বাড়ীঘর, ইট, কাঠের স্তূপ, ফলেফুলে পূর্ণ মানুষের তৈয়েরী বাগান, মরুভূমি হয়ে যাবে, নীল নদের ধারে হাজার হাজার বছর আগে যা ঘটেছে। হয়ত তখন কোন অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতাত্ত্বিকের চোখে এদের এই জীবনযাত্রার উপাদানগুলি এক বিস্মৃত সভ্যতার নিদর্শন হয়ে দেখা দেবে। তখন কেউ নামও করবে না এই সভ্যতার, কথাও জানবে না এই উন্নতির, ভেবেও দেখবে না যে একদিন এই সভ্যতা দেখেই পূর্ব্বযুগের অবশিষ্ট বৃদ্ধেরা কিরূপ চমৎকৃত ও বিস্মিত হয়েছিল; তখন তাদের কাছে এই উন্নতিটুকু নিতান্ত নগণ্য হয়ে দাঁড়াবে যেমন আমাদের চক্ষে দাঁড়িয়েছে আদিম প্রস্তর যুগের মানুষের পাহাড়ে-খোদা বাইসন বা ম্যামথের ছবিগুলো।

কিন্তু এই যে ছেলের দল, এরা সেদিন এম্‌নি করেই হাসবে, এম্‌নি করেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ছুটে বেড়াবে, এমনি করেই তাদের মুখ আশার আলোকে, আনন্দের উদ্বেগে, ভবিষ্যতের উজ্জল কল্পনায়, প্রকৃতিকে জয়ের নিবিড় কামনায় উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে। হয়ত সেদিন দুর্গা পূজা বলে কিছু থাকবে না, কিন্তু বছরের শ্রেষ্ঠ পূজা বলে দুর্গা পূজার যেটা একান্ত সত্যরূপ সেটা ঠিকই বেঁচে থাকবে, কালের স্রোত তাকে প্রতিরুদ্ধ করতে পারবে না। এই

দুর্গা পূজাই একদিন Isis-এর মন্দিরে, Molochএর প্রাঙ্গণে, ভ্রাম্যমান ইহুদিদিগের তাঁবু মন্দিরের সম্মুখে চিরদিনই ঘটে এসেছে, মানুষের সেই আদি সভ্যতার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত একই ভাবে।

দুর্গাপূজার এইটাইত সত্যরূপ। মানুষ শুধু চেয়ে দেখচে আমি সারা বছরের গ্রীষ্মের অগ্নিময় রৌদ্রে, বর্ষার কর্দ্দমাক্ত মাঠে, কতখানি ফসল উৎপন্ন করেছি। এই সময় মানুষ তার চিরাচরিত সংগ্রাম থেকে তিন দিনের অবসর নিয়ে দেখতে চায় তার কাজ কতখানি এগিয়েচে। ঐসব ছোট ছোট আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে পরিমাপ করতে চায় যে ভবিষ্যতে যখন তাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে তখন এই জগতের মধ্যে তাদের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য কতখানি শক্তি রেখে যেতে পারবে। দেখতে চায় যে যুদ্ধ সেই সৃষ্টির আদিম যুগে আরম্ভ হয়েছে, ভগবানের নিষেধ বাণী অবহেলা করে যে জ্ঞান-বৃক্ষের বপন করেছে তাদের মনের মধ্যে তার ফসল কতখানি হ'ল এবং কবে তার পূর্ণ পরিসমাপ্তি এবং মহাসিদ্ধি লাভ করে তারা সেই স্বর্গোদ্যানে ফিরে যেতে পারবে, ভগবানের পদসেবী দাসানুদাস হয়ে নয়, ভগবানের সমান শক্তিমান পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে। আমাদের উৎসবগুলি তাই জীবনের এক একটি মহা আনন্দের দিন, উপভোগের দিন, পরিপূর্ণ সিদ্ধি লাভের দিন।

দশভূজার মূর্ত্তি বোধ হয় সেই কল্পনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, উভয় পার্শ্বে জ্ঞান ও সম্পদ, শক্তি ও সিদ্ধি একসঙ্গে বিরাজ করছে। যেন আমাদের সামনে দেখিয়ে দিচ্ছে ঐ মূর্ত্তি মানুষকে লাভ করতে হবে—ভগবানের অভিসম্পাতস্বরূপ প্রকৃতির এই নিবিড় বিরোধিতা, প্রকৃতির এই মহামারণের আয়ুধ, জগতের এই একান্ত দুঃখ দৈন্যের সমুদ্র সব কিছুকে পরাস্ত করে একদিন মানুষ দাঁড়িয়ে উঠবে এমনি করে প্রকৃতির বুকের উপর পা দিয়ে, তাকে দশদিকে দশ অস্ত্রে আঘাত করে, তাকে জ্ঞানে বিজ্ঞানের নাগপাশে বদ্ধ করে। ভগবান সেদিন তাঁর সেই আনন্দময় স্বর্গরাজ্যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে দেখবেন তাঁর সেই বারণ করা ফলের কতখানি গোপন শক্তি ছিল যা তাঁর সমস্ত বিরোধিতাকে পরাজিত করে মানুষকে তাঁর সমান শক্তিময় করে তুলেছে, অনন্তকালের নিবর্ত্তনে মানুষ মহামানবের পদে উন্নীত হয়েছে।

ঐ ছোট ছেলেগুলো হচ্ছে সেই মহাজয় লাভের প্রতীক। অনাদি অনন্ত কাল ধরে প্রাণের সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, চেতনের সঙ্গে, জড়ের অবিদ্যার এবং অচেতনের যে মহা সংগ্রাম চলেছে ওদের মুখে আমি দেখতে পাচ্ছি সেই সংগ্রাম জয়ের জয়টীকা। ওরা এখনও দুঃখের ভারে নুয়ে পড়েনি, নিরাশার চাপে ক্ষুব্ধ হয়নি, পরাজয়ের ভয়ে ভীত হয়নি। ওরা হচ্ছে আলেক্-জেণ্ডারের সেই বিশ্ববিজয়ী গ্রীকসৈন্য, ওরা হচ্ছে সিজারের সেই অপরাজেয় লিজিয়ন, ওরা হচ্ছে ক্রমওয়েলের আয়রণ সাইড, ওরা পরাজয়কে জানে না, ভয় করে না, তাই ওদের সন্ত্রস্ততার ভাব নেই—মুখে হাসি এবং আনন্দ, আশা এবং আকাঙ্ক্ষা।

শ্রীমতিলাল দাস

কোজাগরী

শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী

অঙ্গন জুড়ি আলিপনা আঁক
নিপুণ হাতে,
লক্ষ্মী আসিবে আমাদের ঘরে
আজিকে রাতে।
জোছনায় ধোয়া পথের দুধারে
শেফালী ঝ'রেছে অযুতে হাজারে,
ওদেরে দলিয়া রাতুল দু'খানি
চরণ ঘাতে ;—
আঁক আলিপনা, লক্ষ্মী আসিবে
আজিকে রাতে।

আসিবে দেখিতে হ'ল কি না হ'ল
প্রদীপ জ্বালা,
নীলাম্বরীর অঞ্চলে বাঁধি
তারার মালা।
ধূপ জ্বালাইয়া ব'সে থাক দ্বারে,
সন্ধ্যার ফাঁকে আসিতেও পারে,
চন্দন মাখি ফুল তু'লে রাখ
ভরিয়া ডালা ;
আসিবে লক্ষ্মী দেখিতে হ'ল কি
প্রদীপ জ্বালা

ধানের শীর্ষে বুলাইয়া কর
মাঠের মাঝে
অই এল বুঝি ! অই শোন কোথা
শঙ্খ বাজে !
আপনার পরে রাখো প্রত্যয়,
সাড়া দিতে যেন দেরী নাহি হয়,
অই এল বুঝি, অই শোন কোথা
শঙ্খ বাজে।
দিবস রাতির মিলন-মদির
সোনার সাঁঝে !

আসে নাই সাঁঝে ? না আসুক, ঢলি'
প'ড়োনা ঘুমে !
হয় নাকি দেরী স্বরগ হইতে
নামিতে ভূমে ?
গাঢ় কতখানি অনুরাগ কার,
হতাশায় কেবা রুধিয়াছে দ্বার,
পরখিতে মাতা পারে না কি বসে
সুদূর ব্যোমে ?
যদি হয় দেরী তুমি তাড়াতাড়ি
প'ড়োনা ঘুমে।

ঘুম-পাড়ানিয়া সুরের কুহক
নামিছে ধীরে,
কমল বনের কল-গুঞ্জন
থামিল কি রে ?
আকাশের সাদা মেঘের চড়ায়
হাসি ছড়াইয়া জ্যোছনা গড়ায়,
থামিল কি তরী নীরব নিশুতি
সাগর তীরে ?
হের ঝাঁপি কাঁকে লক্ষ্মী নামিছে
নীরবে ধীরে !

'কো জাগরে ঘরে কো জাগরে আজ'
শুধান মাতা—
কোনখানে বল আসন আমার
হয়েছে পাতা।

এ পাড়া ও পাড়া ঘুরি' অবশেষে
তোমারি দুয়ারে দাঁড়ায়েছে এসে,
পরাইয়া দাও যে মালা দিবসে
হয়েছে গাঁথা,
'কো জাগরে ঘরে কো জাগরে আজ'
শুধান মাতা।

বরণ করিয়া লও ঘরে তুলে
অর্ঘ্য দানে।
ভয় কিছু নাই, দেখরে চাহিয়া
মুখের পানে !
দৃষ্টিতে ঝরে করুণা-অমিয়,
সাহস করিয়া চেয়ে চেয়ে নিও,
অমর করিবে সাধনের ধন
সিদ্ধি দানে,
ঋদ্ধি দিবে মা, দেখরে চাহিয়া
মুখের পানে।

প্রতুলের বউ সুনীতি

শ্রীআশীষ গুপ্ত

বিয়াল্লিশ এবং চল্লিশ,—প্রতুল ও তাহার স্ত্রী সুনীতির বয়স। কিন্তু প্রতুল ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে,—সংসারের আর বর্ণসুষমা নাই,—পৃথিবীর দীপ্তি নিবিয়া গেছে, নরনারীর আচরণে ঔজ্জ্বল্য অবলুপ্ত, দেহে মনে তার অন্তহীন অবসাদ। কোনও কিছুতে শান্তি ত নাইই, নাই স্বাচ্ছন্দ্যও। শুধু যে কাজটি যখন করা অত্যাবশ্যক সেটি সমাধা করার জন্যই প্রতুল তাহা করে,—তদতিরিক্ত কোনও উদ্দেশ্য, কোনও আনন্দের সন্ধান আপাতত সে আর জানে না।

দম দেওয়া কলের মত বাড়ী এবং কলেজ, কলেজ এবং বাড়ী করিয়া দিন কাটে,—সূর্য্যদেব দীপ্ত কিরণে পূর্ব্বগগনে উদিত হ'ন, মধ্যাহ্নগগনে প্রদীপ্ততর গৌরবে দ্যুতিশীল হইয়া ওঠেন, এবং অপরাহ্নে পাণ্ডুর বিষন্নতায় পশ্চিমদিগন্তে অস্ত যান,—অর্থাৎ দিন কাটে কিন্তু প্রতুলের মনের বিচিত্র অন্ধকার আর কাটে না।

কাহারও সহিত দেখা করার আকাঙ্ক্ষা নাই, কথা বলার আগ্রহ নাই, কোথাও যাওয়া আসার প্রয়োজনও শেষ হইয়া গেছে। মনের ইহা এক বিচিত্র অবস্থা,—অলসতার বিলাস নয়, লুপ্ত-ঐশ্বর্য্য চিত্তের সীমাহীন দৈন্যের অবসন্নতার গ্লানি প্রতুলকে পাইয়া বসিল।—একটা নিরতিশয় অভাবের বেদনা বুকের অন্তঃস্থল মথিত করিয়া উঠিয়া হাত পা অসাড় করিয়া দেয়, সকল সচলতাকে করিয়া তোলে স্তম্ভিত! আরাম-কেদারায় দেহ প্রসারিত করিয়া চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া থাকে।

সুনীতিকে প্রতুল একদিন ভালবাসিত, এখনও সে ভাল-বাসা একেবারে ভূতপূর্ব্ব হইয়া ওঠে নাই।—তাহাদের সন্তান নাই,—সুনীতি তাহার বড় বোনের একটি ছেলেকে এক বছর বয়স হইতে পালন করিয়া আট বছরেরটি করিয়া তুলিয়াছে। সেই ছেলে সুধীরের প্রতিও প্রতুলের স্নেহ কম নয়। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার কেন্দ্রস্থল যে সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, কিছুক্ষণ ধরিয়া সে কথা চিন্তা করার মত মনের একাগ্রতাও প্রতুলের আজ আর নাই। ক্লান্ত বিষণ্ণতায় প্রতুল একটুখানি ম্লান হাসিল। সে হাসির না আছে শ্রী, না আছে অর্থ।

সুনীতির রূপ আছে—চল্লিশ বৎসর বয়সেও সে অতিক্রান্ত-যৌবনা নয়। চেষ্টা করিয়া তাহার যৌবনকে ধরিয়া রাখিতে হয় নাই, অনল্প বিত্ততায় অগ্রসর হইয়া তিরিশের প্রান্তসীমায় আসিয়া দৃঢ়সঙ্কল্পতায় সুনীতির রূপ স্থির হইয়া গেছে। সুনীতির বয়সের ক্ষেত্রে চল্লিশ এবং তিরিশের ব্যবধান দশ নয়, এক নয়, কিছুই নয়। মোটের উপর এ বিষয়ে পাটি-গণিতের সরলতম নিয়মকে নিষ্ফল করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া সুনীতি গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে।

প্রতুলের স্ত্রী শুধু যে অচঞ্চলযৌবনা তাহাই নহে, সে স্বামীসেবাপরায়ণাও বটে! প্রতুলের জামায় অপ্রয়োজনেও সে বোতাম লাগাইয়া দেয়, সেলাই করা বোতাম পুনরায় শক্ত করিয়া সেলাই করে,—স্বামীর জন্য সে স্বহস্তে জলখাবার প্রস্তুত করে,—কলেজ হইতে তাঁহার প্রত্যাগমন-পথের পানে উদ্বিগ্ন প্রত্যাশায় অপরাহ্নকালে চাহিয়া থাকে।

রূপেগুণে এমনই আদর্শ নারী সুনীতি, এরূপ স্ত্রীরত্নকেও যদি প্রতুল বিন্দুমাত্র অনাদর অবহেলা করিত তাহা হইলে তাহাকে পাষণ্ড বলিতাম,—কিন্তু প্রতুল দুর্বৃত্ত নয়, সুনীতিকে সে ভালবাসে। আর তাহার প্রতি সুনীতির গভীর প্রেম ত জামায় বোতাম লাগানোর সুপবিত্র ও অতিপ্রাচীন পদ্ধতিতেই পরিস্ফুট; অতএব ও সম্বন্ধে বাগ্‌বিস্তার অনাবশ্যক।

এমনতর সুখের সংসারেও প্রতুলের সহসা যেন আর কিছু ভালো লাগে না!

পাশের বাড়ীর লাল রংয়ের ছোট ছোট গোল চোখ-ওয়ালা লোকটি জেম্স্ মরিসন কোম্পানীর আড়াই শ' টাকা বেতনের বড়বাবু। তিনি সেদিন সহসা হার্টফেল্ করিয়া দিব্যধাম প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার বাড়ীর লোকদের উচ্চ চীৎকারে ক্রন্দনপরায়ণ করিয়া তুলিলেন।

সুনীতি আসিয়া স্বামীর ইজিচেয়ারের পাশে দাঁড়াইল। প্রতুল চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। সুনীতি কহিল, "ওগো শুন্ছ ?"

প্রতুল চোখ মেলিল,—সুনীতির পানে চাহিয়া দেখে উচ্ছলিত অশ্রুতে তাহার দুই চোখ ভরিয়া গেছে।

"মন্মথবাবু মারা গেলেন !"

নিঃস্পৃহভাবে প্রতুল বলিল, "কি হয়েছিল ?"

"কিচ্ছু না,—হঠাৎ হার্টফেল করে' মারা গেলেন !—আহা, বউটা যা কাঁদছে ! অতগুলো ছেলে মেয়ে !—কি হ'বে বল ত !"—

পূর্ব্বাপেক্ষাও নিরাসক্তভাবে প্রতুল কহিল, "মন্মথবাবু ! মন্মথবাবু ! ছোট ছোট গোল চোখওয়ালা মন্মথববাবু ! তিনি মারা গেলেন ! হার্টফেল করে' মারা গেলেন !"

প্রতুল যেন নেশা করিয়াছে, এত বড় ব্যাপারটার গুরুত্ব যেন ওর মাথায় সহজে প্রবেশ করিতেছে না !

বিস্মিত সুনীতি কহিল, "তুমি কি নিষ্ঠুর গো ! তোমার একটুও দুঃখ হ'ল না ? স্ত্রীটা এখন কোথায় দাঁড়াবে, ছেলে-মেয়েগুলো এখন কার আশ্রয়ে থাকবে ? মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সচ্ছল অবস্থায় অভ্যস্ত, এক ফুঁয়ে নিবে গেল সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আড়াইশ' টাকা মাইনের মাসিক আয় !"

বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রতুল সুনীতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চোখ মুছিয়া সুনীতি কহিল, "ভদ্রলোক এমন করে' মারা গেলেন ! দুঃখ হয় বৈ কি ! কিন্তু যারা বেঁচে রইল তাদের কথাও ত ভাবতে হ'বে, মাসে আড়াইশ' টাকাটাও ত তুচ্ছ কর্‌বার জিনিষ নয় !"

প্রতুলের অবসাদগ্রস্ত অপ্রযুক্ত মন যেন ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে,—সুনীতির বাষ্পাকুল নেত্রের পানে চাহিয়া সে যেমন করিয়া মৃদু হাসিল তাহাকে অবিমিশ্ররূপে তিক্তই বলা চলে।

মন্মথবাবু জীবনবীমা করিয়া মারা যাইবার সুবিধা পান নাই। কথাটা প্রতুল সুনীতির নিকট হইতে শুনিল। সুনীতি রাগ করিয়া বলিল, "কি দায়িত্বজ্ঞানশূন্য লোক দেখ। স্ত্রী, এতগুলি ছেলেমেয়ে, এমন অসহায় অবস্থায় সব পড়ে' রইল, —এ্যায্ এ প্রটেকশ্যন্ একটা ইন্সুর্যান্স্ পলিসি অবধি নেই !"

কি ভাবিয়া প্রতুল হাসিল, "আমি মর্‌লে কিন্তু তোমার ভারী সুবিধে হ'বে,—পাবে তুমি তিরিশ হাজার টাকা—এতকাল পরে পলিসিটা সদ্য সদ্য তোমার নামে এ্যাসাইন্ করেছি"—

সুনীতির মুখ বেদনায় কালো হইয়া গেল।—"ফেলে দাও গে, উড়িয়ে দাও গে, পুড়িয়ে দাও গে তোমার সর্ব্বনেশে টাকা ! চাইনে, চাইনে, চাইনে আমি ও নোংরা জিনিষ।" বলিতে বলিতে উদ্বেলিত দুঃখে সুনীতি কাঁদিয়া ফেলিল।

অথচ বিস্ময়ের বিষয়, অন্যমনস্ক প্রতুলের মনের উপর এতবড় বেদনার কোনও প্রভাব নাই। সুনীতির ক্রন্দনের উচ্ছ্বসিত বহিঃপ্রকাশের অন্তরালবর্ত্তী একটি ক্ষীণ অথচ গভীর প্রত্যাশার সুর যেন তাহার কানে অনুরণিত হইতে থাকে, এবং বোধ করি বা সেই অনুরণনই তাহার সমস্ত চেতনাকে করিয়া রাখে আচ্ছন্ন।

টেবিলের নিকট বসিয়া প্রতুল ইনসুর্যানসের পলিসিখানা দেখিতেছিল। সুধীর আসিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইল, শিশুসুলভ অনুসন্ধিৎসার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কি কাগজ মেসোমশাই ?"

"বাজে কাগজ বাবা—"

আবদারের ভঙ্গীতে সুধীর কহিল, "আমায় একবারটি দাও না—"

প্রতুলের কি একটা কথা মনে হইল, স্মিতমুখে প্রশ্ন করিল "তুমি এটা নেবে সুধীর ?"

ষ্ট্যাম্প দেওয়া পার্চ্চমেণ্ট কাগজে ঝক্‌ঝকে লেখা,—আনন্দে

সুধীরের চোখমুখ চক্চক্ করিতে লাগিল, হাত বাড়াইয়া ঘাড় নাড়িয়া সে সম্মতি জানাইল, "হাঁ—"

তিরিশ হাজার টাকার পলিসিখানা যেন একটা ছেঁড়া কাগজ, এমনইতর প্রতুলের ঔদাসীন্য। সে কহিল, "আচ্ছা, ওটা তোমাকে দিলাম সুধীর।"

চায়ের পেয়ালা হাতে সুনীতি ঘরে ঢুকিল, সুধীরের হাতের কাগজখানার দিকে চোখ পড়িতেই কহিল, "ও কিসের কাগজ সুধীর?"

পলিসিখানার উপর হইতে লুব্ধ নেত্র অপসারিত না করিয়াই গম্ভীর মুখে সুধীর কহিল, "মেশোমশাই দিয়েছে—"

চায়ের পেয়ালা টেবিলের উপরে রাখিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া সুনীতি কহিল, "কি জিনিস দেখি!" পরে বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "কাজের জিনিষ নিয়ে খেলা! দাও শীগ্‌গির আমার কাছে!"

ত্বরিতগতিতে সুধীর দুই হাত পিছনে লুকাইয়া কান্নার উপক্রম করিয়া কহিল, "বাঃরে, মেশোমশাই আমাকে দিলেন যে।"

সুধীরের ত্রস্তব্যাকুল ভাব দেখিয়া সুনীতি হাসিয়া ফেলিল,—খুব সম্ভব পরিহাস করিয়াই কহিল, "হ্যাঁ, তোমাকে দিলেন বৈকি! ও বলে আমার জিনিষ!"

প্রতুলের চোখের দৃষ্টি যে সহসা কেন অত শঙ্কিত ও বেদনার্ত্ত হইয়া উঠিল তাহা বুঝা গেল না। মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া সে বলিল, "ওটা তোমার মাসীমারই জিনিষ সুধীর, আমার ভুল হয়েছিল!"

প্রতুলের অবসাদ একেবারে পরিপূর্ণরূপে বিদায় লইয়াছে। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় এখন তাহার কর্ম্মতৎপরতা। বন্ধুবান্ধবদের সহিত আড্ডা দিয়া, কলরব কোলাহল করিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎকাজ সম্পন্ন করিয়া জীবনটাকে সে নানাদিক হইতে পরীক্ষা করিয়া লইল। ইহারই মধ্যে কোথা দিয়া যে সাতটা দিন কাটিয়া গেল যেন টের পাওয়া গেল না। দেখিয়া শুনিয়া সুনীতির আর বিস্ময় এবং অস্বস্তির পরিসীমা রহিল না।

অবশেষে রবিবার আসিল এবং প্রতুল তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

সাতদিনের বিকার কাটিয়া গেছে, আবার সেই ক্লান্তি, আবার সেই বিবর্ণ পাণ্ডুর চিত্ত!—মৃত্যুর মধ্যে কিন্তু একটা অপূর্ব্ব আত্মোপলব্ধির সুযোগ আছে, অদ্ভুত ইহার মাধুর্য্য, বিস্ময়কর ইহার পরিপূর্ণতা! স্বেচ্ছায়, নিজের খেয়াল খুসী মত সুযোগ সুবিধা অবসর অনুসারে মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করার ন্যায় এত বড় বিলাস সংসারে আর নাই! স্থূল দেহে অবিদ্যমানতার আনন্দ প্রতুলকে গ্রাস করিয়া বসিল যেন! ফর্ দ্য ফান্ অভ্ ডাইং, ফর্ দ্য ফান্ অভ্ ডাইং!—

প্রতুল ড্রয়ার হইতে রিভলভার বাহির করিল। কানের পাশে ব্যারেলটা ভারী ঠাণ্ডা বোধ হয় কিন্তু!—প্রতুলের মুখে তিক্ত অথচ রহস্যময় হাসি!

সুনীতি দেবী কিন্তু সেই রবিবার দিন অবধি জানিতেন না যে প্রতুল তাহার জীবনবীমার টাকা হিন্দু মহাসভার নামে নূতন করিয়া দান করিয়া দিয়া গেছে!

দুঃখ হয়, আহা পতিগতপ্রাণা অনাথা বিধবা! বেচারী, বেচারী সুনীতি!

শ্রীআশীষ গুপ্ত

পট ও মঞ্চ

আনন্দ

শিল্পী বাঙালী

কবি গাঁথেন ছন্দের মালা, অন্তরের রঙে ও রসে শিল্পী করেন পটের রেখায় প্রাণ-সঞ্চার, গায়কের কণ্ঠে জেগে ওঠে

Victor Melaglen কে সেদিন হলিউডের অভিনেতৃসঙ্ঘ The Informer ছবিতে অভিনয়-কুশলতার জন্য পুরস্কার দিয়েছেন। অতএব আমরা অনুমান করতে পারি ভিক্টর এ বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্ব্বাচিত হবেন। ভিক্টর প্রথমে What Price Gloryতে নাম করে, তারপর এডমণ্ড লো-র সঙ্গে The Cockeyed Worldএ নামে। Lowe—Melaglen এর পর বহুবার একত্র নেমেছে।

সুন্দরের তরে আকুল আকুতি আর অপর দিকে দেখি স্বার্থে স্বার্থে হিংস্র সংঘাত, লালসা ও লাভের বীভৎস নগ্ন আকৃতি, অর্থ ও অন্নের জন্য নির্ম্মম হানাহানি। একটীতে প্রকাশ পায় অন্তরের প্রেরণা, অপরটায় প্রকট হয় দেহের তাড়না। জৈব জীবনকে মানুষ যেমন অস্বীকার করতে পারে না, কারুকলাও সৃষ্টিহীন হলে তার আবার তেমনি পরিচয় দেবার মত কিছুই থাকে না। আর শিল্প ও সৌন্দর্য্যকে মানুষ বাদ দেবেই বা কি ক'রে? তার দেহের মাঝে যে রক্ত চলে সে চলে নেচে—তার গতি ছন্দঃসুন্দর। মানুষ মাত্রেরই অন্তরে একটা চিরন্তন অতৃপ্ত পিপাসা আছে, সে পিপাসা রূপের ও রসের চির-অতৃপ্ত কামনা নিয়ে অন্তর তার কেঁদে কেঁদে ফেরে; যার কাছ হতে মেলে রস ও রসদ তারই চরণে সে লুটিয়ে পড়ে।

প্রাচ্যে প্রতীচ্যে, দেশে দেশে প্রদেশে প্রদেশে কলা-কমলার পূজার পদ্ধতি ও আয়োজন বিভিন্ন। যে আবেষ্টনীর মাঝে মানুষ বাস করে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে তার চারুকলা চর্চ্চায়। কেউ সৃষ্টি করে রূপ, কেউ বা রস আর কেউ বা উভয়ই। বাঙালীর পিপাসা কেবল রূপদর্শনে মেটে না, রসাবেশে বিভোর না হলে তার কাছে শিল্পসৃষ্টির মূল্য নেই। বাঙালী কবির জাতি, বাঙালী শিল্পী, বাঙালী রূপ ও রসস্রষ্টা।

পূবালী আকাশের রাঙা আভায় যার মন রঙীন হয়ে ওঠে, কাশগুচ্ছের মত পুঞ্জমেঘে সুন্দর উদাসী নীল আকাশ যার মনে জাগিয়ে তোলে বাউল সুর, গোধূলির সোণা-আকাশ যাকে করে তোলে কবি আমরা সেই বাঙালী-শিল্পীর জাতি। প্রকৃতিতে যখন শ্যামলিমার সমারোহ তখন বাঙালী গড়ে পুতুল—

এই পুতুলই তার চিরসুন্দরের প্রতিমা। তুমি উপহাস করতে পার, বিদ্রূপ করতে পার, বাঙালীকে কুসংস্কারাছন্ন বলতে

Conrad Veidtকে একমাত্র The Cabinet of Dr. Coligiri নামে নির্ব্বাক ছবি অমর করে রাখবে। সবাক যুগে I was a Spy, Rome Express, Jew Suss প্রভৃতি ছবিতে এই জার্ম্মান অভিনেতা বিটেনের চিত্রশিল্পকে সুসমৃদ্ধ করেছেন।

পার, কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছ কি পথ থেকে পাথর কুড়িয়ে মাটী আর খড়ের প্রতিমা গ'ড়ে কেন সে তাদের ঠাকুর বলতে চায়—অন্তরের দেবতাকে সে পাষাণে আর মৃত্তিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সুন্দরের বহিঃপ্রকাশ দেখবার জন্য আপনার ভাবাবেগ আর শিল্পকুশলতা উজাড় ক'রে দেয়! আহারের অন্ন জোটে না, পরিধেয় ছিন্ন ও মলিন, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই, পরাধীনতার ও পরাজয়ের গ্লানিতে জীবন তিক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তবু শিল্পি-অন্তর ভাবপাগল বাঙালী চারুশিল্প সাধনায় মগ্ন, আর এই ক'রেই সেই এনেছে অন্নহীন জীবনে অমৃতের প্রবাহ। দরিদ্র সে, দীনতার তার অন্ত নেই, কিন্তু তার অন্তরে চলে নিত্য-উৎসবের সমারোহ।

দেওয়া নেওয়া কেনা বেচায় জগৎ চলে। বাঙালীকে বাঁচতে হলে জগতের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে। পৃথিবীতে এসে বেঁচে থাকাটাই পরম লক্ষ্য। আজ দুনিয়ার হাটে দেখি বাঙালী ভিন্ন সব জাতিই সস্তা চটকদার চারুশিল্প-সম্ভার নিয়ে ব'সে গেছে। অন্যান্য দেশে চারুকলার চর্চ্চা ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং সে ব্যবসা লাভদায়কও বটে। বিজ্ঞাপন-আড়ম্বর চাকচিক্যের যুগে যে বুদ্ধিমান সে ব্যবসায়ে নেমে পড়েছে, ক্রেতার চাহিদা মেটাবার জন্য প্রাণের পরিচয়হীন মেসিনে তৈরি সস্তা চকচকে

Myrna Loyকে প্রথমে কেউ আমল দিতে চাইতো না; ভুতুড়ে ভুমিকায় বা মোহিনীরূপে মার্ণাকে অসংখ্য বার দেখা গেছে। কিন্তু The Thin Man যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন মার্ণা কতবড় অভিনেত্রী। Evelyn Prentice, Manhattan Melodrama, Broadway Bill, Stamboul Quest প্রভৃতি ছবি মার্ণার যশো-মুকুটের নব নব রত্ন। শ্রীমতী নাকি এবার এম-জি-এমের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে হেক্ট-ম্যাকার্থারের দলে যোগ দিয়েছেন। অন্যত্র গেলে দুঃখ হোত, কিন্তু যারা 'ক্রাইম্ উইদাউট্ প্যাশান্' তুলেছে তাদের দলে অবশ্যই মার্ণার সুনাম নষ্ট হবেনা।

জিনিষে দোকান সাজাচ্ছে আর চাকচিক্যই সুবর্ণত্বের প্রমাণ ভেবে লোকে নিচ্ছেও সেই সব জিনিষ। ব্যবসায়ের অন্যান্য

আর এক চমৎকার অভিনেতা হচ্ছে William Powell. ইনি প্রথমে ভ্যান্ডাইন্ প্রণীত ডিটেক্টিভ্ গল্পের সব ছায়ারূপে ফিলো ভান্সের ভূমিকাভিনয়ে নাম করে। One way Passage ছবিতে বিল্ চিত্রজগৎকে স্তম্ভিত করলে। বিল্ যে সর্ব্বপ্রকার ভূমিকাভিনয়ে সমান দক্ষ তার প্রমাণ পাওয়া গেছে Manhattan Melodrama, The Thin Man, Evelyn Prentice প্রভৃতি ছবিতে। The Thin Man হচ্ছে বিলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছবি।

ক্ষেত্রে বাঙালী পরাজিত। কারণ রাতারাতি গণেশ উল্টে ঐশ্বর্য্যলাভের পথ বাঙালী চেনে নি, সহজে অর্থাগমের উপায় জানা থাকলেও বাঙালী তদনুযায়ী কাজ করতে পারে না—বেপরোয়া ব্যবসায়কে ইহজগতের একমাত্র সত্য ব'লে জেনে যারা অন্য যেকোনো সত্যকে অস্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করে না, জীবন-সংগ্রামে তারাই জয়লাভ করছে; আর অসাধুতায় অনভ্যস্ত বাঙালীর ব্যবসায়ে পরাজয় পদে পদে। এবং অংশতঃ এরই ফলে আমাদের সোণার দেশ আজ প্রায় অস্তসর্ব্বস্ব। শাসনে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে স্বীকার করি, কিন্তু শোষণেও বড় কম সর্ব্বনাশ হয়নি। অর্থাগম নেই অথচ ব্যয়ের অঙ্ক বেড়েই চলেছে। শিল্পীর জাতিতে বেঁচে থাকতে হলে ঘরে আজ টাকা আনবার প্রয়োজন এবং টাকা আসবে ব্যবসায়ে—সে ব্যবসা চারুশিল্পের এবং প্রধানতঃ ছায়াশিল্পের। ছায়াশিল্প ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বেণেদের অতিলাভের লোভ জাগিয়ে তুলেছে—এখন আর ছায়াছবির মাঝে রূপ ও রসপরিবেশনের তেমন চেষ্টা নেই যেমন আছে টাকা লোটবার। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এযুগে সংখ্যাধিক্যই

এক কালে দাত উঁচু পুরুষালি চেহারার এক মেয়েকে সব ষ্টুডিয়োই ফিরিয়ে দিয়েছিল। তার পর সেই মেয়ে ক্রমে আর্ভিং থালবার্গের পত্নী হয় ও নির্ব্বাক যুগে The Student Prince, He who Gets Slapped, The Actress এবং সবাক যুগে The Divorcee, A Free Soul, The last Mrs. Cheyney, Strangers May Kiss, Smiling Three, Barretts of the Wimpole Street প্রভৃতির মত ছবি করে। এর মধ্যে The Divorceeতে অভিনয় ক'রে Norma Shearer (হ্যাঁ, সেই মেয়েটির এই-ই নাম) শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নির্ব্বাচিত হয়।

ঘটে, গুণপনা বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু শিল্প আজ ব্যবসায়ের সস্তা পণ্যে পরিণত হলেও প্রকৃতিতঃ কৃষ্টি ও রসানুভূতি

কাণায় কাণায় পূর্ণ যৌবনের প্রতীক Joan Crawford. Our Dancing Daughters, Unknown, Our Modern Maidens, Rose Marie প্রভৃতি জোনের সেকালের বিখ্যাত ছবি এবং Possessed, No More Ladies, Dancing Lady, Rain, Sadie Mckee, Chained, Forsaking All others তার এ যুগের নাম করা ছবি।

তার সৃষ্টির মূলে থাকবেই। অথচ দেখা যাচ্ছে বম্বের মত যারা ছায়াছবির কলানুগ দিকটা বাদ দিয়ে তাকে কেবল ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে তাদের আর্থিক অবস্থাও উন্নতির পথে, যদিও এরা করেছে কেবল অপরের বিকৃত ও কদর্য্য অনুসরণ। ছায়াছবির মত এমন সর্ব্বত্র প্রচারযোগ্য সর্ব্বজনগ্রাহ্য ব্যবসায় আর নেই এবং এই কারণে ছায়াশিল্প আজ ফিল্মের ব্যবসাতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু রূপ ও রসপরিবেশন যে ছায়াছবির প্রধান অঙ্গ সেই ছায়াছবি করতে শিল্পীর প্রয়োজন। আর শিল্পকলার জ্ঞানে রূপসৃষ্টিতে ও রসপরিবেশনে তাদের সমতুল্য কেউ নেই অন্নচিন্তাও যাদের সূক্ষ্মকলাজ্ঞানকে বিনষ্ট করতে পারে নি। ছায়াশিল্পের প্রথম পাঠ বাঙালী হয়ত' এখনও সাঙ্গ করেনি, কিন্তু জন্মাবধি শিল্পী বাঙালী যে কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে সমশ্রেণীর আর কোনও ছাত্রই তা পারে নি। অন্তর-সম্পদে বাঙালীর মত সম্পন্ন কেউ নয় এবং শিল্পোৎকর্ষের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্মান তারই প্রাপ্য, কিন্তু বাঙালী এখনও অত্যন্ত অন্তর্মুখী, জগতের

এই Carol Lombard মেয়েটী ছোট বড় নানা রকম ভূমিকায় অভিনয় করার পর আজ প্রথম শ্রেণীর নটীদের মধ্যে স্থান পেয়েছে এবং ক্যারল্ অভিনয় করেছে প্রায় প্রত্যেক সেরা অভিনেতার সঙ্গে। ওর গালে প্রায় অদৃশ্য ছোট্ট একটী কাটার দাগ ওর মুখকে আরো সুন্দর করেছে এবং আমার ভারী ভাল লাগে ওর আন্তরিকতাময় অভিনয় ও কথা বলার ধরণ। No Man of her Own, No More Orchids, Now and Forever, The Gay Bride, The White Woman, 20th Century প্রভৃতি ক্যারলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটী ছবি।

সামনে সে আপনার সুন্দর শিল্পসম্ভার নিয়ে দাঁড়ায় নি। বাঙালী তর্ক করে স্বাভাবিকতার ও কারুকলার পক্ষ নিয়ে—ছবিতে সে রূপ ও রস পরিবেশনেরই চেষ্টা করে, ব্যবসায়ের খাতিরে ছবিতে অসংখ্য গান জুড়ে দিয়ে বা সস্তা হাততালি নেবার প্যাঁচ কষে সে আপনার শিল্পি-মনের পরে অত্যাচার করতে চায় না। বাঙালী যে তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ উক্তরূপ আচরণ করেছে তার মূলে ছিল হয়ত' অর্থপতির আজ্ঞা, না হয় তার নিজের কিঞ্চিৎ অনভিজ্ঞান। বম্বে বিদেশে ছবি পাঠিয়ে ভারতের তথা শিল্পী বাঙালীর সম্মানের হানি করছে,

চিত্র পরিচয়

সেপ্টেম্বরের একুশ তারিখ অবধি যতগুলি উল্লেখযোগ্য ছবি মুক্তি লাভ করেছে এখানে তাদের শ্রেণী বিভাগ ক'রে দেওয়া হোল। আমাদের মতে (ক) শ্রেণীর ছবি অসাধারণ, (খ) শ্রেণীর সুন্দর, (গ) উপভোগ্য এবং (ঘ) শ্রেণীর ছবি সাধারণ। 'ছ' চিহ্নিত ছবি ছেলেরাও দেখতে পারে।

(ক) শ্রেণী—দি হোল্ টাউন্ ইজ্ টকিং।

(খ)—রবার্ট', লা মিজারেব্‌ল্ (ছ) (টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি পিক্‌চার্সের তোলা আমেরিকান সংস্করণ), ক্যাসিনো ডি প্যারি।

হ্যাঁ, অবশ্যই এটা Marlene Dietrich-এর ছবি। মার্লিন্ উপস্থিত তার প্রথম আমেরিকান ছবির নায়ক Gary Cooper-এর সঙ্গে Frank Borzage-এর অধীনে Desire তুলছে। আমরা কিন্তু মার্লিনের সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। তার উত্থানের ইতিহাস-কার Josef Von Sternberg-কে ছেড়ে প্রথম Song of Songs-এ নেমে সে অনেকটা হেলো হয়েছিল। জোসেফ ভন্ তার প্রতিভার পরিমাণ ও তার প্রয়োগক্ষেত্র জানতেন এবং সে জন্য মার্লিন suppressed হলেও সুনাম হারায় নি। অবশ্য বোরজেগ্ তারকাস্রষ্টা শ্রেষ্ঠ প্রযোজক ; কিন্তু তারপর Glamour Queen ?

চতুর শক্রতে আমাদের নামে অযথা কুৎসা প্রচার করছে—এখনও কি বাঙালী নিছক শিল্পসৃষ্টিতে আত্মসমাহিত থাকবে ? ব্যবসায়ী হলে আজ বাঙালী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু বিশ্ব-বাসীর কাছে স্বদেশের সৌন্দর্য্যের ও গৌরবের ছবি তুলে দেখাতো, করতো দেশের মুখরক্ষা, পরিচয় দিতো নিজস্ব অনুপম সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানের। কিন্তু উছল নদীর কলতান, সোনালি মাঠ, মিঠে মেঠো সুর বাঙালীকে ক'রে তুলেছে অলস, ভাববিভোর, স্বপ্নাবিষ্ট। ভাবি এজন্য আক্ষেপ করবো না কিন্তু পাউণ্ড-ডলার-টাকার পৃথিবীতে তা আর হয়ে ওঠে না।

(গ)—ব্রড্‌ওয়ে বিল্, পাব্‌লিক্ হিরো নাম্বার ১, দি থার্টি নাইন্ ষ্টেপ্‌স, অয়েল্ ফর দি ল্যাম্পস্ অব্ চায়না।

(ঘ)—মেন্ উইদাউট্ নেম্‌স্ (ছ), দি ক্লেয়ার ভয়েণ্ট, লাইফ্ বিগিন্‌স্ এট্ ফর্টি (ছ), দি ভার্জ্জিনিয়ান্, ভ্যারাইটি (ছ), উই আর রিচ্ এগেন্, দি ডেয়ারিং ইয়ং ম্যান্

আগামী ছবির মধ্যেও কতগুলি কোন শ্রেণীর দাঁড়াবে ব'লে আমাদের মনে হয় তাও বললাম,

(ক)—জি মেন্, দি ইন্‌ফর্ম্মার

(খ)—ইন্ ক্যালিয়েণ্টি, বেকি সার্প (মনোহর রঙীন), দি র‍্যাভেন্, লাভ্ মি ফরেভার

(গ)—দি ওয়েডিং নাইট্, দি ফ্লেম্ উইদিন্, লেট্ আস্ লিভ্ টু-নাইট্, দি গ্লাস্ কী, দি ড্রাগন্ মার্ডার কেস, আওয়ার লিট্‌ল গার্ল, ওয়্যারউল্‌ফ্ অব্ লণ্ডন্, কানিভ্যাল,

বরাতঃবলি Miriam Hopkins-এর, শুধু প্রতিভায় কি করতে পারে যদি না থাকে চওড়া কপাল। কোরাস গার্ল থেকে মিরিয়াম্ এত উঠেছে যে প্রথম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রঙীন ছবি Becky Sharp-এর সে নায়িকা। The Smiling Lieutenant, The World and the Flesh, Dancers in the Dark, Dr. Jekyll & Mr. Hyde, All of Me, Temple Drake প্রভৃতি মিরিয়ামের ছবি। হাঁ, মিরিয়াম একটু মন্দ মেয়ের পার্ট করে, আর করেও চমৎকার।

(ঘ)—দি গ্রেট্ হোটেল্ মার্ডার, নিট্ উইটস্, এ ডগ্ অব্ ফ্ল্যাণ্ডার্স,

দেবদাস—নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী ছবি। প্রযোজক প্রমথেশ বড়ুয়া বাংলা সংস্করণের অধিকাংশ দৃশ্য যথাযথ রেখেছেন, তবে এ ক্ষেত্রে সংলাপ হিন্দী। নূতন দৃশ্য যেগুলি যোগ দেওয়া হয়েছে সেগুলি প্রাক্তন দৃশ্যের মত উন্নত নয়। এক্ষেত্রে দেখা গেল চন্দ্রমুখী দেবদাসদের গ্রামে গেছে এবং

কুটীরের খুঁটীতে ঠেস দিয়ে বিরহের গান গাইছে, চন্দ্রমুখীর কলিকাতার বাড়ীতে যাদের গতায়াত ছিল এক্ষেত্রে তারা

আজকের কথা নয়, ১৯২৩ সালে Jean Arthur ছবিতে এসেছে কিন্তু এতাবৎকাল ছোট কমিক আর তদধিক ছোট্ট ভূমিকায় নেমেছে। আজ কিন্তু জীনের বরাত খুলে গেছে। Public Hero Number 1, The whole Town is Talking, Diamond Jim প্রভৃতি ছবির সে নায়িকা। সত্যি জীন ভাল অভিনয় করে।

লোক হাসাবার জন্য নিছক ভাঁড়ামির আশ্রয় নিয়েছে। প্রথম দৃশ্যে এখানে দেবদাস গান গাইছে এবং পূজার্থিনী পার্ব্বতী তার কাছে আসছে—বলা বাহুল্য এ সব দৃশ্যে সূক্ষ্ম কলাজ্ঞান-সম্পন্ন বাঙালী খুব খুসী না হলেও অবাঙ্গালীরা তাদের মনোমত জিনিস পাবে। নূতন দৃশ্যে বড়ুয়ার বাংলা সংস্করণের অনুরূপ

Ann Sothern খুব বেশি দিন চিত্র-জগতে আসে নি। Let's fall in Loveএ অভিনয় ক'রে য্যান্ কর্ত্তাদের এমন দৃষ্টি আকর্ষণ করলে যে দেড় বছরের মধ্যে ছুটির মুখ দেখতে পেলনা। গানের ছবির নায়িকা হিসাবে য্যান্‌কে আপনারা Melody in Spring, Kid Millions, To his Bergere প্রভৃতি ছবিতে দেখে থাকবেন। য্যান্ এখন কলম্বিয়ায় James Dunnএর সঙ্গে Moon-light on the River তুলছে।

উচ্চ প্রয়োগ-কৌশলের অভাব দেখে ভাবছি : 'বাংলা দেবদাস' কি প্রমথেশবাবুর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান, না তার বিকাশের প্রথম অধ্যায় ?

দেবদাসের অংশে সায়গাল অতি সুন্দর অভিনয় করেছেন, তবে তাঁর রূপ-সজ্জা প্রশংসার্হ নয়। শ্রীমতী যমুনার পার্ব্বতীও বাংলা সংস্করণের চেয়ে ভাল হয়েছে। শ্রীমতী রাজকুমারীর অপরাপর অভিনয় চলনসৈ। ছবির দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত ভাল। পারম্পর্য্য সর্ব্বত্র রক্ষিত হয়নি। বিমল রায়ের আলোকচিত্র সুন্দর, তবে বাংলা ছবির মত তেমন কলা-

বিলাতে যারা ছবিতে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে Jack Hulbert তাদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী। জ্যাক হাসায় খুব। Cicely Courtneidge তার স্ত্রী। জ্যাক স্কুল কলেজ থেকেই থিয়েটার ক'রে আসছিল। Jack's the Boy, Happy Ever after, falling for you, Love of Wheels, Bulldog প্রভৃতি ছবি জ্যাক্‌কে চিত্র জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

কি, হাসছেন যে বড়? না, 'আনন্দ' এদের পরিচয় দিচ্ছে না। Bonnie Scotland ছবিতে এদের আপনি এবার দেখবেন। দৈর্ঘ্যের অনুপাতে এদের বড় ছবিতে হাসি অত্যন্ত কম ব'লে এরা এবার বড় ছবি আর বিশেষ করবে না।

চন্দ্রমুখী প্রথমে খুব ভাল না হলেও চন্দ্রাবতীর শেষ পর্য্যন্ত কাছাকাছি গেছে। কিন্তু চুণীলাল আমাদের হতাশ করেছে; ল য়্যাডল্‌ফ্‌ মেঞ্জু সত্যি, কিন্তু সে পশ্চিমা ভাঁড় নয়।

কৌশলপূর্ণ নয়। শব্দগ্রহণ নির্দ্দোষ এবং তিমিরবরণের সুরসংযোজনা অতীব আনন্দকর।

আনন্দ

শ্রীসুশীলকুমার বসু

পূজার বন্ধ ও ছাত্রদল

পূজার দীর্ঘ অবকাশে অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহাদের জন্ম-পল্লীতে যাইবেন। আরও অনেকে যাঁহারা যাইবেন, তাঁহাদের শ্রমবহুল জীবনের বহুকাম্য এই স্বল্প বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু, ছাত্রদের সম্বন্ধে অন্যকথা। তাহারা যে পরাধীন, দরিদ্র, অজ্ঞ, স্বাস্থ্যহীন, সহস্রবিধ বৈষম্য ও অবিচারে খণ্ডীকৃত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে জন্মিয়াছেন সেকথা তাঁহাদের ভুলিলে চলিবে না। তাঁহাদের চিন্তা, প্রচেষ্টা, সাধনা ও শক্তির উপর দেশের সমগ্র ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। দেশের ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব তাঁহাদেরই মাথার উপর রহিয়াছে।

সাধারণতঃ এ সময়টা তাঁহারা খেলাধূলা, থিয়েটার গান, এবং আরও নানা আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া থাকেন। জীবনের বিকাশের পক্ষে যৌবনকে তাজা রাখিবার পক্ষে যে ইহার প্রয়োজন আছে, তাহা সত্য। কিন্তু, ক্লান্তিহীন উদ্যম দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা, দুরূহ সাধনা, কঠোর শ্রমনিষ্ঠা, নিশ্চল অধ্যবসায় নির্ভিক বলিষ্ঠ চিন্তা, সর্ব্বোপরি নূতন পথে যাত্রা করিবার দুর্নিবার প্রেরণা ; যে-অতীত তাহার আয়ু অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানের সীমায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, নির্ম্মম আঘাতে তাহাকে চূর্ণ করিবার দুঃসাহসিকতা প্রভৃতিও যে যৌবনের ধর্ম্ম ; এই সকলের মধ্য দিয়াই যে যৌবন তাহার পূর্ণতম মহিমায় প্রকাশিত সেকথাও আমাদের ছাত্রদের ভুলিলে চলিবেনা।

ভারতবর্ষ অনেক দিন হইতে সমগ্র জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই বিচ্ছিন্নতা শুধু ভৌগোলিক নহে ; বহু যুগ ধরিয়া পৃথিবীর অন্যত্র মানবের চিত্তক্ষেত্রে যে বিপ্লব চলিয়াছে, মানুষকে যে-সকল নূতন চিন্তা, ভাব ও সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ; তাহার মনের যে গতিবেগ, ভুল, ত্রুটি এবং বিপদের মধ্য দিয়া তাহাকে সম্মুখের দিকে লইয়া চলিয়াছে, দুঃখ লাঞ্ছনা এবং মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিয়া 'ভালর' পরিবর্ত্তে 'আরও ভালকে' গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে, মানুষের সেই চলমান চিত্ত হইতে যে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তাহাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুর্গতির কারণ হইয়াছে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র যখন মানুষ নিজের উদ্যম ও প্রচেষ্টার দ্বারা ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করিয়াছে, আমরা তখন অতীতকে বর্ত্তমানের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি। অন্যদেশে মানুষ অনাগত কালকে সৃষ্টি করিয়াছে, আর আমাদের দেশে 'কাল' আপনা হইতে আবর্ত্তিত হইয়াছে। সেইজন্য আমরা পথচলা ভুলিয়া গিয়াছি, পুরাতন জীর্ণ আশ্রয়কে ত্যাগ করিয়া নূতন পথে যাত্রা করিতে ভয় পাইতেছি।

ভারতবর্ষের যুবকচিত্তকে আমাদের এই দৈন্যের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হইবে এবং আঘাতের পর আঘাত দিয়া এই মোহাচ্ছন্ন জীর্ণতাকে দূর করিয়া জাতির মনে নূতন প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে। তাঁহাদিগের একথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশের কোটি কোটি লোক অস্পৃশ্য অনাচরণীয় ও অপাংক্তেয় হইয়া নিত্য অসম্মানের মধ্যে কাল-যাপন করিতেছে ; তদপেক্ষাও অধিক সংখ্যক লোক দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের মধ্যে ডুবিয়া আছে ; ইহাদের ভুলিলে চলিবে না যে দেশে এখনও প্রচুর সংখ্যায় সেই সকল ভণ্ড রহিয়াছে যাহারা খুচরা সুবিধা দিয়া ক্রমিক প্রতিকারের আশ্বাস দিয়া নিজেদের স্বার্থনাশের আশঙ্কায় প্রকৃত অবস্থাকে

ঢাকিয়া রাখিতেছে এবং প্রতিকারের আসল উপায়কে কৌশলে দূরে সরাইয়া দিতেছে। ছাত্রদলকেই দেশকে এই অসাড়, নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, তাঁহাদের তারুণ্যের স্পর্শে জাতিকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে।

ছাত্রদের অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তাঁহারা বিদেশে কাটান, অল্পদিনের জন্য দেশে আসিয়া বিশেষ কিছু করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অধিকাংশ সময় বাড়ীতে না থাকিলেও, বৎসরে তিনমাসের উর্দ্ধকাল তাঁহারা অনেকেই থাকিতে পারেন। তদুপরি বাড়ীতে যখন তাঁহারা থাকেন না তখনও পল্লীর সহিত তাঁহাদের যোগসূত্র সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয় না। তাঁহাদের গ্রাম্য বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং পল্লীবাসী ছাত্রদলের মধ্য দিয়া তাঁহাদের প্রভাব অনুপস্থিতির সময়ও কার্য্যকরী হইতে পারে।

কিন্তু যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে শিক্ষাবিস্তার বা ঐ প্রকার কোন স্থায়ীকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সাফল্য লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে তবু, অস্থায়ী এমন বহুকাজ তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, যাহা করিতে পারিলে, তাহার মূল্য বা দেশের ভবিষ্যতের উপর তাহার ফল কোন প্রকারের স্থায়ী কাজ অপেক্ষা কম হইবে না।

শিক্ষায়, অর্থ সম্পদে নানাবিধ জাগতিক উন্নতিতে যে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির পশ্চাতে পড়িয়া আছি, তাহাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দৈন্য নয়। আমাদের মধ্যে যে আজও গণচেতনা জাগে নাই, সঙ্ঘবদ্ধভাবে যে আমরা কোন কাজ করিতে পারি না, বহুপ্রকারের কল্পিত ও মিথ্যা বিভাগ যে আমাদের বহুখণ্ডে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে, যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত লাভ হইবে না এমন সকল কাজকেই যে অকাজ মনে করিয়া থাকি; বহু-প্রকার অবিচার ও অন্যায়ের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া বাস করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানবমনের স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা যে আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, সর্ব্বপ্রকার নূতনের বিরুদ্ধে আমাদের মনে দুর্ব্বলতাজনিত যে অবিশ্বাস জাগিয়াছে, তাহাই আমাদের উন্নতির পথে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে।

এই অবস্থা দূর করিবার জন্য কোন স্থায়ী গঠনমূলক কাজ অপেক্ষা যাহাতে লোকের মনে নূতন চিন্তা জাগিতে পারে, লোকে নূতন পথে অগ্রসর হইবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারে, সংস্কারের উপর বুদ্ধি ও যুক্তিকে অধিক মূল্য দিতে পারে, পুরাতনের জীর্ণতাকে উপলব্ধি করিতে পারে, এই প্রকার কাজের দ্বারাই অধিকতর ফল লাভ করা যাইবে। নানাপ্রকারে লোকের যুক্তিবিরোধী সংস্কারকে আঘাত করিয়া প্রচলিত ভুল মত ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া, প্রতিকূল জন-মতের সম্মুখে নিজেদের জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং আমাদের আভ্যন্তরীণ কোন কোন ব্যবস্থা এবং কিপ্রকারের মনোভাব জাতীয় মুক্তির সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিঘ্ন, অসঙ্কোচে তাহা বলিয়া দেশের লোকের নিশ্চলচিত্তে গতি দেওয়া যাইবে। এসকলের জন্য স্থায়ী কাজের সুবিধার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

ছাত্রদের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, ছাত্রীদের সম্বন্ধেও তাহার সকল কথা সমানভাবে প্রযোজ্য বরং ছাত্রদের অপেক্ষা তাঁহাদের দায়িত্ব গুরুতর ও জটিলতর। দেশের যে সকল দুঃখ দুর্দশা আছে, পুরুষদের সহিত তাঁহারা তাহার সম-ভাগী; দেশের সেই সকল দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহাদিগকেও তরুণের পাশে সাহসের সহিত সমানভাবে দাঁড়াইতে হইবে। নারীদের আরও অতিরিক্ত যে নানা দুঃখ আছে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে তাঁহাদের সামান্যতম ব্যক্তিগত স্বাধী-নতা পর্য্যন্ত নাই, তাঁহাদের শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি যে একান্তভাবে ইহার উপর নির্ভর করিতেছে, অবোরোধ দূর না হইলে, স্বচ্ছন্দে গতিবিধির স্বাধীনতা না পাইলে যে তাঁহাদের কোন প্রকার উন্নতি সম্ভব নহে এবং তাঁহাদের এই সকল সমস্যার সমাধান যে ছাত্রীদের উপর বহু-পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, সেকথা মনে রাখিয়া দৃঢ়পদে তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য পালনের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে।

এই সকল কাজের জন্য ইঁহারা দীর্ঘ অবকাশগুলির সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন।

ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল

আইন পরিষদ কর্তৃক ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল ৭১—৬১ ভোটে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই আইনটির সহিত বাংলার স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু, দুঃখের বিষয়

বাঙ্গালী সদস্যেরা নিজেদের বক্তব্য বলিবার সুযোগ পান নাই। এতদপেক্ষাও দুঃখের বিষয়, আইনপরিষদের ডেপুটিপ্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত আইনটির বিরুদ্ধে খুব চমৎকার, যুক্তিপূর্ণ, সারগর্ভ এবং তেজস্বী বক্তৃতা করিলেও, বাংলার সংবাদপত্র গুলিতে তাহা যথাযথ প্রাধান্য পায় নাই।

সংবাদদাতারা সম্ভবতঃ কংগ্রেসী সদস্যদের প্রতিই সমধিক মনোযোগী এবং ইঁহাদের বক্তৃতা ও বিতর্ককেই বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত দত্ত জাতীয়দলের সদস্য বলিয়া হয়ত তাঁহার বক্তৃতাকে যথোচিত প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। এমনও হইতে পারে, অবাঙ্গালী নেতাদের সম্বন্ধে অন্য প্রদেশের সংবাদদাতা ও অন্যেরা যতটা শ্রদ্ধাশীল, বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে তাহারা ততটা শ্রদ্ধাশীল নহেন। এই জন্য শ্রীযুক্ত দেশাই প্রভৃতির ক্ষমতা দেখাইবার জন্য তাঁহাদের অতিরিক্ত আগ্রহ বশতঃ, অন্যদের সম্বন্ধে তাঁহারা কতকটা অবিচার করেন।

যাহা হউক বাঙ্গালী সংবাদপত্র পরিচালকদের এ সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ হইবার প্রয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গালী সদস্যদের চিত্রাদি এবং তাঁহাদের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ সময় মত দিবার, তাহার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য করিবার, বক্তৃতাগুলিকে বিশেষ প্রাধান্য দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এসম্বন্ধে ইংরাজী কাগজগুলির দায়িত্ব, বাংলা কাগজগুলির অপেক্ষাও বেশী। কারণ বাংলার ইংরাজী কাগজগুলির অনেক অবাঙ্গালী পাঠকও আছেন।

শ্রীযুক্ত দত্তের বক্তৃতা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।

"বিরোধীপক্ষের বক্তাদের মধ্যে ডেপুটিপ্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, সর্ব্বাপেক্ষা সারগর্ভ ও তথ্যবহুল হইয়াছিল। পুরা দুই ঘণ্টাকাল শ্রীযুক্ত দত্ত বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি এই বিল সম্পর্কে বাংলার মনোভাব ও বাংলার বক্তব্য চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেন। লবী মহলের আলোচনায়ও জানা যায় যে, শ্রীযুক্ত দত্তের বক্তৃতার সকলেই তারিফ করিয়াছেন।...তুমুল জয়ধ্বনিতেই মাঝে মাঝেই শ্রীযুক্ত দত্তের বক্তৃতা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছিল। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে সকলের মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সরকার পক্ষের সদস্যগণ শ্রীযুক্ত দত্তের যুক্তি কোনক্রমেই খণ্ডন করিতে সমর্থ হন নাই।"

পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত পি-এন-ব্যানার্জির বিবৃতি আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।

"ফৌজদারী আইন সংশোধন বিলসম্পর্কে প্রদত্ত শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের বক্তৃতার এসোসিয়েটেড্ প্রেস প্রদত্ত যে বিবরণ অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি এবং অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার মন্তব্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত সংবাদদাতার মন্তব্য দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত ও ভ্রান্তি-উৎপাদক। বাংলার সকল সদস্যই বিলটি সম্পর্কে কিছু না কিছু বলিবার জন্য সমুৎসুক ছিলেন, কিন্তু, বাংলার একাধিক সদস্য কিছু বলিবার সুযোগ না পাওয়ায় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত এরূপ তেজস্বিতা ও বিচক্ষণতা সহকারে বাংলার বক্তব্য ব্যক্ত করেন যে, অনেক সদস্যই তাহার সুখ্যাতি না করিয়া পারেন না। স্বরাষ্ট্রসচিব ও মিঃ গ্রিফিথ্ কর্ত্তৃক উত্থাপিত যুক্তিজাল শ্রীযুক্ত দত্ত অবলীলাক্রমে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন। কিন্তু, এসোসিয়েটেড প্রেস তাঁহার বক্তৃতার যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী।"

দেশীয় লোকের দ্বারা বিদেশী নিয়োগ

আমরা আধুনিক জগতের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। বিদেশী উন্নতিশীল জাতি সমূহের বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াই আমাদের সকল বিষয়ে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের নূতন কোন বৃহৎ প্রচেষ্টার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহায্যেয় প্রয়োজন হইতে পারে এবং এইরূপক্ষেত্রে বিদেশী বিশেষজ্ঞের নিয়োগও সমর্থনযোগ্য হইতে পারে।

কিন্তু, আমাদের অনেক লোকেরই এই প্রকার একটা ধারণা আছে যে, যেখানে কোন বৃহৎ কারবার সুশৃঙ্খলায় চালাইবার প্রয়োজন হয়, এবং বিশেষ করিয়া ইহার জন্য বহুলোকের উপর প্রভুত্ব করিবার প্রয়োজন হয়, সব সময়ে সজাগ ও সাবধান থাকিয়া যেখানে বড় কাজের বহু খুঁটিনাটির উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়, এমন সব যায়গায় দেশীয়দের অপেক্ষা ইউরোপীয়েরা অধিকতর যোগ্যতার সহিত কাজ করিতে পারেন। কার্য্যেও অনেক সময় এই কথার সত্যতার প্রমাণ

কোন কোন ক্ষেত্রে যে না পাওয়া যায়, এমন নহে। এই জন্য আমাদের বিভিন্নপ্রকারের অনেক কাজে প্রধান পরিচালকের পদে ইউরোপীয়ের নিয়োগের প্রথা এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। ইহা যে আমাদের পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা যখন অপরের নিকট আমাদের নিজেদের সর্ব্ববিধ দায়িত্বপূর্ণ কাজ চালাইতে পারিবার দাবী করিতেছি, তখন আমাদের হাত আছে এমন কোন কাজে দেশীলোকের পরিবর্ত্তে যদি আমরা বিদেশী নিযুক্ত করি তবে তাহা আমাদের অযোগ্যতার প্রমাণ হিসাবেই গৃহীত হইবে।

উদ্যমের সহিত কাজ করিবার শক্তি ও অভ্যাসের অভাব, কাজে যথাসাধ্য ফাঁকি দিবার চেষ্টা, নিন্দা ও শাস্তি এড়াইবার জন্য নিতান্ত যতটুকু করা প্রয়োজন তাহার অধিক কাজ না করা, আমাদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতায় দাঁড়াইয়াছে। দায়িত্ব-পূর্ণ পদে যাঁহারা অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁহারাও সকলে এই দুর্ব্বলতা জয় করিতে পারেন না। ফলে, অধীনস্থ লোকদের নিকট হইতেও পূর্ণমাত্রায় ইঁহারা কাজ আদায় করিতে পারেন না। কাজেই, বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা সহজেই আসিয়া পড়ে। সম্ভবতঃ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের অপেক্ষা বাঙ্গালীরা এই দোষে অধিকতর দুষ্ট। বাঙ্গালীদের কোন ফার্ম বা অফিসের কাজের পারিপাট্য ও শৃঙ্খলার সহিত সাহেবদের কোন ফার্ম ও অফিসের কাজের তুলনা করিলে, উভয়ের পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যাইবে।

আমাদের যে সকল বড় প্রতিষ্ঠান কারবার গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অধিকাংশ বা সবগুলির ইতিহাস হইতেই জানা যাইবে যে, তাহারা কোন না কোন শক্তিশালী ব্যক্তির চেষ্টা পরিশ্রম এবং কর্ম্মকুশলতায় গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারা আমাদের গঠনমূলক কর্ম্মশক্তির পরিচায়ক নহে।

অবশ্য আমাদের একটি মনোবৃত্তিও আমাদের এই আপেক্ষিক অযোগ্যতার সহিত জড়িত রহিয়াছে। আমরা নিজেদের হীন মনে করিতে এবং অপরকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে এতটা অভ্যস্ত হইয়াছি যে, উপরস্থ কোন বাঙ্গালীর গুণের মর্য্যাদা দান করিতে, তাঁহার কথা শুনিয়া ভয় করিয়া চলিতে চাহিনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ করিতে হওয়াকে অসম্মানজনক বলিয়া মনে করি। অথচ, উপরস্থ কোন কমযোগ্য সাহেবের গুণের শতমুখে প্রশংসা করিতে, তাঁহার কথা শুনিয়া ভয় করিয়া চলিতে গৌরব বোধ করিয়া থাকি।

আমাদের এই আত্ম-অবিশ্বাসের আরও একটা প্রমাণ তখনই পাই, যখন দেখি ভারতীয় মালিকেরাই যে বেতনে ইউরোপীয় নিযুক্ত করেন, দেশীয় যোগ্যলোকদের তাহার অর্দ্ধেক বেতনও দিতে চাহেন না। সমান বেতনে হয়ত সমান যোগ্য লোক পাওয়া যাইত।

গ্রামমুখীনতা

শিক্ষার্থীরা যাহাতে গ্রামমুখী হইয়া গ্রামেই থাকিতে বাধ্য হয়, তাহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের পরিকল্পনা হইয়াছে এবং ইহার সমর্থনকল্পে গ্রামমুখীনতা কথাটির যথেষ্ট অপব্যবহার করা হইয়াছে।

আমাদের দেশে যাঁহারা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান এবং অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী তাঁহাদের অধিকাংশই সহরে থাকেন এবং দরিদ্র, অজ্ঞ এবং চাষীর দলই গ্রামে থাকিয়া থাকেন। কাজেই, সহরগুলি একদিকে যেমন শিক্ষা সভ্যতা, জ্ঞান বিজ্ঞান, ব্যবসা বানিজ্য এবং বিলাস ব্যসনের কেন্দ্র হইয়াছে অন্যদিকে তেমনই গ্রামগুলি দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য এবং অপরিচ্ছন্নতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অনেক দিন হইতেই লোকে এই সকল কারণে নাগরিক জীবনকে বিদ্যাবত্তা, ধনশালীতা, অগ্রবর্ত্তিতা এবং আভিজাত্যের নিদর্শন মনে করিতে এবং পল্লীজীবনকে অক্ষমতা, দারিদ্র্য এবং পশ্চাদ্বর্ত্তীতার লক্ষণ বলিয়া হীন চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ইহার ফল হইয়াছে যে, যাহারা কোন প্রকারে একবার সহরে বাস করিতে পারিয়াছে বা বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহারা প্রাণপণে গ্রামের সম্পর্ক ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং আমাদের নাগরিক ও পল্লীজীবনের মধ্যে ব্যবধান অতিশয় বিস্তৃত হইয়াছে, এবং পল্লীজীবন নাগরিক জীবনের অগ্রগতি ও উন্নতির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। নাগরিক জীবনের সর্ব্বপ্রকারের প্রগতি পল্লীজীবনে প্রসারিত হইতে না পারিলে, পল্লীর হীনাবস্থা দূর হইবে না এবং পল্লীর হীনবস্থা দূর না

হইলে, অধিকাংশ লোক পল্লীতে বাস করে বলিয়া দেশের দুঃখ দূর হইবে না বা দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। এই জন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই আমাদিগকে গ্রামমুখী হইবার কথা বলিয়াছেন। এই কথা বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ এ কথা বলিতে চাহেন নাই যে, কেহ গ্রাম হইতে বাহিরে না গিয়া সকলেই গ্রামের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে এবং বাহিরে যাইবার মত বিদ্যাবুদ্ধিও কেহ অর্জ্জন করিবে না। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছেন, গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের হীন ধারণা ও ঔদাসীন্য দূর করা এবং সর্ব্বপ্রকারে যাহাতে আমাদের যুবকেরা পল্লীর উন্নতি বিধানে যত্নবান হন তাঁহাদের মধ্যে এরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা, দেশের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য। তাঁহারা যুবকদের গ্রামে আটকাইয়া রাখিতে চাহেন নাই; যেসকল যুবক সহরের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইয়াছেন, নাগরিক শিক্ষা দীক্ষার ফলে যাঁহাদের চিত্ত পুষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকে সুযোগ ও সুবিধা মত গ্রামে থাকিয়া গ্রামগুলিকে সহরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী করিয়া তুলুন। তাঁহাদের অনেকের কর্ম্মক্ষেত্র গ্রামে হইলে (অবস্থার চাপে অনেকের অবশ্য তাহাই হইতেছে) তাঁহাদের চেষ্টা ও সংসর্গের ফলে গ্রামগুলির মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইবে, ইহারা শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে অনেক উন্নত হইবে এবং ফলে সহর ও গ্রামের বর্ত্তমান ব্যবধান অনেক কমিয়া যাইবে। এইরূপে সহর এবং গ্রামের মধ্যে সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হইলে, গ্রামবাসীরা বর্ত্তমানের অপেক্ষা আরও অধিক সংখ্যায় সহরে যাইবেন এবং শিক্ষিত ও যোগ্য লোকেরাও অসঙ্কোচে গ্রামে থাকিতে পারিবেন। ইহাতে যে ধন সম্পদ, শিক্ষা দীক্ষা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি এখন সহরেই সীমাবদ্ধ আছে তাহা দেশবাসী সকলেরই ভোগ্য হইবে।

গ্রামমুখীনতার অর্থ যে অন্যপ্রকার নহে তাহার একটা বড় প্রমাণ এই যে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে সহর (আধুনিক অর্থে) ছিল না, সকলেই গ্রামে থাকিতেন; কিন্তু, সে যুগকে কেহই বোধকরি উন্নতির যুগ বলিবেন না।

কিন্তু, সুস্পষ্ট এবং সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে যে সকল শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ নহে, ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার অপপ্রয়োগ হইতে পারে এবং ইচ্ছা করিয়াও কেহ নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য অন্যায়ভাবে কাজে লাগাইতে পারেন। শিক্ষানীতি স্থির করিবার সময় যেমন সব সময়ই দেশ কাল পাত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তেমনই যাহাতে তাহা মাত্র দেশ কাল ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া শিক্ষার মূল ও প্রধান উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করিয়া না দেয় তাহার প্রতিও সমানই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু আমাদের প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে অর্থাৎ বুদ্ধি ও মনের যথাযথ বিকাশের পক্ষে প্রথমটি অপেক্ষা শেষোক্তটির অভাব অনেক বেশী মারাত্মক।

মধ্য বাংলা স্কুল

বিস্তার এবং সুফল প্রসব উভয় দিক দিয়াই প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের দেশে অনেকটা ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে। যাহারা শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে, তাহাদের অধিকাংশই পুনরায় নিরক্ষর হইয়া পড়ে এবং যাহারা সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষর না হয় তাহাদেরও সামান্য অক্ষর জ্ঞান বিশেষ কোন কার্য্যোপযোগী হয় না। বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষারই ইহা কয়েকটি প্রাথমিক ধাপ মাত্র বলিয়া এই শিক্ষা সম্পূর্ণও নহে। কিন্তু, ইহার বড় সার্থকতা এই দিক দিয়া হইয়াছে যে, উচ্চশিক্ষার প্রাথমিক ধাপ হওয়ায়, ইহা দেশের উচ্চশিক্ষাবিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে; এখনও দেশের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দ্বারাই পুষ্ট হইতেছে।

যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান এবং প্রথমতম উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হইয়া যায় এবং উচ্চশিক্ষার সহিতও ইহার বর্ত্তমান সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায়, শিক্ষানীতির পরিকল্পনার সময় এই দুইটি বিষয়ের প্রতি সমানভাবে লক্ষ্য রাখিতে না পারিলে দেশের কল্যাণ ব্যাহত হইবে।

শিক্ষার নিম্নবিভাগে অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসাবে সকলেরই ইংরাজী পড়িতে হওয়াটা ছেলেদের সময় এবং শক্তির অনেকটা অপব্যয়; বাংলার মধ্যবর্ত্তিতায় শিক্ষাদান এবং শিক্ষার জন্য পূর্ণভাবে বাংলা ভাষার উপর নির্ভর করিবার নীতি ব্যতীত এই ত্রুটি সংশোধিত হইবে না (অবশ্য শিক্ষার মধ্যবিভাগ হইতে সকলেরই অল্পবিস্তর ইংরাজী শিক্ষার এবং পরে ক্রমে কতকের ভালভাবে ইংরাজী শিক্ষার

প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা স্বীকার করি)। কিন্তু ইহার ব্যবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও ক্রমে সেই পথে অগ্রসর হইতেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্রভাবে এই ব্যবস্থা করিতে গেলে, শিক্ষার নিম্নবিভাগ, উচ্চবিভাগ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং উচ্চশিক্ষার দিকে ছেলের যোগান অনেক কমিয়া যাইবে। অনেক প্রতিভাবান ছেলে যাঁহারা, উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিতেন, গোড়া হইতে তাঁহাদের শিক্ষা অন্যপথে চালিত হইলে উচ্চশিক্ষার সুযোগই তাঁহারা পাইবেন না! উচ্চশিক্ষার উঁচুর ধাপগুলিতে বর্ত্তমানের ন্যায় বাছাই করা ভালছেলেরা যাইবেন না। ইহার ফলে উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি এবং উৎকর্ষ উভয় দিকই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বাংলা নানাবিষয়ে প্রদেশগুলির ভিতর সর্ব্বাগ্রগামী হইয়াছে; তরুণ বাংলা বলিতে আশা ও আনন্দের সহিত আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতেছি,—কিন্তু, ইহা যে বহু-নিন্দিত উচ্চশিক্ষার ফল, সে কথা আমরা অনেকেই ভুলিয়া যাই।

তদ্ব্যতীত, প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুসারে মোটামুটি প্রতি পাঁচ বর্গ মাইলে একটি করিয়া স্কুল থাকিবে এবং এই প্রকারের পঁচিশটি স্কুল লইয়া একটি করিয়া মধ্য বাংলা স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইবে। কাজেই, ছেলেরা বাড়ী হইতে এই সকল স্কুলে যাইতে পারিবেন না। যাঁহারা উচ্চশিক্ষার জন্য বাড়ী হইতে দূরে যাইতে পারেন, অবস্থাপন্ন এমন ছেলেরাই মাত্র এই সকল স্কুলে পড়িতে যাইবেন। এজন্য এমন কথাও বলা যাইবে না যে, এই সকল বিদ্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সকলের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া দিবে।

যাঁহারা শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা পাইবেন, তাঁহাদের শিক্ষাকে কতকটা সম্পূর্ণ করিয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে এবং সম্ভবতঃ এই প্রয়োজন হইতেই মধ্যবাংলা স্কুলের পরিকল্পনার উদ্ভব হইয়াছে। যদিও এই প্রয়োজন ইহার দ্বারা সিদ্ধ হইবার আশা নাই বলিলেই চলে।

সাধারণ লোকের দ্বারা সাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠার এবং চালাইবার সুযোগ পূর্ণভাবে রাখিয়া, বর্ত্তমান প্রস্তাব অনুসারে প্রতি পাঁচ বর্গ মাইলে একটি করিয়া আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, ইহার প্রথম চারি শ্রেণীর পাঠ্য তালিকা উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের অনুযায়ী করিতে পারিলে এবং যে সকল ছাত্র উচ্চশিক্ষার দিকে যাইবেন না, তাঁহাদের জন্য আদর্শ বিদ্যালয়-গুলিতে দুই বৎসরের দুইটি করিয়া শ্রেণী রাখিলে পরিকল্পিত শিক্ষার ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইতে পারিবে এবং প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের শিক্ষাও সম্পূর্ণ হইতে পারিবে।

সাধারণ স্কুলগুলির চলিবার যথেষ্ট সুযোগ থাকিলে, আদর্শ স্কুলের শিক্ষকদের, বর্ত্তমান প্রস্তাবানুসারে আর দুইটি করিয়া স্কুল চালাইতে হইবে না এবং তাঁহারা শিক্ষার সম্পূর্ণতা-বিধায়ক দুইটি করিয়া শ্রেণী সহজেই চালাইতে পারিবেন। ইহাতে যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের পথও যেমন খোলা থাকিবে, তেমনই যাঁহারা উচ্চশিক্ষার দিকে ঝুঁকিবেন না, তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার ব্যবস্থাও সকলের আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে।

স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে কি না

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকাদের একত্র অধ্যয়ন নানাদিক দিয়া বাঞ্ছনীয়। বালিকাদের জন্য পৃথক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় দেশময় যথেষ্ট সংখ্যায় গড়িয়া তুলা সম্ভব হইবে না, এবং অন্য কোন উপায়ে বালিকাদের উচ্চ শিক্ষাদান সম্ভব হইবে না বলিয়া, উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের বালিকা ও বালকদের একত্র অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ইহাতে যে কোনপ্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই বরং বালিকাদের শিক্ষা-সমস্যা অনেকটা সরল হইয়া যাইবার আশা আছে তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

তথাপি, বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা এখনও রহিয়াছে। এই প্রয়োজনীয়তার কারণ ইহা নয় যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালকবালিকাদের একত্র অধ্যয়ন বাঞ্ছনীয় নহে, অথবা অভিভাবকেরা এক স্কুলে ইঁহাদিগকে পড়িতে দিতে চাহিবেন না। বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা এখনও যথেষ্ট উদাসীন, এই ঔদাসীন্য দূর হইতে এখনও যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হইবে। বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় কতকটা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদিগকে শিক্ষার জন্য

উৎসাহিত করিবে। কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, স্কুলের কর্তৃপক্ষ স্কুল চালাইবার জন্য সবসময়েই বালিকা সংগ্রহে তৎপর থাকিবেন এবং এইরূপে ইহা বালিকাদের শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিবে।

কাজেই, প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণভাবে বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা না থাকায় ফল ভাল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

নূতন শিক্ষা পরিকল্পনায় সাম্প্রদায়িকতা

নূতন শিক্ষা পরিকল্পনাকে যে কতকটা সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহাই ইহার নানাত্রুটির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি। যাহাতে সাধারণ পাঠশালা এবং মক্তাবের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকে, সেজন্য স্কুলগুলিকে কতকটা মক্তাবের আদর্শে গঠন করা হইবে এবং যে সকল স্কুলে মুসলমান-ছেলেদের সংখ্যাধিক্য থাকিবে সে সকল স্কুলকে মক্তাব বলিয়া অভিহিত করা হইবে!

সাধারণ পাঠশালাগুলির ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক; এখানে হিন্দু বা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুকূলে কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। এই প্রকারের অসাম্প্রদায়িক স্কুলের সাহায্যেই দেশে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইবে এবং শিক্ষার্থীরাও মানসিক গঠনে, সংকীর্ণ অর্থে কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান না হইয়া সকলেই উদার-চিত্ত মানুষ এবং দেশের লোক হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবেন।

অন্যদিকে মক্তাব একটি বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের সহিত সম্পর্কিত বিদ্যালয়। এই সকল বিদ্যালয়ে এই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ছেলেরাই মানসিক বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পান কিনা, তাহাতে এই সম্প্রদায়েরই অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির সন্দেহ আছে। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরত এই প্রকার স্কুল সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি থাকা অতিশয় স্বাভাবিক। কোন লোককে সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিয়া জাতীয়তার দিকে অগ্রসর হইতে বলা যাইতে পারে, ইহার যৌক্তিকতাও তাহাকে বুঝান যাইতে পারে। কিন্তু, অপর কোন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার অনুকূলে কাহাকেও সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিতে বলা অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অবিচারমূলক। কোন স্কুলের মুসলমান ছেলের সংখ্যা বেশী হইলে যদি স্কুলকে মক্তাবে পরিণত করা হয় তবে, সেখানকার হিন্দুছেলেদের উপর নিতান্তই অবিচার করা হইবে। অথচ, যে কোন সম্প্রদায়ের ছেলেকে অসম্প্রদায়িক সাধারণ স্কুলে পড়িতে বলা যাইতে পারে, এবং তাহাতে তাহার উপর কোন অবিচার করা হয় না।

মক্তাব ও সাধারণ স্কুলের পর্থক্য দূর করিবার যে কথা হইয়াছে, তাহার মারাত্মক ফল সমগ্র প্রদেশের অন্য সকল সম্প্রদায়ের ছেলেদেরই ভোগ করিতে হইবে। মক্তাব যেমন একটি বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠশালাগুলি যদি তেমনই অন্য কোন সম্প্রদায়ের বিদ্যালয় হইত তবে, এই দুইশ্রেণীর স্কুলের মধ্যে একটা মিটমাটের চেষ্টা সঙ্গত হইতে পারিত। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতির ব্যবস্থা করিয়া, সকলকেই সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিতে বলাও সঙ্গত হইতে পারিত।

স্কুলে মুসলমান এবং অন্য ছেলেদের জন্য ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। সকল ধর্ম্মের সকল মানুষের পক্ষে যাহা পালনীয় হইতে পারে, স্কুলে ধর্ম্মবিষয়ক এমন শিক্ষা সমর্থন যোগ্য হইলেও, স্কুল কোন বিশেষ ধর্ম্মশিক্ষার স্থান নহে। এই নীতি জগতের অন্য সর্ব্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমাদের দেশের ন্যায় নানাধর্ম্মের ও নানা সম্প্রদায়ের দেশেও ইহা বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে, এবং শিক্ষাসমস্যাকেও বিশেষভাবে জটিল করিয়া তুলিবে।

শ্রীহট্টের বাংলার অন্তর্ভুক্তি

শ্রীহট্টের বাংলার অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে আইন-পরিষদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। আসামে এ প্রশ্ন জাগিয়াই রহিয়াছে। বাহিরের বাঙ্গালীরা যে বাংলার সহিত মিলিত হইতে চাহিবেন এবং বাঙ্গালীরাও যে বাংলার বাহিরের বাঙ্গালীদের ফিরিয়া চাহিবেন, ইহা ত নিতান্তই স্বাভাবিক। বাঙ্গালীদের নিজস্ব সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা আছে, অন্যান্য প্রদেশবাসীদের সহিত নানা বিষয়ে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট, বাংলার প্রতিবেশী প্রদেশগুলিতে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ জাগিয়াছে; কাজেই, অন্য কোন প্রদেশে অল্প

সংখ্যায় বাস করিতে হইলে যে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে; তাঁহাদের ভাষা, সভ্যতা ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা যে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে, প্রাদেশিক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় যে তাঁহাদের গুরুত্ব স্বীকৃত হইবে না তাহা সহজেই অনুমেয়। এইজন্য বাংলার প্রান্তবর্ত্তী বাংলাভাষী যে জেলাগুলিকে অন্যায়ভাবে বিহার উড়িয়্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সেগুলিকে পুনরায় বাংলায় আনয়নের জন্য বাংলার ভাষিক সীমাকে, প্রাদেশিক রাষ্ট্রিক সীমা করিবার জন্য বাঙ্গালীদের বিশেষ সচেষ্ট হইয়া আন্দোলন চালাইবার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু, শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি সম্বন্ধে এই সকল কথা সমভাবে প্রযোজ্য কি না তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। শুধুমাত্র শ্রীহট্ট নয়, সমগ্র আসাম প্রদেশকেই বাংলার অংশ বলা যাইতে পারে। আসামের মোট জন সংখ্যার অর্দ্ধেকের কাছাকাছি বাঙ্গালী এবং ইঁহাদের সংখ্যা খাস আসামীদের সংখ্যার দ্বিগুণ। কাজেই, সংখ্যাল্পতার জন্য কোন প্রকার অসুবিধা ইঁহাদের ভোগ করিবার কথা নহে। বরং রাষ্ট্রিক বাংলার বাহিরেও বাঙ্গালীদের আর একটা প্রদেশে যথেষ্ঠ প্রতিপত্তি থাকিবার সুবিধা ইহাতে আছে। ইহাতে বাংলার শিক্ষা সভ্যতা ও ভাষারও বিস্তৃতির সুবিধা হইবে। আসামের বহুলক্ষ মজুর অধিবাসীর মধ্যে অনেকেই এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। ইহাদের কোন বৃহৎ ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত যুক্ত হইতে হইবে; বাঙ্গালীরা সচেষ্ট হইলে (বাঙ্গালীরাই এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়) ইঁহাদের মধ্যে কাজ করিতে পারিবেন। তদুপরি এখানকার আসামী ও অন্যদের সমবেত সংখ্যা বাঙ্গালীদের সমান; কাজেই ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক বাঙ্গালীদের প্রভাব অতিক্রম করা ইঁহাদের পক্ষেও সম্ভব হইবে না। বাংলা আসামের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ বলিয়া আসামের বাঙ্গালীরা বাংলার বাঙ্গালীদের সহিত সর্ব্বতোভাবে অবিচ্ছিন্ন এবং এক বলিয়া, আসামী-বাঙ্গালীদের পশ্চাতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শক্তি রহিয়াছে।

আসামের মোট বাঙ্গালীদের অর্দ্ধেকের উপরের বাস শ্রীহট্টে। এই জেলাটি বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইলে, আসামে বাঙ্গালীদের প্রতিপত্তি ও গুরুত্ব নিশ্চয়ই অনেকাংশে হ্রাস পাইবে এবং সম্ভবতঃ এখানকার বাঙ্গালীরা নানাপ্রকার অসুবিধায় পতিত হইবেন।

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি সম্বন্ধে একথাটি অন্যান্য কথার সহিত ভাবিয়া দেখিতে হইবে এবং বিহার উড়িষ্যার অন্তর্গত বাংলাভাষী জেলাগুলিকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আরও সচেষ্ট হইতে হইবে।

১৯৩১ সালের গণনা অনুসারে, আসামের বিভিন্ন জেলার বাঙ্গালী ও আসামীদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জেলা	বাঙ্গালী	আসামী
কাছাড়	৩,৩৮,৭৭২	২,২১৫
সিলেট	২৫,০৯,৬৮২	১,৪৭৭
খাঃ + জঃ পর্ব্বতমালা	২,১৬৯	২৮৩
নানা পর্ব্বত	৫২৭	৮১৫
লুসাই পর্ব্বতমালা	১,৩৩৩	১১৪
গোয়ালপাড়া	৪,৭৬,৪৩৩	১,৬১,১৭৯
কামরূপ	১,৭০,৪০৯	৬,৪৯,৫১২
ডারাং	৯৫,১১৫	১,৯৩,০৮৯
নওগাঁ	১,৯৩,৩৪৯	২,৩৭,৪০৬
শিবসাগর	৭৩,৩৫১	৫,০৩,৬০৩
লখিমপুর	৭৭,৪৭১	২,২৮,৪৬১
গারো পর্ব্বত	২০,৪৫৩	৫,৫৭৩
মদিয়া সীমান্ত	১,১৯৩	৮,৪১৯
বানিয়া পাড়া সীমান্ত	৪৫৫	৭০০
মণিপুর রাজ্য	২,২৭৩	১২৫
খাসী রাজ্য	৩,৩৭৮	১,৫৯৩

পূজার বাজার

প্রতিবৎসর পূজার সময় আমরা বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকাদের স্বদেশী দ্রব্যের বিশেষ করিয়া বাংলায় প্রস্তুত প্রয়োজনীয় ও সখের দ্রব্যাদির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। গত কয়েক বৎসর অপেক্ষা স্বদেশীক্রয়ের কথা মনে করাইয়া দিবার প্রয়োজন একটি কারণে হয়ত অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রিক আন্দোলনের উত্তেজনার মধ্যেই আমাদের স্বাদেশিকতার উদ্ভব। আমাদের দারিদ্র্য এবং অর্থনীতিক পরাধীনতা যে আমাদের রাষ্ট্রিক দুঃখের জন্য অনেকখানি দায়ী এই বোধই আমাদিগকে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী করিয়াছে।

কাজেই দেশে যখন রাষ্ট্রিক আন্দোলনের উত্তেজনা প্রবল বা মৃদুভাবে বর্ত্তমান থাকে তখন স্বদেশীক্রয় সম্বন্ধে আমরা অনেকটা সচেতন থাকি এবং যাঁহারা স্বদেশী ক্রয়ে আগ্রহান্বিত না থাকেন জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকেও বিদেশী বর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু, সাধারণ সময়ে এই সচেতনতা শিথিল হওয়ায় এবং জনমতের চাপ না থাকায় কোন লোকই বাছিয়া স্বদেশী জিনিষক্রয় সম্বন্ধে যত্নশীল থাকিবেন না এবং কতক লোক এবিষয়ে একেবারেই উদাসীন হইয়া পড়িবেন। দেশের বর্ত্তমান অবসন্নতার সময় কিছু কিছু এই প্রকার অবস্থার সৃষ্টি হইবে আশঙ্কা করিয়া আমাদের সকল পাঠককে এসম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য এবং সুযোগ ও সাধ্যমত অন্য সকলকেও এই কথা বুঝাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। উত্তেজনার মধ্যে দেশে যে কর্ম্মপ্রেরণা জন্মলাভ করিয়াছে, শান্তির সময়ে গঠনমূলক কাজের মধ্যে যাহাতে তাহা সার্থক ও ফলপ্রসূ হইতে পারে, তাহার জন্য প্রত্যেক দেশবাসীকেই সচেষ্ট হইতে হইবে। নূতন নূতন শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির রক্ষা স্বদেশী জিনিষের চাহিদার উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। আমরা যদি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া দেশের কোন বিশেষ উন্নতিমূলক কাজে সংঘবদ্ধভাবে এখনই না নামিতে পারি তবুও আমাদের সকলের ব্যক্তিগত দৃঢ় ইচ্ছা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগের দ্বারা ধীর ও নিশ্চিতভাবে আমরা দেশের আর্থিক অবস্থাকে ফিরাইতে পারি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের এ কথাটি ভুলিলে চলিবেনা যে, বর্ত্তমানে আমাদের স্বদেশী দ্রব্যের যে চাহিদা আছে (বিশেষ করিয়া চিনির ও কাপড়ের), ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উৎপন্ন দ্রব্যই তাহা পূরণ করিতেছে। বাংলার কলকারখানার প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বাংলাকে কতকটা অসম প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। বাঙ্গালী খরিদ্দারেরা যদি বিশেষভাবে সাবধান না হন তবে আমাদের নব প্রতিষ্ঠিত কলকারখানাগুলির টিকিয়া থাকা যেমন শক্ত হইবে, তেমনই স্বদেশী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির সুযোগও বম্বের সুপ্রতিষ্ঠিত কলের মালিকেরা সহজেই গ্রহণ করিবেন।

বাংলার কলকারখানার কোনগুলি সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালীর তাহাও সকলের জানিয়া রাখা দরকার। কারণ এদিক দিয়াও বাঙ্গালী ক্রেতারা ঠকিতেছেন, এবং বিশেষভাবে সচেষ্ট না হইলে ভবিষ্যতে ঠকিতে থাকিবেন।

স্বদেশী জিনিষ চালাইতে হইলে আরও সচেষ্ট হওয়া চাই

স্বদেশী জিনিস দেশের মধ্যে ভালভাবে চালাইতে হইলে, শুধুমাত্র স্বদেশী মনোভাব সৃষ্টি করিয়া অথবা শুধুমাত্র অনুকূল মনোভাবের উপর নির্ভর করিয়া অন্যদিকে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। বিদেশী জিনিসগুলি দেশের মধ্যে কি ভাবে চলিতেছে,—এমন কি যাঁহারা দেশী জিনিস কিনিতে ইচ্ছুক কিছু পরিমাণে তাঁহাদের মধ্যেও—তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেশী জিনিস কিনিবার ইচ্ছা সব সময় কার্য্যকরী হইবার সুযোগ পায় না। লোকে সব সময়েই হাতের কাছে জিনিষ পাইতে চায় এবং সস্তায় পাইতে চায়। পল্লী অঞ্চলে দেশী জিনিস পাওয়া দুষ্কর; অপেক্ষাকৃত মূল্য অধিক বলিয়া বিক্রেতারা বাংলার জিনিস আমদানি করে না বলিলেই চলে, এবং অনেকক্ষেত্রেই অজ্ঞ খরিদ্দারগণের নিকট দেশী জিনিস বলিয়া বিদেশী জিনিস চালায়। ইহার উপর বেপরোয়া ফেরিওয়ালারা ঠিকদার বিদেশী সস্তা জিনিস সৎ ও অসৎ উপায়ে প্রায় প্রতিগৃহেই অল্পবিস্তর চালাইয়া যায়। একথা সহর সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর সত্য।

স্বদেশী জিনিস ভালভাবে চালাইতে হইলে লোকের অনুকূল মনোভাবের দ্বারাই মাত্র সুফল লাভ করা যাইবে না। স্বদেশী জিনিস বিশেষ করিয়া বাংলায় প্রস্তুত জিনিসগুলি যাহাতে লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে পারে এবং লোকে সহজে ও সুলভে তাহা পাইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিতে না পারা পর্য্যন্ত বিদেশী জিনিষের বিক্রয় বন্ধ বা দেশী জিনিসের প্রচলন আশানুরূপ হইবে না।

যে সকল ফেরিওয়ালা বিদেশী জিনিস বিক্রয় করে, তাহাদের অধিকাংশই ভিন্নপ্রদেশবাসী এবং ইহাদের উপার্জ্জনও কম নহে। বাঙ্গালী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবকেরা কথাটা ভাবিয়া দেখিতে পারেন। সম্ভবতঃ আমাদের শ্রম-কাতরতা এবং শ্রমের মর্য্যাদাবোধের অভাবই এই পথের বড় বিঘ্ন।

কুমারী সাধনা সেনগুপ্তা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনমিকস'এর এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কুমারী সাধনা সেনগুপ্তা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ শাখায় ও প্রতিযোগিতায় ছাত্রীরা সর্ব্বত্র যে কৃতিত্ব দেখাইতেছেন তাহাতে মেয়েদের মানসিকশক্তি সম্বন্ধে যাঁহারা হীন ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন আশা করি। কুমারী সাধনা গৌহাটীর এসিস্টান্ট্ সার্জ্জন শ্রীযুক্ত এ এম সেনগুপ্তের কন্যা।

আবিসিনিয়ায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা

ইটালি ও আবিসিনিয়ার মধ্যে যে কোন সময়েই যুদ্ধ বাধিতে পারে। যুদ্ধ বাধিলে এখানে যেসকল ভারতীয় আছেন, তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি ও জীবন বিপন্ন হইতে পারে মনে করিয়া, তাঁহারা শঙ্কিত হইয়াছেন। ইহাঁরা প্রায় সকলেই ব্যবসায়ী। ইহাঁদের ব্যবসা যে নষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; জমাজমি এবং বাড়ীঘরও পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। ভারতবাসীরা ব্রিটীশ প্রজা; কাজেই, ইহাঁদের ধনপ্রাণ, বিশেষ করিয়া প্রাণরক্ষার দায়িত্ব অবশ্য ব্রিটীশ সরকারের। কিন্তু, পরাধীন অশ্বেত জাতির লোক বলিয়া বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন অবস্থায় ভারতবাসীদের যেসব অভিজ্ঞতা আছে, তাহার ফলে ইহারা বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিতেছেন না। আক্রমণকারী শ্বেতকায় ইটালীয়েরা শ্বেত জাতি সমূহের লোকদের ধনপ্রাণের প্রতি যতটা মর্য্যাদা দেখাইবেন, ভারতীয়দের প্রতি ততটা দেখাইবেন না, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত ইহাদের রক্ষার আর একটা অতিরিক্ত এই অসুবিধা আছে যে, ইহাদের বাস প্রধানতঃ দেশীয় পল্লী অঞ্চলে। কাজেই আকাশ হইতে বোমা ফেলিবার সময় ইচ্ছা থাকিলেও ইহাদিগকে নিরাপদ রাখা যাইবে না।

গোলমালের সুযোগে দেশীয়েরাও ইহাদের আক্রমণ করিতে পারেন এবং ইহাদের ধন সম্পত্তি লুট করিতে পারেন। ১৯১৬ সালের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় এরূপ ঘটনা কিছু কিছু ঘটিয়াছিল। ভারত ও ব্রিটীশ সরকার এসম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

ফরেন পলিসি ইন্সটিটিউট

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের কথা বাহিরে প্রচারের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং ইহার উপযোগিতার কথা দেশবাসীগণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রকে লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষকে যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতেই হয় তবে বিশ্বের জনমতকে আমাদের অনুকূলে সংঘবদ্ধ করিতেই হইবে। ইহার জন্য দুইটি জিনিস বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ আমাদিগকে ভারতের বাহিরে কাজ করিতে হইবে। এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক ব্যাপার সমূহ সম্বন্ধে আগ্রহ জাগাইতে হইবে। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। অন্যান্য প্রধান দেশে এই প্রকারের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার ফরেন পলিসি এসোসিয়েসন, ইংলণ্ডের রয়াল ইনসটিটিউট অব ইনটারন্যাশনাল এফেয়ার্স এবং অন্যান্য দেশের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের নাম করা যাইতে পারে। সুভাষ বাবু ভারতবর্ষেও এই প্রকার একটি পরিষদ গঠনের পরামর্শ দিয়াছেন। ইহার জন্য বর্ত্তমানেই বিশেষ কোন প্রকারের আয়োজন করিতে হইবে না। আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে ইহাদিগকে পুস্তক পত্রিকাদি প্রকাশ করিতে হইবে এবং অন্যান্য দেশের এই প্রকারের প্রতিষ্ঠান সমূহ যেসকল পুস্তক পুস্তিকাদি প্রকাশ করেন ইহাদিগকে সেইগুলি লইতে হইবে। তাহা হইতে ইহারা নিজেরাও পুস্তক পত্রিকাদি প্রকাশের উপাদান পাইবেন। এই পরিষদ আন্তর্জাতিক বিষয় সমূহ লইয়া বক্তৃতা ও বিতর্কাদির ব্যবস্থাও করিতে পারিবেন। আমেরিকার ফরেনপলিসি এসোসিয়েসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভারত সম্বন্ধে একটি বিতর্ক সভায় পরলোকগত ভি-জে-প্যাটেল ও ক্যাপ্টেন ওয়েজউড্ বেন প্রধান বক্তারূপে যোগদান করেন।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

মনোভৃঙ্গ গুঞ্জরিল

শ্রীবিমল মিত্র

হঠাৎ বাড়ীর বাইরে মটরের আওয়াজ হোল। বোঝা গেল মটর এসে দরজার সামনে থেমেছে। তারপর মৃদু আওয়াজ করে' সে মটর আবার চলতেও সুরু করেছে—যন্ত্রের শব্দে তা'ও বোঝা গেল। দোতলার ঘর থেকে বেশ স্পষ্ট অনুমান করা গেল—আরোহীকে নাবিয়ে দিয়ে মটর বহুদূরে প্রস্থান করেছে। বিছানায় শুয়ে সুনীল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে—এতক্ষণে সুষমা এল—

মাথাটা তুলে সুনীল ঘড়িটার দিকে একবার দেখলে; দশটা বেজেছে! সেই দুপুরে গিয়েছিল—আর এখন রাত। রাত দশটা এখন। আড্ডা দিতে আরম্ভ করলে মেয়েদের তো আর সময়ের হিসেব থাকে না।—অবশ্য রাত করেছে বলে' সুনীলের যে কিছু অসুবিধে হয়েছে—তা' নয়। কিম্বা সুষমা রাত করে' ফিরেছে বলে' সুনীল যে কিছু রাগ করেছে—তাও' নয়। কিম্বা সুষমার এই বাইরে যাওয়াতে সুনীল যে কিছু অসন্তুষ্ট তা'ও নয়। কিছুই নয়—বরং উল্টো। বাড়ীর বাইরে—সংসারের কর্ত্তব্যের বাইরে—কোনও দিন সুষমাকে নিয়ে যেতে পারেনি বলেই সুনীল অসন্তুষ্ট হোত—আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনদের বাড়ী কাজে-অকাজে মাঝে মাঝে যাওয়াই তো ভাল,—অন্ততঃ বেড়াতেও দু'চার দিনের জন্যে যেতে হয়। তা' নয়! সংসার আর সংসার! সংসার নিয়েই সুষমা ব্যস্ত। কাজ না থাকলে সুষমা জানালার পর্দ্দা সেলাই করতে বসে। ভাঁড়ারের চাবি নিজের হাত ছাড়া করবে না—আর চাকরদের কাছ থেকে বাজারের হিসেবের আধ্‌লাটা পর্য্যন্ত মিলিয়ে নেবে।

যা' হোক্—এতক্ষণে সুষমা এসেছে।

নীচেয় সুষমার গলা শোনা যাচ্ছে; চাকরদের সঙ্গে কী সব কথা বলছে। ওপরের টবে জল রাখা হয়েছে কি না, পাখীটাকে ছোলা দেওয়া হয়েছে কি না—নিত্য নৈমিত্তিক কাজের ঠিক সুশৃঙ্খলা আছে কিনা; তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সবাই ফাঁকি দিয়েছে কি না, এই সব খোঁজ নিচ্ছে সুষমা।

সুনীল মনে মনে হাসলে।

সুষমার গৃহিণীপনাতে সুনীল মনে মনে হাসলে। সংসার পরিচালনায় সুষমার এমন গৃহিণীপনার পরিচয় সুনীল অনেকবার পেয়েছে। ছোট এতটুকু মেয়েকে গৃহিণী সাজলে কেমন মানায়! তা' সুষমা ছোট বৈ কি! বয়েস যা-ই হোক—সুষমা দেখতে এখনও ছোট। নতুন করে' আবার তা'র বিয়েও হ'তে পারে। 'কনে' সাজলে সুষমাকে এখনও মন্দ মানাবে না! অথচ সুষমার এই গৃহিণীপনা সুনীলের কাছে যেন বেমানান্! বেমানান তা'র কারণ আছে। মানাবে কেমন করে?...মানায় সুনীলের বৌদিদিকে! তিনটে ছেলে মেয়ে—কেবল ব্যস্ত তা'দেরই কাজে। এটা কাঁদছে—ওটা খাচ্ছে; কিন্তু সুষমার? এইটুকু মানুষ—ছেলে কোলে করে, দুধ খাওয়ালে সুষমাকে কেমন মানাবে সুনীল তাই ভাবতে লাগলো।

চটির চপ্ চপ্ শব্দ করতে করতে সুষমা সিঁড়ী দিয়ে ওপরে উঠে এল—

সুনীল তাড়াতাড়ি সুজ্‌নীটা টেনে গায়ে ঢাকা দিলে—এখনি নইলে সুষমা এসে অনুযোগ সুরু করবে—ঠাণ্ডা লাগতে পারে! এই সেদিন কানে গলায় ব্যথা হয়েছিল—পাখা খোল্‌বার পর্য্যন্ত হুকুম ছিল না! সুষমার যে কী স্বভাব—এতটুকু বিশৃঙ্খলা কোথাও সহ্য করতে পারবে না!

বিদ্যুল্লতার মত বেগে ঘরের ভেতর ঢুকে সুষমা বললে—বাবা বাঁচলাম, একদিন বাড়ী ছেড়ে আমি কোনও জায়গায় থাকতে পারবো না। নিজের বাড়ী যেন স্বর্গ—আর সেই কাজের বাড়ী, চ্যাঁ—ভ্যা—হৈ চৈ—পালাই পালাই করেছি কেবল—ওমা, দশটা বেজে গেছে এর মধ্যে?

সুনীল কিছু উত্তর দিলে না।

সুষমা বললে—খাওয়া হয়েছে তোমার ?

সুনীল লম্বা করে উত্তর দিলে—কখন—কোন্ সকালে—

সুষমা প্রশ্ন করলে—কটা ডিম দিয়েছিল ? তা' ওদের বিশ্বাস নেই—আর পুডিং ? কেমন হয়েছিল—? ওটা আমি ক'রে রেখে গিয়েছিলুম—আহা ওদের বাড়ী কী পুডিংই খেয়ে এলুম—মাগো, সাত জন্মের ঘেন্না! টুনিদি' বলছিল—পুডিং খেলে না—? মুখের ওপর কী করে বলি আর বলো ? বললাম পেট ভরে' গেছে—ওই তো রান্না তা'র যদি আদিখ্যেতা শুনতে !...

সুনীল জিগ্যেস করলে—কী রকম ?

সুষমা এলিয়ে পড়লো—বড় বাড়ীর মাসীমা এসেছিল। বললে :—চমৎকার হয়েছে, যেমন রান্না তেমনি আয়োজন! দেখ—ঠিক এই এতটুকু-টুকু পানতুয়া, ঠিক্ এই টুকুটুকু—তাই একটা ক'রে পাতে দেওয়া হোল। পরের বারে টুনিদি' বল্লে, আর একটা পান্তুয়া দেবো ? আমার জানো রাগ হোল—ঘাড় নেড়ে জানালুম, না, ওমা—যেই বলেছি, না, আর না তো না। হ্যাঁ গো, তা' পাতে দিয়ে গেলেই হয় !...

সুনীল রসিকতা করে বললে—তা' হ'লে উপোস করে' আছ—বলো।

সুষমা হেসে গড়িয়ে পড়লো তা' একরকম তা'-ই! আমার ইচ্ছে করে কী জানো ? ইচ্ছে করে সকলকে একদিন ডেকে খাওয়াই—দেখিয়ে দিই খাওয়াতে হয় কেমন করে! আমার তো অমন করে' খাওয়াতে লজ্জাই করে—সত্যি—

সুনীল যেন গম্ভীর হয়ে উঠলো—তা' খাওয়ালেই পারো। তুমি টুনিদির বাড়ী 'সাদে'র নেমন্তন্ন খেয়ে এলে—একদিন তোমারও—

সুষমা সত্যি সত্যি রেগে উঠলো। কান আর গাল দুটো লাল হ'য়ে উঠেছে। বলে' উঠলো—তুমি যে কী বলো তার ঠিক নেই! আমি কি তাই বলেছি নাকি? বয়ে গেছে আমার খাওয়াতে—বেশ আছি নির্ঝঞ্ঝাট! যেখানে খুশী যাচ্ছি—যখন ইচ্ছে ঘুমুচ্ছি—তা নয় !—যা' দেখে এলুম—

সুনীল জিগ্যেস করলে—কী দেখে এলে ?

সুষমা আবার হাল্কা হ'য়ে গেল—বললে—সেই গড়পারের রাঙাকাকীর ছোট বউ এসেছিল। এই আমার সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে তো—পাঁচ কি ছ'বছর হোল—এরি মধ্যে এতগুলো এণ্ডি গেণ্ডি—বেতিব্যস্ত একেবারে। এটা কাঁদে তো ওটা চেঁচায়—ওটা খায় তো সেটা বমি করে—। সেই কাজের বাড়ীতে—মনে করো—কোথায় বাথরুম, কোথায় সাবান, কোথায় হেন, কোথায় তেন—শেষকালে যে ছেলেটার পেটের অসুখ হয়েছে—সে খাবার জন্যে কী কান্নাটাই না কাঁদলে !...আমি ছিলুম তাই রক্ষে—

সুনীল সাগ্রহে প্রশ্ন করলে—তুমি তা'দের কোলে করলে নাকি ?

সুনীলা হেসে উঠলো—কেন, কোলে করতে আমি পারিনে নাকি ? ছেলেপুলে না হ'লে বুঝি আর কারুর কিছু জানতে নেই !...তা' কোলে করেছি ব'লে কাপড়ের কী কাণ্ড হয়েছে দেখেছ ? এই দেখ—ঠিক সুষমার বুকের কাপড়ের ওপর এতখানি একটা হলদে দাগ লেগে আছে। নতুন সাড়ীটার ওপর দাগটা যেন ঠিক কলঙ্কের মতন। সাড়ীটা রীতিমত দাগী হ'য়ে গেছে। না ধুইয়ে আর পরেরবার সাড়ীটা পরা চলবে না।

সুষমা বুঝিয়ে দিলে—ছেলেটাকে আদর করে' কোলে নিয়েছি, আমি অত কিছু দেখেনি—পরে দেখি, ওমা, হাতে মিহিদানা ছিল—কখন সাড়ীময় মাখিয়ে দিয়েছে—কী আর বলবো, বোঝে না তো—ছোট ছেলে—কাপড়টা উল্টে নিলুম—

সুনীল হেসে বললে—অনভ্যেসের ফোঁটা কিনা,—তা' নতুন সাড়ীটা নষ্ট হোল তো—অমন জর্জেট সাড়ী—'সাদে'র নেমন্তন্ন খেতে যাবে বলে' কিনে আনলুম—

সুষমা ঠোঁট উল্টিয়ে বললে—তা' যাক্‌গে, ভালোই তো, আর একটা হবে! তা' দেখ—এবার পুজোর সময় একটা ওই রকম সাড়ী কিনে এনো—টুনিদির মেজো ননদ পরেছিল ; বেশ ডিজাইন্—কোণে কোণে কলকা,—পাড়টা ঠিক—ঠিক—আহা কী নাম বললে যে—মনে পড়ছে না—

সুনীল বলে' উঠলো, নামটাও জিগ্যেস করেছিলে নাকি ?

সুষমা গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—কেন, তাতে কী হয়েছে ? আমরা অমন মেয়েমানুষদের মধ্যে জিগ্যেস করি—। তা' বেশ মানিয়েছিল কিন্তু সুধাকে—

সুনীল উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলো—কে, সুধা ?

—ওই যে গো—সুষমা উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে—ওই যে, বড়মামার ছেলের সঙ্গে যা'র—·· শোন নি তুমি ? আজকে সে কথাও উঠলো ; কার্ত্তিকের বউ মীনা সব ভেঙে বললে। সে অনেক কথা—বিষ খেতে গিয়েছিল—তারপর ধরা পড়ে, শেষে অনেক কেলেঙ্কারীর পর এখন একটু শান্ত হয়েছে ; তাও তো শুনলুম এবার নাকি আই-এ ফেল্ করেছে। ফেল্ করবে জানা কথা ; ন'দাদাবাবুর যে কী ওই এক সখ্ ! মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে বড় বয়েসে বিয়ে দেবে—রাণুর বেলায় কী হয়েছিল জানো না ?

সুনীল সাশ্চর্য্যে বললে—না—

—ওমা, তা-ও জানো না ? তবে শোন, বিয়ে তো ঠিক,—গায়ে হলুদ হচ্ছে—আমরা সব 'এয়ো'—কোমার বেঁধে বাড়ীময় বেড়াচ্ছি—হঠাৎ বরের বাড়ী থেকে চিঠি এল বিয়ে বন্ধ। হবে না বিয়ে—

সুনীল প্রশ্ন করলে—কেন ?

—কেন আবার ! তবে তোমায় আর বলছি কী !···তা' সেই রাণুর যা' হোক্ এখন সবই তো হয়েছে। বর বুঝি কোথাকার অফিসার, দেখলুম গাড়ী করে এল—এই এম্‌নি মোটা হয়েছে, আর এমনি ভাগ্যি—হবি তো হ'—পরপর তিনটিই ছেলে—ফুটফুটে ফরসা, লাল জামা পরিয়ে দিয়েছে—যেন শালুক ফুল—

সুনীল সকৌতুকে বললে—কোলে করলে না তাদের ?

সুষমা বলে' উঠলো—দায় পড়েছে ! তা'দের বলে এক এক-জনের এক-একটা আয়া—হিন্দুস্থানী আয়া কিনা—ছেলেগুলো এখন থেকেই কেমন হিন্দী শিখেছে—হাসতে হাসতে আমার···

সুনীল বলে' উঠলো—আজ বুঝি ঘুমোবেন না, কাপড় চোপড় বদলে এসে শোও—

সুষমা উঠলো। গল্প করতে বসলে সুষমার আর জ্ঞান থাকে না। ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে, রাত এগারোটা হোল। হাতের ফুলের তোড়াটা টেবলের ওপর রাখলে—তারপর পাশের ঘর থেকে বেশ পরিবর্ত্তন করে এসে বললে—কি, ঘুমোওনি তুমি ? ভাবলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ—

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সুনীল বললে—আজ ঘুমোব না—

—না না—না ঘুমোলে শরীর খারাপ হবে—দরজা বন্ধ করে' সুষমা এসে সুনীলের পাশে শুয়ে পড়লো। ঘর আবার অন্ধকার হ'য়ে গেছে। বাইরে চাঁদ নেই যে জানালা দিয়ে এসে লুটিয়ে পড়বে বিছানায় ; আর তাইতে আমরা দেখতে পাবো দু'জনকে ! আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। দু'জনের নিশ্বাস পড়ছে—শুনতে পাচ্ছি। সুনীল পাশ ফিরে শুলো, তা'ও টের পেলাম—কিন্তু আর কিছুই নয়।...দু'জনে পাশা-পাশি শুয়েছে—তা' আমরা জানি।

হঠাৎ সুনীলের গলার শব্দ এল। বললে—আমার কথা কেউ কিছু বললে না ?

সুষমা বললে—বড়-মাসীমা জিগ্যেস করছিল—

—কী জিগ্যেস করছিল ?—সুনীলের আগ্রহের অন্ত নেই—

—কী আবার বলবে—বললে, জামাইয়ের শরীর কেমন—এই সব। আর বলছিল টুনিদি'র বড় ননদ—সেই যার পাটনায় বিয়ে হয়েছে।

সুনীল সাগ্রহে বললে—সবাই এসেছিল দেখছি—তা' কী বললে টুনিদি'র বড় ননদ ?

সুষমা মৃদু হেসে উঠলো—সে অনেক কথা, সে-সব তোমার শুনতে নেই। শুধু কি তোমার কথা ? তা'র বরের কথাও হোল—

তারপর আবার সব নিস্তব্ধতা। আমরা কল্পনা করতে পারি—দু'জনেই এবার শিগ্রি ঘুমোবে। ঘুম এসে গেছে। এবার আমরা চলে' আসতে পারি। দু'জনে এবার বিশ্রাম-ভোগ করুক্। আমরা কল্পনা করতে পারি—দু'জনে এবার সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু হঠাৎ খিল্‌খিল্ হাসির আওয়াজ এল—হাসছে সুষমা। অর্থাৎ বোঝা গেল—সুষমা ঘুমোয়নি—

সুনীলও জেগে ছিল। বললে—হাসছ যে ?

হাসতে হাসতে সুষমা বললে—একটা কথা হঠাৎ মনে পড়লো—

—কী কথা ? খুব হাসির কথা বুঝি ?

—না—হাসতে হাসতে সুষমা বললে।

সুনীলের ভারী আশ্চর্য্য বোধ হোল। বললে—হাসির কথা নয়—তবে হাসছ কেন ?

সুষমা বললে—সে শুনলে তুমিও হাসবে—

—কী শুনিনা কথাটা—

—না না সে বলা যায় না।—কেমন করে বলবে সে-কথা সুষমা ভেবে পেলে না।

—বলো না, শুনি—

সুষমা হাসতে হাসতে আরম্ভ করলে—আমি তো হেসেই উড়িয়ে দিলুম, আমি কেন, যে শুনবে সেই হাসবে। খাওয়া-দাওয়ার পর পশ্চিমের বারান্দায় এসে মীনার সঙ্গে গল্প করছি—বড়-মাসীমা এসে বললো আমায়—আমি তো হেসে বাঁচিনে—হ্যাঁ, তাই নাকি আবার হয়—আমার ও-সব মাদুলীতে বিশ্বাস নেই—সত্যি—বলে' সুষমা আবার হাসতে লাগলো—

সুনীল বললে—বাঃ, কথাটা কী—শুনি,—হেসেই গড়িয়ে গেলে—কথাটা কী ?

সুষমা বললে—না না সে বলা যায় না—বলে'ই হাসতে লাগলো—

—আমার কাছেও বলা যায় না ?—

সুষমা হেসে হেসে বললে—সে তুমিও হেসে উড়িয়ে দেবে—! বড়মাসীমা বলছিল—তবে শোন—হাওড়ায় পঞ্চানন না-কি এক সাধু আছে—সে-ই মাদুলী দেয়—কত লোকের নাকি হয়েছে, বড়মাসীমা বললে—অব্যর্থ! আমি তো, বুঝলে, হেসে আর বাঁচিনা—হাসতে হাসতে আমার......

সুনীল বললে—তা' এতে হাসির কী আছে ?

সুষমা তেমনি ভাবে বলে উঠলো—তুমি কি মাদুলী-টাদুলী বিশ্বাস করো নাকি ? আমার যে একতিল বিশ্বাস নেই ওতে—যত সব পয়সা নেবার ফিকির—ভগবান যা'কে দেবেন না...

এর পরে দু'জন ক্রমে ক্রমে ঘুমিয়ে পড়েছে, দুজনের মন্থর একটানা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এবার আমরা ফিরে আসবো—এখন আমাদের চলে' যাওয়াই উচিত। কিন্তু আর একটু থাকাও দরকার আমাদের।

মাঝ রাত্রিতে সুনীলের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। জলতেষ্টা পেয়েছে। উঠে আলো জেলে জল খেলে। টেবিলের ওপর সুষমার সাড়ী ব্লাউজ পাট্‌করা রয়েছে—যা' পরে সে টুনিদির বাড়ী 'সাদে'র নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল। একটা ফুলের তোড়া—আধ-শুকনো! নতুন জর্জেট্‌ সাড়ীটায় মিহিদানার দাগ লেগে গেছে—ওটা তো কালই ধুতে দিতে হবে। তবে আর অত যত্ন করে' পাট করে রাখা কেন? সুনীল ভাবলে। বিছানার ওপর সুষমা ঘুমোচ্ছে—স্থির বিদ্যুল্লতার মতন। সমস্ত দিনের ক্লান্তি যেন মুখে মাখানো। হঠাৎ ব্লাউজের আর সাড়ীর ফাঁকে সুনীলের নজর পড়লো।—এক টুকরো কাগজ-কী যেন তা'তে লেখা। সুনীল কাগজটা তুলে নিয়ে পড়লে: একটা ঠিকানা।—হাওড়া—পঞ্চানন ঠাকুর—ঠিকানাটা একটা কাগজে আবার লিখে এনেছে...আশ্চর্য্য—হঠাৎ কী হ'য়ে গেল, সুষমার সেই হাসির কথাটা হঠাৎ সুনীলের মনে পড়লো।

এবার সুনীলের আর হাসি এল না। সত্যি সত্যি সুষমা বড় নিঃসঙ্গ। সুনীল আজ প্রথম গভীর করে' হৃদয়ঙ্গম করলে—কীসের অভাব সুষমার। এতদিন এই নিয়ে সুনীল কত হাসি-ঠাট্টা করেছে—কত পরিহাস করেছে; আজ সুনীলের মনে-হোল—সত্যিই সুষমা বঞ্চিত। আজ আর সুনীলের হাসি এল না—জীবনের শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন থেকে সুষমা বঞ্চিত। সেই রাত্রে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সুনীল একদৃষ্টে সুষমার দিকে চেয়ে রইল—সেই নিদ্রা-কাতর মুখ, সেই ধনুর মত বাঁকা ভ্রূযুগ, সেই অবিন্যস্তবেশা তনুলতা, সেই সুকুমার গ্রীবা আর পুষ্প-কোমল ওষ্ঠ, সন্ধ্যাতারার করুণতা হ'য়ে বালুচরের কাশশ্রীর শুভ্রতা হ'য়ে—বর্ষাকাশের ঘন কালো মেঘের ম্লানিমা হ'য়ে—তরুপ্রচ্ছন্ন ছায়াবীথির বিশ্রাম হ'য়ে, মেঘশূন্য নভস্তলের মাধুর্য্য হ'য়ে—বিরাট পৃথিবীর অনন্ত-রাত্রির মূক ব্যথায়—তারাহীন আকাশের স্তিমিত মৌনতায়—অদ্ভুতভাবে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে গেল।............

শ্রীবিমল মিত্র

অজানা পুলকে অবাধ হরষে উথলায় মোর প্রাণ

৺মঞ্জরী দাসগুপ্তা

হে বিশ্ব ! আজি থামাও তোমার কল-কোলাহল শত,
শোন আজি মোর গান,
অজানা পুলকে স্বচ্ছ-সলিলা অবাধ নদীর মত
নেচে ওঠে মোর প্রাণ।
তুচ্ছ শোক ও দুঃখ তোমার
ভুলে যাও আজি শুধু একবার,
মোর বীণে আজি ঝঙ্কারি ওঠে শত সুর শত তান,
অজানা পুলকে অবাধ হরষে উথলায় মোর প্রাণ।

হে কুসুম ! তব রূপ লাগে ম্লান চাহি আজি তব পানে,
তোমায় অসুন্দর
চির-সুন্দর ধরা দেবে আজি মোর কণ্ঠের গানে
হবে সুন্দরতর ;
আজি ফোটো তুমি কালি ঝ'রে যাও
ছিন্ন মলিন ধূলায় লুটাও
তোমার ও রূপ অসার ক্ষণিক নিমেষেই হবে ম্লান
চির-সুন্দরে জানাবে প্রণতি মোর কণ্ঠের গান।

অন্তরে মোর কি জানি কেন বা কাঁপিতেছে থরথর
কত ভাব নব নব,
বিশ্ব হইতে আনন্দ হাসি সঙ্গীত মনোহর
আজিকে ছানিয়া লব ;
ধরণীর শত আনন্দ মাঝে
আমার প্রাণের সুরখানি বাজে,
আমার প্রাণের মধুরতা নিয়ে এ ধরণী সুন্দর,
কি জানি কেন বা অবাধ উলাসে কাঁপে মোর অন্তর।

ওগো ও বিশ্ব, ভোল আজি তব দুঃখ শোকের গীতি,
দুঃখেরে আজি ভোল ;
আজি শুধু হাসি, গান, কৌতুক, স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি
অন্তরে ভ'রে তোল ;
তোমার সুখের পরশ পাইয়া
দুঃখ ভুলুক শত শত হিয়া,
বহুদিন পরে দুখ যামিনীর আজি অবসান হ'ল ;
আনন্দ আর ভালবাসা দিয়ে হিয়াখানি ভরে তোল।

আমার বীণায় ঝঙ্কারি ওঠে নব ভার নব সুর
অতুলন, অক্ষয় ;
দুঃখ ও শোক, বিষাদ, ম্লানিমা—আজি তারা হোক দূর
দূরে যাক যত ভয় !
যে হরষে নাচে আমার এ হিয়া
সে পুলক আজি পড়ুক ছড়িয়া,
দিকে দিকে আজি সঙ্গীত মোর দানে যেন বরাভয় ;
দুঃখ আজিকে হোক পরাজিত হরষের হোক জয়॥

---

* ৺মঞ্জরী দাসগুপ্তা গত ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় মহিলা ছাত্রীদের মধ্যে অপর একটি ছাত্রীর সহিত প্রথম হইয়াছিলেন, এসংবাদ বিচিত্রার পাঠকপাঠিকাগণের মনে আছে। কলেজে প্রবেশ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই দুই দিনের জ্বরে মঞ্জরী দাসগুপ্তার মৃত্যু হয়, এ শোচনীয় সংবাদও বিচিত্রায় গতমাসে প্রকাশিত হইয়াছে। মঞ্জরী বহুবিধ গুণসম্পন্না বালিকা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে অতি অল্প-বয়সে যে বিস্ময়জনক কবিপ্রতিভার অস্তিত্ব ছিল উপরে মুদ্রিত কবিতাটী তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। মঞ্জরী এইরূপ বহুসংখ্যক কবিতা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আশা করি সেগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ লাভ করিবে। যে অসাধারণ প্রতিভা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইল, তাহার জন্য একটী সশ্রদ্ধ বেদনা এইখানে আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। বিঃ সঃ।

ডাক্তার আর ডাক্তারী এটিকেট

"ডাক্তার"

যদিও ডাক্তারদের সম্বন্ধে লিখ্‌তে বসেছি তবু গোড়াতেই বলে রাখা ভাল যে আর পাঁচ জনের মত ডাক্তাররাও রক্ত মাংসে গড়া মানুষ, তাঁরা সমাজের বাইরের অদ্ভুত একটা কিছু জীব নন্‌। অর্থাৎ সন্দেশ খেতে দিলে তাঁরা, নিতান্তই ডায়াবিটিস্‌ কিম্বা এই ধরণের কোন রোগে যদি না ভোগেন, তৎক্ষণাৎ তার কার্ব্বোহাইড্রেট্, প্রোটীন এবং ফ্যাটের হিসাব করতে বসেন না; সন্দেশটা জিহ্বায় যেমন লাগে ঠিক সেই জিনিসটাই উপভোগ করেন। শরীর অসুস্থ হলে, তাঁরা অন্য সাধারণ রুগীদের চেয়ে বরং বেশী তবু কম অস্থির হন্‌ না। আমার বক্তব্য হচ্ছে ডাক্তাররা সব সময়েই ডাক্তার নন্, সব সময়েই তাঁরা একমাত্র রোগ এবং চিকিৎসার কথা চিন্তা কিম্বা আলোচনা করেন না। অন্য লোকের মতন অবশ্য নিজেদের ব্যবসার কথা আলোচনা করতে ভালবাসেন, তবে চব্বিশ ঘণ্টাই ইংরাজীতে যা'কে "talking shop" বলে তা ভালবাসেন না। গানের আসরে গানই শোনেন্, গায়কের মেনিন্‌জাইটিস্‌ হতে পারে কিনা তা গবেষণা করেন না। একথাটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু নেই এবং সকলেই এটা জানেন, কিন্তু প্রত্যেক ডাক্তারের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে তাঁকে দেখলেই লোকের অসুখের কথা মনে পড়ে যায় এবং সে বিষয়ে কিছু না কিছু সংবাদ জানবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে, তা সেটা রবিবাবুর বক্তৃতার হলেই হোক্‌ আর ট্রামে-বাসেই হোক্‌।

লোকে ডাক্তার হয় কেন? পয়সা উপায়ের জন্যে। এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ। ডাক্তারের ছেলে প্রায়ই ডাক্তার হয়। তার একটা কারণ হচ্ছে নূতন একটা রোজ-গারের পথ তাঁরা সহজে খুঁজে নিতে চান্‌ না। আর একটা কারণ—ছেলেবেলা থেকে রোগ এবং রুগীর কথা শুনে শুনে ডাক্তারী বিষয়ে তাঁরা রপ্ত হ'য়ে যান। আবার অনেকের ঠিক্‌ এই কারণেই ব্যাপারটার ওপর এমন একটা বিতৃষ্ণা জাগে যে, তাঁরা মেডিকেল কলেজের ত্রিসীমার মধ্যে দিয়ে হাঁটেন না। কেহ কেহ আবার ডাক্তার হন তার কারণ ছেলেবেলা থেকেই তাঁদের ঐ দিকে ঝোঁক্ (প্রেরণা?) আসে। তাঁরাই বোধ হয় ভবিষ্যতে বড় ডাক্তার হন।

ডাক্তারের কাছে রুগীমাত্রেই 'কেস্'! তিনি জাস্তিপুরের মহারাজাই হোন্‌ আর বুদ্ধন্‌ ঝাড়ুদারই হোন্‌। মেডিকেল কলেজ কিম্বা ইস্কুলে পড়বার সময় এই 'কেস্' জ্ঞানটা এমন ভাবে মজ্জাগত হয়ে যায় যে, রুগী এলে তার সাংসারিক অবস্থার কথা একেবারেই মনে পড়ে না—তাকে একটা 'কেস্' বলেই মনে হয়। একটা উদাহরণ দিলে জিনিষটা একটু সহজে বোঝা যাবে। ডাক্তার হবার আগে আমার এক বাল্যবন্ধুর বাড়ী প্রায়ই বেড়াতে যেতাম—তখন কিন্তু তার বাবা যেদিকে থাকতেন পারতপক্ষে সেদিক মাড়াতাম না, ভদ্রলোক এমনই রাশভারি এবং জবরদস্ত হাকিম ছিলেন। সেই আমি যখন ডাক্তার হিসেবে তাঁর চিকিৎসা করতে গেলাম, তখন তাঁকে একটা 'কেস্' ভিন্ন অপর কিছুই ভাবতে পারলাম না। এ কথা মনে হ'লনা যে, তাঁকে দেখলে আমি এককালে ভয় পেতাম। ডাক্তারের এই রকম মনের অবস্থা না থাকলে চিকিৎসা করা অসম্ভব। ঠিক্‌ এই কারণেই ডাক্তাররা নিজের পরিবারের কাহাকেও চিকিৎসা করতে চান্‌ না।

সমাজে বাস করার সুবিধে হবে বলে যেমন প্রত্যেকেই কতকগুলি 'এটিকেট' মেনে চলে, ডাক্তারী এটিকেট জিনিষটা ঠিক্‌ সেই ধরণেরই একটা ব্যাপার। এর মধ্যে অদ্ভুত কিছু নেই, যদিও ইংরাজী এবং বাংলা নভেলিষ্টরা এটাকে "ফ্রী-মেসনদের" আইনকানুনের মতন এর চারিদিকে একটা রহস্যের জাল দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা জিনিষটাকে

অনেক সময়ে হাস্যকর করে তোলেন। অনেকের ধারণা 'বেচারা' রুগীদের ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করবার জন্যেই ডাক্তাররা 'ট্রেড-ইউনিয়নিজমে'র মত জিনিষ করে নিয়েছে। ব্যাপারটা ঠিক্ তা নয়—'বেচারা' ডাক্তারদের সুনাম বজায় রাখবার জন্য, এবং তাঁদের এবং রুগীদের সুবিধার জন্য কতকগুলো লিখিত এবং অলিখিত আইন করা হয়েছে।

সবচেয়ে জরুরী এটিকেট ধরা যাক্—কাহারও কোনও অসুখ করলে, সেই রোগের বিষয় রুগীর অত্যন্ত নিকট আত্মীয়কেই দরকার হলে বলতে পারা যায়—সাধ্যমত না বলাই ভাল। এই সাধারণ আইনটার জন্য অনেক সময় বন্ধু-বিচ্ছেদ হবারও উপক্রম হয়েছে। একটা উদাহরণ দিই। চিন্তামণি বাবু তাঁর কোন গোপনীয় রোগের চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। তিনি যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন আমাদের উভয়ের বন্ধু জগবন্ধুবাবু ঢুকলেন। ঢুকেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "চিন্তামণি এসেছিল কেন হে?" আমি বল্লাম, 'এমনিই"। তিনি বল্লেন, "সেই লোক চিন্তামণি কিনা! বিনা দরকারে সে যেন কারুর কাছে যায়! ওর হয়েছে কি?" বল্লাম, "এমনিই সামান্য অসুখ।" তখন তিনি চটে গিয়ে বল্লেন, "বলবেনা, তাই বল! তোমার আবার এটিকেট্ এটিকেট্ বাই আছে।" এ রকম অবস্থায় প্রত্যেক ডাক্তারের প্রায়ই পড়তে হয়। সত্য কথা বল্লে মানহানির মকদ্দমার ভয় আছে, আর না বল্লে বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়। ডাক্তাররা এক্ষেত্রে শেষেরটা পছন্দ করেন।

আর একটা আইন হচ্ছে—সাধারণের কাছে যে ওষুধের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সে ওষুধ ব্যবহার না করা। এ নিয়মটা পালন করলে ডাক্তার এবং রুগীর উভয়েরই সুবিধা। ধরুন একজন কাশিতে কিছুদিন ধরে ভুগছেন—ডাক্তার তাকে একটা পেটেণ্ট ওষুধ দিলেন। সে ওষুধের বিজ্ঞাপন প্রায় প্রত্যেক সাময়িক কাগজে পাওয়া যায়। তাতে বড় বড় করে লেখা আছে—ঔষধ সেবনে যক্ষ্মার কীটাণু সমূলে বিনষ্ট হয়। তার সঙ্গে আবার সত্য মিথ্যা অনেক অযাচিত যাচিত এবং ক্রীত প্রশংসাপত্র দেওয়া আছে। রুগী সেই ওষুধ দেখেই ধরে নিলেন তাঁর যক্ষ্মা হয়েছে এবং বড় বড় ডাক্তারদের কাছে গিয়ে নানাপ্রকারে পয়সার অপব্যয় করলেন। ডাক্তারের কি লাভ হয় সে কথা বলতে আমার নিজের এক অভিজ্ঞতা মনে পড়ে গেল। একটা বন্ধুর জন্য ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়া অনুমোদিত একটা অতিসাধারণ ওষুধের ব্যবস্থা করি। আমার জানা ছিল না কোন কোম্পানী ঘরের পয়সা খরচ করে এই বড়ীর বিজ্ঞাপন দেয়। দিন কতক পরে তাঁর স্ত্রীর অসুখের জন্য আমাকে সেই বন্ধুর বাড়ী যেতে হয়। তিনি আমাকে দেখেই বল্লেন, "ভারি এক ওষুধ দিয়েছিলে হে! তোমার ওষুধের বিজ্ঞাপন বি, কে, পাল কোম্পানীর পাঁজিতে পাওয়া যায়।" আমি প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন, কাজ হয়নি নাকি?" তার উত্তরে তিনি বল্লেন, "কাজ ত বেশ হয়েছে, আর আমি 'বিরেচক' কথাটাও শিখে ফেলেছি, কিন্তু তুমি আমাকে একটা যা-তা ওষুধ দিলে শেষে!" মনে হ'ল, আমার ওপর বিশ্বাসটা তাঁর একটু কমে গেছে। এই জন্যেই বোধহয় ল্যাটিনে প্রেস্‌ক্রিপসন লেখার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল, আর এই জন্যেই বোধহয় ডাক্তারদের হস্তাক্ষর অপাঠ্য না হোক্ দুষ্পাঠ্য হয়।

একজনের চিকিৎসাধীন থাকলে সেই রুগীকে প্রথম ডাক্তারের অজ্ঞাতে কিম্বা বিনা অনুমতিতে অন্য ডাক্তারের চিকিৎসায় যাওয়া উচিৎ নয়। এ কথাটা অনেকে বুঝতে পারেন না, কিম্বা বুঝতে চান না। এতে ডাক্তারদের ট্রেড-ইউনিয়নিজম্ আছে ভাবলে তাঁদের ওপর অন্যায় দোষারোপ করা হয়। একজন ঠিক্ চিকিৎসা করেছে কিনা সেটা জানবার জন্য যদি আপনি অন্য ডাক্তারের মত চান্, তা হ'লে সেটা আপনার ডাক্তারকে জানালেই তিনি সম্মত হবেন। ডাক্তারের ক্ষমতা যে কত সঙ্কীর্ণ এবং ডাক্তারের ভুল যে কতরকমে হয় একথা তাঁদের চেয়ে আর কাহারও জানা সম্ভব নয়। ডাক্তারও ত মানুষ—ভগবান নয়। আমাকে না জানিয়ে আর কাউকে দিয়ে যদি আমার বিদ্যা যাচাই করা হয় আর তাতে যদি আমি চটি, তাহলে কি সত্যই অন্যায় করা হয়? এতে রুগীরও ক্ষতি হবার আশঙ্কা কম নয়। একজন রোগের গোড়া থেকে দেখছেন, তিনি হয়ত পারিবারিক চিকিৎসক, তিনি জানেন কার কেমন 'ধাত'। তিনি পারিবারিক চিকিৎসক না হলেও তিনি গোড়া থেকে দেখছেন বলে তিনি রুগীর বিষয়ে যতটা জানেন, হঠাৎ একজন নূতন

ডাক্তারের পক্ষে ততটা জানা সম্ভব নয়, তা তিনি যতই বিচক্ষণ হোন্ না কেন। এ কথাটা এতটা বেশী করে না লিখলে হয়ত ভাল হ'ত কিন্তু ব্যবসা করতে গিয়ে দেখছি লোকে, এমন কি উকিলরাও যাঁদের মধ্যে এই নিয়ম আছে, এ কথাটা বুঝতে চান না।

আর একটা এটিকেট্—যতই ক্লান্ত হোন্ আর চিন্তাক্লিষ্ট হোন্—রুগীর কাছে ডাক্তারের সব সময় হাসিমুখ হওয়া চাই। রুগীর যখন যন্ত্রণা হয় তখন সে বোঝেনা যে ডাক্তারও মানুষ, তারও শ্রান্তি ক্লান্তি আছে। অনেক রাত্রে, বাইরে তখন ঝম ঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ী ফিরে পায়ের জুতো খুলে ডাক্তার আঙুলের কড়ায় হাত বুলোচ্ছেন, (ডাক্তারের পায়েও কড়া হয় এবং তাতে ব্যথাও হয়,) আর বিছানার দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাইছেন, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল, "হ্যালো, কে ডাক্তারবাবু? আমি মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। দেখুন, আজ দুপুর থেকে ছোট খুকীর পেট কামড়াচ্ছে, কিছুতে থামছে না, একবার আস্তে পারেন।" হায়রে বিছানা! আর, হায়রে পায়ের কড়া! তখনই বলতে হ'ল, "আচ্ছা আমি এখনই যাচ্ছি, খুবসম্ভব কিছু নয়, তবু একবার দেখে আসি।" বলতে হয়ত একবার ইচ্ছে হয়েছিল—দিনদুপুর থেকে যন্ত্রণা, আর রাতদুপুরে ডাকবার কথা মনে পড়ল? আবার ধড়াচুড়ো প'রে ওয়াটারপ্রুফ জড়িয়ে ডাক্তার বেরোলেন মিসেস্ ব্যানার্জীর ছোট খুকীর পেটের ব্যথা সারাতে। ফিরে যখন এলেন তখন রাত আর বেশী বাকি নেই, বিছানায় শুয়ে প'ড়ে একবার মুখ দিয়ে বেরুল "আঃ" এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ জুড়ে এল,—আর ঠিক সেই সময়ে পাশের বাড়ী থেকে ডাক এল, "ডাক্তার! ডাক্তার!"

'ডাক্তার'

দীপশিখা

শ্রীরঘুনাথ মাইতি

অন্ধকার—
অন্ধকার—সীমাহীন, অতল, অপার,
ঊর্দ্ধে, নিম্নে, সম্মুখে, পশ্চাতে—
বাহিরে—অন্তরলোকে,
সর্ব্বদেশ সর্ব্বকাল আবরিয়া লক্ষ পক্ষপুটে
জেগে আছে স্পন্দহীন রাশি রাশি গাঢ় অন্ধকার।
তাই আছি অন্ধ হয়ে।
নয়নের দৃষ্টি আছে,
দৃষ্টির পিপাসা আছে,
কিন্তু—ব্যর্থ সব,
অভেদ্য আঁধার-দুর্গে বন্দী সব আশা।
সহস্র বিচিত্র ধ্বনি বিচিত্র সঙ্কেত
তরঙ্গের মত আসে,
জাগে কৌতূহল,
ইচ্ছা হয় দেখে নিতে একটী পলকে
যা' কিছু সঞ্চিত আছে বিচিত্রার বিরাট গহ্বরে।
কিন্তু—ব্যর্থ সব,
আঁধারের যবনিকা—রন্ধ্র নাহি তার।

———
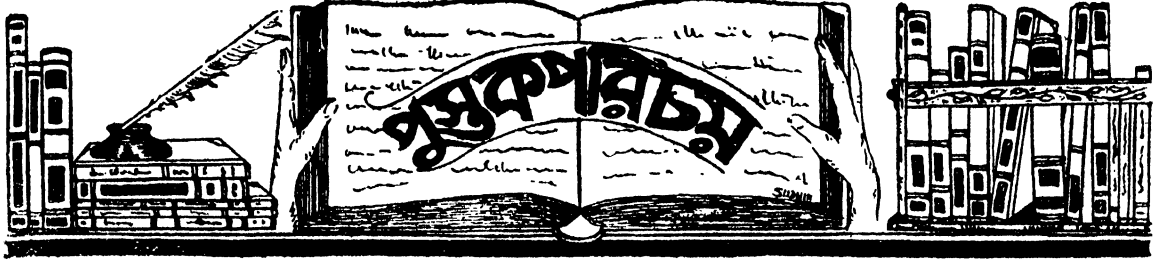
আজব বই—শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী সম্পাদিত। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক, দেবসাহিত্য কুটীর।

এই চিত্রবহুল গল্প ও কবিতার বইটি পূজার সময় ছেলে-মেয়েদের যে বিশেষভাবে আনন্দ দান করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু গল্প কবিতাই নয়, নানারকম বৈজ্ঞানিক সংবাদাদিও এ বইখানিতে সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে' যা ছেলেদের আনন্দের সঙ্গে প্রচুর জ্ঞানও প্রদান করবে। পৃথিবীর নানারকম আজব খবর এতে আছে। বস্তুসম্পদের হিসাবে বইখানির মূল্য বেশী হয়নি বলেই আমাদের মনে হয়।

শ্রীআশীষ গুপ্ত

নবান্ন। শ্রীযুক্ত সুহৃৎনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বেহালা অভয়কুটীর, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় রোড হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

ইহা—গ্রন্থকারের ভাষায়—একটী Talkie Drama.

মানসী ও মর্ম্মবাণী। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস প্রণীত। রাজশাহী হইতে প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই। ইহা একখানি কবিতা পুস্তক। ব্যক্তিগত শোকোচ্ছ্বাস।

জেজুরের মিত্র-বংশ। শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মিত্র বর্ম্মা প্রণীত। জেজুর বিশ্বম্ভরধাম হইতে গ্রন্থকারকর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

নারী। শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১০।২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

সাকী ও সুরা। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচায্য প্রণীত। খড়দহ পূরবী সাহিত্য পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

মাধুকরী। শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ১৮৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চার আনা।

তিনখানিই কবিতা পুস্তক, এবং তিনখানিই একটী বিশেষ সুরে বাঁধা। সে সুরের স্রষ্টিকর্ত্তা বঙ্গের একজন খ্যাতনামা কবি। তবে ইহার মধ্যে শোসোক্ত খানিতে একটু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বিদ্যমান।

বিশ্বকর্ম্মা

আত্মকথা। শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৩নং সুকিয়া রো হইতে প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই।

কবিতা পুস্তক। ব্যক্তিগত শোকোচ্ছ্বাস।

স্বপ্নসুন্দরী। শ্রীযুক্ত গদাধর সিংহরায় প্রণীত। ১।১ বদন রায়ের লেন, হাওড়া হইতে শ্রীযুক্ত অমরনাথ সিংহরায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। ইহা একখানি নাটিকা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী লীলামৃত। শ্রীমতী সারদা-সুন্দরী দাসী প্রণীত। বাণী-ভবন, কলেজষ্ট্রীট—মার্কেট, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ভট্টাচায্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

ইহা একখানি কবিতা পুস্তক।

হরগৌরী। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

ইহা একখানি পৌরাণিক নাটক।

বুঝেছ। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৫২ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

ইহা একখানি নাটক।

রঘুভূতি—

বিচিত্রার শতমাসিকী

বর্ত্তমান কার্ত্তিক সংখ্যায় বিচিত্রার একশত সংখ্যা পূর্ণ হ'ল। এই শত সংখ্যার প্রত্যেক সংখ্যাকে এক-একটি স্বতন্ত্র দল বিবেচনা ক'রে বর্ত্তমানের বিচিত্রাকে সাহিত্যের একটি শতদল পদ্ম ব'লে দাবী করা যায় কি-না, সে বিচার বিচিত্রার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ করবেন,—কিন্তু বহু শক্তিশালী লেখক-লেখিকার সদয় সহযোগিতা লাভ ক'রেও বিচিত্রাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে আমাদের কল্পনা এবং আদর্শের মত ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে পারি নি, সে কথা আজ অকপটে স্বীকার করি।

তথাপি, এক মুহূর্ত্তের অতি-সংক্ষিপ্ত হিসাব নিকাশের সময়ে এ কথা বল্‌লে বোধ করি অবিনয় প্রকাশ করা হবেনা যে, বাঙলা দেশের সাহিত্য-সাধনা এবং সাহিত্য-প্রসারের মধ্যে বিচিত্রা একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে, এবং বহু শক্তিশালী লেখক বিচিত্রা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং সাহিত্য-দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 'ইতিপূর্ব্বে আর কোনো কাগজে লেখা প্রকাশিত হয় নি'—বিচিত্রায় লেখা প্রকাশিত হওয়ার বিষয়ে এ কথা কোনো অখ্যাত-অজ্ঞাতনামা লেখকের পক্ষেই বাধা নয়। বস্তুত, তেমন কোনো লেখকের অপরিণত রচনার মধ্যেও শক্তির পরিচয় পেলে আমরা সে লেখা বিচিত্রায় প্রকাশিত করবার জন্য লুব্ধ হই।

এখানে প্রসঙ্গত আর একটি কথা এসে পড়ছে। যে-সকল বিপুর দ্বারা অধুনা আমাদের দেশ [illegible]ড়ম্বিত, সাম্প্রদায়িকতা তন্মধ্যে একটি অতিশয় প্রবল [illegible]। রাজনীতি এবং রাষ্ট্র-নীতিকে অবলম্বন ক'রে এই [illegible] বহুক্ষেত্রে ভেদনীতির বিকটতম মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রের অনাবিল আবহাওয়ার মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু প্রবেশ করলে ক্ষোভের আর অন্ত থাকবে না। লেখকের জাত আছে, বর্ণ আছে, ধর্ম্ম আছে, হয়ত সাম্প্রদায়িকতাও থাকতে পারে, কিন্তু লেখার ও-সব কোনো বালাই নেই। লেখারও ধর্ম্ম আছে, কিন্তু সে অন্য ধর্ম্ম—হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম নয়। রসের দরবারে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি; তাই সঙ্গীতের হিন্দু শিষ্য সকালবেলা নিদ্রাভঙ্গের পর মুসলমান ওস্তাদের নাম স্মরণ ক'রে মাথায় করস্পর্শ করে। সাহিত্যক্ষেত্রে কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িকতা যে আমরা স্বীকার করি না, তার প্রমাণ স্বরূপ বল্‌তে পারি বিচিত্রায় মুসলমান লেখকের লেখা বিরল নয়। সাহিত্য সকল জাতির সকল মানবের মহামিলন ক্ষেত্র,—আদমসুমারি প্রভৃতি ভেদনীতির যুক্তি-তর্ক হ'তে একেবারে নিষ্কণ্টক। আমরা আশা করি বিচিত্রার পৃষ্ঠার মধ্যে ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় অধিকতর শক্তিশালী মুসলমান লেখকের পরিচয় লাভ করতে আমরা সমর্থ হব।

বাঙালার সাহিত্যগগনের সূর্য্য চন্দ্র স্বরূপ দুই জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকের লেখায় বিচিত্রা সমুজ্জ্বল। এঁদের দুজনের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। নানাবিধ গুরুতর কার্য্যের অবসরহীনতা এবং শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও প্রতি মাসে বিচিত্রার জন্য লেখা পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ধন্য করেছেন। বিচিত্রার প্রতি তাঁর স্নেহ এবং প্রীতির সীমা নির্দ্দেশ করতে পারিনে। শরৎচন্দ্রেরও বিচিত্রার প্রতি অনুরাগ অপরিসীম। দুঃসহ শিরঃপীড়ার মধ্যেও তিনি নববর্ষা-রম্ভে নূতন উপন্যাস আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু পীড়া অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায় লেখা কয়েক মাস বন্ধ রয়েছে। কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য তিনি খানিকটা লিখেছিলেনও, কিন্তু পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করতে পারেন নি ব'লে তা প্রকাশ করা গেল না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি শরৎচন্দ্র অচিরে সম্পূর্ণ ভাবে রোগমুক্ত হউন।

পরিশেষে আমাদের সকল লেখক-লেখিকা পাঠক-পাঠিকা এবং হিতৈষীগণের প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিবাদন

জানিয়ে আমরা বিচিত্রার প্রথম শতক সমাপ্ত করলাম। আগামী অগ্রহায়ণ মাস থেকে দ্বিতীয় শতক আরম্ভ হবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—অয়মারম্ভঃ শুভায় অস্তু।

কবিতা ত্রৈমাসিকী পত্র

নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানিতে কবিতার প্রতি যে সাধু সঙ্কল্প ব্যক্ত হয়েছে তার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য আমরা সম্পূর্ণ পত্রখানি প্রকাশিত করলাম। কাব্যরসিক মাত্রেই এ শুভ সংবাদে উল্লসিত হবেন।

"চল্‌তি সাময়িকপত্রে নিজেদের কবিতা ছাপতে দিতে আজকালকার অনেক কবিই অনিচ্ছুক—এবং এ অনিচ্ছা অন্যায়ও নয়। কেননা অগ্নিবাস মাসিকপত্রের পাঁচামেশালি ভিড়ের মধ্যে সত্যিকারের ভালো কবিতারও কেমন একটা বাজে ও তুচ্ছ চেহারা যেন হ'য়ে যায়। কবিতাকে যথোচিত গৌরবে বিশেষভাবে ছেপে থাকে এমন সাময়িক পত্র বর্ত্তমানে দেশে বেশী নেই। অথচ আধুনিক কবিদের অনেকেই নতুন কবিতা লিখছেন্—বাইরের পাঠকমণ্ডলী দূরে থাক, সব সময় নিজেদের মধ্যেও সেগুলো দেখাশোনার সুবিধে হয় না।

এই কারণে আমরা একটা ত্রৈমাসিক কবিতা পত্র বার করতে বাধ্য হচ্ছি। পত্রিকার নাম হবে কবিতা এবং তাতে থাকবে শুধু—কবিতা। আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিরা সকলেই এতে তাঁদের রচনা প্রকাশ করবেন। নবীন কবির ভালো কবিতাও যতটা পাওয়া যায় প্রকাশিত হবে। প্রথম সংখ্যা বেরুবে আগামী ১লা আশ্বিন। প্রতিসংখ্যা ছ' আনা করে দোকানে ও ষ্টলে বিক্রি হবে, বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। এই পত্রিকাসংক্রান্ত সর্ব্ববিধ চিঠিপত্র আমাদের ম্যানেজার শ্রীসত্য প্রসন্নদত্তের নামে ১৬২--১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স ১৫ কলেজ স্কোয়ার ও ডি, এম লাইব্রেরি ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ এই দুই ঠিকানা থেকে সহরের ও মফঃস্বলের পাঠকরা প্রতিসংখ্যা সংগ্রহ করতে পারবেন। ইতি

বুদ্ধদেব বসু
প্রেমেন্দ্র মিত্র"

শিল্পী শ্রীকৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য

শিল্পী কৃষ্ণনাথ বেঙ্গল কাউন্সিল হাউসের চিত্রাদি সংরক্ষণের জন্য কিউরেটর নিযুক্ত হ'য়েছেন। কৃষ্ণনাথের বয়স

শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য

মাত্র ২৩ বৎসর। এই অল্প বয়সেই তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। গত ১৯৩২ সালের ১০ই মার্চ্চ মাননীয়া লেডী জ্যাকসন্ মহোদয়া কৃষ্ণনাথের শিল্প প্রতিভা সম্বন্ধে যে প্রশংসা পত্র দিয়েছিলেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

—I have been much impressed by the work Mr. K. M. Bhattacharjee, a young artist of twenty, who displays remarkable natural gifts. I am taking one of his pictures Home with me, which, in my opinion, shows considerable talent and great promise.

Sd. Julia H. Jackson

বঙ্গীয় পি-ই-এন্ ক্লাব

বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ দ্বিপ্রহরে হোটেল ম্যাজেষ্টিকে নব-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় পি-ই-এন্ ক্লাবের একটি

বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বঙ্গীয় পি-ই-এন্ ক্লাব বিলাতের সুবিখ্যাত P. E. N.এর অন্তর্গত একটি শাখা প্রতিষ্ঠান, এ কথা বোধকরি অনেকেই অবগত আছেন।

সেদিনকার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত পি-ই-এন্ কর্ত্তৃক সম্মানার্হ বিশেষ অতিথিরূপে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কয়েকজন মহিলাও সেদিনকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

হোটেল ম্যাজেষ্টিকের সুবৃহৎ ডিনার হল পি-ই-এন্-এর সদস্য ও অপরাপর নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গে একেবারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। লাঞ্চের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এবং প্রমথ চৌধুরী এবং লাঞ্চের পরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্নদাশঙ্কর রায় ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সেদিনকার অনুষ্ঠানের উপযোগী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাদি দিয়েছিলেন। পি-ই-এন ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ ও মণীন্দ্রলাল বসুর আদর-আপ্যায়নে ও সুব্যবস্থায় সকলেই তৃপ্ত হয়েছিলেন। হোটেল পক্ষ থেকেও সমাগত ব্যক্তিবর্গের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ এবং সমাদর দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

বঙ্গীয় পি-ই-এন এর ভবিষ্যৎ কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব রইলাম।

বর্ত্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদ

এবারকার বিচিত্রার সুদৃশ্য প্রচ্ছদটি শক্তিশালী তরুণ শিল্পী-শ্রীমান ইন্দু রক্ষিত এঁকেছেন। শ্রীমান ইন্দু রক্ষিতের অঙ্কিত চিত্রাদির সহিত বিচিত্রার পাঠকবর্গেরও যেটুকু পরিচয় আছে তাতে তাঁরা এই তরুণ শিল্পীর শিল্পপ্রতিভার বিষয়ে নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একমত হ'বেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই তরুণ শিল্পীর উন্নতি কামনা করি।

শারদীয় পূজায় বিচিত্রা কার্য্যালয়ের ছুটি

আগামী ১৬ই আশ্বিন হ'তে ৫ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বিচিত্রা কার্য্যালয় বন্ধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে যে সকল চিঠিপত্র আসবে ছুটির পর সেগুলির বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করা হ'বে।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at the Sahitya-Bhaban Press, 26, Sitaram Ghose Street, and Published by the same from 27-1, Fariapooker St., Calcutta.

নবম বর্ষ, ১ম খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ | ৫ম সংখ্যা

বাসর ঘর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

কিছুদিন আগে তোমার "বাসর ঘর" বইখানি পৌঁচেছে আমার টেবিলে। গড়িমসি করে দেরি করেছি খবর নিতে। ভয় ছিল পাছে ভালো না লাগে। এর থেকে প্রমাণ হয় বয়স হয়েছে। যৌবনে নিষ্ঠুর হবার তেজ থাকে মানুষের—আমার সেকালের লেখায় তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এখন কাউকে নিন্দা করে দুঃখ দিতে কলম সরে না। সেই জন্যে নতুন বই পড়তে সঙ্কোচ বোধ করি, বিশেষত এমন লেখকের যার প্রতিষ্ঠা আছে। অভিমত দিতে মাঝে মাঝে বাধ্য হতে হয়, দ্বিধাগ্রস্ত মনে নিজের অলক্ষ্যেও কখনো কমিয়ে বলি কখনো বাড়িয়ে বলি—কিন্তু এড়িয়ে চলতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই।

তোমার বইখানি নিঃসংশয়েই ভালো লাগল, তাই অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছি। গল্প হিসাবে তোমার এ লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বেগে বয়ে চলেচে। একটি নারী এবং একটি পুরুষ এই দুটি তটের 'মাঝখানে' এর আবেগের ধারা। ধারার মধ্যে থেকে থেকে আবর্ত্ত পাক খেয়ে উঠচে, কিন্তু তার কারণগত আঘাত বাইরের দিক থেকে নয়, গভীর তলার দিক থেকে। কারণ যদি থাকত বাইরে, তাহলে তার ইতিহাস নিয়ে আখ্যানের উপকরণ জমে উঠতে পারত। তাহলে এর ভিতর থেকে দস্তুরমতো একটা গল্প দেখা দিত। তুমি যেন স্পর্দ্ধা করেই সেটা ঘটতে দাওনি। আশপাশের দুটি একটি পাত্রকে এনেছ তোমার রচনার আঙিনায়, তাদের চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে, কিন্তু গল্পের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে তারা জটিলতা বিস্তার করবার অবসর পায়নি—তুমি যেন উদ্ধতভাবেই জানিয়েছ এতে তোমাদের হস্তক্ষেপের

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুকে লেখা পত্র

দরকার নেই, সব দরজাতেই লট্‌কিয়ে দিয়েছ অনধিকার প্রবেশ অনভিপ্রেত। শোভাকে মাঝে মাঝে এমন করে ঘুরিয়ে নিয়ে গেছ যে তাকে উপলক্ষ্য করে একটা অপঘাতের প্রত্যাশায় অনেক পাঠকই হয়ত উৎসুক হয়ে উঠবে। তোমার মনের কোণে সেরকম দুরভিপ্রায় যদি থাকে তবে সেটাকে তুমি ঠেলে রেখেছ নেপথ্যের অগোচরে—সদ্য পাত পেড়ে রস ভোগ করতে দাওনি পাঠকদের—লালায়িত রসনা নিয়ে তারা হয়তো দুঃখিত হয়ে ফিরবে। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এ বইখানি প্রেমের রসনচৌকিতে দুই বাঁশির সম্মিলিত ডুয়েট—কখনো মধুর কখনো তীব্র, মাঝে মাঝে তার তালফেরতা। এলেখার গতিবেগের এমন প্রবলতা এবং রসের এমন প্রাচুর্য্য আছে যে এর মধ্যে পাঁচমিশেলি বৈচিত্র্যের অভাব পীড়া দেয়নি। রচনায় বাইরের যে মশলা যোগ করেছ সে বিশ্বপ্রকৃতির। তাকে না হলে বাসর ঘর গড়া যায় না—এই দুটির যোগসাধন করেছ নিপুণ হাতে। তোমার গল্পের বিশেষত্ব এই যে, যেখানে শেষ হলো বই, গল্পটা রয়ে গেছে তার পরের দিকে। তুমি দেখালে বান ডেকে আসচে, তারপরে বল্‌লে, বাস, আর দরকার নেই, ভাঙচুর সুরু হবে সে তো ধরা কথা, অলমতি বিস্তরেণ। তুমি দেখালে বানটা সর্ব্বনেশে, তার সৌন্দর্য্য আছে তার মহিমা আছে, সে নির্ম্মল তবু সে ভীষণ; দেখালে প্রবল ভালবাসার আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের মধ্যেই অনিবার্য্য হিংস্রতা, যুগ্ম জ্যোতিষ্কের পরস্পর আকর্ষণের মধ্যে যে দূরত্ব থাকলে তাদের যুগল যাত্রা নিরাপদ হোতো, আবেগের দুর্দ্দামতায় সেইটে কমে গিয়ে আসন্ন প্রলয় সংঘাতের আশঙ্কা উগ্র হয়ে উঠ্‌ল। এই তোমার গল্প-না-বলা গল্পটিকে তুমি যে এমন করে দাঁড় করাতে পেরেছ সে তোমার কবিত্বের প্রভাবে।

একটা কথা বলে রাখি, "কুন্তলা" নামটা ভালো লাগল না। কুন্তল মানে চুল, আ-কার যোগ করে তাতে স্ত্রীত্ব আরোপ করা বৃথা। কেউ কেউ মেয়ের নাম রাখেন অনিলা। অনিল মানে হাওয়া, হাওয়াকে হাওয়ানী বলে ছদ্মবেশে চালানো যায়না; চুলকে চুলা বললে আরো দোষের হয়। একথা মানা যেতে পারে "চুলা"কে স্ত্রীজাতীয় বলে নির্দ্দেশ করলে ভাবের ক্ষেত্রে কোনো কোনো স্থলে সঙ্গত হতেও পারে।

ইতি ২৫ অক্টোবর ১৯৩৫

রবীন্দ্রনাথ

জাপানী-পঞ্চাশিকা

(ইংরাজি অনুবাদ হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ (ক্যাল ও ক্যাণ্টাব)

তুষারাবৃত

মেরুপ্রদেশের শীতের প্রকোপ জানি।
আসেনা ত কেহ, শূন্য এ ঘরখানি।
তৃণহীন মাঠ, শবকঙ্কাল শাখী,
তুষারাবরণে তাদেরে রেখেছে ঢাকি।
গেছি মরে ঝরে আমিও তাদেরি মত,
তুষারের ভার বহিতেছি অবিরত।

মিনামাটো আসোন্

সারস

শুভ্র সারস দাঁড়ায়ে সিকতা পরে,
পরপার হতে বহে বায়ু বেগভরে।
শুভ্র ঢেউটি যেন
দাঁড়ায়ে রয়েছে হেন,
নিরুপায় অতি, বায়ু আসি' নদী হ'তে
দেয় না তাহারে ফিরে যেতে পুন স্রোতে।

ইউদা

অন্তর্বাহিনী

হৃদয় আমার মনে হয় যেন মেরুপ্রদেশের নদী,
উপরে বরফ, ব'য়ে যায় নিচে প্রেমধারা নিরবধি।

মিউনে-ওকা নো ও-ইয়োরি

জিজীবিষা

তোমারে যখন দেখেনি তখন মমতা ছিলনা জীবনে,
পেয়েছি তোমারে দীর্ঘায়ু তাই চাই দেবতার চরণে।

ফিউজিওয়ারা নো ইয়োশিতাকা

যাত্রী

আমি পান্থ প্রেমপথে, গতি নিরুদ্দেশ,
যেখানে তোমারে পাব সেথা যাত্রা শেষ।

ওসিকোসি মিস্ৎসুনে

দীপান্তরালে

গভীর নিশীথে ফুরাল তৈল যেমনি আমার দীপে,
হেরি বাতায়নে হাসিমুখে চাঁদ এসেছে পা
টিপে টিপে।

বাশো

দরদ

ছিঁড়িওনা ফুলটিরে।
এসেছে অলিরা, কেঁদে তারা যাবে ফিরে।

বাশো

আশা

বিপুল পাষাণ এল মাঝখানে দোঁহে গেনু দ্বিধা হ'য়ে,
জানি আরবার একটি ধারায় যাব সম্মুখে ব'য়ে।

সুতোকু ইন্

পরিদেবনা

শশিকলা হ'ল বিকলা রাত্রি শেষে,
পান্‌সীটি তার লাগে গিরি-শিরে এসে।
বুদ্বুদ সম অন্তিম বায়
বক্ষে আমার ফুটে ফেটে যায়,
নয়নে অশ্রু ঝরে,
রহিল এ ক্ষোভ, জানিলেনা তুমি, কাঁদি যে
তোমারি তরে!

ওয়াঙ্‌-সেভ্‌-জু

অপেক্ষা

কোষের মাঝারে বন্দী রয়েছে অসি,
ফুঁসে কাল-ফণী যেন গহ্বরে বসি!
আমি সারা নিশি জাগিয়া বসিয়া রই,
তার গুমরণে রণোদ্দীপ্ত হই।
কৃপাণ আমার, রহ ধৈরজ ধরি,
হয়নি সময়, থাক তুমি চুপ করি।
মাহেন্দ্রখন আসিবে অচিরে যবে,
এই হাতে তুমি কোষবিমুক্ত হবে।

অজ্ঞাত

রটনা

ঢাক্ ঢোল্ পিটে সবাই রটনা করে
প্রেম-ফাঁদে ধরা পড়েছি তোমার তরে!
কভু আঁখি মেলি' চাইনি তোমার পানে,
আমি যা' জানিনা, পড়শীরা তাহা জানে!

মিবু নো তাদানি

নিশান্তে

তিমির-কলাপী গুটাল' পক্ষভার;
তারকা খচিত বিপুল পুচ্ছ তার
লুটায়ে গগনে ধীরে ধীরে চলে যায়,
কাঁদি নিশি ভোর অসহ প্রতীক্ষায়।

কাকি-নো-যোতো নো হিতোমারো

কারু-শিল্পিন

হয়েছি যে চিত্রাঙ্ক কর্ব্বুর,
রঙিন তন্তুর
চারু-শিল্প-নিখচিত রুচির বুনানি।
সূক্ষ্ম সূচিকায় হিয়া সূত্রে সূত্রে বিঁধিয়াছ জানি
নিপুণ অঙ্গুলি চালনায়,
তাই তব চিত্রলেখা তিমির প্রচ্ছদে শোভা পায়।

কাওয়ারা নো সাদাইজিউ

উৎসবান্তে

বসন্তের হল অন্ত, আসিল নিদাঘ
প্রক্ষালিয়া উৎসবের পুষ্পল পরাগ,
রাশি রাশি আর্দ্রবাস যত দিক্‌বালা
মেলি' দিল গিরিশিরে। রবিরশ্মি ঢালা
সে আতপে শুষ্ক হয় অমল দুকুল,
গন্ধবহ সমীরণ সৌরভে আকুল!

জি তো তেন্নো

প্রিয়াস্মৃতি

'আরিমা' পাহাড়ে কাঁপে বাঁশঝাড় চঞ্চল সমীরণে,
আমি কেঁপে উঠি তেমনি তোমার স্মৃতিভরা শিহরণে!

দাই-নি-নো সাম্মি

রসিক

ডোবে আর ভাসে ডাহুক্ সরসী জলে,
জানে সে কী আছে হ্রদের অন্তস্তলে।

জেশো

'যথারণ্যং তথা গৃহম্'

জানিনা কোথায় যাব,
কোথা গেলে শান্তি পাব ?

ভাবিলাম বনে গিয়া
বিজনে জুড়াব হিয়া।

শুনি সেথা কম্প্র গাত্রে,
কাঁদে মৃগী অর্দ্ধরাত্রে !

তোসিনারী

গোপন প্রেম

দুর্ব্বিষহ এ জীবনের গুরুভার
আমি কোনো মতে বহিতে পারিনা আর !
একটি দিনের স্মৃতির সুরভি ঢালা
কণ্ঠে আমার দোলে সেই বনমালা।
যতদিন যায় হয় যে বহ্নিময়,
আমি পুড়ে মরি এ দাহ নাহি যে সয় !
ছিঁড়ুক এ মালা, নতুবা যে হাহাকারে
বুঝিবে সবাই, কী আছে কণ্ঠহারে !

শিকিশি নেইশিন্নো

অটুট

ব্রজপাণি দেবরাজ,—যাঁর পদভরে
জাগে ভয়ঙ্কর রব অসীম অম্বরে,
পারেন কভু কি তিনি ভিন্ন করিবারে
প্রেমপাশে বাঁধা দুটি প্রণয়ী-হিয়ারে ?

অজ্ঞাত

অনির্ব্বাণ

বাঁচিবার সাধ একেবারে নাই মোর,
তবু বেঁচে আছি, মরেও মরিনি আজি।
এখনো জোছনা আনে স্বপনের ঘোর,
চাঁদের কিরণে মনোবীণা ওঠে বাজি।

সাগ্নো নো ইন্

পরিমাপ

ওগো প্রিয়তমা, প্রেম-দরিয়ার বহর বুঝিবে যদি,
তার নীল জলে আকণ্ঠ ডুবি' গুণো ঢেউ নিরবধি।

ফিজিওয়ারা নো ওকিকাৎ সে

নাকি কান্না

বিড়াল যখন ধরা পড়ে প্রেম ফাঁদে,
সকরুণ রবে গোড়া থেকে শুধু কাঁদে।

ইয়াহা

সাড়ী

রঙিন্ সাড়ীটি ঘুরায়ে ফিরায়ে
পর' আর ছাড়' যবে,
ওড়ে অঞ্চল ; আমি ভাবি তুমি
প্রজাপতি বুঝি হবে !

অজ্ঞাত

ধর্ম্ম-যোদ্ধা

কোনো শক্তি নাই মোর জানি,
মুক্তি লাগি তবু যুদ্ধ করি,
সম্বল গৈরিক বাসখানি
বৈরাগ্য-কৃপাণ হাতে ধরি।

সাকি নো দেই সো-জো জি-ইয়েন্

সর্ব্বংসহ

প্রেমিক বিড়াল প্রিয়ার কামড় খেয়ে,
অপলক চোখে তারা-পানে রয় চেয়ে।

কিয়ারাই

প্রেম ও জঠরানল

প্রেয়সীর অপেক্ষায় বিফলে বসিয়া বহুক্ষণ,
ক্ষুধিত বিড়াল এবে ইঁদুর ধরিতে দিল মন।

শিকো

কাঠ-ঠোক্‌রা

ফুলে ফুলময় মালঞ্চখানি, এল বসন্তকাল,
কাঠ্‌-ঠোক্‌রার চোখেও পড়ে না! খোঁজে
সে শুক্নো ডাল।

জোশো

নিশান্তে

ঝলকে ঝলকে যবে নব রবি ঢালে তীব্র কর,
কী গভীর বেদনায় ফুলশয্যা ছাড়ে বধূবর!

অজ্ঞাত

ধরা-বন্দিনী

সুরবালিকারা চড়ি' পুষ্পক রথে
এই ধরণীতে নেমেছিল পথ ভুলি'।
আন মেঘমালা হে পবন, সুর পথে
দিওনা তাদের ফিরিবার পথ খুলি।

সোজো-হেনজো

আর্ত্তরব

শুনিনু কাতরকণ্ঠে সারস ডাকিছে শরবনে,
যারে সে ভুলিতে চায় সহসা কি পড়ে তারে মনে?

ৎসুরাউকি

অতীত গৌরব

সহস্র-ধারা শুকায়ে গিয়াছে কবে,
তবু নরনারী মুগ্ধ তাহার স্তবে!

দেইনাগোঁ কিণ্টো

উদাসীন

আগুন লেগেছে বটে ঘরে,
মাঠে তবু ফুল ফোটে ঝরে,
প্রজাপতি সেথা খেলা করে।

হোকুশী

দুর্ভর

ঘাসের ডগায় ভীমরুল্‌ যদি বসে,
পদভরে তার ভঙ্গুর ভিৎ খসে।

বাশো

বনের গহনে 'মোমজি' গিরির মূলে
আমি চলি একা দলিয়া পর্ণরাজি,
বনহরিণীর ক্রন্দনে যাই ভুলি'
আপনার ব্যথা হেমন্ত-সাঁঝে আজি।

সারুমারু দাইয়ু

পরিবর্ত্তন

জানি সে বিশ্বাসহন্তা, তবু ক্ষমি তারে।
কেন হেন উদারতা জেগেছে এবারে?

ফিউজিওয়ারা নো তামা-কো

অপরিচিত

দর্পণে যখন হেরি নিজ ছায়াখানি,
ভাবি, এ বুড়ারে আমি কভু নাহি জানি

হিতোমারো

ছায়ামুগ্ধ

জলার গভীরে কেতকী ফুলের ছায়াখানি ভাসমান,
মহোল্লাসে কি তাই ভেকদল তুলিয়াছে কলতান?

অজ্ঞাত

প্রবেশ নিষেধ

বন্ধু তোমরা এসনা এখন কাছে,
ফুলেরা আমায় যাদু ডোরে বাঁধিয়াছে।

কিয়োরাশি

'ভাল করি পেখন না ভেল'

জোছনা যামিনী ফিরিতেছি পথে একা,
মোর পাশ দিয়া চলি' গেল চকিতে কে?
দেখি দেখি করি হল না যে তারে দেখা,
সহসা চাঁদেরে কালো মেঘ দিল ঢেকে।

মিউরা সাকি শিকিবু

সুন্দরতর

মাঝে মাঝে মেঘ চাঁদের আননে
গুণ্ঠন দেয় টানি,
তাইত দ্বিগুণ মধুময় হয়
চাঁদিমার মুখখানি।

বাশো

বিন্দু মন্দাকিনী

শিশির বিন্দু যবে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে,
মনে হয় পাপ ধুয়ে গেল ধরা পরে।

হোশি

বেপরোয়া

নীড়পুড়ে গেছে? যাক্‌না।
এ পাখীর আছে পাখ্‌না।

হোকুশী

মানুষের হৃদয়

একটি কুসুম আছে এ ধরায় গোপনে শুকায়, ঝরে,
দেখিবে সে ফুল তোমরা সকলে নিজ নিজ অন্তরে।

ওনো নো কামাচি

অপরিবর্ত্তনীয়

আজি হল সাদা সে চিকণ কালো চুল,
সে বিমুখী হিয়া হলনাত অনুকূল।

অজ্ঞাত

শাদ্দল

ভূধর শিখরে শ্যামতৃণরাজিসম
গোপনে লুকান সুকোমল প্রেম মম।
শ্যামলদ্যুতি চিক্কণ মনোলোভা,
কেহ দেখিবেনা এ কচিঘাসের শোভা।

ওনো নো ইওশিকি

অনির্ব্বচনীয়

আমি ত জানি না প্রণয়ের পরিমাপ,
কেমনে বুঝাব কত ভালবাসি তারে ?
অগ্নি-গিরির গহ্বরে কত তাপ
কে বুঝিবে বল হেরিয়া ধূমোদ্‌গারে ?

ফুজিওয়ারা নো সানেকাতা আসোন্

বিতৃষ্ণা

ময়ূর যখন সাপ ধরে ধরে খায়,
পেখমের মোহ এ নয়নে উবে যায়।

বাশো

শ্মশানে

গণিকার পাশে সাধ্বী রাখিল দেহ,
এ শ্মশান ভূমি সবাকার শেষ গেহ ।

বাশো

প্রত্যাখ্যান

পাষাণ প্রাকার-বেষ্টিত তট পরে,
ঢেউগুলি আসি' শতধা ভাঙিয়া মরে।
ওগো নিষ্ঠুর, উন্মদ-উচ্ছাসে
আসি তব কাছে শুধু মরিবার আশে

মিনামোটো নো শিজেযুকি

অজ্ঞাতবাস

ফুল ফোটে যদি পাতার আড়ালে
থাক্ সে গোপনে ফুটিয়া,
লোকচক্ষুর দৃষ্টিতে হায়
পড়িবে শতধা টুটিয়া।

বাশো

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

কবিতা অনুবাদে সিদ্ধহস্ত সুরেন্দ্রনাথ বহু জাপানী কবিতার বঙ্গানুবাদ করেছেন। তন্মধ্য হ'তে পঞ্চাশটি নির্ব্বাচিত ক'রে আমরা উপরে প্রকাশিত করলাম। আপাত-লঘু এই কবিতাগুলির মধ্যে 'বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু'র মত গভীর ও বিস্তৃত ভাব লুক্কাইত আছে—জাপানী শিল্পবৈশিষ্ট্যেরই অনুরূপ। বর্ত্তমান সময়ে বিখ্যাত জাপানী কবি নগুচি বাঙ্গালা দেশে অবস্থান করছেন। আশা করি এ-সময় জাপানী কবিদের কাব্যগত নির্ব্বাচিত এই কবিতাগুলি পাঠকচিত্তে কৌতুহল উদ্রিক্ত ক'রবে। বিঃ সঃ

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২১

প্রত্যূষে যখন প্রমথর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। মুখ হাত পা ধুয়ে এসে একটা চুরুট ধরিয়ে সে সোফায় বস্‌ল। চেয়ে দেখে মনে হল সন্ধ্যার ঘরের দ্বার রুদ্ধই রয়েছে। মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, প্রথম রাত্রিটা যে ভালয় ভালয় কেটে গেল, বাঁচা গেল।

নিজের মানসিক শক্তির দৃঢ়তার প্রতি আস্থার অভাব না থাকলেও এ কথাও প্রমথর অবিদিত ছিলনা যে, সাধু-সঙ্কল্পের দণ্ডাঘাতে বিতাড়িত হয়ে বাসনা-কামনার যে হাঙ্গর-কুমীরগুলো চিত্তের সুগভীর প্রদেশে নিঃশব্দে সঞ্চরণ করছিল তাদের শক্তিও কম প্রবল নয়, এবং সুযোগ লাভ করলে যে-কোনো মুহূর্ত্তে তারা উপরে ভেসে উঠে অনর্থ ঘটাতে পারে। রাত্রির নির্জ্জনতা তেমনিই একটা সুযোগ। সুতরাং প্রথম রাত্রির বিষয়ে তার মনের মধ্যে সামান্য একটু উৎকণ্ঠা লেগে ছিল। সেই আশঙ্কার লগ্ন নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়ে আত্মজয়ের প্রসন্নতায় মনে মনে সে নিজের পিঠ ঠুকে দিয়ে বললে, সাবাশ প্রমথ!

কিন্তু এই সাবাশি সে কেমন ক'রে কোন্ শক্তির বলে অর্জ্জন করলে তা ভেবে তার মন বিস্ময়ে এবং কৌতূহলে আচ্ছন্ন হয়ে এল। তার চিত্তের অবচেতন মহলে যে আভিজাত্য এবং সুনীতিবোধ সুষুপ্ত ছিল তা-ই সহসা জাগ্রত হয়ে উঠল,—না, অস্পর্শনীয় সন্ধ্যার অপরিমেয় চরিত্র-প্রভাব তার মনের সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিলে, তা সে কিছুতেই ভেবে পেলে না। মনে মনে বল্‌লে, দূর হোক্‌গে ছাই, যেমন ক'রেই হোক্ এ যা হয়েছে খুবই ভাল হয়েছে; পাপ ত অনেকই করা গেছে কিন্তু তাই বলে রক্ষক হবার ছল করে ভক্ষক হওয়া,—এত বড় পাপ কিছুতেই করা হবে না। কিন্তু মাত্র বৎসর দেড়েক পূর্ব্বে কাঞ্চনপুরের বিনোদিনীর সম্পর্কে আশ্রিতকে রক্ষা করবার এ নীতিজ্ঞান তার কোথায় ছিল আজ তা একেবারেই মনে পড়ল না। অথচ সেই বিনোদিনী এই কাশীতে তারই মাসহারায় জীবন যাপন করছে। মনে মনে মাথা নেড়ে বারম্বার সে বলতে লাগল, ক্ষেপেছ? কখনই না, কিছুতেই না! রক্ষক হয়ে ভক্ষক হওয়া, সে কিছুতেই হবেনা। তার চেয়ে এবার একবার ভক্ষক হ'য়ে রক্ষক হওয়ার আস্বাদটা উপভোগ করে দেখা যাক্।

খুট্ করে একটা শব্দ হ'ল। প্রমথ চেয়ে দেখলে পাশের ঘরের দরজা খুলে সন্ধ্যা পাল্লা দুটোয় ছিট্‌কানি লাগাচ্ছে।

"এস ঊষা।"

সন্ধ্যা প্রমথর ঘরে প্রবেশ করল। একটা চেয়ার নির্দ্দেশ ক'রে প্রমথ বললে, "বোসো।" সন্ধ্যা উপবেশন করলে জিজ্ঞাসা করলে, "কাল রাত্রে ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি ত?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "না।" তারপর প্রমথর মুখের প্রতি দৃষ্টি উত্তোলিত ক'রে বললে, "আপনার নিশ্চয়ই হয়েছিল?"

"অনুমান করছ? না, দোর খুলে ঘরে এসে দেখে গিয়েছিলে?"

ঈষৎ আরক্তমুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, অনুমানই করছি।"

প্রমথ বললে, "অনুমান ভুল হচ্ছে। আমার ঘুম এত ব্যাঘাতশূন্য হয়েছিল যে, মনে মনে যে, সঙ্কল্প করে রেখে-ছিলাম রাত্রে এক আধবার বারান্দায় বেরিয়ে তোমার ঘরের সামনে পাহারা দিয়ে আস্‌ব, তা একবারও পেরে উঠিনি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার ঘরের বারান্দার দিকের দরজা খুলে দিয়েছ কি?"

কি মনে ক'রে ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে সন্ধ্যা বললে, "দিয়েছি।"

"দিয়েছ, ভালই করেছ। কিন্তু তুমি তা হ'লে আধ মিনিট

বোসো উষা, আমি চট্ ক'রে সেই ফাঁকে একটা কাজ সেরে নিই।" ব'লে তার মাথার বালিসটা নিয়ে সন্ধ্যার ঘরে গিয়ে সন্ধ্যার ও তার মাথার বালিশদুটো পাশাপাশি স্থাপন করে পাশ বালিশটা শয্যার এক পাশে ঠেলে দিলে। সমস্ত পালঙ্কটা যৌথ নিশা-যাপনের একটা কপট পরিচয় বক্ষে ধারণ ক'রে মলিন হ'য়ে উঠল।

প্রমথর পিছনে পিছনে সন্ধ্যা দরজার নিকট এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রমথ তার দিকে ফিরতেই সে বললে, "এ কিন্তু আমার ভাল লাগে না প্রমথ দাদা।"

"কি ভাল লাগে না?"

"এই এ-রকম ছল চাতুরী।"

প্রমথ এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে ঈষৎ গভীর স্বরে বল্‌লে, "কিন্তু এ ত একমাত্র তোমার জন্যেই করছি উষা! নইলে আমারই কি এই বিনা শাঁসের খোসা চিবুতে ভাল লাগে? সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক যদি একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে না পার, একটু মাত্র মোহও যদি মনের মধ্যে লেগে থাকে, তা হলে এ-রকম ছোট-বড় কপট আচরণের আশ্রয় নিতেই হবে। এই যে তুমি এখন থেকে আমাকে প্রমথদাদা ব'লে ডাকতে আরম্ভ করলে, এও ত তাই-ই। নইলে আমি আর তোমার দাদা কোন হিসেবে বল? তা ছাড়া, এর দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত কুফলই ফল্‌বে। কাশীর তৃতীয়-ব্যক্তি-হীন বাড়িতে আমাকে দাদা ব'লে সম্বোধন করলে সকলেই মনে মনে তোমাকে যা ব'লে স্থির ক'রে নেবে আসলে তুমি ত সে ঘৃণিত বস্তু নও, তাই তার মিথ্যা কলঙ্ক থেকে আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই। চল, ও ঘরে গিয়ে বসা যাক্।"

সোফায় উপবেশন ক'রে একটা চুরুট ধরিয়ে প্রমথ বল্‌লে "এ অবস্থায় একমাত্র যে পরিচয়ে তোমার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে, লোকে সহজ ভাবে সেই পরিচয়টাই ধরে নিচ্ছে। বিলাসপুর ষ্টেশনের সেই স্ত্রীলোকটির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু অত-বড় ধূর্ত্ত মেয়েমানুষ মানদা মাসীর কথা ভাব; সে তোমাকে আমার স্ত্রী বলে মনে করলে; শঙ্কর পাণ্ডা তোমার মুখের মধ্যে কি দেখতে পেলে জানিনে, কিন্তু জিজ্ঞাসা না ক'রেই একেবারে আমার গোত্র ধ'রে তোমার সঙ্কল্প করিয়ে দিলে। স্ত্রীলোক সঙ্গে ক'রে তার কাছে যাওয়া এই আমার প্রথম নয়, কিন্তু এ রকম সে কোনো বারই ত করে নি। সকলেই তোমাকে বিবাহিত স্ত্রীর মর্য্যাদা দিচ্ছে উষা, আমি কেমন ক'রে তোমাকে সেখানে থেকে নামিয়ে আনি? আমার না হ'লেও, তুমি একজনের বিবাহিত স্ত্রী ত নিশ্চয়ই—কিন্তু রক্ষিতা তুমি কারোই নও। কিন্তু এ তুমি নিশ্চয় জেনো, তুমি যদি আমাকে প্রমথদাদা ব'লে ডাকতে আরম্ভ কর তা হলে কেউ তোমাকে তা ছাড়া আর কিছু মনে করবে না। এখন যারা তোমাকে অন্তরে বাইরে শ্রদ্ধা করছে সম্মান করছে, সেই দাস-দাসী বামুন-চাকর থেকে আরম্ভ করে মানদা মাসী শঙ্কর পাণ্ডা পর্য্যন্ত সকলেই তখন মনে মনে তোমাকে করুণা করবে, হয়ত একটু ঘৃণাও করবে। তুমি আমার জীবনে মান্য অতিথি উষা, তোমার এ অকারণ অমর্য্যাদা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তা যদি পারতাম তাহ'লে কাল সমস্ত দিন নৌকোয় না কাটিয়ে তোমাকে নিয়ে সোজাসুজি মানদা মাসীর বাড়িতেই উঠতাম, এত হাঙ্গামার মধ্যে যেতাম না।"

প্রমথর কথার ভিতর কোন্ এক মুহূর্তে অতর্কিতে সন্ধ্যার চোখের কোণে অশ্রু সঞ্চিত হয়েছিল, হঠাৎ ঝরঝর ক'রে ঝ'রে পড়ল। বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে চক্ষু মুছে দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সে বললে, "সত্যি! কি বিব্রতই না আমি আপনাকে করেছি!"

সন্ধ্যার কথা শুনে এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক থেকে প্রমথ বল্‌লে, "না, এ সত্যি নয়। কিন্তু সত্যি যা, তা যদি সহজে বিশ্বাস-যোগ্য না হয় তাহ'লে সে কথা কাউকে বল্‌তে নেই, মনে মনে রাখতে হয়—এ হচ্ছে শাস্ত্রের উপদেশ। কিন্তু তুমি কাঁদলে কেন উষা? আমি ত' তোমার মনে কষ্ট দেবার মতো কোনো কথা বলিনি। তবে অভিধানে যা লেখে তাই থেকে যদি হাঙ্গামার অর্থ বিব্রত ক'রে থাক তাহ'লে ভুল করেছ।"

বিষণ্ণ মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "বিব্রত অর্থে আপনি যে হাঙ্গামা শব্দ ব্যবহার করেননি তা আমি জানি। আমার সে দুঃখ নয়; আমার দুঃখ অন্য।"

"কি তোমার দুঃখ?"

একটু ইতস্ততঃ করে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আপনার আশ্রয়ে আমার নিজের যথার্থ পরিচয়ে বাস করবার সুবিধে হ'ল না—এই আমার দুঃখ।"

ঈষৎ মাথা নেড়ে প্রমথ বল্‌লে, "বুঝেচি। আমার নিজের দিক থেকে তাতে বিশেষ কিছু আপত্তি নেই উষা, কারণ সমাজকে আমি বহুদিন থেকেই বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে আস্‌ছি, কিন্তু তোমার যথার্থ পরিচয়ে এ বাড়িতে বাস করা তোমার পক্ষে সুবিধের হবে কি-না সেইটেই হচ্ছে কথা। আমার মনে হয় এই কথাটা স্থির করবার জন্যে আগে একটা পরীক্ষা হ'য়ে যাওয়া ভাল।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কি পরীক্ষা?"

প্রমথ বল্‌লে, "মাথার বালিস নিয়ে উপস্থিত যখন কথাটা উঠেছে তখন সেইটে দিয়েই পরীক্ষা হোক। আমার মুখ ধোয়া-টোয়া হ'য়ে গেছে, মিনিট কুড়ি পঁচিশ আমি মর্ণি-ওয়াক্ ক'রে আসি। তুমি ততক্ষণে মুখ-হাত-পা ধুয়ে চা খাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে নাও, আর তার আগে আমাদের মাথার বালিস দুটো, প্রয়োজন বোধ করলে বিছানার অন্যান্য জিনিসও, এ দুটো ঘরের এমন যায়গায় এমন ভাবে রেখে দাও যাতে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রাত্রে তুমি আর আমি পৃথক ঘরে পৃথক শয্যায় শুয়েছিলাম, সুতরাং খুব সম্ভবতঃ আমরা স্বামী-স্ত্রী নই। তারপর সুবিধা মত একদিন মানদা মাসীর কাছে তোমার জীবন-বৃত্তান্ত খুলে বোলো। তা হ'লেই সমস্ত জিনিসটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে। কেমন?"

সন্ধ্যা শুধু একবার প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, কিছু বল্‌লে না।

পাশের ঘরে গিয়ে ছড়ি নিয়ে ফিরে এসে প্রমথ বল্‌লে, "উষা, তয়েরী থেকো, বেড়িয়ে এসে একসঙ্গে চা খাব।" ব'লে আর একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রমথ যখন ফিরে এল তখন সন্ধ্যা বাথরুমে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে সন্ধ্যার ঘরে গিয়ে দেখলে শয্যার অবস্থা সে যেমন করে রেখেছিল ঠিক তাই আছে, সন্ধ্যা স্পর্শ পর্য্যন্ত করেনি। মনে মনে একটু হাস্য ক'রে নিজের ঘরে এসে বস্‌ল। রাস্তা থেকে একটা খবরের কাগজ কিনে এনেছিল, তাইতে মনোনিবেশ করলে।

মিনিট পাঁচেক পরে বাথরুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে সন্ধ্যা প্রমথর ঘরে উঁকি মেরে দেখলে প্রমথ ফিরে এসেছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার চা আর খাবার আনতে বলব?"

প্রমথ বল্‌লে, "বল। কিন্তু শুধু আমার নয়, তোমারও।"

"আচ্ছা।" বলে সন্ধ্যা বেরিয়ে গেল।

কিন্তু চায়ের জন্য সন্ধ্যার বিশেষ কিছুই ব্যবস্থা করতে হ'লনা, শুনতে পাওয়া গেল নীচে মানদা বিষম তর্জ্জন করছে, "আটটা বাজতে চলল, এখনো চা আর খাবার তৈরী হল না; তবু না যদি কাল সমস্ত বলে ক'য়ে দেখিয়ে শুনিয়ে যেতুম! বিরিঞ্চি, শীগগির ওপরের বারান্দায় টেবিল চেয়ার পেতে আয়!"

উপরে এসে সন্ধ্যার ঘরে প্রবেশ করে মানদা চিৎকার করে উঠল—"দেখেচ! কাণ্ড দেখেচ! বাসি বিছানা তেমনি প'ড়ে আছে, এখন পর্য্যন্ত হাত পড়েনি! আর দুটো দিন দেখব, তারপর ঝেঁটিয়ে সব বিদেয় ক'রে একেবারে নতুন সেট্ আনব। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব!"

প্রমথর ঘরে মানদা প্রবেশ করতে প্রমথ বললে, "কি মাসী, সকাল বেলা এসে একেবারে রণ-মূর্ত্তি ধরলে কেন?"

মৃদু হেসে চাপা গলায় মানদা বললে, "রণমূর্ত্তি কি সাধে ধরেচি, দু-দিন এমনি করে তম্বি করলে সবগুলো সায়েস্তা হ'য়ে যাবে।" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ত বউমা?"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না।"

"রাত্রে বেশ ঘুম হয়েছিল?"

"হয়েছিল।"

কামিনী চা আর খাবার নিয়ে আস্‌ছিল, দেখ্‌তে পেয়ে মানদা বল্‌লে, "চা দিয়েছে, যাও তোমরা খেতে যাও।"

চা খেতে খেতে প্রমথ বল্‌লে, "তোমার পরীক্ষার কি হ'ল উষা? পরীক্ষায় একেবারে হাজিরই হ'লে না? পরীক্ষাটা একটু গোলমেলে ঠেক্‌ল না-কি?"

এ-গুলো প্রশ্নের কোনোটা'রই উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "আমরা এখানে কতদিন থাক্‌ব?"

"যতদিন তোমার ইচ্ছে।"

"কলকাতায় কবে যাব?"

"যে দিন তুমি বল্‌বে।"

"লক্ষ্ণৌ যাবেন না?"

"বল ত যাই। সেখানে ত আমার নিজের বাড়িই রয়েছে। কিন্তু কাশী কি তোমার ভাল লাগছে না উষা?"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না, খারাপও লাগছে না।"

প্রমথ বল্‌লে, "তবে কাশীতেই দিন কতক থাকা যাক। থাকতে থাকতে দেখবে কাশী নিতান্ত মন্দ জায়গা নয়। কিন্তু তোমার মন সহজ ক'রে নাও উষা, নইলে কোনো জায়গাই ভাল লাগবে না। নিজের যথার্থ পরিচয়ে এ বাড়িতে বাস করতেই যদি তোমার ভাল লাগে তাহ'লে তাই না হয় আরম্ভ কর। আজ থেকে রাত্রে তোমার ঘরের মেজেয় কামিনী যাতে শোয় সে ব্যবস্থা ক'রে দেব। কেমন, তা হ'লেই হবে ত?"

সন্ধ্যা মুহূর্ত্তের জন্য প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে "না, কামিনীর শোবার দরকার নেই, আমি একাই শোব।"

হর্ষোৎফুল্লমুখে প্রমথ বললে, "এইত বীরত্বব্যঞ্জক কথা! না হয় কিছুদিনের জন্যে আমাকে পাতানো স্বামীত্বে বরণই কর না উষা? বিপদে পড়লে শত্রুকেও সেলাম করতে হয়, তোমার এ বিপদের ত কথাই নেই। এমন ত কত মেয়ে দাদা, কাকা, মেসো, পিসে পাতাচ্ছে; তেমন প্রয়োজন হলে স্বামী পাতানোতেই বা দোষ কি? বিয়ের আগে ত খেলাঘরে কত মেয়ে সে সম্পর্কও পাতায়। তোমারও এ খেলাঘরই। তারপর সৌভাগ্যক্রমে যেদিন আসল স্বামী তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আস্‌বে সে দিন খেলাঘরের এ পাতানো স্বামীকে ফেলে গেলেই হবে!" বলে প্রমথ হো হো ক'রে হাসতে লাগ্‌ল।

পাতানো স্বামীত্বের এই বিচিত্র তত্ত্ব শুনে সন্ধ্যার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। মনে হল এই যেন তার ভবিষ্য জীবনের আভাস। প্রমথর ঘর তার খেলাঘর, এবং সেই খেলাঘরের ভিতরে প্রমথ তার পাতানো স্বামী,—এই নিয়েই বাকি জীবনটা মিথ্যার অভিনয় করে কাটাতে হবে। তারপর একদিন সৌভাগ্যক্রমে আসল স্বামী এসে উপস্থিত হবেন?—হায় রে! সে সৌভাগ্য চাচ্ছেই বা কে, আর পাচ্ছেই বা কে! একটা মর্ম্মন্তুদ নৈরাশ্যে সন্ধ্যার হৃদয় উদাস হয়ে গেল। চখের সম্মুখে শরৎ-প্রভাতের উজ্জ্বল আলোক হয়ে গেল স্তিমিত।

"উষা!"

সন্ধ্যা তার চিন্তা-স্বপ্ন থেকে সহসা জাগ্রত হয়ে বললে, "আজ্ঞে"?

"অলস হয়ে বাড়ী ব'সে আর কি হবে?—একটু বেড়াতে যাবে?"

"কোথায়?"

"এম্‌নি,—পায়ে পায়ে পথে পথে।"

দুঃখ মনস্তাপের মধ্যে প্রস্তাবটা সন্ধ্যার নিতান্ত মন্দ লাগলনা; বললে, "চলুন।"

চা খাওয়া শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, উভয়ে উঠে পড়ল। তারপর বেশ ভূষা পরিবর্ত্তিত ক'রে পথে বেরিয়ে পড়ে উভয়ে পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করলে। যেতে যেতে প্রমথ বললে, "উষা, আমাদের জীবনটা একটা অভিনয়।"

সন্ধ্যা বললে, "সত্যি।"

প্রমথ বললে, "আমার সঙ্গে তোমার যে জীবন তাও অভিনয়, আবার প্রিয়লালের সঙ্গে তোমার যে জীবন হবে, তাও হবে অভিনয়। শুধু আমার সঙ্গে হচ্ছে ট্র্যাজেডি, আর তার সঙ্গে হবে কমেডি। বল ঠিক কি না?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না। নীরবে চলতে লাগল।

"উষা!"

"আজ্ঞে?"

"ব্যাপার কি বল দেখি? একবার মাত্র ডেকে, আর আমাকে প্রমথ দাদা ব'লে ডাক্‌ছনা! কামিনীকে ঘরে শোয়াতে রাজি হ'লে না। শেষ পর্য্যন্ত নকল সম্পর্ক পাতাবারই মৎলব নাকি?"

সন্ধ্যা তেমনি নীরবে চলতে লাগল। কোনো কথা বললে না।

প্রমথ সহাস্যমুখে বললে, "তোমার কোনো ভয় নেই উষা, যদিই সে সম্পর্ক পাতাও, তার কপট অভিনয় চলবে একমাত্র মানদা মাসীদের দলের সম্মুখে; তোমার আমার মধ্যে চল্‌বে বন্ধুর সহিত বন্ধুর অকপট অভিনয়। তোমার ভয় নেই।"

এ কথাতেও সন্ধ্যা কোনো কথা কইলে না, নতমুখে প্রমথর পাশে পাশে চলতে লাগল। আধ মাইলটাক পথ অতিক্রম করবার পর একটা বড় বাদ্যযন্ত্রের দোকানের সম্মুখে তারা উপনীত হল।

প্রমথ বললে, "চল উষা, এই দোকান থেকে দু একটা যন্ত্র কেনা যাক্‌।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "কেন, কি হবে?"

"অবশ্য, বাজানো হবে।"

"কে বাজাবে?"

"ধর, কখনো কখনো আমিও বাজাবো।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি বাজাতে পারেন?"

গম্ভীর মুখে প্রমথ বল্‌লে, "পারিনে, কিন্তু বাজাই।"

উত্তর শুনে সন্ধ্যার মুখে ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হল; বল্‌লে, "কিন্তু আমার জন্যে যদি হয়, তা হলে এ-সব কেনবার কোনো দরকার নেই। মিছে কতকগুলো টাকা নষ্ট করবেন না।"

প্রমথ বললে, "মিছে কেন বলছ উষা? আর নষ্টই বা কেন বলছ? আমার ত' মনে হয় দুঃখ, কষ্ট, মনস্তাপ ভুলে থাকবার পক্ষে সঙ্গীতের চেয়ে বড় বস্তু আর কিছু নেই। তোমার নিঃসঙ্গ বৈচিত্র্যহীন জীবনে সঙ্গীত একটা বড় রকমের অবলম্বন হবে। লক্ষ্মীটি এস, অবুঝ হোয়োনা।" বলে প্রমথ দোকানের দিকে অগ্রসর হ'ল। অগত্যা সন্ধ্যাকে অনুসরণ করতেই হ'ল।

বেছে বেছে প্রমথ একটা হারমোনিয়ম, একটা এসরাজ, একটা সেতার এবং এক সেট বাঁয়া তবলা কিন্‌লে। পরীক্ষা করবার সময় সন্ধ্যার হাতের দুই-একটা টান এবং দু-চারটে ঝঙ্কার থেকেই প্রমথ তার নৈপুণ্যের পরিচয় পেলে। সকাল সন্ধ্যার সঙ্গীতমুখর গৃহের কথা মনে মনে কল্পনা ক'রে খুসীতে মন ভ'রে উঠল।

দাম হল সবশুদ্ধ দু শ' পঁচাশী টাকা। দোকানদারকে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "বেনারস ব্যাঙ্কের উপর চেক লিখে দিলে চলবে?"

দোকানদার একটু ইতস্ততঃ করছে দেখে একজন কর্ম্মচারী ত্বরিত পদে কাছে এসে কানে কানে কি বলতেই দোকানদার প্রসন্ন নিশ্চিন্ত মুখে বললে, "চলবে।" তারপর ক্যাশ মেমো সই ক'রে প্রমথর হাতে দিয়ে বললে, "বছর খানেক আগে আমরা যে আপনার জন্যে সাড়ে তিন শ টাকা দামের একটা বক্স হারমোনিয়ম ক'রে দিয়েছিলাম, সেটা কেমন বাজচে?"

প্রমথ বললে, "তা ত ঠিক বলতে পারিনে, যার কাছে আছে সেই বলতে পারে। সম্ভবতঃ ভালই বাজছে। দেখুন, আমাকে আর একটা সেই রকম হারমোনিয়ম করিয়ে দিন। আমি স্বতন্ত্র একটা চেকে পঞ্চাশ টাকা আগাম দিয়ে যাচ্ছি।"

দোকানদার বললে, "আগাম আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। আপনি শুধু আমাকে আপনার ঠিকানাটা লিখে দিন। হারমোনিয়ম হ'লেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো।"

গাড়ীতে উঠে সন্ধ্যা বললে, "এত দাম দিয়ে আবার একটা হারমোনিয়ম করতে দিলেন কেন? ও অর্ডারটা ক্যান্‌সেল করিয়ে দিন।"

প্রমথ স্মিতমুখে বললে, "কিন্তু ও হারমোনিয়মটাও যে তোমারই জন্যে করাচ্ছি এ মনে করছ কিসের জোরে উষা?"

এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন, সুতরাং চুপ করতেই হ'ল।

অপরাহ্ণে অনেক সাধ্য সাধনা উপরোধ অনুরোধ ক'রে প্রমথ সন্ধ্যাকে এসরাজ বাজাতে রাজি করালে। সোফার উপর বসে সন্ধ্যা একটা ভীমপলশ্রীর আলাপ করছিল, আর প্রমথ তন্ময় হ'য়ে মুদিতনেত্রে ইজিচেয়ারে শুয়ে তাই শুন্‌ছিল, এমন সময়ে কামিনী এসে ডাক্‌লে, "বাবা!

চক্ষু উন্মীলিত ক'রে বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে প্রমথ বললে, "কি"?

"একজন লোক দুটো টেরাঙ্কো নিয়ে এসেছে, নাম বললে শোভরাজ।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রমথর মুখের বিরক্তির ভাব অপসৃত হল; বললে, "শোভরাজ?" একটু চিন্তা করে বললে, "এই খানেই নিয়ে এস। বিরিঞ্চিকে বল বাক্স দুটো এখানে তুলে আনবে।"

ভীমপলশ্রীর সুমধুর রেশ শূন্যপথে তখনো সম্পূর্ণ বিলীন হয়নি, ছড়টা এস্রাজের গায়ে সংলগ্ন করতে করতে সন্ধ্যা বললে, "আমি তা হ'লে ও ঘরে গিয়ে বসি?"

একটু অন্যমনস্কভাবে প্রমথ বললে, "তুমি?—আচ্ছা, তাই না হয় একটু বোসো।"

ক্ষণকাল পরে শোভরাজ এসে তার ট্রঙ্ক দুটি খুলে টেবিলের উপর কুড়ি পঁচিশ খানা জড়োয়া অলঙ্কার সাজিয়ে ফেললে। হীরা, মুক্তা, চুনি, পান্নার বিচিত্র প্রভায় টেবিল-খানা অপরূপ রূপ ধারণ করলে।

বহুক্ষণ ধ'রে পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা ক'রে প্রমথ তা থেকে

পাঁচখানা অলঙ্কার নির্ব্বাচিত করে নিয়ে সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'ল। বললে, "উষা, এগুলো তোমার জন্যে নিলাম।"

বিরক্তি-বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে সন্ধ্যা বললে, "কেন নিলেন? এর ত' আমার কোনো দরকার নেই! এ আপনি ফিরিয়ে দিন।"

প্রমথ বললে, "আচ্ছা, ফিরিয়ে না হয় দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা উষা, তুমি শুধু তোমার নিজের দরকারটাই দেখচ,—আমার দরকার দেখচনা।"

প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আপনার এতে কি দরকার?"

প্রমথ বললে, "তোমাকে আমি আমার বাড়িতে যে পদে প্রতিষ্ঠিত করেছি তার উপযুক্ত সাজ সজ্জা অলঙ্কার দেওয়ার আমার একটা দায়িত্ব আছে। তার জন্যে তোমার কাছে আমার কোনো জবাবদিহি হয়ত নেই, কিন্তু তুমি ছাড়া আর সকলেরই কাছে আছে।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বললে, "এই শুধু আপনার দরকার?"

প্রমথ বললে, "এ ছাড়া আর যদি কিছু থাকে ত' তা জেনে তোমার প্রয়োজন কি? যা বললাম তাই কি যথেষ্ট নয়?"

বিষণ্ণ গভীরকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "তা হলে ফিরিয়ে কাজ নেই, রাখুন।"

প্রমথ বললে, "আর একটা উৎপীড়ন তোমার ওপর করতে হবে উষা।"

"কি বলুন।"

"নিত্য ব্যবহারের মতো তোমার জন্যে এক সেট সোনার গহনা শোভরাজকে অর্ডার দোবো বলেছি,—তার মাপ দিতে হবে।"

"কি ক'রে দোবো বলুন।"

"শোভরাজের কাছে নানা ফাঁদের মাপ আছে, ও-ই মাপ নেবে।"

"তা হ'লে ও-র কাছে যেতে হবে কি?"

"গেলেই ভাল হয়।"

"চলুন, যাই।"

শোভরাজ সন্ধ্যার অলঙ্কারের মাপ আর জড়োয়া গহনাগুলোর রসিদ নিয়ে মনোনয়নের জন্য সেগুলো রেখে চ'লে গেল।

প্রমথ বল্‌লে, "গহনাগুলো একবার পরে দেখবে না উষা?"

সন্ধ্যা বল্‌লে "বলেন ত পরি।"

সাগ্রহে প্রমথ বল্‌লে, "পর-না একবার।"

"আচ্ছা আপনি বসুন। আমি পরে আস্‌ছি।"

পাশের ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা হাতে পরলে চুনির চুড়ি আর হীরার ব্রেস্‌লেট্, গলায় পরলে মুক্তার হার, কানে পরলে হীরার দুল, আঙ্গুলে পরলে হীরার আংটি। কি মনে ভেবে আর্সির সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াল; স্তব্ধ হ'য়ে দর্পণের মধ্যে নিজ মূর্ত্তি দেখতে দেখতে গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তারপর বস্ত্রাঞ্চলে চোখের জল ভাল ক'রে মুছে প্রমথর সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'ল।

নির্নিমেষ নেত্রে ক্ষণকাল সন্ধ্যার দিকে চেয়ে থেকে প্রমথ বল্‌লে, "উষা, গয়না নিয়ে তোমাকে উত্যক্ত ক'রে অপরাধ হয় ত কিছু করেছি, কিন্তু তা না করলে আরো কত বড় অপরাধ করতাম জান? প্রতিমার অঙ্গে রঙ ফলিয়ে তারপর সাজ না পরালে কারিগরের যে অপরাধ হয়, আমার সেই অপরাধ হোত। বিশ্বাস না হয়, একবার একটা আরসির সামনে গিয়ে দেখে এস।"

কোনো কথা না বলে সন্ধ্যা নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

"রাগ করেছ উষা?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "না।"

"অভিমান হয়েছে?"

একটুখানি ম্লান হাসি হেসে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, হয় নি।"

"তা যদি না হয়ে থাকে তা হ'লে তখনকার শেষ-না-করা ভীমপলশ্রীটা আবার আরম্ভ কর-না উষা, অবিশ্যি তোমাদের মতে ভীমপলশ্রীর লগ্ন যদি এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে না থাকে।" বলে প্রমথ এসরাজটা সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে দিলে।

এসরাজটা হাতে তুলে নিয়ে সন্ধ্যা বললে "গয়নাগুলো এখন খুলে রেখে দোবো?"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রমথ বললে, "থাক্ না

একটু, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। বিশেষ আপত্তি আছে কি?"

"না, তা নেই।" ব'লে সন্ধ্যা এস্রাজ নিয়ে সোফার উপর উঠে বস্ল। তারপর ছড় দিয়ে তারের উপর একটা টান দিলে, নি সা গা মা পা—

এর পর দিন দুই-তিন ধরে অবিশ্রান্ত নানাবিধ দ্রব্যের আমদানিতে গৃহ পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠতে লাগল। লোহার আলমারি, কাঠের আলমারি, কাঠের আলনা, ক্যাশ বক্স, গহনার বাক্স, তাঁতের শাড়ী, রেশমি শাড়ী, ব্লাউস্ পীস, সেলাই কল, গ্রামোফোন, প্রসাধন সামগ্রী,—জিনিষপত্রের একটা যেন হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ফিরে ফিরে দেখেও, কিন্তু কিছু বলে না।

এক সময়ে তাকে কাছে পেয়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "বিরক্ত হচ্ছ উষা?"

সন্ধ্যা বল্লে, "বিরক্ত কেন হব?"

"এই সব জিনিষ-পত্র আস্ছে ব'লে? কই, আর কিছু প্রতিবাদ করছ না ত?"

সন্ধ্যা একটু চুপ করে রইল, তারপর মৃদুস্বরে বল্লে "আপনার বাড়ি আপনি জিনিষ পত্রে পূর্ণ করছেন, আমি তাতে প্রতিবাদ করব কেন?"

গভীর স্বরে প্রমথ বললে, "সে কথা সত্যি উষা। যদিও এ সমস্তই আমি তোমার জন্যে করছি, কিন্তু বস্তুত এ-সব কিছুই তোমার নয়। কোনো দিন যদি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে পাইক বরকন্দাজ এসে হাজির হয়, সেদিন তখনি এ খেলাঘর ভেঙ্গে দিয়ে এর সমস্ত জিনিষই পিছনে ফেলে চলে যাবে। যে ব্যক্তি এ খেলাঘর গড়বার জন্যে উন্মত্ত হয়েছিল, যাবার তাড়াতাড়িতে হয় ত তার দিকেও একবার ফিরে চাইবার কথা মনে পড়বে না।"

সন্ধ্যা নিমেষের জন্য প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে নতমুখে বল্লে, "আমাকে কি এমনই অকৃতজ্ঞ মনে করেন?"

"অকৃতজ্ঞ কেন উষা? পাতানো সম্পর্ক ত বেশি দূর পর্য্যন্ত শেকড় ফেল্তে পারে না—তাই টান দিলে সহজেই সমূলে উপড়ে আসে। কিন্তু সে যাই হোক্—সংসারে ত কোনো জিনিষই চিরদিন থাকে না, শেষ পর্য্যন্ত ভেঙে যায়ই। আমাদের এ খেলাঘর যত দিন না ভাঙ্গচে ততদিন এর প্রতি একটু মন দাও না?"

"কি করতে হবে বলুন?"

প্রমথ হেসে ফেল্লে; বল্লে "বেশ! আমাকে যদি বলে দিতে হয়, তা হ'লে আমাকেই ত মন দিতে হবে। ক্যাশ বাক্সর টাকা-কড়ি থেকে এক পয়সাও এ পর্য্যন্ত খরচ করেছ কি?"

সন্ধ্যার মুখে অতি ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে; বল্লে, "করিনি, কিন্তু আজ করব।"

"কোরো।"

প্রমথর মুখের দিকে একবার দৃষ্টি উত্তোলিত করে সন্ধ্যা সভয়ে জিজ্ঞসা করলে "একটা কথা বল্ব?"

"বল না?"

"এখান থেকে শুনে ঠিক তৃপ্তি হয় না, আজ সন্ধ্যাবেলা ভাগবত পাঠ শুনতে যাব?"

প্রমথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "নিশ্চয় যাবে। এর জন্যে আবার অনুমতি চাচ্ছ কেন? এ ধারণা তুমি মন থেকে মুছে ফেল উষা, যে, তুমি আমার বাড়িতে বন্দিনী। তুমি আমার বন্ধু, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তা ছাড়া ভাগবত-পাঠ শুনতে যাওয়া ত পুণ্যের কাজ। নিশ্চয় যাবে।"

"আপনি সঙ্গে যাবেন ত?"

সহাস্যমুখে প্রমথ বললে, "ঐটি পারবনা। প্রথমতঃ ধর্ম্মের বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার হাঁফ ধরে, দ্বিতীয়তঃ চড়া গলায় কড়া কীর্ত্তন আধঘণ্টার বেশি আমি শুনতে পারিনে, মাথা ধরে। এ ত খুব কাছেই, বলতে গেলে পাশের বাড়ি। তুমি কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। মেয়েদের বসবার জায়গায় বোসো, কোনো অসুবিধে হবেনা।"

সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা।" তারপর প্রমথর মুখের দিকে চেয়ে বললে, "আপনি বাড়িতে থাকবেন?"

"হ্যাঁ, বন্ধুহীন একা!"

সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; বললে, "এর জন্যে আপনার খাওয়া দাওয়ার দেরি হয়ে যাবে না ত?"

প্রমথ বললে, "কিছু দেরি হবে না, তুমি এলে দুজনে এক সঙ্গে খাব। আর, 'দাওয়া' ত আলাদা আলাদা ঘরে, কিন্তু তার আগে একটা বেহাগের আলাপ শুনিয়ে দিতে হবে।"

আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "দোবো।"

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

না-বলা

শ্রীমিহিরকুমার বসু

অনেক কথাই হ'ল বলা,
এবার যে না-বলার পালা ;
অশ্রুজলের আবেগ নিয়ে
নীরবে আজ গাঁথব মালা।
অনাগতের আভাস বাজে
আকাশ মাঝে,
তুচ্ছ বড় সকল কাজে,
তাহার তরে মর্ম্মতলে
সাজিয়ে আছি অর্ঘ্যডালা।

অশ্রু কত অলক্ষিতে
পড়্‌ল ঝ'রে ধূলির 'পরে,
কতই কথা ব্যর্থতাতে
হৃদয় মাঝে গুম্‌রে মরে।
তীক্ষ্ণফলা ছুরীর মতো
মর্ম্মাহত
করলে হিয়া, বেদন কত ;
খুঁজতে গিয়ে তা'দের, ভাষা
থম্‌কে দাঁড়ায় লজ্জাভরে।

আজকে গভীর নিরবতায়
ডুবিয়ে দেব কাজের কথা,
অনাগতের আভাস হেরি'
আজকে থাকুক চঞ্চলতা।
যেই বেদনার হা হা স্বরে
অশ্রু ঝরে,
অন্ধকারে একলা ঘরে
পরাণ আমার উঠুক ভ'রে
বক্ষে ধরি সেই সে ব্যথা।

জর্জ্জ টমাস

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, পি আর এস

আয়র্লণ্ডের অন্তঃপাতী টিপেরারী প্রদেশের Roscrea সহরে ১৭৫৬ হইতে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে জর্জ্জ টমাসের জন্ম

বেগম সমরু

হইয়াছিল। তাঁহার পিতামাতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, বাল্যে পুত্রের শিক্ষা বিধানের কোন ব্যবস্থা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তখনকার দিনে অবশ্য ইউরোপে এখনকার মত শিক্ষার প্রসার হয় নাই, টমাস সমাজের যে স্তরে জন্মিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন মোটেই ছিল না। উদরান্নের জন্য নিতান্ত অল্পবয়সে টমাস নাবিকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৭৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ এডমিরাল সার এডওয়ার্ড হিউয়েজ পরিচালিত নৌবহরান্তর্গত একটি রণপোতে মাল্লা অথবা সাধারণ গোলন্দাজরূপে টমাস সর্ব্বপ্রথম এদেশে আসেন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি 'কোয়ার্টার মাষ্টার' ছিলেন; সে কথা কিন্তু সত্য নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঠিক সেই সময় এডমিরাল সাফ্রঁা পরিচালিত ফরাসী নৌবিহারে তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী পেঁরও নৌসৈন্যদলের সার্জ্জেণ্টরূপে উপস্থিত ছিলেন। আরও এক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মিল দেখা যায়;—তাঁহারা দুইজনে একই বর্ষে (১৭৮১ খৃঃ) নিজ নিজ জাহাজ হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া দেশীয় দরবারে ভাগ্যান্বেষণে গমন করিয়াছিলেন। তখন এদেশে ইউরোপীয় সমরব্যবসায়ীর বড় আদর। পরবর্ত্তী প্রায় পাঁচবৎসর কাল টমাস কর্ণাটক প্রদেশের বিভিন্ন সর্দ্দারগণের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের এই সময়ের কোন কথা জানা যায় না। ইহার পর তিনি কিছুকাল নিজাম সরকারে গোলন্দাজরূপে কর্ম্মনিরত ছিলেন। কিন্তু সে কার্য্য বেশীদিন ভাল না লাগায় অনন্তর তিনি হিন্দুস্থানে ভাগ্যপরীক্ষা করিতে গমন করেন। তখনও দিল্লীতে মারাঠা আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই; তখনও দি বইন তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী সংগঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন নাই; হিন্দুস্থানে তখনও শিক্ষিত সৈন্যদল বলিতে বেগম সমরুর ব্রিগেড বুঝাইত। টমাস বেগমের কর্ম্মে প্রবেশ করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই নিজগুণে তাঁহার স্নেহপ্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বেগম তাঁহাকে স্বীয় শরীররক্ষীদলের নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন এবং মারিয়া নাম্নী তাঁহার আশ্রিতা জনৈকা বর্ণসঙ্কর জাতীয়া ফরাসী রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন, (২৭।৫।১৭৮৭)। পাদ্রি গ্রেগরিও গুরগাঁও সহর হইতে চারি মাইল দূরে বেগমের জায়গীর বাদসাপুরে সংঘটিত এই বিবাহে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

বেগমের কর্ম্মনিরত থাকা কালে টমাস গোকুলগড়ের যুদ্ধে সবিশেষ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। ফলতঃ বেগমের ও তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সাহস ও তৎপরতার জন্যই মোগলসেনা এযুদ্ধে পরাজয় ও স্বয়ং বাদসাহ শত্রুহস্তে বন্দীত্ব হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ১৭৮৮ সালের প্রারম্ভে সম্রাট সাহআলম একবার মেবাৎ প্রদেশে অবাধ্য আমীরগণকে দমন করিবার জন্য অভিযান করিয়াছিলেন। উহাদের নেতা ছিলেন মীর্জ্জা নজফকুলিখাঁ। এই ব্যক্তি একজন স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দু; পরলোকগত উজীর মীর্জ্জানজফের ধর্ম্ম-পুত্র এবং রোহিলা সর্দ্দার গোলাম কাদেরের ভগিনীপতি ছিলেন। কনৌন্দ ও গোকুলগড়ের সুদৃঢ় দুর্গদ্বয় তাঁহার দখলে ছিল। বাদসাহী ফৌজ আসিয়া গোকুলগড় অবরোধ করিল। উক্ত স্থান দিল্লীর ৪৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রেওয়ারীর অদূরে অবস্থিত। তখন রমজানের সময়। মোগলরা মনে ভাবিয়াছিল যে ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের মত শত্রুসেনাও সারাদিন উপবাসের পর রাত্রে পানাহার করিবে। তাহারা কোনরূপ প্রহরার বন্দোবস্ত না করিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে যখন উপবাসভঙ্গে ব্যাপৃত ছিল তখন সমধর্ম্মী হইলেও তাহাদের শত্রুরা সে সুযোগ পরিত্যাগ করিল না। গোলাম হোসেন নামক নজফ কুলির জনৈক অনুচর এবং মেজর নেয়ার সহসা দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অতর্কিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এ অভাবনীয় বিপৎপাতে বাদশাহী ফৌজ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। বিদ্রোহীগণ ক্রমে সম্রাটের শিবিরের অদূরে আসিয়া দেখা দিল,—বাদশাহ তাহাদের হস্তে ধৃত হন আর কি; এমন সময় বেগম সমরু ও টমাসের সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতার জন্য সব দিক রক্ষা পাইল। উঁহারা কতকগুলি সিপাহী ও একটি তোপ লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত বাদসাহের শিবির রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া টমাস সম্মুখবর্ত্তী শত্রুসেনার উপর মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন; পদাতিকগণ দৃঢ়মুষ্টিতে বন্দুক ধরিয়া গুলিবৃষ্টি করিয়া গোলন্দাজদিগের সহযোগিতা করিতে লাগিল। বিদ্রোহীরা এ ধরণের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলনা। তাহাদের অগ্রগতি প্রতিহত হইল। ইহার পর যখন একদল মোগল অশ্বারোহী সেনা অদূরে আসিয়া দেখা দিল তখন আর তাহারা রণস্থলে তিষ্ঠিতে সাহস করিল না। সাহ-আলম যে শুধু রক্ষা পাইলেন তাহা নহে; গোকুলগড়ের দুর্গও তাঁহার করায়ত্ত হইল। বিদ্রোহীরা মহাভয়ে অবাধ্যতাচরণ হইতে নিরস্ত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। কৃতজ্ঞ বাদসাহ প্রকাশ্য দরবারে বেগম সমরুকে ও টমাসকে সাধুবাদ দিয়া বেগমকে টপ্পলের মূল্যবান পরগণাটী জায়গীর এবং তাঁহার সেনাপতিকে একটি মহামূল্য খেলাৎ দিয়াছিলেন। টপ্পল পঞ্জাব প্রদেশের সীমানায় শিখ জনপদের সমীপবর্ত্তী ছিল। সুতরাং শিখ আক্রমণ হইতে বাদসাহের রাজ্যরক্ষার ভারও এখানকার ফৌজদারের প্রতি সন্ন্যস্ত ছিল। বলা বাহুল্য বেগম জায়গীরের শাসনভার টমাসকেই দিয়াছিলেন।

মির্জ্জা নজফ কুলি খাঁ

দেশশাসনে পূর্ব্বেকার কোন অভিজ্ঞতা না থাকিলেও টমাস উক্ত কার্য্য বেশ সুচারুভাবে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুর্দ্দান্ত অধিবাসীগণের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ, শিখদিগের আক্রমণ প্রতিহত করা এবং তাহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণপূর্ব্বক তাহাদিগের দেশে প্রবেশ করিয়া

লুঠতরাজ, অর্থদণ্ড আদায় করা ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে তিনি নিজ কার্য্যক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন।

শাহআলম

টমাসের কৃতিত্বের ফলে অনতিকাল মধ্যেই বেগমের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল। দুই বৎসরকাল টপ্পলের ফৌজদারী করিবার পর টমাস সার্দ্ধানা বাহিনীর অধ্যক্ষতা লাভ করেন। টমাসের দ্রুত উন্নতি এবং অধিনেত্রীর উপর তাঁহার প্রতিপত্তি দেখিয়া সহকর্ম্মী ফরাসী-সৈনিকগণ তাঁহার প্রতি বিষম ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিল। টমাসও তখনকার দিনের অপরাপর বৃটিশারগণের মত ঘোর ফরাসীবিদ্বেষী ছিলেন। সৈন্যবিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া তিনি উক্তজাতীয় সৈনিকগণকে বিতাড়িত করিতে সচেষ্ট হইলেন এবং তদুদ্দেশ্যে বেগমকে বুঝাইলেন যে বৃথা অর্থব্যয় নিবারণ করিতে হইলে ব্রিগেডের অপ্রয়োজনীয় অফিসরগণকে কর্ম্মচ্যুত করা আবশ্যক। এসংবাদে ফরাসী-দিগের মধ্যে ক্রোধোত্তেজনার অবধি রহিল না। উহারাও আত্মরক্ষার্থ টমাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। কর্ণেল নিকোলাস লেভাসুলৎ অসন্তুষ্ট সৈনিকগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। উহারা টমাসের এক অভিযানে অনুপস্থিতির সুযোগে বেগমকে বুঝাইল যে টমাস গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে এক চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্যই স্বীয় অভীষ্ট সাধনের পথে প্রধান অন্তরায় ফরাসীদিগকে বিদূরিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন;—সুতরাং বেগম আশু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করিলে তাঁহার আর রক্ষা নাই। ইহাতে অভীপ্সিত ফল ফলিল কিন্তু টমাস তখন অনুপস্থিত। ক্রুদ্ধা বেগম তাঁহার স্ত্রী ও শিশুসন্তানের উপর আক্রোশ মিটাইলেন। তাঁহার সদাচরণের জামীন স্বরূপ উহাদিগকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। মারিয়া কোন এক সুযোগে স্বামীকে সংবাদ পাঠাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সার্দ্ধানায় ফিরিলেন এবং উহাদিগকে উদ্ধার করিয়া টপ্পলে লইয়া গিয়া বিদ্রোহ-ধ্বজা উত্তোলন করিলেন। বেগমও সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন; টপ্পলগড় অবরুদ্ধ হইল; টমাস কয়েকদিনের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। বেগম তাঁহার অপর কোন শাস্তিবিধান না করিয়া নিজ পরিজনবর্গ ও ধনসম্পত্তি সহ বৃটিশ অধিকারে চলিয়া যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

টমাস মনে মনে বেগমকে বিবাহ করিবার আশা পোষণ করিতেন; কিন্তু তিনি তাঁহার পরিবর্ত্তে লেভাসুলতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করায় ক্রোধে ও ক্ষোভে তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে চলিয়া গিয়াছিলেন, একথা স্লিমানই বোধ হয় প্রথম লিখেন। পরবর্ত্তী লেখকগণ সকলেই সবিশেষ আলোচনা না করিয়া ঐ কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে আবার ইহার উপর রং ফলাইয়া বলেন যে সুপুরুষ সৈনিকগণের উপর বেগমের লক্ষ্য থাকিত, টমাস তাঁহার বহুসংখ্যক প্রণয়ীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাত্র; এ জন্য তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না, কারণ প্রথম জীবনে ক্রীতদাসী বা নর্ত্তকীর নিকট কেহ উচ্চাঙ্গের নীতিজ্ঞান আশা করে না। কিন্তু কথা এই যে, বেগম ইতিপূর্ব্বে নিজে উদ্যোগী হইয়া যে ব্যক্তির সহিত স্বীয় এক পরিচারিকার বিবাহ দিয়াছিলেন তাহার জীবদ্দশাতে পুনরায়

সেই ব্যক্তিকে স্বয়ং বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে কি সম্ভব? টমাসের বেগমের নিকট হইতে চলিয়া যাওয়া, লেভাসুলতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরে বেগমের ঐ ব্যক্তিকে বিবাহ এই সকল ঘটনা হইতে ঐ কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর টমাস বৃটিশ সীমান্ত ষ্টেসন অনুপসহরে আসিলেন। তাঁহার মোট পুঁজি তখন পাঁচ শত টাকা মাত্র। একাদশ বর্ষ সৈনিকবৃত্তির পর তাঁহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ শুনিয়া অনেকেই বিস্মিত হইবেন। তিনি যে জায়গীরের ফৌজদার ছিলেন তাহার বার্ষিক আয় ছিল লক্ষ টাকারও অধিক। টমাসের দারিদ্র্য তাঁহার সততারই পরিচয় দেয়। অবস্থাচক্রে তিনি বেগমের শত্রুতাচরণ করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহার অতিবড় শত্রুও কখন তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতা অথবা কোনরূপ হীনতার অপবাদ দিতে পারিত না। এইখানেই ছিল টমাসের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও অপরাপর ভাগ্যান্বেষী সৈনিক হইতে পার্থক্য। অতঃপর টমাস সঞ্চিত অর্থে কতকগুলি সশস্ত্র অনুচর নিযুক্ত করিয়া তাহাদের সাহায্যে সমীপবর্ত্তী একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম লুণ্ঠন করিলেন। তথায় যে অর্থ অর্থ পাওয়া গেল তদ্দ্বারা দুই শতেরও অধিক অশ্বারোহী-সৈনিক সংগৃহীত হইল। পিতল কাঁসার বাসনগুলি গলাইয়া চারিটি ছোট তোপ ঢালাই করা হইল। সিপাহীগণের যথা সম্ভব সামরিক শিক্ষাবিধানের পর টমাস বেতন বিনিময়ে তাঁহাকে কর্ম্মে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তির সন্ধান আরম্ভ করিলেন। অচিরেই আপ্পাখাণ্ডেরাও নামক জনৈক মারাঠাসর্দ্দারের নিকট হইতে তিনি আমন্ত্রণ পাইলেন। ইঁহারই অধীনে দি বইন সর্ব্বপ্রথম মহাদজী সিন্ধিয়ার কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আপ্পার তখন নিতান্ত হীনদশা। কোন কারণে সিন্ধিয়া তাঁহার প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন। সামান্য অবস্থা হইতে দি বইনের অসাধারণ উন্নতি আপ্পার চোখের সামনে ঘটিয়াছিল। তাঁহার মনে হইল একজন ফিরিঙ্গি সৈনিক যাহা করিতে পারিয়াছে অপর একজন তাহা পারিবে নাই বা কেন? টমাসকে আশ্রয় করিয়া তিনি স্বীয় ভাগ্য পুনর্গঠনে সচেষ্ট হইলেন। স্থির হইল টমাস তাঁহার জন্য পাশ্চাত্য রণপদ্ধতিতে সুশিক্ষিত একদল সৈন্য সংগঠন করিবেন। কিন্তু তজ্জন্য অর্থ আবশ্যক। আপ্পার ছিল সেই জিনিসটিরই বিষম অভাব। মীর্জ্জা নজফকুলি খাঁ ও ইস্মাইল বেগের মেবাৎ প্রদেশস্থ জায়গীর, কনৌন্দের সুদৃঢ় দুর্গ সমেত, ইতিপূর্ব্বে মারাঠাবিজয়ের পর আপ্পার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু সেখান হইতে তিনি এক পয়সা রাজস্ব আদায় করিতে পারিতেন না। তখনকার দিনে সৈন্য পাঠাইয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হইত, বাধ্য না হইলে কেহই রাজকর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিত না। আপ্পা মাছের তেলে মাছ ভাজিবার ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল টমাস মেবাৎপ্রদেশ জয় করিয়া তিজার, তপুকার এবং ফিরোজপুর এই তিনটী জেলা সৈন্যদলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ জায়গীররূপে লইবেন! অনন্তর তিনি আপ্পার নিকট হইতে দুইটি তোপ ও কিছু গোলা বারুদ পাইয়া সিপাহী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যটী নিতান্ত সহজ হয় নাই।

শাহআলম মহিষী জিন্নৎ-মহল

অনিশ্চিত বেতনের লোভে লোকে ভুলিল না। বহু আয়াসে ৪০০ সৈনিক সংগৃহীত হইল। উহাদের লইয়াই টমাস জায়গীর দখলে চলিলেন। বেগম সমরুর জায়গীরের ভিতর দিয়া তাঁহার যাইবার পথ ছিল। টমাস এ সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি উভয় পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর বেশীদূর যাইতে হয় নাই।

ইতোমধ্যে পুণায় মহাদজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু সংবাদ (১১।২।১৭৯৪) হিন্দুস্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। তাহাতে দেশের সর্ব্বত্র বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। যদি দিল্লীতে কোন বিশৃঙ্খলা বাধে এই ভয়ে আপ্পা টমাসকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। অপর এক মতে এই সুযোগে রাজধানীতে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার গোপন অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু দি বইনের বাহিনীর জন্য সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা রক্ষিত হইল;

জর্জ্জ টমাস

কোথাও কোন গোলযোগ ঘটিল না। ইহার পর টমাস কিছুকাল সিপাহী সংগ্রহের জন্য দিল্লীতে ছিলেন। ক্রমে তাঁহার দলে প্রায় সাত শত লোক আসিয়া জুটিল। উহাদের লইয়া তিনি আবার মেবাৎ যাত্রা করিলেন। কিন্তু এবারও তাঁহার বেশীদূর যাওয়া হইয়া উঠিল না। অনিশ্চিত রাজস্ব-লব্ধ বেতনের আশা সিপাহীগণকে অধিককাল প্রলুব্ধ রাখিতে পারিল না। অধিকাংশ ব্যক্তিই সামান্যদূর মাত্র গিয়া দল ছাড়িয়া পলায়ন করিল। অগত্যা টমাস দিল্লী ফিরিয়া আসিয়া আপ্পাকে জানাইলেন যে নগদ টাকা ভিন্ন তাঁহার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নহে। টাকার কথায় আপ্পা বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। সে বিষয়ে টমাসও বড় কম গেলেন না। পরিশেষে রফা হইল এই যে আপ্পা টমাসকে নগদ ১৪০০০৲ টাকা ও অবশিষ্ট অর্থের জন্য হাত চিঠা লিখিয়া দিবেন। তখন সৈন্যগণের দাবী কতকাংশে মিটাইয়া দিয়া টমাস পুনরায় তৃতীয়বারের মত মেবাৎ অধিকারে যাত্রা করিলেন (জুলাই ১৭৯৪)।

বারিধারাপ্লাবিত এক ঘনান্ধকার নিশীথে টমাস তিজারের অদূরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার নূতন প্রজারা সেই রাত্রেই তাঁহাকে তাহাদের অভ্যস্ত বিদ্যার নিদর্শন দেখাইল; অর্থাৎ গভীর নিশীথে শিবিরের ঠিক কেন্দ্রদেশ হইতে একটি ঘোড়া চুরি করিয়া লইয়া গেল। উহাদের ধৃষ্টতার শাস্তি দিবার জন্য ক্রুদ্ধ টমাস ঘোড়াচোরের সন্ধানে একদল লোক পাঠাইলেন। কিন্তু সংখ্যায় প্রবল বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। তখন টমাস সসৈন্যে তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই তাঁহার অধিকাংশ সৈনিকই মহাভয়ে দল ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ইহাতে মেবাতীদের আনন্দের অবধি রহিল না, তাহারা টমাসের মুষ্টিমেয় অনুচরবৃন্দকে মহোৎসাহে আক্রমণ করিল। কিন্তু টমাস তাহাদের পরাজিত ও রণভূমি হইতে বিতাড়িত করিলেন। ছত্রভঙ্গ সৈনিকগণকে সম্বদ্ধ করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন যে দলে মাত্র ৩০০ জন অবশিষ্ট আছে, অপর সকলে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। উহাদের লইয়াই তিনি পুনরায় যুদ্ধে আগুয়ান হইলেন। কিন্তু মেবাতীদের সকল সাহস বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহারা অপহৃত অশ্বটী প্রত্যর্পণ, এক বৎসরের রাজস্ব প্রদান এবং ভবিষ্যৎ সদাচরণের জন্য উপযুক্ত জামীন দাখিল করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল।

তিজার নগর অধিকারের ফলে সমগ্র জেলাতে টমাসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মেবাৎপ্রদেশ মধ্যে তিজারই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় স্থান। এখানকার অধিবাসীগণের

দুর্দান্ত, জেদী, কলহপ্রিয় ও দস্যুবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে বেগম সমরুর সমগ্র বাহিনী তিজার আক্রমণ করিতে আসিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। অতঃপর টমাস ঝাঝার নগর অধিকার করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে প্রদত্ত সমগ্র জায়গীর তাঁহার হস্তগত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঐখানকার রাজস্ব টমাস তাঁহার সৈন্যদলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ লইবেন, আপ্পার সহিত তাঁহার সেইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক এই সময় খাণ্ডেরাওয়ের সৈন্যগণ দীর্ঘকাল বেতন না পাইয়া বিদ্রোহ করাতে টমাস সংগৃহীত অর্থ নিজে না লইয়া তাহাদের দাবী মিটাইবার জন্য প্রভুকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর নিজ তহবিল পূর্ণ করিবার জন্য টমাস বাহাদুরগড় লুণ্ঠনে গমন করিলেন।

টমাসের সাফল্য দিল্লীর মারাঠা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিষম উদ্বেগের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। রাজধানীর অত নিকটে তাঁহার প্রতিষ্ঠালাভ তাঁহাদিগের প্রীতিকর হইবার কথা নহে। বেগম সমরুও তাঁহার জায়গীর লুণ্ঠন করার জন্য টমাসের প্রতি জাতক্রোধ ছিলেন। তিনি এবং মারাঠা দরবার সম্মিলিতভাবে টমাসের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠাইয়াছিলেন। বাহাদুরগড় আক্রমণোদ্যত টমাস সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী বেগমের স্বামী কর্ণেল লেভাসুলৎ সার্দ্ধানা-বাহিনীসহ তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। স্বীয় অর্দ্ধশিক্ষিত সিপাহীদিগকে লইয়া তাঁহার সহিত বল পরীক্ষা করিতে টমাসের সাহস হইল না। তিনি তিজারে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার অল্প পরেই টমাস আপ্পার নিকট হইতে জরুরী আহ্বান পাইলেন যে অবিলম্বে কোটপুতলী নামক স্থানে গিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহী সৈনিকদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। তাহারা বেতনাভাবে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি কাহাকেও প্রত্যয় করিতে পারিতেছিলেন না, পাছে কেহ তাঁহাকে উহাদের হস্তে ধরিয়া দেয় সেই আশঙ্কাই তখন তাঁহার মনে প্রবল হইয়াছিল। বিপদে পড়িয়া টমাসকে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম মনে পড়িয়াছিল। টমাস যখন সংবাদ পাইলেন তখন অপরাহ্ন-কাল, মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। কিন্তু তাহা সত্বেও তিনি কালবিলম্ব ব্যতিরেকে সর্ব্বপ্রকার দুর্য্যোগ উপেক্ষা করিয়া প্রভুর কার্য্য সাধনে যাত্রা করিলেন এবং প্রচণ্ড ধারাপাত মাথায় লইয়া কর্দ্দমাকীর্ণ পথে একাদিক্রমে ৩০ ঘণ্টারও অধিক চলিয়া পরদিবস মধ্যরাত্রে কোটপুতলীতে আসিয়া পৌছিলেন। সেই দুর্য্যোগময়ী নিশীথে বিপন্ন সর্দ্দারের সাহায্যে যে কেহ আসিতে পারে তাহা বিদ্রোহীরা একবারও মনে করে নাই। উহারা তাঁহাকে কোন বাধা দিতে পারিল না। তিনি আপ্পাকে উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে কনৌন্দদুর্গে লইয়া গেলেন। টমাসের এই কার্য্য সত্যই তাঁহার সুগভীর প্রভুভক্তি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অসম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করে। কৃতজ্ঞ সর্দ্দার তাঁহাকে ধর্ম্মপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পদোচিত মর্য্যাদার সহিত বাস করিবার জন্য তাঁহাকে আবশ্যকীয় হস্তী ও শিবিকা কিনিবার জন্য তাঁহাকে তিন সহস্র টাকা খেলাৎ দিয়াছিলেন। সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার জন্য টমাসকে বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীরও তিনি দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য জায়গীরগুলি পূর্ব্ববৎ অধিকার করার পর তথা হইতে রাজস্ব পাওয়া সম্ভব ছিল।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গোপাল রাওয়ের পরিবর্ত্তে দি বইন হিন্দুস্থানের সুবেদার নিযুক্ত হন। লকবা দাদা নামক মহাদজী সিন্ধিয়ার জনৈক প্রিয় অনুচরের হস্তে তিনি নিজ কার্য্যভার বহুলপরিমাণে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনি একবার সদল বলে আপ্পার জায়গীরের অদূরে আসিয়া উপনীত হইলে খাণ্ডেরাও তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া দাদা বাকি রাজস্ব দিবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন এবং আপ্পা তাহা দিতে না পারায় তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। তখন উপায়ান্তরবিহীন আপ্পা মুক্তি লাভের জন্য জায়গীরগুলি বাপু ফড়ণাবিশ নামক একজন মারাঠা সর্দ্দারের নিকট বন্ধক দিয়াছিলেন। টমাসের জায়গীরগুলিও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার পক্ষে এ ক্ষতি বড় সামান্য ছিল না। সিপাহী-দিগের তাঁহার নিকট হইতে বেতন বাবদ অনেক টাকা পাওনা হইয়াছিল; তাহা পরিশোধ করিবার অপর কোন সংস্থান

ছিল না। কিন্তু সে জন্য টমাস আপ্পার নিকট কোন অনুযোগ অথবা টাকার জন্য তাঁহাকে একবারও পীড়াপীড়ি করিলেন না। বরং তাঁহার অন্যান্য জায়গীর মধ্যে গোলযোগ দেখা দিলে তৎপরতার সহিত তাহা প্রশমন করিয়াছিলেন।

ইহার অল্প পরে আপ্পা টমাসকে জানাইয়া ছিলেন যে অবস্থা বিপর্য্যয়ের জন্য তাঁহার পক্ষে আর ব্রিগেড রাখা সম্ভব নহে; সে জন্য তিনি সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিতে চাহেন; সে কারণ আবশ্যকীয় আলোচনাদি করিবার জন্য তিনি টমাসকে একবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছিলেন। সাক্ষাতে আপ্পা তাঁহাকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন। টমাসের সামরিক কৃতিত্ব ও ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি যে মারাঠা দরবারের পক্ষে বিষম চিন্তার কারণ দাঁড়াইয়াছে, উঁহারা যে তাঁহার নিকট টমাসের কর্ম্মচ্যুতি দাবী করিয়াছেন, সে আদেশ লঙ্ঘনের তাঁহার যে সাধ্য নাই এ সকল কথা তিনি খোলাখুলি ভাবে তাঁহাকে জানাইলেন। টমাস কাহাকেও ভয় করিয়া চলিবার পাত্র ছিলেন না। সকল কথা শুনিয়া তিনি সোজা লকবার নিকট চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত চলিতেছে তিনিই তাহার মূল বলিয়া তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। দাদা বলিলেন যে এ বিষয়ে তিনি কিছুই জ্ঞাত নহেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহাকে ইহাও জানাইলেন যে টমাস যদি সিন্ধিয়ার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছুক হন তবে তিনি তাঁহাকে দুই সহস্র সৈনিকের নেতৃত্ব প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। টমাস অনায়াসে এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিতেন, তাহাতে কোন বাধা ছিল না। আপ্পা তাঁহাকে স্পষ্টই জবাব দিয়াছিলেন। তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলে তাঁহার জীবনের গতি ও পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিবার প্রয়োজন হইত। কিন্তু মহানুভব টমাস বিপদের সময় প্রভুকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না, বরং প্রাণপণে তাঁহাকে রক্ষা করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বস্ততা ও প্রভু-ভক্তির এ নিদর্শনে মুগ্ধ আপ্পা নিজ আচরণের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; বলিলেন উপায়ান্তরাভাবে বিষম অনিচ্ছার সহিত তিনি ঐ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার কিছু পরেই লাকবার নিকট হইতে সবলগড় আক্রমণ-নিরত সিন্ধিয়ার সৈন্যদলকে সাহায্য করিবার জন্য খাণ্ডেরাওয়ের প্রতি আদেশ আসিল। মেজর জেমস গার্ডনার চারি ব্যাটালিয়ন সিপাহী লইয়া কিছুকাল হইতে উক্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। আপ্পার আদেশে টমাসও সসৈন্যে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল বেতন না পাইয়া অসন্তুষ্ট সৈনিকগণ টাকা না পাইলে যুদ্ধ করিবে না জানাইল। কোন মতে তাহা-দিগকে রাজি করাইতে না পারিয়া টমাস নিজ তৈজস পত্রাদি বিক্রয় করিয়া তাহাদের পাওনা কতকাংশে মিটাইয়া দিয়া যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সমরপরিষদের এক অধিবেশনে সিন্ধিয়ার সেনানায়কগণ বলিলেন যে দুর্গ যেরূপ সুদৃঢ় তাহাতে সম্মুখ আক্রমণে উহা অধিকারের আশা করা বাতুলতা মাত্র; দীর্ঘ অবরোধের পর খাদ্যাভাবে শত্রুসৈন্যকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। টমাস কিন্তু এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না। চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে অতর্কিত আক্রমণে দুর্গ অধিকার করা সম্ভব এবং তাঁহার সিপাহীরা একেলাই সে কার্য্য করিতে সক্ষম। পরদিন প্রত্যূষে তিনি শত্রুদুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং সকলে ব্যাপার সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেই দুর্গ ও নগর অধিকার করিলেন। এমন সময়ে মারাঠারা আসিয়া দেখা দিল। দুর্গ হইতে যে দুইলক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল উঁহারা তাহার অংশ দাবী করিলে টমাস বলিলেন যে স্বীয় বাহুবল লব্ধধনে অপর কাহারও অধিকার তিনি স্বীকার করেন না।

অতঃপর টমাস আবার আপ্পার ও নিজের অবাধ্য প্রজা-বৃন্দকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে সকল যুদ্ধা-ভিযানের দীর্ঘ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধু নরনাল অবরোধের কথা বলা যাইতেছে। আপ্পা ও টমাস উক্ত স্থান অবরোধ করিলে কিল্লাদার টমাস প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর করিয়া তদীয় করে আত্মসমর্পণ করিল। ইহাতে আপ্পার ক্রোধের অবধি রহিল না। তিনি আশা করিয়াছিলেন দুর্গ হইতে বহু অর্থ লাভ হইবে। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন টমাসের শত্রুকে কোনরূপ সর্ত্তদানের অধিকার নাই বলিয়া তিনি

টমাসকে তাঁহার করে কিল্লাদারকে সমর্পণ করিবার আদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য টমাস তাহাতে সম্মত হইলেন না। এইরূপে আবার উভয়ের মনোভঙ্গ হইল।

ঐ ঘটনার কয়েকদিন পরে আপ্পার আদেশ মত টমাস তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া শুনিলেন যে শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি উপরে শুইয়া আছেন এবং তাঁহাকে তথায় যাইতে বলিয়াছেন। টমাসের মনে কোন সন্দেহ হইল না। দেহরক্ষী সৈনিকদিগকে নিচে রাখিয়া তিনি একাকী উপরে উঠিয়া গেলেন; কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন অসুখের কথা সব মিথ্যা, সর্দ্দার সুস্থশরীরে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। বলাবাহুল্য ফৌজদার সম্বন্ধে তাঁহাদের কথা হইল। টমাস পুনরায় স্পষ্টভাবে বলিলেন যে স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে তিনি অসমর্থ। তাঁহাকে সেইখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আপ্পা বাহিরে গেলেন। পরমুহূর্ত্তে একদল সশস্ত্র সৈনিক আসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। টমাস সব বুঝিলেন। তবুও তিনি কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখাইলেন না। তাঁহার নির্ব্বিকার শান্তভাব দেখিয়া আগন্তুকগণ কতকটা হতভম্ব হইয়া পড়িল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি একখানি পত্র আনিয়া টমাসকে দিল। তাহাতে আপ্পা তাঁহাকে শেষবারের মত তাঁহার আদেশ পালন করিতে বলিয়াছিলেন। এ অবস্থায় খুব অল্প লোকেই নিজ দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারে। টমাস সেই অল্প কয়েক জনের অন্যতম ছিলেন। কোনরূপ চাঞ্চল্য না দেখাইয়া তিনি দৃঢ়পদে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে আপ্পা সকাসে গমন করিলেন। কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না। তিনি যে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন তাহা সর্দ্দার একবারও মনে ভাবেন নাই। তিনি নিশ্চিন্ত মনে স্বীয় পারিষদগণের সহিত বাক্যালাপনিরত ছিলেন। এক্ষণে মুক্ত কৃপাণ করে প্রদীপ্তনেত্র ফিরিঙ্গী সৈনিককে আসিতে দেখিয়া তাঁহার হৃৎকম্প হইল। তিনি নির্ব্বাক নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। সুযোগ বুঝিয়া টমাস তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে নিচে নামিয়া গেলেন। একপ্রাণীও তাঁহাকে বাধা দিতে উঠিল না। শিবিরে ফিরিয়া গিয়া টমাস সর্দ্দারকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে অতঃপর তাঁহাদের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, তাঁহার মত অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম করা আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। ইহাতে আপ্পার হইল সমূহ বিপদ। টমাসের ব্রিগেড হাতছাড়া হইয়া যায় দেখিয়া তিনি প্রমাদ গণিলেন। পরদিন টমাসের সহিত তিনি নিজে দেখা করিতে গেলেন এবং নানা মিষ্টকথায় তাঁহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। টমাসও বুঝিলেন যে আপ্পার মত প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সহসা পরিত্যাগ করা সমীচীন হইবে না। তখনকার মত উভয়পক্ষে শান্তি স্থাপিত হইলেও শীঘ্রই আবার বিরোধ উপস্থিত হইল। একটি গিরিদুর্গ দখল করিয়া টমাস কতকগুলি কামান পাইয়াছিলেন। সর্দ্দার ঐগুলি দাবী করিলে তিনি জবাব দিয়াছিলেন যে যুদ্ধলব্ধ অস্ত্রশস্ত্রে চিরকাল বিজেতার অধিকার স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহাতে আপ্পার ক্রোধের অবধি রহিল না। তিনি অবাধ্য সৈনিককে সমুচিত শাস্তি প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার শিবিরের অদূরে একদল গোঁসাই আস্তানা পাতিয়াছিল। তাহাদের সর্দ্দারের সহিত গোপনে বন্দোবস্ত হইল যে টমাসকে তিনি কোন অজুহাতে এক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইবেন এবং পথিমধ্যে অন্ধকার রাত্রে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া উহারা তাঁহার প্রাণসংহার করিবে, তজ্জন্য তিনি তাহাদের দশ হাজার টাকা দিবেন। টমাস সকল সংবাদই পাইলেন। আপ্পার অনুচরগণের মধ্যে তাঁহার চরের অভাব ছিল না। আদেশমত যাত্রা করিয়া মাত্র কিছু দূর গিয়াই তিনি দ্রুতপদে অন্যপথে ফিরিয়া চলিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই গোঁসাইগণকে সম্পূর্ণ অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া অনেকের প্রাণসংহার করিলেন। অনন্তর তিনি সর্দ্দারকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে পূর্ব্ব হইতেই তিনি সকল কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার মত "দাগাবাজে"র কার্য্য করা আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ টেলর সাহেবের মত অবস্থায় পড়িতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নাই। *

এই দুই ঘটনা হইতে তখনকার দিনে রাজনীতির অবস্থা বুঝা যাইবে। তখন বিশ্বাস ভঙ্গ দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। আপ্পার দাবী যে কিছু অন্যায় ছিল তাহা তাঁহার

* টেলর নামক একজন ইংরাজ সৈনিক আপ্পার অধীনে কর্ম্মনিরত ছিলেন। সর্দ্দার একবার তাঁহার নিকট হইতে বহু অর্থ দাবী করেন এবং টেলর তাহা দিতে না পারায় দীর্ঘকাল তাঁহাকে গোয়ালিয়র-দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অথবা সমসাময়িক অনেকের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিলনা। টমাসের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দৃঢ়তা তাঁহার নিকট একগুয়েমির নামান্তর বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। তিনি যে ভাবে টমাসকে ধরাধাম হইতে অপসারিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাও তৎকালে রাজনীতিতে বৈধভাবে প্রচলিত ছিল।

আপ্পার সহিত টমাসের বিরোধ দর্শনে তাঁহার শত্রুরা হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে আক্রমণে তৎপর হইল। তখন আবার তিনি টমাসের শরণ লইতে অগ্রসর হইলেন। নিজ আচরণের কৈফিয়ৎ দর্শাইতে বিলম্ব হইল না। তিনি কিছু জানিতেন না, শারীরিক অসুস্থতার জন্য সে সময় তিনি বিষয়কর্ম্ম কিছু দেখিতেন না, তাঁহার নামে যে সকল কর্ম্মচারী ঐ কার্য্য করিয়াছিল তাহাদের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, বিপদের সময় তাঁহাকে পরিত্যাগ করা টমাসের উচিত হইবে না ইত্যাদি অনেক কথাই তিনি টমাসকে লিখিয়াছিলেন। কেহ বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণ লইলে তাঁহার সাহায্য জন্য প্রাণপাৎ না করিয়া টমাস থাকিতে পারিতেন না। এই উদার মহানুভবতাই ছিল তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব।

তিনি তৎক্ষণাৎ শত্রুহস্ত হইতে সর্দ্দারকে উদ্ধার করিলেন। শিখরাও এই সময় দোয়াব প্রদেশমধ্যে প্রবেশ করিয়া সাহারণপুর জেলা উৎসন্ন করিতেছিল। আপ্পার আদেশে অন্যান্য মারাঠা সর্দ্দারগণের সহিত টমাসও তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। মারাঠারাজ্য হইতে তিনি শুধুই যে তাহাদের বিতাড়িত করিলেন এমন নহে, তাহাদের অনুধাবন করিয়া তাহাদের নিজেদের রাজ্যমধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে সুপ্রচুর লুঠ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। টমাসের কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া লক বা শিখদিগের আক্রমণ হইতে মারাঠা সাম্রাজ্য রক্ষার ভার তাঁহার করে দিতে চাহিলেন। স্থির হইল টমাস সে জন্য ২০০০ পদাতিক, ২০০ অশ্বারোহী সৈনিক ও ১৬টী তোপ রাখিবেন এবং উহাদের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে পাণিপথ, শোণপথও কর্ণাল এই তিনটী জেলা জায়গীর দেওয়া হইবে। ইচ্ছা না থাকিলেও আপ্পা এ ব্যবস্থায় কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না।

ইহার কিছুকাল পরে টমাস বেগম সমরুকে তাঁহার বিদ্রোহী সৈনিকগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় স্বীয়পদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বেগমের জীবনী প্রসঙ্গে সে ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে; পুনরুক্তি অনাবশ্যক। বেগমের পূর্ব্ববৈর সত্ত্বেও এই মহাবিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করা,—টমাস উক্তকার্য্যে নিজ তহবিল হইতে লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন,—টমাসের পক্ষে যে কিরূপ ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের পরিচায়ক তাহা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। বেগম তজ্জন্য বরাবর টমাসের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহার পতন ও মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গের সকল ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে টমাস আপ্পার নিকট হইতে একটী পত্র পাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে দীর্ঘকালজাত রোগযন্ত্রণা ক্রমেই তাঁহার অসহ্য হইয়াছে. পীড়া শান্তির কোন আশা নাই দেখিয়া দুর্ব্বহ জীবনভারে বীতস্পৃহ হইয়া তিনি পূণ্যসলিলা জাহ্নবী গর্ভে দেহত্যাগ করিতে স্থির সঙ্কল্প হইয়াছেন ও তদুদ্দেশ্যে গঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে টমাসের সহিত একবার দেখা হয় ইহাই তাঁহার অন্তিম কামনা। টমাস যেন কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করেন, দেরী হইলে দেখা না হওয়াই সম্ভব। আপ্পার সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই, কারণ পত্র প্রাপ্তিমাত্রে টমাস রওনা হইলেও তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই মধ্যপথে যমুনাগর্ভে সর্দ্দার দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন (১৭৯৭ খৃঃ)।

আপ্পার মৃত্যু টমাসের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইয়াছিল মারাঠা জগতে তিনি অন্যতম প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় অনেক সুবিধা ছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী বামনরাও লোকটার কোন গুণ ছিল না। তিনি যেমন অনভিজ্ঞ, তেমনই অহঙ্কারী ও তোষামোদপ্রিয় ছিলেন। কুচক্রীগণের পরামর্শে তিনি টমাসের জায়গীরগুলি বলপূর্ব্বক অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া শিখরাও আসিয়া দেখা দিল। কিন্তু টমাস একে একে উভয় পক্ষকেই পরাজিত করিলেন। এমন সময় সাহারাণপুরের ফৌজদার বাপু সিন্ধিয়ার সহিত আবার তাঁহার বিরোধ বাধিল। এবার টমাস বিপদে পড়িলেন। এক সঙ্গে তিন পক্ষের সহিত যুদ্ধ করা চলে না, তিনি ঝাঝারে ফিরিয়া

আসিলেন। বাপু তাঁহার উত্তরাঞ্চলবর্ত্তী জায়গীরগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। এ দিকে বামনরাও তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে ঝাঝার ভিন্ন তাহার দক্ষিণের জায়গীর গুলি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে টমাস সম্পূর্ণ রূপে কর্ম্মহীন হইয়া পড়িলেন। বামনরাও এবং বাপু সিন্ধিয়া উভয়েই তাঁহার শত্রুতা আচরণ করিয়া ও জায়গীর সমূহ দখল করিয়া লইয়া তাঁহাকে সৈন্য রাখিবার চুক্তি হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু টমাসের অধীনে তখন বেতন না পাইয়া অসন্তুষ্ট প্রায় তিন হাজার সৈনিক ছিল। তাহাদের প্রাপ্য পরিশোধ না করিয়া তাহাদের বিদায় দেওয়া চলে না। একমাত্র ঝাঝারের আয় হইতে তাহা অসম্ভব। আর দল ভাঙ্গিয়া দিবার পর তিনি কিই বা করিবেন? টমাস দেখিলেন বিদ্রোহী সৈনিকদিগের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিবার অথবা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার বাসনা না থাকিলে তাঁহার পক্ষে নির্ব্বিচারে পরস্বাপহরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এতদিন তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ প্রদত্ত একটা আদেশের আবরণ ছিল। কিন্তু অতঃপর তাঁহাকে পরস্বাপহারী, লুণ্ঠনোপজীবি দস্যুসর্দ্দার ভিন্ন অপর কোন আখ্যা প্রদান করা চলেনা। টমাসের ভক্তগণের পক্ষে একথা স্বীকারে কুণ্ঠা হইতে পারে, কিন্তু সত্যকথা গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা।

ঝাঝারে ফিরিয়া আসিবার পর সিপাহীরা বেতন দাবী করিলে টমাস তাহাদের লইয়া জয়পুর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। হরিচু নামক একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের নিকটে আসিয়া তিনি স্থানীয় ভূস্বামীর নিকট লক্ষটাকা মুক্তিপণ দাবী করিলেন। এক কথায় অত টাকা আর কে দেয়? টমাস গ্রাম অধিকার করিয়া দুর্গ আক্রমণের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় ভীত জমিদার মহাশয় ৫২০০০৲ টাকা দিয়া তাঁহার সহিত রফা করিলেন। টমাস নিজ আচরণ সমর্থন করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই; বরং স্পষ্টই বলিয়াছেন যে অর্থাভাববশতঃ তিনি হরিচুতে আসিয়া নিজ প্রয়োজন মিটাইয়াছিলেন! টমাসের "পিণ্ডারী-বৃত্তির" অধিক পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। ১৭৯৮খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে তিনি ষোড়শমাসব্যাপী অবিরাম যুদ্ধাভিযানক্লান্ত সৈনিকগণকে কিছুদিনের মত বিশ্রাম দিবার জন্য ঝাঝারে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন। এই কয়মাস তিনি যে ভাবে কাটাইয়াছিলেন সে ভাবে যে অধিক দিন চলেনা তাহা তিনি যে বুঝিতেন না এমন নহে। টমাস দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে মাত্র দুইটি পথ উন্মুক্ত আছে; প্রথমতঃ সব পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ রাজ্যে ফিরিয়া যাওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ তখনকার দিনের আরও অনেকের মত মাৎস্যন্যায়উপদ্রুতজনপদে বাহুবলে নিজ আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা। টমাসের তেজস্বী মন পরাজয় স্বীকারে সম্মত হইল না। তিনি শেষোক্ত পথ নির্ব্বাচন করিলেন। কিন্তু স্বাধীন রাজপাট স্থাপন জন্য রাজ্য আবশ্যক। টমাস দেখিলেন পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ দিল্লী অঞ্চলে এবং দক্ষিণ দিকে মারাঠা আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, সে দিকে অথবা পশ্চিমের বিকানীরের মরুভূমিতে অধিকার স্থাপন অসম্ভব। ঝাঝারের উত্তর-পশ্চিমে বিশাল হরিয়ানা প্রদেশ অধিকারীবিহীন অবস্থায় পড়িয়াছিল,—একমাত্র সেখানেই তাঁহার স্বাধীন রাজ্যস্থাপন সম্ভব। আধুনিক যুগের হরিয়ানার অবস্থা হইতে তৎকালীন হরিয়ানার কোন ধারণা করা সম্ভব নহে। প্রায় তিন হাজার বর্গমাইল পরিমাণ বিস্তৃত ভূখণ্ড তখন সম্পূর্ণ বন্য, অনুর্ব্বর পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত ছিল। যুগে যুগে পশ্চিম হইতে সমাগত আক্রমণকারীগণ এই জনপদের মধ্য দিয়া হিন্দুস্থানের অভ্যন্তর প্রদেশে অভিযান করার ফলে সমগ্রদেশ উৎসাদিত মরুভূমিপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। পাঠান সম্রাট ফেরোজ তোগলকের রাজত্বকালে এই স্থান তাঁহার প্রিয় শিকারভূমি ছিল। এখানকার মাটি কঠিন ও অনুর্ব্বর; বারিপাতের পরিমাণ স্বল্প—কাজেই গভীর করিয়া খনন না করিলে কূপে জল পাওয়া যায় না। সে জলও তাদৃশ স্বাদু বা সুপেয় নহে। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে ফেরোজ যমুনা হইতে জল আনাইবার জন্য একটি খাল কাটাইয়াছিলেন। কালের কুটিলগতিতে তাহা স্থানে স্থানে মজিয়া গেলেও তখন পর্য্যন্ত তাহার এবং উক্ত সম্রাট স্থাপিত গ্রাম নগরাদির নিদর্শন দেখা যাইত। হান্সি ও হিসার এখানকার দুই প্রধান নগর ছিল। হরিয়ানার উত্তরে ঘাঘর বা বৈদিক সরস্বতী নদী প্রবাহিত। বর্ষাকালে যখন তাহার সলিলপ্রবাহ দুই কূল ছাপাইয়া উঠে তখন উভয়তীরে যে পলিমাটি সঞ্চিত হয় তাহাতে খুব ভাল

ঘাস ও গম জন্মে। সে জন্য পাঞ্জাবের গম ও হিসারের গরু সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে বর্ষা কম, জমিও বালুমিশ্রিত, সেজন্য শস্য ভাল হয়না। হান্সি অতি প্রাচীন নগর। এখানে একটি অশোকস্তম্ভের ভগ্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১০৩৬ খৃষ্টাব্দে গজনির মামুদের পুত্র সুলতান মামুদ হান্সিনগর বিধ্বংস করেন। হান্সিসহর পার্শ্ববর্ত্তী সমতল হইতে কতকটা উচ্চ এক ভূখণ্ডের উপরে অবস্থিত। সেজন্য শত্রু হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার বেশ উপযোগী ছিল। কালের গতিতে দুর্গ, নগর প্রাকার, পরিখা মূর্চ্চা সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও উহাদিগের সংস্কার সাধন একেবারে অসম্ভব ছিল না। দীর্ঘকাল অরাজকতার মধ্যে বাস করার ফলে এখানকার অধিবাসী জাঠ, শিখ ও ভট্টিরা, ঘোর উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছিল। সাহসী, নির্ভীক, নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক, প্রতিহিংসাপরায়ণ তাহাদিগের নিকট মনুষ্য-জীবনের—নিজের বা অপরের—কোন মূল্য ছিল না। ১৭৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে বিষম দুর্ভিক্ষে সমগ্র জনপদ সবিশেষ প্রপীড়িত হইয়াছিল। সেই সময়ে অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে খাদ্যাভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল; অনেকে দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিল। টমাসের আগমনকালেও হরিয়ানা দুর্ভিক্ষের কবল হইতে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যসমাচ্ছন্ন বিরলবসতি এই জনপদ টমাস তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া নির্ব্বাচন করিলেন। *

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* কথিত আছে টমাসের আগমনকালে হান্সিসহরে শুধু একজন ফকির ও দুইটি সিংহ বাস করিত। বর্ত্তমানে কাথিয়াবাড় প্রদেশের গিরজঙ্গল ভিন্ন ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি সিংহ দেখা না গেলেও, অতীতে উত্তর পশ্চিম ও মধ্যভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই সিংহ বিচরণ করিত তাহার বহু প্রমাণ আছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হান্সি জেলায়, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জব্বলপুরে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র রাজ্যে এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দেও কোটারাজ্যে সিংহ দেখা গিয়াছে।

অরণ্যানী

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

কুহেলির আবরণে ঢাকি সারা দেহ,
পূরব গগন প্রান্তে দেখা দিল চাঁদ ;
আজি শুক্লাত্রয়োদশী তিথি।
পর্ব্বত শিখরে ঝরে জননীর স্নেহ ;
ভাঙিয়া গিয়াছে বুঝি মন্দাকিনী বাঁধ,
ভাসাইয়া দিল বনবীথি ॥
শারদ পূর্ণিমা আসে, বহে হিম বায়ু
উত্তর দিগন্ত হ'তে, কাঁপে বেণুবন—
অরণ্যের শ্যামল উত্তরী।
পলে পলে ক্ষ'য়ে আসে রজনীর আয়ু,
ক্ষীণ হোলো দীপশিখা, আর কতখন্ !
শেষ হ'য়ে আসে বিভাবরী ॥
আজি শুক্লাত্রয়োদশী, আমি কবি বন-জোছনার,
দুর্গম পর্ব্বতপথে শুনি বন বীণা বাজে কা'র ॥

———

নিশি

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

রজনী করের একমাত্র পুত্র হীরালাল আজ নয় বৎসর দেশত্যাগী---এ আখ্যায়িকার ভূমিকা মাত্র এইটুকু।

এই কয় বছরে রজনীকর বাবু ঠিক তেমনই আছেন। ঠিক আগের মতই সুস্থ ও সবল, সৌখীন এবং খামখেয়ালী; অকারণেই নিরীহ লোকের সহিত গোল বাধাইয়া চক্ষু ঘূর্ণন করেন এবং কথায় কথায় তাহাদের সহিত সুমিষ্ট সম্বন্ধ পাতান। কেবল দুঃখ এই, বয়সের গুণে মাথার অনেকগুলি চুল তাঁহার শাদা হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যারাত্রে ঝম্ ঝম্ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। কিন্তু আকাশ স্বচ্ছ হয় নাই। দিগন্তব্যাপী ঘোলাটে মেঘের ফাঁক দিয়া মাঝে মাঝে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বর্ষণ হইতেছে। রজনীকর বাবু হ্যারিক্যানের আলোটা অনুজ্জ্বল করিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। বৃষ্টির সুরটা কানের কাছে সঙ্গীতের ন্যায় বেশ উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। খোলা জানালার ভিতর দিয়া বৃষ্টিসজল বহিঃপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টিটা তাঁর স্থির এবং নিরুদ্বেগ। বৃষ্টিসিক্ত হাওয়ায় পুষ্করিণীর পাড়ে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল গাছের শাখাগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অতীত দিনের একটি কাহিনী তাঁহার মনে পড়িতেছে, একখানি মুখ আর অর্দ্ধমুদিত দু'টি চোখ।—রজনীকর বাবু চক্ষু ফিরাইলেন না, ধীরে ধীরে চক্ষু বুজিলেন।

কতক্ষন কাটিয়াছিল, কে জানে। রজনীকর বাবু হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। অনুজ্জ্বল আলোটা এইমাত্র নিভিয়া গিয়াছে। গভীর অন্ধকারে কক্ষ আচ্ছন্ন, যেন শ্বাস রোধ হইয়া আসে, এমনি অন্ধকার। রজনীকর মেঝেয় নামিতে সাহস করিলেন না, বিছানার উপর পাথরের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। শব্দটা তিনি স্পষ্ট কর্ণে শুনিয়াছেন। একবার নয়, দুইবার নয়, উপরি উপরি বারকয়েক। রুদ্ধকক্ষের দ্বারে পায়ের শব্দ ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্ট। সে শব্দ কক্ষের দ্বারে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। খোলা জানালায় একটিবার মাত্র এক অস্পষ্ট মূর্ত্তিও রজনীকর আবার দেখিতে পাইয়াছেন। দেখার পরেই অন্ধকার। সূচিভেদ্য অন্ধকারে আর কিছু চোখে পড়ে নাই। সর্ব্বাঙ্গ রজনী করের থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। দেশলায়ের বাক্সটা অভ্যাস মত তিনি বালিশের নীচেই রাখিয়া দেন। আলো জ্বালিতে বিলম্ব হইল না। ঘরের অন্ধকার প্রেতের মত অদৃশ্য হইয়া গেল।

কই কিছুই ত হয় নাই! খাট আলমারি যেখানে যা ছিল, সেইখানেই ঠিক তেমনি আছে। কেবল খোলা জানালাটা হাঁ হাঁ করিতেছে। জানালাটা তিনি এমন ভাবে খুলিয়া রাখেন নাই। তবে কি বাতাসে খুলিয়া গেল? কিন্তু এই বর্ষারাত্রে বাতাসের কোন উদ্দামতাই রজনীকর দেখিতে পাইলেন না। রজনী করের ভয়ের কারণ দৃঢ় হইল। ঠিক এই জানালার ভিতর দিয়াই তিনি তাহাকে দেখিয়াছেন—মাথার কেশগুলি রুক্ষ অথচ দীর্ঘ, দুটি চক্ষে তীব্র জ্বালা জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় লক্ লক্ করিতেছে। ভুল নয়।

ঘর রুদ্ধ! রজনীকর জানালার কাছে আসিতে সাহস করিলেন না। বিছানায় বসিয়াই ডাকিলেন, তারা।

কণ্ঠস্বর ঘরের ভিতরে আবদ্ধ রহিল।

পাশের ঘরে তারা ঘুমাইতেছে। তারা রজনী করের কন্যা। ঘরটা মাত্র হাতকয়েকের ব্যবধান। কিন্তু দ্বার খুলিয়া রজনীকরের বাহির হওয়ার সাধ্য কি?

রজনীকর আবার দম লইয়া ডাকিলেন, যোগি, ও যোগি যোগিনী,—ডাকের পর ডাক! এ ডাক ব্যর্থ হইল না।

রাত দুপুরে অত চেঁচাচ্ছ যে কি হয়েচে তোমার?

রজনীকরের সাহস ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তিনি উঠিতে পারিতেছেন না। এই একটা দিনেই তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। তবু না উঠিলে উপায় নাই।

খোলা দরজা দিয়া একটি স্ত্রীলোক আসিয়া ঘরে ঢুকিল। মধ্যমাকৃতি ঋজু দেহ। যৌবনের চঞ্চলতা কাটিয়া যাওয়ায় তার চোখে মুখে একটি স্নিগ্ধ কমনীয় মাধুর্য্য স্থির হইয়া গিয়াছে।

হাতের আলোটা মেঝেয় নামাইয়া রাখিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল,—অত হাঁক ডাক কিসের বাপু! আমাদের কি ঘুম নেই! কি হয়েচে?

হয়েচে অনেক কিছুই, আগে শুধুই, তুমি জেগে ছিলে না ঘুমিয়ে ছিলে যোগি?

যোগিনী হাসিতে হাসিতে বলিল, আ মরণ, কিসের দুঃখে জেগে থাকব রাতদুপুরে! তুমি ছিলে বুঝি!

অন্য সময় হইলে রসিকতাটুকু আর কিছু দূর আগাইত। কিন্তু রজনী করের মনের অবস্থা আজ তেমন নয়। এখনও ত'ার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিতেছে। যোগিনীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আজ হীরু এসেছিল এই কতক্ষণ, জানলার বাইরে তার মুখ দেখে আমি চিনেছি!

যোগিনীর চোখে মুখে একটা চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল, বলিল ঘুমের ওষুধটা আজ তোমায় দেওয়া হয়নি কেমন!

রজনী কর বাধা দিলেন, আমার ঘুমের জন্যে অত ব্যস্ত হ'চ্চ কেন? আমি স্বপ্ন দেখে তোমাকে ডাকিনি।

যোগিনী একদৃষ্টে রজনী করের মুখের দিকে তাকাইল। মুখখানি সত্যই কেমন বিবর্ণ ঠেকিতেছে।

রজনী কর ঘরের ভিতর পা চালাইতে চালাইতে বলিলেন, সে পাষণ্ডকে কোনদিন আমি ত্রিসীমানায় আস্‌তে দেবনা। ভেবেচে তা'র জন্যে আমার ঘুম নেই, বয়ে গেছে এইটে। কুপুত্তুর, রাত দুপুরে ডাকাতি করতে এসেচে আমার বাড়ী, কিন্তু জানেনা যে, বাপ তা'র ডাকাতের ডাকাত।

কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রজনীকর এই উত্তেজনায় একটু ভীত এবং একটু লজ্জিত হইলেন।

সত্যসত্যই জীবনে তিনি অনেক কিছুই করিয়াছেন, অনেক কিছু। আলোকাকীর্ণ নিভৃত কক্ষের দিকে তাকাইয়া রজনী করের দুটি চোখ সহসা বিজয়ের উল্লাস ফুটিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া যোগিনীকে বলিলেন, যা কিছু আছে, তোমার কাছে ত গোপন নেই যোগি, সব আমি তোমাকেই দিলাম।

যোগিনী ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, রাত দুপুরে এসব কি শুনি, ও ঘরে মেয়ে আছে খেয়াল নেই?

কি জান যোগি, বলা ত যায় না কখন কি ঘটে, সব জেনে রাখাই ভাল! দেখ এই মেঝের তলায় সব আছে। কাউকে দিইনি যোগি, শুধু সঞ্চয় করেচি এতদিন। কিন্তু ভয় হচ্চে, এসব তুমি আবার রাখতে পারবে ত? যেন কাউকে দিও না বুঝলে?

যোগিনী বিহ্বলনেত্রে দাঁড়াইয়াছিল। রজনীকর সে দৃষ্টি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। আবার বলিতে লাগিলেন,—হীরুকে দিলাম না এই কথা ত, সে আমার ইচ্ছে। সে কুলাঙ্গার, তা'র আমি মুখ দেখবনা যোগি। রজনী করের দুটি চোখে একটি করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিঃশব্দে তিনি খোলা জানালাটা বন্ধ করিয়া পূর্ব্বের স্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

যোগিনী কুলুঙ্গী হইতে সত্যসত্যই ঘুমের ওষুধটা পাড়িয়া আনিল। রজনীকর শিশিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, চুলোয় দাওগে ওষুধ, আজ সারারাত জেগে থাকব। সে ব্যাটা কখন কি করে বসে কে জানে। ডাকাতি করতে এসেচে বুঝচনা। যাও, শোও গে যাও।

দরজা বিপুল শব্দে বন্ধ হইয়া গেল। যোগিনী কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

রজনী কর, সেদিন ভোর রাত্রে মারা গেলেন।

রজনী করের সংসারে যোগিনীর আগমন একটু বিস্ময়ের সূচনা করে।

রজনী করের স্ত্রী দিন কয়েক মারা গিয়াছেন। কি একটি বৈষয়িক কাজে রজনীকর মুর্শিদাবাদে গেলেন। সেখানে এই কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কাছেই এক ভদ্র পল্লীতে গান হইতেছিল। ভিড় ঠেলিয়া এক পাশে একটু জায়গা করিয়া রজনীকর গান শুনিতে বসিলেন।

গানের মর্ম্ম :—শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কুব্জার সহিত তাঁহার প্রেমের কথা রাই-কিশোরী দূতীমুখে শুনিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া

অভিমানিনী ইনাইয়া বিনাইয়া গাহিতেছেন :—বলি, ও কুব্‌জার বঁধুহে আজ যাও ফিরে যাও মথুরায়।

বড় মিষ্টি গলা মেয়েটির। বৃন্দাবনের কৃষ্ণবিরহিনী রাইয়ের কথা সুরের পাথায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া রজনীকরের হৃদয়ে অমৃতবর্ষণ করিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে এই সুকণ্ঠ মেয়েটি রজনীকরের দুটি চোখে বড় অপরূপ বলিয়া মনে হইল। এত দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখ এ সবের মধ্যে এই মেয়েটি কবে হইতে যেন তাঁর হৃদয়ের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে; ইহাকে বাদ দিলে তাঁর বাঁচিয়া থাকাই মিথ্যা! মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া প্রসন্নচিত্তে পরদিন রজনী কর গ্রামে ফিরিলেন। সে এই যোগিনী। সেদিন হইতে রজনী করের সংসারে তা'র ন'টা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

পূরা দুইটি দিন যোগিনী ঘরের এককোণে পড়িয়া রহিল। সে জলটুকু অবধি মুখে দেয় নাই।—রজনীকরের মৃত্যু তাহাকে এম্‌নি ভাবেই বিচলিত করিয়া দিয়াছিল। প্রতিবেশীরা আসিয়াছিল রজনীকরের শবদেহ শ্মশানে লইয়া সৎকার করার জন্য। সে কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া তাহারা এ গৃহের সম্পর্ক চুকাইয়াছে। তৃতীয় দিনে যোগিনী ঘর হইতে উঠানে নামিল। উঠানের উপর বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া রজনীকরের সংসারটা সে করুণনেত্রে দেখিতে লাগিল। এই সংসারে দুদিন আগেও একজন কর্ত্তৃত্ব করিয়াছে, প্রতিনিয়ত তার পায়ের শব্দ সে শুনিতে পাইয়াছে। আজ আর শত চেষ্টাতেও তাকে ফিরাইয়া আনা যাইবেনা;—চারিদিক হইতে নৈরাশ্য আর ব্যর্থতার ছায়া যোগিনীর চোখের উপর ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

রজনীকরের শয়ন ঘর হইতে বাহির হইতেই যোগিনী দেখিল, তারা উঠানের উপর দিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিতেছে। তারাকে দেখিয়া যোগিনীর মনটা হঠাৎ স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিল। এই সদ্য পিতৃহীনা মেয়েটিই যে সংসারে তা'র একমাত্র সম্বল, এ কথা তার নূতন করিয়া মনে হইল। ধীরে ধীরে যোগিনী তারার ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

যোগিনী বলিল, আজ তোমার যে একটু কাজ আছে মা; ত্রি-রাত্রি আজ, কথাটা আমার মনে হয়নি বল্‌তে। মধু পুরুতকে একবার খবর দিতে হত যে!

তা' আর বাকি আছে না কি? তারা যোগিনীর দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইল।

যোগিনী বলিল, জিনিষপত্র গুলো এখনই যোগাড় ক'রে নিতে হবে। কি কি লাগে তা'র একটা ফর্দ্দ চাইত।

তারা উত্তর দিল, তোমাকে কিছু ভাবতে হবেনা। সব এখনই হ'য়ে যাবে!

তারা চলিয়া গেল। যোগিনী ক্ষুব্ধ হইল। এই তিন দিনে তারাকে সে মুখের একটি কথাও শুধায় নাই। একটু সান্ত্বনা দিয়াও তারার চোখের জল মুছাইয়া দেয় নাই। তারার অভিমানটা যোগিনী বুঝিল। তারা যে কত বড় অভাগিনী, তা তা'র সিঁথির দিকে চাহিলেই স্পষ্ট মনে হয়। অভাগিনী আজ আবার পিতৃস্নেহ হইতেও চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইল।

শূন্য দৃষ্টিতে যোগিনী বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগিনীর বড় একটা সম্পর্ক ছিলনা। কারণ, রজনীকরের সংসারে যোগিনীর আগমনটা কোন দিনই তারা ভাল চোখে দেখে নাই। প্রতাপসম্পন্ন রজনীকরের সাম্‌নে তা'রা কিছু বলিতে সাহস না করিলেও, গোপনে গোপনে তা'রা এই বিষয় লইয়া বেশ আলোচনা করিত। যোগিনী তাহা বুঝিত, এইজন্য কোন দিনই সে তাহাদের কাছে যায় নাই।

রজনীকরের মৃত্যুর দিনকয়েক পরে যোগিনী একদিন পাড়ার ভিতর বেড়াইতে গেল। সুখে দুঃখে ইহারাই ত আজ সম্বল। ইহারা না দেখিলে কে তাহাদের দেখিবে! কিন্তু কোন হৃদ্যতার সংস্পর্শ যোগিনী তাহাদের কাছে পাইল না। সবাই তাহাকে বিদ্রূপ ও ঈর্ষার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। দুই একজন আবার তাহাকে চিনিতেই পারিলনা, এম্‌নি ভাব! একজন বয়স্ক গোছের লোক লজ্জার খাতিরে যোগিনীকে প্রবোধ দিল,—মানুষে দেখে আর কি কর্‌তে পারে মা, যাঁ'র দেখবার, তিনিই দেখ্‌বেন। তোমার কোন ভয় নেই। কথাটা খুবই সত্য।

যোগিনী মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, তিনি ত সবই দেখচেন, কিন্তু আপনাদের কাছে যখন আছিই, তখন আপনাদের কোন সাহায্যও কি আমি পাবনা?

পাবেনা কেন মা, খুব পাবে। কিন্তু সাহায্যের এমন দরকারও তোমার হবেনা। উনি ত আর তোমাকে পথে বসিয়ে যান্‌নি।

কথাটা যিনি বলিলেন, তাঁর ওষ্ঠে ক্ষীণ একটু হাসির রেখাও দেখা গেল।

যোগিনী ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু ইহাতে তেমন ক্ষোভ ছিল না! তারার ব্যবহারে যোগিনী দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। আজকাল বাড়ীতে তারাকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায়না। রজনী-করের তিরোধানে তারা একবারে স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে। গৃহকোণের সে করুণ ম্লানমুখী তারা আর নাই।

যোগিনী একদিন স্নেহের সুরে বলিল, পাড়ায় পাড়ায় যখন তখন ঘুরে বেড়ানোটা ভাল নয় তারা। তুমিও আর ছেলে-মানুষটি নও।

তারা যোগিনীর মুখের দিকে কিছুক্ষন স্থির নেত্রে তাকাইয়া রহিল, তারপর রুক্ষকণ্ঠে বলিল, কেন, আমি বেড়াই ত তোমার তাতে কি হ'ল শুনি। দিন রাত তোমায় মত ঘরের কোণে বসে থাক্‌লে সবাই আমায় ভাল বলবে নাকি ?

কথাটায় যে শ্লেষ ছিল, যোগিনী তাহাতে আহত হইল। সংসারে তার স্থান যে কোথায় তারা তাহাকে তীব্রভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যোগিনীর কোন লাভ নাই, সংসার যে আজ তাহারই। এ অবাধ্য মুখর মেয়েটিকে স্নেহ দিয়া আপন করিতে হইবে।

যোগিনী কাছে আসিয়া বলিল, আমি তোকে যদি না যেতে দিই, যাবি তুই! আমার কথা ছেড়েদে, তোর বুঝে চলার সময় এই! সংসারে আমি ছাড়া তোর আপনার বলতে নেই কেউ, বুঝে দেখিস্।

তারা কোন কথা বলিলনা।

একটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। খিড়্‌কির পুকুর হইতে বিকালে গা ধুইয়া ভিজা কাপড়ে উঠানে ঢুকিতেই যোগিনী সেদিন অবাক হইয়া গেল। উঠানের উপর পাড়ার তিন চারিজন ভারিক্কি বয়সের লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গুঞ্জন করিতেছে। আর তা'দের এক পাশে দাঁড়াইয়া তারা। ইহাদের দেখিয়া যোগিনীর ভিতরের ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে দেরী হইলনা। যোগিনী কাঠের মত দাঁড়াইয়া ভারি গলায় শুধাইল, ব্যাপার কি তারা ?

উত্তরটা আর তারাকে দিতে হইলনা। প্রবীণ রাখাল সরকার একটু হাসিয়া বলিলেন, তারা আমাদের সকলকে ডেকে এনেচে, বাপের জিনিষপত্র নগদ টাকার একটা ব্যবস্থা করে নেবে।

যোগিনী এ কথায় মোটেই বিচলিত হইল না। বলিল, আমার সঙ্গে পৃথক হবে বুঝি, কিরে হবি নাকি ?

তারার মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল। যোগিনী দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—পৃথক্ হবি কা'র সঙ্গে তুই ? কে তোকে পরামর্শ দিয়েচে শুনি ? এ সংসার আমার না তোর রে ? তুই দেখে শুনে নে না সব, কিছু আমি নেব না, একটা কানা কড়িও না। যে পায়ে এসেচি সেই পায়ে চলে যাব।

সিক্তবসনা যোগিনীর মুখের দৃঢ়তা অপরূপ শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে! যোগিনীর দিকে চাহিয়া কাহারও কণ্ঠে একটা কথা অবধি ফুটিলনা। তারা কুণ্ঠিতভাবে সবাইএর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

রাখাল সরকার অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, তবে আমা-দের আর কিছু বলার নেই মা, আমরা আসি।

যোগিনী দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, তাই আসুন, বোঝাপড়ার যদি দরকার হয়, আমরাই ক'রে নিতে পারব। তারা কিছু ছেলে-মানুষ নয়।

তা বটে, রাখাল সরকারের দল ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

যোগিনী তারার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, তোর কিছু যদি বলার থাকে, আমাকে স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে পারিস্ তারা, গাঁয়ের লোকের কথা আমি বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ব না।

তারা কোন উত্তর দিল না। যোগিনী ভিজা কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

পাড়ার কান্তের মা ঝিএর কাজে লাগিয়াছে। হাট্‌টা

বাজারটাও কান্তের মাকে নিজের হাতে করিতে হয়। এ বাড়ীর কাজ করিতে আসিয়া তা'কে পাড়ার লোকের কম কথা শুনিতে হয় নাই। কিন্তু কান্তের মা নির্ব্বিকার, সে জানে তা'র পেট আছে, দুঃখ ধান্দা না করিলে চলিবে কি করিয়া?

পাড়ার লোকে কেউ আমাকে দু চোখে দেখতে পারেনা, কি বলিস্ কান্তের মা। যোগিনী কথাটা একদিন হাসিতে হাসিতে শুধাইল।

কান্তের মা বলিল, হ্যাঁ গো সত্যি কথা; দিন রাত শুধু ফিস্ ফিস্ আর গুজ্ গুজ্ করে তোমার সম্বন্ধে কথা, কান পাতার যো নেই; আর এক কথা, তারাকে ওদের কাছে যখন তখন যেতে দিওনা বাপু। কি জানো পাড়ার সবই তোমার শত্তুর, যুবতী মেয়ে, যদি কোন ভাল মন্দ হয়।

যোগিনী ইহা নিজেও জানে। কিন্তু উপায় কি? এ গাঁ হইতে বাস কি তাহারা উঠাইয়া লইবে?

কান্তের মা তারাকে চোখে চোখে রাখিতে লাগিল। পাড়ায় যে যে বাড়িতে তারার অবাধ গতি, সেই সব স্থানে কান্তের মা সকাল সন্ধ্যায় ঘুরিতে লাগিল। সবাই জানিল, কান্তের মার এতখানি চেষ্টার মূলে কাহার ঈঙ্গিত সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

মাস তিন চার পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় কান্তের মা ব্যস্তভাবে যোগিনীর কাছে আসিয়া বলিল, যা বলেচি তাই, সিঁদুরে কুঠির রায় বাবুদের পাল্কিতে চড়ে তারা রাণী বসে আছে। ঘাট পার হয়ে দশ বেহারা বাতাসের আগে বেরিয়ে গেল!

যোগিনীর মুখে প্রথমে কোন কথা ফুটিলনা। তারপর বলিল,—দেখে এলি স্বচক্ষে? গাঁয়ের কেউ সেদিকে এগোলনা?

কি বোকা তুমি বাপু, গাঁয়ের লোকেরই ও কাজ। তারা এগোবে কিসের দুঃখে?

যোগিনী শুধাইল, তারা কাঁদ্‌ছে না? তোকে দেখে কিছু বল্‌লনা?

ওমা আমাকে কি বল্‌বে গো,—একবার দেখেই হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল। ছুঁড়ির তলে তলে এত সাড়ানিও ছিল।

যোগিনী আর কিছু শুধাইলনা।

তালগাঁয়ের ব'সেদের কথা অনেকদিন পরে যোগিনীর মনে পড়িতেছে। প্রকাণ্ড চক্‌মিলানো বাড়ী—বাগ-বাগিচা দীঘি—দীঘির কালো জলে গাছের ছায়া দিনরাত্রি কাঁপিয়া উঠিতেছে।

একদিন বাবা আসিয়া বলিলেন, মাকে আমি নিতে এসেচি বেহাই মশায়, ওর মার বড় অসুখ।

তা কি করে সম্ভব,—এখন আমি পারব না লিখেচি ত আপনাকে।

আমার সময়টা আপনি বুঝ্‌চেন না, একটা বিবেচনা থাকা উচিত ত?

—তা বটে, নিয়ে যান্।

সে বাড়ীতে আর কোন দিন যোগিনীর ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই। যোগিনী ভাবিত, কেউ একদিন আসিবে! ছেলেরই ত বউ, শ্বশুর রাগ করিবেন কেন?

গাঁয়ের বিস্তৃত মাঠের উপর দিয়া যে পথ তালগাঁয়ে চলিয়া গিয়াছে, সেই পথের দিকে যোগিনী ব্যাকুল নয়নে তাকাইয়া থাকিত। তা'র পর একদিন তাহারা আসিল। সেও ঠিক এম্‌নি সন্ধ্যায়। ধক্ ধক্ করিয়া মশালের আলোয় চারিদিক আলো হইয়া উঠিয়াছে। কাহারা তা'কে পাল্কির ভিতর উঠিতে বলিল। কাহারা এরা? বাবা কই? যোগিনী একবার সভয়ে তাকাইয়া পালকিতে গিয়া উঠিল। পরে সে জানিল, এ পাল্কি তাল গাঁর ব'সেদের নয়।

চট্ করিয়া চেতন হইতেই যোগিনী দেখিল, সে মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া শুইয়া আছে। প্রদীপের আলোটা ঘরের ভিতর মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

যোগিনী ডাকিল, কান্তের মা।

কেন?

ঘুমিয়েছিস্!

না, আজ আর রান্না বান্না কর্‌বনা!

থাক্ গে।

যোগিনী পাশ ফিরিয়া শুইল। তার মনে হইতে লাগিল, তারার কোন দোষ নাই। একটি নিষ্পাপ জীবন যোগিনীর সংস্পর্শে আসিয়া দিন দিন পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে তা'র পাপের আদর্শ তারার জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তারার কি অপরাধ?

যোগিনীর চখের উপর সারা পৃথিবীটা অট্টহাসির মত

ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। যোগিনীর মনে হইল, কে সে? এ সংসারে কিসেরই বা তা'র অধিকার? ইচ্ছা করিতে লাগিল, এখান হইতে এই মুহূর্ত্তেই সে ছুটিয়া পালায়। যেখানে মানুষের সম্বন্ধ নাই, এমন কোন নিভৃত স্থানে গিয়া সে দুদণ্ডের জন্য আত্মগোপন করে।

ভাবিতে ভাবিতে অনেক রাত্রে যোগিনী নিদ্রা গেল।

দ্বিপ্রহরে খাওয়া দাওয়ার পর যোগিনী সেদিন বিশ্রাম করিতেছে,—কে যেন বাহির হইতে ডাকিল বলিয়া মনে হইল। কিছুক্ষণ আগে কান্তের মা বাড়ী গিয়াছে, যোগিনী উঠিয়া উঠান দিয়া বরাবর রুদ্ধ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

খিল খুলিয়া যোগিনী শুধাইল, —কে গো বাছা?

আমি, আমি,—তারপর আরও কি বলিতে গিয়া লোকটি সবিস্ময়ে যোগিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শীর্ণ মূর্ত্তি, তবু চেহারায় একটু আভিজাত্যের ছাপ রহিয়াছে। মনে হইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সে এই গৃহ-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকটির চ'খ দুটিতে কেমন একটা ক্লান্ত ভাব।

লোকটা পুনরায় শুধাইল,—এ বাড়ীতে রজনী কর বাবুর কেউ নেই?

যোগিনী উত্তর দিল, আছে। আপনার দরকার আছে বুঝি কারুর সঙ্গে।

এমন দরকার বিশেষ নেই, তবু একবার এসেছিলাম এইদিকে,—আমি তাঁর ছেলে।—লোকটি ইতস্ততঃ করিয়া শেষ কথাটা যোগিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া ফেলিল।

যোগিনীর চ'খদুটি গভীর বিস্ময়ে আয়ত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম হীরু, হীরালাল?

ঘাড় নাড়িয়া সে এ কথার উত্তর দিল।

যোগিনীর যেন কি হইয়া গেল! এক নিমেষে সে সকল সঙ্কোচ ভুলিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া হীরালালের হাত দুখানা ধরিয়া ফেলিল, আয় বাবা! তারপর সেই খোলা দরজা দিয়াই হীরালালকে এক রকম বুকে করিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। কি করিবে কি বলিবে কিছুই যোগিনী ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা; চ'খ দুটিতে তা'র জীবন ফিরিয়া আসিয়াছে।

হীরালালের বিস্মিত দুটি চখের উপর কিছুক্ষণ সে তাকাইয়া বলিল, ঘরের ছেলে ঘরে আস্‌বি, এতে তোর দ্বিধা কিসের বাবা। সংসার ত তোরই, আমি শুধু আগ্‌লে নিয়ে পড়ে আছি; তুই দেখে নে, বুঝে নে চুল চিরে। অন্যায় এতটুকু হয়নি।

গভীর উত্তেজনায় যোগিনীর ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছে। হীরালাল তা'র মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

যোগিনীর জীবন ঠিক স্রোতের ন্যায় ক্ষিপ্র হইয়া উঠিয়াছে। দিন রাত্রি বুকের উপর যে ভারি পাষাণ চাপা ছিল তাহা নামিয়া গিয়াছে। কে জানিত হীরু আবার ফিরিয়া আসিবে। স্বেচ্ছায় যে একদিন সব ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, সে আর নাও ফিরিতে পারিত ত? কত ছেলে যায়, আর ফেরেনা। হীরু তা' করে নাই। সংসারে তা'র মমতা আছে, সে ফিরিয়া আসিয়াছে। যোগিনী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বহুদিন পরে নিভৃতে সে একবার প্রাণ ভরিয়া হাসিল।

সংসারে এবার মন দে হীরু, দশটা বছর ত ঘুর্‌লি, হয়রানও খুব হয়েছিস্, আর না বাবা!

হীরু হাসিল।

আমি না থাক্‌লে কে তোর মুখ চেয়ে থাক্‌ত, একবার ভাব দেখি; বাড়ীঘর জঙ্গলে ভরে যেতনা? যাক্, ভগবান্ তোর সুমতি ফিরিয়েচেন। তাঁর বিচার নেই কে বলেচে রে?

আছে বই কি, নইলে কেন ফির্‌ব!

যোগিনী শুনিয়া খুসি হইল।

তবু মাঝে মাঝে যোগিনীর একটু সংশয় হয়। হীরু যেন নিজেকে ঠিক করিয়া লইতে পারিতেছে না। সে কেমন যেন একটু উদাস আবার চঞ্চল। বেশির ভাগ সময়ই সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

একদিন যোগিনী শুধাইল, তুই যে বল্‌লি সন্ন্যাসী হয়েছিলি, তা' গায়ে ভস্ম মাখ্‌তিস্ ত?

হীরালাল মৃদু হাসিয়া বলিল, ভস্ম না মাখ্‌লেই বুঝি আর সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। না আমি কখনও মাখিনি।

আমিও তাই ভাবি, ছাই-ভস্ম কেন মাখ্‌তে যাবি? কিসের দুঃখে শুনি, ঘর বাড়ি নেই তোর?

হীরালাল হাসিতে লাগিল।

সেদিন রাত্রি বেলায় বিছানায় শুইয়া যোগিনীর মনে হইল, কে যেন খিড়্‌কি পুকুরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে। ফুট্‌ফুটে রঙ্‌, চখের ভুরু দুইটি টানা টানা, কটিদেশ অবধি কাল চুলের রাশ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। যোগিনী মেয়েটিকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। চিনিয়া একদৃষ্টে সে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। কি যেন মেয়েটি বলার উপক্রম করিতেছে, যোগিনীর চট্‌ করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, কিছুই নয়, অন্ধকারে নারিকেল গাছের ডাল্‌টা বাতাসে অবিরাম কাঁপিতেছে।

এই মেয়েটির ইতিহাস যোগিনী অনেকদিন আগে শুনিয়াছে। হেমদা তখন এ সংসার হইতে কেবল বিদায় লইয়াছিল।

রজনী কর একদিন ঢের রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া বলিলেন, জাল দলিল প্রমাণ হয়েচে হেমদা, সুখেশ মুখুয্যের স্থাবর অস্থাবর আর দুদিন বাদেই ডিক্রী ক'রে নেব।

হেমদা বলিল, অমন কথা মুখে এন না, জীবনে ঢের পাপ করেচ, মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়েচ, আর নয়। তোমার দুটি সন্তান আছে, তাদের মুখ চেয়ে ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়ো।

রজনী কর হাসিলেন, বলিলেন, ক্ষমা টমা বুঝিনে, সুখেশের স্ত্রীকে পথে বসাব, এই জানি।

আহা সতীলক্ষ্মী মেয়ে গো, ওকে দুঃখ দিয়ে তোমার কি লাভ হবে। আমার কথা রাখ!

ক্ষতিই বা হবে কি?

হবে বৈকি, না হ'লে কেন বার বার ক'রে অনুরোধ করিচি তোমাকে! রাখ্‌বে না কথাটা!

পাগল নাকি; চ'খ আছে দেখ আগে কি করি!

হেমদার দুচ'খ বহিয়া কান্না আসিয়া পড়িল! এ গৃহে আসিয়া স্বামীর শত শত হীন আচরণ সে দেখিয়াছে। টাকার জন্য মানুষ কি না করে! তবু সব কিছু সে সহিয়াছে। আজ অভিমান তা'র বাধা মানিলনা। ছেলে মেয়েদের স্নেহময় দৃষ্টির দিকে সে তাকাইল না। চুপি চুপি সে খিড়্‌কির পুকুরের দিকে অগ্রসর হইল। ভোর বেলায় রজনী কর দেখিল হেমদার মৃত দেহ জলের উপর ভাসিতেছে!

সে দিন হইতে হীরালালের এ সংসারের সহিত ছাড়াছাড়ি! রজনী করের নৃশংস আচরণ সে ক্ষমা করিতে পারে নাই!

শেষ রাত্রির দিকে যোগিনী ধড়্‌মড়্‌ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। সোজাসুজি একেবারে রজনী করের শয়ন-কক্ষের দ্বারে আসিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ঘরেব ভিতর আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু ঘর শূন্য। দীর্ণ বিদীর্ণ মেঝের উপর সারি সারি পিতলের কলসী। যোগিনী সরিয়া আসিয়া দেখিল, টাকা আর গহনায় প্রত্যেকটি কানায় কানায় ভর্ত্তি হইয়া আছে!

এত রাত্রে কে এগুলি তুলিয়াছে!

হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া যোগিনী ডাকিল, হীরু।

ত্রস্তপদে খিড়্‌কীর দরজার কাছে আসিয়া যোগিনী দেখিল, দরজা খোলা আছে। পুকুর ঘাটে নারিকেল গাছের মাথায় একটা বড় তারা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। সে আলোয় পথের রেখাটা ক্ষীণভাবে চ'খে পড়িতেছিল!

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যোগিনী আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, হীরু, হীরু, হীরালাল···

কিন্তু কোথায় সে? কোন দিক্‌ হইতেই আজ তাহার সাড়া মিলিলনা।

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

কাব্যে রবীন্দ্রনাথের দুই রূপ

শ্রীসুখরঞ্জন রায় এম্‌-এ

মধ্যযুগের শেষ

"সোনার তরীর" যিনি মানস সুন্দরী, প্রকৃতির মাঝে যিনি বিচিত্ররূপিণী, তিনিই "চিত্রা" কাব্যে চিত্রারূপে দেখা দিয়াছেন। বাহিরে যিনি বিচিত্রা এবং ভিতরে যিনি এক, সেই প্রকৃতির মর্ম্মবাসিনীকে আহ্বান করিয়া কবি বলিতেছেন—

চিত্রা

অপার রহস্য তব হে রহস্যময়ী
খুলে ফেল—আজি ছিন্ন করে ফেল ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর।
মহামৌন অসীমতা নিশ্চল সাগর,
তারি মাঝখান হতে উঠে এস ধীরে
তরুণী লক্ষ্মীর মত হৃদয়ের তীরে
আঁখির সম্মুখে!

সেই প্রকৃতির মর্ম্মপুরে "নন্দনবনের মাঝে"

নির্জ্জন মন্দির খানি:—যেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা, রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে,
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক!
তারি পদে, মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ;
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে।

ইনি কে? সকলের মনে এবং মুখে উত্তর আসিবে, ঈশ্বর। কিন্তু কবির কাছে ইনিতো সেই মামুলি ঈশ্বর নন্‌।

শুধু জানি তাহারি মহান্‌
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চল প্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বরে ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্ত্তি খানি
বিকাশে পরম স্থানে প্রিয়জন মুখে! শুধু জানি
যে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান

এঁকে যে "বিশ্বপ্রিয়া" বলা হইয়াছে! হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। ইনিতো ভগবান নন্‌। একটু নীচেই দেখি—

প্রসন্ন বদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্য খানি।

তখনি পরিষ্কার বুঝিতে পারি ইনি সেই মানস-সুন্দরীই, সেই "বিশ্ব-সোহাগিনী লক্ষ্মীই, তবু সৌন্দর্য্যরূপ ছাড়িয়া তিনি মঙ্গলরূপ ধরিয়াছেন। এই রূপের ভিতর দিয়াই কবি মানস-সুন্দরীকে আনিয়া বিশ্বদেবতা বা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন বলিতে পারি।

মানস-সুন্দরীর মঙ্গলরূপ ফুটিয়াছে এই "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায়, তারি তত্ত্বরূপ ফুটিয়াছে "অন্তর্য্যামী" ও "জীবন দেবতায়"। মানস-সুন্দরী ও জীবন-দেবতা একই, তবে একটি অন্যটির পরিণত রূপ। মানস-সুন্দরী মঙ্গলের দিক দিয়া যেমন বিশ্বদেবতা, সত্যের দিক দিয়া তেমনি জীবন দেবতায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। এই জীবন-দেবতা কে? অনেকে তার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে দুই উত্তর কিম্বা দুই ধারণা হইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না। Thomson সাহেব জীবন-দেবতাকে সক্রেটিশের doemon এবং platoর ideaর সঙ্গে তুলিত করিয়াছেন মনে হয়। এ মর্ম্মে যাকে oversoul বলিয়াছেন এই জীবন-দেবতাকে তাও মনে করা চলে। কবি নিজেই অন্যত্র তাঁর ক্ষুদ্র-আমি ও বৃহৎ-আমির কথা বলিয়াছেন। নীতির দিক দিয়া ইহা বিবেক, সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া ইহা মানস-সুন্দরী, জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের দিক দিয়া ইহা জীবন-দেবতা। এই জীবন-দেবতা হইয়াছে কবির বৃহৎ-আমি, যাহা বিশ্ব-আত্মা (uni-

versal soul) এবং ব্যক্তি-আত্মার (individual soulএর) মধ্যে যোগসূত্রের মত কাজ করিতেছে। এই জীবন-দেবতা কবির জীবনের সমস্ত ছিন্নগ্রন্থিকে এক করিয়া কবির ব্যক্তি-আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া এবং তার সঙ্গে একাত্ম হইয়া অথচ তাহার অতীত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। জীবন-দেবতা মুক্ত আকাশ, ব্যক্তি আত্মার ঘটে তারি প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। কবি জিজ্ঞসা করিতেছেন—এ প্রতিবিম্ব কি স্বচ্ছ হইয়াছে, তুমি কি আমার ভিতরে আসিয়া তৃপ্ত হইয়াছ? অর্থাৎ কবির ক্ষুদ্র আমি কি তার বৃহৎ আমির—তাঁর আদর্শের অনুরূপ হইয়াছে? আর তা যখন হইয়াছে তখনই জীবন-দেবতা কবির জীবনকে বিশ্ব-দেবতার পূজার প্রদীপ করিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছেন।

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দির তলে?

বিশ্বদেব হইতে জীবনদেব যে পৃথক, অথচ দুইয়ের মধ্যে যে যোগসূত্র রহিয়াছে এই কয়টি কবিতা-পংক্তিতেই তাহা ধরা পড়ে। জীবনদেবরূপী মুক্ত আকাশই মহাকাশের সঙ্গে কবির অন্তরাকাশকে আনিয়া যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। একদিকে জীবন-দেবের ধারণার সোপান অবলম্বন করিয়া কবি ক্রমে বিশ্বদেবের ধারণায় আনিয়া উপনীত হইয়াছেন বলিতে পারা যায়। নানা কবিতায় মানস সুন্দরীকে কবি নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু 'চিত্রায়' "অন্তর্যামী" পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বত্রই নারীরূপিণী। "জীবন-দেবতা" কবিতাতেই তিনি সর্ব্বপ্রথম পুরুষ হইয়া দেখা দিয়াছেন, তিনি সেখানে 'অন্তরতম' 'জীবন নাথ' 'প্রাণেশ' আর কবি হইয়াছেন নারী। অধ্যাত্মরাজ্যে এই অপরূপ যৌন-বিনিময়ের কথা এমার্সন এক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। মানস-সুন্দরী ক্রমপরিণত হইয়া তার এই যৌন পরিবর্ত্তনটি আমার কাছে বিশেষ অর্থপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। বিশ্বদেবের সঙ্গে জীবনদেবের ব্যবধান যে খুব সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে ইহা তাহারি প্রমাণ। এই জীবনদেবতার ব্যাপারটিকে টম্‌সন্ সাহেব রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের একটা passing phase বলিয়াছেন। আমি মনে করি এবং তাহা দেখাইতেও চেষ্টা করিয়াছি, কবির কৈশোরের কবিতা-বধূ যৌবনের মানস-সুন্দরীর ভিতর দিয়াই যৌবনান্তকালের জীবন-দেবতার মধ্যে আসিয়া নবরূপ গ্রহণ করিয়াছে, আর এই জীবন-দেবই আবার গীতাঞ্জলির যুগের বিশ্বদেবের সহিত যুক্ত। এই জীবন-দেবতাই আবার সবুজপত্রের যুগে—কবির দ্বিতীয় যৌবনের যুগে—"বলাকা"য় আবির্ভূত হইয়াছে, এবং শেষে 'পূরবীতে সমস্ত কাব্যটির মধ্যে প্রধান স্থান জুড়িয়া আছে। যখন ভাবি রবীন্দ্র-কাব্যে একদিকে মর্ত্ত্য-নারীর ধারাটাই মানসী ও মানস-সুন্দরীর ভিতর দিয়া জীবন-দেবতায় আসিয়া মিশিয়াছে এবং অন্য দিকে যখন দেখি জীবন-দেবতা ও বিশ্ব-দেবতার মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম পর্দ্দা ক্ষণে ক্ষণে উড়িয়া গিয়াছে, যখন দেখিতে পাই কবির মধ্য যুগের জীবন-দেবতা দক্ষিণে বামে হস্ত প্রসারিত করিয়া কবি-জীবনের আদিকাণ্ড ও উত্তর কাণ্ডকে বিবৃত করিয়া রাখিয়াছে, যখন দেখি জীবন-দেবতা রূপ ফলটি "চিত্রা" কাব্যে তত্ত্বে-রসে পূর্ণ হইয়া উঠিলেও কবির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী কাব্যজীবনে প্রসারিত বিস্তৃত রসপায়ী শিকড়জালের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ রহিয়াছে তখন কবির কাব্যে সেটাকে আর একটা আকস্মিক কিম্বা ক্ষণস্থায়ী আবির্ভাব বলা চলে না। বরং এ কথাই বলিতে হয় জীবন-দেবতার ধারা কবির কাব্যে একটি প্রধান পরিব্যাপক ধারা। পূর্ব্বে আমরা রবীন্দ্র-কাব্যে 'নারী' ও 'মানব' এই দুই ধারার কথা উল্লেখ করিয়াছি। জীবন-দেবতার ধারা বস্তুতঃ একদিকে নারী এবং অন্যদিকে বিশ্বদেবতার ধারার মধ্যে যুক্ত, এরা তিনে এক একে তিন। নারী, জীবন-দেবতা এবং বিশ্বদেবতা এই ত্রিরূপী পরম ইপ্সিতের সঙ্গে কবির অন্তরের যোগ নানা লীলাখেলায়, আর মহামানবের সঙ্গে হলো তাঁর বাহিরের যোগ নানা কর্ম্মের বন্ধনে। এই অন্তর্ধারা ও বহির্ধারা, এই সৌন্দর্য্যের ধারা ও মঙ্গলের ধারা রবীন্দ্র-কাব্যে নানা সংযোগে বিয়োগে প্রবাহিত। *

---

* আমি প্রস্তাব করিতেছি কবির জীবন-দেবতা ভাবদ্যোতক সমস্ত কবিতা গুলিকে একত্র সংগ্রহ করিয়া

এই জীবনদেবতারই ভাব 'চিত্রা' 'জোৎস্নারাত্রে,' 'প্রেমের অভিষেক', 'এবার ফিরাও মোরে', 'অন্তর্যামী' 'জীবনদেবতা' ছাড়াও 'চিত্রা' কাব্যের আরো কয়েকটি কবিতায় পাই। 'পূর্ণিমায়' কবি যখন তর্কজালবিজড়িত ঘন বাক্য-বনে শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ অক্ষরের পথে একাকী ভ্রমিতেছিলেন তখন হঠাৎ তিনি বিশ্বব্যাপিনী 'লক্ষ্মী'রূপে আসিয়া কবিকে দেখা দিয়াছেন। 'সান্ত্বনা'য় তিনিই 'বাসরের রাণী'র বেশে রুদ্ধকণ্ঠ গীতহারা কবিকে 'মঙ্গল প্রদীপ ধরে বরণ করিয়া পুষ্প-সিংহাসনে আনিয়া বসাইয়াছেন। 'আবেদনের' রাণীও তিনিই আর ভৃত্য কবি নিজে। 'আবেদন' কবিতাটি হইয়াছে 'এবার ফিরাও মোরে'র উল্টা পিঠ। এখানে কর্ম্মজগৎ হইতে সরিয়া আসিয়া কবি হইয়াছেন রাণীর স্বেচ্ছাবন্দী দাস, খ্যাতিহীন, কর্ম্মহীন মালঞ্চের মালাকর। এই জীবন-দেবতাকেই কবি তাঁর 'শেষ উপহার' নিবেদন কয়িরা দিয়াছেন। 'চিত্রা'র শেষ কবিতা 'সিন্ধুপারে' 'আসিয়া দেখি 'এখানেও তুমি জীবনদেবতা'। 'সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি সেই সুধাভরা আঁখি, কবিকে 'চিরদিন যাহা হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি !"

সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর ধ্যান ধারণায় এবং পূজায় 'চিত্রা' কাব্যটি ওতপ্রোত। এই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকে জীবনদেবতারই একটি প্রকাশরূপে আমরা এতক্ষণ দেখিয়া আসিয়াছি। এই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী জীবনদেবতার ধারণার কতকটা বাহিরে স্বাধীনভাবে বিশ্ববিশ্রুত 'উর্ব্বশী' কবিতায় তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই কবিতাটি অবিমিশ্র সৌন্দর্য্যপূজার শ্রেষ্ট ফল, বিশ্বসাহিত্যে অতুল। যুগযুগান্তর হইতে দেব ও মর্ত্ত্যমানবের আকাঙ্ক্ষার জিনিষ এই যে উর্ব্বশী প্রাচ্যমনের সৌন্দর্য্যবোধের এই যে চরম বিকাশ, তার সঙ্গে পাশ্চাত্য Aphrodite—যাকে Swinburne কবিতায় রূপ দিয়াছেন—তার রূপ নিঙড়াইয়া মিশাইয়া কবি Keats এর ঐশ্বর্য্যময় ও ঘনীভূত শিল্পপ্রকাশের ক্ষেত্রে কবি এই অনবদ্য সৃষ্টিটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। স্বর্গপরী এই বিশ্বপ্রেয়সী উর্ব্বশীর প্রতীকটি অবলম্বন করাতেই সৃষ্টি-হিসাবে কবিতাটি এমন আশ্চার্য্য রূপে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যচেষ্টার মধ্যেও পৃথক গৌরব অর্জ্জন করিয়া তাঁর দুইরূপের মধ্যে একরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতি-নিধি-কবিতা হইয়া আছে।

কিন্তু ইহার সঙ্গেই পরবর্ত্তী কবিতা "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতাটা অনুধ্যান করিলে বুঝা যাইবে এমন কি সৌন্দর্য্য-বোধের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় রূপও কি করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে। এই কবিতায় দেখিতে পাইতেছি স্বর্গের উর্ব্বশীর সঙ্গে মর্ত্ত্যনারীর পার্থক্য কোন জায়গায়। উর্ব্বশী হইয়াছে "নিষ্ঠুরা বধিরা'। স্বর্গের অপ্সরী "কারে কবে করে না প্রার্থনা

—কারো তরে নাহি শোক।" ধরার প্রেয়সী
শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্ত্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা।

"তারপরে"—অর্থাৎ বিবাহের পরে—

সুদিনে দুর্দ্দিনে, কল্যাণ কঙ্কন করে,
সীমন্ত সীমায় মঙ্গল সিন্দুর বিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী সুখে দুঃখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে।

কবি স্বর্গ হইতে—অর্থাৎ উর্ব্বশীর রাজ্য এবং তারি কল্পনা হইতে—মর্ত্ত্যজননীর কাছে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মর্ত্তকে "পুত্রহারা" বলা হইয়াছে, কারণ কবি এতদিন প্রেমের সৌন্দর্য্য-স্বর্গে নির্ব্বাসিত ছিলেন, মর্ত্ত্যপ্রেমের মঙ্গলদিকটা তাঁর চোখে পড়ে নাই। আজ কবি মর্ত্ত্যজননীর কোলে ফিরিয়াছেন, যেখানে

বাজিবে মঙ্গল শঙ্খ, স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে
তব গেহে, তব পুত্রকন্যার মাঝারে
আমারে লইবে চিরপরিচিত সম।

উপযুক্ত ভূমিকা ও টীকা সহ একটি সংস্করণ প্রকাশের কেহ ভার নিন। ইংরাজীর মত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও ছোট গল্প প্রভৃতির উচ্চবিদ্যালয়ে পাঠের উপযুক্ত এমন সব সংস্করণ কেন যে বাহির হয় না জানিনা। ছোট গল্পের মধ্য হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে কবির অলোকপন্থী (Mystic) গল্পগুলি একত্র করিয়া উপযুক্ত ভূমিকা সহ বাহির করা চলে।

"উর্ব্বশী" ও "স্বর্গ হইতে বিদায়" দুইটা complementary কবিতা, একে অন্যের অনুপূরণ করিতেছে। দুইটাতে রবীন্দ্রনাথের দুই রূপ আমরা পাইতেছি, দুইটাতে প্রেমের দুই-দিক—একটাতে পাই সৌন্দর্য্য, আর একটাতে মঙ্গল; একটাতে প্রেমের কল্পপন্থী (Romantic) দিক, অন্যটিতে তার ধ্রুবপন্থী (Classical) দিক—একটাতে পাই নারীকে মোহিনীরূপে, আর একটাতে পাই গৃহলক্ষ্মীরূপে। বিজয়িনী"তেও নারীর এই মোহিনীরূপই আঁকা হইয়াছে। "রাত্রে ও প্রভাতে" কবিতায়ও এই দুইরূপের কথাই বলা হইয়াছে।

> রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
> তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরি,
> প্রাতে কখন দেবীর বেশে
> তুমি সমুখে উদিলে হেসে।

চৈতালী

"চিত্রার" সৌন্দর্য্য স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়াই মনে হয় কবি "চৈতালীর" মধ্যে মর্ত্ত্যকে এমন সাক্ষাৎ ভাবে দেখিয়াছেন, পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছ জিনিষকে কবি Wordsworthএর মত এমন হৃদয়ের আলোকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছেন, ধূলি ও মলিনতার ভিতর হইতেও মঙ্গলের দ্যুতি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। "দুর্লভ" কবিতায় "চৈতালির" মুল সুরটি ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—

> যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়.
> সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।
> দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
> দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

এখানে পশ্চিমী মজুরের ছোটমেয়ে—"কর্ম্মভারে অবনত অতি ছোটদিদি" নরশিশু ও ছাগশিশুর পরিচয়, কৃষক ও তার পুঁটুরাণী নামে মহিষ, বেদের মেয়ে ও তার কুকুরশিশু, কন্যাহারা গৃহকর্ম্মরত ভৃত্য—সমস্তের উপরই কবির সহানুভূতি আসিয়া পড়িয়াছে। ভালবাসাই এখানে পূজা হইয়া গিয়াছে। দেবতা দরিদ্রের রূপ ধরিয়া বলিতেছেন—

> জগতে দরিদ্র রূপে ফিরি দয়াতরে,
> গৃহহীনে গৃহে দিলে আমি থাকি ঘরে।

এই সমস্ত কাব্যটি জুড়িয়া কবি বিশেষ করিয়া শান্তসংযত মঙ্গলের জ্যোতিই বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন; প্রাচীন ভারতের তপোবনের শান্ত ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; নাগরিক সভ্যতার চেয়ে তপোবনের সভ্যতাকে বেশী কাম্য মনে করিয়াছেন; যে নারী অর্দ্ধেক বিধাতার সৃষ্টি অর্দ্ধেক সৃষ্টি পুরুষের, যে অর্দ্ধেক মানবী এবং অর্দ্ধেক কল্পনা তার মানসী ছবির সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের ছবিও প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছেন।—

> তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
> তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

এ নারীরই "ধ্যানে" "নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ' নারীর মাঝে আত্মপ্রতিরূপ দেখিতেছেন। "শান্তিমন্ত্রে" কবির জীবনের অধিষ্ঠাত্রী "অন্তর্যামিনী দেবী"কে কবি তাঁহাকে শান্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে বলিতেছেন, বলিতেছেন সংসারের বিরোধ এবং বিদ্বেষের মাঝে তাঁর বীণার মঙ্গল ধ্বনিতে কবি-চিত্ত নিত্যকাল ধ্বনিত করিয়া রাখিতে।

কল্পনা

"চৈতালি"র বাস্তব স্পর্শ হইতে "কল্পনা"য় আসিয়া দেখি "চৌরপঞ্চাশিকা" "স্বপ্ন" "মদন-ভস্মের পূর্ব্বে" "মদনভস্মের পর" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় কবির চিত্ত কল্পনার পক্ষে ভর করিয়া অতীতের অভিসারে ছুটিয়াছে। আবার স্বপ্নে উজ্জয়িনী প্রয়াণের উল্টাদিকে খুব নিকট বর্ত্তমানের কয়েকটি দেশ-প্রেমের কবিতাও ইহাতে আছে। আমাদের এই প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া দরকার যে তিনটি কবিতার তার মধ্যে "বিদায়" ও "অশেষ" কবির দুইরূপের দ্বন্দ্বকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কবির এ "বিদায়ে"ও সৌন্দর্য্য-স্বপ্নের স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া কর্ম্মজগতে জন্মান্তরের কথাই বলা হইয়াছে। যে প্রেয়সী—যে মানসী—ঘুমাইছে—

> —নিলীন নয়নে
> কাঁপিয়া উঠিছে বিরহ স্বপনে"

তাহারি 'বাঁধন ছিড়িতে হবে' বলিয়া কবি সংকল্প করিয়াছেন। এ কথাটির অপপ্রয়োগ অথবা কবির অনভিপ্সীত অর্থে প্রয়োগ আজকাল প্রায়ই দেখা যায়।

> বিশ্বজগৎ আমাকে মাগিলে
> কে মোর আত্মপর!
> আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
> কোথায় আমার ঘর!
> কিসেরি বা সুখ কদিনের প্রাণ?
> ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান,

আমার মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে!
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে ওই বারেবার
আমারে ডাকিছে সবে।

এ আহ্বান কর্ম্মজগৎ হইতে মঙ্গলেরই আহ্বান।

এ আহ্বান "অশেষে"ও ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আহ্বান করিতেছেন কে?

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা,
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী?

এই স্বামিনী কবিকে অসময়ে কর্ম্মজগতে আহ্বান করিতেছেন। তাঁকে বলা হইয়াছে মোহিনী। কাজেই তিনি সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী, মানস-সুন্দরী, জীবনদেবতা। কিন্তু তিনি আবার নিষ্ঠুরা রক্তলোভাতুরা এবং কঠোরাও বটেন। এখানে দেখি জীবনদেবতার সঙ্গে কর্ত্তব্যের দেবীও মিলিয়া গিয়াছেন। কারণ কর্ত্তব্য কঠোর—"Stern daughter of the voice of God" এই স্বামিনী ও "এবার ফিরাও মোরে"র বিশ্বপ্রিয়া একই, জীবনদেবতারই মঙ্গলরূপের দেবী। এই শ্রেয়ের আহ্বান যার কানে পৌছিয়াছে তিনি আর প্রেয় জিনিষকে আঁকড়িয়া থাকিতে পারেন না।

রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে গাঁথা মালা।

কবি কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন এবং কঠোর জীবন-দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

বল তবে কি বাজাব, ফুল দিয়ে কি সাজাব
তব দ্বারে আজ,
রক্ত দিয়ে কি লিখিব, প্রাণ দিয়ে কি শিখিব,
কি করিব কাজ?

সমস্ত দ্বিধা দুর্ব্বলতাকে সবলে ঠেলিয়া বলিতেছেন—

হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী,
তোমর আহ্বান বাণী সফল করিব রাণী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি র'ব জাগি,
দীপ নিবিবে না।
কর্ম্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

'বর্ষশেষ' কবিতাটি হইয়াছে কবির Ode to West Wind. শেলীর "Make me thy lyre" এর মত এই কবিও বলিতেছেন—

শঙ্খের মতন তুমি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে।

পরে বলিতেছেন—জীবনের তুচ্ছতা হইতে আমাকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধর—

শ্যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে উর্দ্ধে লয়ে যাও
পঙ্ক কুণ্ড হতে

"Oh! Lift me as a wave, a leaf, a cloud,"

কারণ জীবনের ক্ষুদ্রতাকে কবির আর সহ্য হইতেছে না—

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী।
লাভ ক্ষতি টানাটানি, সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ
কলহ সংশয়,
সহেনা সহেনা আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

কথা

"কথা" গ্রন্থে কবির মঙ্গলরূপেরই জয় ঘোষিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এই সমস্ত কাব্যটিই একটানা বীরত্বের, কর্ম্মের, মহত্বের, ত্যাগের ও কল্যাণের গাথাকাব্য। এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় রূপকে

প্রকটিত করিয়া তুলিতে কোনো কবিতা বিশেষকে বাছিয়া নেওয়া সম্ভব নয়, সমগ্র কাব্যটিই তার দ্যোতক। এই কাব্যের বিশেষত্ব হইয়াছে এই যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গীতিকাব্যের মধ্যে (একমাত্র "পলাতকা" ছাড়া) শুধু এইটিতেই মানব চরিত্রের ভিতর দিয়া কবির মহত্ত্ব ও কল্যাণের আদর্শকে রূপায়িত করা হইয়াছে, আর সেই মানবেরাও জাতীয় ইতিহাসের মহৎ ও বীর মানব। মানব চরিত্রের ভিতর দিয়া মঙ্গলকে মূর্ত্তি দিবার এই কাব্য-প্রয়াসকে কবিরা নাট্যকাব্য, নাটক ও কথাসাহিত্যক প্রচেষ্টার ভূমিকা স্বরূপ গ্রহন করা যাইতে পারে, যদিও প্রথম যৌবনের বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষিকে বাদ দিলে ছোট-গল্প হয়ত কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সমগ্র গ্রন্থ হইতে "পরিশোধ" কবিতাটিকে একটু বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে এজন্য যে ইহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের মোহ ও মহত্ত্বের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়য়াছে। এই কবিতাটি পড়িয়া Byron এর Corsair এর কথা মনে হওয়া বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সুন্দরীপ্রধানা শ্যামার প্রতি প্রেম অথবা সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ একদিকে, তার পাপের জন্য বজ্রসেনের ঘৃণা এবং মহত্ত্ব অন্যদিকে, এই দুইয়ের বিরোধ ইহাতে যেমন চমৎকার ফুটিয়াছে Corsair এ তার কিছুই নাই।

কাহিনী

"চৈতালী"তে যে পতিতা সতীশিরোমণি হইয়া দেখা দিয়াছে, 'কাহিনী'তে সেই 'পতিতার' মধ্য হইতেই "কুমারী নারী'কে বাহির করিয়া আনিয়া যে মঙ্গলের আলো ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে মানবচিত্তের উপর তাহার প্রভাব "উর্ব্বশীর" সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ হইতে কিছু মাত্র কম নয়। পতিতাতে সংসারের ধূলিমাটি অন্য দশজনের চাইতে বেশী লাগিয়াছে, কিন্তু ধূলিমাটির মলিনতা যেখানে যত বেশী তার ভিতর হইতে যে কল্যাণের মূর্ত্তিকে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে আর মূল্য ও প্রভাবও তত বেশী। পাপের সংস্পর্শ হইতেই মঙ্গলের জন্ম, স্বর্গের অপ্সরীর মধ্যে সে সম্ভাবনা নাই। "উর্ব্বশী" ও "পতিতা" রবীন্দ্রনাথের দুই বিভিন্ন বিভাগের দুইটি প্রতিনিধি-কবিতা, দুটিই কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। একটি কবির নিছক সৌন্দর্য্যের ধ্যানের ঘনীভূত ফল হইয়া দেখা দিয়াছে, অন্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে মলিন বাস্তব পরিপার্শ্ব হইতে মেঘবিচ্ছুরিত শ্রেয়ঃ পন্থার (Idealism এর) দ্যুতিতে স্নাত অপরূপ কল্যাণী মূর্ত্তিতে।

কবির নাটক, নাট্যকাব্য প্রভৃতিকে এই আলোচনার বিষয়ীভূত করা হইবে না—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাই "কাহিনীর" নাট্যকাব্যগুলির কথা এখানে তুলিলাম না। তবে "পতিতা' ছাড়া অন্য একটি কবিতা ইহাতে আছে—"ভাষা ও ছন্দ"। এই কবিতার উদাত্ত ধ্বনিতে পাই ভাষা ও ছন্দের পার্থক্যের তত্ত্বরূপ; কবির রামচরিত্রের ধারণার মধ্যে পাই শান্ত সংযত সমুচ্চ এবং মহান কল্যাণেরই বিকাশ। এই কবিতাতে দেখিতে পাই কবির দার্শনিকতাকে কাব্যরূপ দিবার শক্তি কত উচ্চগ্রামে আসিয়া পেঁাছিয়াছে, দেখি তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে সৌন্দর্য ফলাইবার উল্টাপিঠে ধ্রুবপন্থী (classical) শক্তি ও সংযমও কতটা বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে, দেখি জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কবি-ভাস্করের বাটালির দুই একটি ঘায়ে রেখায় রেখায় কতটা সুস্পষ্ট এবং সমুচ্চ হইতে পারে।

এই খানেই কবির কাব্য-জীবনের মধ্যযুগের শেষ। তার পর "ক্ষণিকাতে" বিশ্রাম করিয়া কবি "নৈবেদ্যে"র মধ্যে তাঁর কাব্যজীবনের আধুনিক যুগ আরম্ভ করিবেন বলা চলে।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়
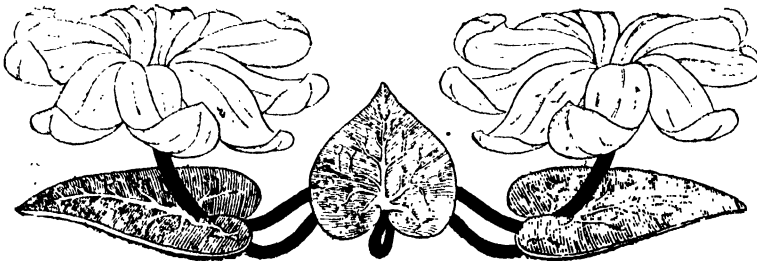
৪

সেইদিন সকাল বেলায়ই মুকুন্দ চলে যাওয়ার পরে আমি মার কাছে গিয়ে কথাটা আবার তুললাম। বল্লাম "মা শেষ পর্য্যন্ত তোমরা এক কালো মেয়ের সঙ্গে দাদার বে দেবে ?"

মা বললেন "ওঁর মেয়ে ভারি পছন্দ হয়েছে। বলেন—বড় সুন্দর লক্ষ্মীশ্রী।"

বল্লাম "কিসে যে এত পছন্দ হল—তাত জানিনা মা! তুমি চেষ্টা করে বে-টা ভেঙ্গে দাও। আমার এ বে' মোটেই ভাল লাগ্‌ছেনা। খুঁজলে এর চাইতে ঢের সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যাবে দাদার জন্য।"

মা বল্লেন "সে আর হয়না সুশন্! উনি কথা দিয়েছেন।"

বাবার কথা দেওয়ার মূল্য যে কতখানি, তা আমি ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি। তাই আর কোনও কথা বল্লাম না। মা আমার দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লেন "কালো মেয়েতে তোর এত আপত্তি, তোর বেলায় যাতে খুব সুন্দরী মেয়ে ঘরে আসে সেই ব্যবস্থাই করব।"

কথাটা শুনে কেমন যেন একটু লজ্জা হল। তাড়াতাড়ি বললাম্ "আহা! আমি সেই কথা বল্‌লাম বুঝি।"

দাদার সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত মণ্টীর বিয়ে—মনটা সমস্ত দিনই কেমন যেন একটু ভারি হয়ে রইল। কিন্তু সেই দিনই বিকেলবেলা এক ব্যাপার ঘটল এবং তাতে করে এ কথাটা আমার মনের মধ্যে একেবারে চাপা পড়ে গেল—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য।

আমাদের গ্রামের ফুটবল ক্লাবের আমি ছিলাম ক্যাপ্টেন। আমি নিজে যে খুব ভাল ফুটবল খেলতাম, তা নয়। কিন্তু কতকটা গ্রামের বড়বাবুর ছেলে হওয়ার দরুণ, এবং কতকটা আমার লেখাপড়ার খ্যাতির জন্য খেলার মাঠের সব ছেলেরা মিলে আমাকেই ক্যাপ্টেন বানিয়েছিল।

কিছুদিন হল গ্রীষ্মের ছুটীর পরে স্কুল খুলেছিল। এবং স্কুল খোলার ৫।৭ দিনের মধ্যেই আমাদের গ্রামের সঙ্গে 'বিলখালি' গ্রামের ম্যাচ হয়ে গেল, এবং তাতে বিলখালি আমাদের এক গোল দিলেও শেষ পর্য্যন্ত আমরাই এক গোলে জিতলাম। বিলখালি আবার আমাদের তাদের গ্রামে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছে। সেই বিষয় বিস্তারিত বিবেচনা করার জন্য আজ বিকেলে আমাদের স্কুলের খেলার মাঠে বড় বটগাছ তলায় ক্লাবের সভ্যদের এক মিটিং হবে। চারটে বাজ্‌তে না বাজতেই আমি ও মুকুন্দ খেলার মাঠ অভিমুখে রওনা হলাম।

আমাদের খেলার দলে সব চেয়ে ভাল খেলত—হরিশ সেন বলে একটী ছেলে। কালো রং, ছিপ্‌ছিপে রোগা লম্বা গোছের চেহারা এবং মুখের মধ্যে একটা বিরাট নাক ছাড়া তার যেন আর কিছুই ছিল না। সে স্কুলে আমার এক ক্লাশ উপরে পড়ত—এইবারই দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উঠেছে। লেখাপড়ায়ও ভাল ছেলে শুনেছি এবং স্কুলে তার বেশ একটা খ্যাতির ছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই হরিশ সেন ছেলেটীকে আমি কোন্ কালেই পছন্দ করিনি। কি যে তার কারণ, এখন

ভেবে দেখলে বিশেষ কিছু খুজে পাই না। তবুও ছেলেটিকে দেখলেই আমার যেন কি রকম রাগ হত। মনে হত ও যেন সব সময়ই আমাকে অবহেলা করছে, তাচ্ছিল্য করছে।

আগেই বলেছি সকলের কাছেই আদর যত্ন খাতির আমার যেন নিত্য পাওনা হয়ে উঠেছিল। খেলার মাঠেও সব ছেলেরাই আম'কে মেনে চলত, এমন কি প্রথম শ্রেণীরও দু একটী ছেলে, যারা আমাদের ক্লাবের সভ্য ছিল তাদেরও কথাবার্ত্তার মধ্যে আমার প্রতি সম্মানের অভাব ছিলনা। এই সব কারণে আমার মধ্যে ধীরে ধীরে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ক্রমে আমার সমস্ত প্রাণটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল---আদর যত্ন, খাতির---এটা যেন আমার ন্যায্য পাওনা; যেখানে এর ব্যতিক্রম ঘটে সেখানেই যেন জগতের একটা মস্ত বড় নিয়ম অমান্য করা হয়; সেখানে নিয়ম ভঙ্গকারীর শাস্তিই বিধান। তাই বোধ হয়, এই বয়সেই এতটুকু অবহেলা, এতটুকু অপমান---তাও আমি একেবারে'ই সইতে পারতাম না।

এখন ভেবে বুঝতে পারি হরিশ সেন আমার প্রতি ব্যবহারে স্বেচ্ছাকৃত কোনও অভদ্রতার দোষে দোষী ছিলনা। স্বভাবতই সে ছিল একটু আত্মাভিমানী এবং কারুরই মনস্তুষ্টির জন্য অযথা ব্যবহার বা বৃথা বাক্যব্যয়---এসব ছিল একেবারেই তার স্বভাববিরুদ্ধ।

তাই যখন খেলার মাঠে ছেলেরা আমারই মনোরঞ্জনের জন্য আমারই উপাদেয় কথা বলতে এতটুকু দ্বিধা করত না, হরিশ সেন চুপ করে থাকৃত এবং প্রয়োজন হলে তীব্র প্রতিবাদ করতে তার এতটুকু ভয় ছিল না।

নিতান্ত গরীবের ছেলে ছিল সে। তার বাপ, শ্রীযদুনাথ সেন বিদ্যানিধি ছিলেন আমাদেরই গ্রামের কবিরাজ। এই বছর দুই হল আমাদের গ্রামে এসে ব্যবসা সুরু করেছেন। বাপ আর ছেলে মাধবপুর বাজারে রামচরণ ভুঁইয়ার প্রকাণ্ড চালের দোকানের পাশের ছোট ঘরটী ভাড়া নিয়ে কোনও রকমে নিজেদের একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। ঘরে একটী তক্তাপোষ পাতা ছিল—বাপ আর ছেলে রাত্রে শুতেন। ঘরে গোটা দুই পুরোনো ময়লা কাঁচের আলমারি ছিল—বাপের ওষুধপত্র থাকত। এই ঘরের সঙ্গে রামচরণ ভুঁইয়ার পিছনের বারান্দার একটু কোণে বাপ ও ছেলে ভাগাভাগি করে নিজেরাই নিজেদের রান্না করে নিতেন।

যাই হোক্ লেখাপড়ায় ভাল ছেলে, খেলার মাঠে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বিশেষ করে বিলখালির সঙ্গে ম্যাচে শেষ পনর মিনিটের মধ্যে ফুটবল খেলার অদ্ভুত কৌশল দেখিয়ে পর পর দুটী গোল দেওয়ার দরুণ গ্রামের ছেলেদের মধ্যে সে একটা "হিরো" হয়ে উঠেছিল এবং একটী দুটী করে ক্রমেই তার ভক্তর দল যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে—আমার অগোচর ছিল না।

পথে যেতে যেতে মুকুন্দকে বললাম "দেখ মুকুন্দ, হরিশ সেন যদি আজ আমার কথার উপর কথা কয়, আমি তাহলে খেলার মাঠ ছেড়ে চলে আসব—এসব ব্যাপারের মধ্যে থাকৃব না।"

মুকুন্দ বলল "সে কি কথা শান্তদা! তুমি ক্যাপ্টেন, তোমার কথা ত সকলকেই মেনে চল্‌তে হবে।"

আমি বললাম "তাত জানি, আর সবাই মান্‌বেও। কিন্তু হরিশ সেন ছেলেটার বড্ড গুমোর। ভাল খেলে বলে ও যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করে।"

মুকুন্দ বল্‌ল "তাই বলে ক্যাপ্টেনের কথা না শুনলে সবাই চাঁটী মেরে ওকে ঠিক করে দেবোনা।"

পথে আর বিশেষ কিছু কথা হলনা। স্কুলের পাশের নদীর ধারের সেই বড় বটগাছ তলায় গিয়ে দেখি বেশীর ভাগ ছেলেরাই এসে হাজির হয়েছে। সেই বটগাছ তলায় একটা বসবার জায়গা বড় সুন্দর ছিল। গাছের একটা বেশ মোটা রকমের শেকড় গাছের গুঁড়ি থেকে বেরিয়ে বেঁকে গিয়ে একটু দূরে মাটীর মধ্যে মিশেছে। এই শেকড়টার উপর বসে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিলে বেশ আরাম পাওয়া যায়, কতকটা ইজিচেয়ারে বসার মত। যতীন বলে একটী ছেলে এই জায়গাটি দখল করে বসেছিল। আমাকে দেখেই যতীন উঠে বললে, "বসো শান্তদা! তুমি এইখানটায় বসো।"

আমি গিয়ে সেইখানটায় বস্‌লাম। মুকুন্দ আমার পায়ের কাছটাতে বস্‌ল।

আমি একবার চারিদিকে চেয়ে বললাম "কৈ, হরিশবাবুকে দেখতে পাচ্ছিনা।"

ননী ময়রা বল্‌ল "হরিশবাবু এখুনিই আস্‌বে। তার

বাপ তাকে কোথায় একটা কি কাজে পাঠিয়েছে। আমাকে বলে দিয়েছে চট্ করে সে কাজটা সেরেই চলে আসবে।”

আমি ক্যাপ্টেনী সুরে বললাম “এ বড় অন্যায়। ঠিক চারটের সময় আমাদের মিটিং বসবার কথা ছিল। চারটে অনেকক্ষণ বেজে গিয়েছে।”

আমি আশা করেছিলাম ২।৪ জন আমার কথার সমর্থন করবে। কিন্তু কেউ কোনও কথা কইলে না। আমার একটু রাগ হল।

এমন সময় আমরা সবাই দেখতে পেলাম দূরে মাঠের উপর দিয়ে হরিশ আসছে। খুব যে হন্ হন্ ছুটে আস্‌ছিল তা নয়, বরং একটু মন্থরগতি।

মুকুন্দ আমাকে চুপি চুপি বলল “চাল্ দেখছ শান্তদা!”

হরিশ এলো; এদিক ওদিক চেয়ে একটু দূর থেকে একটা ভাঙ্গা ইঁট নিয়ে এসে সেইটের উপর বস্‌ল। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল “কি ঠিক হল—বিলখালিতে খেল্‌তে যাওয়া হবে ত?”

মহিম বলল “শুধু ত আমাদের ইচ্ছেয় হবে না, গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে খেল্‌তে গেলে হেডমাষ্টার মশাইয়ের মত নেওয়া দরকার।”

আমি বল্লাম “তার জন্য আটকাবে না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে মাধবপুর যদি বিলখালির সঙ্গে খেলতে যায় তাহলে যেন একটা গোলও না খায়।”

হরিশ বলল “তা কি কেউ জোর করে বল্‌তে পারে।”

আমি বললাম “সে ভরসা যদি না থাকে ত খেল্‌তে না যাওয়াই ভাল। বিলখালি গিয়ে মান সম্মান খোয়াতে আমি রাজী নই।”

হরিশ বলল “তা ভাবলে ত কোথাও খেলতে যাওয়া চলে না।”

বিপিন বলল “তা ত বটেই। বিলখালি টিম্‌ও বেশ জোরের। জেতা যে খুব সহজ হবে বলে আমার মনে হয় না।”

আমি বললাম “তাহলে দরকার নেই গিয়ে।”

বিপিন বলল “কিন্তু শান্ত বাবু! ওরা আমাদের ডাক্‌ছে—না গেলে বল্‌বে ভয়ে পেছিয়ে গেল।”

মহিম বলল “তা ত বটেই। না যাওয়াটা ভীরুতা।”

আমি একটু জোরের সঙ্গে বললাম “ভয় আমার নেই। আমার ষোল আনা ভরসা আছে। যদি খেলতে যাইত জিতবই।”

হরিশ শান্তস্বরে বললে “আমার অবশ্য অতখানি ভরসা নেই।”

কথাটা বিদ্রূপের মত শোনাল। হরিশ সব চেয়ে ভাল খেলোয়াড়। তার ওরকম ভরসা না হলে আমার পক্ষে ওরকম ভরসা হওয়া যে কতখানি বাতুলতা—এইটেই যেন সে সকলের কাছে প্রমাণ করতে চায়। আমাকে যেন অপমান করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। হরিশের কথাটাতে নিজেকে যেন বড় ছোট মনে হল সকলের কাছে। রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে উঠ্‌ল।

মুকুন্দ আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার মনের অবস্থাটা কতকটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। সে কি যেন একটা জোরের সঙ্গে বলতে যাচ্ছিল এমন সময় যতীন বলে উঠ্‌ল “তা হরিশবাবুর যদি সে ভরসা না থাকে ত খেলতে না যাওয়াই ভাল।”

মহিম একটু উত্তেজিত স্বরে বলে উঠ্‌ল “এ তোমার অন্যায় কথা যতীন। হরিশবাবু একলাইত সব খেলাটা খেল্‌বেন না। এগার জন সবাই তাঁর মত হলে তিনিও ভরসা পেতেন।”

যতীন বলল “সে আর কোন্ টিমে কবে হয়ে থাকে।”

মহিম উত্তেজিত স্বরেই বলল “সেই জন্যই কোন টিমের কোনও খেলোয়াড়ের পক্ষে আমরা জিত্‌বই, একথা জোর করে বলা চলেনা।”

মহিম যে প্রচণ্ড একজন হরিশ ভক্ত এ আমার অবিদিত ছিলনা, তাই মহিমের এই উত্তেজনার মূলে হরিশের অনুপ্রেরণায়, আমার রাগটা হরিশের উপরই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

বিপিন বলল “যাক্ যাক্, তর্কাতর্কি করে কি লাভ। এখন আসল কথাটা ঠিক করে ফেলা দরকার।” এই বলে আমার মুখের দিকে চাইলে।

মহিম বল্‌ল “বেশ, ভোট নেওয়া যাক্ আমরা বিল্‌খালি খেল্‌তে যাব কিনা।”

সহসা মুকুন্দ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "শান্তদা ক্যাপ্টেন শান্তদা যা ঠিক করবেন্ তাই হবে। সবাই সেকথা শুনতে বাধ্য।"

হরিশ বলল "তার কোনও মানে নাই। এসব ব্যাপারে বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ের যা ইচ্ছা—সেইরকমই কাজ হবে।"

কি স্পর্দ্ধা! একথা হরিশ ছাড়া ওখানে বোধ হয় কেউই বল্‌তে সাহস করতনা। বেশ একটু তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম "কার কার বিলখালিতে খেলতে যাওয়ার ইচ্ছে শুনি।"

হরিশ ও মহিম ছাড়া প্রথমটা কেউই হাত তোলেনি। তার পর হরিশের দিকে চোখোচোখি হওয়াতে ননীময়রা অধোবদনে ধীরে ধীরে হাত তুল্‌ল। বিপিন মহেশ পরস্পর চোখ চাওয়াচায়ি করতে লাগ্‌ল। হরিশ বোধ হয় তখন রেগে গিয়েছিল। তার ছোট ছোট চোখ ছুটো যেন কেমন একটু লাল হয়ে উঠল। কিন্তু অত্যন্ত শান্ত এবং গম্ভীর স্বরে বললে "মোটে তিনজন। বেশ তাহলে বিলখালিতে খেল্‌তে যাওয়া হবেনা।" এই বলে সে উঠে দাঁড়াল।

আমি হঠাৎ চীৎকার করে বললাম "নিশ্চয়ই খেল্‌তে যাবো।"

হরিশ বল্‌ল "তাত হতে পারেনা, মোটে তিনজন আমার দিকে ভোট দিয়েছে।"

আমি বললাম "ভোট কে চেয়েছিল। খেলতে যাব এইটেই আমি ঠিক করলাম।" এই বলে সকলের দিকে চাহিলাম।

হরিশ বলল "আর সবাই যায় যাক্, এর পরে আমি অন্ততঃ কিছুতেই খেল্‌তে যাব না।"

আমি বললাম "ক্লাবের সভ্য হিসেবে আপনি যেতে বাধ্য।"

হরিশ একবার ঘৃণাভরে আমার দিকে চাইলে, তারপর একটু উত্তেজিত স্বরে বললে, "না হয় ক্লাশের সভ্যগিরি আমি ইস্তফা দিচ্ছি।"

মুকুন্দ চেঁচিয়ে উঠল "আপনি ক্যাপ্টেনকে অপমান করছেন হরিশবাবু!"

মহেশ বলে উঠ্‌ল "এ আপনার অন্যায় হরিশ বাবু"—সহসা মহিম মহেশকে এক ধমক দিলে "তুই চুপ কর!" মহেশ চুপ করে গেল।

আমি বললাম "হরিশ বাবু! ইস্তফা দেব বললেই দেওয়া যায় না। ক্লাবের নিয়ম কানুন আছে। খেলতে আপনি বাধ্য।"

হরিশ বলল "কেন? আপনি জমিদারের ছেলে বলে খেলার মাঠেও কি আপনার জোর চলবে?"

আমি রেগে চেঁচিয়ে উঠলাম "সাবধান হরিশবাবু! বাপ তুলে কথা কইবেন না বলে দিচ্ছি।"

হরিশ বলল "বাপ তুলে আমি কিছু বলিনি। আপনিও ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করবেন না।"

এই বলে হরিশ আর দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে আমাদের দিকে পিছন ফিরে চল্‌তে আরম্ভ করল। আমার রাগ তখন সপ্তমে চড়েছে। এমন সময় মুকুন্দ এককাণ্ড করে বসল। সে হঠাৎ সুর করে চেঁচিয়ে উঠল—

"যদু কব্‌রেজের বড়ি
রোগীর গলায় দড়ি"

এই শ্লোকটার সৃষ্টিকর্ত্তা কে জানিনা। কিন্তু স্কুলের ছেলেদের মধ্যে এটা অনেকের মুখেই অনেকবার শুনেছি।

হরিশ আহত ব্যাঘ্রের মত হঠাৎ ফিরে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তার ছোট ছোট কোটরাগত চোখদুটো তখন জলছে। চীৎকার করে উঠল "কে বললে—কে বললে একথা?"

মহিম যেন কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় আমি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে হরিশের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম "আমি বলেছি।"

হরিশ খানিকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে গুম হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর তীক্ষ্ণস্বরে বললে,—"যার নিজের বাপ একটা খুনে, পরের বাপের বিষয় কথা কইতে তার লজ্জা করেনা?"

রাগে আমি তখন চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছি। চীৎকার করে উঠলাম "মুখ সাম্‌লে কথা কও বল্‌ছি।"

হরিশও সমান চীৎকার করে বলল,—"কার ভয়ে মুখ সাম্‌লে কথা কইব শুনি। সত্য কথা বল্‌তে ভয় করি নাকি? তোমার বাপ যে সাতঘাটার ফকির মণ্ডলকে নায়েব বাহার আলীমিঞাকে দিয়ে খুন করিয়েছিল কে না জানে। পয়সা আছে তাই বেঁচে গেছে, নৈলে যে এতদিন ফাঁসীকাঠে—

আমার চাইতেও বোধ হয় মুকুন্দর বেশী অসহ্য হয়েছিল। সে আমার পাশ কাটিয়ে, এক লাফে গিয়ে হরিশের টুঁটী চেপে ধরল্। হরিশ হঠাৎ আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে না পেরে নীচে পড়ে গেল। মুকুন্দ তার বুকের উপর বসে দুহাত দিয়ে তার চুল টেনে ছিঁড়চে। সেও ঘুসী চালাচ্ছে মুকুন্দর নাকে মুখে বুকে।

খানিকটা আমি কি রকম হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম ছেলেদের মধ্যে সবাই কোথায় সরে পড়েছে, অন্ততঃ কাছাকাছি কেউ ছিল না। আমিও মারামারিতে মুকুন্দর সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলাম—একটা কঞ্চি কুঁড়িয়ে নিলাম হাতে। (ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত
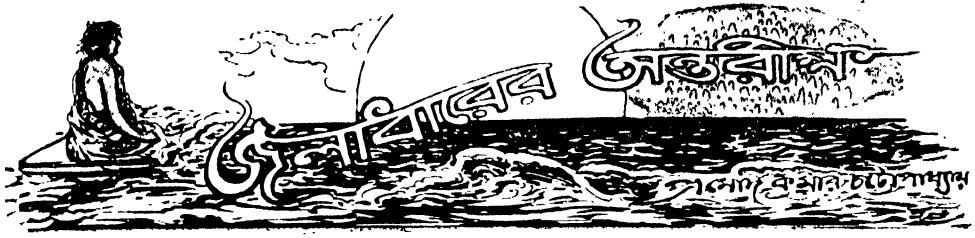
৫

কোন কঠিন বিপদ, যাহাকে দৈব বিপদ বলে, যাহাতে মানুষের হাত নাই, সাধারণ মানুষ সেই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইলে বলে যে, ভগবান রক্ষা করিলেন। মুখে বলা সুধু নয় যেন নিশ্চিতরূপে ভাবিয়াও থাকে। কিন্তু যথার্থ ব্যাপার যাহা ঘটে তাহা যদি জানিবার সুযোগ হয় তাহা হইলে আর কেহ ভগবান বলিয়া কাহাকেও ডাকিবে না। বাস্তবিক সে সকল আপদ উদ্ধারের ব্যাপার এ সকল আপদেবগণেরই কার্য্য। দেবদূত কথাটা বড়ই মিষ্ট মানুষের কানে শুনায়, তাই তাহাদের দেবদূতই বলিলেও দোষ হয় না—তাহাতে বোধ করি অর্থ বিপর্য্যয়ও ঘটিবে না।

বলিতেছিলাম, যখনই অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপাকে পড়িয়া মানুষ কাতর প্রাণে বিপদের গুরুত্ব হৃদয়ে অনুভব করে তখনই স্বভাবের নিয়মে আপদ উদ্ধারের আশায় সে একটি বিরাট শক্তির সহায়তা চায় যিনি তাহাকে বিপদমুক্ত করিতে পারিবেন, আর তাহাকেই সে ভগবান বলিয়া জানে। তখনই মানুষ নিজ শক্তিকে ক্ষুদ্র ও অক্ষম নিশ্চিতরূপেই ধারণা করিতে পারে। কিন্তু এ সৃষ্টির এমনই নিয়ম, ভগবান কি বস্তু, কোথায় তাঁর অধিষ্ঠান, তাঁর স্বভাবই বা কিরূপ, মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধই বা কি, এ সকল বিষয়ে কোন স্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলেও তাহার অন্তরের ঐকান্তিক ব্যাকুল আর্ত্তি ভাব-তরঙ্গের প্রবাহরূপে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক জায়গায় পৌছায়;—আর প্রতিকারও, তাঁহার অন্তরে বিপদ অনুভূতির গভীরতা বা পরিমাণ অনুসারে, শীঘ্র বা বিলম্বে আসিয়া থাকে। বিপদ অনুভব এবং বিপদ উদ্ধার ইহার মধ্যে যত কিছু বেদনা, আতঙ্ক, অবর্ণনীয় নৈরাশ্য জনিত উদ্বেগ, আবার সময়ে সময়ে সেই প্রচণ্ড উদ্বেগের তাড়নায় স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও শরীর যন্ত্রের বিকৃতি, হয়ত এ সকলও তাহাকে সহ্য করিতে হয়। তাহার কর্ম্ম-সংস্কারগত ভোগশরীর ও মনের দুর্ব্বল গঠনের ফলে এই সকল দুঃখ আসিয়া থাকে তাহাও হয়ত সে জানে না,—কিন্তু যখন সেই বিপদ কাটিয়া যায় প্রতিক্রিয়ার ফলে সে সেই পরিমানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আরাম পায়, আনন্দ ভোগ করে, তাহার দুঃখ, বেদনার কাহিনী প্রিয়জনের কাছে দশ মুখে প্রকাশ করিতে চায়,—জানে কি, কোথা হইতে পরিত্রাণ আসিল? ভগবান রক্ষা করিলেন এ কথা সে বলিলেও, অন্তরে তাহার এ ব্যাপার রহস্যময় থাকিয়াই যায়, কারণ ভগবান বলিয়া এই যে একটি ভাব তাহাও ত মানুষের কাছে অসীম রহস্যে আবৃত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর জীব-সমাজের মধ্যে যত কিছু চিন্তা এবং কর্ম্ম চলিতেছে, প্রত্যেকটি চিন্তা এবং কর্ম্ম হইতে কোন না কোন ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছে আর সেই তরঙ্গে অন্তরীক্ষ মহাসমুদ্র অবিরাম আলোড়িত হইতেছে, যাহা হইতে এই আপদেবগণ নিজ নিজ কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতেছেন। এ কর্ম্মের ইতি দেখিতে পাই নাই। এখন আমার কোন সঙ্কোচ বা কর্ম্ম নির্দ্ধারণে বুদ্ধির অভাব নাই। তাহা অবশ্য প্রথমেও ছিল না, তবে পূর্ব্বে কোন আহ্বান আসিলে আমি দেখিতাম প্রথমে কে বা কাহারা উঠিলেন, তাহা দেখিয়া আমি তাঁহাদের সঙ্গে মিলিতাম। তারপর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কি ভাবে তাঁহারা কর্ম্ম করেন, শক্তি প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এ সকল লক্ষ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতাম, তারপর আমার গতি অন্তরীক্ষের মধ্যেও একটি সীমার মধ্যে ছিল, তাহার অধিক গতি ছিল না,—এখন

আর সে সকল লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ করিতে হয় না,—এখন তরঙ্গ লক্ষ্য করিয়া স্বতঃই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই,—কেমন ভাবে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় সে বিষয়ে আর সহায়তা বা আদর্শের প্রয়োজন হয় না, আমার গতিও প্রসারিত হইয়াছে;—তবে কর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যেই রহিয়াছি; অন্যান্য বিশাল দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম সকল যাহা উচ্চ স্তরের দেবদূতগণের অধিকারে তাহার মধ্যে আমার গতি হয় নাই। তবে বুঝিয়াছি, এখানেও কর্ম্মের ক্রম-প্রকরণ আছে, অধিকার আছে, দায়িত্ব আছে, প্রসাদ আছে, মহিমা আছে, সে সকল উচ্চ অবস্থা কর্ম্মোৎকর্ষের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে আপনাপনিই হইয়া যায়। কেহ গুরু নাই, উপদেষ্টা নাই, বাকবিতণ্ডা নাই, নিস্তব্ধ একটি বিরাট প্রেমের রাজ্য, অনির্ব্বচনীয় মহিমায় এই ধরাতলের সুখ ও কল্যাণের নিয়ন্তারূপে সর্ব্বকাল ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

এখন এখানে আমার কর্ম্ম-সম্পর্কে আর একটি ঘটনার কথা বলি। তখন আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপের নিকটে;—আদিত্যরশ্মির সুধাময় কিরণে,—সুরালোকের অবিশ্রান্ত বিকীরণের মধ্যে নৃত্যে মগ্ন ছিলাম। এটুকু এখানে জানা প্রয়োজন যে, স্থূল প্রাণীজগতে নিদ্রা বা সুষুপ্তি যেমন জীবনের পক্ষে অচ্ছেদ্য নিয়ম, পরিমিত নিদ্রার অভাবে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে কারণ শরীর এবং প্রাণের অপচয় এই আনন্দময় সুষুপ্তিতেই পূর্ণ হয়, দৈনিক কর্ম্ম জীবন আনন্দময় হয়;—সেইরূপ, অন্তরীক্ষের এই আপদেবগণের সূর্য্য-কিরণ-রশ্মি-বিকীরিত অমৃতময় সুরধারায় স্পন্দনের মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থাই হইল নিদ্রা বা সুষুপ্তি। আদিত্য কিরণ মিলিত সুরধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে স্নান যে কি আনন্দময় তাহা কি করিয়া বুঝাইব? উহা প্রকাশের শব্দ ত নাই-ই পরন্তু প্রবৃত্তিও হয় না।

এখন যাহা বলিতেছিলাম,—আমরা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপর মহানন্দময় সুষুপ্তিতে বিভোর ছিলাম,—একটি অতি কাতর, মহাভয়ের ভাবতরঙ্গ আসিয়া অন্তরীক্ষে লাগিল। শান্তিময় অবস্থা হইতে জাগ্রত হইলাম, তরঙ্গের কেন্দ্রস্থল লক্ষ্য করিলাম। ভারতের দিকটা মেঘাচ্ছন্ন, ঝড় ও মেঘের খেলা চলিতেছে। সমস্ত পশ্চিমদিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত জলদের মেলা, বহুদূর উর্দ্ধ বেড়িয়া প্রবলভাবে আলোড়িত হইতেছে।

তরঙ্গ লক্ষ্য করিয়া মুহূর্ত্তে গিয়া পৌছিলাম এক গ্রামের মধ্যে, এক সম্পন্ন গৃহস্থের আশ্রমে। একটি পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয় যুবা মৃত্যুশয্যায়। জীবিত পিতা, মাতা, স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত সকলের মুখে শোকের পূর্ব্বাভাষ। যুবা তখন বাহ্যতঃ অচৈতন্য, অন্তরে তাহার প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছে। শ্বাসও উঠিয়াছে। বুঝিলাম আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে যুবা ক্ষীণ এবং অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

যুবা কল্পনা করিতেছে শূন্য, নিঃসঙ্গ অবস্থা, সে যেন সঙ্গ ও সমাজ হইতে নিস্তব্ধ শূন্য এক অনন্ত অন্ধকারময় লোকে যাইতেছে, তাহা বড়ই ভয়ঙ্কর। ঐ সকল তাহার জীবিত কর্ম্মাবস্থার অনেকানেক শ্রবণ মননের ফল,—আসলে সবটাই তার কল্পনা। কল্পনায় তাহার ভয় ক্রমাগতই বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে হৃদপিণ্ডের গতিও বিষম দ্রুত হইতেছে।

এখন একথা যেন কেহ মনে না করেন যে আমার অবস্থার এই আপদেবগণের কাজই হইল প্রাণ ভয়ে ভীত সকলকেই প্রাণে বাঁচাইয়া দেওয়া। আর সকল সময় প্রাণে বাঁচানোটাই যথার্থ কল্যাণের কাজও হয় না এবং বিপদগ্রস্ত সকলকেই প্রাণে বাঁচাইয়া দেওয়া তাহাদের সাধ্যায়ত্তও নয়। বাঁচানো বা মারার নিশ্চিত্ত বিধান আরও উচ্চস্তরের দেবদূত-গণেরই কর্ম্ম। আমার এখন সে অধিকার নাই, কারণ প্রকৃতির গুহ্যতম নিয়ম সকল ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে এখনও আমি সম্যক পরিচিত নহি। আমার এখন প্রাথমিক স্তরের কতকটা লইয়াই কর্ম্ম চলিতেছে কাজেই যেখানে কাহাকেও বাঁচানো বা মারার স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইবে সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের মত একজনের কর্ম্ম করিবার পথ নাই, সেহেতু প্রেরণাও আসে না। তবে আমার কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া এ জ্ঞানটি স্বতঃই আসিয়া থাকে যে যাহাকে বা যাহাদের লইয়া আমার কর্ম্ম তাহাদের উপর প্রাকৃতিক বিধানটা কিরূপ হইবে সেই অনুসারেই আমায় ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে হয়।

এ ক্ষেত্রে আমি দেখিলাম যে যুবার দেহত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। পার্থিব লোকের শরীর ও মন সম্পর্কে যেমন দয়া বা মমতা তাহার বশে তাহাদের কর্ম্মে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হয়, আমাদের সেরূপ কোনও মনোভাব নাই। প্রাকৃতির নিয়মে এ ক্ষেত্রে তাহার যে গতি হইবে তাহাতে কিছু অন্তরায় থাকিলে সেটি

দূর করিয়া তাহাকে নিজ গতিতে কতকটা অগ্রসর করিয়া দেওয়াই এখানে আমাদের কর্ম্ম। এখন দেখিলাম ইহার দেহত্যাগের কিছু বিলম্ব আছে, কারণ তাহার প্রাণ নিম্ন মার্গের কেন্দ্রসকল হইতে সঙ্কুচিত হইয়া প্রাণকেন্দ্রে এখনও গতিমান হয় নাই।

ষঠচক্রের ব্যাপারে যাহাদের জানা আছে তাঁহারা জানেন যে প্রাণ আপন কেন্দ্র অর্থাৎ উপর দিকে যেখানে মেরুদণ্ডের শেষ সেখান হইতে নিম্নে যেখানে মেরুদণ্ড শেস হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত অবিরাম অতি দ্রুত যাতায়াত করিয়া শরীরক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে। তাহার মধ্যে তাহার ছয়টি কেন্দ্র আছে, প্রত্যেক কেন্দ্রের ক্রিয়া পৃথক ভাবের। নিম্নতম কেন্দ্র হইল গুহ্যদেশ, তাহার উপর লিঙ্গ, তাহার উপর নাভি, তাহার উপরে হৃদয়, তার উপরে কণ্ঠ, তার উপরে ভ্রূমধ্যে প্রাণকেন্দ্র। এই সকল কেন্দ্রই প্রাণের উপস্থিতি এবং সূক্ষ্মভাবে স্পন্দনের ফলে শরীর মনের যাবতীয় কর্ম্ম চলিতেছে। এখন মৃত্যুকালে দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রাণ নিম্নমার্গের সকল কেন্দ্র হইতে গুটাইয়া প্রাণকেন্দ্রে স্থির হয়, তারপর দেহত্যাগ করিয়া আত্মা সূক্ষ্ম শরীরে বিরাট ব্যোমে নিজ মার্গে গতি পাইয়া থাকেন। স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া গেলেও আত্মার একটি সূক্ষ্ম আবরণ তখনও থাকে তাহাকেই সূক্ষ্ম শরীর বলে।

এখন এই যুবা নিজের ভয়াত্মক কল্পনায় এমনই ভাসিয়া চলিয়াছে যে তাহার চৈতন্যের নাগাল পাওয়াই যায় না। অনেকটা, কানটা কাকে লইয়া গেল শুনিয়া কাকের পিছনে দৌড়ানোর মতই। এ অবস্থায় বেশীভাগ স্থূলবুদ্ধি জীবেরই এরূপ হইয়া থাকে। আমার এবার মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে তখন প্রকৃতিস্থ বা স্থির থাকাই কঠিন, কারণ অন্তর ক্ষেত্রে তখন ভূত বর্ত্তমান কর্ম্ম ও তাহার ফল সংক্রান্ত হিসাব নিকাশ, এবং ভবিষ্যতে তাহার গতি কি হইবে এই সকল চিন্তার ঝড় বহিতে থাকে। দেখিলাম যুবার এত ভয় হইয়াছে যে শান্তিময় অবস্থায় দেহত্যাগের পথ আপনিই রোধ করিয়া ফেলিতেছে। মধ্যে মধ্যে বিকট মূর্ত্তি নানাপ্রকার কল্পনা করিতেছে।

এ ক্ষেত্রে তাহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা ধরিয়া অনুসরণ করিতে এটুকু স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম যে তাহার এই ভয় ও উদ্বেগের কারণটি এই যে তাহার জীবনের সকল কর্ম্মই চঞ্চল বুদ্ধি প্রসূত। তাহার প্রকৃতিই চঞ্চল। সুস্থ, বলবান শরীরে মনের চাঞ্চল্যই তাহাকে কর্ম্মের প্রেরণা যোগাইয়াছে। আর যে সকল কর্ম্ম সে করিয়াছে তাহাতে তাহার চৈতন্য পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই, স্থির সংযমের পথ পায় নাই। ধীর বিচারবান হওয়া ত দূরের কথা, সে কখনও কোন সময় একস্থানে চার দণ্ড স্থির হইয়া বসে নাই। অতিরিক্ত সঙ্গপ্রিয় ছিল তাহার স্বভাব, কখনও অল্পক্ষণের জন্যও নিঃসঙ্গ হইতে পারে নাই। তবে তাহার মধ্যে সরলতা ছিল। কুটীল কিম্বা দুষ্ট বুদ্ধি অপরের অনিষ্টকারী স্বভাব তাহার ছিলনা। অতিরিক্ত চঞ্চল প্রকৃতি বলিয়াই অতিরিক্ত প্রাণশক্তির চালনায় এই বয়সেই সে তাহার জীবনের ভোগ শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। সে ছিল অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সুখপ্রিয় যৌবন-বিকাশের বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহার যৌন ক্রিয়ার প্রবল তৃষ্ণা জাগিয়া নানাপ্রকার সঙ্গে মনোভাব বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ভালবাসা, প্রেম, এসকল তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই। জীবনে তাহার মুখ্যতঃ দুইটি কর্ম্ম প্রবল হইয়া ছিল, একটি তাহার নিরন্তর বন্ধু বা লোক সঙ্গ, দ্বিতীয় নারী সংসর্গ। ইহার জন্য তাহার কোনপ্রকার কর্ম্মবুদ্ধি জাগে নাই; অভাব, দুঃখ, সামাজিক বা গার্হস্থ্য জীবনের দায়িত্ব বোধ তাহার মধ্যে তিলার্দ্ধ স্থান পায় নাই। কাজেই এই সঙ্কট সময়ে ক্ষীণ মস্তিষ্কে তাহার সংযমের অভাবই তাহাকে অতিরিক্ত পরিমাণে কাতর করিয়াছিল।

এ ক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য হইল, উৎকট কল্পনাপ্রসূত বিষম আতঙ্কের অবস্থা হইতে তাহাকে স্থির বা শান্ত করা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি কল্পনার বেগ এতটা প্রখর তাহাতে তাহার চৈতন্যের নাগাল পাওয়াই যায় না। পাগলের মত তাহার চৈতন্য উদ্দাম বিপরীত মার্গেই গতিবিশিষ্ট। তখন অন্য-দিক দিয়াই উপায় করিতে হইল।

তাহার আত্মীয়মণ্ডলের মধ্যে সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল—এখন তাহাদের মধ্যে একজনের মনে হইল অনেকক্ষণ কিছুই খাওয়ানো হয় নাই গলাটা বড়ই শুখাইয়াছে একটু কিছু পান করানো যায় কিনা—দেখা যাক্। তাহার কথা শুনিয়া সকলেই অনুমোদন করিল। এক পাত্র একটু

জল লইয়া একজন তাহার চৈতন্যের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের চেষ্টায় যখন অল্প একটু বাহ্য চেতনা আসিল, সে তখন ক্ষণেকের মত একবার চাহিয়া দেখিল,—আমি তাহাই চাহিতেছিলাম। যেই চক্ষু একবার খুলিয়াছে, বিকারের ঘোরে চাওয়ার মত, তাহার ঠিক সম্মুখেই ছিলাম, এবার আমি তাহার দৃষ্টির উপর শক্তি প্রয়োগ করিলাম। আমার প্রকাশ সে চৈতন্য দিয়াই অনুভব করিল। সে তখন, ওকি ? এ কে ? শব্দগুলি যন্ত্রচালিতের মতই তাহার মুখ হইতেই বাহির হইয়া গেল। তারপর পুনরায় চক্ষু মুদিত করিল। তখন তাহার অন্তরে কল্পনার ভয় প্রশমিত হইল। তাহার আত্মিয়গণ তাহার কথা শুনিয়া একটু ভয় পাইয়াছিল তাহার, ও কি ? কে ? কে ? কথাগুলি শুনিয়া তাহারা নানাপ্রকার ভয়াত্মক কিছু কল্পনা করিতে লাগিল, কিন্তু মুখে বলিল, কৈ আর কেউ ত এখানে নেই, এই যে আমরা সকলেই তোমার কাছে আছি। খাও এই জলটুকু খাও,—বলিয়া জলটুকু খাওয়াইতে চেষ্টা করিল। সে চেষ্টার ফলে এখন সে কতকটা জলপান করিয়া তাহাতে অন্তরে বায়ুর গতি কতকটা স্থির হইল।

সেই যে একবার দেখা তাহার সেই দৃষ্টিসূত্রে তাহার প্রকৃতি স্থির হইতে সহায়তা করিল। তাহার ভয় ক্রমে ক্রমে একেবারেই চলিয়া গেল। ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের গতিও স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। কল্পনার যত কিছু ভয়ের ব্যাপার আর কিছুই নাই, ক্রমে তাহার বড়ই আরাম বোধ হইতে লাগিল। সে বুঝিল নিঃসঙ্গ সে নয়। প্রিয়জন একটি তাহার সঙ্গেই আছে, ঠিক মানুষের মত তাহার শরীর দেখিতে পাইতেছে না বটে কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছে। সে অনুভব স্থূল চক্ষে দেখার তুলনায় আরও নিকট বেশী স্পষ্ট এবং ঘনিষ্ট। জ্ঞানে তাহার এখন আমায় লক্ষ্য হইয়াছে ; সে বলিল, আমার কাছেই থাক, চলে যেও না, —এই কথা কয়টি বলিয়া ফেলিল।

শুনিয়া আসে পাশের নানা জনে নানা কথাই মনে করিল। তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতেছে, একথার কি অর্থ হইতে পারে ; উত্তরে একজন বলিল, না না, এই যে, আমরা তোমার কাছেই আছি, ভয় কি ?

ইত্যবসরে প্রাণের গতি কেন্দ্রের দিকেই নির্দ্দিষ্ট হইল, অন্তরের সকল চাঞ্চল্য আর নাই,—যুবকের দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ, এক হইয়া শান্তির আরাম স্থির ভাবেই অনুভূত হইতে লাগিল। হৃদয়ের শেষ স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের ঘন অনুভব,—তারপর বিহ্বলতা, তারপর সংজ্ঞা লোপ। এ অবস্থায় চৈতন্যকে জাগ্রত রাখিবার মত অহং তাহার ছিল না ;—সাধারণের তাহা থাকেও না,—কাজেই স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে স্থিতির মত দেহত্যাগ সময়ে অচৈতন্য রহিল। এইখানেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হইল।

একটা কথা জানিয়া রাখা ভাল যে,—সাধারণ জীব অজ্ঞান অবস্থায় দেহত্যাগ করে। মমতা যাহাদের অধিক—দেহগত চৈতন্য যাহাদের স্তিমিত, তাহাদের দেহত্যাগের সময়ে মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কিছুতেই সে প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী এই নিয়মে সহজে নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারে না। মৃত্যুকে স্বীকার করিলেও তাহার যে সেই সময় এতটা নিকট হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, কোনও প্রকারে যেন এড়াইতে চায়। যে দেহকে আধার করিয়া তাহার অহঙ্কারের স্ফুরণ হইতেছিল সেই দেহের উপরেই তাহার অধিকার ত্যাগ একথা সে ভাবিতেও পারে না। কিন্তু সে সময় আসিলে তখন সেই অবশ্যম্ভাবী নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া ছাড়া উপায়ও থাকে না। আখিরী হিসাব চুকাই-বার সময় কৃপণের সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে বিচ্ছেদের উৎকণ্ঠার মত—দেহাত্মবোধ যাহাদের প্রবল দেহত্যাগের সময়ে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হয়—সেই জন্যই তখন মূর্চ্ছা আসে, পরে সেই অবস্থাতেই তাহাদের শরীর ছাড়িতে হয়।

এ ক্ষেত্রে এই যুবকের যাহা ঘটিল, দেহ ত্যাগের পরে তাহার অবস্থার কথা কিছু বলা ভাল। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূর্চ্ছার ভাব কাটিয়া গেল। তখন তাহার শরীর এবং শরীরের সকল ক্রিয়ার মূল প্রাণের অভাব বোধ হইল। আমি আছি এ জ্ঞানটি আছে, মনের সংকল্প বিকল্পময় অবস্থা আছে, কিন্তু প্রাণের অভাবে তাহা ক্ষীণ এতই ক্ষীণ যে তাহা হইতে ইচ্ছামত কর্ম্ম করিবার শক্তি এবং প্রবৃত্তির অভাব, যেমন তিন চার দিন উপবাসের পর শরীরে প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয় সে সময় যেমন হাল্কা বোধ হয়, আকন্দ ফল পাকিলে তাহা ফাটিয়া যেমন অন্তরস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তুলার গুচ্ছ সকল বাতাসের গতি অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া বেড়ায়, দেহচ্যুত এই

জীবের গতিও সেইরূপ,—তখন তাহার কর্ম্মানুসারী গতিতে তাহার অভিষ্ট মার্গে গতিমান হয়।

জীবিত অবস্থায় যে ধারায় তাহার কর্ম্ম চলিয়াছিল, প্রত্যেক কর্ম্মের ফলাফল বিষয়ে তাহার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে,—সেই সকল অভিজ্ঞতাই তাহার গতি, এখন প্রাণশক্তির অভাব হইলেও তাহার সেই ক্ষীণ জ্ঞানই তাহাকে তাহার নিজ মার্গে আধিকার করিতে সহায়তা করিতে থাকে। অন্তরের চৈতন্য কর্ম্মবিপাকে মলিন থাকিলে এই পরলোকে তাহাকে কতকটা অন্ধকার দেখিতে হয়,—কিন্তু বিবেকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ক্রমে ক্রমে তাহার জড়বুদ্ধি যত পরিষ্কৃত হইতে থাকে ততই অর্থাৎ সেইক্রমে সে নিজের পথে আলোক দেখিতে পায়। এই যুবকের তাহাই হইয়াছিল,—যতক্ষণ তাহার নিজ মার্গ সরল, আলোকময় না হইল ততক্ষণ আমাকে প্রচ্ছন্ন ভাবেই তাহার সাথে সাথে থাকিতে হইল। ইহাও সত্য যে তাহার দেহত্যাগের পর যতক্ষণ তাহার এই পার্থিব জড়তার অসহায় ভাবটি না কাটিল ততক্ষণ তাহার বিচার বুদ্ধির উপর আত্ম-শক্তির বিকাশের এবং নিজ মার্গে গতিমান করিতে সহায়তা করিতে হইয়াছিল, যে হেতু সৌর দেবদূতগণের ইহা অন্যতম প্রিয় কার্য্য। যাঁহারা এ জড় জগতের জড় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সর্ব্বদা লোক সঙ্গে জীবন যাপন করেন মৃত্যুকে তাঁহাদের প্রধান ভয়ই নিঃসঙ্গতাঘটিত, তাঁহাদের কল্পনা এই ভাবেই পুষ্ট হয়, যেন দেহত্যাগের পরের অবস্থা কেবল অন্ধকারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকা,—তাহাদের জন্যই আমার এই সত্যটি প্রকাশ করিতে হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

আবির্ভাব

শ্রীরসময় দাস

অন্ধকার এ জীবনে উষালোক সম
কে তুমি আসিলে নামি' পরম সুন্দর?
সুদূর দিগন্ত সীমা উদ্ভাসিয়া মম
স্মিত হাস্যে কে চলিছ নীরব মন্থর?
হৃদয় নিকুঞ্জে মোর বিহগ সঙ্গীতে
উঠিতেছে ধীরে ধীরে আরতির ধ্বনি,
কোথা হতে সমীরণ জাগি আচম্বিতে
ছড়ায়ে কুসুম রেণু ভরিছে অবনী।
এ কি গো অপূর্ব্ব আলো ঝলসায় আঁখি,
এ কি হর্ষ জাগে চিত্তে ব্যথার মতন!
এ সঙ্গীত কোথা হতে উঠে থাকি থাকি;
আনন্দ-আবেশে মোর মূর্চ্ছে' প্রাণ মহ!
প্রভাত জগৎ মাঝে বক্ষ উঠে দুলি',
আমারে কি পুষ্প সম নিবে তুমি তুলি?

সুভদ্রাঙ্গী

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

১০

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা। উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বতমালা হ'তে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ মগধ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পূর্বে কেবল প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম) ও কলিঙ্গ, এবং উত্তরে কেবল কাশ্মীর ও নেপাল মগধ-সম্রাটের অধিকারভুক্ত হয়নি। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর খৃষ্টপূর্ব্ব ২৯৭ বর্ষে তাঁর পুত্র, বিন্দুসার এই বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে পঁচিশ বৎসর কাল এর শাসন করেছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন এবং তাঁর সুশাসনে ভারতীয় প্রজাবর্গ সুখে কালাতিপাত ক'রত।

সেকালে রাজা মহারাজাদিগকে পার্শ্বরক্ষকগণ দ্বারা পরিবৃত থাক'তে হ'ত। রাজাদের রাত্রি-যাপন স্থানের রহস্য তাঁদের অতি বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গ ভিন্ন কেহই জান্‌তে পারত না। প্রত্যেক রাণীরই অন্তঃপুর মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ এক একটী ছোট মহল ছিল, এবং মহলগুলি এরূপ কৌশলে স্থাপিত যে এক রাণীর মহলের ঘটনা অন্যান্য রাণী বা তাঁদের পরিচারিকারা জানতে পারত না। রাজা কোন রাণীর মহলে আজকার রাত্রি অতিবাহিত ক'রবেন এ সংবাদ সন্ধ্যার পর মৌবিদ দ্বারা অন্তঃপুরে প্রচারিত হ'ত। কিন্তু প্রায়ই তিনি সে মহলে না গিয়ে অপর কোন রাণীর মহলে অকস্মাৎ আবির্ভূত হতেন। এক জনের আশাভঙ্গ ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে অপরকে অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে সম্মানিত ক'র্‌তে শত্রু-সঙ্কুল রাজ ভবনে মহারাজকে বাধ্য হ'তে হ'ত।

সুভদ্রার থাকবার স্থান ছিল দাসী মহলের এক প্রান্তে। সেখানে সে দীনবেশে ও মলিন চিত্তে নিঃসঙ্গে কালযাপন ক'র্‌ত। অন্য দাসীরা তাকে তাদেরই ন্যায় একজন দাসী ভাবত। তার রূপ তাদের অসহ্য ছিল—কেহ তার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'র্‌ত না।

একদিন এক রাণী সুভদ্রাকে ব'ল্‌লেন, "হ্যাঁলো, সুবী পোড়ারমুখী, কাল বিকেলে তোকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, আসা হয়নি কেন, শুনি।"

সুভদ্রা—কি ক'র্‌ব রাণীজী? চুল বাঁধবার জন্য সেজ রাণীজী আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর পরিচারিকারা যে ভাবে তাঁর চুল বেঁধে দেয়, তা তাঁর পছন্দ নয়। যখন আপনার দাসী গেল, তখন অন্ধকার হ'য়ে এসেছে—আমি তখন তাঁর চুলের বিউনী ক'র্‌ছি। রাত হ'য়ে গেল, আস্‌তে পারিনি।

রাণী—এবারে তোকে কিছু বললাম না। দেখিস্, এর পর এমন যেন না হয়।

আর একদিন সুভদ্রা অন্য এক রাণীর নখ কাটছিল—রাণী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "হারামজাদী, আঙুলটা কেটে দিলি?"

সুভদ্রা—না, রাণীজী, কাটেনি ত।

রাণী—তবে, লাগল কেন? একি তোদের মত ছোট লোকের গা যে, যাতা ক'রে দিবি? সাবধান হ'য়ে কাট্‌বি, যেন একটুও না লাগে।

এইরূপ দুর্বাক্য ও লাঞ্ছনা সুভদ্রার প্রায়ই সহ্য ক'র্‌তে হ'ত। সেই বিশাল পুরীতে তার দুঃখে দুঃখী হওয়ার কেহ ছিল না। সে ভাবত "হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য! ব্রাহ্মণের মেয়ে হ'য়ে আমাকে অন্যের পদসেবা ক'র্‌তে হ'চ্ছে। আমি কি কখনো ভাবতে পেরেছিলাম যে আমার এই দুর্দশা হ'বে? দরিদ্র হ'লেও দেশে আমার দিনগুলি হেসেখেলে কাটছিল। কিন্তু নিষ্কৃতির ত কোন উপায়ই দেখছিনে।"

যদিও কষ্টসহিষ্ণুতায় ও ধৈর্য্যে সে অভ্যস্ত ছিল, তথাপি বন্দী-জীবনের মর্মন্তুদ দুঃখ ও নৈরাশ্য তার অসহনীয় হয়ে উঠল। সে চিন্তা করে, "এই ভাবেই কি আমার চিরজীবন

কাট্‌বে? বাবা, কোথায় আপনি? আপনার আদরের ভদ্রার দশা দেখে যা'ন্‌। আপনি ভুল ক'রেছেন। আপনি ভেবেছিলেন যে, একবার আমায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করাতে পার্‌লে জ্যোতিষীর বাক্য সফল হবে। কিন্তু অন্তঃপুরের ভিতরকার খবর ও কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখে আমার ভ্রম ঘুচে গিয়েছে, এবং আমি বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আপনার উচ্চাভিলাষ দুরাশা মাত্র। কোথায় অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী অখণ্ড প্রতাপ মগধ সম্রাট আর কোথায় নগণ্যা দাসী। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে যে আমার পক্ষে মহারাজের অনুগ্রহ লাভ করা অসম্ভব।"

এইরূপ ভাবতে ভাবতে কিছু দিনের মধ্যে তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘ'ট্‌ল, এবং সে আত্মহ'ত্যায় কৃতনিশ্চয় হ'ল।

১১

কিছুকাল পরে একদিন সুভদ্রা মহারাজকে অন্তঃপুরের এক অলিন্দে একলা পদচারণা ক'র্‌তে দেখতে পেলে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর কবে ঘটবে? এই মনে ক'রে সে অগ্রপশ্চাৎ ক'র্‌তে লাগল। সে জানত যে, এক অপরিচতার পক্ষে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে কিছু বল্‌বার চেষ্টা করাও যা, আর জীবনের আশা ত্যাগ করাও তাই। কিন্তু তার মনে হ'ল, "আমি ত মর্‌ব বলেই সঙ্কল্প করেছি,—আমার সব ভয় ত্যাগ করা উচিত—এখন আর আমার ভয় কিসের? এই ভেবে সে মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য অগ্রসর হল। কিন্তু পৌছতে পার্‌লে না। যেই মহারাজের দৃষ্টি তার উপর পড়ল, অমনি তার মাথা ঘুরে গেল, এবং সে মূর্চ্ছিত হ'য়ে মাটীতে প'ড়ে গেল। পিতাদ্বারা পরিত্যক্ত হ'য়ে অসহায় অবস্থায় হীন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে তার যে দারুণ মানসিক ক্লেশ হয়েছিল, তার প্রভাব তার শরীরের উপর বিলক্ষণ পড়েছিল। সে শীর্ণ ও দুর্ব্বল হ'য়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, মহারাজের কাছে যাই.কি না যাই, এই চিন্তায় তার এরূপ একটি মানসিক উত্তেজনা উপস্থিত হয়েছিল, যাতে মহারাজের দৃষ্টি তার উপর পড়বামাত্র চরম সীমায় পৌছে তার মস্তিষ্কের সাম্য নষ্ট ক'রে দিয়েছিল।

সে প'ড়ে গেল, কিন্তু তার পতনের পূর্ব্বেই মহারাজ এক নজরেই বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে সে তরুণী এবং অসামান্য রূপ-লাবণ্যের অধিকারিনী। পার্শ্বরক্ষক প্রহরিণীরা নিকটেই ছিল—পড়বার শব্দ শুনবামাত্রই তারা দৌড়ে এল। মহারাজ আদেশ কর্‌লেন "একে কোন খালি মহলের আলোক ও বাতাসযুক্ত কক্ষে নিয়ে যাও।" তারা তাকে তুলে সেইরূপ একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যার উপর শুইয়ে দিলে। মহারাজ নিজেও সেই ঘরে উপস্থিত হ'লেন, এবং রোগিণীর পরিচর্য্যা চল্‌তে লাগলো। রাজবৈদ্যের নিকট সংবাদ পাঠান হ'ল। মহারাজ সৌবিদাদের জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "এ কে?" তারা অভিবাদন ক'রে উত্তর দিলে, "মহারাজ, এ নাপতিনী—রাজ-মহিষীদের সেবায় নিযুক্ত আছে।" মহারাজের সন্দেহ হ'ল—ভাবলেন, "নাপতিনীর এমন অসাধারণ রূপ হ'তে পারে না।"

সম্রাট চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজবৈদ্য এলেন, এবং সুভদ্রার চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল। পরদিন মহারাজ আবার এলেন—দেখলেন সুভদ্রা তখনও সংজ্ঞাহীনা। তৃতীয় দিবসে সুভদ্রার চেতনা ফিরে এলে সে দেখলে যে, সে এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে কোমল শয্যায় শুয়ে আছে। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তার উঠবার শক্তি হয়নি। মহারাজ এলেন, এবং তার সংজ্ঞা ফিরে এসেছে দেখে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি অতি কোমল স্বরে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তুমি কে? এখানে কেমন ক'রে এসেছ?" সে অতি ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলে, "মহারাজ, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি উঠতে পারছি না—আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। আমার পিতার বাড়ী চম্পানগর। কোন কার্য্যবশতঃ আমি আমার পিতার সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। রাণীজীরা আমাকে দেখতে চাওয়াতে এক পদাধিকারিণী আমাকে অন্তঃপুরে নিয়ে আসেন। তারপর আমাকে আর বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি—আমাকে রাণীজীদের পদসেবিকার কাজ করতে হয়।" মহারাজের দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল—এই কথা শুনে তিনি দুঃখিত হলেন। প্রথম হতেই সুভদ্রার প্রতি তাঁর সকরুণ ভাব ছিল—এই বিবরণ শুনে তাঁর সহানুভূতি বেড়ে গেল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, তার নাম সুভদ্রাঙ্গী। তিনি নিত্য এসে তাকে দেখে যেতেন। কিছু দিনের মধ্যে সুভদ্রা নীরোগ হ'য়ে উঠল।

এর আগেই তার সেবার জন্য কয়েক জন পরিচারিকা নিযুক্ত হয়েছিল।

সম্রাট্ বিন্দুসার প্রায়ই দুচার দিন অন্তর সুভদ্রার নিকট এসে তার কুশল জেনে যেতেন। একদিন সুভদ্রা মহারাজকে অভিবাদন করে যুক্তকরে বল্‌লে, "মহারাজ, আমার কিছু নিবেদন করবার আছে, যদি অনুমতি দেন ত বলি।" মহারাজ বললেন, "তোমার কি বলবার আছে, সুভদ্রা? যা বলতে চাও বল।" সুভদ্রা বললে, "এই দীনা ব্রাহ্মণ তনয়ার প্রতি মহারাজ অসীম দয়া দেখিয়েছেন। যত দিন দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন আপনার অনুগ্রহের স্মরণ থাক্‌বে, এবং আমি আপনার শুভ কামনা করতে থাকব। এখন আমি সুস্থ হয়েছি—এখন আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে—এই ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের যোগ্য নই। আমি আমার পিতার কুটিরে নিজ হাতে সব কাজ কর্‌তাম—এখানে দাসীরা আমাকে কোন কাজই করতে দেয় না। আমি সমস্ত দিন অলসভাবে কাটাই। আলস্যে কোন সুখ নাই—পরিশ্রমের পর বিশ্রামেই সুখ। আমি আরামের অধিকারিণী নই। আমি বুঝতে পেরেছি যে, এখন আর আমা দ্বারা রাণীজীদের পদসেবিকার কাজ করান মহারাজের ভাল লাগবে না—সে কাজে আমারও রুচি নাই। অতএব অভাগিনীর প্রার্থনা এই যে মহারাজ কোন উপায়ে আমাকে আমার পিতার নিকট দয়া করে পাঠিয়ে দিন। বাবাকে দেখবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়েছে।"

মহারাজ সুভদ্রার অন্তরের ভাব অনুভব করলেন, এবং বুঝতে পারলেন যে এ ঠিক বলছে—এ নিজ বাড়িতে স্বেচ্ছায় বিচরণ করত, এখানে পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এত আরামের মধ্যে থেকেও এর মন জন্ম-বিটপি-ক্রোড়ে ধাবিত হচ্ছে। তথাপি তিনি বললেন, "সুভদ্রা, তুমি কেন একথা বলছ? এখানে কি তোমার কোনো অসুবিধা আছে? এখান থেকে তুমি কেন যেতে চাচ্ছ? তুমি কি চাও, বল। আমি সৌবিদাদের আদেশ দিয়ে যাচ্ছি যে তোমার যে বস্তুর প্রয়োজন হবে, তৎক্ষণাৎ তা তোমাকে আনিয়ে দেবে।"

সুভদ্রা—মহারাজের অনুগ্রহে আমার কোনো বস্তুরই অভাব নাই। বরং আমি এত সামগ্রী পাই যে গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, কারণ আমি এ সবে অভ্যস্ত নই। এই সকল দ্রব্যের ভোগ করাতে আমার একটা কু-অভ্যাস হ'য়ে পড়ছে, কারণ আমার পিতার গৃহে এর সহস্রাংশের একাংশও পাওয়া সম্ভব নয়।

মহারাজ—এখনো ত তুমি ভাল আরাম হওনি। আচ্ছা, আরো কিছুদিন এখানে থাক—পরে তোমার পক্ষে যা ভাল হয়, তাই করা যাবে।

এই বলে সম্রাট প্রস্থান করলেন। সুভদ্রা যেরূপ বন্দিনী ছিল, এখনো সেইরূপ বন্দিনীই আছে। এখন যে আরামে সে আছে, সে আরামে সে বিরক্ত। অথচ এখনকার বন্দী-জীবন কিয়ৎ পরিমাণে তার সহনীয় হয়ে এসেছে। এর কারণ কি? তাকে আর দাসীবৃত্তি ক'র্‌তে হয় না ব'লে কি? না, আর কিছু কারণ আছে?

চারদিন পরে সুভদ্রার কক্ষে মহারাজের আবার শুভাগমন হ'ল। একটী চিত্রাধারে চারিদিক থেকে টেনে বেঁধে সমতল করা এক খণ্ড পটের উপর সুভদ্রা কোনো চিত্র অঙ্কিত করছিল। মহারাজা আসতেই সে চমকে গেল—চিত্র সরাতে পার্‌লে না—উঠে মহারাজকে অভিবাদন ও অভ্যর্থনা ক'র্‌লে। মহারাজ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "সুভদ্রা, কি ক'র্‌ছ?" সেই সময়ে চিত্রের উপর মহারাজের নজর প'ড়ল—দেখলেন পটের উপর ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা আছে—

"নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।*

বর্ণগুলির লেখা সমূহে ফুল, পাতা ও রঙ্গের সমাবেশ এমন নৈপুণ্যের সহিত করা হ'য়েছে যে, চিত্রকলায় লেখকের যথেষ্ট নৈপুণ্য লক্ষিত হ'চ্ছে। মহারাজ বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লেন, "এ চিত্রখানি কি তুমি এঁকেছ, সুভদ্রা? তুমি লেখাপড়াও জান?" সঙ্কোচ বশতঃ সুভদ্রা দৃষ্টি অবনত ক'রে দাঁড়িয়ে র'ইল—কিছুই ব'ল্‌তে পা'র্‌লে না। সম্রাট ব'ল্‌লেন, "তুমি লেখাপড়া জান এবং চিত্রবিদ্যায় এত নিপুণ, তাত আমি জা'নতাম না। আজ জান্‌তে পেরে অতিশয় আনন্দ লাভ কর্‌লাম।"

সুভদ্রা—কি করি, মহারাজ, চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে দিন আর কা'টতে চায় না। আমার ভাগ্যের চিন্তাও আমাকে

* শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৩।৮।

অবসন্ন ক'রে ফেলে। চিত্ত প্রসন্ন রা'খবার জন্য এই কাজ হাতে নিয়েছি।

মহারাজ—আচ্ছা, তুমি শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ লিখে এই চিত্রখানি সম্পূর্ণ কর। আমি ভারি খুসী হয়েছি।

এই ব'লে মহারাজ চলে গেলেন। তিনি ভাবছিলেন, "সুভদ্রা ব'লছিল যে তার ভাগ্যের চিন্তা তাকে অবসন্ন ক'রে ফেলে। ব্রাহ্মণের মেয়ে, অনিন্দ্য রূপসী এবং অসীম গুণবতী হয়েও তাকে অতি হীন কর্ম ক'রতে হ'য়েছে। একি তার কম দুর্ভাগ্য? পিতা হ'তে বিচ্ছিন্ন করে তাকে অন্তঃপুরে বন্দিনী ক'রে রাখা হ'য়েছে, এতে সে কিরূপ মানসিক যাতনাই অনুভব করছে! কিন্তু এ কথা জেনেও ত আমি তাকে ছাড়তে চাচ্ছিনে। আমি তার রূপগুণে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছি। এই রমণীরত্নটীকে পাওয়ার কি উপায়? তাকে কিরূপে আমার প্রতি আকৃষ্ট করা যায়? সে ব্রাহ্মণ—আমি ক্ষত্রিয় ব'লে কথিত হ'ই, কিন্তু আমাতে শূদ্র-সংস্পর্শ আছে। এরূপ স্থলে তার সঙ্গে আমার বিবাহ কি করে হ'তে পারে? প্রতিলোম বিবাহের সন্তান জাতিভ্রষ্ট হয়। তবে, প্রতিলোম বিবাহ এখন চ'লছে। কি করা যায়? প্রথমে ত আমার উপর তার প্রীতি উৎপন্ন হওয়া চাই। অধর্মের কাজ আমা-কর্ত্তৃক হবে না—বিশেষ কথা এই যে, সে ভারি তেজস্বিনী —কোনো অন্যায় কাজে সে স্বীকৃত হ'বে না।"

অনেক দিন থেকেই মহারাজ সুভদ্রাকে প্রীতির চক্ষে দেখে আসছিলেন—এখন তাঁর চিত্ত তার চিন্তায় ভরপুর। এখন থেকে তার বিরহ মহারাজের কষ্টদায়ক হ'তে লাগ্‌ল।

এবারে সম্রাট্ সুভদ্রার কক্ষে তৃতীয় দিনেই এসে প'ড়লেন। দেখ্‌লেন চিত্রখানি সম্পূর্ণ হয়েছে—শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধও ঠিক প্রথমার্দ্ধের ন্যায় ফুল, পাতা ও রং দিয়ে লেখা হয়েছে—

"শরীর-যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥"

সুভদ্রা মহারাজকে অভিবাদন ক'রে হাত জোড় করে নিবেদন ক'র্‌লে, "চিত্র ত সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, এখন মহারাজের কি আজ্ঞা? এখন আমি ছুটী পেতে পারি?"

সম্রাট ব'ললেন, "তুমি যাওয়ার জন্য এত ব্যস্ত হ'য়েছ কেন, সুভদ্রা? আমি যত তোমাকে বেঁধে রা'খতে চাচ্ছি, তুমি তত বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছ। আমি তোমাকে সুখী ক'র্‌বার জন্য এত আগ্রহ দেখিয়ে আস্‌ছি, কিন্তু তোমার কাছ থেকে কোনো সাড়াই পাচ্ছি না।"

সুভদ্রা—আমি অকৃতজ্ঞ নই, মহারাজ। কিন্তু কি ক'রে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাব, তা ভেবে ঠিক করতে পা'রছি না।

মহারাজ—ভেবে দেখো, সুভদ্রা। এখানে থাক্‌বার কি তোমার কোনো আকর্ষণই নাই? আজ আমার কাজ আছে—এখন আমাকে যেতে হ'বে। এর পরে আমি যে দিন আ'স্‌ব, আমার প্রশ্নের উত্তর দিও।

সুভদ্রা মনে মনে চিন্তা ক'রতে লাগল, "মহারাজ আমাকে ভালবাসেন, তা আমি অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছি। আমিও পাষাণী নই—আমিও তাঁর গুণরাশিতে মুগ্ধ। তাঁর রাজোচিত রূপ আছে—যৌবনের সীমা অতিক্রম ক'র্‌তে তাঁর অনেক বিলম্ব—তিনি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, দয়ালু ও কোমল-স্বভাব। তিনি স্নেহশীল, বিশেষতঃ আমার প্রতি তাঁর স্নেহ অসীম। তিনি আমাকে যে অসাধারণ অনুগ্রহ দেখিয়ে এসেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তিনি তাঁর ভালবাসার প্রতিদান চান। আমি তাঁকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছি, কারণ তাঁর অদর্শনে আমি ব্যথিত হই। তিনি তাঁর প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর চান। তিনিও হয় ত কতকটা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন। বৈধ বিবাহ-সূত্রে আমরা আবদ্ধ হ'তে পারি কি না এই প্রশ্নের উপর সমস্ত নির্ভর ক'রছে। এর উত্তর না জান্‌তে পার্‌লে মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। এই প্রেমের ব্যাপারে হ'য় ত আমাকে আজীবন দুঃখ ভোগ ক'রতে হ'বে।"

দু দিন পরে সম্রাট্ এলেন। সুভদ্রা তাঁকে যথোচিত সমাদর করে বসালে। সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুভদ্রা তুমি কি আর কোন কাজ হাতে নিয়েছ?"

সুভদ্রা—আজ্ঞে না, মহারাজ। আমি ভারি মনমরা হয়ে পড়েছি—কোনো কাজই ভাল লাগে না।

মহারাজ—বিষাদের কারণ কি?

সুভদ্রা—মহারাজ সহজেই আমার বিষাদের কারণ অনুমান ক'রতে পারেন। কারাগৃহে বন্দীর মনের ভাব যেরূপ হয়,

আমার মনের ভাবও সেইরূপ। এই ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? কি অধিকারে আমি এ সব ভোগ করুছি? এই চিন্তা আমার মনকে অপ্রসন্ন ক'রে তোলে। মহারাজ আমার জন্য অনেক করেছেন, এবং সর্ব্বদা আমাকে সুখী ক'রবার চেষ্টা করুছেন। কিন্তু এই দানের প্রতিদান আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব, তা মহারাজই আমাকে অনুগ্রহ ক'রে ব'লে দিন।

মহারাজ—কেন অসম্ভব, সুভদ্রা?

সুভদ্রা—কি সম্বন্ধে আমি এখানে থা'কৃব?

মহারাজ—এতে সম্বন্ধের দরকার কি? তুমি এই স্থানে এই ভাবে থাকৃবে আর আমি কখন কখন দিনের বেলা এসে তোমাকে দেখে যা'ব।

সুভদ্রা—মহারাজ, অপরাধ ক্ষমা ক'রুবেন—আমি একটী কথা বলবার অনুমতি চাই। মহারাজের আগ্রহ তাঁর বিমল বুদ্ধির উপর যেন একটী যবনিকা পাত করেছে। মহারাজ হয়ত লোকনিন্দার কথা ভাবেন্ নি। লোকে আপনার শুভ্র যশের উপর মসী-লেপন করুবে। আমার ত কোন কথাই নেই।

মহারাজ—এখন দেখ্ছি যে আমার বিবেচনার ত্রুটি হয়েছে। যাই হ'ক্, সুভদ্রা আমাকে বল তুমি আমাকে চাও কি না। তোমার ও আমার মিলন কি অসম্ভব? তোমার উত্তরের উপর আমার ভবিষ্য-জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর ক'রছে।

সুভদ্রা—আমার মনোভাব হয়ত মহারাজ অনুমান ক'রতে পেরেছেন। যদি বৈধ উপায়ে আমাদের মিলন সম্ভব হয়, তা হলে আপনার চরণের আশ্রয় আমি ত্যাগ করবনা।

মহারাজ—হৃদয়, বল আমা অপেক্ষা আজ সুখী কে? নিশ্চয়ই আমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রুব।

সুভদ্রা—আমার পিতার অনুমতিও আবশ্যক। আমার ইচ্ছা যে তিনি আমাকে নিজ হস্তে সম্প্রদান করেন। আমার পিতাও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। এই সব কার্য্যে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। ততদিন পর্য্যন্ত আমার অন্তঃপুরে থাকা উচিত নয়—নানা কথা উঠতে পারে। পাটলীপুত্র নগরের আর কোনো স্থানে থাকলেও কুৎসার হাত এড়ান যাবে না। তা ছাড়া, আমার পিতা আমাকে ফেলে রেখে দেশে চলে গিয়েছেন। সেখানকার লোকেরা আমার সম্বন্ধে কি বলছে বলা যায় না। এরূপ অবস্থায় বিবাহ পর্য্যন্ত আমার চম্পানগরে গিয়ে থাকাই উচিত। অতএব, যদি মহারাজের মত হয়, আমাকে রাজ-পুরোহিত ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের সঙ্গে চম্পানগরে পাঠিয়ে দিন। সেখানে রাজ-পুরোহিত মহাশয় আমার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে তাঁর সম্মতি নেবেন। তিনি আমার পিতা ও তাঁর দু একজন বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে পাটলীপুত্র নিয়ে আসবেন। আমিও সেই সঙ্গে ফিরে আস্‌ব। আমরা ফিরে এসে মহারাজ—নির্দ্দিষ্ট বাসায় উঠব, এবং সেখানে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হ'বে।

মহারাজ সুভদ্রার প্রস্তাবের দূরদর্শিতা, যৌক্তিকতা ও ব্যবস্থা-কুশলতা অনুভব করে বিস্মিত হলেন, এবং ঐ প্রস্তাবই অনুমোদন করুলেন—ভাবলেন এ অদ্ভুত রমণী—সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য আমার এইরূপ ধর্ম্মপত্নীই আবশ্যক।

কিন্তু তখনও তাঁর মন সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান ছিল। তিনি বল্‌লেন, "যদি শাস্ত্রের মত প্রতিকূল হয়, তা হলে কি হবে, সুভদ্রা?"

সুভদ্রা—সে অবস্থায় আজীবন কুমারী হ'য়ে থাকা ছাড়া আমার অন্য উপায় কি? আমি মহারাজকে যতদূর বুঝেছি, তাতে আমার ধারণা এই যে, শাস্ত্রের বিধানকে লঙ্ঘন ক'রে মহারাজ কখনো আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হ'বেন না। আমিও মনে যাঁকে পতিত্বে বরণ করেছি, তাঁর স্মৃতি বহন ক'রে বিরহ-দগ্ধ জীবন অতিবাহিত করব।

সুভদ্রার প্রেমের গভীরতা ও পণের কঠিনতা মহারাজকে চমৎকৃত করলে—ভাবলেন, যদি দৈব-দুর্বিপাকে এই মহাপ্রাণা রমণীকে হারাতে হয়, তা, হ'লে কি পরিতাপের বিষয় হ'বে! আমার জীবন কি দুঃসহ হ'বে!"

এই ভা'ব্‌তে ভা'বতে মহারাজ মন্ত্রিসভাভিমুখে প্রস্থান করুলেন।

১২

একদিন সকালে দেখা গেল যে চম্পানগরের পশ্চিম প্রান্তের বিস্তীর্ণ মাঠে কতকগুলি বোঝাই গোরুর গাড়ি ও অনেক লোকজন এসে তাঁবু ফেলবার উদ্যোগ করছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কয়েকটী শিবির শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্ম্মিত হয়ে

গেল। নগরবাসীরা ক্রমশঃ জান্‌তে পারলে যে শিবিরগুলি মগধ সম্রাটের কোনো উচ্চ কর্ম্মচারীর সাময়িক বাসের জন্য স্থাপিত হয়েছে।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে এক অশ্বারোহী সৈনিক নারায়ণ শর্ম্মার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ মহুয়া বৃক্ষের তলায় এসে তাঁকে ডাকলে। নারায়ণ শর্ম্মা বাড়িতেই ছিলেন, এবং বেরিয়ে এসে অশ্বারোহী সৈনিককে দেখে বিস্মিত ও ভীত হলেন। সৈনিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌লে যে তাঁরই নাম নারায়ণ শর্ম্মা, এবং কটিবন্ধ হ'তে একখানি পত্র বার করে তাঁর হাতে দিয়ে বললে, "পড়ে দেখুন—সব জানতে পারবেন"। নারায়ণ শর্ম্মা পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লেন, "আমার ভদ্রা আমার কোলে ফিরে আসছে? সম্রাট তাকে পত্নীত্বে মনোনীত ক'রেছেন? একি সম্ভব?" সৈনিক বললে "পত্রে যা কিছু লেখা আছে, সকলই সত্য। আপনি মনের আবেগ সম্বরণ করুন—সন্দেহ করবার কারণ নাই। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আপনার কন্যার শিবিকা আপনার দ্বারে উপনীত হবে। নগরের পশ্চিমের মাঠে রাজপুরোহিত ও একজন মহামাত্রের অবস্থানার্থ এবং শতাধিক সৈনিক ও ভৃত্যের বাসের জন্য শিবির সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সেখানে তাঁরা থাক্‌বেন। কেবল দুজন দাসী আপনার কন্যার সঙ্গে আপনার বাড়ীতে আসবে। এই গাছ তলায় তাদের থাকার ও পাকাদি কার্য্যের জন্য দুটী ছোট তাঁবু খাটান হবে। আমি ফিরে গিয়েই লোকজন পাঠাব। তারা এসে অতি সত্বর সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। কাল পূর্ব্বাহ্নে রাজপুরোহিত ও মহামাত্র-মহাশয়দ্বয় আপনার সহিত দেখা করবেন। অনুমতি করেন ত আমি এখন শিবিরে ফিরে যাই।"

নারায়ণ শর্ম্মা তাকে সৌজন্যের সহিত বিদায় দিলেন। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য নারায়ণ শর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, এবং সম্রাটের পত্রখানি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, "এখনি একজন অশ্বারোহী সৈনিক এসে এই পত্রখানি আমাকে দিয়ে গেল, এবং বলে গেল যে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সুভদ্রা এসে পড়বে। তার সঙ্গে দুটী দাসী আসবে তাদের থাকার ও রন্ধনাদির জন্য মহুয়াতলায় দুটী ছোট তাঁবু খাটান হবে। কাল সকালে মহামাত্র ও রাজপুরোহিত আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আস্‌বেন। আমার বাড়িতে স্থান না থাকায়, আপনার বাড়িতে তাঁদের নিয়ে এসে বসাব। পত্রখানি প'ড়ে দেখুন।"

শাস্ত্রী—(পত্রখানি পড়ে) "এযে অভাবনীয় ব্যাপার! জ্যোতিষীর কথা বর্ণে বর্ণে ফলে গেল দেখছি!"

নারায়ণ—এখনো আহ্লাদে অধীর হওয়ার সময় হয়নি, শাস্ত্রী মহাশয়। শাস্ত্রের বিধানের উপর সমস্ত নির্ভর করছে।

শাস্ত্রী—প্রতিলোম বিবাহের একাধিক উদাহরণ আমি প্রাচীনকালের ইতিহাস থেকে দেখাতে পারি। শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর সহিত মহারাজা যযাতির বিবাহ হয়েছিল। তাঁর আর এক কন্যা আব্‌জাকে অযোধ্যার রাজপুত্র দণ্ড বিবাহ করেছিল। ক্ষত্রিয়-ঔরসে ব্রাহ্মণী-গর্ভে লোমহর্ষণাদি সুতজাতীয় দ্বিজদের জন্ম। এখন ত প্রতিলোম বিবাহ ব্রাহ্মণ-সমাজে অবাধে চ'ল্‌ছে। শাস্ত্রের বিধান পাওয়া যাবে না ব'লে তুমি অকারণ মন খারাপ ক'র না। যখনি ঋষিরা দেখেছেন যে পূর্বেকার শাস্ত্রাজ্ঞা সময়ানুকূল নয়, তখনি তাঁরা সময়োপযোগী নূতন ব্যবস্থা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এই জন্যই মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজকেরা পর পর তাঁদের গ্রন্থ প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন সমাজের যেরূপ মনোবৃত্তি, তদনুসারে নূতন ধর্মশাস্ত্র রচিত হওয়া আবশ্যক।

নারায়ণ—আপনিই এখানকার—এখানকার কেন, সমগ্র অঙ্গদেশের—প্রধান শাস্ত্রবেত্তা। আপনি যখন এই বিবাহ সমর্থন ক'রছেন, তখন আর কে কি ব'ল্‌তে পারে?

শাস্ত্রী—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকোগে যাও—আমি এ বিবাহে মত দেব।

নারায়ণ—আমি আশ্বস্ত হলাম। দেখা যাক্ কাল রাজ-পুরোহিত মহাশয় কি বলেন।

শাস্ত্রী—তিনি পাটলীপুত্রের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই কি এখানে এসেছেন?

নারায়ণ—খুব সম্ভব। বেলা অনেক হয়েছে, এখন আসি।

নারায়ণ শর্ম্মা বাড়ি ফিরে এসে দেখেন যে তাঁবুর সব সরঞ্জাম মহুয়া তলায় এসে পড়েছে। তৃতীয় প্রহরের পূর্ব্বেই

তাঁবু উঠে গেল। পাচক ও ভৃত্যেরা এসে তাদের কাজ আরম্ভ করে দিলে।

সন্ধ্যার দণ্ডখানিক পূর্বে একখানি পালকি ও দুখানি ডুলি মহুয়াতলায় এসে থাম্‌ল। ডুলি দুখানি থেকে দুজন দাসী নামল এবং পালকি থেকে সুভদ্রা। সুভদ্রার ইঙ্গিতে দাসীরা তাঁবুর ভিতর ঢুক্‌ল। সুভদ্রা একেবারে বাড়ির ভিতর চলে গেল। বাইরে বেহারাদের হাঁক শুনে নারায়ণ শর্মা ভেতর-কার দাওয়া থেকে উঠানে নামছিলেন, এমন সময় সুভদ্রা এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। তিনিও কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হেঁট হয়ে তাকে তুলবার চেষ্টা ক'র্‌লেন। তার পর তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলেন—তাঁদের হৃদয়ের আবেগ শান্ত হ'তে অনেক সময় লাগল। সুভদ্রা বল্‌লে, "বাবা, আপনি আমায় যে কয়েদ খানায় রেখে এসেছিলেন, তা থেকে যে কখনো উদ্ধার পা'ব তা ভাবিনি।"

নারায়ণ—কেন, সেখানে কি বড় কষ্ট?

সুভদ্রা—সে কথা ক্রমশঃ ব'ল্‌ব। আজ সাতদিন ক্রমাগত পাল্‌কিতে আছি—কেবল দুপরবেলা দু তিন দণ্ড ও রাত্রিটা বিশ্রাম ক'র্‌তে পেতাম।

নারায়ণ—সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে। এখন তুই মুখ হাত ধুয়ে, কাপড়-চোপড় ছেড়ে, কিছু জল খেয়ে খানিক বিশ্রাম কর—পরে কথাবার্ত্তা হ'বে।

সুভদ্রার বস্ত্রাদি দাসীদের কাছে ছিল। সুতরাং সে তাঁবুতে গেল। দাসীরা তার হাত পা ধুইয়ে, গা মুছিয়ে দিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে দিলে। সামান্য জলযোগ ক'রে সে, সেখানকার খাটে শুয়ে পড়ল। শীঘ্র উঠে পিতার কাছে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু ক্লান্তি বশতঃ তার চোখ দুটী ঘুমে জড়িয়ে এল। দু তিন দণ্ড ঘুমোনর পর ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে সে যে তাঁবুর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। লজ্জিত হ'য়ে সে বাবার কাছে এসে দেখলে তিনি একখানি কম্বল মুড়ি দিয়ে নিজের বিছানায় ব'সে আছেন। তাকে নিকটে আস্‌তে দেখে তিনি বললেন, "তুই ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিস্‌ ভেবে আমি তোকে ডাকি নি।" দণ্ড দুই কথাবার্ত্তা হওয়ার পর একজন দাসী এসে ব'ললে, "খাবার তৈরী হয়েছে।" সুভদ্রা তাকে ব'ল্‌লে, "ভেতরের দাওয়ায় খাবার জায়গা করে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে দুজনের খাবার দিয়ে যেতে বল।" পিতা পুত্রীতে আহারে বসলেন। আহারের ব্যবস্থা রাজবাড়ির ধরণেই হয়েছিল। খাবার সময় সুভদ্রা পাড়ার সকলের খবরই নিলে—বিশেষ ক'রে কমলা, মালতী ও জ্যোঠাই-মাদের। আহারান্তে দাসীরা গরম জল ঢেলে দিতে লাগল আর তাঁরা আঁচাতে লা'গলেন। তার পর তারা পান নিয়ে এলে সুভদ্রা তাদের বলে দিলে যে সে বাড়ির ভেতরেই শোবে। তারা তাঁবুতে চ'লে গেল।

সুভদ্রা আস্‌বে বলে নারায়ণ শর্মা তাঁর শোবার ঘরটী নিজে ভাল করে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে বিছানা দুটী গুছিয়ে পেতে এবং লেপ দুটী ঝেড়ে ঝুড়ে পায়ের কাছে পাট ক'রে রেখে দিয়েছিলেন। তাঁরা নিজের নিজের বিছানায় লেপ গায় দিয়ে শুয়ে প'ড়লেন। সুভদ্রা শুয়ে শুয়ে বল্‌লে, "বাবা, আপনি তখন রাজান্তঃপুরে আমার কষ্টের কথা জান্‌তে চেয়েছিলেন—এখন বলি শুনুন। রাণীরা আমাকে দেখে ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে আমাকে তাঁদের পদসেবিকার কাজে নিযুক্ত ক'র্‌লেন—আমাকে অন্তঃপুর থেকে বেরুতে দিলেন না। আমাকে দাসী-মহলের এক কোণে পড়ে থাক্‌তে হত—দাসীরা কেউ আমার সঙ্গে কথা ক'ইত না। নখ কা'টবার পা ছুলবার, আলতা পরাবার সময় সামান্য কারণে বা বিনা কারণে রাণীরা আমাকে যা তা ব'ল্‌তেন। কোন রাণীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছি এমন সময় আর একজন আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার যেতে দেরী হ'ল—তখন আর রক্ষে নেই। এরূপ জীবন আমার অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। উদ্ধারের কোনো উপায় না দেখে আমি আত্মহত্যা ক'র্‌তে উদ্যত হ'লাম।"

তারপর আজ পর্য্যন্ত যা ঘটিছিল, তা এক এক ক'রে সব ব'লে গেল—শেষে বল্‌লে, "আমি কৌশল ক'রে আমাকে এখানে পাঠানর পরামর্শ মহারাজকে দিয়েছিলাম। তা'ই তিনি রাজ-পুরোহিতকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে এখেনে পাঠিয়ে-ছেন। চম্পানগরে ফির্‌বার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপাচ্ছিল—আমি আপনাদের না দেখে থাক্‌তে পা'রছিলাম না। যদি শাস্ত্রের বিধান অনুকূল হয়, তা হ'লে আমাকে পাটলীপুত্রে

ফিরতে হবে। যদি না হয়, চিরদিন আমি এখেনেই থা'কব"।

নারায়ণ—তোর যে এত ক্লেশ হবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। শাস্ত্রের বিধান বিরুদ্ধ হবে না। তোর ফিরতেই হ'বে। তোর সঙ্গে আমারো যেতে হ'বে।

কথাবার্ত্তায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হ'য়ে গেল, পরে উভয়েই ঘুমিয়ে প'ড়লেন।

১৪

পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে রাজ পুরোহিত মহাশয় ও মহামাত্র মহাশয় নারায়ণ শর্ম্মার বাড়িতে দেখা দিলেন। সেখানে ব'সবার সুবিধা না থাকায় নারায়ণ শর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়িতে তাঁদের নিয়ে গেলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁদের মহা সমাদর ক'রে বসালেন।

মহামাত্র মহাশয় ব'ল্লেন, "আমরা মগধ-সম্রাটের প্রতিনিধি হ'য়ে এখানে এসেছি। তিনি আমাদের দ্বারা নারায়ণ শর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা সুভদ্রাঙ্গী দেবীর সহিত তাঁর বিবাহের প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন"।

নারায়ণ—এই প্রস্তাবে আমি নিজেকে সম্মানিত বিবেচনা ক'রছি। শাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা না থাকলে আমি এই বিবাহে সম্মত আছি।

রাজ-পুরোহিত—পাটলীপুত্র ত্যাগ করবার পূর্ব্বে আমি সেখানকার প্রধান প্রধান স্মার্ত্তগণের মত সংগ্রহ ক'রেছি। তাঁরা সকলেই একবাক্যে বিবাহের পক্ষে মত দিয়েছেন। এই দেখুন তাঁদের লিখিত ব্যবস্থপত্র। এখন আপনাদের মত হ'লেই সম্বন্ধ স্থির হ'তে পারে।

নারায়ণ—চন্দ্রমৌলী শাস্ত্রী মহাশয় অঙ্গদেশের প্রধান পণ্ডিত। তাঁর অসাধারণ শাস্ত্র জ্ঞানের কথা হয় ত পাটলীপুত্রের কোনো কোনো পণ্ডিতেরও জানা আছে। তাঁর সম্মুখে আমরা উপস্থিত। পাটলীপুত্রের অধ্যাপকদের স্বাক্ষরিত এই ব্যবস্থা-পত্র প'ড়ে যদি তিনি অভ্রান্ত বলে স্বীকার করেন, তা হ'লে কোন আপত্তিই থাকতে পারে না।

শাস্ত্রী—অসবর্ণ বিবাহ এখন এদেশে প্রচলিত হয়ে পড়েছে প্রতিলোম বিবাহও বিরল নয়। যাঁরা প্রতিলোম বিবাহে সংসৃষ্ট সমাজ যখন তাঁদের নিতে আপত্তি করছে না তখন এটা দেশাচার হ'য়ে পড়েছে বলে ধরা যেতে পারে। সমাজের অবস্থানুসারে যুগে যুগে ধর্ম্মশাস্ত্রের পরিবর্ত্তন হয়ে এসেছে। আমি পাটলীপুত্রের আচার্য্যদের ব্যবস্থা পড়ে দেখলাম—অনেক শাস্ত্র থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত ক'রে তাঁরা তাঁদের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁদের যুক্তিতে কোনো দোষ আবিষ্কার করতে পারছিনা।

মহামাত্র—যখন আপনিও এই ব্যবস্থা সমর্থন করছেন। তখন এই ব্যবস্থা পত্রে আপনারও স্বাক্ষর থাকলে এটা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'বে।

শাস্ত্রী—আমার কোন আপত্তি নাই। এই আমি স্বাক্ষর ক'রে দিলাম।

মহামাত্র—যখন আপনি এতে নিজ স্বাক্ষর সংযোজিত করেছেন, তখন অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের ন্যায় আপনি আপনার ন্যায্য পারিতোষিক একত্রিশ নিষ্ক স্বর্ণ গ্রহণে আপত্তি ক'রবেন না।

শাস্ত্রী—আমি বড় লজ্জিত হচ্ছি।

রাজ-পুরোহিত—লজ্জার কোন কারণ নাই। এ তৈলবট আপনার ন্যায্য প্রাপ্য।

মহামাত্র—কন্যাপক্ষ থেকে আপনার বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকাও প্রয়োজন। অতএব সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ আমি আপনার পাটলীপুত্র যাওয়ার নিমন্ত্রণ ক'রছি। নারায়ণ শর্ম্মা মহাশয়কেও নিমন্ত্রণ ক'রছি, কারণ তিনি কন্যা সম্প্রদান ক'রবেন। আপনাদের আর কোন বন্ধু বান্ধবকে যদি নিয়ে যেতে চান, তাঁদের নাম বলুন, আমি তাঁদেরও নিমন্ত্রণ ক'রব।

শাস্ত্রী—আমি যেতে সম্মত। শুভদিনে আমাদের এখান থেকে যাত্রা কর্'তে হবে, এবং বিবাহের লগ্নটাও স্থির ক'রে ফেল্'তে হ'বে।

রাজ-পুরোহিত—আমরা উভয়ে পরামর্শ ক'রে যাত্রার দিন ও বিবাহের লগ্ন স্থির ক'রব। বেলা অনেক হ'য়েছে—এখন আমাদের শিবিরে ফিরে যেতে অনুমতি দিন।

শাস্ত্রী—যে আজ্ঞে। আমার কুটীরে আপনাদের পদার্পণে আমি সম্মানিত হ'লাম।

তাঁদের পাল্‌কি নারায়ণ শর্ম্মার বাড়ির মহুয়া তলায়

অপেক্ষা কর্'ছিল। নারায়ণ শর্ম্মা রাস্তায় শঙ্কর মিশ্রের বাড়িতে তাঁদের নিয়ে গিয়ে তাঁকে পাটলীপুত্র যাওয়ার নিমন্ত্রণ করালেন।

কমলা ও মালতী শুনেছিল যে, সুভদ্রা ফিরে এসেছে, কিন্তু সেদিন রাত হ'য়ে যাওয়াতে দেখা ক'রতে পারেনি। পরদিন সকালেও তারা আ'স্‌তে পারেনি। কমলার পিতার সঙ্গে রাজ-পুরোহিতের কি কথাবার্ত্তা হয়, তাই আড়াল থেকে শুন্‌বার জন্য তারা অপেক্ষা ক'রলে। সুভদ্রা জা'ন্‌ত যে মহামাত্র মহাশয় ও রাজপুরোহিত মহাশয় তার পিতার সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়িতে গিয়েছেন। সেইজন্য সে কমলা ও মালতীর খোঁজে বেরুতে পারেনি। সভা ভঙ্গ হওয়ার আগেই কমলা ও মালতী জান্‌তে পা'র্‌লে যে বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

অপরাহ্নে তারা সুভদ্রাদের বাড়িতে এসে দেখলে যে সে আগে যেমনটী ছিল, তেমনটীই আছে। তার ব্যবহারের ও বেশের কোনো পরিবর্ত্তনই হয়নি। কমলা ব'ল্‌লে, "হ্যাঁলা, মহারাণীর কি এই বেশ?"

সুভদ্রা—এখনো ত রাণী হ'ইনি।

মালতী—আর বাকি কি? কেবল মন্ত্র ক'টা পড়া বই ত নয়।

সুভদ্রা—তাও ত হয়নি—রাণীর পোষাক পরি কি ক'রে? চম্পানগরে আমি যে ভদ্রা সেই ভদ্রাই থাকব।

কমলা—হ্যাঁলা, পাটলীপুত্র গেলি, আর সম্রাটকে যাদু ক'র্‌লি কি ক'রে?

মালতী—ওর যে হাসি হাসি মুখ ও চোখের চাহনি, তাতে পুরুষ মানুষের মুণ্ডু ত ঘুরে যাবেই, মেয়েমানুষ শুদ্ধু বশীভূত হ'য়ে যায়। এই দেখনা কেন, ওর বিরহে এ ছমাস আমরা কি দুঃখেই কাল কাটিয়েছি।

সুভদ্রা—আমার দুঃখের কথা যদি বলি, ত তোরা শিউরে উঠবি। তবে শোন।

এই বলে সে তার চম্পানগরের ঘাট থেকে রওনা হওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত যা ঘটেছে সবিস্তার বর্ণন করলে। কমলা ও মালতী স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। মালতী বললে, "বলিস কি? রাজান্তঃপুরে তোকে এত কষ্ট ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে? ভাগ্যিস ঝোঁকের মাথায় গলায় দড়ি দিয়ে ফেলিস্ নি!"

কমলা—কিন্তু তুই সব কষ্টের পুরো শোধ নিইছিস্ ভাই,—সম্রাটকে তুই মুটোর মধ্যে করে ফেলেছিস।

মালতী—এখন বিয়েটা ভালয় ভালয় হ'য়ে গেলে হয়।

কমলা—এবার গেলে তুই ত আর চম্পানগরে ফিরবিনে। তোকে আমরা চিরদিনের জন্যে হারাব।

মালতী—জ্যোতিষীর কথা সম্পূর্ণ ফলে গেল কি না বল?

কমলা—রূপেগুণে মগধের সম্রাজ্ঞী হওয়ার যোগ্য তোর মত আর কে আছে?

সুভদ্রা—যোগ্য হই আর না হই, এটা আমার বিধিলিপি বলে আমি বুঝতে পেরেছি। কিছু দিন রাণী হয়ে না দেখলে বুঝতে পার্‌ব না রাণী হওয়ার কত সুখ।

কমলা—আচ্ছা ভাই, এখন আমরা আসি।

সুভদ্রা—যে ক'দিন আমি এখানে আছি, সে ক'দিন যেন সর্ব্বদা তোদের দেখতে পাই। বাল্য-স্মৃতির সুখ ঐশ্বর্য্য-ভোগের সুখের চেয়ে কম নয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

রূপকথা

[শিশুর চরিত্র গঠনে রূপকথার স্থান]

শ্রীগৌরী চক্রবর্ত্তী

রূপকথা সার্ব্বজনীন। সকল দেশে ও সকল কালে, যেখানেই মানুষ আছে, যেখানে মানুষের মনের ভাব মুখের ভাষায় ব্যক্ত হয়, যেখানে শিশু আছে, যেখানে স্নেহ থাকে মা'র বুকে—আফ্রিকার অসভ্য জুলু বা প্রতীচ্যের সুসভ্য মানব, সেমিটিক বা হ্যামিটিক, ককেসীয় বা মাঙ্গোলীয় সকল শ্রেণীর, সকল জাতির মধ্যেই আমরা দেখি রূপকথার প্রচলন। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে রূপকথার বর্ণনা বা রচনায় সামান্য কিছু পার্থক্য নির্দ্দেশ করিলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার আসল কথাটা, তাহার ভিতরের সুরটী সর্ব্বত্রই প্রায় সমান। (Cf :—The genuine Rupakathas and legends all over the world have many strikingly common points in them.—Folk-Literature of Bengal) রূপকথার পরিচয় দিতে গিয়া সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন "They are simple tales in which the superhuman element predominates. The Raksasas, the beasts and the celestial nymphs often play the most important parts in these stories. The tales of heroism related in them are sometimes fantastical···The human powers were exaggerated till imagination feasted itself to a satiety, and in Eastern tales, in particular, the romance of these was not bound by time and space, but transcended limits of all sorts." (এই সকল গল্পের মধ্যে একটি অতিমানুষিক ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রাক্ষস জীবজন্তু বা পরীরাই হয় প্রধানতঃ তাহাদের নায়ক বা নায়িকা। বীরত্বের কাহিনী অনেক সময়েই অলীক বলিয়া মনে হয়। বিশেষ করিয়া প্রাচ্য গল্পগুলিতে কল্পনা সকল সীমা ছাড়াইয়া যায়।) বাস্তবিকই এই অলৌকিক, বা অদ্ভুত ভাবটিই যেন রূপকথার নিজস্ব ধন। এই যে একটা অত্যাশ্চর্য্য কিছু যাহাকে আমরা কল্পনায় পাই কিন্তু কঠিন বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে হারাই এইটাই যেন তাহার বিশেষত্ব। 'কথা' যেন এক অপরূপ রূপ পরিগ্রহণ করিয়া 'রূপকথা' এই নামে পরিচিত হইয়াছে।

সাহিত্যের আসরে ইহার স্থান যে এমন কিছু উচ্চে তাহা নয়। কাব্য বা মহাকাব্য যেখানে ভাষার নানারকম বাঁধা-বাঁধির মধ্যে, ভাবের সমন্বয় ও কথার সমাবেশ লইয়া ব্যস্ত, রূপকথা সেখানে চলে সরল, সহজ, স্বচ্ছন্দ গতিতে। সাহিত্য যেখানে নানান্ ছন্দে, নানান অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিরাজিতা, রূপকথা সেখানে নিরাভরণা। সাহিত্যের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে মনে হয় যেন আধুনিক সহরের কোন সুশিক্ষিতা, মার্জ্জিতরুচি, রমণীর পার্শ্বে এক অসহায়া, অসংস্কৃতবেশা গ্রাম্য বালিকা উপবিষ্টা। রূপকথার মধ্যে ভাষার বা ভাবের প্রাচুর্য্য আমাদের আকৃষ্ট করে না,—করে যা সে ঘটনার পর ঘটনার সমাবেশ, চিত্রের পর চিত্রের বিরচন। "সে যেন প্রভাত পুষ্পের পূর্ণডালা; তার কল্পনা যেন সদ্য উষার শিশিরসিক্ত ফুলের মত মনোরম"।

ইহাদের মধ্যে এমন এক আশ্চর্য্য-কলা-প্রয়াসহীন সরলতা পাই যাহা অন্যত্র দুর্লভ। দূর উচ্চ ভাব এবং অসম্ভবের ভিতরেও এই সকল কথা কাহিনী কৌশল-ঘটার জটিলতাহীন, ইহাদের মূর্ত্তি অনাড়ম্বর। ইহাদের মধ্যে অসম্ভব কিছুই নাই, কিন্তু এ অসম্ভব সরল অসম্ভব। দেশের মেরু-মজ্জায় জড়িত স্বাভাবিক ভাবে ইহা বিকশিত হইয়াছে;

"বাধাহীন মুক্ত সৌন্দর্য্যে, সম্ভব অসম্ভবে মাখামাখি অনায়াস শিল্পকৌশলে ছোট বড় সমস্ত কুড়াইয়া লইয়া, কোথাও কল্পনার ডালপত্র মেলিয়া গগন জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে, কোথাও ফুল বাতাসী-পাখায় সাট দিয়া গগনে উধাও হইয়া গিয়াছে"।

এই রূপকথাগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙ্গা টুকরা বলিয়া বোধ হয়, উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখ দুঃখ শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, অনেকদিনের অনেক হাসিকান্না যেন আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, অনেক হৃদয়ের কথা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই জন্যই রবিবাবুর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে, "ইহাদের মধ্যে আমরা দেখি—কতকালের একটুকরা মানুষের মন কাল সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহুদূরবর্ত্তী বর্ত্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে ;—আমাদের মনের কাছে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার সমস্ত বিস্মৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হইয়া আবার অশ্রুরসে সজীব হইয়া উঠিতেছে"। রূপকথা যেন চিরকালের সামগ্রী।

"কত নিশি গেছে কতদিন, কত সকাল সন্ধ্যা বেলি।
কত বার মাস যুগ যুগান্তের অতীতে পড়েছে ঢলি"॥

কিন্তু রূপকথা এখনও যেন চিরনূতন, চিরনবীন।

মার আঁচলের সুলভ বাতাসের মত আসে সে—কত পুরানো অতীতের ছবি আমাদের চক্ষের সাম্‌নে মেলিয়া ধরে। তার ভিতর দিয়া আমরা পুরাকালের চিন্তার ধারার সহিত পরিচিত হই, তখনকার সমাজের চিত্র দেখিতে পাই।

ইতিহাস কতকগুলি ঘটনা শুধু ধারাবাহিক রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু রূপকথার কাজ অন্য। সে তার কল্পনা তার বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমাদের বহুপ্রাচীন যুগের মানবের চিন্তা, ধারণা, বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও রীতিনীতির সন্ধান দেয়। আধুনিক কালে ইহারাই ইতিহাসের উপাদান যোগাইয়া ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে। জর্জ্জ লরেন্স গমি (George Lawrence Gomme) তাঁহার Folklore as an Historical Science নামক পুস্তকে এ বিষয়ে অনেকটা ইঙ্গিত দিয়াছেন। মিষ্টার জে, এফ, ক্যাম্বেল (J. F. Campbell) তাঁহার Highland Tales নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"যাঁহারা এই গল্পগুলির বক্তা তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র ইহাদের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্যই এই সকল উপকথা হইতে জীবন যাত্রার অনেক বিস্মৃত অধ্যায় উদ্ধার করিতে পারা যায়।" এমনকি ইতিহাস যাহাদের কথা লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই—সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক তথ্যের ইঙ্গিত ইহার ভিতরে আবিষ্কার করা কঠিন হয়।

এইরূপে Dr. Callway সংগৃহীত Nursery Tales and Tradition of the Zulus নামক পুস্তকে দেখিতে পাই যে রূপকথা তাহার অনৈতিহাসিক আবরণের মধ্যে সেকালের জাতীয় সম্মিলনের (Tribal Assembly) সঠিক চিত্র লুকাইয়া রাখিয়াছে। তাই বলি রূপকথা শুধু পরী, ভূত, প্রেত বা অতিমানবের কাহিনী নয়—ইহার ভিতর আমরা প্রাচীন যুগের আচার ব্যবহার এবং সভ্যতার এমন অনেক নিদর্শন পাই যাহার ঐতিহাসিক মূল্য বড় কম নয়।—(Cf:—"These tales are a mirror of the customs and the thoughts of the people, and as such are of far greater value to us than the dates and the names of a few individuals—the dry bones of history".)

আরব্য উপন্যাস পড়িতে পড়িতে সেকালের মুসলমানদের ঐশ্বর্য্যের কথা স্বতঃই মনে জাগরূক হয়। এইরূপে Round Table Romanceএ King Arthur এবং তার বার জন knights বা শার্লমাই-এর গল্পগুলিতে মধ্যযুগের ইউরোপের চিত্র পাওয়া যায়। এই সকল গল্পের কোনটির কোন কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া আমরা কোন পরিচয় পাইনা, এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদিত হয় না। ইহারা যেন মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।

এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইলেও নূতন "কত স্বপ্ন যেন অকৃত্রিম কল্পনায় গোচরীভূত হইয়া, চিত্তের দুয়ারে কত সোনার রাজ্য আনিয়া বসাইয়া যায়। তখন স্নিগ্ধ প্রকৃতি যেন অকস্মাৎ সুরে আহত হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এবং শিশু হইতে বৃদ্ধের সমুদয় অন্তর কত কাব্য, কত কল্পনা, কত সৌন্দর্য্যের কি এক অব্যক্ত মোহন ভাবের অমৃত ঝঙ্কারে তারে তারে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে"।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও অতি প্রাচীনকাল হইতে এইরূপ রূপকথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

দীনেশবাবু ইহাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে প্রায় বৌদ্ধযুগ হইতে ইহাদের জন্ম—কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে ইহারা বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। তিনি এই সকল শ্রুতিসাহিত্য বা লোক-সাহিত্যকে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন যথা :—রূপকথা, ব্রতকথা, রসকথা ও গীতকথা। ইহাদের সম্বন্ধে কথা-সাহিত্য-সম্রাট দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন ;—"এখনও বাঙ্গালীর সেই প্রকৃত প্রাণ-স্থান পল্লীর গৃহে, অলিন্দে, পল্লীর অঙ্গনে, এই সকল রূপকথার পবিত্র মধুর মন্ত্র এবং ললিত মধুর আ'লাপ যখন প্রাণের সমস্ত সরলতা ও সরসতা নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া শৈশবের ধুলিমাখা সোনার দিনগুলি, মাতৃব্রতের উৎসবময় প্রাতঃমধ্যাহ্ন আর স্নিগ্ধ শ্যামা সন্ধ্যাকে আনন্দ-কোলাহলমুখর করিয়া তুলে—তখন বাঙ্গালীর জীবন, বাঙ্গালীর দিন, কতই আপন সত্তায়, কতই সরল পরমানন্দভাবে যেন মায়ের ক্রোড়ে, কাটিয়া যায়।" "আবার যখন সেই, পল্লীর শান্ত বাটে, মুক্ত মাঠে, নদীর ঘাটে, নিত্য এই কথার স্বর প্রাণের আবেগরাশি ও আদররাশি মথিত করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠে, পরিচিত বা অপরিচিত কলাপ্রয়াসহীন কোন সাধারণ কণ্ঠেও যখন সেই স্থর বাজিতে থাকে, তখন সেই নিত্যনূতন আবছায়ায় ঢাকা মধুর গল্পগুলি বাতাসের হিল্লোলে হিল্লোলে সুধাতরঙ্গ কাঁপাইয়া তোলে"।

এক্ষণে উপন্যাস যে ক্ষেত্রে যাহা করিতেছে, সেই ক্ষেত্রে তাহার অপেক্ষা অনেকখানি বেশি কাজ এই কথাগুলির উপর সংন্যস্ত ছিল, এবং আপনার প্রত্যেক শব্দে, প্রতি স্থরে, নিতান্ত সরল হেলায় ইহারা নিজ কার্য্য উদ্ধার করিয়া গিয়াছে। ইহারা বাঙ্গালীর আপন প্রাণের নিতান্ত নিজস্ব স্থরে একান্ত সহজ ভাবে বাজিয়া যায়। "ইহাদের মধ্যে বাংলার মাটীর গন্ধ মিশিয়া আছে। তাহা কুন্দ শেফালি অপরাজিতার মতই খাঁটি বাংলার সামগ্রী"। "ইহাদের মনোমোহন রূপ বাংলার দীপ-খচিত সন্ধ্যাকে ব্যগ্র আনন্দে অধীর করিয়া তোলে; সে ব্যগ্রতায় কর্ম্মশ্রান্তির কিছুমাত্র আবিলতা থাকে না। সেই আরামের সন্ধ্যা!—সেই বিশ্রামের শীতল লগ্ন!—সে সন্ধ্যা শুক্লাই হউক, কৃষ্ণাই হউক,—তখন গলার স্থরে প্রাণের পুলকে তাহা মধু হইতেও মধুময়ী হইয়া উঠে।

একথা সকলেই স্বীকার করেন এবং মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বহুবিধ নিদর্শনের দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে শৈশবের চিন্তা বা ভাবধারা (পরিণত বয়সে) মানবচরিত্রে অলক্ষ্য হইলেও সুনিবিড় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তখনকার কল্পনা, তখনকার আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও উদ্বেগ মনের উপর যে ছায়া নিপতিত করে তাহা সহজে মুছিয়া যায় না। গোপন প্রাণের অন্তস্তলে তাহারা সঞ্জীবিত থাকে। মনের ভিতর গাঁথিয়া যায় তাহারা—কিন্তু কেমন করিয়া যে যায় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ফ্রয়েড্ প্রায় ইহাকেই amnesia of childhood নামে অভিহিত করিয়াছেন। (...These impressions these plastic images are not really forgotten......they become part of the unconscious). তাই দেখি এইসকল রূপকথা—যাহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল প্রধানতঃ শিশুরই মনোরঞ্জনের নিমিত্ত, যাহারা এই নিঃসঙ্গ কিশোর প্রাণের সহচর তাহারা তাহার সুকুমার চিত্তের উপরে নানান্ রঙ্গের রেখা অঙ্কিত করিয়া যায়। রূপকথা শুনিতে শুনিতে সেও যেন 'সোনারকাঠি', রূপারকাঠির' পরশ পায়—স্নেহের মোহন আবেশে তাহার চিত্ত উঠে ভরিয়া, সে পায় আশায় রঙ্গীন প্রেরণা,—আনন্দ ভয় কৌতুক মিশ্রিত ছবি তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।

প্রথমতঃ—শিশু যখন মার কোলে বা ঠান্‌দিদির আঁচলের মধ্যে রূপকথার স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকে তখন সে শুধু গল্প শুনিয়াই যে পরিতৃপ্ত হয় তাহা নয়—সে এই গল্পের মধ্যে, এই বর্ণনার মধ্যে যে প্রীতি, যে আদরের পরিচয় পায় তাহা কখনও ভুলিতে পারে না; সংসারের নিষ্ঠুর আঘাতে তাহাদের কোমল প্রাণ যখন ব্যথিত হইয়া উঠে সেই সময় ইহারই স্মৃতি তাহাদের পীড়িত অন্তঃকরণে শীতল প্রলেপ দান করে। এই প্রসঙ্গেই রবিবাবু বলিয়াছেন; "এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহু যুগের বাঙ্গালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্যপরিবর্ত্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে

স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্য্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত। অতএব বাঙ্গালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে, তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে—সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়"।

এই মমতায় ভরা সন্ধ্যাপ্রদীপালোকিত সৌন্দর্য্যচ্ছবিটী চিরদিন একাত্মভাবে জীবনের সহিত মিশিয়া যায়।

এই ত' গেল একদিক্। আর একদিকে দেখি শিশুর মন স্বতঃই কল্পনাময়। সে চায় ছবি, সে ভালবাসে রঙ্। নূতনত্ব তাহার চিত্তে অধিক করিয়াই আঘাত করে। "সে এখনও জগতে সম্ভাব্যতার শেষ সীমাবর্ত্তী প্রাচীরে গিয়া চারিদিক হইতে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসে নাই। তাহার কাছে অদ্ভুত কিছুই নাই, কারণ তাহার নিকট অসম্ভব কিছু নাই"। তাই রূপকথার অপূর্ব্বতাই তাহাকে বেশী করিয়াই আকৃষ্ট করে, সেই অপূর্ব্বতাই তাহার প্রধান কৌতুক। রাজপুত্র যখন পক্ষীরাজে চড়িয়া রাক্ষসদলনে বাহির হয় তখন তাহার মানসপটে যে ছবি ফুটিয়া উঠে—সেটা যে শুধুই ছবি এটুকু সে বুঝিতে পারে না। গল্পের পর গল্পে সে দেখিতে পায় বীরেরই হয় জয়—বসুন্ধরা হয় বীরভোগ্যা—তাই বীরত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠে—তাহার মনের ভিতর লুকান মন যেন বলিয়া উঠে "আমিও ঠিক এম্‌নিটীইত' হব।" আমাদের দেশের অমরকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত—রূপকথারই মত অলৌকিক সাহস ও শক্তির কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে বালক শিবাজীর হৃদয়ও একদিন এমনই নাচিয়া উঠিয়াছিল, শৈশবের অনুপ্রেরণা যৌবনে তাঁহাকে ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। শুধু বীরত্বই নয়, অন্যান্য চিত্তবৃত্তিও অনেক সময় এই উপায়ে শিশুর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। দুয়োরাণীর দুঃখে তাহার চক্ষু অশ্রুসজল হয়, তাহার সুখে সে আনন্দে উদ্বেল হইয়া পড়ে; সুয়োরাণীর শাস্তিতে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে পায়, বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীর সহিত তাহার কল্পনা বন হইতে বনান্তরালে, দেশ হইতে দেশান্তরে উড়িয়া যায়; কাঞ্চনমালা বা মালঞ্চ-মালার মধ্যে সে পায় পতিভক্তির আদর্শ, হবুচন্দ্র ও গবুচন্দ্রের আখ্যায়িকা হাসির লহর তুলিতে থাকে।

অতএব আমরা দেখিতেছি বহুবিধ নীতিবাক্য, আদর্শ ও কৌতুকে পূর্ণ এই সকল রূপকথা অবহেলার সামগ্রী নয়। গল্পের ছলে উপদেশ অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয় বলিয়া বর্ত্তমানে বিদ্বজ্জন চলচ্চিত্র প্রভৃতির দ্বারা শিশুদিগকে শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা করিতেছেন কিন্তু এতকাল রূপকথাই তাহা আরও মনোরমভাদে সম্পন্ন করিয়াছে। যতই ঘটনার পর ঘটনা ছবির পর ছবি তাহার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, ততই "তারপর" "তারপর" প্রশ্নে সে আপন কৌতুহল ব্যক্ত করিতে থাকে। শিশুর অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি করিবার জন্য যে স্থান অধুনা Kinder-garten System of Education অধিকার করিয়াছে সে স্থান এই রূপকথারই ছিল।

কিন্তু রূপকথার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—উহা অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করিয়া শিশুর কোমল ও নমনীয় চিত্তে অলীক বিষয়বস্তুর প্রতি অত্যধিক আস্থা আনিয়া দেয়। ভয়ঙ্করের প্রতিমূর্ত্তি রাক্ষস রাজপুত্রের অস্ত্রাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে শিশুর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয় কিন্তু অধিকাংশ সময়েই রূপকথার এই দৈত্য দানবের নামে তাহার বিস্ময়ভীত চিত্ত আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে;—বহু প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তির "ভূতের ভয়ের' মধ্যে ইহারই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু, ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের কল্পনাকে সুরূপে চালিত করা দূরে থাকুক, অনেক ক্ষেত্রেই কুশিক্ষা, কুনীতি ও কুসংস্কারের বীজ ইহার দ্বারাই আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ লাভের সুযোগ পায়। শিয়াল পণ্ডিত বা ধূর্ত্তনাপিতের চাতুরীপূর্ণ প্রতারণা অথবা চৌর্য্যবৃত্তিকে অনেক সময়ে সুবুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া উচ্চাসন দেওয়া হইয়া থাকে। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতির বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কপটতাকে দেওয়া হয় প্রশ্রয়। কখনও কখনও তাহাদিগকে দৈবের প্রতি অত্যধিক আস্থাবান করা হইয়া থাকে। শিশুর সরল, ভাবপ্রবণ হৃদয় এই পরীর রাজ্য আর আজগুবি দেশের "কুঁচবরণ কন্যা, তার মেঘবরণ কেশ" এবং "রাক্ষসবেষ্টিত

পুরীর মধ্যে পরমাসুন্দরী এক রাজকন্যার' স্বপ্নে বিভোর হইয়া রঙ্গীন কল্পনায় পার্থিব জগতের সহিত সংস্রব হারাইয়া ফেলে।

তথাপি এ কথা নির্ব্বিবাদে বলা চলে 'দেশের ছেলে-মেয়েদের সহজ কল্পনা বিকাশ করিতে, গৃহলক্ষ্মীদের প্রাণটিকে অতি কোমল ভাবে গৃহধর্ম্মে তন্ময় করিতে, নিত্য কথোপকথনচ্ছলে জ্ঞান ও নীতিসমূহকে হাস্যে তরল করিয়া চিত্তের ভিতরে প্রবেশ করাইতে, এবং দেশের ছোট বড় জনসাধারণের মন আমোদবিহ্বল করিয়া উচ্চতম আদর্শের শিক্ষা এবং অশেষ সৌন্দর্য্যে সুগঠিত করিতে অমৃতের কলস দেশে দেশে ইহার মধ্যেই সংরক্ষিত আছে।'—উপযুক্ত রূপে বিতরিত হইলে সে সুধা সকলেরই প্রাণ পরিতৃপ্ত করিতে পারে।

ইহাদের স্মৃতি, ইহাদের আকর্ষণ ভুলিবার নহে। দীন, দরিদ্র, মূর্খ কৃষক আর সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত বিদ্যাভারাবনত মনীষী সকলেরই হৃদয়-কন্দরে শৈশবের এই সোনার দিনগুলির চিহ্ন সঞ্চিত থাকে। শিশুর পরমবন্ধু জ্ঞানবৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করিয়াছেন—"ইহাদের মোহ এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই।"

গৌরী চক্রবর্ত্তী

নিরুদ্দেশ

শান্তি পাল

কালো মেঘ উড়ে যায়
চুমিয়া চাঁদে,
ক্ষুদ্র এ-হত প্রাণ
কেন রে কাঁদে ?
কাহার দরশ মাগি
পথ চল নিশি জাগি,
দেহ মনে দোলা লাগি
নয়ন ধাঁধে ;
কি জানি কেন রে আজ
পরাণ কাঁদে ?

ওই দূরে দেখা যায়
মাঠের শেষে,
ঘরখানি নুয়ে যেথা
মাটিতে মেশে ;—
কতদিন কত নিশা
সেই কত মিলামিশা,
মরু মাঝে জল তৃষা
মিটিত এসে ;
মনে পড়ে হাতে যুঁই,
মালতী কেশে।

কে যেন দাঁড়ায়ে সেথা
ডাকিছে মোরে,
কাননের বেড়াখানি
জড়ায়ে ধ'রে ;
দূর বনবীথি তলে
জোনাকীর খেয়া চলে,
গেঁয়ো-নদী কলকলে
চ'লেছে জোরে—
ঝিল্লীর ঝঙ্কার
বাজিছে ওরে !

আমি আজ প'ড়ে আছি
অনেক দূরে,
মাঝখানে বাঁকা পথ
চ'লেছে ঘুরে ;
ধরণীর ছোট মেয়ে
চ'লে গেছে গান গেয়ে,
ভাঙা তার তরী বেয়ে
সুদূর পুরে
সুরখানি রেখে গেছে
ভুবন জুড়ে ॥

নকল হীরা

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম্-এ

মঁসিয়ে লাস্তিন মেয়েটিকে দেখেন তাঁর এক বন্ধুর গৃহে এক সান্ধ্য আসরে। অমন সুন্দরী মেয়ে প্যারীর মত সহরেও বড় বেশী চোখে পড়ে না। প্রথম আলাপেই লাস্তিন তার প্রেমে পড়ে গেলেন।

মেয়েটির বাপ ছিলেন সরকারী কর্ম্মচারী। প্যারীর কাছেই এক ছোট সহরে তিনি থাকতেন। মাস কয়েক হ'ল তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটির মা প্যারীতে এসেছেন মেয়েকে নিয়ে। মনে তাঁর আশা প্যারীতে কিছু-দিন থাকলে মেয়ের একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন—সুপাত্রের অভাব প্যারীতে হ'বে না নিশ্চয়ই। এরই মধ্যে দু'চারঘর প্রতিবেশীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও হ'য়েছে।

মেয়েটির যে শুধু রূপ আছে তা' নয় গুণও তা'র অনেক। অতি নম্র ধীর সে, গর্ব্বের লেশমাত্র নেই,—সকলকে আনন্দ পরিবেশন করাই যেন তা'র জীবনের লক্ষ্য। অধরে সব সময় প্রসন্নতার মিষ্ট হাসি—সংসারের কোন দুঃখ জ্বালা যেন তা' নিমেষের তরেও মলিন করতে পারে না! এক কথায়, যে-রকম মেয়েকে পুরুষ মাত্রেই কামনা করে জীবনপথের সাথী ক'রে নিতে, এ-মেয়েটি ঠিক তাই। প্রতিবেশীদের মুখে তা'র প্রশংসা ধরে না। সকলেই বলে,—এ-মেয়ে যাকে স্বামিত্বে বরণ করবে পরম ভাগ্য তার!

মঁসিয়ে লাস্তিনের সম্প্রতি পদোন্নতি হয়েছে। এখন তাঁর বেতন তিন হাজার পাঁচ শো ফ্রাঁ। এ টাকায় বিবাহ ক'রে সংসারী হওয়া চলে। কিছুদিন যাতায়াতের পর লাস্তিন একদিন মেয়েটির কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলেন—মেয়েটি সানন্দে সম্মতি জানালে।

বিবাহের পর লাস্তিনের দিনগুলি পরম আনন্দে কাটতে লাগল। স্ত্রী গৃহকর্ম্মে সুপটু—এমন হিসাবী সে যে সংসারে কোনো অভাবই নেই,—বরং মনে হয় যেন বিলাসের মধ্যেই দিন কাটছে! তাঁকে সর্ব্বরকমে সুখী করতে স্ত্রীর কতই না আগ্রহ! তাঁর সামান্য এতটুকু কষ্ট তাকে ব্যস্ত চঞ্চল করে তোলে।......

স্ত্রীর সোহাগ ও যত্নে তাঁকে এমনই মুগ্ধ করে রেখেছে যে বিবাহের ছ' বৎসর পরেও লাস্তিন মনে মনে ভাবেন, 'মধুচন্দ্রে'র প্রথম ক'টা দিন স্ত্রীকে যতখানি ভালবেসেছিলেন, এখন যেন ভালবাসেন তা'র চেয়ে অনেক বেশী!

স্ত্রীর দোষের মধ্যে দু'টি—সে দোষ তেমন মারাত্মক না হ'লেও লস্তিনের চোখে তা ভাল ঠেকে না। একটি, রঙ্গালয়ের প্রতি তা'র অনুরাগ; অপরটি, কৃত্রিম মণিমুক্তার অলঙ্কার ব্যবহারের সাধ। সপ্তাহে দু'তিন দিন, বিশেষ করে কোনো নতুন নাটকের অভিনয় হ'লেই, তা'র সঙ্গিনীরা—এদের মধ্যে বেশীর ভাগই অল্প বেতনের কর্ম্মচারীর স্ত্রী—আগে থেকেই তা'র জন্যে আসন সংগ্রহ করে রাখে, আর সারাদিন আপি-সের খাটুনির পর—ইচ্ছা থাক আর নাই থাক্—লস্তিনকে থিয়েটারে যেতে হয় স্ত্রীর সঙ্গী হয়ে।

কিছু দিন পরে লাস্তিন একদিন স্ত্রীকে বললেন, এবার থেকে সে যেন তার পরিচিতা কোনো মেয়ের সঙ্গে থিয়েটারে যাবার ব্যবস্থা করে—সারাদিন আপিসে খেটে তিনি এমন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন যে বাড়ী ফিরে থিয়েটার দেখতে যাবার ইচ্ছা তাঁর একেবারেই থাকে না। স্ত্রী এ কথায় প্রথমে ঘোর আপত্তি তুললে, শেষে স্বামীর বিশেষ পীড়া পীড়িতে রাজী হ'ল। লাস্তিন যেন এক মহাদায় থেকে বেঁচে গেলেন।

থিয়েটারের প্রতি অনুরাগ যেমন তার ক্রমেই প্রবল হয়, অলঙ্কারের প্রতি লালসাও তেমনি দিনে দিনে বাড়ে। পোষাকে অবশ্য কোনো পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। কিন্তু নানারকমের অলঙ্কার তা'র দেহের শোভা বর্দ্ধন করতে

লাগল। কানে তার শাদা পাথরের দুল,—দেখতে হীরার মত ঝকৃঝকে; কণ্ঠে কৃত্রিম মুক্তার মালা; মণিবন্ধে ব্রেসলেট।

স্বামী অনুযোগ ক'রে বলেন,—আসল মণিমুক্তা কেনবার যখন তোমার সঙ্গতি নেই, কি হ'বে ওসব ঝুটো পাথরের গহনা পরে? মেয়েদের যা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—সৌন্দর্য্য ও শিষ্টতা —তার কি কিছু তোমার অভাব আছে? ওই নিয়েই তোমার সাধারণের সামনে বের হওয়া উচিত।

স্ত্রী হেসে বলে,—বুঝি এ আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু কি ক'রব, এ আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না।

তারপর সে মুক্তার মালাটি আঙুলে জড়িয়ে চোখের সামনে তুলে ধরে, আলোয় মুক্তাগুলি ঝিকমিক করে ওঠে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সে বলে,—দেখছ, কী উজ্জ্বল এদের দীপ্তি! কে না বলবে, এ মুক্তা আসল!...

স্বামী ঈষৎ হেসে বলেন,—তোমার রুচি সত্যই অদ্ভুত! এতে যে তোমার কি তৃপ্তি তা' তুমিই জানো!

সন্ধ্যায় অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে স্বামী স্ত্রী যখন চা পান করেন, তখন প্রায়ই স্ত্রী উঠে গিয়ে তা'র গহনার বাক্সটি নিয়ে আসে। মরক্কো চামড়ার সুদৃশ্য বাক্স,—চায়ের টেবিলের উপর সযত্নে সেটি রেখে কৃত্রিম মণিমুক্তাগুলি পরম আগ্রহের সহিত সে নিরীক্ষণ করে। চেয়ে চেয়ে আশা তা'র মেটে না,—যেন কি গোপন আনন্দ তার মধ্যে নিহিত! তারপর একছড়া হার তুলে নিয়ে সোহাগ-ভরে স্বামীর গলায় সে পরিয়ে দেয়। স্বামী আপত্তি করেন, কোনো আপত্তিই সে শোনে না, কৌতুক হাস্যে মুখ উজ্জ্বল ক'রে বলে,—বাঃ! কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়!—তারপর স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; গভীর অনুরাগে তাঁর মুখ চুম্বন করে।

একদিন এক শীতের রাত্রে অপেরা থেকে বাড়ী ফিরে সে জরে পড়ল। জরের সঙ্গে কাসি,—ক্রমশঃ নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা গেল। স্বামী সাধ্যমত চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই স্ত্রীকে বাঁচাতে পারলেন না। আটদিনের দিন স্বামীর কাছ থেকে চিরদিনের জন্য সে বিদায় নিলে।

মঁসিয়ে লান্তিন শোকে, এমন কাতর হ'য়ে পড়লেন যে একমাসের মধ্যেই চুল তাঁর শাদা হয়ে গেল। অশ্রুপাতের বিরাম নেই,—মৃতা স্ত্রীর কথা ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে, আর তাঁর দু'চোখ জলে ভরে আসে!

দিন যায়; লান্তিনের দুঃখ কিন্তু এতটুকু কমে না, বরং দিনে দিনে তাঁর নৈরাশ্য বাড়ে। আপিসে বসে যখন তিনি কাজ করেন, তখন প্রায়ই তিনি উন্মনা হয়ে পড়েন; আশে পাশে সহকর্ম্মীরা কত কি আলোচনা করছে, তাদের কলরব তাঁর কানে আসে না। দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে বেদনা-বিহ্বল দৃষ্টিতে শূন্যপানে তিনি চেয়ে থাকেন।—স্ত্রী বেঁচে থাকৃতে তার ঘর যেমন ভাবে সাজানো ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। তার আসবাব পত্র, এমন কি সাজ পোষাক,—কিছুই স্থানচ্যুত হয় নি। প্রতিদিন মঁসিয়ে লান্তিন এঘরে এসে খানিকক্ষণ বসেন, আর একলা বসে বসে ভাবেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর কথা,—যার বিহনে জীবন তাঁর একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে!...

জীবনের পথ ক্রমেই জটিল হয়ে আসে,—অর্থের অনটন লান্তিনকে বিব্রত করে তোলে। স্ত্রী বেঁচে থাকতে তাঁর যা আয় ছিল, আজও ঠিক তাই; অথচ তখন সংসার চলত বেশ স্বচ্ছলভাবে আজ তাঁর একার অভাবই মেটে না! লান্তিন অবাক হ'য়ে ভাবেন, কেমন করে সে ওই সামান্য অর্থে সংগ্রহ ক'রত অমন উৎকৃষ্ট সুরা ও উপাদেয় ভোজ্য,—তিনি তো কৈ পারেন না!

লান্তিনের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে উঠল। চারি-দিকে দেনা,—দিন আর চলে না। একদিন সকালে দেখেন, পকেট একেবারে শূন্য। স্থির করলেন, কিছু বিক্রী করে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করবেন। কিন্তু কি বিক্রী করা যায়? অমনি মনে পড়ল স্ত্রীর অলঙ্কারের কথা। এই ঝুটো অলঙ্কারের প্রতি বরাবরই তিনি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। এ যেন তাঁর দৃষ্টিকে বেঁধে, প্রিয়তমার মধুর স্মৃতিকে পঙ্কিল করে!

মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত স্ত্রী এই ঝুটো অলঙ্কার খরিদ করেছে—এমন দিন খুব কম গেছে যেদিন রাত্রে সে বাড়ী ফিরেছে নতুন কোনো অলঙ্কার না নিয়ে। অলঙ্কারগুলি খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে লান্তিন ভারী এক ছড়া নেকলেস তুলে নিলেন বিক্রী করবার জন্যে। মনে মনে ভাবলেন, এর

দাম ছ'সাত ফ্রাঁর কম হ'বে না—মেকী হ'লেও এর কারুকার্য্য সত্যই সুন্দর!···

নেকলেসটি পকেটে ফেলে লাস্তিন বাড়ী থেকে বেরুলেন, তারপর এক মণিকারের দোকানের সামনে এসে একটু ইতস্ততঃ ক'রে ভিতরে ঢুকলেন। নিজের দারিদ্র্য এমন করে অপরের কাছে প্রকাশ করতে কা'র না বাধে!

নেকলেসটি এগিয়ে দিয়ে লাস্তিন একটু কুণ্ঠিত ভাবে বললেন,—এর দাম কত হ'তে পারে, দয়া করে বলবেন কি?

মণিকার নেকলেসটি পরীক্ষা করে, সহকারীকে ডেকে নিম্নস্বরে কি বললে; তারপর পুনরায় অলঙ্কারটি টেবিলের উপর রেখে দূর থেকে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

এই অর্থহীন আড়ম্বর লক্ষ্য ক'রে লাস্তিন বিরক্ত হ'য়ে বলতে যাচ্ছিলেন,—অনর্থক দেরী করেন কেন? এর দাম যে কিছু নয়, এতো আমার জানাই আছে!—ঠিক সেই সময় মণিকার বললে,—দেখুন, এ-নেকলেসের দাম বারো হাজার থেকে পনেরো হাজার ফ্রাঁর মধ্যে, কিন্তু আমি আপনার জিনিস কিনিতে পারি না যতক্ষণ না জানছি কোথায় আপনি এটি পেয়েছেন।

বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করে লাস্তিন মণিকারের মুখের পানে চেয়ে রইলেন। পনেরো হাজার ফ্রাঁ! এযে অসম্ভব কথা!—খানিক পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন,—আপনি যা বলছেন ঐ তাহ'লে এর দাম?

নীরসকণ্ঠে মণিকার উত্তর দিলে,—আর কোথাও যাচাই করে দেখতে পারেন,—ওর বেশী যদি কেউ দেয় তারই কাছে বেচবেন। পনের হাজার ফ্রাঁ পর্য্যন্ত আমি দিতে পারি—ঐতেই রাজী থাকেন তো আসবেন।

নেকলেসটি তুলে নিয়ে লাস্তিন দোকানের বাইরে এলেন। মণিকারের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা ভেবে ভারি হাসি পেল তাঁর। মনে মনে বললেন,—এমন বোকাও মানুষে হয়!...

আমি যদি সত্যই ওর কথা বিশ্বাস করতাম! লোকটা পাকা জহুরী নয়, নইলে ঝুটোকে মনে করে আসল হীরা!···

মিনিট কয়েক পরে লাস্তিন রু-দ্য-লা-পে-তে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এক নামজাদা জহুরীর দোকান। ত্বরিত পদে লাস্তিন দোকানের ভিতর প্রবেশ করলেন। নেকলেসটি দেখেই জহুরী সাশ্চর্য্যে বলে উঠল—বাঃ এ যে দেখছি আমার এখান থেকে কেনা!

বিচলিত স্বরে লাস্তিন জিজ্ঞাসা করলেন,—এর দাম কত, বলুন তো?

—দাম? আমি অবশ্য এটি বেচি বিশ হাজার ফ্রাঁয়, —তবে ওদাম আমি দিতে পারব না। আঠারো হাজারে আপনি যদি সন্তুষ্ট হন তো নিতে পারি···কিন্তু এক সর্ত্তে··· এ-জিনিস আপনার হাতে এল কি করে আপনাকে তা' বলতে হবে···জানেনই তো আমাদের ব্যবসার এ দস্তুর······

লাস্তিন একেবারে হতবুদ্ধি! অতি কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে জড়িতস্বরে বললেন,—কিন্তু ভাল করে একবার পরীক্ষা করুন দেখি···এক মুহূর্ত্ত আগেও আমার ধারণা ছিল, এ-জিনিস আসল নয়, ঝুটো।

দোকানদার জিজ্ঞাসা করলে,—আপনার নাম কি; মঁসিয়ে?

—লাস্তিন···স্বরাষ্ট্রবিভাগের মন্ত্রীর অধীনে আমি কাজ করি। যোল নম্বর রু-দে মারত্ এ আমার বাসা।

দোকানদার খাতা খুলে দেখতে লাগল। খানিক পরে খাতার পৃষ্ঠায় চোখ রেখে বললে,—এই নেকলেস পাঠানো হয়েছিল মাদাম লাস্তিনের ঠিকানায়—যোল নম্বর রু-দে মারত্।

লাস্তিন বিস্ময়ে নির্ব্বাক্! জহুরী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চায়,—চোরাই মাল নয় তো?

খানিক পরে জহুরী বললে,—ঘণ্টা কয়েকের জন্যে এ-নেকলেস আমার দোকানে রেখে যেতে আপনার আপত্তি আছে কি? আমি অবশ্য আপনাকে রসিদ দেব।

লাস্তিন তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন—না আপত্তি কিসের?

তারপর জহুরীর দেওয়া রসিদখানি পকেটে পুরে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন।······

অনেকক্ষণ লক্ষ্যহীনভাবে পথে পথে তিনি ঘুরতে লাগলেন। মন তাঁর বিভ্রান্ত! কিছুতেই যেন ব্যাপারটা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। এতদামী অলঙ্কার কেনবার মত সঙ্গতি তাঁর স্ত্রীর ছিল কি? নিশ্চয়ই না। তবে এ হয়ত কারো উপহার!

…কিন্তু কার উপহার ?…কেনই বা এই উপহার দেওয়া ? চলতে চলতে রাস্তার মাঝেই তিনি থামলেন। এক ভীষণ সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল।…সে কি…যদি তাই হয়, তবে আর সব অলঙ্কারও উপহার ?……

পায়ের নীচেকার মাটি যেন দুলতে লাগল—চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে এল! সংজ্ঞাশূন্য হয়ে লাস্তিন মাটিতে পড়ে গেলেন।…চেতনা যখন ফিরে এল তখন তিনি এক ডাক্তার-খানায়। শুনলেন জন কয়েক লোক এখানে তাঁকে রেখে গেছে। একটু সুস্থ বোধ করতেই লাস্তিন ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে এলেন। বাড়ী পৌঁছেই ঘরে দরজা দিয়ে গভীর দুঃখে তিনি কাঁদতে লাগলেন। কেঁদে-কেঁদে শরীর তাঁর অবসন্ন হ'য়ে এল। তারপর কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি জানেন না!

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই আপিসে যাবার জন্যে তিনি তৈরী হ'তে লাগলেন। কিন্তু এরকম আঘাতের পর কাজে আর মন আসে না! একদিনের ছুটি প্রার্থনা ক'রে আপিসের কর্ত্তাকে তিনি চিঠি লিখলেন—তারপর চাকরকে ডেকে সেই চিঠি আপিসে পৌঁছে দিতে বললেন। একটু পরেই মনে পড়ল জহুরীর সঙ্গে দেখা করবার কথা। দেখা করতে মন চায় না—কিন্তু নেকলেসটিই বা কেমন করে ওর কাছে ফেলে রাখা যায়!…তাড়াতাড়ি পোষাক বদ্‌লে বাড়ী থেকে তিনি বেরুলেন।…

সেদিনের প্রভাব অতি সুন্দর। নির্মেঘ, নীল আকাশের নীচে রৌদ্রদীপ্ত সহরটি অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করেছে! রাস্তা দিয়ে লোক চলেছে কাজে; যাদের কোনো কাজকর্ম্ম করতে হয় না, তারা পরম নিশ্চিন্তভাবে, পকেটে হাত পূরে ইতস্ততঃ চলা ফেরা করছে। তাদের লক্ষ্য ক'রে, মঁসিয়ে লাস্তিন মনে মনে বললেন,—ধনীরাই বাস্তবিক সুখী। টাকা থাকলে দুঃখ শোক,—তা' সে যেমনই হোক্ না,—সহজেই ভোলা যায়। যেখানে খুসী লোকে যেতে পারে,—আনন্দ, বৈচিত্র্য, সমারোহ কিছুরই অভাব হয় না,—দু'দিনেই মনের ঘা শুকিয়ে আসে! হায়, আমি যদি ধনী,—হ্যাঁ; শুধু ধনী হতাম!…

কাল সারাদিন উপবাসে কেটেছে, আজ এখনো কিছু খান নি, লাস্তিন ক্ষুধার্ত্ত বোধ করলেন। কিন্তু পকেট একেবারে শূন্য যে! আবার মনে পড়ল নেকলেসের কথা। আঠারো হাজার ফ্রাঁ! আঠারো হাজার ফ্রাঁ! এত টাকা এক সঙ্গে কখনো পেয়েছেন বলে' মনে পড়ে না।…

কিছুক্ষণ পরে রুদ্য লাপ-তে তিনি পৌঁছিলেন। সামনেই সেই জহুরীর দোকান! আঠারো হাজার ফ্রাঁ!…বিশবার তিনি সঙ্কল্প করলেন ভিতরে ঢোকবার, কিন্তু প্রতিবারই লজ্জা বাধা দিলে। ক্ষুধায় তিনি কাতর…অত্যন্ত কাতর…পকেট এক কপর্দ্দকও নেই!…তাড়াতাড়ি কর্ত্তব্য স্থির ক'রে, তিনি ছুটে চললেন দোকানের দিকে, ভাববার অবসর যাতে এতটুকু না মিলে! একেবারে দোকানের ভিতরে এসে তিনি থামলেন।

দোকানদার উঠে এসে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলে। তারপর বসবার জন্যে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে,—আমার যা জানবার ছিল, জেনেছি। আপনি যদি ওই নেকলেস বেচবার ইচ্ছা ত্যাগ না করে থাকেন,—আমাকে বলুন, কাল যে দর বলেছি সেই দরে কিনতে আমি প্রস্তুত আছি।

লাস্তিন বাধ বাধভাবে বললেন,—তা'—হ্যাঁ—আমি বেচতেই তো এসেছি।

দোকানদার দেরাজ খুলে আঠারোখানি নোট বা'র করে লাস্তিনের সামনে ধরলে। রসিদ লিখে দিয়ে, লাস্তিন কম্পিত হস্তে নোটগুলি নিয়ে পকেটে পুরলেন।

দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে লাস্তিন আবার ফিরলেন। দোকানদার জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর মুখের পানে তাকালে। মাথা নীচু ক'রে লাস্তিন বললেন,—আরও খান কয়েক অলঙ্কার আমার আছে। কেনেন যদি, নিয়ে আসতে পারি।

দোকানদার সবিনয়ে বললে,—আনবেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সব অলঙ্কারগুলি নিয়ে লাস্তিন দোকানে হাজির। জহুরী অলঙ্কারগুলি একে একে পরীক্ষা ক'রে দাম ঠিক করলে। হীরার দুলের দাম বিশ হাজার ফ্রাঁ, ব্রেস্‌লেট পঁয়ত্রিশ হাজার, এক সেট্ চুনী পান্না চৌদ্দ হাজার, সোনার এক ছড়া চেন্, বড় এক খণ্ড হীরা তা'তে দুলছে, চল্লিশ হাজার—সব শুদ্ধ এক শো তেতাল্লিশ হাজার ফ্রাঁ।

ঈষৎ হেসে জহুরী বললে,—আপনার স্ত্রী দেখছি যা' কিছু সঞ্চয় সবই ব্যয় করেছিলেন হীরা জড়োয়ায়!

লাস্তিন গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন,—অর্থ সঞ্চয়ের এ একটা রীতি।

সেদিন ভয়সিঁতে বসে লাস্তিন বৈকালিক জলযোগ করলেন—খাদ্যের সঙ্গে যে সুরা পান করলেন তার এক বোতলের দাম বিশ ফ্রাঁ। তারপর একখানি গাড়ী ভাড়া ক'রে বোই-এর চারিদিকে ঘুরতে লাগলেন। পথে কত রকমের সুদৃশ্য গাড়ী, বিচিত্র বেশভূষায় আরোহীরা সজ্জিত, তাদের পানে চেয়ে লাস্তিন অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, গর্ব্বিত উল্লাসে উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমিও তোমাদের মত ধনী,—বিলাসিতা করবার সামর্থ্য আমারও আছে! দু'লক্ষ ফ্রাঁর মালিক আমি আজ!...

হঠাৎ আপিসের কথা মনে পড়ল। কর্ত্তার সঙ্গে একবার দেখা করা চাই।...গাড়ী এসে আপিসের সামনে থামল। উৎফুল্লভাবে লাস্তিন ভিতরে প্রবেশ করলেন। কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, কাজে তিনি ইস্তফা দিতে চান।—এইমাত্র তিন লক্ষ ফ্রাঁ উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পেয়েছেন। সহকর্ম্মীদেরও এই শুভ সংবাদ দিতে তিনি ভুললেন না।

সন্ধ্যার পর ক্যাফে আঙ্গলে-তে তিনি উপস্থিত হ'লেন। এখানে খাওয়ার সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে তাঁর আর কখনো হয়নি। যে লোকটির পাশে গিয়ে তিনি বসলেন, তাঁকে দেখে বেশ সম্ভ্রান্ত বলে মনে হয়। খেতে খেতে একসময় তাঁকে বললেন—অবশ্য কথাটা যেন বিশেষ গোপনীয় এই ভাবে—যে সম্প্রতি উত্তরাধিকারীরূপে তিনি পেয়েছেন—চার লক্ষ ফ্রাঁ।......

জীবনে এই প্রথম থিয়েটারে বসে থাকতে তাঁর কোনো কষ্ট হ'ল না।...বাকী রাতটুকু তিনি কাটিয়ে দিলেন আমোদ প্রমোদে। *

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

ঘুম

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে? এত শীগগীর?

ক্লান্ত দিন আঁখি মুদেছে সন্ধ্যার কোলে এসে। সহস্র মুখরতা স্তব্ধ। তোমার চোখের পাপড়ি দুটো ঘুম পাড়িয়েছে তোমার দৃষ্টিকে। তার অজস্র কথা-বলা এখন বন্ধ।

তোমার চুল পড়েছে ছড়িয়ে। সারাদিন দুলেছে বাতাসে, ভিজেছে, শুকিয়েছে। এখন অন্ধকার রাত্রির মত গভীর প্রশান্তিতে সুপ্ত।

ঠোঁট দুটি ঈষৎ কাঁপছে। কলকাকলি ভাষার দুই তটে বিলীন হয়েছে অস্পষ্ট ধ্বনির মূর্চ্ছনায়। আকাশে পৃথিবীতে কোলাহল ক্ষান্ত, বোবা প্রকৃতিতে শুধু ইঙ্গিতের গুঞ্জন।

একখানি হাত আমার কোলে, একখানি বিছানায়—ক্লান্ত, শিথিল। বক্ষমণির এখনো বিশ্রাম নাই, নিঃশ্বাস-স্রোতের মুখে মুহুর্মুহু কম্পমান। বাতাস বইছে মন্থর আলস্যে, গাছের পাতা নড়ছে, ফুলের গন্ধ আসছে ভেসে।

দেহের প্রান্তে শাড়ীর বন্ধন শ্লথ। চলার গান থেমেছে চরণোপান্তে এসে। নীড়ের পাখীরা রাত্রির কোলে তন্দ্রাচ্ছন্ন।

পৃথিবী ঘুমিয়েছে, আমার স্বর্গও ঘুমিয়েছে। আমি শুধু জেগে বসে আছি নির্ব্বাক হয়ে। শান্ত জ্যোৎস্নার মৃদু স্পর্শ লাগছে তার গায়ে। সে ঘুমিয়েছে। আমি দেখছি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে।

———

* গী দ্য মোপাসাঁ হইতে

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এ (ক্যাল ও ক্যাণ্টাব)

স্তব্ধ অর্দ্ধরাত্রে যবে নিস্পন্দ রহিবে জাগরণে,
স্বপ্ন তব মোর লাগি শব্দহীন পক্ষবিধূননে
উড়িয়া কি যাবে সেথা, মৃত্যু যেথা ভাবে মূঢ় নর
ধূলিলীন করিয়াছে মোরে যার প্রেমের সাগর
বুকভরা তোমা তরে ; এত ভালবাসিতে যাহারে
সেই আমি ! আজিকে করুণাভরে স্মরিবে কি তারে ?

হায়, এত ভালবাসা ছিল যেথা মাঝে দুজনার
সেথা এত ভুল বোঝা ! ছিল কভু সম্পর্ক আমার
তাহাদের সনে যারা তন্দ্রালস ঘৃণ্য কাপুরুষ
এ ধরায় ? লক্ষ্যহীন আশাহীন বাসনা বেহুঁষ
সহায় সম্বলহারা ভেসেছি কি কভু দিবা যামী
কালস্রোতে ধ্বংস মুখে প্রিয়তম সে তোমার আমি ?

—যে আমি জীবনে কভু করি নাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
স্ফীতবক্ষে লক্ষ্য পানে চলিয়াছি, টলেনি চরণ,
হোক ঘনঘটা মেঘ কাটিবে যে করিনি সংশয়,
স্বপনেও ভাবি নাই অন্যায়ের কভু হবে জয়,
হোক্ ব্যর্থ ন্যায় তবু ; উঠিব আবার পড়ি যদি,
জানিতাম বিফলতা দিবে জয়, জাগরণ নিদ্রার অবধি।

কর্ম্মরত মানবের মুখরিত দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
নয়ন দেখেনা যারে ডেকো তারে প্রফুল্ল অন্তরে।
অগ্রসর হ'তে তারে বোলো সদা, কিছু যেন তার
নাহি রয় পিছু পড়ি'। "প্রচেষ্টা ও সমৃদ্ধি অপার
লভ নিত্য"—বোলো তারে। দিও প্রবর্ত্তনা—
"আগে ধাও,
যুদ্ধ করি লভ সিদ্ধি হেথা যথা, তেমনি সেথাও।"

ব্রাউনীং-এর Asolando হইতে।

ছবির মূল্য

স্বর্গীয়া শান্তি ঘোষাল

১

Who's that—morning! নমস্কার।

কে আপনি? কাকে চান?

I say,—আপনার নাম কি অসিট্‌বাবু?

অসিত তখন কাঠের প্লেটের উপর রক্ষিত দুই তিনটি বিভিন্ন রঙ এক সঙ্গে বেমালুম মিশাইয়া তুলির মুখে তুলিয়া লইতেছিল।

আপন মনে কাজ করিতে করিতে অসিত উত্তর করিল, বলুন। আমারই নাম অসিত।

সামনের ইজেলের উপর একখানি পটের ছবি। কাহার কে জানে। অসিত তাহার উপর বাছিয়া বাছিয়া রঙ নিক্ষেপ করিতেছিল। কতদিন ধরিয়া পটখানির উপর সে রঙের পর রঙ চড়াইয়াছে, কিন্তু এই সাত বৎসরের তপস্যার পরও তার মানসীর সঠিক ছবি সে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলনা। পটের উপর রঙিন রেখাগুলির মধ্যে লুকাইয়া এক নারীমূর্ত্তি, যৌবন তাহার উছলিয়া উঠিতেছে। কিন্তু তবু সে যে কে? তাহা বুঝা যায় না, রেখাগুলি এমনি অস্পষ্ট। অসিত কতবার সেই রেখাগুলি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহার মাঝে সে তাহার মানসীকে খুঁজিয়া পায় নাই। ধীরে ধীরে আবার সে রেখাগুলির উপর রঙ চড়াইয়া মিলাইয়া দিয়াছে।

ক্ষুণ্নমনে একবার তুলির দিকে ও আর একবার সেই আধ ফোটা ছবির দিকে তাকাইয়া অসিত একটা নিষ্ফলতার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তাহার পর আগন্তুকের দিকে চাহিয়া বলিল, বসুন।

আগন্তুক এতক্ষণ একদৃষ্টে সেই ছবিখানাই দেখিতেছিল। কিছুই বুঝা যায় না, তবু চারিদিকের সেই রঙের খেলা, রঙের ঢেউ সে অবাক হইয়া দেখিতেছিল। অসিতের কথায় সে অপ্রতিভ ভাবে বলিল, হ্যাঁ বসি। তা দেখুন, আমার স্ত্রী এই মাস চারেক হল মারা গিয়েছেন। তাঁর একখানা ছবি আমাকে করে দিতে হবে।

বেশ ত তাঁর একখানা ফটো রেখে যাবেন।

আজ্ঞে তাঁর ত কোন "ফটো" নেই। সেই জন্যই ত আপনার কাছে এসেছি। শুনেছি আপনি ছবির রাজ্যে অসাধ্য সাধন করে থাকেন।

অসিত অবাক হইয়া কথা কয়টা শুনিল। তারও ত চেষ্টা এবং অক্ষমতা ওইখানে। লোকটা বলে কি? লোকটা যাহাই বলুক, অসিতের মনে হইল, যেন সে-ই তাহার সিদ্ধির উপায় বলে দিতে পারিবে।

অসিত বুঝিত, তাহার এই প্রচেষ্টা একটা মানসিক বিকার। কিন্তু বুঝিলে কি হয়, সে কিছুতেই নিজেকে এই ব্যাধি হইতে মুক্ত করিতে পারিত না। কতবার কত রকমে সে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই।

মানসিক ব্যাধি শারীরিক ব্যাধির চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর। এই ব্যাধির কথা কাহাকেও বলা যায় না। বলিলে হয়ত রোগ হালকা হইয়া যায়, তর্ক ও আলোচনার মধ্যে ঔষধের সন্ধান মিলে। কিন্তু তবু কেহ কাহাকেও বলে না। আপন দুর্ব্বলতা লোকের কাছে সাবধানে গোপন রাখিতে গিয়া তাহারা তাহাদের বাহিরের ব্যবহার বিকৃত করিয়া তোলে, অর্দ্ধ পাগল সাজে মাসের পর মাস ভুগিয়া চলে, যতক্ষণ না সেই চিত্তচাঞ্চল্য আপনি আপনি সরিয়া যায় বা অতর্কিতে সঠিক ঔষধের সন্ধান মিলে।

অসিত নাচার হইয়া বুঝিয়াছিল যে, তাহার মুক্তির একমাত্র উপায় সিদ্ধি।

অসিতের মনে হইল, তাহার একমাত্র মুক্তিদাতা এই আগন্তুক। কল্পনার ছায়াতে কায়া ফুটাইবার হদিস্ সেই হয়ত বলিয়া দিতে পারিবে। মুক্তির আশু আশা তাহাকে যেন

উন্মাদ করিয়া তুলিল। এতদিন যাহা সে আপন মনে গোপন করিয়া আসিয়াছে তাহা আজ ভাষার মুখে বাহির হইয়া আসিতে চায়।

অসিত প্রাণপণে মনের আবেগ চাপিয়া নিজেকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিলনা। স্নায়ুর শক্তি মস্তিষ্কের আদেশ আর মানিতে চায় না। চিরবাধ্য মন আজ তার আয়ত্তের বাহিরে। বহুদিনের চাপা আবেগ, অসিত আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। যে প্রশ্ন এত দিন সে সাবধানে নিজেকেই করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহা সে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল। ফলে, সুতা ছেঁড়া ঘুঁড়ির ন্যায় সে ঘুরিয়া গিয়া খেয়ালের মাথায় আগন্তুকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—বলে দিতে পারেন, যাকে কখনও দেখিনি, তার ছবি কি করে আঁকা যায়! আজ সাত বৎসর ধরে এই ছবিখানা শেষ করতে পারলাম না!

—হায় ভগবান—একবার জীবনে—শুধু ক্ষণিকের জন্য যদি তার ছায়াটাও দেখতে পেতাম!

আগন্তুক একজন নবীন ব্যারিষ্টার। অসিতের এই পাগলামীর কথা সে শুনিয়াছিল। অসিতের ব্যবহারে চমকাইয়া তিনি দুই পা পিছাইয়া গেলেন, কিন্তু খুব বেশী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যে, এই ধরণের পাগলরাই Genius হয়ে থাকে। সেই জন্য প্রসন্ন স্মিতমুখে বলিল, উপায় আপনি করে দেবেন বলেই ত আপনার কাছে এসেছি। দেখুন সে সাত বছরের একটী মেয়ে রেখে গেছে। এই মেয়েটার জন্যই আমার ছবির প্রয়োজন। হাজার হোক বড় হয়ে সে তার মাকে দেখতে চাইতে পারে ত। তা নইলে আমার আর কি' আমি already engaged. মেয়েটার মুখ দেখে যদি তার মার মুখের আদল আনতে পারেন ত চেষ্টা করে দেখুন।

কথাটা ভাবিবার বিষয়। অসিত প্রথমে নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার এইরূপ একটা অহেতুক উন্মাদনার কোন কৈফিয়তই তাহার মনে আসিতে ছিল না। আগন্তুকের উত্তর তাহাকে যেন আবার সতেজ করিয়া দিল। অসিত আবার সব ভুলিয়া গেল। সে আনন্দের আতিশয্যে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—ঠিক বলেছেন, হবে। হয়ত আমি পারব! শুনেছি তারও একটী মেয়ে আছে। আমাদের দুজনারই উদ্দেশ্য এক। আশার ক্ষীণ আলো ও সাফল্যের একটা আশু সূচনা সে যেন দেখিতে পাইল।

ব্যারিষ্টার সাহেব সিগারেটের খানিকটা ছাই টেবিলের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে আশে পাশের ছবিগুলি দেখিতে দেখিতে দুই একবার সিশ দিলেন। তাহার পর ফরাসী কায়দায় হাতের আঙ্গুল উল্টাইয়া বলিয়া উঠিলেন, বলতে পারি না মসাই আপনার কি উদ্দেশ্য। তবে আমার উদ্দেশ্য এখন, সন্ধ্যার পরে যথা সম্ভব সত্বর আমার New sweet-heart Dollyদের বাড়ীতে চা খেতে যাওয়া। বুঝলেন? যাই হক্, আপনার ঘরের ছবিগুলা দেখিলে মনে হয় আপনি একজন Genius।

এই নির্লজ্জ লোকটার উপর আসিতের কিছু পূর্ব্বে বিরক্তি আসিয়াছিল। একটু গম্ভীর হইয়া সে বলিল,—দেখুন, আমরা Genius কিনা তা জানিনা, তবে আমরা স্রষ্টা। সৃষ্টির আনন্দেই আমরা কাজ করে থাকি। এখন আপনার স্ত্রীর চেহারার সম্বন্ধে আমাকে কিছু সন্ধান দিন।

আগন্তুক দুই পা পিছাইয়া গিয়া বলিল, By Jove! আমি কবি নই মশাই। বিনিয়ে বিনিয়ে রূপ বর্ণনা করা আমার দ্বারা হবে না, যে গেছে সে গেছেই। তবে এই মাত্র বলতে পারি যে, তার নাম ছিল লীলা, সে ছিল সিঙ্গাপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মতি নাগের মেয়ে। Though not exactly a beauty, but surely a meek girl.

সিঙ্গাপুরের মতি বাবুর মেয়ে! অসিতের সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ চলিয়া গেল! পায়ের তলার মাটি যেন তার ভার আর রাখিতে পারিতেছে না। এই ব্যক্তিই তা হলে লীলার স্বামী! তার মানস-লক্ষ্মীর দেবতা! অসিত কথা বলিতে পারিল না, চোখ বুজিয়া অতি কষ্টে কণ্ঠে স্বর আনিল, কিন্তু বলিবার ভাষা যোগাইল না। সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না যে, না দেখিয়া সে সমস্ত জীবন যাহার পায়ে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছে, এই নয় বৎসর নিবিড় ভাবে [illegible]

লোকটা কি করিয়া তাহাকে এত শীঘ্র ভুলিতে পারে! অনাদৃত লীলার আত্মার উদ্দেশ্যে তাহার দুই ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া পড়িল। অন্তরের কষ্ট চাপিয়া সে মুখে বলিল, বেশ, আপনার খুকীকে ও মিসেস্ দত্তের পরিধেয় বস্ত্রাদি আপনি কাল পাঠিয়ে দেবেন। কাল থেকেই আমি কাজে হাত দেব।

দত্ত সাহেব অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। বিগতা স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যের বোঝা তাঁহার কাঁধ হইতে অনেক খানি যেন নামিয়া গেল। স্মিত মুখে বলিলেন, আসি মশাই! Goodnight—Cheer you!

তাহার পর ছড়িটী হাতে করিয়া রুমাল দিয়া আর একবার মুখ মুছিয়া লইয়া বোধ হয় কুমারী ডলি মিত্রের বাটীর উদ্দেশ্যেই প্রস্থান করিলেন।

২

দত্ত সাহেব অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন। কখন আপন অধিকার সন্ধ্যাকে ছাড়িয়া দিয়া দিবা চলিয়া গিয়াছিল তাহা অসিত টের পায় নাই। সন্ধ্যাও চলিয়া গিয়া তখন পরিপূর্ণ রাত্রি। অসিত চুপ করিয়া বসিয়া তখনও ভাবিতেছিল। দুঃখের মাঝেও মন তার আনন্দে ভরপূর। তাহার এতদিনের তপস্যা এইবার সফল হইবে। সফলতার বাণী সে শুনিয়াছে। দেওয়ালে টাঙানো তৈল-চিত্রের মাঝে তাহার পিতার ছবিটীর দিকে সে একবার চাহিল। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণের সেই শেষ কথা কয়টী তখনও যেন তাঁহার ঠোঁট ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, ওরে মতির মেয়েকে তুই বিয়ে করিস্। আমি তাকে কথা দিয়েছি।"

পাশেই সুনিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া পিতৃবন্ধু মতিবাবুর একখানি তৈল-চিত্র। চোখ দুইটা তাঁহার ব্যথায় ভরা। প্রিয় বন্ধুর দিকে চাহিয়া যেন কি একটা কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিতেছে। দুজনারই মুখে যেন সেই একই কথা "একি হল, কেন এমন হল"! সহানুভূতির সহিত অসিত একবার মতিবাবুর ছবির দিকে চাহিল, মতিবাবুর চিত্র হইতে কে যেন বলিতেছিল, ওরে খোকা, মেয়েটাকে আমার সামনে একবার এনে দিতে পারিস্। আমি তাকে একবার দেখবো।

অসিত একবার মৃত পিতার ও একবার বিগত পিতৃবন্ধুর ছবির দিকে চাহিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, আনব। আপনাদের কাছে তাকে এনে দেব। আমি তার সন্ধান পেয়েছি।

দুই বন্ধুই আজ পরলোকগত। সেই কবে সিঙ্গাপুরের পথে দুইজনে বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। তখন সে শিশু। তাহার পর কিশোরে, বাল্যে ও যৌবনে এমন দিন ছিল না যে দিন না অসিত শুনিয়াছিল মতিবাবুর কন্যা লীলার কথা। কল্পনায় লীলাকে হৃদয়রাণীর আসনে বসাইয়া কতদিন সে পূজা করিয়াছে। বিহগকুল যখন আকাশ পথে উড়িয়া যাইত সে মনে করিত সিঙ্গাপুরের কথা তাহারা জানে। লীলাকে বুঝি তাহারা দেখিয়াছে। কিন্তু কোন বিহঙ্গই তাহার কাছে আসে নাই, লীলার কথা তাহাকে বলিয়া যায় নাই। অসিত কল্পনায় লীলার মুর্ত্তি আঁকিত।

ইহারও অনেক পরের কথা। বালিগঞ্জের কুটিরে পিতৃদেব তাঁহার শেষ আদেশ শুনাইয়া চক্ষু বুজিলেন। অসিত আকুল হইয়া সিঙ্গাপুরে পত্র লিখিল। উত্তর আসিল, মতি বাবুও তাঁহার প্রিয় বন্ধুকে পরলোকের পথে অনুসরণ করিয়াছেন! অনেক কথাই অসিতের মনে আসিতেছিল। সে সান্ত্বনার আশায় ধীরে ধীরে তৈল-চিত্র দুইটীর তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। মূক ছবি। ঠোঁট তাহাদের নড়ে, কিন্তু কথা বাহির হয় চোখ দিয়া। কি তাহারা বলিল—অসিত তাহা বুঝিল না, তবে সবটাই সে অনুভব করিল।

স্বর্গস্থিত বন্ধুদ্বয় যেন ছবি দুইটির মধ্য হইতে উঁকি দিতে দিতে সমস্বরে তাহাকে বলিল, বাছা, হতাশ হসনি। আমরা তোর ব্যথা বুঝি। আমরা জানি তুই তাকে তুলির মুখেই হারিয়েছিস্, তবে তোকে এও বলে দিতে পারি যে তুই তুলির মুখেই আবার তাকে পাবি। আর সেইটেই হবে সত্যিকারের পাওয়া। এই মিঃ দত্ত তাকে পেয়েছিল। কিন্তু তাকে ধরে রাখতে পারল কি! কিন্তু তুই তাকে অনন্তকাল ধরে ধরে রাখতে পারবি। যারা কলার আশ্রয় নেয় তারা মরে না। তোর প্রেম অমর হবে। কারণ তোর পাওয়ার মধ্যে কাঁচা মাংস নেই, রক্তমাংসের স্বাদ নেই—সম্বন্ধ নেই। তাই তোর

মানসীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপ চিরকাল লোকে জানবে ও মানবে। তার প্রতি রেখায় রেখায় জড়ান থাকবে প্রাণের সুর।

অসিত ভাবিতে লাগিল—তুলির মুখে হারিয়েছি। সত্যই ত তাই। সিঙ্গাপুর থেকে পাওয়া লীলার দাদার শেষ চিঠিটার ছত্রগুলি ছবির রেখার মতই তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কি মর্ম্মন্তুদ লেখা। অসিত চুপ করিয়া ভাবিতে থাকে, হঠাৎ চাহিয়া দেখে দেওয়ালের দিকে। সারা দেওয়ালের উপর সেই চিঠির ছত্র কয়টি কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

* * * *

—"বাবার কথা রাখতে পারলাম না বলে আমি বিশেষ লজ্জিত আছি। অসিত কলেজ ছেড়ে দিয়ে আর্ট স্কুলে ঢোকাতে আমরা বড়ই দুঃখিত। সে চিত্রকর হইয়াছে। চিত্রকরেরা মানুষের ভুয়ো প্রশংসা পেতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত মর্য্যাদা পায় না। বিশেষত আমাদের দেশে। আর্ট ছেড়ে আবার কলেজে ঢুকতে অসিত যখন কিছুতেই রাজী হল না, তখন লীলার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে আমরা অপারগ জানবেন। লীলা অসিতকে না দেখলেও বাবার মুখে বরাবর তার কথা শুনেছিল বলে তারও ঝোঁক ছিল অসিতের দিকেই খুব বেশী। তবে তার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আমরা বিয়েটা নাকচ করে দিলাম। অসিতকেও বুঝাবেন, যেন সে দুঃখিত না হয়।"

সুন্দর সুস্পষ্ট অক্ষরের সারি। অসিত ভাবে এ বুঝি তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের একটা সাময়িক বিকার। দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া সে আবার দেওয়ালের দিকে তাকায়, কিন্তু লেখাগুলি আবার নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠে।

সারা বাড়ীটায় সে একা। হঠাৎ কাহার যেন তপ্ত শ্বাস সে অনুভব করে। কে যেন বলিয়া উঠে,—কই আমার আবাস কই—আমার দেহ? আমি যে তোমাদের কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা।

সভয়ে অসিত পিতা ও পিতৃবন্ধুর পায়ের তলায় গিয়া দাঁড়াইল।

অসিতকে সেখানে দাঁড়াইতে দেখিয়া ফ্রেমের ভিতরকার মানুষ দুইটী যেন ঈষৎ নড়িয়া একটু আগুয়াইয়া আসে ও তাহার পর বলিয়া উঠে—ভয় কি? সে আমাদের দেখতে চায়, ওরে, যত শীঘ্র পারিস তাকে এনে দে।

অসিত কুঁজা হইতে খানিকটা জল ঢালিয়া লইয়া তাহার উত্তপ্ত মাথাটা ধুইয়া ফেলে ও তাহার পর আবার ভাবিতে বসে। রাত্রি বাড়িয়াই চলিয়াছে কিন্তু অসিতের সে দিকে খেয়াল নাই। ঘরের ভিতরকার আধপোড়া বাতি দুটার ক্ষীণ আলো জানলার ধারে ওপারের অন্ধকারের সহিত প্রাণপণে ঠেলাঠেলি করিয়া যেন আপন অধিকার বজায় রাখিতে ব্যস্ত। অসিত উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, তোমাদের আদেশ শিরোধার্য্য। তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত বধূ আদরের কন্যাকে আমি এনে দেব। আমি তাকে পাব। আর এই তুলির মুখেই পাব, যে তুলি একদিন আমার কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিছল্।

৩

বাবুজী—খুঁকী এসেছে।

প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটী মঞ্চে অসিত বসিয়াছিল। পাশে টবে রাখা একটী যুঁই ফুলের গাছ। তারই একটা আধ ফোটা ফুলের দিকে চাহিয়া অসিত ভাবিতেছিল। হঠাৎ সে চাহিয়া দেখিল একজন বুড়া দরোয়ানের সহিত একটী আধ-ফোটা খুকী। ঠিক এই যুঁই ফুলেরই মত।

অসিত ছুটিয়া গিয়া লীলার সেই শেষ স্মৃতিটুকুকে বুকের মধ্যে তুলিয়া লইল। তাহাকে চুমা দিল, বারম্বার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু তাহার আশ মিটিল না। খুকীর নিটোল দেহটীর দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অসিত জিজ্ঞাসা করিল, খুকী তোমার নাম কি?

আমার নাম? আমার নাম অসিতা।

অসিতা? কে তোমার এ নাম রেখেছে খুকী?

কেন—আমার মা।

অগ্নিকণার ন্যায় ঠিকরাইয়া যেন কথা কয়টী অসিতের বুকে আসিয়া বিঁধিল। তাহার কানের পর্দ্দায় পর্দ্দায় ঝঙ্কারিয়া উঠিল সেই শব্দ—আমার নাম? আমার নাম অসিতা। মা রেখেছে।

হৃদয়ের সবটুকু স্নেহপ্রীতি দিয়া খুকীকে অসিত বুকের

মধ্যে টানিয়া লইল। অদেখা মানসীর মুখে অসিতের যা কিছু শুনিবার ছিল তার সবটুকুই যেন খুকীর মুখের এই একটি কথাতেই তাহার শোনা হইয়া গেল। তাহারই জন্য যেন খুকীর মুখে এই ছোট্ট একটী কথা রাখিয়া গিয়াছে। ছোট্ট একটী মন্ত্রপূত কথা, কিন্তু অসীম তাহার ক্ষমতা। অসিতের হৃদ্-যন্ত্রটা নিঙড়াইয়া নিঙড়াইয়া তাহার বুকটা যেন তোলপাড় করিয়া দিল।

খুকী এক হাতে অসিতের গলা জড়াইয়া ধরিল, যেন কতকাল ধরিয়া সে তাহাকে চিনে। তাহার পর অপর হাতটি বুড়া দরোয়ানের দিকে দেখাইয়া বলিল, মার জামা, কাপড়, দুল, হার সব ওই ওর কাছে আছে। তারপর আবার তাহার ছোট ছোট হাত দুইটি দিয়া অসিতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, মা কোথায় ? আমি মাকে দেখবো !

লীলার বাপের বাড়ীর বুড়া দরোয়ান। খুকীকে কুড়াইয়া লইয়া সে-ই এ কয়দিন তাহাকে মানুষ করিতেছিল। পথে অসিত আসিতে সে খুকীকে কি বুঝাইয়া ছিল সেই জানে। কে যেন অসিতের কানে সজোরে বলিয়া গেল,—হবে, হবে এইবার তুমি পারবে।

অসিত মুখে কিছু বলিল না। এক দৃষ্টে খুকীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর লীলার পরিত্যক্ত কাপড়, জামা, হার, দুল সব কয়টী এক সঙ্গে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার উত্তাপ অনুভব করিতে লাগিল। লীলার ছোঁয়া—লীলার গায়ের গন্ধ তখনও তাহাতে মিশান। তাহাকে তৃপ্তি দিল কি উহা তাহার কষ্টের কারণ হইল, ঠিক বুঝা গেল না।

অসিত খুকীকে আর একটী চুমা দিয়া সামনের ইজেলের উপর রাখা তাহার মানসীর সেই আধফোটা ছবির রেখাগুলি তুলির মুখে ফুটাইয়া ফুটাইয়া দুই ঘণ্টার মধ্যেই খুকীর একটি নিখুঁত ছবি আঁকিয়া ফেলিল। অদূরে খুকীকে কোলে করিয়া বুড়া দরোয়ান অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। অসিত আঁচড়ের পর আঁচড় দিতেছে। কতক্ষণ যে তাহারা বসিয়া আছে, সে দিকে তাহার খেয়াল নাই। চারি ঘণ্টার পরিশ্রমের পর তুলি ফেলিয়া আবার সে খুকীর দিকে ছুটিয়া গেল। ভাল করিয়া সে খুকীকে দেখিল, কোথায় কোনখানে, তাহার পিতা মিঃ দত্তের কতটুকু ছাপ পড়িয়াছে। আর কোথায় বা পড়ে নাই। তাহার পর আবার চিত্রের কাছে গিয়া সযতনে খুকীর সেই ছবি হইতে তাহার পিতার যা কিছু ছাপ তাহার শেষ কণাটুকু পর্য্যন্ত পুঁছিয়া ফেলিতে লাগিল। বাকি যা রহিল তা শুধু তাহার মায়ের।

অসিত আপন মনে কাজ করিয়া যাইতেছিল, তাহার যা কিছু বিদ্যা ও বুদ্ধি ছিল, তার সবটুকু নিঙড়াইয়া সে উহাতে রূপ দিতেছিল, রস দিতে ছিল, গন্ধ দিতে ছিল। শুষ্ক চিত্রপটের উপর ফুটাইয়া তুলিতেছিল একখানি নিখুঁত সজীব ছবি। হঠাৎ দরোয়ান দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে এ কেয়া তাজ্জব ! এতো মাজীকা থোড়া উমরকো তসবির বান্ গিয়া"।

অসিত চাহিয়া দেখিল, বুড়া দরোয়ান উৎফুল্ল নয়নে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টার দিকেই যেন তাহার লক্ষ্য ছিল বেশী। চোখে তাহার জল। মুখে তাহার ভাষা নাই।

অসিত সাফল্যের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ছবি খানির উপর বয়সের রেখা দিতে দিতে ভাঙা হিন্দিতে বলিল, "হাঁ, এই ছোটা মাজীকো উমের আভি যাস্তি হোনে হোনে আসল মাজী বান্ যায়গা।"

দরোয়ান উত্তর করিল, "আপনি দেবতা আছেন। হামার মা জীকে আপনি এনে দেছেন। হামার মাজী! কেতনা উনকা তকলিপ মিলাথা, কেয়া বোলে। বালিষ্টার সাহেব মাতোয়ালা হোকে মা জিকে দু এক থাপ্পড় ভি দে দেতা থা। হারে হামার মা'জী !"

তুলির আঁচড় টানিতে টানিতে অসিত কথা কয়টা শুনিয়া দরোয়ানের দিকে একবার চাহিল মাত্র। মুখে কিছু বলিল না।

৪

একটা টুলে বসিয়া অসিত সামনের ইজেলের উপর রাখা লীলার তৈল-চিত্রের উপর তখনও রঙের আঁচড় টানিয়া চলিতেছিল।

ভোরের রঙিন আলো তার সবখানি বর্ণরেশ অসিতের বুকের ও মুখের উপর ছড়াইয়া দিয়া ভূমির উপর লুটাপাটি খাইতেছিল। পাশের সজিনাগাছের একটা কাল ছায়া

হাওয়ার ভারে তুলিয়া অসিতের পায়ে একটি করিয়া চুমা দিয়া আবার দূরে সরিয়া যাইতেছিল। অসিতের কিন্তু সে দিকে খেয়াল নাই। ধীরে ধীরে বেলা বাড়িতে লাগিল, তবু অসিতের ধ্যান শেষ হইল না।

হঠাৎ ছবির উপর একটা মানুষের ছায়া পড়াতে অসিত চমকাইয়া উঠিয়া ফিরিয়া দেখিল বুড়া দরোয়ান খুকীকে কোলে করিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। তুলি কয়টি পাশে রাখিয়া দিয়া অসিত সরিয়া দাঁড়াইল। যেমন করিয়া পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের মন্তব্যের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে।

দরোয়ান ঘরে ঢুকিয়া আর পা তুলিতে পারিল না। ছোটবেলা হইতে সে লীলাকে মানুষ করিয়াছে। লীলার অঙ্গের প্রতি রেখাগুলির সহিত সে পরিচিত। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, আরে মাজী হ্যায়! একেয়া মাজী!

দরোয়ানের মুখে মাজী শুনিবামাত্র খুকীও চিত্রের দিকে চাহিয়া দেখিল। ক্ষুদ্র শিশু কি বুঝিল জানি না। সেও দুই হাত বাড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমার মা! ঐ যে মা! আমি মার কাছে যাব!

অসিত তাড়াতাড়ি খুকীকে কোলে করিয়া ছবির পিছন দিকে লইয়া তাহাকে ভুলাইতে লাগিল। দরোয়ান ছবিটী অসিতের নির্দ্দেশ মত কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিল। কিন্তু খুকী নাছোড়বান্দা তাহার মুখে সেই একই কথা—আমার মা কই! মা কোথায় গেল!

কে তাহাকে বলিয়া দিবে তাহার মা কোথায় গেল। ক্রন্দনরত খুকীকে লইয়া দুজনা নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ এই ভাবে বসিয়া থাকিবার পর অসিত জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা বাবু কাঁহা।"

দরোয়ান উত্তর করিল, "জাহান্নমমে। কাঁহা কেয়া বোলে উনকাবাত। আপকো এইসেন কাম্‌কা ওয়াস্তে হাম সে কুল্লে পনর রুপেয়া ভেজ দিয়া। হামরা সরম লাগে বাবু। বিলাইত হোনে আপ্‌ক পনর'শ রুপেয়া জরুর মিল যাতা।"

পৃথিবীর কোনও শ্রেষ্ঠ শিল্পী তাহার শ্রেষ্ঠ চিত্রে এই পনরটী মুদ্রার বেশী পায় নাই। অসিত একটু হাসিয়া টাকা কয়টি বুড়ো দরোয়ানকে পাশের একটি টুলে রাখিতে বলিল।

রাত্রি তখন আটটা। ঘরের সেই আনন্দের মেলার মধ্যে অসিত বসিয়া ছিল। উপরে পিতা ও তাঁহার প্রিয় বন্ধু। নীচে সে আর তাহার লীলা। যাহার যত কিছু কথা, যাহার যত কিছু ব্যথা, তাহারা যেন পরস্পরকে শুনাইতে ব্যস্ত, কিন্তু এ আনন্দ অসিতের কাছে বেশীক্ষণ রহিল না। তাহার সংস্কারান্ধ মন যেন তাহাকে বলিতে লাগিল, সে এ কি করিতেছে? লীলা যে অপরের। তাহার স্বামীর কাছ থেকে ছিনাইয়া আনিয়া তাহার পবিত্রতা নষ্ট করা কি তাহার উচিত। তাহার অধিকার কোথায়। সে একবার পিতার দিকে, একবার মতিবাবুর দিকে, আর একবার লীলার দিকে চাহিল। যাহারা এতক্ষণ উৎফুল্ল নয়নে তাহাকে আনন্দ দিতেছিল তাহারা যেন এইবার চোখ নামাইয়া লইল। কেহ কোন উত্তর দিল না। এমন সময় বাহিরে মোটরের হর্ণের স্বরের সহিত সুর মিলাইয়া কে যেন ডাকিয়া উঠিল,—"এই কোই হ্যায়? বেয়ারা!"

বারকতক এইরূপ ডাকের পর অসিতের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তার উপর একটী মোটরে মিঃ দত্ত ও তাঁহার New sweet heart মিস্ ডলি বসিয়াছিলেন। অসিত কে দেখিয়া মিঃ দত্ত বলিলেন—"হ্যালো—দরোয়ানের মুখে সব শুনলাম। একটা Excellent creation বলতে হবে।"

অসিত বলিল, "হঠাৎ এ সময়ে?"

"আরে ভাই—Only to see the light and shade together! লেকে বেড়াতে বেড়াতে খেয়াল হল কে বেশী সুন্দর দেখা যাক, Old or new তার উপর ডলি মোটেই বিশ্বাস করতে চায় না যে না দেখে মানুষের ছবি আঁকা যায়।"

অসিত ডলির দিকে একবার চাহিয়া বলিল,—"উনিই বুঝি আপনার Light?"

মিঃ দত্ত ডলিকে বাম বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া নাড়া দিয়া বলিল, "Yes, yes, This Sweet Rose!"

অসিত অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর বলিল—"আসুন!" ঘর অন্ধকার ছিল। অসিত একটী উজ্জ্বল বাতি জ্বালিয়া ছবির পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

চিত্রের দিকে নজর পড়িবা মাত্র, লোকে ভূত দেখিলে

যেরূপ চমকাইয়া উঠে সেইরূপ ভাব দেখাইয়া মিঃ দত্ত ও কুমারী ডলি তিন চারি পা পিছাইয়া গেল। তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, উহা জীবন্ত মানুষ নয়। মিঃ দত্ত ভীতকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে একবার বলিল, "Marvellous !"

অসিত বাতিটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ছবির নানা অংশে আলো ফেলিতেছিল, যেমন করিয়া লোকে প্রতিমাকে বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে আরতি করে! চোখে তাহার বিদায়ের অশ্রু।

উজ্জ্বল আলোকে ছবি কখনও বামে ফিরিয়া কখনও বা উঁচু মুখে, কখনও বা আঁখি দুইটী নীচু করিয়া মিঃ দত্ত ও মিস্ ডলিকে দেখিতে লাগিল। কখনও ঠোঁট, কখনও বা তাহার চোখ কথা বলে। কখনও হাসে কখনও কাঁদে, কখনও বা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া শ্লেষের দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়। আলোর ছোঁয়াচ লাগিয়া তাহার বাসন্তী রঙের শাড়ীখানি তাহার রক্তাভ মুখখানির মতই, কখনও লাল হয়, কখনও নীল কখনও বা আবার পীতাভ হইয়া উঠে।

মিঃ দত্তের মনে হইতে লাগিল যেন লীলা তাহার অঙ্গুলীটি ঈষৎ নাড়িয়া বলিতেছে—ছি ছি স্বার্থপর পুরুষ। এতদিন আমাকে যাহা শুনাইয়া আসিয়াছিলে, তাহার সবই তাহলে মিথ্যা।

মিস্ ডলির মনে হইতে লাগিল যেন ছবি বলিতেছে, কে গা তুমি! আমার স্বামীর পিছন পিছন অমন নির্লজ্জের মতন ঘোর কেন?

সভয়ে দত্ত সাহেব ও ডলি মিত্র পাশে সরিয়া গেল। কিন্তু ছবির চোখ যেন পাশ ফিরিয়া আবার তাহাদিগের দিকে তাকায়। চারিদিক অন্ধকার শুধু ছবির সামনে উজ্জ্বল আলো। সভয়ে দত্ত সাহেব দেওয়ালের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। ডলি অস্ফুট আর্ত্তনাদে জানালার একটী কপাট জড়াইয়া ধরিল। ছবি যেন পট ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়!

অসিত আপনমনে বাতি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আরতি শেষ করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে মুখ নামাইয়া, লীলার দক্ষিণ হস্তে একটী চুমা দিল। তাহার পর বাতিটি উল্টাইয়া তাহার অগ্নিফলক লীলার পায়ে বার বার করিয়া ছোঁয়াইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চিত্রের রঙ মিশ্রিত তৈল অগ্নি স্পর্শে জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমে লীলার পা তারপর তাহার আঁচল, তাহার কৃষ্ণচুল ও ঢল ঢল রাঙা মুখখানি অগ্নির স্পর্শে উজ্জল হইয়া উঠিল। দত্ত সাহেব প্রথমে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। হঠাৎ ব্যাপার দেখিয়া, তিনি চীৎকার করিয়া অসিতকে ধরিতে গেলেন, কিন্তু তখন আগুনের ঝলকে আর ছবির কাছে যাওয়া যায়না।

দত্ত সাহেব চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি করলেন অসিত বাবু! আমি যে দুবার করে তাকে হারালাম!"

অসিত কথা বলিল না।

নির্ব্বাক হইয়া সকলে দেখিতে লাগিল, লীলা পুড়িতেছে। যেমন করিয়া তিনমাস আগে তাহার দেহ নিমতলার ঘাটে পুড়িয়াছিল, ঠিক তেমনি করিয়া তাহার গায়ের মেদ ও চর্ব্বির ন্যায় চিত্রের কাঁচা তৈল গলিয়া গলিয়া মাটির নীচে পড়িতে লাগিল। ঠিক তেমনি করিয়া একটির পর একটি করিয়া কাঁচা সোনার অঙ্গগুলি পুড়িয়া কাল হইয়া ছাই হইতে লাগিল। অগ্নি শিখার উপরে অসিতের পিতা ও মতিবাবুর তৈলচিত্রে লাগায় উহার কিছু তৈল গলিয়া গিয়াছিল। সেই তৈলের সহিত তাহাদের মসীকাল চক্ষু চারিটি হইতে কাল কাল জলের কয়েকটি ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া মেঝের উপর পড়িতে লাগিল। অসিতের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। মূক ছবি দুইটির কান্নার সহিত সেও অনেক কাঁদিল।

চিত্রের ভস্মরাশির দিকে চাহিয়া মিঃ দত্ত বলিলেন, "একি করলেন! নিষ্ঠুর Cruel destroyer! এ যে পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে থাকত। লীলাকে যে তুমি সত্যিকার প্রাণ দিয়েছিলে। এখন কোথায় আবার এমন জিনিষ পাবে?"

চোখের জলের সঙ্গে একটু হাসির রেশ মিশাইয়া অসিত বলিল, "কেন মিঃ দত্ত! এর দাম ত মাত্র পনর টাকা। বাজারে ঐ টাকা কয়টির বিনিময়ে এমন অনেক ছবি ত আপনি পেতে পারেন। ঐ নিন আপনার টাকা কয়টা, ঐ টুলের উপর রয়েছে। নিয়ে যান।"

অদূরে জানালার নীচে মিস্ ডলি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তখনও তাহার মনের সহজ ভাব ফিরিয়া আসে নাই। মিঃ দত্ত চিত্রার্পিতের ন্যায় একবার তাহার দিকে ও একবার চিত্রের সেই ভস্মরাশি দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর ছুটিয়া গিয়া অসিতের হাত দুইটি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া অনুযোগের স্বরে বলিল—"Please অসিট্ বাবু, Try again!" অসিত দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "না না, আর তা হয় না। ছবির ধ্বংস ঠিক মানুষেরই মৃত্যুর মতো, একবার হারালে আর ফিরে আসে না।"

নারী-শক্তি

শ্রীকমলানন্দ দাসগুপ্ত

বলে কিনা
নারী শক্তিহীনা !
সৃষ্টির আদিম যুগ হতে
মহাকাল সাথে
অবিরাম
যেই নারী করিছে সংগ্রাম
সৃষ্টি রক্ষিবারে,
বলে কিনা শক্তিহীনা তারে ?
সম্মুখে যাহারে পায়
করিয়া বিলীন
মহাকাল চিরদিন
আপন গন্তব্য পথে করিছে গমন,
আমি শুধু তার সাথে করিয়াছি রণ
রোধিতে মরণ ।
নিজ শক্তিবলে নিত্যপুরুষেরে
করি আকর্ষণ
করিয়া সৃজন
নবীন জীবন
মহাকাল বক্ষপরে পদচিহ্ন আঁকি
আমার চলার পথে নিত্য যাই রাখি ।

পুরুষ ত ভোলানাথ সমাধি-মগন,
আমিই জাগাই তার রূপ রস গন্ধের চেতন ।
চৌদিকে ঘিরিয়া তার নিত্য নবরূপে
বিকসিত করি আমি আমার স্বরূপে,
যেন কত প্রেমভারে আবেশবিহ্বলা
শ্যামলা কোমলা কভু বিদ্যুচ্চঞ্চলা
হাসিয়া চুমিয়া যাই দিগন্ত মেখলা,
চঞ্চল চটুল ছন্দে নৃত্য করি ফিরি
সমাধিস্থ পুরুষের সর্ব্বেন্দ্রিয় ঘিরি ।

যাহা কিছু বুকে মোর ফুটে ওঠে চোখের তারায়
সোহাগ ঝরিয়া পড়ে কথায় কথায়,
লাবণ্যের তীব্রদ্যুতি উছলিয়া পড়ে,
সর্ব্ব আশা উঠে জাগি প্রশান্ত অধরে ।
মোর প্রেমে মোর রূপে পুরুষ পাগল
সর্ব্বহারা দেয় মোরে তপস্যার ফল,
সংসার সমরক্ষেত্রে আমি চিরজয়ী
আমি নারী মহামায়া মহাশক্তিময়ী ।
আমিই ত তীব্র তপস্যায়
সৃষ্টি করি আপন সত্তায়
পুরুষ সুন্দর
করিয়াছি মোর চির লীলা সহচর,
নিজ বক্ষরক্তদানে পুষ্ট করি বক্ষ সবাকার,
তাই তারা সামর্থ্যে দুর্ব্বার ।
শুধু মোর সৃষ্টি রক্ষাতরে
ত্রিজগতে ফিরি আমি নানা রূপ ধরে,
নহি ভোগ্যা নহি কাম্যা পূজ্যা পুরুষের,
আমি মাতা চিরদিন
অনন্ত বিশ্বের !

দুখানি বই

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সপ্তপর্ণ

সপ্তপর্ণ একখানি ছোট গল্পের ছোট বই। এ গল্পগুলির লেখক হচ্ছেন শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়। এই বইখানি পড়ে আমি খুসী হয়েছি, আর কেন যে খুসী হয়েছি তাই প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

প্রথমেই বলে রাখি যে, শ্রীমান কিরণশঙ্কর আমার একজন প্রিয় বন্ধু। আমার খুসী হবার সেও একটি কারণ। আমি বছর দুই আগে "নীললোহিতের আদি প্রেম" নামক একখানি ছোট গল্পের বই প্রকাশ করি এবং সে বইখানি শ্রীমান কিরণশঙ্করকে উৎসর্গ করি। এবং সেই সূত্রে বলি যে, "যখন সবুজপত্র তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করে, তখন যে সব নবীন লেখকদের সহায়তায় উক্ত পত্রকে বাঁচিয়ে রাখি, তাদের মধ্যে তুমি ছিলে অন্যতম। তারপর তুমি সাহিত্যক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়ে পলিটিকাল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছ। তাহলেও তোমার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। বাংলা তুমি আজকাল লেখো না বটে, কিন্তু পড়ো।"

আমি অবশ্য এ যুগে পলিটিক্সচর্চ্চার অপেক্ষা সাহিত্য চর্চ্চাকে শ্রেষ্ঠ অধ্যবসায় বলে মনে করিনে। তবুও শ্রীমান কিরণশঙ্কর যে লেখকশ্রেণী ত্যাগ করে পাঠকশ্রেণীভুক্ত হয়েছেন, তাতে আমি খুসী হইনি। কারণ তাঁর লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই আমার চোখে পড়ে যে, শ্রীমান কিরণ-শঙ্করের লেখার হাত আছে, যার অভাব বহু লেখকের বহু লেখার অন্তরে নিত্য পাওয়া যায়।

সপ্তপর্ণের গল্প সাতটির কথাবস্তু সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। এর দুটি কথিকা ইংরাজী "কথিকার" বাঙলা সংস্করণ। অপর পাঁচটির গায়ে কোন কোনও পূর্ব্ব লেখকের গল্পের ছায়া পড়েছে। কিন্তু প্রায় সব ক'টিরই লেখা চমৎকার। সবুজপত্রের প্রভাবে যে শ্রীমান কিরণশঙ্করের ভাষা এত সহজ, স্বচ্ছন্দ ও মনোহারী হয়েছে, তা অবশ্য নয়। এ ভাষার সঙ্গে বীরবলী ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই। দু'-কথায় বলতে হলে, সপ্তপর্ণের ভাষা সুন্দর ও সুকুমার, অথচ খাঁটি বাঙলা। যা আমার মনকে বিশেষ করে স্পর্শ করেছে, সে হচ্ছে কলকাতার নয়, বাংলাদেশের মাটি, জল, আকাশ, বায়ু, লতা-পাতা, ফলফুলের বর্ণনা। সে বর্ণনা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি স্পষ্ট। প্রথম গল্পের বক্তা অমল বলেছেন যে "এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আকাশের যে কী প্রেমলীলা চলে, সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।" অমল দেখুন আর নাই দেখুন, কিরণশঙ্কর যে স্বচক্ষে দেখেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রীমান কিরণশঙ্কর ও আমি—আমরা উভয়েই প্রায় এক দেশেরই লোক, আমাদের উভয়েরই বাড়ী পদ্মার ওপারে। ওদেশের বর্ণনা যে কিরণশঙ্করের মনগড়া নয়, তা আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি। আর আমরা উভয়েই বাল্যকাল থেকেই কলিকাতাবাসী হলেও ও-অঞ্চলের মায়া আজও কাটাতে পারিনি। যাকে আমরা দেশ বলি, তা শুধু পঞ্চভূতের সমষ্টি নয়, নানারকম দৃষ্ট ও শ্রুত স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। কানে-শোনা কথাও আসলে মনের কথা। আর মনের কথা যিনি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন, তিনিই যথার্থ লেখক। সুতরাং কিরণশঙ্কর যে একজন যথার্থ লেখক, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করবেন।

হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি

"হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি" একখানি নতুন বই। এ বইয়ের লেখক শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব জনৈক তরুণ লেখক হলেও পাঠকসমাজের নিকট সুপরিচিত।

কারণ তাঁর কলম ইতিমধ্যেই বহু গল্প-উপন্যাসের প্রসব করেছে। বুদ্ধদেবের লেখনীর সৃজনীশক্তি অফুরন্ত,—বারোমাসই তা যুগপৎ ফলন্ত ও ফুলন্ত।

বই লিখলেই আমরা নিন্দাপ্রশংসার ভাগী হই। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ লেখকের কপালে যা জোটে সে হচ্ছে—সমালোচকের মুরুব্বিয়ানা স্বল্পনিন্দা অথবা স্বল্পপ্রশংসা। কিন্তু বুদ্ধদেবের কপালে যে নিন্দাপ্রশংসা জুটেছে, তার একমাত্র বিশেষণ হচ্ছে "অতি।" এই 'অতি' জিনিযটেকে আমি ডরাই, কারণ আমার বিশ্বাস যে অতিনিন্দুক এবং অতিস্তাবক উভয়েই সাহিত্যের বাজারে একদরের জহুরী। এই কারণেই বুদ্ধদেবের কোন লেখা সম্বন্ধে কোনও কথা বলতে আমার কখনো উৎসাহ হয়নি। এক্ষেত্রে সমালোচনার অর্থ হচ্ছে বাক্-বিতণ্ডা। আর এক কথা, আমি যদি এক্ষেত্রে সমালোচনার বামমার্গ অবলম্বন করতুম, তাহলে লোকে বলত যে আমি শিঙ বাঁকাচ্ছি হিংসেয়; অপরপক্ষে আমি যদি দক্ষিণমার্গ অবলম্বন করতুম, তাহলে লোকে বলত আমি শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে মিশেছি।

আজকে যে তাঁর নতুন বইখানির প্রশংসা করতে উদ্যত হয়েছি, তার কারণ এখানি প্রবন্ধের বই—গল্পের বই নয়। বিশেষতঃ এ প্রবন্ধগুলি আমরা যে-জাতীয় প্রবন্ধ পড়ি ও লিখি সে-জাতীয় প্রবন্ধ নয়। অর্থাৎ এসব প্রবন্ধের এমন কোন বিষয় নেই, যা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পেতে পারে। জিওগ্রাফি, হিষ্টরি, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম কিম্বা নীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেননি। বলা বাহুল্য যে, কোন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ সেই বিষয়ই আমাদের লেখার সাহায্য করে। কিন্তু মনকে সেই বিষয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ করাই এ-জাতীয় প্রবন্ধ লেখকের প্রথম কর্ত্তব্য। এ-জাতীয় জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের অন্তরে মন চাই কি নাও থাকতে পারে।

কিন্তু আর একজাতীয় প্রবন্ধ আছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে-কোন নিত্যপরিচিত নগণ্য বিষয় অবলম্বন করে লেখকের আত্মপ্রকাশ করা। এ পুস্তকে একটি প্রবন্ধ আছে, যার বিষয় হচ্ছে "বাথ্‌রুম।" অবশ্য এ বিষয়েও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখা যায়। মহেঞ্জদারোয় যখন ড্রেন ছিল, তখন বাথ রুমও নিশ্চয় ছিল; তবে কি আকারের স্নানাগার ছিল, আর ডারউইনের evolution অনুসারে এ যুগে তা কি আকার ধারণ করেছে, সে বিষয়ে অবশ্য এমন thesis লেখা যায়, যার প্রসাদে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি লাভ করতে পারি।

কিন্তু বুদ্ধদেব সে-জাতীয় প্রবন্ধ লেখেননি। তিনি বাথ্‌রুমকে উপলক্ষ্য করে, নিজের কতকগুলি মানসিক ও শারীরিক অনুভূতির এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি আত্ম-চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। এ-জাতীয় প্রবন্ধ ইংরাজরা খুব ভাল লেখেন। Lamb এ-জাতীয় প্রবন্ধকারদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য, এবং তাঁর প্রবন্ধাবলী অতুলনীয়। এ-জাতীয় প্রবন্ধ মানুষের এত ভাল লাগে, কেননা তার প্রসাদে লেখক নামক একটি মানুষকে পুরো পাওয়া যায়। এবং সেই সঙ্গে নিজের মনের সূক্ষ্মশরীরের।

আমি অবশ্য বুদ্ধদেবকে Lambএর সঙ্গে এক ব্র্যাকেটভুক্ত করতে চাইনে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বুদ্ধদেবের প্রবন্ধের জাত চিনিয়ে দেওয়া। আর এই শ্রেণীর প্রবন্ধকেই যথার্থ সাহিত্য বলা হয়। এ-জাতীয় প্রবন্ধের প্রধান গুণ হচ্ছে তা কিছুই প্রমাণ করতে চায় না, কোন-কিছু শিক্ষা দিতে চায় না। সুতরাং fact ও logic-এর লৌহ শৃঙ্খল থেকে এ-রকম লেখা মুক্ত। এর ভিতর যে fact আছে, সে হচ্ছে লেখকের ব্যক্তিগত শরীর ও মনের fact। আমাদের ব্যক্তিত্ব দেহ ও মন এ দুয়ের যোগফল মাত্র।

এ শ্রেণীর প্রবন্ধ যদি প্রলাপ না হয়, যদি তার কোনও রূপ থাকে ত সে রূপ আমাদের বৈষয়িক মনের ভিতরে কি বাইরে যে মন আছে সেই অনির্দ্দিষ্ট মনকে স্পর্শ করে, আর নানা চিন্তার উদ্রেক করে। বুদ্ধদেবের প্রবন্ধগুলির ভিতর সেই রূপ আছে। তাঁর প্রবন্ধগুলি হ য ব র ল নয়। তাঁর দুটি প্রবন্ধ আমার খুব ভাল লেগেছে। একটির নাম "রূপ ও স্বরূপ,"—অপরটির "মৃত্যুজল্পনা,"। আমার মতে "মৃত্যুজল্পনা"ই এ পুস্তকের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। দেহ ও মন ঐকান্তিক অবসাদগ্রস্ত হলে, মানুষের অর্দ্ধমৃত অর্দ্ধজীবিত মনের যে অবস্থা হয়, তার চমৎকার বর্ণনা। আর যিনি কখনো নিজের মনের ও-অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য যে বুদ্ধ-

দেবের বর্ণনা কাল্পনিক নয়, বাস্তবিক। আমি যথার্থ পাঠককে এ প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি।

এখন আমি লেখকের ভাষা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে চাই। বুদ্ধদেবের গল্পের ভাষার ও ভাবের অন্তরে ইংরাজীতে যাকে বলে forced তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যেত। সম্ভবতঃ এওএকটা কারণ, যার দরুণ তাঁর লেখা অতিনিন্দিত এবং অতি প্রশংসিত হয়েছিল। Forced সাহিত্য forced সমালোচনা ডেকে আনে।

কিন্তু এই "রূপ ও স্বরূপ" এবং "মৃত্যুজল্পনা" প্রভৃতি লেখা ভাষার বাহ্বাস্ফোটন ও ভাবের বুকফোলানো রূপ থেকে প্রায় মুক্ত। আমরা কোনও লেখকের muscle দেখতে চাইনে, দেখতে চাই তাঁর মন। আর মনের শক্তির একমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় তার আলোয়। আর রঙ জিনিষটে, যার জন্য আমরা সাহিত্যিকমাত্রই লালায়িত, তা হচ্ছে আলোরই বিকার। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন আলো জিনিষটা কি? তার উত্তর—কথার জোরে অন্ধের চোখ ফোটানো যায় না।

বুদ্ধদেব কিরকম ভাষায় লিখতে চান, তার পরিচয় তিনি নিজমুখেই দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং সরস্বতীকে বলেছিলেন—"দেবী! ভাষা এত দুর্ব্বল কেন? ভাষার সেই রহস্য আমাকে বলো, যাতে তা দীপ্ত কৃপাণ হয়ে ওঠে, প্রবল বন্যা হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে দুরন্ত বহ্নিশিখা।"

লেখকের মহাসৌভাগ্য যে, দেবী সরস্বতী তাঁকে সে রহস্য বলেননি। কেননা, তাহলে বুদ্ধদেবের রচনারীতি হয়ে উঠত, আলঙ্কারিকরা যাকে বলেন গৌড়ীরীতি—আর ইংরাজরা যাকে বলে bombast। ফলে সে ভাষা হয়ে উঠত, প্রবল বন্যার মত, দুরন্ত অগ্নিশিখার মত। অর্থাৎ সাহিত্য-জগতে একটি ভীষণ-উৎপাত। আমরা পাঠকরা এ-জাতীয় উৎপাতকে ভয় করি, ভালবাসিনে।

সে যাই হোক, তাঁর বাথ্রুমেও "দুর্ব্বার জলরাশির" সাক্ষাৎ আমরা পাইনি, আর তাঁর ক্লাইব ষ্ট্রীটের চাঁদও দুরন্ত বহ্নিশিখা নয়।

বন্যা, তুফান, অগ্ন্যুৎপাতাদির সঙ্গে কোনরূপ সাদৃশ্য না থাকলেও. ভাষার অন্তরে যে প্রাণ ও স্পষ্ট গতি থাকতে পারে, তার প্রমাণ বুদ্ধদেবের কোন কোনও প্রবন্ধের ভিতর পাওয়া যায়। "রূপ ও স্বরূপের" স্বচ্ছন্দ গতি মুক্তছন্দ গদ্যের প্রকৃষ্ট নমুনা। এর ভিতর বন্যা নেই, স্রোত আছে, কিন্তু যে স্রোত মনকে টেনে নিয়ে যায়।

আমি খানিকক্ষণ আগে কিরণশঙ্করের রচনারীতির সুখ্যাতি করেছি; এখন বুদ্ধদেবের ভাষারও প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত নই। যদিচ এ দুই ভাষার চাল সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

কিরণশঙ্করের ভাষার প্রধান গুণ এই যে সে ভাষা, বুদ্ধদেব যাকে বলেন, "মন্থর ও কোমল।" অপরপক্ষে বুদ্ধদেবের ভাষার স্পষ্ট গুণ হচ্ছে তার গতি ও প্রাণ। শক্তি নামক ধর্ম্ম অবশ্য এ উভয় ভাষার অন্তরে আছে। বাঙলা ভাষাটা ঠা ও দুন্ দুই টানেই লেখা যায়। ভাষা দ্রুত কিম্বা বিলম্বিত হবে, তা নির্ভর করে লেখকের অন্তরের বেগের উপর। সে বেগ মৃদুও হতে পারে, তীব্রও হতে পারে। এই সব লেখা পড়ে মনে হয় যে বাঙলা ভাষা তার স্বরূপ লাভ করছে। ভাষার স্বরূপ হচ্ছে বহুরূপ। আর এই বহুরূপের অন্তরেই তার স্বরূপের সাক্ষাৎ মেলে।

প্রমথ চৌধুরী

মুসাফিরের ডায়রী

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী এম্‌-এ

আলোক চিত্রশিল্পী শ্রীরাধাভূষণ বসু, বি-এস্‌সি, বি-কম্‌

শিলং

ভ্রমণ জিনিষটা কারো বা পেশা, কারো বা নেশা—আমার পক্ষে অন্তত নেশাই বটে। মাঝে মাঝে এই নেশার ডাক আমার কানে আসে আর আমি তল্পি-তল্পা বেঁধে মুসাফিরের মত বেরিয়ে পড়ি—দূর দিগন্তে চলে আমার পাড়ি—কখন নিঃসঙ্গ, কখন বা সসঙ্গ। পথে আমার মত কত মুসাফিরের সঙ্গে ঘটে পরিচয়। সে পরিচয় কোথাও বা স্থায়ী ভাবে বাসা বাঁধে, আবার কোথাও বা মুসাফিরখানার সদালাপে দৃষ্টির অন্তরালের সঙ্গেই শেষ হোয়ে যায়। দেশ দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে মনের ভাণ্ডারে আমার রঙের তবিলটাই জমে উঠেছে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পান করে দু'চোখ ভরে উঠেছে, প্রাণের মানুষটির গায়ে লেগেছে অফুরন্ত বসন্তের বাতাস, তাই বয়স বাড়তির পথে চললেও এখনও আমি সবুজ, আয়ুর পাতায় এখনও ঝরে পড়ার হলুদ রং ধরেনি। তাই তীর্থকামীর মন নিয়ে আর পুণ্যার্থীর চোখ নিয়ে আমি পথে পা দিই না—পথের ডাকেই আমি পথে বার হই; আকাশ বাতাস মাটি গাছপালা পাহাড় পর্ব্বত নদী নালার গান আমার কানে বেজে ওঠে—তীর্থের দেবতার আহ্বান সে গানের তলায় হয়ত চাপা পড়ে যায়। দেব-মন্দিরের বাইরের সৌন্দর্য্য আর কারুতার দিকেই আমার যত আকর্ষণ, ইট পাথর আর গঠন সৌন্দর্য্যের রহস্য ভেদ করতেই চলতি পথের ধারে মন্দির সিমানায় দাঁড়াই। কবে কোন তারিখে মন্দির গ্রথিত হয়েছে, কে তার স্থাপয়িতা ইত্যাদি ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করে মুসাফির মন আবার পথে পাড়ি জমায়—ভক্তের ভক্তি নেই, তাই দেবতাও পান না কোন ভক্তি-নিবেদন, আর পূজারী ব্রাহ্মণ সেবাইতরাও নিরাশ হন।

রানাঘাট ষ্টেশনে "আসাম মেল" দাঁড়াইয়া আছে—লেখক ও অমূল্য সেনকে দেখা যাইতেছে।

পূজার সময় কোথায় বাঙ্গালীর ছেলে দেশে থেকে শারদীয়ার আনন্দ উপভোগ করবে, তা না তল্পি বেঁধে রেল কোম্পানীর আয় বাড়াতে চলল হাওয়া খেতে—এমন মন্তব্যও শুনতে হয়। আবার কেউবা বলেন, পূজোর সময় হাওয়া খাওয়া একটা ফ্যাসান হোয়ে দাঁড়িয়েছে, তা না হোলে এ্যারিষ্টোক্রেসি যে বজায় থাকে না। কিন্তু এই সব হিতকামীরা বোধ করি জানেন না আমার ভ্রমণটায় হাওয়া বদলির সদ্ইচ্ছা একটুও নেই, কারণ হাওয়া বদল করেন তাঁরাই যাঁরা শরীরযন্ত্রকে মেরামত করে বাঁচিয়ে রাখতে চান স্থূলকায় করে; আমার ও মেরামতির বালাই নেই, কারণ শরীরযন্ত্রে আজ পর্য্যন্ত আমার বিকল হবার লক্ষণ দেখা দেয়নি, আর

স্থূলত্বও আমি কামনা করিনে। আমি বেরিয়ে পড়ি দেশের বাইরের রূপশ্রীর সঙ্গে মিতালি পাতাবার জন্য—পান্থশালার পথিক ঘর বাড়ী বেঁধে হাওয়া খাওয়া আমার ধাতে সয়না। যে দেশেই যাই ঘুরে ঘুরেই আমার দিন কাটে—চেঙ্গারদের মত ঘড়ির কাঁটা ধরে আমার গতিবিধি নির্দ্দেশিত হয় না, আহার, নিদ্রা সময়ের মাপ কাঠি মেনে চলে না। দেশের বাইরে গিয়ে মুক্ত পাখীর মত আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, প্রশস্ত মুক্তির আনন্দে ভুলে যাই ঘর সংসারের কথা; বাস্তবগন্ধী সুখ, দুঃখ, অভাব অনটন ও প্রাচুর্য্যের কোন কিছুরই খেয়াল তখন আমার থাকেনা—Thrill, adventure আর একটা যেন romantic জগতে মন তখন উড়ে বেড়ায়, গতিবিধির থাকে না ঠিকানা, নিয়ম কানুনের শৃঙ্খল যায় ভেঙ্গে। এই হোল আমার জীবনের কাব্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন চাক্‌রিতে ঢুকেছি, ছুটী না হোলে বেরিয়ে পড়তে পারিনা—কাজেই ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চুপচাপ থাক্‌তে হোল। তারপর তোড়-জোড় কর'তে আরও কটা দিন লেগে গেল। সপ্তমী পূজার দিন বেরিয়ে পড়লাম্ মোট মাট বেঁধে—বন্ধু বান্ধবদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম শিলং যাত্রীর ডায়রী যথা সময়েই তাদের হাতে পৌঁছুবে। অবশ্য কথা উঠতে পারে শিলং তো গেছেন অনেকেই তার কাহিনীও মাসিকের পাতায় আশ্রয় নিয়েছে বহুবার, নতুন করে মুসাফিরের ডায়রীর প্রয়োজন কী? এর উত্তরে আমার নিজের কিছু বলা শোভন হবে না, যাঁদের জন্য এ ডায়রী লেখা তাঁরাই বিচার করবেন নতুন তথ্য এর মধ্যে কিছু আছে কিনা। তবে এটুকু বলতে পারি বহু বন্ধু বান্ধবী ও গুণগ্রাহী অনুগতদের একান্ত ইচ্ছায় মুসাফিরের ডায়রী লেখবার ভার আমি নিয়েছি—তাঁদের বিশ্বাস আমি নাকি শিলংকে দেখব With a different eye and different mood। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি পত্র ঘেঁটে যারা রিসার্চ্চ করে তারা যে সব বিষয়েই নতুন কিছু আবিষ্কার ক'রবে এ ধারণাটা ভ্রান্ত—আমার একথাটা অনেকেই মানতে চাননা—তাই অনন্যোপায় হোয়েই শিলং সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলবার চেষ্টা আমার করতে হোচ্ছে। এটা হয়ত কতকটা কৈফিয়ৎ এর মতই শোনাবে—কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই।

আসাম মেল দেড়টায় ছাড়ে—পৌনে একটায় শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে ছুট্‌লাম। বাড়ী থেকে ষ্টেশন দূরে নয়, পনের মিনিটের মধ্যেই পৌছে গেলাম। রেল কোম্পানীর ছাড়-পত্র আগেই কিনে রাখা গিয়েছিল, সুতরাং ভীড়ের টিপুনি খেতে হোল না। সপ্তমী পূজার দিনও যে বিদেশগামী বাঙালীর ভীড় থাক্‌তে পারে তা' আগে ভেবে দেখিনি।

পাণ্ডুঘাটে মেশর্স্ কমার্শিয়ল্ ক্যারিইং কোম্পানী লিমিটেডের ষ্টেশন—ল্যাগেজ ভ্যান্‌গুলি দেখা যাইতেছে।

এদের দেখে মনে মনে বললাম্ আমার মত নাস্তিকের সংখ্যা তা' হোলে কম নয়। আরো ভাবলাম্ গাড়ীখানা যে রকম লম্বা তার পরিমাপে যাত্রীর সংখ্যাও লম্বা কিন্তু তাতেও সকলের স্থান মিল্‌বে কিনা সন্দেহ—গাড়ী ছাড়বার পর দেখলাম্ আমার সন্দেহটা মিথ্যা হয়নি, সত্যিই অনেকে গাড়ীতে স্থান সংগ্রহ করে নিতে পারেনি।

প্লাটফর্ম্ম-এ ঢুকতেই শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা বসু ও দুই দৌহিত্র শ্রীমান টুটু ও শ্রীমান টুলুকে দেখতে পেলাম। সত্যেন বাবু আমায় দেখতে পাননি, মালপত্র ঠিক মত গাড়ীতে উঠ্‌ছে কিনা তার তদারকে তিনি

তখন ব্যস্ত। আমার শর্ট সার্ট ও হ্যাট পরিহিত মূর্ত্তি দেখে প্রতিমাদি হয়ত প্রথমে চিনতে পারেননি; কিন্তু পরক্ষণেই চিনতে পেরে হেসে হাত নেড়ে ডাকলেন। কাছে যেতেই বললেন—শিলং যাচ্ছ তাহলে, যাক্ বাঁচা গেল, আমরা তো ভাবছিলাম্ তুমি হয়ত শেষ পর্য্যন্ত পিছুলে। আমি বললাম্ পিছুবার ছেলে আমি নই—এগুনোই আমার স্বভাব। তার প্রমাণ এতদিনে আপনার পাওয়া উচিত ছিল।'

পাণ্ডু-গৌহাটি-শিলং রোডে "নন্-প্রো"তে ট্র্যাফিক্ কন্ট্রোল—বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত শিলং হইতে গৌহাটী এবং গৌহাটী হইতে শিলংগামী সমস্ত প্রাইভেট মোটর কার, ট্যাক্সি, বাস্, লরী প্রভৃতি জমা হয়। এখানে সকল প্রকার যান-বাহনকেই কিছুক্ষণ আটক থাকিতে হয়। যখন বুঝা যায় যে শিলং হইতে গৌহাটী বা গৌহাটী হইতে শিলং যাইবার আর কোনও গাড়ী আসিবার সম্ভাবনা নাই, তখন ইহারা আটক থাকা হইতে মুক্তি পায়। প্রথমে আপ্ ট্র্যাফিক অর্থাৎ গৌহাটী হইতে শিলংগামী যানবাহনগুলিকে যাইতে দেওয়া হয়, পরে ডাউন ট্র্যাফিক্। এইরূপ ট্র্যাফিক্ কন্ট্রোলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ রাস্তাটী এত সরু ও বিপজ্জনক যে আপ্ এবং ডাউন দুইখানা গাড়ী পাশা পাশি যাওয়া মুস্কিল। বলা বাহুল্য "নন্ পো"তে রাস্তাটী বেশ প্রশস্ত—এখানে পোষ্ট অফিস এবং কয়েকটী ইঙ্গ-বঙ্গ ও দেশী চা-এর দোকান আছে—এখানে বসিয়া চা পানান্তে পার্ব্বত্য রাস্তায় ভ্রমণ জনিত ক্লেশ বহুলাংশে উপশমিত হয়।

ততক্ষণে তিন বছরের বীর শ্রীমান টুটু আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আমার ছড়িটা দখল ক'রে বসেছে। বেশ গম্ভীর মুরুব্বি চালে বললে—দেখেছ আমার কি রকম পোষাক, নড়াই করতে হবে কিনা, টুলু ভাইটা ছোট কিনা তাই ও যত্নর কোলে আছে। আমি বললাম্—কোথায় নড়াই করবে টুটু সিং? বীর টুটু গম্ভীর গলায় বললে—দেখনা কত নড়াই করব, সব্বাইকে হারিয়ে দোব, আমার বন্দুক আছে—এই ই ক'রে গুড়ুম ক'রে দোব—ব'লে এক অপরূপ ভঙ্গীতে শ্রীমান টুটু ছড়িখানাকে ধরে দাঁড়াল—। আশে পাশে দু' একজন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা শ্রীমানের বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী দেখে এবং কথা শুনে হেসে উঠলেন।

সত্যেন বাবু আমাদের গল্প ক'রতে দেখে হেসে ব'ললেন—বেশ তো বুড়োর উপর তদারকের ভার দিয়ে টুটুর বীরত্ব কাহিনী শুনছ, এদিকে ঘণ্টা পড়ল যে, কি পড়ে রইল দেখে শুনে নিয়ে উঠে প'ড়লে ভাল হয়না কি? দেখলাম্ মালপত্র সবই কুলিরা যথাস্থানে তুলে দিয়েছে। গাড়ী ছাড়তে তখনও মিনিট দশেক দেরী আছে দেখে দু'একখানা বিলিতি ম্যাগাজিন সংগ্রহ করবার উদ্দেশে হুইলারের ষ্টলের দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম। খান দুই True Story Magazine আর Cinema World খরিদ করে ফিরছি, বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানীর হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা বন্ধুবর অমূল্য সেনের সঙ্গে দেখা। শিল্পী সমর দেকে সাথী করে ভায়াও শিলং চলেছেন। ভায়ার প্রাণে যে সখ আছে তা পূর্ব্বে জানা ছিলনা—কুবেরের উপাসক বলেই তাঁকে জানতাম্। তাই বললাম—কী বিপদ, অটো-টাইপের লোহার সিন্দুক ফেলে শিলং সুন্দরীর আকর্ষণে তুমি যে চলেছ এ তো বিশ্বাস হয়না—ব্যাপার কী বল দেখি? এ যে তোমার বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরাপুরী গমনের মত দেখ্‌ছি।

ভায়া গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রে ব'ললেন—

আর তো ব্রজে যাবনা ভাই,

ব্রজের খেলা শেষ হয়েছে
এবার যাব মথুরায়—

কিন্তু তোমার যাওয়া হ'চ্ছে কোথায়? আমি নিরাশ কণ্ঠে হতাশার অভিনয় ভঙ্গীতে বললাম্—জানই তো ভাই আমার ব্রজও নেই, রাধাও নেই, সুতরাং গন্তব্যেরও বাধা নেই। আপাতত পদ্মা তো পার হই তারপর দেখি বাষ্পযান কোন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিয়ে যায়। গীতার নিস্পৃহ নিরাসক্ত জীবন আমার হৃদিস্থিত হৃষিকেশ 'যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি'।

পিছন থেকে কাঁধের উপর এক বিরাট বাহুর চাপ প'ড়ল। ফিরে দেখি অভিন্নহৃদয় বন্ধু ডাঃ দুলালচন্দ্র সোম। হাসতে হাসতে বন্ধুবর ব'ললেন—উহুঁ হোলনা বন্ধু, গীতার মর্ম্ম বুঝলেও নিরাসক্ত তুমি নও, ওটা তোমার ঝুট্ কথা। আসক্ত বলেই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সুধা পান ক'রতে চলেছ।

এতক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা প'ড়ল। কথা কইতে কইতে ডাঃ সোম ও আমি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কামরার দিকে এগিয়ে চললাম্। সোম বললেন—তোমায় বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এলাম, ঠিক সময়ে কিন্তু এসে প'ড়েছি।

আমি ব'ললাম্—কষ্ট করবার দরকার ছিলনা—পৌঁছেই পত্র দিতাম।

গাড়ী ছাড়বার শেষ ঘণ্টা প'ড়ল। হাতল ঘুরিয়ে নির্দ্দিষ্ট কামরায় উঠে পড়লাম্। গাড়ী চল্‌তে সুরু করেছে তখন। বন্ধুবর টুপিটা তুলে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

ই, বি, আর-এর গাড়ীগুলোর এক কম্পার্টমেণ্ট থেকে আর এক কর্ম্পাটমেণ্টে যাওয়া যায়। লম্বা করিডোরে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে গেছেন, প্রিয়জনদের হাত তুলে বিদায় জানাচ্ছেন, মেম সাহেবরা রুমাল উড়াচ্ছেন। সবটাই বিলিতি কায়দা। আমিও একটা জানালার ফাঁকে মাথা গলিয়ে অপস্রিয়মান প্লাটফর্ম্মের দিকে চেয়ে রইলাম্। বহু যাত্রী স্থানাভাবে গাড়ীতে উঠ্‌তে না পেরে হতাশভাবে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে চলমান দীর্ঘাকৃতি গাড়ীখানার দিকে চেয়ে রইল।

গাড়ী যখন বেশ জোরে চলতে সুরু করেছে তখন সত্যেন বাবু ডেকে বললেন—মাথাটা অমন বার করে না দাঁড়ানই ভাল। ভিতরে এসে বোস।— তাঁর আদেশ মত ভাল ছেলেটির মত একটা জায়গা দখল ক'রে বসলাম্।

আমাদের কামরায় জন আষ্টেক যাত্রী। ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র বসু কন্যা ও জামাতাসহ শিলং চ'লেছেন। সেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কিছুকাল ধরে অবস্থান করছেন। তিনিও ডাক্তার—টিউবার কিউলেসিস সম্বন্ধে রিসার্চ্চ করতে গিয়ে নিজে ঐ ভয়াবহ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হোয়ে প'ড়েছেন—শিরদাঁড়াটি একেবারে অকর্ম্মণ্য হোয়ে গেছে। অনেক দিন সুইজারলাণ্ডে থেকে চিকিৎসা করিয়েছেন। কিন্তু ফল কিছু হয়নি। প্লাসটার অফ্ প্যারিস্ দিয়ে স্থানটা আবৃত করে রাখা হোয়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠবার, ঘাড় ফিরাবার বা নড়বার চড়বার উপায় আর নেই—হয়ত যতদিন জীবিত থাক্‌বেন ততদিন এমনি অবস্থাতেই কাটাতে হবে। ভদ্রলোক নিজে একজন বড় স্কলার, সুস্থ থাকলে হয়ত জনসমাজের অনেক কল্যাণই করতে পারতেন, কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ।

প্রাচীন এবং আধুনিক কালের যান বাহন—বহুদিন পূর্ব্বে এইপ্রকার ঘোড়ার গাড়ীই একমাত্র যান ছিল।

খানিক পরে এক হাসির ব্যাপার ঘটে গেল। একজন ভদ্রলোক স্ত্রীপুত্র এবং কন্যা নিয়ে কামাখ্যা দর্শনে চলেছেন। নিজে রেলওয়ের কর্ম্মচারী—শ দেড়েক টাকা মাইনে পান। ছুটীতে পাশ সংগ্রহ ক'রে তীর্থক্ষেত্রে পুণ্য অর্জ্জন করতে চ'লেছেন। ভদ্রলোক সকলের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় ক'রে জেনে নিতে লাগলেন কে কোথায় চলেছেন,—তার পর প্রশ্ন তুললেন কোন জন রেলের কোন্ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন। তাঁর ধারণা তাঁর মত সকলেই রেলওয়ের কর্ম্মচারী

এইখানে শিলং এর ৬টি রাস্তা আসিয়া মিলিয়াছে—রাস্তাগুলি বামদিক হইতে যথাক্রমে, পোষ্ট অফিসে যাইবার রাস্তা, লাবানের দিকে যাইবার রাস্তা, পাণ্ডু-গৌহাটী-শিলং রোড, পুলিস বাজার রোড, কুইণ্টন্ হল রোড এবং জেল রোড। ইহার মধ্যে লাবানের রাস্তাটী এবং কুইণ্টন্ হল রোড দেখা যাইতেছে না। এই স্থানটি আসাম কাউন্সিল হাউসের সম্মুখে এবং বিদেশ হইতে শিলংএ আগত প্রত্যেক যান বাহনকে ইহার উপর দিয়া যাইতেই হইবে। ইহাকে শিলং সহরের নার্ভ-সেণ্টার (Nerve Centre) বলা যাইতে পারে।

এবং পাস সংগ্রহ করে ছুটীতে বিদেশে হাওয়া খেতে চলেছেন। তাঁর এ ধারণাটুকু বুঝে নিতে কারুরই দেরী হোলনা—ভদ্র-লোকের প্রশ্ন শুনেই সকলেই সেটা বুঝে নিয়েছিলেন। একে একে সকলকেই ঐ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে যখন শুনলেন কেউই রেলের চাকুরে নয়, তখন তিনি বললেন—তা' মশাইরা যখন এত খরচ করে শিলং চলেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনাদের কলকাতায় বড় বাড়ী আছে এবং রোজগার পত্রও নিশ্চয়ই বেশ ভাল। আমরা সকলে মুখ টিপে হাসতে লাগলাম।

এক ভদ্রলোক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ তা আছে বৈকি! এ গাড়ীর সকলেই জজ ম্যাজিষ্ট্রেট। ভদ্রলোক বললেন—আমারও তাই মনে হোয়েছিল মশাই, রেলে চাকরী না করলে দেশ বিদেশে বেড়ান তো সোজা নয়। এইবার ভদ্রলোকের ডাঃ বসুর উপর নজর পড়ল। ডাঃ বসু অত্যন্ত সাদা সিধে পোষাক পরেছিলেন—ভদ্রলোকের কেমন যেন ধারণা হোয়ে গেল ইনি নিশ্চয় রেলের গার্ড টার্ড হবেন। ডাঃ বসুর দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বিড়ি টানতে টানতে বললেন—আপনাকে কিন্তু রেলের কর্ম্মচারী বলেই মনে হচ্ছে—মশাই বোধ করি এই লাইনেই কর্ম্ম করেন। আমরা আর হাসি চেপে রাখতে পারলামনা, ডাঃ বসুর কন্যা মুখে রুমাল দিয়ে হাসতে লাগলেন, আর জামাতা জানালার বাইরে মুখ বার করে হাসি চাপায় উদ্যত হলেন। ডাঃ বসু কিন্তু বেশ নির্ব্বিকার মুখে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আজ্ঞে না, আমার বাপ,পিতামহ থেকে আরম্ভ করে আমি পর্য্যন্ত কেউই কখন রেলে চাকরী করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিনি।

যে ভদ্রলোক বলেছিলেন—এ গাড়ীর সবই জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি একটু উষ্মাযুক্ত কণ্ঠে বললেন—আরে মশাই তো দেখছি আচ্ছা লোক—রেলের চাকরী আমরা পাব কোথা থেকে, আপনি যদি একটা জোগাড় ক'রে দেন তো না হয় করি।

ভদ্রলোক কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করে ডাঃ বসুকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন—তবে মশায়ের কী করা হয়? ডাঃ বসু পূর্ব্ববৎ গম্ভীর গলায় বললেন, কিছুই নয়।

যে ভদ্রলোক চাকরী জোগাড় করে দেবার কথা বলছিলেন, তাঁর নাম অতুল প্রসাদ চন্দ—ইনি রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের পুত্র Burn Co-তে Accounts Departmentএ Auditএর কাজ করেন। অতুলচন্দ ভদ্রলোকের কথা শুনে

বেশ খানিকটা বিরক্ত হোয়ে উঠেছিলেন। ধৈর্য্য রাখতে না পেরে চন্দ সাহেব বললেন—আপনাকে তো বললাম, আমাদের কেউই রেলে চাকরী করেন না—ডাঃ কার্ত্তিক বসুর নাম শুনেছেন? ভদ্রলোক—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, ওই তো আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে Dr. Boses Laboratoryর ডাঃ কার্ত্তিক চন্দ্র বসু—তাঁর নাম আর শুনিনি।

চন্দ সাহেব—ইনিই সেই ডাঃ বসু।

ভদ্রলোক এইবার মহা অপ্রস্তুতে পড়লেন। বিপদগ্রস্তের মত দু'হাত জোড় ক'রে ডাঃ বসুর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নানা রকম ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রলেন, এবং ডাঃ বসুর মত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হওয়ায় তাঁর যে কত বড় সৌভাগ্য ঘটেছে তাই বার বার করে জানাতে লাগলেন। ভদ্রলোকের ভঙ্গী দেখে আর একবার সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল। ডাঃ বসু কম কথার মানুষ, তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে ভদ্রলোকের স্তুতি শুনে গেলেন, কিছু বল্‌লেন না।

রেলে যাতায়াতের সময় এরকম সহযাত্রী পেলে সময় মন্দ কাটেনা। আমরাও ভদ্রলোকের সঙ্গ সুখ অনুভব ক'রে বেশ আনন্দ লাভ ক'রতে লাগলাম।

তার পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। রাত দশটা আন্দাজ আসাম মেল পার্ব্বতীপুর পৌঁছাল। এইখানে গাড়ী বদল ক'রে মিটার গেজের শিলং মেলে উঠ্‌তে হবে। পার্ব্বতীপুরে পৌনে একঘণ্টা অপেক্ষা ক'রতে হয়। গাড়ী বদল ক'রে শিলং মেলে ওঠা গেল—তারপর খাওয়া সেরে অমূল্য সেন ও সমর দের সন্ধানে কামরা থেকে নেমে প্লাটফর্ম্মে ঘোরা-ঘুরি ক'রতে লাগলাম। অমূল্য ভায়ার দর্শন পাবার জন্য প্রত্যেক কামরায় মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌তে লাগলাম্। হঠাৎ পুরাতন বন্ধু নৃপেন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বীণা চট্টোপাধ্যাকে দেখতে পেলাম একটা কামরায়। নৃপেনের সঙ্গে পরিচয় পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে এম্-এ পড়বার সময়। এখন সে লাহোরে ডি, এ, ভি, কলেজের ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপক। বহুদিন পরে দেখা কাজেই তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার বাসনাটা প্রবল হোয়ে উঠ্‌ল। নৃপেনকে আস্‌ছি ব'লে নিজেদের কামরায় ফিরে গিয়ে সত্যেনবাবুকে ব'লে এলাম—একজন পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোয়েছে, আমি কয়েকটা কামরা পরেই রইলাম।

ফিরে এসে নৃপেনদের কামরায় উঠে পড়লাম্। নৃপেন ছাত্র হিসাবে খুবই ভাল ছিল।

বহুদিন পরে অর্থাৎ প্রায় বছর তিনএক পরে নৃপেনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দটা খুবই হোল। নানা কথাবার্ত্তায়

আসাম কাউন্সিল হাউস—সম্মুখের দৃশ্য।

সময়টা কেটে গেল। রাত বারটায় নৃপেন ও শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় রংপুরে নেমে গেলেন। যাবার সময় লাহোরে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন।

এ কামরায় আর দুটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোল। একজন হোচ্ছেন ছাপরার উকিল মিঃ কপিল দেও নারায়ণ সিংহ, অপরজন ডাঃ চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়—ইনি মন্দার হিলসে থাকেন এবং সেখানেই প্র্যাকটিস্ করেন। এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে মাসখানেকের জন্য সস্ত্রীক শিলং বেড়াতে চলেছেন। সিংহজীও আমাদেরই পথের পথিক—ভদ্রলোক খুব আমুদে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমার সঙ্গে এমন আলাপ জমিয়ে ফেল্‌লেন যে রাত্রিটা তাঁর সঙ্গেই এক কামরায় গল্প স্বল্প ক'রে কাটাতে হোল।

এ গাড়ীতে আর একজন ভদ্রলোক তাঁর দুই বোনকে নিয়ে শিলং বেড়াতে চ'লেছেন। এঁদের সঙ্গেও খুব আলাপ জমে উঠ্‌ল। ভদ্রলোকটির নাম নির্ম্মলকুমার মিত্র আর তাঁর ভগ্নীদ্বয়ের নাম শ্রীমতী লতিকা ও শ্রীমতী শেফালিকা। এঁরা, দু' বোনেই কলকাতায় কলেজে পড়েন—প্রথম জন বি-এ এবং দ্বিতীয়জন আই, এ। নির্ম্মলবাবুর পেশা ওকালতী।

খ্রীষ্টানদিগের "প্রেস্‌ বিটেরিয়ান্‌" গীর্জ্জা।

কথায় কথায় জানা গেল নির্ম্মলবাবুর এক বন্ধু রাধাভূষণ বসু শিলংয়েই রয়েছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে থেকে তিনি হাওয়া বদলের উদ্দেশে শিলং স্বাস্থ্য-নিবাস হোটেলে অবস্থান ক'রছেন। রাধাভূষণ বাবুকে আগেই চিঠি লিখে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া ক'রে রাখবার কথা জানান হোয়েছে। মিঃ বোস লাবানে তাঁদের জন্য একটা ছোট বাড়ী ঠিক্‌ও ক'রে রেখেছেন। মুসাফিরের ডায়রীকে যিনি চিত্রিত করেছেন তিনিই হোলেন নির্ম্মলবাবুর বন্ধু এই রাধাভূষণ বসু। আমার প্রথম সাক্ষাৎ এঁর সঙ্গে Shillong Commercial Carrying Coর Shillong Motor Stationএ। ইনি Incorporated Accountancy পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হোচ্ছেন, শীঘ্রই সাগর পারে পাড়ি দেবেন।

প্রথম সাক্ষাতেই আমাদের আলাপ ঘনীভূত হোয়ে উঠ্‌ল এবং এখন দেখলে কেউই মনে ক'রতে পারবেনা যে আমরা বহুকালাবধি পরিচিত নই। শিলং-এ যতদিন ছিলাম, অমলা ভায়া, সমর দে, অতুলচন্দ, সিংহজী আমি এবং বোস একটি ছোটখাট ব্যাটেলিয়নের মত ঘুরে ফিরে বেড়াতাম্‌। আমাদের বন্ধুত্ব একটি মধুর বন্ধনে যেন বাঁধা পড়ে গেল—একটি নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য্যভরা সম্পর্কে আমরা সম্পর্কিত হোয়ে উঠ্‌লাম্‌। প্রবাস বাসের সে দিনগুলি আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে চিরদিন অক্ষয় হোয়ে থাক্‌বে।

সমস্ত রাতটা এক রকম বিনিদ্রেই কাটল। ভোর ছটায় আমিনগাঁও ষ্টেসনে গাড়ী পৌছাল। এবার ব্রহ্মপুত্র পার হোতে হবে। ই, বি, আর-এর এক-খানা বড় ফেরি ষ্টীমার যাত্রীদের পারাপার করে। ষ্টীমারটি খুব বড় এবং সুন্দর। দিন্‌সা সোরাবজী এই ষ্টিমারে কেটারিং-এর কারবার করে। এদের রান্না বেশ মুখরোচক এবং শিলংযাত্রীদের অধি-কাংশই ব্রহ্মপুত্র পার হবার সময় এঁদের ভাসমান হোটেলে আহারাদির কাজটা সেরে নেন, কারণ কমার্সিয়াল ক্যারিয়িং কোম্পানীর বাস পাণ্ডু থেকে শিলং পৌছায় বারটা, সাড়ে বারটার পর। পৌছে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা একটা কঠিন কাজ এবং তাতে ঝঞ্ঝাটও অনেক। সুতরাং দিন্‌সা সোরাবজীর কারবার যে ভালই চলে সেটা বলা বাহুল্য মাত্র।

আমিনগাঁও পৌছে মালপত্র ষ্টীমারে ওঠানর জন্য কুলি পাওয়া এক সমস্যা হোয়ে দাঁড়াল। যত লোক গেছে তার অর্দ্ধেক কুলিও ষ্টেসনে নেই। দৌড়াদৌড়ি ক'রে গোটা চারেক কুলি তো সংগ্রহ করা গেল। মাঝ পথ থেকে অমূল্য ভায়া কোথা থেকে উদয় হোয়ে আমাদের একজন কুলিকে পাক্‌ড়াও ক'রে এক রকম হাত ধ'রে টান্‌তে টানতেই অদৃশ্য হোয়ে গেল। আমি চিৎকার ক'রতে লাগলাম্‌—ও অমূল্যদা, কুলি কটা অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি ছেড়ে দাও ভাই, অনেক মালপত্র—চারজন না হোলে আমার চলবেই না। অমূল্যদা সে কথা কানেই তুললে না—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা

হোল। সামনে দিয়ে আর দুটো কুলি দৌড়ে যাচ্ছিল, তাদের অমূল্যদার নীতি অনুসরণ ক'রে পাকড়াও করলাম। গোলমাল হৈ চৈ এর মধ্যে কোন রকমে মালপত্র নিয়ে ষ্টীমারে ওঠা গেল। অসম্ভবরকম ভীড়—একদিকে লোকের ভীড় আর একদিকে পর্ব্বত প্রমাণ মালপত্র, দাঁড়াবার জায়গা পাওয়াও কঠিন।

কামাখ্যায় তীর্থযাত্রীর ভীড় থার্ড ক্লাস ডেকের উপর ভেড়ার পালের মত কোন রকমে মাথা গুজে জায়গা ক'রে নিয়েছে। উপরে দোতলায় মেয়েদের উঠিয়ে দিয়ে নির্ম্মলবাবু আমি ও সিন্‌হা ইণ্টার ক্লাশের ডেকে কোন রকমে দাঁড়াবার জায়গাটা ক'রে নিয়ে মালপত্রের তদারক ক'রতে লাগলাম্।

ব্রহ্মপুত্র পার হোতে মিনিট পনের সময় লাগে। বড় ষ্টীমারটাকে একটা ছোট ষ্টীমার ঠেলে নিয়ে পাণ্ডু ঘাটে পৌঁছে দিলে। আবার ভীড়ের হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি সুরু হোল। ভীড় কমলে আমরা ধীরে সুস্থে মালপত্র দেখে শুনে নিয়ে ষ্টীমার ত্যাগ করলাম্। এবার কমার্সিয়াল ক্যারিয়িং কোম্পানীর অফিসে ভীড়। সমস্ত মাল ওজন করে লরিতে লগেজ ক'রে দিতে হবে। প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে কোন মালপত্র নেবার নিয়ম নেই —ছোট খাট এক আধটা এ্যাটাচি কেস্, এক আধটা ছোট টুক্‌রি ওভার কোট, ওয়াটার প্রুফ ও ছড়ি নেওয়া চলে। ইণ্টার ও থার্ড ক্লাসের প্রত্যেক টিকিটের উপর ১৫ সের এবং ফার্ষ্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাসে দেড়মণ ও তিরিশ সের বাদ দিয়ে যা হয় তার উপর সেরে এক আনা ক'রে লাগেজ ফেয়ার দিতে হয়। মালপত্র ওজন করে রসিদ নিয়ে প্রত্যেক প্যাকেজের উপর টিকিট লাগিয়ে ষ্টেসনে ফেলে গেলেই কোম্পানী যত্ন নিয়ে সমস্ত মাল শিলং পৌঁছে দেয়। কোম্পানীর ব্যবস্থা অতি সুন্দর, জিনিষ পত্র নষ্ট, হারান, ভাঙ্গা বা খোয়া যাবার সম্ভাবনা এঁদের হাতে খুবই কম। আমার সুটকেসে [illegible]—কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন জিনিষ পত্র খোয়া তো যায়নিই, এধার ওধার ছড়িয়েও পড়েনি। এসব বিষয়ে কোম্পানীর লোকেরা খুব হুসিয়ার এবং অনেষ্ট।

যাত্রীদের বাস গুলোও খুব মজবুত, বসবার ব্যবস্থাও বেশ ভাল। কলকাতার সবচেয়ে সেরা যে বাস তার চেয়ে ওদের থার্ড ক্লাস বাসও ঢের ভাল। চার রকম arrangement এঁদের আছে। ফার্ষ্ট ক্লাস যাত্রীরা কোম্পানীর মোটরে ক'রে যেতে পারেন। প্রত্যেক সিট পিছু ভাড়া ১৮৲ টাকা। সেকেণ্ড ক্লাস যাত্রীদের Mail Vanএ যেতে হয়। এর প্রত্যেক সিটের ভাড়া ১২৲ টাকা করে। ইণ্টার ক্লাস বাসের সিটের ভাড়া আট টাকা আর থার্ড ক্লাস সিটের ভাড়া ৪৲ টাকা। থার্ড ক্লাস এবং ইণ্টার ক্লাসের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। একটু আগে পিছে পৌঁছায় এই যা। প্রায় ৫০০ লরি বাস এবং মোটর কমার্সিয়াল ক্যারিয়িং কোম্পানীর আছে। প্রত্যেক খানি গাড়ীই সুন্দর এবং মজবুত। ড্রাইভারগুলিও খুব হুঁসিয়ার এবং এক্সপার্ট—বেতনও এরা পায় বেশ মোটা রকমের। এক একজন ড্রাইভারের বেতন ১৫০৲ থেকে ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত। মাঝে মাঝে চেকিং সিষ্টেমও আছে। পাহাড়ে রাস্তা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল—পথ ক্রমেই উঁচুর দিকে চলেছে, প্রত্যেক দশ পনের হাত অন্তর বাঁক—এক ধারে খাড়াই পাহাড় আর একধারে অতলস্পর্শী গহ্বর। কোন

শিলং পোষ্ট অফিস—রাস্তা হইতে একটু নীচে অবস্থিত বলিয়া কেবল শীর্ষদেশ দেখা যাইতেছে। এই স্থানে শিলং Sea-level হইতে ৪৯০৮ ফীট উচ্চে।

রকমে বে-হুঁসিয়ার হোলেই যাত্রীদের জীবননাট্যের যবনিকা-পাত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু রাস্তাগুলি সুন্দর, মাঝে মাঝে

মেসার্স কমার্শিয়ল্ ক্যারিইং কোম্পানী লিমিটেডের ডাকবাহী বাস্‌টি (Mail Van) শিলং পোষ্ট অফিসে ডাক লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বাস্‌টির সম্মুখ ভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের বসিবার স্থান। প্রত্যহ বেলা ২টার সময় কলিকাতাগামী ডাক যায়।

এস্‌ফালটাম্, মাঝে মাঝে লালরঙের পারে বিছান পথ— ক্রমাগত উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। হাই স্পীডে গাড়ী উপরের দিকে ছুটে চ'লেছে, পিছনে পথ নিচের দিকে গড়িয়ে গেছে। এইমাত্র যেখান দিয়ে গাড়ী ছুটে চ'লেছে তারপর মুহূর্ত্তে উপর থেকে সে পথের দিকে তাকালে আতঙ্ক উপস্থিত হয়—কত নিচে থেকে কত উপরে চলে এসেছি—লুপ থেকে লুপে গাড়ী যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চ'লেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে ভয়ঙ্করের হাত থেকে যেন সে দৌড়ে চলেছে। Up-up-up hills—ক্রমাগতক উপরের দিকে উঠে চলেছি—সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি। বাসের দোলানীতে অনেকে বমি ক'রতে সুরু করে দিলে, অনেকে মাথা নিচু ক'রে চোখে বুজে সামনের সিটের ব্যাকে মাথা রেখে বসে রইল।

যন্ত্রদেবতা অজেয়কে জয় করেছে—দুর্গমকে সুগম করেছে—প্রকৃতির দুর্ভেদ্য রম্যস্থানে মানুষ সৃষ্টি ক'রেছে তাদের বিলাসকুঞ্জ, ভয়ঙ্করের মূর্ত্তিকে মানুষ রূপ দিয়েচে আনন্দের।

গৌহাটি শিলং রোডের দৃশ্য অতি মনোরম, অপূর্ব্ব, অনুপম। পাহাড়ের মাথায় মানুষের তৈরী পথ, তার নিচে গভীর খাদ, মাঝে বেগবতী পর্ব্বত-নির্ঝরিণী পার্ব্বত্য নদীর আকারে ছুটে চলেছে যেন কোন অজানা প্রিয়তমের অভিসারে—তার পায়ে পায়ে বাজছে অবিশ্রান্ত নুপুর শিঞ্জিনী—ও পারে শ্যামায়মান ঘন-পল্লবিত গভীর বন—যাকে ভেদ করে সূর্য্যরশ্মিও পাহাড়ের বুকে খরতাপের স্পর্শমাত্র দিতে পারেনা। মাঝে মাঝে প্রচুর বাঁশবন, নানারকম লতা, বিরাটকায় বন্য তরুশ্রেণী, লাল নীল শাদা কত রকমের বন্য ফুল, ছবির মত চোখের সামনে ভেসে ভেসে চলেছে—গতির তালে তালে সামনের দৃশ্য পিছনের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। অজস্র ঝরণা অবিরল ধারায় পাহাড়ের বুক থেকে নেমে আসছে পার্ব্বত্য নদীর বুকে

শিলং এ ইউরোপীয়গণের ক্লাব।

অভিসার যাত্রাকে শক্তি দিতে। একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার কণ্ঠ সঙ্গীত সেই প্রবহমান জলরাশির সঙ্গে যে কি

সেক্রেট্যারিয়ট্ বিল্ডিংসের একটি বাড়ী—সম্মুখে যুদ্ধে মৃত সৈনিকদিগের স্মৃতিস্তম্ভ।

মধুর সুর লয়ের সৃষ্টি ক'রেচে তা শুধু অনুভবীর কানেই এক অনুভূতির আনন্দ-রাজ্য সৃষ্টি করতে পারে। প্রকৃতির সে রূপ আমার চোখকে করে তুলল মোহমুগ্ধ, আমার অন্তর হোল চরিতার্থ, আমার মন হোল রূপ-পাগল। বোধ করি প্রত্যেক যাত্রীরই সেই অবস্থা—কারো মুখে কোন কথা নেই—শুধু চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে বিস্ময়, রসানুভূতির গভীর আনন্দ প্রত্যেকেরই মুখের উপর উঠেছে ভেসে। বিপদসঙ্কুল পথের ভীষণতার ছবি তখন কারো মনকে আতঙ্কিত করে তোলেনি —এটা নিশ্চয় করে বলা যায়। প্রতিমুহূর্ত্তে যে পথ আমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে সেই পথের রূপ যে এত অপরূপ হোতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

বেলা দশটা আন্দাজ আমরা নংপো ব'লে একটা জায়গায় পৌছালাম। এখানে বাস আধ ঘণ্টাটাক দাঁড়ায়। ছোট একটি গ্রামও বলা চলে, সহরও বলা চলে। পথের দুধারে চায়ের দোকান। খাসিয়া মেয়েরা নানা রকম ফল মূল নিয়ে পথের উপরেই দোকান সাজিয়ে বসেছে। যাত্রীরা অনেকেই নেমে এধার ওধার ঘুরতে লাগল,—অনেকে চায়ের দোকানে ঢুকে চায়ের তৃষ্ণা নিবারণ করতে লাগলেন। আমি ও প্রতিমাদি নেমে কিছু ফল মূল কেনবার চেষ্টায় একটি খাসিয়া মেয়ের দোকানের কাছে দাঁড়ালাম্। মেয়েটি ভাঙ্গাভাঙ্গা হিন্দী জানে বলে মনে হোল। পেয়ারার দাম জিজ্ঞাসা করলাম—বললে "পাসথ্"। বুঝলামনা—আশা ছেড়ে দিয়ে কলার দর জিজ্ঞাসা

শিলং-এর লেক—কমিশনার ওয়ার্ড সাহেবের নামানুসারে ইহার নাম রাখা হইয়াছে, ওয়ার্ড লেক। লেকটি কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ঢাকুরিয়া লেকের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ—একেবারে একখানি ছবি।

করলাম, এক ডজনের দাম বললে "সার আনার"—বুঝলাম চার আনা চায়। শেষে দুআনায় কলাগুলো কেনা গেল। আর

এক পসারিণীকে পেয়ারার দাম জিজ্ঞাসা করলাম্, সেও বললে "পাস্থ্"—এবারও বুঝলাম না। কাছেই একজন ড্রাইভার

ওয়ার্ড লেকের আর একটি দৃশ্য—দূরে আসাম গভর্ণমেণ্ট হাউসের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে।

দাঁড়িয়ে ছিল সে ব'ললে পয়সায় পাঁচটা। এক পয়সার পেয়ারা কেনা গেল।

গাড়ীতে ফেরবার সময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—একটি বছর চারেকের আদম শিশু একমুঠো বিড়ি একহাতে ধরে আছে, অপর হাতে একটি জলন্ত বিড়ি, মাঝে মাঝে জোরসে টান দিচ্ছে আর নাক মুখ দিয়ে ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া উদ্গীরণ করছে। আমি ও প্রতিমাদি দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রতিমাদি বললেন— ওমা এই-টুকু ছেলের কাণ্ড দেখ—কি রকম বিড়ি খাচ্ছে। আমি ছেলেটার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। সে দৃক্পাত না ক'রে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। আরো দুএকজন লোক সে দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে গেল। ব্যাপার দেখে বোধ হয় বাচ্ছা আদমের লজ্জা হোল, বিড়িটাকে ফেলে দিয়ে তার মায়ের পিঠের উপর মুখখানা লুকিয়ে ফেললে। তার মা হি হি করে হাস্‌তে লাগল। সেই ড্রাইভারটি বললে—বিড়ি খাওয়াটা এরা শিশু অবস্থা থেকেই শেখে—হয়ত ঠাণ্ডা বাঁচাবার জন্য এরা এটায় অভ্যস্ত হোতে চায়।

গাড়ীতে হর্ণ বাজতে লাগল—গাড়ী ছাড়বার নিশানা ওটা। সুতরাং গাড়ীতে ফিরে গিয়ে ব'সতে হোল। আবার সুরু হোল সেই romantic drive—৬৩ মাইল পথের অর্দ্ধেকও এখনও আসা হয়নি। এইবার আরো stiff climbing সুরু হোল। স্পীডের মুখে গাড়ী উপরে উঠ্ছে, নিম্নভূমি ক্রমাগতক পিছিয়ে প'ড়ছে, চড়াই উৎরাই-এর মুখে বাস যেন সমুদ্রের বুকে জাহাজের মত দুলছে—প্রকৃতির calm and serene রাজ্যে মানুষের অভিযান,—বুদ্ধিবৃত্তি, শক্তি আর যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতির নিস্তরঙ্গ নীরবতাকে মানুষ খণ্ড বিখণ্ডিত ক'রে সুন্দরী শিলং-এর বুকে এক মায়ারাজ্য গড়ে তুলেছে। আমরা চ'লেছি সেই দেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যার বুকে "শেষের কবিতার" হার

ওয়ার্ড লেকের আর একদিকের দৃশ্য—বাঁধ দিয়া জল আটকান আছে—অতিরিক্ত জল বামদিক হইতে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়।

ভুলিয়েছেন। 'শেষের কবিতার' 'অসিত' 'লাবণ্য' মিলেছিল এই শিলং-এর অপরূপ মাটীতে—তাদের প্রেম জন্ম নিয়েছিল পাহাড়ের কোলে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে—তাই শিলং আমার কাছে শেষের কবিতার দেশ। মনে মনে একটা স্বপ্ন পথ এঁকে বেঁকে চ'ল্ল। তিন হাজার ফুট পার হবার পর সুরু হোল পাইনের জঙ্গল—ঠাণ্ডা বাতাস মুখে চোখে আছাড় খেতে লাগল। পাইনের সার মাথা তুলে মর্ম্মরিত ভাষায় আমাদের জানাতে লাগল স্বাগত সম্ভাষণ। মেঘ, ছায়া,
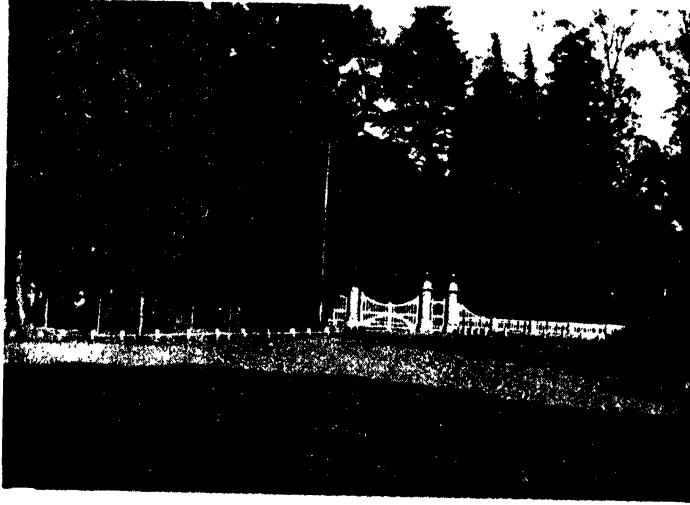
আসাম গভর্ণমেণ্ট হাউসের গেট—পাইন গাছ ও বাঁশ ঝাড় দ্রষ্টব্য।

জেগে উঠল, যত নিকটে আস্‌ছি ততই যেন একটা কল্পনার দোলায় মন দু'লছে। মনের মধ্যে শিলং-এর একটা ছবি ধীরে ধীরে আপনা হোতে গ'ড়ে উঠ্‌তে লাগল। যতই নিকটস্থ হচ্ছি ততই যেন সে কল্পনার রূপ সত্য হোয়ে দেখা দিচ্ছে—প্রকৃতির সে বন-রাজ্যে মন যেন হারিয়ে যায়, চেতনা যেন পাখা মেলে উড়তে আরম্ভ করে।

বড়পানি বলে একটা বড় নদী পথের নীচ দিয়ে এঁকে বেঁকে বহুদূর চলে গেছে,—তারই তীর দিয়ে এবার যেন আলো, অন্ধকারের খেলা সুরু হোল যত উপরে উঠছি। দূরে দিগন্তে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত পাহাড়ের শ্রেণী শূন্যের বুকে ঢেউ দিয়ে দিক্‌হীন কোন অজানা রাজ্যে মিলিয়ে গেছে—যেন সঙ্গীতের তালের মত অসম রেখার মত পাহাড়ের বুকে বুকে অসমতার রেখা ব'হে গেছে—সে যেন প্রকৃতির সঙ্গীতের রেখা চিহ্ন।

পাহাড়ের পর পাহাড় এমনি ক'রে পার হোয়ে শিলং পৌছালাম্ বেলা ১২টার সময়।

(ক্রমশঃ)

মৃণাল সর্ব্বাধিকারী

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ডাঃ আম্বেদকর ও হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

বম্বে প্রাদেশিক অনুন্নত সম্প্রদায় সম্মিলনের মাসিক অধিবেশনে, সভাপতি ডাঃ আম্বেদকরের পরামর্শানুসারে সভায় সমবেত প্রায় দশ সহস্র লোক হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের অনুন্নত জনসাধারণের মধ্যে যে ক্রমেই আত্মচেতনা জাগিতেছে, বর্ত্তমানের হীনাবস্থায় যে তাঁহারা কোনও ক্রমে আর থাকিতে চাহিতেছেন না, ইহা তাহার পরিচয় হইলেও, এইরূপ কোনও সঙ্কল্প ব্যাপকভাবে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না। দেশের নানাস্থান হইতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহার প্রতিবাদও জানাইয়াছেন।

ধর্ম্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার না হইয়া রাষ্ট্রিকও সামাজিক বিভাগের ভিত্তিস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া এবং এই প্রকার বিভাগকে এখনও জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া এই প্রকারের প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে।

ডাঃ আম্বেদকর নিজে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছেন এবং অপর সকলকেও এই প্রকার পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা এই ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিলে দেশের এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের কতটা লাভ হইবে তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

ডাঃ আম্বেদকর যদি মাত্র নিজে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে ইচ্ছুক হইতেন, তাহাতে অন্য লোকের বিশেষ কিছু বলিবার থাকিত না। তবে তাহার মূলে অধিকতর সম্মান, প্রতিষ্ঠা এবং সুবিধা লাভের আশা থাকিলে (যেমন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আছে) তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকিত। ডাঃ আম্বেদকর যে সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছেন, তিনি হিন্দু না হইয়া অন্য ধর্ম্মের লোক হইলে তাহা অধিকতর পরিমাণে লাভ করিতে পারিতেন বলিয়া আমরা মনে করি না এবং ইহাও মনে করিনা যে, তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে এই সকল সুবিধা তাঁহার কিছুমাত্র বাড়িয়া যাইবে।

ইঁহার কিছুসংখ্যক অনুচর যদিও ধর্ম্মান্তর গ্রহণে ইঁহার অনুবর্ত্তী হন (অবশ্য এরূপ সম্ভাবনা নাই) তবুও, অনুন্নত সম্প্রদায়ের সকল, অধিকাংশ, বা বহু সংখ্যক লোকের পক্ষে এই পন্থা অনুসরণের সম্ভাবনা নাই। কাজেই, ইঁহাদের কার্য্যের দ্বারা সমগ্র অনুন্নত সম্প্রদায়ের দুঃখ দূর হইবার আশা নাই বরং তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকিবে! যাঁহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদেরও সুবিধা ও অধিকার যে কতটা বাড়িবে তাহা তাঁহারা এদেশীয় অশিক্ষিত খৃষ্টান বা মুসলমানদের সহিত ঐ সকল সম্প্রদায়ের এবং সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষিত ধনবান এবং অভিজাতদের সম্পর্ক কি প্রকারের তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

সমগ্র দেশের দিক দিয়াও এই কার্য্য কিছুমাত্র লাভজনক হইবে না। হিন্দু সমাজের অসংখ্য বিভাগ এবং অসংখ্য প্রকারের বৈষম্য দেশের সর্ব্বপ্রকার প্রগতির পক্ষে যে অন্যতম প্রধান অন্তরায় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু কয়েক সহস্র বা কয়েক লক্ষ লোকের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলে এই অবস্থার অবসান হইবে না। মুসলমান, খৃষ্টান, বা বৌদ্ধদের সংখ্যা কিছু বাড়িলে এবং হিন্দুদের সংখ্যা কিছু কমিলে দেশের সমস্যা কিছু মাত্র কমিবে না। যদি এরূপ আশা করা হইয়া থাকে যে, ইহাদ্বারা হিন্দুসমাজ এতটা আঘাত প্রাপ্ত হইবে যে, তাহার ফলে ইহার সকল ত্রুটি সংশোধিত হইবে,

তাহা হইলেও সে আশা এই জন্য বৃথা যে, হিন্দুসমাজে এরূপ ঘটনা নূতন নহে।

অস্পৃশ্যতা এবং অন্যান্য অন্যায় বৈষম্য যে মনুষ্যত্বনাশকারী এবং হীনতাসূচক, ইহা দূরীভূত হইবার উপর যে জাতীয় উন্নতি বহু পরিমাণে নির্ভরশীল, তাহা সত্য হইলেও, একথাও সত্য যে, শিক্ষা এবং অন্যান্য সংস্কারের উপরও পরিপূর্ণ সাম্য অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। ইহার জন্য সমগ্র ও সর্ব্বতো-মুখী চেষ্টার প্রয়োজন হইবে।

হিন্দুসমাজও যে এ বিষয়ে ক্রমেই সচেতন হইয়া উঠিতেছে, তাহা অনুন্নতদের উন্নয়নের জন্য দেশের সর্ব্বত্র যে বহুমুখী চেষ্টা ও আন্দোলন চলিতেছে, তাহা হইতেই পরিস্ফুট হইবে। অঘটন যে কোথাও ঘটিতেছে না, তাহা নহে, তবে পরিবর্ত্তনের সময় ইহা অনেকটা অনিবার্য্য। এই প্রকারের ঘটনা হইতে দেশের সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ নাই।

অবশ্য, হিন্দুসমাজের অবিচার ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার গুরুত্বকে কিছুমাত্র লঘু করিবার ইচ্ছা নাই। ইহা যে সকল মানুষের মর্য্যাদাজ্ঞানকে আঘাত করে, তাহাকে ছোট ও হীন করিয়া রাখে, তাহার মনুষ্যত্বকে সঙ্কুচিত করে, ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিক্রিয়া যে স্বাভাবিক, বর্ত্তমান ঘটনাটি যে অবস্থার গুরুত্বের পরিচায়ক, একথা প্রত্যেক হিন্দুকে মনে রাখিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে সমাজের অত্যাচারে ও সঙ্কীর্ণতায় নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বহু হিন্দু সব সময়েই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছেন। কোন বড় ঘটনা হইলে তাহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।

হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিচিত্রায় যে সকল কথা বলা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহার পুনরুক্তি আশা করি দোষের হইবে না।

যাঁহারা হিন্দুদের বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায়, বা কোনও শ্রেণী বিশেষের আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিতে উদ্যত হন তাঁহাদের জানা দরকার যে, কোনও সমাজেই পরিপূর্ণ অধিকার ও ব্যবহার-সাম্য নাই। বাহির হইতে কোনও সমাজের ভিতরের পরিচয় সঠিক পাওয়া যায় না; ধর্ম্মান্তর গ্রহণে যে সকল সুবিধা পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রথমে মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রেই পরে সে ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

তাঁহাদের ক্ষোভের কারণ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে নয়, বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অথবা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অন্য কতকগুলি লোকের অথবা শ্রেণীর বিরুদ্ধে। কাজেই, এরূপ ব্যাপারে কারণ ও ব্যবস্থার ঐক্য থাকে না।

আমাদের কোনও সামাজিক ব্যবস্থা অন্যায়, অপমানজনক বা অকল্যাণকর হইলে, তাহার সহিত সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া, এমন কি জীবন পণ করিয়াও লড়া মানুষোচিত। কিন্তু, তাহার জন্য ধর্ম্মত্যাগ করিতে যাওয়া কাপুরুষতার পরিচায়ক, অন্যায় এবং অমানুষোচিত। ভারতবর্ষ পরাধীন এবং অন্য অনেক দেশ অপেক্ষা অনগ্রসর বলিয়া যদি কেহ এই দেশের উন্নতির চেষ্টা না করিয়া দেশত্যাগকে শ্রেয় বলিয়া মনে করেন, তাহা যেমন সমর্থন যোগ্য হইতে পারে না, কোনও অসুবিধার জন্য সমাজ বা ধর্ম্মত্যাগও তেমনই সমর্থন যোগ্য হইতে পারে না।

সর্ব্বোপরি আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল্য জাগতিক সুবিধা অসুবিধা অপেক্ষা অনেক অধিক। কোনও প্রকার সাংসারিক কারণে ধর্ম্মত্যাগ কোনও প্রকারের ধর্ম্ম বা নীতির অনুমোদিত নহে। ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক মূল্য বাদ দিয়াও একথা বলা যায় যে, ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার সহিত আমাদের মনের অনেক নিগূঢ় ভাব ও অভ্যাসের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, তাহার সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন হইলে যে আঘাত পাইতে হয়, তাহার রূঢ়তা পূর্ব্বে কল্পনাতীত থাকে।

এই সকল কথা ব্যতীত এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা এই বলিবার আছে যে, হিন্দু সমাজের সকল প্রকার অন্যায় ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য দেশময় আন্দোলন এবং চেষ্টা চলিয়াছে। আশা করা যাইতে পারে যে, ইহার ফলে হিন্দুধর্ম্ম সকল প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি হইতে মুক্ত হইয়া সকল মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে স্বীকার করিবার মত শক্তি লাভ করিবে।

যাঁহারা আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে বিশেষ বেদনাদায়ক মনে করেন, সংস্কার আন্দোলনের যাহাতে শক্তিবৃদ্ধি হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের তাহাই করা উচিত।

যদি কেহ এই কথা মনে করেন যে, যে সকল লোকের অন্যায় আচরণে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে সেই সকল লোক জব্দ হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, যে সকল লোক আজও অন্যায় আচরণ করিবার জন্য জেদ করিতেছেন, ধর্ম্ম বা সমাজের ক্ষতিতে তাঁহারা বিচলিত বা জব্দ হইবার লোক নহেন।

সাম্প্রদায়িকতার মাপ কাঠি

কোনও প্রতিষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক কিনা, তাহা সেই প্রতিষ্ঠানের নীতি কার্য্য ও আদর্শ হইতেই মাত্র জানা যাইতে পারে। প্রতিষ্ঠান কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক লইয়া গঠিত, অথবা তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোক সমানুপাতে আছেন প্রভৃতি কথা তাহার সাম্প্রদায়িকতা বা অসাম্প্রদায়িকতার বিচার সম্পর্কে অনেকটা অবান্তর। দেশের রাজসরকারের অধিকাংশ লোক এই দেশের সকল শ্রেণীর মধ্য হইতে গৃহীত হইলেও, যেমন এই সরকারকে আমরা জাতীয় প্রতিনিধিমূলক বলিতে পারি না, তেমনই আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মাত্রকেই আমরা অসাম্প্রদায়িক আখ্যা দিতে পারি না। আবার অন্যদিকে কোন প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও নীতি যদি সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক হয়, অথচ তাহা প্রধানতঃ কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক লইয়াই গঠিত হয় তবে, সেই প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া মনে করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে, এরূপক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করিবার মত লোক সকল সম্প্রদায়ে নাই বা পাওয়া যায় নাই।

এই কারণে যখন কংগ্রেসকে, যে জন্যই হউক, কেহ হিন্দু কংগ্রেস বলিয়া থাকেন তখন, কংগ্রেসসম্পর্কে সাধারণ লোকের মনে ভুল উৎপাদন করা হইয়া থাকে। কংগ্রেসের নীতি যতক্ষণ সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে আছে ততক্ষণ ইহাকে সাম্প্রদায়িক বলা যাইবে না। বরং কংগ্রেসের অধিকাংশ লোক হিন্দু বলিয়া অন্যান্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে ইহাকে অনেক সময় অন্যায় দুর্ব্বলতা দেখাইতে হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক ও আর্থিক সমস্যা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সোসালিস্ট সম্মিলনের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলাদেশেও এই সমস্যা প্রধানতঃ আর্থিক সমস্যা। মুসলমানেরা প্রায় সকলেই প্রজা এবং জমিদারেরা প্রায় সকলেই হিন্দু বলিয়া এই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। শ্রেণীগত এবং সাম্প্রদায়িক সীমানা এখানে এক বলিয়া জমিদার এবং প্রজার দ্বন্দ্বকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হইয়াছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা যে শ্রেণী সমস্যারই নামান্তর একথা আংশিকভাবে মাত্র সত্য হইতে পারে। এখানকার সাম্প্রদায়িক সমস্যা যে বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িক সমস্যার আকারেই দেখা দেয় এবং সেই ভাবেই কাজ করে তাহা বাংলার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাগুলির ইতিহাস লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে। বাংলার সম্প্রদায়গুলির মনোভাব যাঁহারা জানেন, অত্যন্ত ছোট খাটো ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়া একই শ্রেণীর মধ্যে কিভাবে সাম্প্রদায়িক মনকষাকষি চলে তাহার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা এখানে কতটা তীব্র এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব এখানে কতটা দৃঢ়মূল। পল্লীতে অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যপার সমূহ লইয়া হিন্দু ও মুসলমান কৃষকের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় তাহা পরিণতি লাভ করে। গোহত্যা মসজিদের সম্মুখে বাদ্য এবং অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া বহুবিরোধের সৃষ্টি হয়। সহরেও একই শিক্ষিত শোষক শ্রেণীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সব ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়াই বিরোধের উৎপত্তি হয়। এই সকল বিরোধে যাহারা জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তাহারাও অধিকাংশক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি বিশিষ্ট লোক। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি জনসাধারণের মধ্যে এখনও এতটা তীব্র যে, কোন ব্যক্তিগত কারণে যদি দুইজন লোকের মধ্যে বিরোধ ঘটে এবং ঘটনাক্রমে তাঁহাদের একজন হিন্দু ও অন্যজন মুসলমান হন তবে, সেই বিরোধ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আকারে তৎক্ষণাৎ সাম্প্রদায়িক আকার গ্রহণ করে।

পাশাপাশি বাস করিয়া মানুষ পরস্পরের সম্বন্ধে কখনই নিরপেক্ষ ঔদাসীন্য দেখাইতে পারে না। যদি সংযোগ সহযোগিতা ও সম্প্রীতি না থাকে তবে, প্রতিযোগিতা ও পাল্লাপাল্লির ভাব সহজেই আসিয়া পড়ে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগত স্বার্থবুদ্ধি প্রবল হয় এবং যে কোন সময়েই এবং সুযোগেই ইহা বিরোধের আকারে দেখা দেয়।

একথা অবশ্য সত্য যে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কল্পনা এবং ভিত্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কৃত্রিম; শ্রেণী স্বার্থবোধ বা জাতীয়তাবোধের প্রসারের সহিত এই মনোভাব দূর হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাকে অস্বীকার করিয়া লঘু করা যাইবে না বা ইহাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। কাজেই, অন্যান্য চেষ্টার সহিত, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করিয়া, তাহার কারণ গুলি অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; নহিলে অন্যান্য পথে অগ্রসর হওয়া শক্ত হইবে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদ ভাল নহে

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় হিন্দুদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা প্রতিবাদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ বলিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় ২।১টি আসন কম পাইল বা বেশী পাইল, তাহার সহিত স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন সম্পর্ক নাই। হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকলেই ভারতবাসী; আসনের যদি কোন উপকারিতা থাকে, তবে, হিন্দু, মুসলমান, শিখ যাঁহারাই অধিক পান না কেন, তাঁহারা সকলেই ভারতবাসী বলিয়া তাহাতে ভারতবাসীদেরই লাভ হইবে।

কিন্তু সমস্যাটি সম্ভবতঃ এতটা সরল নহে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর দিক হইতেছে যে, ইহাতে কাহাকেও কম সুবিধা এবং কাহাকেও বেশী সুবিধা দেওয়া থাকায়, ইহা সম্প্রদায়গুলির ভিতর বিদ্বেষ ও স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি জাগাইয়া রাখিবে; যাঁহারা বেশী সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারা তাহা রক্ষা করিবার জন্য জনসাধারণের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে অবিরত শান দিতে থাকিবেন এবং দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধার সৃষ্টি করিবেন। বর্ত্তমান সরকার সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহাদের উপর অধিক নির্ভর করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেই অধিক সুবিধা দান করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই পক্ষপাতদুষ্ট বাঁটোয়ারা একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক স্বার্থ জাগাইয়া রাখিবে, অন্যদিকে স্বাধীনতালাভের পক্ষেও স্থায়ী বাধার সৃষ্টি করিবে।

যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহারা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের লোক হিসাবে যদিও গণ্য হইবার যোগ্য নহেন, তবুও, অতীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকগণ অধিকাংশ হিন্দু ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও কিছুদিন ইহাঁরা হিন্দুদের মধ্য হইতেই সংগৃহীত হইবেন। কাজেই সম্প্রদায় হিসাবে যদি হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হন, এবং তাঁহাদের সেই ক্ষতিদ্বারা অপরের জাতীয়তাবিরোধী সাম্প্রদায়িকতা পুষ্ট হয় তবে তাহাতে সকল ভারতবাসীই একহিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। অধিক আসন লাভের দ্বারা শুধুমাত্র যে উপকারই হইবে তাহা নহে, অনেকসময় অপকারকে নিবারণও করা যাইবে।

জাতির ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সমগ্র মানসিক গঠন প্রভৃতির উপর সাম্প্রদায়িক প্রভাববিস্তার করিবার অন্যায় সুবিধা গ্রহণের সুযোগ ইহাতে থাকিবে। এরূপ সুযোগ কোন সম্প্রদায় গ্রহণ করিবেনই, এরূপ কথা বলা না গেলেও, অনেকখানি বিপদের ঝুঁকি যে থাকিয়া যাইবে তাহা সুনিশ্চিত।

অস্পৃশ্যতা ও শ্রেণীবিরোধ

জনৈক পত্র লেখক, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের তীব্র সমালোচনা করিয়া, এবং এই চেষ্টাকে রুটির পরিবর্ত্তে প্রস্তরখণ্ডদানের সহিত তুলনা করিয়া মহাত্মাজীকে একখানা পত্র লিখিয়াছেন। পত্র লেখকের মতে, হরিজনদের দুঃখ দূর করিতে হইলে, তাঁহাদের দারিদ্র্যের কারণ দূরীভূত করিতে হইলে, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে, জাতীয় সম্পদের সমতামূলক বণ্টনের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে এই কথা বিশেষভাবে বুঝাইতে হইবে যে, বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক-শোষণের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

ইনি আরও বলিয়াছেন যে, এই সমস্যা শুধুমাত্র ভারত-

বিচিত্রা · আঁধারে আলো স্বর্গীয়া শান্তি ঘোষাল

অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

বর্ষের নহে, ইহা পৃথিবীব্যাপী এবং ভুল করিয়া ইহাকে রাজনীতিক সমস্যা বলা হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা অর্থগত। আমেরিকায় নিগ্রো বিদ্বেষ, জার্ম্মানির ইহুদি বিদ্বেষ, রাশিয়ার অভিজাত বিদ্বেষ, চৈনিকের মিকাডোভীতি প্রভৃতির মূল কারণ আর্থিক বৈষম্য। ভারতীয় অস্পৃশ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধেও ইনি বলিয়াছেন যে, অর্থগত উদ্দেশ্যের জন্য, আর্য্য-বিজেতাদিগের বিজিত আদিম অধিবাসীদিগকে অধীনে রাখিবার প্রয়োজন হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে।

মহাত্মা শ্রেণীবিরোধে বিশ্বাসী নহেন, এবং ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্ছেদসাধনে ইচ্ছুক নহেন বলিয়া তাঁহার কার্য্যের দ্বারা প্রকৃত লাভ হইবে না বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। ইহার উত্তরে মহাত্মাজী বলিয়াছেন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সহিত সংগ্রাম শেষ হইবে মনে করিয়া পত্র লেখক ভুল করিয়াছেন। অনতিক্রম্য ধর্ম্মগত বাধা দূর করিবার জন্য, এখান হইতেই সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইয়াছে। অস্পৃশ্যেরা অন্যান্য কারণ বাদ দিয়া শুধু অস্পৃশ্যতার জন্যই একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদিগকে জন্মের জন্যই কলুষিত মনে করা হয়। একথা কে না জানেন যে, আর্থিক হিসাবে ইঁহারা সম্পন্ন হইলেও, সামাজিকভাবে ইঁহাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করা হয়। ত্রিবাঙ্কুরের হাজার হাজার এঝোয়া এবং বাংলার নমঃশূদ্রেরা যথেষ্ট সম্পন্ন হইয়াও অনাচরণীয় রহিয়াছেন। পার্থিব সম্পদ তাঁহাদের সামাজিক মর্য্যাদা বাড়াইতে পারে নাই।

হরিজনেরা ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৬র কাছাকাছি হইবেন। যাঁহারা আর্থিক শোষণের কুফল ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা জনসংখ্যার শতকরা ৯০এর কম হইবেন না। অস্পৃশ্যতা দূর হইলেই তবে, হরিজনেরা আর্থিক উন্নয়নের সুফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে পারিবেন।

শ্রেণীবিরোধ সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে, শ্রেণী-বিরোধের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করেন না, একথা ঠিক নহে। তিনি ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে ও ইহাকে বাড়াইতে-চান না। ইহা যে পরিহার করা সম্ভব, তাঁহার এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হইতেছে। ধনিক ও শ্রমিকের বিরোধের মূল অধিক দূরে প্রসারিত নহে। শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া এক ব্যক্তির ন্যায় কাজ করিবার মত বুদ্ধি অর্জ্জন করিতে পারিলেই, অধিকতর না হইলেও, ধনিকদের তুল্য শক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। প্রকৃত যুদ্ধ হইতেছে বুদ্ধিমত্তা এবং নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্যে। এই সংগ্রামকে বাঁচাইয়া রাখা নিশ্চয়ই অবিবেচনার কার্য্য হইবে। নির্ব্বুদ্ধিতাকে দূর করিতে হইবে।

মহাত্মাজীর কথা

মহাত্মাজী জনসাধারণের নির্ব্বুদ্ধিতাকে তাঁহাদের আর্থিক কষ্টের জন্য দায়ী করিয়াছেন এবং শ্রমিকদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা গড়িয়া উঠিলে তাহাদের দুরবস্থার অবসান হইবে বলিয়া আশা করিয়াছেন। তাঁহার আশা যদি সত্য হয়, তবে তাঁহার ন্যায় সকলেই শ্রেণীসংগ্রামকে অবাঞ্ছনীয় মনে করিবে। তাঁহার আশা যে আংশিক সফলতা লাভ করিতে পারে তাহা নিশ্চিত হইলেও, ইহার সম্পূর্ণ সফল হইবার পক্ষে যে দুরতিক্রম্য বাধাগুলি আছে তাহার সম্বন্ধে মহাত্মাজীর মতামত জানিবার আমাদের কৌতূহল আছে।

ধনিক এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত রাষ্ট্রতন্ত্রের আজ্ঞায় থাকিয়া শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হইবার পক্ষে যে সকল বাধা আছে, তাহা কি প্রকারে দূর করা যাইবে। শোষক শ্রেণীগুলি মানবমনের সহজ দুর্ব্বলতাগুলির সহিত ভালভাবেই পরিচিত এবং নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে তাহার ব্যবহার করিয়া শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা ভাঙ্গিয়া দিতেও তাহারা বিশেষ দক্ষ।

এসকল বাধা অতিক্রম করিয়া যদি শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হইতে পারেন, তাহা হইলেই বা লাভ কতটুকু হইবে। কার-খানায় যে শ্রমিকেরা নিযুক্ত থাকিবেন, ইহাতে তাঁহাদের কিছু সুবিধা অবশ্য হইতে পারে; কিন্তু কারখানার দ্রুত উৎপাদনের ফলে যে বহুসংখ্যক লোক কর্ম্মচ্যুত হইবেন, সেই ক্রমবর্দ্ধিত বেকারের দলের ইহাতে কোন সুবিধা হইবে না। এই বেকারের দলকে কাজ দিতে হইলে, আরও বহুসংখ্যক কারখানার সৃষ্টি করিতে হইবে এবং তাহার উৎপন্ন বিক্রয়ের জন্য নূতন শোষণের ক্ষেত্র অধিকার করিতে হইবে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে এই সমস্যাই আজ মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছে।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, কলকারখানা যন্ত্রপাতি বাদ দিয়া কুটীরশিল্পের সাহায্যেই আমরা আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে পারিব (অবশ্য বর্ত্তমান যান্ত্রিক প্রতিযোগিতার যুগে তাহা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না), তাহা হইলেও অবশ্য সব প্রশ্নের শেষ হইবে না। কারণ, তাহার ফলে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দান হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। শিক্ষা, দীক্ষা এবং মানসিক উৎকর্ষের জন্য যে প্রচুর অবসরের প্রয়োজন পূর্ব্বে তাহা অল্প লোকেই পাইতে পারিত। অধিকাংশ লোককেই অধিকাংশ সময় খাটিতে হইত। এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে গেলে, এখনও তাহাই করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যন্ত্রপাতির আশীর্ব্বাদে দ্রুত উৎপাদনের সুবিধার ফলে সকল মানুষেরই শ্রমলাঘবের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। অর্থ, শ্রম, অবসর এবং মানুষের সকল প্রকার সুখ সুবিধার সমবণ্টনের উপরই এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে।

ইহা সম্ভব করিতে হইলে, উৎপাদনের সকল ক্ষেত্র হইতেই ধনিকদের হস্তাপসরণ প্রয়োজন হইবে। ইহাতে অপর পক্ষের চাপ ব্যতীত তাঁহারা সম্মত হইবেন, এমন সম্ভাবনা কম।

অপর পক্ষের কথা

মহাত্মাজীর পত্র লেখক, এবং তাঁহারই পথে যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহারা সামাজিক সমস্যাকে যথোচিত মূল্যদান করিতে চাহেন না। যদিও আর্থিক সমস্যা সকল সমস্যার মূলীভূত, এবং আর্থিক সাম্য স্থাপিত হইলে, অন্য সকল সমস্যার সমাধান আপনা হইতে হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তবুও সেই সাম্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অন্যান্য সকল সমস্যাই রহিয়াছে, সেই সকল সমস্যার হাত হইতে কর্ম্মীরা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে পরিত্রাণ পাইবেন না, এবং এই সকল সমস্যা তাঁহাদের কর্ম্মপথকে কণ্টকাকীর্ণ করিতে থাকিবে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় একজন বর্ণ হিন্দুর ও একজন অনুন্নতের কাজ করিবার সমান সুযোগ নাই; একজন পুরুষের ও একজন নারীর কাজ করিবার সমান সুযোগ নাই; সমাজের ও ধর্ম্মের যে সকল অন্যায় বিধি নিষেধ আমাদিগকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে তাহা আমাদের না মানিয়া উপায় নাই।

পাশ্চাত্য দেশগুলি এবং প্রাচ্যেরও অনেক দেশ হইতে সামাজিক দিক দিয়া আমরা অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী। এই সকল দেশে অনেক বৈষম্য এবং ধর্ম্মগত দলাদলি প্রভৃতি থাকিলেও, তাহা এত শিথিল যে লোকের ব্যক্তিগত জীবনকে তাহা বিশেষ স্পর্শ করে না। সে সকল দেশে পরস্পরের মধ্যে খাওয়াদাওয়ার ছোঁয়াছুঁয়ির দুরতিক্রম্য বাধা নাই, কোন বিশেষ বংশে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য রাজনীতিক বা অন্যবিধ কাজ করিবার সুযোগ কমিয়া যায় না, নারীদের অবরোধের মধ্যে অবস্থান করিতে হয় না; কাজেই, সামাজিক এবং অন্য যে সকল বৈষম্য আছে, ভবিষ্যতের জন্য তাহা রাখিয়া দিয়া, সে সকল দেশে কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

কিন্তু অবস্থা অন্য প্রকারের হওয়ায়, আমাদের দেশে রাষ্ট্রিক কার্য্যের সহিত সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ না করিয়া, বা তাহাকে লঘু করিয়া কাজ করিতে গেলে, বিশেষ-ভাবে বাধাগ্রস্ত হইতে হইবে।

অবশ্য সামাজিক ত্রুটি সমূহ সহসা সংশোধিত হইবে অথবা সামাজিক সাম্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে অন্য কাজে হাত দেওয়া যাইবে না, এমন কথা বলা লেখকের উদ্দেশ্য নহে। অন্যান্য কাজের সহিত তীব্রভাবে সংস্কার আন্দোলনসমূহ চালাইতে থাকিলে, অন্ততঃ এই লাভ হইবে যে, জনমত ত্রুটিসমূহ সম্বন্ধে সজাগ থাকায়, যাঁহারা অন্যায় নিষেধ সমূহ না মানিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকে বিশেষ হীন ধারণা করিবে না এবং ফলে, তাঁহাদের অন্যান্য কার্য্য কম বাধাগ্রস্ত হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন নারী যদি বিশেষ কোন রাজনীতিক মতে বিশ্বাসী হইয়া কাজ করিতে চান, এবং তাহার জন্য তাঁহাকে অবরোধের বাহিরে আসিতে হয় তবে, অবরোধ ভাঙ্গিবার জন্যই তাঁহাকে এতটা লড়াই করিতে হইবে যে, তিনি অন্য কাজ করিতে পারিবেন না। কিন্তু, যদি দেশে পর্দ্দাবিরোধী আন্দোলন তীব্রভাবে চলিতে থাকে, তবে, কোন মেয়ের পক্ষে অবরোধের বাহিরে আসা অনেক সহজ হইবে এবং আসিলে জনমতের একাংশের সমর্থন তিনি সব সময়েই পাইবেন। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই একই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অস্পৃশ্যতা থাকিবার যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহার সকলগুলির সহিত অস্পৃশ্যতার সম্বন্ধ নাই এবং তাহার সকলগুলি অর্থনীতিক বৈষম্যপ্রসূত কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, এই সকল দেশের অস্পৃশ্যতাও ভারতীয় অস্পৃশ্যতার অনুরূপ, তাহা হইলে, একথাও সত্য যে, এই সকল স্থানে মানুষের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য এই সকল অস্পৃশ্যতারও উচ্ছেদ সাধনের আবশ্যক হইবে।

আমেরিকায় যদি আর্থিক ভিত্তিতে সমাজ গঠনের প্রয়োজন হয়, তবে, সর্ব্বপ্রথম সেখানে কাল মানুষদের উপর শাদা মানুষদের মনোভাবের পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে হইবে, নহিলে, কোন প্রকার কার্য্যারম্ভ অসম্ভব হইবে।

দেশের সকল সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, এবং প্রত্যেকটিকে সমানুপাত গুরুত্ব প্রদানের উপর আমাদের সকল কাজের সাফল্য নির্ভর করিবে।

বাংলা লাইনো টাইপ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের সত্ত্বাধিকারী ও আনন্দ বাজার পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে বাংলায় লাইনো টাইপ সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। আজকাল প্রত্যহই সুবিখ্যাত আনন্দ বাজার পত্রিকার কিয়দংশ ঐ টাইপে ছাপা হইতেছে। সাধারণ বাংলা টাইপে কিছু ছাপিতে যত সময় লাগে লাইনো টাইপে ছাপিতে সেই সময়ের এক ষষ্ঠমাংশ মাত্র আবশ্যক হইবে। সুতরাং ঐ দিক দিয়া বাংলা খবরের কাগজ ওয়ালাদের খুব সুবিধা হইবে। যে সকল সংযুক্ত অক্ষরের রূপ সংযুক্ত অক্ষর গুলির প্রত্যেকটি হইতে ভিন্ন হইয়া অপর একটি নূতন অক্ষরের রূপ ধারণ করে, সে সকল অক্ষরগুলির (২।১টি বাদে) রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সংযুক্ত অক্ষরগুলির প্রত্যেকটি হইতে যাহাতে সহজে চেনা যায় এমন এক একটি অংশ লইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। ফলে প্রথম শিক্ষার্থীর ও যে সকল অন্যভাষা-ভাষী ব্যক্তি বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করিবেন তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে। এক্ষণে বাংলা প্রেস ওয়ালাদের মধ্যে এধরণের টাইপের যাহাতে শীঘ্র প্রচার হয় তাহার চেষ্টা হওয়া উচিত; এবং এদিক দিয়া কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা গভর্ণমেণ্টের মিনিষ্ট্রি অব এডুকেসন অনেক কিছু করিতে পারেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা লাইনো টাইপের উদ্বোধন উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ যাহাতে লাইনো টাইপে ছাপিয়া বাহির হয় সে বিষয় অবিলম্বে বিবেচনা করিবেন বলিয়া বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, সমস্ত বাংলা পুস্তকের সমগ্র অংশটাই হঠাৎ লাইনো টাইপে না ছাপিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এবিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পঁচিশ হাজার ছাত্র গতবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল—তন্মধ্যে শতকরা ৯৫ জন ছাত্রের মাতৃ-ভাষা যে বাংলা তাহা নিরাপদে বলা চলে। সুতরাং প্রতিবৎসর চল্লিশ হাজারের উপর ছাত্রের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর) বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাংলা পুস্তক পড়িতে হয় (এখানে যাঁহাদের আই-এ, বি-এ ও এম-এতে বাংলা পুস্তকাদি পড়িতে হয় তাঁহাদের বাদ দিলাম)। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত নির্দ্দিষ্ট বাংলা পাঠ্যের কয়েকটি কবিতা যদি লাইনো টাইপে ছাপা হয় এবং ঐ কবিতাগুলি হইতে একটি না একটি প্রশ্ন প্রতি বৎসরই লিখিতে দেওয়া হইবে এমন নিয়ম করা হয়, প্রত্যেক ছাত্রই ঐ কবিতাগুলি পাঠ করিবেন এবং নূতন কোন জিনিষ হঠাৎ লইতে হইলে যে জাতীয় বিতৃষ্ণা সাধারণতঃ মনে সঞ্চার হয় সে জাতীয় বিতৃষ্ণা হইতে তাঁহারা মুক্ত হইয়া লাইনো টাইপ পাঠে অভ্যস্ত হইবেন। ছাত্রদিগকে লাইনো টাইপের মত অক্ষর লিখনে অভ্যস্ত করিতে হইলে, প্রশ্নপত্রের কোন একটি অংশের উত্তর এই অক্ষরে লিখিত হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ দিলেই চলিবে।

যাঁহারাই লাইনো-টাইপ প্রচারে অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের প্রথম প্রথম কোন জিনিসের সমগ্রটাই এই টাইপে না ছাপিয়া কিয়দংশ এই টাইপে ছাপা উচিত। লাইনো টাইপের ঢং প্রচলিত অক্ষরের ঢং হইতে বিভিন্ন হওয়ায় পড়িবার অসুবিধা হইতেছে—চোখেও কিছু কিছু লাগিতেছে। আশা করা যায় প্রচলিত অক্ষরের ঢংএর সহিত লাইনো-টাইপের ঢংএর সাদৃশ্য থাকে সে দিকে দৃষ্টি দিবেন।

বাঙালীছাত্রের স্বাস্থ্যহীনতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রমঙ্গল সমিতির ১৯৩৪ সালের যে কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এ বৎসরও আমাদের স্কুল কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্যহীনতার ভয়াবহতা অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ছাত্রমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠা হইতে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের যাহা কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছিল তাহা সকলই বন্ধ হইয়াছে। উপরন্তু যে ফুসফুসের ব্যাধি ও ক্ষয়রোগ দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তাহার আক্রমণ হইতে ছাত্রগণও নিষ্কৃতি পান নাই।

ছাত্রমঙ্গল সমিতি যে সকল ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কতজন কোন রোগে ভুগিতেছে তাহার একটি বিবরণ দিয়াছেন :—

রোগের নাম	কলেজের ছাত্র (পরীক্ষিত ছাত্র সংখ্যা ৯০০)	স্কুলের ছাত্র (পরীক্ষিত ছাত্র সংখ্যা ১০০২)
অপুষ্টি	২৯·৪২	৪০·৫১
দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা	৩৪·৯৪	২৬·২৪
গলার অসুখ	২৭·৯৩	৪০·৫১
দাঁতের অসুখ (caries)	১১·৪৯	১৮·৯৬
চর্ম্ম রোগ	১৩·১০	১২·০৭
ফুসফুসের রোগ	৭·১২	১·১৯
বর্দ্ধিত প্লীহা	৩·৪৪	১·৬৯
হৃদ্‌রোগ	১·৯৫	২·৪৯
বর্দ্ধিত যকৃত	১·০৩	০·৬৯
পায়েরিয়া	১·১৪	৪·৩৯
ক্ষয়কাশ	০·৮০	০·০৪

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবের দরুণ অপুষ্টি স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেই অধিক। কার্য্য বিবরণী হইতে জানা যায় যে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এই অপুষ্টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্ষয়রোগ উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেই ক্রমবর্দ্ধমান। তবে আলোচ্য বর্ষে গত দুই বৎসর অপেক্ষা নানাপ্রকার খর্ব্বতা ও রোগের দরুণ যে সকল ছাত্রের চিকিৎসা প্রয়োজন তাহাদের সংখ্যা কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে।

আমাদের প্রায় সকল প্রকার রোগের মূলেই রহিয়াছে উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ও দেশব্যাপী অস্বাস্থ্য। অবশ্য আমাদের আর্থিক দুর্দ্দশা, স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতাই আংশিকভাবে উল্লিখিত কারণ দুইটির মূলে রহিয়াছে। আর্থিক দুরবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবেনা বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যবিধির উপর দৃষ্টি দিলে ও খাদ্য সম্বন্ধে একটু বাদ বিচার করিলে বর্ত্তমান আয়ের মধ্য হইতেই আমাদের অস্বাস্থ্য অনেকটা দূর করা সম্ভবপর। বিহার ও মধ্যপ্রদেশবাসী যে সকল ব্যক্তি কুলি মজুরী করিয়া এই প্রদেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে তাহাদের আর্থিক অবস্থা আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা অপেক্ষা ভাল নহে। অথচ তাহাদের স্বাস্থ্য আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাস্থ্য অপেক্ষা উন্নততর।

এতদ্ব্যতীত এই হীন অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে এবং দিন দিন যে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছে তাহার গতি প্রতিরোধ করিতে হইলে প্রতিবৎসর ব্যাপকভাবে যুবকদের ও ছাত্রদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ও আর্থিক দুরবস্থা সাধারণভাবে আমাদের অস্বাস্থ্যের মূলে রহিলেও, কোন প্রকার খাদ্যের অভাবে কাহার কোন রোগোৎপত্তি হইয়াছে ব্যাধির মূলে আর কোনও কারণ কায করিতেছে কিনা এ সকল উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। এবং আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার ভিতর হইতেই বা কি প্রকার কতটা স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে সে সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ ও অভিমত যাহাতে সহজলভ্য হয় সে ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অবশ্য এ সকল ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ এখনই করিতে সক্ষম হইবেন না কিন্তু এ বিষয়ে বিলম্ব না করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের অচিরেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশের অভিভাবকেরা রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী না হইলে সাধারণতঃ নিজ পুত্র কন্যাদিগকে নীরোগ মনে করিয়া থাকেন। অনেকস্থলে অজ্ঞতাই এজন্য দায়ী; আবার যেখানে অজ্ঞতা নাই সেরূপ স্থলে বিনা খরচায় স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকার দরুণই এরূপ ঘটিয়া থাকে। ফলে অনেক বালক বালিকার স্বাস্থ্যই দিন দিন হীন হইতে হইতে যৌবনাবস্থায় একদম ভাঙ্গিয়া পড়ে।

এ অবস্থায় কোন ব্যাপক প্রতিকার এখনই হওয়া সম্ভবপর না হইলেও সরকার মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সহায়তায় যে টুকু প্রতিকার সম্ভব তাহাও হইতেছে না। বাঙ্গালা সরকার সম্প্রতি যে নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে এ বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতার কথা লেখা হইয়াছে।

Most of the Municipalties and all the District boards have Government health officers and the medical inspection of school-children is a part of their duties. Unfortunately sufficient attention is rarely given to this side of the work mainly owing to the lack of interest of the school authorities.

তাৎপর্য্য; প্রায় সকল মিউনিসিপ্যালিটিতেও ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে সরকারী হেলথ অফিসার আছেন; এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্যপরীক্ষা তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের জন্য এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় না।

স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের এবিষয়ে উদাসীন্য আছে সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তাদের যাঁদের উপর জেলার বা সহরের স্বাস্থ্যের ভার ন্যস্ত থাকে তাঁহাদেরই বা এদিকে দৃষ্টি নাই কেন?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল সমিতি ব্যতীত কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ছাত্রমঙ্গল সমিতি প্রতি বৎসর মোট ছাত্র সংখ্যায় এক ক্ষুদ্র অংশকেই পরীক্ষা করিবার সুযোগ সুবিধা পান। বাদবাকী ছাত্রদের স্বাস্থ্যই পরীক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ ছয় বৎসর সাত বৎসর কলেজে পড়িতেছে, অথচ ছাত্রমঙ্গল সমিতি কর্ত্তৃক স্বাস্থ্য কখনও পরীক্ষিত হয় নাই এরূপ ছাত্রের সংখ্যাই অধিক। অথচ ছাত্রমঙ্গল সমিতির অপেক্ষা না রাখিয়া অতি অল্প ব্যয়েই প্রত্যেক কলেজ নিজেদের ছাত্রদের প্রতি বৎসর স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

বহু মনীষী কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর একটি বিষয়ের প্রতি বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেও এখানে তাহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। আমাদের দেশে অনেক স্কুল কলেজেই খেলা ধূলার কোন ব্যবস্থা নাই—অধিকাংশ স্থলেই এ বিষয়ে কি কর্ত্তৃপক্ষের কি ছাত্রদের কোন উৎসাহই দেখা যায় না। যে যে বিদ্যালয়ে খেলাধূলা করিবার ব্যবস্থা আছে, সেখানেও ছাত্র সংখ্যার তুলনায় ব্যবস্থা অতি তুচ্ছ। পড়াশুনার রীতিমত চাপ আছে অথচ শারীরিক ব্যায়ামের কোন ব্যবস্থা নাই—এরকম অবস্থায় উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান হইলেও স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া না পড়িবার খুব কমই সম্ভাবনা এবং ভাঙ্গিয়াও যে পড়িতেছে তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিতেছেন; সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের প্রত্যেক বিদ্যায়তনেই ছাত্রদিগের জন্য খেলাধূলার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা ও খেলাধূলার প্রতি ছাত্রদিগের উৎসাহ যাহাতে জাগরিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আবশ্যক বিবেচনা করিলে, প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে ব্যায়াম বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করা উচিত।

ছাত্রমঙ্গল সমিতি কলেজে ভর্ত্তি করিবার প্রাক্কালে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া লইবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে যে সকল ছাত্রদের স্বাস্থ্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেনা, তাহাদের উপর পড়াশুনার চাপ পড়িয়া তাহাদের আরও স্বাস্থ্যহীনতা ঘটাইবেনা ও ছাত্রমঙ্গল সমিতির রিপোর্টে কলেজের ছাত্রদের উত্তরোত্তর স্বাস্থ্যোন্নতি পরিলক্ষিত হইবে বটে, কিন্তু সমগ্র দেশের পক্ষে ওরূপ ব্যবস্থার বিশেষ কোন মূল্য থাকিবেনা। অবশ্য প্রত্যেক ছাত্রের স্বাস্থ্য কলেজের ছাত্রাবস্থায় পরীক্ষিত হওয়া সুনিশ্চিত হওয়ায় অনেকের রোগই ধরা পড়িবে এবং ছাত্রেরা রোগমুক্ত হইবার নিমিত্ত অবস্থানুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ পাইবে।

স্কুলের ছাত্রদের যতই বাছাই করিয়া কলেজে লওয়া হউক কলেজে পড়িবার সময় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ অভিভাবক ও ছাত্রমঙ্গল সমিতির নিশ্চিন্ত হওয়া চলিবেনা। স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া ছাত্রেরা যখন কলেজে পড়িতে আসে তখন অনেকেই উপযুক্ত স্বাস্থ্য লইয়া না আসিলেও অস্বাস্থ্য লইয়া আসে না। কিন্তু কলেজের পাঠ সমাপন করিতে না করিতে অনেকেই স্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলে। অনেক স্বাস্থ্যবান যুবকেরও কলেজে পড়িতে পড়িতে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

স্যাডলার কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান কালে ডাঃ জে এম গ্রে বলিয়াছিলেন !

The men of the 1st year class are as a whole better than the men in the B. A. class or better than they will be again during their University career.

শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র ঘোষ সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন Many a bright youth of eighteen with intermediate class breaks down in the fourth year class and some drop out altogether.

ইটালি আবিসিনিয়া ও জাতিসংঘ

সাম্রাজ্য লিপ্সু জাতিদের লোভে পৃথিবীর দুর্ব্বল জাতি সমূহ তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছে। বেকার বা দুর্ব্বল জাতি সমূহের অভিভাবকতার দোহাইয়ে, কোথাও বা অসভ্য বর্ব্বর জাতিকে সভ্য করিবার অছিলায়, শক্তিমান, শিল্পসমৃদ্ধ জাতি সমূহ আরব্যোপন্যাসের বৃদ্ধের মত দুর্ব্বল জাতির স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া আছে। দুর্ব্বল আবিসিনিয়ার, শক্তিমান ইটালির প্রয়োজনে তাহার স্বাধীনতা হারাইবে, ইহাতে তেমন আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ছিল না, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, মঞ্চুরিয়ার স্বাধীনতাও জাপান এইভাবে কাড়িয়া লইয়াছে। কিন্তু, ইটালি-আবিসিনিয়ার ব্যাপার লইয়া জাতিসংঘে যে অভিনয় চলিতেছে, তাহা যেমনই লজ্জাকর তেমনই কৌতুকাবহ। আবিসিনিয়া আক্রমণের পূর্ব্বে জাতিসংঘ এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য অনেক মৌখিক প্রয়াস করিয়াছিলেন ; এমন কি ইটালিকে বাধা দিবার নিমিত্ত অনেক জোরাল প্রস্তাবও এখানে করা হইয়াছিল। কিন্তু, আক্রমণ যখন সুরু হইয়া গেল, তখন জাতিসংঘ ইটালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বিধান প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। এই প্রস্তাব জাতিসংঘের অনেক সভ্যই অনুমোদন করিয়াছেন, এবং অনেক বিলম্বের পর ১৮ই নবেম্বর এই ব্যবস্থা অবিলম্বিত হইবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ইটালি আবিসিনিয়ার ভিতর অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

অর্থনৈতিক বিধান আদৌ ফলদায়ক হইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইটালির আর্থিক অবস্থা খুব ভাল না হইলেও, প্রস্তুত না হইয়া ইটালি যুদ্ধে নামে নাই। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন—অনেক দিন ধরিয়া যদি যুদ্ধ চলে তবে হয়ত এই অর্থনৈতিক বিধান ফলপ্রসূ হইতে পারে। কিন্তু, যুদ্ধ যদি অনেকদিন ধরিয়া চলিবার সম্ভাবনা না থাকে তবে, এই বিরোধের প্রয়োগ নিস্ফল হইবে। সার স্যামুয়েল হোর তাঁহার বক্তৃতায় (অকটোবর ২২-লণ্ডন, রয়টার) জাতিসংঘের অভিপ্রায় সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। হোর বলিয়াছেন এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে যুদ্ধ স্বল্পস্থায়ী হইবে। কিন্তু জাতিসংঘের এই ব্যবস্থা যদি সফল না হয়, তাহা হইলে ইটালির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কর্ত্তৃক কোন সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না। জাতিসংঘের সভায় এ পর্য্যন্ত সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাই উঠে নাই। বক্তৃতার একস্থানে হোর বলিয়াছেন,—লীগ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন তাহা সামরিক নহে—অর্থনৈতিক। কারণ লীগ শান্তি প্রতিষ্ঠানেরই যন্ত্রস্বরূপ।

জাতিসংঘের এক প্রতিপত্তিশালী সভ্য যখন জাতিসংঘের বিধান ভাঙ্গিয়া, জাতিসংঘের অন্য একটি দুর্ব্বল সভ্যের উপর আক্রমণ করিয়া শান্তিভঙ্গ করিতেছেন, তখন শান্তির দোহাই পাড়িয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে জাতিসংঘ পরোক্ষে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করিবেন।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

আধুনিক কবিতা

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা আমাদের সামনে এল। এমন সুন্দর ছাপান ও বাঁধান কোন পত্রিকা হাতে পড়লে প্রাণটা খুশী হয়ে ওঠে। তার ওপর বিষয় হোলো কবিতা, কেবল কবিতা; হিন্দুদর্শনের চাল, অ্যাবিসীনিয়ার অসভ্য জাতির বর্ণনার ডাল এবং গল্পের আনাজ মিশিয়ে জগাখিচুড়ি নয়। কলাপাতার ওপর বাসমতী চালের ভাত কেবল, গন্ধেই খিদে আসে, জোর একটু গাওয়া ঘির প্রয়োজন হয়, না হলেও চলে। প্রথম দর্শনে মনে হয় নতুন ত্রৈমাসিকটি ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক আহার।

ইংরেজদের Poetry Review আছে। অবশ্য আমাদেরও ছিল, এবং হয়ত এখনও আছে,—গল্প লহরী ইত্যাদি যাতে গল্পই ছাপা হয়। ও দেশে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ফলে ধরা পড়ল অধিকার ভেদ, আমাদের দেশে জন কয়েকের মধ্যে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও প্রকট হোলো সাধারণ পাঠক ও পাঠিকা। প্রথম অবস্থা কি না! তাই বোধ হয় দরকারও ছিল ঐ প্রকার সাম্যের। কিন্তু আমাদের প্রগতি গেল আটকে। তাই বড় বড় নামজাদা মাসিক পত্রিকাও এখনও, ১৯৩৫ সালেও, সর্ব্বসাধারণের তুষ্টি সাধনে হায়রান হচ্ছেন। অর্থাৎ অবসর কাটাবার সাহায্য করাই তাদের উদ্দেশ্য, চিত্তপ্রকর্ষের নয়, চিত্ত-বিনোদনের নয়। কিন্তু চিৎ বস্তুটির স্বভাব এমন যে তা ভিন্ন আর আনন্দই পাওয়া যায় না। সকলে একথা বোঝেন না, কারণ ভাববিলাসে এক প্রকার সস্তার আমোদ পাওয়া যায়। যাতে সংসার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাইতে সোয়াস্তি আসে, ভাবের ধোঁয়ার মতন Camouflage আর নেই। সামুদ্রিক একপ্রকার মাছও এ রহস্যটুকু জানে। কিন্তু যারা পালাতে চায়না তাদের পক্ষে এই চিৎ-শক্তি ছাড়া অন্য গতি নেই। যারা পালাবে এবং যারা পালাবেনা তাদের মধ্যে মিল থাকতে পারে না। অর্থাৎ আনন্দের প্রয়াসী ও আমোদবিলাসী ভিন্ন জাতির। জাতিভেদ চিত্তের অস্তিত্ব স্বীকারে। সেই জন্যই সাহিত্য কেবল দুই শ্রেণীর হতে বাধ্য—চিত্তসর্ব্বস্ব এবং চিত্তরহিত। সোজা বাঙলায় Deliberate, cerebral, intellectual, এবং তার উল্টোটা —সেটা কি, যে কোন বাঙলা বই ও মাসিক পড়লেই বোঝা যায়। সমাজতত্ত্বের ভাষায় দলীয়, Clique এর, Coterie র, এবং সার্ব্বজনীন ইত্যাদি, প্রভৃতি। 'কবিতা' পত্রিকাটি ছোট্ট একটি দলের কাগজ তাই সাধারণে পড়বেনা। শ' দুই তিন লোক পড়লেই চলবে—অবশ্য কিনে।

সাহিত্যিক দলের উদ্দেশ্য সঠিক কি প্রশ্ন উঠতে পারেনা, ডাকাতের দলের হয়ত সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে পারে। উদ্দেশ্য গড়ে ওঠে এ-সব ক্ষেত্রে। হয়ত এই পত্রিকার মারফৎ কিছুই হবে না, তাতেও পাঠকবৃন্দের আসে যাবে না। কারণ কবিতাগোষ্ঠীর সভাবৃন্দ অন্য কোন কাগজে কবিতা ছাপাতে দ্বিধা করেন না এবং করবেন না। তবে বর্ত্তমান সংখ্যার লেখক যদি কবিতা পত্রিকাতে বরাবর লেখা ছাপাতে থাকেন তবে ঠিক ঐ স্থানিক ঐক্যের বশে তাদের সাধারণ গুণগুলি দানা বাঁধবে, আমাদের কাছে প্রকট হবে। অধ্যাপকবৃন্দেরও সুবিধে—তাঁরা একটা 'স্কুল' খুঁজে পাবেন।

এখন আমাদের পদ্যসাহিত্যে কি হচ্ছে ধারণা করা একটু কঠিন। মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি, অচিন্ত্য প্রেমেন বুদ্ধ—এক Unholy Unity, তারা কেবল ভাঙ্গনের পক্ষপাতী, আর বাকী সব, মোহিত বাবু, যতীনবাবু সবাই রক্ষণশীল। পল্লী-কবির হা হুতাশ, বিদ্রোহী কবিদের গর্জ্জনও কানে আসে। কানাঘুষোয় শোনা যায় বিষ্ণু দে নামে একজন যুবক বাঙলা কবিতায় ইংরেজী এবং পরিচয়ের সম্পাদক সুধীন্দ্র দত্ত সংস্কৃত কথা প্রয়োগ করে থাকেন। ধারণা আমাদের এই—

* 'কবিতা'-ত্রৈমাসিক পত্র, সম্পাদক, বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪২, ৪০ পৃঃ, প্রতি সংখ্যা ছয় আনা।

রবীন্দ্রনাথ এখনও কবিতার রাজা, তবে সীমান্তপ্রদেশে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিয়েছে, অবশ্য কিছুই হবে না।

'কবিতা'র প্রথম সংখ্যাটি পড়ে আমার নতুন কবিদের বাঙলা কবিতা সম্বন্ধে যা ধারণা হয়েছে তাই লিখছি। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগত সমালোচনা করছিনা। প্রত্যেক কবিরই বৈশিষ্ট্য আছে, অনেক ক্ষেত্রেই তা ধরা পড়েছে—যেখানে ধরা পড়েছে সেইখানেই কবিতা সার্থক হয়েছে। এখন আমি 'কবিতা' পত্রিকার সমালোচনা করছি। অজিতকুমার, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্র দত্ত ও হেমচন্দ্র বাগচী ছাড়া আর সকলেই অর্থাৎ বাকী সাতজন গদ্য ছন্দে লিখেছেন। * অতএব সাংখ্যিক হিসেবে বলা চলে যে এই দলটি গদ্যছন্দের ভবিষ্যতে আস্থাবান, অর্থাৎ কবিতা পুনশ্চের পৌনঃ পুনিক। নিন্দার কথা নয় এতে, কারণ গদ্য-কবিতাও একপ্রকার কবিতা, এবং পুরানো কবিতার বন্ধন শিথিল করবার প্রয়োজন হয়েছিল। তবে গদ্য-কবিতায় একটা ছন্দ রাখতেই হবে, কেবল আভ্যন্তরিক নয় পারম্পরিকও। সেই ছন্দ হবে পুরুষালী, মেয়েলী নয়। আর থাকা চাই স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের বিন্যাস, যার সাহায্যে ভাবদ্যুতি ফুটে উঠবে চীনে-ফানুসের মতন, সন্তরণদক্ষ যুবতীর অঙ্গ থেকে স্বাস্থ্যের মতন। কবিতার প্রথম সংখ্যায় সমর সেনের রচনাই এই হিসেবে সার্থক হয়েছে। গদ্য-ছন্দের জন্য কাব্যছন্দ উঠে যাবে না। কবিতার বাঁধন মেনেও যে নতুন ধরণের ভালো কবিতা লেখা যায় তার প্রমাণ সুধীন্দ্র দত্তের 'জাগরণ'। মাত্র গদ্যছন্দের 'রাখী' ছাড়া প্রথমসংখ্যায় প্রকাশিত রচনাবলীর অন্য এমন কি সূত্র আছে যেটি স্বকীয়তা না হানি করে সমষ্টিকে এক করেছে? প্রশ্নটি তোলা খুবই ন্যায্য, এবং তারই উত্তরের ওপর 'কবিতা' পত্রিকার সাহিত্যিক সার্থকতা নির্ভর করছে। বিলেতী নতুন ধরণের পত্রিকার প্রত্যেকটিতে সাধারণ সূত্র একটি না একটি পাওয়া যায়। হয় সেটি সাহিত্যের সামাজিক মূল্যে বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসের নানা ঢঙ, আর না হয় ধর্ম্মের প্রতি আস্থা। ভেতর থেকে তীব্র অনুসন্ধিৎসা, পরীক্ষা করবার প্রবৃত্তি কিংবা ঐ ধরণের একটা আবেগ বিদেশী তরুণ কবিদের দলবদ্ধ করে। আধুনিক মনোভাবের সঠিক সংজ্ঞা না দিতে পারলেও অনেক দলে তার অস্তিত্ব ওতঃপ্রোত থাকে। আমার বক্তব্য হোলো এই যে দল তৈরীর জন্য বন্ধন চাই, বাইরের ভেতরের দুএর পরস্পর সাহায্য থাকলে ত' কথাই নেই। বন্ধন চোখে পড়লেই ভালো, সে জন্য হয়ত পুরাতন কবিকে কিংবা কাব্য পদ্ধতিকে ঘৃণা করারও প্রয়োজন আছে, কিন্তু অদৃশ্য থাকলেও চলে। অন্ততঃ তাই থেকে আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে নতুন দল রচিত হবে।

কবিতার সম্পাদকদ্বয় এই বিষয়ে আমাদের কিছু সাহায্য করেছেন অবশ্য—প্রেমেন মিত্র কবিতা লিখে এবং বুদ্ধদেব বাবু মন্তব্য প্রকাশ করে। সূতোর একটা দিক পেলেই হোলো। প্রেমেন বাবুর 'তামাসা' পড়লে অনেকটা বোঝা যায়। নব্য পদার্থ-বিজ্ঞানের গোটা কয়েক কথা কবিতায় রয়েছে, ইলেকট্রনের মরীচিকা, দেশ-কাল-জড়ান জ্যামিতিক ভগবান, ইত্যাদি—তারপর তিনি লিখছেন,—

'জানি এ-পিঠে নেইকো কোন মানে।
তবু কি হবে তলিয়ে দেখে এই তামাসা।'

কিন্তু মনোভাবটি আধুনিক নয়, মোটেই নয়, এ কেবল আধুনিক বুলি, রবিবারের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পড়ে বিজ্ঞানের খবর জানলে যা হয় তাই, কিংবা তরুণ-বৃদ্ধেরা যা বলেন তাই। প্রেমেন বাবু বলছেন,

"আমার থাক
সমস্ত অঙ্কের এপিঠে
মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ
নেশার রঙে টলমল
এই মুহূর্ত্ত বুদ্‌বুদ,
জন্ম, মৃত্যু, প্রেম
আনন্দ, বেদনা আর নিষ্ফল এই
আত্মার আকুতি"

প্রকৃত আধুনিকদের মধ্যে কেউই নেশার রঙএ সন্তুষ্ট নন, তাঁরা মুহূর্ত্তকে বুদ্‌বুদ বলেন না, নিষ্ফল বলে আত্মপ্রসন্ন হন না। আজকালকার যে সব কবি ঐ প্রকার মনোভাব প্রকাশ করেন তাঁরা এখনও মরেননি বলেই আধুনিক। প্রকৃত আধুনিক বিজ্ঞানকে positively কাজে লাগাতে তৎপর,

* ধূর্জ্জটিবাবুর গুনতিতে ভুল হয়েছে। এগারো জন লেখকের মধ্যে পাঁচজন গদ্যে লিখেছেন—অর্দ্ধেকেরও কম। সম্পাদক

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এবং তাঁদের মতে কবিতার বিষয়; অর্থাৎ রঙ, বুদ্বুদ আত্মা, ঘোর নিষ্ফল আকুতিকে বিরুদ্ধ সংজ্ঞা হিসেবে ধরেন না। হীরের মতন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের ওপর জীবন, এবং কবির জীবন প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের স্পৃহা, পারেন না, তবু দুরাকাঙ্ক্ষা। ক্ষোভ, আফ্‌শোস, আকুতির যুগ কেটেছে বলেই আমার বিশ্বাস। সোজা কথা এই: প্রেমেন বাবুর রচনা চমৎকার হয়েছে—একটি মনোভাবের বিকাশ হিসেবে, কিন্তু মনোভাবটিকে আধুনিক ভাবলে ভুল করা হবে, এই মনোভাবের চারপাশে দানা বাঁধলে তাতে দল তৈরীও হবে, তবে সেটা আধুনিক-দল হবে না। আবার বলি লেখকের সার্থকতা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়, পত্রিকাটির সাহায্যে আধুনিক দলের ভিত্তি পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য। 'তামাসা' প্রেমেন বাবুর নিজের কোন বইএ প্রকাশিত হলে তখনই তার স্বকীয়তা ও সার্থকতা নিয়ে উচ্ছ্বাস চলত। এক্ষেত্রে একটি চাল টিপে ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা দেখছি।

সম্পাদকীয়টিও বিদ্রোহ ঘোষণা মাত্র। কবিতার অর্থ থাকবে না, কবিতার বিষয় নাও থাকতে পারে, এবং সেটি দুর্বোধ্য হবে। এই ধরণের কথা মোটেই নতুন নয় বিদেশে—বাঙলায় অনেকেরই কাছে নূতন, তাই প্রকাশের জরুরী প্রয়োজন আছে। কিন্তু ঘোষণা পত্রে আরো কিছু চাই। উত্তর আসতে পারে—নতুনত্ব ফুটে উঠবে পত্রিকার পৃষ্ঠায়। তাই ঠিক, ফলেন পরিচীয়তে, কিন্তু কি ফল প্রত্যাশা করতে পারি? বুদ্ধদেব বাবুর কবিতায় গদ্যছন্দের মারপ্যাচ ছাড়া নতুনত্ব কি আছে? পূর্ব্বেই বলেছি ছন্দের নতুনত্ব ভিন্ন আমি আরো কিছুর ভিখারী। মাত্র রসের দিক থেকে আমি যে কোনো মতামত পেলেই সন্তুষ্ট, অবশ্য কবিতায় রূপগ্রহণ করা চাই। Modern Temper পেলে ত' কৃতজ্ঞই থাকব। কিন্তু তাই বা কই? বিষ্ণু দের পঙ্কমুখে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু গুঞ্জন হিসেবে। আমি আরো স্পষ্ট-ভাবে শুনতে চেয়েছিলাম। এ-যুগে দিন কয়েকের জন্য গোটাকয়েক কবিতা Didactic ও parable ধরণের হলে ভাল হয়।

বাইরের দিক থেকে মনে হয় 'কবিতা'র কোন কবি সমাজের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে কাব্য-রচনার সম্বন্ধ কি হতে পারে ভেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। অথচ কবিতার রূপ পরিবর্ত্তনের, অর্থাৎ গদ্য-ছন্দের পরিণত হবার সঙ্গে সমাজ ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিশ্বাস-পরিবর্ত্তনের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছেই আছে। কবি অবশ্য প্রবন্ধ লিখবেন না, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশ্বাসটি মনের কোণে থাকবেই থাকবে, এবং কবিতায় constantএর মতন থাকবে।

অতএব আমার বক্তব্য হোলো এই—'কবিতা' পত্রিকাটি (ছন্দভিন্ন) আধুনিক মনোভাবের পরিচয়-জ্ঞাপক পত্রিকা হিসেবে হয়নি, কিন্তু একটি উৎকৃষ্ট কবিতা সংগ্রহ হয়েছে, যাতে প্রত্যেক নামজাদা তরুণ কবির অপ্রকাশিত কবিতা স্থান পেয়েছে। এতে এমন কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে যার মূল্য, আমার মতে, আজকালকার যে কোন তরুণ ইংরেজ কবির রচনা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। কাব্য-রসিকের পক্ষে এই যথেষ্ঠ।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

একখানি চিঠি

শ্রীসুধীরকুমার রাহা

অনেক দিন পরে আমাদের আড্ডায় আজ চক্কোত্তি মশায়ের আবির্ভাব। আমাদের এই পাড়াতেই তাঁর বাস, একপুরুষের নয় তিনপুরুষের। বয়েস আটচল্লিস পেরিয়ে এসেচে অথচ অঙ্গে বানপ্রস্থের কোন লক্ষণই নেই। সংসারে এমন এক একটা লোক থাকে বয়েস যাদের দেহের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে। চক্কোত্তিমশায় সেই জাতের। শিশুর সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ নির্ঝরের মত অবিরত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে, আবার মৃত্যুর কোঠায় যারা পা দিয়েচে তাদের সঙ্গেও গীতার তত্ব আলোচনায় চক্কোত্তি মশায়ের উৎসাহ অপরিমিত। তবে সত্যি কথা যদি বলি অনুরাগটা চক্কোত্তির এই আড্ডার যুবজনের প্রতিই বেশী। আমাদের সঙ্গে হত শুধু গল্প এবং কালেভদ্রে তর্ক। চক্কোত্তিমশায় গল্পকে গল্প বলবেন না, বলেন সত্য ঘটনা। আমরা কখনো তাঁকে রাগতে দেখিনি, এমন কি ভগবানের প্রসঙ্গে তর্ক যখন অতিশয় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখনো নয়। পোষাকে পরিচ্ছদে যেমন একটা অনাড়ম্বর পারিপাট্য, মনেও ছিল তাঁর তেমনি একটা নম্র আভিজাত্য।

একদিন দিব্যি গল্প জমিয়ে তুলেচেন, এমন সময়ে ডাক পড়ল গলির শেষপ্রান্তে অবস্থিত ত্রিতল এক ভবন থেকে। গৃহস্বামী অবসর প্রাপ্ত সবজজ, শেষ বয়সে স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্‌ নিয়ে মেতেচেন, তিরিশ বছর ধরে অবিশ্রান্ত দুপক্ষের শওয়াল জবাবের ধারালো কাঁটাবেড়ার মাঝখানদিয়ে অতি সন্তর্পণে পথ ক'রে আস্‌তে হয়েচে। সেই স্বভাবের শিকড় পৌঁছেচে বুদ্ধির মূলে। চক্কোত্তিকে কল্পিত অপরপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো অত্যাবশ্যক, কেননা তর্কে তাঁর জুড়ি নেই। চক্কোত্তি যান নি, এই থেকে অনুমান করা যায় চক্কোত্তির মনের টান কোনদিকে। তাঁর নিজের উক্তি হচ্চে—ছেলেদের সঙ্গে থাকলে মনের রঙে ময়লা ধরেনা।

চক্কোত্তির চোখে নিকেলের চশমা। আমরা বিস্তর আপত্তি জানিয়েছি চশমাটার জন্যে। চক্কোত্তি কিন্তু প্রিয় চশ্‌মা জোড়াটিকে ত্যাগ করতে রাজি হন নি; উত্তরে বলেছিলেন—"তোমরা একটা কথা মনে রেখো, পুরোনো হলেও এই চারটে জিনিয় কখনো ছাড়বেনা—জুতো গামছা বউ আর চশ্‌মা"।

চক্কোত্তি মশায় কখনো চাকরি করেছিলেন বলে শোনা যায় নি। চাকরি তাঁর পক্ষে বাহুল্য। তাঁর ঠাকুরদাদা নানা উপায়ে এত সম্পত্তি করে রেখে গিছলেন যে তিনপুরুষ তাতেই স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। চক্কোত্তি সম্ভবত কখনো বিয়ে করেন নি। করলেও তা আমরা জানতে পারিনি। তার স্ত্রীও বর্ত্তমান নেই, বছরের অধিকাংশ সময় দেশ বিদেশ পর্য্যটন করে বেড়ান। ওটা ছিল তাঁর নেশার মধ্যে। আর যখন বাড়ী ফিরে আসেন তখন আড্ডা জমান আমাদের এখানে।

অনেকদিন পরে রূপোবাঁধানো লাঠি গাছটা হাতে নিয়ে চক্কোত্তিমশায় এসে দাঁড়িয়েচেন আমাদের আড্ডার দোর-গোড়ায়। স্মিত হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত। একটা হৈ চৈ পড়ে গেল—"এই যে চক্কোত্তিমশায়"—"চক্কোত্তিমশায় এসেচেন"—"কোথায় ছিলেন এত্‌দিন?"—"আমাদের ভুলে গিচলেন বুঝি?" চক্কোত্তি তাঁর প্রিয় ক্যানভাসের আরাম চেয়ারটিতে উপবিষ্ট হয়ে লাঠিগাছটি নিজের উরুর উপর শুইয়ে রাখলেন, তার পর ডাকলেন—"রাধু, বাবা একটু তামাক"। আনন্দের ধাক্কায় ওকথা ভুলেই গিছলুম। আমরা ভুললেও রাধু ভোলেনি। রাধু গুড়গুড়ি হাতে তামাকে ফুঁ দিতে দিতে এসে উপস্থিত। ধীরে ধীরে চক্কোত্তিমশায়ের পদতলে গুড়গুড়িটি রেখে দাঁড়ালো।

চক্কোত্তি মশায়কে সামনে রেখে আমরা বৃত্তাকারে ঘিরে বসলুম। এর অর্থ চক্কোত্তির কাছে অবিদিত ছিল না। তবু ভ্রূ উঁচু করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুরেনের দিকে তাকালেন।

সুরেন বল্লে—"একটা গল্প চক্কোত্তি মশায়। আমরা প্রায় শুকিয়ে এসেচি"। চক্কোত্তি বল্লেন—"আচ্ছা সুরেন, আমাকে গল্প বলতে শুনেচ কখনো"। সুরেন অমনি উত্তর করলে—"না চক্কোত্তিমশায়, আমার ভুল হয়েচে। আপনার একটা সত্য ঘটনা থলে থেকে বার করুন আজ।" চক্কোত্তি একটু থেমে বল্লেন—"নিছক সত্য কথা বললে তোমরা শুনতে চাইবেনা। একটু রং ফলাবো।" এই বলে চক্কোত্তিমশায় মৃদু ও মধুর স্বরে ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন—

সরোজিনীর বিয়ে হয় যখন তার বয়েস আঠারো। সাবেকি মতে এত বয়সে বিয়ে হওয়াটা নিন্দনীয়। কত বয়েসে বিয়ে হওয়া মানবের পক্ষে কল্যাণকর এ সম্বন্ধে ঋষিরা একমত হতে পারেন নি। মানুষও সেইজন্য নিজের খেয়াল মতে যে-কোনো বয়েসে বিয়ে করেচে। কেউ বা করে এক বছরের সময়, কেউ বা বাইশ বছরের সময়, কেউ আবার বাহাত্তর বছরের বয়েসের সময় বিয়ে করচে।

সংসারে স্বামী ভার নেয় স্ত্রীর, এই রীতিই চলে আসচে। সরোজিনীর বেলায় সে ব্যবস্থা উল্টে গেল। তাকেই নিতে হল স্বামীর ভার। ব্যাপারটা একটু বিস্ময়সূচক। স্ত্রীর ভার বহন করা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার তা বিবাহিত পুরুষ মাত্রই জানে। তোমরা কেউ বিয়ে করনি সুতরাং বুঝতে পারবেনা। এখানে কেবল আমিই বুঝতে পারছি একটি অবলার পক্ষে স্বামীর ভার বহন করা কতদূর মর্ম্মান্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। তোমরা বলতে পার ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হচ্চে, স্বামী স্ত্রী কেউ কারুর ভার নেবে না। কিন্তু ওটা একটা থিওরি। আর তোমরা জানো একটা থিওরিকে কার্য্যকরী করতে হলে সেই সঙ্গে আরও নানান ব্যবস্থার ওলট পালট করে ফেলতে হয়। সে সাহসিকতা অতিশয় দুর্লভ।

হরনাথের, অর্থাৎ সরোজিনীর স্বামীর, বিয়ের সময়কার বয়েস ঠিকুজির হিসেবে উনচল্লিশ। বয়েসের হিসেব হরনাথের পক্ষে অবান্তর কথা, কারণ জন্মের সময় থেকে বয়স তার বেড়েই চল্‌লো হু হু করে কিন্তু মন দাঁড়িয়ে রৈল সেই একই জায়গায় নিশ্চল হয়ে। তার উনচল্লিশ বৎসরের অবস্থাটা এই,—তার কথা শুনলে কোনো সময় রাগ হয়, কোনো সময় হয় দয়া, কোনো সময় আতঙ্ক, আর যে সময় মেজাজ খুব ভাল থাকে সে সময় পায় হাসি। পৃথিবীতে এমনধারা লোকও জন্মগ্রহণ করে, নইলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য সম্পাদিত হত না।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবচ, সরোজিনী কেন এই ইডিয়টটাকে বিয়ে করলে। তার কারণ অনেক। প্রথমত সরোজিনী স্বয়ম্বরা হয়ে বিয়ে করেনি, ওর বিয়ে হয়েছিল। তারপর একটা কথা, সংসারে রূপেগুণে ঠিক পুরুষের সঙ্গে ঠিক স্ত্রীর মিলন হয় না; দৈবাৎ যদি হয় তাকে শাস্ত্রে রাজযোটক বলে। তোমরা একথাটা বিশেষ করে মনে রাখবে স্বামী যদি হয় বোকা, স্ত্রী হবে বুদ্ধিমতী। স্ত্রী যদি হয় ছিপছিপে লম্বা, স্বামী নিশ্চয় হবে বেঁটে এবং মোটা; স্বামী যদি হয় স্বাস্থ্যবান স্ত্রী হবে রুগ্না, এবং সেই রোগের তদ্বির করতে করতে স্বামীও নিজের স্বাস্থ্য হারিয়ে বসবে। এই রকম গরমিলের দরুণ সংসারে নানান অশান্তির উৎপত্তি। তবু এই ঘটে। এর কোনো ফিলজফি নেই।

আসল ব্যাপারটা এই,—সরোজিনী যখন দুবছরের তখন তার পিতৃদেব স্বর্গলাভ করেন। স্বর্গ বলচি কেননা বাংলা-দেশে মৃতব্যক্তির উল্লেখ করতে হলে প্রথমেতে উক্ত পদটির প্রয়োগ করতে হয়। অবিশ্যি স্মৃতিরত্ন ছাড়া কেউ সঠিক বলতে পারবে না দেহান্তে তিনি কোন লোকে অবস্থান করচেন। কিম্বা তিনি আদৌ অবস্থান করচেন কিনা। এসব তত্ত্ব বড়ই জটিল।

স্বামীর অকাল মৃত্যুতে সরোজিনীর মা হেমলতা অবশ্য খুব একচোট খানিকটা চেঁচিয়ে কেঁদেছিল। অবস্থাটা বিবেচনা করলে কান্নাটা খুবই স্বাভাবিক। সদ্য পতিশোক-সন্তাপিতা নারীর বিলাপের সুরের মধ্যে ছিল করুণ রস, কিন্তু কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল ভাবীকালের জন্যে উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কা। এই থেকে দেখতে পাবে মৃতের চেয়ে জীবিতের জন্যে ভাবনা বেশী মানুষের। তা না হয়েই পারেনা। মৃতলোকের ভার কে নেয় তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু জীবিত লোকের ভার জীবন্ত মানুষের পরে। তোমরা সকলেই জানো জীবনধারণরূপ ব্যাপারটা সম্পাদিত হয় অর্থের সহায়তায়। এ ক্ষেত্রে সীতানাথ তার কিছুই রেখে যায়নি, রেখে গিছল ঋণ আর ভিটেবাড়ী। ও দুটোয় কাটাকাটি হলে থাকে শূন্য। মেয়েদের একটা সহজ সাংসারিক জ্ঞান আছে,

তারই বলে সেদিন হেমলতার মানসচক্ষে ভাবীকালের একটা দুর্গতির ছবি ফুটে উঠেছিল। অতি অল্প সময়ের ভেতর হেমলতা পতিশোক কাটিয়ে উঠলো কিন্তু কাটিয়ে ওঠা দায় হল তার অনটনের তীব্র এবং অবিরাম দহন। তারপর যেদিন ঋণের দায়ে ভিটেবাড়ী মহাজনের হস্তগত হয়ে গেল, সেদিন হেমলতার মন থেকে সব ভয় ভাবনা দূর হয়ে গেল। মেয়েটার হাত ধরে বাপের বাড়ী গিয়ে উঠল। স্বামী বেঁচে থাকলে অভিমান করে অনেক সময় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকা চলে। স্বামীহীনার বাপের বাড়ী যেতে হয় একটু কুণ্ঠার সহিত।

পঞ্চদশবর্ষ নানা দুর্য্যোগের ভিতর দিয়ে মামাবাড়ীতে সরোজিনীর পথ কেটে চলতে হয়েছিল। দুর্য্যোগে জীবনতরী বেয়ে এলে মাঝি হয় পাকা। সেই আবহাওয়ায় সরোজিনীর মন গড়ে উঠলো যেমন শক্ত হয়ে, বুদ্ধিও হল তেমনি ধারালো।

ঠিক এমনি সময়ে সরোজিনীর বুদ্ধি যখন খুব ঝকঝকে হয়ে উঠেচে তাদেরই পাশের বাড়ীতে এল একটি ছেলে বেড়াতে। দেখতে শুনতে বেশ, কথা নিরতিশয় মিষ্ট। কথায় আবার বেশ বাঁধুনিও আছে। কলকাতায় স্কুলে পড়তে পড়তে ঠিক আসন্ন পরীক্ষার সময় শরীরের মধ্যে কোথায় কি একটা ব্যাধি প্রবেশ করলে, তাকে অনুভব করা যায় কিন্তু বাইরে প্রকাশ নেই। এই সব রোগের ডাক্তারি প্রেসক্রিপসন হচ্চে হাওয়া বদলানো, সেই অনুসারে পিসের বাড়ীতে এসে নির্ভাবনায় মাঠের দিকে বিচরণ করতে লাগলো। দেখা গেল মাঠে বাটে মুক্ত হাওয়াতে বেড়ানোটা রজতের কাছে দুদিনেই অরুচিকর হয়ে দাঁড়িয়েচে। তার গতিবিধি রুদ্ধ হয়ে পড়লো সরোজিনীদের আঙিনায়। মিষ্টি কথা এবং চমৎকার কথার জোরে দুদিনেই রজত নিলে মেয়েমহলের মন জয় করে। মিষ্টি কথা যে শালীনতার দিক থেকে বড় কথা তা নয়, লাভের দিক থেকেও বড় কথা, উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে পরম সহায়ক। চোর এবং ভণ্ডরা সাধারণত এর আশ্রয় নেয়। আর দেখবে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে এর ফাঁদে পড়ে শিগগির।

রজতের মধুমাখা কথা সরোজিনীর হৃদয়ের এক সুপ্ত তারে আস্তে আস্তে ঝঙ্কার জাগিয়ে তুললো। আদিকাল থেকে এই হয়ে আসচে। এটাকে ভালবাসা বলতে পার, কিম্বা আধুনিক মতে যৌন আকর্ষণ বলতে পার। কথা হচ্ছে, এটা একটা মানসিক ভাব বিশেষ। এর ধর্ম্ম পরস্পরকে কাছে টানা। তবুও প্রথমটা সরোজিনী রজতকে কেমন একটু দূরে দূরে রেখেই চলত, আর একদিকে রজতের সঙ্গ পাবার জন্য তার মন উন্মুখ। সরোজিনীর দেহে রেখাচ্ছন্দের যে হিল্লোল খেলে বেড়াত তাকে যৌবনের প্রতীক মনে করে কবির মত দূর থেকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকার মত স্বভাব রজতের নয়। ছন্দের হিল্লোলকে হাতের মুঠোয় টিপে ধরাই তার কাছে পাওয়া। অবশেষে সে হল জয়ী। মেয়েরা যতই বুদ্ধিমতী হোক ভালবাসলে হয় বোকা—সাংঘাতিক রকমের বোকা। যতক্ষণ প্রেমে না পড়ে দেখবে মেয়েদের সহজজ্ঞান থাকে দিব্যি টন্‌টনে, বুদ্ধি থাকে ধীর, স্বভাব থাকে শান্ত সংযত।

প্রেমের এই হোলিখেলায় সরোজিনীর হার যখন দাঁড়ালো মারাত্মক রকমের, তখন একদিন নিভৃতে সে-ই রজতের কাছে প্রস্তাব করলে তাকে নিয়ে কোনো সুদূরদেশে পালিয়ে যেতে হবে, কেননা···শুনে রজত উঠ্‌লো চমকে। সরোজিনীকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লে, তাই হবে।

কিন্তু দুদিন পরে সে পলায়ন করলে। অবশ্য একাকী, কেননা শাস্ত্রেই বলেচে—পথি নারী বিবর্জ্জিতা। শাস্ত্রগুলির যত দোষই থাক, একটা মহৎগুণ এই, শাস্ত্র বাক্য নিজের সুবিধামত চিন্তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। একা নারীই যথেষ্ট ভার তার ওপর যদি অনাগত আর একটা ভারের সম্ভাবনা থাকে তাহলে ডবল ভার নেওয়ার জন্য কাঁধটা একটু শক্ত হওয়া চাই। দুদিন ভেবে ভেবে এই তত্ত্বই রজত লাভ করেছিল।

এদিকে সরোজিনীর কর্তৃপক্ষীয়দের মধ্যে বিষম একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। এরকম ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদারচেতা লোকেরও মাথা ঘুরে যায়। সৌভাগ্যক্রমে হাতের সামনে পাওয়া গেল হরনাথকে। হরনাথের মানসিক সম্পদ কারুর কাছে অজ্ঞাত ছিল না। ঠিক সেইজন্যই হরনাথ হল উপযুক্ত পাত্র। ইতিমধ্যে একদিন গভীর রাত্রিতে গ্রামের এক দক্ষ বৃদ্ধার সাহায্যে সরোজিনীর দেহ থেকে কলঙ্করেখা মুছে ফেলা হল। এখানে যে সব নৈতিক সামাজিক প্রশ্ন উঠতে পারে সে সম্বন্ধে তোমরা নিজেরা ভেবো। আমি কিছু বলতে চাই না, কেননা আমি বলচি সত্য ঘটনা।

বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে যাবার পর সরোজিনী এল স্বামীর ঘর করতে। স্বামীগৃহ ঠিক ঘর নয়, খড় এবং মাটির স্তূপ। নূতন আবহাওয়ায় সরোজিনীর মাথার কিছুমাত্র গণ্ডগোল হয়নি, বস্তুতঃ কোন কৃচ্ছ্রসাধনই তারপক্ষে কঠিন নয়। তারপর পতি যে অবস্থায় থাকে সতীর তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ এই হচ্চে আমাদের শাস্ত্রীয় মত। শ্বশুরবাড়ীতে সরোজিনীর কার্য্য কলাপ লক্ষ্য করলে মনে হতে পারত যেন এই মতটিকে প্রতিপন্ন করার জন্যই সে জন্মগ্রহণ করেচে। তাদের গার্হস্থ্যজীবনের একদিনকার ঘটনা এই, হরনাথ তার ছেঁড়া কাপড় দেখিয়ে একখানা নতুন কাপড়ের দাবী জানিয়ে বসল সরোজিনীর কাছে। এতদিন সরোজিনী যে কষ্টে সংসার চালিয়ে এসেচে তা শুধু সেই জানে। সরোজিনী শুধু একটু হাসল, সে কি হাসি। অমন মর্ম্মান্তিক হাসি তোমরা দেখনি। আসলে ওটা হাসি নয় কান্না। বললে—"আমার ত ভাত কাপড় দেওয়ার কথা নয়। তুমিই সেরকম একটা অঙ্গীকার করে বিয়ে করেচ"। অবশ্য এ পরিহাসটা হরনাথের সঙ্গে নয়। তার পক্ষে এর অর্থভেদ করা দুঃসাধ্য। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে নিজের একখানা সাড়ী এনে হরনাথের হাতে দিয়ে বললে—"এখানা হলে হবে"? হরনাথ বললে—"না"। হরনাথও সাড়ী ও ধুতির পার্থক্য ধরতে পারে। সরোজিনী বললে—"কাল এনে দোবোখন। এখন ত আমি হাটে যেতে পারবনা।" হরনাথ খুশী হল।

এমনি এক শুভলগ্নে সন্ধ্যেবেলায় সরোজিনীর দূর সম্পর্কের এক পিসি এল। পিসির পূর্ব্ব ইতিহাস সন্তোষজনক নয়। ভাইঝিকে হঠাৎ স্মরণ করার একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। ঘরে উঠেই বল্‌লে—"সরি, কি করে থাকিস এমন ঘরে। ওমা দম যে বন্ধ হয়ে আসচে"। সরোজিনী হেসে বল্‌লে, "কোথায় পাব ভাল বাড়ী পিসি"। পিসি মুচকে হেসে বল্‌লে, "পাবি লো পাবি"। সেই রাত্রিতে পিসির সঙ্গে সরোজিনীর যা কথাবার্ত্তা হল তার মর্ম্ম এই,—সরোজিনী যদি কলকাতায় যায় পিসি সেখানে কোনো বড়লোকের বাড়ী চাকরি জুটিয়ে দিতে পারবে···সেখানে সুখ যে কত তা না গেলে বুঝতেই পারা যায় না। সরোজিনীর অভিজ্ঞতা না থাকলেও কি একটা বিপদের কথা তার মনে বার বার উদয় হচ্ছিল। কিন্তু এখানে থাকলে না খেয়েই হয়ত মরতে হবে। কপালে যাই থাক কলকাতায় যেতে হবে।

এই ঘটনার দুদিন পরে হরনাথকে সঙ্গে করে পিসির সঙ্গে সরোজিনী কলকাতায় এসে উপস্থিত হল। বাস করার জন্য চার টাকা ভাড়ায় খোলার বাড়ীতে একখানা ঘর ঠিক হল, আর ঠিক হল কোনো নিঃসন্তান বড়লোকের বাড়ী চোদ্দ টাকা মাইনের একটা চাকরি,—রাঁধতে হবে।

কি পৌরাণিক কি আধুনিক কি ভাবীকালে একদল লোক ছিল আছে এবং থাকবে, তারা দলেও পুরু, যাদের ভোগযন্ত্রগুলি অপরিমিত ব্যবহারে নির্জ্জীব হয়ে পড়ে। কিন্তু তোমরা জানো ইন্দ্রিয়গুলির শক্তির একটা সীমা থাকলেও মনের তৃষ্ণার সীমা নেই। এই তৃষ্ণাকেই বুদ্ধদেব নিন্দে করেছেন। তোমরা ব্যস্ত হোয়োনা, তোমাদের ধর্ম্মকথা আমি শোনাতে বসিনি। হরেন বাবু অর্থাৎ যার বাড়ীতে সরোজিনী কাজ নিয়েচে তিনি এই দলের একজন বিশিষ্ট তান্ত্রিক।

একদিন সরোজিনী রান্নাঘরে একা রাঁধচে, হরেন বাবু এসে দাঁড়ালো চৌকাঠে পা দিয়ে, হেসে বললে "বামন-ঠাকরোণের রান্না চমৎকার! খুব মিষ্টি, আরও মিষ্টি তোমার—" সরোজিনী ঘোমটা আরও বেশী করে টেনে দিয়ে রান্নায় গভীর মনোনিবেশ করে দিলে। হরেন বাবু সোজা ঘরে ঢুকে সরোজিনীর হাত ধরলেন চেপে। সরোজিনী নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা পেয়ে বললে, "ছেড়ে দিন হাত!" হরেন বাবু বললে "ছাড়তে ত আসিনি, ধরতেই এসেছি।" এক হাত দিয়ে সরোজিনীর কুসুমকোমল অথচ দৃঢ় লতার মত দেহকে বেষ্টন করে নিজের কাছে টেনে নিয়ে এল। প্রাণপণ বলে নিজের দেহকে তার নির্ম্মম কবল থেকে মুক্ত করে এক খানা লোহার খুন্তি কুড়িয়ে নিয়ে সরোজিনী সরে দাড়ালো; বললে—"খবরদার।" সরোজিনীর মাথা থেকে কাপড় ও চুল খসে কাঁধে এলিয়ে পড়েচে, মুখ হয়ে উঠেচে রাঙ্গা টকটকে, চোখ থেকে বেরুচ্চে আগুনের ফুলকি! হরেন বাবু দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রৈল। তার সমস্ত জীবনের প্রেতলীলায় কঠোর অভিজ্ঞতা দুএকটা হয়েচে বটে। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা তার হয়নি। হরেনবাবুর মনে হল ব্যাপারটা ছলনা পদবাচ্য নয়, তাই আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

নিজের ঘরে ফিরে এসে সরোজিনী দেখতে পেলে হরনাথ একখানা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে নানান সুরে নানান ভঙ্গিতে বহু দেবদেবীর নাম নিয়ে একমাত্র প্রার্থনা জানাচ্ছে—যেন এবার তাকে রেহাই দেওয়া হয়। সরোজিনী কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখলে, আগুনের মত গরম শরীর। হরনাথ সরোজিনীকে দেখেই তার উদ্‌ভ্রান্ত করুণ দৃষ্টি তার মুখের পরে স্থাপন করলে। অনেকটা যেন সে ভরসা পেয়েচে এমনি ভাব। মুখের কাছে মুখ নিয়ে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মধুর কণ্ঠে সরোজিনী বল্‌লে—"এই যে আমি আছি, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। ঘুমোও তুমি, বেশী চেঁচিও না।" হরনাথ সরোজিনীর সেবা গ্রহণ করতে করতে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল। সরোজিনী উঠে জানলার ধারে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে তার উদাসদৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে নীল আকাশের অসীম গায়ে। তার বুকের ভেতর কি সব ভাবনা আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো, কবি হলে তা আমি তোমাদের বোঝাতে পারতুম, এখনকার মত তোমরা নিজেরাই কল্পনা করে নাও। হঠাৎ নিজের নাম শুনতে পেয়ে চমকে দেখলে রজত ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েচে।

রজত সেদিন গলির ঐ পথ ধরে যাচ্ছিলো বোধ হয় কোনো কাজে। জানলার কাছে সরোজিনীর মূর্ত্তি দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারপর তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ঢুকে ডাকলে—"সরোজ।" অত্যন্ত রুক্ষভাবে সরোজ জিজ্ঞাসা করলে "আপনি এখানে কেন? কেন এয়েচেন এখানে?" রজত অবশ্য এর কি জবাব দেবে ভেবেই পেলে না, বললে "আমি ভাবলুম"—সরোজিনী বললে "আপনি অনেক ভেবেচেন। ঐ আমার স্বামী শুয়ে আছেন, আপনি চলে যান এখান থেকে।" এই কি সেই সরোজিনী! রজতের পৌরুষে লাগলো বিষম ঘা। সরোজিনী বললে—"দাঁড়িয়ে রৈলেন যে।" আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করা চলে না। রজত বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

যে বস্তু সুলভ তার প্রতি মানুষের অবজ্ঞার অন্ত নেই। সরোজিনী একদিন ছিল সুলভ, আজ হয়েচে দুর্ল্লভ। রজতের মনে হল তার মুখের গ্রাস অপর এক ব্যক্তি কেড়ে নিয়েচে। পরদিনই রজত চললো সরোজিনীর কাছে। মনে মনে কৈফিয়ৎ দিলে, আমি চলেচি ক্ষমা প্রার্থনা করতে।

সরোজিনীর ব্যবহারে কিন্তু রজত সেদিন চমৎকৃত হয়ে গেল। আশ্চর্য্য মেয়েমানুষের মন। কণ্ঠে আজ তার মধু ঝরে পড়চে। দুজনে মিলে লেগে গেল হরনাথের সেবায়। রজত ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। ওষুধ আনতে ছুটলো এ দোকান সে দোকান। কিন্তু হরনাথ তিন দিনের দিন পৃথিবীর বাস তুলে চলে গেল।

হরনাথের শবযাত্রায় রজত ক্লান্ত, সমস্ত দুপুরবেলা ঘুমিয়ে কাটিয়েচে। সন্ধ্যেবেলা সর্ব্বাঙ্গে এত ব্যথা অনুভব করলে যে সেদিন আর সরোজিনীর কাছে যাওয়া হল না।

পরদিন প্রায় বেলা দশটার সময় রজত সরোজিনীর ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালো। দেখলে ঘর বন্ধ, তালা চাবি দেওয়া। রজত বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চলে যাবে কিনা ভাবচে, এমন সময় পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক। রজতের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনার নাম কি রজত বাবু?" রজত বললে "হ্যাঁ। কেন?" স্ত্রীলোকটি রজতের হাতে একখানা খাম দিয়ে বল্‌লে—"সরোজিনী এই চিঠিখানি আপনি এলে দিতে বলে গেচে।" রজত জিজ্ঞেস করলে—"সরোজ কোথায় গেচে, ঘর বন্ধ দেখচি।" স্ত্রীলোকটি বললে—"আমি জানিনা! কাল একটি আধবয়সী মেয়েমানুষ এসেছিল তারই সঙ্গে কোথায় গেচে।" এই বলে স্ত্রীলোকটি নিজের ঘরে ঢুকে পড়লো।

রজত খাম খুলে দেখে তার মধ্যে রয়েচে তারই দেওয়া একটা আংটি, আর চিঠিতে এই কয় ছত্র লেখা আছে। এই বলে চক্কোত্তি মশায় চোখ বুজে ঠিক মুখস্থ বলে যাওয়ার মত আবৃত্তি করলেন—প্রিয়তম, জীবনে যা একবার আসে তা আর ফিরে আসে না। একদিন আমি তোমাকে ভালবেসেছিলুম, আজও বাসি। তুমি সেদিনও ভালবাসনি, আজও বাসনা। তোমার দেওয়া আংটি যত্ন করে হাতে রেখেছিলুম। আজ ফেরত দিচ্ছি, কোনো দরকার নেই। এখানে তুমি আসবে আমি জানি, কিন্তু আমার দেখা পাবে না। আমি বন্যায় ভেলার মত ভেসে এসেচি, কোথায় যাব জানি না। ইতি সরোজ।

সুরেন জিজ্ঞাসা করলে—"তারপর"।

চক্কোত্তি বললেন—"তারপর আর কিছু নেই।"

আমরা দেখতে পেলুম চক্কোত্তি মশায়ের হাতে একখানা ময়লা খাম। আর তার দুচোখের কোণায় জল চিক্ চিক্ করছে। চক্কোত্তি তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ফেল্লেন, তারপর ডাক দিলেন—"রাধু এইবার বাবা, একছিলিম তামাক।"

সুধীর রাহা

জাপানী কবি নোগুচি

শ্রীকালীচরণ মিত্র

সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়া ঘেরা গীতি কবিতা—স্বল্প পরিসরে রসের ভিয়ান করা। মূর্ত্ত হইয়া উঠে পেলব-কোমল ভাব-শতদল কেন্দ্র করিয়া একটি মাত্র স্পন্দনকে—চীনা জবার মাঝের ডাঁটিটির মত। প্রজাপতির ডানায় রংয়ের যেন ছিটা—আছে কি নাই, ঝিলিক হানে নয়নে, শিশির ঝরায় মনের গোপন কোণে!

এমনই কবিতাকে রূপ দিয়াছেন বিশ্ববিশ্রুত কবিরা—গেটে, হুগো, হায়েণ ইত্যাদি, আর একালে ভারতের মুকুটমণি বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ এবং কতক পরিমাণে প্রাচ্যের অন্যতম কৃতীসন্তান জাপানী কবি ইওন নোগুচি প্রভৃতি। আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় যে সুর—সুরের মূর্চ্ছনা ও দ্যোতনা, তাহাই যেন ধরা দেয় তোমার আমার কাণে কাণে, মসগুল করে মধুময় আবেশে, চেনা ও অচেনা ঝঙ্কার তুলে ত্রিতন্ত্রীতে যাদুস্পর্শে।

সাঁঝের বাতি নড়ে চড়ে যেমন, জীবন-সায়াহ্নে শ্রেষ্ঠ কবিরাও কি সেই পথ বাহিয়া চলেন? সসাগরা ধরণীর রূপ বহু, বর্ণও বহু, তাহারই লোলুপতায় বিভোর কি তাঁহারা? রবীন্দ্রনাথ সাতের কোঠায় নিত্য পাড়ি দিতেছেন সমুদ্র পারে দেশ-দেশান্তরে, উড়িতেছেন আকাশমার্গে এরোপ্লেনে, রেলে মোটরে ঘুরিতেছেন অবিশ্রান্ত। কবি নোগুচিও বৃদ্ধ বয়সে না যাইতেছেন কোথায়, না দেখিতেছেন কি—জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, জাপানের এই ক্ষণজন্মা মনীষীর প্রভূত প্রতিষ্ঠা ইংলণ্ড প্রমুখ য়ুরোপ খণ্ডের সকল দেশে এবং বিশেষ করিয়া মার্কিন মুলুকে। ইংরাজী ভাষায় বিরচিত তাঁহার বিবিধ গদ্য ও প্রধানতঃ পদ্য পুস্তকগুলির সমাদরের অন্ত নাই সর্ব্বত্র। জাপানের টোকিও কেইওগিজুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক তিনি। প্রতীচ্যের নানাদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন প্রচুর, সম্প্রতি প্রাচ্য ভ্রমণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। গঙ্গা, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কাঞ্চনজঙ্ঘা, তাজমহল, অজন্তার গুহা প্রভৃতি দর্শনের তাঁহার অভিলাষ। সম্প্রতি রেঙ্গুন হইয়া আসিয়াছেন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বাসভূমিতে—এই সহর কলিকাতায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে ঘটিয়াছিল যেমন, এই দুই বাণীর বরপুত্রের হইবে হয়ত তেমনই মহামিলন শেষ বয়সে—কবিতার আবাসস্থল ভারতবর্ষে। নগরের বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী দিবেন অবশ্য শ্রদ্ধা প্রেম ও অনুরাগের পুষ্পাঞ্জলি। আমরাও জানাইতেছি তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন—তাঁহার সুললিত কবিতার পীযূষ-ধারায় মুগ্ধ আমরা।

পৃথিবী-বিখ্যাত এই জাপানী কবির রচনার সহিত পরিচয় নাই বলিলেও চলে বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের। অনুবাদ-সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত ছন্দ-সরস্বতী কবি সত্যেন্দ্রনাথ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে পরিচয় সাধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার "মণি-মঞ্জুষা" নামক অনুবাদ গ্রন্থে নোগুচির কয়েকটি অনবদ্য কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেন—রূপে ও রসে তাহা টলটল। ইংরাজী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করিতে চাহি না। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে মূল হইতে কোন অংশে ন্যূন নয়। তাহা হইতেই রসগ্রহণ সহজ।

"নববর্ষে" কবি দেখিতেছেন নূতন মাধুরী ও নূতন উল্লাস—প্রাচীন ধরার জীবনে সমাগত যেন শুভক্ষণ, নব উৎসবে মাতোয়ারা নরনারী। বলিতেছেন—সূর্য্যের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া একযোগে দাঁড়াইয়া সকলে—

অন্যায়ে আজি হাস্যের তোড়ে
করিব বিসর্জ্জন,
তাজা এ হাওয়ায় শিস্ দিয়ে শুধু
ফিরিব অনুক্ষণ।

*　　*　　*

এবার মোদের যাত্রার পথে
হাসি আর আলো সাথী;
জয় জয় জয় নূতন সূর্য্য!
জয় সূর্য্যের ভাতি।

"আকাশের খোকা-খুকী"দের দ্বৈত সঙ্গীতে খোকা-খুকীরা জিজ্ঞাসা করিতেছে পরীকে—"হে অপ্সরী, আমাদের নিজের তাল কি?" পরী উত্তর করিলেন—"ভয় নাই তোমাদের, না ভাবনা। শূন্যে বুনিয়া চলিয়াছ স্বপ্নজাল, হাওয়ার মত অব্যাহত তোমরা, হাওয়ার তালেই নৃত্য কর নগ্ন পদে টাটকা রোদে পারুল গাছ হাসে যেখানে।" তখন বলিতেছে আকাশের খোকা-খুকীরা—

"সুর শিখেছি তাল শিখেছি
এখন মোরা করব কি?
আলোর ধারা পড়ছে ঝরে
মুঠায় ক'রে ধরব কি?

শুনিয়া মৃদুহাস্যে পরী বলিতেছেন—

"লক্ষ্মী মেয়ে! লক্ষ্মী ছেলে!
ঘুমাও এখন মার কোলে;
হাওয়ার খোকা হাওয়ার খুকী
ঝুলছে তারার হিন্দোলে।

"বাসন্তিকায়" পরীকে সম্বোধন করিয়া কবি গাহিতেছেন—

বাসন্তিকা! বাসন্তিকা!
দুখানি তোর রঙীন পাখা
ঢুলিয়ে দে!
হাস্নুহানার গন্ধেতে ভোর
প্রাণের পরে স্বপ্নের ঘোর
বুলিয়ে রে।
* * *
উঁকি দিয়ে লুকিয়ে ফেরা,—
এই খেলা কি খেলার সেরা?—
মর্ত্ত্যে আয়।
ধরতে তোরে হারিয়ে ফেলি,
চোখের জলে চক্ষু মেলি,
হায়রে হায়!

তখন পাকাপাকি ধার্য্য হইল—না, ছাড়া আর হইবে না, ধরিয়া রাখিতেই হইবে পরীকে—

এবার ফাগুন ফিরলে পরে—
ছাড়ব নারে—রাখব ধ'রে;
ভাবছি তাই।
হায় গরবী। হায় সোহাগী!
আমরা যে তোর পরশ মাগি'
ধরতে চাই।

গীতি-কবিতার সমুজ্জ্বল রত্ন 'রহসি'—

গোলাপ যে ভাষা বলিতে এখন গিয়েছে ভুলি'
সে নিভৃত ভাষে নারী সে কহিল মু'খানি তুলি'—
'প্রিয় মোর! প্রিয়তম!'
সচেত গোলাপ সম;
পুরুষ বিভোল্ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া!"
সে আওয়াজ আজো ফোটে নাই কোন সাগর দিয়া।

তারপর 'মখ্‌মল্ পায়ে জোছনা যেমন ভুবনে নামে, সেই মত চুপিচুপি বামে হেলিয়া নারী আপনি কথার প্রতিধ্বনি করিল। পুরুষও পূর্ব্ববৎ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল। কবি বলিতেছেন সেই শব্দ এখনও গিরিবক্ষে লুকান আছে।

বলিতে বলিতে কবির মনে পড়িয়া গেল সন্ধ্যারাণীকে। গোধূলি শেষে যে সুরে তারকারাজিকে ডাকে সন্ধ্যা সেই মৃদুসুরে নারী তখন প্রিয়তমকে রভসাবেশে পুরাতন সম্ভাষণের পুনরুক্তি করিল, পুরুষও প্রত্যুত্তর দিল সেই দুই অক্ষরে—"প্রিয়া"। সেই আওয়াজে জাগিয়া উঠে ফাল্গুন, মৃত উঠে জীবন্ত হইয়া।

অবশেষে—

তুষার গলিয়া গোপনে যেমন সলিল সরে
তারি মত সুরে নারী সে কহিল নিরালা ঘরে,
'প্রিয় মোর। প্রিয়তম!'
তরুণী তটিনী সম;
পুরুষ বিভোল্ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া!"
সে ভাষায় শুধু আকাশেরে ডাকে বনের হিয়া।

"বরভিক্ষায়" এক জাপানী তরুণীর মনোমত পতিলাভের প্রার্থনা লিপিবদ্ধ। ছোট ছোট কুমারীরা আমাদের এই বাংলায় 'পুণ্যিপুকুর' আদি কতমত ব্রত করিতেন ঐ একই উদ্দেশ্যে। কবিত্বমণ্ডিত ভাষায় কবি নোগুচি একটি সুন্দর আলেখ্য চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন। সেই সহজ সরল চিত্রে মন্ত্রমুগ্ধ না হন এমন কে—কোথায়?

চিত্তহারানী জাপানী বালিকা
ওহারু তাহার নাম,
বুকে তার চেরী-ফুলের স্তবক
রক্তিম অভিরাম।
জানু পাতি বালা পতি-বর মাগে
প্রজাপতি-মন্দিরে;
থরে থরে ফুটে চন্দ্রমল্লি
ওহারুর তনু ঘিরে।

বালিকা করজোড়ে বলিতেছে—দাও প্রভু, দাও এমন বর যাহার উৎসুক উষ্ণ নিশ্বাসে চরাচর আসে নিভিয়া, যাহার নিশ্বাসে ক্ষণিকের জন্য হয় নেশা, ক্ষণেকের জন্য হরণ করে দৃষ্টি, স্বর যাহার গোপন সানুর মর্ম্মরের মত যেখানে বসন্তের চাঁদ একা চুপিচুপি করে অবস্থিতি। আরও—যাহার কটাক্ষে প্রাণ হইবে পাগল, আফিম-ফুলের ঈষৎ রক্তবর্ণ গাছগুলি মৃদুবায়ু-হিল্লোলে করিবে আন্‌চান্ এবং যাহার ভালবাসা হইবে পাখী-ডাকা ছায়া-ঢাকা কাননের মত উদার। উচ্ছ্বসিত হইয়া বালিকা ফুকারিয়া উঠিতেছে—

"দাও হেন বর সাগরের মত
গম্ভীর যার বাণী,
আন্-ভুবনের অজানা সুরভি
পরাণে মিলাবে আনি,
কল্প-আঙুলে ফুটাবে যে মোর
সকল পাপড়িগুলি।

* * *

"চুম্বনে যার তরুণী ওতারু
নারী হবে রাতারাতি।"

সুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বালিকা আত্মহারা হইয়া গিয়াছে, চাহিতেছে এমনই বর যাহার হাসিতে ও কথায় প্রাণে আসিবে সান্ত্বনা, কাব্যলোকে জ্যোৎস্নার ন্যায় আশে পাশে সর্ব্বদা রহিবে যে, নিদাঘের শ্যাম ছায়ার মত স্নেহ হইবে যাহার মধুর ও উদার।

অনেক চাহিয়া অনেক বলিয়া প্রার্থনার উপসংহার করিতেছে বালিকা এইবার—

"দাও হেন পতি যাহার মুরতি
হৃদে অহরহ রয়,
জনমের আগে সাথী যে ছিল গো
মরণে যে পর নয়;
জন্ম-তোরণে জল অরণো
হারায়ে ফেলেছি যায়।"

* * *

"দাও সে যুবকে আছে যার বুকে
অঙ্কিত মোর নাম,
যদিও বলিতে পারিনে এখন
কবে তাহা লিখিলাম!
কোন্ সে জনমে কোন্ সে ভুবনে
কোন্ বিস্মৃত যুগে।"

তখন—

চেরীফুল সনে চন্দ্রমল্লি
জাগে ওহারুর বুকে।

মিঠা সুরে মধুপের আলাপ হইল এতক্ষণ, এইবার গভীর সুরে প্রবন্ধের সমাপ্তি।

"বৈরাগ্য" কবিতায় কবি জানাইতেছেন যে বৈরাগ্যের হাওয়া লাগিয়া কুহেলিকার কুহক ঘিরিয়াছে তাঁহাকে, সমাধি-ভূমির সমাধান-বাণী বেড়িয়াছে চৌদিকে। অচঞ্চল কবির চিত্ত-বিশ্লেষণের বর্ণনা এইরূপ—

নিবাত নি-বাক্ ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফিরি
নীরব আঁধার জড়াই বুকে,
যেথা কোলাহল চির সমাহিত
আমি সে নিভৃতে বেড়াই সুখে।

* * *

আব্‌ছায়া-ঘেরা ভোরের বাসরে
ঘুরি ফিরি একা কৌতূহলে,—
যেথা বিস্মৃত লভে বিশ্রাম
ধ্বংসের বুকে ধূলির তলে।

শ্রীকালীচরণ মিত্র

পট ও মঞ্চ

আনন্দ

পাঠকবর্গ আমার সশ্রদ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ বিজয়ার নমস্কার গ্রহণ করুন। তাঁদের কাছে আমি নিবেদন জানাই যে 'আনন্দ'কে যেন কেউ দোষদর্শী ব'লে ভুল না করেন। সমালোচনা আর দোষদর্শনে অশেষ প্রভেদ; সমালোচকের সহানুভূতি-হীন হওয়া সাজেনা; কিন্তু 'সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা' যেখানে স্তাবকতার রূপান্তর সেখানে প্রকৃত অবস্থা পর্য্যবেক্ষনের ও কথনের প্রয়োজন। উপরন্তু, আমি সু-উচ্চ আশার পরিপোষক এবং এ কারণে পট ও মঞ্চের বর্ত্তমান প্রচেষ্টার প্রগতির সম্বন্ধে উদাসীনতা আমাকে বিশেষ খুসী করতে পারে না এবং আমার বিশ্বাস, শিল্পের উন্নতিকামী সকলকেও না। দ্রুত, বিস্ময়কর রকম দ্রুত, উন্নতি যে চেষ্টা যত্নেরও বহির্ভূত নয় তা নিউ থিয়েটার্সের 'দেবদাস' প্রমাণ করেছে এবং সে প্রমাণের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে তাঁদেরই 'ভাগ্যচক্র'।

বাস্তবিক, Dr. Jekyll & Mr. Hydeএর কথা মনে হলে আজও কত আনন্দ হয়। Fredric March ঐ ছবিতে যা অভিনয় করেছে তা অবিস্মরণীয়। কিন্তু তারপর Fredrick এত বেশী ছবিতে নেমেছে আর এত এত সাধারণ ছবিতে নেমেছে যে তার সুনাম ক্ষুণ্ণ হবার মত হয়েছিল। We Live again ও Death takes a Holyday এই দুটী ছবিতে March আমাদের যথেষ্ট তৃপ্তি দিয়েছিল কিন্তু আমেরিকান Les Miserablesএ তার অভিনয় আমাদের তাদৃশ খুসী করতে পারেনি। Garboর Anna Karenina যা এবার Venice Expositionএ সেরা ছবি বিবেচিত হয়েছে তার নায়ক-রূপে Fredric Marchকে দেখবার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

রঙীন ছবি

Thackeray প্রণীত Vanity Fair গ্রন্থাবলম্বনে তোলা ছবি Becky Sharp কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। ছবিটী রঙীন। রঙীন ছবি অবশ্য অনেক দেখা গেছে। আমাদের মনে পড়ে Viking, Whoopee প্রভৃতি রঙীন ছবি দেখবার কালে আমা-দের চোখ ফেটে জল বেরিয়েছিল। রঙের এমনি নয়নান্তকর অবস্থা অল্পদিন হোল ঘুচেছে যখন এল পাইয়োনীয়ার পিক-চার্সের La Cucaracha, Betty Boop আর Silly Symphony কার্টুনে ধরলো রঙ, আর এল Jolly Little Elves নামে ইউনিভার্সালের রঙীন কার্টুন। এদের মধ্যে আমাদের মতে শেষোক্ত কার্টুনেরই রঞ্জন সব চেয়ে ভাল। ছোট রঙীন ছবি আজ সংখ্যাতীত। প্যারা-মাউন্টের ও মেট্রোর ছবির রঙ খুব গাঢ়, ওয়ার্ণার ও ইউ-

নভার্সালের আবার অযথা ফিকে, La cucaracha ও Silly Symphony কার্টুনের রঙ গাঢ়র দিকে; নবতম রঙীন ছবি Legong ওরও রঙ পাতলা—যথাযথ কোনটাই নয় কিন্তু

Gary Cooperকে প্রত্যেক চিত্রপ্রিয় অবশ্যই একবার দেখে থাকবেন কারণ এই চমৎকার অভিনেতা বহুবৎসরাবধি ছবির নায়ক সেজে আসছে। One Sunday Afternoon, A Farewell to Arms, Morrocco, Now and Forever, সেই কুখ্যাত Bengal Lancer, Operater 13, The wedding Night,...(আর কত নাম করবো বলুন!) প্রভৃতি ছবির নায়ক Gary Cooper ছবি ভক্তদের নিশ্চয়ই অজানা নয়। যাই হোক, আগামী ছবি Peter Ibbeston (সঙ্গে Ann Harding) ও The Pearl Necklace (নায়িকা Marlene Dietrich)।

সবারই রঙ নয়নাভিরাম। পাইয়োনীয়ার পিকচার্সেরই Becky Sharp রঞ্জনকৌলীন্যের জন্য চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হলেও এমন সুন্দর রঙীন ছবি পূর্ব্বে দেখা যায়নি। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয় বলছি এই জন্য যে, এই ছবির রঙ চোখকে চমকে না দিলেও তাকে রঙের খেলার দিকে একান্ত আকৃষ্ট রাখে—স্বাভাবিকতায় স্নিগ্ধ করে না। যাই হোক, Becky Sharp রঙের নবযুগের প্রথম সম্পূর্ণ ছবি।

চাঞ্চল্যটা কি কারণে তাই বলি। কথা উঠেছে, ছবিতে রঙের কাজের জন্য যখন তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন কেন ভবিষ্যতের সব ছবি রঙীন হবে না? প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব ছবি রঙীন করতে হয়। কিন্তু তা কোথায় এবং কেন বাধা পায় তাই ভেবে দেখতে হবে।

প্রথম কথা হোল, রঙীন হলে ছবির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় কিন্তু তার স্বাভাবিকতা বৃদ্ধি পায় ত'? পায় না। তারপর যখন রঙই হবে ছবির প্রধানতম আকর্ষণ তখন ছবি দেখে মন তৃপ্ত হবে ত'? না, চোখের আনন্দ বৃদ্ধি পাবে কিন্তু রঙের নেশায় ভরপুর চোখ মনকে ভুলে গিয়ে তাকে উপবাসী রাখবে। তবে রঙ যতদিন চোখকেই ভুলিয়ে রাখবে, তাকে মনের রসাস্বাদনের সাথী হতে দেবে না, অর্থাৎ যতদিন রঙের জন্য ছবির সৌন্দর্য্যের সঙ্গে স্বাভাবিকতা বৃদ্ধি পাবে না, ততদিন রঙীন ছবির সার্থকতা অল্পই। এখানে যে সব কথা বললাম সেগুলি আমার নয়, আমাদের বন্ধু অমৃত বাজারের সিনেমা এডিটর শ্রীযুত নির্ম্মলকুমার ঘোষ বা এন, কে, জি-র।

রঙীন ছবির রেওয়াজ যখন আসবে তখন লোকে আজকের মত কেবল রঙের খেলা দেখবার জন্য ছবি দেখতে যাবে না অর্থাৎ সাধারণ ছবি খুব চমৎকার রঙীন হলেও বর্ত্তমান ছবির সমাবস্থাপন্ন হবে অথচ খরচ, সাধারণ ছবিকে রঙ করার জন্য খরচ, বর্ত্তমান ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ উপরন্তু অধিক লাগবে। কিন্তু তাতে লাভ কি? যে যুগে সব ছবিই রঙীন হবে সে যুগে রঙীন হলেও সাধারণ ছবি সাধারণত্বের পর্য্যায়ের ওপরে নয়। সাধারণ ছবিতে লাভ খুব বেশি নেই, চাহিদা মেটাবার ও বাজার বজায় রাখার জন্য সাধারণ ছবির সৃষ্টি। এই ছবিকে রঙ করতে গেলে ব্যয়ই বৃদ্ধি পাবে কিন্তু আয় সমানই থাকবে। এ যুগে ছবির ব্যবসায়ে বাজার বজায় রাখা এক বিশিষ্ট কৌশল। আমেরিকানরা এক কালে এদেশে শতকরা ৯৯ ভাগ ছবি দেখাতো এবং আজও তারা সুবিধা পেলে ঐ পরিমাণ ছবি দেখাবে। কিন্তু

এখন যদি তারা বর্ত্তমান চাহিদা অনুযায়ী ছবি জোগান দিতে না পারে তবে তাদের ক্রমশঃ প্রবলায়মান প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও ব্রিটেন এই সুযোগে এ দেশে ছবির বাজার আমেরিকানদের কাছ থেকে অনেকখানি কেড়ে নেবে; এবং রঙীন ছবি করতে গেলে সময় অপেক্ষাকৃত বেশি লাগবে। মোট ছবির সংখ্যা যাবে কমে কারণ সপ্তাহে, দু সপ্তাহে বা মাসে একখানি ক'রে রঙীন ছবির জন্ম দেওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়।

কিন্তু সত্যি রঙীন ছবি চমৎকার জিনিষ। নাচের দৃশ্যগুলি রঙীন হলে কত সুন্দরই না হয়, কার্টুন ও অন্যান্য ছোট ছবি যাদের স্বাভাবিকতার পরে খুব বেশি জোর পড়ে না তাদের রঙীন হওয়ার থেকে আর কি কাম্য থাকতে পারে। আমেরিকা ছায়াশিল্পের জন্য ধন জন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে দ্বিগুণতার আশ্রয় নিলে ভবিষ্যতে বরাবর রঙীন ছবি তোলা সম্ভব। আমেরিকান বা ব্রিটিশ ছবি এদেশে যতই কম টাকা পাক না কেন ঐ সব ছবির বাজার পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ব'লে মোটের ওপর সাধারণ ছবিও লাভদায়ক হয়। কিন্তু ছবির ভবিষ্যৎ অর্থাগমের কথা বলা যায় না। বহু ধুম ধাম খরচ খরচা ক'রে তোলা হলেও অনেক ছবি The Scarlet Empress বা The Devil is a Woman এর মতই আশানুরূপ আর্থিক সাফল্য লাভ করতে পারেনি। রঙকরা Extra risk হলেও, আমাদের মনে হয়, উক্ত দুখানি ছবিতে রঙের আকর্ষণ থাকলে ওগুলি অর্থপ্রসূ হোত।

ভারতবর্ষের কথা আলাদা। এদেশে ছবি করার খরচ অপরাপর দেশের অনুপাতে অত্যন্ত কম। এতাবৎকাল ম্যাডান থিয়েটার্সের 'মাধবীকঙ্কন' (নির্ব্বাক) ও 'বিল্বমঙ্গল' (সবাক) এবং প্রভাত ফিল্মসের 'সৈরিন্ধ্রি' (সবাক)—মাত্র এই তিনখানি ছবি Germany থেকে রঙ করিয়ে এনে দেখানো হয়েছে এবং ছবিগুলি চলেছিলও ভাল। কিন্তু রঙের যখন রেওয়াজ আসবে তখন নটীর পূজা, পুনর্জ্জন্ম, ঋণমুক্তি, বিল্বমঙ্গল, পাতালপুরী, পায়ের ধূলো, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতির মত ছবি রঙ করলে কোনই ফল হবে না—অযথা ব্যয়াধিক্যের জন্য অর্থহানি ঘটবে। আর তা ছাড়া যেখানে ছবির বাজার প্রা...শক বা কেবল একটা দরিদ্র দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে অধিকতর ব্যয়ের রঙীন ছবি যে লাভ দেবে অল্পতর ব্যয়ের সাদা ছবি তার চেয়ে বেশি লাভজনক হবে। সব ছবি লোকে রঙ করতে যাবেই বা কেন? সাধারণ ছবির পিছনে অযথা অধিকতর অর্থ ও পরিশ্রমের শ্রাদ্ধ করবার মত পাগল এখনও মানুষ হয়নি। সব দেশেই Super বা বিরাট ছবির রঙ্গন চলতে পারে কারণ ঐ প্রকার ছবিগুলি ব্যয়বহুল হলেও ভালই দাঁড়ায় এবং অর্থপ্রদও হয়। এ দেশে অল্প অর্থেই খুব ভাল ছবি তোলা যায় এবং ছবি ভাল হলেই তা আশাতীত লাভদায়ক। রঙীন সুপার ছবি করতে ব্যয় বাড়বে কিন্তু

Claire Trevor হচ্ছে ফক্স-এর ভাবী প্রধান তারকাদের আর এক জন। বহু ছবিতে সু-অভিনয়ের ফলে Claire চিত্রপ্রিয়দের মনে স্থায়ী আসন পাততে সমর্থ হয়েছে। Baby Take a Bow, Elinor Norton প্রভৃতি ছবিতে Trevorকে দেখে থাকবেন এবং অচিরেই ফক্সের বিরাট ছবি অমর কবি দান্তের Infernoতে দেখতে পাবেন।

আয় সেই অনুপাতে নাও বাড়তে পারে। যাই হোক, এদেশে রঙীন ছবির ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ। তবে অবশ্য সব

ছবিকেই রঙীন করতে হলে সব ছবিই যত্ন সহকারে তুলতে হবে. কিন্তু বাজার বজায় রাখা যে ব্যবসায়ীদের প্রধান লক্ষ্য তাদের সব পণ্যই সমান ভাল হতে পারে না।

Fox Filmsএর উঠতি তারকাদের মধ্যে Alice Faye এক জন। George Whita's Scandals, 365 Nights in Hollywood প্রভৃতি Aliceএর স্মরণীয় ছবি। গানের জন্য Fayeর খুব নাম কিন্তু অভিনয়েও Alice সমপারদর্শিনী। Every Night at Eightএ Alice Fayeকে দেখতে পাবেন প্লাজায়।

যাঁরা সব ছবিতেই রঙ দেখবার ভক্ত তাঁদের কানে কানে একটা কথা বলি : তাঁরা পূরা বা আংশিক রঙীন ছবিকারদের দিকে ফিরে তাকান, তার কেউ আর রঙীন ছবি করতে সাহসী হচ্ছে না। Becky Sharpএর কর্ত্তা John Hay Whitneyর দুর্ভাবনার অন্ত নেই, Inferno নিয়ে Winfield Sheemanএর ঘুম হয় কি না জানি না, A Midsummer Nights Dreamএর জন্য ওয়ার্ণারের বড় সাহেব Jack Warner কতবার cash departmentএ takingsএর খোঁজ নেয় আমরা জানি না······অথচ এগুলি সব Super, এরা অর্থনাশ করে না।

সুপার ছবি আগাগোড়া রঙ করা যেতে পারে, ভাল ছবির কয়েকটি দৃশ্য রঙীন হতে পারে কিন্তু সব ছবিই আগাগোড়া রঙ করা? হতেই পারে না।

অনধিকারচর্চ্চা।

মানুষের অতীত জীবনযাত্রার প্রণালী নিয়ে কথা উত্থাপন করা সমালোচকের কর্ত্তব্য নয়—তার বর্ত্তমান কাজকর্ম্ম নিয়েই আমাদের আলাপ আলোচনা। কিন্তু মানুষ বয়োগ্রগতির সাথে যে পথ অতিক্রম করে এসেছে সেই পথের ধুলো তার সর্ব্বাঙ্গে থেকেও যেতে পারে। তখনি টান পড়ে পিছনে যখন আমরা দেখি মানুষের বর্ত্তমান কাজে কোথায় যেন গরমিল রয়ে যাচ্ছে, দেখি এই কর্ম্মমন্দিরে সে অনধিকার প্রবেশ করেছে। ছায়াশিল্প যখন এদেশে নূতন তখন তার কর্ম্মীরা অবশ্যই বিভিন্ন পথ থেকে এদিকে আসবে জীবনের পাথেয় সংস্থানের চেষ্টায়; সবাই নবাগত। এবং আমরা তাদের সকলকেই স্বাগতম্ জানাই—আমরা সম্পূর্ণ ভুলে যাই অমুক ছিল কেরাণী, অমুক ছিল cutter আর অমুক এসেছে gutter থেকে, কারণ তাদের কাজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ—অতীতেতিহাসের সাথে নয়। আজ ছায়াশিল্পের শৈশব অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রথমে গৃহপ্রবেশের কালে যাদের স্বাগতম্ বলেছিলাম আজ তাদের অধিকাংশেরই উপস্থিতি আদৌ বাঞ্ছনীয় মনে করছি না : আজ বুঝছি এরা কেবল বসে বসে অন্ন ধ্বংস করেছে, গৃহের শ্রী বৃদ্ধি না ক'রে তার শ্রীহীনতার কারণ হয়েছে। বুঝছি এরা বারংবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও নিজেদের যোগ্যতা অপ্রতিপন্ন ক'রে নিছক অনধিকার চর্চ্চা ক'রে এসেছে—নিজেদের অধিকারবাদ আদৌ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে ঘরুয়া আফিসের মত। কর্ত্তাদের আত্মীয়রা সব বছরের পর বছর কোম্পানীর কাজে ঢুকেছে,

Abraham Lincoln (সবাক), Rain, An American Madness, Gabriel over the white House, Storm at Day break প্রভৃতি ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সকলেই বুঝবেন, Walter Huston কত বড় চরিত্রাভিনেতা। Hustonএর আগামী ছবি The Life of Cecil Rhodes

কাজ দেখাতে পারে না কিন্তু তাতে বেতনবৃদ্ধি বা কর্ম্মের স্থায়িত্বের কিছুই এসে যায় না অথচ বাজারে যোগ্যতর ব্যক্তিরা ভিখারীর মত দিন যাপন করছে। হাঁ, আমি পুনরুক্তিই করছি। অসংখ্য chance পেয়ে যে নিজের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করতে পারেনি, যার মাঝে এতটুকু Shark দেখা যায়নি সে কেন শিল্পের কল্যাণার্থীর মত যোগ্যতর ব্যক্তির জন্য স্থান ছেড়ে দেয় না? মানুষ উন্নতি করে অভিজ্ঞতার বলে আর প্রতিভার প্রভাবে। কিন্তু শিল্প যে দেশে কয়েক যুগ পেছিয়ে আছে সে দেশে আমরা অপেক্ষা করতে পারি না প্রতিভাহীনের অভিজ্ঞতাবলে উন্নতির কাল পর্য্যন্ত। হাসি পায়—যারা প্রতিভার পরিচয় আদৌ দিতে পারেনি তাদের পদস্থতা-জ্ঞান আর আত্মম্ভরিতা দেখে আমার হাসি পায়; এবং যে অবাঙালী ষ্টুডিয়োর মালিকদের চরম কামনা হোল যে-কোন প্রকারে যা তা একটা ছবি করা, অর্থাৎ যারা কাচ ও কাঞ্চনের প্রভেদ বোঝে না, তারা এদের আশ্রয় দিয়ে আব্দার সহ্য ক'রে চারুশিল্পের অশেষ ক্ষতিসাধন করছে। চন্দ্র আর সূর্য্যের উদয় আর অস্ত, মহাশক্তির দশ মূর্ত্তি, বিরাট বিরাট কারুহীন সেট দেখিয়ে আর চোখের জল টেনে এনে যারা

দুষ্টু মেয়ের মিষ্টি হাসি। এই মেয়েটীর নাম Jane Withers। Bright Eyes ছবিতে সার্লি টেম্পলের জুড়ীদার এক দুষ্টু মেয়েকে মনে পড়ে? সেই Jane Withers সম্প্রতি Ginger ছবিতে অভিনয় ক'রে আমাদের অপূর্ব্ব আনন্দ দিয়েছে। Janeএর সম্বন্ধে বলা হয়:

The miss you'll want to kiss
The kid you'ld like to kick.

mass ভোলানো theme এর পর সাদরে ছবি করতে পারে তারাই অবাঙালীদের আখড়ার বিশিষ্ট সব প্রয়োগশিল্পী।

অভিনয়ের স্বরূপ

একদিন ছবির দোকানে গেছলাম। ইচ্ছা ছিল নিজের

চেনা চেনা মনে হচ্ছে, না? হ্যাঁ, এই হচ্ছে Tom Walls-এর আসল চেহারা; ছবিতে অবশ্য Tomকে অল্পতরবয়স্ক দেখেছেন। বিলাতে সকলেই Tomকে চেনে, এমন কি রেসের ভক্তরাও, কারণ Tom ভাল রেসের ঘোড়ার মালিক। আগে team ছিল Tom Walls ও Ralph Lynn, এখন Robertson Hare দলে ভিড়েছে। Tomকে সেদিন cicely court-neidgeএর সঙ্গে Me and Malboroughতে দেখা গেছে। আগামী ছবি Foreign Affairs, প্রযোজক যথাপূর্ব্ব Tom নিজেই।

একখানা ছবি কাগজে ছাপিয়ে দিই। সবাই ছবি ছাপাচ্ছে, সম্পাদকরাও নিজের সম্পাদিত কাগজে যখন নিজেদের শ্রীমূর্ত্তির প্রতিলিপি দেখতে আগ্রহাতুর হয়েছেন তখন লেখক হিসাবে কাগজের পাতায় নিজের ছবি দেখবার আমারই বা আগ্রহ হলে দোষ কি? সুতরাং যাওয়া গেল ছবির দোকানে। মালিক album দিলেন হাতে। তাতে কত লোকের ছবি—রাজা, জমিদার, ধনী, কবি, লেখক এবং নট ও নটী। এলবাম দেখে উঠে পড়লাম। মালিক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার ছবি তুলবেন না? আমাদের কাজ দেখলেন ত, আর দামও সস্তা···। বললাম: কি রকম ছবি হবে মশাই? মালিক একখানা নিখুঁত ছবি দেখিয়ে জানালেন সেই রকম ছবি হবে। জানালাম ওরকম আমার পছন্দ নয়। কেন, কি দোষ হয়েছে: মালিক প্রশ্ন করলেন। উত্তর করলাম: দেখছেন না, মশাই, সব portraitই আগাগোড়া studied, কোনটা এতটুকু সহজ নয়—সবাই যেন মনে রেখেছে—আমার সামনে ক্যামেরা রয়েছে, ভাল ক'রে পোজ দিয়ে, সুন্দর সেজে ছবি তুলতে হবে, Camera Consciousness এদের অতিরিক্ত আর সেই জন্যেই এদের ছবি অত্যন্ত Studied, এদের পোজে চেষ্টা আর কষ্ট স্পষ্ট। নমস্কার ক'রে বিদায় নিলাম। যাবার মুখে কানে এল মালিকের মন্তব্য: বাবা, এ যে আবার লম্বা চওড়া কথা বলে

আর একদিন এক রসিকজনের বৈঠকে নানা আলোচনার পরে একটা 'বিখ্যাত' 'বহুপ্রশংসিত' ছবির নায়কের অভিনয় সম্বন্ধে কথা উঠলো। রসজ্ঞ একজন বললেন: অভিনয় দাঁড়াতো ভালই যদি না মাঝে তাল কেটে যেত, একে fake acting তার ওপর তা সর্ব্বত্র বজায় নেই। বাস্তবিক এই কথাটাই আমাদের বার বার মনে পড়ে—কেন অভিনয় স্বাভাবিক হয় না? ওদেশে অভিনেতাকে প্রথমেই তিনটী কথা বলে দেওয়া হয়: Imbibe the spirit of the character, just be free and easy; but please do not try to act. আশ্চর্য্যের বিষয়, যাদের ভোঁতা মুখে ভাবের সম্যক ব্যঞ্জনা হয় না, যারা গ্রন্থকারের উৎকৃষ্ট সংলাপ আওড়েই খালাস, যারা pantomimeএর ধার ধারে না তারাই অবাঙালী কর্ত্তাদের আদরনীয় আর্টিষ্ট। Affected actingএ অনেক সস্তা প্যাঁচ আছে যার সাহায্যে সহজে

নাম করা যায় এবং আমাদের নট-নটীরা এই নাম করবার সহজ পন্থারই ভক্ত। এই fake acting এসেছে প্রধানতঃ মঞ্চ থেকে। আমরা যারা বিদেশীদের উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখে অতুল আনন্দ পেয়েছি আমরা সেই সুদূর শুভদিনের প্রতীক্ষা করছি, যেদিন আমরা বলতে পারবো: This is not acting, this is something far greater; this is inspiration (কথাটা Escape me never ছবিতে Elisabeth Bergnerএর অতুলনীয় অভিনয় দেখে এক সমালোচক বলেছেন)!

চিত্র পরিচয়—

অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত যে সব ছবি মুক্তি লাভ করেছে এখানে তাদের শ্রেণী বিভাগ ক'রে দেওয়া হোল। আমাদের মতে (ক) শ্রেণীর ছবি অসাধারণ, (খ) সুন্দর, (গ) উপভোগ্য এবং (ঘ) শ্রেণীর ছবি সাধারণ। (ছ) চিহ্নিত ছবি ছেলেরাও দেখতে পারে।

(ক) শ্রেণীর ছবি:—দি ইন্‌ফর্মার ও জি মেন্ (ছ)।

(খ) শ্রেণীর ছবি একটাও নেই।

(গ) শ্রেণীর ছবি:—দি ফার্মার টেক্‌স্ এ ওয়াইফ্ (ছ), বেকি সার্প, দি ওয়েডিং নাইট্, স্যাণ্ডার্স অব্ দি রিভার (ছ), দি গ্ল্যাস্ কী, দি ফ্লেম্ উইদিন্, ওয়্যারউল্‌ফ্ অব্ লণ্ডন্ (ছ), আওয়ার লিটল্ গার্ল (ছ), এইট বেল্‌স্ (ছ), ইন্ ক্যালিয়েন্টি, এইটীন্ মিনিটস্, অর্কিড্‌স্ টু ইউ, কার্ণিভ্যাল্ (ছ), দি র‍্যাভেন্ (ছ), ব্রাইট্ লাইটস্ (ছ) ও দি ষ্টুডেণ্টস্ রোমান্স (ছ)।

(ঘ) শ্রেণীর ছবি:—দি গ্রেট হোষ্টেল মার্ডার, ইন্ টাউন্ টুনাইট, দি রক্‌স্ অব্ ভ্যাল্‌পার (ছ), ম্যাক্‌সেন্ট অন্ ইয়ুথ, পিপল্ উইল্ টক্ (ছ), বয়েজ উইল্ বি বয়েজ (ছ), দি ড্রাগন্‌মার্ডার কেস্, ওয়্যাগন্ হুইল্‌স্ (ছ), স্কেপ্ মি নেভার, লেডি টাব্‌স্, দি মার্ডার-ম্যান্ ও সি (ছ), বাংলা ছবিগুলির মধ্যে ভাগ্যচক্র ছাড়া কোনটাই ছেলেদের দেখবার উপযুক্ত নয়।

ভাগ্য চক্র—

নিউ থিয়েটার্সের বাংলা ছবি। 'দেবদাস' যদি জয়যাত্রার পথের সন্ধান দিয়ে থাকে 'ভাগ্যচক্র' সেই পথের প্রথম মাইলষ্টোন। প্রথম শ্রেণীর ছবির প্রধান প্রধান সব কটি গুণেরই অধিকারী 'ভাগ্যচক্র'—ছবির গতি যুগোপযোগী দ্রুত ও ছন্দঃসুন্দর, ছবির প্রযোজনায় মস্তিষ্কের পরিচয় আছে, ছবিতে হাস্যরস আছে প্রচুর আর ছবির অভিনয়ের

The Dubarry নামে সঙ্গীতমুখর ছবির নায়িকাকে দুবছর অনুসন্ধানের পর B. I. P. র কর্ত্তারা এই Gitta Alparএর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। এই জিপসি মেয়েটী অপূর্ব্ব সুকণ্ঠের অধিকারিনী; মঞ্চে ঐ নাটকেরই অভিনয়ে কর্ত্তারা Gittaকে দেখার ফলে তাকেই নায়িকা করেছেন। The Dubarry পট ও মঞ্চ উভয়এই Gittaর জন্য বিশেষ ক'রে লেখা হয়েছে।

team work বা ব্যক্তিগত অভিনয় হয়েছে উচ্চাঙ্গের। কিন্তু ছবির গল্প ভাল নয়, সংলাপও প্রথম শ্রেণীর নয়। প্রযোজক নীতিন বসু সাধারণ মনোবৃত্তির অনুকূল গল্পের সুন্দর কলাসম্মত treatment করেছেন—কোথাও এতটুকু

অবান্তরতা বা বাড়াবাড়ি নেই। প্রথমেই ছবি যে আগ্রহের সৃষ্টি করে তা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হতে থাকে—যেমন gripping ছবি তেমনি তার climax। চিত্রগ্রহণেও নীতিন বাবু তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, ফটোগ্রাফি প্রথম শ্রেণীর; motor chasingএর দৃশ্যটী অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। ছোট্ট অংশে দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় নিখুঁত অভিনয় করেছেন; অমর মল্লিকের সুন্দর চরিত্র-চিত্রণের মাঝে Olie Hardyর অনুসরণ ভাল দেখায় না। কৃষ্ণচন্দ্র ভাবব্যঞ্জনায় সর্ব্বত্র সমান সফল না হলেও দরদী বাচনে ও গানে এবং প্রাণঢালা অভিনয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন, তবে দীপককে খুঁজে পাবার জন্য পুনরায় থিয়েটার করতে সম্মত হওয়ার দৃশ্যে তিনি ও অমর বাবু অতি-অভিনয় করেছেন; শেষ দৃশ্যে দীপককে অত অধিক বার ডাকাও ভাল নয়। দীপকের ও মীরার অংশে যথাক্রমে পাহাড়ী সান্যাল ও শ্রীমতী উমাশশী বেশ ভাল অভিনয় করেছেন ও গান গেয়েছেন, তবে শ্রীমতীর দৈহিক পরিধি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। অপরাপর চরিত্রচিত্রণ যথাযথ ও আনন্দকর। শব্দগ্রহণ সুন্দর, সুরসংযোজনায় রাই বড়াল তাঁর যোগ্য কাজ করেছেন।

পায়ের ধূলো—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মসের বাংলা ছবি। গ্রন্থকার হেমেন্দ্র কুমার রায়ের চিত্রনাট্য আদৌ উন্নত নয়। একে সস্তা theme-এর গল্প, তাতে আবার বলার কোন নূতনত্ব নেই এবং শেষতঃ চিত্রনাট্যে আজে-বাজে অজস্র জিনিষ এত এসেছে যে ছবির গতি দুর্ব্বিসহ রকম মন্থর হয়েছে—কথা বাহার সংলাপ এখানে পীড়াদায়ক হয়ে পড়েছে—অথচ পতিতাদের সৎ ও শুদ্ধ অন্তরের কথা নিয়ে red hot সমাজদ্রোহের ছবি। প্রয়োজনা অপটু; একে অভিনয় মন্দ তার আবার সকলকে undue prominence দিয়ে বেশির ভাগ close-up নেওয়া হয়েছে। অভিনয় Fake actingএর জলন্ত দৃষ্টান্ত। নায়িকা একেবারে অ-চ-ল; ভূমিকাবণ্টন প্রশংসার যোগ্য নয়। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ চলনসৈ। ছবিটীর প্রযোজক জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় এবং এর নট নটী জহর গাঙ্গুলী, 'দিগদারী' নামে ঘটনাহীন ছোট ছবিতে কথারই সাহায্যে লোক হাসাতে চেয়েছেন তুলসী লাহিড়ী।

বিদ্যাসুন্দর—

একগাদা গান যেখানে সেখানে জুড়ে দিলেই যদি musical ছবি হয় তবে 'বিদ্যাসুন্দর' তাই। ছবির গতি অত্যন্ত মন্থর, চিত্রনাট্যকার হেমেন্দ্রকুমার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। অভিনয় কারুরই up to the mark হয় নি, তবে টুলু সেনের সপ্রতিভ ভাব আমাদের খুব ভাল লাগে; শ্রীমতী নীহারবালা মাঝে মাঝে অত্যন্ত মঞ্চঘেষা অভিনয় করলেও আমাদের নাচে ও গানে আনন্দ দিতে পেরেছেন। শ্রীমতী রাণীর স্থূলতা একে বিসদৃশ তায় কচি মেয়ের মত আধ-আধ কথা ব'লে তিনি আমাদের হতাশ করেছেন। ললিত মিত্রের 'কোটাল' ভালই। অপরাপর অভিনয়ের কথা না বলাই ভাল। চিত্রগ্রহণ ভালই, শব্দগ্রহণও প্রায় দোষশূন্য। মিউজিকাল ছবির বিশিষ্ট সম্পদ হচ্ছে সুশ্রী তন্বী সব নাচিয়ে মেয়েরা কিন্তু এখানে কয়েকটী number বেশ সুন্দর হলেও কুরূপাদের জন্য তেমন ভাল লাগে না। এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়ী থাকবে ব'লে কি 'ভাগ্যচক্রের' যুগে 'পায়ের ধূলো' ও 'বিদ্যাসুন্দর' থাকবে? ছবির কয়েকটী বিভাগ চলনসৈ, তবে অধিকাংশ বিভাগের কাজই তারও নীচে। পটলবাবুর মঞ্চসজ্জা বেশ সুন্দর ও রুচিকর।

মণিকাঞ্চন ২য় পর্ব্ব—

লেখক তুলসী লাহিড়ী কেবল রসাল সংলাপের সাহায্যেই কাজ সারতে চেয়েছেন—Funny ও embrassing situation create করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নি। তুলসী লাহিড়ী ও শিশুবালার অভিনয় ভাল হয়েছে। শ্রীমতী রাণীবালা শিক্ষিতা তরুণীর রূপ ফোটাতে পারেন নি, অক্ষম বিকৃত অনুকরণ করেছেন মাত্র। শিক্ষিতা তরুণীকে যা আঁকা হয়েছে তা প্রতিবাদের বিষয়। অপরাপর অভিনয় উল্লেখযোগ্য নয়। ননী সান্যালের চিত্রগ্রহণ ও মধু বাবুর শব্দ গ্রহণ শিক্ষানবিশের হাতের কাজ ব'লে মনে হয়।

পট ও মঞ্চ

[প্রতিবাদ]

শ্রীদীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্বিনের বিচিত্রায় পট ও মঞ্চ প্রসঙ্গের শেষে আনন্দ প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর-স্বরূপ কিছু লিখেছেন। কিন্তু এটি ঠিক প্রত্যুত্তর হয় নি। আমি যে কথাগুলি লিখেছিলাম তার একটিরও তিনি জবাব দিতে পারেন নি। তারাশঙ্কর ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ বা প্রবোধ সান্ন্যালের রচনার বিশেষত্ব নিয়ে আমি আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নি। সুতরাং তাঁর লেখার এই অংশ সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক বোধে আমি কিছু বলব না। তবে দুটি কথা এখানে বলা দরকার। তা' এই যে তিনি অনেক কিছু বলা সত্ত্বেও তাঁর অন্তরের ভাষা এবং মহত্তর ও বৃহত্তর জীবনের ইঙ্গিত যে Quibble ছিল তা-ই রয়ে গেছে এবং দ্বিতীয়তঃ শরৎবাবুর লেখায় সমাজের ঘোঁট, হাঁড়ি হেঁসেলের কথা ইত্যাদি থাকে না প্রথমে লেখার পর এবার তিনি যেভাবে সেটা explain করবার চেষ্টা করেছেন তাহা তাঁহার নিজের ভাষায় বলতে 'হাস্যকর' হয়েছে।

মতামত জিনিসটা চিরকালই সকলকার নিজস্ব। তবে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘরোয়া মজলিসে সেটা করলে কারু কিছু আপত্তি করবার থাকেনা, তা সে যত হাস্যকরই হোক না কেন। কিন্তু কাগজে কলমে প্রচার করলে এবং তার মধ্যে সারবত্তা না থাকলে সাধারণের তরফ থেকে তা'তে আপত্তি ওঠাবারই কথা; এতে ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট বোধ করলে চলবেনা। প্রতিবাদ সহ্য করতে না পেরে আরও বেফাঁস কথা লিখলে নিজেকে হাস্যকর করে তোলা ছাড়া অপর কিছু লাভ হয় না। "মেয়েদের গল্পের সঙ্গে শরৎ সাহিত্যের সামঞ্জস্য ও তুলনা...ব্যাপারটা হাস্যকর" এই কথা বলে তিনি নিজেকে যে কতখানি হাস্যকর করে ফেলেছেন তা বোধ হয় তিনি ধারণা করতে পারেননি; না হলে অত বড় হাসির কথা তিনি কোন মতেই লিখতেন না। এই অন্ধ কর্তা-ভজামি নিয়ে সমালোচনা ত সম্ভবই নয়, এমন কি মোটামুটি রকমের আলোচনাও চলে না। 'আনন্দ' আমার লেখাটি নিশ্চয়ই ভাল করে পড়ে দেখেননি। তার কোন জায়গাতে সমালোচকদের বিদ্বেষ-বুদ্ধি-প্রণোদিত antipropagandists বলা হয়নি। তবে সমালোচনার নামে গুরুপূজা এবং সত্যের অপলাপ চেষ্টার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে বটে। আমার লেখাটি থেকে আরও দেখা যাবে যে আমি কারও সাথে কারও সামঞ্জস্য ও তুলনা মোটেই করি নি বরং ঐ ধরণের মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেই বলেছি। genius বা talent কোন ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব জিনিষ নহে। প্রতিভা জিনিসটা সুধু এক স্থানেই সীমাবদ্ধ নয় এবং তার স্বরূপও এক-মুখী নহে। কাজেই বিভিন্ন মনীষীদের প্রতিভার ঠিক পরস্পর তুলনা করা চলে না; করতে গেলেই সেটা একদেশদর্শী হয়ে পড়ে। প্রতিভার বিকাশ যেখানে দেখা যায়, স্বীকার না করে উপায় নেই। কলমের জোরে ছেঁদো কথার মালায় সত্য কথা মানতে না-চাওয়ার নাম সমালোচনা নয়। শরৎ-সাহিত্যের মূল্য সকলেই জানেন ও মানেন; অকারণ অপরের প্রতি কটুকাটব্য বর্ষণ না করেও সেটাকে ভাল বলা চলে এই কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম। শরৎ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে গিয়ে অপর সকলের লেখাকে গল্প আখ্যা দিয়ে তিনি যে হাস্যকর situationটা সৃষ্টি করেছেন সেটি সত্যই উপভোগ্য হয়েছে। আনন্দ জানিয়েছেন মতামতটা তাঁর নিজস্ব। সুতরাং তাঁর মত অন্য অনেকেরও নিজস্ব মতামত থাকতে বাধা নাই এবং তার জোরে যদি তাঁরা বলেন যে মেয়েদের লেখার সঙ্গে শরৎবাবুর লেখার সামঞ্জস্য ও অতুলনা ব্যাপারটা হাস্যকর (অবশ্য 'আনন্দ' যে মানে

করে বলেছেন তার ভিন্ন অর্থে), তবে তা'তে তাঁর রাগ করবার কিছু নেই। বঙ্গ-সাহিত্যের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে সে রকম লোকের সংখ্যাও যে নিতান্ত অল্প নহে তা'র বহু প্রমাণ ইতি পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে;—যদিও 'আনন্দ' সম্প্রদায় তাঁদের কলারসানভিজ্ঞ নিতান্ত কৃপার পাত্র বলে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত।

কিন্তু এ ধরণের অন্ধ মনোবৃত্তিটাই সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। যে কারণে আনন্দের মতামতটা হাস্যকর দাঁড়িয়েছে সেই একই কারণে এ'কেও সমর্থন করা চলবে না। যাক্ সে কথা। সাহিত্যে Idealism বা Realism অথবা সাহিত্যিক-গণের স্থান নির্ণয় নিয়ে আমার আলোচনা নয়। 'বিজয়া' নাটকখানির মত হালফিলে অপর কোন নাটক সাফল্য লাভ করেনি বলে তার কারণ স্বরূপ তিনি কতকগুলি গুণের উল্লেখ করে মহিলা লেখিকাগণের লেখায় আগাগোড়া দোষের কথা বলায় আমি বলেছিলাম যে হালফিলে ওর চেয়ে অনেক বেশী সমাদর লাভ অন্যান্য নাটকের অদৃষ্টে ঘটেছে এবং মেয়েদের লেখায় তাঁর কথা-কথিত দোষগুলি অন্য নাটকের মধ্যেও আছে। এ কথার তিনি এখনও কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। এর মধ্যে শরৎ-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা বা সামঞ্জস্যই বা তিনি কোথায় পেলেন বোঝা শক্ত। সত্য কথা ধামা চাপা দিবার চেষ্টা বৃথা। এ আশা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ভবিষ্যতে তিনি যুক্তি বিচারে টেঁকে এমন কথা ব্যবহার করবেন, নিছক ভক্তির ভরে বিচারবুদ্ধি হারাইবেন না। তাতে সুধু নিজেকে হাস্যকর করে তোলা ছাড়া অপর কিছু লাভ হয় না।

শ্রীদীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবির বেদনা

বনচারী

আপনারে প্রকাশের লাগি আমার মনের মাঝে
যে নীরব কবি এতদিন গুমরি মরিতেছিল
আজ শুভক্ষণে
তুমি তারে করিলে মুখর। তোমারে বাসিয়া ভাল
পেনু আজ পথের সন্ধান। তুমি চাহ নাই মোরে
—মিলনের লাগি এ জীবনে কোন আশা নাই!—তবু
প্রেম মোর জাগায়ে তুলেছে মনে জ্যোতির্ম্ময় লোক।
অন্তরের দিকে দিকে লেগেছে আগুন।
ভাষার বিচিত্র রঙে
জীবনের ব্যর্থতারে প্রকাশের লাগি কেন মোর
এই বিড়ম্বনা?
—বলিতে পারিনা।

অরুণ উষায়
আকাশের প্রেমরক্তগলে যবে জেগে ওঠে ভানু
—শিশিরের স্বেদবিন্দু ঝরে পড়ে শিহরিত ভালে—
অশ্রুমুখী কমলের বনে বনে প্রকাশের লাগি
তখন যে জাগে চঞ্চলতা
—আপন গৌরব-মুগ্ধ সূর্য্যদেব ফিরেও চাহেনা!
তবু কমলের সেই ব্যথাগূঢ় সৃষ্টির কামনা
কেন?—কে বলিবে তা'।
আপনার গূঢ়বেদনাকে রূপেগন্ধে বিকশিয়া
যে আনন্দ মেলে,
সেই তার জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা!

নৃতত্ত্বের এবং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া পশুবলি আলোচনা

ডাঃ সরসীলাল সরকার এম্-এ

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া পশুবলি আলোচনা নামে কার্ত্তিক মাসের বিচিত্রায় একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধে আদিমযুগের বলিদান প্রথা সম্বন্ধে গবেষণায় পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্ যে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল। সে সিদ্ধান্তটি এই যে, "বলির পশু বলিদানকারীর পিতৃগণের প্রতীক স্বরূপ।"

ডাক্তার ফ্রয়েড আদিম যুগের যে সকল জাতির বিবরণ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ভারতবর্ষের উল্লেখ তাহার মধ্যে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় না, সুতরাং এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উপস্থিত হইতে পারে যে, অন্যান্য দেশের আদিম জাতির বলিদান প্রথা সম্বন্ধীয় এই সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা ?

এ সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে 'বলিদান' প্রথাটি হিন্দুধর্ম্মে কি ভাবে গৃহীত হইয়াছিল এবং আদিমকালের অসভ্য অবস্থা হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতা বিকাশের সহিত বলিদান প্রথা কি কি রূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আগে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

গত ১৭ই অক্টোবর তারিখের অমৃতবাজারে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের বলিদান সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় সম্প্রতি পণ্ডিচেরী আশ্রমে বাস করিতেছেন। ইনি শ্রীঅরবিন্দের একজন প্রিয় শিষ্য, সুতরাং তাঁহার এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়া শ্রীঅরবিন্দের অভিমতের ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি ইহা মনে করা অসঙ্গত নয়। এই প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় দেখাইয়াছেন "হিন্দুধর্ম্ম ভগবানের সৃষ্টিকর্ত্তা রূপ বা পালকরূপকেই পূজা দান করে নাই, তাঁহার সংহারকারী ভীষণরূপও হিন্দুধর্ম্মে আধ্যাত্মিক দর্শনের অঙ্গীভূত হইয়া পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় একাদশ অধ্যায়ে ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনায় সেই ধ্বংসকারী মূর্ত্তির বর্ণনা আমরা পাই। কুরুক্ষেত্রে মহা যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডব পক্ষের রণনায়ক অর্জ্জুন সেই রূপ দর্শন করিয়াছেন ও তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনে যে পুরুষ ও প্রকৃতির বর্ণনা আছে তাহাতেও দেখা যায় পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইয়া শয়ণ করিয়া দ্রষ্টাভাবমাত্র ধারণ করিয়াছেন। এই পুরুষ মহাদেব। আর প্রকৃতি মহাকালীরূপে বক্ষের উপর নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার সেই নৃত্যলীলায় নিমেষে নিমেষে কত ধ্বংস হইতেছে তাহার সীমা নাই। সেই ধ্বংস নিরর্থক নয়, অথবা অকল্যাণকরই নয়। কত কত প্রাণীর আত্মত্যাগ সেই ধ্বংসকে মহীয়ান করিয়াছে। সেই ধ্বংসের ভিতর আমরা দেখি নিম্নপ্রাণীতে একটি পক্ষীমাতা ব্যাধের তীক্ষ্ণ শর হইতে শাবককে রক্ষার জন্য নিজের দেহদ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া নিজের প্রাণ দিতেছে, আবার উচ্চপ্রাণী মানব জাতিতে কত পরার্থে আত্মোৎসর্গ, নিজের দেশের জন্য জাতির জন্য প্রাণদান—এই সমস্তই সেই মহাকালীর ধ্বংসলীলার বলিস্বরূপ।"

"বলি"র এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে লেখক এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, "কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতা আমাদের দেশে পূজায় যে পশুবলি দেওয়া হয় তাহাতে আরোপ করা যায় না। এবং পশুবলির সহিত আধ্যাত্মিকতার যখন সম্পর্ক নাই, তখন ইহা পূজা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সাধনা হইতে পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত।"

শ্রীযুক্ত রায় আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া আলোচনায় পূজায় পশুবলি সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্গণ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় দেখাইয়াছেন যে, আদিম যুগের বলিপ্রথার (পশু ও মানুষ উভয়বিধ বলি) মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বীজও ছিল। তাঁহারা প্রথমে আদিম যুগের মানবের বোধশক্তি ও অনুভূতির বিষয়ে আলোচনা

করিয়া দেখাইয়াছেন আদিম যুগের মানব প্রাণবান ও জড় এই উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়াছিল, এবং প্রাণীতে যে প্রাণরূপ একটি শক্তি আছে, যাহার দ্বারা সে জীবিত থাকে ইহাও বুঝিয়াছিল। তাহাদের এইরূপও একটি অনুভূতি ছিল যে, এই যে প্রকৃতির ক্রিয়া হইতেছে ইহার পশ্চাতে পরিচালক দেবতাগণ আছেন, এবং সেই দেবতাগণ প্রাণবান। সেই দেবতাগণকে পরিতুষ্ট করিতে হইলে, তাঁহাদের সহিত আদান প্রদান করিতে হইলে তাঁহাদিগকে এমন দ্রব্য উৎসর্গ করিতে হইবে যাহাতে প্রাণ আছে।

মানব জাতির আদিম পূর্ব্বপুরুষগণ ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিল যে, রক্তমোক্ষণ করিলে প্রাণী প্রাণহীন হয়। সেজন্য তাহারা বুঝিয়াছিল রক্তের সহিত প্রাণের বিশেষ সম্পর্ক আছে। পাহাড় ও পর্ব্বতের গুহাগাত্রে আদিম যুগের যে সমস্ত চিত্র উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে রক্তপাতের চিত্র অনেক দেখা যায়। কোনখানে একটি বাইসন আঁকা হইয়াছে, তাহার গাত্রে একটি বর্শার আঘাত, সেই আঘাতের স্থান হইতে রক্ত পড়িতেছে ছবিতে ইহা দেখানো হইয়াছে। আমাদের দেশেও দুর্গাপূজায় দুর্গাদেবী অসুরের বক্ষে বর্ষাবিদ্ধ করিয়াছেন ও তাহা হইতে রক্ত পড়িতেছে এই ভাবে প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। দশমহাবিদ্যায় ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিতে দেবী নিজের রক্ত নিজেই পান করিতেছেন,—এখানেও রক্তকে জীবনের প্রতীক স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। আদিমযুগে রক্ত বুঝাইবার জন্য ধাতুজ লাল রং ব্যবহার করা হইত। আদিম যুগের অনেক শব উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই সমস্ত শবের সমস্ত গাত্রে ধাতুজ লাল রং মাখানো, যেন রক্ত দিয়া মৃতের প্রাণশক্তিকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অসভ্যদিগের মধ্যে এখনও অনেক স্থলে মৃতের সমাধির উপর নিজের শিরা কাটিয়া রক্ত দেওয়ার প্রথা আছে, দেব স্থানে আত্মীয়ের মঙ্গল কামনায় বুকের রক্ত দেওয়ার প্রথা আছে, এবং অনেক স্থানে শিশু ও রুগ্ন হইয়া পড়িলে মাতা নিজের বুকের রক্ত সন্তানের গায়ে মাখাইত। আমাদের দেশেও অন্য বলির পরিবর্ত্তে আত্ম-বলিদানের বা নিজের বুকের রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। রাবণের ইষ্ট পূজার কাহিনীতে তিনি নিজের মুণ্ড কাটিয়া ইষ্ট দেবতার প্রীত্যর্থে আহুতি দিতেছেন এরূপ বর্ণনা আমরা পাই। এই নিজের রক্তদান করার ভিতর আধ্যাত্মিকতার ভাব আছে ইহাতে সন্দেহ নাই, কেননা ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের ভিতর দিয়াই আধ্যাত্মিকতার বিকাশ। কিন্তু পরে দেবোদ্দেশে রক্তদানের ভিতর অন্য ভাব আসিয়া পড়িল যাহা আত্মোৎসর্গের ভাব নয় বরং আত্ম-স্বার্থের ভাব। ধর্ম্ম ব্যাপারটির ভিতর যে একটি অলৌকিকত্ব আছে, অথবা আরও সহজ ভাবে বলিতে গেলে যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিকের মত কিছু ক্ষমতা আছে যাহা অঘটনও ঘটাইতে পারে, মানুষের অসাধ্য সাধন করিতে পারে, অসভ্য কাল হইতেই মানুষ তাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। দেবতাদিগকে রক্ত উপহার দেওয়ার ফলে অলৌকিক কিছু ঘটিতে পারে; যাহা তাহারা নিজের ক্ষমতায় লাভ করিতে পারিতেছে না, সেই সকল প্রার্থিত বস্তু লাভ করিতে পারে, ইহা তাহারা আশা করিত। সেই জন্য নিজের রক্ত দিয়া দেবতার তুষ্টি সাধন করিত। ক্রমশঃ মানুষের ব্যবসায় বুদ্ধি যখন বাড়িল তখন নিজে কষ্ট করিয়া রক্ত না দিয়াও যাহাতে কার্য্য উদ্ধার হয় সেই জন্য প্রতিনিধির দ্বারা সে কার্য্য সম্পাদনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিল, অর্থাৎ পরিবর্ত্তে অন্য নরবলি ও অভাবে পশুবলি প্রভৃতি আরম্ভ হইল। ক্রমে নিজের রক্তপানের পরিবর্ত্তে অপরের রক্ত পানের প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইল। এখনও অসভ্য দেশে কোন কোন স্থানে রক্তপানের প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। মহাভারতে আছে, প্রতিহিংসা সাধনের জন্য ভীম দুঃশাসনকে নিহত করিয়া তাহার বুকের রক্ত পান করিয়াছিলেন।

মিস্ মেয়ো তাঁহার 'মাদার ইণ্ডিয়া' পুস্তকে কালীঘাটের পূজার বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, এদেশের মেয়েরা পশুবলির পর বলিদানের রক্ত পান করে। অবশ্য এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু এই দেশেই মেয়েরা এবং পুরুষেরা বলির রক্তের তিলক কি কপালে ধারণ করেনা? মহিষ বলির পর মহিষের মস্তক মাথায় লইয়া নৃত্য করিতে করিতে কি রক্তে স্নাত হয় না? অবশ্য আমরা মিস্ মেয়োকে অনেক বিষয়ে মিথ্যাবাদিনী বলিতে পারি, কিন্তু লর্ড মর্লির মত প্রধান রাজকর্ম্মচারী এবং বিখ্যাত পণ্ডিতের কথা এত সহজে উড়াইয়া দিতে পারি না। তিনি যখন ভারতবর্ষের Secretary of State

ছিলেন তখন লর্ড মিণ্টোকে তিনি একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন, চিঠিটি পাদটিকায় দেওয়া হইল। *

পূজায় বলি প্রথা সর্ব্বদেশেই প্রচলিত ছিল, সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত তাহা এখন লোপ পাইয়াছে। ধর্ম্মোদ্দেশে বলিদান কোন কোন জাতির মধ্যে থাকিলেও দেব মন্দিরে বলিদান এখনও কেবল অসভ্যদিগের ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই আছে। অথচ হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে বলিদান কোন স্থলেই পূর্ণভাবে সমর্থিত হয় নাই। অনেক স্থলে 'বলিদান' ব্যাপারটি রূপক রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। অসুর নাশ অর্থে মনের কুপ্রবৃত্তিগুলি বলিদান অর্থাৎ ভগবানের নামে সেগুলি একেবারে পরিত্যাগ—শাস্ত্রে অনেকস্থলে এই অর্থ টি গ্রহণ করা হইয়াছে। আবার অন্যভাবে, বলি উৎসর্গ, আহুতি, যজ্ঞের জন্য কর্ম্মাবরণ প্রভৃতিতে ভগবানের বা জাতির জন্য আত্মোৎসর্গের ইঙ্গিত রূপকভাবে করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের কামনাত্মক ক্রিয়াকলাপ (অর্থাৎ পশুবলি প্রভৃতির) সুস্পষ্ট ভাবে নিন্দা করা হইয়াছে ও যজ্ঞের প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি তাহাও পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় ৪২, ৪৩, ৪৪ শ্লোকে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন।

E. O. James Origins of Sacrifice নামক পুস্তকে এই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

'Throughout these developments, the central conception underlying the institution of sacrifice—the giving of life to promote and conserve life continued to find expression, but in a spiritualized and moralized form.' (Vide page 286.)

অর্থাৎ "পরবর্ত্তী ধর্ম্ম বিকাশের মধ্য দিয়া বলিপ্রথার মূল ভাবটি এই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল যে জীবনদান করিতে পারিলেই জীবন সফল হয় এবং জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু এই 'জীবন দান' হত্যার দিক দিয়া নয়, আধ্যাত্মিকভাবে ও নৈতিকভাবে প্রকাশ পাইতে চলিয়াছিল।

যাহা হউক পশুবলি যে-কোন ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক, বলির পশু বলিদানকারীর পিতৃপুরুষগণেরই প্রতীক এই ভাবটি সকল প্রকার পশুবলির ভিতরই অন্তর্নিহিত ভাবে ছিল। অসভ্যগণের ভিতর তাহাদের বাহিরের আচরণেই তাহা প্রকাশ পাইত। ওয়েষ্টার মার্ক (Westermark, Origin and Development of Moral Ideas II p. 556.) লিখিয়াছেন যে, "সুমাত্রার Bataks জাতীয় লোকেরা তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের আত্মীয়গণ যখন বৃদ্ধ ও অসমর্থ হইত তখন তাহাদের খাইয়া ফেলিত। তাহারা ক্ষুধাতৃপ্তির জন্য যে এরূপ করিত তাহা নয়, এরূপ করাকে তাহারা পবিত্র ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করা হইতেছে বলিয়া মনে করিত।" * আমাদের দেশে উড়িষ্যার নিকটে দ্রাবিড় জাতীয় খন্দ (Khonds) নামে এক জাতি আছে, তাহারাও বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাহাদের বৃদ্ধ আত্মীয়দিগকে নরবলি দিয়া ভোজন করিত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে অসভ্য জাতির বলির মধ্যে ধর্ম্মভাবের সহিত বৃদ্ধ আত্মীয়গণকে আহার করা কার্য্যটির একটা বিশেষ যোগ ছিল। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত পূর্ব্ব প্রবন্ধে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া এই ব্যাপারের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

---

* I enclose you a little piece about cruelty to animals in certain religious sacrifices. It is prompted by an article in the Nineteenth Century for October last by the Bishop of Madras, interesting but revolting. If you could by good fortune make any move against such diabolic doings, it would stand you in good stead at the Day of Judgment I do believe. If it were not all so horrible, I would try to enlist Lady Minto. Blessed are the merciful. From Recollections by John Viscount Morley, vol II. page 192.

* Thus the Bataks of Sumatra declared that they frequently ate their own relatives when aged and infirm not so much to gratify their appetite, as to perform a pions ceremony.

Westermarck—Origin and Development of Moral Ideas II p 556.

এখন আমরা অসভ্য দেশ ছাড়িয়া বাংলা দেশে উপস্থিত হইতেছি। বাংলা দেশের প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি কবিতা হইতে দুই ছত্র উদ্ধৃত করিলাম ;—

"ছলে এক মস্ত্র বলি বলিদান লয়ে।
খান দেবী পিতৃমাথা বিশ্বমাতা হয়ে।"

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা চার্ব্বাকের শ্লেষাত্মক শ্লোকের উক্তির সহিত ফ্রয়েডের মতের মিল দেখাইয়াছিলাম, সেইরূপ অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের এই কবিতাটীরও আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। কবিদিগের অবচেতন মনের গভীর ভাব বিশ্লেষণের যে একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে এই কবিতাটী তাহারই প্রমাণ স্বরূপ।

বলিদানের ছাগমুণ্ড দেবী ভগবতীর পিতৃমুণ্ডই বটে! কেননা ভগবতীর পিতা প্রজাপতি দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তাঁহার নরমুণ্ড পরিবর্ত্তিত হইয়া ছাগমুণ্ড হইয়াছিল ; দেবী পূজায় যখন সেই ছাগমুণ্ড বলিরূপে গ্রহণ করিতেছেন অর্থাৎ ভক্ষণ করিতেছেন তখন তিনি যে পিতৃমাথাই খাইতেছেন এ কথা বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। দুর্গোৎসব তত্ত্বে দুর্গাপূজার বিধানে দেখিতে পাওয়া যায় বলির মুণ্ড ও রক্তই প্রধান উপহার ;—

"স্থানে নিয়োজয়েদ্রক্তং শিরশ্চ সপ্রদীকম্
এবং দত্বা বলিং পূর্ণফলং প্রাপ্নোতি সাধক।

পশু হনন করিয়া তাহার রক্ত ও মুণ্ড প্রদীপের সহিত মণ্ডপের যথাস্থানে স্থাপন করিবে। এইরূপ ভাবে বলি প্রদান করিলে বলির পূর্ণফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রক্তদানের বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। মুণ্ড উপহার দান আমাদিগকে আদিম অসভ্য মানবের মুণ্ড সংগ্রহের প্রবৃত্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। মুণ্ড সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানেও বহু আলোচনা আছে। প্রবন্ধ বিস্তার আশঙ্কায় এখানে তাহা দেওয়া হইল না।

দুর্গোৎসব শরৎকালে হয়। তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় যে, দেব মারুতির তুষ্টির জন্য শরৎকালে একটি উৎসব হইত। এই উৎসবে সতেরোটি পাঁচ বৎসর বয়স্ক কুব্জহীন ক্ষুদ্রকায় বৃষ এবং সতেরোটি দুই বা আড়াই বৎসরের গাভী উৎসর্গ করা হইত। বৃষগুলিকে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত এবং প্রত্যেক দিন তিনটি করিয়া বৎসতরী বলিদান দেওয়া হইত। সামবেদের তাণ্ড্য ব্রাহ্মণেও এই উৎসবের কথা আছে, এবং তাহাতে প্রতি বৎসরের জন্য বিভিন্ন বর্ণের গাভী বলির কথা আছে। ষষ্ঠি, সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিরও উল্লেখ আছে—

ষষ্ঠ্যাং শরদি কার্ত্তিকে মাসি যজেত।
সপ্তম্যামষ্টম্যাং তু
বৎসতরীরে বালভেরণ উক্ষৌ বিসৃজেযুঃ।

বৃষ উৎসর্গ করিয়া বধ না করিয়া যে ছাড়িয়া দেওয়া হইত ইহার ভিতরেও আদিম যুগের মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আদিম যুগে অসভ্য মানব এক একটী পশুকে এক এক বংশের আদি পিতা বলিয়া মনে করিত। মনোবিজ্ঞানে ইহাকেই Totem বলা হইয়াছে। বিশেষ কোন উৎসব না হইলে সেরূপ পশুকে কখনও হত্যা করা হইত না। আমাদের দেশেও এইরূপে গাভী ও বৃষ পূর্ব্বে বধ্য থাকিলেও ক্রমশঃ অবধ্য ও পিতৃ ও মাতৃস্থানীয় হইয়াছে। বৃষ উৎসর্গ প্রথা এখনও আছে। পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে বৃষ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাতে পিতা ও মাতার সহিত বৃষের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। বংশের নাম উচ্চারণ করিতে হইলে 'গো' শব্দ পূর্ব্বে দিয়া উচ্চারণ অর্থাৎ গোত্র বলিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। অন্যান্য আদিম জাতির যেমন ভিন্ন ভিন্ন পশু Totem আছে, হিন্দুজাতির সেইরূপ বৃষ ও গাভী Totem হইয়াছে। প্রাচীন কালের শারদোৎসব এখন দুর্গোৎসব এবং প্রাচীন কালের বৎসতরীর পরিবর্ত্তে ছাগ ও মহিষবলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

সুতরাং একথা বলিলে ভুল বলা হয় না যে পশুবলি আমাদের আদিম মনোবৃত্তিরই পুনরাবৃত্তি। অন্যান্য দেশে এই বলিদানের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নততর মনোবৃত্তিতে বিকাশ হইয়াছে, আমাদের দেশেও সাত্বিক পূজাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে, পশুবলিদান সংযুক্ত পূজাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন শাস্ত্রকারই প্রশংসা করেন না, বরং ইহা যে আধ্যাত্মিকতার বিরোধী এবং পাপকার্য্য এমন কি এরূপ পাপ কার্য্য যে তাহাতে নরকগামী হইতে হয় ইহাও মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীসরসীলাল সরকার

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই প্রবন্ধটি অন্তর্জাতিক বঙ্গ পরিষদের সভায় পঠিত হইয়াছিল।

স্বর্ণমান

স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র বাগ্‌চী বি, কম

চিরাচরিত প্রথানুসারে এক কথায় স্বর্ণমানের সংজ্ঞা নিরূপণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিব না। প্রসঙ্গক্রমে ইহার অর্থ স্বতঃই উপলব্ধি হইবে। আলোচ্য বিষয়টি মুদ্রা, বিনিময় প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া ইহার বিচ্ছিন্ন আলোচনা সম্ভবপর নহে। মুদ্রার সহিত প্রবন্ধ-বিষয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাই মুদ্রা লইয়াই আরম্ভ করা শ্রেয়ঃ ও যুক্তিযুক্ত।

পৃথিবীর অন্ধকারময় যুগে যখন মানবজাতি ধরণীপৃষ্ঠে অবাধে বিচরণ করিত তখন তাহাদের প্রাথমিক অভাব ক্ষুৎ-পিপাসা ব্যতীত অন্য কিছুই ছিলনা। উন্মুক্ত, উদার আকাশের নীল চন্দ্রাতপে, শ্যামল অরণ্যানীর শীতল ছায়ায়, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত সানুদেশে বা দুর্গম গিরিগুহায় তাহারা নিশ্চিন্ত আরামে কর্ম্মহীন দিবস অতিবাহিত করিত। নদ-নদী, গিরি-প্রস্রবণ তাহাদের পিপাসার বারি এবং নানাজাতীয় লতাপাদপ ক্ষুধার ফল প্রদান করিত। কিন্তু প্রকৃতি দেবী সর্ব্বত্রই তাঁহার দান সমভাবে বণ্টন করেন না। কোথাও তিনি মুক্ত-হস্তা, কোথাও সাতিশয় কৃপণা। তাই আদিম মানব-জাতির অনেককেই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত, খাদ্যাভাব দূরীকরণার্থ নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকিতে হইত। এই অভাব হইতেই অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা। অর্থনীতির বহু জটিল সমস্যা এই অভাবেরই ক্রম-বিবর্ত্তন। মানবের ক্ষুন্নিবৃত্তিই আজ একমাত্র প্রয়োজন নহে। শতসহস্র অভাবের আবেষ্টনে আজ আমরা আবদ্ধ এবং এই সকল বিভিন্ন অভাব দূর করিবার জন্য আমাদের কার্য্যের আর অন্ত নাই। কেন এমন হইল? কিসের জন্য মানুষ শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াই তৃপ্ত রহিল না? হয়ত তাহার স্বাভাবিক বৈচিত্র্যপ্রিয়তাই ইহার কারণ। বৈচিত্র্যই সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের প্রাণ, তাই চির-সুন্দরের মোহনীয়া সৃষ্টি মানব যুগে যুগে বৈচিত্র্যপ্রয়াসী। কালক্রমে সে তাহার প্রয়োজনের পরিধি বাড়াইয়া ফেলিল, যাবতীয় অভাব একক চেষ্টায় মিটাইতে অক্ষম হইল এবং এইরূপে শ্রম-বিভাগের সৃষ্টি হইল। একজন আর একজনের শ্রমজাত দ্রব্যদ্বারা আপনার অভাব মিটাইতে লাগিল। এইখানে আসিল বিনিময়।

যতদিন না শ্রম সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হইল ততদিন দ্রব্যের বিনিময় প্রচলিত ছিল কিন্তু এইরূপ বিনিময়প্রথায় কতকগুলি অসুবিধা হইতে লাগিল। মনে করুন কোন কুম্ভকারের দুইখানি বস্ত্রের প্রয়োজন; সে ঐ বস্ত্র তাহায় মৃৎপাত্রের বিনিময়ে গ্রহণ করিবে। এমতাবস্থায় এমন কোন তন্তুবায় চাই যাহার কিছু মৃৎপাত্রের প্রয়োজন। সুতরাং যতদিন না কোন মৃৎপাত্রলাভেচ্ছু তন্তুবায়ের সন্ধান মিলিতেছে ততদিন ঐ কুম্ভকারকে দুইখানি বস্ত্রের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। হয়ত বা সৌভাগ্যক্রমে এমন দুইটি ব্যক্তির সমাবেশ ঘটিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাহারও অভাব মিটিল না, কারণ তন্তুবায়ের মাত্র দুইটি পাত্রের প্রয়োজন এবং এই দুইটি পাত্রের জন্য সে দুইখানা ত দূরের কথা, একখানা কাপড় দিতেও প্রস্তুত নয়।

এইরূপ গুরুতর অসুবিধার জন্য উৎপাদন কার্য্য বাধাগ্রস্ত হইতে লাগিল এবং এই বাধা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানবসমাজ সাধারণের গ্রহণীয় কতকগুলি বস্তু মূল্যের পরিমাপক বলিয়া প্রচলন করিল। এই সাধারণ গ্রাহ্য প্রচলিত বস্তু-বিশেষই মুদ্রা এবং বিনিময়ের সৌকর্য্যার্থই মুদ্রার প্রচলন। মুদ্রাই বিনিময়ের প্রাণ, উৎপাদন ও উপভোগ-ক্রিয়ার যোগসূত্র। Weston তাঁহার "Banking and Currency" গ্রন্থে বলিয়াছেন—"Without money, the difficulty of bringing together people with

reciprocal wants would be insuperable, and Exchange, which alone makes Division of Labour possible, could have little scope. Division of Labour, Exchange and Money have all developed together; they are all mutually cause and effect. An urgent need for a means of comparing the products of different occupations constituted the imperious demand for money; the adopting of a system for measuring values—of a device whereby things could be arranged in an order of precedence—enabled Exchange and with it Division of Labour to be extended"। অতএব দেখা যাইতেছে যে মুদ্রা একটি তৃতীয় বস্তু যাহা প্রত্যেক দুইটি বস্তুর বিনিময়ের সাধারণ গ্রাহ্য উপায় এবং মূল্যের পরিমাপক—"A third commodity, chosen by common consent to be a means of exchange and a measure of value between every other two commodities" (Principles of Commerce—Stevenson.)

মানবের অর্থনৈতিক প্রগতির অনিয়ন্ত্রিত যুগে কত যে বিভিন্ন মুদ্রার প্রচলন ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আমেরিকায় যাঁহারা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা তথাকার আদিম অধিবাসীগণকে কাচখণ্ড, পশুচর্ম্ম প্রভৃতি বিচিত্র দ্রব্য মুদ্রাস্বরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন। তিমি মাছের দাঁত, মাদুর প্রভৃতি দ্রব্য আমেরিকায় স্থানে স্থানে প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে এই সে দিন পর্য্যন্ত কড়ি চলিত এবং শুনিয়াছি কোন কোন অংশে এখনও অল্পবিস্তর কড়ির ব্যবহার আছে। প্রাচীন জগতের প্রচলিত মুদ্রা সম্বন্ধে বহু চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কায় এই সকল বর্ণনার উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। বহু উন্নতিশীল দেশে পুরাকালে গবাদি পশু মুদ্রাস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। ধাতব মুদ্রা প্রচলিত হইবার পরও কোন কোন দেশের মুদ্রায় এইরূপ পশুচিহ্ন অঙ্কিত থাকিত। ইংরাজী pecuniary এবং ল্যাটীন pecunia শব্দ pecus হইতে উদ্ভূত এবং pecusএর অর্থ গরু। Capital শব্দের মূল Caput (অর্থ—মস্তক) এবং cattle শব্দ এই capital হইতেই উদ্ভূত।

কালক্রমে উল্লিখিত মুদ্রাসমূহ কোথাও আংশিক এবং কোথাও সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলিতে ধাতবমুদ্রার প্রচলন হইল; কারণ অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য মুদ্রার যে বিশেষ ক্রিয়ার প্রয়োজন সেই ক্রিয়া সম্পাদন করিবার যোগ্যতা কতকগুলি মূল্যবান ধাতুতেই বিদ্যমান। John Stuart Mill বলিয়াছেন—"By a tacit concurrence, almost all nations, at a very early period, fixed upon certain metals, and especially gold and silver, to serve this purpose. No other substances unite the necessary qualities in so great a degree, with so many subordinate advantages."

মুদ্রার এই বিশেষ ক্রিয়া কি এবং কোন কোন গুণ উহাতে বর্ত্তমান থাকিলে ঐ ক্রিয়ার সন্তোষজনক সম্পাদন হয় দেখা যাক। মুদ্রার কার্য্য প্রধানতঃ দুইটি :—

(১) মূল্যের পরিমাণ নির্ণয় করা, এবং

(২) বিনিময় সংঘটনের যন্ত্রস্বরূপ কার্য্য করা।

যে বস্তুর নিজস্ব অন্তর্নিহিত মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা, স্থায়িত্ব, বহনযোগ্যতা, বিভাজ্যতা, মূল্যের আত্যন্তিক হ্রাসবৃদ্ধিহীনতা, পরিচয়যোগ্যতা প্রভৃতি গুণ আছে সেই বস্তুই আদর্শ মুদ্রা বলিয়া সর্ব্বজনগ্রহণীয় হয় এবং উল্লিখিত ক্রিয়াদ্বয় সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্যের, বিশেষতঃ স্বর্ণের, উক্ত সমুদয় গুণগুলিই বর্ত্তমান এবং তন্নিবন্ধন এই দুইটি ধাতুই অধিকাংশ সভ্যদেশে প্রচলিত মুদ্রার ভিত্তিস্বরূপ।

সুদূর অতীতে, ভারতের গৌরবময় যুগে, দ্রব্যাদির বিনিময় কার্য্যে স্বর্ণ ব্যবহৃত হইত। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে নৃপতিগণ কর্ত্তৃক সুবর্ণদানের উল্লেখ আছে। বহু হিন্দুরাজ্যে রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে ঐ সকল মুদ্রার আকার, গঠন ও ওজন একরূপ ছিল না। সমগ্রদেশে নানারূপ ধাতব মুদ্রা একই সঙ্গে

চলিত এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য এই দুইটি অপেক্ষাকৃত মূল্যবান ধাতু বড় বড় আদান প্রদানে ব্যবহৃত হইত। তবে সাধারণের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার ছিল না বলিলেই চলে। বিভিন্ন আকার ও ওজনের ধাতব মুদ্রার প্রচলন হেতু স্বর্ণাদি তৌল করিয়া বিনিময় হইত এবং কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্রব্যমূল্যের পরিমাপক বলিয়া গণ্য হইত। মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি বহু প্রাচীন সভ্যদেশেও ধাতব মুদ্রার প্রাথমিক ইতিহাস একইরূপ। ইংলণ্ডের সভ্যতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও ঐ দেশে ধাতব মুদ্রা প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে দ্রব্যাদির মূল্য রৌপ্যের ওজনে নির্ণীত হইত। এক পাউণ্ড ওজনের রৌপ্য মূল্যের মাপকাঠি ছিল। কালে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় ইংলণ্ডের আর্থিক সৌভাগ্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ দেশের রাজশক্তি মুদ্রা আইন নিয়ন্ত্রিত করিল। বিভিন্ন আকার ও গঠনের মুদ্রা ক্রমে অপসারিত হইয়া গেল, স্বর্ণকে মুদ্রার শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া রৌপ্যকে নামাইয়া দেওয়া হইল এবং রৌপ্য ও নিম্ন মূল্যের ধাতুদ্বারা গঠিত কয়েকটি বিভিন্ন মুদ্রাকে স্বর্ণ মুদ্রার সাহায্যকারী করা হইল।

আমেরিকা আবিষ্কার ও সুয়েজখাল খননে জনবহুল প্রাচ্যদেশের পথ সুগম হওয়াতে অর্থনৈতিক জগতে এক বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল। বাষ্পীয়যান ও বাষ্পীয়পোতের ব্যবহার, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন, নানারূপ যানবাহনাদির অভূতপূর্ব্ব উন্নতি, নবনব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন প্রভৃতি মানবের ভোগলিপ্সা ও অভাব সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিল এবং এই ক্রমবিবর্দ্ধমান অভাব দূর করিবার জন্য বহু শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতি আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন রহিল না, সমগ্র বিশ্ব এক বিরাট ব্যবসায়ক্ষেত্রে পরিণত হইল, একদেশের চাহিদা মুহূর্ত্ত মধ্যে সপ্ত সাগর পারে অপর দেশে বিজ্ঞাপিত হইতে লাগিল এবং শ্রম সূক্ষ্মতম অংশে বিভক্ত হইল। সহস্র সহস্র বিশেষজ্ঞগণ সহস্র সহস্র বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইল, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সহযোগিতায় উৎপাদন কার্য্য চলিতে লাগিল। ফলে বিনিময় সংখ্যা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল এবং বিনিময় সংঘটনের প্রধান কর্ত্তা মুদ্রারও অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হইতে লাগিল। এই আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের ফলে স্বর্ণের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল, কেননা স্বর্ণই সার্ব্বজনীন মুদ্রা বলিয়া স্বীকৃত এবং স্বর্ণপ্রেরণ বা স্বর্ণে অধিকার দান ব্যতীত আর কোন উপায়ে সাধারণতঃ ব্যবসায় দ্রব্যের মূল্যের আদান প্রদান সংঘটিত হয় না। তাই ইংলণ্ড যখন রৌপ্যকে মুদ্রার সর্ব্বোচ্চ আসন হইতে বিচ্যুত করিয়া স্বর্ণকে সেই আসনে বসাইল ও স্বর্ণকেই ভিত্তি করিয়া অন্যান্য ধাতব মুদ্রার প্রচলন করিল তখন অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশও পশ্চাতে পড়িয়া রহিল না। ক্রমশঃ আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, ইটালি প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিও স্বর্ণকে মানদণ্ড করিয়া মুদ্রার প্রবর্ত্তন করিল এবং তদনুসারে নিজ নিজ মুদ্রা-আইন বিধিবদ্ধ করিল। দেশের প্রধান মুদ্রা স্বর্ণের সহিত যুক্ত হইল এবং অন্যান্য মুদ্রাগুলি ঐ প্রধান মুদ্রার সাহায্যকারী হইয়া কার্য্য করিতে লাগিল।

যে মুদ্রাকে ভিত্তি করিয়া দেশের অর্থনৈতিক আদান প্রদান সম্পন্ন হয় সেই মুদ্রাকেই Standard Coin বা মান-মুদ্রা বলে এবং এই মান-মুদ্রার কার্য্যে যে সকল মুদ্রা সহায়তা করে সেই সকল মুদ্রাকে সাহায্যকারী মুদ্রা, অর্থাৎ Subsidiary বা Token Coins বলে। যে সকল দেশে মান-মুদ্রা স্বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সকল দেশকে Gold Standard Countries বলে এবং যে সকল দেশের মানমুদ্রা রৌপ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সকল দেশকে Silver Standard Countries বলে। পূর্ব্বে কতকগুলি দেশে উক্ত উভয়বিধ Standardই প্রচলিত ছিল। ঐ সকল দেশকে Double Standard Countries বলিত। বাস্তবক্ষেত্রে এই দ্বৈতমান কার্য্যকরী হয় না, কেননা স্বর্ণ ও রৌপ্য এই উভয় ধাতুর উপর ভিত্তি করিয়া মুদ্রা প্রচলিত হইলে মূল্য-সমতা রক্ষা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। Single বা Double Standard ব্যতীত আরও কতকগুলি Standard-এর প্রচলন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যথা Paper Standard, Limping Standard, Tariff Standard ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন মুদ্রামান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয় নহে, তবে মুখ্যতঃ মুদ্রামানগুলির বিভাগ নিম্নে ইংরাজীতে প্রদত্ত হইল :—

Monetary Standards.

- Metal
  - Single (Monometallism)
    - Gold or Silver
  - Double (Bi-metallism)
    - Gold & Silver
  - [1] Pure or Limping
- Mixed
  - Metal & Paper
- Paper
  - Inconvertible
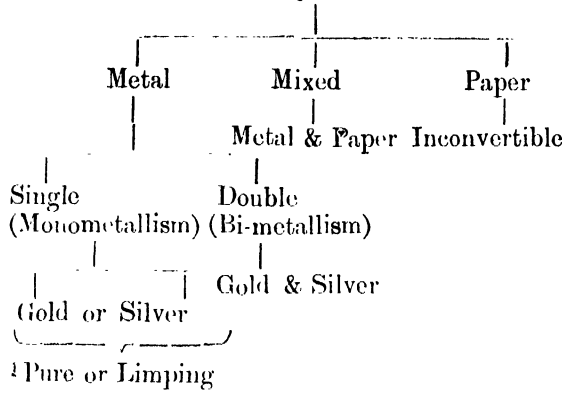
ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিনিময় ক্রিয়ার সৌকর্য্য-সাধন করণার্থ মুদ্রার প্রয়োজন এবং ঠিক এই কারণেই মুদ্রানির্ম্মাণ কার্য্য প্রগতিশীল দেশমাত্রেই রাষ্ট্রের অধীনে ও পরিচালনায় নিয়ন্ত্রিত হয়। কতকগুলি বিশেষগুণ-বিশিষ্ট ধাতুকে মুদ্রার উপাদান স্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন আকারের ও ওজনের মুদ্রা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হয়। এই সকল মুদ্রার মধ্যে যাহা সর্ব্বপ্রধান তাহারই মূল্যের সহিত অপর মুদ্রাগুলির মূল্য নিয়ন্ত্রিত করা হইয়া থাকে। এই প্রধানমুদ্রাকে মানমুদ্রা বা Standard Coin ও অন্যান্য মুদ্রাগুলিকে সাহায্যকারী মুদ্রা, Subsidiary বা Token Coin কহে। রাষ্ট্রীয় আইন বলে উক্ত Standard এবং Token Coinএর নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি পরিদৃষ্ট হয় ;—

(১) মানমুদ্রার অন্তর্নিহিত বিনিময়মূল্য মুদ্রার ধাতব উপাদানের মূল্যের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ মানমুদ্রার উপাদান-ধাতু-পরিমাণের স্বাভাবিক মূল্য ও নির্ম্মিত মুদ্রার আইন-নির্দ্দিষ্ট মূল্য সমান।

(ইংলণ্ড যখন স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং মুদ্রার ষ্টার্লিং অর্থাৎ মুদ্রার আইনগত মূল্য ও উহার স্বর্ণ-উপাদান-পরিমাণের মূল্য একই ছিল। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে প্রবর্ত্তিত মুদ্রা আইন অনুযায়ী ঐ দেশের Pound sterling বা শভ্‌রিণে ১১৩০০১৬ grain ওজনের বিশুদ্ধ স্বর্ণ আছে।)

ব্যবহার করিতে করিতে মুদ্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এই হ্রাস যথাসম্ভব দূর করিবার জন্য সভ্‌রিণে কিয়ৎ পরিমাণে তাম্রের মিশ্রণ দেওয়া হয়। ২ ভাগ খাদ ও ২২ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণে যে স্বর্ণ প্রস্তুত হয় উহাকে Standard Gold বলে। সুতরাং Standard gold বা গিনি সোণার বিশুদ্ধতা ১২ ভাগের ১১ ভাগ। এক আউন্স Standard gold ৩ $\frac{২৯৬}{৬২৩}$ সভ্‌রিণের সমান। সুতরাং এক আউন্স স্বর্ণের টাঁকশালের দর ৩ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স। যে কোন ব্যক্তি ৩ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্সের পরিবর্ত্তে এক আউন্স সোণা পাইত বা ঐ পরিমাণ-সোণা দিলে উক্ত সংখ্যক মুদ্রা পাইত।

(২) এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে মানমুদ্রার দ্বিতীয় বিশেষত্ব বিনামূল্যে ঐ মুদ্রার নির্ম্মাণ এবং (৩) তৃতীয় বিশেষত্ব সাধারণকে যে কোন সংখ্যায় উহা লইতে বাধ্য করা।

অপর পক্ষে সাহায্যকারী মুদ্রা বা Token Coinএর যে মুদ্রামূল্য রাষ্ট্র ধার্য্য করিয়া দেয় ঐ মূল্য মুদ্রার ধাতুমূল্য হইতে অনেক অধিক। সুতরাং সাহায্যকারী মুদ্রার বিশেষত্ব এই যে উহার মুদ্রামূল্য কৃত্রিম ও ধাতুমূল্যাপেক্ষা অত্যন্ত অধিক এবং তন্নিবন্ধন উহার মুদ্রণ অবাধ নহে। সাধারণকে ঐ মুদ্রা যে কোন সংখ্যায় গ্রহণ করিতে আইনতঃ বাধ্য করা যায় না।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ হইতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে দেশের মানমুদ্রা বা Standard Coin স্বর্ণ সেই দেশই স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত দেশে স্বর্ণমূল্য মুদ্রা-মূল্যের সহিত নির্দ্দিষ্ট হারে গ্রথিত সুতরাং জনসাধারণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের পরিবর্ত্তে মুদ্রা অথবা নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ পাইবার অধিকারী। Cassel তাঁহার Money And Foreign Exchange after 1914 গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"The fact that a country has a gold standard implies that the currency of that country is bound up with the metal gold in a fixed ratio of value, so that the price of gold in the currency of the country is fixed—not absolutely it is true—but so that it varies only within narrow limits. In so far as other forms of currency are valid within the country, such currency must clearly be redeemable in gold coin or at any rate in a certain weight of gold. But this is not sufficient to maintain the fixed parity

between the currency and gold. If the gold standard is to be effective, one must be able to obtain for a certain quantity of gold lying either at home or abroad a certain sum in the currency of the country and viceversa, one must be able to obtain for such a sum a certain quanity of freely disposable gold. The guarantees for this are, in the first place, the right of the possessor of the gold to free import and free coinage and, in the second place, the right of the possessor of the country's gold coins to free export and free smelting."

উদ্ধৃত বর্ণনায় স্বর্ণমানের রূপ, বিশেষত্ব, সংজ্ঞা ও কার্য্যকারিত্ব সুইডেনের বিখ্যাত অর্থ-নীতিবিদ পণ্ডিত Gustav Cassel অতি অল্প কথায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এ বিষয় যেটুকু আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে অন্ততঃ একটি জিনিস নিঃসন্দেহে বুঝা গিয়াছে যে স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত দেশে সর্ব্বসাধারণের স্বর্ণে অবাধ অধিকার। ইচ্ছা করিলেই যে-কেহ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রচলিত মানমুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ পাইতে পারে এবং ঐ স্বর্ণ রপ্তানী, ঋণ পরিশোধ, অলঙ্কার নির্ম্মাণ প্রভৃতি যে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং স্বর্ণমান বজায় রাখিতে গেলে দেশে যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণতহবিলের একান্ত প্রয়োজন। অর্থনৈতিক কার্য্য, যথা ব্যবসায়বাণিজ্য-সংক্রান্ত আদানপ্রদান ক্রিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে পরিমাণ স্বর্ণের নিতান্ত আবশ্যক তদপেক্ষা উহার ন্যূনতা ঘটিলে প্রচলিত মুদ্রাকে এই ধাতুটির সহিত গ্রথিত রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে এবং ফলে ঐ মুদ্রার বিনিময়ে সাধারণের স্বর্ণ-প্রাপ্তির অধিকারের সঙ্কোচ সাধন করিতে হয় ও স্বর্ণের অবাধ মুদ্রণ স্থগিত করতঃ প্রচলিত প্রধান মুদ্রার ধাতুগত মূল্যাপেক্ষা অধিক মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যে বিরাট অর্থনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহার যাথার্থ্য স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইউরোপে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। উহার পূর্ব্বে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইটালী প্রভৃতি দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত যুধ্যমান দেশসমূহে সংরক্ষিত স্বর্ণ-পরিমাণ যুদ্ধের বিপুল ব্যয়নির্ব্বাহে এবং তৎসহ আভ্যন্তরীন ও বহির্ব্বাণিজ্য প্রয়োজনে অপ্রচুর হইয়া পড়িল। কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কসমূহে রক্ষিত স্বর্ণতহবিল ক্রেডিট্ বজায় রাখিবার জন্য পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না। ব্যবসায় বাণিজ্যে এক বিরাট বিপর্য্যয় আসিয়া উপস্থিত হইল। যুদ্ধের বিপুল ব্যয়; যেমন করিয়াই হউক এ ব্যয় বহন করিতে হইবে। উপায় কি? অজস্র Paper money দেশময় ছড়াইয়া পড়িল এবং ঐ গুলির পরিবর্ত্তে স্বর্ণ-পাইবার অধিকার রহিল না। দেশে যে টুকু স্বর্ণ রহিল উহাই হইল দেশের একমাত্র সম্বল এবং ঐ টুকুকেই ভিত্তি করিয়া ক্রেডিটের ক্রমশঃ প্রসার হইতে লাগিল। দেশ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিল, কেন না তাদৃশ দুঃসময়ে জনসাধারণকে মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণে অবাধ অধিকার প্রদান করিলে সংরক্ষিত স্বর্ণতহবিলের লোপ যে একরূপ অবধারিত ইহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ঐ সময় যুধ্যমান জাতি সমূহের স্বর্ণমাণ পরিত্যাগ করিবার কারণ সম্বন্ধে Cassel বলিয়াছেন—"The most immediate cause of the gold standard being suddenly dispensed with on the outbreak of war was the desire to preserve as far as possible the gold reserves of the central banks. The extra-ordinary uncertainty as to the future which governed the world during the first days of the war would in all probablity have led to a sharply rising demand for gold as a means to the maintenance of wealth, and as a means of payment especially to abroad. The central banks, therefore, had to reckon with the possibility of being speedily deprived of their gold, if they continued to redeem their notes and other bonds in gold. The loss of gold cash reserves—nay even a considerable reduction of them—would, it was supposed, seriously affect the general confidence in the central banks' note issues, and thereby in the future of the currency. Indeed, the central bank was, as a general rule, legally bound to retain a certain amount of gold in cover for its notes, a substancial drain on the gold reserves would have involved the neglect of that duty, and had therefore to be prevented."

স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইলে দেশের স্বর্ণসংরক্ষণের যে একান্ত প্রয়োজন ইহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আকস্মিক অর্থ নৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইলে এই রক্ষণক্রিয়া কতকগুলি উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে ব্যাঙ্কগুলির সুদের হার বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া অন্যতম। কিন্তু বিপ্লব বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িলে কোন দেশই বর্দ্ধিত সুদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া উক্ত দেশে স্বর্ণ আমানত রাখিতে দ্বিধা বোধ করে। এমতাবস্থায় ক্রেডিটের সঙ্কোচসাধন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং এই সঙ্কোচসাধনের ফলে দেশের দ্রব্যমূল্য হ্রাস হইতে থাকে, উৎপাদন ক্রিয়ার গুরুতর ব্যাঘাত ঘটে এবং এক বিরাট বাণিজ্য সঙ্কট উপস্থিত হইয়া অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে। পরন্তু ব্যবসায়ের চাহিদা অনুযায়ী ক্রেডিট বজায় রাখিতে হইলে মানমুদ্রাকে স্বর্ণ হইতে বিচ্যুত করিয়া স্বর্ণসংরক্ষণ করিতে হয়।

একথা অনেকেই অবগত আছেন যে ইংলণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি দেশ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছে। য়ুরোপীয় সমরের প্রারম্ভ হইতে একাধিকবার তাহাদের এইরূপ করিতে হইল। প্রথমবারের কারণাবলী সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি। দ্বিতীয়বার স্বর্ণমান পরিত্যাগের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উক্ত দেশসমূহের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার্থ যে পরিমাণ স্বর্ণের প্রয়োজন তাহা কতকগুলি কারণে অপ্রচুর হইয়া পড়িল। ইংলণ্ডের তৎ-কালীন অবস্থাই উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাক। এই বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য-সঙ্কট উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য অত্যন্ত মন্দা যাইতেছিল। ইংলণ্ডকে বিপুল পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী করিতে হয় এবং তদীয় বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া আমদানী দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ায় দেশের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতির মূল্য পরিশোধ করিবার জন্য স্বর্ণের অভাব হইতে লাগিল। ইহার উপর সমর ঋণের গুরুভার। ঔপনিবেশিক এবং অন্যান্য দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির লণ্ডনস্থ শাখা সমূহের মারফৎ প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইতে লাগিল। ব্যাঙ্ক রেট প্রভৃতি বৃদ্ধি মুষ্টিযোগে এই মারাত্মক ব্যাধির কোন প্রতীকার হইল না। ক্রেডিটের সম্প্রসারণ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না কেননা উপযুক্ত স্বর্ণপোষকতা না থাকিলে এইরূপ সম্প্রসারণ অত্যন্ত বিপজ্জনক। অনন্যোপায় হইয়া ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে হইল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ইংলণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি দেশের দ্বিতীয়বার স্বর্ণমান পরিত্যাগের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উক্ত দেশ সমূহের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার্থ যে পরিমাণ স্বর্ণের প্রয়োজন তাহা কতকগুলি কারণে অপ্রচুর হইয়া পড়িল। এই কতকগুলি কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ আমেরিকা ও ফ্রান্স কর্তৃক প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ-সঞ্চয় ও ঐ স্বর্ণ বাণিজ্যার্থ নিয়োগে অসম্মতি। অর্থনৈতিক ভাষায় বলিতে গেলে তাহারা স্বর্ণকে কোনঠাসা (corner) করিয়া উহার মূল্য বাড়াইয়া দিল। স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত দেশসমূহে স্বর্ণের মূল্য বাঁধা এবং দ্রব্য-মূল্য স্বর্ণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়: সুতরাং স্বর্ণমূল্য বৃদ্ধির অর্থ দ্রব্য-মূল্য হ্রাস। দ্রব্য মূল্যের এই নিম্নগতি ব্যবসায় বাণিজ্যের অত্যন্ত প্রতিকূল এবং ইহার প্রতিকার সাধারণ উপায়ে সম্ভব না হইলে মুদ্রাকে স্বর্ণ হইতে বিচ্যুত করা একরূপ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ সমরঋণপ্রপীড়িত বিভিন্ন দেশের সংরক্ষিত স্বর্ণতহবিলের অভূতপূর্ব্ব স্থান পরিবর্ত্তন এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স কর্তৃক বিপুল স্বর্ণ সঞ্চয় বিংশ শতাব্দীর এই ভয়াবহ বাণিজ্য-শৈথিল্য ঘটাইবার অন্যতম কারণ। সুদীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া য়ুরোপে যে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য-সঙ্কট। এই সঙ্কটকালে উদ্ভূত শোচনীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ধনবিজ্ঞানবিদ বহু পণ্ডিতকে গভীর ভাবে চিন্তা করিবার খোরাক যোগাইয়াছে। উৎপাদন, ধনবণ্টন, আভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্বাণিজ্য, প্রচলিত মুদ্রাপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মতবাদেরই অভ্রান্ত সত্যতা সম্বন্ধে আজ যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; একমাত্র স্বর্ণকেই মুদ্রা এবং ক্রেডিটের ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহার করিবার আদর্শ ও যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধেও ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

অতিশয় দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক গত ১০ই নভেম্বর রবিবার সহসা মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। ইনি বিচিত্রায় অর্থনীতি সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখ্‌বেন ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাল সে বিষয়ে হন্তারক হ'ল। গণেশচন্দ্র হোরমিলার কোম্পানীতে চাকরী করবার অবস্থায় বি-কম পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি অব বুক-কিপিং-এ ফেলোশিপ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। শ্রীরামপুর বনফুল সাহিত্য-সমিতির তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এমন একজন সাহিত্যানুরাগী উৎসাহশীল যুবকের অকাল মৃত্যুতে আমরা আন্তরিক ব্যথিত হয়েছি। বিঃ সঃ।

দম্পতি

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

বাঙলা দেশে এমন কোনো শিক্ষিত লোক নেই যে সুচারু বাবুর নাম না জানে। খ্যাতনামা গল্পলেখক হিসাবে তাঁর যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যাঁরা শুধু গল্পাংশই গলাধঃকরণ করে থাকেন এবং মাসিকপত্রের পাতা উলটানোই যাঁদের পরম উপজীবিকা, তাঁরাও ব্রিজের আড্ডায় তাঁর গল্পের সমালোচনা করেন। আর যাঁরা আপনাদের বিদগ্ধ সমাজের অন্তর্ভুক্ত মনে করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন, তাঁরা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করে থাকেন সুচারু বাবুর অভিনব আখ্যানবস্তু, তাঁর অপরূপ লিপিচাতুর্য্য। কিন্তু আমি তাঁর শিল্পিজনোচিত অস্থির চিত্তবৃত্তি অথবা তাঁর অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি,—কোনটার কথাই তুলবনা। এ সব সংবাদে নূতনত্ব নেই, জনসাধারণের ভিতর সে সকল বার্ত্তা গিয়ে পৌচেছে। যারা সুচারুবাবুর অন্তরঙ্গ বলে আপনাদের গণ্য ও ধন্য মনে করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে সুচারু বাবু ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী শোভনা দেবীর মধ্যে একটি সুন্দর, মধুর ও বিশ্বস্ত সম্পর্ক আছে। জনসাধারণের একটা ভ্রান্ত ধারণা আমি সচরাচর লক্ষ্য করেছি যে, যাঁরা বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনায় আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাদের পারিবারিক জীবনে নাকি একটা সূক্ষ্ম ও গভীর অশান্তি বিরাজ করে। অর্থাৎ স্বামী যখন সৃষ্টিলোকে আত্মহারা, পত্নী তখন দিনানুদৈনিক সংসারের তুচ্ছ বাস্তবতায় তাকে শিল্পের কল্পলোক থেকে টেনে আনেন।

হয়ত মোটামুটি এ তথ্যের ভিতর কিছু পরিমাণে সত্য লুকান আছে। কিন্তু যিনি একবার সুচারু বাবুর সঙ্গে গভীর মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন, তিনিই জানেন যে লেখাপড়ার চর্চ্চা থেকে আরম্ভ করে জামা কাপড়, খাওয়া দাওয়া, সকল কাজেই সুচারুবাবু শোভনা দেবীর পরামর্শ ছাড়া চলেন না। অনেক স্বামীই করে থাকেন, এর মধ্যে বিশেষত্বটা কোনখানে? একথা আপনারা হাজারবার জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবনা, কেননা এ হল হৃদয়ের জিনিষ। মনোরাজ্যে এই আদান-প্রদানজনিত সূক্ষ্ম ও পরম বিশ্বস্ত মিলনসূত্রটি ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। চাক্ষুষ দর্শনে ও উপলব্ধিতেই এ সম্পর্কের চরম পরিচয়, বিশ্লেষণে তার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়।

আমিও এককালে সুচারুবাবুর অন্তরঙ্গ ছিলুম। কত শান্ত সন্ধ্যায় বাতির স্তিমিত আলোকে তাঁর পড়ার ঘরে সদ্যলিখিত রচনা শুনে মুগ্ধ হয়েছি; আর অখণ্ড মনোযোগের অবকাশ মুহূর্ত্তে লক্ষ্য করেছি স্বামী স্ত্রীর দৃষ্টি বিনিময়। সে দৃষ্টিতে মোহ নেই, রূপলালসা নেই যদিও শোভনা দেবী সৌন্দর্য্যের দাবী অনায়াসেই করতে পারতেন। শুধু দেখেছি তাঁদের চোখে পারস্পরিক ঐক্য, যেখানে বিরোধের স্বর নেই; সে অপ্রমেয় যোগসূত্রের উদ্ভব একমাত্র আশ্বাস ও নির্ভরশীলতা থেকে।

যতবারই আমি এই দুটি অ-সাধারণ ব্যক্তির কথা ভেবেছি, ততবারই চমকিত হয়েছি,—মনে পড়েছে একটি অপ্রাকৃত রজনীর অবিশ্বাস্য কাহিনী। সে কাহিনী আমার মনে যে আঘাত করেছিল, তা আমি কখনো ভুলতে পারিনা, তা যেমনি কঠিন, তেমনি আকস্মিক।

* * * * *

সেদিন ছিল রবিবার। সারা সন্ধ্যাটা বৃথা কাটিয়ে চিত্তের অপ্রসাদটুকু পরিষ্কার হলনা। ভাবলাম সুচারুর বাড়ী যাই, আর কিছু লাভ না হোক ওদের আতিথ্যে, সরস হাসি ও গল্পে মন প্রফুল্ল হবে।

সুচারুর বাড়ী যখন গেলাম, তখন শোভনা দেবী এগিয়ে এলেন আমাকে অভ্যর্থনা করতে। বাড়ীটা বরাবরই নিস্তব্ধ, যেহেতু নিঃসন্তান পরিবারে শিশুর কলহাস্য ও দৌরাত্ম্য কোথায় মিলবে? তবুও সেদিন মনে হয়েছিল, স্তব্ধতাটা যেন

অস্বাভাবিক। শোভনা দেবী বললেন, "আজ বোধ হয় আপনাদের তেমন আলাপ জমবেনা।" জিজ্ঞাসা করলাম "কেন"?

"সম্পাদকের তাড়া এসেছে। ওঁর ত জানেন সব শেষ মুহূর্ত্তে করা চাই। কতবার বলেছি এইবার একটু একটু করে কাজ আরম্ভ করো! এখন সন্ধ্যাবেলায় চিঠি এসেছে কাল অন্ততঃ একটা ছোট গল্প চাই।"

"তা হলে আমি এখন আসি। আজ আর বিরক্ত করবোনা। আপনি বলবেন, আমি এসেছিলাম⋯"

"না, না, আপনি যাবেননা। আমি এখনি খবর দিচ্ছি।"

আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে তিনি একটু মৃদু হেসে বললেন, "উনি ত মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। আপনি থাকলে পরে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ওঁর মন ভালো হবে। তা ছাড়া একটু স্বার্থও আছে। চাই কি, আলাপের প্রসঙ্গে একটা গল্পের কোনো উপাদান বা ইঙ্গিত মিলে যেতে পারে।"

আমার মন শোভনা দেবীর ওপর শ্রদ্ধায় ভরে গেল। কিছু না বলে আমি ওপরে উঠে গেলুম। গিয়ে দেখি সুচারু বসবার ঘরে একটা ইজি চেয়ারে এলায়িত শরীরে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। আমায় দেখে একটু উঠে বসে বললে, "বোস। শুনেছ বোধ হয় কি মুস্কিলেই পড়া গেছে! সম্পাদকের জরুরী তাগিদ অথচ আরাধনাতেও দেবীর প্রসন্ন আবির্ভাব হচ্ছে না।" মনে মনে ভাবলাম—এক হিসাবে আছি ভালো। তোমাদের মত সৌখীন দাসত্ব পোষায় না।

সুচারু যে ঘরটায় বসেছিল, সেই ঘরের ভিতর দিয়ে তার পড়বার ঘরে যাওয়া যায়। মাঝের দরজাটা খোলাই ছিল, বসে বসে দেখতে পাচ্ছিলাম অদূরে একটি ছোট লেখবার টেবিল, নিকটেই শুভ্র বাতি- দান জলছে। টেবিলের উপর এক গোছা সাদা কাগজ ঝকঝক করছে। হাতের কাছেই একটা ট্রের উপরে কয়েকটা সাজা পান ও প্রচুর সিগারেট সাজানো রয়েছে। বুঝলাম এই সযত্ন পরিচর্য্যার পিছনে শোভনা দেবীর কতটা বুদ্ধিমান সাহচর্য্য! তাঁর আশা, যে এ রকম পরিষ্কার ও লোভনীয় পরিবেশের আকর্ষণে সুচারুর মস্তিষ্কে একটা গল্প উদ্ভাবিত হবে।

সুচারুর মনটা যে অধীর হয়েছে সেটা বুঝলাম যখন সে আমার সঙ্গে অতিসাধারণ কথার অবতারণা করলে। কোথায় রাস্তায় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে, নতুন কি একটা ছবি এসেছে, এই সব অর্থহীন, অপ্রস্তাবিক সংবাদ কখনই সে দিতে পারতনা, যদি না তার মন অতিমাত্রায় চঞ্চল হত।

কথাবার্ত্তার মাঝখানে টেলিফোনের ঘনটাটা বেজে উঠল। শোভনা দেবী পড়বার ঘরে উঠে গেলেন, টেলিফোন ধরতে। শুনলাম তিনি বলছেন, "হ্যালো।" শোভনা দেবী আর ফিরে এলেন না। একটু খানি চুপ করে থেকে সুচারু বললে, "আচ্ছা, টেলিফোনের সাহায্যে কোনো অপরিচিত লোক যদি একটা প্লট বলে দিত!"

"টেলিফোনে প্লট?"

"আশ্চর্য্য লাগছে, অমল? কিন্তু এ অবিশ্বাস্য ব্যাপার একবার সত্যই ঘটেছিল। ঠিক এই রকম রাতে, আমার মনটা সেদিন আজকের মতই বেবাক শূন্য ছিল। রাত্রির অপরিসীম নিস্তব্ধতার ভিতর থেকে একজন অপরিচিত মহিলা আমাকে একটি অতি সুন্দর গল্প শুনিয়েছিলেন। আমি সে কাহিনীটা কখনো কাজে লাগাইনি। কিন্তু সেটা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। টেলিফোনের ঘণ্টা শুনলেই আমার পুরানো স্মৃতিটা ভেসে আসে। কতদিন গভীর রাতে লিখতে লিখতে সে মহিলাটীর কথা চিন্তা করেছি, তার কণ্ঠ-স্বরের প্রতীক্ষায় আশান্বিত হয়ে উঠেছি।"

"এমনি অদ্ভুত সে গল্প? না জানি⋯"

আমার কথায় সুচারু একবার পড়বার ঘরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। যেন চকিতে দেখে নিলে যে তার স্ত্রী সেখান থেকে চলে গিয়েছেন কিনা। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, "আচ্ছা অমল, তোমার কি বিশ্বাস হয় যে, কোনও লোক একজন সম্পূর্ণ অজানিত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব মহিলাকে ভালোবাসতে পারে? খুব গভীর ভাবে তাঁর সঙ্গে সত্যিকার প্রেমে পড়তে পারে?"

"একটু খুলে বল, নইলে তাৎপর্য্যটা দুর্ব্বোধ্য থেকে যাবে।"

"আমার জীবনে একটি মাত্র নারী প্রবেশাধিকার পেয়েছে আর সে নারীকে আমি কখনো ইতিপূর্ব্বে দেখিনি।"

আমি সুচারুর দাম্পত্য জীবনের নির্বিরোধ ইতিহাস স্মরণ করে স্তম্ভিত হলাম। এতই অবিশ্বাস্য যে⋯⋯

"কেন এতে আশ্চর্য্য হবার কী আছে? আমরা কাকে ভালোবাসা দিই, বল? একটি বিশিষ্ট মুখের অধীশ্বরীকে, না তার অশরীরী মানসিক পরিমণ্ডলকে? আমি জোর করে বলতে পারি যে আমি তার অবচেতনার গভীর স্তরগুলি পর্য্যন্ত যে ভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছি, তাকে বাহুপাশে, আলিঙ্গনে বেঁধেও তার শতাংশের একাংশ পেতুম না। আমি তার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জানি। কেবল জানিনা যে খবরগুলি নিতান্তই গৌণ, যে গুলি মৌখিক পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে,—ধর যেমন তার স্বাস্থ্য, আকৃতি, তার বর্ণ, তার নাম, অথবা সে কুমারী কিংবা পরস্ত্রী। এগুলো আমি জানতে পারিনি সত্য—কিন্তু যেটুকুর পরিচয় পেয়েছি—তার রুচি, ও সংস্কার, তার আত্মার প্রকৃতি কিংবা তার হৃদয়ের গোপন কামনা—সেগুলি আমার কাছে অতিপরিচয়ে সুস্পষ্ট। তুমি বল—এসবের মূল্য কি নেই?"

সুচারু থামল, তারপর একটু দ্বিধাহত সুরে বলতে সুরু করলে:

"আমার হয়েছে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। যদি আমি ঘুণাক্ষরেও স্ত্রীর সমালোচনা করি, তুমি ভাববে—আমি একটা অকৃতজ্ঞ অপদার্থ। আর যদি তুমি ভাবো, সাধারণ আলাপী লোকেরা যেমন মনে করে, যে আমরা উভয়ে পরম সুখী, আর আমি যদি তার প্রতিবাদ না করি, তা হলে তোমাকে যে কাহিনী শোনাব তার যথাযথ মূল্য তুমি দিতে পারবেনা। শোনো:

আমাদের বিয়ের কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলুম যে আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা বড় রকমের অমিল আছে। সে বৈষম্য কোথায় সেটা ঠিক্ বোঝান যায় না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমাদের জীবনের সর্ব্ববিধ কাজে ও মতে সে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল। প্রথমে আমি তাকে বলতাম, বিয়ের আগে, যত সব মনীষীদের আত্মকথা, তাঁদের অপূর্ব্ব প্রেরণা ও অধ্যবসায়। বিশ্বসাহিত্যিকদের সে সব প্রাণবান্ বর্ণনা শুনে আমার স্ত্রী মুগ্ধ হত। বিয়ের পর তাকে শোনাতুম্ আমার নিজের আশা ভরসার কথা, আমার ভবিষ্যৎ, আমার কাল্পনিক ভবিষ্যৎ। এ পরিবর্ত্তন তার কাছে কঠিন লাগল। সে হ'ল বর্ত্তমানের জীব। গল্প গল্পই, তার ভিতর দিয়ে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ-এ সব বড় বড় কথা তার কাছে নিরর্থক। চেয়েছিলুম সহানুভূতি, প্রতিদানে মিলল নির্ব্বিকার শীতলতা—উদাস শৈথিল্য। ছোট-খাটো ঘটনায় মনোরাজ্যে যখন নিত্যদ্বন্দ্ব, প্রেম সেখানে কতদিন টিকে থাকে—বল? দার্শনিক আপনা থেকেই জন্মায় না, অমল, অভিজ্ঞতাতেই তার সৃষ্টি। ক্রমশঃ আমার মনে একটা বিদ্রোহভাব এল। কেনই বা হবেনা? আমি চেয়েছিলাম—আমার নিঃসঙ্গ জীবনে একজন প্রকৃত সঙ্গী, সত্যকারের সমবেদনায় যে আমার হৃদয় পূর্ণ করে রাখবে, নৈরাশ্যে আনবে প্রেরণা......

সুচারু একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলে:

"বছর তিনেক আগেকার কথা। তখন আমি কাজ করতুম নীচের ঘরে বসে। টেলিফোনটাও নীচেই থাকত। একদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে ভাবছিলুম। ভাবছিলুম একটা গল্পের প্লট্; শত চিন্তাতেও যা মাথায় আসছিল না। ঠিক্ আজকের মতই আমার ছিল সেদিনকার মানসিক অবস্থা। গল্পের কথা বিস্মৃত হলুম্—ভাবতে লাগলুম আমার নিজের জীবনের কথা—তার বিফলতা। চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে—একটা ধরতে যাই, দীর্ঘ বিসর্পিত হয়ে সেটা কোথায় মিলিয়ে যায়! এমন সময়ে বেজে উঠ্‌ল টেলি-ফোনের ঘণ্টা। রিসিভারটা কাণে তুলে নিতেই পরিষ্কার মেয়েলী কণ্ঠস্বর পেলাম···'কেমন আছ? আজ দুদিন তোমার খবর নেই। ঘুম আস্‌ছেনা—তোমার কথা ভেবে, তাই রিঙ্ আপ্ করলুম্...'

এ আবেদন আমাকে নির্ব্বাক্ করে দিল। বুঝলাম—এ ভুল নম্বরের কারসাজি। কিন্তু ভারী ভালো লাগলো এই বহুদূর থেকে ভেসে আসা অজানা কণ্ঠস্বর। সহরের কোন অপরিচিত প্রান্ত থেকে এ বিস্ময়কর সুর আমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলে দিল! সহসা ঝোঁকের বশে বলে ফেললুম্...

আমিও নিঃসঙ্গ। বোধহয়, এতক্ষণ এরি প্রতীক্ষায় ছিলুম।

ক্ষণিক বিরতির পর চমকিত সুরে কথা এলো,

'কে আপনি?'

সে ভাগ্যবান্ নই নিশ্চয়ই। কিন্তু কিছু কম উৎসুক নই···

হালকা হাসির মিষ্টি সুর বেজে উঠ্ল।

"একটু সদয় হোন্। দুটি সঙ্গহীন মনের এ রকম আকস্মিক সংযোগ—নিশ্চয়ই বিধাতার অভিপ্রায়। আপনার কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই, যেহেতু আমি আপনাকে একেবারেই চিনি না। অন্ততঃ কিছুক্ষণ বাক্যালাপ করুন।

"কি বলব বলুন্?"

"যাতে আমাদের দুজনেরই স্বার্থ আছে—অর্থাৎ আপনার নিজের কথা।"

"না।"

"আপনার সঙ্কোচের কারণ?"

'আচ্ছা থাক্—একটা গল্প বলি শুনুন্।'

"কিন্তু সত্যের প্রতি আমার অনুরাগ বেশী। তবে একান্তই যদি না বলেন, বাধ্য হয়ে গল্পটা পছন্দ করছি।"

'আপনার রুচির প্রশংসা করি। আপনি স্থির হয়ে বসুন্।'

কৌতুক-হাস্যে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বললুম্, "অপরিচিতা দেবী, অনুমতি করুন একটু ধূমপানের তৃষ্ণা পেয়েছে···

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে হাসি ভরা আওয়াজ এল, 'আপনার ভদ্রতাকে কিন্তু অনেক দূর টেনে নিয়ে যাচ্ছেন···'

"কতদূর?" তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলাম্। কিন্তু সে ইঙ্গিতের ধার দিয়েও গেল না। তার নাম ধাম সবটাই অপ্রকাশিত রইল। ভাবতে লাগলুম—না জানি সহরের কোন্ পল্লী থেকে .. ?

আদেশের সুর এল;

'মন দিয়ে শুনুন্। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে—তারা পরস্পর খুব ভালোবাস্ত। বিয়ের সমস্তই ঠিক্ হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ কি একটা তুচ্ছ উপলক্ষ্যে মেয়েটি বড় অসুখে পড়ল। কিছু দিন রোগ ভোগের পর ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেল। জীবনের আশা নেই বুঝে অন্তিম শয্যায় সে ছেলেটিকে ডেকে পাঠাল। বিদায় দেবার সময় তার অপরূপ কবরী থেকে একটি ভ্রমর-কৃষ্ণ অলকগুচ্ছ কেটে নিয়ে ছেলেটিকে দিয়ে বললে, তুমি যাকে এত ভালবাসতে তারি একটা নিদর্শন রেখে গেলাম। যে দেশে আমি যাচ্ছি,—সেখানে তোমারি অধীর প্রতীক্ষায় থাক্‌ব। আবার দেখা হবে,—কিন্তু লক্ষ্মীটি অবিশ্বাসী হয়োনা, আমার মরেও সুখ হবে না...যদি তোমার ভালোবাসা কমে যায়—আমার এই চুলের গোছা বিবর্ণ হয়ে যাবে। ভুলো না...

মেয়েটি মারা গেল। ছেলেটি শোকে আকুল...কিছুতেই শান্ত হয় না। বিষণ্ণ, ম্রিয়মাণ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঘরে সর্ব্বত্রই তার ছবি টাঙ্গিয়ে রাখল। বন্ধুরা কিছুতেই তাকে প্রকৃতিস্থ করতে পারল না। মধ্যে মধ্যে ছেলেটি দরজা বন্ধ করে সেই অলকগুচ্ছটি নিরীক্ষণ করে—দেখে বর্ণান্তর হয়েছে কিনা। দেখে ঠিক যেমনটি ছিল, তেমনি আছে। আশ্বস্ত হয়—ভাবে আমার প্রেম অজয়।

সেবার বিদেশে একটি নতুন মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হল; কালক্রমে সে আলাপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরিণত হল। হিতৈষী বন্ধুরা নিশ্চিন্ত হল; দুষ্ট লোকে মন্তব্য করলে। কিন্তু ছেলেটি আবার সুখী হল। ধীরে ধীরে তার জীবন থেকে মরণের অসহ্যকর প্রভাব কেটে গেল।

একদিন তার স্ত্রী দেরাজ থেকে সেই পুরাণো প্যাকেটটা বার করলে। সযত্নে জড়ানো মোড়কের মধ্যে কি থাকতে পারে ভেবে তার কৌতূহল জাগল। ছেলেটী সামনে বসে—কিছু বলতে পারে না—কেবল সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, মনে মনে কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করে। আড়চোখে দেখে, তার স্ত্রী সেটা খুলেছে; কিন্তু পরক্ষণেই তার স্ত্রীর কলহাস্যে নিস্তব্ধ কক্ষ মুখর হয়ে গেল। আমি কি বোকা! সত্যি আমার ভয় হয়েছিল—ভেবেছিলুম কাউকে তুমি আগে ভালোবাস্‌তে, তারি···

ছেলেটি সাগ্রহে মুখ বাড়িয়ে দেখল···কেশগুচ্ছ শুভ্রবর্ণ ধারণ করেছে!'

সুচারু নিভে-যাওয়া সিগারেট আবার জালিয়ে নিলে।

"সত্যি বলতে কি, এ কাহিনীটা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাতে এমন আন্তরিকতার সুর... এমন বিষাদের রেশ পেয়েছিলাম যে কিছুক্ষণের জন্য আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হল না। আমার অজানা সহচরীকে প্রশংসা

অথবা সমালোচনা কোনোটাই জানালুম না। কেবল জিজ্ঞাসা করলুম—কে আপনি—বলুন্!

'এ প্রশ্ন আর কখনও তুলবেন না। ভালো লাগল কিনা, তার জবাব দিন। এতেক্ষণে কি আপনার অবসাদ একটুকুও দূর হয়নি?'

'হয়েছে।'

'আমারও তাই। আচ্ছা আসি—নমস্কার।'

তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম্—'একটু অপেক্ষা করুন্—অনুগ্রহ করে বলে যান্ আবার কখন আপনার সঙ্গে...?'

কোন উত্তর পেলাম না। যে রকম নিঃশ্বাস রোধ করে প্রতিটি মুহূর্ত্ত গুণেছিলাম, অন্য কোনো নারীর মুখের জবাবের জন্য এতটা সাতঙ্ক অপেক্ষা আমায় করতে হয়নি।

"কাল সকালে?" জিজ্ঞাসা করলুম্।

"না।"

'বিকালে?'

'অসম্ভব।"

'তবে কাল রাত্রিতে—ঠিক্ এমনি সময়ে?'

'আচ্ছা দেখি যদি পারি।'

'আমার নম্বরটা জেনে নিন্...পার্ক ১৬৪৯। যদি সুবিধা হয় টুকে রাখুন।'

'লিখে রেখেছি।'

'বলুন, দেখি—ভুল হয়েছে কিনা?'

'পার্ক ১৬৪৯। রাইট?'

'রাইট।'

'নমস্কার। আপনি ঘুমের চেষ্টা করুন।'

'আর আপনি?'

জবাব পেলাম না। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে চলে এলাম।

তুমি হয়ত ভাবছ, অমল, যে আমার এই ভৌতিক আবেশের কথা আমি সকালে উঠেই বিস্মৃত হলুম। তা মোটেই নয়। সারাদিন ধরে আমার মন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইল। হয়ত মিনিট পনর আমরা আলাপ করেছিলাম, কিন্তু ওই সময়টুকুর মধ্যেই অপরিচয় ও দূরত্বের ব্যবধান কাটিয়ে আমরা পরস্পরের অতি নিকটে এসেছিলাম। তখন বুঝেছিলাম যে দর্শনমাত্রেই প্রেম বলে একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য হলাম ভেবে...যন্ত্রের সাহায্যে আত্মার এ সান্নিধ্য কি অপ্রত্যাশিত ভাবেই সম্ভব হল! উপন্যাস, গল্পে অনেক যায়গায় লেখা থাকে দেখেছি—মনের অধৈর্য্যে ঘড়ির কাঁটা যেন আর চলে না বোধ হয়। কথাটা বরাবরই হাস্যকর ঠেকেছে, কিন্তু সেদিন সে অতিরঞ্জনের সত্যতা উপলব্ধি করেছিলাম। সারাটা দিন কি করে কেটেছিল—ভগবানই জানেন। অবশেষে সময় যখন আগতপ্রায়, আমার স্ত্রী নীচেকার ঘরে এসে ঢুকলেন। দেখলাম, কিছু করছি না দেখে আমার সঙ্গে গল্প করতে চান। তুমি নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারবে, অমল, আমার সে মুহূর্ত্তের মানসিক অবস্থা। নির্দ্দিষ্ট ক্ষণ এগিয়ে আসছে, অথচ আমার স্ত্রী নড়ছেন না। হঠাৎ ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে গেল। যদি হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে ওঠে, তখন কি করা যাবে? স্ত্রীর উপস্থিতিতে তার সঙ্গে আলাপ অসম্ভব, অথচ কাজের অছিলায় কথা বন্ধ করলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না। আবার যদি অন্যমনস্কতার ভাণ করে টেলিফোন না ধরি, স্ত্রী নিজেই হয়ত উঠে গিয়ে...উঃ কি দারুণ সঙ্কট। মনে মনে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে লাগলুম। তিনি কর্ণপাত করলেন। চাকর এসে সে সমস্যার সমাধান করে দিলে। আমার স্ত্রী কি একটা সাংসারিক কাজে অন্যত্র চলে গেলেন।

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে ঘণ্টা বেজে উঠল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে টেলিফোন ধরলুম। 'নমস্কার। এই দেখুন ঠিক্ কথা রেখেছি।'

আমি কম্পিত গলায় বললাম—"নমস্কার। অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু ইচ্ছে করছে সামনা সামনি...

'বেশী বীরত্বে কাজ নেই। বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ হচ্ছে, শুনুন। আচ্ছা ঠিক্ করে বলুন ত, আপনি মনে মনে তারিফ করছেন নিশ্চয়ই?

'কেন—কিসের?'

'বৃষ্টির মধ্যে আপনাকে কষ্ট করতে হচ্ছেনা বলে। নিজের ঘরে আরামে বসে শুষ্কবস্ত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করছেন।'

'কতকটা সত্য—কিন্তু একটা বড় অসুবিধা, আপনাকে চোখে দেখতে পাচ্ছিনা।' 'সেটার জন্যও আপনার আমার

কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। হয়ত, আপনার আশাভঙ্গ হত, আমাকে চাক্ষুষ দেখলে। হতেও ত পারে, আমি একজন প্রৌঢ়া—নিতান্তই সাদাসিদে; রূপ গুণের বালাই নেই। কিংবা ধরুন কোনো বইএর ক্যানভ্যাসার......

ভাল কথা। কাল রাত্রির পর থেকে আপনার একখানা বই আবার পড়তে সুরু করেছি।'

'আপনি আমার নাম জেনেছেন দেখ্‌ছি। আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন যে আপনার কাছে আমি টেলিফোনের তালিকায় একটা নম্বর মাত্র নই। আচ্ছা—এর পূর্ব্বে কি কখনো আমাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে?'

'কাল রাতেই প্রথম আপনার সঙ্গে কথা কয়েছি—কিন্তু প্রায়ই আপনাকে দেখেছি।' 'আপনারই জয়। অন্ততঃ, মোহ-মুক্তির আশঙ্কা নেই .....'

কি বলছেন?'

'বলছি যে আপনি আমার নাম জানেন, আমাকে দেখেছেন। আর আমি—কিছুই জানি না। এ অবস্থায় আলাপ সরল ও সমধর্ম্মী হতে পারে না।'

'সত্যি। কিন্তু যদি বলি আমি আপনার বিশ্বাস ও নিঃসঙ্কোচ আলাপের একেবারে অযোগ্য নই...?'

'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু আপনি হয়ত ভাবছেন—এটি নতুন চাল, আসলে এক লঘুচিত্ত মেয়ে রহস্যের আবরণ টেনে নিজেকে মায়াময়ী করে তুলতে চায়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার পরিচয় দেবার উপায় নেই। আপনার যা অভিরুচি তাই ভাবুন, তবে যা বললাম তা সত্য।'

'আপনাকে কখনো আপনার পরিচয় নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত করব না। যেটুকু পেয়েছি সেটুকুই পরম লাভ। আপনার স্বরূপ-উন্মোচনের প্রয়াস করতে হবে না। শুধু কথা দিন্ যে এ আলাপ অবসর-বিনোদনের ক্ষণিকের খেয়ালেই শেষ হবে না।'

'তথাস্তু। কিন্তু আপনিও কথা দিন্ যে আপনি নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা বলবেন? মনে কুণ্ঠা রাখবেন না।'

'যে রকম অসঙ্গত আদেশ করছেন, শুনে ভরসা হচ্ছে আপনি প্রৌঢ়া ত ননই; নিতান্ত সাধারণ নন্।'

একটু থেমে আওয়াজ এল, 'আচ্ছা এখন আসি—নমস্কার।'

* * * *

সুচারু বললে, "এর পরের ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন নয়। তবে আমার মনের তরফ থেকে সে এক নূতন যুগের সূত্রপাত। আমার সব ধ্যান, সব জ্ঞান ঐ টেলিফোনের চিন্তায় প্রযুক্ত হল। আহারে, আলাপে, সামাজিকতায়, সাংসারিক কর্ত্তব্যে—সমস্ত কাজের ভিতর দিয়ে ঐ অপরিচিতার মোহ আমাকে নিত্য নূতন আশায় উজ্জীবিত করে রাখত। রাতে, আপন কক্ষের নির্জ্জনতায়, যখন পরস্পর মিলিত হতুম্—তখন আমার উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষা দেখে তুমি বুঝতে পারতে যে বহু-ঈপ্সিত নারীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেও এ অনির্বচনীয় তৃপ্তি হয় না। অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ আত্ম-সংযোগের ফলেও সে আশক্তির নিবৃত্তি দূরে থাকুক এতটুকুও অপক্ষয় ঘটে নি।"

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। কোনো প্রশ্ন করে সুচারুর আত্ম-সমাহিত ভাবের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করতে প্রবৃত্তি হল না। খানিক-ক্ষণ নিঃশব্দ থেকে সুচারু বললে:

"মনে ভয় ছিল সর্ব্বদাই যে কোন দিন আরব রজনীর অলীক স্বপ্নকাহিনীর মত আমার এই অদৃশ্য-যোগসূত্র মিলিয়ে যাবে। মানসিক সংসৃষ্টি যেখানে সূক্ষ্ম সংযোগ সাধন করে, সে মিলন কতদিন স্থায়ী হতে পারে? অশরীরী মায়ার আকর্ষণ কি শেষ পর্য্যন্ত প্রবল থাকবে? এ অশান্তির ওপর আবার নূতন উৎপাত সুরু হল। আগে কচিৎ কখনো কেউ আমাকে ফোনে ডাকত। এখন ভাগ্য পরিবর্ত্তনে তুচ্ছ কাজের অছিলায়, সময় নেই, অসময় নেই, পরিচিত, অপরিচিত ব্যক্তিরা ফোনে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে। শেষে আপনাকে সংযত করা শক্ত হয়ে পড়ল। কোন্‌টা বাইরের ডাক—কোন্‌টা নিজস্ব—কে কখন ফোন ধরবে—যদি আমার স্ত্রী কোনোদিন নিজেই···উঃ এই সব প্রাণান্তকারী চিন্তায় আমার স্নায়ুগুলো উৎপীড়িত হয়ে উঠল। এক এক সময় মনে হত, স্ত্রীর কাছে অকপটে সব কথা স্বীকার করি, তাকে বুঝিয়ে বলি। কিন্তু হাজার বুদ্ধিমতী হলেও, স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকলেও, কোন্ স্ত্রী তার স্বামীকে এ অবস্থায় মার্জ্জনা করবে? শত্রু অদৃশ্য বলেই তার ভীষণতা, তার ছলাকলার অকাট্য প্রমাণ আরো উৎকট ভাবে প্রতিপন্ন হবে।

কিন্তু সব দ্বন্দ্বের নিরসন হ'ত সেই নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে—আমাদের পরম মিলনক্ষণে। আমার মন ভয়াবহ চিন্তা থেকে এক নিমিষে মুক্ত হত। বিরক্তিকর প্রাত্যহিকতা এড়িয়ে এক মুহূর্ত্তে আমি অখণ্ড, নির্ব্বেদ শান্তির আশ্রয়ে চলে যেতাম। আর আমার অপরিচিতাকে সমস্ত দুঃখই নিবেদন করতুম। আমার আশা, জল্পনা, আমার সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ আমার উদ্বেগ, আমার যাবতীয় গোপন বাসনা তাকে জানাতুম। তার পরিবর্ত্তে যা পেয়েছি, সে আমার চিরকালের অক্ষয় সম্পদ। সে সমবেদনার এতটুকু ভগ্নাংশ আমার স্ত্রীর কাছে পাই নি।

ভুল করো না—অমল, আমার কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল না—মনের কোণে কোনো অন্যায় লোভ পরিপুষ্ট হয়ে ওঠেনি। তার কাছে পেয়েছিলাম—মধুর সঙ্গ—বুদ্ধির সাহচর্য্য। যে দিন আমার লেখা ভাল হত, মনে করতুম আজ পড়িয়ে শোনাতে হবে, দেখি কি বলে! তুমি আশ্চর্য্য হবে সে ছিল আমার তীব্রতম সমালোচক, অথচ সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ উৎসাহ তারি কাছে পেয়েছি। তার অন্তর্দৃষ্টি ও সাহিত্যের মানদণ্ডে কোনো রচনার রূপ-বিচার, এ দুটি ক্ষমতায় আমি মুগ্ধ হতুম, অবাক হয়ে যেতুম। আর যেদিন লেখা ভালো হত না, অথবা কাজ অগ্রসর হতনা, অকপটে স্বীকার করতাম, কারণ লুকোচুরির সম্পর্ক আমাদের ছিলনা। মৃদু অনুযোগ করত, অনুরোধ করত এমন সুরে যেটা আদেশের মতই অপরিহার্য্য।

আমার জীবনায়ন অন্য ধারায় প্রবর্ত্তিত হয়ে গেল। আমার সাহিত্য-রচনার সেটা হল তুঙ্গ স্থান। স্নেহই বল, আর দেহহীন প্রেমই বল, সে আমার হৃদয়ে নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করল। আশ্চর্য্য নয়? যে নিঃসঙ্গতার সূত্র ধরে ভাগ্যের পরিহাসে আমার জীবনে এক অভ্যাগত অতিথি উপস্থিত হল, সেই আমার পরমাত্মীয় হল? জীবনের অর্থবোধ, আমার দায়িত্ব, যশোলিপ্সা সবগুলি সুস্পষ্ট হল তারি অযাচিত করুণায়। কেউ জানতনা—অতি নিকট বন্ধু—তোমরাও না—যে এই নব প্রেরণার উৎস মূলে রয়েছে এক অদৃশ্য বান্ধবী।'

সুচারু নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল। মুখে তার চিন্তার ছাপ। একটু বিশ্রামের জন্য উঠে সিগারেটটা ধরিয়ে নিলাম। হঠাৎ মাঝের খোলা দরজার দিকে নজর পড়তেই চমকিত হলাম। দেখি, টেবিলের উপর এক হাতে কপোল ন্যস্ত করে আনত হয়ে শোভনা দেবী…

সুচারুকে সতর্ক করবার জন্য কাছে এসে ইঙ্গিত করলাম। কিন্তু সে, বোধ করি, তখন অপরিচিতার পূর্ব্ব স্মৃতিতে তন্ময়। আমার তখন উভয় সঙ্কট। শোভনা দেবী যদি সহসা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তা হলে লজ্জার পরিসীমা থাকবেনা, আপনাকে অপ্রস্তুত, অপমানিত মনে করবেন। এদিকে সুচারু আমার দিকে ভুলেও তাকায়না যে থামতে বলি।

তারপর হঠাৎ সুচারু দ্রুত বলে উঠল, একটু উত্তেজিত সুরে :—

"শোনো। সুখে বিভোর ছিলাম—ভবিষ্যতের গহ্বরে কি গুপ্ত আছে লক্ষ্য করবার অবসর মেলেনি। অবশেষে একদিন শুনলাম—

'বিদায় বন্ধু। এই শেষ।'

মাত্র চারটি কথা। কিন্তু ঐ কয়টি কথাতেই আমার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হলাম। মুখে উত্তর জোগালনা।

'কথা বলছেন না যে...কি হল আপনার? আমার যে ভয় হচ্ছে?'

'না কিছু ত হয়নি।' কিন্তু আকস্মিক বিচ্ছেদের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। বলতে গিয়ে আমার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠল। ওদিকে উদগত দুঃখ রোধ করবার সকরুণ প্রয়াস উপলব্ধি করলাম। প্রশ্ন করলাম—"আপনি কি কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন? কোথায়?"

'বলবার উপায় নেই। জিজ্ঞাসা করে অযথা কষ্ট দেবেন না।'

'কবে ফিরবেন? আশা আছে কি?...আমি প্রতীক্ষায় থাকব।'

'তাও বলতে পারি না।' বিনীত অনুতপ্ত সুরে আবার বললে, 'আমায় আপনি ক্ষমা করুন।'

হঠাৎ আমার মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এ ব্যবধান ঘোচাবার কি উপায় নেই? অন্তরীক্ষ পথে যে আলাপের প্রারম্ভ, মরীচিকার মতই কি তা আকাশ পথে বিলীন হবে? কেন, আমার এই আকুল প্রশ্নের উত্তর অসম্ভব? কিন্তু কথা

দিয়েছি যে তার পার্থিব পরিচয়ের জন্য কোনও দিন তাকে পর্য্যন্ত করব না। তবু জোর করে বললাম—"যদি এই শেষ হয়, তাই ভালো। মেনে নিলাম আপনার কঠিন আদেশ। কিন্তু বলে রাখি,—না জানিয়ে দেওয়ার কোনো অর্থও নেই যে, আমি আপনাকে ভালবেসেছি, হ্যাঁ, মূঢ়ের মত অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে গভীরভাবেই ভালোবেসেছি। এইটুকুই শুনে রাখুন ··

সাশ্রু কণ্ঠস্বরে প্রত্যুত্তর পেলাম, 'আমারো ত মন ফেরাবার উপায় নেই। দোষী আমিই। তবে একা আপনারই বেদনা নয়···যাক্, এই শেষ! সময় নেই। বিদায় নমস্কার নেবেন ...'

আমার অবিশ্বাস্য কাহিনীর এই অন্ধকার সংক্রান্তি। এক মুহূর্ত্তে আলোকিত, স্বপ্নসমৃদ্ধ জগৎ থেকে নেমে এলাম নৈরাশ্যময়, অর্থহীন সংসারের দরিদ্রতায়। অমল, কখনো তোমার ভাগ্যে এরূপ ঘটেছে কি,- -যে তুমি কোনো মহিলাকে ভালোবাসো—অথচ—তার ঠিকানা, পরিচয় কিছুই জানো না —দিনের পর দিন আপনারই সুগোপন জ্বালায় জলেছ, বাইরে প্রকাশ করতে পারোনি—? মন অধীর হয়েছে, ক্ষুব্ধ হয়ে সংসারে তিক্ত হয়েছ, অথচ সে বিদ্রোহভাবকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অমানুষিক স্থৈর্য্যের সহিত দমন করেছ? তা হলে হয় ত আমার অবস্থাটা অনুমান করতে পারবে। সে আমাকে নিঃসঙ্গ করে যায়নি···নিঃস্ব করে গিয়েছে। তবু, তবু...এই যান্ত্রিক যুগের প্রতিনিধি, ঐ টেলিফোনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ওরি মধ্যে তাকে পেয়েছিলাম···ওরি ভিতরে সে মিলিয়ে গিয়েছে।"

* * * *

সুচারু ইজি চেয়ারে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করে বসল। সম্মুখেই শোভনাকে দেখা যাচ্ছে। উৎকণ্ঠায় আমি নির্ব্বাক্।

"শুধু ঐ যন্ত্রটা; ওইটাই আমার নিজস্ব, আমার প্রেরণার গোপন মূলাধার।"

'চমৎকার হয়েছে,' শোভনা দেবী বলতে বলতে কতকগুলো লেখা কাগজ নিয়ে আমাদের ঘরে উঠে এলেন। 'কিন্তু মধ্যেকার ঐ ছোট গল্পটা—ছেলেটী ও মেয়েটির প্রেম-কাহিনী,' —ওটা কেন এরি মধ্যে চালিয়ে দিলে? একটার মূল্যে দুটো ভালো গল্প দেওয়া আমার মত নয়।'

"যাক্ গে—শোভা। মনে এসে গেছে যখন—যেতে দাও। তা ছাড়া—অত অল্পকায়, সুকুমার গল্পটি কোনো দিনই কাজে লাগাতে পারতুম না। একটু উদারতায় ক্ষতি কি?" সুচারু হাসিমুখে শোভনার দিকে চাইলে।

'তা সত্যি! তবে যাক্···কিন্তু আপনার কি হল অমল বাবু? আপনার মুখে যেন···'

সুচারু জোর গলায় হেসে উঠল। "অমল বোধ হয় ধরতে পারেনি যে আমি গল্প রচনা করে যাচ্ছি, আর তুমি পিছন দিক থেকে সেটা নকল করে নিচ্ছ।···না অমল? কিন্তু ভাগ্যিস্ তুমি এসেছিলে, ভাই! নইলে টেলিফোনের আওয়াজ থেকে এ স্বপ্ন-কাহিনী রচনা করতুম কাকে ধরে? ভালো কথা, কে ফোন্ করেছিল—শোভা?"

"সম্পাদক মশাই। জিজ্ঞাসা করছিলেন বড় ব্যস্ত হয়ে, কালকের মধ্যে গল্প পাবেন কি না!"

* * * *

সেদিন আমি ভীষণ প্রতারিত হয়েছিলাম। তবে সে প্রতারণায় বিস্ময়জনিত আনন্দও ছিল। হ্যাঁ···ওরা সঙ্গী বটে। আদর্শ দম্পতি বলে যখন অন্য লোকে ওদের প্রশংসা করে, আমি চুপ করে থাকি। ভাবি সেদিনকার রাত্রির কথা। স্মরণ করি ওদের পরিগূঢ় প্রেম···ওদের বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা,—যা একদা আমার বাহ্য-দৃষ্টিকে মধুর ভাবে চমকিত ও প্রবঞ্চিত করেছিল।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মেরিকের একটি গল্প অবলম্বনে।
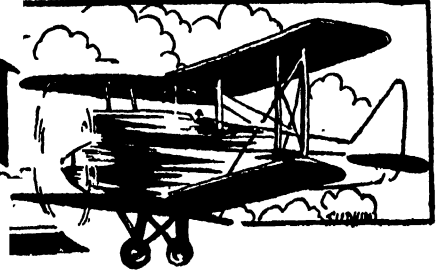
বিলাতে বঙ্গসাহিত্যালোচনা

'বিচিত্রা'র পাঠকবর্গের অবিদিত নেই যে, লণ্ডনে "বেঙ্গলী লিটারারি সোসাইটি" নামে বাঙ্গালীদের একটি প্রতিষ্ঠান আছে এবং গত কয়েক বৎসর ধরে প্রশংসার সহিত ইহার কার্য্য পরিচালিত হয়ে আসছে। গত মাসে এই সমিতির উদ্যোগে 'বিচিত্রা'র শুভানুধ্যায়ী অধুনা লণ্ডন-প্রবাসী কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের অভ্যর্থনার জন্য একটি বিশেষ সভা আহূত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন এবং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২১ নং ক্রমওয়েল রোডের বিস্তৃত সভাগৃহে। সভায় পুরুষ মহিলা নির্ব্বিশেষে লণ্ডনস্থ প্রায় সমস্ত বাঙ্গালীই উপস্থিত ছিলেন। সভার অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীমতী অমিতা দেবীর এবং শ্রীমতী আশা দেবীর সঙ্গীত অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল। সকলের অনুরোধে কবি কান্তিচন্দ্র স্বরচিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। সভায় ভারতীয় জলযোগের ব্যবস্থা ছিল এবং তার আয়োজন করেছিলেন ডাক্তার দ্বিজেন্দ্র-নাথ দত্তের ইংরাজ সহধর্ম্মিণী। কবি কান্তিচন্দ্র সম্প্রতি লণ্ডনস্থ P. E. N. ক্লাবের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ইনি এবং অক্সফোর্ডের শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী এই দু'জনই এখন London P. E. N. এর ভারতীয় সভ্য।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

উক্ত সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত সংবাদটি সাধারণের অবগতির জন্য আমরা প্রকাশিত করলাম।

"গত বৎসর কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে স্থির হয়েছিল যে ১৩৪২ সালের ত্রয়োদশ অধিবেশন বড় দিনের ছুটির সময় কাশীধামে অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু কয়েকটি অপ্রত্যাশিত কারণ বশতঃ এ বৎসরের অধিবেশন সেখানে হওয়া সম্ভবপর হইল না। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে উক্ত অধিবেশন আগামী বড় দিনের সময় নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে।"
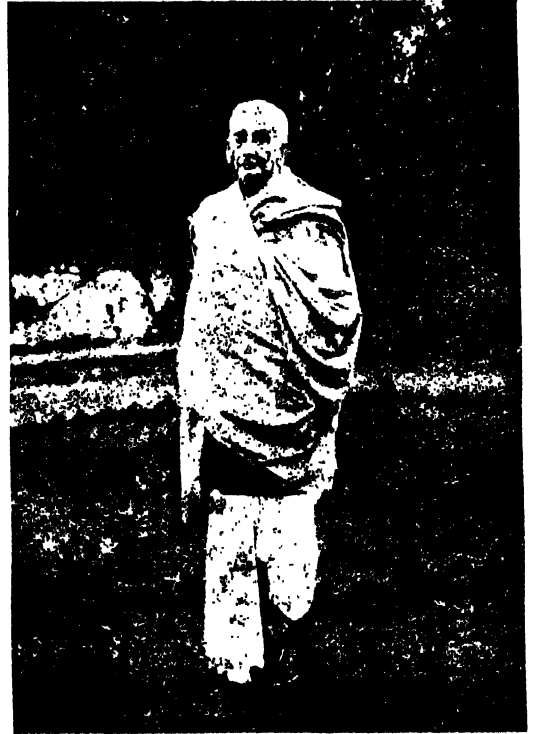
স্বর্গীয় ঈষানচন্দ্র ঘোষ

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

গত ১১ই কার্ত্তিক ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করেছেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি

দরিদ্র অবস্থায় জন্মগ্রহণ ক'রেও শিক্ষা ও চরিত্রবলে কিরূপ উন্নতি করা যায় ঈশানচন্দ্রের জীবন তার নির্দ্দেশ। অধ্যয়ন শেষ করার পর তিনি শিক্ষা বিভাগে ক'য়েক প্রকার চাকরি করে অবশেষে হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টারের পদ লাভ করেন। তিনি অনেকগুলি পুস্তক রচিত করেছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ জাতকের বঙ্গানুবাদই তাঁর বিরাট কীর্ত্তি। ১৬ বৎসরের পরিশ্রমে এই গ্রন্থ প্রস্তুত ক'রে ১২০০০৲ টাকা ব্যয়ে মুদ্রিত করেন।

ঈশানচন্দ্র জীবিতকালে দাতা ছিলেন এবং উইলেও তিনি তাঁর সম্পত্তির অধিক অংশ জনহিতকর কার্য্যে দান করে গেছেন।

প্রধানতঃ বাণীর সেবক হ'লেও ব্যবসা-বুদ্ধি তাঁর প্রখর ছিল। সেই জন্য কারবারে তিনি প্রভুত অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন এবং অনেকগুলি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ছিলেন।

ঈশানচন্দ্রের দুই পুত্র—প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র ঘোষ। আমরা তাঁদের পিতৃবিয়োগে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

পরলোকে জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

বিগত ৫ই কার্ত্তিক জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল বিলাতে অবস্থান ক'রে ব্যারিষ্টারী পাশ করার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু ব্যারিষ্টারী পেশা ভাল না লাগায় তাঁর অগ্রজ স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রিপন কলেজে আইন অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। জিতেন্দ্রনাথ অসাধারণ দৈহিক শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। সে জন্য দুর্ব্বল বাঙালী জাতিকে স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিসম্পন্ন ক'রে কি উপায়ে তার অসামরিকতার দুর্নাম অপনোদিত করা যায় সে বিষয়ে তাঁর চিন্তা এবং চেষ্টার অবধি ছিল না। তদুদ্দেশ্যে তিনি নিজে কলিকাতা ভলাণ্টিয়ার রাইফল্‌স্-এ যোগ দেন এবং জার্ম্মান যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালী সৈনিকদল গঠিত করেন। শেষোক্ত কার্য্যের জন্য তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে "ওয়ার ব্যাজ" এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে 'ক্যাপ্টেন' পদ লাভ করেন।

বাঙ্গালী জাতির দৈহিক শক্তির উন্নতিকল্পে জিতেন্দ্রনাথ একটি ট্রাষ্ট গঠিত ক'রে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি, যার মূল্য একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ব'লে নির্দ্ধারিত হয়েছে, "অল বেঙ্গল ফিজিকাল কল্‌চার এসোসিয়েশান"কে দান ক'রে গেছেন।

জিতেন্দ্রনাথের মতো দশজন বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ করলে বাঙ্গালী জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হ'য়ে যায়।

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র

গত ২০শে আশ্বিন ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র পরলোক গমন করেছেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। যতীন্দ্র-নাথ এমনিই সুচিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু চক্ষুরোগের চিকিৎ-সক রূপে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য এবং খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কলিকাতার করপোরেশনের তিনি একজন পরাক্রান্ত কাউন্সিলর ছিলেন এবং রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁর অনুরাগ এবং উদ্যম অল্প ছিল না। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল।

আনন্দচন্দ্র রায়

গত ৯ই কার্ত্তিক ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল এবং নেতা আনন্দচন্দ্র রায় ৯২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে আনন্দচন্দ্রের যোগ প্রবল ছিল এবং বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় আনন্দচন্দ্রের অগ্রজ ছিলেন। ওকালতি ব্যবসায়ে আনন্দচন্দ্র অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিলেন।

মনোমোহন পাঁড়ে

গত ২৩শে আশ্বিন মনোমোহন পাঁড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। ঠিকাদারী ব্যবসা এবং মনোমোহন রঙ্গালয়ের স্বত্তাধিকারীরূপে তিনি প্রভুত অর্থ অর্জ্জন করেন। জন-হিতকর কার্য্যে তাঁর অসাধারণ উৎসাহ ছিল। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের তিনি একজন অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং প্রায় ষাট হাজার টাকা ঐ বিদ্যালয়ে দান করেন। লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে পিতার নামে কাশীধামে "বীরেশ্বর ধর্ম্মশালা" প্রতিষ্ঠা তার একটি অক্ষয় কীর্ত্তি।

স্বর্গীয়া শান্তি ঘোষাল

বিগত ১৫ই অক্টোবর ১৯৩৫ শ্রীমতী শান্তি ঘোষাল মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। সাহিত্য এবং শিল্প উভয় বিষয়ে তিনি বিশেষ শক্তিসম্পন্না ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে

স্বর্গীয়া শান্তি ঘোষাল

বিচিত্রায় তাঁর অঙ্কিত ছবি প্রকাশিত হয়েছে, সেদিক থেকে বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট তিনি অপরিচিত ছিলেন না। বর্ত্তমান সংখ্যাতেও তাঁর রচিত একটি গল্প এবং তাঁর অঙ্কিত একটি চিত্র প্রকাশিত হ'ল। তা' থেকে সাহিত্য এবং শিল্প বিষয়ে তাঁর প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাবে। স্বর্গীয়া শান্তি ঘোষাল বাল্যকাল থেকেই ফ্রেস্কো, তৈল চিত্র, চামড়ার উপর চিত্র ইত্যাদি অঙ্কনে বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউট এক-জিবিসন, একাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ একজিবিসন্, সরোজ-নলিনী ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল এক্‌জিবিসন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক তাঁর চিত্রাদি বিশেষভাবে প্রশংশিত হয়েছিল। শুধু সাহিত্য এবং চিত্রেই নয়, সঙ্গীত এবং সূচী-শিল্পেও তাঁর অধিকার সামান্য ছিলনা, বিশেষতঃ সেতার বাজানতে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করেছিলেন।

স্বর্গীয়া শান্তি ঘোষালের রচিত অনেকগুলি গল্প বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এ বৎসর পূজার সময় তাঁর একমাত্র উপন্যাস "নীচের সমাজ" প্রকাশিত হয়। সেই উপন্যাসটি অল্প দিনের মধ্যেই পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

স্বর্গীয়া শান্তি ঘোষালের পিতা ছিলেন পরলোক গত কে, কে, চ্যাটার্জ্জি B. Sc. (Lond.), Ch. F. (Cuperhill), A. M. C. E. (Lond.), I. S. E.—ইহার নিকট শ্রীমতী শান্তি ঘোষাল বাল্যকাল হতে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষায় উৎসাহ লাভ করেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল এম্, এস্-সি তাঁর স্বামী। ইনি স্বয়ং একজন সাহিত্যিক এবং শিল্পানুরাগী ব্যক্তি, সুতরাং বিবাহিত জীবনেও শ্রীমতী শান্তি তাঁর সাহিত্য এবং শিল্প সাধনায় যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেছিলেন। অতি অল্প বয়সে এই প্রতিভাসম্পন্না মহিলার মৃত্যুতে আমরা আন্তরিক ব্যথিত হয়েছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত স্বামী এবং অন্যান্য পরিজনবর্গকে আমাদের ঐকান্তিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

হুগলী জেলা-সাহিত্য সম্মেলন

উক্ত সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হ'তে নিম্নলিখিত সংবাদটি আমরা প্রকাশের জন্য পেয়েছি।

"গত ১৩৪০ সালে কোন্নগর পাঠ চক্রের উদ্যোগে এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হয় নাই। আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে এই বৎসর ১২ই পৌষ শনিবার "শতদল সাহিত্য সংসদের" উদ্যোগে চাতরা-শ্রীরামপুর গ্রামে এই জেলা-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই সভার পৌরোহিত্য গ্রহণ করিবেন।"

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Saratchandra Mukherjee at the Sahitya-Bhaban Press, 26, Sitaram Ghose Street, and Published by the same from 27-1, Fariapooker St. Calcutta.

বিচিত্রা

হারেম

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ গুপ্ত

পৌষ, ১৩৮২

নবম বর্ষ, ১ম খণ্ড | পৌষ, ১৩৪২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

জন্মদিনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার জন্মদিনে আমার
কাছের দিনের নেই তো সাঁকো
দূরের থেকে রাতের তীরে
বলি তোমায় পিছন ফিরে,
"খুসি থাকো" ॥

দিনশেষের সূর্য্য যেমন
ধরার ভালে বুলায় আলো,
ক্ষণেক দাঁড়ায় অস্তকোলে
যাবার আগে যায় সে ব'লে,
"থেকো ভালো" ॥

জীবনদিনের প্রহর আমার
সাঁঝের ধেনু, প্রদোষ ছায়ায়
চারণ-শ্রান্ত ভ্রমণ সারা
সন্ধ্যাতারার সঙ্গে তা'রা

মুখ ফিরিয়ে পশ্চিমেতে
বারেক যদি দাঁড়াও আসি,'
আঁধার গোষ্ঠে এই রাখালের
শুনতে পাবে সন্ধ্যাকালের
চরম বাঁশি ॥

সেই বাঁশিতে উঠবে বেজে
দূর সাগরের হাওয়ার ভাষা ;
সেই বাঁশিতে দেবে আনি'
বৃন্তমোচন ফলের বাণী
বাঁধন-নাশা ॥

সেই বাঁশিতে শুনতে পাবে
জীবন পথের জয়ধ্বনি,
শুনতে পাবে পথিক রাতের
যাত্রামুখে নূতন প্রাতের
আগমনী ॥

শান্তিনিকেতন
২৪ অক্টোবর
১৯২৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাঙা দেউল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ

আমার এক্কা এসে থাম্‌ল জঙ্গলের ধারে। এক্কা-ওয়ালা বল্‌ল, এবার নাম্‌তে হবে গাড়ী ছেড়ে, যেতে হবে ওই বনের ভিতর দিয়ে ক্রোশ খানিক পথ হেঁটে, তবে পৌছাব সেই মন্দিরে।

ভাঙা দেউলের দেবতার যে দর্শনপ্রার্থী, তাকে বাঁধা পথ ছেড়ে একটু জঙ্গলের অলি গলি দিয়ে যেতে হয় বই কি। দেবতা যখন জাগ্রত ছিলেন, স্বয়ং থাকুন না থাকুন, অন্ততঃ ছিলেন ভক্তের চিত্তে, তখন পথ ছিল অবারিত। কাঁসর ঘণ্টা ত্রিসন্ধ্যা বাজত; যাত্রী, পাণ্ডা, অতিথশালার অভাব ছিলনা।

বহুদিন সে মন্দিরে পূজা হয়েছে বন্ধ। নাই যাত্রী, পূজারি পাণ্ডা, শঙ্খ ঘণ্টা, নৈবেদ্যের থালি। তোরণের নহবতে সানাই আর বাজেনা। আছে কেবল ঘুঘু পায়রা বাদুড় চাম্‌চিকে। পথে আছে সাপের ভয় দিনে রাতে, সন্ধ্যার পর বাঘ ভালুকের হানা।

এক্কাওয়ালা তার ছক্কোড় ছেড়ে এলনা সঙ্গে, যেতে হ'ল একলা। ভাঙা দেউলের দেবতার সন্ধানে একলাই ত যেতে হয়। চল্লাম একাকী। পেলেম পল্লবঘন ছায়াতরুর অনাতপ, পাখীর গান, পদভরে উচ্চকিত পর্ণমর্ম্মর, তরুগুল্মের আরণ্য-নিঃস্বন উদভ্রান্ত পবনে। একটা খর্‌গোস্ পালিয়ে গিয়ে দাঁড়াল অদূরে সাম্‌নের পা দুখানি তুলে, উদগ্রীব হয়ে আমাকে দেখল একবার, তারপর কোথায় হ'ল অন্তর্দ্ধান। গভীর অরণ্যে যখন পৌছলাম, দেখি এক হরিণমিথুন। কি অভিরাম তাদের গ্রীবাভঙ্গী, স্নিগ্ধদৃষ্টি। মন্থর চরণে হ'ল তারা নিরুদ্দেশ বনের অন্তরালে। আমাকে দেখে ত ভয় পেলনা, খুঁজল তারা শুধু নিভৃতি।

আরও চলেছি অগ্রসর হয়ে। দেখি সম্মুখের পথে ছড়ান পাথরের ছোট বড় টুক্‌রাগুলি, চিত্রাঙ্ক কর্ব্বুর, ভাঙা মন্দিরের অস্থিপঞ্জর যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বুঝলাম পৌছতে আর বিলম্ব নাই। কুতূহলী দৃষ্টি এদিক্ ওদিক করছে অন্বেষণ, কোথায় সেই জীর্ণ মন্দির, আমার গন্তব্যের পূর্ণচ্ছেদ। অচিরে অদূরেই পেলেম দেখতে ধূসর পাটল দেউলের তৃণগুল্মাচ্ছন্ন জীর্ণগাত্র, অভ্রভেদী ভগ্নচূড়া, ফাটলে ফাটলে অশথের কিশলয়।

মন্দিরের তোরণে যখন পৌছলাম হঠাৎ জাগল জন্মান্তরের পূর্ব্ব স্মৃতি। পরিচিতের সম্ভাষণ মুখর হ'ল চতুর্দ্দিকে। ছিলেম আমি এই মন্দিরের পূজারী। অতথ্য নয় এ প্রত্যয়। আমার নিজের হাতে খোদা শ্লোকটির অস্পষ্ট লেখা রয়েছে আঁকা দেয়ালের গায়ে। আপাদমস্তক উঠলাম কেঁপে থর থর ক'রে, বিস্ময়ে উল্লাসে, কুহক সন্ত্রাসে। লেখা দেখে নয় শুধু। ওই পাথর খানির তলে নিজের হাতে পুঁতে রেখেছিলাম একটি মালা। দেবী সশরীরে এসেছিলেন সেই ফাল্‌গুন পূর্ণিমার রাত্রে, পরিয়ে দিয়েছিলেন ওই মালা আমার কণ্ঠে। বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করি, খুঁজি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বহুকষ্টে ভিত্তিগহ্বরের মুখ থেকে উদ্‌ঘাটিত কর্‌লাম সেই প্রস্তর ফলক। অপূর্ব্ব সৌরভে উঠল ফুটে মন্দিরের প্রদোষান্ধকার। দেখি অবাক হয়ে অক্ষুন্ন রয়েছে মালাখানির মঞ্জুশ্রী, সদ্যোস্ফুট পেলবকান্তি, খসেনি একটি ফুল, ঝরেনি একটি পাপ্‌ড়ি। মালাটি তুলে নিয়ে পরলাম গলায়। একটা দম্‌কা হাওয়ায় উদ্বেলিত হল স্তব্ধ প্রকোষ্ঠের স্তিমিত ছায়ালোক। শুন্‌লাম প্রশ্ন মধুরকণ্ঠে —'তুমি এলে এতদিনে?'

শূন্য দেউলে হল কি আমার দেবীর আবির্ভাব? কার পদতলে পড়লাম মূচ্ছিত হয়ে?

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২২

সন্ধ্যার পর কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যা যখন ভাগবত-সভায় উপস্থিত হ'ল তখন সবেমাত্র পাঠ আরম্ভ হয়েছে। চকমেলান প্রশস্ত গৃহাঙ্গন। দুই দিকের বারান্দায় স্ত্রীলোকদের বস্বার জায়গা, এবং একদিকের বারান্দায় এবং প্রাঙ্গণে পুরুষদের। পুণ্যকথা-শ্রবণোৎকর্ণ নরনারীতে সমস্ত স্থান পূর্ণ হয়ে গেছে, ন স্থানং তিলধারয়েৎ বল্‌লে অন্যায় হয় না। কিন্তু সে জন্য সন্ধ্যার কোনোরূপ অসুবিধা ভোগ করতে হ'ল না ; তার দেহের লাবণ্যে এবং বস্ত্রালঙ্কারের আভিজাত্যে আকৃষ্ট হয়ে পুরমহিলাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হ'য়ে এসে সযত্নে তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সম্মুখ শ্রেণীতে স্থান করে বসিয়ে দিলে।

ভাগবত-পাঠকের নাম শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী। কাব্যে এবং ন্যায় শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছেন, পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থে অসামান্য অধিকার। তর্কদর্শনতীর্থ প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট উপাধি আছে, কিন্তু নামের পশ্চাতে কখনো সেগুলি ব্যবহার করেন না, সবগুলিই উপাধি-পত্রের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে,—বিশেষতঃ ভাগবত সম্বন্ধে উপাধিটি। কেহ সে বিষয়ে উল্লেখ করলে মৃদু হাস্য করেন, পীড়াপীড়ি করলে বলেন, গ্রহণ ক'রে যে অন্যায় করেছি ঘোষণা ক'রে তাকে বাড়াতে চাইনে।

পাঠকজীর বয়ক্রম ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর ; সুগঠিত নাতি-পুষ্ট উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ ; চক্ষে প্রতিভার প্রদীপ্ত দীপ্তি ; সমস্ত মুখমণ্ডল ব্যাপিয়া নির্ম্মলতা এবং অধ্যাত্ম বৈভবের সুস্পষ্ট সুষমা। রঘুনাথের কণ্ঠে পুষ্পপত্রখচিত মাল্য, ললাট ও বাহু চন্দনচর্চ্চিত, পরিধানে হরিদ্রাবর্ণের রেসমের ধুতি এবং উত্তরীয়। সম্মুখে তুলসীবৃক্ষ তলে শালগ্রাম শিলা। কাষ্ঠাসনে উপবেশন ক'রে সুস্পষ্ট সুমিষ্ট কণ্ঠে রঘুনাথ ভাগবত পাঠ করছেন,—প্রথমে মূল শ্লোক, তারপর অন্বয়, তারপর অনুবাদ, সর্ব্বশেষে টীকা। সূর্য্যকিরণের প্রভাবে পদ্মকোরকের দলগুলি যেমন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে যায়, সরস প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যার প্রভাবে ভাগবতের শ্লোক সমূহ তেমনি তাদের অর্থ এবং মর্ম্মের কোষগুলি ধীরে ধীরে উন্মোচিত করে দিচ্ছে,—কোথাও বিন্দুমাত্র জটিলতার আবরণ থাকচে না। বিদ্বান মূর্খ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, পুরুষ স্ত্রীলোক সকলের মনে এক পরিতৃপ্তি, এক আনন্দ।

ব্যাখ্যার স্থানে স্থানে রঘুনাথ গান গাচ্ছেন। কণ্ঠের ধ্বনি সুমিষ্ট সুগভীর ;—গমক, গিটকারী, মীড়, মূর্চ্ছনায় সম্পন্ন ; শুন্‌লে সন্দেহ থাকে না যে একজন প্রথম শ্রেণীর গুণী।

পাঠ শেষ হবার পর রাত্রি সাড়ে নটার সময়ে সন্ধ্যা গৃহে ফিরল ; চক্ষে অশ্রুর আমেজ, বক্ষে উদ্বেল আবেগ। গৃহে উপনীত হ'য়ে দেখলে প্রমথ বেরিয়েছে, তখনো ফেরে নি। বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার ছিল, তার মধ্যে দিলে অবশ দেহটাকে এলিয়ে। স্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে দুই চক্ষু বেয়ে নামল অশ্রুর বন্যা। কিছুক্ষণ সেইভাবেই কাটল, তারপর সিঁড়িতে পদধ্বনি শুন্‌তে পেয়ে চক্ষু মার্জ্জিত ক'রে উঠে দাঁড়াল।

প্রমথ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে সন্ধ্যাকে দেখতে পেয়ে বল্‌লে, "কি উষা ? এখানে দাঁড়িয়ে যে ?"

সন্ধ্যা বললে, "এম্‌নি।"

"ভাগবত কেমন লাগল ?"

"বেশ লাগল।"

"আর ক'দিন হবে ?"

"আর চার দিন। আসছে বুধবারে পূর্ণিমার দিন

উদ্‌যাপন।" এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বল্‌লে, "এ কদিন আমি যাব ?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ হাস্‌তে লাগল, বল্‌লে, "স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে তোমরা যতই লাফালাফি কর না কেন উষা, শেষ পর্য্যন্ত ও জিনিস তোমাদের ধাতে সইবে না। তোমরা লতার জাত, পাদপকে আশ্রয় ক'রেই চিরকাল থাকবে। আমি ত বলেছি তোমাকে, এ বাড়ীতে তুমি যখন বন্দিনী নও তখন এ রকম অনুমতি চাইবার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার যদি ইচ্ছে হয় তা হ'লে নিশ্চয় যাবে।"

ইচ্ছে! পরদিন সমস্ত দিনটা সন্ধ্যার কাটল ভাগবত পাঠের অধীর প্রতীক্ষায়! দিন যেন আর শেষ হ'তে চায় না, সন্ধ্যা যেন আর আসে না! শেষ পর্য্যন্ত যথাকালের জন্য ধৈর্য্য কিছুতেই রাখা গেল না। কয়েকটা প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করতে প্রমথ বাইরে গিয়েছিল, তার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যা ভাগবত-সভায় উপস্থিত হ'ল। চতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখলে সে-ই প্রথম, বাইরের শ্রোতাদের মধ্যে আর কেউ তখনো উপস্থিত হয়নি। নিজের অধীরতার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণে মনে মনে একটু লজ্জিত হ'ল, খুসীও হ'ল এই মনে ক'রে যে, যে-বস্তু তাকে এমন করে আকৃষ্ট করছে, চিত্তের অন্তরতম প্রদেশে তার প্রতি তার শ্রদ্ধারও অন্ত নেই। মনে বাইরে এমন সামঞ্জস্যের তৃপ্তি বহুকাল সে উপভোগ করেনি। গত রাত্রে যে সভাগৃহে সে এই নূতন আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছিল আজ তারা জনহীন নির্ব্বাক আবেষ্টনীও তাকে কম পরিতুষ্ট করলে না।

মহিলাদের বসবার সম্মুখ বারান্দায় প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্থলে সন্ধ্যা স্থান অধিকার করে বসল। পূর্ব্বদিনের সেই স্ত্রীলোকটি দেখতে পেয়ে সন্ধ্যার পাশে এসে উপবেশন ক'রে সহাস্য মুখে বল্‌লে, "কাল আপনি এসেছিলেন খুব দেরী করে, আজ এসেছেন সকলের আগে,—আপনার যে খুব ভাল লেগেছে, তা বুঝতে পারছি।"

সলজ্জমুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভাল লেগেছে। এত ভাল জিনিস আমি এর আগে আর কখনো শুনিনি।"

স্ত্রীলোকটি বললে, "সে কথা এক হিসেবে সত্যি। এত বড় ভাগবত-পাঠক সারা বাঙলা দেশে আর নেই বললে চলে। তার ওপর কি চমৎকার গান গাইতে পারেন, দেখেছেন ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "ভারি চমৎকার! আমার মনে হয় এত বড় গাইয়েও আমাদের বাঙ্গলা দেশে খুব বেশি নেই। আচ্ছা, ইনি কোথায় থাকেন ?"

স্ত্রীলোকটি বল্‌লে, "নবদ্বীপে।"

"নবদ্বীপে কি করেন ?"

"নবদ্বীপে এঁর আশ্রম আছে,—সেখানে ইনি শিষ্যদের পড়ান, নিজেও পড়েন, তাছাড়া দুঃখী দুর্ভাগাদের আশ্রয় দেন, সেবা করেন। শুনেছি বিয়ে করবার পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়ে বাইশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করে বৈরাগী হন। সেই থেকে বরাবর নবদ্বীপে আছেন। এত বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত আর সাধু বৈষ্ণব নবদ্বীপে ইনি ছাড়া আর কেউ আছেন বলে মনে হয় না।"

শেষের দিকের সব কথা সন্ধ্যা মন দিয়ে শুনল কি-না বলা যায় না, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "নবদ্বীপে এঁর আশ্রমে মেয়েরা কেউ আছেন কি ?—শিষ্যদের মধ্যে, কিম্বা সেবকদের মধ্যে ?"

স্ত্রীলোকটি বল্‌লে, "তা ত ঠিক বল্‌তে পারিনে, তবে থাকাই সম্ভব। কারণ এত বড় চরিত্রবান সংযমী মহাপুরুষের কাছে মেয়েদের আশ্রয় ত' পাকা।"

"ইনি এখানে কোথায় থাকেন ?"

"এখানে ? এই বাড়িতেই থাকেন। ঐ যে পূর্বদিকের বারান্দায় কোণের ঘর দেখছেন, ঐ ঘরে থাকেন। সব শুদ্ধু চারখানা ঘর ওঁর ব্যবহারের জন্যে দেওয়া হয়েছে। কেন ? ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান না কি ?"

সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; বল্‌লে "না, এম্‌নি জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

এর পর কথোপকথন তেমন আর জমল না, সন্ধ্যা অবিরত অন্যমনস্ক হ'তে লাগল; ওদিকে মেয়েরাও একে একে আস্‌তে আরম্ভ করেছিলেন; স্ত্রীলোকটি বললে, "চল্‌লুম ভাই, ওঁদের বসাইগে; আবার আস্‌ব অখন।"

এ কথারও একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে সন্ধ্যার ভুল হ'য়ে গেল, চিন্তাচ্ছন্ন মনে স্তব্ধভাবে সে ব'সে রইল।

সেদিন পাঠ-শেষে একটা গভীর নিদ্রার স্বপ্নের স্মৃতি নিয়ে সন্ধ্যা বাড়ি ফিরল। দীর্ঘকালব্যাপী পাঠের মধ্যে কোন্ সময়ে ঠিক কি-ভাবে এ স্বপ্ন সে দেখেছিল তা মনে পড়ে না, কিন্তু সেই অস্পষ্ট অনির্ণেয় স্বপ্নের কথা চিন্তা করতে করতে মন উত্তরোত্তর চঞ্চল থেকে চঞ্চলতর হ'য়ে উঠতে লাগল। আহার বিহার, কাজ কর্ম্ম, কথাবার্ত্তার মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও তার বিরাম নেই!

এম্নি ভাবেই আরও দুদিন কেটে গেল, অবশেষে এল বুধবার, ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। দীর্ঘ তিন মাস পূর্ব্বে এক পূর্ণিমা তিথিতে এই পাঠ আরম্ভ হয়েছিল, আজ পূর্ণিমায় তার পরিসমাপ্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতের যে অংশটুকু বাকি ছিল তা বেশি নয়, মাত্র দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়। অল্প সময়ের মধ্যে সেটুকু শেষ করে রঘুনাথ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবতার উদার আদর্শ-বাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। সংসারনিস্পৃহ কৈবল্যকামী আদর্শ বৈষ্ণবের বৈরাগ্যমধুর অথচ সেবানিরত জীবনযাপনের বিষয়ে সে কি বিচিত্র অভিভাষণ! পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত সে জীবনের অবস্থান আছে কিন্তু আসক্তি নেই, ঔদাস্য আছে কিন্তু আলস্য নেই, কর্ম্ম আছে কিন্তু লোভ নেই। যে ধর্ম্মকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব এই ভাবে দিনাতিপাত করেন, রঘুনাথ তাকে উপমিত করলেন মহাসিন্ধুর সহিত। মহাসিন্ধুর মতোই সে ধর্ম্মের বিস্তৃতি, মহাসাগরেরই মতো গভীরতা; মহাসিন্ধুর গর্ভের মতোই সে ধর্ম্মের গর্ভে মানুষের দুঃখ-দৈন্য পাপ-তাপ সমস্ত নিমজ্জিত হয়ে যায়, আর মহাসিন্ধুরই মতো উপরে প্রবাহিত হয় জ্ঞানসূর্য্যকিরণের মধ্যে আনন্দের সমীরণ! বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত মানুষের এত বড় আশ্রয় আর কিছু নেই। কোনো অবস্থাতেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম মানুষকে অস্বীকার করে না,—তার পাপ পুণ্য, দুঃখ দৈন্য, ত্রুটি বিচ্যুতি সমস্তর সঙ্গেই সে তাকে স্বীকার করে। তাই সে ধর্ম্ম মানুষকে শাস্তি দেয় না, শোধন করে;—তিরস্কৃত করে না, পরিস্কৃত করে; বর্জ্জন করে না, আশ্রয় দেয়। দুঃখ গ্লানি নৈরাশ্যে যে জীবন নিষ্ফল হবার উপক্রম করেছে মানব কল্যাণের মহত্তর কর্ত্তব্যসাধনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত ক'রে তাকে সার্থক ক'রে তোলে। তাই এ ধর্ম্ম জাতি-কুল-গোত্রনির্ব্বিশেষে সমস্ত বিশ্বের মানবসমাজের দিকে দুই বাহু প্রসারিত করে আহ্বান করছে; বলছে—এস এস, দুঃখী এস, সুখী এস, আর্ত্ত এস, সমর্থ এস, পাপী এস, পুণ্যাত্মা এস; আমার আশ্রয়ে এসে সকল সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদের বোঝা নামিয়ে দিয়ে লঘু হও, মুক্ত হও,—পরমা শান্তি লাভ কর!

সভা শেষ হ'য়ে গেছে। রঘুনাথ তাঁর বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে শ্রান্তি অপনয়ন করছেন, শ্রোতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই গৃহ-প্রত্যাগমন করেছে, সন্ধ্যা কিন্তু তার স্থানে অনড় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। চক্ষে অশ্রু, বক্ষের মধ্যে দুরন্ত ঝটিকা।

কামিনী এসে ডাক্‌লে, "মা"।

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে কামিনীর দিকে চেয়ে দেখে সন্ধ্যা বল্‌লে "কি?"

"ভাগবত ত শেষ হয়ে গেছে, রাত হয়েচে বাড়ি চলুন।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "কামিনী, পাঠক-ঠাকুর এখন কোথায় আছেন জান?"

কামিনী বল্‌লে, "জানি বই কি মা। ঐ যে কোণের ঘরে ব'সে আছেন, পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে ঐ যে একটু একটু দেখা যাচ্ছে।"

"ওঁর কাছে গিয়ে বলতে পার, আপনার সঙ্গে একটি মেয়ে দেখা করতে চায়?"

কামিনী ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "তা পারি। আপনি দেখা করবেন না কি মা?"

"হ্যাঁ।"

কামিনী রঘুনাথের কক্ষের দিকে অগ্রসর হ'ল।

কামিনীর পিছনে পিছনে সন্ধ্যা রঘুনাথের ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল। পর মুহূর্ত্তেই কামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধ্যাকে বারান্দায় দেখতে পেয়ে বল্‌লে, "মা ঠাকুরমশাই আপনাকে ডাকছেন।"

সন্ধ্যা ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে দেখলে দর্শনপ্রার্থিনীর অপেক্ষায় রঘুনাথ সহাস্যমুখে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা চেয়ার নির্দ্দেশ করে তিনি বললেন, "বোসো মা, বোসো, ঐ চেয়ারটায় বোসো।"

সন্ধ্যা একটু এগিয়ে গিয়ে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে রঘুনাথের পদ-ধূলি নিতে উদ্যত হ'ল। রঘুনাথ দুই পা পিছিয়ে গেলেন, কিন্তু

নিবারণ করতে পারলেন না, সন্ধ্যা তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে মস্তকে হস্ত স্পর্শ করলে।

রঘুনাথ অসন্তোষসূচক মাথা নেড়ে বললেন "এ ভাল নয় মা, তুমি আমার পায়ে হাত দিলে কেন?—সাধারণ নমস্কার করলেই ত চল্‌ত।" তারপর পুনরায় পূর্ব্বের সেই চেয়ারটা নির্দ্দেশ করে সন্ধ্যাকে উপবেশন করতে বললেন। রঘুনাথ আসন গ্রহণ করলে সন্ধ্যা সঙ্কুচিত হ'য়ে চেয়ারে উপবেশন করল।

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্নিগ্ধ কণ্ঠে রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও মা, তুমি আমার কাছে?"

রঘুনাথের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করে নতনেত্রে সন্ধ্যা বল্‌লে "আশ্রয়।"

বিস্মিতকণ্ঠে রঘুনাথ বল্‌লেন, "আশ্রয়? আশ্রয়ের দ্বারা তুমি কি বলতে চাও তা'ত ঠিক বুঝতে পার্‌ছিনে মা?"

"আপনি আমাকে আপনার নবদ্বীপের আশ্রমের একজন সেবিকা ক'রে নিন্‌—একজন দাসী!"

"কিন্তু তুমি আমার আশ্রমের দাসী কেন হবে, তা' ত আরও বুঝতে পারছিনে মা! তোমার আকৃতি বেশভূষা দেখে তোমাকে ত' রাজরাণী ব'লে মনে হয়!"

সন্ধ্যার চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল; কম্পিত দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সে বল্‌লে, "এ বেশভূষা আমার নয়, আমার কাছে এর কোনো মূল্য নেই,—এ সাজানো জিনিস! আপনি আমাকে দয়া ক'রে আশ্রয় দিন, আমি সত্যিই আশ্রয়হীন! আজ আপনার কথা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমার মতো হত-ভাগিনীর জীবনও একেবারে অসার্থক না হ'তে পারে, কিছু প্রয়োজন তারও থাকতে পারে! আপনি আমাকে আপনার আশ্রমের সেবিকা করে নিন!"

সন্ধ্যার ক্লুস্থ অবস্থা দেখে রঘুনাথের মুখেচক্ষে গভীর সহানুভূতির চিহ্ন ফুটে উঠল; স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বল্‌লেন, "তুমি বিচলিত হয়েছ মা, একটু সংযত হ'য়ে নাও, তারপর তোমার সকল কথা শুনব। যে গৃহত্যাগী হ'য়ে সংসার ছেড়ে আস্‌তে উদ্যত হয়েছে সংযম তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ততক্ষণে আমার সাধুচরণকে কথাবার্ত্তার মধ্যে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে।" ব'লে রঘুনাথ কক্ষের বাইরে চ'লে গেলেন, তারপর মিনিট দুই তিন পরে ফিরে এসে বল্‌লেন, "আচ্ছা মা, এবার তুমি বেশ সংযত হয়ে তোমার আর যদি কিছু বলবার থাকে ত' বল।"

তখন সন্ধ্যা ধীরে ধীরে তার দুঃখময় জীবনের ইতিহাস যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলে গেল,—তার প্রয়োজনীয় অংশ কিছুই বাদ দিলেনা, অনাবশ্যক অংশও বিবৃত করলেনা।

গভীর মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত শুনে রঘুনাথ বললেন, "কিন্তু তুমি কি তোমার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার জন্যে আর চেষ্টা করতে চাও না?"

সন্ধ্যা বললে, "না।"

"বাপের বাড়িও যেতে চাও না?"

"না।"

"যতদূর শুনলাম আর বুঝলাম, প্রমথবাবু তোমাকে একটা বিশেষ রকম অবাঞ্ছনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার ক'রে তোমার উপকার করেছেন। তোমার প্রতি আচরণও তাঁর যৎপরোনাস্তি ভাল। তবে তুমি তাঁর আশ্রয় ছেড়ে আসতে চাচ্ছ কেন?"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে সন্ধ্যা বললে, "প্রমথবাবু আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন, আর আমার প্রতি তাঁর আচরণ খুব ভাল এ নিশ্চয়ই সত্যি,—কিন্তু এই কপট জীবন ধারণ ক'রে আমি বেশি দিন বাঁচবনা—এ আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে!"

ক্ষণকাল কি চিন্তা ক'রে রঘুনাথ বললেন, "তোমাকে ছেড়ে দিতে প্রমথবাবু সম্মত হবেন ত মা?"

"নিশ্চয় হবেন। আমার স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি কখনো বাধা দেবেন না, একথা বার বার বলেছেন।"

"কিন্তু তোমার এরূপ আচরণে তিনি দুঃখ পাবেন বলে মনে কর না কি মা?"

একটু চিন্তা ক'রে ঈষৎ আরক্ত মুখে সন্ধ্যা বললে, "তা হয়ত' একটু পাবেন, কিন্তু উপায় কি?" তারপর সংশয়-ব্যাকুল স্বরে বল্‌লে, "এত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? তবে কি আমাকে আশ্রয় দিতে আপনি রাজি নন?"

"তুমি যে অতিশয় বুদ্ধিশালিনী মেয়ে তা আমি তোমার জীবনকাহিনী বর্ণনা করবার শক্তি থেকেই বুঝতে পেরেছি, তাই তোমাকে এত অল্প কথা জিজ্ঞাসা করলাম ; অপর কেহ হলে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে হ'ত।"

আগ্রহান্বিত কণ্ঠে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তা হ'লে আমাকে গ্রহণ করলেন ত আপনি ?"

প্রসন্নমুখে রঘুনাথ বল্‌লেন, "হ্যাঁ মা, তোমাকে আমি সাদরে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলাম। শাস্ত্র চর্চ্চা ত নীরস বস্তু, সেবা-ব্রতের মধ্যে সরসতার অন্ত নেই। পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয় কোনো পুণ্য অর্জ্জন করেছিলাম, আজ তাই আমার হাতের সেবা গ্রহণ করবার জন্যে বাসুদেব তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তোমার সেবা ক'রে আমি ধন্য হব মা।"

রঘুনাথের কথা শুনে সন্ধ্যার চোখ ছলছলিয়ে এল ; বললে, "ও কথা ব'লে আমাকে অপরাধী করবেন না!"

রঘুনাথ হাসতে লাগলেন ; বল্‌লেন, "তুমি জানো না মা, তাই ভাবছ, এ আমার অত্যুক্তি কিম্বা অন্যায় উক্তি। কিন্তু আর কিছু দিন পরে তুমিও বুঝবে যে সেবা করতে পাওয়ার চেয়ে বড় সৌভাগ্য বৈষ্ণবের কাছে আর কিছু নেই। কিন্তু সে কথা যাক্—আমি ত আজ রাত্রেই বারোটার গাড়ীতে নবদ্বীপ যাচ্ছি। তুমি কবে, কি রকম করে যাবে ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমিও আজ রাত্রে আপনার সঙ্গে যাব।"

"হয়ে উঠবে ?"

"নিশ্চয় হবে।"

রঘুনাথ বল্‌লেন, "তবে আর বিলম্ব কোরো না—প্রস্তুত হ'য়ে এস। জিনিস পত্র কিছু এনো না, সংসার ত্যাগ করে আসবার সময়ে এক বস্ত্রে আস্‌তে হয়। দেহে যা থাকবে তা তা অবশ্য আন্‌তে পার—কিন্তু বহন করে কিছু এনোনা। তোমার নিত্যকার যা কিছু প্রয়োজনের বস্তু সবই আশ্রম থেকে পাবে—তবে সেখানে গিয়ে দেখবে সে প্রয়োজন অতি অল্প।"

ভূমিষ্ঠ হ'য়ে রঘুনাথকে প্রণাম করে সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল। তার মস্তকের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করে রঘুনাথ বললেন, "বাসুদেবের ইচ্ছায় আশ্রমে তোমার এই যোগদান তোমার পক্ষে, আমার পক্ষে আর আশ্রমের পক্ষে শুভ হোক, কল্যাণপ্রদ হোক্।"

আর একবার ভূমিষ্ঠ হয়ে রঘুনাথের পদধূলি গ্রহণ ক'রে সন্ধ্যা প্রস্থান করলে।

২৩

সন্ধ্যা যখন গৃহে পৌছল তখন রাত্রি নয়টা। প্রমথ একটা বিদেশী উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ পাঠে ব্যাপৃত ছিল। স্থানটা খুবই চিত্তচমকপ্রদ, কিন্তু উদরের মধ্যে ক্ষুধার প্রকোপ এমন একটু বেড়ে উঠেছিল যে মনটা ঠিক তার মধ্যে বসছিলনা, মনে হচ্ছিল সন্ধ্যা শীঘ্র শীঘ্র এলে মন্দ হয় না, আহারে বসা যায়। ঠিক এম্‌নি এক মুহূর্ত্তে সন্ধ্যার আবির্ভাবে মনটা খুসী হয়ে উঠল ; বল্‌লে "আজ একটু শীঘ্র ফিরেছ উষা, আজ শেষ হ'য়ে গেল বুঝি ?'

নিকটে এসে একটা চেয়ারে উপবেশন করে সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বল্‌লে "হ্যাঁ।"

"আর অন্য কোনো বাড়িতে পাঠ হবে না ?"

"না।" একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার খাওয়া হয়েছে ?"

এ প্রশ্নে একটু বিস্মিত হ'য়ে প্রমথ বললে, "তা কি করে হবে ? তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে কোনো দিন খেয়েচি কি ?"

"তা হ'লে আপনারে খাবার দিতে বলি ?"

"আর তোমার ?"

একটু ইতস্ততঃ করে সন্ধ্যা বললে, "আমি আজ একটু জল-টল খেয়ে নোবো—বেশি কিছু খাবনা।"

উদ্বিগ্ন মুখে প্রমথ বললে, "কেন, শরীর খারাপ হয়েছে না-কি ?"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "না শরীর ভাল আছে।"

"তবে ?"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বললে "আপনি খেয়ে নিন, তারপর সে কথা বলব।"

প্রমথ বললে, "কিন্তু সে ত আমি পারব না উষা, উদ্বেগ নিয়ে এক গ্রাসও আমার গলা দিয়ে নাববে না। কি কথা, তুমি এখনি বল।"

সন্ধ্যা এক মুহূর্ত্ত নীরবে ব'সে রইল তারপর প্রমথর প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত করে নতনেত্রে বললে, "আমি আপনার কাছ থেকে আজ মুক্তি ভিক্ষে চাচ্ছি।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথর মুখখানা একটু বিবর্ণ হয়ে গেল; বললে, "বাঁধন কোথায় যে মুক্তি! কিন্তু সে কথা যাক্, আসলে কথাটা কি খুলে বল দেখি?—ভাগবত-সভায় কোনো আত্মীয়-স্বজনের দেখা পেয়েছ?"

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "না, তা পাই নি। ভাগবত-পাঠকের সঙ্গে আমি নবদ্বীপ যেতে চাই তাঁর আশ্রমের একজন সেবিকা হয়ে।"

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করে প্রমথ বললে, "এই রকম একটা কথা কি তুমি মনে মনে ভাবতে আরম্ভ করেছ, না, তাঁর সঙ্গে ও কথাটা শেষ করে এসেছ?"

"তাঁর সঙ্গেও কথা কয়েছি।"

"তিনি রাজি আছেন?"

"আছেন।"

"এ সঙ্কল্প কি তোমার একেবারে পাকা উষা, না এখনো এ বিষয়ে বাদানুবাদের সময় আছে?"

দুঃখ-মিনতি-পূর্ণ কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "দেখুন, আপনি আমার পরম উপকারী বন্ধু, আপনার কাছ থেকে আমি যে সদয় ব্যবহার পেয়েছি তার জন্যে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, কিন্তু তবু আপনি আমাকে এ অনুমতি দিন্। আমার মনে হয় আশ্রমের সেবাদাসী হয়ে আমার এই কদর্য্য জীবন সামান্য একটুও সার্থক হতে পারে।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ আঙুল দিয়ে দুই চোখ টিপে ধ'রে নিঃশব্দে ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা করলে, তার-পর চোখ চেয়ে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আমার কাছ থেকে উপকার পেয়ে তুমি যে আজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিদায় নিচ্ছ উষা, এজন্যে আমিও তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মানুষের মন আজকাল এমন শুকিয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে যে, কৃতজ্ঞতা লাভ করাও একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সে কথা যাক্, আজ তোমার কাছ থেকে যে আঘাতটা পেলাম তা একদিন পেতে হবে ব'লে আগে যদি জানা থাকৃত তা হলে কখনই আমি তোমাকে প্রকাশ দাদার বাড়ি থেকে উদ্ধার ক'রে আনতাম না। এত বড় নিঃস্বার্থ-পরার্থপর ব্যক্তি আমি নই যে, এতখানি মূল্য দিয়ে পরের উপকার করতে পারি।"

সন্ধ্যা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না, জড় পদার্থের মত নিঃশব্দ নিশ্চল হ'য়ে বসে রইল।

একটু পরে প্রমথ পুনরায় বল্‌তে আরম্ভ করলে, "তোমার বোধ হয় মনে আছে উষা, একদিন তোমাকে বলেছিলাম যে, আমি গদ্য-প্রকৃতির সোজাসুজি লোক, কাব্যগন্ধী কথা শুনতেও ভালবাসিনে, বলতেও ভালবাসিনে। কিন্তু মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্ত আসে যখন সে নিজেকে হারায়, নিজের প্রকৃতিকে হারায়। আজ মনে হচ্ছে আমারও সেই রকম একটা মুহূর্ত্ত এসেছে। আমি হয়ত আজ তোমাকে কিছু কাব্য-কথা শোনাব, কিন্তু তার আগে ভূমিকার মতো একটা খুব ছোট গল্প শোনাই। একজন অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির দুর্ব্বৃত্ত লোক ছিল, তার কাজ ছিল সারাদিন তীর ধনুক হাতে বনে বনে পাখী মেরে বেড়ান। প্রাণীহত্যা ক'রে ক'রে তার মন হয়ে গিয়েছিল পাথরের মত কঠিন, তাই কোনো রকম দুষ্কর্ম্ম ক'রে তার মনে কিছুমাত্র কষ্ট হ'ত না। একদিন তীর ধনুক হাতে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে পায়ে বাজল তার একটা পাথরের নুড়ি; নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে বিরক্ত হয়ে সেটা তুলে ধরতেই আকৃতি গেল তার বদলে, চোখ হ'য়ে গেল বড় বড়, মুখে ফুটে উঠল বিস্ময় আর আনন্দের দীপ্তি। কত সংখ্যাতীত নুড়ি সে তার জীবনে দেখেছে, কিন্তু এমনটি ত কোনো দিন দেখেনি; একেবারে সুডোল স্বচ্ছ শ্বেতকান্তি স্ফটিক, কোথাও কোনোখানে তার একটুখানি মলিনতা নেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটিকে দেখতে দেখতে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল, বাঁ হাত থেকে তীর ধনুক মাটীতে গেল খসে; তারপর নদীর জলে নুড়িটিকে পরিষ্কার ক'রে নিতে গিয়ে নিজেও জলের মধ্যে নেবে পড়ল; অবগাহন স্নান ক'রে নুড়িটি নিয়ে সে বনের মধ্যে নিজের আস্তানায় উপস্থিত হ'ল; একটা প্রকাণ্ড বুনো গাছের তলা, কত পাখীর পালক প'ড়ে আছে চতুর্দ্দিকে, এইখানে সে পাখী পুড়িয়ে পুড়িয়ে খায়; সেখানে অমন নির্ম্মল জিনিস রাখতে প্রবৃত্তি হ'ল না, একটা বটগাছ খুঁজে নিয়ে তার তলা পরিষ্কার করে সযত্নে সেখানে সেটিকে স্থাপন করলে; তার পর খেয়াল চাপল, বন থেকে খুঁজে নিয়ে এল ফুল ফল দূর্ব্বা বেলপাতা; তাই দিয়ে পূজো করে, ভোগ দেয়; ভুলে গেল নদীর ধারে ফেলে-আসা তীর ধনুকের কথা। এই রকম করতে করতে একদিন সে হ'য়ে গেল বাবাজী-মহারাজ আর তার নুড়ি হয়ে গেল শালগ্রাম শিলা। আমার জীবনেও একদিন ঠিক এমনি একটা ঘটনা ঘটল উষা! ছিলাম মোদো-মাতাল দুশ্চরিত্র, মেয়ে-মানুষ শিকার ক'রে ক'রে গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে বেড়িয়ে বেড়াতাম; হঠাৎ হোলো প্রকাশ দাদার বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা; নিয়ে এলাম সেখান থেকে তোমাকে কুড়িয়ে কাশীতে; সব ভুলে গিয়ে তোমাকে নিয়ে মত্ত হলাম; বসন ভূষণ সাজ সজ্জা দিয়ে তোমাকে সাজাতে লাগলাম মনের মতন ক'রে; কোথায় অন্তর্হিত হোলো এত দিনের অভ্যাসের মদ আর মেয়েমানুষ! আজ আমার শালগ্রাম শিলা হঠাৎ নোটিস দিচ্ছেন যে, তিনি এই অপবিত্র কাশী সহর পরিত্যাগ ক'রে পবিত্র নবদ্বীপধামে আশ্রমবাসিনী হ'তে

চলেছেন। এখন ভাবছি কি জানো উষা? ভাবচি, এই শালগ্রামহীন বাবাজী-মহারাজের কি দশা হবে, এখন কি ফল-মূল খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারবেন, না তীরধনুক সংগ্রহ ক'রে আবার ছুটবেন পাখী শিকার করতে। যাক্‌, সে কথা ভাববার অনেক সময় পাওয়া যাবে, উপস্থিত তোমার কথা একটু ভাবা যাক্‌। নবদ্বীপ যাওয়া তা হ'লে কবে?"

পাষাণের মত অসাড় হ'য়ে সন্ধ্যা এতক্ষণ প্রমথর কথা শুনছিল, এক এক সময়ে তার নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল। একটু চুপ করে থেকে সিক্ত চক্ষু-পল্লব অলক্ষিতে বস্ত্রাঞ্চলে মুছে নিয়ে বললে, "আজই।"

"আজই? ক'টার গাড়িতে?"

"রাত্রি বারোটার গাড়ীতে।"

পুনরায় ক্ষণকাল চুপ করে থেকে প্রমথ বললে, "তা হ'লে তোমার জিনিস-পত্র গুছিয়ে নাও। সময় ত' খুব বেশি নেই।"

একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "জিনিস-পত্র নিতে পাঠক-ঠাকুর নিষেধ করেছেন।"

"নিষেধ করেছেন? ওঃ, খেয়াল হয়নি! অপবিত্র স্থানের জিনিস-পত্রের ছুঁৎ দিয়ে আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট করা হবে না! তা হ'লে কি একবস্ত্রেই যেতে বলেছেন?"

"হ্যাঁ, তাই বলেছেন।"

"মাথার একটা বালিশ, কি গায়ের একটা কাপড়, তাও নেওয়া চলবে না?"

"না।"

"জয়! পাঠক-ঠাকুরজীকী জয়! এখন থেকেই কৃচ্ছ্র-সাধন আরম্ভ হ'য়ে গেল! তা হ'লে আর দেরি না করে একটু যা হয় খেয়ে নাও। না, সে বিষয়েও পাঠক-ঠাকুরজীর নিষেধ আছে।"

একটু চুপ করে থেকে সন্ধ্যা বললে, "আপনার খাবার তা হ'লে দিতে বলি?"

প্রমথ বললে, "ক্ষেপেচ? আমি শুধু শুধু তোমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি খেতে যাব কেন? পাঠক-ঠাকুরজীর জিম্মায় তোমাকে দিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে খেতে বসব।"

প্রমথর প্রতি একটা কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সন্ধ্যা প্রস্থান করলে, তারপর মিনিট দশ পনেরো পরে ফিরে এসে দাঁড়াল। মূল্যবান সাড়ী পরিত্যাগ ক'রে একটা মামুলী সূতীর বস্ত্র পরিধান করেছে, দেহে কিন্তু অলঙ্কারগুলো তখনো রয়েছে।

প্রমথ চেয়ে দেখে বললে, "কি, প্রস্তুত না কি?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না, নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

"খেয়েছ?"

"খেয়েছি।"

"চল, তা হ'লে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে কুণ্ঠিতস্বরে সন্ধ্যা বললে, "গহনা-গুলো তা হ'লে খুলে দিই?"

উঠতে উঠতে প্রমথ ধপ ক'রে সোফার উপর পুনরায় বসে পড়ল, মুখে তার ফুটে উঠল একটা মর্ম্মান্তিক বেদনার ছায়া; বললে, "দোহাই উষা, তোমার সমস্ত জিনিসই ত ফেলে যাচ্ছ, গা থেকে গহনা খুলে নেবার গ্লানি থেকে আমাকে অব্যাহতি দাও! যদি প্রয়োজন মনে কর, ও নিষ্ফল অপয়া জিনিসগুলো পুলের উপর থেকে কাশীর গঙ্গায় ফেলে দিয়ো, কিন্তু আমার হাতে খুলে দিয়ো না!"

আঁচল থেকে চাবির রিং খুলে প্রমথর হাতে দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "এটা আপনার পকেটে রাখুন।"

চাবির রিংটা হাতে নিয়ে প্রমথ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "একটা কথা উষা। যাবার আগে আমার একটা প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে যাও। মাসিক একহাজার টাকা আয়ের আমার কল-কাতার একটা বাড়ি তোমার নামে লিখে দোবো বলেছিলাম, আমাকে সে প্রতিশ্রুতি পালন করবার অনুমতি দিয়ে যাও। তার আয় থেকে তুমি আশ্রমেরও ত' অনেক প্রয়োজন মেটাতে পারবে, জনসেবার জন্যে অর্থের প্রয়োজন কম নয়। কিছু আগে কৃতজ্ঞতার কথা তুলেছিলে, সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ যদি শোধ করে যেতে চাও তা হলে আমার এই অনুরোধটা রাখ।"

প্রমথর মুখের উপর সজল চক্ষের করুণ দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা।" তারপর অঞ্চল-বস্ত্র গলায় দিয়ে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে প্রমথকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল।

প্রমথ বললে "আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি উষা, যত দুঃখ যত কষ্টই আমাকে তুমি দিয়ে যাও না কেন, তুমি যেন এবার সুখী হয়ো।"

সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে প্রমথ যখন গৃহ থেকে বহির্গত হ'ল তখন রাত্রি দশটা।

২৪

প্রমথ ও সন্ধ্যা যখন ভাগবত-সভা গৃহে উপস্থিত হ'ল তখন রঘুনাথ আহারাদি শেষ করে বারান্দায় ব'সে তিন চার জন লোকের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। সন্ধ্যাকে দেখতে পেয়ে লোকগুলি উঠে পাশের ঘরে গিয়ে বসল।

রঘুনাথ দাঁড়িয়ে উঠে সাদরে আহ্বান করলেন "আসুন, আসুন!" প্রমথর প্রতি সহাস্যে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "প্রমথ বাবু নিশ্চয়ই?"

করজোড়ে নমস্কার ক'রে প্রমথ বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই

পাপিষ্ঠই বটে ! আপনারা সাধু পুরুষ, আমাদের মুখ দেখলেই চিনে ফেলেন।"

রঘুনাথ বললেন, "প্রমথবাবু, শাস্ত্রের মতে নিন্দার ছলে আত্মস্তুতি, আর স্তুতির ছলে পরনিন্দা—উভয়ই নিষিদ্ধ। আপনি নিজেকে পাপিষ্ঠ আর আমাকে সাধুপুরুষ ব'লে উভয়তই শাস্ত্রবাক্যের অপলাপ করছেন।" ব'লে হো হো করে হাস্‌তে লাগলেন।

প্রমথ পুনরায় হাত জোড় ক'রে বল্‌লে, "আপনি বৈষ্ণব, আর আমি শাক্ত, আপনার সঙ্গে বিনয়ে পেরে উঠব কেন ? আমার বিনয়ে সত্যের অপলাপ করিনি, তবে এক হিসাবে আপনি আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতেই আছেন,—শুধু আপনি ওপরে আর আমি নীচে।"

রঘুনাথ বল্‌লেন, "সে কথা শুন্‌ছি, তার আগে এই চেয়ারটায় আপনি বসুন, আর তুমি মা, এই চেয়ারটায় বোসো।" উভয়ে উপবেশন করলে বললেন, "এবার বলুন, কোন শ্রেণীতে আপনার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।"

প্রমথ বললে, "কথাটা শুনতে ভাল নয় কিন্তু আসলে সত্য, অভয় দেন ত বলি।"

রঘুনাথ হাসতে লাগলেন : বললেন, "ভয় দেখালেও আপনি বলবেন, কারণ আমি বৈষ্ণব আর আপনি শাক্ত। তবুও অভয় দিচ্ছি, বলুন।"

প্রমথ বললে, "পথে আসতে আস্‌তে এই মেয়েটির মুখে শুন্‌লাম, ইনি এঁর দুঃখের কাহিনী মোটামুটি সবই আপনাকে জানিয়েছেন। তা হ'লে বুঝতেই পারচেন যে আমি চোর, কারণ প্রকাশ বাবুর বাড়ি থেকে এঁকে চুরি ক'রে নিয়ে আসি। কিন্তু এত বড় বাটপাড় কাশীতে ভাগবত পাঠ করছেন জানলে কি আমি এক দণ্ডের জন্যে কাশীর মাটি মাড়াই ? একেবারে সোজা লক্ষ্ণৌয়ে পাড়ি দিই। এখন বুঝতে পারছেন, কোথায় আমি আর আপনি এক শ্রেণীতে আছি, আর সেখানে কেন আপনি ওপরে আর আমি নীচে ?"

প্রমথর কথা শুনে রঘুনাথ হাস্‌তে লাগলেন ; বললেন, "এমন সাধু-চোরের ওপর যে বাটপাড়ি ক'রে সে কিন্তু অসাধু, তা সে যতই ভাগবত পড়ুক না কেন। মা-লক্ষ্মীর নামটি কিন্তু এখনও আমার জানা হয়নি প্রমথবাবু।"

প্রমথ বললে, "এঁর দুটি নাম—উষা আর সন্ধ্যা।"

"তার অর্থ ?"

"তার অর্থ, যেখানে ইনি উদয় হন সেখানে ইনি উষা, আর যেখানে অস্ত যান সেখানে সন্ধ্যা।"

প্রসন্নমুখে রঘুনাথ বললেন, "তা হ'লে আমার আশ্রমে ইনি উষাই হবেন।"

প্রমথ বললে, "তা সত্যিই হবেন। আপনি দেখবেন এঁর প্রভায় আপনার আশ্রম আলোকিত হবে। এমন একটি মেয়ে কদাচিৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায় গোঁসাইজী, একেবারে খাঁটি হীরে,—কোথাও একটু দাগ-দোগ খুঁজে পাবেন না।"

রঘুনাথ বললেন, "তা বুঝতে পেরেছি। বাসুদেবের কৃপায় আর আপনার অনুগ্রহে এমন রত্ন লাভ করলাম।"

প্রমথ মাথা নেড়ে বল্‌লে, "বাসুদেবের কৃপায় কি-না তা বলতে পারিনে, কারণ বৈকুণ্ঠের কোন খবরই আমি রাখিনে ; কিন্তু আমার অনুগ্রহে যে নয় তা হলফ নিয়ে বলতে পারি। কিন্তু রাত হয়ে আসচে, আর দুটো কথা আপনার সঙ্গে কয়ে নিয়ে বিদায় হই।"

রঘুনাথ বল্‌লেন, "কি কথা বলুন।"

প্রমথ বল্‌লে, "আমি ত একটি পয়লা নম্বরের দুরাত্মা ব্যক্তি। আপনার আশ্রমের কোন উপকারেই লাগ্‌ব না, কারণ সেখানে আমার প্রবেশ-নিষেধ,—কিন্তু উষার জন্যে অথবা আশ্রমের জন্যে যদি কখনো আপনাদের বিশেষ কিছু অর্থের ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন হয় তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে হুকুম-নামা পাঠাবেন, তামিল করব।"

রঘুনাথ সহাস্য মুখে বললেন, "দুরাত্মা আপনি কার পক্ষে তা জানিনে, কিন্তু আমাদের পক্ষে যে নিকট আত্মীয় হলেন তাতে সন্দেহ নেই। আশ্রমে কারোই প্রবেশ-নিষেধ নেই, আপনার ত নেই-ই। যখনই আপনার ইচ্ছে হবে আমাদের সম্মানার্হ অতিথি হ'য়ে সেখানে যাবেন।"

প্রমথ বল্‌লে, "ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি ভদ্রতা ক'রে যেতে বল্‌লেন বলেই যে আমি যাব বলে আপনাকে ভয় দেখাব, ততটা দুরাত্মা আমাকে মনে করবেন না। আমার দ্বিতীয় কথা শুনুন। অপরাধ নেবেন না গোঁসাইজী, ষোল আনা প্রত্যয় আমার কোনো জিনিষেরই উপরে নেই, এমন কি আপনার আশ্রমের উপরেও নয়। তাছাড়া, মানুষের জীবন ত অনিশ্চিতই, তা আমারই বলুন, আর আপনারই বলুন। সেই জন্যে আমি শীঘ্র কলকাতা গিয়ে আমার একটা বাড়ী উষার নামে লিখে দিয়ে দলীলপত্র খানা আপনার কাছে পাঠিয়ে দোবো। সেই দলীলপত্রে লিখিত সর্ত্ত মতো উষা আর আপনি বিষয় এবং আয়ের বিলি ব্যবস্থা করবেন, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে এই আশ্বাসটুকু দিন। উষা সমস্তই ছেড়ে এসেছে, শুধু আমার একান্ত পীড়াপীড়িতে এইটুকুতে রাজি হয়েছে,—এজন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।"

রঘুনাথ বল্‌লেন, "আমার প্রতি ভারার্পণ ক'রে আপনি যে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করছেন সে জন্যে আমিও

আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের ভার থেকে মুক্ত হওয়াই উচিত প্রমথবাবু ভার বাড়ানো উচিত নয়।"

প্রমথ বল্‌লে, "দলীলপত্র দেখ্‌লেই বুঝতে পারবেন যে তাতে ভার থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থাই থাকবে। আমারই কর্ম্মচারী আদায়পত্র ক'রে মাসে মাসে আপনাকে টাকা পাঠাবে—এবং সে টাকার হিসাব-নিকাশ করবার কোন দায়িত্বই আপনার থাকবেনা।"

প্রমথ আসন ত্যাগ ক'রে উঠে রঘুনাথকে নমস্কার করে বল্‌লে, "চিঠিপত্র লেখালেখি আপনাদের বোধহয় সুবিধে হবেনা, নিয়মও হয়ত নেই, দরকারও নেই; কিন্তু ভগবান না করুন, উষার যদি কখনো তেমন বেশি অসুখ-বিসুখ ক'রে সে কথা আমাকে অবিলম্বে জানাবেন।"

রঘুনাথ বল্‌লেন, "জানাব।"

সন্ধ্যা এসে গলবস্ত্র হ'য়ে প্রমথকে প্রণাম করলে, তার পর উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লেন, "বাড়ি গিয়েই খেতে বসবেন।"

পুনরায় রঘুনাথকে নমস্কার করে প্রমথ সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

২৫

অবস্থা বিশেষে মানুষে যেমন হাসি দিয়ে কান্না ঢাকবার চেষ্টা করে ঠিক সেই রকমেই রঘুনাথের কাছে প্রমথ তার দুঃসহ দুঃখটা হাসি-কৌতুক দিয়ে চাপা দেবার চেষ্টা করছিল। পথে বেরিয়ে কিন্তু চিত্তের সেই কৃত্রিম ভাবটা অন্তর্হিত হ'তে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হল না। রিক্ততার একটা মর্ম্মন্তুদ গ্লানিতে সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় টন্ টন্ করতে লাগল। সন্ধ্যা-সহ বিগত কয়েক দিনের জীবনযাপন মনে হ'তে লাগল যেন একটা নিঃসত্ব সুখস্বপ্ন, নিদ্রাভঙ্গে যার অবাস্তবতা সমস্ত মনকে মহাশূন্যতায় ভ'রে দিয়ে গেল। পলে পলে তিলে তিলে যে জিনিসকে সে বহু দুঃখে যত্নে আয়ত্ত করে আনছিল, এক মুহূর্ত্তে তাকে হারাতে হ'ল!

গৃহে ফিরে প্রমথ সোজা সন্ধ্যার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। সেই ড্রেসিং টেবল, সেই কাঠের আলনায় কয়েক খানা কোঁচানো শাড়ী ব্লাউস আর পেটিকোট, পালঙ্কের উপরে সেই শয্যা পাতা। সবই রয়েছে, নেই শুধু সে যার অভাবে এ সমস্তই বৃথা হয়ে গেছে। পিঞ্জর আছে, পাখী নেই; বৃন্ত আছে, ফুল নেই!

শয্যার উপরে প্রমথ তার শিথিল অলস দেহটাকে বিস্তৃত ক'রে দিলে। খাবার দেবে কি-না জিজ্ঞাসা করতে এসে পাচক বিষম তাড়া খেয়ে পালাল, কামিনী আসছিল সন্ধ্যার বিষয়ে কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে, প্রভুর রুদ্রমূর্ত্তি দেখে ঘরে ঢুকতে সাহস হল না, নিঃশব্দে পাচককে অনুসরণ করলে।

শুয়ে শুয়ে প্রমথ কতকি মাথামুণ্ড ভাবতে আরম্ভ করলে, যার না ছিল আদি, না ছিল অন্ত। অসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন চিন্তার জাল,—কখনো অতীতের স্মৃতি, কখনো বর্ত্তমানের দুঃখ, কখনো ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় তার অব-স্থিতি। ভাবতে ভাবতে নিজের কথা ভেবে একবার তার ভারি হাসি পেল! মনে মনে নিজেকে সম্বোধন করে বললে, ছি বাপু প্রমথনাথ, নেশা-ভাঙ বদখেয়ালি করতে, বেশ ছিলে! হঠাৎ একটা খেয়ালের বশে ভদ্রলোক সেজে এ দুর্গতি কেন টেনে আন্‌লে! ফেরো আবার আগেকার জীবনে, আনো ডাকিয়ে মানদা মাসীকে, কিনতে পাঠাও শোকদুঃখচিন্তাবিনাশিনী সুধার ভাণ্ডার। তারপর আছে বিনোদিনী, আছে সরমা, আছে সুরমা, আছে রেবতী। কে সন্ধ্যা? কার সন্ধ্যা? কোথায় সন্ধ্যা? সন্ধ্যা রজনীর অন্ধকারে মিশে গেছে।

চিত্তের এক দিক কিন্তু মাথা নেড়ে বলে, না, না, তা হয় না। এতটা এগিয়ে এসে এখন আর পেছন ফেরা যায় না। স্রোতস্বতীর সাক্ষাৎ পেয়ে পঙ্কিল নালার মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব। তার চেয়ে এবার এক তৃতীয় পন্থা অবলম্বন কর। এবার হিমালয় থেকে কুমারিকা আর মণিপুর থেকে বেলুচিস্থান ঘুরে বেড়াও। এবার পরিব্রাজক শ্রীমৎ প্রমথনাথ স্বামী!

দ্বারের দিকে কিসের খুস্‌খাস্ শব্দ হল। অল্প একটু মাথা তুলে প্রমথ দেখলে সন্ধ্যা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে! সহসা এক ঝাঁকা দিয়ে টপ ক'রে শয্যার উপর উঠে বসে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "একি সন্ধ্যা! তুমি যে আবার এলে?"

সন্ধ্যা বললে, "দশ দিনের জন্যে ফিরে এলাম।" মুখে তার রহস্য এবং কৌতুকের অনিবারণীয় আভা।

"দশ দিনের জন্যে ফিরে এলে? জয় বিশ্বনাথ! কিন্তু দশ দিনের জন্যে কেন? চিরদিনের জন্য কেন নয়?" শয্যার একেবারে এক প্রান্তে স'রে গিয়ে অপর প্রান্তে সন্ধ্যাকে বসতে ব'লে প্রমথ বললে, "বোসো বোসো, ভাল করে সমস্ত কথা বল।"

শয্যায় উপবেশন করে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমরা যখন গেলাম তখন যে লোকগুলি পাঠকজীর কাছে বসেছিলেন তাঁরা তাঁদের বাড়ীতে দশ দিনের পাঠের ব্যবস্থা করতে এসেছিলেন। আপনি চ'লে আসার পরই তাঁদের সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেল। পাঠকজী অবশ্য একবার বলেছিলেন যে, আমার থাকবার জন্যে একটা স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু আমি যখন এই দশ দিন এ বাড়ীতে কাটাবার কথা বললাম, তখন তৎক্ষণাৎ লোক সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ভাবলাম, কাশীতেই যখন থাকতে হোল তখন পরের বাড়ী থাকি কেন।"

প্রমথর মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল; বললে, "বেশ কথা বলেছ! তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ! সত্যিই ত, তোমার নিজের বাড়ি থাকতে পরের বাড়ি থাকতে যাবে কেন?"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। প্রমথ যে তার কথাটা নিয়ে এমন একটা মোচড় দেবে তা সে আগে বুঝতে পারেনি।

"উষা?"

"আজ্ঞে?"

"দশ দিন পরে নবদ্বীপ যাওয়া কি একেবারেই ঠিক?"

একটু চুপ করে থেকে নতনেত্রে সন্ধ্যা বললে, "উপস্থিত ত ঠিক।"

"তা হোক। আমি মুহূর্তের উপাসক উষা; মুহূর্তের সুখ, মুহূর্তের আনন্দকে আমি উপেক্ষা করিনে। কালকের দুশ্চিন্তায় আজকের দিনকে নষ্ট করা আমি বোকামি মনে করি। এই ধর, কথার কথা বলছি, দশ দিন পরে তুমি যখন চলে যাবে তখন ত ঠিক আজকের মতোই দুঃখ পাব? কিন্তু এমনও ত ঘটা আশ্চর্য্য নয় যে সে দুঃখ না পেতে পারি। জীবন ত আমাদের অনিশ্চিত উষা; ধর, দশ দিনের মধ্যে কোনো দিন আমার যদি মৃত্যু হয়, কথার কথা বলছি, তা হলে ত আর আমাকে তোমার চলে যাওয়ার দুঃখ ভোগ করতে হবে না! তবেই বুঝে দেখ, দশ দিন পরে যে দুঃখ ঘটবে তার জন্যে আজ হা-হুতোস্মি করার মধ্যে কোনো বুদ্ধির পরিচয় নেই।"

স্তব্ধ হয়ে সন্ধ্যা প্রমথর এই গভীর বেদনাত্মক কথা শুনছিল, চোখের কোণ তার ভিজে এসেছিল। আর্দ্র নেত্রের চকিত-বিমর্ষ দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য প্রমথর মুখে স্থাপিত করে সে বললে, "জীবনের উপমা দিয়ে কোনো কথাই এ রকম ক'রে বলতে নেই!"

শুনে প্রমথ হাসতে লাগল; বললে, "ক্ষণে-অক্ষণের কথা হঠাৎ লেগে যেতে পারে এই ভয় করছ ত? নিশ্চিন্ত থেকো, অত সুখে-সুখে মরব না;—তোমার হাতে অনেক দুঃখ পেতে এখনো বাকি আছে! কিন্তু এ সব কথা পরে হবে, উপস্থিত কাশীর রাবড়ি, চমচম—এই সব ভাল ভাল জিনিস আনাও, ভাল করে খেতে হবে।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা চমকিত হয়ে বললে, "আপনি এখনো খাননি না-কি?"

হাসিমুখে প্রমথ বললে, "নিশ্চয় খাইনি, কিন্তু নিশ্চয় খাব! তুমিও খাবে।"

খাবারের ব্যবস্থা করবার জন্যে সন্ধ্যা দ্রুতপদে অগ্রসর হল। প্রমথ ডাক দিয়ে বললে, "উষা, একটা কথা শুনে যাও।"

ফিরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"আজ আমার যেমন দুঃখের দিন, তেমনি সুখের দিন। আজ আমার একটা প্রার্থনা পূর্ণ করবে?"

কুণ্ঠিত স্বরে সন্ধ্যা বললে "কি বলুন?"

"খাওয়া-দাওয়ার পরে এস্রাজের গোটা দুই আলাপ, আর তোমার গলার গোটা দুই গান শোনাবে? তুমি ত বলেছিলে উষা, ভাগবত শেষ হয়ে গেলে শোনাবে—আর আজ না শুনিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলে। শোনাবে?"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "শোনাব" তারপর দ্রুতপদে নিচে নেমে গিয়ে পাচককে বললে, "ঠাকুর, শীঘ্র বাবুর খাবার উপরে নিয়ে এস।"

পাচক বললে, "মা, একটু আগে বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম, বাবু আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন যে আজ খাবেন না।"

ঈষৎ আরক্ত মুখে সন্ধ্যা বললে, 'না খাবেন,—নিয়ে এসো।'

"আপনারও ত' নিয়ে যাব মা?"

একটু ইতস্ততঃ করে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, আন।"

২৬

সময়ে সময়ে এমন অদ্ভুত ভাবে ঘটনার সমাবেশ হয় যে, মনে হয় এ যেন আপন খেয়ালে ঘটেনি, কোনো অদৃশ্য নিয়ন্তার ইচ্ছার বশে ঘটেছে। দু দিন পরে অপরাহ্ণের দিকে অতিশয় কম্প দিয়ে প্রমথর যখন জ্বর এল তখন অন্ততঃ সন্ধ্যার মনে হল, হয় ত এমনি একটা ঘটনাই ঘটবার উপক্রম করছে। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল, মনে হল কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কে জানে!

একটা মোটা র‍্যাগে সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে বালিসে ভর দিয়ে প্রমথ সোফার উপর শুয়েছিল; চোখ দুটো হয়েছিল জবা-ফুলের মতো লাল, মুখে ফুটে উঠেছিল তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। সন্ধ্যা এসে বললে, "চলুন, ওঘরে বিছানায় শোবেন চলুন।"

রক্তবর্ণ চক্ষু সন্ধ্যার মুখে স্থাপিত করে প্রমথ বললে, "কার বিছানায়? তোমার?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি তা হলে কোথায় শোবে?"

সন্ধ্যা বললে, "সে রাত্রের কথা রাত্রে হবে, এখন ত আপনি চলুন।"

সমস্ত দেহটা ছড়িয়ে দিয়ে ভাল করে শয়ন করবার জন্য ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে প্রমথ বললে, "চল।"

প্রমথ শয্যায় শয়ন করলে সন্ধ্যা ভাল করে দুখানা র‍্যাগ তার গায়ে দিয়ে দিলে, তারপর অডিকলোনের জল করে কপালে জলপটি দিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে মাথার শিয়রে বসল।

"উষা !"

"আজ্ঞে ?"

"কোনো দিন বোধ হয় ভুলে বড় রকমের একটা পুণ্যের কাজ করেছিলাম তাই এ অসুখটা আজ হোল।"

সন্ধ্যা কোনো কথা কইলে না, চুপ করে রইল।

"কেন বুঝতে পেরেছ ?"

সন্ধ্যা বললে, "পেরেছি, আপনি চুপ করে থাকুন, কথা কইবেন না।"

প্রমথ কিন্তু কথাটা শেষ না ক'রে ছাড়লেনা ; বললে, "তাই তোমার হাতের এত মিষ্টি সেবা পেলাম।" তারপর ঘাড় ফিরিয়ে সন্ধ্যার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "কিন্তু তাই ব'লে মনে কোরোনা সে পুণ্যটা এত বেশি যে, সেদিনকার সে কথাটাও ফলে যাবে। দেখো, শেষ পর্য্যন্ত সেরেই উঠব।"

সন্ধ্যার মুখে গভীর বেদনার রেখা ফুটে উঠল। আর্দ্র কণ্ঠে সে বললে, "আপনি চুপ করবেন কিনা বলুন !"

স্মিতমুখে প্রমথ বললে, "আচ্ছা, চুপ করলাম। চুপ করতেই ত চাই, কিন্তু জ্বরের ধমকে কথাগুলো কেমন আপনি যেন বেরিয়ে আসে।"

সন্ধ্যা মনে মনে সকাতরে তার অন্তরের ঐকান্তিক প্রার্থনা জ্ঞাপন করে বললে, 'হে বাবা বিশ্বনাথ ! দয়া করো ঠাকুর ! নইলে এ মুখ দেখাবার আর কোনো উপায়ই থাকবেনা।'

"মা।"

সন্ধ্যা তাকিয়ে দেখলে দ্বারের কাছে কামিনী দাঁড়িয়ে। উঠে গিয়ে বললে, "এনেছ ?"

"হ্যাঁ মা, এনেছি" বলে কামিনী একটা থার্মোমিটার সন্ধ্যার হাতে দিলে।

প্রমথ তাকিয়ে দেখে বললে, "ওটা কি উষা ?"

সন্ধ্যা বললে, "থার্মোমিটার।"

"আনালে ?"

"হ্যাঁ।"

থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর পরীক্ষা করে সন্ধ্যার মুখ শুকিয়ে গেল। জ্বর প্রায় ১০৫।

প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "কত দেখলে ? খুব বেশী, না ?"

সন্ধ্যা বললে, "না খুব বেশী নয়।" কিন্তু সন্ধ্যা যে সত্য কথা অনেকখানিই গোপন করলে তার মুখ দেখে প্রমথর তা বুঝতে বাকী রইল না।

থার্মোমিটার তুলে রেখে সন্ধ্যা ত্বরিতপদে নিচে গিয়ে কামিনীকে বললে, "কামিনী, বাবুর বড় বেশি অসুখ। তুমি মানদা মাসীর কাছে গিয়ে বল যে তিনি যেন শীঘ্র একজন ভাল ডাক্তার নিয়ে এখানে আসেন।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই মানদা একজন বিচক্ষণ ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হ'ল। ডাক্তার ভাল করে রোগীকে পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর পাশের ঘরে গিয়ে গোটা দুই প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন।

সন্ধ্যা এসে নমস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন দেখলেন ?"

ডাক্তার বললেন, "উপস্থিত ভয়ের কোন কারণ নেই, কিন্তু আপনার স্বামীর হার্ট তেমন সবল নয়। একেবারে ওঠা-বসা করতে দেবেন না, তা ছাড়া অবিরত মাথায় বরফ দিতে হবে, অডিকলোনে চলবে না। জ্বর একশ দুয়ের নীচে নামলে বরফ বন্ধ করবেন। মনে হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। কাল রক্ত পরীক্ষা করাব।"

পথ্যাদির ব্যবস্থা করে ডাক্তার চলে গেলে সন্ধ্যা ঔষধ-পত্রের একটা ফর্দ্দ করে মানদার হাতে দিলে। একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে বললে, "শীঘ্র এগুলো আনিয়ে দিন।"

ঔষধাদি এলে একটা ছোট টেবিলের উপর সন্ধ্যা সেগুলো সাজিয়ে ফেললে।

সমস্ত রাত ঔষধ পথ্য আর বরফ চলল। রাত দুটোর সময় প্রমথ তাকিয়ে দেখলে তার মাথায় বরফের টুপি ধরে সন্ধ্যা বসে রয়েছে। ব্যস্ত হ'য়ে বললে, "এখনও বসে আছ উষা ? বিরিঞ্চিকে কি ঠাকুরকে টুপিটা ধরতে দাও না একটু।"

সন্ধ্যা বললে, "ওরা এসব পারবে কেন ? আপনি ঘুমোন, আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

মেঝেয় বিছানা পেতে মানদা ঘুমোচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়ে প্রমথ বললে, "মানদামাসীকে একটু দাওনা।"

সন্ধ্যা বললে, "একটা লোক ঘুমোচ্ছে অনর্থক তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে কি লাভ হবে ?"

প্রমথ একটু হাসলে ; বললে, "কিন্তু সমস্ত রাত জেগে বসে থেকে তোমারই বা কি লাভ হবে বল ?"

সন্ধ্যা কোন উত্তর দিলে না,—বরফ বদলে আনবার জন্যে টুপিটা নিয়ে উঠে গেল।

প্রত্যুষ পাঁচটার সময় সন্ধ্যা থার্ম্মোমিটার নিয়ে দেখলে জ্বর একশ এক-এর কাছে নেবে গেছে। টুপি থেকে বরফ ফেলে দিয়ে ফিরে এসে দেখলে প্রমথ তারই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। অল্প অল্প ঘাম হচ্ছিল, একটা র‍্যগ আস্তে আস্তে গা থেকে তুলে দিলে। তারপর মানদার পাশে একটা মাদুর পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

দুদিন অসুখটা খুব বেশী চল্‌ল। তারপর ক্রমশ কমে কমে ছ'দিনের দিন জ্বর ছেড়ে গেল। বেলা দশটার সময় সন্ধ্যা প্রমথকে হরলিক্‌স করে খাওয়াবার উপক্রম করছে, এমন সময় একটা পিতলের পরাতে নৈবেদ্য নিয়ে কামিনী প্রবেশ ক'রে বল্‌লে, "মা, পূজো দিয়ে এলুম।"

সন্ধ্যা উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে কামিনীর হাত থেকে পরাতটা নিয়ে ঘরের এককোণে রাখলে। তারপর তা' থেকে একটি ফুল আর বিল্বপত্র তুলে নিয়ে প্রমথর মাথায় ছুঁইয়ে দিলে। একটুখানি চিনি নিয়ে প্রমথকে বললে, "হাঁ করুন।" প্রমথ হাঁ করলে তার মুখে চিনিটুকু ফেলে দিয়ে হাতটা নিজের মাথায় বুলিয়ে নিলে। তারপর ফীডিং কাপে হরলিক্‌স ঢেলে প্রমথকে খাওয়াতে উদ্যত হ'ল।

হরলিক্‌স্ খাওয়া শেষ হ'লে প্রমথ সন্ধ্যার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "অনাহারে অনিদ্রায় নিজের শরীরপাত ক'রে, দেবতার পায়ে মাথামুড় খুঁড়ে আমাকে ত' বাঁচিয়ে তুল্‌লে ঊষা, কিন্তু এ অসার অপদার্থ বস্তু তোমার কোন্ কাজে লাগবে তা' ত' ভেবে পাচ্ছিনে একটুও।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "শরীর আপনার অতিশয় দুর্ব্বল, এ সব কথা এখন ভাববেন না।"

প্রমথ হাস্‌তে লাগল ; বল্‌লে, "ভাবব না সে কথা কেমন ক'রে বলি, তবে বল্‌বনা না-হয়। কিন্তু তুমি ঠিক বলেছ ঊষা, শরীর আমার অতিশয় দুর্ব্বল হয়েছে। মাত্র দিন ছয়েকের জ্বর, শরীরটা কিন্তু একেবারে গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে। তুমি না থাক্‌লে এবার লম্বা পাড়ি দিতে হ'ত। ভাগ্যিস দিন কতকের জন্য ফিরে এসেছিলে তাই !"

কথাটা যে একেবারে নিছক মিথ্যা নয়, এ বিশ্বাস সন্ধ্যারও ছিল। নিরবসর সতর্ক সেবার মধ্যে সামান্য অবহেলা হ'লেও সে কঠিন রোগ বোধহয় একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চ'লে যেতে পারত। শুশ্রূষার অকুণ্ঠিত প্রশংসা করবার সময় ডাক্তারও সেই মর্ম্মে ব'লে গিয়েছিলেন। তাই প্রমথর কৃশ দেহ এবং পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সন্ধ্যার চোখ ছলছলিয়ে আস্‌ত। মনে হ'ত, আহা ! বাপ নেই মা নেই স্ত্রী নেই কেউ নেই,—ভাগ্যে আমি ছিলাম ! এই চিন্তা হ'তে ধীরে ধীরে ক্ষরিত হ'ত একটা সূক্ষ্ম মমতার বোধ ;—কঠিন রোগ হ'তে আরোগ্য লাভের পর সন্তানের প্রতি জননীর যেমন একটা নূতন মায়া পড়ে কতকটা সেই প্রকার।

দিন দুই পরে প্রমথর শয্যাপার্শ্বে ব'সে সন্ধ্যা বেদানা ছাড়াচ্ছিল, এমন সময়ে কামিনী এসে বল্‌লে, "মা, সেই পাঠকঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন।"

কামিনীর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে উঠল ; বল্‌লে, "কি দরকার ?"

"তা' ত বল্‌তে পারিনে মা, আপনাকে খবর দিতে বল্‌লেন।"

প্রমথ বল্‌লে, "কি দরকার বুঝতে পারছনা ঊষা ? আজ বোধ হয় দশদিন পুরল—তাই তোমাকে খবর দিতে এসেছেন।"

এ কথা সন্ধ্যাকে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সে আপন মনে মৃদুস্বরে গুঁইগাঁই করতে লাগল—আমি কিন্তু আজ কি ক'রে যাই—আজ আমার যাওয়া কেমন ক'রে হয় ?—

প্রমথ বল্‌লে, "আমি ত এখন ভাল হয়েছি ঊষা, এখন আর তোমার যেতে আপত্তি কি ?"

এ কথার উত্তরে সন্ধ্যা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন যোগযুক্তি-বর্জ্জিত যে কয়টি কথা বল্‌লে তার ভাষাগত অর্থ নিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু ভাবগত অর্থ যে নবদ্বীপ যাবার একান্ত অনিচ্ছা তা বুঝতে প্রমথর কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না। উদগ্র আনন্দ এবং কৌতুক কষ্টে রোধ ক'রে গম্ভীর মুখে সে বল্‌লে, "কিন্তু সেটা ভাল দেখায় না ঊষা, কথা দিয়ে এখন যদি বল—"

প্রমথকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু কথা আমি যখন দিয়েছিলাম তখন ত আপনার

অসুখ হয় নি। এখনো আপনি ভাত খাননি, এ অবস্থায় ফেলে কেমন ক'রে চ'লে যাই? তা ছাড়া—"

এবার প্রমথ সন্ধ্যাকে তার অসমাপ্ত কথার মধ্যে নিবারিত করলে; বললে, "তা ছাড়া যা বলবার তা পাঠক-ঠাকুরকে আমিই বলব, তোমার আর কিছু বলবার দরকার নেই।" কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

রঘুনাথ ঘরে প্রবেশ করতেই প্রমথ হাত জোড় ক'রে বললে, "ক্ষমা করবেন মশায়, রোগে পড়া ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় অপরাধ নেই, কিন্তু আপনার শিষ্যা বিগড়েছেন।"

সহাস্যমুখে রঘুনাথ বললে, "অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ তিনি মনে করছেন যে, উপস্থিত যে সেবার ভার তিনি নিজের হাতে নিয়েছেন তা অসমাপ্ত রেখে নবদ্বীপ গেলে আশ্রম-ধর্ম্মের ব্যতিক্রম হবে।"

রঘুনাথ বললেন, "তা সত্যিই হবে। বিশেষতঃ তাঁর সেবা অসমাপ্ত রেখে, যাঁর কাছে মা-লক্ষ্মী এতখানি উপকৃত।"

প্রমথ সহাস্যমুখে বললে, "উপকার-প্রত্যুপকারের হিসেব করতে যাবেন না গোঁসাইজী, ও ব্যাপার অতিশয় জটিল, কারণ ওঁর কাছেও আমি কম উপকৃত নই। সেই উপকারের কথা স্মরণ করে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, সমর্থ হওয়া মাত্র আমি ওঁকে আপনার আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

রঘুনাথ বললেন, "সেই কথাই ভাল। এখন মা-লক্ষ্মী আপনার কাছেই থাকুন। তাঁর জন্যে আমার আশ্রমের দ্বার সব সময়েই খোলা রইল।"

প্রমথ ও সন্ধ্যার সহিত কিছু ক্ষণ আলাপ ক'রে রঘুনাথ বিদায় গ্রহণ করলেন।

দিন দশেক পরের কথা। নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ দ্বিপ্রহরে গঙ্গাবক্ষে নৌকা করে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। কথাবার্ত্তার মধ্যে এক সময়ে সে বললে, "উষা, এখন ত আমি বল পেয়েছি, এবার চল একদিন তোমাকে নবদ্বীপ রেখে আসি।"

সন্ধ্যা কোনো কথা বললেনা, চুপ করে বসে রইল।

"কি বল?"

সন্ধ্যা বল্লে, "আপনি বলছেন বল পেয়েছেন, কিন্তু আপনাকে দেখে তা একটুও মনে হয় না। আমার মনে হয় একটা কোনো ভাল জায়গায় আপনার চেঞ্জে যাওয়া উচিত।"

"কোথায় যাবে বল?"

একটু ভেবে সন্ধ্যা বললে, "লক্ষ্ণৌয়ে ত আপনার নিজের বাড়ি আছে। সেখানে গেলে হয়।"

প্রমথ বল্লে, "সে মন্দ কথা নয়। তা হ'লে কবে যাবে বল?"

সন্ধ্যা বললে, "দেরি ক'রে আর লাভ কি? দু তিন দিনের মধ্যে বেরিয়ে পড়লে হয়। এখন ত আপনি কতকটা বল পেয়েছেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ আর হাসি চেপে রাখতে পারলে না; বললে, "কিছু মনে কোরো না উষা, যে অত্যাশ্চর্য্য বল আমাকে লক্ষ্ণৌ নিয়ে যেতে পারে অথচ নবদ্বীপে নিয়ে যেতে পারে না, তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু একটা কথার উত্তর দেবে কি?"

আরক্ত মুখে সন্ধ্যা বললে, "কি?"

সন্ধ্যার দিকে একটু মুখ বাড়িয়ে মৃদুস্বরে প্রমথ বললে, "পাখী কি অবশেষে পোষ মান্‌ল? আমার সংসারেই কি তোমার আশ্রম পাতলে উষা?"

সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, চুপ করে রইল।

প্রমথ বললে, "পাত না ভাই! নাও না আমাকে রিক্ত ক'রে আমার সমস্ত সম্পদ! নিরন্নের আহার যোগাও, দরিদ্রের সেবাশ্রম কর,—যেভাবে তোমার ইচ্ছে হয়, যা করলে তোমার ভাল লাগে। পরের আশ্রমে গিয়ে কাজ কি উষা?"

এবার সন্ধ্যা তার মুখ ফিরিয়ে নিলে রামনগরের তীরের দিকে, তখন তার চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝরে পড়ছে—বোধ হয় অনেক দুঃখে অনেক সুখে।

এর দিন তিনেক পরে তারা কামিনী প্রভৃতিকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ রওনা হ'ল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কাব্যে রবীন্দ্রনাথের দুই রূপ—শেষ যুগ

শ্রীসুখরঞ্জন রায় এম্‌-এ

ক্ষণিকা ও নৈবেদ্য

"নৈবেদ্য" হইতেই কবির কাব্যজীবনের শেষ যুগ আরম্ভ হইয়াছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু এই "নৈবেদ্যের" আগে বা প্রায় সমসময়েই কবি 'ক্ষণিকা' নামে অন্য একটি কাব্য-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। "ক্ষণিকা" এবং "নৈবেদ্যের" কাব্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে—এই দুইটি হইয়াছে কবি-চিত্রের সম্পূর্ণ দুই বিপরীত দিকের প্রতিনিধি-কাব্য। সত্যের প্রশান্ত ধারণায় ও মঙ্গলের শুভ্র দ্যুতিতে, নিষ্ঠার সংযমে ও দুঃখের নিবিড় উপলব্ধিতে, মহত্ত্বে বীর্য্যে ও দুঃখ বীর্য্য ত্যাগ ও নিষ্ঠা দ্বারা লভ্য বিরাট মনুষ্যত্বের ধারণায় "নৈবেদ্য" কাব্যটি অধ্যাত্ম সংগ্রামনিরত মানবের চিরকাল উত্তুঙ্গ এবং বলিষ্ঠ আশ্রয় হইয়া থাকিবে। ইহার এক দিকে আছে ভগবৎ-প্রেম ও গভীর অধ্যাত্মোপলব্ধি, অন্যদিকে বিধাতা-প্রদত্ত কঠোর কর্ত্তব্য বহন। ভগবৎ-প্রেমের দিকে আছে নিষ্ঠা সংযম এবং সত্যের অনুধ্যান এবং সমস্তকে ছাপাইয়া বিদ্যুৎবিভাবৎ আনন্দ-স্ফুরণ, আর কর্ত্তব্যের সূত্রে পাই স্বদেশের কাজ। এই কাব্যে স্বদেশ-প্রেমের যে সমুচ্চ ধারণা, মানবের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার যে ছবি, প্রাচীন ভারতের যে আদর্শ, পাশ্চাত্য সভ্যতার যে উচ্চাঙ্গ প্রকাশ পাই বাংলা সাহিত্যে অন্যত্র তাহা দুর্লভ। তাঁর রণ-গুরুর কাছে অস্ত্রে দীক্ষা লইয়া এই বীর-কবি এই কাব্যে সমুন্নত বীর্য্য, তেজ এবং নির্ভয়ের যে ছবি ফুটাইয়াছেন নিছক উত্তেজনা এবং আস্ফালন-বহুল রচনা বলিয়া স্বীকৃত কোনো রচনার মধ্যেও তাহা নাই। অধ্যাত্মোপলব্ধির ছায়ায় প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া এই লোকভয়-রাজভয় এবং মৃত্যুভয়-জয়ী বীর্য্য সহজে চোখে পড়ে না, কিন্তু জাতির প্রকৃত স্বাদেশিকতার উদ্বোধনে তাহা যতটুকু কার্য্যকরী হইয়াছে বাংলা সাহিত্যে ততটা আর কিছু দ্বারা হইয়াছে বলিয়া জানি না।

কাজেই দেখা যাইতেছে "নৈবেদ্য" কাব্যটি high seriousness এর, তারি চরম অভিব্যক্তির কাব্য। "ক্ষণিকাতে" ভাষায় ভাবে ছন্দে সমস্ত Seriousnessকে উড়াইয়া গুঁড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কাব্যে সমাজ-নীতি কর্ত্তব্য-মহত্ত্ব কবি-চিত্তের হাল্‌কা হাওয়ার হিল্লোলে কোথায় যে ভাসিয়া বহিয়া গিয়াছে তার ঠিকঠিকানা নাই, মনে হয় কোথাকার এক পাগল গণ্ডগোলে সমাজস্থিতিকে ওলট পালট করিয়া দিয়াছে, চিরাচরিত ধারণার মূলে ধ্বংস আনিয়া দিয়াছে, সমস্ত গতানুগতিকতাকে হাসির বাণে বিদ্ধ করিয়া একেবারে গতাসু অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। "নৈবেদ্যে" আছে গাম্ভীর্য্য, "ক্ষণিকাতে" লঘুতা; "নৈবেদ্যে" শান্ত সংযম, "ক্ষণিকা"য় হাল্‌কা উন্মাদনা; "নৈবেদ্যে" ভাষায় ভাবে ছন্দে ধ্রুবপন্থী (classical) সুর, "ক্ষণিকায়" কল্পপন্থার (Romanticismএর) চরম, অথবা তারি ইচ্ছাকৃত বিকার। অথচ এই দুইটি কাব্য রচনার কাল হিসাবে প্রায় সমসাময়িক। একই কবি প্রায় একই সময়ে যে এই রকম বিপরীত ভাবের বিকাশ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন তাহা হঠাৎ আশ্চর্য্য ঠেকে। কিন্তু মানব-মনস্তত্ত্বের রহস্যের কথা ভাবিলে এই high seriousness এবং চরম লঘুতার একত্র সমাবেশ অসম্ভব মনে হইবে না, বরং এই high seriousnessএর গায় গায় তারি উল্টা পিঠে চরম লঘুতার আবির্ভাবই বেশী স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে। টেনিসন নাকি অতিরিক্ত খাটুনির ফাঁকে ফাঁকে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অশ্লীল রসিকতায় শ্রান্তি দূর করিতেন। সার্কাসের ক্লাউনেরা শারীর অকৌশলের ভাণ করে। টেনিসনের যে নীতিজ্ঞান ছিলনা তা নয়; সার্কাসের ক্লাউনদের যে শারীর কৌশল জানা নাই তা বলা যায় না। কবির এই লঘুতাও সেই রকমের একটু রকম-ফের, চিত্তে একটু উল্টা হাওয়া লাগানো বৈ কিছু নয়। এ কাব্য হইয়াছে ছন্দ ভাষা ভাব

লইয়া শক্তিমানের অপরূপ ছিনিমিনি খেলা—রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-চেষ্টার মধ্যেও আপন বিশেষত্বে সমুজ্জ্বল।

"ক্ষণিকার" কয়েকটি কবিতায় আবার যে seriousness আছে তা অস্বীকার করা যায় না—যেমন "কল্যাণী"তে—"ভালে যাহার আছে লেখা, পুণ্যধামের রশ্মিরেখা," যাহার "শান্তি পান্থজনে ডাকে গৃহের পানে।" মোহিনী এবং কল্যাণী, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নারীর এই দুইরূপ।

"ক্ষণিকার" লঘুতাকে ভাণ বলিয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে রবীন্দ্রনাথের দুই রূপের এক রূপ যে নিছক কবি-রূপ তার ঠিক প্রতিনিধি-কাব্য বলিয়া" ক্ষণিকাকে" গ্রহণ করা যায় না। "নৈবেদ্য" ও "এবার ফিরাও মোরের" লেখকের উল্টাদিক আমরা "চিত্রা"র অনেক কবিতায়, বিশেষ করিয়া "আবেদনে" দেখিয়াছি। "উৎসবের" একটি কবিতাতেও তাহা বিশেষ করিয়া ফুটিয়াছে। "আবেদনে"র সেই রাণীকেই সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

নগরের হাটে করিবনা বেচাকেনা,
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোন কাজে,
পাবনা কিছুই রাখিব না কারো দেনা,
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।
তরুতলে বসি মন্দ মন্দ
ঝঙ্কার দিব কত কি ছন্দ,
যত গান গাব তব বাঁধা তারে
বাজিবে তোমার উদার মন্ত্র

এই "উৎসর্গে"রই "হিমালয়", "শান্তি" 'শিলালিপি' "তপোমূর্ত্তি", "হরগৌরী", "সঞ্চিত বাণী" "জগদীশচন্দ্র বসু" এই কয়টি কবিতায় "নৈবেদ্যে"র সেই বীর্য্যে দৃঢ়, সত্যে শান্ত, নিষ্ঠায় অটল কবিকেই আমরা দেখিতে পাই। মানস-সুন্দরীর ভক্ত সৌন্দর্য্যের পূজারী কবি, আর সত্য ও মঙ্গলের ধ্রুবতার সাধক কবি—এই দুই রূপ "উৎসর্গের" আরো একটি কবিতাতে পাই। তাহাতে জীবন-দেবতারও সুন্দর রূপ ও মঙ্গল রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তার সুন্দর রূপ, যথা—

সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো
সে কি তুমি, মোর সভাতে?
হাতে ছিল তব বাঁশি
অধরে অবাক হাসি,
সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল
মদবিহ্বল শোভাতে।

সত্য ও মলঙ্গলরূপ, যথা—

আজি তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
তাপস মুরতি ধরিয়া।
স্তিমিত নয়ন তারা,
ঝলিছে অনল পারা
সিক্ত তোমার জটাজূট হতে
সলিল পড়িছে ঝরিয়া।

"নৈবেদ্য" হইতে আরম্ভ করিয়া "খেয়া" "গীতাঞ্জলি" ও "গীতিমাল্যের" ভিতর দিয়া "গীতালি" পর্য্যন্ত কবির কাব্য-ধারা ভগবৎ-প্রেমের খাতে বহিয়া চলিয়াছে। তবে "নৈবেদ্যে" বিশ্বদেবের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকেও পাই, ভগবান্ সেখানে দেশ ও সমাজের সঙ্গে যুক্ত, দেশসেবার কঠোর দায়িত্ব সেখানে তাঁরই দেওয়া। "গীতাঞ্জলি"র যুগে সেই ভগবান অনেকটা personal হইয়া দেখা দিয়াছেন, ভক্তকে এমনি এক রাজ্যে লইয়া গিয়াছেন যেখানে ভক্তের সহিত একা নির্জ্জনে তাঁর লীলাখেলা। "খেয়া"র "পথের শেষে" দাঁড়াইয়া তাই দেখি কবি "ক্লান্ত প্রাণে" সব অকস্মাতের আশা ছাড়িয়া "এখন কেবল একটি পেলেই" "বাঁশি"র সুর ধরিয়াছেন, নীড়ের বাঁধন ভুলিয়া গিয়া নীল আকাশের নির্জ্জন গান গাহিতেছেন, এখন কালোজলের কলকলে আঁখি তাঁহার ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে, ওপার হইতে সোনার আভা তাঁর পরাণ ছাইয়া ফেলিয়াছে, "রত্নখোঁজা রাজ্য ভাঙ্গাগড়া, মতের লাগি দেশ বিদেশে লড়া" তাই ছাড়িয়া দিয়া কাজের পথ হইতে "বিদায়" লইয়া তিনি মেঘের পথের পথিক হইয়া উঠিয়াছেন। "গীতাঞ্জলি"র কয়েকটি কবিতায় এই সুরটার বাহিরে অন্য একটা সুরও পাই। তাদের একটি হইয়াছে "হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে,", যাতে "সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ-নীরে' মার অভিষেকের মঙ্গল-ঘট ভরিতে কবি বলিতেছেন, যাতে বিশ্বমানবতার এবং ভারতে মহাসমন্বয়ের ধারণাকে কবি প্রথম গানে ফুটাইয়াছেন। কয়েকটিতে Personal God "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন" সেই সবার নীচে "মানুষের নারায়ণ," দীন দরিদ্রের নারায়ণ হইয়া "সৃষ্টি বাঁধন" পড়িয়া সবার কাছে

বাঁধা হইয়া দেখা দিয়াছেন। আর কবি তাই মুক্তি না চাহিয়া বলিতেছেন—

রাখোরে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি,
কর্ম্ম-যোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে॥

কবি "রাজার মত বেশ" খুলিয়া ফেলিয়া "যেথায় বিশ্ব-জনের খেলা, সমস্ত দিন নানান্ খেলা" সেখানে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছেন। অন্যত্র এক গানেও আছে—

অন্ধকারে একা একা
সে দেখা যে স্বপ্ন দেখা,
ডাকো তোমার হাটের মাঝে
চল্‌ছে যেথায় বেচাকেনা,
সেথায় হবে জানাশোনা।

কবির অধ্যাত্মোপলব্ধিরও এই দুইটা দিক—এই অন্তরের দিক ও বাহিরের দিক—না দেখিলে কবিকে সমগ্র-ভাবে দেখা হইবে না। তবু মোটামুটি "নৈবেদ্যের" সঙ্গে "গীতাঞ্জলি" প্রভৃতির ভাবের দিক দিয়া পার্থক্য কোন্ জায়-গায় তাহা বলিয়াছি। সেই কথাই অন্যভাবে বলিলে বলিতে হয় "নৈবেদ্যে"র মধ্যে ভগবানের সুন্দরের দিক হইতে সত্য ও মঙ্গলের দিকটাই বেশী ফুটিয়াছে, "গীতাঞ্জলি" প্রভৃতিতে ফুটিয়াছে সুন্দরের দিক। "নৈবেদ্যে" দেখা দিয়াছে বেশী করিয়া সাধনার কৃচ্ছ্রতা, আর "গীতিমাল্য" প্রভৃতিতে ফুটি-য়াছে সেই কৃচ্ছ্রতাকে আড়ালে ফেলিয়া এবং তাকে অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্মোপলব্ধির আনন্দ। "নৈবেদ্যে" যে সাধনা সুরু হইয়াছিল "গীতাঞ্জলি" প্রভৃতির বহুস্থানে দেখি তার কাঁটাকে ধন্য করিয়া কবির জীবনে ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিল্পরীতির দিক দিয়াও "নৈবেদ্যের" সঙ্গে "গীতাঞ্জলি" প্রভৃতির আকাশ পাতাল প্রভেদ। "নৈবেদ্য" কবিতা, "গীতাঞ্জলি" প্রভৃতি গান—এই এক কথাতেই তাদের শিল্প-রীতির পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। "ক্ষণিকা"র হাল্‌কা-চলতি ভাষা ও লঘুছন্দে এই গীতির যুগে কবি সুরের পথে সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং গভীর উপলব্ধির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু এই "গীতাঞ্জলি" যুগের কথা মনে করিয়াই নলিনী বাবু শুধু সুরের পথেই কবির অধরাকে ধরিবার চেষ্টার কথা বলিয়াছেন। সেটা যে কবি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য নয় তা দেখাবার স্থান এ নয়।

"কড়ি ও কোমলে"র যৌবন-ও-সৌন্দর্য্য-স্বপ্নের কবি যে কি করিয়া সত্য ও মঙ্গলরূপ বিশ্বদেবের ধ্যানে মগ্ন হইলেন পৃথিবীর সাহিত্যে সেটা একটা পরম বিস্ময় হইয়া থাকিবে। আমরা এই আলোচনায় কবি-চিত্তের সেই ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাসের উপরও কতকটা আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, আমরা দেখিয়াছি সম্ভোগ্যা নারীই মানসী হইয়া দেখা দিয়া মানস-সুন্দরীর ভিতর দিয়া কিরূপে জীবন-দেবতার তত্ত্বরূপ ও মঙ্গলরূপ ধারণ করিয়াছে। এই জীবন-দেবের সহিত বিশ্বদেবের যোগ, এক ধারণা হইতে অন্য ধারণার উদ্‌গতির কথা আমরা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। বহু কবিতায় ও গানে হয়ত কবির অজ্ঞাতসারেই এই দুই ধারণা এক হইয়া গিয়াছে।

"গীতাঞ্জলি"র যুগে যে জীবনদেবতা বিশ্বদেবতার মধ্যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল "বলাকা"য় আসিয়া দেখি সেই জীবনদেবতা আবার আসিয়া তার পৃথক সত্তায় দেখা দিয়াছে।—

পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় যে দেখা
শুধু নিমেষ তরে।

কবি দুঃখ করিতেছেন—

তারে নিয়ে হ'ল না ঘর-বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা।

সেই জীবনদেবতাই "বিরহী মেয়ে" হইয়া মত্ত সাগর পাড়ি দিয়া কবির জন্য অভিসারে আসিতেছেন। কবি তাকেই "অজানা" বলিতেছেন—

এখনো সে দেখায় নি তার মুখ
তাই ত দোলে বুক,
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের সঙ্গ।

"গীতাঞ্জলি"র কবি মোটামুটি জগৎ-সংসার হইতে দূরে অধ্যাত্মসাধনার অতলে ডুবিয়া গিয়াছিলেন, "বলাকা"য় এবং "পূরবী"তে দেখি প্রাণের হাটে এবং জীবনের ঘাটে ঘাটে তিনি

নবজন্ম লাভ করিয়াছেন। জীবনের কবি আবার জাতীয়তার গান গাহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মানবকে আবার তিনি খুব কাছাকাছি পাইয়াছেন। কবির এই দ্বিতীয় জন্মে—দ্বিতীয় যৌবনে—মর্ত্ত্যনারীর "ছবি"কে অবলম্বন করিয়া কভু বা "সাজাহানে"র প্রতীকের আড়ালে তিনি প্রেমের কথা তুলিয়াছেন, এবং নয়ন সম্মুখে যিনি নাই তাঁহাকেই শ্যামলে শ্যামল এবং নীলিমায় নীল দেখিয়া "স্মরণে"র স্ত্রীবিয়োগ-ঘটিত কবিতা স্মরণে আনাইয়া মানসীর সঙ্গে মর্ত্ত্যনারীর যোগ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সূত্রেই জীবনের কবির কাব্যে আবার জীবনদেবতার আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।

এই যে সুরের রাজ্য হইতে আবার কবিতার রাজ্যে, অধ্যাত্মোপলব্ধির নির্জ্জনতা হইতে বৃদ্ধবয়সে আবার মানব-কোলাহলের ক্ষেত্রে নূতন ভাষা ছন্দের কলেবরে কবির দ্বিজত্ব লাভ তাহা তাঁহার জীবন-ইতিহাসে চিরকাল একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হইয়া থাকিবে। ইহার justification কবি নিজেই দিয়াছেন।—

> চলেছিলেম পূজার ঘরে
> সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য,
> খুঁজি সারাদিনের পরে
> কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
> এবার আমার হৃদয়ক্ষত
> ভেবেছিলেম হবে গত,
> ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
> হবে নিষ্কলঙ্ক।
> পথে দেখি ধূলায় নত
> তোমার মহাশঙ্খ।

এই ধূলায় নত মহাশঙ্খকে তুলিয়া ধরিয়া আবার তাতে ফুৎকার দিতে হইবে, তাই কবি বলেন—

> এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
> পরাও রণ-সজ্জা।

কবির "গীতাঞ্জলি"র যুগ ও "বলাকা"র যুগের—আধ্যাত্মিকতা ও মানবিকতার—এই যোগসূত্র দেখিতে পাই "হে মোর সুন্দর" এই কবিতাটিতে।

কিন্তু নিছক আধ্যাত্মিকতা—মানবিকতা যুক্ত আধ্যাত্মিকতা—জীবনদেবতার ধারণার অতীত আধ্যাত্মিকতা—যাহা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আশায় "সারারাত্রি পথ চাওয়া কম্পিত আলোর প্রতীক্ষায় দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে" তাহার পরিচয়ও এ কাব্যে আছে। আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি এ আধ্যাত্মিকতারও এক দিক্‌প্রান্ত সুন্দরের রঙে রঙিন হইয়া গিয়াছে, অন্য দিক্‌প্রান্ত সত্যমঙ্গলের শুভ্রতায় অঞ্জনহীন হইয়া দেখা দিয়াছে। এ আধ্যাত্মিকতা পুষ্ট করিয়াছে একদিক দিয়া যেমন জীবনদেবতার মোহিনীরূপ, অন্যদিক দিয়া তার "স্বামিনী" রূপ তার "মহিমালক্ষ্মী" রূপও আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কবির মানবতার মধ্যেও যে অংশে নারীর প্রাধান্য মানসীর প্রাধান্য সে অংশ সৌন্দর্য্যে বিচিত্র, যে অংশে কর্ম্ম প্রধান সে অংশ কল্যাণে বিভাসিত। "বলাকা"র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য ও মঙ্গলরূপ দেখিতে পাই মহাযুদ্ধের উপর কবিতায়। কবি এখানে মৃত্যুর ভিতর হইতে অমৃতকে ছানিয়া তুলিয়াছেন, পৃথিবীর মহাযুদ্ধরূপ মহাকর্ম্মমন্থন করিয়া পরম মঙ্গলের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

> তোরে নাহি করি ভয়,
> এ সংসারে প্রতি দিন তোরে করিয়াছি জয়।
> তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ।
> শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

তারপর বলিতেছেন—

> মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
> সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
> পাপ যদি নাহি সরে যায়
> আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
> অহঙ্কার ভেঙ্গে নাহি পড়ে আপনার অসত্য সজ্জায়,
> তবে ঘর ছাড়া সবে
> অন্তরের কি আশ্বাস রবে
> মরিতে ছুটিবে শত শত
> প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো?
> বীরের এ রক্ত-স্রোত মাতার এ অশ্রু-ধারা
> এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
> স্বর্গ কি হবে না কেনা?
> বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
> এত ঋণ?
> রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
> নিদারুণ দুঃখরাতে
> মৃত্যুঘাতে
> মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্যসীমা
> তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

মহাযুদ্ধের মধ্যে কবি কবিতার উপাদান দেখিতে পান নাই, ভালো কিছু দেখেন নাই, টম্‌সন সাহেবের এই অভিযোগ যে কত মিথ্যা এই কবিতা তার প্রমাণ। কবি এখানে জীবনের ভিতর দিয়া মঙ্গলকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"পলাতকা"য়ও কবি জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি করিয়াছেন। কিন্তু "বলাকা"য় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পাই জীবনের তত্ত্ব, জীবনের দার্শনিকতা এবং কিছুটা পরিমাণে জীবনের কর্ম্মও। "বলাকা"র বেগবান কাব্যগতিপথে এগুলি পদে পদে আবর্ত্ত রচনা করিয়া ফেনোর্ম্মির দ্বারে দ্বারে কাব্যরসকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। "পলাতকা"য় দেখি কবি একই অসম ছন্দের কাব্য গতিতে পায়ের সেই তত্ত্ব-শৃঙ্খল সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছেন। এখানে নবাবির্ভূত জীবনদেবতার স্থান নাই, মানসতার রস কোনো দিক্‌প্রান্তে উঁকি দেয় নাই। দার্শনিকতা এবং কর্ম্মচেষ্টাকে সম্পূর্ণ ঝাড়িয়া ফেলিয়া কবি এখানে নিছক কবিরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাই বাধাহীন গতিতে কবিতাগুলি দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া চলিতেছে, তাদের স্বচ্ছ চলমান স্রোতে ফুটিয়া উঠিয়াছে নানা টুক্‌রা জীবনের চিত্র, অথচ সেই বিচ্ছিন্নতাকে এক করিয়া রাখিয়াছে একটি নিবিড় রসানুভূতির ধারা।

মানব চরিত্র ও জীবনের বস্তু-বিষয়কে অবলম্বন করায় রবীন্দ্রকাব্যে "কথা"র বিশিষ্টতার কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। "পলাতকা"য়ও সে বিশিষ্টতা রহিয়াছে। তবে "কথা" গড়িয়া উঠিয়াছে অতীত জীবন—ইতিহাসের জীবন লইয়া। আর "পলাতকা" গড়িয়া উঠিয়াছে বর্ত্তমান সমাজ জীবন লইয়া। কাজেই "কথায়" পরিস্থিতিটি (setting) হইয়াছে কল্পপন্থী (romantic) আর "পলাতকা"য় পরিস্থিতি বস্তুপন্থী (realistic)। আর "কথা" হইয়াছে গাথাকাব্য, "পলাতকা" আকৃতিতে আখ্যানকাব্য হইলেও প্রকৃতিতে গীতিকাব্য। "কথা"য় কবি নিজকে আড়ালে রাখিয়াছেন, তাই সেখানে পাই আত্মনিরপেক্ষ বস্তু-বিষয়ের ভিতর দিয়া মানবচরিত্রের বিকাশ, আর "পলাতকা"র অনেকগুলি কবিতায়—যেমন "ভোলা" "আসল" "ছিন্নপত্রে"—দেখি কবি নিজেই নায়ক, অনেক গুলিতে—যেমন "কালো মেয়ে"তে—অন্য নায়কের ভিতরে কবি নিজকেই প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, অন্যের আড়ালে নিজের আত্মমগ্নতাকেই (subjectivism)-কেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই আত্মমগ্নতার সঙ্গে সঙ্গে "পলাতকা"য় পাই গীতিকাব্যেরই দ্বিতীয় বিশেষত্ব—বিশেষ একটি সরল স্নিগ্ধ গভীর অনুভূতির উপর কাব্যের গোড়াপত্তন। সেই বিশেষ অনুভূতির আলো কোনো কোনো সময়—যেমন "ফাঁকি" ও "ছিন্নপত্রে"—কবিতার শেষে একটি নাটকীয় মুহূর্ত্তের মধ্যে সংহত করিয়া রাখা হইয়াছে। অনুভূতিতে ঝলমল ও কারুণ্যে সুগভীর সেই মুহূর্ত্তগুলি পাঠকের হৃদয়ের কাছে তাদের অব্যর্থ আবেদন লইয়া স্বল্প বস্তুর অবলম্বনে "মনুরে কি গেছ ভুলে ?" এই প্রশ্নের মতই এই পুস্তকের চোখের পাতায় একটি ফোঁটা চোখের জলের মত "অনন্তকাল রইবে দুলে।" এই কবিতাগুলি বিশেষ করিয়া মনে করাইয়া দেয় গীতিকাব্যের সুরে বাঁধা কবির প্রথম যুগের ছোট গল্পগুলিকেই। এগুলিতে যেমন "বলাকা"র জীবনের তত্ত্বরূপ নাই "কথা"র মহত্ত্ব ও ত্যাগের ছবি ফুটাইবার প্রয়াস নাই সেই সময়ের সবুজপত্রী যুগের ছোট গল্পের জীবনসমস্যাও তেমনি এগুলিকে ঘোরালো করিয়া তুলে নাই। কবির জীবনে "গীতাঞ্জলি"র যুগের পরে "বলাকা" আসিবে একথা কেহ ভাবিতে পারে নাই। "গীতাঞ্জলি"র যুগের নির্জ্জন সাধনা ও আধ্যাত্মিকতার নির্ম্মোক হইতে মুক্ত হইয়া "বলাকা"য় জীবনের পথে তত্ত্বদর্শী পরিব্রাজকের গতির পর, মন হইতে দার্শনিকতার অঞ্জন মুছিয়া ফেলিয়া হৃদয় হইতে কর্ম্মচেষ্টার খোলস ঝাড়িয়া দিয়া শুধু কবির অনুভূতি, শুধু তাঁরি ভালোবাসা এবং ভালো-লাগার দিক হইতে জীবনকে এমন সরস গভীরভাবে দেখার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু "পূরবী"তে আমরা সেই পুরোপুরি দার্শনিক কবিকেই আবার পাই এবং আরো বেশী করিয়াই পাই। কাজেই "প্রভাত সঙ্গীত" ও "কড়ি ও কোমলে"র মধ্যে "ছবি ও গানে"র মত, "কথা"ও"নৈবেদ্য"র মধ্যে "ক্ষণিকা"র মত, "বলাকা" ও "পূরবী"র মধ্যে "পলাতকা"কে বিশ্রামের কাব্য বলিয়া ভাবা যায়। তবে "বলাকা," "পলাতকা" ও "পূরবী"র মধ্যে যোগ রহিয়াছে, এইদিকে যে এই তিনটি কাব্যেই জীবন আসিয়া আবার কবির কাব্যে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিয়া বসিয়াছে। "গীতাঞ্জলি"র যুগের কাব্য-সাধনার মূল সুরটি ফুটিয়াছে "গীতাঞ্জলি"র এই গানে—

কাছের পানে তাকিয়ে আমার দিনতো গেছে কেটে,
এবার যেন সন্ধ্যাবেলায় কাছের ক্ষুধা মেটে—
এতকাল যে রইলে দূরে
তোমারি হোক্ জয়।

কিন্তু এখন জীবনের নব আবির্ভাবের যুগে "প্রবাহিনী"র একটি কবিতায় কবি বলিতেছেন—

ফুরায়নি ভাই কাছের সুধা,
নাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা;
এই যে এ-সব ছোটো-খাটো পাইনি এদের কূল-কিনারা,
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজো আমার হয়নি সারা॥

কবির "নৈবেদ্য" ও "গীতাঞ্জলি"র যুগের আধ্যাত্মিকতার উপর এই জীবনের পরিপূর্ণ বিজয় ঘোষিত হইয়াছে "পূরবী" কাব্যে। "পূরবী"র প্রথম কবিতাতেই আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে এবং উল্টা পিঠে কবির মানবতাকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বৃদ্ধকালের উপর যৌবনের জয়, সন্ন্যাস ও তপস্যার উপর প্রেমের জয়, ঋষির উপর কবির জয়কে অবলম্বন করিয়াই "তপোভঙ্গ" নামক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। "বিশ্ব জ্বলিছে নিবিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি, কখনো বা ভাবময় কখনো মূরতি।" কবির কাব্য ও জীবন সেই বিশ্বছন্দে বাঁধা। তাহাতে জোয়ার ভাটা, দিন ও রাত্রি, Secred হইতে Secular এবং Secular হইতে Sacredএ আনাগোনা, বাম হাত হইতে ডান হাতে এবং ডান হাত হইতে বাম হাতে যাতায়াতের রহস্য রহিয়াছে, একদিকে তাঁর বিচিত্র, অন্যদিকে এক, একদিকে রহিয়াছে, বর্ণে গন্ধে গানে কবির প্রকাশ, অন্যদিকে বিপুল বিরতির মধ্যে তপস্বীর বিকাশ।

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি।
আমি কবি যুগে যুগে আমি তব তপোবনে।

এই যে মহাকালের তপোভঙ্গের কথা ইহা "গীতাঞ্জলি" যুগের কবির নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার ভঙ্গের কথাই, "পূরবী"র সুন্দরের হাতে আনন্দে তার একান্ত পরাভবের কথাই। "ভাঙামন্দির" ও কবি নিজেই, যার শূন্যতা সুন্দর আসিয়া ভরিয়া দিয়াছে, যার ভিত্তিরন্ধ্রে আনন্দ, যার রূপের শব্দে অসংখ্য জয়ধ্বনি। যার পূজার মঞ্চে এখন শুধু বিহঙ্গেরা কূজন করিতেছে। ভাঙামন্দিরে এখন পূজা হয় না, তা শুধু জীবের আশ্রয় হইয়াই আছে। কিন্তু তাইতো কবির মতে শ্রেষ্ঠ পূজা—

উৎসব-রসে সেইতো পূজন
জীবন-উৎস তীরে।

"কথা ও কাহিনী"র "নিবেদন" এবং "চৈতালীর" একটি চতুর্দ্দশপদী এখানে সকলেরই মনে হইবে। কবির পূর্ব্বমত "গীতাঞ্জলি"র যুগে কতকটা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, এখন তাঁহার কাব্যে ও জীবনে আবার নূতন সাধনার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঋষি, মনীষী, কর্ম্মীর উপর কবির জয় "বকুল বনের পাখী"তেও ঘোষিত হইয়াছে।—

শোনো, শোনো, ওগো বকুল বনের পাখী,
মুক্তির টীকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাবো না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট খসে যাক্ নিঃশেষে,
কর্ম্মের এই বর্ম্ম যাক্ না ফেঁসে,
কীর্ত্তি যাক্ না ঢাকি।

সুন্দরের ধ্যানরত কবি এই দ্বিতীয় যৌবনেরই "আগমনী" গাহিয়াছেন, "সখী"র কাছে আবার "গানের সাজি"টি ভরিয়া আনিয়াছেন। কাজ ভোলাবার জন্য যে বারে বারে কাজের কক্ষকোণে ঘুরে "লীলাসঙ্গিনী"র মধ্যে আবার সেই মানস-সুন্দরীকে ফিরিয়া পাইয়া নব আভরণে মানস প্রতিমা-গুলি সাজাইতে বসিয়াছেন। "যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে-প্রত্যুষ বেলায়" কবিতা-বধূরূপে দেখা দিয়াছিল আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্তাচলের ওপারে তাহাকেই কবি খুঁজিয়া "শেষ অর্ঘ্য" দিতে চলিয়াছেন, যে নারী বিচিত্র বেশে আসিয়া কবির জীবনের অব্যক্ত অখ্যাত আবাসে আলো জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন, অসাড়ের মধ্যে সাড়া জাগাইয়াছেন, নিশ্চল তুষারকে নৃত্য-কলরোলে গলাইয়া দিয়াছেন সেই নারীর চরম "আহ্বানে"র প্রতীক্ষায় এখনো কবি বসিয়া আছেন।—

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরাণে—
চরম আহ্বান?
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণতানে
মোর শেষ গান।

কোথা তুমি, শেষ বার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সঙ্গীতে?
মহা-নিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছো, রমণী,
নীরব নিশীথে?

"বলাকা" ও "পূরবীর" বহু কবিতায় এই নারীকে, এই জীবনদেবীকে আমরা দেখিতে পাই। যে সব কবিতার কথা উপরে ইঙ্গিত করা হইয়াছে সেগুলি ছাড়াও "ক্ষণিকা"য় "খেলায়" "অপরিচিতা"য় এবং আরো কতকগুলি কবিতায় এই জীবনদেবীকে পাই। কিন্তু "আহ্বানে"র মধ্যেই ফুটিয়াছে তার শ্রেষ্ঠরূপ। সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যে জীবনদেবতার ভাব নিয়া যত কবিতা লেখা হইয়াছে তার মধ্যেও এই "আহ্বান"কে শ্রেষ্ঠ বলা চলে। নারীকে এত বড় করিয়া কবিতায় আর কোনো কবি আঁকিয়াছেন কিনা জানি না। এই দ্বিতীয় যৌবনে নারী আবার আসিয়া কবিকে মুগ্ধ করিয়া বসিয়াছেন, কাজেই কবির মধ্যে সুন্দর আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে সে তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু নারীর মোহিনীরূপ যেমন, তার কল্যাণীরূপ তেমনি রহিয়াছে। জীবনদেবীরও দুইরূপ পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি। তার কল্যাণীরূপের কথা "পূরবী"তেও রহিয়াছে।—

তুমি যে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকুতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত-বারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হ'য়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু'বাহু বাড়ালে।

"স্বপ্নে"র মধ্যে বিশ্বদেবতা ও জীবনদেবতা বা লীলা-সঙ্গিনীর যোগ—পূজা ও ভালবাসার যোগই দেখিতে পাই। তাই কবি বলিতেছেন, যে এখানো অচেনা

হয়ত তারে দুঃখ দিনে
অগ্নি-আলোয় পাবে চিনে,
তখন তোমার নিবিড় বেদন নিবেদনের জ্বালবে শিখা।

তারপর শুনি "পদধ্বনি।" কার পদধ্বনি? জীবন দেবতার—না—বিশ্বদেবতার? না, দুইয়েরই? কে বলিবে? চরম "প্রকাশে"র আকাঙ্ক্ষা তো দেখিতে পাই। সেই চরম প্রকাশ হইতে, যেদিন

দুঃখ-সাগর তীরে
লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে
রূপের কোলে পরম অপরূপ।

"শেষে"র মধ্যেও "হে সুন্দর," "হে ভীষণ" বলিয়া যাকে কবি আহ্বান করিতেছেন, অথবা "দোসরে" যেখানে "আমার হলো একার সহিত মিলন একা" বলা হইয়াছে সেখানেও পরমসুন্দর জীবনদেবতা ও পরমমঙ্গল বিশ্বদেবতার ধারণা যে মিলিয়া যায় নাই তাহা কে বলিবে? কে বলিবে যে সুন্দরী কবির আধ্যাত্মিকতাকে আঘাত করিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছে, সেই যে তাকে আবার নব-কলেবরে নব-জন্ম দেয় নাই? কে বলিবে অপূর্ব্ব কবিত্ব ও আধ্যাত্মিকতার নব সমন্বয়ে, জানা ও অজানার সঙ্গমতীর্থে "প্রবাহিণী"র বহুগানে সুন্দর ও মঙ্গল নব রূপ গ্রহণ করে নাই?

সত্যের সঙ্গে সুন্দরের যোগ এই "পূরবী" কাব্যে আরো সুস্পষ্ট, "বলাকা" ও "পূরবী"র যুগ কবির মানস (Intellectual) যুগ। এ যুগকে কবির Decadent যুগ বলিয়া অভিহিত করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। তবে এ যুগের অনেক কবিতায় অনধিকারীর প্রবেশ নিষেধ, সেগুলি সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বল পাকস্থলীর পক্ষে মোটেই লঘুপথ্য নহে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এখানে দার্শনিকতার সহিত কবিত্বের আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। এত বড় সমুচ্চ দার্শনিকতাকে এমন অপূর্ব্ব কবিত্বের রূপ আর কেহ দিয়াছেন কি না জানি না। এখানে কবির সৌন্দর্য্যবোধের হজমশক্তি বা স্বীকরণশক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। "বলাকা", "তাজমহল" "চঞ্চলা" "তপোভঙ্গ", "আহ্বান", "ক্ষণিকা", "লিপি" প্রভৃতিতে সত্য তার স্থূলত্ব পরিহার করিয়া সুন্দরের কবলে পড়িয়া তার রঙে নিজের অন্তর বাহির রাঙিয়া তুলিয়া অপরূপ নবজন্ম লাভ করিয়াছে। সত্য এবং সুন্দর এখানে শ্রেষ্ঠ কবির বাক্ ও অর্থের মত, পার্ব্বতী পরমেশ্বরের মত অঙ্গাঙ্গী হইয়া দেখা দিয়াছে।

সমগ্রতা ও সমন্বয়ের কবি রবীন্দ্রনাথের এই সমন্বয়শক্তির

কথা বলিয়াই আজ আমরা আলোচনা শেষ করিব। তাঁর মধ্যে কিছুই একক অথবা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে নাই। তাঁর প্রত্যেক স্বষ্টির মধ্যেই এই সমগ্রতার দৃষ্টি, এই আশ্চর্য্য সমন্বয়ের শক্তির পরিচয় রহিয়াছে। তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখার প্রয়াস অনেক সময় ব্যর্থ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রাজ্যের একদিকে রহিয়াছে সংঘাত, বেদনা ও দুঃখ, অন্যদিকে প্রশান্তি ও আনন্দ। এক দিকে সংঘাত আছে বলিয়াই তার ভিতর হইতে যে প্রশান্তিকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে তাহা হইয়া উঠিতে পারিয়াছে এমন সুনিবিড়; জীবনের দুঃখ কৃচ্ছ্রতারূপ তপস্যাকে হৃদয়ে বরণ করিবার শক্তি কবির ছিল বলিয়াই তার উপর প্রতিষ্ঠিত আনন্দ হইয়া উঠিয়াছে এত সুগভীর ও মূল্যবান। এই দুইটা দিককে বিযুক্ত করিয়া দেখাতেই আজ কাল কাহারো কাহারো মুখে একদিকে এই মিথ্যা অভিযোগ শোনা যায় যে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ-বাদী, তিনি পাশ্চাত্য দুঃখবাদ এ দেশে আমদানী করিয়াছেন, যেন প্রাচ্য জীবনে দুঃখ, কৃচ্ছ্রতা, সংগ্রাম এবং তপস্যা কোনো দিন ছিল না; আবার অন্যদিকে শোনা যায় তিনি ভাববিলাসী। এই অভিযোগ দুইটি পরস্পরবিরোধী। যিনি ভাববিলাসী তিনি দুঃখবাদী হইতে পারেন না, যিনি দুঃখবাদী তিনি ভাববিলাসী হইতে পারেন না। এ যেন একই জিনিষকে সাদা এবং কালো বলার মতন। কোনোটাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সত্য দৃষ্টি নয়। বিধাতার বিশ্বস্বষ্টির বাহিরের দিকে আনন্দের প্রকাশ। কিন্তু ভিতরের দিকে রহিয়াছে সংযম ও নিষ্ঠা; বাহিরে আবেগ, উচ্ছ্বাস ও কলরব; ভিতরে সংকল্পের দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যের কঠোরতা ও নির্জ্জনতার সাধনা; বিশ্বস্বষ্টির উপর তলায় ফুলের কোমলতা ও পল্লবের শ্যামলতা, কিন্তু তার নীচ তলায় তরুকাণ্ডের কাঠিন্য, মৃত্তিকার দৃঢ়বন্ধন। এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ এবং বিচ্ছেদ রেখা টানিয়া দেওয়া অসম্ভব। শ্রেষ্ঠ কবির দৃষ্টিতেও তাই। সমালোচক Saintsbury কবি Dante সম্বন্ধে আলোচনায় বলিয়াছেন—একদিকে তার উদ্দাম কল্পনার সঙ্গে অন্য দিকে যুক্ত রহিয়াছে গণিতবিদের অঙ্ক গণনা। রবীন্দ্রনাথের স্বষ্টির নীচতলায়ও রহিয়াছে এই সংযম ও নিষ্ঠা, এই কর্ত্তব্যের কাঠিন্য, এই সত্য ও মঙ্গলের ধ্রুবত্ব; আর উপর তলায় ফুটিয়াছে তার আনন্দরূপ, তার সৌন্দর্য্যরূপ, ভিতরই বাহিরকে সুবলয়িত সুসমঞ্জস করিয়া তুলিয়াছে; ভিতরে কাঠিন্যের ভিত্তিই বাহিরে দিয়া দিয়াছে এমন অপরূপ রূপের আধার, বর্ণে গন্ধে গানে এমন বহু-ভঙ্গিমরুচির বৈচিত্র্য। এই দুইয়ের যোগেই রবীন্দ্র-নাথের স্বষ্টি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। এই দুইকে যুক্ত করিয়া দেখাই তাঁর সম্বন্ধে সত্য দেখা।

(সমাপ্ত)

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

লঘু মেঘ

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

পীতাম্বরের পিতা কি ভাবিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, পীতাম্বর এম, এ পাশ না করাতক পুত্রবধূকে এ বাড়ীতে আনিবেন না, বা পীতাম্বরকে শ্বশুর গৃহে যাইতে দিবেন না— অর্থাৎ সে ছয় বৎসরের ব্যাপার, পীতাম্বর তখন ফার্ষ্ট আর্ট পড়িত মাত্র। কথাটা যে গেলো নয় তা' প্রমাণ করার জন্য বিশেষ করিয়া বৈবাহিক মহাশয়কে ইহা জানাইয়া লিখিয়া দিলেন যেন তাঁহারা ইহা কথার কথা মনে করিয়া পীতাম্বরের কচি মনকে প্রলুব্ধ না করেন। পিতা হইয়া পুত্রের প্রতি এই নিষ্করুণ নির্দ্দয় ব্যবহার, ইহা পীতাম্বরের মঙ্গলের জন্যই করিতেছেন—তাহাকে মানুষের মতো মানুষ হইতে হইবে! পিতা হইয়া তিনি যদি পুত্রের অতৃপ্ত ম্লান মুখ দেখিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা দূর হইতে এই সামান্য কষ্টটুকু অবশ্যই সহ্য করিতে পারিবেন।

আদেশটী সামান্য হইলেও কন্যার পিতামাতার পক্ষে কত খানি দুর্ব্বহ ও বিপজ্জনক তাহা পীতাম্বরের শ্বশুর ও শাশুড়ী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেও অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বৈবাহিক মহাশয়কে লিখিয়া দিলেন যে তাঁহার এই আদেশ শিরোধার্য্য......এবং এ পর্য্যন্ত এ আদেশ তাঁহারা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

আজ সেই প্রতিজ্ঞা-উদ্‌যাপনের দিন। পীতাম্বর শেষ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিযাছে। পীতাম্বরের পিতা রূঢ় ও নীতিপরায়ণ হইলেও হৃদয়হীন নন। পুত্রের বাড়ী পৌছার কথা জানাইয়া অদ্যই রাত্রির ট্রেনে সে যে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর পদবন্দনা করিতে যাইতেছে তাহা টেলিগ্রাম করিয়া বৈবাহিক মহাশয়কে তিনি জানাইয়া দিয়াছেন।

পীতাম্বরের আনন্দের সীমা নাই—না থাকিবারই কথা। সারা শীতকাল যদি মৃতের মতো পড়িয়া থাকিয়া অকস্মাৎ-কোকিল কূজিত গীতি-উদ্‌ভ্রান্ত আনন্দ-ঝলমল বসন্ত প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গে, তাহা হইলে কাহার না আনন্দ হয়?

পীতাম্বরের দোষ কি?

কিন্তু এই আনন্দের পাশ দিয়া এই অচিন পথের অপরিচিত যাত্রার কথায় তাহার তরুণ মন হর্ষ-বেদনায় আপ্লুত—হইয়া উঠিতেছিল। ছয় বছর হইল বিবাহ হইয়াছে—অথচ দেখা ঐ একবার মাত্র! ভাগ্য বিড়ম্বনায় পিতার আদেশে বিবাহের পরদিনই তাহাকে পাঠ্যক্ষেত্রে যাইতে হইয়াছিল। ......বধূর একবার-দেখা সেই মুখখানি যেন ঘুম ভাঙ্গার পর স্বপ্নের অস্পষ্ট মায়া মধুর স্মৃতির একটু রেশ—মনে পড়ে, পড়েও না! শুধু বুকের তলায় কে যেন নূপুর বাজাইয়া শিহরণ তুলিয়া বুকখানা সুখে ভরিয়া দিয়া অহরহঃ আনাগোনা করে—পীতাম্বর ধরিতে পারে না। জোর করিয়া মনের মধ্যে সে মূর্ত্তিখানি গড়িতে গেলে অরুণোদয়ে হাস্‌নাহানার গন্ধের মতোই কোথায় যেন তাহার ক্ষীণ স্মৃতিটুকুও মিলাইয়া যায়।

শুভ দৃষ্টি—তা' হইয়াছিল বৈ কি? কিন্তু এত লোকের কৌতূহল দৃষ্টির সামনে সে কেমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া চাহিবে? শুধু তাহার তৃসিত চাহনি, প্রিয়ার দীর্ঘায়ত স্নিগ্ধ কালো চোখ দুইটীর মধুর স্মৃতি বুকে করিয়া আজও হাহাকার করিতেছে।

পীতাম্বর সেই মুখখানি কল্পনাও করিতে পারে না......

ভয় হয়, যদি এমন হয়...সাত বোন এক সাথে আসিয়া কৌতুক করিয়া বলে, বেছে নাও তোমার কোনটী,—পীতাম্বরের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠে, চোখে ব্যাকুল ভাব জাগে—বুকের ভিতর অসহায় দিশেহারা চিন্তা নিস্ফল দীর্ঘশ্বাস ফেলে!

রাগ হয়.....পিতার সৃষ্টিছাড়া প্রতিজ্ঞাই যতো অনিষ্টের মূল। যদি এমনই হয়.........তখন?

পীতাম্বর ভাবিয়া পায় না!

একবার ভাবিল মুস্কিলটা মাকে বলিয়াই ফেলে। কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করে। আবার ভাবে শরীর অসুস্থ বলিয়া পড়িয়া থাকে। পিতা যাইয়া লইয়া আসুক··· কিন্তু মনঃপূত হয় না। সেই ক্ষণদেখা পটভূমির কত আনন্দ-দৃশ্য কল্পনার রঙীন আলোকে তাহার ক্ষুধিত মনের উপর মায়াময় মধুর পরশ বুলাইয়া দিয়া যায়—শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে!

পীতাম্বর উদ্‌ভ্রান্তের মতো চাঁদের আলোভরা নির্ম্মল আকাশের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহে—যদি সেইখানে তাহার স্বপ্নপুরী জয়ের কোন কৌশল চাঁদের দেশের কেহ ভুলিয়া লিখিয়া রাখিয়া যায়।

সাড়ে দশটার গাড়ী। পীতাম্বরকে সত্যই তাহাতে উঠিয়া বসিতে হইল। বাড়ীর কাছেই ষ্টেশন—পীতাম্বরের পিতা নিজে আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া দিয়া গেলেন।·········সেকেণ্ড ক্লাশের নির্জ্জন কামরায় পড়িয়া থাকিয়া পীতাম্বর সীমাহীন চিন্তায় তলাইয়া গেল।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ কেমন হইবে? কথাটা খুবই সহজ অথচ তাহার পক্ষে একান্তই মর্ম্মান্তিক। যেমন সকলের জীবনে হয় যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে আজ এই পুঞ্জীভূত চিন্তায় তাহার আনন্দময় জীবন বিড়ম্বিতই বা হইবে কেন? সে তো আর অপ্রাপ্তবয়স্কা পুষ্পকলিসমা বধূ সম্ভাষণে যাইতেছে না—সে যে নব বসন্তে উদ্‌ভ্রান্ত-যৌবন প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের সুষমা বিজড়িতা পরিণতবয়স্কা স্ত্রী সম্ভাষণে চলিয়াছে······অথচ, হয়তো কেহ কাহাকে চিনেও না!—বিপদ যে তাহার ঐ খানেই!

পীতাম্বর দিশাহারা হইয়া পড়িল। বাঙ্গলার ভাল ভাল উপন্যাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠা তাহার চোখের সামনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু কৈ—এমন করিয়া কোন নায়ক নায়িকাকে কেহ মিলায় নাই তো! তাহার রাগ হইল। এমন কি উপন্যাসসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপরও তাহার অনুযোগের সীমা রহিল না—তিনি এত করিয়াছেন, ইন্দিরার জন্য বুড়া বয়সে এত রস ঢালিলেন, আর এমন করিয়া কিছু লিখিতে পারিলেন না?

নিরুপায় পীতাম্বর পরম অস্বস্তি লইয়া ভোরে আমখালি ষ্টেশনে পৌছাইতেই কেমন চমকাইয়া তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল—মনে হইল কেমন করিয়া সারা রাত্রিটা কাটিয়া গিয়া ট্রেণটা আসিয়া ঠিক যায়গায় পৌছাইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য!

দরজা খুলিতেই পিতাম্বর থ হইয়া গেল। শ্বশুর শ্যালককেই যেন ষ্টেশন ভরিয়া গিয়াছে!

বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয় তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন, এমন করেই কি ভুলে থাকতে হয় বাবা?

কি মধুর স্বর! পীতাম্বরের সমস্ত চিত্ত যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

শ্যালকদিগকে প্রণাম করিতে গিয়া সে এক হাস্যকর ব্যাপার করিয়া তুলিল। ঠাহর করিয়া দেখিল সবাই মাথায় তাহার উঁচু—তাই একদিক হইতে সকলকে প্রণাম করিতে গিয়া...কি কলরোল! পীতাম্বর অপ্রস্তুত হইয়া মুখ তুলিতেই পীতাম্বরের শ্বশুর স্মিত-হাস্যে কহিলেন, ছ'বছর—তোমাদের অনেককেই তো প্রায় দেখেনি...

অচিন পথের অভিজ্ঞতাতেই পীতাম্বর দমিয়া গেল। ভিতরের প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা ভয়ে এইবার সত্যই শিহরিয়া উঠিল।

ঠিক যেন বিয়ের বাড়ী! ..

পীতাম্বর শাশুড়ীকে প্রণাম করিতেই তিনি প্রাণ ঢালিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার সুমধুর স্বরে পীতাম্বরের মাতৃ-স্নেহ বঞ্চিত শুষ্ক বুক আজ যেন বহুদিন পরে মা'র অনুপম স্নেহ-ধারায় সজল হইয়া উঠিল।

পাশ হইতে এক তরুণী স্মিতহাস্যে কহিল, কৈ, আমাদের প্রণাম করলে না?

পীতাম্বর ফিরিয়া দেখিল—মনে মনে এতক্ষণ যে আশঙ্কা করিতেছিল ঠিক তাই! সাতটী বোনই উপস্থিত—সাতটী রঙীন প্রজাপতির মতো আনন্দে ঝলমল্ করিতেছে।

পীতাম্বরের বিবাহ হইয়াছিল চতুর্থার সহিত। কিন্তু ঠাহর করিয়া কিছুতেই বুঝিতে পারিল না কোনটী সে! সবগুলি প্রায় একই রূপ! পীতাম্বর আরক্ত হইয়া উঠিল। একটু থামিয়া আগাইয়া যাইতেই সকলেই প্রণাম লইবার জন্য ভিড় করিয়া আগাইয়া আসিল।

পীতাম্বর প্রমাদ গণিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতে সকলেই

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পীতাম্বর ফিরিয়া দেখিল শাশুড়ী ঠাকুরাণীও কখন চলিয়া গিয়াছেন। সে হতাশ হইয়া পাশের চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

পীতাম্বর সহসা তৃতীয়টীকে চারুদিদি বলিয়া চিনিতে পারিল। মনে একটু ভরসা হইল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, চারুদি, এ বিপদে আপনি .....

চারু আগাইয়া আসিতেই পীতাম্বর প্রণাম করিয়া কহিল, দোহাই চারুদি'···

চারু হাসিয়া কহিল, আমি কি কর্‌বো?···ওরাই বা শুন্‌বে কেন? ছ'বচর আসোনি, তার সাজাটা···

পীতাম্বর হাসিয়া কহিল, একশ'বার নিতে রাজি আছি, যদি বিচার ক'রে দেন। কিন্তু অপরাধ তো আমার নয়···

তা' ওরা মানে না। তোমার আসা উচিত ছিল—বোন্‌টী যা' কষ্ট পেয়েছে! তা' ছাড়া ও প্রতিজ্ঞা ক'রেছে বউ চিনে নিতে পারো ভালই, নইলে···

পীতাম্বর মনে মনে সুনিশ্চিত হইল, এই সপ্তরথী চক্রব্যূহে অভিমন্যুর মতো তাহার ভাগ্যে মৃত্যু না ঘটিলেও, কৌতুক লাঞ্ছনা কম হইবে না।

চারু আর একবার হাসিয়া কহিল, যদি এর মধ্য থেকে বৌকে বেছে নিতে পার ভাল—নইলে কেউ পরিচয় দেবে না। চারু চলিয়া গেল।

সকলে আর একবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

আহারান্তে নির্জ্জন ঘরে বসিয়া পীতাম্বর আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল—এতো বিড়ম্বনাও ভাগ্যে ঘটে! কোথায় নব বধূ লইয়া আনন্দসাগরে হাবুডুবু খাইবে, তা নয়······সমস্ত শ্যালিকাবৃন্দের উপর সে চটিয়া গেল।

আর সরোজই বা কেমন? সেই বা কোন আক্কেলে স্বামীর সঙ্গে এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যঙ্গ কৌতুক করে? লজ্জা করে না? স্বামীর প্রণাম লইবার জন্য আসে···ইহারাই আবার স্বামী ভক্তির দাবী করিয়া সীতা সাবিত্রীর সহিত নিজেদের তুলনা করিয়া গগন পবন বিদারণ করে?···কিন্তু, তা'রই বা ঠিক কি? সে যদি এ রঙ্গ কৌতুকে অবতীর্ণ না হইয়াই থাকে? যদি আর কাহাকেও তাহার স্থলে দাঁড় করানো হয়? ...পীতাম্বরের মেঘাচ্ছন্ন মুখ ধীরে ধীরে প্রসন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল।

চারু ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, তোমার পান জল রইল ভাই।

পীতাম্বর উঠিয়া বসিয়া হাসিয়া কহিল, তা' থাক্‌—কিন্তু সরোজ কি গুপ্তই রইবে না কি দিদি?

চারু মৃদু হাসিয়া কহিল, ঐ তো বল্‌লেম—চিনে নিতে পার নাও, নইলে...

পীতাম্বরের মাথায় চট্‌ করিয়া দুষ্টু বুদ্ধি জাগিয়া গেল। হাসিয়া কহিল, ডাকুন তাদের...

চারু অনতিবিলম্বে সকলকে লইয়া আসিল। পীতাম্বর চাহিয়া কৌতুকোজ্জ্বল কণ্ঠে কহিল, চারু দিদি, আপনি বাদ এই ছ'জন—এরই মধ্যে সরোজ আছেই। এই তো আপনাদের কথা? আমায় বেছে নিতে হ'বে—ছ'বছর দেখিনি, সেই বিয়ের রাতের স্বপ্ন দেখার মতো দেখা ছাড়া! কিছুই মনে নেই, একটা আবছায়া স্মৃতি—রূপবিহীন! সকলের কাছেই বলেছি, মিনতি জানিয়েছি—আপনারা তা' শোনেন নি। বেশ, সরোজকে বেছেই নেবো! কিন্তু একটা কথা—যাকে সরোজ বলে বেছে নেবো, সে আমার হ'বে তো?

কে একজন কোকিলকণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ গো, মশাই, হ্যাঁ—যদি তোমার মুরোদ থাকে...

পীতাম্বর হাসিল, কহিল, ঠিক্‌ তো?

আর একজন বিদ্রূপ করিয়া কহিল, ভেলা বোকারাম জামাই বাপু!—নিজের পরিবারকে চেনে না!

পীতাম্বর উঠিয়া এক এক করিয়া দেখিয়া শেষের একটীকে বাদ দিয়া দ্বিতীয়াটীকে কহিল, তুমিই সরোজ, এসো!

সে হাসিয়া বিদ্যুৎ বিকীর্ণ করিয়া কহিল, বাঃ, আমি অমনি যাব কেন? আপনার সরোজই যদি—হাত ধ'রে নিয়ে যান্‌ না?

কেন, অমনি আস্‌তে...

সে চোখ ঘুরাইয়া কহিল, কেন, পরিবারের হাত ধরা যায় না নাকি সন্ন্যাসী ঠাকুর?

পীতাম্বর হতাশ হইয়া ধপ্‌ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কহিল, মাপ্‌ করবেন চারুদি, আমার সরোজে দরকার নেই।

উঃ, সে কি হাসি—কি বিদ্রূপ—কি অভাবনীয় কৌতুক ব্যঙ্গ! বেচারা পীতাম্বর মৃত্যু কামনা করিল।

কিন্তু পীতাম্বরের বিক্ষুব্ধ মন ক্রমশঃই বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই অসহনীয় অভদ্র কৌতুকভরা ব্যঙ্গ সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না···তাহার বিরহকাতর মন তখন স্বপ্নে ভরপুর! কোথায় অনাস্বাদিত পুলকধারায় স্নাত হইয়া নূতন জগতের অপরূপ বর্ণে নিজকে রঞ্জিত করিবে—প্রিয়ার

বাহুবদ্ধ হইয়া জাগরণের মধ্যেই তন্দ্রাতুরের ন্যায় অবশ আচ্ছন্ন দেহে প্রিয়ার কোমল অঙ্কে মিশিয়া যাইবে... তা' নয়...

পীতাম্বর ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল এই অভদ্র প্রগল্‌ভতার একটা উপযুক্ত শিক্ষা দিতেই হইবে।

দেওয়ালের কড়ির দিকে চোখ পড়িতেই দেখিল তখন চারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। পাঁচটার গাড়ীর মাত্র আর পনর মিনিট বাকি।

সে আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া পিছনের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল এবং আশে পাশে কাহাকেও না দেখিয়া একেবারে সড়ক ধরিয়া ষ্টেশনের দিকে দ্রুত চলিতে লাগিল।

ষ্টেশনেও পৌঁছিল, গাড়ীও আসিয়া দাঁড়াইল। পীতাম্বর কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া একখানা খালি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বসিল। অকস্মাৎ তাহার মুখ হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, দেখা যাক্, সরোজকে চেনা যায় কিনা? বাড়ী ব'য়ে গিয়ে চিনিয়ে আসতে হ'বে না? এবং বোধ করি তাহার আত্মপ্রসাদ একটু বেশীই হইয়াছিল, কেন না শেষের দিকটা সে প্রায় উচ্চ কণ্ঠেই বলিয়া ফেলিয়াছিল।

খট্ করিয়া দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিতেই পীতাম্বর বিস্মিত হইল। এক ষোড়শী তরুণী তাহারই গাড়ীতে উঠিয়া প্রায় তাহার সামনের বেঞ্চেই বসিয়া পড়িয়াছে।

পীতাম্বর কয়েক মিনিট চুপ করিয়া আড়নেত্রে ইহার দিকে চাহিতেই দেখিল, তরুণীটিও তাহার দিকেই চাহিয়া আছে। পীতাম্বর একটু লজ্জিত হইল, অগোচরে তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কৌতূহল সীমাহীন হইয়া উঠিল। অবশেষে এক সময় সে সসম্ভ্রমে কহিল, আপনি কোথায় যাবেন, জিজ্ঞেস্ করতে পারি কি?

তরুণী হাসিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল, বিলক্ষণ! সে তো আপনিই জানেন!

পীতাম্বর অবাক হইল।...সেই জানে?...

তরুণী হাসিতে লাগিল।

পীতাম্বর মনে করিল, বোধ হয় তরুণী প্রশ্নটা ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই। তাই বিনীত কণ্ঠে কহিল, আপনার গন্তব্য স্থানটীর কথাই...

তেমনি বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া তরুণী কহিল, তাই তো বল্‌ছি আমিও! আপনি কোথায় নিয়ে যাবেন আমি কি ক'রে জানবো? আপনি যদি দিল্লী নিয়ে যান, তো আমি কি বল্‌বো যাব শিলং?...

পীতাম্বর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মনে হইল আরব্যোপন্যাসে বর্ণিত সেই একটি রমণী তাহার আশ্চর্য্য যাদুমন্ত্র লইয়া তাহার চোখের সামনে আজ যেন আবার নূতন করিয়া নামিয়া আসিয়াছে। এ যেন সেই রহস্যময়ী নারী!—না জানি কল্পলোকের স্বপ্নলোকের অজানা অশোনা কত আশ্চর্য্য কথাই শোনাইয়া তাহাকে উন্মাদ করিয়া দেয়! কিন্তু তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও ফুটিল না। ভিতরে কি একটা বিপুল উত্তেজনা ঠেলিয়া প্রায় ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া, বাধিয়া, সমস্ত মুখখানি শুধু বলিতে না পারার গভীর লজ্জাতেই যেন লাল হইয়া রহিল।

তরুণী মুখে রুমাল চাপিয়া ফাটিয়া পড়িল।

ইহার হাস্য-কলরোলে চমকিত হইয়া তরুণীর মুখের দিকে চাহিতেই, সহসা পীতাম্বরের বুকের তলে অস্পষ্ট কোন স্মৃতি দুলিয়া উঠিল। এবং তাহাই ভেদ করিয়া ততোধিক অস্পষ্ট একখানি কিশোরীর মুখ, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্মুখে উপবিষ্টা নারীর হাস্যোজ্জ্বল মুখের উপরেই নিজের ছায়া ফেলিয়া আর একটু উজ্জ্বল হইয়া স্থির হইয়া রহিল। পীতাম্বরের চোখ, মুখ, কান, গরম হইয়া সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সন্দিগ্ধব্যাকুল দৃষ্টিতে তরুণীর মুখের দিকে আর একবার চাহিতেই, তাহার চোখের সামনের ঘন কাল পরদাটা যেন অকস্মাৎ শরতের লঘু মেঘের মতোই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। পীতাম্বর আনন্দে দিশাহারা হইয়া পড়িল। ষ্টেশনের জনতা প্রভৃতি কিছুই তাহার মনে পড়িল না। উন্মাদের মতো তরুণীকে নিকটে টানিয়া লইয়া বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, আঃ—তু—তুমি—সরোজ...

আঃ—ছাড়ো—ছাড়ো, বাবা যে...

পীতাম্বর সরোজকে ছাড়িয়া দিয়া ধপাস্ করিয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া উত্তেজনায় ঘামিতে লাগিল।

বৃদ্ধ ক্ষিতীশ বাবু সশব্দে গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া একবার কন্যার, একবার জামাতার মুখের দিকে চাহিয়া বিমূঢ়ের ন্যায় কহিলেন, একি, তোমরা পাগল নাকি। এই সকালে এসে, বলা নেই কওয়া নেই—অ্যাঁ...

পীতাম্বর মাথা নীচু করিয়া কোন প্রকারে উচ্চারণ করিল, আজ্ঞে...

আরে আজ্ঞে,—সে তো বুঝি! এদিকে যে ট্রেণ...ওরে, ও রামটহাল—উতারো...সব উতারো...এই জল্‌দি। নামো, নামো সরোজ,...আঃ, পীতাম্বর, আর দেরী করো না...কি যে বাপু সব হ'য়েছো তোমরা আজ কাল...এই রামটহাল...

শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র সাহা

জর্জ্জ টমাস্

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, পি-আর-এস্

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

হরিয়ানা প্রদেশ অধিকারে টমাসকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই তিনি তথায় আত্ম-প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি হান্সিতে নিজ রাজ-পাট স্থাপন করিলেন। "সহরটী দীর্ঘকাল যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল বলিয়া প্রথমটায় আমাকে অধিবাসী সংগ্রহে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে নানাবিধ উপায়ে আমি প্রায় পাঁচ ছয় হাজার লোক সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং উহাদিগকে হান্সিতে বসাইবার জন্য অনেক প্রকার সুখ সুবিধা দিয়াছিলাম। আমি টাকশাল স্থাপন করিয়া স্বীয় মুদ্রা প্রস্তুত করিলাম; সৈন্যদলে এবং রাজ্যে তাহাই প্রচলিত হইল। ঝাঝারে প্রথম প্রতিষ্ঠা হইতেই আমার স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে কারণ আমি সর্ব্বপ্রকারের শিল্পী ও কারিকর নিযুক্ত করিলাম। একমাত্র নিজ বাহুবলে যে আমার পক্ষে স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নহে তাহা আমি জানিতাম। সে জন্য আমি সৈন্যবল বাড়াইলাম, নূতন তোপ ঢালাই এবং গুলি বারুদ বন্দুক নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলাম;—সংক্ষেপে বলিতে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ এই দুইয়েরই জন্য আমি সাধ্যমত প্রস্তুত হইয়াছিলাম। এইরূপে শিখ-জনপদের এক প্রান্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমি সুযোগ উপস্থিত হইলে পঞ্চনদপ্রদেশ জয় এবং আটক তীরে বৃটিশ পতাকা উত্তোলনরূপ সম্মানের অধিকারী হইতে পারার মত অবস্থায় আপনাকে স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলাম।" শাসনকার্য্যের অঙ্গীভূত সকল বিধিব্যবস্থা টমাস একে একে নিজ রাজ্যে প্রবর্ত্তন করিলেন। আইন প্রণয়ন ও আদালত প্রতিষ্ঠা, রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা দ্বারা তিনি নিজ দুর্দ্দান্ত অশান্ত প্রকৃতিপুঞ্জকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্য হইতে তিনি সৈন্য সংগ্রহও আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাঁহার দলে খুব বেশী লোক ছিল না। তিন রেজিমেণ্ট পদাতিক, ১৪টী কামান এবং তাঁহার দেহরক্ষী পাঠান অশ্বারোহীদল ইহাই ছিল তাঁহার সম্বল। টমাস তাঁহার সৈনিকগণের জন্য পেন্সন ও ভাতা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যুদ্ধে যাহারা আহত হইত তাহাদিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নিহতদিগের পরিজনবর্গকে তাহারা যে বেতন পাইত তাহার অর্দ্ধেক অংশ ভাতা হিসাবে প্রদত্ত হইত। তজ্জন্য টমাস বার্ষিক অর্দ্ধ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সমগ্র রাজস্বের দশমাংশ পৃথকভাবে রাখিতেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক আধুনিক সভ্য রাষ্ট্রের আদর্শস্থানীয় ছিলেন।

এই সকল কার্য্য করিতে টমাসের সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন তিনি আবার অর্থলাভে সচেষ্ট হইলেন। তাহার অতি সহজ উপায় হাতেই ছিল। এ পর্য্যন্ত জয়পুর রাজ্য তাঁহার প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল। পূর্ব্বের মত আবার তিনি জয়পুরে একটি "Excursion"এর আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় এই সময়ে মারাঠা দরবার জয়পুরাধিপতি তাঁহার দেয় রাজকর প্রদান না করায় বামনরাওকে তাঁহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কর আদায়ের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। সংগৃহীত অর্থের দশ আনা তিনি মুনাফা পাইবেন স্থির হইয়াছিল। ঐ কার্য্যে একা যাইতে বামনরাওয়ের ভরসা না হওয়ায় তিনি টমাসকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ঐ ধরণের আহ্বানে ঔদাসীন্য প্রকাশ টমাসের, শুধু তাঁহার কেন, সে যুগের প্রথাবিরুদ্ধ ছিল। বামনরাও প্রদত্ত যাত্রার উপযোগী অর্থে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিজ সমগ্র বাহিনী, সংখ্যায় প্রায় দুই সহস্র হইবে, লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। বামনরাও নিজ ৪০০০ সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এবার আর টমাস তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারী নহেন, এখন তিনি বামনরাওয়ের স্বাধীন সমকক্ষ মিত্র। এইরূপে মুষ্টিমেয়

অনুচর লইয়া তাঁহারা অর্দ্ধ লক্ষ সৈন্যাধিপতি প্রতাপসিংহের রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রায় একমাস কাল ধরিয়া মহোৎসাহে পথিমধ্যে যে সকল গ্রাম ও জনপদ পড়িল তথা হইতে অর্থদণ্ড আদায় করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে ক্রমেই তাঁহারা নিজেদের দেশ হইতে দূরে শত্রুরাজ্যের অভ্যন্তরে গিয়া পড়িলেন। হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল যে ৪০০০০ সৈন্য লইয়া প্রতাপসিংহ তাঁহাদের শাস্তিবিধানে অগ্রসর হইয়াছেন। বামনরাওয়ের আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ পলায়নে ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু টমাস সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহারা তখন যেখানে অবস্থিত ছিলেন সেস্থানটি প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার উপযোগী নহে দেখিয়া তিনি কিছু দূরে অবস্থিত ফতেপুর নগর অধিকারে সচেষ্ট হইলেন। স্থানটী সুদৃঢ় ও বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া সেখানে আত্মরক্ষার আয়োজন ও আহার্য্য লাভ দুই কার্য্যই সম্ভব ছিল। তাঁহার আগমনসংবাদে অধিবাসীরা পথিমধ্যে অবস্থিত কূপ-গুলি বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। টমাস সে কথা জানিতেন না, যখন জানিলেন তখন আর সে পথে ফেরা চলে না। মরু-ভূমির ভিতর দিয়া যাইবার সময় জলাভাবে তাঁহাদের বড় কষ্ট হইয়াছিল। শেষদিনে একাদিক্রমে ২৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত সৈনিকগণ নগর সমীপে আসিয়া দেখিল প্রাকারের বাহিরে অবস্থিত একটী কূপ রাজপুতসেনা তখন বিধ্বস্ত করিতেছে। ক্ষুৎপিপাসা-কাতর সৈন্যদের কিছু বলিতে হইল না। অদম্য তৃষ্ণার বেগেই তাহারা প্রচণ্ড আক্রমণে শত্রুপক্ষকে বিতাড়িত করিয়া কূপ অধিকার করিল। সে রাত্রির মত টমাস সৈন্যগণকে বিশ্রামের অবকাশ দিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে নগরাধিকার করিয়া তিনি আত্মরক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজপুতনার এই অঞ্চলে বাবুল নামক এক প্রকার বন্য কাঁটা গাছ ভিন্ন অপর কোন বড় গাছ জন্মে না। টমাস রাশি রাশি বাবুল গাছ কাটিয়া শিবিরের সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্টভাবে বেড়া দিলেন; যাহাতে সেগুলি সহজে স্থান ভ্রষ্ট না হইয়া পড়ে সেজন্য মধ্যে মধ্যে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। পশ্চাতে নগর মধ্যেও তিনি একদল সৈন্য রাখিলেন। ইতোমধ্যে কয়েকটি কূপ পরিষ্কার করায় জলাভাব বিদূরিত হইয়াছিল। সকল আয়োজন সমাধা হইবার পূর্ব্বে জয়পুরী সৈন্য আসিয়া দেখা দিল। প্রথম দুই দিন বিশেষ কিছু ঘটিল না। তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে রাজপুতেরা আক্রমণে অগ্রসর হইল;—তাহাদের দক্ষিণপ্রান্ত বিপক্ষের শিবির, বাম প্রান্ত ফতেপুর নগর এবং কেন্দ্রদেশ টমাসকে আক্রমণ করিবে স্থির হইল। শেষোক্ত দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন স্বয়ং জয়পুরী প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা রোরাজী ঘাবিস। শত্রুসেনাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়াই বামনরাওয়ের বার্গীদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ মহাভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। সুতরাং টমাসের সৈন্য-দলের উপরই যুদ্ধের সকল ভার পড়িল। তিনি নিজ মুষ্টিমেয় অনুচরগণসহ একটি বালিয়াড়ির উপরে অবস্থিত ছিলেন। স্থানটী প্রকৃতই আত্মরক্ষার উপযোগী ছিল। শত্রুসেনার পক্ষে নিজেদের পশ্চাদ্ভাগ বিপন্ন না করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর তিনি যে তাহাদের সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইলেন শুধু তাহা নহে, পরন্তু নগর মধ্যে রক্ষিত তাঁহার সৈন্যদলের সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। উহারা এতক্ষণ প্রবল শত্রুসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে টমাসকে আসিতে দেখিয়া মহোৎসাহে নগর হইতে বাহির হইয়া জয়পুরীদের আক্রমণ করিল। এইরূপে যুগপৎ সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় প্রান্ত হইতে আক্রান্ত হইয়া রাজপুতগণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। স্থিরলক্ষ্য শিক্ষিত পদাতিকদলের অব্যর্থ গুলি-বৃষ্টি ও সঙ্গীণের আঘাতে তাহাদের অশ্বারোহীগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কেন্দ্রদেশ ইতিপূর্ব্বেই বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, বাম প্রান্তেরও এবার অনুরূপ অবস্থা ঘটিল, কিছু পরে দক্ষিণ প্রান্তেরও অদৃষ্টে সেই দশা উপস্থিত হইল। তখন সমগ্র রাজপুত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নে তৎপর হইল। রোরাজী বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে ফিরাইতে পারিলেন না। এইরূপে টমাস দুই হাজারেরও কম সৈন্য লইয়া ৪০০০০ শত্রুসেনাকে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার সাহস ও বীরত্ব, উদ্যম, কর্ম্মদক্ষতা এবং সেনাপতিত্বের সত্যই প্রশংসা করিতে হয়। যুদ্ধে তাঁহার সর্ব্বসমেত ৩০০ লোক ক্ষয় হইয়াছিল। জন মরিস নামক জনৈক ইংরাজ সৈনিক

আহত হইয়াছিলেন। রাজপুত পক্ষে দুই হাজারেরও অধিক ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের বহু কামান, অশ্ব ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য টমাসের হস্তগত হইল। *

পরদিন সকালে টমাস রোরাজীকে জানাইলেন যে যদি তাঁহারা আহতদিগকে অপসারিত এবং মৃতদেহ সমূহ সংকার করিতে চাহেন তবে অনায়াসে সে কার্য্য করিতে পারেন; তিনি তাহাতে কোন বাধা দিবেন না। তাঁহার এ উদারতায় রাজপুতরা বড় প্রীত হইল। রোরাজী তাঁহার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। যতক্ষণ যুদ্ধ চলিতেছিল বামন-রাওয়ের কোন সন্ধান ছিল না। তিনি এক্ষণে সন্ধির নামে নিজ নিরাপদ আশ্রয় হইতে বাহির হইলেন এবং মারাঠা-দরবারের নিযুক্ত কর্ম্মচারীরূপে সর্ত্তনিরূপণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তিনি নিতান্ত অসঙ্গত দাবী করিলে রোরাজী জানাইলেন যে প্রতাপসিংহের অনুমতি ভিন্ন তাঁহার পক্ষে তাহাতে স্বীকৃত হওয়া সম্ভব নহে। তখন আবার উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। টমাসের শিবিরে মনুষ্য ও গবাদিপশু সকল-কারই আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্য ঘটিয়াছিল। প্রায় দশ ক্রোশ দূর হইতে অশ্বগবাদির খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত; পথিমধ্যে প্রতিপক্ষের অশ্বারোহীদলের দৃষ্টি এড়াইয়া তাহা আনা যে কিরূপ বিষম ব্যাপার ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বিকানীরাধিপতি সুরৎসিংহ জয়পুররাজের সাহায্যার্থ সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রোরাজী নিজ রাজ্য হইতে বহু সৈন্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু টমাসের নিজ সৈন্যদল ব্যতীত কোথাও হইতে কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির আশা ছিল না। তাহাও আবার দীর্ঘ যুদ্ধাভিযানে অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল কারণে টমাস নিজ রাজ্যে ফিরিয়া যাওয়া সমীচীন বিবেচনা করিয়াছিলেন পরদিন প্রত্যুষে তিনি যাত্রারম্ভ করিলেন। রাজপুতরা সে কথা জানিতে পারিয়া মহোৎসাহে পলাতকগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। সমস্তদিন ধরিয়া তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে করিতে সৈন্যদল চলিল। রাত্রিকালে গোলযোগ বিশৃঙ্খলার অবধি রহিল না। অন্ধকারে কে শত্রু কে মিত্র নির্ণয় করা অসম্ভব হইল। দিনের আলো দেখা দিলে টমাস শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আবার অগ্রসর হইলেন। সেদিন আবার নিদারুণ গরম ছিল। উপরে ভগবান ময়ূখমালী সহস্রধারায় অগ্নিবৃষ্টি করিয়া চরাচর দগ্ধ করিতেছিলেন। নিম্নে যতদূর দৃষ্টি চলে অফুরন্ত বালুরাশি ধূ ধূ করিতেছে;—কোথাও একটু ছায়া, একটু হরিদ্বর্ণ, একবিন্দু জল দেখা যায় না। চারিদিকে অগ্নিকণা ছড়াইয়া প্রচণ্ড "লু" বহিতেছে। মধ্যে মধ্যে হতাশ প্রাণে আশার ক্ষীণ আলো জ্বালাইয়া মায়াবিনী মরীচিকা দূরে দেখা দিয়া পর মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইতেছিল। তখন নিদারুণ অবসাদ ও আশাভঙ্গে মুহ্যমান ক্লান্ত চরণ আর চলিতে চাহিতেছিল না। কিন্তু দাঁড়াইলেই বা রক্ষা কোথায়? পশ্চাতে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত রাজপুতসেনা অনুসরণরত। "দীর্ঘ পঞ্চদশ ঘণ্টা ধরিয়া পশ্চাতে নিশ্চিত মৃত্যু এবং সম্মুখে অনিশ্চিত আশ্রয়ের আশা লইয়া চলিয়া সন্ধ্যাবেলা আমরা একটি গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে এখানে সুপেয় জলপূর্ণ দুইটি কূপ ছিল। তৃষাতুর সৈনিকগণ জলের লোভে উন্মত্তের মত ছুটিল,—কাহারও কোন বাধা মানিল না। ঠেলাঠেলিতে দুই ব্যক্তি কূপ মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে একজনকে আর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।" কিছু পরে শত্রু-সেনাও আসিয়া প্রায় তিন মাইল দূরে শিবির স্থাপন করিল। পরদিন সকালে টমাস তাহাদের আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যগণের অবস্থা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন তাহাদের দ্বারা আর কোন কার্য্য হওয়া সম্ভব নহে। তখন আবার পূর্ব্ব দিনের মত যাত্রারম্ভ হইল। নিরুদ্যম, হতাশ সিপাহীদিগকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য টমাসও তাহাদের সহিত সমান দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন। নিজ অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া সকলের পুরোভাগে তিনি পদব্রজে সারাপথ হাঁটিয়া চলিলেন। 'সাহেব বাহাদুরে'র এ সহানুভূতিতে সৈন্যগণের লুপ্তপ্রায় উদ্যম আবার ফিরিয়া আসিল। তাহারা

* ফতেপুর যুদ্ধের যে বিবরণ প্রদত্ত হইল তাহা টমাসের জীবন-চরিত অবলম্বনে লিখিত। রাজপুতপক্ষ হইতে বিবরণের জন্য টডের "রাজস্থান" ২য় খণ্ড, ৪৫৬পৃঃ দ্রষ্টব্য। জন মরিস সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। টমাসের জীবনচরিতে ফতেপুর যুদ্ধ ভিন্ন অপর কোন প্রসঙ্গে তাঁহার কোন উল্লেখ নাই। টমাস বলেন "মরিস খুব সাহসী ছিল, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যপরিচালন করা অপেক্ষা কোন দুঃসাহসিক কার্য্যে নেতৃত্ব করার সে অধিকতর উপযুক্ত ছিল।"

অনুসরণকারী শত্রুসেনাকে বিতাড়িত করিয়া নবীন উৎসাহে আগুয়ান হইল এবং সমস্ত দিন ধরিয়া আবার পূর্ব্ববৎ ক্লেশ সহ্য করিতে করিতে চলিয়া সায়াহ্নকালে একটি গ্রামসমীপে আসিয়া থামিল। তথায় সুপেয় জলপূর্ণ পাঁচটী কূপ দেখিয়া তাহাদের উল্লাসের অবধি রহিল না। ইতোমধ্যে রাজপুতরা অনুসরণকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ফতেপুরে ফিরিয়া গিয়াছিল। তখন টমাস কিছুদিনের মত সৈন্যদিগকে বিশ্রাম দিবার জন্য উক্ত স্থানে অবস্থান করিবেন স্থির করিলেন। সপ্তাহকালের মত সিপাহীদিগের পূর্ব্ব সাহস ও উৎসাহ ফিরিয়া আসিল। সাহেব বাহাদুরের ইকবালে অর্থাৎ সৌভাগ্যে তাহাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল। হান্সি হইতে সমরসম্ভার লইয়া নূতন একদল সৈন্য আসিয়া পৌছিলে টমাস আবার জয়পুর রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই লুণ্ঠনের ফলে তাঁহার হস্তে সুপ্রচুর অর্থাগম হইল। আর অধিক দিন এভাবে চলিলে তাঁহার সমুদয় জনপদ মরুভূমে পরিণত হইবে বুঝিয়া প্রতাপসিংহ তাঁহাকে বিদায় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বামনরাওয়ের দাবীও এখন অনেকটা নামিয়াছিল। ত্রিশ হাজার টাকা লইয়া তাঁহারা জয়পুররাজ্য পরিত্যাগ করিলেন।

বিগত সমরে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করার জন্য অতঃপর টমাস বিকানীরাধিপতিকে দণ্ড দিবার জন্য তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা স্মরণে মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইবার সময় এবার তিনি সঙ্গে মশকপূর্ণ করিয়া জল লইয়াছিলেন। শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করিয়া টমাস নিজ অভ্যস্ত উপায়ে অর্থ সংগ্রহে তৎপর হইলে তাঁহাকে বাধাদানে অক্ষম সুরথসিংহ দুই লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দিতে সম্মত হইয়া পরিত্রাণ পাইলেন। তন্মধ্যে অর্দ্ধেক টাকা নগদ এবং বাকী টাকার জন্য তিনি জয়পুরের মহাজনদিগের নামে হুণ্ডি দিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় টমাস হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিলে মহাজনরা টাকা দিল না; বলিল বিকানীররাজ উক্ত মর্ম্মে তাহাদের কোন আদেশ দেন নাই। টমাস মনে মনে ভবিষ্যতে এ শঠতার প্রতিশোধ লইবেন স্থির করিয়া রাখিলেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মের প্রারম্ভে টমাস নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। দুই দিন শান্তিতে অতিবাহিত করা তাঁহার কোষ্ঠিতে লেখে নাই, অচিরে তিনি আবার সমরে মাতিলেন। এবার তিনি ঝিন্দ ও পাতিয়ালা হইতে প্রচুর লুঠ লইয়া ফিরিয়াছিলেন। পাতিয়ালাধিপতি সাহেব-সিংহ ছিলেন বিষম অলস, নিরুদ্যম ও দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার ভগিনী কুণুরের প্রকৃতি ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। টমাসের সহিত যুদ্ধে এই তেজস্বিনী মহিলা নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া তিনি যখন সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন তখন সাহেবসিংহ তাহাতে সম্মতি দিলেন না, বরং উক্ত অপরাধে ভগিণীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এ সংবাদে টমাস আবার ফিরিলেন। কুণুরকে উদ্ধার করিয়া এবং তাঁহার ভ্রাতাকে সন্ধিস্থাপনে বাধ্য করিয়া তিনি হান্সিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এ বিষয়ে তিনি পরে বলিয়াছিলেন :—"She was a bitter enemy, but a better 'man' than her brother."

ইতোমধ্যে লকবা দাদার পতন আরম্ভ হইয়াছিল। বাইদিগের অর্থাৎ মহাদজী সিন্ধিয়ার বিধবাদিগের প্রতি দৌলৎরাও অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে তিনি তাঁহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া সিন্ধিয়া এজন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অম্বাজী ইঙ্গলিয়াকে হিন্দুস্থানের সুবেদারী দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি এই সময় তাঁহার মন্ত্রণাদাতৃবর্গের পরামর্শে সেনবী-ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ঘোর উৎপীড়ন করিতে থাকেন। লকবা ছিলেন উঁহাদিগের প্রধান, তিনি স্বজাতীয়গণকে রাজ অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। সিন্ধিয়া এবং তাঁহার শ্বশুর ও প্রধান মন্ত্রী সখারাম বা শিরজিরাও ঘাটগের আচরণে নানা কারণে অসন্তুষ্ট অনেকেই তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। দাদা নিজ অনুচরবৃন্দ সমেত মিবার রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানকার সর্দ্দারগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার পক্ষভুক্ত ছিল। লকবাকে বিদ্রোহী ঘোষণা করিয়া অম্বাজী কর্ণেল রবার্ট সাদারলণ্ডকে এক ব্রিগেড সৈন্যসহ তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন এবং টমাসের নিকটও মাসিক ৫০০০০৲ টাকা বেতনের বিনিময়ে ঐ কার্য্যে তাঁহার সাহায্য কামনা করিলেন। এ ধরণের আহ্বানে ঔদাসীন্য দেখাইবার পাত্র টমাস ছিলেন না। নিজের কোন স্বার্থ না থাকিলেও অর্থের

জন্য অপরের হইয়া লড়িতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। এ বিষয়ে তাঁহাকে "ভাড়াটিয়া গুণ্ডা" ব্যতীত অপর কোন আখ্যায় অভিহিত করা চলে না। লকবা তখন মিবার রাজধানী উদয়পুর হইতে অদূরে একটি সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কট সন্নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। উদয়পুরের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়া টমাস সংবাদ পাইলেন যে সিন্ধিয়া লকবাকে মার্জ্জনা করিয়া স্বীয় কর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সহিত আর যুদ্ধ করিতে হইবে না। কিন্তু সে কথায় তিনি কর্ণপাৎ করিতে চাহিলেন না; বলিলেন, অম্বাজীর আদেশে তিনি যখন লকবাকে মিবার হইতে বহিষ্কৃত করিবার ভার লইয়াছেন তখন তাঁহার আদেশ ভিন্ন তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতে অক্ষম। অতঃপর সাদারলণ্ড এবং টমাস কর্ত্তব্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন, স্থির হইল পরদিবস প্রাতঃকালে তাঁহারা শত্রুকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করিবেন। কিন্তু সাদারলণ্ডের কি হইল বলা যায় না, সেই রাত্রেই তিনি নিজ সেনাদলসহ টমাসকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। তাঁহার এ আচরণের কোন কারণ পাওয়া যায় না; সম্ভবতঃ পেরঁ ও অম্বাজীর বিরুদ্ধে তিনি লকবার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। টমাস কিন্তু একাকী পড়িয়াও কিছুমাত্র ভীত হন নাই। তিন দিন পরে তিনি লকবার সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এমন সময় অকস্মাৎ মুষলধারায় বর্ষণ নামিল। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাতের জন্য তিনি অধিকদূর যাইতে পারেন নাই। পার্ব্বত্য তটিনীসমূহ মুহূর্ত্তের মধ্যেই খরস্রোতা নদীতে পরিণত হইল। মধ্য পথে তিনি যে স্থানে থামিয়া ছিলেন তাহা অশ্বারোহীসেনার আক্রমণের পক্ষে বেশ অনুকূল দেখিয়া বৃষ্টি থামিবার পর লকবা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই টমাস অন্য সুরক্ষিত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তখন আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস না করিয়া লকবা স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনার্থ পশ্চাৎপদ হইলেন। *

* এখানে উদয়পুর অভিযানের যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা টমাসের জীবনী হইতে গৃহীত। মিবারের ইতিহাসের দিক হইতে যুদ্ধের বিবরণ জন্য টডের "রাজস্থান", ১ম খণ্ড, ৪৭৭—৫০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গভীর নিশীথে লকবাপ্রেরিত দূত আসিয়া টমাসকে সিন্ধিয়ার লিখিত পত্র দেখাইল; তাহাতে তিনি উভয়পক্ষকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার আদেশ দিয়াছিলেন। টমাস বলিলেন, অম্বাজী তাঁহাকে লকবাকে বিতাড়িত করিয়া মিবার রাজ্য তাঁহার অধীনে আনিয়া দিবার জন্য কর্ম্মদান করিয়াছেন, সে কারণ যে সন্ধিতে দাদার উক্ত জনপদ পরিত্যাগ করিবার সর্ত্ত থাকিবে না তাহাতে স্বীকৃত হইতে তিনি অসমর্থ। তখন স্থির হইল যে উভয়পক্ষই মিবার রাজ্যের উত্তর প্রান্তে গিয়া তথায় ঐ বিষয়ে সিন্ধিয়ার নূতন আদেশের প্রতীক্ষা করিবে। তখন বিষম বর্ষা নামিয়াছিল। বৃষ্টি ও পথের অবস্থার জন্য ৭৫ মাইল দূরবর্ত্তী সাহপুর নামক স্থানে যাইতে পক্ষকাল কাটিয়া গেল। ঐখানে আসিয়া পৌঁছিবার পর তাঁহার জায়গীর আজমীর হইতে আসিয়া নূতন একদল সৈন্য লকবার দলপুষ্টি করিল। ইহাতে তাঁহার সাহস বাড়িয়া গেল। তিনি মিবার রাজ্য পরিত্যাগ করিতে স্পষ্ট ভাবেই অস্বীকার করিলেন। তখন আবার যুদ্ধ বাধিল। এখানে তাহার সবিশেষ বিবরণ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। এমন সময় টমাস সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে পেরঁ ঝাঝার আক্রমণ করিয়াছেন। লকবার কাছেও সকল খবর যাইতেছিল। তিনি এই সুযোগে টমাসকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য খুব সুবিধাজনক সর্ত্তে তাঁহাকে নিজ কর্ম্মে গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। অম্বাজী ও পেরঁর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য টমাস এক্ষণে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহাদিগের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিতেন; ইহাতে দোষের কিছু ছিল না। কিন্তু নিজ বহুবিধ উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও তিনি কথার লোক ছিলেন। তিনি লকবাকে বলিলেন যে অম্বাজীর আচরণের জন্য যদিও বর্ত্তমান সমরের অবসানে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি যতক্ষণ তিনি তাঁহার কর্ম্মনিরত আছেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রু-তাচরণ অথবা তাঁহার শত্রুগণের সহিত মিত্রতাস্থাপন উভয়-বিধ কার্য্যেই তিনি তুল্যরূপে অক্ষম। বলা বাহুল্য টমাসের এ নীতিজ্ঞান লকবা দাদা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

নানা খণ্ডযুদ্ধের ফলে টমাসের ও অম্বাজীর রসদ ফুরাইয়া আসিয়াছিল। সাহপুর হইতে ৩০ মাইল দূরে সিংখান নামক

স্থানে টমাসের সমরসম্ভারের ডিপো ছিল। অতঃপর তাঁহারা সেখানে ফিরিয়া চলিলেন। আহত ও পীড়িত সৈনিকদিগকে লইয়া পথিমধ্যে বিব্রত হইতে অম্বাজীর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। টমাস কিন্তু তাহাদিগকে শত্রুকরে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি নিজ ব্যয় তাহাদিগকে যথাস্থানে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে বিপক্ষের অশ্বারোহীদল কয়েকবার তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু টমাস প্রত্যেকবারই তাহাদিগকে বিদূরিত করিলেন। এবারে অম্বাজীর বোধ হয় একটু চক্ষুলজ্জা হইল। পেরঁর ঝাঝার আক্রমণ তাঁহার সম্মতিক্রমে হইয়াছিল। তাঁহারা মনে ভাবিয়াছিলেন যে লকবা শীঘ্রই মিবার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন, তখন আর টমাসকে হাতে রাখার কোন প্রয়োজন থাকিবে না; সুতরাং এই সুযোগে তাঁহার জায়গীর-গুলি অধিকার করিয়া লওয়া যাউক। কিন্তু তাহার স্থলে সুধু টমাসের বিশ্বস্ততা ও কর্ম্মকুশলতার জন্য দাদার হস্তে পরাজয় হইতে সসৈন্যে রক্ষা পাইয়া নিজ পূর্ব্বাচরণ স্মরণে অম্বাজী কিছু লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং সেজন্য ঝাঝার আক্রমণের সকল দায়িত্ব পেরঁর স্কন্ধে আরোপ করিয়া তিনি আত্মদোষক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। টমাস সব বুঝিলেও এ বিষয় লইয়া আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। সিংথান হইতে আবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্ররসদাদি লইয়া তিনি আবার যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু দাদার আর তাহাতে অভিরুচি ছিল না। তিনি আজমীরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে টমাসের ইষ্টসিদ্ধি হইল। অম্বাজী যে জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা সফল হইয়াছিল; লকবা মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অতঃপর টমাস অভিযানের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অর্থ সংগ্রহে তৎপর হইলেন। অম্বাজী খুব সম্ভব তাঁহাকে অঙ্গীকারমত অর্থ দেন নাই। স্বল্প কালের মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা তাঁহার হাতে আসিল। এ লাভজনক ব্যবসা তিনি আরও কিছুকাল চালাইতেন, যদি না পেরঁর নিকট হইতে তাঁহাকে অবিলম্বে মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিবার আদেশ প্রদত্ত হইত। সিন্ধিয়া লকবাকে আবার সেনাপতিত্ব প্রদান করিয়াছেন জানিয়া পেরঁ তাঁহার সহিত সদ্ভাবরক্ষায় যত্নবান হইয়া পূর্ব্বমিত্র অম্বাজীকে উদয়পুর পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে অন্যথায় তিনি দাদাকে তাঁহাকে বহিষ্করণ ব্যাপারে সাহায্য করিতে বাধ্য হইবেন। ফলে অম্বাজী ও টমাসকে কালব্যত্যয় ব্যতিরেকে মিবার পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন অগত্যা টমাস ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হান্সিতে ফিরিয়া আসিলেন। নীতির কথা একেবারে বাদ দিলে সাহস ও বীরত্বের সমুজ্জল নিদর্শনে পরিপূর্ণ টমাসের এই অভিযানটীর সত্যই প্রশংসা করিতে হয়। পাঁচ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি নিজ মুষ্টিমেয় সৈন্যদলসহ প্রায় সহস্র মাইল পথ পর্য্যটন, ক্রমান্বয়ে কয়েকটী যুদ্ধ ও অবরোধে বিজয় লাভ এবং লকবাকে মিবার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং নিজ তহবিল যথাসম্ভব পূর্ণ করিয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়াছিলেন।

টমাসের পক্ষে বেশীদিন কিন্তু শান্তিতে অতিবাহিত করা সম্ভব হইল না। অচিরেই তিনি আবার সমরে মাতিলেন। সুরথসিংহের সহিত হুণ্ডির ব্যাপার লইয়া বোঝাপড়া বাকী ছিল সে কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি বিকানীর রাজ্যের প্রান্তসীমায় আসিয়া পৌছিলে কয়েকজন ভট্টি জাতীয় সর্দ্দার তাঁহার সহিত দেখা করিয়া জানাইল যে তাহাদের রাজধানী ভাটিণ্ডা হইতে নয় মাইল দূরে ভাটনের নামক স্থানে বিকানীররাজ যে দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা যদি তিনি অধিকার করিয়া তাহাদিগকে দেন তবে বিনিময়ে তাহারা তাঁহাকে ৪০,০০০৲ টাকা দিতে সম্মত আছে। তাহাদের প্রার্থনা সানন্দে পূর্ণ করিয়া টমাস আবার আগুয়ান হইলেন এবং বহু খণ্ডযুদ্ধ, অবরোধ, লুঠতরাজের পর বিকানীর রাজ্য হইতে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া হান্সিতে ফিরিলেন (মার্চ্চ ১৮০০)।

সিন্ধিয়ার সহিত লকবা দাদার সদ্ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। অচিরেই আবার উভয়ে বিরোধ বাধিল। লকবাকে বিদ্রোহী ঘোষণা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরি-চালনার ভার পেরঁর প্রতি প্রদত্ত হইল। তখনকার মত পেরঁর নিকট হইতে ভয়ের কোন কারণ নাই বুঝিয়া টমাস অতঃপর নিজ উত্তর প্রান্তবর্ত্তী জনপদসমূহ হইতে রাজস্বসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমে সাহস বাড়িয়া যাওয়াতে যথাসম্ভব

অর্থ আদায় করিয়া লইবার জন্য পার্শ্ববর্তী মারাঠারাজ্য সাহরাণপুর প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখানকার ফৌজদার তখন ছিলেন শম্ভুনাথ নামক লকবার জনৈক পুরাতন অনুচর। বিপদের দিনে আর সকলের মত তিনি প্রভুকে পরিত্যাগ করেন নাই; বরং প্রাণপণে তাঁহার স্বার্থরক্ষায় যত্নবান ছিলেন! শম্ভুনাথ নিজ সৈন্যদলসহ পেরঁর দোয়াবপ্রদেশ মধ্যবর্ত্তী জায়গীরে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। এ সংবাদে পেরঁ মেজর লুইস্মিথকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি কয়েকটী যুদ্ধে শম্ভুনাথের অশিক্ষিত অনুচরবৃন্দকে পরাজিত করিলেন। সাহারণপুর অঞ্চল একরূপ অরক্ষিত অবস্থাতে পড়িয়া ছিল। সুযোগ বুঝিয়া টমাস তথায় প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার উপস্থিতি কেহ জানিবার পূর্ব্বেই লুঠতরাজ করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। এমন সময় পেরঁ লকবার বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করিয়া স্মিথের হস্ত হইতে যুদ্ধভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া শম্ভুনাথের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে টমাসও চিঠি পাইলেন যে পেশবার আদেশে তাঁহাকে লকবার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। উক্ত পত্র যে জাল এবং তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার জন্য পেরঁর কারসাজিমাত্র তাহা বুঝিতে টমাসের বিলম্ব হইল না। তখন তিনি ইতিপূর্ব্বে শম্ভুনাথের পক্ষ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া টমাসের অনুতাপ হইল; কারণ সে ক্ষেত্রে সুধু যে তিনি পরাজয় হইতে রক্ষা পাইতেন এমন নহে, পরন্তু পেরঁর শক্তির মূলে তদ্দ্বারা ভীষণ রকম কুঠারাঘাত সম্ভব হইত। কিন্তু তখন আর কোন উপায় ছিল না। টমাস শম্ভুনাথকে নিজ অশিক্ষিত অনুচরবৃন্দসমেত পেরঁর সম্মুখীন হইতে নিষেধ করিয়া তাঁহার রাজধানী হান্সি নগরে আশ্রয় লইবার জন্য বলিলেন। কিন্তু শম্ভুনাথ সে কথা শুনিতে চাহিলেন না। পেরঁর আগমন সংবাদে তাঁহার সৈনিকগণের মধ্যে অনেকে ভয়ে পলায়ন করিল এবং তিনি নিজেও অনতিকাল বিলম্বে খাটলৌর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শিখ অধিকারে আশ্রয় লইলেন। তখন "একজন শস্ত্রব্যবসায়ীর উপর বিজয় লাভ করিয়া যে পরিমাণ আত্মপ্রসাদ লাভ করা সম্ভব তাহা লইয়া পেরঁ দিল্লী ফিরিয়া গেলেন।" টমাসও অতঃপর পঞ্চনদপ্রদেশ বিজয়ের জন্য আবশ্যকীয় আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। নূতন সৈন্য সংগ্রহ, কামান বন্দুক, গোলাগুলিবারুদ নির্ম্মাণ, রসদাদির ব্যবস্থা করিতে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। ডিসেম্বরের শেষে তিনি শতদ্রু প্রদেশের শিখ রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

সুধু ক্ষুদ্র হরিয়ানার আধিপত্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকা টমাসের ইচ্ছা ছিল না। সমগ্র পঞ্চনদপ্রদেশে কালক্রমে নিজ প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার মনোগত বাসনা ছিল। হরিয়ানা অধিকার ছিল সে কার্য্যের প্রাথমিক সোপান মাত্র। তখনও পাঞ্জাব-কেশরীর অভ্যুদয় হয় নাই। শিখরা তখনও নানা বিভিন্ন "মিসিলে" বিভক্ত ছিল, উহাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ, মনোমালিন্যের অবধি ছিল না। তখনও তাহারা দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধজাতিতে পরিণত হয় নাই। দীর্ঘ পনের বৎসর যাবৎ শিখগণ এবং তাহাদের সমরপদ্ধতি টমাসের পরিচিত ছিল। বহু যুদ্ধে তিনি নিজ মুষ্টিমেয় অনুচরবৃন্দ লইয়া বিশাল শিখ অশ্বারোহীদলকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। "জাহাজী সাহেবের" নামে পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। বাঙ্গালায় বর্গী, ইংলণ্ডে নেপোলিয়ন, আফগানিস্থানে হরিসিংহনালুয়ার নামের মত সে সময় শিখ-জননীরা "জওরজ জঙ্গের" নাম করিয়া দুরন্ত শিশু সন্তান-দিগকে শান্ত করিতেন। সুতরাং পঞ্জাব-বিজয় কার্য্য টমাস কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু সম্মুখের শত্রু অপেক্ষা পশ্চাতের শত্রুর নিকট হইতে আশঙ্কার কারণ যে অধিক ছিল তাহা টমাস বুঝিতেন। হরিয়ানায় তাঁহার অবস্থান যে মারাঠা দরবার এবং হিন্দুস্থানের প্রকৃত অধিপতি পেরঁর পছন্দকর ছিল না এবং তাঁহারা যে তাঁহার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন এবং সে জন্য সুবিধা পাইলে তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না সে কথা টমাস বেশ করিয়া জানিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র চিন্তার কারণ। তাহার প্রতিবিধানের জন্য তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন অর্থাৎ অভিযানকালে পেরঁ নিরপেক্ষ থাকিবেন তাঁহাদের নিকট হইতে এবম্বিধ অঙ্গীকার চাহিয়াছিলেন। কাপ্তেন হোয়াইট নামক জনৈক ইংরাজ সৈনিকের মারফৎ টমাস-ওয়েলেসলিকে জানাইয়াছিলেন যে শিখরা মারাঠা ও ইংরাজ

উভয়েরই শত্রু ; সুতরাং তাহাদের সহিত নিশ্চিন্তমনে যুদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিশ্রুতি আবশ্যক ; এ কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট আনুকূল্য করিলে তিনিও প্রতিদানে পঞ্জাব জয় করিয়া তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিবেন। টমাস বলিয়াছিলেন "ইহাতে আমার স্বদেশের এবং রাজার গৌরববৃদ্ধি ব্যতীত আমার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া আমি এ প্রস্তাব করিতেছি না। আমার বিজিত জনপদ মারাঠারা লাভ করে তাহা আমি চাহি না। আমার স্বদেশের ভূপতিকে উহা প্রদান করাই আমার আন্তরিক বাসনা। অবশিষ্ট জীবন সুধু তাঁহার সেবাতে অতিবাহিত করাই আমার এখনকার কামনা। একমাত্র সৈনিকরূপেই তাহা আমার পক্ষে করা সম্ভব।" রাজনৈতিক কারণে ওয়েলেসলি টমাসের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। নতুবা অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পূর্ব্বেই পঞ্চনদ প্রদেশে বৃটিশ বৈজয়িন্তী উড্ডীন হইতে পারিত।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে টমাস শতদ্রুনদীর পূর্ব্বতটবর্ত্তী শিখরাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বিগত বিকানীর সমরকালে শত্রুতাচরণ জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথম পাতিয়ালার সাহেবসিংহের রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছিলেন। তিনি তখন তাঁহার ভগিনী কুম্বুরকে এক দুর্গ মধ্যে অবরোধ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। টমাসের আগমন সংবাদে তিনি মহাভয়ে সে অঞ্চল হইতে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে কুম্বুর আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। টমাসের এই অভিযানের দীর্ঘ বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। সংক্ষেপে সুধু বলা ভাল যে পাতিয়ালার সাহেবসিংহ, মালের কোটলার তারাসিংহ, ঝিন্দের ভাগ-সিংহ, এবং কৈথলের লালসিংহ প্রমুখ শিখ সর্দ্দারবৃন্দকে বারম্বার পরাজিত ও বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি পরে নিজে বলিয়াছিলেন "সাত মাস পূর্ব্বে আমি যে আশা লইয়া মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য ও ৩৬টী কামান সম্বল করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক সাফল্যলাভ করিয়া ফিরিয়াছিলাম। হতাহত ও কার্য্যাক্ষম সর্ব্বসমেত আমার সৈন্যদলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু শত্রুপক্ষের লোকক্ষয় পাঁচ হাজারেরও উপরে গিয়াছিল। সৈন্যদিগকে প্রদত্ত বেতন ভিন্ন আমি দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, জামীনদারগণের নিকট হইতে আরও লক্ষাধিক টাকা পাওনা ছিল। আমি সমগ্র জনপদ তন্ন তন্ন করিয়া ঘুরিয়াছিলাম, বিভিন্ন শক্তিবৃন্দের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া-ছিলাম, সংক্ষেপে বলিতে শতদ্রুর দক্ষিণতটবর্ত্তী যাবতীয় শিখ-জনপদের আমি "ডিক্টেটর" হইয়াছিলাম।" এই অভিযানে টমাসের বীরচরিত্রের আর একটা দিক পরিষ্কার দেখা যায় ; সে কথা এখানে বলা প্রয়োজন। লুধিয়ানা জেলার রায়কোট নগরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রায়বংশের বাস ছিল। রায়রা প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে রাজানুগ্রহভাজন হইবার জন্য ইসলামধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহাদিগকে "রায়"-উপাধিসহ লুধিয়ানা প্রদেশ জায়গীর দিয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনজনিত অরাজকতার দিনে রায়েরা লুধিয়ানা ও ফেরোজপুর অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করেন। সন্নিকটবর্ত্তী শিখসর্দ্দার-গণের সহিত তাঁহাদের প্রায়ই যুদ্ধ বিবাদ লাগিয়া থাকিত। এই সময়ে রায় এলায়াস নামক একজন বালক রাজা রায়-কোটের গদীতে সমাসীন ছিলেন। রাজার অপ্রাপ্তবয়স্কত্বের সুযোগে শিখরা তদীয় রাজ্যের কতকাংশ আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছিল। কোন মতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া রাজমাতা রাণী নুরউন্নিসা টমাসের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। উদারহৃদয় টমাস তাঁহার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন নাই। তাঁহাকে এজন্য দীর্ঘ সমরে লিপ্ত হইতে হইবে জানিয়াও "এক সুপ্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশের পতনদশা দেখিয়া ব্যথিত" হইয়া তিনি রাণীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোক বিপদে পড়িয়া তাঁহার সাহায্য চাহিলে তিনি কখনও উদাসীন থাকিতে পারিতেন না, তজ্জন্য সর্ব্ববিধ আয়াসস্বীকারেও তিনি কখন পশ্চাৎপদ হইতেন না ;—তা সে আহ্বান সার্দ্ধানা, পাতিয়ালা বা রায়কোট যেখান হইতে আসুক না কেন।

টমাস এই সময় তাঁহার যশের ও সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিচক্ষণতা এবং রাজনীতির জ্ঞানও যদি তাঁহার সামরিক কৃতিত্বের অনুরূপ হইত তাহা হইলে পরবর্ত্তী ইতিহাসের ধারা নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ

ভিন্নপথে প্রবাহিত হইত। কিন্তু একান্ত অপরিহার্য্য ঐ দুই গুণ তাঁহার ছিল না। তদ্ভিন্ন ক্রমাগত সাফল্য লাভে নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বড় বেশী রকম উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া তিনি মাত্রাজ্ঞান হারাইয়াছিলেন। ফলে জলন্ত হাউইয়ের মত উর্দ্ধগতিতে মুহূর্ত্তের তীব্রচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তাহার পরেই তাঁহার পতন হইল। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে পের্‌ঁ আবার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছেন সংবাদ পাইয়া টমাস দ্রুতগতি হান্সিতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি অত শীঘ্র ফিরিতে পারিবেন বলিয়া পের্‌ঁ মনে করেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে তখনকার মত প্রকাশ্য বলপরীক্ষা হইতে নিরস্ত হইয়া উপায়ান্তর উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইতে হইল।

টমাসের সহিত পের্‌ঁর বিরোধের কারণ বুঝিতে হইলে কিছু পূর্ব্ব কথা বলা প্রয়োজন। দিল্লী হইতে অনতিদূরে টমাসের অভ্যুদয় যে মারাঠাদরবারের পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। টমাসের অনন্যসাধারণ কার্য্য-কলাপ, অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও শঙ্কাজনক শক্তি বৃদ্ধি তাঁহাদিগের নিকট বিষম দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। "জঙ্গরজ জঙ্গ" যে একদিন দিল্লী দখল করিবার চেষ্টা করিবেন না তাহারই বা কি স্থিরতা ছিল? মারাঠা কর্ত্তৃপক্ষ টমাসকে তাঁহাদের অত নিকটে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না দেওয়াই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন। প্রথমটায় তাঁহারা তাঁহাকে নিজেদের কর্ম্মে গ্রহণ করিয়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু টমাসের একগুঁয়েমীর জন্য সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সে যুগের আরও অনেক বৃটিশারের মত টমাসও উৎকট ফরাসী বিদ্বেষী ছিলেন। পের্‌ঁর অধীন হইয়া থাকিতে তিনি কিছুতে সম্মত হইলেন না। মারাঠা-দরবারের প্রস্তাবের তিনি প্রত্যেকবারই এক প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, "আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আমাকে কোন ফরাসীর অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিতে নিষেধ করে। আপনারা যদি আমাকে কোন কার্য্যভার দিয়া হিন্দুস্থান, পঞ্জাব অথবা দাক্ষিণাত্যের যে কোন স্থানে নিযুক্ত করিতে চাহেন তাহা হইলে সিপাহী-গণের বেতনসর্ত্ত নিরূপিত হইবামাত্র আমি উক্ত কার্য্যে গমন করিতে প্রস্তুত আছি।" ইহার উত্তরে পের্‌ঁর কথামত টমাসকে জানান হইয়াছিল যে তাঁহার প্রস্তাব দরবার গ্রহণ করিতে অসমর্থ, কারণ পরে অপরেও ঐ নজির দেখাইতে পারে। এদিকে পের্‌ঁও ছিলেন টমাসের মত সাম্রাজ্যবাদী এবং তাঁহার মতই স্বদেশের গৌরবকামী। ভারতবর্ষীয় নৃপতিবৃন্দের দরবারে ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃন্দের প্রভাব প্রতিপত্তি নেপোলিয়নের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। ভারত-বর্ষে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি উহাদিগের সাহায্য অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। পের্‌ঁর তাঁহার সহিত পত্রব্যবহার ছিল। দেকার্ত্তে (Descartes) নামক স্বীয় জনৈক অনুচরকে তিনি একবার বোনাপার্টের নিকট দৌত্যকর্ম্মে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে নামে সিন্ধিয়ার হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহার সেনাদল তাঁহারই নিজস্ব; উহাদিগকে তিনি নিজ ইচ্ছামত যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। এই কারণে পের্‌ঁ হিন্দুস্থানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য রক্ষা করা এবং তাহার একমাত্র উপায় নিজ ব্রিগেডগুলি কোন মতে হস্তচ্যুত না করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি হোলকরের সহিত সমরলিপ্ত দৌলৎ-রাওয়ের নিকট হইতে পুনঃপুনঃ আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে কোন সাহায্য পাঠান নাই। কিন্তু হিন্দুস্থানে পের্‌ঁর আধিপত্যের বিষম অন্তরায় ছিলেন। তাঁহার সেনাদল পের্‌ঁর বাহিনী অপেক্ষা সংখ্যা ভিন্ন অপর কোন বিষয়ে অপকৃষ্ট ছিল না। পের্‌ঁর বৃটিশজাতীয় অফিসরগণের নিকট টমাস অতিশয় প্রিয় ছিলেন। উহারা তাঁহার স্বজাতি-প্রীতি পছন্দ করিত না। পাছে উহারা চক্রান্ত করিয়া টমাসকে সৈন্যদলের অধ্যক্ষতা প্রদান করে এই ভয়ে পের্‌ঁ নিতান্ত শঙ্কিত থাকিতেন।* সিন্ধিয়ার তাহাতে কোন আপত্তি না হওয়াই সম্ভব ছিল, কারণ দাক্ষিণাত্য লইয়াই তিনি যথেষ্ট বিব্রত ছিলেন; হিন্দুস্থানে তাঁহার লক্ষ্য রাখিবার অবকাশ ছিল না, তথায় তাঁহার নামে পের্‌ঁ বা টমাস যে

* পের্‌ঁর আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ছিল বলিয়া মনে হয় না। মেজর লুইস্মিথ লিখিয়া গিয়াছেন "সিন্ধিয়ার বাহিনীর নেতৃত্বে পের্‌ঁর স্থলে টমাসের নিয়োগ শুধু ওয়েলেসলির একটি মুখের কথার উপর নির্ভর করিতেছিল। সেক্ষেত্রে ফরাসীরা যাহাই করুক না কেন, বৃটিশ সৈনিকগণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে সমর্থন করিতেন।

কেহ আধিপত্য করুক না কেন, তাহাতে উদাসীন থাকা ভিন্ন তাঁহার পক্ষে গত্যন্তর ছিল না।

এই সকল কারণে পের॑ টমাসকে বিষম শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং যে কোন উপায়ে তাঁহাকে চূর্ণীকৃত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থানে মারাঠা আধিপত্য রক্ষার জন্য টমাসকে যে আশু উন্মুলিত করা আবশ্যক সিন্ধিয়াকে তিনি তাহা বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দৌলৎরাওকে সে কথা বিশেষ করিয়া বলা প্রয়োজন ছিল না। দাক্ষিণাত্যই যথেষ্ট ছিল, তাহার উপর আবার হিন্দুস্থানে নূতন গোলযোগের সম্ভাবনায় তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ছিলেন। প্রকাশ্য বলপরীক্ষায় লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে সকল সমস্যা সমাধানের সহজ উপায়রূপে টমাসকে কর্ম্মে লইবার জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিতে তিনি পের॑কে আদেশ দিয়া ছিলেন। টমাসের একগুঁয়েমীর জন্য ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক বারই সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল তাহা বলিয়াছি।

পের॑ ও টমাসের মধ্যে যুদ্ধ যে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সকলেই বুঝিয়াছিল। এমন সময় শিখরা টমাসের নিকট কোন মতে না পারিয়া পের॑র নিকট সাহায্য কামনা করিল এবং জানাইল যে তাহারা টমাসের ধ্বংস কার্য্যে দশ সহস্র সৈন্য এবং পাচ লক্ষ টাকা নগদ দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে।

পের॑ও এই সময় নিজ রাজ্য হইতে বহু দূরে যুদ্ধনিরত টমাস তাঁহাকে বাধা দিতে পারিবেন না বুঝিয়া তাঁহার সহিত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি শিখদিগের কৃত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া এই সুযোগে টমাসের রাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে টমাস শতদ্রুতীর হইতে নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসায় তাঁহাকে তখনকার মত প্রকাশ্য বল পরীক্ষা হইতে নিরস্ত হইতে হইল। তখন তিনি সিন্ধিয়ার প্রদত্ত প্রস্তাবসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য টমাসকে তাঁহার নিকট একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে বলিলেন। টমাসের ইহাতে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না।

এমন সময় উজ্জয়িনীর যুদ্ধে (২১৭।১৮০২) সিন্ধিয়ার সৈন্যদলের হোলকরের হস্তে পরাজয়ের সংবাদ হিন্দুস্থানে আসিয়া পৌছিল।* সেই সঙ্গে দৌলৎরাওয়ের নিকট হইতে পের॑র প্রতি টমাসের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া যথা সম্ভব তৎপরতার সহিত মালবপ্রদেশে গমনের আদেশ আসিল। এ যাবৎ পের॑ নিজ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া প্রভুর পুনঃপুনঃ আদেশ সত্ত্বেও তাঁহাকে সাহায্য পাঠান নাই। এবার তিনি বুঝিলেন যে অতঃপর প্রভুর স্বার্থে ঔদাসীন্যে তাঁহার প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হইবে। অথচ হিন্দুস্থানে নিজ বল খর্ব্ব করিতে অথবা টমাসের মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অক্ষুণ্ণ থাকিতে উক্তদেশ পরিত্যাগ করিতে তাঁহার আদৌ বাসনা ছিল না। সে কারণ তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার ব্যবস্থা করিলেন অর্থাৎ টমাসকে সিন্ধিয়ার কর্ম্মে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে যশোবন্তের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইবেন স্থির করিলেন।

টমাস প্রেরিত দূতকে যথেষ্ট সৌজন্যসহকারে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তিনি জানাইলেন যে, সকল কথা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিবার জন্য তিনি একবার তদীয় প্রভুর সাক্ষাৎকার কামনা করেন। টমাস ইহাতে সম্মত হইলে দিল্লীর অদূরে বাহাদুরগড় নামক স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে স্থির হইল। কর্ণেল লুই বুকুর্য়্যার অধীনে তৃতীয় ব্রিগেডের দশ ব্যাটালিয়ন পদাতিক ও দুই হাজার অশ্বারোহী পাঠাইয়া দিয়া আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পের॑ আলিগড় হইতে যাত্রা করিলেন।

টমাসও দুই ব্যাটালিয়ন পদাতিক, নিজ দেহরক্ষী ৩০০ সওয়ার এবং হপকিন্স, হিয়ার্সে ও বার্চ্চ নামক তাঁহার তিনজন বৃটিশ বংশোদ্ভূত অফিসরকে লইয়া হান্সি হইতে বাহির হইলেন। মধ্যপথে পের॑ প্রেরিত মেজর লুই স্মিথ আসিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। ১৯শে আগষ্ট তারিখে টমাস বাহাদুরগড়ে আসিয়া পৌছিলেন।

পরদিবস বৈঠকে সুধু 'সেয়ানে সেয়ানে' কোলাকুলি হইল। পের॑ ও টমাস উভয়েই খোলাখুলি মন না লইয়া ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও শত্রুতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। বরং স্বার্থের

* এ সকল কথা ইতিপূর্ব্বে দুদ্রেনেক-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে; পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

খাতিরে পের্ঁ কতকটা বাহ্যতঃ উদারতা দেখাইয়াছিলেন; টমাস কিন্তু নিজ মনোভাব গোপন করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। এ সম্বন্ধে তিনি পরে বলিয়াছিলেন মিঃ পের্ঁ এবং আমি পরস্পর বিষম শত্রু, দুইটি বিভিন্ন জাতির প্রজা বলিয়া আমাদের মধ্যে সহযোগিতা অথবা সৌহৃদ্যের সহিত কার্য্য করা সম্ভব ছিল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ফরাসী বলিয়া এবং জাতীয় শত্রুতা থাকার জন্য পের্ঁ সর্ব্বদা আমার সকল আচরণ প্রতিকূলভাবে দেখিবেন। সেজন্য সকল বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বুঝিয়া আমি বৈঠকে গিয়াছিলাম। যেখানে আরম্ভেই এইরূপ মনোবৃত্তি, সেখানে আর মীমাংসা কেমনে সম্ভব? পের্ঁ টমাসকে তাঁহার সর্ত্ত অথবা চরম পত্র দিয়াছিলেন,—যথা (১) সুধু হান্সি নিজ অধিকারে রাখিয়া তিনি ঝাঝার জেলার অধিকার পরিত্যাগ করিবেন; (২) কর্ণেলপদ লইয়া তিনি নিজ সেনাদলসহ পের্ঁর অধীনে সিন্ধিয়ার কর্ম্মে প্রবেশ করিবেন এবং তাঁহার নিজের ও সিপাহীগণের বেতন বাবদ তাঁহাকে মাসিক ৬০,০০০৲ টাকা দেওয়া হইবে; (৩) দাক্ষিণাত্যে হোলকরের সহিত যুদ্ধে তিনি ৪ ব্যাটালিয়ন সৈন্য পাঠাইবেন। বলা বাহুল্য টমাস এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। "অতঃপর আর কোন আলোচনা না করিয়া বিরক্তচিত্তে হঠাৎ বৈঠক ভাঙ্গিয়া দিয়া আমি হান্সি অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলাম।"

টমাস যদি ধূর্ত্ত অথবা বিচক্ষণ হইতেন, কিম্বা যদি তাঁহার কোন সাংসারিক জ্ঞান থাকিত তবে তিনি নিশ্চয়ই পের্ঁর প্রস্তাবে সম্মত হইতেন এবং সে ক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে ভালই হইত। তাঁহার বোঝা উচিত ছিল যে বরাবরের মত পঞ্চনদ-প্রদেশে স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না; কারণ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বা মারাঠা দরবার কাহারও নিকট তাহা প্রীতিপদ হইবার কথা নহে। শেষোক্ত-দিগের পক্ষে ত তাহা রীতিমত বিপজ্জনক বিষয় ছিল। এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই পের্ঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিত না। উহাতে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা ছিল। অচির ভবিষ্যতে অনুগত বৃটিশবংশীয় সৈনিকবর্গের সহায়তায় হয়ত টমাসের পক্ষে পের্ঁর স্থলাধিকার করা কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য ব্যাপার হইত না। কিন্তু তাঁহার উৎকট ফরাসী-বিদ্বেষ ও আত্মম্ভরিতার জন্য টমাসের পতন হইয়াছিল।

অতঃপর টমাসকে চূর্ণ করা ভিন্ন পের্ঁর গত্যন্তর রহিল না। বুর্কুয়্যাকে যুদ্ধ পরিচালনের ভার দিয়া তিনি নিজে আলীগড়ে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। বুর্কুয়্যার নিকট তখন তৃতীয় ব্রিগেডের ১২,০০০ সৈন্য ও ৬০টী কামান ছিল, তাহা ছাড়া কয়েক দিনের মধ্যে ৬০০০ শিখ অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে তিনি টমাসের রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিনা বাধায় ঝাঝার অধিকার করিলেন। অতঃপর তিনি ঐ স্থান হইতে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত টমাসের জর্জ্জগড় নামক অন্যতম দুর্গ অধিকারে সচেষ্ট হইলেন। যে সময় প্রথম যুদ্ধ বাধিয়াছিল সে সময় হান্সি হইতে টমাসের নিজের সৈন্যদল অপেক্ষা শত্রুসেনা অধিকতর নিকটে অবস্থিত ছিল। হান্সি ছিল টমাসের রাজধানী ও সমর-সম্ভারের প্রধান ডিপো। পাছে উহা বিপক্ষের করায়ত্ত হয় এই ভয়ে তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, অথচ বাহুবলে তাহাদের বাধা প্রদান সম্ভব নহে বুঝিয়া তিনি তাহাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য এক অভিনব কৌশলের আশ্রয় লইয়াছিলেন। জর্জ্জগড় বা হান্সি রক্ষার কোন চেষ্টা না করিয়া তিনি নিজ সৈন্যদলসহ উত্তরদিকে চলিলেন, ভাবে দেখাইলেন যেন শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতেছেন ও উহাদিগের সহিত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া আসিয়া বুর্কুয়্যার সহিত বলপরীক্ষায় লিপ্ত হইবেন। টমাস যাহা আশা করিয়াছিলেন ঠিক তাহাই ঘটিল, তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া বুর্কুয়্যা মেজর স্মিথের অধীনে সামান্য একদল সৈন্য জর্জ্জগড় অবরোধ জন্য রাখিয়া সমগ্র বাহিনীসহ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিছুদূর গিয়া টমাসের অন্যপথে জর্জ্জগড় অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন এবং দ্রুতগমনে দুইদিনে ৭০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অকস্মাৎ সংখ্যায় বলীয়ান সৈন্যদল লইয়া স্মিথের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চরমুখে তাঁহার আগমনসংবাদ পাইয়া স্মিথ প্রমাদ গণিলেন এবং নিজ বিষম বিপজ্জনক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া ঝাঝারে আশ্রয় লইতে ছুটিলেন। কিন্তু পলাতকগণ তথায় পৌছিবার পূর্ব্বেই টমাসের সৈন্যদল

নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রান্তক্লান্ত সিপাহীগণকে বিশ্রামের অবকাশমাত্র না দিয়া টমাস যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নৈশান্ধকারে তাঁহার সৈন্যদলের অধিকাংশ পথ ভুল করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছিল। পর দিবস (২৭।৯।১৮০১) যথন ভোরের আলো ফুটিল টমাস দেখিলেন তাঁহার নিকট মাত্র এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য আছে। উহাদের লইয়াই তিনি প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। উহারা আর তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য দাঁড়াইল না, নিজেদের পলায়নের বেগ বাড়াইল মাত্র। সুধু বৃদ্ধ রাজপুতবীর পূরণসিংহ অসম সাহসের সহিত নিজ মুষ্টিমেয় অনুচরবৃন্দসহ পলাতকগণের পৃষ্ঠদেশ রক্ষার্থ আগুয়ান হইলেন এবং মহাবীরত্বের সহিত সম্মুখবর্ত্তী আক্রমণকারিদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের চারিটী কামান কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু পরিশেষে ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধের পর তাঁহার দল সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, স্বয়ং পূরণ সিংহ আহত অবস্থায় শত্রুকরে বন্দী হইলেন। এই যুদ্ধে টমাসের প্রায় একশত এবং মারাঠাপক্ষে সাতশতেরও অধিক লোক-ক্ষয় হইয়াছিল। স্মিথ অদূরে থাকিলেও নিজের তোপখানা রসদ বাঁচাইতে সচেষ্ট ছিলেন, বিপন্ন সহযোগীকে সাহায্যের কোন চেষ্টা করিলেন না। এ সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত ইতিহাসে পরে লিখিয়াছিলেন, "বিজয়লাভ করিয়া কেন যে টমাস আমার অনুসরণ করেন নাই তাহা আমি বলিতে পারি না। তিনি আমার পশ্চাদ্ধাবন করিলে আমার সমগ্র তোপখানাও তাঁহার হস্তগত হইত; আমার সৈন্যদলও বিনষ্ট হইত। আমাকে অব্যাহতি দিয়া টমাস জর্জ্জগড়ে রহিয়া গেলেন।" স্কিনারও টমাসের নিষ্ক্রিয়তার যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছেন। কিন্তু আসল কথা এই যে, দীর্ঘপথধাবনক্লান্ত পরিশ্রান্ত সৈনিকদিগকে লইয়া টমাসের পক্ষে আর ঐ কার্য্য সম্ভব হয় নাই; তাহাদিগকে বিশ্রামের অবসর দিতে হইয়াছিল। টমাস স্মিথের প্রশংসা করিয়া পরে বলিয়াছিলেন, "কাপ্তেন স্মিথ প্রথমে তোপখানা ও রসদ পাঠাইয়া দিয়া যে সুদক্ষ সৈনিকোচিত সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার জন্যই ঐগুলি রক্ষা পাইয়াছিল। তথাপি তাঁহার গোলাবারুদের অধিকাংশ আমাদের হস্তগত হইয়াছিল।"

পরদিবস প্রাতঃকালে টমাস আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিবার আয়োজন করিতেছেন এমন সময় চরমুখে সংবাদ পাইলেন যে বিপক্ষের অশ্বারোহী সেনা অদূরে আসিয়া দেখা দিয়াছে। উহারা ছিল বুর্কুয়্যার বাহিনীর অগ্রগামী দল, তাহাদের লইয়া মেজর স্মিথের অনুজ কাপ্তেন এমিলিয়স ফেলিক্স, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভাষায় বলিতে, "বিস্ময়কর ক্ষিপ্রগতিতে দশ ঘণ্টায় আশী মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ভ্রাতার সাহায্যে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন; ভ্রাতৃস্নেহ তাঁহাকে এই কার্য্যে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল।" তাঁহার সময়োচিত আগমনে পরাজিত লুই রক্ষা পাইলেন। বুর্কুয়্যার আগমনের আর অধিক বিলম্ব হইবে না, অতঃপর আত্মরক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক বুঝিয়া টমাস আর তাঁহাকে আক্রমণ না করিয়া জর্জ্জগড়ে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

পরদিবস (২৯।৯।১৮০১) বেলা তিন ঘটিকার সময় বুর্কুয়্যা জর্জ্জগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দিনমান অবসান হওয়ার আর অধিক বিলম্ব ছিল না, তথাপি তিনি শ্রান্তক্লান্ত ক্ষুৎপিপাসাকাতর সৈনিকগণকে বিন্দুমাত্র বিরামের অবসর না দিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। ইহা তাঁহার উচিত হয় নাই সকলেই বলিবেন; মনে হয় টমাসের নিকট বুদ্ধির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি বিষম ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। টমাস যুদ্ধার্থ যে স্থানটী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন তাহা আত্মরক্ষার বেশ উপযোগী ছিল। তাঁহার সম্মুখে ছিল গভীর বালুকাপূর্ণ নরম জমি, সে পথে কামান লইয়া অগ্রসর হওয়া দুষ্কর; পশ্চাতে ছিল প্রাচীরবেষ্টিত একটি গ্রাম; বামপ্রান্তে ছিল একটি উপদুর্গ ও কয়েকটি বালিয়াড়ী এবং দক্ষিণপ্রান্তে ছিল জর্জ্জগড়ের সুদৃঢ় দুর্গ। কোন পথেই তাঁহাকে সম্মুখ-আক্রমণ করা সহজসাধ্য ছিল না। টমাসের নিকট এই সময় দশ ব্যাটালিয়ন পদাতিক, ১১০০ নিয়মিত ও অনিয়মিত অশ্বারোহী ও ৫৪টী কামান ছিল। তিনি জানিতেন যে বিপক্ষের গোলাবৃষ্টি সহ্য করিতে অনভ্যস্ত তাঁহার সৈন্যদল বুর্কুয়্যার তোপখানার সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিবে না। সেইজন্য তিনি এই বালুময় ভূমি যুদ্ধার্থ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন কারণ ইহাতে শত্রুর গোলন্দাজদলের পক্ষে কামানসমূহ যথাযথ সন্নিবেশ করার ঘোর অসুবিধা ছিল এবং গোলা-

সমূহও মাটিতে পড়িয়া ফাটিবার বা ছিটকাইবার সম্ভাবনা ও কম ছিল।

অধিনায়কের আদেশে আদেশপালনে অভ্যস্ত সিপ্লিয়ার বীর সৈনিকগণ দৃঢ় পদে শত্রুর অভিমুখে অগ্রসর হইল। গভীর বালিরাশির উপর দিয়া তাহাদের যাইবার পথ, তদুপরি পঞ্চাশটী কামান হইতে বিপক্ষের গোলন্দাজ দল মুহুর্মুহু তাহাদের উপর অনলবর্ষণ করিতেছিল। টমাস যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। নরম বালিতে কামানের চাকা ও ভারবাহী পশুদিগের পদদেশ প্রোথিত হইতে থাকার ফলে তাহাদের পক্ষে কামান বসান সম্ভব হইল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শত্রুর গোলাবৃষ্টিতে তাহাদের ২৫টী গোলাবারুদের গাড়ী এবং কয়েকটি কামান বিনষ্ট হইল। পদাতিক সৈন্যগণও কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলনা। তখন অশ্বারোহী দল বিপক্ষের কেন্দ্রদেশ লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে ধাবিত হইল এবং প্রচণ্ড আক্রমণে তাহাদের চঞ্চল করিয়া তুলিল। টমাস বুঝিলেন আশু তাহার প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক নতুবা তাঁহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশে কাপ্তেন হপকিন্স ও কাপ্তেন বার্চ্চ নামক দুইজন সেনানী দুই প্রান্ত হইতে প্রত্যেকে দুই ব্যাটালিয়ন সিপাহী লইয়া বাহির হইলেন। "পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা মত তাহারা যে প্রকার ধীরতার সহিত শত্রুর সম্মুখে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিল তাহা দেখিয়া মনে হইল যেন তাহারা কুচকাওয়াজ করিতেছে।" দৃঢ়মুষ্টিতে বন্দুক ধরিয়া শত্রুর প্রতি গুলিবৃষ্টি করিয়া তাহারা দ্রুতপদে ধাবিত হইল এবং সঙ্গীনের আক্রমণে ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধের পর তাহাদিগকে বিতাড়িত করিল। ইতোমধ্যে বুর্কুয়ঁ্যার গোলন্দাজদল প্রাণপণ চেষ্টায় কয়েকটি কামান বসাইয়া গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিল। গ্রহবৈগুণ্যে একটি গোলাঘাতে কাপ্তেন হপকিন্স সাংঘাতিক আহত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন, তাঁহার একখানি পা উড়িয়া গিয়াছিল। অধিনায়কের পতনে সৈনিকগণের সকল সাহস অন্তর্হিত হইল, তাহারা রণে ক্ষান্ত হইয়া তাঁহাকে লইয়া বিশৃঙ্খলভাবে পশ্চাৎপদ হইল। কয়েক ঘণ্টা দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাভোগ করিয়া হপকিন্স গতায়ু হইলেন। টমাসের অফিসরগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মঠ ছিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যু টমাসের পক্ষে বিষম ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। এইরূপে ঠিক সাফল্যের মুহূর্ত্তে চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মী টমাসের সম্মুখে দেখা দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। বুর্কুয়ঁ্যার বিধ্বস্তপ্রায় বামপ্রান্ত পুনরায় সমবেত হইবার অবকাশ পাইয়া তাহাদের পরিত্যক্ত স্থান পুনরধিকার করিল। কিন্তু টমাসের গোলন্দাজগণের প্রচণ্ড অগ্নিবৃষ্টির জন্য তাহাদের আরও সম্মুখে অগ্রসর হইবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন বুর্কুয়ঁ্যার আদেশে সৈনিকগণ উচ্চাবচ ভূখণ্ডের মধ্যে যে যেখানে যতটুকু আশ্রয় পাইল তাহার অন্তরালে শুইয়া পড়িল। টমাসের সৈন্যগণও সেইভাবে বালিয়াড়ির অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছিল। তখন আর কেহই সম্মুখে অগ্রসর হইবার বা পশ্চাতে ফিরিবার চেষ্টা করিল না,—কেহই আর মাথা তুলিয়া অপরপক্ষের কামানবন্দুকের লক্ষ্যস্থল হইতে চাহিল না। এই ভাবে সন্ধ্যা সমাগত হইল। শোনিত রঞ্জিত রণক্ষেত্র নৈশান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে যুযুধান সৈনিকবৃন্দ সে রাত্রি সেইখানেই কাটাইল। পরদিবস প্রাতঃকালে আহতগণকে অপসারিত এবং মৃতদেহসমূহ সৎকার করিবার জন্য ছয় ঘণ্টার জন্য যুদ্ধ বন্ধ রহিল। মধ্যাহ্নে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পরও কোন পক্ষই বলপরীক্ষায় যত্নবান হইল না। বুর্কুয়ঁ্যা রণভূমের অধিকার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইলেন। টমাসও তাঁহাকে কোন বাধা দিলেন না।

এইরূপে জর্জ্জগড়ের যুদ্ধের অবসান হইল। ভারতবর্ষে ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয় সৈনিকগণ কর্ত্তৃক গঠিত ও পরিচালিত সেনাদল মধ্যে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে তন্মধ্যে ভীষণতায় ইহাকে অন্যতম প্রধান বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে খুব বেশী রকম লোকক্ষয় হইয়াছিল। *

* স্কিনারের মতে তাঁহাদের পক্ষে তিন চার হাজার এবং অপর পক্ষে দুই হাজার সৈনিক হতাহত হইয়াছিল। টমাস ঐ দুই সংখ্যা যথাক্রমে দুই হাজার এবং সাত শত বলিয়াছেন। স্মিথের মতে 'মোট ১১০০ অর্থাৎ যুদ্ধনিরত সৈন্যগণের এক তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হইয়াছিল। ইঁহারা তিনজনেই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। বুর্কুয়ঁ্যার আত্মচরিত সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার এই অংশের কয়েকখানি পাতা পাওয়া যায় না। স্কিনার প্রদত্ত সব তারিখ ও লোকসংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক নহে।

এ মিলিয়স এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লুই ফার্ডিনাণ্ড কোম্পানীর সৈনিক মেজর লুই স্মিথের পুত্র ছিলেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড প্রদেশে এ মিলিয়সের জন্ম হইয়াছিল। নিতান্ত অল্প বয়সে তিনি সিন্ধিয়ার সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পকাল পরেই ৭৬শ সংখ্যক রেজিমেন্টে কমিশন পাইয়া কোম্পানীর কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এ পদে কিন্তু আর তাঁহার বেশী দিন থাকা হয় নাই, কারণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট থাকিতে পাইবার লোভে শীঘ্রই তিনি আবার সিন্ধিয়ার কর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার অনতিকাল পরে পেরঁ তাঁহাকে কাপ্তেন লে মার্শার বিধবা পত্নীর বিদ্রোহ প্রশমন কার্য্যে পাঠাইয়াছিলেন। সে কথা অন্যত্র বলা যাইবে। ইহার পর তিনি হিন্দুস্থানী সওয়ার দলে নিযুক্ত হন এবং উহাদের সহিত টমাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করেন। টমাসের হস্তে লুই পরাজিত হইলে এ মিলিয়স অগ্রগামী অশ্বারোহীদল সহ আসিয়া ভ্রাতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। জর্জ্জগড়ের যুদ্ধে তিনি অশ্বারোহীসেনার বাম প্রান্ত পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং মহাবীরত্বের সহিত শত্রুব্যূহে চার্জ্জ করিবার সময় একটি গোলার প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার একখানি পা চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আনাড়ী চিকিৎসকগণ তাঁহার ভগ্ন পদদেশ ছেদন করিয়া দিয়াছিল। কয়েক দিন ধরিয়া মনুষ্যোচিত সাহস ও সহিষ্ণুতার সহিত দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৮ই অক্টোবর তারিখে এ মিলিয়স পরলোক গমন করেন। অন্তিম নিশ্বাসের সহিত তিনি সাক্ষেপে বলিয়াছিলেন "হায়! আমি নিজ রেজিমেন্টের সহিত ঈজিপ্টের প্রান্তরে নিহত হইলাম না কেন! তাহা হইলে ত আমার কোন খেদ থাকিত না।" অনিন্দ্যনীয় চরিত্র, স্নেহপ্রবণ, সুশিক্ষিত এই তরুণ সৈনিক নিজ গুণে সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিখ্যাতিও ছিল। সমসাময়িক বহু পত্রিকায় তাঁহার রচনাবলী বিক্ষিপ্ত দেখা যায়।

কাপ্তেন হপকিন্স কোম্পানীর জনৈক কর্ণেলের পুত্র ছিলেন। "তাঁহার পিতা তাঁহাকে একটি অনূঢ়া ভগিনীর ভারার্পণ পূর্ব্বক সংসারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন" স্মিথের এই কথা হইতে মনে হয় যে অপরাপর বহু ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের মত তাহার জননীও এতদ্দেশীয়া ছিলেন। হপকিন্স প্রথমে সিন্ধিয়ার কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে পেরঁর স্বজাতি প্রীতিতে তিনি ও হিয়ার্সে উভয়ে বিরক্ত হইয়া তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, প্রধানতঃ তাঁহার ফরাসী বিদ্বেষের জন্য জর্জ্জ টমাসের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হপকিন্স নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন এবং টমাসের পাঞ্জাব অভিযানে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। জর্জ্জগড়ের যুদ্ধে তাঁহার অকাল মৃত্যু টমাসের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। স্মিথ বলেন টমাসের কাছে দুই ব্যাটালিয়ন সিপাহী অপেক্ষা হপকিন্সের মূল্য অনেক বেশী ছিল। তাঁহার মত অপর একজন সৈনিক থাকিলে অমীমাংসিত জর্জ্জগড়ের যুদ্ধ পূর্ণ বিজয়ে পরিণত হইত। তিনি যে সুধু টমাসের শ্রেষ্ঠ অফিসর ছিলেন তাহা নহে; তাঁহার পরম সুহৃদ এবং একমাত্র বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। টমাস এই সময় যে মানসিক অবসাদ দেখাইয়া ছিলেন হপকিন্সের জন্য শোক তাহার একমাত্র কারণ।" স্কিনার বলেন যে "তাঁহার একমাত্র বন্ধু এবং বিশ্বাসভাজনকে হারাইয়া দীর্ঘ কয়েক বৎসরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সমরক্লান্ত টমাস উদ্বেগ ও অশান্তির ভারে দুর্ভাগ্যক্রমে আবার তাঁহার অভ্যস্ত দীর্ঘ দিনব্যাপী সুরাপানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় হপকিন্সের সহোদরাকে সহানুভূতি জানাইয়া একখানি পত্র লিখিয়া তখনকার মত আবশ্যকীয় ব্যয়নির্ব্বাহার্থ দুই হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে দরকার হইলে পরে আরও দিবেন।" টমাস নিজে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "হপকিন্স তাঁহার সমগ্র কর্ম্মজীবন মধ্যে যে অবিচলিত দৃঢ়তা ও জীবনের শেষে যে মনুষ্যোচিত সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহাকে প্রীতিদায়ক ব্যক্তি এবং সাহসী ও নির্ভীক সৈনিক বলিয়া বেশ বুঝা যায়।"

কামান নষ্ট হইয়াছিল খুব বেশী। বুর্কুয়্যাঁর ২৫টী গোলাবারুদের গাড়ী নষ্ট হইয়াছিল। ছুঁড়িবার সময় নরম বালিতে ঠিকভাবে recoil করিতে না পারায় তাঁহার ১৫টী এবং টমাসের ২০টী তোপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাঁহার অধস্তন সাতজন ইউরোপীয় অফিসরের মধ্যে কাপ্তেন এ মিলিয়স ফেলিক্স স্মিথ এবং লেফটেনাণ্ট ম্যাকালক নিহত হইয়াছিলেন এবং কাপ্তেন অলিভার ও কাপ্তেন রাবেলস নামক দুইজন ফরাসী সৈনিক আহত হইয়াছিলেন। টমাসের পক্ষে তাঁহার সকল কার্য্যে দক্ষিণহস্ত স্বরূপ কাপ্তেন হপকিন্স প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

বাড়ী ফিরবার পথে মনটা ক্রমেই যেন অবসন্ন হয়ে আস্‌ছিল—একটা গ্লানিতে ভরা। অনুতাপ অবশ্য একটুও হয়নি, কেন না এ বিশ্বাস আমার ছিল যে হরিশের অপরাধের গুরুত্ব এত বেশী যে তা ক্ষমা করা কোনও মতেই চলে না। তবুও ত ব্যাপারটা না ঘট্‌লেই ছিল ভাল—কেন ঘট্‌ল !

ভয়ও যে প্রাণে এতটুকুও হয়নি—এমন নয়। কি জানি, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। হয়ত বাবার কানে সব উঠবে। তিনি আমারই উপর রেগে না যান্। স্কুলেই বা মাষ্টাররা বলবে কি—সবাই আমাকে এত ভালবাসেন। তারপর হরিশেরইবা মার খাওয়ার ফলে কি হয় কে জানে। মারটা একটু গুরুতর রকমেরই হয়েছিল। কেন না আমি গিয়ে মুকুন্দর সঙ্গে যোগ দেওয়ার পরে হরিশ আর আত্মরক্ষা করার বিশেষ চেষ্টা করেনি। কেবল বলেছিল "দুজনে মিলে একজনার সঙ্গে লড়তে এসেছ—লজ্জা করে না।"

বাড়ীর পথে ফিরতে ফিরতে অনেকক্ষণ আমার আর মুকুন্দর মধ্যে কোনও কথা হয়নি। দুজনেই চুপ চাপ করে চলেছি। হঠাৎ মুকুন্দ আমাকে প্রশ্ন করল "শান্ত দা! বাড়ী গিয়ে কি বলা যাবে ?"

মুকুন্দর দিকে চেয়ে দেখলাম। বেচারীর জামাটা একেবারে ছিঁড়ে গেছে মুখখানা যেন লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। বল্‌লাম "বাড়ীতে গিয়ে এসব কথা কিছুই বলা চল্‌বে না। ২।১ দিন চুপচাপ থাকা দরকার। দেখি না কতদূর গড়ায়।"

মুকুন্দ বল্‌ল "তাত বুঝলাম। কিন্তু আমার জামাটা যে একেবারে ছিঁড়ে গেছে ?"

একটু ভেবে বল্‌লাম "এখুনিই বাড়ী ফিরব না। চল্ একটু নিরিবিলি কোথাও নদীর ধারে বসি। তারপর সন্ধ্যে ঘোর হলে তোর ঐ ছেঁড়া জামাটা নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে খালি গায় টুক্ করে অন্ধকারে বাড়ী ঢুকে পড়বি।"

* * * *

ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু কোনই গোল হল না, একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। আমাদের ভয় ছিল হরিশ কিম্বা তার বাপ হয় আমার বাবার কাছে, না হয় মুকুন্দর বাবার কাছে, না হয় হেডমাষ্টার মশাইএর কাছে নালিশ রুজু করবেন—এবং তাহলেই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। কিন্তু তারা কোনও নালিশ ত রুজু করেনই নাই বরং কোনও দিন স্কুলে হরিশের মুখে এ বিষয় কোনও আলোচনা শুনিনি।

খেলার মাঠে হরিশ আর আস্‌ত না কিন্তু স্কুলে হরিশের সঙ্গে আমার চোখোচোখি হলেই আমার কেমন যেন একটা লজ্জা হত এবং পাশ কাটিয়ে পালাবার পথ পেতাম না। সেই ত আমার বাপকে গালাগাল্ দিয়েছিল এবং তারই ফলে উচিত শিক্ষা পেয়েছে সে, তবুও তারই কাছে আমার যে কেন একটা লজ্জা হয়েছিল এ কথা আজও ভেবে কোনও কারণ খুঁজে পাইনা।

কিছুদিন গেল। আমার প্রাণের মধ্যে ব্যাপারটার জন্য গ্লানি তখন আর নাই। হরিশের প্রতি মনোভাবে, তখন,

কোনও রকম বিরাগ ত ছিলই না বরং অনেক সময় মুকুন্দর সঙ্গে পরামর্শ করেছি যে নিজেদের মান বাঁচিয়ে হরিশকে আবার কি করে—ফুটবল খেলার দলে টানা যায়। কিন্তু তবুও কোথায় যেন প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ব্যথাটা সেইদিন বিকেলবেলা থেকেই প্রাণের মধ্যে সুরু হয়েছিল, তবে প্রথম প্রথম সেই ঘটনাটি নিয়ে নানা বিভিন্নমুখী ঘাত প্রতিঘাতে প্রাণের এই বেদনাটী কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল, সব সময় ধরা দিত না। কিন্তু ক্রমে মন যতই শান্ত হল, প্রাণে কোনও আলোড়ন আর নেই, ততই এই ব্যথাটী যেন স্পষ্ট হয়ে সজাগ হয়ে উঠল আমার সমস্ত অন্তরে।

বাপ আমার "খুনে"—এত বড় অপবাদ আমার বাবার সম্বন্ধে, আমি সইতে পারছিলাম না। এই কথাটা আমার প্রাণের মধ্যে যেন একটা কাঁটার মত ফুটে রইল—উঠতে বসতে শুতে লাগে। কে বলেছে, কেন বলেছে; কে শুনেছে, কে না শুনেছে—এ সব কথা আর আমার মনেই ছিল না। কেবল ঐ কথাটী যেন একটা বাস্তব রূপ নিয়ে জগতের মধ্যে সত্য হয়ে রইল আমার চোখের সামনে। হরিশকে শাসন করেছিলাম। আরও যদি কঠোর শাস্তি তার হত, যদি হরিশ ও তার বাপকে মাধবপুর থেকে বিদেয়ও করে দিতাম, তবুও সে যে ঐ কথাটী বলেছে, মাধবপুরের আকাশে বাতাসে ঐ কথাটী লেখা হয়ে গেল, তাত আর পুঁছে ফেলা যেতনা। আমার বাপ রতন সা, যাঁর এত বড় নাম, এত খাতির, যাঁর গর্ব্বে আমার বুকখানা সব সময়ই ছিল ভরা—তিনি 'খুনে'। এই কথা আমাকেই শুনতে হল। আমার এত বড় গর্ব্বে এমন করে ঘা লাগ্‌ল—

একি সওয়া যায়।

মনের যখন এই রকম অবস্থা তখন একদিন সন্ধেবেলা আমি ও মুকুন্দ বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধারে গিয়ে বস্‌লাম। খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ চাপ্‌। হঠাৎ মুকুন্দ আমাকে প্রশ্ন করে বস্‌ল।

"হ্যাঁ শান্তদা! কথাটা কি সত্যি?"

আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। জিজ্ঞাসা করলাম—

"কোন কথা?"

মুকুন্দ বল্‌ল,

"ঐ যে সেদিন হরিশ যে কথাটা বলেছিল?"

মুকুন্দও কি তা হলে ঐ কথাটাই নীরবে ভাব্‌ছিল এতক্ষণ। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা। যারা যারা সেখানে ছিল সেদিন, সবাই বোধ হয় ঐ কথাটাই দিনরাত ভাবে। কেউত ভোলেনি তা হলে। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—

"কোন কথাটা রে?"

মুকুন্দ সঙ্গে সঙ্গে বল্‌ল,

"ঐ যে জ্যাঠামশাইএর নামে—"

একটু বিরক্তির সুরে বল্‌লাম,

"যত বাজে কথা। এ কখনও হতে পারে।"

মুকুন্দ চুপ করে গেল।

বাজে কথা যে এ বিষয় আমারত কোনও সন্দেহ ছিল না। অবশ্য কথাটার সত্যাসত্যর দিক দিয়ে কখনও ভেবে দেখিনি। কিন্তু কথাটা যে সত্য হতে পারে এ ধারণাও যে অসম্ভব।

কিন্তু মুকুন্দ! মুকুন্দ কি তা হলে কথাটার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দিহান। ছিঃ ছিঃ এত বড় অপমান শেষকালে মুকুন্দ পর্য্যন্ত বাবাকে করলে। আবার আমাকেই প্রশ্ন। একবার দারুণ ঘৃণাভরে মুকুন্দের দিকে চাইলাম। ভাবলাম—মুকুন্দ ছেলেটা কি!

বল্‌লাম,

"তুই একথা ভাব্‌লি কি করে?"

মুকুন্দ অত্যন্ত অপরাধীর মত বল্‌ল,

"না শান্তদা! আমি ভাবিনি। আজ দুপুরবেলা ঘটক মশাই আর কেষ্টদা ঐ কথা বল্‌ছিল।"

ঘটক মশাই আর কেষ্টদা মুকুন্দদেরই গোমস্তা। একটু চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

"কি? কি বল্‌ছিল তারা?"

মুকুন্দ কেমন যেন হয়ে গেল। চুপ করে রইল। একটু ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম,

"মুকুন্দ! সত্যি কথা বল। কি বল্‌ছিল তারা?"

মুকুন্দ একটু ইতস্ততঃ করে বল্‌লে,

"না, ঐ ঘটকমশাই বল্‌লে—সাতু ঘোষকে জ্যাঠামশাই হলে ফকীর মণ্ডলের দশা করত।"

উত্তেজিত স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম,

"তার মানে কি?"

মুকুন্দ ঠিক তেমনি ইতস্ততঃ করেই বল্‌ল—

"সাতু ঘোষ বড় পাজী। আমার বাবা ভাল মানুষ কিনা তাই কিছু বলে না।"

"তাই বুঝি ঘটক মশাই বললেন—আমাদের প্রজা হলে বাবা তাকে খুন করতেন।"

মুকুন্দ চুপ করে রইল।

তা হলে গ্রাম শুদ্ধ সবাই এই নিয়েই আলোচনা করে। কি অপমান! কি লজ্জা! বুকখানা যেন একখানা পাথর হয়ে উঠ্‌ল।

কতক্ষণ গুম হয়ে বসেছিলাম মনে নাই। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লাম,

"মুকুন্দ! বাড়ী যাও। আমি চল্‌লাম।"

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে হন্ হন্ করে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললাম। মুকুন্দ পেছন থেকে চীৎকার করে দুবার ডাক্‌ল "শান্তদা! শান্তদা!" শেষবারের ডাকটা যেন একটা চাপা কান্নার মত শোনাল।

* * * *

বাড়ীতে এসে কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে সটান শোবার ঘরে গিয়ে অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কত কী যে ভেবেছিলাম সে সব এখন এতদিন পরে বিস্তারিত লেখা কঠিন। ভেবেছিলাম যদি কাল সকালবেলা বিছানা থেকে উঠে দেখি এ সবই একটা দুঃস্বপ্ন, বাবার এই অপবাদ এক-রাত্রের স্বপ্নের মধ্যেই এর সৃষ্টি এবং স্বপ্নের মধ্যেই এর সমাপ্তি, তা হলে—। ভেবেছিলাম, এর কোনও কি উপায় নেই, এমন কোনও কি মন্ত্র নেই যার ফলে সমস্ত গ্রামবাসীরা এক মুহূর্ত্তে এ কথা একেবারে ভুলে যাবে। ভেবেছিলাম কোথায় কোন গহনবনে কোন সন্ন্যাসী সেই মন্ত্রটী জানে একবার সন্ধান পেলে আজই রাত্রে বেরিয়ে পড়তাম তার উদ্দেশ্যে।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নাই। মা যখন খাবার জন্য ডাকৃতে এলেন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। বেদনার তীব্রতাটা কমে গেছে—সমস্ত প্রাণে একটা আড়ষ্ট ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম। আমারই মা আমারই কাছে দাঁড়িয়ে আছেন—নীচে বারান্দায় ভাতের থালায় সাদা সাদা ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, মাছের ডিম ভাজা, মাছের ঝোল্ একবাটী দুধের ওপর সর ভাস্‌ছে—এই সব কল্পনার মধ্যে একটা যেন জোর পেলাম প্রাণে। মার হাত ধরে নীচে খেতে গেলাম।

রাত্রে খেয়ে উঠে বিছানায় শুয়ে কেমন যেন একটা অবসন্নতায় প্রাণটা ভরে গেল। নানান রকম এলোমেলো ভাবছি, কোনও একটা চিন্তাকে আঁকড়ে ধরতে পারছি না, এমন সময় কেন জানিনা, এই প্রথম—হঠাৎ মনে প্রশ্ন উঠল—কথাটা সত্যি নয়ত! আমাদের স্কুলে এসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার মশাই বড় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি একটা কথা প্রায়ই বলতেন—পাপ কখনও চাপা থাকে না, আগুন কি কাপড় দিয়ে চাপা যায়। তবে—

কথাটা ভাবা মাত্রই সমস্ত প্রাণটায় হাজার বিছে একসঙ্গে কামড়ে দিলে। কেমন যেন শিউরে উঠল সমস্ত শরীর।

* * *

সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গেই হঠাৎ মনে হল কি যেন একটা মস্ত কাজ আমার বাকী—আজই করতে হবে।

সেদিন উঠতে একটু বেলা হয়েছিল। পুকুর পাড়ে গিয়ে দাঁতন দিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে আমাদের পুকুর পাড়ের বাগানের দিকে চেয়ে ছিলাম। সূর্য্যদেব তখন পূর্ব্বাকাশে অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েছেন। সকাল বেলার তাজা সোনালী রংয়ের রোদটুকু ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের বাগানের গাছগুলির মাথায় মাথায়, পুকুর পাড়ের ঘন ঘাসের গায়ে গায়ে। কালও ঠিক যেমন দেখেছিলাম, আজও জগৎটা ঠিক তেমনি আছে—তবুও কেমন যেন মনে হচ্ছিল জগৎটা যেন আজ নতুন রূপে ধরা দিল আমার চোগে। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপর দিয়ে এক রাত্রে কি যেন একটা আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। আমার মধ্যে কালকের জগৎটা আজকে যেন আর নাই।

মুখ ধুয়ে চল্‌লাম বৈঠকখানা বাড়ীর উপরে আলীমিঞার সঙ্গে দেখা করতে। তার সঙ্গে আমার একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া হওয়া দরকার। সেইটেই যেন সকালকার প্রথম

কাজ। তারপর অনেক কাজ, আমার যেন অনেক কাজ বাকি! তারপর সমস্ত পৃথিবীটার সঙ্গে যেন একটা নতুন করে হিসেব নিকেশ করে নিতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আলীমিঞার সঙ্গে সকালে কোনও কথাই হলনা। যতবার ওপরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি—সমস্ত সকালটা আলীমিঞা বাবার ঘরে বাবারই সামনে বসে খাতা খুলে কি যেন কাজে মহাব্যস্ত। মাঝে মাঝে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু উপায়ই বা কি?

আলীমিঞাকে যখন নিরিবিলি পেলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

সমস্তদিন আজ আমি বাড়ী থেকে বেরুইনি! বিকেল তখন চারটে বেজে গেছে, আমি আমার শোবার ঘরে চুপ করে বিছানায় শুয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় মুকুন্দ ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকল। মুকুন্দর মুখের দিকে চেয়েই আমার বুকটা হঠাৎ যেন মুকুন্দর প্রতি কেমন একটা মায়ায় দুলে উঠল। কেমন যেন সঙ্কুচিত তার সমস্ত ভঙ্গী, কেমন যেন অপরাধীর সন্ত্রস্ত চাহনি তার চক্ষে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—ছেলেমানুষ মুকুন্দ—কাল সন্ধ্যাবেলা বড় নিষ্ঠুরের মত একলা তাকে নদীর ধারে প্রান্তরে ফেলে চলে এসেছিলাম। আর আজ সমস্তদিন তার কথা একবারও মনে ভাবিনি।

বললাম "এই যে মুকুন্দ! এসো এসো। বাড়ীতে আর ভাল লাগছে না—চল একটু বেড়িয়ে আসি।"

মুকুন্দকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েও ঠিক শান্তি পেলাম না। সন্ধ্যা হতে না হতেই বাড়ী ফিরে আসার পথে আমাদের পুকুরের পূবের পাড়ের বাঁধান ঘাটে আলীমিঞার সঙ্গে দেখা হল। তিনি চুপটি করে বসে আছেন যেন আমারই প্রতীক্ষায়।

ধীরে আলীমিঞার কাছে এগিয়ে গিয়ে বসলাম।

আলীমিঞা জিজ্ঞেস করলেন—

"কতদূর বেড়িয়ে এলে খোকাবাবু?"

আমি বললাম "এই একটু নদীর ধারে।"

আলীমিঞা জিজ্ঞেস করলেন "তা আজ সন্ধ্যেবেলা মাষ্টার আসবেন না?"

বললাম "হ্যাঁ—এখনও একটু দেরী আছে। তা আপনি এখানে বসে আছেন, বাড়ী গেলেন না?"

আলীমিঞা বললেন "না। আজ যে কখন ছুটী পাব জানিনা। সন্ধ্যের পরে বড় বাবুর সঙ্গে আবার খাতা পত্র নিয়ে বসতে হবে। সাতঘাটা মহল নিয়ে বড় গোলমাল চলেছে কি না—"

হঠাৎ যেন একটু উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম "সাতঘাটা! সাতঘাটা! যেখানে ফকীর মণ্ডলের বাড়ী?"

আলীমিঞা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন "তা ফকীর মণ্ডলকে তুমি চিনলে কি করে খোকাবাবু?"

আমি বললাম "বলুন না, সাতঘাটায় ফকীর মণ্ডলের বাড়ী কি না?"

আলীমিঞা একটু যেন চুপ করে থেকে বেশ সহজ সুরেই বললেন "হ্যাঁ। তা ফকীর মণ্ডল ত এখন আর নেই খোকাবাবু। সে মারা গেছে।"

হঠাৎ আলীমিঞার উপর কেমন যেন রাগ হয়ে গেল। একটু তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞাসা করলাম "তা, আপনিইত তাকে খুন করেছেন?"

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে, তাই আলীমিঞা আমার কথা শুনে চমকে উঠলেন কিনা ঠিক বুঝতে পারলাম না। চুপ করে রইলেন।

বললাম "সত্য কথা বলুন না—চুপ করে আছেন যে।"

গম্ভীর কণ্ঠে আলীমিঞা জিজ্ঞেস করলেন,

"তা এসব কথা তোমায় কে বলেছে খোকাবাবু?"

আমি উত্তেজিত স্বরেই বললাম,

"সবাই ত বলে, গ্রাম শুদ্ধ লোকেই ত বলছে।"

আলীমিঞা আবার চুপ করে রইলেন। আমার রাগ যেন আলীমিঞার নীরবতাকে আশ্রয় করে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। বেশ একটু কটু সুরে বললাম,

"কি? আমার কথার উত্তর দেবেন না—ঠিক করেছেন!"

আলীমিঞা শান্ত অথচ বেশ একটু তীক্ষ্ণ সুরে বললেন—'তুমি ছেলেমানুষ, এসব কথায় তোমার কি দরকার? বড় হও তখন প্রয়োজন হলে সব বুঝিয়ে দেব। এখন রাত হয়ে গেল, পড়তে যাও।"

আলীমিঞার মুখে এ রকম সুরে এ রকম ধরণের কথা কখনও ত শুনিনি। কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অন্য দিকে চেয়ে খানিকটা চুপ করে বসে রইলাম। আলীমিঞাও আর একটি কথাও কইলেন না।

একটু পরে ধীরে ধীরে ঘাট ছেড়ে চলে এলাম। আসার সময়ও আলীমিঞা আমার সঙ্গে কোনও কথা কননি। নিজের মনে অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন আকাশ পাতাল ভাবছেন।

বেশ মনে আছে সেই ভরা সন্ধ্যাবেলা বাগানের পথে ফিরতে ফিরতে আসল কথাটা প্রাণের মধ্যে কোথায় যেন [illegible]লিয়ে গেল। বড় করে প্রাণে বাজতে লাগল—আলীমিঞার সেই রুক্ষ ব্যবহার। আজ পর্য্যন্ত আলীমিঞার কাছে সস্নেহ আদরই পেয়ে এসেছি, কখনও এতটুকু [illegible] পর্য্যন্ত পাইনি। কিন্তু আজ একি হল!

সন্ধ্যাবেলা মাষ্টার এলেন, পড়িয়ে গেলেন—কিন্তু আলীমিঞার এই ব্যবহার আমি যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। সমস্ত প্রাণখানা থেকে থেকে ব্যথায় টন্‌টনিয়ে উঠ্‌তে লাগল।

একটা ভারী প্রাণ নিয়ে রাত্রে বিছানায় শুতে না শুতেই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু খানিকটা পরেই কিসের যেন একটা শব্দে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। বুঝলাম বাবার শোবার ঘরে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

আজও বেশ স্পষ্ট মনে আছে হঠাৎ বুকের ভিতরটা কিসের যেন একটা ধাক্কা লেগে কেঁপে উঠ্‌ল—আমার বাপ 'খুনে'! খুনীর রক্ত আমার শরীরে! (ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত

সংশয়

শ্রীবিমলজ্যোতি সেনগুপ্ত

তবে আমায় কেমন কোরে বাঁধবে আমায় বাঁধবে,
আমার পানে চেয়ে যদি আমার আঁখি ধাঁধবে?
চাইবে নাকো আমার কাছে
দেবার আমার যে ধন আছে,
লাজে ভয়ে রইবে দূরে, আকুল হ'য়ে কাঁদবে,
তবে আমায় কেমন কোরে বাহুর ডোরে বাঁধবে?

কেমন কোরে আমায় তুমি করবে অপহরণ?
এসো তবে আমার কাছে রিক্ত নিরাভরণ!
চিত্তে তোমার যে সুর বাজে [illegible]!
সে সুর কিছু বুঝি না যে,
সঙ্কোচে আজ কাজ কি প্রিয়া? মিথ্যা এ আবরণ।
এবার তবে তোমার বুকে দাও আমারে শরণ।

আর্থার সোপেনহাওয়ের

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

১

মানুষের জীবনে কোন্ শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবতী সে সম্বন্ধে ইউরোপের দর্শনশাস্ত্রে তিনটি বিভিন্ন মতধারা প্রচলিত আছে। Thinking, Feeling ও Willing অর্থাৎ চিন্তন, অনুভূতি ও ইচ্ছা বা বাসনা এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি যে মানবজীবনের আদিম ভাব এ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা ভিন্ন মত।

সাধারণের ধারণা যে, মানুষের জীবনে বুদ্ধিশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবতী, কিন্তু জার্ম্মাণ দার্শনিক সোপেন-হাওয়ের (Schopenhauer) সে কথা স্বীকার করেন না। মানুষের ইচ্ছা, তার কামনা—যাকে সাধারণতঃ আমরা দ্বিতীয় স্থান দিয়ে থাকি তাকেই তিনি মানবজীবনের পরমা শক্তি বলে মনে করেন।

এই ইচ্ছা বা কামনা স্বতঃস্ফূর্ত্ত; বুদ্ধি কিংবা জ্ঞানের কোনও তোয়াক্কা রাখে না। সময়ে সময়ে হয়ত মনে হয় যে বুদ্ধি ইচ্ছাকে পরিচালিত করিতেছে কিন্তু সে যেন ভৃত্য প্রভুকে পথ দেখাইতেছে মাত্র। ইচ্ছা যেন শক্তিমান জন্মান্ধ; চক্ষুষ্মান্ কিন্তু খঞ্জ বুদ্ধিকে কাঁধে লইয়া চলিয়াছে। আমাদের প্রয়োজন হয় বলিয়া যে আমরা কোনও বিশেষ বস্তু কামনা করি তা নয়; আমরা উহা কামনা করি বলিয়াই মনে করি যে উহার প্রয়োজন হইয়াছে।

আমাদের পরাজয়ের কথা, গ্লানির কথা, লজ্জার কথা আমরা কত শীঘ্র ভুলিয়া যাই কিন্তু আমাদের বিজয়ের, গৌরবের, কৃতিত্বের কথা বহুদিন স্পষ্ট মনে থাকে। ইহার মানে আর কিছুই নয়; আমরা যাহা মনে রাখিতে চাই তাহাই মনে থাকে, যাহা চাই না, সহজেই ভুলিয়া যাই। স্মৃতি আমাদের ইচ্ছার সেবাদাসী মাত্র। Memory is the menial of will.

বিকারগ্রস্ত রোগীর মত মানুষের যে ব্যাকুলতা, উদর-পরিতৃপ্তি ও ইন্দ্রিয়সুখের জন্য যে লালায়িত ভাব, উহা যে বুদ্ধিপ্রসূত এমন মনে হয় না। ইচ্ছাশক্তি এতই তীব্র যে বুদ্ধি বা জ্ঞান উহাকে দমন করিতে পারে না। বুদ্ধি ইচ্ছার অস্ত্র বিশেষ; আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইচ্ছাশক্তি ইহাকে উদ্ভূত করিয়াছে।

অধিক কি, আমাদের স্থূল শরীরও ইচ্ছার দ্বারাই তৈয়ার হইয়া থাকে। ইচ্ছা বা কামনা (সাধারণে যাহাকে জীবন বলিয়া জানে) প্রণোদিত হইয়া ভ্রূণের উপরে যে রক্তচলাচল হয় তাহাতেই তাহার উপরে দাগ পড়িয়া পড়িয়া শিরা ও উপ-শিরা তৈয়ার হয়। জানিবার ইচ্ছার ফলে মস্তিষ্কের সৃষ্টি, ধরিবার ইচ্ছাতে হাতের এবং খাইবার ইচ্ছাতে পাকস্থলীর উদ্ভব।

Even the body is the product of the will. The blood pushed on by that will which we vaguely call life, builds its own vessels by wearing grooves in the body of the embryo; the grooves deepen and close up, and become arteries and veins. The will to know builds the brain, just as the will to grasp forms the hand, or as the will to eat develops the digestive tract.

ইচ্ছা ও মানবশরীর এ দুটি যে বিভিন্ন তাহা মনে করিবার কোনও হেতু নাই। শরীর শুধু স্থূল ইচ্ছা। ইচ্ছার প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই সেইমত শরীর সৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলি যে যে ইচ্ছা প্রকাশ করে ঠিক তাহারই অনুরূপ হইয়া গড়িয়া ওঠে। তাহারা সেই সেই বাসনার বাহ্য প্রকাশ।

বুদ্ধির বৈকল্য উপস্থিত হয়, সময়ে সময়ে তাহার শ্রান্তি

আসে কিন্তু ইচ্ছা বা কামনার কখনও নিবৃত্তি হয় না। নিদ্রা মানুষের মস্তিষ্ককে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলে কিন্তু ইচ্ছা বা বাসনাকে জাগাইয়া তুলিতে বা তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিতে কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। সুপ্ত অবস্থায়, বুদ্ধি যখন বিশ্রাম করে, মানবজীবন যখন জড়-জীবনের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যায়, সেই সময় বাঁধন-হারা বাসনারাজি স্ফূর্ত্তি লাভ করে। তাহাদের সত্য স্বরূপ তখনই প্রকাশ পায় যখন বুদ্ধির শাসনদণ্ড তাহাদের মাথার উপরে আন্দোলিত হয় না।

কিন্তু এই যে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি, এ কিসের ইচ্ছা? সোপেন-হাওয়ের বলেন যে ইহা কেবল মাত্র জীজিবিষা। বাঁচিয়া থাকা—শুধু বাঁচিয়া থাকা নয়, সম্পূর্ণভাবে বাঁচিয়া থাকা। জীবন যে জীব মাত্রেরই কত প্রিয় আলোচনা করিয়া তাহা বুঝাইতে হইবে না। এই যে আদিম জীজিবিষা, সোপেন-হাওয়ের বলেন ইহাই পরম ও চরম সত্তা।

সকলেই বাঁচিতে চায় অথচ মৃত্যু আসিয়া সকলেরই গতিরোধ করে। তাই মৃত্যু জীবের চিরবৈরী। মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার প্রাণপণ চেষ্টা হইতেই প্রজনন ব্যাপারের উৎপত্তি। যৌবনে পা দিয়াই যে সকল প্রাণী সন্তান উৎপাদন করিবার জন্য ব্যাকুল হয় তাহার কারণ আর কিছুই নয়, তাহার মধ্যে যে জীজিবিষা ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান আছে উহাই তাহাকে প্রচলনের চেষ্টায় ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাহার দিন শীঘ্রই ফুরাইবে কিন্তু তবু সে যে বাঁচিয়া থাকিবে তাহার সন্তানের মধ্যে, এই উদ্দেশ্যেই জীব মাত্রেই প্রজনন প্রয়াসী।

এই বিরাট ব্যাপারে বুদ্ধির কোনই অধিকার নাই। প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা যে এ রাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি সহজেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যাহার যে জিনিষটুকুর অভাব সে তাহার সাথীর মধ্যে সেইটুকুরই সন্ধান করে। এখানেও প্রবৃত্তিরই কারসাজী। সন্তান যাহাতে পূর্ণত্ব লাভ করে সেই জন্যই তাহার পিতা ও মাতা না জানিয়াও এইরূপ করিয়া থাকে।

দুর্ব্বল পুরুষ সবলা নারী পাইতে চায়। আপনার যাহা নাই, যাহার সেইগুলি আছে তাহারই প্রতি মানুষ অধিক আকৃষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি বা বিবেচনা মানুষকে কোনই সাহায্য করে না। তাহার ভিতর হইতে কি একটা শক্তির প্রেরণা যেন তাহাকে কার্য্য করায়। যৌবনেই প্রজনন সম্ভব ও সেইজন্য যৌবনে নরনারী পরস্পরের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

কোনও দুইটি বিশেষ নরনারী সুখী কি অসুখী হইল, প্রকৃতি তাহা দেখে না। যে দুটী স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের একান্ত উপযোগী (শুধু প্রজনন ব্যাপারে) প্রকৃতি তাহাদের মিলন ঘটাইয়া দেয়। তাহাদের দ্বারা প্রজা-সৃষ্টি প্রকৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য; ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখে দৃষ্টিপাত করে না।

২

সোপেন হাওয়েরের দুঃখবাদ

জগৎ প্রবৃত্তিমূলক সুতরাং উহা দুঃখমূলক। প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা প্রকাশ পায় তখনই যখন কোনও অভাব বিদ্যমান থাকে। একটি ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইলে আর দশটি তাহার স্থান জুড়িয়া বসে। প্রবৃত্তি, বাসনা বা ইচ্ছা অনন্ত; কাহারও কখনও পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ হইতে পারে না। আমাদের বাসনা তৃপ্তি যেন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়ার মত; কোনও প্রকারে আজ তাহার ক্ষুধা মেটে কিন্তু কাল আবার ভিক্ষা করিতেই হইবে।

যতক্ষণ প্রবৃত্তি আমাদের চেতন জীবনের অধীশ্বর থাকিবে, যতদিন আশা-ভয় দোদুল বাসনারাশি আমাদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করিবে, যতদিন আমরা প্রবৃত্তির দাস—ততদিন কোনও মতেই আনন্দ বা শান্তি লাভ হইতে পারে না।

যতদিন একটি অভাব পূর্ণ না হয় ততদিন অন্যান্য আকাঙ্ক্ষাগুলি পিছনে লুকাইয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু সেই অভাবটি মিটিলেই আর একটি অভাব আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এই চির-আকাঙ্ক্ষা, চির-হাহাকার, চির-যাচ্ঞা প্রবৃত্তির ধর্ম্ম।

অভাব অর্থাৎ অপূর্ণতা মনকে পীড়া দেয়। জীবন অভাবমূলক সুতরাং উহা বেদনামূলক। দুঃখ ও বেদনা জীবনে একমাত্র সত্য-আনন্দ বা সুখ বলিয়া কিছু নাই। যে ক্ষণটুকু আমরা দুঃখ না পাই, সেই ক্ষণটুকুই আমাদের

মনে হয় আনন্দময়। আমরা যাহাকে সুখ বা পরিতৃপ্তি বলিয়া মনে করি তাহার কোনও মূল্য নাই। আমাদের কখনও সুখ বা আনন্দ লাভ ঘটে না। কিছুক্ষণের জন্য দুঃখ বা বেদনা বন্ধ থাকে এবং তখনই মনে করি বুঝি বা বিশাল কিছু লাভ হইল।

জীবন দুঃখময়, কারণ যদি কোনও দিন সমস্ত অভাব মিটিয়া যায়, বিরক্তি ও অবসাদ ennui আসিয়া জীবনকে তিক্ত করিয়া তোলে। যখন কোনও কাজ থাকে না (অর্থাৎ চাহিবার কিছুই থাকে না) তখন আমাদের "ভালো লাগে না।" বিরক্তি আসিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, আমরা বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে চাই অর্থাৎ নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া নূতন বেদনা জাগাইয়া তুলি, কারণ একমাত্র বেদনার পীড়নেই আমরা মোহাচ্ছন্ন হইয়া কাল কাটাইতে পারি।

জীবন দুঃখময়, কারণ যে জীব যত উন্নত তাহার দুঃখ ততই বেশী। যাহার প্রবৃত্তি যত বহুমুখী ততই তত বেশী বেদনা। জ্ঞান যত প্রসার লাভ করে, চৈতন্য যত স্বচ্ছ হয়, বেদনাও তত বৃদ্ধি পায়। আবার, মানুষ জাতির মধ্যে যে যত বেশী জানে, যে যত বেশী বোঝে, তাহার তত বেশী বেদনা। The more intelligent he is, the more pain he has.

জীবন দুঃখময়, কারণ এ জীবন যুদ্ধক্ষেত্র। স্থলে, জলে, আকাশে, বাতাসে সর্ব্বত্র সবল দুর্ব্বলকে সংহার করিতে চায়।

"ভেকো ধাবতি তক্ষ ধাবতি ফণী
সর্পং শিখী ধাবতি।
ব্যাধো ধাবতি শিখিনং বিধিবশাৎ
ব্যাঘ্রোঽপি তং ধাবতি॥

আমাদের বিবাহিত জীবন সুখের নয়, কৌমারাবস্থাও দুঃখের। একা ভালো থাকি না, সকলে মিলিয়া থাকিলেও খারাপ লাগে। ঘনাইয়া বসিতে চাই, বেশী ঘনাইয়া বসিলে পরস্পরের গায়ে কাঁটা ফুটে; দূরে সরিয়া গেলে মন কেমন করে—ইচ্ছা হয় আবার ঘনাইয়া বসি।

We are unhappy married and unmarried we are unhappy. We are unhappy when alone and unhappy in society: We are like hedgehogs clustering together for warmth, uncomfortble when too closely packed and yet miserable when kept apart.

জীবনের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে আমাদের কোনও চেষ্টায় কিছুই হয় না; পরিশ্রম, যত্ন, অধ্যবসায় এ সকলের কোনও মূল্য নাই। যাহা কিছু ভালো, যাহা কিছু সুন্দর—সবই মরীচিকা; জগৎ যেন দেউলিয়া, জীবন-ব্যবসায়ে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের অঙ্ক অনেক ভারী।

৩

উপায়

"মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাম্" সোপেনহাওয়েরও এই নীতি। তিনি বলেন যে ধনোপার্জ্জন দ্বারা শান্তি বা সুখ লাভ করার প্রয়াস বাতুলতা। মানুষ নিজে কি তাহারই উপর তাহার সুখী হওয়া নির্ভর করে—তাহার কি আছে বা নাই তাহাতে কিছুই যায় আসে না। It is quite certain that what a man is contributes more to his happiness than what he has.

ধনে সুখ নাই, জ্ঞানেই শান্তি। ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হইলেও সাধনার দ্বারা জ্ঞানের প্রবৃত্তি-নিরোধকারিণী ক্ষমতা লাভ হইয়া থাকে।

প্রবৃত্তির বেগ অনেক মন্দীভূত হইয়া আসে যদি সমস্ত কাজকেই কার্য্যকারণ শৃঙ্খল নিয়মের বশবর্ত্তী বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা হয়। দশটি জিনিষ যদি চিত্তকে আলোড়িত করিতে আরম্ভ করে তাহার মধ্যে নয়টি কিছুই করিতে পারিবে না যদি তাহাদের ঘটিবার কারণ ও প্রকৃত সত্তা আমাদের জানা থাকে। দুর্দ্দম অশ্বের যেমন বল্গা, প্রবৃত্তিরও তেমনি জ্ঞানের রশ্মি।

আমাদের প্রবৃত্তিগুলির সম্বন্ধে আমরা যত বেশী জানিব, আমাদের উপর তাহাদের ক্ষমতা ততই লোপ পাইবে। Si vis tibi omnia subjicere, subjice te rationi—যদি

সকল জিনিষকে তোমার অনুগত করিতে চাও, আপনাকে বুদ্ধির অনুগত কর।

দর্শন শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্তির শুদ্ধি হয়। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের অর্থ জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা—শুধু বই পড়া নয়। অপরের চিন্তার স্রোত যদি ক্রমাগত মনে আসিয়া ঘা দিয়া যায় তাহা হইলে নিজের চিন্তাশক্তি ক্রমে শিথিল হইয়া আসে ও অবশেষে চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পায়। অতএব আত্মানং বিদ্ধি।

জীবনের অভিজ্ঞতা পাঠের মূল সূত্র হোক। চিন্তা ও জ্ঞান হোক তাহার টীকা ও ভাষ্য। শুধু রাশি রাশি চিন্তা ও জ্ঞান এবং মাত্র যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা যেন দুটি ছত্র পুঁথি ও তাহার চল্লিশ পৃষ্ঠা টীপ্পনী।

যে ব্যক্তি পার্থিব বস্তুকে ভোগ্য বা কাম্য বলিয়া মনে করে তাহার দুঃখ চিরদিন। বস্তু-জগৎকে যে ভোগ্য বা কাম্য বলিয়া মনে করে না, এই জগৎ হইতে চাহিবার যাহার কিছুই নাই, তাহার জ্ঞান প্রবৃত্তির স্পর্শে কলুষিত হয় না, একমাত্র সেই শান্তির অধিকারী। এ যেন গীতার প্রতিধ্বনি।

বিহায় কামান যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কার সঃ শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

৪

ঋষি

ঋষি বা মনীষী প্রবৃত্তিজয়ী জ্ঞানের চরম স্তরের পুরুষ। প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যতখানি চায় তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী যাহার জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাহাকেই সোপেনহাওয়ের genius বা মনীষী বা ঋষি বলেন।

ঋষি ও স্ত্রী জাতির মধ্যে সেইজন্য চিরশত্রুতা। স্ত্রী জাতি সৃষ্টিরূপিণী। তাহার ধর্ম্ম সন্তানোৎপাদন করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করা। জ্ঞানকে প্রবৃত্তির পদানত করিয়া জাতিগত অমরত্ব রক্ষা করা স্ত্রীর ধর্ম্ম।

স্ত্রী জাতির বহুবিধ মানসিক ক্ষমতা থাকিতে পারে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কখনও মনীষার স্ফূর্ত্তি হয় না কারণ তাহারা চিরদিন অন্তর্মুখী। জগৎকে তাহারা বিচার করে ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া—নিজেকে ছাড়িয়া তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না।

কিন্তু মনীষা বা প্রতিভার অর্থ মনের সম্পূর্ণ বহির্মুখী ভাব। মনীষী আপনার সকল স্বার্থ, সকল ইষ্ট, সকল উদ্দেশ্য বিসর্জ্জন দিয়া, আপনার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়া শুধু জ্ঞানময় হইয়া স্বচ্ছ নয়নে জগৎকে দেখিতে পারেন।

প্রবৃত্তির বাঁধন খসিয়া পড়িলে বস্তুজগতের প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মনীষার মায়ামুকুরে জগতের যে ছায়া পড়ে তাহার মধ্যে প্রবৃত্তির স্পর্শ থাকে না বলিয়া তখন তাহার সত্যরূপ প্রকাশ পায়। ব্যষ্টির পিছনে যে একত্ব, বস্তুর পিছনে যে বাস্তবতা, লীলাজগতের আড়ালে প্রকৃতির সত্যরূপ তখনই উদ্ঘাটিত হয়।

মনীষীর ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব লোপ পায় বলিয়া কাহারও সহিত সে মিশিতে পারে না। সামাজিক বলিয়া কখনও আদৃত হওয়া তাহার ভাগ্যে নাই, সকলেই তাহাকে অদ্ভুত বলিয়া মনে করে। সে ভাবে সেই পরম সত্তার কথা, বিশ্বের প্রাণের কথা, চিরন্তনীর কথা, আর সামাজিক জীব ভাবে বর্ত্তমানের কথা; তাহার জীবনের গণ্ডী অনেক ছোট, তাই দু'জনার মিলন হয় না।

প্রবৃত্তিস্পর্শকলুষহীন জ্ঞান, আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া চিত্তের যে রসানুভূতি সোপেনহাওয়ার তাহাকেই আর্ট বা সৌন্দর্য্যবোধ বলেন। যতক্ষণ মানুষ তাহার আপন ব্যক্তিত্বের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না ততক্ষণ তাহার প্রকৃত রস-বোধ হয় না। কাব্য, চিত্র বা জগতের রূপরাশির রস আস্বাদন করিতে হইলে আপন খণ্ড ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া তাহাদের সত্তার সহিত একীভূত হইতে হইবে।

সোপেনহাওয়ের বলেন বুদ্ধের ধর্ম্ম মহান কারণ সে ধর্ম্মের চরম আদর্শ নির্ব্বাণ বা প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ পরাজয়। ইউরোপের দার্শনিকদিগের তুলনায় ভারতের ঋষি বা দ্রষ্টা জীবনের রহস্য আরও ভালো ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চিত্ত ছিল অন্তর্মুখী, বিশ্বের তাঁহারা ব্যাখ্যা করিতেন অন্তরের দিক দিয়া। তাঁহারা জানিতেন যে 'অহং' জ্ঞান মিথ্যা। ব্যক্তি বলিয়া কিছুই নাই; একমাত্র সত্য সেই পরম পুরুষ—তৎ সৎ।

The Hindus saw that the 'I' is a delusion; that the individual is merely phenomenal and that the only reality is the Infinite One— "That art thou."

কিন্তু নির্ব্বাণই শেষ নয়। নির্ব্বাণে খণ্ড ব্যক্তিত্ব লোপ পায় কিন্তু ততঃ কিম্। জীবনের হিল্লোল তাহাতে আসে না—তাহার সন্তান-সন্ততির মধ্য দিয়া নিরবচ্ছেদে বহিয়া যায়। মানুষের নির্ব্বাণ লাভ হয় কিন্তু মানবজাতির কি নির্ব্বাণ লাভ হইবে না? সমগ্র মানবের মুক্তি হইবে কবে? How can 'Man' be saved? Is there a Nirvana for the race as well as for the individual?

সমগ্র মানবজাতিরও নির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে যদি সন্তানোৎপাদনের ইচ্ছা থামিয়া যায়। প্রজনন-ইচ্ছার চরিতার্থতা সম্পূর্ণরূপে দূষনীয় কারণ উহাই জীবন-লালসা বা জীজিবিষার প্রধান সহায়। নরনারীর সঙ্গমে যে একটি লজ্জার ভাব আছে তাহার কারণ তাহারা জানে যে তাহারা বিশ্বাসঘাতক—মানুষকে চিরদিন প্রবৃত্তির পদানত করিয়া রাখিবার ষড়যন্ত্র তাহারা করিতেছে।

৫

নারী

সোপেনহাওয়ের নারী বিদ্বেষী। তিনি বলেন যে মায়াবিনী নারী পুরুষকে প্রলুব্ধ করিয়া প্রবৃত্তির পদানত করায়। প্রবৃত্তির সীমা ছাড়াইয়া যে উঠিতে চাহে তাহাকেও কুহকিনী নারী প্রলুব্ধ করিতে ছাড়ে না এবং সুবিধা পাইলেই তাহার দ্বারাও প্রজনন করাইয়া লয়। যৌবনে পুরুষ বুঝিতে পারে না যে নারীর রূপ কত ক্ষণস্থায়ী, যখন বুঝিতে পারে তখন আর পালাইবার উপায় থাকে না। ফুলের গন্ধ ও বর্ণ যেমন পতঙ্গকে লুব্ধ করিয়া টানিয়া আনে—পতঙ্গের উপকার করিতে নয়, তাহার আপনার বংশ বিস্তার করিতে, তেমনই নারীর রূপ ও যৌবন পুরুষ-পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করে শুধু সৃষ্টিরক্ষা ও প্রজাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

যৌবন প্রজননের উৎকৃষ্ট কাল; সেই সময় প্রকৃতি নারীকে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে মণ্ডিতা করিয়া তোলে। মাত্র কিছুদিনের জন্য প্রকৃতি আপন রূপের ডালি উজাড় করিয়া দিয়া যেন নারীজাতিকে মনোমোহিনী করিয়া তুলিতে চায়—শুধু পুরুষকে প্রলুব্ধ করিতে; সন্তানের জন্মের পর ধীরে ধীরে তাহার রূপের সাগরে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ করে, কারণ তাহার দ্বারা প্রকৃতির কার্য্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, বৃথা তাহাকে রূপবতী করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই।

সোপেনহাওয়ের বলেন নারীকে যে সুন্দরী বলে সে অন্ধ। নারী অপেক্ষা পুরুষ সর্ব্বাংশে রূপবান্। যৌনক্ষুধায় যাহার বিচার-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, সে-ই নারীকে সুন্দর বলিয়া মনে করে। হ্রস্বাকার, ক্ষীণস্কন্ধ, স্ফীতশ্রোণী, ক্ষুদ্রপদ জাতিকে মনোমোহিনী বলা চলে না।

It is only a man whose intellect is clouded by his sexual inpulse that could give the name of the 'fair sex' to that undersized, narrow-shouldered, broad-hipped and short-legged race.

কোনও বিষয়েই নারী শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে না। সঙ্গীত, কাব্য, ললিতকলায় তাহাদের কোনও অধিকার নাই—এগুলি যে তাহারা অভ্যাস করে সে শুধু পুরুষের মনোহরণ করিবার জন্য।

ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। সোপেনহাওয়ের বলেন, "আমার মনে হয় স্ত্রীজাতিকে কখনও স্বাধীনতা দেওয়া উচিৎ নহে। হিন্দুস্থানের প্রচলিত নিয়ম মত তাহাদের সর্ব্বদা পিতা, পতি বা পুত্রের অধীনে রাখা উচিৎ।

I am therefore of opinion that women should never be allowed altogether to manage their own concerns, but should always stand under actual male supervision be it of father, of husband, of son as is the case in Hindustan.

নারীর সহিত সম্বন্ধ যত কম হয় ততই ভালো। The less we have to do with women the better. তাহাদের দূরে রাখিলে জীবনযাত্রা অনেক সহজ ও নিরাপদ হইবে। নারীজাতি মায়াবিনী এ কথা উপলব্ধি করিলে প্রজননের প্রহসন থামিয়া যাইবে। জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইলে সন্তান উৎপাদনের ইচ্ছা হ্রাস পাইবে ও মনুষ্যজাতির নির্ব্বাণ লাভ হইবে তখনই। মানুষ আর কতদিন মরীচিকার পানে ছুটিবে? জীবনের মোহ ঘুচিবে কবে? কবে মানব বুঝিবে যে নির্ব্বাণ মৃত্যুই—শ্রেয়ঃ?—the greatest boon of all is death.

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

সুভদ্রাঙ্গী

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

৯৫

মহামাত্র মহাশয়, রাজ পুরোহিত মহাশয়, চন্দ্রমৌলী শাস্ত্রী মহাশয় ও নারায়ণ শর্ম্মা শিবিরে দুদিনের অধিবেশনের পর যাত্রার দিন ও বিবাহের লগ্ন স্থির ক'রলেন। তখনও পৌষ মাসের দু-তিন দিন অবশিষ্ট আছে—স্থির হ'ল যে ২রা মাঘ যাত্রা করা হ'বে, এবং ২রা বা ৫ই ফাল্গুন বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হ'বে।

কথা উঠল যে কন্যার বাসায় বিবাহের মাঙ্গলিক কার্য্যগুলি কি ক'রে সম্পন্ন হবে?—সেখানে ত কন্যার কোনো আত্মীয়া স্ত্রীলোক থাকবে না। সুভদ্রার ভারি ইচ্ছা কমলা ও মালতী এবং তার দুই জ্যেঠাইমা বিবাহ-উৎসবে উপস্থিত থাকেন। সুভদ্রা পিতাকে দিয়ে মাহামাত্র মহাশয়কে তার অভিলাষ জানালে। তিনি তাঁদের পাটলিপুত্র নিয়ে যাওয়া স্থির করলেন। মহামাত্র মহাশয় ও রাজপুরোহিত মহাশয় তাঁদের পাটলীপুত্র যাওয়ার অনুরোধ তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে ক'রে এলেন।

অনুরোধটী হঠাৎ এসে পড়ল দেখে শাস্ত্রী মহাশয়, শঙ্কর মিশ্র ও তাঁদের সহধর্ম্মিণীরা কিছু বিব্রত হয়ে পড়লেন। মাঝে আর তিন দিন বই নাই। অন্ততঃ দু মাসের জন্য বাড়ী এবং সমস্ত সাংসারিক কাজ কর্ম্ম ফেলে যেতে হ'বে—তাঁদের অনুপস্থিতিতে গৃহাদির রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদির কি ব্যবস্থা হ'তে পারে, তা ভেবে বার ক'রতে সময় লাগল। ভদ্রার জ্যেঠাইমারা তার বিয়েতে যাবেন না, এ কথা কিছুতেই বলতে পারলেন না। অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে সব বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল, এবং তাঁরা যেতে সম্মত হ'লেন।

সাতখানা অতিরিক্ত পাল্‌কি এবং তাদের বইবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় বাহক সংগ্রহ ক'রতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল। ২রা মাঘ সকালেই শিবিরাধ্যক্ষ ডেরা-ডাণ্ডা তুলে গোরুর গাড়িতে বোঝাই করতে আদেশ দিলেন। এই সকল তাঁবু ও তাদের সরঞ্জাম এবং সুভদ্রার পাটলীপুত্র থেকে আসবার সময় তার আহারাদি ও বিশ্রামের জন্য যে তেরটি স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছিল, সেখানকার তাঁবুগুলি একে একে তুলে নিয়ে পাটলীপুত্র পৌঁছতে কুড়ি পঁচিশ দিন লাগবে। পথের ধারের তাঁবুগুলি ফিরবার সময় পর্য্যন্ত খাটানই ছিল। এক একটী স্থানে দুজন করে সৈনিক এবং উপযুক্ত সংখ্যায় পাচক ও ভৃত্য রাখা হয়েছিল। প্রত্যাবর্ত্তন কালে কোন্ দিন কোন্ সময় সুভদ্রা ও তার সঙ্গীরা এক একটা শিবিরে পৌঁছবেন এই সংবাদ নিয়ে দুজন অশ্বারোহী সৈনিক দু-দিন আগে চম্পানগর শিবির থেকে বেরিয়ে গেল।

২রা মাঘ সূর্য্যোদয় হ'তে হতেই আটখানা পালকি ও দুখানা ডুলি নগরের ভেতর থেকে শিবির প্রাঙ্গণে এসে পড়ল। অমনি মহামাত্র মহাশয় ও রাজপুরোহিত মহাশয় স্ব স্ব পালকিতে উঠে বসলেন। সৈনিকেরা আগেই সজ্জিত হ'য়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন ক'রে প্রস্তুত ছিল। রাস্তায় ব্যবহারের জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, সে সকল কতকগুলি ঘোড়ার দু পাশে ঝুলিয়ে নিয়ে ভৃত্যেরা তাদের উপর চ'ড়ে বসল। তদন্তর যাত্রা আরম্ভ হল—প্রথমে একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈনিক, তারপর দশখানা পালকি দুখানা ডুলি, তারপর অশ্বপৃষ্ঠে আসবাব সহ ভৃত্যগণ, এবং অবশেষে আর একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈনিক। এই ক্রমানুসারে পথ অতিক্রান্ত হ'তে লাগল।

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই পথিকগণ প্রথম শিবিরে পৌঁছিলেন। সেখানে স্নানাহার ও তিন চার দণ্ডকাল বিশ্রাম ক'রে তাঁরা আবার পথে বার হ'লেন, এবং সন্ধ্যার পর দ্বিতীয় শিবিরে উপস্থিত হ'য়ে আহারান্তে সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম ক'রে পরদিন প্রত্যুষে পুনরায় যাত্রায় প্রবৃত্ত হলেন। এই প্রণালীতে

অগ্রসর হ'তে হ'তে পথে তাঁদের সাতদিন অতিবাহিত হ'য়ে গেল। শিবিরগুলিতে অপেক্ষা করবার অবসরে কমলা, মালতী ও তাদের মাতাদের সঙ্গলাভ করে সুভদ্রার আনন্দের আর সীমা ছিল না। শিবিরগুলি লোকালয় হ'তে কিছু দূরে স্থাপিত থাকাতে মধ্যাহ্নের অবস্থানকালে সুভদ্রা, কমলা ও মালতী বাইরে বেরিয়ে পড়ত, এবং বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূরে পর্য্যন্ত চ'লে যেত। সৈনিকেরা তা লক্ষ্য করে তাদের রক্ষার জন্য অলক্ষিতে তাদের অনুসরণ করত। তারা কোথাও পার্ব্বত্য প্রদেশের তরঙ্গায়িত ভূমি, কোথাও ছোট পাহাড়, কোথাও রবিশস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, কোথাও শাল পিয়ালাদি নানা অপরিচিত বৃক্ষ, অপরিচিত পশু পক্ষী কীট ইত্যাদি নৈসর্গিক শোভা-সন্দর্শনে আনন্দাভিভূত হ'ত। রাত্রিতে তারা শীতাধিক্য বশতঃ তাঁবুর বার হ'ত না—প্রথমে হাস্য পরিহাসে এবং তৎপরে গাঢ় নিদ্রায় তাদের সময় কা'টত। কখন কখন সুভদ্রার জ্যেঠাইমারা তাদের কথোপকথনে যোগ দিতেন। এই যাত্রায় তাঁদেরও অনেক নূতন অনুভূতি হ'ল—তাঁরা অনেক নূতন জিনিষ দেখলেন। পথ চ'লতে চ'লতে বনের মধ্যে তাঁরা যেরূপ আহার, বাসস্থান ও পরিচর্য্যা পেতেন, তা দেখে তাঁরা বিস্মিত হ'তেন। পুরুষদের শিবিরেও আরাম ও উপভোগের উপকরণ যথেষ্ঠ ছিল, এবং সেবাও তাঁরা পূর্ণমাত্রায় পেতেন।

সপ্তম দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুভদ্রা ও তার সঙ্গীদের যান-বাহন পাটলীর রাজোদ্যানে উপস্থিত হ'ল। উদ্যান মধ্যস্থ ভবন কন্যাপক্ষীয়দের বাসের জন্য সম্রাট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। এই ভবনের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ পুষ্পবাটিকা শ্রেণীবদ্ধ নানাজাতীয় প্রস্ফুটিত-কুসুমযুক্ত লতা-গুল্মে সুশোভিত এবং নানা ঋজু ও তির্য্যক্-পথ-সমন্বিত। ইহার স্থানে স্থানে চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ বা গোল সাচ্ছাদন চত্বর থাকাতে বায়ু-সেবীদের যথেচ্ছ উপবেশন করবার সুবিধা হ'ত। বাগানে শতাধিক মালী অনবরত কাজ করছে। ভবনের উভয় মহলের উভয় তলেই বাতায়ন-যুক্ত বহুসংখ্যক সুবিন্যস্ত প্রকোষ্ঠ এবং উভয় মহলের দ্বিতলে একএকটি বৃহদায়তন সুসজ্জিত কক্ষ ছিল।

কন্যাপক্ষের অভ্যর্থনার জন্য মহারাজের কতকগুলি উচ্চ-পদাধিকারী ভবনদ্বারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে ভবন-মধ্যে নিয়ে গেলেন। কতকগুলি পরিচারিকাও অপেক্ষা করছিল। তারা মহিলাদের অন্দর-মহলে নিয়ে গেল। ভবন-মধ্যে প্রবেশ ক'রে কন্যার আত্মীয়েরা দেখলেন যে অনেকগুলি কক্ষেই পর্য্যঙ্কের উপর শুভ্র আস্তরণাচ্ছাদিত, এবং উপাধান ও তুলাপুরিত-প্রচ্ছদপট-সমন্বিত কোমল শয্যা রয়েছে; এবং প্রত্যেক কক্ষই দীপ-মালায় উদ্‌ভাসিত।

অন্দর ও বাহির মহলের কয়েকটি ঘরের মেঝেয় গালিচা পাতা ছিল। তাঁরা গালিচার উপর উপবেশন করলেন। অন্দর মহলে দাসীরা মহিলাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হ'ল—ঈষদুষ্ণ জলে তাঁদের মুখ, হাত, পা ধুইয়ে অঙ্গমার্জ্জনা করে দিয়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়ে দিলে। বহির্বাটীতেও ভৃত্যেরা শাস্ত্রী মহাশয়ের, শঙ্কর মিশ্রের ও নারায়ণ শর্ম্মার ঐরূপ পরিচর্য্যা করে একটি পূজার প্রকোষ্ঠে তাঁদের নিয়ে গেল। সেখানে কতকগুলি আসন পাতা, এবং প্রত্যেক আসনের উত্তরদিকে গঙ্গাজল-পূরিত কোশা ও তন্মধ্যে কুশী রক্ষিত ছিল। সেখানে তাঁরা তিনজনেই সন্ধ্যাবন্দনাদি করলেন। পাশের ঘরেই জলখাবার ব্যবস্থা ছিল। জলযোগ সমাপনান্তর ক্লান্তি বশতঃ তাঁরা পর্য্যঙ্কের শরণাপন্ন হ'লেন। মহিলারাও জলপান করে এক একখানি খাটে শুয়ে পড়লেন। বহুক্ষণ বিশ্রামের পর আহারের ডাক পড়ল। ভোজন শেষ করে তাঁরা বেশীক্ষণ বসেন নি—আবার শুয়ে পড়লেন।

৯৬

গভীর রাত্রিতে উদ্যান-ভবনে হৈ চৈ পড়ে গেল—কয়েকবার ভেদ ও বমনের পর মালতী অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে—ভবনস্থ সকলেই বিনিদ্র, তার পিতামাতার ও সুভদ্রার উদ্বেগের সীমা নাই। ভবনরক্ষক সৈনিকদের মধ্যে একজন অশ্বারোহণে রাজবৈদ্যের বাড়ী ছুটল। বৃদ্ধ চিকিৎসক মহাশয়কে ডেকে তুলে সমস্ত সংবাদ দেওয়া হ'ল। সত্বর উদ্যান-ভবনে তাঁর উপস্থিতি আবশ্যক। এত সত্বর তিনি সেখানে পৌছতে পা'রবেন না ভেবে তাঁর পঁচিশ, ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবক পুত্র দেবদত্ত ঔষধ পত্র সঙ্গে নিয়ে সৈনিক যে ঘোড়ায় চ'ড়ে এসেছিল, তার উপর আরোহণ করে কশাঘাতে তাকে বেগে

চালিয়ে দিয়ে একদণ্ডের মধ্যে উদ্যান-ভবনে উপস্থিত হ'লেন। তাঁকে রোগিনীর শয্যা-পার্শ্বে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি নাড়ী পরীক্ষানন্তর রোগের বিবরণ শুনে ভীত হ'লেন—তাঁর বিষ প্রয়োগের সন্দেহ হ'ল। সেই অনুমানে একমাত্রা ঔষধ খাইয়ে প্রশ্নের দ্বারা তথ্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন। তিনি প্রথমেই রাত্রির আহার সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রলেন। উদ্বেগাধিক্য বশতঃ সুভদ্রা সকল সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে বললে, রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় আহারের জন্য আমাদের ডাক পড়ল। পাশের ঘরে আমাদের পাঁচজন মহিলারই খাদ্য পরিবেশণ করা হয়েছিল—একখানা থালা অপেক্ষাকৃত বড় এবং তাতে উপকরণাদির সংখ্যাও অনেক অধিক। পরিবেষ্টা-ব্রাহ্মণ বলে গেল, "বড় থালাখানি রাণী-মার জন্য।" আমি এই কথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বললাম, এরূপ বৈষম্য দেখান অতিশয় কদর্য্য। কাল রন্ধন-শালায় ব'লে দিতে হবে যে এরূপ তারতম্য যেন ভবিষ্যতে না করা হয়। আমি ও থালায় কিছুতেই খাব না। এই ব'লে আমি অন্য থালায় বসলাম। সে থালায় একজনকে ত ব'সতে হ'বে—মালতী সেই থালায় ব'সেছিল।

দেবদত্ত বললেন—আচ্ছা আমি কি একবার খাবার ঘরে গিয়ে বড় থালাখানি দেখতে পারি ?

সুভদ্রা ও কমলা তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে গেল। তিনি সেখানে গিয়ে বড় থালায় যে সব দ্রব্য অবশিষ্ট ছিল তার একটু একটু নিয়ে তা একখানি বড় খলে একে একে পিষে তার উপর ঔষধ প্রয়োগ করতে লাগলেন। একটি দ্রব্যের পরীক্ষা হয়ে গেলে খলখানা ধুয়ে ফেলা হতে লাগল। দেবদত্ত একটী খাদ্যে শঙ্খ-বিষের নিশ্চিত প্রমাণ পেলেন। তৎপর মল ও বমনের পরীক্ষা দ্বারা তাঁর ধারণা দৃঢ়ীভূত হল—তিনি নিঃসন্দেহ হ'লেন যে শঙ্খ বিষ থেকেই পীড়ার উৎপত্তি হ'য়েছে। তদনুযায়ী চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলতে লাগল।

এই ব্যাপারে রাত্রি প্রভাত হ'য়ে গেল। রাজ-বৈদ্য মহাশয় এসে উপস্থিত হলেন, এবং যা যা ঘটেছে আনুপূর্বিক শুনলেন। রোগিণীকে একবার দেখে এসে তিনি পাশের ঘরে গালিচার উপর বসলেন। শঙ্কর মিশ্র, শাস্ত্রী মহাশয় ও নারায়ণ শর্মাও সেখানে এসে ব'সলেন। বৈদ্যমহাশয় পুত্রকে প্রাতঃকৃত্য ও বিশ্রামের জন্য বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, এবং বলে দিলেন যে তিনি যেন দ্বিপ্রহরের সময় ফিরে এসে আবার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। দেবদত্ত প্রস্থান ক'রলেন।

নারায়ণ। কি অনর্থই হ'য়ে গেল!

রাজবৈদ্য। রোগের নিদানই চিকিৎসা ব্যাপারে আসল জিনিষ। যখন রোগের কারণ শীঘ্র ধরা পড়েছে এবং উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছে, তখন আর চিন্তার কারণ নাই। দেবদত্ত যেরূপ অনুমান-শক্তি দেখিয়েছে তা বিস্ময়কর—আমি নিজে এলে হয়ত এত শীঘ্র রোগের কারণ ধ'রতে পারতাম না। তার কৃতিত্ব দেখে আমার ভারি আনন্দ হয়েছে। আমি ওকে নিজে সমগ্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পড়িয়েছি এবং হাতে ধ'রে ধ'রে ঔষধের প্রয়োগ-বিধি, নাড়ী-বিজ্ঞান ও শল্য-চিকিৎসা শিখিয়েছি। অনেক স্থলে আমা অপেক্ষা ওর অধিক অনুভবের পরিচয় পেয়েছি। আমি এখন একলা সব কাজ ক'রে উঠ্‌তে পারি না ব'লে মহারাজাধিরাজ আজ এক বৎসর থেকে ওকে আমার সহকারীরূপে নিযুক্ত করেছেন।

শাস্ত্রী। ছেলেটী প্রিয়দর্শন, বুদ্ধিমান্ ও ক্ষিপ্রহস্ত ব'লে বোধ হ'ল।

রোগিণীর বমন ও বিরেচন সে দিন সমস্ত দিবারাত্রি চল্‌তে থাক্‌ল এবং সে সংজ্ঞাহীনা হ'য়ে রইল। দ্বিপ্রহরের পর দেবদত্ত ফিরে এলে রোগিণীর চিকিৎসা তাঁর হস্তে ন্যস্ত ক'রে বৃদ্ধ বৈদ্য মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌লেন। পরদিন প্রাতে ফিরে এসে দে'খলেন যে ভেদ-বমি বন্ধ হ'য়েছে এবং রোগিণীর সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। এক সপ্তাহ কাল দেব-দত্ত তার শয্যা পার্শ্বে থেকে তাকে নীরোগ ক'রে তুল্‌লেন—যে দুর্বলতাটুকু ছিল, তা আর তিন চার দিনের মধ্যে আপনা আপনি চ'লে গেল। তখন দেবদত্ত দিনে একবার মাত্র এসে তার খোঁজ নিয়ে যেতেন। তিনি যখন আসতেন তখন মালতীর মনে একটা অননুভূতপূর্ব প্রসন্নতা দেখা দিত এবং সুভদ্রা তা লক্ষ্য ক'রেছিল।

যে রাত্রিতে রোগ প্রকাশ পেয়েছিল, তার পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে রাজকর্ম্মচারীরা পাচক-ব্রাহ্মণের খোঁজ করে তাকে

পেলেন না। এই কারণে তাঁদের মনে ঘোর সন্দেহ হ'ল যে সেই অপরাধী। তাকে খুঁজে বা'র ক'রবার জন্য চারিদিকে অশ্বারোহী সৈনিক পাঠান হ'ল। পাটলীপুত্র হতে চার ক্রোশ দূরে এক খেয়াঘাটে সে গঙ্গাপার হওয়ার জন্য অপেক্ষা ক'রছিল—সেখানে সে ধরা পড়ল। তাকে রজ্জুবদ্ধ ক'রে পাটলীপুত্রে আনা হ'ল। বিচারালয়ে তার উক্তি লিপিবদ্ধ করা হ'ল এবং তাহা এই যে রাজান্তঃপুরের এক দাসীর প্ররোচনায় সে পঞ্চাশটা দীনার নিয়ে তারই আনীত শঙ্খ-বিষ সুভদ্রার ক্ষীরে মিশিয়ে দিয়েছিল। দাসীকে ধ'রে আনা হ'ল কিন্তু তার মুখ থেকে কোন স্বীকারোক্তি বা'র করা গেল না। বিচারকেরা উভয়কেই পনর বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া উচিত এই মত লিপিবদ্ধ ক'রে মহারাজের আদেশের নিমিত্ত তাঁর নিকট কাগজপত্র পাঠিয়ে দিলেন।

রোগের তৃতীয় দিন সকালে কাগজপত্র প'ড়তে প'ড়তে মহারাজ প্রথমে জানতে পা'রলেন উদ্যান বাটীতে কি বিভ্রাট ঘ'টেছে। তিনি বুঝ্‌তে পারলেন যে অন্তঃপুরে সুভদ্রার হত্যার জন্য কি ঘোর ষড়যন্ত্র চ'ল্‌ছে। তিনি সেই দিনই অপরাহ্ণে রোগিণী ও তার সঙ্গীদের খোঁজ নিতে উদ্যান ভবনে এলেন, এবং রোগিণীর ঘরে গিয়ে তাকে সসংজ্ঞ এবং দেবদত্তকে তার চিকিৎসায় নিযুক্ত দেখ্‌তে পেলেন। সুভদ্রা ও কমলা সেই ঘরে ছিল—মহারাজ আ'স্‌তেই তারা সরে গেল। কমলাকে মহারাজা যা এক নজর দেখেছিলেন তাতে বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে সে সুন্দরী। মালতী যদিও রোগক্লিষ্টা ছিল, তবুও মহারাজের জান্‌তে বাকী থাক্‌ল না যে সেও সৌন্দর্য্যসম্পদে হীনা নয়। দেবদত্তের কথায় মহারাজ জান্‌লেন যে কোন চিন্তার কারণ নাই—আট-দশ দিনের মধ্যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হ'বে। মহারাজ সে সময় সুভদ্রার সঙ্গে দেখা ক'রবার চেষ্টা ক'র্‌লেন না। বাইরের মহলে এসে তিনি নারায়ণ শর্ম্মা, শাস্ত্রী মহাশয় ও শঙ্কর মিশ্রের সহিত আলাপ ক'র্‌লেন এবং যথেষ্ট সৌজন্য দেখালেন। তিনি শঙ্কর মিশ্রকে বললেন, "আপনার দুহিতার আকস্মিক বিপদে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আশা করা যায় যে সে আট-দশ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হ'য়ে যাবে। নবীন চিকিৎসক এই ব্যাপারে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে—তার অসাধারণ অনুভব শক্তির গুণে অপরাধীরা ধরা প'ড়ে দণ্ডিত হয়েছে।"

এই বলে এবং কর্ম্মচারীদিগকে সতর্ক করে মহারাজ প্রস্থান ক'র্‌লেন। দশ-বার দিনের মধ্যেই মালতী সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হ'য়ে উঠ্‌ল।

১৭

শাস্ত্রী মহাশয়ের আগমন-সংবাদে পাটলীপুত্রের বিদ্বৎ সমাজ তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে সমুৎসুক হ'ল, কিন্তু উদ্যান-ভবনের অভাবনীয় ঘটনার বিষয় জ্ঞাত হয়ে পণ্ডিতগণ তাঁদের সাক্ষাৎ স্থগিত রা'খ্‌লেন। যখন তাঁরা জান্‌তে পা'র্‌লেন যে, রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেছে, তখন তাঁরা একে একে আস্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন। তাঁরা শাস্ত্রী মহাশয়ের অগাধ শাস্ত্র জ্ঞানের এবং অকৃত্রিম সৌজন্যের পরিচয় পেয়ে পরম প্রীতি লাভ ক'র্‌লেন। রাজসভার দ্বার-পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হ'ল। তাঁর পুত্র সত্যব্রত চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং রাজ-সভার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন। বিবাহের আর দশ বার দিনের অধিক বিলম্ব ছিল না—আয়োজনাদি পরি-দর্শনের জন্য রাজপুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে নিত্যই তাঁকে দু একবার উদ্যান-ভবনে আস্‌তে হ'ত এবং অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে হ'ত। এক আধদিন সুভদ্রা ও তার সখীরা তাঁদের সাম্‌নে প'ড়ে যেত এবং এই যুবা পুরুষকে দেখে তারা সঙ্কুচিত হ'ত। কয়েকদিন তাঁর এই প্রকার গমনাগমনে তারা জান্‌তে পার্‌লে যে, যুবকটী রূপবান্, কর্ম্মপটু ও ধীর—তার মুখ দিয়ে যেন একটা প্রতিভার জ্যোতি বেরুচ্ছে। ছ' সাত দিনের মধ্যে সুভদ্রা বুঝ্‌তে পা'র্‌লে যে, যুবকের প্রতি কমলার একটা আকর্ষণ জন্মেছে।

বিবাহের দুটী দিন স্থির করা হয়েছিল—২রা ও ৫ই ফাল্গুন। তিনি সুভদ্রা ও তার আত্মীয়দের কুশল জান্‌তে, এবং যদি সম্ভব হয়, সুভদ্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বিবাহের দিন সম্বন্ধে তার মত জান্‌তে এসেছিলেন। বাইরে অঙ্গ-রক্ষিকাগণকে রেখে মহারাজ অন্দরমহলের মধ্যে প্রবেশ করে কোন পরিচারিকাকে দেখ্‌তে পেলেন না। দ্বারের নিকটস্থ নীচের একটী ঘরে দেখ্‌লেন যে সত্যব্রত একলা ব'সে

বাউল

শ্রীবাসুদেব রায়

বিবাহের জিনিস পত্র গোছাচ্ছে। অগত্যা মহারাজ তাঁকে দিয়ে অন্দরে নিজ আগমন সংবাদ পাঠালেন এবং জানালেন যে অল্পক্ষণের জন্য তিনি একবার সুভদ্রার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান। সত্যব্রত ভেতরে গিয়ে খবর দিয়ে এলেন। মহারাজ ভেতরে গিয়ে একটী ঘরে গালিচার উপর উপবেশন ক'রলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই সুভদ্রা সেখানে এসে তাঁকে প্রণাম ক'র্‌লে।

মহারাজ বল্‌লেন, "নানাকাজে আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পানি নি সুভদ্রা—তুমি কিছু মনে ক'রো না। তোমার সখীর বিপদে আমি বড় দুঃখিত। তুমি বুঝতেই পেরে'ছ যে তোমাকে হত্যা করাই শত্রুদের উদ্দেশ্য ছিল—অতএব এখন থেকে তোমাকে সতর্ক ভাবে থাকৃতে হবে। আশা করি তোমার সখী ভাল আছেন। আমি কি তোমার প্রিয় সখীদের দর্শন-লাভ ক'রবার যোগ্য নই?

সুভদ্রা। আজ দুমাস মহারাজের চরণ দর্শন ক'রিনি—আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়েছিল তা মহারাজকে কি জানাব—আজ অধিনীকে স্মরণ করেছেন দেখে অনেক সান্ত্বনা লাভ কর্‌লাম। আমার সখীরা আমার বাল্য সহচরী—আমরা অভিন্নাত্মা। মহারাজের সঙ্গে তাদের পরিচয় হওয়া যে নিতান্ত বাঞ্ছনীয় তাতে আর সন্দেহ নাই। তারা আসবে বটে কিন্তু প্রথম সাক্ষাতে ভয়ে ও সঙ্কোচে তাদের মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না—মহারাজ তাদের ক্ষমা ক'র্‌বেন। আমি তাদের ডেকে নিয়ে আসছি।

সুভদ্রা কক্ষান্তরে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে তার সখীদের নিয়ে উপস্থিত হ'ল। তারা দূর থেকে প্রণাম ক'রে মস্তক অবনত ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

মহারাজ বল্‌লেন, "সুভদ্রার মুখে শুন্‌লাম তোমরা তার বাল্য-সহচরী, এবং তোমরা তিনজন অভিন্নহৃদয়। আমিও তোমাদিগকে নিজ সখী বলেই বিবেচনা কর্‌'ব। অতএব আমার সম্মুখে তোমাদের এত সঙ্কোচ করা উচিত নয়"।

সুভদ্রা। আস্‌চে বারের জন্যে আমি ওদের তালিম দিয়ে রাখব—এখন ওদের যাবার অনুমতি দিন।

মহারাজ। আচ্ছা তাই হ'ক—দেখ ভাই, আগামী বারে আমার প্রতি অনাদর দেখিও না।

কমলা ও মালতী চলে গেলে মহারাজ সুভদ্রাকে বল্‌লেন, "রাজ পুরোহিত মহাশয় বিবাহের দুটী দিন স্থির ক'রে রেখেছেন ২রা ও ৫ই ফালগুন। এর মধ্যে কোনটী ত তোমাদের অসুবিধাজনক নয়? আমাকে রাজ্যের সর্ব্বত্র পূর্ব্বাহ্লে ঘোষণা দিতে হ'বে। আমি ২রা ফাল্গুনই বিবাহের দিন স্থির কর্‌'তে চাচ্ছি। এখানে পরিচারিকারা কেউ উপস্থিত নাই। তোমার সখীরা কি কেউ গিয়ে সত্যব্রতকে ডেকে আনৃতে পারবেন?"

সুভদ্রা বেরিয়ে গিয়ে কমলাকে বল্‌'লে, "সত্যব্রতকে ডাকৃতে মহারাজ তোকে বলছেন। তুই যা, গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়"।

কমলা। সে কি কথা? আমি তা পার্‌'ব না।

সুভদ্রা। দোষ কি? তুই না গেলে মহারাজ কি ভাব'বেন?

কমলা। মালতীকে পাঠিয়ে দে।

সুভদ্রা। মালতী কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছিনে। দেরী হয়ে যাচ্ছে তুই-ই যা না।

তখন বাধ্য হ'য়ে সত্যব্রত যে ঘরে কাজ কর্‌ছিলেন তার দরজার সুমুখে গিয়ে "মহাশয়, মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন"—এই ব'লে কমলা তাড়াতাড়ি চ'লে এল।

সত্যব্রত দ্রুতপদে মহারাজের নিকট উপস্থিত হ'লেন। মহারাজ বল্‌'লেন, "দেখ সত্যব্রত, ২রা ফালগুনই বিবাহের দিন স্থির ক'রে ঘোষণা দিতে চাই। কোনো আপত্তি আছে কি"?

সত্যব্রত। শাস্ত্রের দিক্ থেকে দুটী দিনের একটীতেও আপত্তি নাই। ২রা ফালগুনই স্থির করা হ'ক্।

মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সত্যব্রত প্রস্থান কর্‌লেন।

মহারাজ। সুভদ্রা, তবে এখন আসি। মাতৃদেবীদ্বয়কে আমার প্রণাম জানাবে।

সুভদ্রা মহারাজকে প্রণাম কর্‌লে এবং মহারাজ প্রস্থান করিলেন।

২৩শে মাঘ মহারাজাধিরাজ নগরে ও রাজ্যের সর্ব্বত্র

ঘোষণা ক'র্‌লেন যে আগামী ২রা ফাল্গুন রাত্রিতে তিনি চম্পানগরনিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণ শর্ম্মা মহোদয়ের কন্যা শ্রীমতী সুভদ্রাঙ্গী দেবীকে শাস্ত্রানুসারে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'র্‌বেন। এবারে ব্রাহ্মণ-কন্যা রাণী হবেন জেনে সকলেই সন্তুষ্ট হ'ল এবং নগরবাসীদের মধ্যে একটা উৎসাহের ভাব দেখা গেল। সকল গৃহস্থই স্ব স্ব গৃহ সংস্কারে প্রবৃত্ত হ'ল—রাস্তার ধারের প্রাচীরের বহিঃপৃষ্ঠ ও দ্বারদেশ শুভ্রবর্ণের বিলেপন দ্বারা লিপ্ত, এবং চৌকাঠ ও কপাটগুলি লাল বা নীল রঙে রঞ্জিত হ'ল। দেয়ালগুলির উপর নানা রঙ দিয়ে গণেশ, শিব, সারস, ময়ূর, হংস, কারণ্ডব, সিংহ, হস্তী, হরিণ, অশ্ব ইত্যাদির বড় বড় চিত্র অঙ্কিত করা হ'ল।

১৮

আজ সম্রাট বিন্দুসারের ষোড়শ বিবাহ। মহারাজাধিরাজ আজ সুভদ্রাঙ্গী দেবীর পাণিগ্রহণ কর'বেন। রাজ-প্রাসাদে এবং সমগ্র পাটলীপুত্র নগরে আজ ভারি উৎসব। নগর-প্রবেশের প্রত্যেক দ্বারের উভয় পার্শ্বে পূর্ণ কুম্ভ ও তদুপরি আম্র বা অশ্বত্থ-শাখা রক্ষিত হ'য়েছে—বড় বড় পুষ্পমাল্য তোরণোপরি বিলম্বিত। প্রত্যেক দ্বারে মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ, করতাল, ঝর্ঝর, মর্দল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হ'চ্ছে। তাদের উচ্চরবে সমগ্র নগর কোলাহলময়। নগরের রাজপথের উভয় পার্শ্বের প্রত্যেক গৃহের দ্বারদেশে আম্রপল্লব-যুক্ত মঙ্গল-ঘট স্থাপিত এবং শিরোদেশ পুষ্পমাল্যে শোভিত হ'য়েছে। গৃহ-চূড়াসমূহে নানাবর্ণের ও আকারের পতাকা পত-পত শব্দে উড্ডীয়মান।

রাজ পুরুষগণের ও পুরোহিতগণের চেষ্টায় উদ্যান-ভবনে কয়েক দিন থেকে কতকগুলি উচ্চবংশীয়া পুরস্ত্রীদের সমাগম হ'চ্ছিল। সুভদ্রার জ্যেঠাইমারা তাঁদের পেয়ে পরম সুখী হয়েছেন। দু-তিন দিন থেকে তাঁরা গীত বাদ্যে উদ্যান-ভবন আনন্দময় ক'রে রেখেছেন। উদ্যান ও উদ্যানস্থ ভবন নানা প্রকারে সজ্জিত করা হ'য়েছে।

তৃতীয় প্রহর থেকেই নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হ'তে অজস্র-ধারে স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের সমাগম হ'তে আরম্ভ হ'ল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নগরের লোকেরা স্ব স্ব গৃহ হ'তে বার হ'য়ে জনতার বৃদ্ধি ক'র্‌তে লাগল। সকলেই নানা বর্ণের রুচির বেশভূষা ক'রে ইতস্ততঃ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হ'ল। সন্ধ্যা হতেই জনতা উৎসাহের সহিত রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল। রাত্রির প্রথম প্রহরের শেষ ভাগে রাজভবনের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে অসংখ্য লোকের সমাবেশ হ'ল। ফুল, পাতা, বিচিত্র বর্ণের পতাকাসমূহ ও আলোকমালা দ্বারা রাজভবন বিভূষিত করা হয়েছিল।

যদিও ফাল্গুন মাসের প্রথমাংশ, এখন অল্প অল্প শীত অনুভূত হ'চ্ছে; প্রথম প্রহর অতীত প্রায়। কখন বরের শোভাযাত্রা রাজভবন হ'তে বা'র হবে, এই ভাবতে ভাবতে দর্শকবৃন্দ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে প্রতীক্ষা করছে। ক্রমশঃ তাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হ'তে লাগল; এমন সময় কোলাহল উত্থিত হ'ল যে প্রাসাদ থেকে মহারাজ বেরিয়েছেন। প্রথমে বাদকদের শ্রেণী—তুরী, ভেরী, সিঙ্গা, দামামা, ঢক্কা, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি বাদন করতে করতে বাদকদল অগ্রসর হল। অসংখ্য মশাল দ্বারা পথের সর্ব্বত্র আলোকিত। বাদকদলের পশ্চাতে পদাতিকের দল, তৎপশ্চাতে অশ্বারোহীবৃন্দ, এবং সর্ব্বশেষে হস্তিশ্রেণী। অশ্বপৃষ্ঠে একধারে মহামাত্রগণ, এবং অপরধারে প্রধান প্রধান নগরবাসিগণ। হস্তিসমূহের প্রথম পংক্তির মধ্যস্থলে বিরাজমান শ্রীমন্‌ মহারাজাধিরাজ মগধেশ্বর বিন্দুসার—মস্তকে মণিমুক্তাময় মুকুট, দেহে স্বর্ণখচিত অঙ্গরক্ষক, মণিবন্ধে হীরক-জড়িত বলয়, কর্ণে মুক্তাময় কুণ্ডল এবং পদদ্বয়ে রক্তবর্ণ পাদুকা। মহারাজের মস্তকোপরিস্থ মুক্তার ঝালরবিশিষ্ট রাজছত্র আলোক-রশ্মিতে দেদীপ্যমান। তাঁর দক্ষিণ, বাম ও পশ্চাৎভাগের হস্তিশ্রেণীর উপর উপবিষ্ট ছিল তাঁর শরীর রক্ষিণীগণ এবং অন্যান্য হস্তিপৃষ্ঠে আসীন ছিলেন তাঁর অমাত্যগণ। মহারাজের হস্তীরও বিচিত্র বেশ—তার বিশাল দন্তদ্বয়ের অগ্রভাগ সুবর্ণ-কোষ দ্বারা আবৃত, ও মধ্যভাগ সুবর্ণ বলয় দ্বারা বেষ্টিত; প্রত্যেক পদ রৌপ্য নির্ম্মিত স্থূল ঘণ্টিকাযুক্ত বেষ্টনী দ্বারা পরিবৃত; এবং ললাট হ'তে শুণ্ডের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দেশ ও কর্ণদ্বয় গোরোচন-চর্চ্চিত। তার পৃষ্ঠ হ'তে জানু পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে বিলম্বিত মণিমুক্তার ঝালরবিশিষ্ট আস্তরণের ছটা যেন রাজবৈভবের ঘোষণা করছে।

শোভাযাত্রা যেমন যেমন অগ্রসর হ'তে লা'গল এবং

মহারাজ নিকটে আসতে লাগলেন, দর্শকবৃন্দ জয়ধ্বনি দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ করতে লাগল। এইরূপ শোভাযাত্রাসমন্বিত হ'য়ে মহারাজের উদ্যান-ভবনে পৌঁছতে দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত হ'য়ে গেল। মহারাজ এবং তাঁর অনুচরবর্গ ভবন-দ্বারে নিজ নিজ বাহন হ'তে অবতরণ করলেন, এবং সেখানে কন্যার পিতা, শাস্ত্রীমহাশয় ও শঙ্কর মিশ্র দ্বারা অভ্যর্থিত হ'য়ে ভবন মধ্যে প্রবেশ ক'রলেন। নানা বর্ণের অসংখ্য পুষ্পমাল্য দ্বারা মণ্ডিত এবং মোমের অসংখ্য বর্ত্তি দ্বারা উজ্জ্বল দ্বিতলস্থ বিশাল কক্ষের মধ্যভাগে এক স্বর্ণখচিত সিংহাসনে মহারাজ এবং কক্ষকুট্টিমাচ্ছাদিত গালিচার উপর অন্যান্য ব্যক্তিরা উপবেশন ক'রলেন। সেই মুহূর্ত্তেই নৃত্যগীত আরম্ভ হ'ল। নট-নটীগণ, গায়ক-গায়িকাগণ, নৃত্যগীত দ্বারা, এবং বৈণিক, বৈণবিক ও মৌরজিকগণ বাদ্যকৌশল দ্বারা দর্শকবৃন্দ ও শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত উৎফুল্ল করতে লাগল। এক দণ্ড বিশ্রামের পর পুরোহিতগণ মহারাজকে কক্ষান্তরে নিয়ে গেলেন।

সেখানে সুভদ্রার পিতা পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি মহারাজকে রাজোচিত সম্বর্দ্ধনা ও আশীর্ব্বাদ করে জামাতৃত্বে বরণ করলেন। তৎপরে মাঙ্গলিক আচার পালনার্থ মহারাজকে স্ত্রীসমাজের মধ্যগত হ'তে হ'ল। কন্যার মাতৃস্থলাভিষিক্তা শাস্ত্রী-গৃহিণী তাঁকে বরণ ক'রলেন। এর পর মহারাজকে বেষ্টন ক'রে সাতবার কন্যার পরিক্রমা দেওয়া হ'ল। পিঁড়ি ধরবার জন্য, বলিষ্ঠ ব'লে, দেবদত্ত ও ও সত্যব্রত নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। কমলা, মালতী ও অন্যান্য তরুণীরা সময়োচিত হাস্য-পরিহাসে ঔদাস্য দেখান নি। অনন্তর বর ও কনেকে প্রথম কক্ষে আনা হ'ল এবং সুভদ্রার পিতা বেদোক্ত বিধি অনুসারে মহারাজাকে কন্যা সম্প্রদান ক'রে উভয়ের কর সংযুক্ত করে দিলেন। তারপর বর বধূর শুভদৃষ্টি করান হ'ল।

তদনন্তর রমণীরা উভয়কে বাসর-ঘরে নিয়ে গেলেন। বর যে মগধের সম্রাট একথা ভুলে গিয়ে কমলা ও মালতী আনন্দে উদ্বেলিত হ'য়ে তাঁকে কেবল তাদের প্রিয় সখীর স্বামী বোধে নানারূপ হাস্যপরিহাস ও কৌতুক ক'রতে লা'গল। মহারাজও আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে সাময়িক ভাবে নিজ গাম্ভীর্য্য ভুলে গিয়ে তাদের আনন্দে যোগ দিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হ'য়ে গেল দেখে মহারাজকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেবার জন্য সুভদ্রা ব্যতীত সব মহিলাই বাসর ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ইতিমধ্যে বরযাত্রিগণ স্ব স্ব রুচি অনুসারে পান ভোজন করে নিজ নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলেন।

পরদিন এক প্রহরের পর নূতন বধূকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে মহারাজাধিরাজ রাজভবনে প্রত্যাগমন ক'রলেন। পথে পূর্ব্বরাত্রি অপেক্ষা অধিক জনসমাগম হয়েছিল। কয়েক দিন পর্য্যন্ত রাজবাড়ির ভূরি ভোজন ও নানা উৎসব নগরে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত করে রাখলে।

সুভদ্রার চম্পানগর যাওয়ার পরেই মহারাজ অন্তঃপুরে একটী নূতন প্রশস্ত মহল নির্ম্মাণ করাতে আরম্ভ করেছিলেন। কিছুদিন হ'ল সেই মহলটীর নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হ'য়ে উহা বিশদভাবে সজ্জিত হ'য়েছে। এই মহলটী সুভদ্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'ল। প্রয়োজন ও আরামের সব সামগ্রীই এখানে বিদ্যমান। বিশিষ্টতা এই যে এটা অন্যান্য মহলের সহিত সম্পর্ক-রহিত। এর প্রবেশ-পথে পৃথক একদল প্রহরিণী পাহারা দেওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'ল। ইহাতে একটি গ্রন্থাগার ও একটী উদ্যান সন্নিবিষ্ট। বিশ্বস্ত পাচিকা, পরিচারিকা ও স্ত্রী-উদ্যান-পালিকার সম্প্রদায় পূর্ব হতেই নিযুক্ত করা হয়েছিল।

১৯

তৃতীয় দিবস রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে মহারাণী সুভদ্রাঙ্গীর মহলে মহারাজের শুভাগমন হ'ল। আজ ফুল শয্যা। শয়ন-কক্ষে নানাজাতীয় ও নানাবর্ণের শত শত সুগন্ধ পুষ্পের মাল্য দ্বারা ভিত্তি-গাত্র-চতুষ্টয় রুচির ভাবে চিত্রের ন্যায় বিন্যস্ত, সুবৃহৎ কারুকার্য্যময় পর্য্যঙ্কের সর্ব্বাংশ পুষ্পদ্বারা আচ্ছাদিত এবং প্রত্যেক উপকরণ কুসুমাবৃত। দুখানা সুবর্ণ পাত্রে বেলা ও চামেলীর কয়েক গাছা স্থূল ও সূক্ষ্ম মালা, এবং আর একখানি স্বর্ণ-পাত্রে ঘৃষ্ট চন্দনের পিণ্ড একটী দ্বিরদ-রদ নির্ম্মিত ত্রিপদের উপর স্থাপিত রয়েছে। মহারাজের আগমনের পূর্ব্বে সাধারণ পারিবারিক অন্দর মহল থেকে তরুণীরা মহারাণীকে তাঁর স্বকীয় মহলে রেখে গিয়েছে, মহারাজ শয়ন কক্ষে প্রবেশ ক'রবা মাত্র মহারাণী তাঁর সম্মুখীন

হয়ে ভূমিষ্ট হ'য়ে প্রণাম করলেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ অবনত হ'য়ে দুহাত দিয়ে ধরে তুলে তাঁকে কণ্ঠলগ্ন করলেন। তারপর স্বয়ং পর্য্যঙ্কে উপবেশন ক'রে তাঁকে পাশে বসিয়ে মহারাজ ব'ললেন, "তা হ'লে সুভদ্রা, শেষটা তুমি আমার হ'লে" ?

সুভদ্রা। মহারাজ চরণে আশ্রয় দিয়ে দাসীকে সম্মানিত ক'রলেন।

এই বলে সুভদ্রাঙ্গী পাত্র হ'তে মাল্য গ্রহণ ক'রে চন্দনানুলেপন পূর্ব্বক মহারাজের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। মহারাজও একগাছি মালা তুলে নিয়ে তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন, এবং বললেন, "অসাধ্য সাধন করে তোমায় পেলাম—আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল।"

সুভদ্রা। দাসীও তার বাসনার অনুরূপ পতি পেয়ে নিজেকে ধন্যা বিবেচনা ক'রছে। আবার সেই পতি মগধ-সম্রাট—সে তাঁর ভালবাসা পেয়েছে, এ কম শ্লাঘার কথা নয়।

মহারাজ। তোমার সব বাসনাই কি পূর্ণ হ'য়েছে, সুভদ্রা ?

সুভদ্রা। মহারাজের ভালবাসার যথার্থ অধিকারিণী হওয়া ছাড়া দাসীর হৃদয়ের কোনো বাসনাই নাই ?

মহারাজ। তোমার আর কোনো বাসনাই নাই ? ঠিক ক'রে ভেবে দেখ।

সুভদ্রা। লৌকিক ব্যবহারে আমার দু-একটি বাসনা আছে, তা যদি মহারাজ পূর্ণ করেন তা হ'লে আমি পরম সুখী হব।

মহারাজ। সে বাসনাগুলি কি ?

সুভদ্রা। আমার সখীদের বিবাহ।

মহারাজ। তুমি কি আমাকে তাদের দুজনকেও বিবাহ ক'রতে ব'ল। আপত্তি নাই—তারাও সুন্দরী বটে। তবে, তোমার মত নয়।

সুভদ্রা ঈষৎ হেসে বললেন—মহারাজ পরিহাস করছেন।

মহারাজ। বিবাহ হ'তে গেলে, প্রথম কথা, পাত্র চাই; দ্বিতীয় কথা, পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হওয়া চাই। যাকে তাকে ধ'রে বিবাহ দিলে ত তার পরিণাম ভাল হবেনা। তোমার সখীদের পিতামাতারা শীঘ্রই চম্পানগর ফিরে যাবেন—এর মধ্যে তোমার সখীদের বিবাহ কি করে সঙ্ঘটিত হ'তে পারে ?

সুভদ্রা। পাত্র দুটী আমি মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছি, এবং সেই পাত্রদের প্রতি আমার সখীদের মন আকৃষ্ট হ'য়েছে ব'লে আমার অনুমান হয়।

মহারাজ। পাত্র দুটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

সুভদ্রা। পাত্র দুটী মহারাজের পরিচিত। একটী দ্বার-পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র সত্যব্রত, এবং অপরটী রাজবৈদ্য মহাশয়ের পুত্র দেবদত্ত।

মহারাজ। পাত্র দুটী বাঞ্ছনীয় বটে। তুমি উদ্যান-ভবনের অবরোধের মধ্যে থেকে এই নির্ব্বাচন কি ক'রে করলে ?

সুভদ্রা। দেবদত্ত মালতীর পীড়ার সময় তার চিকিৎসা করেছিলেন, এবং সত্যব্রত বিবাহের আয়োজনের জন্য অনেক সময় উদ্যান-ভবনের ভিতরের মহলে যাতায়াত করতেন। সেই সেই সময়েই মালতী ও কমলা তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল ব'লে বোধ হয়।

মহারাজ। তোমার দর্শনেন্দ্রিয়ের ও অনুমান শক্তির প্রখরতার পরিচয় পেয়ে আমি হাস্য সম্বরণ করতে পারছিনা। তুমি ঘটকচূড়ামণি' উপাধি পেতে পার। যা হ'ক, তোমার পিতা ও তাঁর বন্ধুদের পাটলীপুত্র ত্যাগ করে যাওয়ার পূর্ব্বেই এই দুই বিবাহ সঙ্ঘটিত হবে। তুমি তোমার সখীদের তোমার কাছে ছাড়া হ'তে দিতে চাওনা বুঝতে পারছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

সুভদ্রা। মগধ-সম্রাটের অসাধ্য কি আছে ?

মহারাজ। তুমি তোমার আর কোন বাসনার কথা বল্‌লে না ? তোমার পিতার কথা কিছু ব'ললে না ?

সুভদ্রা। সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নাই। সে বিষয়ে যা কর্ত্তব্য, তা মহারাজ নিজেই করবেন ব'লে আমার বিশ্বাস—তাঁর শ্বশুরের অমর্য্যাদা হ'লে তার নিজেরই অমর্য্যাদা হবে, তা কি আর ব'লতে হবে ?

মহারাজ। যে মহামাত্র এখান থেকে তোমার সঙ্গে চম্পানগর গিয়েছিলেন, তিনি সেখান থেকে ফিরবার পূর্ব্বে তোমার পিতৃগৃহের সংস্কারের ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন। এখানে তোমার পিতা যখন থা'কবেন, তখন কোন রাজকীয় ভবন অধিকার ক'রে বাস করবেন। তাঁর ভোজন পাক

করবার ও সেবার জন্য পাচক ও ভৃত্যাদির ব্যবস্থা করা হ'বে তারা তাঁর দেহান্ত পর্য্যন্ত নিয়ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। এতদ্ব্যতীত রাজসরকার থেকে তাঁর জন্য উপযুক্ত মাসহারার ব্যবস্থা করা হবে।

রাত্রি অনেক হওয়াতে তাঁরা শয়ন করলেন।

২০

পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে মহারাজ রাজপুরোহিত মহাশয়কে ডেকে পাঠালেন। তিনি উপস্থিত হলে মহারাজ সুভদ্রার সখীদের বিবাহের কথা উত্থাপন ক'রে মনোনীত পাত্র দুটীর নাম উল্লেখ ক'রলেন।

রাজপুরোহিত মহাশয় ব'ল্‌লেন "উত্তম প্রস্তাব হ'য়েছে। মহারাজের বিবাহ কার্য্যোপলক্ষে আমাকে উদ্যান-ভবনের অন্দরমহলে সর্ব্বদা যাতায়াত ক'র্‌তে হয়েছিল এবং ঐ কন্যা দুটীকে আমার দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। দেখেছিলাম যে তাদের ও মহারাণীর মধ্যে গাঢ় সখ্য। পরস্পরের সাহচর্য্য থেকে বঞ্চিত হ'লে তাদের অত্যন্ত ক্লেশ হ'বে। যদি এখানে মহারাণীর সখীদের বিবাহ হয়, তা হ'লে মহারাণীর সহিত তাদের মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হ'তে পা'রবে।

মহারাজ। এখন, এই প্রস্তাব প্রথমে শাস্ত্রী মহাশয় ও শঙ্কর মিশ্রের নিকট উত্থাপন করা প্রয়োজন, এবং তাঁরা সম্মত হ'লে, দ্বার-পণ্ডিত মহাশয় ও রাজ-বৈদ্য মহাশয়ের নিকট নিয়ে যেতে হ'বে। আপনার উপর এই সকল কার্য্যের ভার দিলাম। ফাল্‌গুন মাসের মধ্যেই কার্য্য সমাধা হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। উদ্যান-ভবন থেকেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হ'বে। ক্ষিপ্রতা আবশ্যক। আমি মন্ত্রি-মণ্ডলকে এই দণ্ডেই সব কথা জানাব। কার্য্য-প্রণালী কার্য্য-বিভাগ ও ব্যয়ের পরিমাণ তাঁদের দ্বারা নির্দ্ধারিত হ'বে।

সম্রাটের আদেশ-পালনার্থ রাজপুরোহিত মহাশয় বহির্গত হ'লেন। প্রথমেই উদ্যান-ভবনে গিয়ে শাস্ত্রী মহাশয় ও শঙ্কর মিশ্রের নিকট কথা পা'ড়লেন, এবং বিবেচনার্থ একদিন সময় দিলেন,—বল্‌লেন, "কাল বিকালে এসে আপনাদের মত জেনে যাব"। এই ব'লে তিনি প্রস্থান ক'র্‌লেন।

শাস্ত্রী মহাশয় ও শঙ্কর মিশ্র নিজ নিজ পত্নীকে মহারাজের প্রস্তাব জানালেন। এর মূলে কে আছে, তা বুঝতে আর তাঁদের বাকি থাক্‌ল না। যে সময় তাঁরা যুবক দুটীকে দেখেছিলেন, সেই সময়েই নিজ নিজ কন্যার জন্য এইরূপ বরেরই কামনা ক'রেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কখনই ভাবতে পারেন নি যে তারাই সত্য সত্য তাঁদের জামাই হ'বে।

শাস্ত্রী। মহাশয়ের স্ত্রী তাঁকে বললেন, "ভদ্রার কি তীক্ষ্ম দৃষ্টি"?

শাস্ত্রী। নারায়ণ যাকে মগধের সম্রাজ্ঞী হওয়ার উপযুক্ত ক'রে গ'ড়েছেন, তার দৃষ্টি-শক্তিও ভগবদ্দত্ত।

স্ত্রী। আমরা ত কত পাত্র খুঁজেছি, কিন্তু এমন একটী ত বার ক'র্‌তে পারি নি। আমাদের ভাগ্যি যে কমলার এরূপ বর জুট্‌ছে।

শঙ্কর মিশ্রের গৃহিণী স্বামীকে বল্‌লেন "আমরা শুভক্ষণে চম্পানগর থেকে পা বাড়িয়েছিলাম। এত সহজে যে মালতীর বিয়ে হ'বে, তা কখনো ভাবি নি। এরা তিন জন যে এক জায়গায় থা'ক্‌বে তা ভেবে আমি ভারি সুখী হচ্ছি"।

শঙ্কর। বিধাতার নির্ব্বন্ধ। ভদ্রার সৌভাগ্যের সঙ্গে অন্য দুজনের ভাগ্য জড়িত ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

কমলা ও মালতী তাদের আকস্মিক সৌভাগ্যের কথা জা'ন্‌তে পেরে মনে মনে যার পর নাই আনন্দিত হ'ল। তাদের মন যাদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল, তারা তাদেরই পাবে? এ যে অভাবনীয়।

কমলা মালতীকে বল্‌লে, হ্যাঁলা, তোর নাকি বিয়ে?

মালতী। আর আমি শুন্‌লাম যে শাস্ত্রী জ্যেঠা মহাশয় নাকি তোকে চিরকাল আইবুড়ো ক'রে রা'খবেন ব'লে স্থির করেছেন।

কমলা। অপরাধ?

মালতী। তুই নাকি সত্যব্রত ঠাকুরের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে গিয়েছিলি।

কমলা। আমি অপরাধ স্বীকার ক'র্‌ছি। কিন্তু তুই যে বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে সাতদিন ধরে নয়ন-বাণ হেনে দেবদত্ত ঠাকুরকে ঘায়েল ক'র্‌লি তার কি বল।

মালতী। আমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব।

কমলা। আমিও তা হ'লে তোর দেখা দেখি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব।

পরদিন অপরাহ্ণে রাজ-পুরোহিত মহাশয় উদ্যান-ভবনে

গিয়ে উভয়েরই সম্মতি পেলেন। তারপর যথাক্রমে দ্বার-পণ্ডিত ও রাজ-বৈদ্য মহাশয়ের নিকট গিয়ে তাঁদের পুত্রদের বিবাহের প্রস্তাব ক'র্লেন এবং একদিন সময় দিলেন। সেই দিনই রাত্রিতে তাঁরা স্ব স্ব পুত্রের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা ক'ইলেন, এবং জান্‌তে পারলেন যে তাঁদের সম্মতি আছে। পরদিন দ্বার-পণ্ডিত ও রাজবৈদ্য মহাশয়ের নিকট গিয়ে রাজ পুরোহিত মহাশয় তাঁদের সম্মতি নিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গেলেন। মহারাজ প্রীত হ'লেন, এবং অল্প ব্যবধানে বিবাহের ভিন্ন ভিন্ন দুটী দিন স্থির ক'র্‌তে ব'ললেন। শাস্ত্রী মহাশয় ও দ্বারপণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাজপুরোহিত মহাশয় ১৫ই ফাল্গুন্ কমলার ও ২২শে ফালগুন মালতীর বিবাহের দিন স্থির ক'রলেন।

প্রত্যেক বিবাহই ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হ'ল। দুই কনেকেই যথেষ্ট মূল্যবান বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার, এবং দুই বরকেই যথেষ্ট যৌতুক প্রদত্ত হ'ল। প্রত্যেক বিবাহেই মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী বিবাহের দিন সকালে উদ্যান-ভবনে এসে পরদিন বরকনের বিদায় কাল পর্য্যন্ত থাকৃতেন, এবং মহারাজ বিবাহ সভায় উপস্থিত হ'তেন। মালতীর বিবাহের দিন সকালে কমলাকে শ্বশুর-বাড়ি থেকে আনিয়ে পরদিন বরকনে বিদায় হওয়ার পর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিন সখী মিলে যত দূর আনন্দ ক'রতে হয় তা করেছিলেন।

স্থির হ'ল যে বসন্তোৎসবের তিন চারদিন পরে নারায়ণ শর্ম্মা, শাস্ত্রী মহাশয়, শঙ্কর মিশ্র ও সুভদ্রার জ্যেঠাইমারা নৌকাযোগে চম্পানগর ফিরে যাবেন। ফালগুন মাসের পূর্ণিমার দিন বসন্তোৎসব ক'রবার উদ্দেশ্যে মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী নিজ মহলে সখীদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলেন। বেলা দেড় প্রহর থেকে সাড়ে তিন প্রহর পর্য্যন্ত তিন সখী পরস্পরের সাহচর্য্য উপভোগ করলেন। মহারাণী নিজ হাতে সখীদের নখ কেটে পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন এবং পট্টবস্ত্র পরালেন। তিন জনে একত্রে আহারে বস্‌লেন। চিড়া দইয়ের পরিবর্ত্তে এবার নানা সুস্বাদু খাদ্য পরিবেষিত হ'ল। কথাবার্ত্তায় ও আমোদ আহ্লাদে সময় অতিবাহিত হ'ল। তাঁরা তিন জনে মিলে এ বৎসরও বসন্তের একটি গান মৃদুস্বরে গাইলেন।

বসন্ত—ঝাঁপতাল

সরস বসন্ত এবে, বহিছে মধুর বায়।
শাখী 'পরে মধুস্বরে আকুল কোকিল গায়।
ফুটিল মালতী বেলী,
কুমুদ যূথী চামেলী,
সোহাগে গুঞ্জরে অলি, সুবাসে কানন ছায়।
উজলিয়া মধুনিশি
হাসিছে গগনে শশী;
কিংশুকে অশোকে লাল বনতরুরাজি ভায়।

কিন্তু তাঁদের মনে পূর্ব্বের সেই আনন্দটি এল না—দেশ, কাল, অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'য়ে গিয়েছে। সখীদের প্রস্থানের সময় সুভদ্রাঙ্গী জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "ভাই, আমরা এখানে বেশী সুখে আছি, না, চম্পানগরে বেশী সুখে ছিলাম?"

চম্পানগরের অতিথিদের যাত্রার দিন ৩রা চৈত্র ক্রমশঃ এসে পড়ল। রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁদের জন্য একখানি বড় যাত্রীবাহি, নৌকা ভাড়া করে রেখেছে। সঙ্গে যাবে দুজন সশস্ত্র সিপাহী, নারায়ণ শর্ম্মার পাচক ও দুজন ভৃত্য। দুচার দিন স্থায়ী হ'তে পারে এমন কিছু মিষ্টান্ন ও দধি, কিছু ফল, পাকের উপকরণ, তোলা উনান, জ্বালানী কাষ্ঠ, আলোকের উপকরণ, তৈজস-বিছানা-বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য আসবাব—সকলই নৌকায় উঠেছে। আহারাদির পর অপরাহ্ণে নৌকা ছাড়া হ'বে। স্রোতোভিমুখে চম্পানগর পৌছিতে ছ-সাত দিন লাগবে।

মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী নিজে সকালে এসে কমলা ও মালতীকে শ্বশুর-বাড়ি থেকে আনিয়েছেন। আহারাদি শেষ হ'ল। এইবারে বিদায়ের পালা। হায়, সে দৃশ্য কি—করুণ! কন্যারা ও মাতৃদেবীরা অজস্রধারে রোদন ক'রছেন—হৃদয় যেন বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। আশাতীত রূপ, গুণ ও মর্য্যাদা-সম্পন্ন পাত্রে কন্যা তিনটী পড়ল বটে, কিন্তু পিতামাতা জন্মের মত তাদের হারালেন। আশৈশব যাদের স্নেহে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত করেছেন, চিরদিনের জন্য তারা তাঁদের অঙ্কচ্যুত হ'ল—পর হ'য়ে গেল। এ চিন্তা কি কম মর্ম্মস্পর্শী? তাঁদের আজ হরিষে বিষাদ।

২রা মাঘ যখন তাঁরা চম্পানগর ত্যাগ করে পাটলীপুত্রাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, তখন কি তাঁরা ভাবতে

পেরেছিলেন যে ঘটনাচক্র দু মাসের মধ্যে তাঁদের কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে? তাঁরা কি জা'ন্‌তেন যে সুভদ্রার সঙ্গে তাঁদের স্নেহের কন্যা দুটীকে পাটলীপুত্রে রেখে যেতে হ'বে? সুভদ্রাই কি বুঝেছিলেন যে তাঁর ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর সখীদ্বয়ের ভাগ্য জড়িত? লোকে বলে যে, জন্মজন্মান্তরের কর্মফল থেকে ভাগ্য গঠিত হয়। প্রত্যেক জীবের ভাগ্য ভিন্ন ভিন্ন হ'লেও কতকগুলি জীবের,—যেমন পিতামাতা, পতি-পত্নী, পুত্র-কন্যা ইত্যাদির ভাগ্য, অন্ততঃ তাদের সুখ দুঃখ, এক স্রোতে প্রবাহিত হয় কেন, এ রহস্য ভেদ করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য।

পাল্‌কির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নৌকা-যাত্রীরা তাই চড়ে নৌকায় গিয়ে উঠলেন। পাল্‌কিগুলি ফিরে আসা পর্য্যন্ত তিন সখী উদ্যান-ভবনে রোদনপরায়ণ অবস্থায় অপেক্ষা ক'রে থাক্‌লেন। আজ আর তাঁদের মুখে সে হাসি নাই—সে রহস্যপ্রিয়তা নাই। পাল্‌কি ফিরে এলে তাঁরা বিরস বদনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে আপন আপন আলয়ে চ'লে গেলেন।

২৯

মহারাজ প্রায়ই মহারাণী সুভদ্রাঙ্গীর মহলে রাত্রিযাপন করেন। তাঁর সেবায় এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মহারাজের বিশেষ প্রীতি। তাঁর ন্যায় বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা রমণীর পক্ষে মহারাজের মনোরঞ্জন করা কঠিন কাজ নয়। তাঁর কথার সরসতায় ও বুদ্ধির প্রখরতায় মহারাজ যে আনন্দ অনুভব করেন, অন্য রাণীদের সঙ্গে বাক্যালাপে তার শতাংশের একাংশও পান না। প্রত্যুত তাঁদের ভাবের ও ভাষার স্থূলতা মহারাজের বিরক্তি উৎপাদন করে।

রাজ বাড়িতে প্রবেশ করার পর মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী দেখলেন যে, শারীরিক পরিশ্রমের ও ভাব-বিনিময়ের কোন সুযোগেই তাঁর মহলে বা সমগ্র রাজান্তঃপুরে নাই। এক প্রহরের পর দু এক দণ্ড তিনি সাধারণ পারিবারিক অন্তঃপুরে গিয়ে উপাসনা গৃহে দেবোদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ সম্পর্কে আর্য্যাদের নিকট উপস্থিত হ'য়ে তাঁদের চরণ বন্দনা এবং এবং অপর মহিলাগণকে যথাবিহিত সম্ভাষণ করতেন। তৃতীয় প্রহরান্তে কোন সাক্ষাৎকামী মহিলা তাঁর মহলে উপস্থিত হ'লে তিনি সাদর সম্ভাষণে ও মিষ্ট বাক্যালাপে তাঁকে পরিতুষ্ট ক'র্‌তেন। এতদ্ব্যতীত অবসর কাল তিনি গ্রন্থাগারে অতিবাহিত ক'র্‌তেন—কিছু সময় গ্রন্থপাঠে, কিছু সময় চিত্রাঙ্কনে ও কিছু সময়ে সূচি কর্ম্মে নিযুক্ত থাক্‌তেন। বিবাহের দু এক মাস পরেই তিনি একদিন মহারাজের নিকট নিবেদন ক'র্‌লেন, "মহারাজ আমার সময় বৃথা নষ্ট হ'চ্ছে। আমি কাজ না পেয়েই অসুখী—আমাকে কিছু কাজ দিন।"

মহারাজ। তুমি কি কাজ চাও?

সুভদ্রা। আমি এমন কাজ চাই যা আমার মনকে নিবিষ্ট ক'রে রাখতে পারে—শারীরিক বা মানসিক।

মহারাজ। রাজ-মহিষীর পক্ষে ত কোন শারীরিক কর্ম্ম সম্ভব নয়।

সুভদ্রা। আমি আমার মহলের বাগানে রোজ দু এক দণ্ড কাজ ক'র্‌ব ভাবছি। মহারাজের কি আপত্তি আছে?

মহারাজ। কোন আপত্তি নাই। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে কখন কখন আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'র্‌ব। আমি যে বিষয়ে তোমার মত চাইব, তুমি বিশেষ চিন্তার পর আমার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হ'লে সে বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ ক'র্‌বে।

সুভদ্রা। আমি পরম অনুগ্রহীত হলাম।

এর পর থেকে মহারাজ যে যে বিষয়ে যখন যখন তাঁর মত চেয়েছেন, সেই সেই বিষয়ে তাঁর নিকট সদুত্তর পেয়েছেন। এইরূপে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে মহারাজের সহকর্মিনী হ'লেন। মহারাজ লক্ষ্য করলেন যে তাঁর বিচার পক্ষপাত শূন্য।

একদিন মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী মহারাজকে বল্‌লেন "শুনেছি মহারাজ কৌটিল্যের শিষ্য—তিনি স্বয়ং মহারাজকে অর্থশাস্ত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই নাই। যদি মহারাজ আমাকে কৌটিল্য দেবের অর্থশাস্ত্রের একখানি প্রতিলিপি করিয়ে দেন এবং সেই গ্রন্থ অধ্যয়নে আমাকে সময় সময় সাহায্য করেন, তা হ'লে আমার সময়ও কাটবে এবং রাজনীতি-শিক্ষাও হবে"।

মহারাজ। তুমি আত্মোন্নতি ক'র্‌তে চাও শুনে আমি পরম প্রীতি লাভ ক'র্‌লাম। তোমাকে আমি অর্থশাস্ত্রের প্রতিলিপি করিয়ে দেব।

একমাস পরে মহারাণী অর্থশাস্ত্রের প্রতিলিপি পেলেন, এবং এই গ্রন্থ অধ্যয়ন ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন। মাঝে মাঝে তাঁকে মহারাজের সাহায্য নিতে হ'ত। এক বৎসরের মধ্যে তাঁর ঐ গ্রন্থ মোটামুটী আয়ত্ত হয়ে গেল এবং তিনি রাজ-কার্য্য সম্বন্ধে মতামত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নৈপুণ্যের সহিত দিতে লাগলেন।

বিবাহের দেড় বৎসর পরে মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করে মহারাজ মহারাণী সুভদ্রাঙ্গীকে প্রধানা মহিষী বা মহাদেবী পদে অভিষিক্ত কর্‌বার সঙ্কল্প করলেন। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার দিন মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী ঐ পদে অভিষিক্ত হবেন এই মর্ম্মে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হ'ল। অভিষেকের দিন রাজপ্রাসাদে ও পাটলীপুত্র নগরে মহাসমারোহে উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল।

মহারাণী সুভদ্রাঙ্গীর মহাদেবী পদে অধিষ্ঠীত হওয়ার পর হ'তে মন্ত্রীরা মতামতের জন্য তাঁর নিকট কোন কোন বিষয়ের কাগজ পত্র পাঠাতে আরম্ভ করলেন, এবং তিনিও তার উপর স্বীয় মতামত লিপিবদ্ধ ক'রতে লাগলেন।

যে সকল মহিষীরা পূর্ব্বে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ক'রে এসেছেন, এমন কি তাঁর প্রাণ সংহারের চেষ্টা পর্য্যন্ত করেছেন, তাঁর হাতে অসীম ক্ষমতা দেখে, তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁরাই তখন তাঁর প্রতিবিধানে যত্নবতী হলেন। মহাদেবী ও তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁদের শ্রদ্ধাভাজন হ'লেন।

কিছুদিনের মধ্যে জানা গেল যে, মহাদেবী সুভদ্রাঙ্গীর সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে। যথা সময়ে তিনি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। এই ঘটনায় রাজ-ভবনে ও নগরে যে আনন্দোৎসব হয়েছিল তার সমান উৎসব নগরে বহুকাল হয়নি।

মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী অন্যান্য রাণীদের ন্যায় আলস্যে ও বিলাসিতায় কালযাপন করেন নি। তাঁর বাল্যের ইতিহাস আলোচনা ক'রলে বেশ বোঝা যায় যে, তিনি যে কেবল রূপের দ্বারাই মহারাজের চিত্ত অধিকার করতে পেরেছিলেন তা নয়। তাঁর গুণাবলীই এ বিষয়ে তাঁর প্রধান বল ছিল তাঁর বাল্যের দারিদ্রই তাঁর অদ্‌ভূত চরিত্র-বিকাশের প্রধান সহায় হয়েছিল। সেই কালেই তিনি স্বাবলম্বন শিক্ষা ক'রে-ছিলেন এবং শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। কর্ম্মে সশ্রদ্ধ আসক্তিই তাঁর চরিত্রের বিশিষ্ট উপাদন—তিনি একটি মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট হ'তে দিতেন না। পতির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, গুরুজনদের প্রতি যথোচিত সম্মান, বন্ধুবর্গের প্রতি অকপট স্নেহ, এবং অসহায়দের প্রতি আন্তরিক করুণা তাঁর স্বভাবজ গুণ ছিল। তিনি ভোগ ও বিলাসিতার প্রতি উদাসীন ছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তাঁকে প্রাকৃতিক শোভার প্রতি আকৃষ্ট এবং চারুশিল্পে প্রবৃত্ত ক'রেছিল। তিনি প্রত্যেক কার্য্য অভিনিবেশ সহকারে ক'রতেন। রূপের একটী প্রধান উপাদান স্বাস্থ্য—তা তিনি তাঁর অক্লান্ত শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা লাভ ক'রেছিলেন। সন্দেহ হ'তে পারে যে, তাঁর প্রকৃতিতে পূর্ণ মাত্রায় সরসতা ছিল না। কিন্তু একথা সত্য নয়—তাঁর ক্রীড়ায় উৎসাহ এবং আনন্দোপভোগে স্পৃহা তাঁর রসানুভূতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব উচ্চ স্থান অধিকার করবার নিমিত্ত যে সব গুণ আবশ্যক, তা অভ্যাস দ্বারা তাঁতে স্বাভাবিক হ'য়ে পড়েছিল। তিনি স্বীয় চরিত্র অজ্ঞাতসারে স্বয়ং গঠিত করেছিলেন, এবং সেই চরিত্র তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মেধা ও শিক্ষা দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও দ্যুতিমান্ হয়েছিল। এরূপ সর্ব্বগুণান্বিতা রমণী ভিন্ন আর কে সম্রাট অশোকের ন্যায় ভুবন-বিশ্রুত পুত্রের জননী হ'তে পারে ?

(সমাপ্ত)

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

মুসাফিরের ডায়রী

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী এম্-এ

আলোকচিত্র-শিল্পী—শ্রীরাধাভূষণ বসু বি-এস্-সি, বি-কম্

২

রাত্রি জাগরণের অবসাদে ও পাহাড়ে পথে মোটর রথের দোলানীতে দেহ ক্লান্তিতে যেন ভেঙে প'ড়ছিল—শয্যায় আশ্রয় নিতে পারলেই যেন বেঁচে যাই, চোখ যেন ঘুমের জড়তায় জড়িয়ে আসছে কিন্তু শিলং-এর স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া সমস্ত অবসাদ, সমস্ত ক্লান্তি যেন দেহ থেকে মুছে নিয়ে গেল, প্রকৃতির সেই আলোঝলমল অপূর্ব্ব রূপ যেন চোখের দৃষ্টিকে সজাগ ও সচেতন করে তুল্‌লে। মনের মানুষ,-যে হৃদয়ের রুদ্ধ কারাপ্রাচীরে বন্দী হোয়ে আছে, সে তখন বলে উঠ্‌ল—

"দিগন্তের পথ বাহি
শূন্যে চাহি
রিক্ত বিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিয়াছে ভাসি,
সেই স্নিগ্ধক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্য্যকরে,
পূর্ণতার গম্ভীর অম্বরে
মুক্তির শান্তির মাঝখানে,
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে॥"

ক্যামেল্‌স্ ব্যাক (Camel's Back) রোড এবং পাইন্‌উড হোটেলে যাইবার রাস্তা। ছবির ডানদিকে ক্যামেল্‌স্ ব্যাক্ রোড—এইস্থানে রাস্তাটী উষ্ট্রের পৃষ্ঠের ন্যায় উঁচু হইয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার ঐ রূপ নাম করণ হইয়াছে—রাস্তাটী গভর্ণমেণ্ট হাউসের পাশ দিয়া "ব্যাঙ্গভিলা" হইয়া রেস্‌কোর্সে গিয়াছে। বাম দিকে পাইন্‌উড হোটেলে যাইবার রাস্তা।

দূরে, আকাশে মেঘ-বলাকার দল শুভ্র পাখা মেলে যেন সত্যিই গৌরীশঙ্করের তীর্থে ভেসে চ'লেছে, আর মাথার উপরে স্ফটিকস্বচ্ছ নীল আকাশ, তার বুকে আলোর ঝল্‌কানি, দূরে পাহাড়ের মাথায় পাইনের শ্যামলশোভা, তার মাঝে ছোট ছোট লাল রঙের জাপানী ধাঁচের বাড়ীগুলি যেন ছবির মত চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল, মন কল্পনার রঙে রঙীন হোয়ে উঠ্‌ল, কোন অজানার সন্ধানে যেন যাত্রা ক'রেছিলাম, এই যেন তাকে পেলাম বলে, এমনি একটা আশায় চোখের জ্যোতি তখন তীব্র হোয়ে উঠেছে, পথের দু'পাশের বিচিত্রতার একটুখানিও যেন তখন সে দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে না। এই রকম অচেনার সন্ধানে বার হোয়েই হয়ত কবি একদিন ব'লেছিলেন—

"রে অচেনা মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে।
কোন্ অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রা জাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর
মুখ দেখিলাম তোর।
* * * *
তোর সাথে চেনা
সহজে হবেনা
কানে কানে মৃদু কণ্ঠে নয়।
ক'রে নেবো জয়
সংশয়-কুণ্ঠিত তোর বাণী
দৃপ্ত বলে লব টানি,
শঙ্কা হ'তে, লজ্জা হ'তে, দ্বিধা দ্বন্দ্ব হ'তে
নির্দ্দয় আলোতে।"

কবির এই সুর তখন যেন আমারও মনের বীণায় বেজে

উঠল—আমিও সেই সুরেই যেন ব'লে উঠলাম—"রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে ?"

আর্ল স্যানিটোরিয়ম—কতকগুলি বাড়ী লইয়া এই স্যানিটারিয়মটা অবস্থিত—তন্মধ্যে দাতা মিঃ বড়ুয়ার অর্থে নির্মিত "বড়ুয়া হাউস"টাই প্রধান এবং ছবিতে "বড়ুয়া হাউস" দেখা যাইতেছে। কমিশনার আর্ল সাহেবের নামানুসারে এই স্যানিটোরিয়মের নামকরণ হইয়াছে। এখানে অল্প খরচে থাকিবার স্থান পাওয়া যায়—রান্নাঘরও আছে, লোক রাখিয়া অথবা হোটেলে গিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। সাধারণ হোটেল বা স্যানিটোরিয়মের ন্যায় এখানে খাবার পাওয়া যায় না।

যতক্ষণ পাহাড়ের পর পাহাড় টপ্‌কে আমাদের রথ গতির পুলকে ছুটে চলেছিল, ততক্ষণ যেন এক স্বপ্ন-রাজ্যের মায়াপুরীর সাত মহালার মধ্যে মন ঘুরে ফিরে নূতন আনন্দে বিভোর হোয়ে ছিল—সে আনন্দের পরিমাপ নেই, সংজ্ঞা নেই, তাকে শুধু অনুভব করা যায়, মন দিয়ে স্পর্শ করা যায়, বাহিরে সে থাকে অব্যক্ত, অপ্রকাশ্য।

নির্ব্বাক নিস্তরঙ্গ আনন্দের মধ্যে ডুব দিয়ে যখন প্রকৃতির সেই রূপ-রাজ্যের মধ্যে মন পথ হারিয়ে বসেছে তখন মোটর বাসের গতি ধীরে ধীরে শ্লথ হোয়ে এসেছে, শিলংএর সীমানায় আমরা এসে পড়েছি। দূরে ডাঃ রবার্টের হাঁসপাতালের লাল চূড়া যেন প্রহরীর মত যাত্রীদের স্বাগত অভিবাদন জানাচ্ছে। শিলং প্রবেশের মুখেই এই হাঁসপাতালটি চোখে পড়ে, তার পর দেখা যায় আর একটা মস্ত উঁচু চূড়া,—সেটা হ'চ্ছে বাজারের সিংহদ্বার। এইটিই শিলং-এর বড়বাজার। পথের নীচে গভীর খাদ; সেই খাদের বুকে উম্‌খারা নদী প্রবাহিত হোয়ে চলেছে, যার বুকের শক্তি যোগাচ্ছে বিডন ফল্‌স্‌। পথের উপর থেকে এই জলপ্রপাতটি চকিতের মত দেখা যায়, চলমান বাসের গতির মুখে যেন সুন্দরী তরুণীর এক ঝলক হাসির মতই সে জল-প্রবাহ মিলিয়ে গেল। এই বিডন ফল্‌স্‌ থেকেই সারা শিলং সহরকে ইলেকট্রিক্ সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করা হোয়েছে। শিলং হাইড্রো-ইলেকট্রিক্ কোম্পানীর পাওয়ার হাউস্‌ এরই তলদেশে অবস্থিত। পাওয়ার হাউসে যাবার জন্য পাথর ফেলে চলন-সই সিঁড়ি একটা বানান হোয়েছে—এই পথেই কোম্পানীর লোকেরা এবং দর্শকেরা পাওয়ার হাউসে যাতায়াত করেন। ১৯২৩ খৃঃ শিলংএর এই প্রদেশের শাসক একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত রামনাথ দত্তের সঙ্গে পরামর্শ করে ভারতবিখ্যাত চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় এই হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা-

শিলংজেল—জেলটী নিতান্ত ক্ষুদ্র—সেন্ট্রাল জেল গৌহাটীতে অবস্থিত। পাইন গাছের শ্রেণীই ইহার বিশেষত্ব।

করেন। যখন এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠার কথাবার্ত্তা চলে কেউই বিশ্বাস করতে পারেনি, এর থেকে এত বড় একটা ব্যবস

পড়ে উঠতে পারে। কিন্তু ডাঃ রায়ের এবং শ্রীযুক্ত রামনাথ দত্তের চেষ্টায় সুন্দরী শিলংকে আজ আর রাতের অন্ধকারের

ডন্ বস্কোর ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত মূর্ত্তি—ডন্ বস্কো ছিলেন এক জন খ্রীষ্টান পাদরী—খাসিয়া জাতির ভিতর খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার এবং শিক্ষাবিস্তারের জন্যই তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তিটা "লাইটুমুখরা" অথবা "লাইমুখরা" নামক শিলং-এর একটা পল্লীতে মিশনারী স্কুল, কলেজ, গীর্জ্জা প্রভৃতির মধ্যে অবস্থিত।

ওড়নায় মুখ ঢাকতে হয়না—বিদ্যুতের চোখ ঝল্সান আলোয় শিলংএর আর একটা নূতন সৌন্দর্য্য রাতের অন্ধকারের মধ্যেও ফুটে ওঠে। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর ব্যবস্থা আছে, পথের দুধারে কলকাতার চৌরঙ্গী ও বালিগঞ্জ অঞ্চলের মত ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের পোষ্ট—সন্ধ্যায় কোন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলে মনে হয় পাহাড়ের মাথায় যেন কারা আকাশ পিদিম জেলে দিয়েছে। অন্ততঃ পুলিশ বাজারের ট্যাক্‌সী ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে লাবানের দিকে চেয়ে আমার তো তাই মনে হ'ত। কুয়াশায় ঢাকা শূন্যাস্তরণের মাঝে মাঝে আলোগুলোর স্তিমিত দীপ্তি যেন দূরের ঐ পাহাড়টাকে রহস্যময় ক'রে আমার চোখে জাগিয়ে তুলত—আকাশ-পিদিমের মত একটার পর একটা আলো যেন মালার মত সমস্ত পাহাড়টাকে জড়িয়ে ধরেছে—আকাশে অন্ধকার নিশিথিনীর কালো এলো চুল, তার পিছনে খসে পড়েছে তার কালো রেশমী ওড়না—রাতের সে রহস্যময়ী রূপ পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত সন্ধ্যায় উপভোগ করেছি, মনের মধ্যে একটা অলৌকিকের ছবি এঁকে নিয়েছি।

বাজারের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে মোটরবাস আসাম কাউন্‌সিল হাউসকে ডানপাশে রেখে কমার্সিয়াল ক্যারিইং কোম্পানীর ষ্টেশনে যাত্রীদের নামিয়ে দিলে। লাগেজ ভ্যানগুলো তখন এসে পৌছায়নি—খবর নিয়ে জানা গেল আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়্‌বে। বেলা তখন দেড়টা বেজে গেছে। পাকস্থলীতে তখন অগ্নিদেবের জ্বালাও ধরে গেছে অনেকেরই। আস্তানায় পৌছুতে পারলে যেন সকলেই বেঁচে যায়। যারা কাছাকাছি কোথাও উঠবেন স্থির ক'রে এসেছিলেন তাঁরা মাল পত্র পরে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন ঠিক্ করে আস্তানার দিকেই এগিয়ে গেলেন। আমাদের একটু দূরেই যেতে হবে, মাল-পত্র একেবারে নিয়ে যাওয়াই সঙ্গত মনে করে লাগেজ ভ্যানের আশায় বসে রইলাম। অনেকে হোটেল এবং বোর্ডিং হাউসে থাকবেন স্থির করে এসেছিলেন তাঁরা
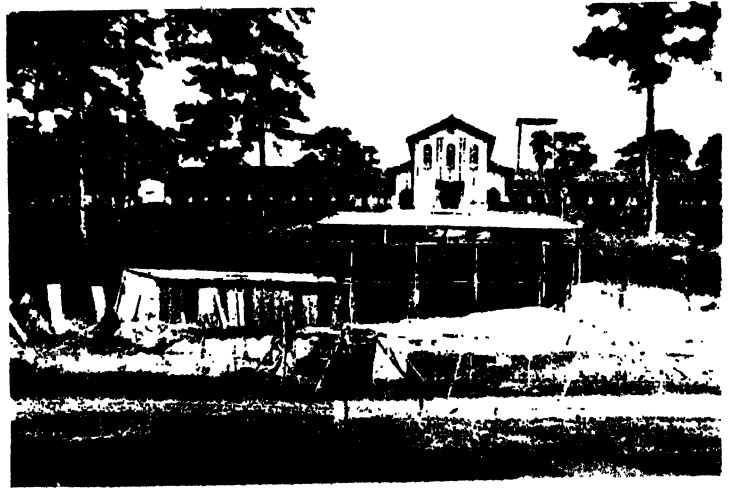
লোরেটো কন্‌ভেণ্ট—মিশনারী স্কুল, কেবল মাত্র মেয়েদের জন্য।

হোটেলের সন্ধানে চলে গেলেন। শিলংএ হোটেল এবং বোর্ডিং হাউস আছে অনেকগুলো—তার মধ্যে "হিলটপ

শিলং রেস্ কোর্স—রেসের দিন লোকের ভীড়

হোটেল," "স্বাস্থ্যনিবাস" আর "শিলং হোটেলই" নামকরা। এই কয়টিই বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত। পাইনউড হোটেলই সব চেয়ে নামকরা হোটেল, কিন্তু ইউরোপিয়ান পরিচালিত। শ্বেতকায়দের এ হোটেলটি বেশ আরামদায়ক—কালা আদমীরাও অবশ্য স্থান পেতে পারেন। আর্ল স্যানিটোরিয়ামে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবার ব্যবস্থা আছে—আহারাদির ব্যবস্থা কিন্তু নিজেকে ক'রে নিতে হয়। দু' চারখানা ঘরও খালি থাকলে একটি পরিবার থাকবার জন্য মাসিক বা সাপ্তাহিক হারে ভাড়া নিতে পারা যায়। এখানে সব চেয়ে কম ভাড়া ঘর পিছু ২৲ টাকা রোজ। যাঁরা সস্ত্রীক এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে আসেন তাঁদের পক্ষে দুতিনখানা ঘর নিয়ে থাকার পক্ষে এই স্যানিটোরিয়ামটি মন্দ নয়—বেশ সাজান গোছান ঘর, স্যানিটারী কনডিসানও ভাল, দোকান বাজার খুব কাছে, পোষ্ট অফিস, ট্যাক্সী ষ্ট্যাণ্ডও দুপা এগুলেই। কাজেই থাকবার পক্ষে জায়গাটা ভালই। তবে ঘর প্রায়ই এখানে খালি থাকে না। আগে থাকতে চিঠিপত্র না লিখে গেলে স্থান প্রায়ই পাওয়া যায় না।

আধ ঘটা সময় কাটাতে হবে—ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম্ যাত্রীদের মধ্যে পরিচিতের চেনা মুখ আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। ভীড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে আসতে নির্ম্মল বাবুর সঙ্গে লাগেজ অফিসের সামনে দেখা হোল। তিনি ব'ললেন—"আমার বন্ধু রাধাভূষণকে এই মাত্র আপনার কথাই বলছিলাম— সত্যিই বিদেশে এসে আপনার মত কবিজনের সাথে পরিচিত হোয়ে নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান্ বলে মনে করছি।"

আমি বললাম—সে সৌভাগ্য আপনার একার নয় মিত্তির মশাই, আমিও আপনাদের মধ্যে নতুন বন্ধু পেয়ে সত্যিই খুব খুসী হোয়েছি। আমার রোগ হোচ্ছে কি জানেন, লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে বেড়ান। আর আপনার মত উকীল ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা তো ভাগ্যের কথা।

নির্ম্মল বাবু হেসে বললেন—কিন্তু উকীল তো আমার মত আণ্ডায় গণ্ডা মিলিয়ে পাওয়া যায়—

আমি বললাম—থাক্, তর্কের শেষ নেই, কিন্তু আমার মতে

পাস্তুর ইন্সটিটিউট—রেস্ কোর্সের নিকটেই

এখানেই ওটার সমাপ্তি ঘটুক। বিনয় গুণ যে আপনার আছে তা প্রথম আলাপেই বুঝেছিলাম। তবে ভাববেন না আমার

বিনয় নেই, বিনয়ী বটে কিন্তু বৈষ্ণবী বিনয়ের পক্ষপাতী আমি নই। এখন আপনার বন্ধুবরের সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা ঘটিয়ে

শিলং হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি কোম্পানীর অফিস

দিন, উনি সুখী হবেন কিনা জানিনে, তবে আমি যে খুসী হব সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন।

রাধাভূষণ বোধ করি কিছু অধৈর্য্য হোয়ে উঠেছিলেন— তিনি বললেন, দেখুন মৃণালবাবু, কথা সাজানই আপনার বৃত্তি। সাক্ষাৎ পরিচয় আপনার সাথে এর পূর্ব্বে না থাকলেও, নামের পরিচয়ের অভাব ঘটেনি। মাসিকের পৃষ্ঠায় আপনার নামটা অনেক আগেই চোখে পড়েছে, আর নির্ম্মলের মুখেও এইমাত্র আপনার কথাই শুনছিলাম,—আপনি সারাপথটা তাদের কবিত্ব খাদ্য জুগিয়ে এসেছেন—

আমি একটু গম্ভীর হোয়ে বললাম— মোটেই না মশাই, মুখে আমার রাটি ছিলনা—নিস্তব্ধ হোয়ে সারা পথটা আমি পার হোয়ে এসেছি। যে পথে এসেছি, সেখানে কথা নেই, শুধু অনুভূতি, শুধু মন দিয়ে স্পর্শ সুখই সে পথে পাওয়া যায়—বাক্য ভাষার অতীত তীরে হারিয়ে যায়। শুধু মনে হোয়েছে—

সাগর গিরি করবো রে জয়
যাবো তাদের লঙ্ঘি,
একলা পথে করিনে ভয়,
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।

তবে একবার মশাই, ভাবাবেশে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আওড়ে ফেলেছিলাম। প্রকৃতির চারুনিকেতনের মাঝ দিয়ে যখন উল্কার বেগে কমার্সিয়াল ক্যারিয়িং কোম্পানীর বাস পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে শুধু উর্দ্ধমুখে ছুটে চলেছিল সেই সময়ে মনে আমার ভাব একটু লেগে গিয়েছিল, আমি স্বগতই বলে উঠেছিলাম

"যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ
দীপক তানে উঠুক্ ধ্বনি
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।"

ক্রিনোলীন জলপ্রপাত—শিলং

এই আর যায় কোথায় মশাই! বাস্ শুদ্ধ লোক তো আমায় ক্ষ্যাপা ঠাউরে হেসে অস্থির! একজন তো বলেই বসলেন

বোস বললেন—আমিও তাই মশাই, পাণ্ডু থেকে শিলং আসবার পথের দৃশ্য আমার মনকেও ভুলিয়ে হাতছানি দিয়ে কোথায় কোন সুদূরে যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তা নিজেই জানতে পারিনি। তারপর কদিন এখানে আছি মনে হোচ্ছে স্বর্গ তো এইখানেই। ওরা যে ব'লে 'Scotland of the East' সেটা বোধ হয় ঠিকই। সারাদিন ক্যামেরা ঘাড়ে ক'রে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই, ঝরণার পাশে বসে মনকে জলের ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিই, পাইনের শিরশিরানির সাথে বাতাসের বাঁশী শুনি, রাতে ঝিল্লীর গানে বিরহী বাউলের গান কানে বাজে—
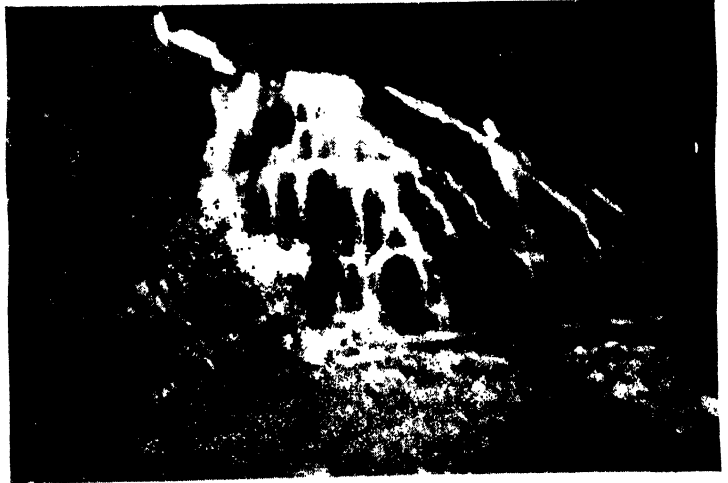
বিডন জলপ্রপাত—এই জলপ্রপাতের গতি দ্বারাই শিলং হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি কোম্পানী শিলং সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেন।

বোধ করি কাব্য-রোগ আছে—তা'না হোলে এই ভয়ঙ্করের সামনে ছুটতে ছুটতেও কবিতা আবৃত্তি করচে কেন?

আমি তাঁর কথা কানে না তুলেই আপন মনে বলেছিলাম,

"পূণ্য হই এ চলার স্নানে
চলার অমৃত পানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।
ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।"

বোস সাহেব, এই অপরাধটুকু করেছিলাম আমি—কাব্যের খোরাক নিজেই পেয়েছি, অন্যকে দেবার মত অকৃপণতা তখন আমার ছিলনা। কৃপণের মত, লোভীর মত আমি আমার দৃষ্টির সঞ্চয়কে প্রাণের মধ্যেই ধরে রাখতে চেয়েছি।

বিশপ জলপ্রপাত—শিলং

আমি বাধা দিয়ে বললাম—শুনুন নির্ম্মলবাবু, কবিত্ব যদি কারো থাকে তা হ'লে আপনার এই বন্ধুটিরই আছে। যাক্, বোস সাহেব, যে কটা দিন প্রবাসে আছি আপনার সঙ্গ দানে অধমকে সুখী করবেন।

বোস বললেন—মাপ করবেন মশাই, কবি টবি আমি নই, নেহাৎ শুখনো নিরস গদ্যপ্রাণ আমার, তবে কি জানি এটাকে কবিতার দেশ ব'লেই মনে হোচ্ছে, তাই হয়ত একটু ছোঁয়াচ লেগে গিয়েছে।

এলিফ্যাণ্ট জলপ্রপাত—আপার শিলং

আমি বললাম—ঠিক কথা। শেষের কবিতার দেশ এটা। এরই কোলে বসে হয়ত একটি ঘন কুয়াশাঢাকা তমসাময়ী রাত্রিতে বিশ্বকবি শুনেছিলেন—"চক্র পিষ্ট আঁধারের বক্ষ ফাটা তারার ক্রন্দন।" শেষের কবিতার জন্ম এরই কোলে—পাহাড়ে রাঙামাটি বিছান পথের ধুলোতেই অমিত ও লাবণ্য পরস্পরকে প্রথম চেনে, এরই আশ্রয়ে তাদের প্রেম অভিনব হোয়ে ফুটেছিল। সেই প্রেমকে কেন্দ্র করে কবি জগতের শ্রেষ্ঠ Romance রচনা করেছেন। শেষের কবিতার তুলনা নেই, গদ্যে লেখা কাব্য ছাড়া ওকে আর অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না।

আমার উচ্ছ্বাসে বাধা পড়ল। হর্ণ বাজাতে বাজাতে লাগেজ ভ্যানগুলি ষ্টেশনে ঢুকতে সুরু করেছে, কুলীরা ছুটোছুটী করে মাল নামানর কাজে লেগে গেল। মালপত্র উদ্ধার ক'রে নির্ম্মলবাবুরা লাবানের দিকে রওনা হোলেন। তাঁর বাসায় যাবার নিমন্ত্রণ দিয়ে যেতে অবশ্য ভোলেন নি।

ডাঃ চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ও লাবানের পথে চললেন—তাঁর ও নিমন্ত্রণ পেলাম।

রাধাভূষণ "স্বাস্থ্যনিবাসে" আশ্রয় নিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধার ক'রছেন। ষ্টেশনের কাছেই তাঁর আস্তানা, সুতরাং তিনিও পা বাড়ালেন এবং তার পরের দিন সকালে ষ্টেশনে এসেই আমার সাক্ষাৎ দেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে গেলেন।

আমাদের যে বাড়ীতে উঠবার কথা ছিল, সেদিকে রওনা হোলেম। কিন্তু সেখানে পৌঁছে গোলযোগে পড়া গেল। বাড়ীর মালিকের বিনা অনুমতিতে সেখানকার বাড়ী যিনি দেখা শুনা করতেন তিনি বাড়ীটি ভাড়া দিয়ে বসে আছেন এবং মালিক আসছেন শুনে গৌহাটীতে বিশেষ কার্য্য বশতঃ রওনা হোয়ে গেছেন। সুতরাং সেই অবেলায় শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ-ভার টানতে টানতে হোটেলের সন্ধানে ফিরতে হোল। 'হিল্‌টপে' স্থান একেবারেইনেই, 'স্বাস্থ্যনি

লাবানের একটী রাস্তা—শিলং
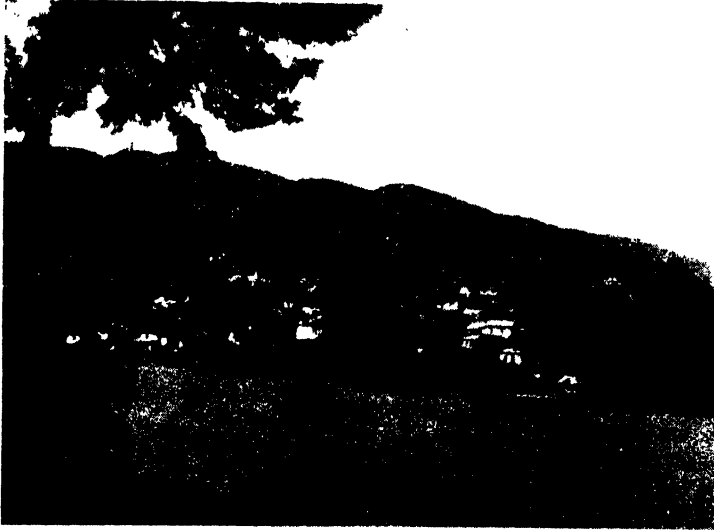
লাবান ক্রিকেট গ্রাউণ্ড—
দূরেলাবান পাহাড়—শিলং

তাই—মহাবিপদে প'ড়ে গেলাম। অতি কষ্টে শিলং হোটেলে স্থান পাওয়া গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

একটা প্রবল বাসনা মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল, কিন্তু তাতে শরীর আরো খারাপ হবার ভয়ে সেটা থেকে নিরস্ত

খাসিয়া ছেলেমেয়েদের
ক্যামেরা-Shyness

বেলা প্রায় চারটায় স্নান সেরে আহারাদি শেষ করা গেল। শরীর খুবই ক্লান্ত হোয়ে পড়েছিল, বিছানায় দেহ এলিয়ে দেবার

হলাম। ঘণ্টাখানেক বসে গল্প স্বল্প করে বিশ্রাম নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী

পুনশ্চ

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

তুমি বল্লে, কী ছাই ভস্ম লেখ বসে বসে,
কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, পুরুষমানুষের
একি সর্ব্বনেশে নেশা !
তোমার সেই এক্‌টা ফুঁয়ে নিভে গেলুম দপ্‌ ক'রে।
মুখে আস্‌ছিল বলি—"যার জন্যে চুরি করি
সেই বলে চোর !"
কিছু বল্লুম না, রইলুম চুপ করে।
তার পর ধীরে সুবুদ্ধি জাগ্‌ল।
দুষ্টু সরস্বতী নাম্‌ল ঘাড় থেকে।
কর্‌লুম শপথ, আর লিখবনা কবিতা।

দিলুম মন কাজে।
সকাল সন্ধে টানি ঘানি, ভ'রে তেলের কল্‌সী।
পেশা বদ্‌লালুম।
বুন্‌তাম কথার জাল,
হ্‌লুম কলু ;
তেলে যেন সোনা গলে, খোল পর্য্যন্ত
হল সোনার তাল।

দিন যায়, ঘানির বলদ বুড়িয়ে এল
ল্যাজমলা খেয়েও চলেনা,
তাকে টান্‌তে টান্‌তে হাঁপিয়ে উঠি

এবার এলে আর এক তুমি।
পুরাণ' খাতাগুলো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিয়ে পড়লে।
বল্লে, ঢের টেনেছ ঘানি,
অনেক করেছ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।
দিচ্ছি নতুন খাতা, আর এই খাগের কলম,
লিখে যাও পাতার পরে পাতা।
তোমার বাণী হ'ল আমার বিধি !
সেই পুরাণ ছিলিমটা ধরালেম আবার ফুঁ দিয়ে।
চোখ বুজে হুঁকো টানি,
কল্লোলিত হয় তোমার অনুপ্রেরণা,
আবার তাঁতি বসে গিয়ে সেই তাঁতে।

অসমাপিকা

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

সমাপ্তির পর নবারম্ভের অবতরণিকা।
কাল তোমাকে দেখেছিলাম আমার অস্তাচলে,
আজ দিলে আবার দেখা এই উদয়-শিখরে।
এম্‌নি করেই ত শেষকে অশেষ ক'রে তোলে।
তোমাকে আর অতিক্রম কর্‌তে পারলাম না।

জীবন এই অসমাপিকার, মালিকা।
তাই মনে হয় মৃত্যুর পরেও আছে জন্মান্তর।
পরলোকের আর প্রমাণান্তর নাই।
স্মৃতিলোকই অমরধাম, বিস্মৃতিই মৃত্যু।

আমার স্মৃতিতে তোমার নব জন্মান্তর।
তেম্‌নি তোমার স্মৃতিতেও আমি বাল-গোপাল।
দূরে থেকে দেখি গোষ্ঠলীলার স্বপ্নচ্ছবি।
স্বপ্নইত শাশ্বত, আর সব চলচঞ্চল।

দেহলোকে করি বাস, তাই দেহে হই সৃষ্টিধর,
আমাদের মর্ত্ত্যপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয় এই সৃজনোল্লাসে।
তবু এই প্রেমের আছে সর্ব্বতোমুখিনী বাসনা,
জলস্থলাম্বরকে তাই এত ভালবাসি।

দেহাতীত পূর্ব্বরাগে দেখা দিয়েছ উদয়াচলে।
মুক্তিলাভ কর্‌ব যখন দেহপিঞ্জর থেকে,
বিশ্বসৃষ্টিশালার বিপুলপ্রাঙ্গণে পাব তখন রাজমজুরি,
তোমাকে আবার পাব কাছে মজুরণীর মধুর মূর্ত্তিতে।

হীরেনের রোমান্স

[সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক]

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

প্রথম অঙ্ক

হীরেনের বসিবার ঘর। দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল, যদিও বেলা তখন সাতটা। হীরেন লিখিবার টেবিল হইতে মাথা তুলিল, ভাবিল ঘড়ির বাজনাটা ঠিক করিয়া দিবে, কিন্তু উঠিতে পারিল না। তাহার আজ মরিবারও ফুর্সৎ নাই। সে প্রেমপত্র লিখিতে বসিয়াছে। জীবনে ইহাই তাহার প্রথম প্রেমপত্র। ⋯টেবিলের নীচে বেতের ঝুড়িটা ছেঁড়া চিঠির কাগজে প্রায় আকণ্ঠ ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনখানি বাংলা অভিধান মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে এবং চতুর্দ্দিকে বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই ছড়ানো। কাব্যসমুদ্র মন্থন চলিতেছে, এখন সুধাই উঠে কি গরলই উঠে।⋯ব্লটিংপ্যাডের উপর হীরেন তাহার উড়িয়া ব্রাহ্মণের চৈতন সমেত মুণ্ড আঁকিয়াছে, তাহার পাশে আঁকিয়াছে একটা ব্যাঙ্, এবং জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ব্যাঙের দিকে চাহিয়া আছে, যদি কোনো inspiration লাভ করে।⋯ বিবাহিত দম্পতীদের পরস্পরকে কিরূপ চিঠি লেখা উচিত সে-সম্বন্ধে বাংলাভাষায় গদ্যে ও পদ্যে রচিত কয়েকটি অমূল্য বই আছে,— আকাশে চাঁদ থাকিলে এইরূপ লিখিবে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে এইরূপ, এবং মেঘ অথবা চাঁদ দুইই না থাকিলে এইরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় অবিবাহিত তরুণ অবিবাহিতা তরুণীকে কিভাবে লিখিবে সে-সম্বন্ধে বাংলাভাষায় কোনো বই নাই। তাই বাধ্য হইয়া হীরেন ইংরাজী পুস্তকের শরণাপন্ন হইয়াছে। তাহার হাতের কাছে কোনো এক বহুবিবাহবিচ্ছিন্ন মার্কিন 'ভেটেরানের' লেখা "How to Propose to a Young Lady" লাল-নীল পেন্সিলে চিত্রাঙ্কিত হইয়া আছে।⋯ কলমদানের পাশেই সোনালি ফোটোফ্রেমে এক তরুণীর আলোক-চিত্র, সুচিক্কণ জর্জেট সাড়ী, মাথার বামধারে সিঁথী ও কপালের মধ্যদেশে টিপ—তরুণী জগৎ-সংসারের দিকে প্রশান্তবদনে হাস্য করিতেছেন। প্রেমপত্র খানি ইঁহারই উদ্দেশে।⋯এমন সময় নফরা ঘরে ঢুকিল। তাহার সামনের দুটি দাঁত পড়িয়াছে, কাণের মধ্যে প্রচুর চুল, এবং গোঁফ দাড়ি কামানো। ফতুয়া পরিয়া আছে। হীরেনের পিতৃমাতৃহীন এবং মক্কেলহীন নব্য উকিলী জীবনে নফরাই একমাত্র সম্বল।

নফ্‌রা। দাদাবাবু, বাজার থেকে কি কি নেস্‌তে হবেন সেইটে শুধোতে এলাম।

[হীরেন তন্ময়। নফরা একটু কাশিল]

হীরেন। আঃ, কেন জ্বালাতন করছিস্! কী, চাস কী!

নফ্‌রা। কোন্ সাত সকাল থেকে উঠে কেবল নিকৃতিচ আর ছিঁড়তিচ, নিকৃতিচ আর ছিঁড়তিচ। লফরার কথাটা একবার শোনো দিকি। যা নেকবার তা সিলেটে নিকে লিয়ে কাগজে মকেসা করে লাও, বাস্, ঝট করে হয়ে যাবেন।

হীরেন। যা, যা, বিরক্ত করিস্ নি।

নফ্‌রা। তখন থেকে শুধোচ্ছি। বাজার ত আর তোমার নেকার পিতীক্ষেয় বসে থাকবেন না। আজ খাবে কি সেটা বলে দিলেই ত পার।

হীরেন। (ব্লটিং প্যাডের দিকে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া) কোলা ব্যাঙ।

নফ্‌রা। আ আমার পোড়াকপাল। এই লেফ্‌রাটি ঝদ্দিন আছে। তারপর তোমার অদেষ্টে কোলাব্যাঙও জুটবেন না, তা বলে দিনু, হ্যাঁ।

[রাগিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল]

হীরেন। (এ সবে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিলেন) কী বলে সম্বোধন করব ছাই, হৃদয় পর্য্যন্ত লিখে বসে আছি। ওগো আমার হৃদ—য়েশ্বরী? ধ্যেৎ! এ যেন গুলুওস্তাগরের লেন! কি লেখা যায় বল দিকি, হৃদয় ড্যাশ, হৃদয় ড্যাশ—থাকুক তবে ঐ হৃদয় ড্যাশ, মন্দই বা কি! (লিখিয়া পড়িতে লাগিলেন) "ওগো আমার হৃদয় ড্যাশ, আমার তিনকুলে কেই নেই, কেবল এক নফরা ছাড়া। আমার বিদ্যাবুদ্ধি তোমার আর জানতে বাকী নেই,—কি বলে যে সম্বোধন করি তাই আমার মাথায় আসছে না। তোমাকে যা আমি লিখতে

চাই নফ্‌রাটা তা গুছিয়ে লিখ্‌তে দিচ্ছে না, তখন থেকে কেবল ঘুলিয়ে দিচ্ছে। মুখে বলতেও পারি না, কথা বেধে যায়। তুমি আমায় দয়া করে বিয়ে করবে কি?—আমি ত তাহলে বর্ত্তে যাই, আর নফ্‌রা হতভাগাও খুব টীট হয়।" —বেশ হয়েছে। দিই পাঠিয়ে। (চিঠিখানা খামে পুরিলেন, ঠিকানা লিখিলেন) নফর, নফর চাঁদ—

নেপথ্যে

উড়িয়া বামুন। হ নফর্ অ ভাই, বাবু ডাকুছন্তি, এখনি গোস্‌সা হইব। যাও—

(নফর নির্ব্বিকার)

উড়িয়া বামুন। ধাঁইকিড়ি—

নফর। ডাকুক গে, ডাকতে দে।

উড়িয়া বামুন। কাঁইকিড়ি?

নফর। কিঁড়ি মিড়ি করিস্‌নে। বুঝলি নে উত হরদমই ডাকতিছে, কাঁহাতক্ আর যাই বল। এখুনি ভুলে যাবে।

হীরেন। ওরে হতভাগা পাজী বাঁদর, ওরে নফ্‌রা—

(নেপথ্যে)

নফ্‌রা। এবার সত্যি সত্যি ডাকৃতিছে। (উচ্চৈঃস্বরে) —এজ্ঞে যাই দাদাবাবু]

(নফ্‌রা প্রবেশ করিল)

নফ্‌রা। এই দেখ! এতক্ষণ হুঁস ছিলেন না, আর এখন লফ্‌রা লফ্‌রা করে বাড়ী মাথায় করতিচ। বাজার থেকে কি লেস্‌তে হবেন বল।

হীরেন। আরে রেখে দে তোর বাজার। কেবল ব্যাটার পেটের চিন্তা। এই চিঠি নিয়ে একেবারে লেক রোডে চলে যা, ঠিকানা পড়তে পারবি ত? বলবি খুব জরুরী। এখুনি জবাব চাই। বাসে করে যাবি আর জবাব নিয়ে বাসে করে চলে আসবি, দেরী করবি না, বুঝলি?

নফরা। আচ্ছা গো আচ্ছা, সে হবেখন।

হীরেন। হবেখন কিরে হতভাগা, এখুনি যা। দেরী না হয়, বুঝলি?

নফ্‌রা। মনিষ্যির শরীল ত, উড়ে ত আর যেতে পারবনি। তুমি চাও ঝেন উড়ে যাই।

(মৃদুমন্দ গমনে চলিয়া গেল)

(সত্যেন আসিয়া উপস্থিত হইল)

সত্যেন। এ কি সকাল বেলা কাব্যচর্চ্চা হচ্ছে না কি হীরেন দা? পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে তুমি নাকি প্রেমে পড়েছ।

হীরেন। নিশ্চয় আমার কোনো শত্রুর কাজ।

সত্যেন। কিন্তু কথাটা সত্যি ত?

হীরেন। শত্রু কখনো মিছে কথা রটায়? কথা, সত্যি।

সত্যেন। [সোনালি ফ্রেমে আঁটা আলোকচিত্র দেখিয়া] ওঃ ইনিই হলেন তিনি। বাঃ, ভারী সুন্দর দেখতে ত! ইনি কে হীরেন দা, কোথায় থাকেন?

হীরেন। ব্যারিষ্টার মিষ্টার ব্যানার্জীর মেয়ে, লেক রোডে থাকেন। ওঁর সম্বন্ধে ফাজলামো করিস নি, মার খাবি।

সত্যেন। ব্যারিষ্টার! There is method in your madness—লেক রোড?—বাংলা দেশের সমস্ত রোমান্স যে পাড়ায় ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে বাস করে, সেই লেক রোড?

হীরেন। চালাকি হচ্ছে, না!

সত্যেন। এর সঙ্গে কি করে আলাপ হল বলবে না হীরেন দা?

হীরেন। হ্যাঃ, আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ওঁকে সব বলতে হবে।

সত্যেন। পায়ে পড়ি তোমার, বল। মাসিকপত্রে সব আজগুবি প্রেমের গল্প পড়ি, চাক্ষুষ রোমান্স একটাও দেখিনি। বল না হীরেন দা।

হীরেন। আলাপ কি আর সহজে হয়, তার জন্যে প্ল্যান করতে হয়। অনেক রকম মৎলব আমার মাথায় এসেছিল। হরিশকে চিনিস ত?

সত্যেন। কুস্তি করে করে যার গুণ্ডার মত চেহারা?

হীরেন। হাঁ হাঁ সেই। ভাবলাম তাকে দিয়ে একদিন অন্ধকারে মিস্ বানার্জীকে খুব কসে ভয় দেখাই, এবং তিনি গুণ্ডার হাতে পড়েছেন ভেবে যখন চীৎকার করে উঠবেন তখন নিজে গিয়ে তাকে উদ্ধার করি।

সত্যেন। মন্দ যুক্তি করনি!

হীরেন। আবার একবার ভাবলাম, নাঃ, হরিশ ফরিশকে এ সব প্রেম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে জড়িয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে

মিস্ বানার্জ্জী যখন সন্ধ্যায় লেকের ধারে পায়চারি করবেন, আমি লুকিয়ে পেছন থেকে তাঁকে জলে ফেলে দেব ঠিক করলাম।

সত্যেন। সর্ব্বনাশ! তারপর নিজে বুঝি জলে ঝাঁপ দেবে?—বুঝেছি, প্রতাপ ও শৈবলিনী!

হীরেন। ছাই বুঝেছিস। মৎলব ছিল সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে টেনে তুলব, তাতে তিনি ভাববেন আমিই তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছি।

সত্যেন। কি চমৎকার তোমার বুদ্ধি! প্রাণদাতার গলা জড়িয়ে তৎক্ষণাৎ প্রেমে পতন ও মূর্চ্ছা—

হীরেন। ফের ফাজলামো করছিস! এসব কিছুই করতে হয় নি।

সত্যেন। তবে?—

হীরেন। (বাহিরের দিকে তাকাইয়া) ঐ যাঃ, একখানা চলে গেল!

সত্যেন। কী চলে গেল হীরেন দা?

হীরেন দা। না, ও একটা ইয়ে—

সত্যেন। তোমার গল্পটা শেস কর।

হীরেন। একদিন বট্‌নিক বাগানে বেঞ্চের ওপর পা তুলে আকাশ পাতাল ভাবছি এমন সময় দেখি একটা ব্রাউন রঙের পিকিনিজ কুকুর আমার একপাটি জুতা নিয়ে পালাচ্ছে।

সত্যেন। এ্যাঁ, বল কি!

হীরেন। আমি কুকুরটার পিছু পিছু ছুটলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি মিস ব্যানার্জ্জী আর তাঁর এক বান্ধবী বসে আছেন, পিছনে ডালাখোলা টিফিন্ বাস্কেট,—কুকুরটা মিস্ ব্যানার্জীর।

সত্যেন। দেখ! একেই বলে যোগাযোগ!

হীরেন। সম্ভব।

সত্যেন। সম্ভব কি, নিশ্চয়। নইলে এই সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করা বাংলাদেশে দ্বিসপ্তকোটি ভক্ষণোপযোগী জুতা ত ছিল, সে সমস্ত ছেড়ে তোমার জুতাই বা নিল কেন কুকুরটা।

হীরেন। যা, যা, ফাজলামো করিস্ নি।

সত্যেন। তোমাকে দেখে মিস্ ব্যানার্জী কি বললেন?

হীরেন। খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

সত্যেন। হবারই কথা। তোমাকে পাগল-টাগল ভাবলেন আর কি।

হীরেন। তোর মাথা! কুকুরটা আমার জুতা নিয়ে পালিয়ে এসেছে শুনে তিনি বললেন, 'জুতা কোথায় রেখেছিস্ বার করে দে, ববী!'—কিন্তু জুতাটা সে কোথায় সরিয়ে ফেলেছিল। তখন পাওয়া গেল না। যে পাটিটা পরেছিলাম—

সত্যেন! ওঃ, তুমি একপাটি জুতা পরেই বুঝি দৌড়েছিলে?

হীরেন। বাঃ, সেটাকে ফেলে দেব নাকি? সেটার দিকে চেয়ে মিস্ ব্যানার্জী বললেন 'এঃ ববী দেখছি আপনার এ জুতাটাও চিবিয়ে দিয়েছে।' কী দয়া। আমি বললাম, না, না, সেজন্যে আপনি ভাববেন না।

সত্যেন। যেন না চিবলেই তাঁর ভাববার কারণ ঘটত।

হীরেন। মিস্ ব্যানার্জীর সেই সঙ্গিনী ইতিমধ্যে টিফিন বাস্কেটের একটা ড্রাগ্ থেকে সর্ব্বাঙ্গে ক্রীমকাষ্টার্ড মাখানো কি একটা জিনিষ বার করে বললেন 'ওমা, এটা কী গো!'

সত্যেন। সেটা কি হীরেন দা?

হীরেন। আমার সেই হারানো জুতার পাটি। ববী কুকুর তাকে লুকিয়ে রেখেছিল ক্রীম-কাষ্টার্ডের মধ্যে।

সত্যেন। সে নিশ্চয় ভেবেছিল ক্রীম কাষ্টার্ডে পড়লে জুতাটির স্বাভাবিক সুস্বাদ আরো বেড়ে যাবে।

হীরেন। মিস্ বানার্জী বললেন, 'জুতাটা ববী ভারী পছন্দ করে। বাবার দুজোড়া স্লিপার আর তিনটে বুট খেয়ে ফেলেছে।'

সত্যেন। এ কুকুর মরে গেলে জুতাওলাদের জোট বেঁধে গড়ের মাঠে শোক সভা করা উচিত।

হীরেন। এমনি করে মিস্ ব্যানার্জী, মানে গায়ত্রী দেবীর সঙ্গে আমার—(বাহিরের দিকে তাকাইয়া) ঐ যাঃ, আর একখানা চলে গেল!

সত্যেন। এ্যাঃ, মানুষকে তুমি চমকে দাও! কী চলে গেল?

হীরেন। মোটর বাস্।

সত্যেন। বাস্ চলে গেল ত কি হল! দেখ হীরেন দা, গায়ত্রীদেবীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে সর্ব্বাগ্রে ববীকুকুরকে

জানমহম্মদের জুতার দোকানে নিয়ে গিয়ে ভুরী ভোজন করিয়ে দিও।

হীরেন। মিষ্টার বানার্জী তার মস্ত প্রতিবন্ধক।

সত্যেন। কেন, কেন?

হীরেন। তাঁকে যদি দেখতিস্ ত বুঝতিস। কী ভীষণ উগ্রস্বভাবের লোক। ব্যারিষ্টারি পাশ করবার আগে তিনি সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন।

সত্যেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের দুর্ভাগ্য তাঁরা একজন জবরদস্ত হাকিম হারিয়েছেন!

হীরেন। কী মেজাজ!

সত্যেন। সুতীব্র সমালোচনার দ্বারা জর্জ্জরিত করবার মতো একজন রৌদ্রদগ্ধ ব্যুরোক্র্যাট্ হারিয়েছে দেশী খবরের কাগজওয়ালারা।

হীরেন। তবে গায়ত্রী দেবী হয়ত আমাকে অপছন্দ করেন না, এই যা আমার ভরসা।

সত্যেন। ওঃ ভারী ভরসা! আমাদের দেশের মেয়ের আবার স্বাধীন মতামত আছে নাকি! বলবে, আমি কি করব বলুন, বাবার যখন অমত—

হীরেন। (রাগিয়া) গায়ত্রী দেবীকে তুই সামান্য মেয়ে ভাবিস নি! সাবধান বলছি! জানিস মহাকবি কি বলেছেন—

"নারীকে আপন ইয়ে জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?
মানে,—ইয়ে,—কেন রব জাগি

ক্লান্ত মৌন,—না না—ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি—" বাকিটা মনে আসছেনা।

সত্যেন। অমন চমৎকার কবিতাটা ভুলে মেরে দিয়েছ। ঐ রকম করে আবৃত্তি করে! তুমি একটা বর্ব্বর। গায়ত্রী দেবী তোমায় বিয়ে করবেন, না ছাই করবেন।

হীরেন। ঐ যাঃ, আর একখানা চলে গেল।

সত্যেন। তখন থেকে দেখছি অম্‌নি করছ। কারো অপেক্ষা করছ নাকি?

হীরেন। নফ্‌রাকে পাঠিয়েছি একটা চিঠি দিয়ে। গায়ত্রী দেবী কি জবাব দেবেন কে জানে!

সত্যেন। কেন, তুমি কি বিয়ের প্রস্তাব করেছ নাকি?

হীরেন। হুঁ।

সত্যেন। এ্যাঁ! সত্যি? ছি ছি হীরেন দা—

হীরেন। কেন, এর মধ্যে ছি ছির কি আছে শুনি?

সত্যেন। একটু তাড়াতাড়ি হল না? ধর, তোমার তেমন পসার টসার ত হয়নি, এরি মধ্যে বিয়ে—

হীরেন। জ্যাঠামি করিস নি। তুই একটা বর্ব্বর। প্রেমের সঙ্গে পসারের কি? জানিস না, মহাকবি কি বলেছেন—

সত্যেন। জানি, জানি, রক্ষা কর, তোমাকে আর কবিতা আবৃত্তি করতে হবে না। 'ধন নয়, মান নয়, এতটুকু ভালবাসা' —সেইটে ত?

হীরেন। হাঁ হাঁ সেইটে! তুই জানলি কি করে? তোর জানবার ত কথা নয়।

সত্যেন। জগতে আর কেউ ত জানে না, এক যা তুমিই জান।

হীরেন। ঐ রেঃ, নফ্‌রা আসছে!

[হীরেন রাস্তার দিকে অগ্রসর হইল। নফরার হাত হইতে একখানি চিঠি কাড়িয়া পড়িয়া ফেলিল। তারপর কি যে হইল সঠিক বলা যায় না। লিখিবার টেবিলটি দোয়াত কলম কালি ও পুস্তকাদিসহ উল্টাইয়া সত্যেনের পায়ে পড়িয়া গেল। টেবিলের এক কোণের ধাক্কা লাগিয়া আলমারির কাঁচ ভাঙিল এবং এক টুকরা কাঁচ ছিটকাইয়া নফরার আঙুল কাটিয়া গেল। আওয়াজ শুনিয়া পাশের বাড়ীর রামবাবু শশব্যস্তে খালি গায়ে চাদর জড়াইয়া হীরেনের বসিবার ঘরের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন]

হীরেন। যাঃ, একটা কাণ্ড হয়ে গেল! গায়ত্রীর ছবিটা ভাঙে নি ত!

সত্যেন। দূর হোক গে ছবি! আমার পাটা ভেঙে দিয়েছ তুমি। আমি বোধ হয় জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে গেলাম।

নফ্‌রা। ওরে বাবারে! আমি আর বাঁচবনিরে! আমি রক্তগঙ্গা হয়ে গেনু রে!—

[সবেগে রামবাবুর প্রবেশ]

রামবাবু। (গৃহবিপ্লবের দিকে অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) খুনে বেটারা! বলি ভেবেছ কি! এটা ভদ্রলোকের

পাড়া, না গুণ্ডার আখড়া হ্যা! আজই আমি পাড়া বদল করব। এই চললুম বাড়ী খুঁজতে!

[এক দৌড়ে বাড়ী খুঁজিতে চলিয়া গেলেন]

হীরেন। যাঃ, রামবাবু রাগ করে চলে গেলেন!

সত্যেন। তোমার ত তাতে ভারী ক্ষতি! পা ভেঙে দিয়ে, আঙুল কেটে দিয়ে, ভদ্রলোকের বাস উঠিয়ে এখন ধেই ধেই করে নাচ ঐ চিঠি নিয়ে!

হীরেন। তুই হলেও তাই করতিস। শুনবি কি লিখেছেন? শোন—

সত্যেন। থাক থাক। তোমাকে আর পড়ে শোনাতে হবে না। দাও আমাকে দাও। (চিঠি পড়িয়া হীরেনকে ফিরাইয়া দিল,) বাঃ, কী চিঠির শ্রী। যেমন তুমি, তেমনি তিনি।

হীরেন। নফরা শোন—

নফরা। আমি আর বাঁচবনি রে—

হীরেন। শোন কি লিখেছেন—"নিশ্চয়ই, একশোবার। খেতে বসেছি, এঁটোহাত, তাই,—নইলে এক্ষুনি যেয়ে তোমাকে বিয়ে এবং নফরাকে টাইট করে দিতাম। আমার আর তস্য সইছে না। ইতি তোমার হৃদয় ড্যাশ।"

দ্বিতীয় অঙ্ক

[ব্যানার্জী সাহেবের বাংলার সামনে ফুলবাগানে গলা খোলা সার্টের আস্তিন গুটাইয়া মিঃ ব্যানার্জী ফুলগাছের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। পুরাতন সাঁওতাল মালী একপাশে কোদাল হাতে দাঁড়াইয়া বকুনি খাইতেছে। গোলাপ গাছের সারির পাশ দিয়া কাঁকরে-ছাওয়া রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া গেটের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে বেয়ারা দাঁড়াইয়া আছে। বেয়ারা পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমান। সাহেবলোগদিগের সহিত তাহার হিন্দীতে কথা বলিবার হুকুম, কিন্তু যাহারা ধুতি পরিয়া আসে তাহাদের প্রতি নিজস্ব পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষা প্রয়োগে মানা নাই।...হীরেন আসিয়া গেটের বাহিরে দাঁড়াইল বেয়ারা গেট খুলিয়া দিল।]

হীরেন। সায়েব আছেন?

বেয়ারা। হ। ঐত ইষের মইধ্যা দেহেন্ না।· (হীরেন অগ্রসর হইল) যাইবেন না বাবু যাইবেন না—

হীরেন। কেন কেন?

বেয়ারা। রাইগ্যা টং অইসে, ইষের মইধ্যা মাইর‍্যা কু-ন্ কইর‍্যা পেলবো।

[হীরেন সন্ত্রস্তভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল,...ইতিমধ্যে একটা গোলাপ গাছের দুষ্টামিতে ব্যানার্জী সাহেব ঘোরতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন।]

মিঃ ব্যানার্জি। এ্যাঁ! যাদু হো গিয়া না? যাদু হো গিয়া! এ হতভাগা গাছটায় ফুলের নামগন্ধ নেই, পাতাগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে! (সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মালীর দিকে চাহিয়া) তুই কিছু করেছিস্ নিশ্চয়!

মালী। আমি কি করব বাবা, হেঁ হেঁ, তুমি ত দেখতিছ আমি বুসে থাকবার লোক নয়। (খনিত্র নাড়িয়া) কুদাল দিয়ে শালার মাটীকে হেই তাড়ছি আর হেই তাড়ছি গো! কুদালটি মাটী তাড়তে বাহাদুর বটে, মাটী উঠাতে তেমন বাহাদুর লয়। তেড়ে তেড়ে ঐ শালার মাটীতে আর কুচু রাখলিনি বাবা, হঁ।

মিঃ বানার্জী। তোর হাত ঘোরাণো রাখ্। জানিস কেবল মাটী কোপাতে আর কিছু জানিস না, বেটা সাঁওতাল, বেটা গর্দ্দভ, বেটা ভূত।

মালী। ঝদি শুনো ত বুলি। নইলে কেনে বুলতে যাবো গো, আমি ছ্যাঁদা কথা বুলবার লোক নয়। তা তুমি কেবল রাগই করতিচ, শুনবে আর কে?—

মিঃ বানার্জ্জী। কি বল্‌বি বল না।

মালী। উই গাছটিরে তুমি লেড়ে বসাতে বুল্‌লে, আমি তখুনি তোমায় বারণ করলি নি? আমি বুল্‌লি বাবা উইটাকে লাড়ালাড়ি করিস না,—তুমি শুনলে কথা? দিলি শালাকে লাড়িয়ে। লাড়ালাড়ির গাছে ত্যাজ্ হবে কুত্থেকে? উটা লাড়ালাড়িতে ধমোক্ খেয়ে গেছে হুজুর, তাই উটার ফুল হয় না বটে—হঁ।

মিঃ বানার্জ্জী। ধমোক্ খেয়ে গেছে না তোর মুণ্ডু। ও আবার কে আস্‌ছে?

মালী। উই যে লফ্‌রার বাবুটি গো—

মিঃ বানার্জ্জী। কে?

মালী। উই সেই যে লফ্‌রা চাকরটি, উয়ারই হাই বাবুটি বটে।

[হীরেন আসিয়া উপস্থিত হইল।]

মিঃ ব্যানার্জী। ওঃ হীরেন। কি হে ছোকরা, কি মনে করে !

হীরেন। নমস্কার। আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে এলাম।

মিঃ ব্যানার্জ্জি। সেত বুঝতেই পারছি।

হীরেন। একটু কথা ছিল।

মিঃ ব্যানার্জী। আঃ, গৌরচন্দ্রিকা না করে কথাটা বলেই ফেল না ছাই।

হীরেন। আজ্ঞে আমার—আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি।

মিঃ ব্যানার্জী। ওঃ এই কথা ? তা ওতে অত থতমত খাচ্ছ কেন ? অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবে ওকাজটা আবহমান-কাল ধরে সকলেই করে আসছে, তুমি কিছু নতুন নও। তাতে থতমত খাবার ত কোন দরকার নেই।

হীরেন। আজ্ঞে আর থতমত খাবনা তাহলে।

মিঃ ব্যানার্জী। বেশ বেশ। শুনে সুখী হলাম। তোমার বিয়ে করা উচিত। আজকাল ত কেবল হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছ শুনি।

মালী। হঁ—এইটি যথাথো কথা বটে। লফরা বুলছেল—

মিঃ ব্যানার্জী। তুই থাম। (হীরেনকে) তা পাত্রীটি কে ? কোনো জমিদার টমিদার পাকড়ালে বুঝি' হাঃ হাঃ—

হীরেন। পাত্রীটি আর কেউ নন, গায়ত্রী দেবী।

মিঃ ব্যানার্জী। অ্যাঃ—গা—গায়ত্রী ! কো-কোথাকার গায়ত্রী ?

হীরেন। আপনার মেয়ে।

মিঃ ব্যানার্জী। হো-হোয়াট !

মালী। (কোদাল ঘুরাইয়া) হাই দিদিমণি গো, মোদের দিদিমনি বটে। উতো এখুন আর ফেরক্ পরে নাচ্‌চেন নি, বেশ ডাগরটি হইয়েছেন বটে, এখুন উয়ার বিয়া না দিলে লেহ্য লয়, নোকে তোমায় দুষবে তা বুলে দিলি, হঁ।

মিঃ ব্যানার্জী। Shut up ! হতভাগা পাজী ! যা দূর হয়ে যা, এখান থেকে,—বেরো—

মালী। তুমি খালি রাগই করতিচ। (চলিয়া গেল)

মিঃ ব্যানর্জী। Some cheek তোমার ছোকরা ! সাল নেই, সুলো নেই, কিস্যু নেই, আমার মেয়েকে বিয়ে করবার সখ ! Preposterous ! জুনিয়ার ব্যারিষ্টার হলেও কথা ছিল !

হীরেন। জুনিয়ার ব্যারিষ্টার হলেও কথা ছিল ?

মিঃ ব্যানার্জী। ছিলনাত কী ! আমার ইচ্ছেই ত তাই। একটা ভ্যারেণ্ডা ফ্রাইং উকীল,—আস্পর্দ্ধা দেখেছ ! (খানিক রাগে ফুলিতে লাগিলেন) Get out—

হীরেন। (চমকাইয়া) এঁ্যা—

মিঃ ব্যানার্জী। (আস্তিন গুটাইয়া হীরনের দিকে অগ্রসর হইলেন) Get out—

[এমন সময় গায়ত্রীদেবী ছুটিয়া আসিলেন, পিছনে আসিল ববীকুকুর]

গায়ত্রী। বাবা !

[মিঃ ব্যানার্জী থমকাইয়া দাঁড়াইলেন]

গায়ত্রী। আবার তুমি রাগ করছ ! এই যে বললে আর কখনো রাগ করবে না !

মিঃ ব্যানার্জী। না মায়ী, আমি,—আমি ত তেমন রাগ করিনি।

গায়ত্রী। আবার কি রকম রাগ করবে শুনি ?

[ববী বলিল—'ঘেউ'—অর্থাৎ তাই ত !]

[মিঃ ব্যানার্জী ঘাড় নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

গায়ত্রী। ঢাকার উকীল শশীবাবু তখন থেকে কাগজপত্র নিয়ে বসে আছেন, তুমি রাগারাগি করতেই ব্যস্ত !

মিঃ ব্যানার্জী। এই যে যাচ্ছি মায়ী।

গায়ত্রী। এখনি যাও। (মিষ্ট কণ্ঠে) লক্ষ্মী বাবা, রাগ করতে আছে কি !

(ববীকুকুর আদর করিয়া মিঃ ব্যানার্জীর পা চাটিয়া দিল)

[মিঃ ব্যানার্জী হীরেনের দিকে একবার চাহিয়া ঘাড় গোঁজ করিয়া চলিয়া গেলেন]

হীরেন। আশ্চর্য্য !

গায়ত্রী। কিসে এত আশ্চর্য্য হলে ?

হীরেন। সার্কাসে দেখেছিলাম মানুষখাদক একটা বাঘকে একটা লোক ধাঁ ক'রে ঠাণ্ডা করে ফেল্ল, আর এই দেখলাম তোমাকে। তুমি না এসে পড়লে আমার মার খেতে হত। উঃ !

(কপাল হইতে ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন)

গায়ত্রী। আজ বাবার মেজাজটা খুবই খারাপ হয়ে রয়েছে। আমি এত করে বোঝাই, কিন্তু বেচারা একটুতেই রেগে ওঠেন। আজ কোর্ট থেকে ফিরে এসেছেন খুব রেগে। একটা অ্যাপীল ছিল, হেরে গেছেন।

হীরেন। হেরে গেছেন তুমি কি করে জানলে?

গায়ত্রী। বেয়ারা যখন তাঁর মোজা খোলে তখন জানতে পেরেছি।

হীরেন। সে কি!

গায়ত্রী। মোজা খোলবার সময় বেয়ারা রোজই বাবার পায়ের দুএকটা চুলে টান দেয়, আর বকুনি খায়। আজ বাবা বল্লেন 'স্কাউণ্ড্রেল্' আর ঘুসি তুললেন। তখনি বুঝেছি হেরে এসেছেন।

হীরেন। আশ্চর্য্য! তোমার মতন আমার অত বুদ্ধি থাকলে—

গায়ত্রী। যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না। অ্যাপীলটা ছিল বড় মজার।

হীরেন। মাম্লা মকরদামার কথাও তুমি সব জানো দেখছি!

গায়ত্রী। বাবা আমাকে বলেন যে। আসামীর চাচী তাকে বলেছিল যে সে বেকার বসে খাচ্ছে তাতে আসামী করল কি রাগের চোটে দিল চাচীর মাথাটা ফাটিয়ে।

হীরেন। বেকার বসে যে খাচ্ছে না তাই প্রমাণ করে দিল।

গায়ত্রী। এখন বাবার মত হচ্ছে যে চাচী যদি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে তার এই রকম আশু সুব্যবস্থার দরকার।

হীরেন। এবং ঘ্যান্ ঘ্যান্কারিণী চাচীমেধ যজ্ঞে আসামী প্রথম পাইওনীয়ার হিসেবে বেকসুর খালাসের যোগ্য।

গায়ত্রী। জজসায়েবদের সেই কথাই বাবা বললেন। কিন্তু তাঁরা শুনলেন না।

হীরেন। অন্যায় দেখ! এ থেকে বোঝা যাচ্ছে জজ সায়েবদের আপনাপন চাচী বহুপূর্ব্বে গতাসু হয়েছেন।

গায়ত্রী। সম্ভব।...আচ্ছা, বাবা আজ তোমার ওপর অত চটলেন কেন? কী বলেছিলে?

হীরেন। আমি—বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম।

গায়ত্রী। অ্যাঁ!—তোমার বুঝি আর তর্ সইল না!... আমার চিঠির কথা বলনি ত?

হীরেন। পাগল!...তোমার বাবা ঠিক কথাই বলেছেন। আমাকে অন্ততঃ ব্যারিষ্টার হয়ে আসতেই হবে, নইলে কোন্ আক্কেলে তোমায় বিয়ে করব? তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে ত?—

(গায়ত্রী নিরুত্তর।)

বল? থাকবে ত?

(ববী গিয়া হীরেনের পা চাটিয়া দিল।)

হীরেন। আমি জানি, আমি জানি।...গোল বেধেছে চক্চকে গোলাকার পদার্থ নিয়ে, অর্থাৎ যা নিয়ে সচরাচর গোল বাঁধে।

গায়ত্রী। তুমি কি—খুব গরীব?

হীরেন। বাবা যা রেখে গেছেন তা থেকে মাসে শদুয়েক টাকা হয়। তবে আমি সঠিক জানি না, আমি তেমন হিসেবী নয় কিনা—

গায়ত্রী। তুমি জান না ত জানে কে?

(ববীও খুব আশ্চর্য্য হইয়া হীরেনের মুখের দিকে চাহিল)

হীরেন। নফ্রা হতভাগা জানে।

গায়ত্রী। বাঃ বেশ!... হাতে তোমার কিছু আছে?

হীরেন। আছে বইকি। (পকেট হইতে বাহির করিয়া গণিয়া কহিল) এই দেখ, পনের টাকা সাত আনা দেড় পয়সা, এই হচ্ছে আমার আপ্টু ডেট ব্যাঙ্ক ব্যালান্স।

(ববী পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া টাকা কয়টা দেখিয়া লইল)

গায়ত্রী। মোটে!

হীরেন। মাসের প্রথমে দুশো টাকা পকেটে রাখি। কি করে যে খরচ হয় জানি না, শেষের দিকে নফরার কাছে ধার করতে হয়। তোমার যদি টাকার দরকার হয়, সাইলকের কাছে ধার চেও, নফরার কাছে চেও না। হতভাগা ভারী কঞ্জুস আর ভারী বকে।

গায়ত্রী। তা এই টাকা দিয়ে বিলেত যাবে কি করে?

হীরেন। তাই ভাবছি।

গায়ত্রী। ভাবলেই কি টাকা আসবে?

হীরেন। নিশ্চয়। 'যেখানে হয় সেখানে এক ইচ্ছা,

সেখানে হয় এক উপায়'—টাকা আমি যেমন করে পারি যোগাড় করে নেব, তা তুমি দেখে নিও।

গায়ত্রী। যেমন করে পারি মানে?

হীরেন। আহা, তা বলে কি আর সিঁধ কাটতে যাব?

গায়ত্রী। তাও তুমি পার। তোমার যদি একটু হুঁস থাকে।

হীরেন। এই দেখ, তুমি আবার নফরার মতন বকুনি সুরু করলে। কিন্তু তোমার কাছে বকুনি খেতে আমার ভারী ভাল লাগে।...হাঁ হাঁ, একটা মতলব মাথায় এসেছে। তোমায় এখন বলব না। (নমস্কার করিয়া) এখুনি যেতে হচ্ছে।

(প্রস্থানোদ্যত)

গায়ত্রী। শোনো শোনো, যেও না। সত্যি সত্যিই কি সিঁধ কাটতে চললে নাকি?

হীরেন। (যাইতে যাইতে) আমার বড্ড তাড়াতাড়ি। তুমি কিছু মনে কোরো না। আমায় মাফ করো।

গায়ত্রী। (পিছন পিছন চলিতে চলিতে) শোনো, শোনো। আমার কথা শুনবে না ত? বেশ, তবে এই পর্য্যন্ত!

(ববীকুকুর ধপ করিয়া রাস্তার উপর বসিয়া পড়িল)

হীরেন। (ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন) আহা রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি। কি বলবে বল।

গায়ত্রী। আমি তোমায় টাকা দিচ্ছি, নাও, পায়ে পড়ি তোমার, চুরী ডাকাতি কোরো না।

হীরেন। তুমি টাকা দেবে? মা যাবার পর আমার ওপর এমন দয়া কেউ করে নি। (ববীকুকুর ফোঁস্ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল) এই যে তুমি দিতে চাইলে এতেই আমার পাওয়া হল। এ ঋণ জীবনে কখনো শোধ হবে না গায়ত্রী। এবার চললাম, কিন্তু চিরদিন একথা মনে করব। (চলিতে লাগিলেন)

গায়ত্রী। (পিছন পিছন চলিতে চলিতে) নেবে না তুমি?

হীরেন। তুমি ভেব না, আমি চুরি ডাকাতি করব না। টাকা আমি যোগাড় করবই। বিলেত আমি যাবই। তারপর আসব তোমার কাছে, মাথায় মুকুট পরে, কেমন? আসব ত? বল।

গায়ত্রী। এসো।

[হীরেনের গেটের অভিমুখে যাইতেই মালী গেট খুলিয়া দিল। সঙ্গোপনে তাহার হাতে কি গুঁজিয়া দিয়া হীরেন বাহির হইয়া গেল। গায়ত্রী দেবী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

মালী। (হাতের তালুর দিকে চাহিয়া) ইঃ, এক্কেবারে দশটাকার লোট রে বাবা, ইঁ!

[মাত্র গনের টাকা সম্বলের মধ্যে দশটাকা এইরূপে সদ্গতি লাভ করিল।...গায়ত্রী দেবীর চক্ষু অকারণে অশ্রুসজল হইয়া উঠিল]

তৃতীয় অঙ্ক

[হরিণমারী জঙ্গলের ভিতর ভাঙা কালীমন্দিরের সম্মুখে জীর্ণ প্রাঙ্গণ। মন্দিরে পেচকগণ সতর্ক নির্ভয়ে বসবাস করিয়া আসিতেছে। ছাদ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, প্রকাণ্ড এক বটগাছ দেয়াল ফুঁড়িয়া উঠিয়া সমস্ত মন্দিরের মাথায় ছাতা ধরিয়া আছে। জীর্ণ প্রাঙ্গণে যেখানে বিছুটী ও আশ্‌শ্যাওড়ার জঙ্গল অপেক্ষাকৃত বিরল সেইখানে এক জটাজুটধারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর বসিয়া আছেন আর তাঁহারই সম্মুখে ভক্তিগদগদচিত্তে হীরেনের মাতুল চন্দ্রশেখর বাবু ক্ষিপ্রহস্তে পূজোপকরণ গুছাইয়া রাখিতেছেন। দুজনের মাঝামাঝি স্থলে একটা প্রকাণ্ড কোশাকুশী, এক বোতল গঙ্গাজল, একটি "বিশুদ্ধ" কাপড় কাচিবার সাবান, এবং গামছায় ঢাকা কালো-রঙের বোতলে "ব্ল্যাকঅ্যাণ্ড্ হোয়াইট" নামক প্রসিদ্ধ কারণসলিল! চন্দ্রশেখর বাবু মুন্সেফ্, সন্তানাদি নাই, এবং বেশ দুপয়সা করিয়াছেন। বাজে খরচটি একেবারে দেখিতে পারেন না। অফিসে এবং মনুষ্য সমাজে ব্যবহারের জন্য তাঁহার একটিমাত্র কোট আছে। কোটের বাহিরের দিকটি কালো বনাতের, ভিতরের দিকটি কালো আলপাকার। বাহির ভিতর বলিয়া কিছু নাই, কারণ কোটটি দুই দিকেই পরা চলে, শীত গ্রীষ্ম ঋতুভেদে। নিন্দুকেরা আড়ালে বলে চন্দ্রশেখর মুন্সেফের কোটটি ঠিক লিপটনের চায়ের মতো, শীতকালে শরীর গরম রাখে এবং গ্রীষ্মকালে শরীর রাখে ঠাণ্ডা।...চন্দ্রশেখর বাবু হরিণমারীর জঙ্গলে আসিয়াছেন পট্টবস্ত্র ও চাদর পরিয়া, কপালে রক্তচন্দনের টিপ, দুই কর্ণে জবাফুল, তাঁহাকেও তন্ত্রসাধকের মতো দেখাইতেছে।...প্রাচীন বটগাছের আড়ালে লুকাইয়া হীরেন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ও মাতুল চন্দ্রশেখরের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।]

সন্ন্যাসী। এই যে ভাঙা কালীমন্দির দেখছ, এটি খুব

জাগ্রত স্থান। তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবার এমন উপযুক্ত ক্ষেত্র আর নেই।

চন্দ্রশেখর। (হাতজোড় করিয়া) আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যেন এক বিশাল জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আমায় বলছেন—তোর সব দুঃখ ঘুচে যাবে।—তার পঁচিশ দিন পরেই বাবার আগমন। আমি আপনার চরণাশ্রিত, এখন বাবার দয়া হলে হয়।

সন্ন্যাসী। আমিই স্বপ্ন দিয়েছিলাম। আমি কে বৎস! কেউ নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। সকলই সেই তারামায়ের ইচ্ছা।... তোমার বাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত যে ছোকরাটিকে দেখছি ওটিকে চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে। ওটি কে বৎস?

চন্দ্রশেখর। ও হীরেন, আমার ভাগনে। নতুন উকীল হয়েছে, কলকাতায় থাকে। হঠাৎ খেয়াল চেপেছে বিলেত যাবে, তাই আমার কাছে এসেছে টাকা চাইতে। আমি যেন টাকার গাছ, নাড়া দিলেই ঝর ঝর করে টাকা পড়বে!

সন্ন্যাসী। ওঃ হীরেন! বটে! নতুন উকীল! দিও না বৎস, ও সকল ম্লেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিও না।

চন্দ্রশেখর। আমি কি বাবা তেম্‌নি কাঁচা! টাকা দেব আমি! আমার রক্ত জলকরা টাকা! আপনি আসবার আগেই পষ্ট বলে দিয়েছি ওসব হবেটবে না।

সন্ন্যাসী। কদিন ধরে দেখছি তুমি আর আমি যখন বিশ্রম্ভালাপ করি ছোকরা তখন আমাদের দিকে চোখ রাখছে। আজ আমরা গোপনে এখানে এসেছি, ছোকরা পেছু নেয় নি ত?

চন্দ্রশেখর। অসম্ভব। কলকেতার বাবু, তার আটটার আগে ঘুমই ভাঙে না। যখন উঠে এসেছি তখন দেখি ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকছে।

সন্ন্যাসী। এ সকল তান্ত্রিক প্রক্রিয়া গোপন রাখতে হয়, নইলে সিদ্ধির বিঘ্ন ঘটে। কুলকুণ্ডলিনী তন্ত্রসারে বলেছে—ওটা কিহে, শুক্‌নো পাতার মধ্যে খস্ খস্ করে উঠল?

চন্দ্রশেখর। (সভয়ে লাফাইয়া উঠিয়া) কই কই, কোথায়? সাপটাপ হবে নিশ্চয়! যে জঙ্গল!

সন্ন্যাসী। না সাপ নয়। মানুষের হাঁচির মতো শব্দ হল না? মন্দিরের অভ্যন্তর হতে আসছে। প্যাঁচা কিম্বা বাদুড়ও হতে পারে।

চন্দ্রশেখর। আমার কিন্তু ভয় ভয় করছে। চাপরাশি টাপরাশি কেউ নেই, যদি একটা সাপ তেড়ে আসে, মারবে কে?

সন্ন্যাসী। নাঃ ভয় নেই। তবুও বলা যায় না। সকলি তারা মায়ের ইচ্ছা। মন ঈষৎ চঞ্চল হল। চিত্তস্থির করা এ সব প্রক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ। তাই কারণের ব্যবস্থা। কারণ করাও বৎস।

চন্দ্রশেখর। আজ্ঞে?

সন্ন্যাসী। বুঝতে পারলে না? তা পারবে কি করে? তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াগুলি ত আর তোমার ডিক্রি ডিস্‌মিস্ নয়, যৎপরোনাস্তি কঠিন এবং দুর্ব্বোধ্য। বোতলটি খোল, কিঞ্চিৎ পান করব, তারপর তুমি প্রসাদ পাবে।

[চন্দ্রশেখর হুইস্কির বোতল খুলিয়া সন্ন্যাসীকে দিলেন, সন্ন্যাসী বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া বোতলের আটআনা রকম নির্জ্জল 'কারণোদক' পান করিয়া ফেলিলেন। তারপর বোতলটি চন্দ্রশেখরের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া কহিলেন—]

সন্ন্যাসী। বিলাতী হলেও শুদ্ধ। হাত দিয়ে ছোঁয় না কিনা। প্রসাদ পাও বৎস।

চন্দ্রশেখর। আজ্ঞে, আমার ত ওসব মদটদ চলে না বাবা—

সন্ন্যাসী। কি বললি! মন্ত্রপূত কারণ সলিলকে বললি মদ! তায় আবার প্রসাদ করে দিলাম। তাকে বললি মদ! তোর ভাগ্যে কচু আর কাঁচকলা। দে বেটা, বোত্-বোতল আমায় দে! (রাগ করিয়া বোতলের বার আনা রকম পান করিয়া ফেলিলেন)

চন্দ্রশেখর। রাগ করবেন না বাবাঠাকুর আমি অজ্ঞ—

সন্ন্যাসী। অজ্ঞ ত বটেই, একেবারে নীরেট অজ্ঞ। পপ্-প্রসাদটুকু তবে খেয়ে ফ্যাল্, অজ্ঞতা দূর হবে।

[চন্দ্রশেখর ইতস্ততঃ করিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া বোতলটি নিঃশেষ করিয়া কাশিতে লাগিলেন]

সন্ন্যাসী। চুপ, চুপ। অত কেক্-কেশো না।

চন্দ্রশেখর। বড্ড ঝাঁজ যে বাবা।

সন্ন্যাসী। ঝাঁজ নয় ঝাঁজ নয়, ওটা তেজ। টাকা এনেছ

ত? বাব্-বার করে ঐ কলাপাতাটায় রাখ। আমি গং-গং-গাজলোর গং-গাজলোর ছিট্-ছিটে দিয়ে দিই।

[চন্দ্রশেখর কোমরের থলি হইতে অনেকগুলি নোট কলাপাতায় রাখিলেন, সন্ন্যাসী কোশা হইতে গঙ্গাজল লইয়া ছিটা দিয়া দিলেন।]

সন্ন্যাসী। টোট্-টোট্-টোট্যাল্টা কত?

চন্দ্রশেখর। আজ্ঞে?

সন্ন্যাসী। তুঃ তুম্যাক্টা আসল্লজ্‌বুক। বলি টাঃ-টাক্কা কত?

চন্দ্রশেখর। পাঁচ হাজার।

সন্ন্যাসী। পাঁঃ হাজার। গোপন করছ! সস্ সন্দেহ! (মারিতে উঠিলেন) তাহলে হয় তুমি ম্র, নয় আমি ম্র।

[চন্দ্রশেখর কাছার পিছনে গোজা সঙ্গোপনে রাখা আর পাঁচ হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া কলাপাতায় রাখিলেন]

চন্দ্রশেখর। মেরো না বাবা। আর গোপন করব না। এই মোট দশহাজার রাখলাম। পাঁচ হাজার কাছার খুঁটে লুকিয়েছিলাম, মন্তরের চোটে তাও জানতে পেরেছ। বাবা সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু। তোমাকে যখন পেয়েছি তখন ছাড়ছি না। (নেশার ঘোরে ভক্তির বেগ তাঁহার প্রবলতর হইয়া উঠিল, সন্ন্যাসীর পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁহার পায়ের কৃত্রিম ধূলা লইয়া অকৃত্রিম ভাবে গিলিয়া ফেলিলেন) দয়া কর বাবা, আমায় দয়া কর। আমার আর কেউ নেই, মা নেই বাপ নেই, কেউ নেই! (পিতৃমাতৃশোকে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন)

সন্ন্যাসী। ধোদ্-ধোধ্-ধোড়ে মিন্‌ষের 'ম্যা নেই ব্যাপ নেই' বলে কাক্-কান্না হচ্ছে! লজ্জা করে না! ওঠ শালা, পাচ্ছাড়—

চন্দ্রশেখর। উঠছি বাবা উঠছি। আমি আশ্রিত। আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার কাছে রাখলাম। বড় গরীব বাবা, আমি বড় গরীব।

সন্ন্যাসী। হ্যাঃ, গিগ্-গ্রীব! শালা টাকারক্-কুকুমীর!

চন্দ্রশেখর। এখন মন্তর দিয়ে নোট ডবল করে দাও। ডবল হবে ত বাবা?

সন্ন্যাসী। আলবাৎ হবে। আমি ত ঘোগ্-ঘোড়ার ডিম এরি মধ্যে চোখে সব ডব্-ডব্-ডবোল দেখছি। সাবান্নিয়ায়—

চন্দ্রশেখর। কি বলছ বাবা? তোমার কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সন্ন্যাসী। সাবান্নিয়ায়, সাস্-সাবান।

চন্দ্রশেখর। সাবান কেন বাবা?

সন্ন্যাসী। ওটা তাৎ-তান্তিক পঃক্রিয়া, তুই বুঝবি কি শালা মেম্-মেঠো হাকিম।

[চন্দ্রশেখর সন্ন্যাসীর হস্তে সাবান দিলেন। সন্ন্যাসী কোশা হইতে জল লইয়া চন্দ্রশেখরের মাথা ও মুখে খুব পুরু করিয়া সাবান লেপিতে লাগিলেন। সাদা ফেনায় চন্দ্রশেখরের শীর্ষদেশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল]

সন্ন্যাসী। দেব্-দেব্—দেক্তে পাচ্চিস্থিছু?

চন্দ্রশেখর। কিছু দেখতে পাচ্ছি না বাবা। চোখ জ্বালা করছে।

সন্ন্যাসী। বেঃ করে চোব্বুজে বসে থাক আর মন্তর পড়। হেউ—

চন্দ্রশেখর। হেউ।

সন্ন্যাসী। গাগ্-গাধা। ওটা মন্তন্নয়, মন্তন্নয়, ওটা মার ঢেড্-ঢেকুর!

চন্দ্রশেখর। শিগগির বল বাবা, আর থাকতে পাচ্ছি না যে—

সন্ন্যাসী। মন্তঃন্তর—চচ-চণ্ডীমুণ্ডা মুম্-মুণ্ডখণ্ডা—

চন্দ্রশেখর। এবার ঢেকুর-টেকুর নয় ত? চণ্ডীমুণ্ডা—তারপর কি বাবা?

সন্ন্যাসী। হ্রীং ছট, হ্রীং ছট—

চন্দ্রশেখর। হ্রীং ছট, হ্রীং ছট—

সন্ন্যাসী। জজ্-জপ করতে হবে পাঁঃশো বার। পাঁঃশো বার—হেউ—করে নোটের দিকে যেই চাচ্—চাইবি অমনি সস্-সমস্ত নোট—হেউ—হয়ে যাবে।

[চন্দ্রশেখর চোখে মুখে এক মুখ সাবান মাখিয়া হ্রীংছট হ্রীংছট বলিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী নোটের তাড়া লইয়া ক্ষিপ্রপদে উঠিয়া পড়িলেন। শুষ্ক পাতায় খস্ খস্ শব্দ হইল]

চন্দ্রশেখর। বাবাঠাকুর। (উত্তর নাই) বাবাঠাকুর! পালালে নাকি বাবা! (কলাপাতায় হাতড়াইয়া) নোট কই! এই রেঃ, সর্ব্বনাশ করেছে! ওরে ওরে—

[অন্তরালে দাঁড়াইয়া হীরেন সমস্ত দেখিল। সন্ন্যাসী টাকা লইয়া টলিতে টলিতে সরিয়া পড়ে এমন সময় হীরেন তাহার পৃষ্ঠে প্রচণ্ড পদাঘাত করিল এবং হাত হইতে নোটের তাড়া কাড়িয়া লইল। চন্দ্রশেখর চাদরে সাবান মুছিয়া অতিকষ্টে চাহিয়া দেখিলেন। টানাটানিতে সন্ন্যাসীর নকল দাড়ি গোঁফ খসিয়া গিয়াছে]

সন্ন্যাসী। আঃ ছাড় ছাড়। কী তাং-তামাসা কর।

হীরেন। আরে কেও, নটবর যে! চিনতে পার?

নটবর। (মার খাইয়া তাহার নেশা প্রায় ছাড়-ছাড় হইয়া আসিয়াছে) উকীল বাবু, আমায় চিচ্-চিনে ফেলেছেন দেখছি!

হীরেন। তা আর চিনব না! ফৌজদারির আসামী ছিলে মনে নেই! আমায় দিয়েছিলে উকীল। এই টাকা ডবল করা নিয়েই ত সেবার তোমার ছমাস জেল হয়ে গেল। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে নতুন শীকার সন্ধান করছিলে তাও জানি।

নটবর। কিক্-করব মশাই, পেটটা চালাতে হবে ত।

হীরেন। তা হবে বই কি! তা এই সাবান দিয়ে চোখ বন্ধ করে দেবার প্যাঁচটা তোমার ভারী original!

চন্দ্রশেখর। হুঁঃ, বেটা একটা পয়লা নম্বরের যোচ্চোর! হীরেন, ওকে ছেড় না বাবা, ওকে পুলিশে দেব। ভাগ্যিস্ তুমি ছিলে। তা আমার টাকাটা---

হীরেন। টাকাটা তোমাকে আর ফিরিয়ে দিচ্ছি না, এই টাকাতেই আমার বিলেত যাওয়ার খরচা হবে।

চন্দ্রশেখর। হা-হা-হা, ছেলেমানুষ আর কাকে বলে। লক্ষ্মীবাবা, দাও, টাকাটা ফিরিয়ে, তামাসা কোরো না। গুরুজনের সঙ্গে কি তামাসা করে!

হীরেন। তামাসা আমি করিনি। এ টাকা তুমি আর পাবে না মামা।

চন্দ্রশেখর। খবরদার বলছি হীরেন, ওসব চালাকি চলবে না। দাও টাকা ফিরিয়ে নইলে—

হীরেন। নইলে কি করবে?

চন্দ্রশেখর। নইলে আমি না-নালিশ করব!

হীরেন। কর না নালিশ, দেখবে তখন মজাটা! তোমার কীর্ত্তি-কাহিনী লোকে পয়সা দিয়ে পড়বে।

চন্দ্রশেখর। অ্যাঁঃ—তা তাহলে কথাটা জজের কানেও উঠবে ত?

হীরেন। তোমার জজ যদি বদ্ধ কালা না হন তা হলে কথাটা তাঁর কানেও ওঠা সম্ভব।

চন্দ্রশেখর। তা উঠুক গে, তবু নালিশ করব। দশ দশ হাজার টাকা!

হীরেন। বটে! তুমি এই মদের বোতলে মুখ দিয়ে ঐ চোরটার এঁটো মদ ঢক্ ঢক্ করে খেয়েছ আমি মামীকে বলে দিব।

চন্দ্রশেখর। অ্যাঁ—

হীরেন। আর বলে দেব তুমি মাতাল হয়ে ঐ জোচ্চোর-টার পায়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদেছ 'আমার মা নেই বাপ নেই কেউ নেই'!

চন্দ্রশেখর। সর্ব্বনাশ! বাবা হীরেন, আমি তোকে এই এতটুকু বয়সে কত কোলে করেছি পিঠে করেছি, তুই এমন কাজ করবিনি বাবা তা আমি বেশ জানি।

হীরেন। ছাই জানো তুমি।

চন্দ্রশেখর। বলে দিবি?

হীরেন। টাকা না দিলে ঠিক বলে দেব।

চন্দ্রশেখর। তাই ত! কী করি! গিন্নী এসব কথা শুনলে আমায় দংশন করবে, বঁটি দিয়ে কাটবে।

নটবর। জজের চেয়ে দেখছি তোমার গিন্নীকে বেশী ভয়!

চন্দ্রশেখর। তুই থাম, হতভাগা পাজী জোচ্চোর! তাই ত! এতগুলো টাকা!

হীরেন। কী ঠিক করলে বল। আমি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না।

চন্দ্রশেখর। তা আচ্ছা, আচ্ছা, তুই না হয় দু-দুশো টাকা নে।

হীরেন। (নোটগুলি চন্দ্রশেখরের দিকে প্রসারিত করিয়া) এই নাও তোমার টাকা। আমি চললুম মামীকে সব বলতে। (প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্রশেখর। ওরে ওরে—বলিস্ নি—তোর যা খুশী কর, গিন্নীকে বলিস্ নি।

হীরেন। তাহলে টাকাটা আমায় দিলে ত? (চন্দ্রশেখর

নিরুত্তর) বেশ বেশ। মনে থাকে যেন, মত বদলালেই মামীকে বলে দেব। (খানিকদূর যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল) হাঁ এখন আর বলতে বাধা নেই, আমিই একটা বেনামী চিঠি দিয়ে ওই নটবরকে তোমার সন্ধান দিয়েছিলাম। যদি সোজাসুজি টাকাটা দিতে তাহলে এই ফ্যাসাদে পড়তে না। আচ্ছা তাহলে চল্‌লাম।

চন্দ্রশেখর। ওরে, ওরে, ঐ—যাঃ চলে গেল!

নটবর। খাসা দাঁওটি মেরে নিয়ে গেল মাইরি! আর আমি শালা যে ধড়িবাজ জোচ্চোর, আমারো চোখে ধুলো দিয়ে গেল!

চন্দ্রশেখর। আমাকেও বোকা বানিয়ে গেল!

নটবর। তুমি ত জন্ম-বোকা, তোমাকে আর বোকা বানাবে কি!

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

ইদ্

(পারসী হইতে)

নূর আহাম্মদ

অন্যের ইদ্ হয় বৎসরে একবার,
মোর ইদ্ প্রিয়ে তব মুখ হেরি যতবার।

(ইদ্-খুশী ; আনন্দ,—মুসলমানী আনন্দ-পর্ব্ব)

যীশুখ্রীষ্টের ভারতে আগমন এবং হিন্দুধর্ম্ম প্রচার

শ্রীসুরথকুমার সরকার কাব্যবিনোদ

খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে যীশুখ্রীষ্টের সম্পূর্ণ জীবনী পাওয়া যায় না। তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃকাল হইতে ত্রিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত সময়ের ঘটনা সম্বন্ধে বাইবেল এবং অন্যান্য খ্রীষ্টীয় সাহিত্য নীরব। যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনাও তাঁহারা এক-প্রকার ভৌতিক গল্পের মধ্য দিয়া শেষ করিয়াছেন। কিন্তু কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ দেখিলে এবং ভারতীয় নাথ যোগী সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে যীশুখ্রীষ্ট পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ বর্ষ কাল ভারতে কাটাইয়াছিলেন এবং পুনরুত্থানের পরে তিনি ভারতে আগমন করিয়া নাথ যোগী সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টের জন্মভূমি প্যালেষ্টাইনে তাঁহার জন্মের বহু পূর্ব্বে হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। প্যালেষ্টাইনে এইরূপ হিন্দু-ভাবাপন্ন একশ্রেণীর সাধু ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম Essene। Arthur Lillie তাঁহার "India in Primitive Christianity" গ্রন্থে ইঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"Jesus was an Essene, and the Essene, like the Indian Yogi, sought to obtain divine Union and the 'gifts of the Spirit' by solitary reverie in retired spots."—Page 200. (Cf. ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে)।

এই Essene শব্দটী ঈশানী (ঈশান বা শিবের সাধক) শব্দের বৈদেশিক উচ্চারণভেদ মাত্র। ইঁহাদের সাধন-পদ্ধতি এবং ভারতীয় নাথ যোগী সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি অভিন্ন ছিল।

জন দি ব্যাপ্টিষ্ট (John the Baptist) এই Essene সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার নাম নাথ যোগী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের নামের সহিত এমন কি এই বাংলা দেশেও গীত হইতে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে। যীশুখ্রীষ্টকে এই মহাপুরুষ জন (John) দীক্ষিত করেন। যীশুখ্রীষ্টের প্রামাণ্য চরিতকার Earnest Renan এই Essene সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'The Essenes resembled the Gurus (Spiritual masters of Brahminism.)

যীশুখ্রীষ্ট ভারতীয় যোগধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষরূপ শিক্ষা লাভের জন্য ভারতে আগমন করেন। এ সম্বন্ধে তিব্বতের মারবুর নামক দুর্গম স্থানের মঠে বহুকালের পুরাতন একখানি পুঁথিতে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই পুঁথি-খানির একখানি নকল ভারত ও তিব্বতের সীমান্তে অবস্থিত হিমিস্ মঠেও বর্ত্তমান আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Dr. Notovitch নামক একজন রুষীয় (Russian) পর্য্যটক হিমিস্ মঠের নিকটে পাহাড় হইতে পড়িয়া চলৎশক্তি রহিত হন এবং লামাগণের অনুগ্রহে হিমিস মঠে আশ্রয় পান। তথায় বাসকালে তিনি লামাগণের নিকটে শুনিতে পান যে যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকটে একখানি বিশেষ মূল্যবান পুস্তক আছে। তিনি লামাগণের নিকট হইতে পুঁথিখানি চাহিয়া লইয়া পাঠ করেন এবং ইংরাজী ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়া লন। পরে আমেরিকা হইতে এই অনুবাদ অবলম্বন করিয়া তিনি "The Unknown Life of Jesus" নামক একখানি পুস্তক লিখেন। এই পুস্তকের কোনও কোনও স্থলে তিনি খ্রীষ্টীয় সমাজকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।

হিমিস মঠে যে পুস্তকখানি আছে তাহা মারবুর মঠের পালি ভাষায় লিখিত পুস্তকখানির তিব্বতীয় অনুবাদ। যীশু-খ্রীষ্ট ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাহা

আমরা এই পুঁথি পাঠ করিলে বুঝিতে পারি। পুঁথিখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছেন এবং উহার কতক অংশ অনুবাদ করিয়া আনিয়াছেন। এই অনুবাদের মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল। তাঁহার ও তিব্বতীয় লামাগণের মতে এই পুঁথিখানি যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ৩। ৪ বৎসর মাত্র পরে রচিত।

"ঈশা ক্রমে ত্রয়োদশ বর্ষীয় হইলেন। ঈশার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া ধনী ও কুলীনগণ তাঁহাকে জামাতা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু বিবাহ করিতে তাঁহায় আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বিবাহের কথায় তিনি গোপনে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং যাঁহারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মধ্যে বলবতী হইল। তিনি একদল সওদাগরের সহিত সিন্ধুদেশ অভিমুখে রওনা হইলেন এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃকালে আর্য্যভূমিতে পদার্পণ করিলেন। জৈনরা তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের মঠে থাকিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না—কারণ তখন কাহারও মত তাঁহার পছন্দ হইত না। ক্রমে তিনি জগন্নাথধামে উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণ-গণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তথায় বেদ ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতে শিক্ষা করিলেন। তৎপরে রাজগৃহ কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে ৬ বৎসর কাটাইয়া তিনি কপিলাবাস্তু যাত্রা করিলেন। তথায় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সহিত ৬বৎসরকাল বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলেন। তথা হইতে তিনি নেপাল ও হিমালয় পরিভ্রমণ করিয়া পারস্যদেশে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২৯ বৎসর হইয়াছিল। ৩০ বৎসর বয়সে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অত্যাচার-প্রপীড়িত স্বজন-গণের মধ্যে তিনি শান্তির বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।"

এই গ্রন্থখানিতে ১৪টী পরিচ্ছেদ এবং ২৪৪টী শ্লোক আছে এবং যীশুখ্রীষ্টকে ঈশা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যীশু যে ভারতে ঈশা নামে পরিচিত ছিলেন তাহা ভাষাতত্ত্বের সামান্য আলোচনাতেই বুঝা যায়। যীশুখ্রীষ্টের হিব্রুনাম জেহুয়া (Jeshua)। উহা গ্রীকে "ঈসোয়াস্"এ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ভারতে উহাই "ঈশাই" বা "ঈশা"তে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। যীশুখ্রীষ্টের বিশেষণ "মেসায়" (Messiah) এইরূপেই ভারতে "মসী" রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তীকালে অনেক স্থলেই যীশুখ্রীষ্টকে "ঈশা-মসী" নামে অভিহিত করা হইয়াছে দেখিতে পাই।

যীশুখ্রীষ্ট যে বেদজ্ঞও ছিলেন তাহা তাঁহার আত্মপরিচয় হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায়। বেদের

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

ইহার সহিত 'Son of God' বলিয়া পরিচয় দেওয়ার কোনই প্রভেদ নাই।

যীশুখ্রীষ্ট নিজেকে "অমৃতের পুত্র" বলিয়া পরিচয় দিলেও কৃশ্চিয়ানগণের সকলকে এই আখ্যা প্রদান করেন নাই। আমাদের মনে হয়, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া তিনি যে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে এই তিন ধর্ম্মের সংমিশ্রণজাত সহজসাধ্য পন্থাই সাধারণকে অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান বৈদিক "অমৃতের পুত্র" বা শাঙ্কর "শিবানন্দরূপঃ শিবোঽহং" পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না। জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গের তুলনায় অত্যন্ত দুর্গম বলিয়াই যীশু ভক্তি ধর্ম্মের জীবসেবা, অহিংসা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের সহিত একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বিন্ধ্যাচলের দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে "নাথ যোগী" সম্প্রদায়ের একশ্রেণীর সাধু আছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও নিকটে "নাথনামাবলী" নামক একখানি পুঁথি আছে। * এই পুঁথিতে দেখা যায় যে "যীশুখ্রীষ্ট চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ভারতে আগমন করেন এবং দীর্ঘ ষোড়শবর্ষকাল সাধনা করিয়া শিবের দর্শন পান। তৎপরে তিনি স্বদেশে যাইয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসীগণের মধ্যে অনেকেই তামস প্রকৃতির ছিল বলিয়া তাহারা এই জ্ঞানের আলোক সহ্য করিতে পারিল না এবং ঈশাইনাথের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার

* এই পুঁথিখানির কিয়দংশ পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও দেখিয়াছিলেন।—প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৩—"সত্তর বৎসর" প্রবন্ধ।

হস্ত-পদে কীলক প্রোথিত করিয়া নির্য্যাতন করিল। ঈশ্বর-দ্রষ্টা ঈশাইনাথ ত্রিলোকের কল্যাণ-কামনায় যোগবলে সমাধিমগ্ন হইলেন। পাষণ্ডগণ তখন তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া ফেলিল। ঈশাইনাথকে কাষ্ঠফলকের উপরে যখন কীলকবদ্ধ করা হয় তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ মহাপুরুষ চেতননাথ হিমালয়ের পাদদেশে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তিনি ধ্যান-যোগে ঈশাইনাথের যন্ত্রণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বদেহকে প্রপঞ্চীভূত করিলেন ও তিন দিনের মধ্যে তিন মাসের পথ উত্তীর্ণ হইয়া ইস্রাইলদের দেশে উপনীত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি বনের মধ্যে স্বরূপে প্রকট হইলেন। এই সময়ে অত্যন্ত যোনি-লিঙ্গ শিবপূজায় প্রবর্ত্তন করেন। তখন নানা দিগ্‌দেশ হইতে সাধুগণ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। তিনি ৪৯ বৎসর বয়সে তাঁহার কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের মানসে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শীর্ষমঠে যোগাসনে বসিয়া দেহ ত্যাগ করেন।"*

"নাথ নামাবলী" অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইলেও উহা অপ্রাপ্য নহে। নাথযোগী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণের নিকটে চেষ্টা করিলে মিলিতে পারে। যীশুখ্রীষ্টের উপরোক্ত কাহিনী ছাড়া এই গ্রন্থে আরও ১৭ জন "নাথ-সম্প্রদায়ের" মহা-পুরুষের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

ভারত সীমান্তে যীশুখ্রীষ্টের স্মৃতি-জড়িত স্থান সকল

দুর্য্যোগ হওয়ায় এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্রুদ্ধ হওয়ায় ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রে জগৎ কম্পমান হইতেছিল। তিনি উহা অগ্রাহ্য করিয়া ঈশাইনাথের দেহ ভূমধ্য হইতে উত্তোলন করিলেন এবং তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিলেন। তৎপরে উভয়ে পবিত্র আর্য্যভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে মঠ স্থাপন করিলেন। এখানে তিন বৎসর সাধনা করিবার পরে পরম কারুণিক শঙ্কর তাঁহাকে পুনরায় দর্শন দেন এবং তাঁহার দ্বারা জগতে সৃষ্টিরহস্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন। তদনুসারে ঈশাইনাথ শঙ্করীর যোনিপীঠের উপরে শঙ্করের জ্ঞান, শক্তি ও বীজরূপী ত্রিশূল স্থাপিত করিয়া

এই গ্রন্থের যোনিলিঙ্গ শিবপূজার বর্ণনা দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে পরবর্ত্তীকালে ইহাই ধর্ম্মপূজা ও বাণলিঙ্গ শিব-পূজায় রূপান্তরিত হইয়াছে অথবা বাণলিঙ্গ শিবপূজার ইহা প্রকারভেদ মাত্র।

যীশুখ্রীষ্ট যে ভারতে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ভবিষ্যপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটী হইতেও আমরা বুঝিতে পারি।

* "পানাইয়ারীতে যীশুখ্রীষ্টের কবর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।" পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ।

"ঈশমূর্ত্তির্হৃদি প্রাপ্তা নিত্যশুদ্ধা শিবঙ্করী।
ঈশা-মসীহ ইতি চ মম নাম প্রতিষ্ঠিতম॥"

ধর্ম্মপূজা ও বাণলিঙ্গ শিবপূজার পদ্ধতি এক, পার্থক্যের মধ্যে ধর্ম্মপূজায় ধর্ম্মকে প্রণাম করা হয় কিন্তু বাণলিঙ্গ শিবপূজায় শিবকে প্রণাম করা হয়। বাণলিঙ্গ শিবপূজা সাধারণতঃ চৈত্র মাসে হয় বলিয়া ইহাকেই বঙ্গদেশে চড়কপূজা বলিয়া থাকে। বাঙ্গলায় বৈশাখী সংক্রান্তিতে ধর্ম্মপূজা হইয়া থাকে। কিন্তু কাশ্মীর প্রদেশে চৈত্র সংক্রান্তিতে ধর্ম্ম ও শিবের একত্রে পূজা হইয়া থাকে। ইহারও পদ্ধতি মোটামুটি বঙ্গদেশীয় শিব পূজার ন্যায়। "তারিখ-ই-আঝাম্" নামক আরবী গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে কাশ্মীর ও কাবুলের সীমানায় "ঈশাতালাও" নামক স্থানে প্রতিবৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে এইরূপ শিবপূজা হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষ্যে তথায় একটী বৃহৎ মেলা বসে। স্থানীয় প্রবাদ এই যে উক্ত ঈশা-তালাও-এর জলাশয় হইতে মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্ট জলপান করিয়া শ্রান্তি দূর করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁহার ভক্তগণ এখনও প্রতিবৎসর এই স্থানে সমবেত হইয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশীয় ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক ছিলেন নাথ যোগীসম্প্রদায়ের সাধুগণ। (ময়নামতীর গান দ্রষ্টব্য)। এই ধর্ম্মপূজার সেবকগণ পূজার কয়েকরাত্রি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে "যোগীর গান" নামক এক প্রকার গান গাহিয়া থাকে। এই যোগীর গান অধুনা লোপ পাইতে বসিলেও এখনও রাজসাহী বিভাগের কোনও কোনও স্থানে বর্ত্তমান আছে। গানগুলি মুসলমান এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে। ইহারই কোনও গানের দুই পদে আমরা "যীশুখ্রীষ্ট" ও তাঁহার গুরু "জন দি ব্যাপ্টিষ্টের" ভারতে আগমনের ইঙ্গিত পাই। যীশুও যে এই যোগীসম্প্রদায়ের বিশেষ পূজ্য ছিলেন ইহা হইতে তাহাও আমরা বুঝিতে পারি—

"(আবে)[১] কোন্ দ্যাশেতে ঈশেই[২] গেল,
ফিরল' কবে ?
কম্নে[৩] গেল জন ?[৩]
(আবে) কুন্ঠি[৪] গেল যোগীর যোগী,
কম্নে রে তোর মন ?"

"(আবে) আরোব[৫] দ্যাশেৎ ঈশেই গেল,
ফিরলো মরি[৬]
মিশর দ্যাশেৎ[৭] জন,
(আবে) ঈশেই আমার গুরুর গুরু[৮]—
যোগীর যোগেই থাকে মন।

১। আবে = আহে = ও হে।
২। ঈশেই = ঈশাই নাথ = ঈশা মসী = Jesus the Messiah = যীশুখ্রীষ্ট।
৩। কম্নে = কোথায়, কোন্ দিকে। জন = John the Baptist ?
৪। কুন্ঠি = কোন ঠাই = কোথায়।
৫। আরোব = আরব = Arabia.
৬। মরি = মর × ই = মরিয়া। (After resurrection ?)
৭। দ্যাশেৎ = দেশেতে।
৮। গুরুর গুরু = সকলের প্রণম্য। সম্প্রদায়ের আদি গুরু।

এই গীতের "ঈশাই নাথ" যে যীশুখ্রীষ্ট এবং "জন" যে John the Baptist তাহা গীতটী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। যীশুখ্রীষ্ট নাথ যোগী সম্প্রদায়ের কোনওরূপ সংশ্রবে না থাকিলে কোনও প্রকারেই তিনি এই পল্লীগীতির মধ্যে গায়েনের বা যোগীর "গুরুর গুরু" হইয়া বসিতে পারিতেন না। "নাথ-নামাবলীতেও" তাঁহার যে পরিচয় পাই তাহা আমাদের স্বপক্ষে যায়। "The Unknown Life of Jesus" গ্রন্থে তাঁহার অজ্ঞাতবাসের যে পরিচয় পাই তাহাও যীশুখ্রীষ্টের "নাথ যোগী" সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি সাধনের কথা অস্বীকার করে না, বরং তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে তিনি এত উচ্চাবস্থার যোগী ছিলেন যে তাঁহাকে সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ দলভুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন ও অতি-উচ্চভাবাপন্ন মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িকতা হইতে দূরে থাকিয়া যীশুখ্রীষ্টের জীবনের এই অজ্ঞাত অংশ লইয়া আলোচনা করিলে ভবিষ্যতে আমরা হয় তো এখন আরও অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিব যাহার উপরে কোনও তর্কাতর্কিই চলিবে না, তাঁহার ভারতে আগমন সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।

শ্রীসুরথকুমার সরকার

গীতা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ

একরকম চাপা ঠোঁট দেখিয়াছ, ধনুকের মত দুই পাশ ঘুরিয়া গেছে, মাঝখানটায় একটি ছোট খাঁজ, দেখিয়াছ? সেই রকম সুন্দর ঠোঁট গীতার, তার সঙ্গে সুন্দর দুটি চোখ তার মুখখানিকে এমনি মাদকতাময় করিয়া তুলিয়াছে যে একবার দেখিলে আরেকবার দেখিতে হয়, আরেকবার দেখিলেই মনে ছাপ পড়িয়া যায়।

পাৎলা ঠোঁট দুখানিতে যখন সে কথা কয়, যখন সে হাসে, যখন সে গাম্ভীর্য্য আনে, সব সময়ই মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িতে থাকে। অথচ রং তার গৌর নয়, উজ্জ্বল শ্যাম, প্রসাধন করিলেই যা ফরসা বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সুন্দরীরা হার মানে শ্যাম্লা এই গীতা মেয়েটির কাছে।

নীতিকৃশ দেহটি ঈষৎ লম্বাধরণের বলিয়া তার চলনে একটা স্বাচ্ছন্দ্য, উপবেশনে ভঙ্গিমা, শাড়ীপরায় একটু লীলায়িত ভাব ফুটিয়া ওঠে। হঠাৎ-লজ্জায় মাথার ডানদিকের কাপড়টা টানিবার সময়, চুড়ী বাজাইয়া কুটনো কুটিবার সময়, পিছনে হাত দিয়া খোঁপাটাকে চাপিয়া বসাইবার সময়, এমন একটা সৌন্দর্য্য দেখা যায়, যা দেখিয়া তার স্বামী দিলীপের বুকটা গর্ব্বে—গৌরবে ভরিয়া ওঠে—স্ত্রীটি তার বেশ!

কাজটি তার শুধু পরিপাটি নয়, নিঃশব্দও বটে। নিজের ঘরকর্ণার কাজ সে মনের আনন্দে করে, সংসারটিকে সবদিক দিয়া চমৎকার করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি সে করে না।

তিনতলায় রান্নাঘর অথচ জলের কলের কত বন্দোবস্ত দেখ। খাবার ঘরের লাল মেঝে তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। নানা রকমের ডিজাইনওলা চায়ের কাপ-প্লেট সুরুচির পরিচয় দেয়। টেব্‌লএ বসিয়া তারা খায়, সেখানেও কি ব্যবস্থা! শয়নের ঘর যেন ছবি। রঙীন মোটা পর্দ্দা ঠেলিয়া ঢোক, দুধারে দুই মিরার্ড আলমারী, মাঝখানে খাট, বালিশ-চাপায় সূক্ষ্ম কারু-কার্য্য, কোণে ড্রেসিং টেবলএর তিনখানা আর্শি গলিতরূপার মত চাকচিক্যময়, জান্‌লায় জানলায় পর্দ্দার বিচিত্র বাহার, পুতুলের আলমারিতে দেশবিদেশের দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ, নানা ফটো ও নদীতটে সন্ধ্যা ও গিরিশিরে প্রভাত ল্যাণ্ডস্কেপ দেওয়ালে—কোনটা রাখিয়া কোন্‌টা তুমি দেখিবে? চোখ খারাপ করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আঁশের ঝিনুকের জরীর চুম্‌কির কত শিল্পকার্য্য সে করিয়াছে তারই অসংখ্য প্রমাণ সারা ঘরে।

পাশের ঘর কাপড় ছাড়িবার। তার পাশে বাথরুম—সেখানে টুথপেষ্ট, আয়না, আলনা, টব, স্প্রের কত সুবন্দোবস্ত, দেখিয়াই স্নান করিয়া লইতে সাধ যায়। এ বাড়ীটি রাজমিস্ত্রী গাঁথিয়া দিয়া কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেছে, কিন্তু এমন করিয়া সাজাইয়া তোলা গীতার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে সম্ভব হইয়াছে। তার স্বামী ত বেশী খরচ করিবে না, সস্তায় শোভন ও সুরুচী-সম্মত আয়োজন যে শুধু প্রয়োজনের তাগিদে হয় না, অনেক মাথা খাটাইয়া অনেক গতর খাটাইয়া অনেক প্রাণপাত করিয়া তবে সম্ভব হয়, এ কথা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে বুঝিবে?

দিনের শেষে তার ছোট ছাতটিতে ফুলের বাহার, সেখানে বেতের চেয়ার বার করিয়া দুজনে বসিয়া চা খাওয়া। দূরে গঙ্গা দেখা যায়, এমনকি তার ওপার পর্য্যন্ত। কলিকাতা সহরে এই তৃপ্তিটুকুই কয়জনে পায়? অন্ধকার ঘন হইয়া আসে, বেলফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। নদীতে সার্চ-লাইট ওঠে পড়ে, স্বামী স্ত্রী চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রাস্তায় রিকশর ঠুংঠুং, অনেক দূরে ট্রামের শব্দ।

গীতার এতটুকু সুখও বিধাতার সহিলনা, শিশুর সাজানো তাসের ঘর ফুঁ দিয়া ভাঙিয়া দিয়া বুড়োরা যেমন আরাম পায়, মানুষের অনেক দিনের পরিশ্রম এক নিমেষে ব্যর্থ করিয়া দিয়া তেমনি সেই অমর পুরুষ মনে করেন, ভারী মজা করা হইল। তাঁর ক্ষমতা অসীম, তাঁর হাইকোর্টের উপর প্রিভিকাউন্সিল

নাই, যা-খুসি তিনি যখন তখন করেন। দুর্ব্বল মানুষ মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে—কর্ম্মফল আর বরাত বলিয়া।

শেয়ারের কাজে দিলীপ রাতারাতি বড়লোক হইয়াছিল, শেয়ারের কাজেই রাতারাতি গরীব হইয়া গেল। একদিন সন্ধ্যাবেলা গীতা শুনিল, বাড়ী বিক্রয় না করিলে জেলে যাইতে হইবে।

শুধু বাড়ী নয়, সমস্ত ফার্ণিচার ও বহুমূল্য অলঙ্কার অবধি বিক্রয় হইয়া গেল। যে শাড়ী সে আজো পরিতে পায় নাই, পাট করিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে, যে শালের সমস্ত দাম চোকানো হয় নাই তাও রহিলনা। বেতার-যন্ত্র, গ্রামোফোন এমনকি পুতুলগুলাকে অবধি পার করিয়া দিয়াও পাওনাদারের সমস্ত ঋণ শোধ হইল না, তবু নাকি তারা প্রাপ্য টাকা বিস্তর ছাড়িয়া দিয়াছে। চাকরী করিয়া ধীরে ধীরে পরিশোধ করিতে হইবে।

দুর্ভাগ্য একলা আসেনা এই দুর্দ্দিনে গীতার প্রথম সন্তান-সম্ভাবনা, বহু আশার বহু প্রতীক্ষার।

যাহাদের মন কোমল, তাহারা আমার এ লেখা পড়িয়োনা, তোমরা বিধাতাপুরুষ নও, তোমাদের মনে দয়ামায়া আছে, তোমাদের নয়নে অশ্রু আছে, কিন্তু মমতা তাঁর নাই। তিনি এই করুণ রসের দৃশ্যটা হয়ত রসিয়া রসিয়া উপভোগ করিয়াছেন।

নহিলে গীতার বাড়ী যে কিনিল তার স্ত্রী বিন্দু গীতারই ছোট বেলার সই। বাপের বাড়ীর অহঙ্কার শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। তার জেঠামশায়ের মত বড়লোক 'কোন পৃথিবীতে নাই,' এই কথা সে স্কুলে শুনাইত। বিয়ের পর বলিতে লাগিল তার স্বামীর মত বিদ্বান ভারত-বর্ষেই নাই। তার স্বামী উৎফুল্ল, আমেরিকাফেরৎ, কিন্তু আগের স্ত্রীকে এক সন্তান সমেত বিদায় করিয়া দিয়াছে। তার অপরাধ সে স্বীকার করে নাই, স্বামীর অনুপস্থিতিতে কি কুকার্য্য সে করিয়াছে। সে ভাবিতে পারেনা, নববিবাহিত যুবক বিয়ের পরই বিদেশে চলিয়া গেল, রহিল দীর্ঘ তিনবৎসর, আর এখানে তার যুবতী পত্নী সংযত শুদ্ধ জীবন যাপন করিল! সে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে! তার গুরুদেব যে নিজে বলিয়াছেন, এ একেবারেই অসম্ভব! তিনি যে তার চোখে জ্যোতিঃ ফেলিয়া স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন তার স্ত্রীর পশ্চাতে আর একজন কার ছায়া! দোষ স্বীকার করিলনা বলিয়াই ত ত্যাগ করিল। স্বীকার করিলেও অবশ্য ত্যাগ করিত হয়ত। এমন পণ্ডিতের স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর গুমোরের সীমা নাই।

একটি বৎসর ধরিয়া অসহ্য দুঃখকষ্ট ভোগের পর একদিন গীতার সাধ হইল, তার বাড়ী সে একবার দেখিয়া আসিবে। সইকে খবর পাঠাইল। সই ত তাই চায়! যে ভোগ করিতে পাইল না তার সামনেই ভোগের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াই ত মূর্খ মেয়েমানুষের পরিতৃপ্তি। এক দুপুর বেলা রিক্শ হইতে গীতা সেই বাড়ীর সামনে নামিল, যার দেয়ালের প্রতিটি দাগের সঙ্গে সে পরিচিত।

প্রবেশ করিবার সময় তার পা বেশ কাঁপিতে লাগিল। অনেককাল সে এখানে কাটাইয়াছে, বলিতে গেলে যেদিন হইতে বাড়ী হইয়াছে। এই দরজার চৌকাঠ মাড়াইয়াই তার মন নিরাপত্তার ভাবে ভরিয়া গেছে, ফিরিয়াই সে গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিতে বলিয়াছে, নয়ত হাসিয়া অন্য কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছে—আসি ভাই!

দরজা পার হইয়াই সুইচ, সেটা হইতে আর একটা সুইচ তারপর আর একটা সুইচ সিঁড়ির পথ আলোয় আলো হইয়া যাইত।

সুইচে হাত দিতে গিয়া পাইল না, এরা কৃপণ, আলো কমাইয়া দিয়াছে। মাগো! সিঁড়ির তলায় কি নোংরা, একতলা দুতলায় ভাড়া দিয়া সইয়েরা তিনতলায় থাকে। দরজায় দরজায় পর্দ্দা। শুধু অপরিচিতের বাড়ী নয়, এ যেন ভূতের বাড়ী।

নিজের ঘরে গিয়া সে অবাক হইয়া গেল। পুঁটলী ট্রাঙ্ক বাল্তি ঘড়ায় যেন গুদাম ঘর। তিনতলার দুইখানি ঘরে সমস্ত সংসারের জিনিষ আনিয়া রাখিলে যা হয়। বিছানা বালিশ কি ময়লা—এর নাম আমেরিকা-ফেরৎ! হাজার হোক্ ইস্কুল মাষ্টার বইত আর কিছু না!

বিন্দু চীৎ হইয়া হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছিল, ছেলেপুলেগুলা দুড় দাড় করিয়া ঘর যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। তাকে দেখিয়া একটা মেয়ে বলিল—ও-মা একটা লোক এসেছে।

মা শুনিতে পাইলনা; তার নাক ডাকিতেই লাগিল। গীতা ঘর হইতে ছাদে, ছাদ হইতে ঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল এ কী কাণ্ড!

যেখানে তার স্বামীস্ত্রীর ছবি ঝুলিত, সেখানে টাঙানো রহিয়াছে এক পুরাতন ঘড়ি, যেখানে তার টয়লেটএর জিনিষ রাখিবার পাথরের টেবল ছিল সেখানে রাখিয়াছে, লেপকাঁথা স্তূপাকার করিয়া। বর্ষার দিনে দক্ষিণের যে জানলাটায় তত বেশী ছাট আসিতনা, সে দাঁড়াইয়া দেখিত দূরের বাড়ীগুলা ভিজিয়া ভিজিয়া ময়লা রংএর হইয়া আসিতেছে, দিলীপ আসিয়া বলিত, শিগ্‌গির্ জানলা বন্ধ করো বিছানা গেল ভিজে—সে ফিরিয়া বলিত, নাগো না কোনো ভয় নেই, এদিক দিয়ে খুব বিষ্টি না হলে জল আসে না, নারকোল গাছটায় আটকায়—সেই বাতায়নতল আজ যেন তাকে ডাক দিল, এসেছ?

পশ্চিমের যে ছাদটায় গাছের টবের বীথি সাজানো ছিল, ঘরের কোলের রানীগঞ্জের টালি দেওয়া বারান্দা হইতে শীতের জ্যোৎস্না সেইখানে পড়িতে দেখিয়া র‍্যাপারটা ভালো করিয়া গায়ে টানিয়া সে দিলীপকে ডাকিয়াছে—চলোনা একটু বেড়াই, সে বলিয়াছে, তারপর খেকর্ খেকর্ কাসো- -কবিত্ব বেরিয়ে যাবে—সেই ছাদটাও দুপুরের রোদে তাহাকে কহিল—এসেছ?

আজ ফুলের গাছ নাই, আছে বাঁশের রাশি, আছে ভাঙা খাঁচা, ফুটো মগ। একটা ডাম্বেল গড়াইতেছে, একটা নির্জ্জীব তুলসীমঞ্জরী মরিচাধরা ঘিয়ের টিনে কাঠ হইয়া আছে।

মোজেকএর মেঝেয় ছেলেরা পেরেক ঠুকিতেছে—দরজার ফাঁকে আখরোট রাখিয়া ভাঙিতেছে। সে পারিলনা, কোনদিন সহ্য করিতে পারে নাই—বলিল মেঝেটা ভাঙছ কেন? ভারী দুষ্টু ছেলে ত?

ছেলেটা জবাব দিল—আমাদের বাড়ী আমি ভাঙব, বেশ করব।

গীতার চোখের কোণটা চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল, সত্যই ত, বাড়ী আর তার নয়। বাড়ী তার হইলে কি ঘরের কোনের দেয়াল পানের পিচে এমন করিয়া রাঙা হইতে পারিত, তার কচি-কলাপাতা-রংএর ঘরে এলো রং উচিত, তাও বালি খসিয়া আঙুলের চুণে ঘসার দাগে এমন বীভৎস হইতে পারিত?

এ সেই ঘর নয়—নিমন্ত্রণ বাড়ী হইতে অনেক রাত্রে ফিরিয়া যেখানে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিতে করিতে সে বলিত, বাঁচা গেল, নিজের বাড়ীতে এসে। বলছিল থাকতে! নিজের ঘরে নিজের বিছানায় ঐ জানলাটির সামনে না হলে কখনো ঘুম হয়! বলে বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পারিনা, পালিয়ে পালিয়ে আসি! নিজের ঘরের মতন ঘর আছে! তা হোকনা যেমন তেমন।

কিন্তু আজ ত এক বৎসর সে অন্য বাড়ীতে গিয়াছে। সেখান থেকেও অন্যবাড়ী। না ঘুমাইয়া সে কি আছে?

কাপড় ছাড়িবার ঘরে ত পা ফেলিবার জায়গা নাই, কলতলার দিকে যায় কার সাধ্য! এই কলতলা প্রয়োজন হইলে সে নিজের হাতে পরিষ্কার করিয়াছে, ফিনাইল ঢালিয়া দিয়াছে, আজ তার কিছু করিবার নাই।

তিনতলার ঐ কলটা, সে বোধ হয় লক্ষকোটিবার খুলিয়াছে বন্ধ করিয়াছে, মিস্ত্রী ডাকিয়া ওয়াশার বদলাইয়াছে, সেই মায়া-ভরা দিনের কথা তার মনে পড়িল। একটা সামান্য কলকে সে এত ভালোবাসিয়াছে? সেই কি জানিত···?

খেলা করিতে করিতে বিন্দুর গায়ের উপর একটা ছেলে পড়িয়া গিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিয়াছে। সে তাহাকে জোরে এক চড় মারিয়া উঠিয়া বসিল। ছেলেমেয়েরা বলিল—মা একটা বৌ এসেছে।

বিন্দু গিয়া দেখিল গীতা ওদিকে ঘুরিতেছে। বলিল, এসো এসো সই এসো, ভুলেই গেছলুম আজ তুমি আসবে! কতক্ষণ এসেছ? ডাকতে হয় আমাকে!

গীতা বলিল দুপুরবেলার ঘুমটা তোমার নষ্ট করব! তাই ভেবে ডাকিনি।

—হুঁঃ আমার আবার ঘুম! সংসারের ত কুটিটি নাড়তে হয় না, সব ঝি চাকরে করে। বামুন রাঁধে; আমি একটা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম, নইলে বড় একটা ঘুমোই না। তোমার বাড়ীটা কেমন রেখেছি বলো?

গীতা একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে বলিবে কি?

বিন্দু বলিল, সব ঘর রং ক'রে নিয়েছি। মেরামত খরচই দুহাজার টাকা প'ড়ে গেল। সকলেই বল্‌ছে বাড়ীটা কিছু বেশী দামে কেনা হয়েছে। ঐ দামে আরো বড় বাড়ী পাবার কথা!

গীতার কিছু বলিবার ছিল না। সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে জানিত জমি কিনিয়া বাড়ীটা করিতে যে খরচ পড়িয়াছে তার আধা দামে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।

বিন্দু বলিল—আমি ভাবছি এটা বিক্রী ক'রে বালীগঞ্জে বাড়ী করাব। তোমারা কিন্‌বে ভাই? এখন শোল হাজার পেলেই ছেড়ে দিই।

ওরা কিনিয়াছিল দশ হাজারে—গীতার মনে আছে। তবু যদি গীতার আজ টাকা থাকিত সে বেশী দাম দিয়াই কিনিয়া লইত। কিন্তু সে শুধু স্বপ্ন! ষোলটা আনা পাইলে সে বর্তিয়া যায়, দিলীপ এখন যা সামান্য উপায় ক'রে তার একটি পয়সা স্ত্রীর কাছে রাখেনা। অথচ একদিন এই চারখানা কাগজ রাখোত—বলিয়া চার হাজার টাকার নোট তার কোলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে! তার হিসাবটাও টুকিয়া রাখে নাই। দিনের মধ্যে দশবার চাবি দিয়া আলমারী খুলিয়া গীতা গোছা গোছা নোট ও টাকা বাহির করিয়াছে, তুলিয়াছে। ষোল হাজার টাকা সেদিন গীতা একটা গোলাপী চেকে নিজেই সই করিয়া তুলিতে পারিত।

ঐশ্বর্য্যের গল্প চলিতে লাগিল। একজন বকিয়া যায়, একজন শোনে। কিন্তু এই বাড়ী হইতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে যে কোনদিন চলিয়া যাইতে হইবে, তাই কি গীতা কখনো ভাবিতে পারিয়াছে? তার নিজের ঘরে আজ তার ধূপ জ্বালাইবার অধিকার নাই, বিজলী বাতির সুইচ টিপিয়া 'সন্ধ্যা' দিবার প্রয়োজন নাই। ঠাকুর ঘরে শাঁখ আজ গীতা বাজাইবে না, বাজাইবে বিন্দু, যে গৃহকর্ত্রী।

গীতা উঠিল, বলিল, আজ চলি।

বিন্দু বলিল, একখানা ট্যাক্সি ডেকে দিক্।

গীতা বলিল, না একটা রিকৃশা হলেই হবে।

বিন্দু চোখ কপালে তুলিয়া কহিল মাগো, রিক্সায় চড়ো কি করে? আমার ত মাথা ঘোরে! আমি সাত জন্মে পারি না।

গীতাই কি পারিত? আজ অভাবেই না···

সে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে সোপানগুলা যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—লক্ষ্মী তুমি যেওনা! তবু যাইতে হয়।

বিন্দু বলিল, যাবে কার সঙ্গে?

চাকর আছে—বলিয়া গীতা ঘাড় নাড়ে।

রিকৃশ আসে। গীতা ওঠে। পর্দ্দার ফাঁক দিয়া বিন্দুর দিকে চায়। ধনুকের মত বাঁকা ঠোঁটে ভদ্রতার হাসি খেলিয়া যায়, রিকশ মোড় বেঁকিতেই অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। বিধাতা পুরুষের করুণরস সৃষ্টি সার্থক হয়।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
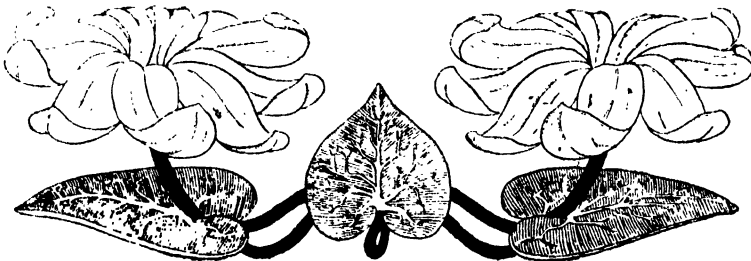
দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

জাতিভেদ,—অসবর্ণ বিবাহ ও একত্র ভোজন

হিন্দুসমাজের জাতিভেদের অনিষ্টকারিতার বিরুদ্ধে যদি দেশের নেতৃস্থানীয় কোন বড়লোক কিছু নাও বলিতেন, তবুও, ইহা যে, বহুমানুষের মর্য্যাদা ও অধিকার অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট ও মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিয়াছে, তাহাদের কল্যাণ ও বিকাশের পথকে রুদ্ধ করিয়াছে, ইহা যে সংখ্যাতীত বিভাগ ও বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়া সমাজকে বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সমানই সত্য থাকিত। ইহা সম্পূর্ণভাবে দূর না হইলে যে সংখ্যাতীত মানুষ মর্য্যাদা ও মনুষ্যত্ব লাভের অধিকারী হইবেন না, তাঁহাদের শিক্ষা ও অন্যবিধ উন্নতির পথ বাধামুক্ত হইবে না, সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না, এবং আমাদের রাষ্ট্রিক প্রগতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা প্রয়োজন, কোন বিশেষ মতবাদের উপর সেই দল গঠন যে সম্ভব হইবে না, তাহা সুনিশ্চিত।

কিন্তু, বহুদিনের অভ্যাস ও জড়ত্বের ফলে, যুক্তি অনুসরণ করিয়া কাজ করিবার এবং নূতন সত্যকে গ্রহণ করিবার মত শক্তি ও আত্মবিশ্বাস আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

বহুদিন ধরিয়া শাস্ত্র মানিতে অভ্যস্ত আমাদের মন, নূতন পথে যাত্রা করিবার সময়ও, অন্ততঃ কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের নির্দ্দেশ বা বাণী পাথেয়স্বরূপ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। প্রাচীন যুগের কথা বাদ দিয়া আধুনিক কালেও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সমসাময়িক মনীষী পর্য্যন্ত এই অন্যায় ও অপমানকর ব্যবস্থাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু, বাংলার বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা ও অধোগতির যুগে শুধুমাত্র নিজ প্রদেশের মনীষিদের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া কাজ করিবার মত অথবা উচিত বুঝিলেও, নিজেদের উদ্ভাবিত কোন কর্ম্মপন্থার অনুসরণ করিবার মত আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া এবং বর্ত্তমান অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনের প্রেরণা মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে আসিয়াছে বলিয়া, তাঁহার মতামতকে এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া অধিকাংশ লোকে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মহাত্মা গান্ধীর এ বিষয়ক সুস্পষ্ট মতামতের সহিত বেশী লোকের পরিচয় না থাকায় এবং কোন একস্থানে তাহা পাওয়া কষ্টকর বলিয়া অনেক লোকে নিজেদের মতকে মহাত্মার মত বলিয়া অজ্ঞলোকদের ঠকাইবার ও তাহাদের প্রভাবিত করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

হরিজন আন্দোলনের সীমা সংকীর্ণ হইলেও এবং মহাত্মা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইলেও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আহার ও বিবাহের বাধায় যে তিনি বিশ্বাসী নহেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার নিজের কার্য্য হইতে পাওয়া যাইবে। তবুও অসবর্ণ বিবাহের কথা দূরে থাকুক, বিভিন্ন শ্রেণীর একত্র পংক্তি ভোজনেরও যে তিনি বিরোধী একথা নির্ব্বিচারে ও অবাধে প্রচারিত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে বর্ণবৈষম্য দূরীকরণের কার্য্য জটিলতর ও বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত হইয়া থাকে।

কোন পত্রলেখকের প্রশ্নের উত্তরে, ১৬ই নভেম্বরের 'হরিজনে' মহাত্মাজী এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"আমি বেদোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আস্থাবান। স্মৃতি এবং অন্যত্র বিরোধী উক্তি থাকা সত্ত্বেও ইহা আমার মতে সম্পূর্ণ সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।"

"যাহা স্পষ্টতঃ বিশ্বজনীন সত্য ও নীতির বিরোধী শাস্ত্রের এমন কোন নির্দ্দেশই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।"

"যুক্তির দ্বারা যাহার সত্য পরীক্ষা হইতে পারে শাস্ত্রের এমন কোন জিনিষ যুক্তিবিরোধী হইলে, তাহাও টিকিয়া থাকিতে পারে না।"

"শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বর্ত্তমানে কোথায়ও প্রতিপালিত হয় না।"

"বর্ত্তমানের জাতিভেদ প্রথা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। জনমত যতশীঘ্র ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে ততই মঙ্গল।"

"বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অসবর্ণ বিবাহের বা সর্ব্বশ্রেণীর পংক্তি ভোজনের কোন বাধা ছিল না এবং থাকা উচিতও নহে। কিন্তু লাভের উদ্দেশ্যে পৈত্রিক ব্যবসায়ের পরিবর্ত্তন নিষিদ্ধ আছে। বর্ত্তমান প্রথা বৃত্তি-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার মানিয়া লইয়াছে অথচ অসবর্ণ বিবাহ ও একত্র ভোজন সম্বন্ধে নানা নিষ্ঠুর বিধি-নিষেধের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া ইহার অন্যায় দ্বিগুণিত হইয়াছে।"

"কোথায় বিবাহ বা আহার করিতে হইবে তাহা নির্ব্বাচনের অবাধ অধিকার সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির (পুরুষ ও নারী) উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

"জন্মগত অস্পৃশ্যতা বলিয়া যে শাস্ত্রে কিছু নাই, একথা আমি পুনঃপুনঃ বলিয়াছি। বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে আমি পাপ এবং হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা বড় গ্লানি বলিয়া মনে করি। আমি পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর গভীরভাবে অনুভব করি, যদি অস্পৃশ্যতা বাঁচিয়া থাকে তবে, হিন্দুধর্ম্মের মৃত্যু অনিবার্য্য।"

মহাত্মার এই স্পষ্ট উক্তি বিশেষভাবে সময়োচিত হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা তাঁহার মত সম্বন্ধে নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণার অবসান হইবে, আশা করা যাইতেছে।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, আমাদের সাধারণ ধারণা অপেক্ষা অস্পৃশ্যতা অনেক অধিক ব্যাপক; যেখানে কোন না কোন আকারে ভেদ ও বৈষম্য আছে, সেখানেই অস্পৃশ্যতা রহিয়াছে; ইহা সম্পূর্ণভাবে দূর করিতে না পারিলে, শুধুমাত্র হিন্দুর নহে, সমগ্র জাতিরই কল্যাণ নাই।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর এই কথাটিও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরা তাহাদের উচ্চ মঞ্চ হইতে অবতরণ না করিলে তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ

শিক্ষা, নানাবিধ কার্য্য এবং আদর্শের জন্য এ পর্য্যন্ত বহু লোককে সমাজ-বিধানের বিরুদ্ধতা করিতে হইয়াছে। সকল দিক দিয়া ইঁহারাই দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক। অথচ সমাজ ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা করে নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, দেশের শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান লোকেরাই যখন সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন নাই তখন, বর্ত্তমান অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের আন্দোলন, যাহা প্রধানতঃ প্রতিপত্তি ও অর্থহীন কর্ম্মীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা কতটুকু। বরং যে প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অনেকটা অজ্ঞাতসারেই লোককে সংস্কারের পথে লইয়া যাইতেছিল, এই প্রকার আকস্মিক আঘাতের ফলে, তাহার গতি রুদ্ধ হইতে পারে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট ও তৎপর হইয়া উঠিয়া দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করিতে পারে।

কিন্তু, সমস্যাটিকে দেখিবার এই দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্তিযুক্ত। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্থান দান করিতে অস্বীকার করিতে পারিয়াছে; কিন্তু, ইহাতে প্রকৃত পক্ষে শক্তির পরীক্ষা হয় নাই। সমাজ যখন ইঁহাদের গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে তখন ইঁহারাও সমাজকে অস্বীকার করিয়া তাহার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইঁহাদের শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, এবং ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্য, সমাজের সাধারণ লোকের কথা ভাবিবার ও তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিবার ইঁহাদের প্রয়োজন হয় নাই। কাজেই, সমাজও ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিপদগ্রস্ত হয় নাই এবং ইঁহারাও কোন প্রকার অসুবিধায় পতিত হন নাই। ইঁহারা যদি নিজেদের আদর্শ সমাজে চালাইতে চেষ্টা করিতেন, অথবা যদি ইঁহারা সাধারণ লোক হইতেন এবং সমাজের তাঁহাদিগকে লইয়া নিত্য বিব্রত হইতে হইত, তাহা হইলে বলা যাইত যে, তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

বর্ত্তমানে যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক সাধারণ কর্ম্মী আছেন এবং অনেকে পল্লীকেই কেন্দ্র করিয়া কাজ করিতেছেন। কাজেই এই আন্দোলন (যদি সঠিকভাবে ইহা পরিচালিত হইতে পারে) ফলপ্রসূ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। উত্তেজনার সময় ব্যতীত শান্তির সময়ও যদি কর্ম্মীদল কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া ধারাবাহিক চেষ্টা করেন তবে, সমাজ তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিলেও, তাঁহাদের লইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িবে। কারণ, তাঁহারা আরও দশ জনের ন্যায় সমাজেই বাস করিবেন, সকলকেই নানা কাজের মধ্যে তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে হইবে, তাঁহারা সকলের মধ্যে নিজেদের ভাব ও আদর্শের কথা প্রচার করিতে পারিবেন; ইহাতে যে সংঘর্ষ বাধিবে তাহাতে যাঁহারা প্রগতির পক্ষপাতী অথচ, বর্ত্তমানে নিষ্ক্রিয় হইয়া আছেন, যাঁহারা (বিশেষভাবে যুবকেরা) ইহাকে আসন্ন সমস্যা বলিয়া মনে করেন নাই এবং এজন্য বিশেষভাবে এসকল কথা চিন্তা করেন নাই বা নিজেদের আপাত কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করেন নাই, তাঁহারা অনেকেই এই দলভুক্ত হইবেন। আন্দোলনকে অধিক দিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে, পরিবর্ত্তনবিরোধী দলের মধ্যে (প্রাণশক্তির অভাব ঘটায়) নানা দুর্ব্বলতা দেখা দিবে এবং পরিবর্ত্তনপন্থীরা তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষোচিত অধিকার লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, এবং ইহা তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যের বৈষম্যকে দূর করিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ইহাদের একত্রিত শক্তি সংস্কারকদের কাজে লাগিবে।

সমাজবিধান ভঙ্গ করবার জন্য সমাজ যাঁহাদিগকে সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাঁহাদের চিন্তা ও কার্য্যের ফলকে ততটা সহজে দূরে রাখিতে পারে নাই। সমাজের সর্ব্ব স্তরে তাহাই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছে এবং তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়াছে। কাজেই, এদিক দিয়া বিচার করিলে, তাঁহাদের চেষ্টা বা কার্য্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না।

সমাজ লোকচক্ষুর অন্তরালে যেরূপ ধীরে ধীরে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে তাহার ধীর অথচ অবিচ্ছিন্ন অগ্রগমনে বিশ্বাসী না হইয়া, তাহাকে ঠেলিয়া দিতে গেলে, তাহার ফল শুভ হইবে কিনা তাহা বিশেষভাবে বিচার্য্য।

কোন নূতন চিন্তা, ভাব বা আদর্শ কতকটা দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহার এই মৃদু আত্মগতির উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। কিন্তু, কোন নূতন আদর্শ যখন ব্যাপ্তি লাভ করিয়া, সমাজের সর্ব্বস্তরেই সংস্কারের আগ্রহ জাগাইয়া তুলে, প্রাচীন বিধিনিষেধের বন্ধনকে যখন ইহা সর্ব্বত্রই শিথিল করিয়া দেয় এবং সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও আগ্রহ যখন তাহার স্বাভাবিক অগ্রগতি অপেক্ষা প্রবলতর হয়, তখনই সুপরিচালিত চেষ্টা, প্রণালীবদ্ধ কার্য্য এবং পরিমিত আঘাতের দ্বারা সফলতা লাভ করিবার সময় আসে।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্পর্কেও আমাদের এই সময় আসিয়াছে। অস্পৃশ্যতার অন্যায় এবং অনিষ্ট কারিতার কথা বুদ্ধি দিয়া আমরা অনেক পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি; পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের ইচ্ছা সমাজের সর্ব্বস্তরের অগ্রবর্ত্তীদলের ভিতর দেখা দিয়াছে; যাঁহারা এই ব্যবস্থার ফলে অন্যায় উৎপীড়ন সহ্য করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষ ও অধিকার লাভের আগ্রহ জাগিয়াছে। সর্ব্বোপরি আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক দিয়া এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এত তীব্র হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা নানা অকল্যাণের সৃষ্টি করিবে মাত্র।

আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে অন্নাহারের প্রচলনকে ইহার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে গ্রহণ করিলে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অনেক অসুবিধা দূর হইবে। অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রদের সাধারণ ছাত্রাবাসে থাকিবার, সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের পরিবারে স্থান পাইবার সুবিধা হইবে এবং ইঁহাদের সাধারণ লোকদেরও এই প্রকারের সুবিধা হইবে।

বাঙ্গালীর নূতন ব্যবসা

জীবনযাত্রার মানের উচ্চতা জাতির ঐশ্বর্য্য এবং সম্ভবতঃ সভ্যতারও মাপকাঠি। আমরা প্রাচ্যসুলভ মনোভাব বশতঃ সর্ব্বপ্রকার বিলাসকে হেয় এবং দূষনীয় মনে করিয়া থাকি।

কিন্তু, আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহারও বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। ধন বণ্টনে এবং ধনোৎপাদনে ইহা বিশেষভাবে সহায়তা করে এবং অনেক লোকের পক্ষে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করে।

কিন্তু, বিলাস ও সৌখীনতার অধিকাংশ দ্রব্যই বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে আসিতেছে বলিয়া, বর্ত্তমানে বিলাসের চর্চ্চা আমাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হইয়াছে। আমাদের স্বাদেশিকতার প্রথম ঝোঁকে স্বভাবতঃই আমাদের দৃষ্টি প্রধান শ্রমশিল্পগুলির উপরই পতিত হইয়াছে এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজনানুরূপ না হইলেও আমরা অল্প কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি। কিন্তু, ছোট খাট জিনিসের দিকে আজও আমরা মনোযোগ দিতে পারি নাই। ফলে, এসব দিক দিয়া বিদেশকে আমাদের আজও অনেক টাকা দিতে হইতেছে। কারণ দেশপ্রেম বা অন্য যে-কোন কারণেই হউক লোকে অধিক দিন নিজের অসুবিধা করিয়া কোন নীতির অনুসরণ করিতে পারে না,—এবং তাহার প্রকৃতির জন্যই হউক বা প্রকৃতিগত কোন বিশেষ দুর্ব্বলতার জন্যই হউক, সম্পূর্ণভাবে সে বিলাসকেও বর্জ্জন করিতে পারে না। নিতান্ত ছোট খাট তুচ্ছ জিনিসের জন্য প্রতি বৎসর বিদেশকে আমাদের কত টাকা দিতে হয় তাহা অনেকটা আমাদের কল্পনাতীত। শুধুমাত্র পুতুল প্রভৃতি খেলনার জন্য ১৯২৯—৩৪ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষ বিদেশকে ১,৩৩,৬০,২২০৲ টাকা দিয়াছে; তাহার মধ্যে বাংলা দেশ দিয়াছে ৫৫,৮৫,৫৫৬৲ টাকা।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, বরিশালের একজন প্রধান কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার রায় চৌধুরী পুতুল প্রস্তুতের জন্য বালিগঞ্জে একটি কারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই প্রকারের প্রচেষ্টা এই প্রথম। একজন বাঙ্গালী যে, নিজ মূলধনে এবং নিজ তত্ত্বাবধানে কার্য্য চালাইবার সাহস লইয়া এরূপ ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছেন ইহা বিশেষ আশার কথা। ইহাদের প্রস্তুত জিনিসও বিদেশী জিনিসের তুলনায় অনেক সস্তা।

কংগ্রেস-সভাপতিত্ব ও বাংলা প্রদেশ

কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে দেশবন্ধু দাশের সভাপতিত্বের (১৯২২) পর এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী এই গৌরবের অধিকারী হইতে পারেন নাই।

এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিবার মত লোকের যে বাংলায় অভাব ঘটিয়াছে অথবা স্বাধীনতা সংগ্রামে নানা অন্তর্বিরোধ সত্ত্বেও বাংলার দান অন্য কোন প্রদেশ অপেক্ষা কোন দিক দিয়াও যে কম হইয়াছে, তাহা নহে। একবার দেশপ্রাণ সেনগুপ্তের অতিশয় সঙ্গত দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রায় সকল প্রদেশেই বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ জাগিয়াছে এবং যাহার ফলে বাঙ্গালীরা তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে অন্যায়ভাবে অন্য ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হইতেছেন, এক্ষেত্রেও তাহাই সম্ভবতঃ তাঁহাদের গৌরব লাভের সর্ব্বপ্রধান বাধা হইয়াছে।

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নাম লইয়া দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব কতকটা অশোভন ধরণে চলিতেছে।

সমগ্র বাংলাদেশ একযোগে সুভাষচন্দ্রকেই সভাপতিরূপে চাহিতেছেন। জাতীয় মহাসমিতির গ্রেটব্রিটেন শাখাও এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও সুভাষবাবুর সমর্থক বহুলোক আছেন।

সুভাষচন্দ্র অপেক্ষা জহরলালের এই সম্মানলাভের দাবী বা যোগ্যতা কিছুমাত্র কম নাই, একথা ধরিয়া লইয়াও বলা যায় যে, তিনি পূর্ব্বে একবার এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন এবং বাংলাদেশ তাহার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য হইতে অনেক দিন বঞ্চিত আছে।

তবুও কংগ্রেসের চিরাচরিত রীতি উপেক্ষা করিয়াও সুভাষচন্দ্র তথা বাংলাকে পিছনে ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য কিভাবে জওহরলালের নাম ইহার মধ্যে জড়াইয়া ফেলা হইতেছে, তাহা বাংলা কংগ্রেসের অন্যতম মুখপত্র ফরওয়ার্ডের নিম্নোদ্ধৃত সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে।

"শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলৎরামের (ইনি কংগ্রেসের একজন সম্পাদক; ওয়ার্কিং কমিটির মাদ্রাজ অধিবেশনের পর ইনি এই মর্ম্মে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন যে, কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটি ও এ-আই-সি-সি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতিত্ব

করিবার জন্য জওহরলালকেই আহ্বান করা উচিত) বিবৃতি হইতে এই কথাটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির স্বেচ্ছাচারী কর্ত্তাগণ, বাংলার সর্ব্বসম্মত জনমতকে পদদলিত করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন। পরলোকগত জে-এম-সেনগুপ্তকে পশ্চাতে রাখিবার জন্যই যে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতিত্বে পণ্ডিত জওহরলালকে আহ্বান করা হইয়াছিল, এ তথ্যটি কংগ্রেস মহলে সুবিদিত। এইরূপ মনে হইতেছে যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেসে তাঁহার যথাযোগ্য স্থান হইতে দূরে রাখিবার জন্য পুনরায় সেই একই কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে।"

"···যখন দুইমাস পূর্ব্বে এই কাগজে প্রথম শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নাম প্রস্তাবিত হয়, তখন ওয়ার্দ্ধা হইতে এই মর্ম্মে তার যোগে জানান হয় যে, এই প্রস্তাবে মহাত্মা গান্ধীর আপত্তি নাই, তবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে আগামী কংগ্রেসের সভাপতি দেখিলে তিনি অধিকতর আনন্দিত হইবেন। আমাদের পূর্ব্বেও এই সন্দেহ ছিল এবং এখনও মনে এই চিন্তা উদিত হইতেছে যে, শ্রীযুক্ত দৌলৎরামের এই বিবৃতির পশ্চাতে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রেরণা রহিয়াছে। সাধারণভাবে বাংলা সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সম্বন্ধে এই সর্ব্বমান্য ব্যক্তির (সরদারের) মনোভাব আমাদের নিকট সুপরিজ্ঞাত। সর্দ্দার প্যাটেলকে বাংলার চিরশত্রু বলিয়া ধরা যাইতে পারে ; এ বিষয়ে তিনি তাঁহার পরলোকগত প্রাতঃস্মরণীয় ভ্রাতা ভিঠলভাই প্যাটেলের সম্পূর্ণ বিপরীত।"

"আমরা জানিয়া বিস্মিত হইলাম যে, মাদ্রাজের ওয়াকিং কমিটিতে তিনি নিতান্ত অপ্রত্যাশিত এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সময় হইতে বাংলাদেশ কংগ্রেসকে চোখ রাঙাইয়া দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।" এই উক্তিতে আমরাও কম বিস্মিত হই নাই।

সিণ্ডিকেট কমিটির রিপোর্ট গ্রহণে মুসলমান সদস্যদের বিরোধিতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায়, সরকারের শিক্ষা সঙ্কল্প সম্বন্ধে সিণ্ডিকেট কমিটির রিপোর্ট গ্রহণকালে, মুসলমান সদস্যগণ শ্রীযুক্ত ফজলুল হকের নেতৃত্বে, রিপোর্টের যে অংশে, প্রাথমিক কোন বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যাধিক্য থাকিলে, তাহাকে মক্তাব নামে অভিহিত করিবার প্রস্তাবের তীব্র আপত্তি করা হইয়াছে, সেই অংশ বর্জ্জনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন।

এ সম্পর্কে সরকারি সঙ্কল্পে বলা হইয়াছে যে, যে-সকল স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র মুসলমান, তাহার নাম মক্তাব দেওয়া যাইবে ; ইসলামীয় বিদ্যালয়ের সহিত এই নাম বহুদিন হইতে যুক্ত হইয়া আসিতেছে। আরও বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মোপদেশ ও ইসলামীয় বিষয়ে শিক্ষাদান ব্যতীত, সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত ইহার পাঠ্যতালিকার আর কোন প্রভেদ নাই।

এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রের সাংখ্যাধিক্য থাকিলে, তাহাকে মক্তাব নামে অভিহিত করিবার প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয় তীব্র আপত্তি করিতেছেন। 'মক্তাব' এবং 'পাঠশালা' এই উভয় নামই উঠাইয়া দেওয়া বিধেয়। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ই বাংলার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য রহিয়াছে, কাজেই, সে সকলকেই শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় বলিয়া অভিহিত করা উচিত। মক্তাবগুলির হয় কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, অথবা নাই। যদি থাকে তবে, অমুসলমানেরা ইহাদের প্রভাবাধীনে নিজেদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা চাহিতে পারেন না ; আর যদি ইহাদের এই প্রকারের কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে তবে, ইহাদিগকে মক্তাব বলিবার আদৌ কোন সঙ্গত কারণ নাই।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আপত্তি খুবই যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলির যদি কোন বিশেষ রূপ না থাকে, তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটা সাম্প্রদায়িক নাম দিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করিবার কোন হেতু নাই। আর প্রকৃত পক্ষে যদি ইহাদের বৈশিষ্ট্য থাকে (যাহা থাকিবে বলিয়া আভাষ পাওয়া যাইতেছে) তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এই সাম্প্রদায়িক প্রভাবের মধ্যে যাইতে চাহিবেন কেন ? আমরা হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলকেই সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জনের কথা বলিয়া থাকি এবং আমাদের অনেক সমস্যা সমাধানের পক্ষে ইহাই একমাত্র উপায় এ কথা

দৃঢ়ভাবে মনে করিয়া থাকি। কিন্তু এরূপ অন্যায় কথা কাহাকেও বলা সম্ভব নয় যে, বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক গর্ব্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকলে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করিয়া, সেই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন কর।

সম্ভবতঃ একটা আপোষমীমাংসার আশায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠশালা নামও উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; যদিও পাঠশালা নামটি সাম্প্রদায়িক নহে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় বুঝাইবার জন্য ইহা বাংলাভাষার একটি অর্থবোধক শব্দ।

শ্রীযুক্ত ফজলুল হক বলিয়াছেন যে, যে-শিক্ষা মুসলমানদের পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে সে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা, ছেলেমেয়েদের মূর্খ করিয়া রাখাই মুসলমান পিতামাতারা অধিকতর শ্রেয় মনে করিবেন। শ্রীযুক্ত হকের মতে মুসলমান ছেলেদের জন্য শিক্ষার অন্ততঃ প্রাথমিক ধাপে মক্তাব অপরিহার্য্য।

শ্রীযুক্ত হক ও শ্রীযুক্ত সারওয়ার্দ্দী প্রভৃতির ন্যায় লোকের নিকট হইতে আমরা নিরপেক্ষ মত ও মনোভাব আশা করিতে পারি। তাঁহারা যে-কারণে মুসলমান ছেলেদের পক্ষে মক্তাব অপরিহার্য্য মনে করিয়াছেন সেই একই কারণে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছেলেদের পক্ষে মক্তাবের শিক্ষা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। মক্তাব অপরিহার্য্য মনে করিলে (আমরা অবশ্য তাহা করি না) তাঁহারা শুধুমাত্র নিজসম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য মক্তাব চাহিতে পারেন। কিন্তু যে-সকল সাধারণ স্কুল উভয় সম্প্রদায়ের জন্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে যদি মুসলমান ছেলেদের সংখ্যা বেশী হইয়া যায় এবং সেই জন্য তাহা সাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণ করে তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছেলেদের উপর নিরতিশয় অবিচার করা হইবে।

সরকারের শিক্ষাসংকল্পের এই অংশ কার্য্যে পরিণত হইলে, বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় মক্তাবে পরিণত হইবে এবং যে-সকল স্থানে মুসলমান ছেলেরা সংখ্যাল্প হইবেন সেখানেও তাঁহারা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র মক্তাবের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ইহার ফলে, অধিকাংশ মুসলমান ছেলেই মক্তাবে পড়িবেন। অসাম্প্রদায়িক সাধারণ বিদ্যালয়ে ইহাঁরা খুব কমই পড়িবেন (অন্ততঃ শ্রীযুক্ত হকের কথায় এইরূপ প্রকাশ) অথচ, বহুসংখ্যক হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছেলেকে বাধ্য হইয়া মক্তাবে পড়িতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ধরণের কোন প্রকার শিক্ষা মুসলমান ছেলেদের পক্ষেও সমগ্র জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইবে কিনা তাহাও মুসলমান চিন্তানেতাদের ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী

মৈমনসিং মিউনিসিপ্যালিটি, জনসাধারণ ও আনজুমান-ই-ইস্লামিয়া প্রভৃতির অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত ফজলুল হক মৈমনসিংএ যাহা বলিয়াছেন তাহা, সকল সময়ে ও সকল ব্যাপারে তাঁহার নিজের এবং হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই স্মরণ ও প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলিয়াছেন যে,—বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য সর্ব্বপ্রযত্নে দূর করা বিধেয়। কোন সম্প্রদায়েরই বিশেষ সুবিধা দাবী করা উচিত নহে; যাঁহারা এই প্রকার বিশেষ সুবিধার দাবী করেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষেই ক্ষতিকর। কেহ যেন নিজেদের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বা বৌদ্ধ বলিয়া না ভাবেন; সকলেই বাংলার কথা ভাবুন এবং নিজেদের বাঙ্গালী বলিয়া মনে করুন। এইরূপ হইলে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য এক দিনেই দূর হইবে এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যে-সকল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আপনা হইতেই অদৃশ্য হইবে। হিন্দু অথবা মুসলমান কাহারই ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কোন বিশেষ রাজনীতিক সমস্যা নাই। সকল সমস্যা বাংলার সমস্যা; ইহা হিন্দুরও সমস্যা নহে, মুসলমানেরও নহে।

বৈদিশিক প্রচার ও কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট

ডাঃ মালেক আনকেল সারিয়া, বিদেশে ভারত সম্বন্ধে প্রচার কার্য্যের একটি পরিকল্পনা দিয়া কংগ্রেসের সভাপতির নিকট একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি তাহার উত্তরে অর্থ ও উপযুক্ত লোকের অভাবের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু সুভাষবাবু এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয়; এজন্য তাঁহার অর্থের

আবশ্যক হইবে না একথাও বলিয়াছিলেন। তবে কি সুভাষবাবুর উপযুক্ততা সম্বন্ধেই কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্টের সন্দেহ আছে। অন্ততঃ তাঁহার এই কথা হইতে আর কিছু মনে করিবার উপায় নাই। সুভাষবাবুর উপর বর্ত্তমান কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষদের যেরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে এমনও মনে করা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানে বৈদেশিক প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে, সুভাষবাবুকে এড়ান যাইবে না মনে করিয়াই কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাপারটি সম্বন্ধে এত ইতস্ততঃ করিতেছেন।

ভাই পরমানন্দের একটি উক্তি

হিন্দুসভার অন্যতম সভাপতি ভাই পরমানন্দ তাঁহার এক অভিভাষণে বলিয়াছেন: "হিন্দুদের আভ্যন্তরীণ কয়েকটি দুর্ব্বলতা হিন্দুসমাজ ও সভ্যতাকে শক্তিহীন করিয়া ফেলিতেছে। আমাদের পরস্পরের সহিত সংযোগহীন সংখ্যাতীত বিভাগ ও উপবিভাগ সংঘবদ্ধ জাতি হিসাবে দাঁড়াইবার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে।...হিন্দুরা যদি বালুকণার মত ঐক্যহীন থাকেন তবে, তাঁহারা নিজেরাও কিছু লাভ করিতে পারিবে না এবং অপর কেহও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবে না।...অস্পৃশ্যতার উদ্ভব আধুনিক অথবা প্রাচীন তাহা লইয়া আমি তর্ক করিতে চাহিনা। আমি ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ অন্যদিক দিয়া দেখিয়া থাকি। সমাজে কোন নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করা বা কোন প্রথাকে বাঁচাইয়া রাখা বা পুরাপুরি বর্জ্জন করা সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের উপর নির্ভর করে। যে সমাজ নিজেদের রীতিনীতি এবং অভ্যাসকে সময় ও অবস্থার দাবীর অনুরূপ করিয়া লইতে পারে না, সে সমাজ অধিক দিন বাঁচিতে পারে না। হিন্দু সমাজের রক্ষার পক্ষে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ অত্যাবশ্যক।"

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্বন্ধে সকল দলের হিন্দু নেতাই একমত, যদিও সমাজদেহ হইতে এই পাপব্যাধি দূরীভূত হইবার আশু কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অবশ্য হিন্দুরা ভারতবর্ষে একটি বিশেষ জাতি হইয়া দাঁড়াইতে পারিবেন এই বিশ্বাস ও আদর্শ-ভ্রান্ত। হিন্দুরাও ভারতীয় মহাজাতির অংশ; তাঁহাদের দুর্ব্বলতা ও ভেদ বিভাগ জাতির শক্তি লাভের ও উন্নতির পথের একটা বড় বাধা হইয়া আছে। কাজেই সকল ভারতবাসীর কল্যাণের জন্যই ইহা দূর করিতে হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

নীলিমা দেবীর টি-পার্টি

শ্রীসরোজকুমার মজুমদার

নীলিমা চুল বাঁধিতেছিল।

এখনই পার্টির সবাই আসিয়া পড়িবে। তাহার পূর্ব্বেই নীলিমার প্রসাধন সম্পূর্ণ হওয়া চাই।

চুল বাঁধা শেষ হইলে সিঁথিতে মসৃণ সিন্দুরের রেখা পড়িল। নিকষকালো ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে নীলিমা ছোট একটি লাল টিপ পরিল।

গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে নীলিমা প্রসাধন টেবিলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখে খানিকটা ক্রীম ঘসিয়া দিল। শাড়ীটা আর একটু ভাল করিয়া পরিল। এ-ব্লাউজের রংটা শাড়ীর সহিত ঠিক সামঞ্জস্য রাখে নাই। নীলিমার ব্লাউজ বদ্‌লাইয়া নিতে দেরী হইল না। এবারে ঠিক হইয়াছে। বড়ো আয়নার সুমুখে গিয়া নীলিমা দাঁড়াইল। আয়নার আরো কাছে গিয়া নিজের মুখটা আরো ভাল করিয়া দেখিয়া নিল। না, সে সত্যই অত্যন্ত সুন্দরী! নীলিমা ভাবে—।

সামনের ঐ লন্‌টাতেই আজ তাহাদের টি-পার্টি বসিবে।

নীলিমা চাকরদের তাড়া দিতে লাগিল, ক্রমে লন্-এর বুকের উপর টেবিল-চেয়ারের ভীড় পড়িয়া গেল।

বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দে চাহিয়া নীলিমা দেখে অমিতা আসিয়াছে। ছুটিয়া বাহিরে গেল নীলিমা। অমিতার দুই হাত ধরিয়া সহাস্যে বলিল—আমি জানতুম অমিতা, তুমিই সবার চাইতে আগে এসে পৌছুবে।

স্মিতহাস্যে অমিতা বলে,—কেন? আমার 'পরে আপনার এত বিশ্বাস!

নীলিমা বলে,—নয়? এতদিনেও যদি তোমায় না চিনে থাকি অমিতা, তবে আর আমায় মানুষ ব'লো না।

দুই জনে আসিয়া ড্রইংরুমে ঢুকিল।

নীলিমাই আবার বলিল,—এই দেখোনা, পাঁচটায় পার্টি। সবাইকেই জানিয়েছি। সময় মতো তো এক তুমিই এলে। আর যাঁরা আসবেন, নিছক ভদ্রতার জন্যই আসবেন তাঁরা। সময় কাটানো বা গল্পো করাই হবে তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। আন্তরিকতা আমি তোমাতে যতো পেয়েছি, অমিতা, সত্যি বলতে কি, এমন আর কোথাও দেখিনি।

অমিতা লজ্জা পায়,—আচ্ছা বেশ! আপনি এখন থামুন তো! যখনি আসবো কেবল আমার প্রশংসা করা! আমার ভালো লাগে না একটুও—সত্যি! অমিতা কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া আবার বলিতে থাকে,—দেখি, কি কি ব্যবস্থা করলেন খাওয়ানোর। চলুন, আমি একটু সাহায্য করি। আসুন!

নীলিমা বালিকার মতো হাসিয়া উঠিল,—এই দেখ, তুমি কেমন আপনার মতো সাহায্য করতে চাইলে। আর কেউ বলুকতো দেখি! মুখে সবাই ভাই একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো কিন্তু আসলে দিদির মতো ভালোবাসা আছে শুধু এক তোমাতেই। ওই তো লক্ষ্মী র'য়েছে, সেদিন বললে কি জানো অমিতা?—নীলিমা হঠাৎ বলিয়া ফেলিল।

নীলিমা অমিতার কানের অতি নিকটে মুখ নিয়া আস্তে আস্তে কি যেন বলিল।

অমিতা চমকিয়া উঠে,—অ্যাঁ লক্ষ্মী! বলেচে এই কথা! আমার সম্বন্ধে?

নীলিমা,—নয়তো কি? আমি কি তোমার কাছে মিছে বলচি? তবে শোন বলি আসল ব্যাপারটা।

পুনরায় নীলিমা ধীরে ধীরে অমিতাকে বলিতে থাকে,—কথা কি জানো? মানে, লক্ষ্মী চায় না যে তুমি অমিয়র সাথে অতো মেলামেশা করো। ওতো আর জানে না যে তুমি অমিয়কে কি চোখে দেখো! ওর হয়েচে ঈর্ষ্যা! তোমার নামেতো ওই সব বিশ্রী আর মিথ্যে কথা আমার

কাছে ব'ললে। আমিও কিছুতে ছাড়িনি। দিলুম দুকথা বেশ করে শুনিয়ে। বললুম,—লক্ষ্মী ! অমিতার চোখে অমিয় বড়ো ভাই ছাড়া আর কিছুই নয়—জানিস্? মিছে কথা তুই কার কাছে কইচিস্ ? তখন লক্ষ্মীর সে কি মেজাজ ভাই অমিতা ! ওই যে, পল্লব বাবুরা দেখচি এসে গেছেন। আচ্ছা অমিতা, বোসো তুমি। আসচি আমি। পরে আবার এ বিষয়ে আলোচনা করবো। মন খারাপ ক'রো না—আচ্ছা ?

নীলিমা ক্ষিপ্রপদে ফটকের দিকে চলিতে লাগিল। কি মনে করিয়া আবার কয়েক পা ফিরিয়া চুপি চুপি অমিতাকে বলিল—তুমি একথা নিয়ে আবার লক্ষ্মীকে কিছু বলো না অমিতা। অ্যাঁ ?

মাটির দিকে চাহিয়াই অমিতা ঘাড়টি আরেকটু কাৎ করে।

ততক্ষণে সুকুমার পল্লব প্রভৃতি নিকটে আসিয়াছে।

নীলিমা খুসীতে ফাটিয়া পড়িল,—আসুন পল্লব বাবু, অতসী আয়, এসো ভাই সুকুমার !—অতসীর কাঁধে একটা হাত রাখিয়া বলিল,—আজ তোকে কী চমৎকারই যে দেখাচ্ছে অতসী ! সত্যিই তুই অপূর্ব্ব, অতসী, অনিন্দ্যনীয় !

পরক্ষণেই অতসীর আরো নিকটে আসিয়া বল্লে আয় দেখবি আয় অমিতাকে। জাফ্‌রাণী শাড়ীর সাথে প'রেচে একটা বেগুনী রংএর ব্লাউজ ! আর, ঘামে আর গোলাপী পাউডারে মিশে ওর মুখের যা চেহারা হয়েচে—ও ! একটা লাফিং ষ্টক্ ! নীলিমা মুখে রুমাল চাপিয়া হাসি থামাইল অতি কষ্টে।

উহারা লন্‌-এর উপর কতগুলি চেয়ারে গিয়া বসিল। নীলিমা সুকুমারের পাশেই বসিয়াছে। সুকুমারের ডান হাতটি কোলের উপর নিয়া নীলিমা বলিল,—তোমার গল্প ভাই পড়লুম আমি বসুমতী-তে। কি বলবো—সামনে ব'ললে ভাববে খোসামদ করচি। কিন্তু সত্যি ব'লতে কি, আমি গোটা বাঙলা-সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত অমন ধারা মিষ্টি ছোট গল্প পড়িনি। কী চমৎকার টেক্‌নিক ! ভাষা কী প্রাঞ্জল !

লজ্জিত হইয়া সুকুমার বলে,—না, না। এ আপনি কি বলছেন নীলিমাদি' ! হয়তো একটু ভালই হ'য়েচে ; কিন্তু তা' ব'লে আপনি যতটা ব'লচেন—

বাধা দিয়া নীলিমা বলিল,—তার মানে ? আচ্ছা, আপনিই বলুন পল্লব বাবু ! এ মাসের বসুমতী-তে প'ড়েছেন তো সুকুমারের গল্পটা ?

পল্লব ঘাড় নাড়িয়া জানায় সে পড়িয়াছে।

—কেমন হ'য়েচে ? চমৎকার ! না ? দেখলে তো ? নীলিমা বিজেতার মতো দৃষ্টিতে সুকুমারের দিকে চাহিল।

সুকুমার জুতার ফিতা নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—অবিশ্যি ভালো হ'লে আমারই সবার চাইতে বেশী আনন্দ পাওয়ার কথা। তবে আমার মনে হয় যে আমার প্রতি আপনার স্নেহের আধিক্যের জন্যে বিচার হয়তো সব সময় নিরপেক্ষ হয় না।

নীলিমা রাগিয়া উঠিল যেন,—বিচার হয় না নিরপেক্ষ ? তা'র মানে ? আমার স্নেহ ভালবাসা অতো অন্ধ নয় সুকুমার। যে-জিনিষ আমার ভালো লাগে না তা' আমি সবার সুমুখেই বলি। জানোইতো কৃত্রিমতা আমার নেই, আমি স্পষ্ট কথা ব'লতেই ভালবাসি। আচ্ছা—

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া নীলিমা পল্লবের দিকে চেয়ারটা টানিয়া নিল,—কিছু মনে করবেন না পল্লব বাবু। এসেছেন —তবুও এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলারই অবকাশ হ'লোনা। আপনি হয়তো ভাবছেন—

পল্লব বাধা দেয়,—আহা ! তা'তে কী ? একটুতেই আপনি অতো সঙ্কুচিত হ'ন কেন ? এতে কুণ্ঠার কি আছে ? একজন মানুষ আপনি। একই সময় সকলের সাথে আলাপ ক'রবেন কেমন ক'রে ?

নীলিমা উত্তর দেয় না—হাসে। দুই হাত দিয়া অনুভব করিল চুলগুলি তাহার শাসনে আছে কিনা। পরে বলে,—হ্যাঁ। একটা কথা আছে পল্লব বাবু। দয়া ক'রে একটু এদিকে আসবেন কি ? আপনাকে আমি গোটাকয়েক প্রশ্ন ক'রতে চাই।

নীলিমা ও পল্লব ধীরে ধীরে হল ঘরের দিকে চলিতে থাকে।

নীলিমা বলিল,—যদি কিছু মনে না করেন পল্লব বাবু, আমি একটা গোপনীয় খবর জানতে চাইচি। (একটু থামিয়া) হ্যাঁ, দেখুন ! কল্পনা গুপ্তা ছদ্মনামে কি কাগজে আজকাল আপনারই কবিতা বেরোচ্ছে ?

পল্লব খানিক চিন্তা করে। ডান হাত দিয়া চশমা-টি নাকের উপর ঠিক করিয়া বসাইয়া বলিল,—হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলুন তো?

নীলিমা বলিল,—এমনি জিগ্‌গেস করেছিলাম। মিষ্টার—নীলিমা এইখানে একটু ভাবিয়া নেয়—মিষ্টার সেনের কাছেই বুঝি শুনলুম। অবিশ্যি, আমি প্রথম থেকেই কল্পনা গুপ্তার কবিতা ভীষণভাবে ভালবাসি। রবীন্দ্রনাথের ভাষা আর আইডিয়া, মনে হয়, এর কাছে কিছুই নয়। অথচ মজা দেখুন, আমি মোটেই জানতুন না যে ওগুলো আপনারই লেখা। কী অসাধারণ ক্ষমতা আপনার পল্লব বাবু,—আমার হিংসা হয়।

পল্লব মজা করিয়া বলিল,—আচ্ছা কা'র লেখা আপনার খারাপ লাগে ব'লতে পারেন?

একটুও না-ভাবিয়া নীলিমা জবাব দেয়,—কেন? নবীন খাস্তগীরের লেখাত' আমার দু'-চোখের বিষ। মোটেই সইতে পারিনে!

পল্লব বলিল,—তা' নয়। খাস্তগীরের কথা বলছি না। যা'র সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে এমন কারুর লেখা আপনার কবে না খুব ভাল লাগে?

টবে লাগানো গোলাপ গাছ হইতে একটা ফুল তুলিয়া নিয়া নীলিমা পল্লবের কোটের বাটন-হোল্-এ লাগাইতে লাগাইতে বলিল,—কি যে বলেন আপনি! এত হাসি পায়! কেন, সুকুমার! এই সুকুমারের লেখা কি একটুও ভালো? রাবিশ! তবে, যে-গল্পটার কথা তখন বললুম ওইটেই যা' তবু পাতে দেওয়া চলে! এই নিন্, চমৎকার মানিয়েছে!

পল্লব ধন্যবাদ জানাইল।

নীলিমা পুনরায় বলিতে থাকে,—নেহাৎ ছেলেমানুষ সুকুমার, তাই একটু "এনকারেজ" করি—এই মাত্র! লিখুক, কালে হয়তো হাত পাক্‌বে। আপনার লেখার সঙ্গে সুকুমারের? হেভন্ এণ্ড হেল্। কিন্তু, হ্যাঁ! যা' বলছিলাম। কাল দুপুরে অমিতা এসেছিলো আমার এখানে। কথায় কথায় আমি বললুম যে আপনিই হচ্ছেন আসলে কল্পনা গুপ্তা। অমিতা বললে কি শুনচেন?—আচ্ছা থাকগে। নীলিমা থামিয়া গেল।

পল্লব বলিল,—কেন? বলুনই না আপনি!

নীলিমা বলিল,—না থাক্। অমিতার সম্বন্ধে আপনার আবার একটু, ইয়ে, উইকনেস্ আছে কিনা! আপনি হয়তো আঘাত পাবেন।

পল্লব বলে,—কী এমন কথা যে পুরুষ মানুষ হ'য়ে আহত হবো।

নিতান্ত অনিচ্ছার সহিতই নীলিমাকে বলিতে হয়,—অমিতা বললো যে পল্লব বাবুর সাধ্য নেই কোন দিন কল্পনা দেবীর মতো লেখেন। মানে, আমাকে একবারে ডাঁহা মিথ্যাবাদী বানিয়ে দিলে। কি আশ্চর্য্য দেখুন তো!

চশমা পরিষ্কার করিতে করিতে পল্লব জবাব দেয়,—হুঁ!

নীলিমা পল্লবের হাতে মৃদু নাড়া দিয়া বলিল,—তা'তে কি? কবিদের, লেখকদের, এই টুকুতেই নিরাশ হ'তে নেই। কত লোকেই-তো কত কথা বলবে। চলুন, ওদিকে যাই এবার। চিয়ারিও!

পরেই আবার পল্লবের হাত ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল,—উঃ! কত বেলা হ'লো দেখুন তো! অমিয় বাবু যে কেন এখনও আস্‌চেন না। নাঃ! পাংচুয়ালিটী জিনিসটা আর আমাদের বাঙালীদের দিয়ে হ'লো না।

দুই জনে লন্-এ আসিয়া পড়িল।

নীলিমা লক্ষ্মীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল,—এই যে! লক্ষ্মী এসে প'ড়েচিস্ দেখচি। বাঃ! অমিয়বাবু কতক্ষণ এলেন?

রিষ্ট্-ওয়াচের দিকে চাহিয়া অমিয় বলিল,—এইতো! দু'-মিনিট, সাত সেকেণ্ড। একটু দেরী হ'য়ে গেল আজ।

নীলিমা আবদারের সুরে বলিল,—কেন দেরী ক'রলেন বলুনতো? এতক্ষণ আপনার সান্নিধ্যের থেকে বঞ্চিত হ'তে হ'লো তো! জানেন তো, আপনার উপস্থিতি, বিশেষ ক'রে আমার কাছে, কতটা প্রীতিপ্রদ?

চট্ করিয়া নীলিমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যস্ততা দেখা যায়। নীলিমা বলিল, এই বয়গুলোকে দিয়ে আর চ'লবে না দেখচি। কেন যে এত দেরী হয়! আপনারা যদি অনুমতি করেন,—আমি এই এলুম ব'লে।

নীলিমা দ্রুত চলিয়া গেল। বাবুর্চিখানা হইতে তাহার গলা শোনা গেল,—লক্ষ্মী, একটু এদিকে আয় তো ভাই! এই চপগুলো—

লক্ষ্মী আসিলে নীলিমা বলিল,—দ্যাখ! এই চপগুলো কি চমৎকার হ'য়েচে দেখতে! আচ্ছা, চল একটু ও-ঘরে। টেবল-ক্লথে একটা নোতুন এম্‌ব্রয়ডারী তুলেচি। দেখবি আয় কেমন হ'য়েচে।

য়্যাটাচি-কেস্ হইতে টেবল্-ক্লথ বাহির করিয়া দেখাইলে লক্ষ্মী বলিল,—বাঃ! বেশ হ'য়েচে! সুন্দর!

নীলিমা একটা চেয়ারে বসিয়া বলিল,—নে, ওই সোফাটায় একটু ব'সতো। কোমড়টা একেবারে ধ'রে গেছে।—একটু থামিয়া আবার বলে,—কি জানি ভাই, কেমন হ'য়েচে। তুই বললি ভালো হ'য়েছে, আবার কেউ কেউ নাক সিঁটকায়।

লক্ষ্মী প্রশ্ন করে,—কেন, খারাপ আবার কে ব'ললো? আমার তো চমৎকারই লাগছে।

নীলিমা হাল্‌কা-স্বরে বলিল,—ওই তো, অতসীকে সেদিন দেখালাম। তা ব'ল্‌লো—অবিশ্যি স্পষ্ট ব'ললো না যে খারাপ হ'য়েচে। তবুও, আমি ত' আর কচি খুকীটি নই যে বুঝতে পারবো না। যাক্ গে!

লক্ষ্মী আয়নায় একবার নিজেকে দেখিয়া নিয়া নীলিমাকে বলিল,—চলুন এবার ও-দিকে। ওঁরা বোধ হয় এতক্ষণে হাঁপিয়ে উঠেচেন।

চল যাই। চেয়ার হইতে নীলিমা উঠিয়া বলিল,—আচ্ছা লক্ষ্মী, তুই নাকি সব কি যা'-তা' ব'লেছিস্ অমিতার নামে?

লক্ষ্মী আকাশ হইতে পড়িল,—আমি? কি ব'লেচি আমি অমি'র নামে?

—অমিতাই তো কতো দুঃখ ক'রে ব'ললে যে তুই নাকি ওর নামে সব মিছে কথা চাদ্দিকে রটিয়ে বেড়াচ্ছিস—আমাদের অমিয় বাবুর সম্বন্ধে!

লক্ষ্মী ব্যগ্রভাবে নীলিমার দুই হাত চাপিয়া ধরিল,—আমি এই কথা বলেচি? অমি' ব'লেচে? আশ্চর্য্য!

নীলিমা নিতান্ত সরলভাবেই বলিল,—কি জানি ভাই! এই তো তোরা আসার একটু আগেই আমায় ব'ললে এখানে ব'সে ব'সে। সত্যি, অমিতা যেন দিনকে-দিন কেমন হ'য়ে যাচ্ছে। ব্যাপার কি জানিস্? অমিতার কোন খবরই তো আর আমার অজানা নয়! এখন অমিয়র ওপরে নজর প'ড়েচে। বুঝলি না? তাই তোর চোখে অমিয়কে খাটো করবার বা তোদের দুজনকার মধ্যে একটা মনান্তর আনবার জন্যে অমিতার এই অভিনব প্রচেষ্টা!

কোন কথা না বলিয়া লক্ষ্মী অলসভাবে কৌচের ভিতরে ডুবিয়া গেল।

নীলিমা যখন বলিল—'চল্ লক্ষ্মী যাই' তখনও সে একই ভাবে শুইয়া থাকিল। চোখ বুঁজিয়াই বলিল,—আপনি যান দিদি। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

আদর করিয়া নীলিমা লক্ষ্মীর গাল টিপিয়া দিল। বলিল,—পাগলী কোথাকার! এতেই মন খারাপ হ'য়ে গেল? আয় তো তুই এখন। এর ব্যবস্থা আমি করছি দাঁড়া শীগগির-ই। এখন চুপ ক'রে থাক। এসব নিয়ে নাড়া-চাড়া করিস না। তোকে ভালবাসি ব'লেই জানালাম। সাবধান হবি। আয়! নীলিমা লক্ষ্মীকে টানিয়া নিয়া গেল।

নীলিমার অলক্ষ্যেই লক্ষ্মী একবার তাহার চোখ মুছিয়া লইল তাহার পরণের শাড়ীর আঁচল দিয়া। মৃদু-স্বরে শুধু বলিল,—অমি' যে আমার সাথে এমনি ব্যবহার ক'রবে তা' কখনো ভাবিনি, দিদি!

বাহিরে আসিয়া নীলিমা তাহার বিলম্বের জন্য সকলের নিকটেই ক্ষমা চাহিল। এই অকর্ম্মণ্য হতভাগা বাবুর্চিগুলি যে কবে মানুষ হইবে। নীলিমাকে ইহারা জ্বালাইয়া খাইল। তাহার মৃত্যু হয় না কেন। নিমন্ত্রিতদের সহিত যে কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত হইয়া গল্প করিবে তাহারও নীলিমার উপায় নাই এই বর্ব্বর বয়গুলির জ্বালায়। চপগুলি ভাজিতে গিয়া একেবারে গুঁড়া করিয়া ফেলিয়াছিল আর কি!

অবশেষে চা-ইত্যাদি আসিতে লাগিল। নীলিমা আপন হাতেই সাবইকে পরিবেশন করিতেছে।

—অমিতা, তোমায় কিন্তু ভাই আজ যাবার আগে গান গাইতে হবে। নীলিমা অমিতার টেবিলে চা' আগাইয়া দিল।

সুকুমার বলিল,—নীলিমাদির এ-প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

একটা আস্ত কেক্ মুখে পুরিয়া অমিয় বিকৃতস্বরে বলিল, আমিও।

একটা-কিছু না-বলিলে ভাল দেখায় না। অমিতাকে

বলিতে হয়,—তখনকার কথা তখন হবে। আপনারা আগেই ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

লক্ষ্মী কুটিল-দৃষ্টিতে অমিতার দিকে চাহিয়া বলিল,—তোকে যেন আজ একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে অমি'। কোন অসুখ করেনি তো?

সকলের অলক্ষ্যে নীলিমা চকিতে অমিতাকে কি ইঙ্গিত করিল।

অমিতা যেন একটু তীব্র-স্বরেই লক্ষ্মীর প্রশ্নের জবাব দিল,—না। অসুখ আবার কি হবে?—বলিয়া অমিয়র সহিত নিম্ন-স্বরে গল্প করিতে থাকে।

নীলিমা ছুটিয়া গেল লক্ষ্মীর নিকটে,—ও-কি ভাই লক্ষ্মী! সন্দেশটা প'ড়ে থাকবে কেন?

পরেই লক্ষ্মীর পেয়ালায় চিনি মিশাইতে মিশাইতে নিম্নস্বর বলিল,—দেখলি? তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে কেমন গায়ে প'ড়ে অমিয়র সঙ্গে আলাপ ক'রচে?

অমিতার দিকে চাহিয়া থাকিয়াই লক্ষ্মী বলে,—হুঁ!

নীলিমার বহু কাজ! একলা আর কতদিকে সামলানো যায় বলো? তটিনীকে গোটা কয়েক স্যাণ্ডউইচ দিতে হইবে।

নীলিমা তটিনীর টেবিলে গিয়া শুধাইল,—আর গোটা-দুই স্যাণ্ডউইচ দিই, অ্যাঁ? অতসী! ওই লাল রংএর সন্দেশের মধ্যে কি-কি আছে বল্‌তো? আমার নিজের হাতে তৈরী। সুকুমারকে কি কোকো দেবো খানিক? না, না পল্লব বাবু! ও-পুডিংটুকু ফেললে চ'লবে না! আতিথেয়তার দিকে নীলিমার একটুও ত্রুটি থাকে না।

এমনি করিয়াই পার্টি শেষ হইল। অমিতার গান-ও হইল। নীলিমা নিজে খুব ভাল ভায়োলীন বাজাইতে পারে। সকলের অনুরোধে নীলিমাকে এক-হাত ভায়োলীন বাজাইতে হইল।

পল্লব তাহার বাজনার তারিফ করায় নীলিমা খানিক বিনয় প্রকাশ করে,—কী-ই আর ছাই আমি বাজাই। এই শহরে যদি কেউ ভায়োলিনের গর্ব্ব ক'রতে পারেন ত' তিনি এক অমিয় বাবু। অমিয় বাবুর কাছে, সত্যি ব'লতে কি, আমি শিশুমাত্র! ইত্যাদি।

আসর ভাঙিতে থাকে।

সকলেই উঠিতে লাগিল। নীলিমা অতসীকে বলিল,—তুই থাক্ অতসী। আমি এঁদের এগিয়ে দিয়েই আস্‌চি।

অতসী অবাক হইয়া যায়,—তার মানে? আর, আমার বুঝি আজ যেতো হবে না, নাকি? না, আপনার এখানে রাতেও নিমন্ত্রণ?

নীলিমা আকাশের চাঁদ হাতে পাইল যেন,—থাকবি তুই আজ রাতে এখানে?—নিজেই আবার জবাব দেয়,—না, না। সে ভাগ্যি কি আর আমার হবে? আচ্ছা দাঁড়া, এই এলুম ব'লে। কথার মোড় ঘুরাইয়া দিতে ওর একটুও দেরী হয় না।

নীলিমা সকলকে লইয়া গেটের দিকে আগাইয়া গেল। প্রত্যেকের নিকট হইতেই পাইল অজস্র প্রশংসা।

আলাদা আলাদা ভাবে নীলিমা সবাইকে অনুরোধ করে,—আসবেন কিন্তু মাঝে-মাঝে, আপনারা এলে এমন ভালো লাগে! এসো কিন্তু তোমরা পরশুদিনই,—অ্যাঁ?

নমস্কারের পরে, যাহারা হাঁটিয়া যাইবে তাহারা চলিতে থাকে। কেউ-কেউ নিজেদের গাড়ীতে চড়িল।

পল্লবের গাড়ী বাহির হইয়া গেল।

আরও একটা গাড়ী চলিয়া গেল

সুকুমার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়াছে, এমন সময় নীলিমা তাহাকে বলিল,—ভালো কথা সুকুমার! তুমি আর আসচো না কেন ফ্রেঞ্চ শিখাতে শুনি? কাল এসো, অবিশ্যি কিন্তু! তোমার Method of coaching এত চমৎকার! একেবারে বাঙলার মতে শিখে ফেলি।

সুকুমার গাড়ী চালাইয়া দিল। জান্‌লা দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিল, সে আসিবে।

ড্রইং-রুমে ফিরিয়া আসিয়া নীলিমা দেখে অতসী গভীর মনযোগে কি একটা বই পড়িতেছে।

—কী দিনরাত খালি পড়া! নীলিমা অতসীর হাত হইতে বইটা কাড়িয়া নিল। বলিল,—বেশ আনন্দই কাটলো সন্ধ্যেটা! কত লোক এলেন। আচ্ছা অতসী! এঁদের মধ্যে কা'কে তোর সবচে' ভালো ব'লে মনে হয়?

অতসী ঠিক বুঝিতে পারে না। বলে,—মানে?

ব্লাউজ-এর বোতাম খুলিতে খুলিতে নীলিমা বলে,—না,

অন্য কিছু আমি Mean করিনি। এই ধর সবচে' সাদাসিদে' বা সকলের চাইতে সরল—কাকে তোর মনে হয়, অতসী?

আয়নার অতসী একবার তাহার দাঁত দেখিয়া নিল। বলিল,—আমার ত' তটিনীদি'কেই সবার চাইতে সরল এবং আন্তরিক মনে হয়।

অতসীর কথা লুফিয়া নিয়া নীলিমা বলে,—ঠিক ব'লেচিস্। আমারো ভালো লাগে সবার চাইতে তটিনী দেবীকে। আর—নীলিমা একটা চিরুণী নাচাইতে নাচাইতে বলে,—আর তোকে।

অতসী যে-বইটা পড়িতেছিল, সেইটা নিয়া নীলিমা অতসীকে বলিল,—একটা কবিতা পড়চি, অতসী! কার লেখা আর কেমন হ'য়েচে ব'লতে হবে কিন্তু।

অতসী বলে,—পড়ুন।

একটা পাতা খুলিয়া নীলিমা পড়িতে থাকে:

"মলয় হাওয়ায় ভেসে আসে আমার প্রিয়ার ছবি,
দূর হ'তে তাই দেখি, ওগো, আমি এ-বিরহী কবি।
ফাগুন রাতের—"

বাধা দিয়া অতসী বলে,—থামুন, থামুন! আর পড়তে হবে না। একেবারে বাজে! কল্পনা গুপ্তার লেখাতো? মানে, পল্লব বাবুর!

নীলিমার চমক লাগে। গালে হাত দিয়া বলে,—বলিস্ কি অতসী? কল্পনা গুপ্তার নামে আমাদের পল্লব বাবু কবিতা লেখেন?

অতসী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল,—হ্যাঁ, তাই।

নীলিমা শুধাইল,—ঠিক জানিস তুই?

পরেই আবার,—তাই বলো! আমি তো ভাবছিলাম মেয়ে মানুষে কি ক'রে এমন সব অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে মেয়েদেরই সম্বন্ধে। উঃ! এমন মজার খবরটা আমিই জানতুম না? মজা দেখ আবার, পল্লব বাবু আজ কি ব'ললেন জানিস অতসী? ওঁকে নাকি এবার 'সনাতন সাহিত্য পরিষদ' প্রেসিডেণ্ট ক'রবে!

অতসী রাগিয়া উঠিল,—আর আপনি তাই বিশ্বাস করলেন?

নীলিমা বলিল,—বাঃ! ভদ্রলোকের কথা! কি ক'রে বিশ্বাস করি যে একেবারে ভুল? একি, তুই উঠছিস্ যে!

অতসী উঠিয়া পড়িল,—এখন যাই নীলিদি! পারিতো কাল একবার আসবো এমনি সময়।

নীলিমাও উঠিল,—যাবি? আচ্ছা, আসিস কিন্তু কাল। সত্যি, তোকে আমার এত ভালো লাগে যে কি বলবো! এতজন এসেছিলেন তো—সবাই চ'লে গেলেন। কিন্তু তোকে তখনই ছেড়ে দিতে কিছুতেই মন চাইছিলো না। বিশ্বাস কর অতসী, তোকে আমি আমার বোনের চেয়েও বেশী ভালবাসি।

নীলিমাকে প্রণাম করিয়া অতসী বলিল,—তাহ'লে যাই নীলিদি!

অতসীর চিবুক স্পর্শ করিয়া নীলিমা বলিল,—হ্যাঁ, আয়। আর হ্যাঁ! নীলিমা অতসীর কাছে আগাইয়া আসিল,—তুই নাকি আজকাল সুকুমারের কাছে রাতে আঁক শিখ্‌ছিস্?

অতসী আকাশ হইতে পড়িল,—আমি? কে বললে? না তো!—তবে সন্ধ্যার দিকে ওঁদের ওখানে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই—এই পর্য্যন্ত!

নীলিমা বলিল,—তবে তাই! আমাকে সাবিত্রীই বলছিলো বুঝি। তবে, বাজে কথা বলেছে! জানি, ওর অমনি স্বভাব! আচ্ছা, অতসী! আসিস কিন্তু ভাই কালকেই! ভুলিস না!

—আচ্ছা। অতসী চলিয়া গেল।

নীলিমা নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। খোলা জানলা দিয়া বাহিরে আকাশে চাঁদ দেখা যাইতেছে।

ঘড়িতে ঢন্ ঢন্ করিয়া আটটা বাজিল।

'এক-দুই' করিয়া নীলিমা নিজের আঙ্গুল গুণিতে লাগিল,—আট!

আপন মনেই নীলিমা হাসিয়া উঠিল, ভারী আরাম লাগিতেছে তাহার!

শ্রীসরোজকুমার মজুমদার
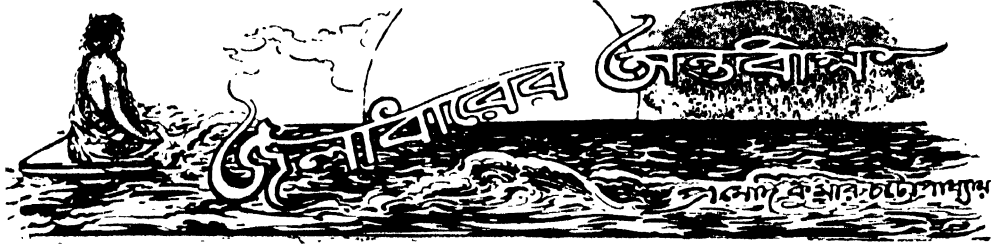
৬

এবার আর একটি ঘটনার কথা,—তারপর কর্ম্মক্ষেত্র পরিবর্ত্তনের কথা বলিব। ব্যাপারটি হিমালয়ের মধ্যে ভোটরাজ্যের এলাকায় একস্থানে ঘটিয়াছিল।

ভোটিয়া স্ত্রী, পুরুষ ও একটি বালক পুত্র। পিতা-পুত্রের পৃষ্ঠে মোট বাঁধা; অবশ্য যে যতটা পারে সেই মতই, নারীর পিঠে ছোট একটি কাপড় চোপড়ের বোঝা। আরও একটি সঙ্গী তাহাদের আছে, একটি পাহাড়ী গাধা তার পিঠে, দুই দিকেই বেশ ভারী মাল চাপাইয়া বেশ প্রফুল্ল মনে তাহারা চলিয়াছে। চল্লিশটি ক্রোশ চড়াই, উৎরাই এবং গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া তাহারা যেখানে যাইতেছে, এই সময়ে সেখানে প্রতিবৎসরেই একটি মেলা বসিয়া থাকে, অনেক টাকার কেনা বেচা হয়। সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া ইহারা যে-সকল দ্রব্য উৎপন্ন করে এই হাটেই তাহা বিক্রয় করে। শেষে ফিরিবার সময় কিছু কিছু কাঁচা মাল সওদা করিয়া আনে যাহাতে আবার সারা বৎসর কাজ চলিবে। এই তাহাদের জীবিকা। সরল, সুন্দর, স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন তাহাদের।

এখন যে-পথে তাহারা চলিয়াছে সে-পথে পড়াও বা আশ্রয় স্থান কিছু দূরে দূরে, এ অঞ্চলে এমনই হয়। সঙ্গে তাহাদের চাল, ডাল, আটা, ঘি, গুড় প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যাদি চলিতেছে। আজ সকালে আহারাদি সারিয়া তাহারা মধ্য পথে একটি জঙ্গলময় পড়াও হইতে বাহির হইল, পাঁচ ক্রোশ গেলে তবে আবার আশ্রয় মিলিবে।

ক্রোশ দুই চলিবার পর পুরুষটি, পেটের পীড়া অনুভব করিয়া বোঝা রাখিয়া জঙ্গলে গেল। মাতা পুত্রে বোঝা নামাইয়া ততক্ষণ একটু বিশ্রামের জন্য বসিল। অনেকক্ষণ পর যখন সে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিতেছে দেখা গেল, তাহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, চলৎশক্তি ক্ষীণ। নারী উদ্বিগ্ন চিত্তে একটু অগ্রসর হইয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিতে সে কেবল মাত্র,—হেজা, এই কথাটি বলিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িল। ওলাওঠা বা কলেরাকে ইহারা হেজা বলে, এ রোগে মৃত্যু নিশ্চিৎ ইহাই তাহাদের ধারণা।

শুনিবামাত্র ভয়ে নারীর মুখ শুখাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি পুত্রকে ডাকিয়া দুজনে গাধাটি ভারমুক্ত করিল। বোঝা হইতে বিছাইবার মত একটা কিছু বাহির করিয়া নারী স্বামীকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিল। পথের পাশে, পীড়িত স্বামী লইয়া এইরূপ অসহায় বিপন্ন নারীহৃদয়ের যে অনুভূতি তাহা বর্ণনার ভাষা নাই। তাহার মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। উদ্বেগ, ভয়, ও বিষাদ মিলিয়া স্বামী স্ত্রী উভয়েই মুহ্যমান, বালকটি এখনও বিপদের কথা ভাল বুঝিতে পারে নাই। সে একবার পিতা ও একবার মাতার মুখের দিকে দেখিতে লাগিল। জলশূণ্য জঙ্গলময় পার্ব্বত্য পথে রুগ্ন স্বামীকে লইয়া নারী সাহায্যের আশায় চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যদি কেহ আসে, কিন্তু কে কোথায় আছে যে তাহাদের সাহায্য করিতে আসিবে!

নারীহৃদয় বিধাতার কি অপূর্ব্ব রহস্যময় সৃষ্টি,—এমনই তাহাদের গঠন, গুরু বিপদে অসহায় বিপন্ন অবস্থাটি তাহারা এমনই তীক্ষ্ণ অনুভব করিতে পারে পুরুষে ততটা পারে না। ঐ অবস্থায় তাহারাই সহজে ভগবানে আত্মসমর্পন করিতে পারে,—স্বভাবতঃ পুরুষার্থ প্রবল পুরুষের যেটি সহজে ঘটিবার নয়; কারণ, সম্পূর্ণ শক্তিহীন না হইলে পুরুষ আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। কখন কখন নিজ শক্তিতে বিশ্বাসের অভাবে তাহারা ভগ্ন হইয়া পড়ে, সেক্ষেত্রে আত্মসমর্পণও ঘটেনা আর পুরুষার্থ প্রয়োগেও শক্তিহীন। নারী, এ সব ক্ষেত্রে, সহজ আত্মসমর্পনের প্রভাবে যে কল্যাণ আকর্ষণ করিয়া

আনে পুরুষ তাহার পূর্ণ অংশই গ্রহণ করে কিন্তু তাহাদের ধারণাতেও আসে না কিভাবে এটি সম্ভব হইল। এই পৃথিবীর সকল মনুষ্য সমাজেই এই ভাবে নারী জাতি অশেষ কল্যাণময়ী অথচ পুরুষের ধারণা, নারী দুর্ব্বল এবং জন্মগত অধীনতা লইয়া তাহাদের সেবার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে।

যথা নিয়মে এখন তাহাদের এই ব্যাকুল আর্ত্তি বিশেষতঃ নারীপ্রাণের গভীর বিষাদ এবং কাতর প্রার্থনা সেই জনশূন্য পার্ব্বত্য অরণ্য ভেদ করিয়া যথাস্থানে পৌঁছিল এবং ঐ ক্ষেত্রে যেরূপ সাহায্য প্রয়োজন তাহার যোগাযোগও ঘটিল।

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পীড়িত ব্যক্তি তৃষ্ণায় কাতর, তাহার কণ্ঠ শুখাইতেছে দেখাইয়া স্ত্রীকে বলিল,—বড় তৃষ্ণা, একটু জল। স্ত্রী ভাবিল, সর্ব্বনাশ! তবে ত রক্ষা নাই। এ রোগে রোগীকে জল দিতে নাই, জলপান করিলেই রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য ইহাই তাহার ধারণা। সুধু তাহার নয় এই হিমালয় রাজ্যে সর্ব্বস্থানেই এই সংস্কার বদ্ধমূল। সুতরাং যদিও সে বলিয়া ফেলিল যে জল এখন কাজনাই, খারাপ হইবে; কিন্তু আমার উপস্থিতির প্রভাব তাহার অন্তঃকরণে অর্থাৎ বুদ্ধির উপর যে ক্রিয়া করিল তাহার ফলে সে ভাবিল যখন এতটাই তৃষ্ণা তখন জল, পাহাড়ে ঝরণার পরিষ্কার জল পান করিলে তাহার হয়ত উপকারই হইবে। তারপর সে নিজেও তৃষ্ণা অনুভব করিয়া বালককে জল আনিতে বলিল। তারপর, রোগী ছটফট করিতেছে দেখিয়া সে তাহার বুকে, মাথায়, হাত বুলাইতে লাগিল। অন্য সময় হইলে সে তাহাকে ছুঁইতনা, দূরে থাকিয়া যাহা করিবার তাহা করিত।

জল ছিল কিছু দূরে, বালকের জানা ছিলনা। এখন তাহাকে পথ দেখাইতে হইল। জল পাইয়া সে প্রথমে নিজে যতটা পারিল পান করিয়া লইল, তারপর পাত্র ভরিয়া লইয়া আসিল। অন্য সময়ে এই ভোটিয়ারা জল পান করে না,—তাহারা মদ্য পান করে। এক প্রকার মদ তাহারা ঘরে প্রস্তুত করে, সংসারের সকল কর্ম্মের মধ্যে ইহাও তাহাদের নৈমিত্তিক কর্ম্ম। তৃষ্ণা অনুভব করিলে জলের পরিবর্ত্তে তাহাই পান করিয়া থাকে। এ অঞ্চলের শীতপ্রধান দেশে জল বড়ই ভয়—সর্দ্দি লাগিয়া যাইবে। সেই জন্যই রোগের সময়ে প্রকৃত জলের তৃষ্ণা যখন পায় তখনও জলকে বিষবৎ এড়াইতে চায়। যাহা হউক এখন বালক জল আনিয়া তাহার জননীকে সেখানে দেখিতে পাইল না। পিতার নিকট পাত্র ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল মা কোথা? রোগী আগে জলতৃষ্ণা মিটাইয়া পরে অঙ্গুলী সঙ্কেতে জঙ্গলের দিকে দেখাইয়া দিল। চাহিয়া দেখিল তাহার মা আসিতেছে, মুখে বিষাদের ছায়া।

জননীকেও রোগে ধরিয়াছে,—পুত্র অগ্রসর হইয়া তাহার কাছে গেল—ধীরে ধীরে তাহার মা পিতার নিকটে আসিয়া বসিল এবং তাহাকে ছুঁইতে নিষেধ করিয়া বলিল, আর রক্ষা নাই, একটু জল দাও। পাত্রটি ছোট, পিতাই সবটা শেষ করিয়াছে, কাজেই বালক আবার ছুটিল জলের উদ্দেশ্যে আর তাহার মা সেইখানে শুইয়া পড়িল। এই পাহাড়ে হৈজাকি বিমার যখন ধরে তখন এই রকমই হয়। পুনরায় যখন বেগ আসিল, তখন আর তাহাদের উঠিয়া জঙ্গলে যাইতে শক্তি নাই। পড়িয়া পড়িয়া তাহারা সেই বিষম রোগ ভোগ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাছিতে সে স্থান পূর্ণ এবং তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গেল। সূর্য্যদেব তখন মাথার উপর।

দুর্গম জঙ্গলে পথের মধ্যে তাহাদের এই অবস্থা। পুরুষের অন্তরে মৃত্যুভয় আছে। নারীর তাহা নাই, সে দেবতার অনুগ্রহের উপর সব ছাড়িয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে সন্তানের কথা ভাবিতেছে বটে তবে দেবতা যা করেন, ভাবিয়া অনেকটাই সে নিশ্চিন্ত; কিন্তু পুরুষটি তাহাদের গাধা, মাল এবং বালকটির কি হইবে এই সকল ভাবিয়া বড় ছটফট করিতেছে। এখন কি ভাবে ইহাদের পরিনতি ঘটিল তাহাই বলিব।

যে পড়াও হইতে ইহারা বাহির হইয়াছিল,—দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে আসাম অঞ্চলের দুটি বাঙ্গালী যুবা সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। একজন পাহাড়ী বাহক তাহাদের মালপত্র লইয়া সঙ্গে ফিরিতেছে। দুজনের হাতেই বন্দুক। তবে শিকার তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, পায়ে হাঁটিয়া হিমালয়ের সবটা ভ্রমণ করিবে এই উদ্দেশ্যেই মাসাধিক কাল ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক জন চিত্রকর, দ্বিতীয় যুবক বড় খেলোয়াড়।

তাহারা ভোরে উঠিয়াই যাত্রা করিয়াছিল, উদ্দেশ্য, আজ রাত্র এখানে কাটাইবে, স্থানটি উপভোগ করিবে; কাল ভোরে আবার যাত্রা করিবে। এই ভাবেই তাহারা আনন্দে হিমালয়

ভ্রমণ করিতেছিল। এখানে পৌঁছিবামাত্র যে ব্যক্তি শিল্পী তাহার মনে স্থানটির উপর একটা বিতৃষ্ণভাব দেখা গেল। বন্ধুকে বলিল জায়গাটা ভাল নয়, ভয়ানক জঙ্গল—চল খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে—কি বল।

বন্ধুর আজই যাইতে আপত্তি ছিল কিন্তু সে জানিত তাহার আপত্তিত কাজ হইবে না কারণ দুজনের মধ্যে গাঢ় প্রণয় ছিল। তবুও বলিল আজ এখানে থাকাই যাকনা, দশ মাইল হেঁটে আসা গেল আবার এখনি যাবে? উত্তরে তাহার বন্ধু বুঝাইল যে, স্থানটি জঙ্গল মোটেই থাকিবার উপযুক্ত নয়, চল যাওয়া যাক, যদিও জায়গাটা ভাল হয় সেখানে না হয় একটু বেশী থাকা যাইবে। মোটেত নয় মাইল, আমরা সন্ধ্যার ঢের আগেই পৌঁছাইতে পারিব।

তাহারা যাইবে ঠিক করিল বটে কিন্তু কুলী আরাম চায়। সে মাল পত্র রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাঠ সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইয়াছে। ফিরিয়া আসিলে দুজনে মিলিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, মোটে সাড়ে চার ক্রোশ পথ, আহারাদি সারিয়া বাহির হইলেও আমরা বেলা থাকিতেই পৌঁছাইতে পারিব। সে কিছুতেই রাজী হয় না দেখিয়া, তাহাকে কিছু অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তখন রাজী হইল।

বেলা যখন তৃতীয় প্রহর ঘেঁসিয়াছে, তখন তাহারা যথাস্থানে আসিয়া পড়িল। পথের পাশে প্রথমে বালকটিকে, পরে রোগে অচৈতন্যপ্রায় স্ত্রী পুরুষ লক্ষ্য করিয়া তাহারা সেখানে দাঁড়াইল, কুলী একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিল।

বালক তাহাদের দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, সে তাহার পিতামাতার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া যাহা বলিতে লাগিল আগন্তুক দুজন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। তবে একথা সহজেই বুঝিল যে ইহারা রোগগ্রস্ত, অসহায় এবং বিপন্ন। রোগীর নিকটে গিয়া অবস্থা দেখিল, হিন্দীতে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কতক মত জানিয়া লইল, কেবল, হৈজা, কথাটির অর্থ বুঝিতে পারিল না। মলের দুর্গন্ধ, সেখানে মাছি ভয়ানক এ সকল দেখিয়া তাহারা অনুমান করিল হয়ত বা কলেরাই হইয়াছে ইহাদের। চক্ষু দেখিল ঘোর রক্তবর্ণ; বিকারের লক্ষণ বুঝিয়া তাহারা চিন্তিত হইল। বলা বাহুল্য তাহাদের আর যাওয়া হইল না।

আগন্তুক যুবকদের দেখিয়া স্ত্রী পুরুষ এবং বালক সকলের প্রাণে ভরসা আসিয়াছে। স্ত্রী পুরুষে জড়িতকণ্ঠে কত কি বলিতে লাগিল কিন্তু তাহাদের কুলী না আসিয়া পৌঁছাইলে কিছুই করা যাইবে না বুঝিয়া পথের দিকে দেখিতে লাগিল। চিত্রকর আগাইয়া গেল দেখিতে, দ্বিতীয় যুবক বালককে জিজ্ঞাসা করিল, জল কোথায় পাওয়া যায়? তাহাদের সঙ্গে একটা তামার কলস ছিল, বালককে জল ভরিয়া আনিতে পাঠাইয়া দিল। তাহারা মলের দুর্গন্ধ পাইয়াও ঘৃণা করিল না।

চিত্রকরের মনে তখন নিশ্চিত ভাবে এই কথাটাই উঠিতে লাগিল যে, রোগগ্রস্ত বিপন্নদের সাহায্যের জন্যই তাহাদের আজ সেখানে থাকা হইল না। ভগবান এই জন্যই তাহাদের এখানে পাঠাইয়াছেন। তার মনে আশঙ্কাও ছিল যে এ-ক্ষেত্রে তাহারাই বা কি করিতে পারিবে। ইহারা বাঁচিবে কিনা সন্দেহ—বালকেরই বা কি হইবে এই সব? যাই হোক কর্ত্তব্য যেটুকু তাহারা সেইটুকু ত করিতে পারিবে। আবার সাহসও আসিতেছিল এই ভাবিয়া যে ভগবান যখন তাহাদের আনাইয়াছেন তখন অবশ্যই ইহাতে একটা শুভ উদ্দেশ্য আছে।

কিন্তু তাহারা কি করিয়া জানিবে কোন্ ভগবান তাহাদের এখানে আনিয়াছেন,—আর কি উদ্দেশ্যই বা তাঁহার আছে ইহার মধ্যে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সৌর দেবদূতগণের কাজ মানুষের চৈতন্য বা বিবেক উদ্বোধিত করা। সরলবুদ্ধি যাহারা তাহাদের উপর দেবদূতের প্রভাব বেশী এবং শীঘ্র কার্য্যকরী হয়। তীক্ষ্ণ বিবেকবান যাহারা তাহাদের উপর কোন প্রভাব বা শক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, সন্নিধ্যেই অভিপ্রেত উৎপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে আমর কর্ম্ম ছিল দূরবর্ত্তী পর্য্যটক যুবকদ্বয়ের সঙ্গে এই বিপন্ন যাত্রীগণের যোগাযোগ ঘটানো; তাহাদের সহিত মিলাইয়া দিলেই এ ক্ষেত্রে কল্যাণ হইবে। তাহারা সরল উন্নতমনা বলিয়া সহজেই অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়া গেল। নতুবা রোগীদের বাঁচাইতে আমার কোন হাত নাই, সে কর্ম্ম আমার নয়। এখানে দেখিলাম স্ত্রী বা নারীর মৃত্যু অনিবার্য্য, পুরুষ বাঁচিবে, কিন্তু আমার দরদ তিনটি প্রাণীর উপর সমানই, ইতর বিশেষ কিছুই নাই, থাকা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

যাহা হউক এই দুই পর্য্যটক বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে সাহস, উৎসাহ, ত্যাগ এবং পরউপকার প্রবৃত্তি থাকার জন্য কাজটি সহজ হইয়া গেল। পূর্ণ আস্থা এবং প্রীতি সহকারে তাহারা এই দৈবনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে লাগিয়া গেল। ইহাতে তাহাদের উপকার কম হইল না। মহত্ত্ব বা মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে এই সকল কর্ম্মই বিশেষ সহায়তা করে।

শুভ কর্ম্মে ব্যাঘাৎ বিস্তর, এ যেন একটা প্রতিজ্ঞার মতই। একাজে তাহারা বাধাও কম পায় নাই। তাহাদের সেই বাহক আসিয়া যখন ব্যাপার দেখিল, বুঝিল, তখন বিষম ভয়ে সে দূরে চলিয়া গেল। দূর হইতে জোড় হাতে সে যুবকদ্বয়কে রোগীর কাছে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিল। বিপদের ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহার অনুনয় বিনয় দেখিয়া একজন বন্দুকটি তুলিয়া লইল এবং বাহকের দিকে লক্ষ্য করিয়া জানাইল যে এখন কথার অবাধ্য হইলে এই গুলিতে তাহার প্রাণ যাইবে। প্রাণের ভয় সকল ভয়ের বড় সুতরাং বাহক এখন বশীভূত হইল।

তখন বাহকদ্বারা যে কাজ প্রয়োজন করানো হইল। জল আনাইয়া রোগীদের পরিষ্কৃত করিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন এবং শয্যায় শয়ন করানো হইল। মোটামুটি কিছু ঔষধ তাহাদের সঙ্গে যাহা ছিল তাহা সেবন করান হইল। দুজনে মিলিয়া এই দুর্গমে অপরিচিত রোগীদের জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে যথাসম্ভব সেবা করিতে লাগিল। এই ভাবে সে রাত্র তাহারা রোগীদের নিকটে কাটাইল। কিন্তু রক্ষা পাইল পুরুষটি। নারীকে বাঁচাইতে পারিলনা ভাবিয়া তাহারা গভীর দুঃখ পাইল বটে কিন্তু ভবিতব্য ভাবিয়া শান্ত হইল। নারীর প্রাণশক্তি ছিল না, পুরুষের কল্যাণে সে সবটাই নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিল।

যাহা হউক স্ত্রীকে হারাইয়া পুরুষের দুর্ব্বল শরীরে যে আঘাৎ লাগিল তাহা সামলাইতে তাহার কয়েক দিন গেল। যুবকদ্বয়—নারীকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যথা কর্ত্তব্য সেবা করিয়া পরে কুলির সাহায্যে গতি করিল এবং যত দিন না পুরুষটি সবল হইল ততদিন তাহারা ঐ খানেই রহিল। পরে যখন পুরুষের চলিবার মত অবস্থা হইল, তখন তাহারা একসঙ্গে চলিল এবং তাহাকে যথা স্থানে পৌঁছাইয়া পরমানন্দে নিজেদের নির্ব্বাচিত পথে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
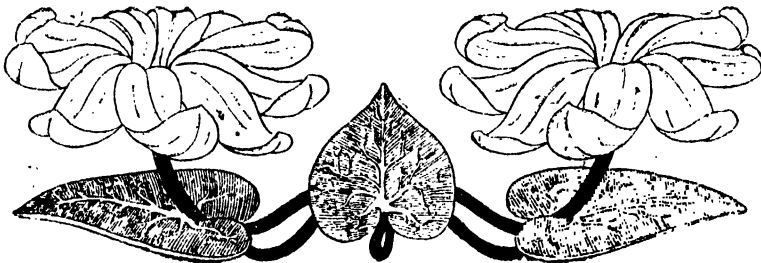
মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়—
জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি একা ম্লান চাঁদ চায়
মেঘে মেঘে ভ'রে যায় আকাশের চারদিক আব্‌ছা আলোয়
মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গে—ঘরখানি ভরা থাকে রাতের কালোয়।
জানালার কোল থেকে সুরভি ছড়ায় মোর হাসনুহানা,
মনে পড়ে জীবনের কতো কথা, কতো গান, জানা-অজানা ;
মশারির জাল দিয়ে মুখে পড়ে জ্যোছনার জাল,
আকাশের সাদা মেঘ মনে হয় বলাকার পাল ॥

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়—
আকাশের চাঁদ যেন মনে হয় ভেসে চলে বায়।
বিছানার একপাশে ঘুম যায় গৃহিণী আমার
মাঝখানে খোকা শোয়,—তুলতুলে গাল দু'টি ত'ার।
মশারির বাইরেতে ভিড় করে মশকের দল
আকাশের মেঘ বলে চল্ চল্-চল্ চল্-চল্ ॥
বাগিচার পূব-কোণে পেঁপে গাছ ঝাঁকড়া মাথায়
বাঁকা পথ ঘুম যায় আমাদের ঘরের কোণায় ॥

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়—
"মহুয়া"র পাতা খুলে প'ড়ি একা ম্লান জ্যোছনায়।
কবিতার সাথে মোর প্রাণখানি উড়ে চ'লে যায়
মশারির জাল নড়ে উড়ে-যাওয়া রাতের হাওয়ায় ॥
মনে হয়, এ জগতে সব বুঝি স্বপনের কথা
জীবনেতে সুখ নাই, দুঃখ নাই, নাই কোনও ব্যথা ॥
ভাবি সব কিছু নয়, খোকা মিছে, মিছে ওর মাতা—
চোখে ফের ঘুম আসে—উড়ে যায় "মহুয়ার" পাতা ॥

পট ও মঞ্চ

আনন্দ

আমাদের সেই গল্পটা আবার ধরা যাক্।

বাসে চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলাম, এক মোড়ে এক সহযোগী বন্ধু উঠলেন। গাড়ীতে স্থান ছিল যথেষ্ট, পাশাপাশি বসা গেল। যথারীতি কুশল প্রশ্নোত্তরের পর বন্ধু কথা পাড়লেন,

দেখছেন, এবার সনাতনের সব রহস্য ফাঁস ক'রে দিয়েছি? চালাকি? আমার সঙ্গে লাগতে আসা! বুঝলেন, যা ঠাণ্ডা করেছি ভবিষ্যতে আমাদের দিকে আর মুখ তুলে চাইতে হবে না। যত সব Scandal monger!

আমি আর কিছু বুঝি-না-বুঝি এটুকু ঠিক জেনে নিলাম যে এঁরা পরস্পরের প্রতি কাগজে মাঝে মাঝে সৌহৃদ্য দেখালেও সব সময় নখ-দন্ত শান দিয়ে বসে আছেন—কারুর কাছ থেকে একটু শব্দ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন। Co-operation আর জনসেবা পরের কথা, আগে 'শত্রু'র শেষ করতে হবে। কিন্তু আমি পাড়লাম অন্য কথা, জিজ্ঞাসা করলাম,

Herbert Marshall-এর আজ খুব নাম। তা হবেনাই বা কেন? সে হয়েছে গ্রেটা, মার্লিন্ ও নর্মা শিয়ারের নায়ক Painted Veil, Sanghai Express ও Riptide ছবিতে। এই বিলাতি নটের এখন খুব চাহিদা। Marshallকে সম্প্রতি ফ্রেড্রিক মার্চ ও মার্লে ওবেরণের সঙ্গে The Dark Angel ছবিতে দেখা গেছে।

কাল Gowns and Girls-এর শো-তে আসছেন ত'?

ঠিক বলতে পারছি না তবে কোম্পানীর আফিসে যাচ্ছি সেই ব্যবস্থা করবার জন্যে।

ছোট্ট একটু প্রশ্ন করলাম,

আপনি যেচে নেমন্তন্ন নিতে যাচ্ছেন?

একটু ভেবে সহযোগী উত্তর করলেন—

কথাটা অবশ্য আপনি যা বল্লেন তাই কিন্তু আপনারা ত' নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন; একবার ওদের invitation list-এ নাম তুলিয়ে নিয়েছেন—এখন আর ভাবনা কি? প্রত্যেক সংখ্যায় write-up দিন না দিন ওদের শো-তে invitaion আপনার বাঁধাধরা। কিন্তু দেখুন, আমি ওদের গালাগালি দিলে কিছু এসে যাবে না, এতদিন ওদের write-up সে জন্যে দিলাম! এখন গিয়ে বলবো ওদের বিচারের কথা—এতদিন ধ'রে ওদের এত publicity করলাম অথচ আমাকেই কিনা invite করবার নাম নেই। ওদের ছবি দেখবার একটা দাবী আছে ত' আমার?

—ঠিকই, কিন্তু দেখুন এতে আপনার position খাট হয়ে যেতে পারে ত'? সুতরাং পয়সা দিয়ে দেখাই ভাল।

—আর পয়সার কথা বলবেন না মশাই, ক'জন কাগজের মালিক সিনেমার লেখককে পয়সা দিয়ে থাকে? অথচ সম্পাদক ত' কড়া সুরে আদেশ দেন যে খবর্দ্দার পাশ চাইবেন না, আমার কাগজের মান যাবে। মজা দেখুন, লিখবে সিনেমার বিষয় অথচ না দেবে সিনেমার একখানা বই না একখানা টিকেট, উল্টে পাশ ফাস এলে মেরে দেবার চেষ্টা! আর

সুন্দরী মেয়ের সুন্দর নাম—Rosemary Ames। Rosemary হচ্ছে Fox Films এর উদীয়মানা অভিনেত্রীদের এক জন। Such Women are Dangerous ছবিতে শ্রীমতী উদানীন্তন সুন্দর অভিনয় করেছে। তবে, আক্ষেপের হলেও কথাটা সত্যি, Rosemary তার অভিনয়ক্ষমতা দেখাবার বিশেষ সুযোগ পায়নি।

পাশ চাইলেই ছোট হয়ে যাব, এমন কোন কথা নয়।

যুক্তির সারবত্তা মেনে চুপ ক'রে রইলাম। বন্ধু বলে যেতে লাগলেন,

আর আমাদের জার্ণালিষ্টদেরই কাণ্ড দেখুন: Flash Picturesএর 'chief' ভবেশ বাবুর কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কাগজের নাম চাইলে, ভদ্রলোক আমাদের কাগজ আর অপর কয়েকখানা কাগজের নাম স্রেফ বাদ দিলেন কারণ আমাদের নাকি circulation কম। আমার কাগজেরও ত' কয়েকজন ধরাবাঁধা পাঠক আছে মশায়। আমি write-up দিলে তাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও ত' সেই ছবি দেখতো। কেন বাপু, Press Show যখন বলছো তখন সব কাগজওয়ালাদেরই invite কর না! ওই ভবেশ বাবুর জন্যেই আমাদের একটা কোম্পানীর ছবি দেখা বন্ধ হয়ে গেল। আর আমাদের invite না করলে হাজার ভাল হলেও আমরা নিজেরা ত' আর পয়সা দিয়ে ছবি দেখতে পারি না—

মাঝ পথে আমি ঔৎসুক্য প্রকাশ করলাম, আচ্ছা ধরুন, কাল আপনি Gowns and Girls দেখতে গেলেন পাশ নিয়ে কিন্তু ছবিটা সত্যি খারাপ হলে কি লিখবেন?

বাঃ, তা একটু ভাল লিখতে হবে বৈকি? অন্ততঃ খুব প্রশংসা না করি ছবির মন্দ দিকটা চেপে যেতে হবে ত'?

তর্ক তুললাম,

কিন্তু কেন মন্দ দিকটা চেপে যাবেন? এটা আমাদের দেশী ছবি নয়, শিশুশিল্প নয় আর এরা বিজ্ঞাপনও দেয় না।

—তা বললে কি হবে, পাশের একটা খাতির আছে ত? কিন্তু ও কথা ছেড়ে দিন। একটা খুব গোপনীয় কথা বলি আপনাকে, কারুকে বলবেন না যেন।

বন্ধু বাস্তবিকই একটা গোপনীয় কথা বললেন। কিন্তু আর কথা হবার পূর্ব্বেই সহযোগীর গন্তব্য স্থান এসে গেল; নমস্কার জানিয়ে নেমে পড়লেন।

পরের দিন Gowns and Girls দেখতে গেলাম। আপনারা নিশ্চয়ই বিস্মিত হতেন কিন্তু আমি সহযোগীকে সনাতন বাবুর পাশে বসে গল্প করতে দেখে এতটুকু আশ্চর্য্য হইনি। কারণ আমি এদের জানি, জার্ণালিষ্টদের আমি ভাল করেই চিনি। জানি এরা সম্মান ও অর্থ আদায় করবার জন্য কৃপণ ছবিকার ও কাগজের মালিকের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করছে। এ পথে এসেছে ব'লে এরা অবিশ্রান্ত আক্ষেপ করে,

ক্ত সংবাদপত্রসেবা এদের নেশা—অন্য পেশা এরা মরে গলেও অবলম্বন করবে না। এদের যুদ্ধোদ্যম কি জিনিষ আমি ঝি। কাগজে কলমের খোঁচায় যাকে যাকে ছিন্ন ভিন্ন করছে মাজে ও আসরে তাকেই আদর করে পাশে ডেকে বসায়—ন্তর খুলে তারই সঙ্গে আলাপ করে; এরা যেমন অভিমানী তমান সরল।

সেদিন আর পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর পাশে বসা হোল না। ড় কাগজের সমালোচক সুবোধ বাবুর পাশে চেয়ার ালি ছিল দেখে সেটা অধিকার করলাম। কি একটা ারণে ছবি যথাবিজ্ঞাপিত সময়ে দেখানো হয়ে উঠছে া। কথায় কথায় সুবোধ বাবুকে জানালাম যে শ্রীদুর্গা পকচার্স নাকি সংবাদ পত্রের সঙ্গে সংশ্রব রাখবে না ঠিক করেছে। ভদ্রলোক একেবারে ফেটে পড়লেন—

হুঃ, তা ত' রাখবেই না কিন্তু লক্কড় ছবি দেখিয়ে আমাদের ননী বাবু, দেব বাবুর কাছে খাতির জমানো কেন? আমি মশাই যত বলি 'let me do justice o my readers' ততই ভদ্রলোকরা বলেন—তা কি ক'রে হয়, আপনি দেশের industryকে বিশেষ সহানুভূতির চোখে দেখবেন, তা নয় তাদের সম্বন্ধে এম। সব সত্যি কথা বলবেন যে লোকে আর ছবিই দেখতে যাবে না; সমালোচক হলেও দেশী ছবির বেলায় আপনার দাঁড়িপাল্লায় একটু সহানুভূতির পাশান দেবেন ত'—আর মশাই, তার ফলে দেখছেন ত আমায় কি রকম মিথ্যা ঢেকে বাজে কথায় লোক ভোলাতে হয়েছে।

সহযোগী এবার নির্ব্বাপিত চুরুটটা আবার জ্বাললেন। এই ফাঁকে আমি কথা তুললাম, কিন্তু বিজ্ঞাপনের জন্যে এ সব হয়নি ত'?

পাগল হয়েছেন মশাই, আমার কাগজে Advertisement না দিয়ে যাবে কোথায়? যাই হোক, ওখানে উপরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়েছে ব'লে অন্যত্র আমি একেবারে ঠুকে লিখে দিয়েছি।

এখানে আমার একটু অনুযোগ করবার ছিল। বললাম, তা আপনি লিখেছেন, কড়া হলেও সত্যি কথা কিন্তু বিমল বাবু একেবারে ... করেছেন।

কেন করবে না, তার কাগজে Advertise করেনি কেন? বুঝলেন, আমাদের হোল সমালোচনা করা নয়—সোজা কথায় Write-up লেখার চাকরি। আর যে বিজ্ঞাপন দেয় নি তাকে শায়েস্তা ক'রে 'ad' আদায় করবার ঐ একমাত্র পলিসি, সেটা সমালোচনার নামে চালাতে হয়।

ছবি এতক্ষণে আরম্ভ হোল। এই মুখে একটু মন্তব্য

একমাত্র Escapade ছবিতেই Louis Rainerকে দেখা গেছে এবং ঐ ছবিটী যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে Louis Rainer মধুর সারল্যময় চরিত্রচিত্রণে সুদক্ষ। Louis Rainer একেবারে unspoilt, unshopsticated কিন্তু ভারী charming। সম্ভবতঃ The Great Zigfield ছবিতে Rainer উইলিয়াম পাওয়েলের সঙ্গে আবার দেখা দেবে।

সেরে নিলাম,

পরে বিমল বাবু নিজের যা সাফাই গেয়েছেন তা কিন্তু একেবারে ছেলেমানুষের মত।

ছবি শেষ হয়ে গেল। পেটের মধ্যে তখন বুল ডগ লাফাচ্ছে। সুবোধ বাবুকে নিয়ে চায়ের দোকানে ওঠা গেল। প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পেল; আমার পকেটে কিছু না থাকলেও

তাঁর পকেটে যৎকিঞ্চিৎ আছে। বলা বাহুল্য, জার্ণালিষ্টরা সহযোগীদের নিয়ে খেতে বসে পয়সা কড়ির হিসাব দেখে না, উপস্থিত ব্যয়সামর্থ্যের কথা ভাবতে বসে না। আহার ও আলোচনা দুইই চললো। কথাটা আমিই তুললাম,

কিন্তু বড় দিনে বাজার বেশ সরগরম হয়ে উঠছে। নূতন

Chester Morris এত বেশি ছবিতে অভিনয় করেছে যে তাদের সংখ্যা-নির্ণয় করা দুরূহ। বলা বাহুল্য, সুদর্শন হওয়ার ফলেই Chesterএর আকর্ষণ নেই কিন্তু সে যে খুব popular leading man তা অস্বীকার করা যায় না। The Case of Sergeant Grischa, The Big House, The Gay Bride, Public Hero No 1 প্রভৃতি Chester Morris এর স্মরণীয় ছবি। আগামী ছবি Pursuit।

ছবি আর নাটকের ছড়াছড়ি, ছবিঘরও আবার খুলছে। আমার এবার মনে হয় এটা বেশ স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

—হ্যাঁ, স্বাস্থ্যের লক্ষণ না ছাই। থিয়েটারগুলোর কথা আর বলবেন না—কেবল আর্টিষ্ট ভাঙ্গানো আর আর্টিষ্টের পয়সার বাজারে প্ল্যাকার্ড ছাড়া। আমরা যদি বললাম অমুক ষ্টেজে মাতলামি করে সুতরাং তাকে দলে নেওয়া উচিৎ নয়, অমনি থিয়েটারওলারা তাকে লুফে নিলে। আর চলে সব কি ক'রে জানেনই ত'। ভাবছে এই সময় বাইরের লোক এলে কিছু পয়সা পাবে তাই মরিয়া হয়ে খরচ করছে......

এই সাথে আমি আমার মন্তব্য পেশ করলাম,—কিন্তু আশ্চর্য্য দেখুন। সহরেই এদের আস্তানা, যার মানে সহরের লোকের পয়সাতেই এদের খেতে হবে অথচ এরা পুরানো গতানুগতিক জিনিষ দিয়ে সহরের লোকের Patronage চায়। সহরের কাছে যা পুরানো তা বাইরের লোকের কাছে নূতন। সুতরাং তারা পয়সা দিতে পারে কিন্তু আমরা কেন পয়সা খরচ করে পচা তামাসা দেখবো?

বন্ধু আবার ধরলেন,

পোষ্টারে পোষ্টারে বাজার ছেয়ে গেছে। অথচ এই বাজারে কোনও পোষ্টারের স্থায়িত্ব মিনিট পনেরর বেশি নয়। পনর মিনিট বাদেই নয়া পোষ্টার আগের পোষ্টার চাপা দিচ্ছে। কিন্তু আমরা খবরের কাগজ-ওয়ালারা ওদের খবর নেবার জন্য আগ্রহ দেখালেও ওরা free solid publicityর সুবিধা নেবে না। বলে, আমাদের ত' আর মশাই সিনেমা নয় যে রোজ রোজ নূতন খবর দেবো। থিয়েটারে দৌড়াও তবে তাহাদের খবর পাবে।

—কিন্তু এই সব নাটক আর ছবি, আমার ভয় হয়, একান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখা দেবে।

—ভয় হয় কি? আমি বাজি রাখছি এরা অপ্রস্তুত অবস্থাতে দেখা দেবেই। আমি কত বার বলেছি কিছু করবার অন্ততঃ সাতদিন আগে সমালোচকদের একবার দেখিও, তাদের suggestion নিও। সামনা সামনা কিছু না বললেও, কর্ত্তারা জানান যে ভুঁইফোড় সমালোচকরা আবার জানে কি! Opening nightএ সমালোচকদের বাচ বিচার করে invite করে, আর সমালোচকরা দোষ কিছু দেখালেই চটে লাল হয়ে যায়। কেন দাদা, আগে থাকতে এদের দেখিয়ে suggestion নিলে ...

অনুযায়ী কাজ কর আর না কর এদের মুখ বন্ধ করতে পারবে ত'।

আমার মুখ তখন বন্ধই ছিল, একটু বাদে খুললাম— কিন্তু দেখবেন সুবোধ বাবু, বিদেশী distributorরা সব lunch dinner টিনার দিয়ে খুব জমাবার চেষ্টা করছে, জমে যাবেন না যেন।

—সে কথা পরে বলছি কিন্তু criticদের ওপর পাঠকদের faith আছে ত'?

Ralph Lynnকে Tom Walls ছাড়া ভাবতেই পারা যায় না কারণ এরা দুজনে বিলাতের সব চেয়ে জনপ্রিয় Comedy team। অনেক ছবিতেই Ralphএর কাণ্ড কারখানা দেখে হেসে খান খান হয়েছেন; অতঃপর Stormy Weather ও Foreign Affairs দেখেও হাসবেন।

—সিনেমার মালিকরা বলে ত' নেই আর সেই জন্যেই বলছে তারা News paperএর সঙ্গে Co-operate করবে না। কিন্তু আমি ভাবি ওরা যদি মনেই করে readerদের আমাদের ওপর faith নেই তবে কেন আমরা ওদের দোষ দেখালে ওরা চটে যায় আর কেনই বা আপনার কাগজের

ওঃ, কি নিষ্ঠুরের কাজ! কিন্তু এতে বলবার কিছু নেই কারণ First a Girl ছবিতে অভিনয় করবার জন্য Jessie Mathewsকে ছোট ক'রে চুল কাটতেই হবে—প্রযোজকের আদেশ, তা ষ্টুডিয়োর নাপিত অমান্য ক'রে কি ক'রে! এই সুন্দরী তরুণীটি কেন যে লোক হাসাবার জন্য আধা comical আধা musical ছবিতে নামে তা অনেকেরই বিচিত্র মনে হয়; কিন্তু এক্ষেত্রেও চিত্রপ্রিয়দের করবার কিছু নেই।

কর্ত্তাদের কাছে বেশ একটু ভাল write-upএর জন্যে আসে!

আহার পূর্ব্বেই শেষ হয়েছিল। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে নিজে উঠে বন্ধু আমায় তুললেন। পথে নেমে আর একটি চরুটে অগ্নি সংযোগ ক'রে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,

হাঁ, বিদেশী distributorরা খাতির জমাবার চেষ্টা করছে কিন্তু তারা আমাদের মর্য্যাদা বুঝতে পেরে আমাদের কাছে আসছে না—নিজেদের মধ্যে রেষারেষির ফলে নানা উপকরণ দিয়ে আমাদের হাতে রাখবার বা দলে টানবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের কিসের সম্বন্ধ...

আমি চলি মশাই, বাস এসে গেল।

ভদ্রলোক বাসে উঠলেন। পথে চলতে আমার হাসি পাচ্ছিল: হায় রে দেশের পীঠ ও পটের উন্নতি-কামী লেখক!

ভাবী কাল

পূর্ব্বে আমরা 'বিচিত্রা'য় একাধিক বার ভারতের এবং বিশেষতঃ বাংলা দেশের ছায়াশিল্পে বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের কথা বলেছি। বহুবার আমরা ইঙ্গিত করেছি যে ছায়াশিল্পে বাঙালীর ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ ব'লে মনে হয় না। বাংলার ধনিকসম্প্রদায় চিত্রশিল্পে টাকা খাটানোকে বিপজ্জনক মনে করে—প্রায় বিনা সুদে ধনী বাঙালীর অর্থ সরকারি তহবিলে জমা আছে। দু একজন বাঙালী যাঁরা চিত্রশিল্পে অর্থনিয়োগ করেছেন তাঁরা আশাতীত অর্থ ও সাফল্য লাভ করেছেন। আজ অনেক ফিল্ম কোম্পানীই গড়ে উঠেছে; তাদের উৎসাহ আছে কিন্তু তাদের আশানুরূপ অর্থবল নেই। অবাঙালী ব্যবসায়ী এই লাভের ব্যবসায়ে উঠে পড়ে লেগে গেছে। লজ্জার কথা, দুঃখের কথা কিন্তু কথাটা সত্য যে বাংলা দেশে মোটের ওপর অবাঙালীর চিত্রব্যবসায় বাঙালীর চিত্রব্যবসায়ের থেকে অধিকতর প্রসার লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠাটা বাঙালীর Quality Pictures এরই কিন্তু অবাঙালীরা ব্যবসা করতে বসেছে, তারা টাকা ফেলছে আর 'বই' তুলছে—Qualityর ধার দিয়ে না গিয়েও তারা Quantityতে মেরে দিয়েছে। বাঙালীর চিত্রপ্রতিষ্ঠান যখন স্বল্পসংখ্যক তখন বাধ্য হয়ে গুণী বাঙালীকে অবাঙালীর কাছে যেতে হচ্ছে। (অবশ্য নির্গুণ বাঙালীও অবাঙালীদের আখড়ায় নিজেদের সখ মিটিয়ে

নিচ্ছে)। বাঙলা দেশে অবাঙালীর ছবিঘরের সংখ্যা, ছবির সংখ্যা দিন দিন ভয়াবহরকম বেড়ে উঠছে। বাইরের অমিতবলশালী প্রতিদ্বন্দ্বীও বাংলার মাটীতে আস্তানা গেড়েছে; তারা সিনেমা চালাচ্ছে, ছবিঘর করছে এবং ছবিও করবে বলছে। বাঙালী চুপ করে থাকলেও অবাঙ্গালী শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ইংরাজি চিত্ররূপ দিতে মনস্থ করেছে। বিদেশীরা ছবি তুললে দেশী শিল্পের অশেষ ক্ষতি হবে। এমতাবস্থায় সরকারি সাহায্য প্রয়োজন; সরকারের উচিৎ বিদেশীদের

Conrad Veidtএর বিলাতের চিত্রশিল্প যে কতখানি ঋণী তা যাঁরা Veidtকে দেখেছেন তাঁরাই জানেন। এবার King of the Damned ও Passing of the Third Floor Back ছবিতে Veidt এর অভিনয়নৈপুণ্যের পরিচয় পাবেন।

ছবি তুলতে না দেওয়া। কিন্তু সে অনেক দূরের কথা। ঘরে বাইরে প্রতিযোগীর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত শক্তি বাঙ্গালীর চিত্রশিল্পের নেই। বাস্তবিক, সবে মিলে ভাবী কালকে বাঙ্গালীর পক্ষে ভয়াবহ করে তুলছে।

চিত্রপরিচয়

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ অবধি যতগুলি ছবি মুক্তি লাভ করেছে নীচে তাদের পরিচয় দেওয়া হোল। কতকগুলি ছবির বিশদ পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই; আমরা তাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে শ্রেণী বিভাগ ক'রে দিলাম। পাঠক-বর্গের, আশা করি, মনে আছে: আমাদের মতে (ক) শ্রেণীর ছবি অসাধারণ, (খ) সুন্দর, (গ) উপভোগ্য এবং (ঘ) শ্রেণীর ছবি সাধারণ। 'ছ' চিহ্নিত ছবিগুলি ছেলেরাও দেখতে পারে। আলোচ্য কালের মধ্যে একখানিও বাংলা ছবি মুক্তি লাভ করেনি।

এ মিডসামার নাইটস্ ড্রিম (ক)—এত দিন বাদে বিখ্যাত প্রযোজক ম্যাক্স রেন্‌হার্ডটের হাতের কাজ দেখার সৌভাগ্য আমাদের হোল। ছবিটীর অপর প্রযোজকের নাম উইলিয়াম দিয়াত্রিলে। বাস্তবিক সেক্সপীয়ারের নাটকের এই চিত্ররূপ কলাকৌশল ও চিত্রগ্রহণের দিক থেকে বিদ্রোহের সূচনা করেছে। এমন চমৎকার ফটোগ্রাফি, এমন অনুপম ও অভিনব টেকনিক পূর্ব্বে আর কোনো ছবিতেই দেখা যায়নি। ম্যাক্স ষ্টেজ-টেকনিকের আশ্রয় নিয়েছেন আবার ফিল্মের কলা-কৌশলও তার সাথে চমৎকার চালিয়েছেন—এই দ্বিবিধ টেক-নিকের সংমিশ্রণের ফলে যে ছবি তৈরি হয়েছে তাকে এ বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি বলা যায়। তার পরেই আসছে ফেলিক্স ম্যাণ্ডেল্‌সনের সুরসংযোজনা যা প্রথমে অদ্ভুত ও বিচিত্র ঠেকে কিন্তু শেষে বোঝা যায় তা কত সুন্দর ও সংঘাত-ময়। সেক্সপীয়ারের নাটক আগাগোড়া মঞ্চের জন্য। সুতরাং অভিনয় হওয়া উচিৎ মঞ্চোপযোগী যা আবার চলচ্চিত্রে দোষাবহ; কিন্তু গুণী লোকের হাতে পড়লে মঞ্চচল অভিনয়ও চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। ম্যাক্সের ছাত্রী মঞ্চনটী অলিভিয়া ডি হাভিলাণ্ড এই ছবিতে চমৎকার মঞ্চাভিনয় করেছে—অবশ্য মাঝে মাঝে তা ধরা যায়। কিন্তু জেমস্ ক্যাগনি আমাদের একেবারে স্তম্ভিত করেছে। ক্যাগনি তার আমেরিকান উচ্চারণ ভুলেছে—বটম্-এর ভূমিকায় নিখুঁত সেক্সপীরিয়ান্ অভিনয় করেছে অথচ আশ্চর্য্যজনক-ভাবে তার নিজস্ব চাল ষোল আনা বজায় রেখেছে। ছবিতে ক্যাগনিই করেছে সেরা অভিনয়। তার পরেই আসে পাক-এর ভূমিকাভিনেতা বালক মিকিরুণি এবং ক্রমান্বয়ে য়্যানিটা লুই, জীন্ মুর, ভিক্টর জোরি, ফ্রাঙ্ক ম্যাকহিউ, আয়ান্ হাণ্টার প্রভৃতি। ডিক্ পাওয়েল, জো ই ব্রাউন, হিউ হার্বার্ট কিন্তু হাল্কা হলিউডের অভিনয় করেছে। তাদের ভূমিকাগুলিও হাল্কারসের কিন্তু সেগুলি সেক্সপীরিয়ান্, এ কথা ভুললে চলবে না।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে ম্যাক্স রেন্‌হার্ডট্ জার্ম্মাণ হলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেক্সপীরিয়ান্ প্রডিউসার; ম্যাক্সের পরবর্ত্তী ছবি 'টুয়েল্‌ফ্‌থ্ নাইট' ছবিটী করতে অত্যাধিক অর্থব্যয় হয়েছে এবং ছবিটী কোথাও রঙ্গীন নয়। তবে সিনেমার মালিক চার দিনের জন্য Pre-release showing হবে Stunt দিয়ে কিছু বেশি টাকা পেয়েছে; কারণ ছবিটী চলেছে দু সপ্তাহ।

কার্লি টপ্ (ক) ও (ছ)

এই হচ্ছে সার্লি টেম্পলের অষ্টম ও শ্রেষ্ঠ ছবি। 'আওয়ার লিটল্ গার্ল' দেখে আমাদের মনে যে ভাবনা ধরে-ছিল 'কার্লি টপ্', দেখে তা অন্তর্হিত হয় নি। আমরা ভাবছি সার্লি আর কত কাল চলবে। 'আওয়ার লিটল্ গার্লে' সার্লির পাকামি দেখে বাস্তবিক আমাদের ভয় হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সে পাকামি করেনি কিন্তু এ কথা আমাদের বার বার মনে হয়েছে যে সার্লি অত্যন্ত Tuped হয়ে পড়ছে। ছবির গল্প একেবারে Daddy long-legs—কেবল অতিরিক্ত এসেছে সার্লির ভূমিকা। সার্লির Personality নেই—থাকতেই পারে না—সুতরাং তার আকর্ষণ দিন দিন কমে যাবে। আবার 'আওয়ার লিটল্ গার্লের মত যদি দু একখানা ছবি করে তবে সার্লিকে লোকে দেখতে যাবে অনেক দ্বিধার পর। এমতাবস্থায় একমাত্র উপায় হচ্ছে সার্লিকে উৎকৃষ্টতর গল্পে নামানো—

গল্পের আকর্ষণে মিষ্ট মেয়েটির আকর্ষণ প্রবলতর হবে ; এবং সার্লির সব চেয়ে উপযোগী গল্প হচ্ছে মেরি পিকফোর্ডের নির্ব্বাক্ ছবির গল্পগুলি। আশার কথা সার্লি সেই সব গল্পেরই সবাকরূপে নামছে। 'কার্লি টপ'এ সার্লিকে অবর্ণনীয় রকম ভাল লেগেছে—তার নাচ, গান, অভিনয় হাসি আমাদের অতুল আনন্দ দিয়েছে। জন্ বোল্স্ রচেল হাড্‌সন ও অপরাপর সকলেও যথাযোগ্য অভিনয় করেছে। আর্ভিং কামিংস ছবিটীর প্রয়োগশিল্পী।

স্কেপেড্ (খ)

এক কালে Maskerade নামে একটী জার্ম্মাণ ছবি প্রায় এক বৎসর কাল একটী সহরে অবিশ্রান্ত চলে। আমাদের এই 'স্কেপেড' হচ্ছে সেই জার্ম্মাণ ছবির আমেরিকান রূপ। সুমধুর একটী প্রেমের কাহিনী, হাস্যরসে সমুজ্জল, সুরে সুন্দর। ছবিটীর মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় লুই রেণারের Charming অভিনয়। ছবির ঘটনাস্থল ভিয়েনারই ষ্টেজের মেয়ে লুই ম্যাক্স রেন্‌হার্ডটের ছাত্রী। লুইয়ের মাঝে এমন একটা সুন্দর সারল্যের পরিচয় পাওয়া যায় যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। লুই অভিনয় করেনি, সে সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি জীবন্ত লিওপোল্ডিন্। ছবির নায়ক উইলিয়াম পাওয়েলের সু-অভিনয়ের সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। রেজিনাও ওয়েন্, ফ্রাঙ্ক মর্গান্ ভার্জ্জিনিয়া ব্রুস্, মেডি ক্রিশ্চিয়ান্স প্রভৃতি রবার্ট জেড্ লিওনার্ড প্রযোজিত এই ছবিতে ভাল অভিনয় করেছে।

পেজ্ মিস্ গ্লোরি (খ)

মেরিয়ান্ ডেভিস্‌কে বহু কাল বাদে দেখে খুব খুসী হলাম। হলিউডের এই শ্রেষ্ঠা ধনিকা রাগ করে মেট্রো ছেড়ে ওয়ার্ণার ব্রাদার্সে যোগ দেয়। মেরিয়ানের কস্মোপলিটান্ প্রডাকসন্স এর মধ্যে ওয়ার্ণারে অনেকগুলি ভাল ছবি তুলেছে—মেরিয়ান্‌কে পেয়ে যে ওয়ার্ণার লাভবান্ হয়েছে তা না বললেও চলে। 'পেজ মিস্ গ্লোরি'র গল্পটী বাজে তবে সুপ্রচুর হাস্যরস থাকায় তার দৌর্ব্বল্য অনিষ্টকর নয় এবং মেরিয়ানের পক্ষে গল্পটী বিশেষ উপযুক্ত। প্যাট্ ওব্রায়েন্, ফ্রাঙ্ক ম্যাক্‌হিউ, মেরি য়্যাষ্টর প্রভৃতি এই ছবিতে সুন্দর অভিনয় করেছে। ডিক্ পাওয়েল ও লাইল্ ট্যাল্‌বটের ভূমিকা দুটীতে কিছুই নেই। প্রযোজনা করেছেন মার্ভিন্ লিরয়।

অন্ উইংস অব্ সং (খ)

গ্রেস্ মুরের দ্বিতীয় ছবি। গ্রেস মুর এর পূর্ব্বেও মেট্রোর হয়ে New Moon, The Prodigal প্রভৃতি কয়েক খানা ছবি করেছে কিন্তু কলম্বিয়াই জগৎসমক্ষে প্রকাশ করেছে গ্রেস্ মুরের প্রকৃত মূল্য 'ওয়ান নাইট্ অব্ লাভ্' দিয়ে। সঙ্গীতাত্মক ছবির সেরা গল্প আমার মনে হয় 'ওয়ান্ নাইট অব লাভ'—যেমন সরল তেমনি ভাবগভীর। এ ক্ষেত্রে গল্পটী কিছু ঘোরাল ও 'নাটুকে'। লিও ক্যারিলো, মাইকেল বার্টলেট, রবার্ট য়্যালেন্ প্রভৃতির সু-অভিনয়ের প্রশংসা করি কিন্তু সব চেয়ে বেশি সাধুবাদ জানাই প্রযোজক ভিক্টর সার জিন্‌জার ও গ্রেস্ মুরকে। ভিক্টর প্রথমে গীতিরচয়িতা ছিলেন ; তাঁর হাতে গীতিপ্রধান ছবির নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত চমৎকার ফুটে ওঠে—তাঁর প্রযোজনার মাঝে মেলে কবিজনোচিত সৌন্দর্য্যপিপাসার পরিচয়। এই ছবির সেরা গান 'লাভ মি ফর এভার' তাঁরই লেখা। গ্রেস্ মুরের অভিনয় করবার, গান গাইবার ভঙ্গীতে এতটুকু চেষ্টা বা কষ্টের পরিচয় নেই। গ্রেস মুরের গান যে কি অপূর্ব্ব সুন্দর তা যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই জানেন।

হার্টস ডিজায়ার (খ) ও (ছ)

গায়কপ্রবর রিচার্ড ট্যবর হচ্ছেন আর এক জন যাঁর গান বা অভিনয়ের মাঝে কোথাও সামান্য effort নেই। 'ব্লসম্ টাইম্' এ ট্যবরের ভরাট দরদী গলা আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিল কিন্তু এই ছবিতে তাঁর অভিনয় হয়েছে উন্নততর, গান সুন্দরতর ; গল্প হয়েছে মর্ম্মস্পর্শী এবং পল্ এল্ ষ্টেনের প্রযোজনা হয়েছে সুষ্ঠু। ছলনাময়ী এক সুন্দরী নারী ও তার প্রেমাস্পদের স্বপ্নকে সফল করে যখন ট্যবর সুন্দরীর কাছ থেকে স্মরণীয় কিছুই পেলেন না তখন দর্শকের অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়ে ওঠে। যাক্, ছবিটী 'ব্লসম্ টাইমে'র করুণ রসে সমাপ্ত হয়নি শেষ পর্য্যন্ত।

বোনি স্কট্‌ল্যাণ্ড (খ) ও (ছ)

ষ্ট্যান্ লরেল্ ও অলিভার হার্ডির শ্রেষ্ঠ ছবি। ছবিটী হাসির ঘটনাতে বোঝাই তবে ঘটনাগুলির যোগসূত্র ক্ষীণ। অতএব দেখা যাচ্ছে অলি-ষ্ট্যানির পক্ষে বড় ছবি করা খুব সুবিধার নয় কারণ তাতে একঘেয়েমি আসবার বিশেষ সম্ভাবনা—এ ক্ষেত্রে না হয় মাণিকজোড়কে অর্দ্ধেক পৃথিবী ঘুরিয়ে একঘেয়েমির হাত এড়ান গেছে! সীমান্ত প্রদেশে যে

হারেমের দৃশ্য দেখানো হয়েছে তা বাস্তবতঃ স্বপ্নের বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষ নিয়ে যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে কিছু প্রতিবাদের বিষয় আছে। যাই হোক, ছবিটী এ বছরের সেরা হাসির ছবি।

দান্তেজ্ ইন্ফার্ণো (গ)

বিরাট ছবি কিন্তু প্রথম শ্রেণীর নয় কেন তাই বলি। গল্প প্রথম দিকে যেমন দ্রুত অগ্রসর হয়েছে শেষের দিকে আবার তেমনি জটিল ও মন্থর হয়ে পড়েছে, ছবির শ্রেষ্ঠ দৃশ্য-গুলি—নরকের ভয়াবহ সবদৃশ্য—ছবির মাঝখানে এসে পড়ায় ছবির শেষাংশের আকর্ষণ খুবই কমে গেছে আর ছবির শেষে জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য এত টেনে বাড়ানো হয়েছে যে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। কিন্তু এ সবেও বিশেষ কিছু এসে যেত না যদি ছবির মিউজিক হোত যথাযোগ্য—সুরসংযোজনা আদৌ অনুকূল নয়। স্পেন্সার ট্রেসি ও ক্লেয়ার ট্রেভর খুব চমৎকার অভিনয় করছে, হেন্‌রি বি ওয়াল্টহলের অভিনয়ও ভাল। নরকের দৃশ্যগুলিতে টেক্‌নিক্ ও ফটোগ্রাফির বিশেষ বাহাদুরি দেখা গেল আর পাওয়া গেল প্রযোজক হ্যারি ল্যাচম্যানের সৃষ্টিশক্তির পরিচয়। কল্পনাটা দান্তের।

(গ) শ্রেণীর অন্যান্য ছবি:—ডায়মণ্ড জিম্ (ছ) (ঘটনাগুলি স্বয়ংপ্রধান—সংযোগসূত্র নেই, এড্‌ওয়ার্ড আর্ণল্ডের সু-অভিনয়), ব্রেক্ অব্ হার্টস্ (বাজে গল্প, ক্যাথরিন্ হেপ্‌বার্ণের সু-অভিনয় ও সামান্য অতি-অভিনয়, সুন্দর সুর), ষ্টার অব মিড্‌নাইট (বাজে গল্প, উইলিয়াম্ পাওয়েলের সু-অভিনয়), দি ক্রুজেড্‌স্ (ছ) (সিসিল্ বি ডিমিল্ যথাপূর্ব্ব জাঁকজমকের দিকে এত নজর দিয়েছে, যে নাটকীয় রস ঘন হয়ে উঠতে পারে নি, ছবিটী বেশ দ্রুত, গল্পেও জটিলতা নেই, অভিনয় চিত্রোপযোগী), মি য়্যাণ্ড ম্যাল্‌বোরো (ছ) (adventure ও comedy ভাল মিশ খায়নি, ছবির গতি মন্থর, যথেষ্ট হাসির খোরাক আছে), ষ্ট্রাণ্ডেড্ ও দি গুজ এণ্ড দি গ্যাণ্ডার (কে ফ্রান্সিস ও জর্জ্জ ব্রেণ্টের সু-অভিনয়; প্রথমটী নাটক, দ্বিতীয়টী হাস্যরস প্রধান ছবি), য়্যানাপলিস্ ফেয়ারওয়েল (ছ) (বাজে গল্প কিন্তু তরুণ মনের পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যকর ছবি), জিন্‌জার (ছ) (সুন্দর গল্প, ছোট মেয়ে জেন্ উইদার্সের চমৎকার অভিনয়), লেগং (বালি দ্বীপের লোকদের নিয়ে তোলা সেখানেরই এক করুণ কাহিনী, রঙীন ছবি)।

নিম্নলিখিত ছবিগুলি (ঘ) শ্রেণীর দি ট্রায়াম্ফ অব সার্লক্ হোমস্, এভ্রি নাইট্ এট্ নাইট্, রেড হট্ টায়ার্য, মিনেস্ (ছ), ওম্যান্ ওয়ান্টেড্, হুরে ফর লাভ, এলিনর নর্টন্, দি ল্যাড্; দি লাষ্ট রাউণ্ড আপ্ (ছ) টেন ডলার রেইজ, ডিভাইন স্পার্ক।

এই ছবিগুলি সাধারণ পর্য্যায়েরও নীচে:—
দি ম্যান অন দি ফ্লাইং ট্র্যাপিজ (ছ), য়্যাডমিরালস্ অল্ টু হার্টস্ ইন ওয়াল্‌জ টাইম্।

শ্রীযুক্ত 'বিচিত্রা' সম্পাদক

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অগ্রহায়ণের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ পড়লাম। দীনেশ বাবুর পূর্ব্ব প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর স্বরূপ যা বলেছিলাম তা তিনি কিছুই হয়নি ব'লে এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছেন এবং তার পর আমায় ব্যক্তিগত আক্রমণ ক'রে গেছেন। এবারেও আমি 'পট ও মঞ্চে'র মধ্যে দীনেশ বাবুর প্রতিবাদের উত্তর দিতে পারতাম কিন্তু তা হলে আমাকে কয়েক মাস পূর্ব্বের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত আমার প্রত্যুত্তরের যুক্তিযুক্ততা ও সারবত্তা প্রমাণ করতে 'বিচিত্রা'র অনেকগুলি পৃষ্ঠা বাজে খরচ করতে হয়। সব চেয়ে আনন্দের কথা এই যে ভদ্রলোক আমায় এবারের মত 'সাবধান ক'রে ছেড়ে দিতে চাইছেন'। নারী ও পুরুষের সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে মতামতটা আমার নিজস্ব এবং তার ঘরোয়া মজলিসেই স্থান। সাহিত্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমার আদৌ অভিপ্রেত ছিলনা কিন্তু প্রতিবাদকারী সেটা 'বিচিত্রা'য় টেনে এনেছেন—সাহিত্য নিয়ে মারামারি করতে আমি চাই না, মেয়েদের লেখা গল্পের নাট্যরূপ নিয়েই আলোচনা ক'রে-ছিলাম। আমি বলেছিলাম এবং এখনও বলি যে নাট্যরূপ-দাতার মুন্সীয়ানা না থাকলে স্ত্রীলোকের লেখা গল্প রঙ্গমঞ্চে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতো না।

পত্রকে দীর্ঘতর করবার ইচ্ছা নেই, কিন্তু প্রতিবাদকারী আমার সব কথা ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ দ্বারা নিজের অসমর্থনীয় মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছেন দেখে দুঃখ অনুভব করছি। নমস্কার জানবেন। ইতি ১০ই ডিসেম্বর ১৯৩৫।

বিনীত
'আনন্দ'

অতঃপর এ বিষয়ে বাদানুবাদ প্রকাশিত করা হবে না। বিঃ সঃ।

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী এম্-এ

ক্রিকেট ঃ

বোম্বে কোয়াড্রাঙ্গুলার টুর্ণামেণ্ট

গত বৎসরের ন্যায় এবারও বোম্বের বিখ্যাত কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতায় হিন্দু বনাম পার্শী এবং মোসলেম বনাম ইউরোপিয়ান দলের খেলা হয়। প্রথম ম্যাচে মোসলেম দলের ক্যাপ্টেন ওয়াজির আলি টস্ জিতে ব্যাট করতে নাবেন। ইউরোপিয়ান দলের ভাল খেলা সত্ত্বেও প্রথম ইনিংসে মোসলেম দলের স্কোর হয় ৩৫৭। কাদরি সুন্দর খেলে ৮৪ রান করেন। মুস্তাফ আলি নির্ভয়ে প্রত্যেক বলটি মেরে মোসলেম দলের গোড়া পত্তন করেন। কিন্তু ওয়াজির আলির যোগ দিবার পরই খেলার গতি গেল বদলে। ইউরোপিয়ানদের নামজাদা বোলারদের অক্ষমতা তখন বার বার সকলের চোখে ধরা পড়ছে। অদ্ভুত ক্রীড়াকৌশলের পরিচয় দিয়ে ওয়াজির আলি ১৪০ রান করে নট আউট হয়ে থাকেন।

ইউরোপিয়ানদের প্রথম ইনিংসে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল। প্রথম ৪ উইকেট তাসের ঘরের মত মাত্র ২০ রানে আউট হয়ে যায়, এতেই এদের ভবিষ্যৎ ফলাফল অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেল। সুদক্ষ হপকিংস ৫৩ রান করে কিছুক্ষণের জন্য টীমটাকে দাঁড় করিয়েছিলেন। তারপর ১৫০ রানে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। বিজয়ী মোসলেম দলের ২০০ রান পেছিয়ে থাকতে বাধ্য হয়ে ইউরোপিয়ানদের 'ফলো' করতে হল। দ্বিতীয় ইনিংসে পাতিয়ালার খেলোয়াড় ওয়ার্ণ ২৩ রান করেন। তার পরই ভাগ্যবিপর্য্যয় হল। ক্লান্ত ইউরোপিয়ান দল মাত্র ১০৩ রান করে এক্ ইনিংসে পরাজিত হয়ে বিষণ্ন মনে মাঠ থেকে বিদায় নিলেন।

বিপুল জনতার সামনে হিন্দু বনাম পার্শী খেলা আরম্ভ হয়। এবার হিন্দু দলে কে বসু ও এস্ ব্যানার্জী নির্ব্বাচিত হওয়াতে এতদিন পর বাংলার ক্রীড়ামোদীদের যথার্থ সম্মান দেওয়া হয়েছে দেখে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছে। খেলা আরম্ভ

বোম্বে কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট ম্যাচ-এ ইউরোপীয় দল মেহোমেডানদের বিরুদ্ধে 'ফীল্ড' করতে চলেছেন।
(উপরে প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাপ্টেন ওয়াজির আলী এবং টি, সি, লংফিল্ড)

হবার পর মাত্র ৪ রানে কে বসু ও হিন্দেলকার আউট হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন নাইডু, মার্চ্চাণ্ট ও অমর নাথই তখন একমাত্র

বম্বে কোয়াড্রাঙ্গুলার টুর্ণামেণ্ট ম্যাচ-এ এইচ, জে, ওয়াজিফদার (পার্শিদের) এবং ম্যাজর সি, কে, নাইডু (হিন্দুদের) ক্যাপ্টেনদ্বয়

আশা ভরসা। নামজাদা পার্শী বোলারদের আক্রমণ ব্যর্থ করে মার্চ্চাণ্ট ৭০ রান এবং নানাপ্রকার ক্রীয়াদক্ষতার পরিচয় দিয়ে ক্যাপ্টেন সি, কে নাইডু সেঞ্চুরী করেন। একমাত্র সি, এস, নাইডুর ৩৪ রান ছাড়া অবশিষ্ট খেলোয়াড়দের খেলা তেমন চমকপ্রদ হয় নি। প্রথম ইনিংসে মোট স্কোর হল ২৮১। ইহার প্রত্যুত্তরে পার্শীদল ২২৪ রান করেন। আলিয়ার ৪৩, পালসেটিয়ার ৩৫, ও খোটার ৩৪ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিজয়ী মেহোমেডান দল
ইহারা কোয়াড্রাঙ্গুলায় ক্রিকেট টুর্ণামেণ্ট-এর প্রথম ম্যাচ্-এ ইউরোপীয়ানদিগকে এক ইনিংস্ এবং ১০৬ রাণে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে হিন্দুদের প্রথম তিন উইকেট অতি অল্পক্ষণে আউট হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন নাইডু ও অমরনাথ আবার টীমটীকে দাঁড় করান। অমরনাথের খেলা খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। রান করেন ৬৫। তারপর ৮ উইকেটে লালসিংহ ও মার্চ্চাণ্ট এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি করলেন। পার্শী বোলারদের বিপদজ্জনক বোলিংএর বিরুদ্ধে লালসিংহ ১৫০ মিনিটে ১০৭ রান করে নট আউট হন। পার্শীদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা তখন সব ভেঙ্গে চুরে গেছে। হিন্দুদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৭ উইকেটে ১৫২ উচ্চ রান ডিঙ্গিয়ে পার্শীদের জয়ী হতে হাতে সময় ছিল অতি অল্প। দ্বিতীয় ইনিংসে পার্শীদের ৪ উই-কেটে ১১০ রান হয়। খেলা অমিমাংসিতভাবে থাকে। প্রথম ইনিংসের ফলাফলের জোরে হিন্দুরা ফাইনালে গেল।

ফাইনালে হিন্দু ও মোসলেম দলের খেলা দেখবার জন্য মাঠে ভীড় হয়েছিল ভীষণ। পার্শীদলের বিরুদ্ধে হিন্দুদের খেলার ফলাফল তেমন সন্তোষজনক না হওয়াতে টিমের পরিবর্ত্তন দেখা গেল। বাংলার কে বসু ও এস বানার্জ্জী বাদ গেলেন। দুঃখের বিষয় উভয়েই তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। মার্চ্চাণ্ট আগের খেলায় হাতে আঘাত পেয়ে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। হিন্দু দল সত্যিই দুর্ব্বল হয়ে গেল। টস জিততে মোসলেম দল ব্যাট করতে নাবেন। মুস্তাফ আলি ও গেদার হিন্দু বোলারদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রানের পর

রান তুলতে লাগলেন। জলযোগের পর খেলার বিপর্য্যয় ঘটল। ওয়াজের আলি ৬৪ রানে আউট হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে কাদির ও নাজির আলি মাঠ থেকে বিদায় নেন। মোসলেম দলেরও ৫ উইকেটে মাত্র ১২০ রান হয়েছে।

এতবড় সুবর্ণ সুযোগ হিন্দুদের মাঠে মারা গেল। হিন্দুদের উল্লাস ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে এল। হোসেন ও বাপোরিয়ার খেলার জোরে মোসলেম দলের ভাগ্য ফিরে গেল। হোসেন ৭২ ও বাপোরিয়া ৬৪ রান করেন। প্রথম ইনিংসে সর্ব্বশুদ্ধ রান হল ২৯৭। ৮ উইকেট ৯৭ রান দিয়ে বোলার সি, এস, নাইডু দর্শকদের নিকট বিপুল অভিনন্দন লাভ করেন। হিন্দুদের প্রথম ইনিংসে স্কোর হল ২৮৮। ক্যাপ্টেন নাইডু সেঞ্চুরী রান করে এক গভীর চাঞ্চল্য উপস্থিত করেন। হিন্দুদের জয় হবার আশা একটু বেড়ে গেল।

দ্বিতীয় ইনিংসে মোসলেম দল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে খেলতে নাবলেন। প্রত্যেক ব্যাটম্যানই হিন্দুদের বার বার আক্রমণ ব্যর্থ করলেন। ওয়াজের আলি ১০৮ রান করে নাইডুর সেঞ্চুরীর যথার্থ উত্তর দিলেন। খেলার সবচেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা যে দুই দলের কাপ্তেনই সেঞ্চুরী রান করে নিজেদের

এইচ, আয়রণমঙ্গার

ফেরিসের পর ইনিই অষ্ট্রেরিয়ার সর্ব্বোত্তম লেফটহ্যাণ্ড বোলার। ব্যাটসম্যানগিরিতে এবং ফীল্ডসম্যানগিরিতে ইঁহার দক্ষতা কিন্তু অতি সামান্য।

যোগ্য পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাজির আলিও পেছিয়ে রইলেন না। ইনিও একশতের অধিক রান করেন। তখন মোসলেম প্যাভিলন হতে এক বিজয়উল্লাস সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুদের আশা তখন প্রায় নিস্তেজ

সি, জি, ম্যাকার্টনী

ইনি নিখিল-জগতে 'গভর্ণর জেনারেল' বলিয়া পরিচিত। অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বোত্তম ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ইনি অন্যতম।

হয়ে এসেছে, কোন মতে ড্র করে পরাজয়ের হাত হতে বাঁচবার সময় ছিল কিন্তু ভগবান বাদ সাধলেন। মোসলেম দল ৭ উইকেটে ৩৫৭ রান ডিক্লেয়ার করেন। এই দীর্ঘ রানের বিরুদ্ধে হিন্দুরা খেলতে নাবলেন। একা ক্যাপ্টেন নাইডু ৪৩ হিণ্ডেলকার ৫১ রানের পর অবশিষ্ট খেলোয়াড়রা কোয়াড্রাঙ্গু-লার ফাইন্যাল গেমে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করতে বদ্ধ-পরিকর হলেন।

চা পানের পর মারাত্মক মোসলেম বোলারের বিরুদ্ধে আর কেউ দাঁড়াতে পারলেন না। নিসার, মবারক আলি ও আমির এলাহির কার্য্যকারিতায় খেলাটী বিশেষ উত্তেজনা পূর্ণ হল। বিশ মিনিট বাকি, তখনও তিন জন হিন্দু ব্যাটকে আউট করতে হবে। বিষণ্ণ ভগ্নোৎসাহ মনে দিবাকর ও গোদাম্বে খেলতে নাবলেন। প্রবল জর হওয়ায় সি, এস,

নাইডু খেললেন না। অতি নির্জ্জীবের মত দিবাকর ও গোদাম্বে আউট হতে মোসলেম দল ২১১ রানে জয়ী হলেন। গত বছরও এমন নিদারুন পরাজয় হিন্দুদের স্বীকার করতে হয়েছিল !

এল, হেক (L Hecht)

চেকোস্লোভোকিয়ান ডেভিস কাপ খেলোয়ার। ইনি সেণ্ট্রাল ইউরোপীয়ান লন টেনিস ক্লাবের একজন সদস্য। আগামী শীতকালে ভারতবর্ষে দেখা দিবেন।

এবার আম্পায়ারিং তেমন আশানুরূপ হয়নি। প্রথম ইনিংসে লাল সিংহ বল না মারা সত্ত্বেও তাঁকে উইকেটের পাছে কট আউট দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে হিন্দেলকার বাপোরিয়াকে কট আউট করেন কিন্তু আম্পেয়ার তাঁকে আউট দিলেন না। আশা করা যায়, আগামী বৎসরে আম্পেয়ার নির্ব্বাচনের দিকে জেম্বের কর্ত্তৃপক্ষ একটু সুনজর দেবেন। নিম্নে দুই টীমের নাম দেওয়া গেল।

বিজয়ী মোসলেম দল :—মুস্তাফ আলি, কাদাড়, লাখুদা, ওয়াজের আলি, (কাপ্তেন) নাজির আলি, হোসেন, বাপোরিয়া, ফিরোজ খাঁন, আমির এলাহি, মবারক আলি ও নিসার।

বিজিত হিন্দু দল :—চম্পক মেটা, হিন্দেলকার, মণিলাল, সি, কে, নাইডু (ক্যাপ্তেন), অমরনাথ, জয়, লাল সিংহ, কেশরী, সি, এস, নাইডু, গোদাম্বে ও দিবাকর।

অষ্ট্রেলিয়া :

মহারাজা পাতিয়ালার অষ্ট্রেলিয়া টীমের যথার্থ যোগ্যতা ও পরিচয় এর মধ্যে আমরা পেয়েছি। ক্রিকেটে অষ্ট্রেলিয়ার কীর্ত্তি অতুলনীয়। এম, সি, সি দলের আগমনের পর হতে সাধারণের ক্রিকেটের প্রতি এক নতুন উৎসাহ আসে। অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আমেরিকার পাশে ভারতীয় ক্রিকেটের স্থান নির্দ্দেশ হয়েছে—এ কম বড় সম্মান নয়! অষ্ট্রেলিয়া দলে পুরোন অদ্বিতীয় ৭টী টেষ্ট ক্রিকেটার এবং ছয়টী তরুন উন্নত খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত।

টীমের কাপ্তেন রাইডার। বিখ্যাত ম্যাকাষ্টনি, অকসেনহাম হেণ্ডরী, আয়রণ মাষ্টার, নেগেল প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়দের নাম কে না শুনেছে! ভারতের মাটীতে প্রথম ম্যাচ অষ্ট্রেলিয়া দল রাজকোটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টেটের বিরুদ্ধে খেলে। খেলায় প্রথম ইনিংসে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টেট ১৫৪ রান করেন। ডক্তর গার্টু ২৫, ফৈইজ আমেদ ২৫, অকসেনহাম ৫ উইকেটে
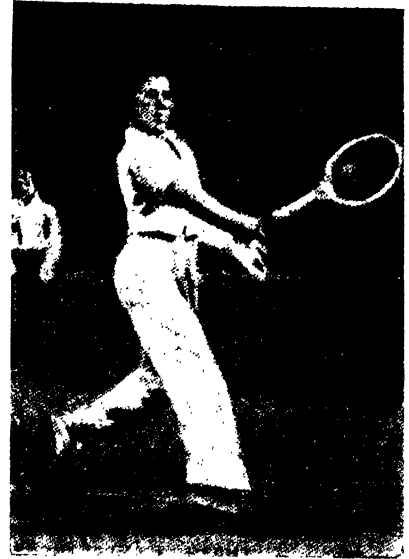
এল, হেক (খেলার ভঙ্গীতে)

৪০ রান নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়া দল দারুণ খেলাতে মাত্র ৯৫ রানে আউট হয়ে যায়। প্রথম ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়ার রান হয় ১৯৭, রামজী ৪ উইকেট ৬৮ রান নেন। দ্বিতীয়

ইনিংসে ৪ উইকেট ৫৪ রানে অষ্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টেটকে পরাজিত করেন। অষ্ট্রেলিয়ার এই প্রথম জয় যাত্রা সুরু হল।

জামনগরে অষ্টেলিয়া বনাম জামনগর ম্যাচে ফলাফল অমিমাংসিত ভাবে থাকে, জামনগরে প্রথম ইনিংসে ১৫৪ রান হয়। মনিলালের ৪২ রান তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবারও অক্‌সেনহাম ৫ উইকেট ৩২ রান নেন। অষ্টেলিয়ার প্রথম ইনিংসে রান হল ৭ উইকেটে ৩১৫ রান। পূর্ব্বের খেলার দক্ষতার পরিচয় ম্যাকার্টনি দিলেন ১৮৬রান করে। ভারতের মাটিতে অষ্টেলিয়ার দলের এই সর্ব্বপ্রথম সেঞ্চুরী রান। ইংলণ্ডের হবস্‌ এবং অষ্টেলিয়ার ম্যাকার্টনির অপূর্ব্ব শক্তি ও কীর্ত্তিকলাপ আজও ক্রিকেট ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। দ্বিতীয় ইনিংসে জামনগর ৬ উইকেটে ১২৪ রানের পর খেলা ড্রতে সাঙ্গ হল।

অষ্টেলিয়াদল আমেদাবাদের দিকে রওনা হলেন। গুজরাট দল অতিকষ্টে প্রথম ইনিংসে ১২১ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অষ্টেলিয়ার মারাত্মক বোলারের হাতে গুজরাট বশ্যতা স্বীকার করলেন। মাত্র ৭৩ রানে গুজরাট সব আউট হয়ে যায়। অষ্টেলিয়ার প্রথম ইনিংসে রান উঠল ৩০০। ক্যাপ্টেন রাইডার গুজরাট বোলারদের পদে পদে অপদস্থ করে ১০৯ রান নট আউট হয়ে থাকেন। মরিসবির খেলা অতি চমৎকার হয়েছিল। ইনি ৭০ রান করেন।

তারপর রাজপুট ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া দলের বিরুদ্ধে অষ্টেলিয়ার খেলা শেষ পর্য্যন্ত বেশ উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। প্রথম ইনিংসে রাজপুতনার ১৩১ রানে সকলেই হতাশ হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে অষ্টেলিয়ার স্কোর বিশেষ সন্তোষজনক হয় নি। মাত্র ১৪৯ রান হয়। এ খেলা ড্রতে পরিণত হবে—অনেকরই সে আশা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে রাজপুতনার ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটল। যাদুকর অকসেনহাম একাই রাজপুতনাকে কাবু করে দিলেন। সেদিন তার বোলিং দেখবার মত হয়েছিল। মাত্র ১৩ রানে ৭ উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অষ্টেলিয়া ৩ উইকেটে ১০১ রান করে ৭ উইকেটে জয়লাভ করেন।

সিন্ধুদেশ বনাম অষ্টেলিয়ার খেলা করাচীতে হয়। বিশিষ্ট সিন্ধু খেলোয়াড় নিয়ে উক্ত টীমটী গঠিত হয়ে ছিল।

শরীর সক্ষম রাখার জন্য অবসর বিনোদন
'উইমেনস্‌ লীগ অব হেলথ্‌ এণ্ড বিউটি' প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সভ্য ফ্যাক্টরী কিংবা অফিস বন্ধ হওয়ার পর সায়াহ্নে এইভাবে ব্যায়াম করেন।

প্রথম ইনিংসে সিন্ধুর সর্ব্বশুদ্ধ রান হল ৭৯। এত অল্প রান নিয়ে পরাজয়ের হাত হতে বাঁচবার আর কোন পথই রইল না। অষ্টেলিয়া ২৯৪ রান করে যোগ্য উত্তর দিল। মরিসবি ৫৯, এলগ্যাব ৫১, ও লাভ ৪৬।

দ্বিতীয় ইনিংসে সিন্ধুর ১২৫ রান হল। একমাত্র ভারতীয় টেষ্ট খেলোয়াড় সওমল ব্যতীত টীমের আর কেউ নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেননি। আজীজ, শঙ্কর, সোবেদ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খেলোয়ারদের ম্যাজিকের মত অকসেন্‌হাম আউট করে দিলেন। এবার অকসেনহাম, ৫ উইকেট মাত্র ৭ রান দিয়ে সকলকেই বিস্মিত করে দেন। এ একটা রেকর্ড বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। অষ্টেলিয়া এক ইনিংস ও ৭০ রানে জয়লাভ করেন।

মহারাষ্ট্রের সঙ্গে খেলায় অষ্টেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট ৩৪৯ রানে ডিক্লেয়ার্ড করেন। রাইডার একটি সেঞ্চুরী করেন। মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংস ২০৫ ও দ্বিতীয় ইনিংস ১ উইকেটে ৪২ রানের পর খেলা সাঙ্গ হয়। তরুণ এম নাইডু ১২৪ রান করে প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় আষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিঞ্চুরি করতে সক্ষম হন। অতঃপর

মিস্ এণা ওয়াল্ডণ

হলিউড্ ডান্স ডিরেক্টরদের সংঘ কর্ত্তৃক ইনি শ্রেষ্ঠকায়া নারী (perfect figure) বলে স্বীকৃত হয়েছেন। ইঁহার দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৩॥ ইঞ্চি, গ্রীবা ১১৷ ইঞ্চি, বক্ষ ৩৩॥০ ইঞ্চি, কটি ২৩৷ ইঞ্চি, কব্জি ৫।০ ইঞ্চি, নিতম্ব ৩৩৷ ইঞ্চি, উরু ১৮ ইঞ্চি, পায়ের ডিম ১২৷ ইঞ্চি, পায়ের গাট ৮ ইঞ্চি।

অষ্ট্রেলিয়া দল বোম্বেতে পৌছান। বোম্বাই সহর বনাম অষ্ট্রেলিয়া খেলা অসমাপ্ত ভাবে শেষ হয়। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস ৮ উইকেটে ৪৬৮ রানের পর ডিক্লেয়ার্ড করেন। ব্রায়ান্ট ১৫৫ ও ওয়েণ্ডেল বিল ১০৭ রান করেছিলেন। প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৪১ রান হওয়ায় বোম্বাইকে বাধ্য হয়ে "ফলো অন" করতে হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ১৭১ রানের পর খেলা শেষ হয়। বোম্বের ক্যাপ্টেন জয় ১১৫ রান করেন। তাঁর খেলা খুব চিত্তকর্ষক হয়েছিল।

বোম্বাইএ আন্তর্জ্জাতি ক্রিকেট

মেজর সি কে নাইডুকে নির্ব্বাচিত না করে পাতিয়ালার যুবরাজকে সমগ্র ভারতীয় টীমের অধিনায়ক পদে নির্ব্বাচন করায় অনেকে অসন্তুষ্ট হয়েছে। বোম্বের ক্রনিকেল তীব্র প্রতিবাদ করে লিখেছেন যে কৃতিত্বের পরিবর্ত্তে উচ্চ বংশের প্রতি ইংরেজ জাতির যে স্বাভাবিক অনুরাগ আছে তাহার অনুকরণে এ দেশেও উচ্চ বংশের জন্য কৃতী ব্যক্তির দাবী উপেক্ষিত হতে আরম্ভ হয়েছে। এ খুব সত্যি, সন্দেহ নাই।

ফুটবল—

এবার কলিকাতায় লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং সিংহলে নিমন্ত্রিত হয়ে কয়েকটী এক্‌জিবিসন ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল। সকলেই আশা করেছিল ক্রীড়া জগতে মোসলেম দল যে সুনাম অর্জ্জন করেছে তার সম্মান রাখতে সক্ষম হবে। কিন্তু ক্রীড়ামাঠে তার বিপরিত দেখা গেল। সিংহলে ফুটবল standard তত উঁচু নয়। মহমেডান স্পোর্টিং টীমে রসিদ, রহিম ও সামাদ যোগ দিতে না পারায় সত্যিই খুব দুর্ব্বল হয়েছিল। সিংহল মোসলেম দলকে ২-০ গোল, গেলীতে ইউরোপিয়ান দলকে ৩-১ গোলে জয়লাভ করে, কিন্তু নিকৃষ্ট টীম সিটি এথলেটিকের হাতে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের নিদারুণ পরাজয়ে সকলেই বিস্মিত হয়েছে। অল সিংহল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের একটী "টেষ্ট" ম্যাচ হয়। খেলাটী ড্র হয়। সিংহল টীমের গোলকিপার আকবরের মুগ্ধকর খেলা এবং গোলের সামনে এসে মহম্মদ স্পোর্টিং ফরওয়ার্ডের গোল দিতে অক্ষমতা, সেদিনকার খেলার ছিল

সবচেয়ে বিশেষত্ব! মহমেডান স্পোর্টিং কয়েকটি গোল দিবার সুযোগ নষ্ট করে। গুজব যে, আগামী বছরে আকবর ও মিসকিন মহমেডান স্পোর্টিংএর হয়ে কলিকাতায় লীগে খেলবেন।

টেনিস

কুইন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়ানশিপ —

World Wizard বরোটা টেনিসে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করলেন। লণ্ডন কুইন্স ক্লাব টুর্ণামেণ্টে বহু বিশিষ্ট খেলোয়াড় প্রতি বছরই যোগ দিয়ে থাকেন। গত ৮ বছর ধরে বরোটা অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়ে আছেন। এবার ফাইনালে সুদক্ষ সার্প ৬-০, ০-২, ৬-০ গেমে বরোটার কাছে পরাজিত হন। ইংলণ্ডের একজন নামজাদা ক্রিটিক লিখেছেন "বরোটার খেলা কুইনস স্পোর্টএ এত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছিল যে মনে হয় টেনিস খেলার সব কৌশলটুকু ইনি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।" মহিলা সিঙ্গলস্ ফাইনালে মিস্ ক্রিভেন ৬-২, ৬-২ গেমে মিস্ হার্ভেকে অতি সহজেই পরাজিত করেন। ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ানশিপ জয়লাভের পর কোন নামজাদা টুর্ণামেণ্টে মিস ক্রিভেন এত খানি পারদর্শীতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন নি। বহুদিন পর কুইন্স কোর্টে কৃতিত্ব লাভ করলেন।

ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপ—

কলিকাতার চ্যাম্পিয়ানশিপ নাম বদল করে এবার সাউথ ক্লাব এই নতুন টুর্ণামেণ্টের গোড়া পত্তন করেছেন। ভারতের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের যোগদান ছাড়া বিদেশ হইতে বিখ্যাত খেলোয়াড় মেঞ্জেল হেক্ প্রভৃতি খেলবেন। ডেভিস কাপে এঁরা বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেছেন। বরোটা-বিজয়ী মেঞ্জেল আজ জগতে "বেষ্ট" দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছেন। ফ্রেঞ্চ টীমের পর এত শক্তিশালী দল ভারতে খেলতে আসে নি। এই অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দলের প্রতিযোগী হিসাবে ভারতের নামজাদা খেলোয়াড়-দের টুর্ণামেণ্টে দেখা যাবে। ডেভিস কাপে অদ্বিতীয় পেরীর কাছে এবার মেঞ্জেল ৯-৭, ৬-১, ৬-১ গেমে হেরে যান। অন্যদিকে ভূতপূর্ব্ব ওয়াল্ড চ্যাম্পিয়ান ক্রফোর্ড ৭-৯, ৬-৪, ৬-৪, ৬-২ গেমে হেক্‌কে পরাজিত করেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিঙ্গেলস্ খেলোয়াড় মহম্মদ শ্লিম ৪২ বছর বয়সে তরুণ প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে খেলবেন শুনে সকলেই আনন্দিত হয়েছে। তারপর ভারতের ১নং খেলোয়াড় ই বব, মোহনলাল, এইচ সোনি, কেন্দিজ্ব রু, মদনমোহন সোয়ানী, যুধিষ্টির সিংহ, ডি এন কাপুর, এন কৃষ্ণস্বামী ইসলাম আহমদ, কাউল এবং বাংলার সি মেটা, ক্রক এডোয়ার্ডস, হডেস মিচেলমোর প্রভৃতি নামজাদা প্রতিযোগীরা আছেন। মহিলা সিঙ্গলস্ বিজয়িনী মিস্ সান্ডিসন্ আবার চ্যাম্পিয়ান হয়ে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করতে মনস্থ করে-ছেন। ইষ্টার্ণ চ্যাম্পিয়ানশিপ জয়লাভ করে কে এবার ভারতের মাটিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে গণ্য হবেন, এখন হতে সে বিষয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলেছে।

স্পোর্টস

মধ্যপ্রদেশের অলিম্পিক স্পোর্টস জব্বলপুরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় তিনশত প্রতিযোগী যোগ দিয়ে-ছিলেন। এবার অলিম্পিক স্পোর্টসটী খুব প্রতিযোগিতা-মূলক হয়েছিল। ১৯৩৩ সালের চ্যাম্পিয়ান সার্জ্জেণ্ট জেন-কিংসকে হারিয়ে নতুন চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন সার্জ্জেণ্ট ব্রিসলে। মধ্যপ্রদেশের গভর্ণর পারিতোষিক বিতরণ করেন।

দিল্লী এথলেটিকস্ স্পোর্টস

এবার দিল্লী স্পোর্টসে বহু প্রতিযোগী যোগদান করে-ছিলেন। এক শত গজ দৌড়ে মাত্র ৯$\frac{৮}{১০}$ সেকেণ্ডে দৌড়ে ই, হোয়াইটসাইড ভারতে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করলেন। এত অল্প সময়ে কেউ এতটা পথ অতিক্রম করতে পারেনি।

কয়েকটি ফলাফল

১০০ গজ দৌড়ে

প্রথম—ই হোয়াইটসাইড।

সময়—৯$\frac{৮}{১০}$ সেকেণ্ড। (নতুন রেকর্ড)

৫০ গজ দৌড়ে (মহিলা)

প্রথম—মিসেস বুথ

ক্রীড়া-জগতের খবর

হে কাপ হকি টুর্ণামেণ্ট ফাইনালে ক্যামারনিয়ন দল ১ গোলে ইষ্ট সারে রেজিমেণ্টকে হারিয়েছে, আমেরিকা ওয়েট্ম্যান কাপে বিজয়িনী মিসেস্ বি আরলড প্রফেসনাল হয়েছেন।

এরিয়ান্স দলের সুযোগ্য ক্রীকেট ক্যাপ্টেন এস দত্ত পরলোকগমন করেছেন। ইনি ফুটবল ও হকিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। বেঙ্গল জিমখানার পক্ষে ইনি আন্তর্জ্জাতিক ক্রীকেট ম্যাচে খেলেছিলেন।

সম্প্রতি দিনাজপুরে সাইকেল এন্‌ড়রেন্স কম্পিটিসনে বহু প্রতিযোগী যোগ দিয়েছিল। শ্রীমান বিজয়চন্দ্র দে ক্রমাগত ৬০ ঘণ্টা ২৫ মিনিট চালিয়ে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

লাইটওয়েট চ্যাম্পিয়ান জিমি ষ্টুয়ার্ট এক বক্সিং যুদ্ধে মাত্র ছ সেকেণ্ডে জ্যাক লর্ডের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে ধরাশায়ী হন। ব্রিটিস বক্সিং ইতিহাসে এ একটা রেকর্ড বল্লেও চলে। ৩৪ বছর আগে আমেরিকায় এইরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। বি, নেলসন দু সেকেণ্ডে ই রোসারকে পরাজিত করেন।

লাহোরে গোকুলচাঁদ টেনিস টুর্ণামেণ্টে ডবলস ফাইনালে সোনি ও মহম্মদ শ্লিম প্রতিযোগী সোয়ানী ও হরিশ্চন্দ্রের নিকট ৫-২, ৫-৭, ৭-১১, ২-৬ গেমে পরাজিত হওয়াতে সকলেই বিস্মিত হয়েছে।

ঢাকায় নাথ কাপ প্রতিযোগিতায় ফাইন্যালে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ৫ উইকেটে জয়লাভ করেছে। বিজয়ী দল প্রথম ইনিংসে ১৭৪ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ৯৫ রানে ডিক্লেয়ার্ড করেন। বিজিত ওয়ারী দল প্রথম ইনিংসে ১২৭ এবং দ্বিতীয় ইংনিসে ১৩৯ রান করেন।

যুক্ত প্রদেশের কর্তৃপক্ষরা টেনিসের উন্নতিকল্পে ইতালীর ডেভিস কাপ টীমের শিক্ষক Weissকে নির্ব্বাচিত করেছেন। ইনি শীঘ্রই আসবেন। বাংলা এ বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক পেছিয়ে আছে।

ডেভিস কাপ টুর্ণামেণ্টে আগামী বছরও এফ, বারো রেফারী নির্ব্বাচিত হওয়াতে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেছে। এই নিয়ে বারো ৮ বার আম্পেয়ার পদে নিযুক্ত হলেন। ১৮৮৪ খৃঃ অঃ ইনি অক্সফোর্ডের ব্লু ছিলেন।

রায়পুরে বিলাসপুর অলিম্পিক টীম সারানগর কাপ টুর্ণামেণ্টে নাগপুরের মরিস কলেজকে ২ গোলে হারিয়ে দেয়।

৪৪০ গজ ব্যাক ষ্ট্রোক সাঁতারে কার্ট জাষ্টেনবার্গ জগতে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। মাত্র ৫ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে তিনি কৃতকার্য্য হন। এর পূর্ব্বে জাপানের কিজোকায়া ১৫ মিনিট ৩০৪/৫ সেকেণ্ডে প্রথম রেকর্ড করেছিলেন। এডিনবার্গএ ফুটবল ইণ্টারন্যাসনাল ম্যাচে স্কটল্যাণ্ড ২ গোলে আয়র্লণ্ডকে পরাজিত করেন।

আমেরিকায় মহিলা টেনিস চ্যাম্পিয়ান মিস্ জেকব এবার ডেভিস কাপ বিজয়িনী হবার আশায় পূর্ব্ব হতেই ইংলণ্ডে প্র্যাকটিস করতে রওনা হয়েছেন। তিনি ৪ বার মহিলা সিঙ্গলস ফাইনালে পৌছিয়ে ছিলেন কিন্তু কোনবারই কৃতকার্য্য হননি।

আগামী বছর কানাডা ক্রীকেট টীম ইংলণ্ডে খেলতে আসছেন। ক্রীকেট ক্রীড়া-ক্ষেত্রে ক্যানাডার যোগদান সম্পূর্ণ নতুন নয়। ১৯৩২ সালে কানাডা সর্ব্বপ্রথম বিলেতে খেলতে আসে।

প্রাইমো কার্ণারা ইতালীর জায়েণ্ট Heavy Weight চ্যাম্পিয়ান জার্ম্মান চ্যাম্পিয়ান নসেলকে এক বক্সিং যুদ্ধে সাক্ষাৎ করেন। ম্যাডিসন গার্ডেনে বিপুল জনতার সামনে প্রাইমো কার্ণারা ১০ রাউণ্ড যুদ্ধে ৬ রাউণ্ডেই নসেলকে ধরাশায়ী করেন। কার্ণারার প্রবল ঘুসিতে নসেলের চোখে নাকে ভীষণ রক্ত পড়ে। লুইস্ ও ম্যাকবেয়ারের কাছে পরাজয়ের পর কার্ণারার এই কৃতিত্বে সকলেই সন্তুষ্ট। নসেল বোধ হয় বক্সিং রিং হতে বিদায় নেবেন। কারণ ইনি শীঘ্রই বিবাহ করছেন।

বার্ট কার্জ্জেন ক্রমান্বয় ২৫ ঘণ্টা ৯ মিনিট হেঁটে পৃথিবীতে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। উক্ত সময়ে তিনি প্রায় ৯৭ মাইল পথ অতিক্রম করেছেন।

শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী

রমণীর মুখ

কমলিনী মলিনা দিবসাত্যয়ে। শশীকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে॥
ইতি বিধি বিদধে রমণীমুখম্। ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ॥

কালিদাসের রচিত রমণীমুখের কাহিনী সংস্কৃত কাব্যের একটি অপরূপ রূপক। কালিদাস লিখেছেন যে বিধাতা সৌন্দর্য্য রূপ সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রথমে রচনা করেন কমল। কিন্তু কমল দিনের শেষে যায় মুদ্রিত হয়ে। বিধাতা সেই জন্যে চন্দ্র সৃষ্টি করলেন, কিন্তু চন্দ্রও যায় দিনের বেলা নিষ্প্রভ হয়ে। বিধাতা এমন রূপ সৃষ্টি করতে চান, দিনে রাতে সর্ব্বক্ষণ যাতে চোখ জুড়িয়ে যাবে। তাই সবশেষে তিনি সৃষ্টি করলেন রমণীর মুখ- -কমলের মত রাত্রে যা মুদিত হবে না, চন্দ্রের মত দিনের বেলা যাবেনা ম্লান হয়ে।

সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে তাই দেখতে পাই রমণীরূপ পুরুষের আনন্দের চিরন্তন উৎস হয়ে আছে। শিল্পীর কাছে নারীর রূপই পরম সৌন্দয্যের আদর্শ। কবিরা তার সৌন্দর্য্যকেই গদ্যে ও ছন্দে অমর করেছেন।

যা কিছু শোভন, যা কিছু সুন্দর, তা যেন তাই আপনা থেকেই নারীর অধিকার ভুক্ত হয়েছে। যে কাজ সে নিজস্ব মধুর ভঙ্গিতে পুরুষের চেয়ে অনেক ভালোভাবেই করতে পারে, সে কাজের ভার তার ওপরই ছেড়ে দিয়ে পুরুষ নিশ্চিন্ত।

এইমত চায়ের অনুষ্ঠানে, পৃথিবীর সকল দেশে সকল ঘরে নারীরই বিশেষ কর্ত্তৃত্বের অধিকার। নারীই চা প্রস্তুত করে, চা তৈয়ারীর সমস্ত খুঁটিনাটির প্রতি তারই সজাগ দৃষ্টি থাকে। চা পানের নিত্যকার অনুষ্ঠানের তদারক সেই করে। তার এ অনুষ্ঠানের কতৃত্ব করবার অধিকার নিয়ে কোন তর্ক ওঠে না। সত্য কথা বলতে কি, নারীর হাতের স্পর্শ বিনা, চায়ের আকর্ষণ অনেক খানিই কমে যায়।

এই তাড়াহুড়োর যুগে আমরা কখন কখন চায়ের দোকানে চা খেতে যাই বটে, তবু চা পানের উপযুক্ত স্থান যে নিজের ঘর এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চা-পানের যথোচিত আবহাওয়াটি ঘরেই শুধু পাওয়া যায়। চা-পানের সামাজিক অনুষ্ঠানে নারী তাই এমন অপরিহায্য।

এদেশে বাড়ীর চাকর বাকরের ওপর চা তৈরি করবার ভার দেওয়া হয় দেখে দুঃখ হয়। চাকর বাকরেরা আনাড়ির মত কি বিচ্ছিরি ভাবেই না চা পরিবেশন করে—পেয়ালা থেকে চামচটা হয়ত বেরিয়ে আছে, পেয়ালার চা উপচে পড়েছে ডিসে। সময় সময় সে চা ত খাওয়াই যায়না। আবার বাড়ীর গৃহিণী স্বয়ং চা তৈরী করে পরিবেশন করলে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে যায়।

ব্রাউনিং বলেছেন,—"একটুখানি বেশী হ'লে কতখানি আর একটু কম হলে কত রাজ্যের তফাৎ।" চায়ের নিত্যকার অনুষ্ঠান সার্থক বা পণ্ড করার পক্ষে একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। চা তৈরী করার সঠিক প্রণালীতে একটু মনোযোগ দিলেই আমাদের এই পানীয়টী একেবারে অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। চা-পান যখন আজকাল আমাদের দৈনিক জীবনের প্রয়োজন হয়ে উঠেছে, তখন ভারতের প্রতি ঘরে মেয়েদের চা প্রস্তুত ও পরিবেশনের ভার নেওয়া উচিত। সংসার সত্যিই তাহলে আরো সুখের হয়ে উঠবে।

চৌষট্টি শিল্পকলার একটি

ভালো ভাবে চা তৈরী করা চৌষট্টি শিল্পকলার একটি বলা যায়। কিন্তু সত্যিকারের ভালো চা কদাচিৎ খেতে পাওয়া যায়। অনেক বাড়ীতে চায়ের জল ত একরকম সারাদিনই ফোটে। তবু খুব কম বাড়ীতেই চা খেয়ে সুখ হয়। একটু যত্ন নিয়ে ঠিক প্রণালীটি অনুসরণ করলেই চা অতি সহজে তৈরী হয়। চা খারাপ হয় শুধু বাড়ীর গৃহিণীদের অবহেলায় ও অপটু চাকর বাকরের দোষে। তাদের নিজের দোষে চায়ের অকারণে নিন্দে হয়, এ সত্যিই বড় দুঃখের কথা।

চা পানের নিয়ম কানুন জটিল নয়। সে গুলি আয়ত্ত করাও কঠিন নয়। সোদ্দা কথা, ঠিকমত সে নিয়মগুলি লোককে দিয়ে পালন করানই শক্ত। ভালো চা তৈরীর জন্য কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, শুধু দুটি হাত আর সে গুলি পরিচালনায় একটু মনোযোগ দিলেই হ'ল। চা তৈরীতে একটু মনোযোগ বিশেষভাবে দরকার। অনেক সময় দেখা যায় তৈরীতে নিপুণ হলেও মনোযোগের অভাবে চা ঠিকমত হয় না।

ভালো চা তৈরীর আসল রহস্য রয়েছে তার জলে। জল টাটকা হওয়া দরকার এবং তা ঠিকমত ফোটানও প্রয়োজন। জল বেশী ফোটালে, আগেকার ফোটান হ'লে বা কম ফুটলে, চা বেতার ও বিস্বাদ হবে। চায়ের পাতা ভেজানর কৌশল তার পরে জানা দরকার। পাঁচ মিনিট ভেজবার আগেই চা যদি পেয়ালায় ঢালা যায় তাহলে স্বাদ ও গন্ধ ঠিকমত হবে না, এ ত্রুটির জন্য চা'কে দোষী করা যায় না। সংক্ষেপে চায়ের পেয়ালা উপভোগ্য করতে-হলে প্রস্তুত করবার জন্য উপযুক্ত সময় দিতে হবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের এদিক ওদিক হলে চলবে না।

চা প্রস্তুতের ব্যাপারে এই দুইটি প্রয়োজনীয় কথা মনে রেখে সেই পুরাণ নিয়মটি অনুসরণ করতে হবে ; "লোক পিছু এক চামচ করে আর পাত্রের নামে আর এক চামচ বেশী"। ঠিক ধরণের পাত্রটিও দরকার। পাত্রটি মাটির হলেই ভালো হয়। ব্যবহারের আগে সব সময়ে যেন পাত্রটি পরিষ্কার ও শুকনো থাকে। এদেশে গরম জলে পাত্র ভর্ত্তি করে তার পর চায়ের পাতা দেওয়ার রীতি বড় বেশী প্রচলিত বলে মনে হয়। এ যেন ঘোড়ার সামনে গাড়ী জোতা, পাত্রটা গরম জলে ধুয়ে নিয়ে তার ভেতর চায়ের পাতার ওপর টাটকা ফোটান জল ঢালাই হ'ল ঠিক পদ্ধতি।

সুপেয় চা তৈরী করবার জন্যে এর চেয়ে বেশী আর কিছু জানবার দরকার নেই। এতেই বোঝা যায় যে চা-তৈয়ারীর বিদ্যা আয়ত্ব করা অত্যন্ত সহজ। চা-রসিকের কাছে তার নিজস্ব মূল্য যা আছে তা ছাড়াও চা-কে জীবনের অন্যতম আনন্দ বলা যায়।

"শত বর্ষ পরে"

একশত বৎসর যে মানুষ বাঁচে তার পরমায়ু অসাধারণ, মানুষের গড়পড়তা আয়ুর তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু জাতির জীবনে একশত বৎসর কাল-সমুদ্রের বিন্দু মাত্র।

মানুষের জীবন গণনা করা হয় বৎসর ধরে, জাতির জীবন শতাব্দীর হিসাবে। দিনের পর দিন সমুদ্রের ঢেউএর মত মানুষ জীবনরঙ্গমঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জাতি সভ্যতা, বহুশত বা বহুসহস্রবর্ষব্যাপি যুগের শেষে লয় পায়। একটা দেশের প্রগতির পথে একশত বৎসর আর এমন কি দীর্ঘকাল? যেমন, ভারতবর্ষ শতবর্ষ আগে বন্য একটি স্বভাবজাত গাছ থেকে, সামান্য একটি উদ্ভিদতত্ব সম্বন্ধে গবেষণা থেকে তার চায়ের বিশাল শিল্প ব্যবসায় গড়ে উঠতে দেখেছে। আমরা সবাই এ কীর্ত্তি নিয়ে গর্ব্ব করতে পারি, কিন্তু ভারতের এই বিরাট শিল্প যেদিন উন্নতির চরম শিখরে উঠবে সেদিন আমরা কল্পনা করতে পারি কি? না পাবারই কথা, কিন্তু এইটুকু আমরা বুঝতে পারি যে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতবর্ষ যদি চা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে তাহ'লে পৃথিবীর চায়ের ব্যবসায়ে সে অদ্বিতীয় হয়ে দাঁড়াবে।

চা ভারতেই উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণ চা ভারত থেকেই সরবরাহ করা হয়। তবু যে-সব দেশে ভারতের চা ছাড়া আর কিছু ব্যবহৃত হয় না, তাদের অধিকাংশের চেয়ে মাথা পিছু এখানে চা খরচ হয় অনেক অল্প; সত্যিই এটা ভাববার বিষয়। প্রত্যেক ভারতবাসী বৎসরে আধসের করে চা ব্যবহার করলেও এ শিল্পের উৎপাদনশক্তি চেপে রাখার কোন দরকার হ'বে না। গত একশত বৎসরে যে বেগে এ শিল্প বেড়েছে তাহ'লে তার চেয়ে অনেক দ্রুত তাকে প্রসারলাভ করতে হবে। পরবর্ত্তী একশত বৎসর তাহ'লে ভারতীয় চা ব্যবসায়ের আরো অসাধারণ উন্নতির যুগ বলে গণ্য হবে।

নিজেদের এই জাতীয় শিল্পের উন্নতির যথাসাধ্য চেষ্টা করার চেয়ে প্রশংসনীয় কাজ ভারতবাসীর আর কিছু হ'তে পারে না। এ শিল্পের ভবিষ্যৎ সত্যিই উজ্জ্বল। এ শিল্প গড়ে তোলায় শতাব্দীব্যাপী সাধনার ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, যারা ভারতীয় চায়ের কদর বুঝতে শিখে তাকে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলেছে, তাদের মত আমাদেরও চা-কে আপনার করে নেওয়া কর্ত্তব্য।

দুখীর মা

শ্রীদিলীপকুমার পুরকায়স্থ

১

ডাক্তারীর খানিকটা পাশ করিয়া গঙ্গাধর যেদিন প্রথম আসিয়া গ্রামে বসিয়াছিলেন, লোকে সেদিন তাহার মর্য্যাদা বুঝে নাই। প্রথম কয়েক বৎসর তিনি টাকার মুখ চোখে দেখিলেন না। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে বসত-বাটীর একখানি ঘর ব্যতীত সমস্তই ঋণের দায়ে বন্ধক দিয়া গিয়াছিলেন। জীবন-প্রভাতে সংসারের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক তাঁহার নিকট অন্ধকার বোধ হইয়াছিল; কিন্তু বছর পাঁচেক পূর্ব্বে যখন সমস্ত গ্রামখানি ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ওজাড় হইবার উপক্রম হইল, ভাগ্যলক্ষ্মী তখন নিঃস্ব গঙ্গাধরের পানে হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন। জীবন-মরণের দ্বন্দ্বগণে গ্রামের লোক একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া পড়িল এবং এই সুযোগে গঙ্গাধরের দশ পয়সার কুইনিনের শিশি পাঁচ আনায় গিয়া স্থান পাইল।

বহুলোক সারিয়া উঠিল। গঙ্গাধরের খ্যাতি প্রভাতের অরুণালোকের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এখানে বিবরণ আর বিস্তৃত করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এইটুকু বলা দরকার যে, সেই দিন হইতে বছর দু'য়ের মধ্যেই গঙ্গাধর ধনে, মানে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে নিজের অসামান্য প্রতিভার জন্য চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আজ সকাল বেলায় তিনি নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, এমন সময় দৃষ্টি সহসা দরজার বাহিরে পড়ায় হুকার নলটা মুখ হইতে সরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুই কে রে?"

"আমি দুখী"—এই বলিয়া একটী বারো-তেরো বছরের ছেলে দোরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

গঙ্গাধর কহিলেন, "ভিতরে আয়,—তুই কি চাস"?

দুখী ভিতরে ঢুকিয়া ডাক্তারকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল "আমার মা'র জ্বর আজো সারেনি"।

"কুইনিন দিয়েছিলি"?

"দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছু হ'লনা"।

ডাক্তার কহিলেন, "হবে;—আরো খাওয়াগে"—

দুখী গেল না; পাশের খুঁটী ধরিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া ডাক্তার কহিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলি যে? যা—"

দুখী ডাক্তারের মুখের পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আর যে নেই—?"

"কি নেই? কুইনিন?"

দুখী মাথা নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল হাঁ।

ডাক্তার কহিলেন, "সে দিন নিয়ে গেলি যে এক শিশি?"

দুখী অস্ফুটে কহিল, "ফুরিয়ে গেছে—"

"ফুরিয়ে গেছে? দাম দিলি নে যে এখনো?"

দুখী কহিল, "দেবে"—

"আর কবে দিবি? সাতমাস পরে?"—একটুখানি চুপ থাকিয়া কহিলেন—"যা নিয়ে আয়গে দাম, তারপর দেবো আর এক শিশি।"

দুখী আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রতি-বেশীর গৃহ হইতে দশটা পয়সা ধার চাহিয়া আনিয়া প্রায় একঘণ্টা পরে পুনরায় ডাক্তারের বাটীতে ফিরিয়া আসিল। দেখিয়া ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, "এনেছিস্ পয়সা?" 'এনেছি' —বলিয়া দুখী হাতের মোট খুলিয়া দশটা পয়সা ডাক্তারের হাতে দিল।

পয়সা গণিয়া ডাক্তার কহিলেন, "দশপয়সা কি রে? এতদিন পরেও কুইনিনের দাম তোকে নূতন করে শিখোতে হবে নাকি? কে বল্লে তোকে দশ পয়সা দিতে?"

"দীনা বল্লে; দীনা সে দিন দশ পয়সা দিয়ে নিজে সহর থেকে একশিশি কুইনিন কিনে এনেছে।"

"দীনা বল্লে, তবে যা তোর দীনার কাছে"—এই বলিয়া ডাক্তার ঝনাৎ করিয়া দশটা পয়সা মেজেতে ফেলিয়া দিলেন।

দুখী খুঁটী ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ডাক্তার ধমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলি যে? বেরো শীগগীর আমার ঘর থেকে—"

দুখী বাহির হইয়া গেলনা। স্তব্ধ হইয়া ডাক্তারের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। লোকটা যে এতবড় অর্থপিশাচ ইহা সে জানিত না। লোকমুখেও কখনো শুনে নাই, নিজেত কখনও ভাবে নাই; বরঞ্চ সুখ্যাতিই তাহার যথেষ্ট শুনিয়াছে, এবং খ্যাতির উপর নির্ভর করিয়াই সে আজ দ্বিতীয় দিনেও আসিয়া বাকী কুইনিন নিবার আশা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শুধু এই নয়; এমন কি, আশা করিয়াছিল, অবস্থা জানিলে হয়তো ডাক্তার কুইনিনের দামটা মাপও করিতে পারেন; কিন্তু এখন চোখের সুমুখে এই মূর্ত্তি দেখিয়াও তাহার সে আশা তিরোহিত হইল না;—ভাবিতে পারিলনা যে মানুষ তাহার অবস্থা জানিলে কখনো তাহাকে দয়া না করিয়া থাকিতে পারে। তাই সে সহসা ডাক্তারের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া, তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ডাক্তার বাবু আমরা যে বড় গরীব; আপনার দয়া ছাড়া আমার মা যে বাঁচবে না—"

কিন্তু ডাক্তারের তাহাতে করুণা হইল না; গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন, "না বাঁচুক গে; ছাড় পা; আমার কথা থেকে দীনার কথা বড়—" এই বলিয়া চট্ করিয়া তিন চারি পা পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে ডাকিলেন, "ভোলা"—

ভৃত্য আসিয়া দুখীকে ঘাড় ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। সে সেখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

২

দিন দুই পরের কথা। নদী হইতে মাছ ধরিয়া দুখী যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, বেলা তখন বাড়িয়া উঠিয়াছে।

মা কহিল, "দুখী ঘরে যে আজ চাল নেই বাবা"—

দুখী কহিল, "তার জন্য তোর ভাবতে হবেনা মা"—

"আজ দুপুরে তবে খাবি কি?"

দুখী বাহিরে গিয়া নিরুত্তরে বেড়া তৈরী করিতে লাগিয়া গেল।

মা কহিল, "আমার যে এখন ভাত খেতে ইছে করে দুখী, চাল না হলে ক্যামনে পাব?"

দুখী মাথা সোজা করিয়া মায়ের দিকে চাহিল; কহিল, "তুই খাবি মা ভাত? কিন্তু কই সকালে খেলিনে ত?"

দুখী আজ সকালে নিজে ভাত রাঁধিয়াছিল; অর্দ্ধেক নিজে খাইয়া বাকী অর্দ্ধেক মায়ের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিল। তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়া কহিল, "আমার হাতে রাঁধা ভাত তুই খেলিনে মা!"

মা কহিল, "এই তো এখন খাব বাবা"—

দুঃখী কহিল, "কিন্তু ভাত খেলে যে তোর অসুখ বাড়বে মা!"

"কে বল্লে রে?"

"সবাই বলে মা, জর গায়ে ভাত খাওয়া ভাল নয়।"

মা কহিল, "ওদের কথায় বিশ্বাস করিস্‌নে দুখী; আমাদের ছোট লোকদের অসুখ বিসুখে ভাত খেলে কিছু হয় না।"

দুখী কহিল, "কিন্তু চাল এখন কোথায় পাব মা?"

জননী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "রায়েদের বাড়ী থেকে দু'টো চাল চেয়ে নিয়ে আয় দুখী,—আমার কথা বল্লে ওঁরা দেবেন।"

দুখী আর দ্বিরুক্তি করিল না; তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুপুরের এই খর রৌদ্রে রায়েদের বাড়ীর সন্ধানে যাত্রা করিল।

কিছু সময় পরে মা ভাতের থালাটা সুমুখে লইয়া বসিল, ছেলের হাতের রাঁধা ভাত! মায়ের দু'চোখে জল আসিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া দু'এক গ্রাস মুখে দিল; কিন্তু আর পারিল না। কান্নায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মনে শুধু এক চিন্তা, সে মরিলে দুখী কেমন করিয়া থাকিবে,—কেমন করিয়া দিন কাটাইবে? ভাবিতে ভাবিতে কান্না যখন তাহার আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তখন পাতের অবশিষ্ট পুকুর ধারে ফেলিয়া দিয়া হাত মুখ ধুইয়া বিছানায় আসিয়া মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে দুখী ফিরিয়া আসিল। ঘরে আসিয়া কাপড়ের বাঁধ খুলিয়া চালগুলি একটা ডালায় রাখিয়া কহিল, "আমি চান করে এসে রান্না বসাবো, তুই শুয়ে থাক্ মা।"

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া দুখী রান্না চড়াইয়া দিল। রাঁধিতে সে জানিত, সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত সম্পূর্ণ করিয়া একটা থালায় নিজের জন্য আর একটা থালায় মায়ের জন্য শাকান্ন সাজাইতে আরম্ভ করিল। এমনি সময়ে প্রাঙ্গণে আসিয়া কে ডাকিল "মা"।

দুখী দরজার দিকে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, "এখানে ভিক্ষে পাবে না;—চলে যাও"। লোকটা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল; কহিল, "আমি ভিখারী নই বাবা, আমি অতিথি।"

দুখী কহিল, "এখানে হবে না, অন্য কোন খানে"—

"বাবা দুখী"!

"কেন মা?"

"অতিথিকে অমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছ?"

"আমাদের যে কিছু নেই মা!"

"না থাকুক গে—; যা আছে তাই দিয়ে অতিথির সেবা করতে হয়; অতিথি বাড়ী থেকে ফিরে গেলে গৃহস্থের সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হয়; কিছুই যদি না থাকে তবে মিষ্ট কথা দ্বারাও অতিথিকে তুষ্ট করতে হয়। অতিথি-সেবাই তো গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম, তা তুমি এখনো শেখোনি বাবা?"

দুখী নতমুখে বসিয়া রহিল; মা কহিল, "দুখী ওকে চান করতে বলগে—"। অতিথিকে স্নানে পাঠাইয়া দুখী ঘরে আসিয়া কহিল, "তুই খা মা, আমার ভাত ওকে দেব।"

"পাগল"!

"না মা, তুই খা"।

মা কহিল, "সকালে ভাত খাওয়ার পর জ্বর যে আমার বেড়ে গেছে দুখী।"

দুখী কহিল, "তুই ত বল্লি মা, আমাদের অসুখ বিসুখে ভাত পেলে কিছু হয় না"।

"কিন্তু হ'ল ত—"।

"না মা তুই মিছে কথা বলছিস্—"।

"না দুখী, মিছে কথা নয়,—ঠিক বলছি। এখন যদি আবার ভাত খাই, তবে আর বাঁচব না বাবা!"

ছেলে চুপ করিয়া গেল। এই কথার উপর কোন কথা বলিবার সাহস তাহার নাই। তবুও নিজে খাইল না, আশা করিয়া রহিল পরে খাইলে মা যদি তাহার থালার খানিকটা অংশ গ্রহণ করে।

অতিথি স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলে, মা ছেলে মিলিয়া তাহার সেবা করিল। সর্ব্বলোকের চক্ষুর অন্তরালে বসিয়া যিনি বিশ্বের লীলা দেখিতেছেন, দরিদ্রার কুটীরের এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটুকুও বোধ করি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না।

৩

বেলা পড়িয়া আসিল। দিন কয়েক পূর্ব্বে দুখী ঘরে বসিয়া কয়টা বেতের সাজি তৈয়ার করিয়াছিল, সেইগুলি হাতে লইয়া কহিল, "আমি হাটে চল্লুম মা, এই সাজি কটা বিক্রী ক'রে কিছু পয়সা যদি পাই—"

মা কহিল, "যা বাবা, শীগগীর ক'রে ফিরে আসিস; আর ফেরবার পথে সুনন্দাকে একটা খবর দিস্ দুখী;—বলিস্, মা আমার আর বাঁচবে না, একটি বার যেন এসে দেখে যায়।"

দুখী কহিল, "যা মা, তুই অমন কথা বলিস নে।"

"কেন বাবা তোর ভয় করে?"—একটু খানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—"যা দুখী, হাটের বেলা বয়ে গেল।"

দুখী চলিয়া গেল। দিবা অবসানে দুখীর মায়ের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইয়া জ্বর আসিল। বাঁশের উপর হইতে কাঁথাটা পাড়িয়া আনিয়া সে চোখ মুদিয়া শয্যায় পড়িয়া কোঁকাইতে লাগিল।

সূর্য্য অস্ত গেল। সন্ধ্যার ম্লান আঁধারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল। গৃহে গৃহে সাঁঝের দীপ জ্বলিয়া উঠিল; এমনি সময়ে দুখী বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। অন্ধকার জীর্ণ কুটীরে কোন ক্রমে ঠাহর করিয়া সে পীড়িতা জননীর এক পাশে বসিয়া ডাকিল "মা—।"

রুগ্না মাতা আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া ডান হাতে ছেলের একখানা হাত ধরিয়া কহিল, "বাবা দুখী—"

"কেন মা?"

"না কিচ্ছু না—"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া দুখী কহিল, "তোর জ্বর আবার বেড়েছে মা—?"

প্রত্যুত্তরে জননী ছেলের হাতটা আরো শক্ত করিয়া ধরিয়া কহিল, "এ জর আর থামবে না দুখী,—এতেই আমি শেষ হ'বো ;—"

মৃত্যু যখন আসিয়া-জীবন দ্বারে ঘা দেয়, তখন এক জাতীয় মানুষ আছে যাহারা বুঝিতে পারে যে এ দুনিয়ার মেয়াদ তাহাদের ফুরাইয়া আসিয়াছে। দুখীর মাও ঠিক সেই দলেরই একজন। জীবন-সূর্য্যের অস্তকাল যে তাহার আসন্ন হইয়াছে, ইহা সে ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিত ; তাই জীবনের একমাত্র অবলম্বন প্রাণাধিক দুখীকে তাহার এক মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের আড় করিতে ইচ্ছা হইত না। দুখী কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিত না। মৃত্যু জিনিষটা যে কি, ইহা যে কেমন করিয়া আসে, তাহা সে কখনও চোখেও দেখে নাই, কোন দিন ভাবেও নাই। একদিন মা যে তাহার সত্যই তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে, —ডাক পড়িলে না গিয়া যে উপায় নাই, ইহা বুঝিতে পারা দূরের কথা,—সে কল্পনাও করিতে পারিত না। জননী ছেলের এই ভ্রান্তি দূর করিবার চেষ্টা করিয়া মাঝে মাঝে বলিত, "বাবা দুখী, একদিন ত আমি মরে যাবরে, সে দিন তুই"—

ছেলে মায়ের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিত "অমন কথা বলিস্‌নে মা ; একি কখনো হয় ? আমায় ছেড়ে তুই ক্যাম্‌নে থাকবি ?"

মায়ের দু'চোখ জলে ভরিয়া উঠিত, ছেলে কাপড় দিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিত। দিন যত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, মায়ের মুখে সেই একটা কথাই পুনঃ পুনঃ শুনিয়া শুনিয়া দুখীর মনে দিন কতক ধরিয়া বিশ্বাস হইল যে, মা তাহার সত্যই একদিন তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। দুনিয়ায় কেহই চিরদিন থাকে না ; কিন্তু কোথায় যায়—কেমন করিয়া যায়, এই গূঢ় সমস্যার সমাধান বালক কোন প্রকারেই করিতে পারিল না। সেই কথাটাই জানিবার উদ্দেশ্যে দুখী আজ মা'কে জিজ্ঞাসা করিল, "মা তুই মরবি ?"

মা কহিল, "হাঁ বাবা, আমি মরলে, আমার মুখে তুই আগুন দিবিনে বাবা ?"

দুখী কহিল, "যাঃ—"

"যা কিরে ? ছেলের হাতের আগুন ! সে-যে মা-বাপের পরম সৌভাগ্যের ধন বাবা !" ছেলে মায়ের মুখের পানে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল ; বুঝিতে পারিল না যে, মায়ের এই কথাটার ভিতরে একটা পরম সত্য নিহিত আছে,—বুঝিতে পারিলনা যে, এটাই জগতের নিয়ম এবং পিতামাতার প্রতি ছেলের এটা একটা মস্ত বড় কর্ত্তব্য। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সহসা দুই হাতে মায়ের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মা তোর সাথে আমায় নিবিনি ?"

মুমূর্ষুর কপোল প্লাবিয়া ফোয়ারার ন্যায় অশ্রু ছুটিল। দুই হাতে ছেলের মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে গেল। কিন্তু অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে বাক্য আর ফুটিল না, প্রাণের কথা ভাষায় আর ব্যক্ত হইল না ; অন্ধকারে শুধু জননীর অশ্রুরাশি কপোল বাহিয়া, আর অবুঝ পুত্রের চোখের জল মায়ের বক্ষ প্লাবিত করিয়া দুই ধারে ঝরিতে লাগিল।

কিছু সময় কাটিয়া গেল। জননী চোখ মুছিয়া ডাকিল, "বাবা দুখন্—?"

"মা ?"

"ঘুমিয়েছিস্ ?"

"না, মা !"

ছেলে মায়ের কণ্ঠ ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। মা কহিল, "দুখ্, ঘরে বুঝি আজ তেল নেই রে ?"

দুখী অস্ফুটে কহিল, "নেই মা—"

মা কহিল গৃহস্থের ঘরে সন্ধ্যেবেলা দীপ জ্বালতে হয় কিন্তু আমার ঘরে আজ আর তা হল না"—এই বলিয়া দরজা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল, "দুখ্, তুলসীতলেও যে আজ বাতি দেওয়া হয়নি বাবা ?"

দুখী কহিল, "তেল নেই মা !"

"না থাকুক গে—শুধু একটা সলতেও না হয় জ্বেলে দিয়ে আয়—"

দুখী উঠিয়া দাঁড়াইল ; অন্ধকারে কোনমতে গৃহের কোণ হইতে সলতে বাহির করিয়া দেশলাই লইয়া বাহির হইবার

সময় মা কহিল, "দুখন প্রণাম করে বলবি মা যেন আমার শীগগীর রক্ষা পায়।"

কথাটার অর্থ দুখী বুঝিল না; কিন্তু চিরদিন যেমন করিয়া না বুঝিয়া, না ভাবিয়া মায়ের আদেশ রক্ষা করিয়াছে, আজো ঠিক তাহাই করিল। বেদীতে দীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "মা যেন আমার রক্ষা পায়।"

হায়! অবোধ ছেলে বুঝিতে পারিল না যে মায়ের এই কথাটার ভিতর এমন কোন গোপন রহস্য থাকিতে পারে যাহা ঘটিলে তাহার পক্ষে মর্ম্মান্তিক ব্যাপার হইবে,—যাহা ঘটিলে সে নিরাশ্রয় হইবে,—যাহা ঘটিলে এ দুনিয়ায় তাহার পানে তাকাইবার আর কেহ রহিবে না; বুঝিতে পারিল না, মা যে তাহাকে এমন করিয়া ফাঁকি দিতে বসিয়াছে, বুঝিতে পারিল না, মা যে তাহার অকূল সমুদ্রে পড়িয়া কূল পাইবার জন্য এতখানি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

রজনী তখন গভীর; দুখী পুনরায় মায়ের পাশে আসিয়া বসিল। মা কহিল, "দুখী, রাত অনেক হয়ে গেছে তুই এখন ঘুমা।"

দুখী মায়ের পাশে শুইয়া পড়িল কিন্তু নিশীথের শুব্ধতার মধ্যে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ আলোড়িত করিয়া শুধু এই প্রশ্নই জাগিতে লাগিল, মা আমার কোথায় যাইবে,—কেমন করিয়া যাইবে? সমস্যার কোন সমাধান হইল না। ভাবিতে ভাবিতে দুখী ঘুমাইয়া পড়িল। নিশান্তে স্বপ্ন দেবী তাহার সহিত খেয়াল করিতে আরম্ভ করিলেন; দুখী দেখিল—চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন; দিগন্ত ব্যাপিয়া দুইদিকে সারি সারি অভ্রভেদী গিরিশ্রেণী উঠিয়া গেছে, তাহার মধ্যে এক অপ্রশস্ত দুর্গম বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ গিরিপথ; আর তাহারই উপর দিয়া মা তাহার রক্তাক্তচরণে ছুটিয়া চলিয়াছে—থামিবার অবকাশ নাই; কত চেষ্টা করিয়াও যেন সে একবার পিছন ফিরিয়া তাহার পানে চাহিতে পারিতেছে না—।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; দুখী কাঁদিয়া উঠিয়া ডাকিল, "মা—!"

"বাবা দুখন।'

দিন তিনেক কাটিয়া গেল। দুখীর মায়ের জীবন নাটকের শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়িবার দিন আসিল।

অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সকাল হইতে পাড়ার লোক আসিয়া একে একে দেখিয়া যাইতে লাগিল। মেয়েরা পাশে বসিয়া—কেহবা লোক-শেখানো, কেহবা প্রাণের আবেগে—কত আক্ষেপ করিতে লাগিল! মজ্জাগত অভ্যাস বশতঃ কেহবা মিছামিছি ফোঁপাইতে লাগিল,—কেহবা সত্য সত্যই প্রাণের টানে সজল চোখ দুটী বার বার আঁচল দিয়া মুছিতে লাগিল; বেশী লাগিল যার, সে দোরের পাশে একটা খুঁটী ধরিয়া কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া জননীর মুখে পানে পলক-হীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এতদিন পরে বুঝিতে পারিল যে মায়ের সমস্ত কথা সত্য, বুঝিতে পারিল যে, মৃত্যু তাহার বাড়ীর অদূরে দাঁড়াইয়া আছে—সময় আর নাই—সে আসিয়া পড়িল বলিয়া।

সকাল হইতে একটা পরিবর্ত্তনের ভাব। লোকজনের আনাগোনা, অঙ্গভঙ্গী এবং সর্ব্বোপরি কথাবার্ত্তার ভাবে সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। বেলা বাড়িতে লাগিল। প্রতিবেশীরা আপন আপন কাজে গৃহে ফিরিয়া গেলে ঘরখানা খানিকটা পাতলা হইল। দুখী মায়ের পাশে আসিয়া বসিল; কিছু সময় ধরিয়া মায়ের মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল; কিন্তু ধৈর্য্য আর বাঁধ মানিল না; তাই সহসা অর্দ্ধ-মৃতা জননীর বিবশ বাহুখানা ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "মা, তোর দুখীকে ফেলে কোথায় যাস্ মা—?"

জননীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সহসা চোখ মেলিয়া, দুই হাত বাড়াইয়া ছেলের মাথাটা বুকের উপর টানিয়া আনিয়া, সে নীরবে, শুধু চোখের জলের ভিতর দিয়া পুত্রের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল। পরে বহুকষ্টে মাথা ফিরাইয়া সুনন্দার পানে চাহিয়া কহিল, "আমার দুখীর তোমরা একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ো—।"

দ্বিপ্রহরে দুখীর মায়ের সংজ্ঞা লোপ পাইল। দুখী পাশে বসিয়া মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতেছিল, এমন সময়ে দীনার মা আসিয়া কহিল "দুখী, গঙ্গা ডাক্তারকে যদি একবার আন্‌তে পারিস, তা হ'লে বলা যায় না জ্ঞান আবার ফিরতেও পারে।"

দুখী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাক্তারের গৃহাভিমুখে দৌড়িতে লাগিল। ডাক্তার তখন আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন; দুখী আসিয়া চোখের জল মুছিয়া

ভৃত্যকে কহিল, "তুমি একটীবার ডাক্তার বাবুকে বলো—"

বাবুর চেয়ে চাকর গরম; ভৃত্য ধমকাইয়া উঠিয়া কহিল, "তুই আবার এসেছিস ? যা, যা, এখন হবে না বাবু ঘুমাচ্ছেন।

"তোমার পায়ে পড়ি একটীবার তুমি ডাক্তার বাবুকে খবর দাও,—না হলে আমার মা আর বাঁচবে না—"।

বাহিরের এই কথাবার্ত্তায় ডাক্তারের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি ভিতর হইতে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "ভোলা, বাইরে এত গোল কিসের রে—?"

ভোলা কহিল "সে দিনের ছেলেটা আবার এসেছে—।"

"বের করে দে হতভাগাকে—"

দিন কয়েক পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই আবার ঘটিল। দুখী বাড়ীর সীমানার বাহিরে দাঁড়াইয়া ব্যর্থ অনুনয় করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন নিরাশ হইয়া পুনরায় বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে, যখন আসিয়া বাড়ীতে পৌছিল, তখন সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া মাকে তাহার প্রাঙ্গণে তুলসীতলে আনিয়া রাখিয়াছে। বাহির হইতে দেখিতে পাইয়া দুখী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া প্রাণহীনা জননীর বুকের পরে লুটাইয়া পড়িয়া ডাকিল, "মা—গো—!"

কিন্তু এখন আর কেহ স্নেহসিক্তকণ্ঠে "বাবা দুখন" বলিয়া জবাব দিল না, পুত্রের ডাকে জননীর মুদিত নেত্র আর উন্মীলিত হইল না!

অবিলম্বেই পাড়ার লোকে বাঁশ বাঁধিয়া, মাচা প্রস্তুত করিয়া, শ্মশানে যাইবার উদ্যোগ করিল। দিনান্তের ক্লান্ত রবির শেষ রশ্মি তখন আকাশের পশ্চিম দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্মশানে আসিয়া পৌছিতে পৌছিতে আকাশে চাঁদ উঠিল। শ্মশানের এক পাশ দিয়া রূপস্ নদী কুল কুল রবে বহিয়া চলিয়াছে। সেই স্বচ্ছ কল্লোলিনীর উপর তখন মধ্যগগনের খণ্ডচন্দ্রের আলো পড়িয়া ঝিক ঝিক করিতেছিল।

চিতা প্রস্তুত হইল, সকলে মিলিয়া দুখীর মায়ের শেষ চিহ্নটুকু তাহারই উপরে স্থাপিত করিল। মন্ত্রপূত অগ্নি যখন চিতাতে সংযোগ করা হইতেছিল, দুখীর হাত হইতে তখন জলন্ত কাষ্ঠ রাশি একে একে করিয়া পড়িতে লাগিল।

চিতা ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠিল, দূরে আসিয়া দুখী প্রণাম করিয়া আর উঠিয়া বসিল না; সুমুখে প্রজ্জলিত চিতানলের পানে চাহিয়াই, কিছু সময়ের জন্য সে জ্ঞান হারাইয়া; ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। ঘণ্টা তিনেক পরে যখন পুনরায় চোখ মেলিল, চিতা তখন প্রায় নিভিয়া গেছে।

শ্রীদিলীপকুমার পুরকায়স্থ

সপ্তম নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন
এলাহাবাদ

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রতি বৎসর এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা এবং সঙ্গীত সম্মেলন হয় এবারে সেই সম্মেলন সপ্তম নিখিল ভারত সম্মেলন নামে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুদূর পাঞ্জাব হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশের গুণীবৃন্দ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এবারকার সভাপতি ছিলেন মাননীয় বিচারপতি উমাশঙ্কর বাজপেয়ী মহাশয় এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, পি এচ্ ডি। ভারতের প্রায় সব প্রদেশ হইতে প্রায় তিন সহস্র গুণী এবং শ্রোতা সমবেত হইয়াছিলেন। প্রথম তিন দিন সকল দেশের এবং সকল বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সঙ্গীত, যন্ত্র, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি প্রতিযোগিতা হয় এবং শেষের তিন দিনে নয়টী জলসার অনুষ্ঠান হয়। খুব সুখের বিষয় গত বারের ন্যায় এবারেও বাংলার ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন ও সমস্ত দেশের অপেক্ষা বাংলা দেশই বেশী পুরস্কার পাইয়াছে।

এবারে বেষ্ট্ মিউজিশিয়ান ফ্যামিলি কাপ এলাহাবাদের ভট্টাচার্য্য ফ্যামিলি পাইয়াছেন, এবং বেষ্ট্ টিচার্স কাপ্ কলিকাতার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী পাইয়াছেন।

ভারতের প্রসিদ্ধ গুণীবৃন্দ যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বরোদার ফৈয়াজ খাঁ, বোম্বাইয়ের নারায়ণ রাওব্যাস ও শ্রীমতী শান্তা অমলাদী, দিল্লীর মজাঃফর খাঁ ও নাথু খাঁ, গোয়ালিওরের পণ্ডিত কৃষ্ণরাও এবং হাফেজ খাঁ, লক্ষ্ণৌয়ের মিষ্টার রতনজনকর, শম্ভুপ্রসাদ, খলিফা আবেদ হোসেন এবং ওয়াজেদ হোসেন, পাঞ্জাবের দীলিপ চাঁদ বেদী, আব্দুল আজিজ্ খাঁ, জয়পুরের মোহনলাল, এলাহাবাদের কুমারী আশা ওঝা, বেনারসের নন্দলাল ও গাপ্পা, মাদ্রাজের নাইডু, কলিকাতার শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল্, শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মন, রায় বাহাদুর কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাস, রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এনায়েৎ খাঁ, সফিউল্লা খাঁ, শ্রীশ্যামকুমার গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীদীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজীতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র, শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, কুমারী সুষমা দে, কুমারী বীণাপাণি মুখার্জ্জী, কুমারী আরতী দাস, কুমারী গীতা দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

যে যে গায়কের গান উল্লেখ যোগ্য নিয়ে তাঁদের বিষয় বলা হইল। প্রথমেই যাঁহার কৃতিত্বের কথা বলা উচিত তিনি বরোদার সভা গায়ক ফৈয়াজ খাঁ। গত বৎসর নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে অনেকেই তাঁহার গান শুনিয়াছেন। তিনি দুদিন গান করেন। তাঁহার অন্যান্য রাগের মধ্যে রামকেলী এবং নট সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। তাঁহার আলাপ বিস্তারের মাধুর্য্য, গমক, দ্রুত তান শুনিবার মত। ভারতের সকলেই তাঁহাকে এখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ গায়ক বলিয়া মনে করেন।

মজাঃফর খাঁর বয়স প্রায় আশী বৎসর। তিনি আড়ানা, বাহার এবং মালকোষের খেয়াল গাহিয়াছিলেন। বৃদ্ধ হইলেও গাহিবার শক্তি এখনও রাখেন। গলায় তিনি সবাইকে হার মানাতে পারেন।

গোয়ালিয়রের কৃষ্ণরাও পণ্ডিত যে একজন গোঁড়াপন্থী তাহা তাঁহার গানে বেশ বোঝা যায়। ইনি গোয়ালিয়রের শঙ্কর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। ইনি ভাঁইরো বাহারের বিলম্বিত খেয়াল গাহিয়াছিলেন। ইঁহার গান শুনিলে যথার্থ গোয়া-লিয়রের ঘর কি, তা বোঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণরতন জানকর ম্যারিস কলেজের অধ্যক্ষ। ইনি

অতি সহজ ভাবে গান করেন। গলার স্বর কম হইলেও ইহার গানে সুরের ও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কানেড়া এবং পরজের খেয়াল খুব ভাল হইয়াছিল।

মথুরার পণ্ডিত চন্দন চৌবে ধ্রুপদ গানের জন্য বিখ্যাত। ইনি তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর বংশপরম্পরায় শিষ্য। ইহার মিড় এবং গমক শুনিবার মত। ইনি প্রথমে তোড়ী এবং শেষ কালে ভৈরবী ঠুমরী গাহিয়াছিলেন।

দিলীপ চাঁদ বেদী আমাদের দেশে বিশেষ পরিচিত না হইলেও গুণী বলা যায়। ইনি ভারতে বিখ্যাত ওস্তাদ ভাস্কর রাওয়ের শিষ্য। উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে ইঁহার যথেষ্ঠ সুনাম আছে। ইনি দেশী তোড়ী ও ঠুমরী গাহিয়াছিলেন। এলাহাবাদে খুব নাম কিনিতে না পারিলেও গুণীদের কাছে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

নারায়ণ রাও ব্যাস্ পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের শিষ্য। ইনি সুরদাসী মল্লার, বাহার এবং মালগুঞ্জরী গাহিয়াছিলেন। রেকর্ডে এঁর যথেষ্ট সুনাম থাকিলেও কলিকাতার শ্রোতার কাছে এঁর গান বোধ হয় ভাল লাগিবে না।

আরও অনেকের মধ্যে নারায়ণ রাও গুণের বলবন্ত রাও এবং কুমারী শান্তাঅমলাদির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শান্তার গলার আওয়াজ অতি মিষ্ট, এবং ধীরে ধীরে গায় বলিয়া ইহার গান বেশ ভাল লাগে।

সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর ঘরের মালিক এবং পণ্ডিত বলিয়া ইঁহার খ্যাতি আছে। ইনি গান সম্বন্ধে অনেক পুস্তক এবং স্বরলিপি লিখিয়াছেন। ইঁহার গান কলিকাতায় প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন। ইঁহার ধ্রুপদের আলাপ অতীব মনোরম হইয়াছিল এবং ইঁহার গান শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি আশোয়ারী এবং গৌড় সারং গাহিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত সঙ্গত করিয়াছিলেন উদীয়মান পাখোয়াজী শ্রীপ্রতাপ মিত্র।

সঙ্গীতাচার্য্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী এখন ভারতের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গায়ক। ইঁহার প্রায় সকল ছাত্রই কোন না কোন পারিতোষিক পাইয়াছেন। বিশেষতঃ এ বৎসর তিনি বেষ্ট টিচার্স ট্রফি লাভ করিয়াছেন। প্রথম দিন নায়িকী কানেড়া এবং ঠুমরী এবং দ্বিতীয় দিন বিলাসখানি তোড়ী এবং ঠুমরী গাহিয়াছিলেন। ইনি অনেক ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করিয়াছেন এবং এখন ইনি ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ খলিফা বাদল খাঁর শিষ্য।

শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, ইনিও বাদল খাঁ সাহেবের প্রিয় শিষ্য, প্রথম দিন জোনপুরী এবং দ্বিতীয় দিন দক্ষিণাবাবুর অনুরোধে দুর্গা ও বেহাগ গাহিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম দিন জোনপুরী শুনিয়া ফৈয়াজ খাঁ, মজাফর খাঁ, শ্রীকৃষ্ণরতন জান্‌কর প্রভৃতি গুণীরা যথেষ্ট তারিফ করেন। এই প্রথমবার তিনি এলাহাবাদ সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করিলেও যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

উদীয়মান গায়ক—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দাস

পণ্ডিত রামকিষণ মিশ্রের নাম কলিকাতায় খুব প্রসিদ্ধ। ইনি পণ্ডিত শিবসেবকের পুত্র। ইঁহাদের ঘরের মতন লয়ের কাজ খুব কম দেখা যায়। ইনি গুর্জ্জরীতোড়ী গাহিয়াছিলেন। এলাহাবাদের বাদক তেওয়ারী ইহার সঙ্গে পারিয়া উঠেন নাই। ভাল সঙ্গত হইলে ইহার গান আরও জমিত।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোপেশ্বর বাবুর সুযোগ্য-পুত্র। ইনি তোড়ী এবং গান্ধারীর খেয়াল গাহিয়াছিলেন। গান খুব ভাল হইয়াছিল। ভবিষ্যতে ইনি ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কুমার শচীন দেব বর্ম্মণের বাংলা গানে নাম হইলেও ধানেশ্রী খেয়াল বাংলা এবং ঠুংরী গাহিয়া সকলকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার 'দখিন পবন' গানটি খুব জমিয়াছিল।

শ্রীঅনাথনাথ বসু পুরুষ এবং মহিলার দুই রকম গলার আওয়াজে গান করেন। ইঁহার বাইজী কণ্ঠের ঠুমরী গান সকলেই বিশেষ ভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দাস বাদল খাঁ সাহেবের অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র এবং সুগায়ক। অতি অল্প সময় পাইলেও গত বৎসরের ন্যায় এবারেও তিনি বেশ ভাল গাহিয়াছিলেন তাঁহার সাহানার খেয়াল এবং পিলুর ঠুমরী খুব জমিয়াছিল। ইঁহার বয়স মাত্র ২১ বৎসর, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ইঁহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী বাংলা দেশের জনপ্রিয় সুগায়ক। ইঁহার সুকণ্ঠের জন্য সকলেই প্রশংসা করেন। ইনি ধ্রুপদ গান করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ এঁর গান ভাল জমে নাই।

শ্রীযুক্ত রথীন চট্টোপাধ্যায়ের 'শঙ্করা,' শ্রীযুক্ত যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ধানেশ্র, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আড়ানা এবং শ্রীমান সুধীর চক্রবর্ত্তীর তিলং বেশ ভাল হইয়াছিল। মেয়েদের মধ্যে কুমারী সুষমা দে, কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, কুমারী গীতা দাস (গীতশ্রী), কুমারী আরতী দাস, কুমারী শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুমারী বিভাষ দেববর্ম্মণের গান বেশ ভাল হইয়াছিল।

তবলায় এখন যাঁহারা ভারত প্রসিদ্ধ, খলিফা আবেদ হোসেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। লক্ষ্ণৌয়ে ইহার বাসস্থান এই জন্য এঁর ঘরোয়ানাকে লক্ষ্ণৌ বাজ্ বলে। ইনি খুব সুন্দর সঙ্গত করিয়াছিলেন।

খলিফা নাথ খাঁ এই প্রথম এলাহাবাদে আসিলেও ইনি একজন প্রসিদ্ধ গুণী ইঁহার দিল্লীতে বাস বলিয়া ইঁহাকে দিল্লীর বাজ্ বলে। ইনি খুব মিষ্ট সঙ্গত করিয়াছিলেন।

ওয়াজেদ হোসেন খাঁ খলিফা আবেদ হোসেন খাঁ সাহেবের শিষ্য এবং জামাতা। ইঁহার হাত বেশ তৈয়ারী এবং বাঁয়ায় কাজ খুব ভাল। পশ্চিমে ইঁহার নাম যথেষ্ট আছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এল মহাশয় এখন ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক। ইনি খলিফা আবেদ হোসেনের প্রিয় শিষ্য। ইনি এলাহাবাদে গিরিজা বাবু, ভীষ্মদেব বাবু, শচীন বাবু, আলাউদ্দীন এবং ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সঙ্গে সঙ্গত করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে বাঙ্গালীর সাফল্যের জন্য গিরিজা বাবু এবং হীরু বাবুর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

যন্ত্র এবং নৃত্য সম্বন্ধে আগামী মাসে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
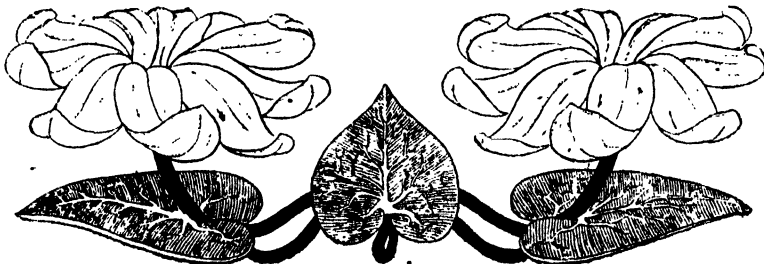
কংগ্রেসের সুবর্ণ-জয়ন্তী

বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের (১৯৩৫ সালের) শেষ সপ্তাহে কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুবর্ণ-জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এইজন্য বিশেষ করে ২৮শে ডিসেম্বর দিনটি ধার্য্য করা হয়েছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের উৎপত্তি। এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্য দিয়ে এই জাতীয় মহাপ্রতিষ্ঠানটি নানাবিধ আপদ বিপদ ঝঞ্ঝা ঝটিকা অতিক্রম করে আজ সুবর্ণ-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে এসে পৌঁছেছে। কংগ্রেসের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে সময় সময় কংগ্রেসের আদর্শ ও পদ্ধতির মধ্যে মতভেদ এবং বৈষম্য উপস্থিত হয়েছে ; কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের হিতৈষনাই কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না যে উত্তরোত্তর এই কংগ্রেস ভারতবর্ষের জনসমষ্টির উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছে। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে আশা করা যায় যে আগামী জয়ন্তী উৎসব সর্ব্বত্র সফলতা দ্বারা মণ্ডিত হবে।

দীপনারায়ণ সিংহ

বিহারের জনপ্রিয় নেতা দীপনারায়ণ সিংহ সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর তেজনারায়ণ সিংহ দীপনারায়ণের পিতা ছিলেন। তিনি ভাগলপুরে তেজনারায়ণ-জুবিলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত করে বিহারাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করেন। শিক্ষা লাভের জন্য দীপনারায়ণ তাঁর পিতা কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত হন এবং ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে ফিরে কিন্তু তিনি আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন নি, দেশের প্রগতিবিধান কল্পে রাজনৈতিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তার ফলে তাঁকে নানাবিধ দুঃখ কষ্ট ভোগ এমনকি কারাবরণ পর্য্যন্ত করতে হয়েছিল। দীপনারায়ণ অতিশয় উদারহৃদয় অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন বলে ভাগলপুরের বাঙ্গালীদের তিনি অকৃত্রিম বন্ধুত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে দীপনারায়ণের বয়ক্রম ৬০ বৎসর হয়েছিল।

মোহান্ত সন্তদাস বাবাজী

বিগত ৯ই নভেম্বর বৃন্দাবন যাত্রার পথে ব্রজবিদেহী মোহান্ত শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী দেহ রক্ষা করেছেন। ইনি গুরু কাঠিয়া বাবার তিরোধানের পর বৃন্দাবনের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মোহান্ত পদে অধিষ্ঠিত হ'ন। ইনি বাঙ্গালী ছিলেন, গার্হস্থ্যাশ্রমে এঁর নাম ছিল তারাকিশোর চৌধুরী। শিক্ষা শেষ করে তারাকিশোর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর যথেষ্ট পসার হয়। কিন্তু পরে সংসারের প্রতি মন বিমুখ হয় এবং সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যে এবং ধর্ম্ম-প্রাণতায় বৃন্দাবন অঞ্চলে তিনি সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মৃত্যুকালে বাবাজীর বয়স ৭৬ বৎসর হয়েছিল।

কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায়

বারুইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, লীলা চট্টোপাধ্যায় মাত্র ৬ মাসের মধ্যে সুবিখ্যাত সন্তরণ শিক্ষক শ্রীযুক্ত শান্তিপালের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তা সত্যই বিস্ময়জনক।

কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায়

এঁর বয়স মাত্র ৯ বৎসর এবং বর্ত্তমানে ইনি সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের একজন সভ্য। শ্রীমতী লীলার সাঁতার শেখবার ধৈর্য্য ও আগ্রহ এত বেশী যে প্রত্যহ তিনি বারুইপুর হ'তে কলিকাতা আসা যাওয়া করেন। বর্ত্তমান বৎসরে বালিকাদের সকল প্রতিযোগিতায় লীলা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন; কেবলমাত্র বয়স্কা মহিলাদের অল্পদূর সাঁতার প্রতিযোগিতায় লীলা বিখ্যাত মহিলা-সাঁতারু শ্রীমতী বাণী ঘোষের সহিত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কিন্তু হুগলীতে একটি মহিলা-প্রতিযোগিতায় উক্ত বাণী ঘোষকে পরাজিত করে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কুমারী বেলারাণী সরকার

কুমারী বেলা সরকার সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্রী। মাত্র ৬ বৎসর বয়স হতে বেলা বালী ব্রিজ হ'তে বেনীয়াটোলা ঘাট পর্য্যন্ত ৭ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পর পর ৩ বৎসরই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভবানীপুর সুইমিং এসোসিয়নের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ক্রমান্বয় ৩ বৎসর প্রথম হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এবং বর্ত্তমান বৎসরে আনন্দ মেলার উদ্যোগে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের অনুষ্ঠিত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ৩টি বিষয়ের মধ্যে ২টিতে প্রথম স্থান এবং একটিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সি গ্রুপ প্রতিযোগিতার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছেন।

কুমারী বেলারাণী সরকার

সঙ্গীত বিদ্যাতেও এই বালিকার কৃতিত্ব সামান্য নয়। বর্ত্তমান বৎসরে এলাহাবাদে নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় বেলা ধ্রুপদ গানে বালিকাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করে সকলকে চমৎকৃত করেন। একাধারে দুইটি বিভিন্ন গুণের এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ কদাচিৎ দেখা যায়।

কলিকাতায় মোটর শিল্প

আমরা অবগত হয়ে সুখী হলাম যে স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকারের পৌত্র শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু সম্মিলিত হয়ে একটি মোটরকার নির্ম্মাণ করবার কারখানা স্থাপন করবার জন্যে ব্যবস্থা করেছেন। সুধীন্দ্র বাবুর বন্ধুগণ ফোর্ড মোটর কোম্পানী ও মরিস্ মোটর কোম্পানীতে চার বৎসর ধরে মোটর নির্ম্মাণ কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। সম্ভবতঃ আগামী মাসে Motor Industries Limited নাম দিয়ে তাঁরা একটি যৌথ কারবার স্থাপন করবেন এবং প্রথম পাঁচলক্ষ টাকার মূলধন তাঁরা নিজেদের মধ্য হতেই সংগ্রহ করবেন। আধুনিক যন্ত্রাবলী আনাবার জন্য আমেরিকার সহিত পত্র-ব্যবহার চলছে।

এই শিল্পের উদ্যোক্তারা ফ্যাক্টরী-গৃহ স্থাপন করবার জন্য ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে এবং লিলুয়ায় স্থান পরিদর্শন কচ্ছেন। আগামী বৎসর পূজার পূর্ব্বে গাড়ী তৈরী করে বার করতে পারবেন বলে তাঁরা আশা করেন। ফ্যাক্টরী সংক্রান্ত যাবতীয় ভার সুধীন্দ্র বাবু ও তাঁর বন্ধুগণ ভাগ করে নেবেন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত ভার মিঃ এম এন ব্যানার্জ্জী এম এ, বি এল গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে কেহ কোন অনুসন্ধান বা পরামর্শ করতে ইচ্ছুক হ'লে যে কোন দিন সকালে ৩২।১০ বিডন ষ্ট্রীট এ শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সরকারের সহিত দেখা করতে বা তাঁকে পত্র লিখতে পারেন।

কবি নোগুচি ও বেঙ্গলী পি, ই, এন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে প্রসিদ্ধ জাপানী কবি নোগুচি ভারতবর্ষে এসেছেন একথা সকলে বিদিত আছেন। বিগত ৮লা ডিসেম্বর ৫॥০টার সময় বেঙ্গলী পি, ই, এন ক্লাব কবি নোগুচিকে নিমন্ত্রিত করে হোটেল ম্যাজেষ্টিকে একটী সম্বর্দ্ধনা সভা অনুষ্ঠিত করেন। ঐ সভায় কবি নোগুচি তাঁর রচিত কয়েকটি জাপানী কবিতা ও তার ইংরাজী অনুবাদ আবৃত্তি করে শোনান। পি, ই এন ক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক ডঃ কালিদাস নাগ ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু মহাশয়ের যত্নে সেদিনকার অনুষ্ঠানটি মনোরম হয়েছিল।

মেগাফোনের রজত-জয়ন্তী

ব্যবসায়ের ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় মেগাফোন কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও শিল্পবৃন্দ গত ২১শে নভেম্বর রূপমহল রঙ্গমঞ্চে মেগাফোনের প্রতিষ্ঠাতা ও সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষকে মেগাফোনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে মানপত্র প্রদান করেছিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জজ্জ কুপার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়েকজন মেগাফোনের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত অনিলমোহন সেনগুপ্ত বলেন যে, ১৯১০ সালের ২১শে নভেম্বর জিতেন্দ্রনাথ মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সাইকেল ও গ্রামোফোনের একটি ক্ষুদ্র দোকান খোলেন। উক্ত যন্ত্রগুলি মেরামত করবার সময় তাঁর স্বদেশী গ্রামোফোন যন্ত্র তৈয়ার করবার ইচ্ছা প্রবল হয় এবং শীঘ্রই তিনি নিজ হস্তে একটি গ্রামোফোন যন্ত্র তৈয়ার করেন ও তার নাম দেন মেগাফোন। স্থায়িত্বে, গঠনসৌন্দর্য্যে ও স্বরমাধুর্য্যে মেগাফোনের যন্ত্র যে কোনো বিদেশী যন্ত্রের সমকক্ষ হওয়ায় শীঘ্রই ইহা বাজারে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্ত্তমানে ভারতে ও ভারতের বাহিরে মেগাফোন মেসিন সমাদৃত হয়েছে। অতঃপর জিতেন বাবু স্বদেশী রেকর্ড প্রস্তুতের প্রতি দৃষ্টি দেন ও শীঘ্রই বাজারে মেগাফোন রেকর্ড বাহির হয়। মেগাফোন মেসিনের ন্যায় মেগাফোন রেকর্ডও

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ

সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়েছে। বাঙ্গালী যুবকের অধ্যবসায়, সৃজনী শক্তি, স্বদেশপ্রীতি ও সততা ২৫ বৎসরের ক্ষুদ্র বিপণিকে বিরাট শিল্প-কারখানায় পরিণত করেছে। গত ১২ই ডিসেম্বর জিতেন বাবু কর্ম্মচারী শিল্পীবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীদের নিমন্ত্রিত করে আপ্যায়িত করেছিলেন। জিতেন বাবু স্বয়ং এবং প্রচার বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা অনিলমোহন বাবুর সাদর সম্ভাষণে সকলেই পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। আমরা মেগাফোন কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

শ্রীকেমিকেল ওয়ার্কস

শ্রীকেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের নমুনা পেয়ে ব্যবহার করে আমরা সন্তোষলাভ করেছি। তৈলটি মনোরম সুমিষ্ট সুরভিযুক্ত ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক বলে মনে হয়।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Saratchandra Mukherjee at the Sahitya-Bhaban Press, 26, Sitaram Ghose Street, and Published by the same from 27-1, Fariapooker St. Calcutta.